ভারতবর্ষ

চৈত্র ১৩৭৩

৫৪তম বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৭৩—জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১০ই আষাঢ়ের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

পৌষ—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সমাধি

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

হে জনাঅপরিজ্ঞাত আত্মা বো দুঃখসিদ্ধয়ে।

পরিজ্ঞাস্বনায় সুখায়োপশমায় চ ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

"হে শোক তাপিত জনগণ! আত্মা যতক্ষণ অপরিজ্ঞাত ততক্ষণ তোমার দুঃখোদ্ভব আর যখন আত্মা পরিজ্ঞাত হবে তখন আসবে পরমা শান্তি। আত্মজ্ঞানেই সমস্ত দুঃখের উপশম ঘটে। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের বিভ্রান্তি নেই। বশিষ্ঠ বলেন পৃথিবীতে চার রকম মতবাদ•প্রচলিত আছে তার প্রথম তিনটি ভ্রান্ত চতুর্থটি গ্রাহ্য। কেহ বলেন আমি দেহ, কেহ বলেন মন, কেহ বলেন সর্ব্বভাবাতীত সূক্ষ্ম পদার্থ আর চতুর্থ মতে দেহ, আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি তুরীয় অবস্থায়, সেই প্রবুদ্ধ অবস্থায় আমরা ব্রহ্মই হয়ে যাই—(প্রবুদ্ধানাং মনোরাম ব্রহ্মৈব হি নেতরৎ—হে রাম, প্রবুদ্ধ অবস্থায় মানুষের মন ব্রহ্ম স্বরূপই ইতর বস্তু নয়)। ডাঃ মতিলাল দাস।

মানুষ খোঁজে শান্তি, আনন্দ পায় দুর্ভোগ অশান্তি ("Pain is the fundamental fact of life, where ever life is there is pain)" এই দুঃখ তাপে জর্জরিত হইয়াই মানুষ, খোঁজে ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ বা উপায় তাই দুঃখবাদই ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ও নাস্তিক, সর্ব্ব দর্শনের মূল সূত্র (the Principal system of philosophy in india starts from

বিষয় করিবে কিরূপে? কিন্তু সমাধিতে সেই তত্ত্বের উপলব্ধি হয় নির্মল নিশ্চল নিরবচ্ছিন্ন আকাশবৎ স্বয়ং সংরূপে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয় বিষয়ী ভেদ বর্জ্জিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-বর্জ্জিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে এবং আনন্দ অর্থাৎ স্বয়ং পূর্ণতার আস্বাদনরূপে নির্বিকল্প সমাধিতে তা উপলব্ধি করা যায়।

সত্যমেকমজং নিত্যং অনন্তং চাক্ষয়ং ধ্রুবম্।
জ্ঞাত্বা যস্তু বদেদ্ ধীরঃ সত্যবাদী স উচ্যতে॥

সত্য এক অজ (উৎপত্তি রহিত) নিত্য [বিনাশ রহিত] অনন্ত (সীমারহিত) অক্ষয় [বিকার রহিত] ও ধ্রুব [সংশয়াতীত বাস্তবতত্ত্ব] এই সত্য জানিয়া যে ধীর ব্যক্তি শুধু এই বিশুদ্ধ সত্যের কথাই বলেন তিনিই বস্তুতঃ সত্যবাদী। গোরক্ষনাথ মতে "ক্ষেত্রজ্ঞ (ব্যষ্টি আত্মা) এবং পরমাত্মার [বিশ্বাত্মার সংযোগঃ যোগ নামে আখ্যাত] হয় [সংযোগঃ যোগ ইত্যাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মনোঃ]।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেমন ভগবানকে লাভ করার বহু উপায় বা পথ আছে তেমনি সমাধি লাভ করার বহু পথ বা উপায় আছে। যোগপথে সমাধি লাভ করা অতীব সুকঠিন এবং এক জন্মে তাহা সম্ভব নয় কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই তা ঘটে থাকে, কিন্তু এই যোগপথ ছাড়াও অন্য পন্থা আছে যার সাহায্যে সহজে ও সত্বর সমাধি লাভ করা সম্ভবপর, যদি কারো সে দৃঢ় বাসনা থাকে। শ্রীঅরবিন্দের মতে চিত্ত নিরুদ্ধ করতে পারলেই তা সম্ভব হয় এবং তার উপায় বা পন্থা "আমরা জানি না যে চিন্তা-প্রবাহ বাহির হতে মস্তিষ্কে এসে প্রবেশ করে কিন্তু মনকে শান্ত করে যদি চিন্তা স্রোত বাহির হতে মস্তিষ্কে এসে প্রবেশ করে এবং তা যদি সময়কালে রোধ করতে পারি তাহলে অতি সহজেই মনকে প্রশান্ত করতে পারা যায়। যদিও এ পথ সুকঠিন এবং সকলেই তা পারে না, কিন্তু একবার তা করতে পারলেই ব্রহ্মোপলব্ধির ইহাই শীঘ্রতম সবল পন্থা। "There is a third, an active method by which one looks to see where thoughts come and finds they come not from one's self but from out side the head as it were, if one can ditect them coming, then before they enter, they have to be thrown away altogether. This is perhaps the difficult way and not all can do it, but if can be done it is the shortest and most powerful road to silence."— Sri Aurobindo

জোর করে মনকে প্রশান্ত (silence) করা যায় এবং তাহলেও অল্প দিনে তা হয় না কিন্তু ধৈর্য্য ধরে নিরন্তর চেষ্টা করলে তাও সম্ভবপর হয়। এই সব সুকঠিন পথ ছাড়াও সমাধি লাভ করার মধ্যবর্তী ও সহজ পন্থা আছে এবং সেই পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য দুই এক বৎসরই যথেষ্ট, যদি সঠিকভাবে পথের নিয়মগুলি পালন করা যায়।

যোগপথে মাত্র সবিকল্প সমাধি লাভ করতেই বহু জীবন কেটে যায়, কারণ সাধককে ধাপে ধাপে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে উঠতে হয়—কোন স্তর বাদ দেওয়া চলে না বা সোজা একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যপথে তা সম্পূর্ণ সম্ভব ও স্বাভাবিক। আমার নির্বিকল্প সমাধির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে প্রায় দশ মাস লেগেছিল: সবিকল্প সমাধি আপনিই এসেছিল অথচ এর জন্য আমাকে কোন প্রচেষ্টা করতে হয়নি (To ascend is easier than to bring down...while the few who have this consciousnees liberated from Ignorance go straight up," Sri Aurobindo), চেতনাকে যে কোন প্রকারেই হোক একবার সহস্রার ভেদ করতে পারলেই তা সম্ভব হয়, এর জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে ধ্যান ধারণা করা বা আসন নিয়মাদিরও কোন প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি না নাভিমূলে আমাদের শরীরে চেতনা জন্মজন্মান্তর ধরে আবদ্ধ আছে একবার তা উপরে তুলে সহস্রার ভেদ করতে পারলেই অতি সহজেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অতীতে আমিও বহুবার করেছি [ব্রহ্মজ্ঞানটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে] এবং এই পথকেই তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়ারা নিয়েছিলেন। "অশরীরী কেহ এই শরীরের ভিতরই লুকাইয়া আছেন। যে তাঁহাকে জানিতে পারে সে মুক্ত হয়। সুতা স্বরূপ শরীরের ভিতরে এই অশরীরী হইতেছেন ভগবান বুদ্ধ। এই বুদ্ধ আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের সহজ স্বরূপ।

তিনি শরীরের ভিতর কোথায় থাকেন? সহজিয়াগণ বলেন, তিনি বজ্রস্বরূপ বা সহজ স্বরূপ···তাই তিনি বাস করেন বজ্রকায়ে বা সহজকায়ে। আমরা বাস করিতেছি নির্ম্মাণ কায়ে—এই নির্ম্মাণ কায় হইতে সহজ কায়ে পৌছিয়া সেই বুদ্ধকে দর্শন করিতে হয়। তিনি মহা-সুখের স্বরূপ, আর সহজকায়ই মহাসুখ কায়। আমাদের দেহের মধ্যে এই চারিটি কায় কোথায় অবস্থিত? নাভি দেশে। তান্ত্রিক মতে যেখানে মণিপুর চক্র অবস্থিত তাহাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের নির্ম্মাণকায়। হৃদয়ে অবস্থিত অনাহত চক্রই সম্ভোগকায়, কণ্ঠে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্রই ধর্ম্মকায় আর তান্ত্রিকদের সহস্রার সহজিয়াগণের বজ্রকায় বা সহজকায় বা মহাসুখকায়। এই নাভিদেশে নির্ম্মাণকায়ে প্রথমে বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিতে হইবে।”

শ্রীক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী ॥

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের পথও তান্ত্রিকগণের মত সুকঠিন। আমি একবারেই সোজা সহস্রার ভেদ করেছিলাম অন্য কোন চক্রে না থেমে, তাই অন্য কোন চক্রের অভিজ্ঞতা আমার নেই, এক ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া, অবশ্য আমি অদিতির (Inconscient) সঙ্গে একীভূত হয়েছি যা অতীব সুকঠিন কিন্তু তা এই চক্রগুলির মধ্যে পড়ে না, তা এই সব চক্রের নীচে পায়ের তলায় পড়ে, (“অব-চেতনা পাথরের মত জড়স্তর, কঠিনতম, জনমানবহীন মহাপ্রদেশ, পূর্ব্বযোগীরা প্রাণস্তরের নীচে নামেনি। তাঁরা ঠিকই করেছেন”···শ্রীঅরবিন্দ)। অতীতে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অধিমানস (Orermental) জগতের দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য বা মহাকালী বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে একত্ব লাভের বা চৈত্যপুরুষের সাড়া পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার পথ অবশ্য মহাকালীই খুলে দিয়েছিলেন, তাঁর দিব্য স্পর্শে বার বর্ষ বয়সে আমাদের গায়ের রং বদলায়, বুদ্ধদেবের কৃপায় পাই রোগমুক্তি ও অধ্যাত্ম অনুভূমি। সম্ভবতঃ এঁদের কল্যাণে আমাকে এত সব লাভ করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি বা বাধা বিপত্তি দুর্ভোগ কিছুই ভোগ করতে হয়নি (“All who enter the spiritual path have to face the difficulties and ordeals of the path”, “Sri Aurobindo), সাধনার পথ যে দুর্গম তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু যাঁরা ভগ-বানের উপর বা ইষ্টের উপর নির্ভর করতে পারেন তাঁদের এসব দুর্ভোগ ভুগতে হয় না (It is a lesson of life that always in this world every thing fails a man. only the divine does not fail him if he turns entirely to the divine “Sri Aurobjndo]। কিন্তু ভগবানের উপর ভক্তি রাখা খুব সহজ কথা নয় বিশ্বাস তো আরো দূরের কথা।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যারা ত্রাটকসিদ্ধ তাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে দুই একমাস সময়ই যথেষ্ট এবং এটাই সহজতম পথ। আমি “ওঁ” মন্ত্রজপ, ত্রাটক ও গীতার কর্ম্মযোগ, তিনটিই একত্রে একসময়ে করেছিলাম, তবে বেশী কিছুই করিনি- অথচ প্রায় দশ মাসে ঐগুলি একত্র করায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় বা দুশ্চিন্তা সকলেরই কম বেশী কিছু আছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পর আমার মৃত্যুভয় চলে গেছে। আমি জানি মৃত্যুতে বা মৃত্যুর পর মুক্তাত্মার ব্রহ্মভাবই থাকে। তার দুঃখ কষ্ট মায়া মোহ ইত্যাদির কোন লেশমাত্র থাকে না। আর একটা কথা—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আনন্দানু-ভূতি থাকে না, নির্ব্বিকল্প সমাধি শুদ্ধ চেতনার এক অংশ-মাত্র আর তা গভীর অন্ধকারময় পরাশান্তি, নিস্তব্ধতা এবং তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের এক অংশ মাত্র, পূর্ণ নয়। আনন্দ সেখানে আছে গুপ্তভাবে এবং তার প্রমাণ মেলে সমাধি হতে স্থূলদেহে নেমে এলে পর, আগে নয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি ও সবিকল্প সমাধিকে অতীতে বহুবার গভীরভাবে পরীক্ষা করেছি। এতে ভ্রমের কোন স্থান নেই। কোন সমাধিই জাগ্রত অবস্থায় লাভ করা যায় না বা জাগ্রত সমাধি হয় না। আর একটি বড় কথা ব্রহ্মজ্ঞানী বা নির্ব্বাণীরা লয় হয়ে যান না, তাঁরাই জগতের প্রকৃত কল্যাণকামী এবং জগতের কল্যাণের জন্য তাঁরাই যে আবার জন্ম নেন শাস্ত্রে তার দৃষ্টান্ত আছে। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের চোখ-মুখ দেখলেই চেনা যায়, যারা শ্রীঅরবিন্দ বা রমণ মহর্ষিকে দেখেছেন এ সত্য তারা ভালো করেই জানেন (ব্রহ্ম বিদ্ ইব সৌম্য প্রতিভাসি···সৌম্য তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছ]।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য ধ্রুবমর্থদম্॥

কিশোর বয়স থেকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করবেন। কারণ এই মনুষ্য জন্ম দুর্লভ হলেও অনিশ্চিত।"

যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে বলিষ্ঠ দেহ, প্রাণ ও মনের বিশেষ প্রয়োজন। দুর্ব্বল লোকের পক্ষে কদাপি যোগে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বলেছেন—"দুর্লভ এমন কোনও বস্তুই জগতে নাই যাহা উদ্যমশীল বীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না।" বীর ছাড়া যোগে সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব কারণ সাধককে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। ক্ষুরস্য ধারা যোগের পথ, এপথে সাধককে, একলাই চলতে হয় (Prepare thyself, for thou have to travel alone. The teacher can but point the way." The vice of the silence), সাধন পথের প্রধান বাধা মন, এই মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ ("মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"—অমৃত-বিন্দু উপনিষৎ) এই মনকে একবার মায়া মুক্ত করতে পারলেই সিদ্ধিলাভ করা সহজ হয়ে আসে, মনকে জোর করে জয় করা অসম্ভব, মনের প্রভু হওয়া খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু তা সম্ভব ("The beginings are difficult for most and at no time it is really easy—" sri aurobindo) । বুদ্ধদেব বারবার বলেছেন "গম্ভীরাং প্রজ্ঞাপরমিতাং। তাঁকে সহজে লাভ করা যায় না, তথাগতত্ব, বুদ্ধত্ব স্বয়ম্ভুত্ব বা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা অতি দুরূহ। এইই সাংখ্যের জ্ঞানমুক্ত, বৌদ্ধের অর্হত্ব, জৈনদের কৈবল্য, বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, নাথ সম্প্রদায়ের মহাজ্ঞান।

এই সব বিভিন্ন যোগপন্থার কোনটাই সোজা নয় ("sharp as the blade of a razor, long and difficult and hard to cross : swami vivekananda) । এগুলি বহু পরীক্ষিত সত্য, ভক্তির পথও সোজা নয় ("Even bhakti is not easy and nirvana for most men more difficult than that," sri aurobindo)। সব চেয়ে সহজ পথ শারীর চেতনাকে নাভিকেন্দ্র হতে ত্রাটক অভ্যাস দ্বারা সহস্রার ভেদ করা এ করা সহজ ("arise ! awake ! stop not till the goal is reached" swami vivekananda) । যতক্ষণ সিদ্ধি লাভ না হয় ততক্ষণ থামতে নেই। একটা বড় কথা সাধনার একটি স্রোত আছে (There is a stream of sadhana" sri aurobindo) এবং এর কথা শ্রীবিজয় কৃষ্ণও বলে গেছেন, ঐ স্রোতাপত্তিটি লাভ করা চাই, যা অনুনাম অজপা, এটাই সিদ্ধির অগ্রদূত বা অমোঘ সংকেত। আমার কোন দীক্ষা গুরু নেই, এক মহাকালী কৃপা ছাড়া আগে আর কারো কৃপা পাইনি, দীক্ষা সাহায্য, মন্ত্র কোন কিছুরই আমার প্রয়োজন হয়নি।

ভগবান্ শ্রেষ্ঠ গুরু তাঁকে একবার আত্ম সমর্পণ করতে পারলে আর ভাবতে হয় না "heaven's call is rare—rare the heart that heads" (sri aurobindo আমি তাই করেই সিদ্ধি লাভ করেছিলাম, লোকে আমাকে জুয়াচোর মনে করে। ভগবান লাভই মনুষ্য জন্মের মূল উদ্দেশ্য (to turn to the divine is the only truth in life" sri aurobindo) ।

"হে গার্গী! যাহারা অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ব্ব এ আনন্দ যাহা অক্ষয় ও অমৃত স্বরূপ তাহাকে বিদিত না হইয়াই এই লোক হইতে চলিয়া যান তাহারা বড় দুঃখী। শ্রীঅরবিন্দ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

অক্ষরাম অম্বরান্তধৃতেঃ (১০)

কস্মিন খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ?

স হোবাচ এতদবৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম অনণু অহ্রস্বম অদীর্ঘম অলোহিতমস্নেহম অচ্ছায়ম অতমো অবায়ু অনাকাশম অসঙ্গম্ অরসম অগন্ধম অচক্ষুষ্কম অশ্রোত্রম অবাক ইত্যাদি ৩।৮।৭-৮

গার্গী যখন যাজ্ঞবল্ক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন
আকাশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর তিনি দেন
ইহা অক্ষর ইহার মহিমা ব্রাহ্মণগণ কয়
নহে স্থূল ইহা নহেক সূক্ষ্ম হ্রস্ব দীর্ঘ নয়
লোহিত এমন নয়
নহে তরলতাময়
ছায়া নয় ইহা অন্ধকার না আকাশ ইহা না হয়
আসক্ত নহে রহে রসময় গন্ধ সক্ত নয়।
চক্ষুষ্মান সে নহে সেই জন কর্ণ বাক্য হীন
তাঁর বর্ণনা বর্ণিতে গেলে ভাষা হার মেনে দীন।
এই অক্ষর পরমাত্মাই অম্বরান্তধৃতেঃ জন
আকাশ হইতে নিচে যাহা আছে সকল ধরিয়া রন
ব্রহ্মের কথা হয়
অন্য কিছুই নয়
অম্বর মানে আকাশের সেই অন্ত যেখানে হয়
পারভূত যাহা প্রকৃতি প্রধান সবেরে যে ধরে রয়।

সা চ প্রশাসনাৎ (১১)

সা (অক্ষর কর্তৃক অম্বরান্তধৃতি) প্রশাসনাৎ প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা।

শঙ্কর কন ইহার অর্থ প্রকৃতি প্রধান নয়
যাহার শাসনে চন্দ্র সূর্য্য আপনি সে ধৃত হয়
অচেতন যেই জন
কি ভাবেতে ধরে রন
এই অক্ষর ব্রহ্ম জানিও সবেরে ধারণ করে
তাঁহার প্রকাশ বর্ণিতে যেই ভাষা ও বুদ্ধি হারে।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ (১২)

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাবের নিবারণ করা হয়
অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কারে বলা নয়

"তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ"।

শুনগো গার্গী এই অক্ষর দৃষ্ট কাহার নন
শুনিবারে পান তবু কারো দ্বারা শ্রুত তিনি নাহি হন
দেখিবারে তিনি পান
দৃষ্ট কাহারো নন
শুনিবারে পান শ্রুত নাহি হন অক্ষর যেই জন
প্রকৃতি প্রধান অচেতন জন এর অধিকারী নন।

পুনশ্চ শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ অতোঽস্তি শ্রোতৃ"

ইনি ছাড়া আর দ্রষ্টা জানিও কোনখানে কেহ নাই
আমাদের কথা শুনিবার তরে হেন
শ্রোতা কোথা পাই
জীবাত্মা কথা নয়
ব্রহ্মের কথা হয়।

ঈক্ষতি কর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ (১৩)

ঈক্ষতির কর্মরূপে উল্লেখ যে হয়
এ কারণে জেন ব্রহ্ম ছাড়া কেহ নয়।

প্রশ্নোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়—

এতৎ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যৎ ওঁকারঃ তস্মাৎ বিদ্বান এতেন এব আয়তনেন একতরম অন্বেতি।"

হে সত্যকাম ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম হয়
ওঁকার ধ্যানে সাধনার দ্বারা একটিকে পাওয়া।

পরে আছে—যঃ পুনঃ এতম ত্রিমাত্রেণ ওম ইতি এতেন অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়তি—স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ
যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্মুক্তঃ
সনামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম

স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম
পুরিশয়ম পুরুষম ঈক্ষতে।
ওঁম এই তিনমাত্রাযুক্ত অক্ষর যেই ধরে
পরম পুরুষে এই মন্ত্রেতে ধ্যান যেই জন করে
সূর্য্যের সাথে মিশে
এক হয়ে যায় যে সে
সর্প যেমন খোলস হইতে মুক্ত যেমন হয়
সব পাপ হতে জেন সেই জন মুক্তি তেমন পায়।
সামগণ তাকে সাথে করে লয়ে ব্রহ্ম
লোকেতে যায়
উৎকৃষ্ট সেই জীবঘন হতে শ্রেষ্ঠ পুরুষে পায়
পরম পুরুষে দেখে
তন্ময় হয়ে থাকে
পরম পুরুষ ব্রহ্মই জেন অন্য ত কেহ নয়
বাক্যের শেষে ঈক্ষতি ধাতু কর্ম রূপেতে রয়।
জীব ঘন মানে জীবরূপ ধরি পরমাত্মাই রয়
জীবে শিব হেরি জ্ঞানীজন তাই সুখেতে
বিভোর হয়
ওঁকারে ধ্যান করে
ফল যেই লাভ করে
সীমা আছে তার ব্রহ্মে স্মরিলে অসীম ফল সে পায়
কন শঙ্কর ওঁকারে জেন অসীমে লাভ না হয়।
দহর উত্তরেভ্যঃ ১৪
ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়
"অথ যদি দম অস্মিন অন্তরাকাশঃ তস্মিন যদন্ত তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম। ৮।১।১

ব্রহ্মপুরেতে কমলরূপেতে এই গৃহ জেন রয়
ক্ষুদ্র এ গৃহ ক্ষুদ্র আকাশ জেন এর মাঝে হয়
তাহার মধ্যে আছে জেন সেই
খুঁজিবে তাহারে জেন সেথা নেই
তাহারে জানিতে হইবেই জেন নহিলে কিছুই নয়
ব্রহ্মপুরেতে কমল গৃহেতে অধরা সেজন রয়।
দহর নামে যে ক্ষুদ্র আকাশ সেজন ব্রহ্ম হয়
শ্রুতিতে বলেছে উত্তরেভ্যঃ এই থেকে জানা যায়
"তস্মিন যদন্ত তদন্বেষ্টব্যং"
বাহির আকাশ যত বড় হয়
ভিতর আকাশও তেমনি যে রয়
ইহার ভিতর পরমাত্মা সে সত্যকামত্ব রয়
সত্যসংকল্প প্রভৃতি গুণেতে সেজন সত্যময়।
গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং [১৫]
গতি ও শব্দ এ দুটি কথাতে ব্রহ্মরে বোঝা যায়
শ্রুতির মাঝেতে দহর আকাশে বর্ণনা এই হয়
ব্রহ্মলোকেতে যত প্রাণী যায়
ব্রহ্মেতে তবু জানে নাত হায়
এই গমনের উল্লেখ হেতু এই কথা বোঝা যায়
দহর আকাশ ব্রহ্ম, জীবেরা সুষুপ্তিতে তা পায়।
এরূপ শব্দ শ্রুতিবাক্যেতে অন্যত্রও দেখিয়াছে
সুষুপ্তি মাঝে জীব সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে মিশিয়াছে
এখানে ব্রহ্মলোক শব্দতে
ব্রহ্ম স্বরূপ এই বুঝায়েছে
চতুর্মুখ সে ব্রহ্মার বাস সত্যলোক এ নয়
কারণ জীবেরা সুষুপ্তি মাঝে সত্যলোকে না যায়।
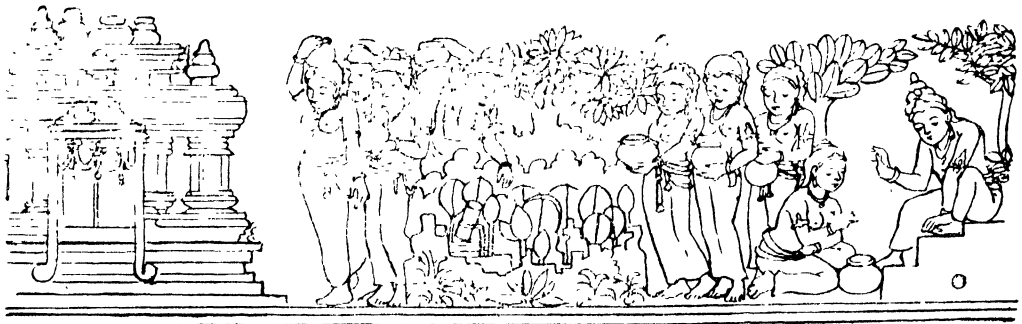
প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

কিন্তু শান্তিপাঠ করলেই জগতে শান্তি এসে হাজিরি দেয় না। প্রেমল মাঝে মাঝেই অসিতকে বলত—এমনি অশান্তির মেঘ এসে হানা দিত—যে, শান্তি পাবার একটি ছাড়া দুটি পথ নেই: "ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্"। বলত: গীতা ত্যাগ নাম দিয়েছে শুধু বাসনা ও কর্মফল ত্যাগকে নয়, সবরকম প্রত্যাশা ত্যাগকে—যাকে বলে "অনপেক্ষ"।

প্রেমল ললিতাকে বৃন্দাবনে এনেছিল বিলাসিনী শিষ্যাকে কৃচ্ছ্রসাধনের কিছুটা দীক্ষা দিতে। কিন্তু দীক্ষা নিলেই শিক্ষা হয় না সব সময়ে। তাই পয়লা নম্বর ললিতা কিছুতেই পারেনি গোয়ালঘরে জলঝড়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা ভুলতে। তর্ক তুলত মাঝে মাঝেই—ঠাকুর কি সত্যি এই-ই চান? আমাদের এক রাজ্যে পাঠিয়ে চান অন্য এক উদ্ভট রাজ্যের আইন কানুন মেনে চলতে? ফলে, দোসরা নম্বর: প্রেমলের মনেও অশান্তির টুকরো মেঘ ফেলত ছায়া—

ওদিকে ললিতা এ যুগের মেয়ে তো—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলত—কেন প্রেমল তাকে অতীত যুগের ছন্দে দীক্ষা দিতে চায়। তেসরা নম্বর: ডাক্তারবাবুও একদিন এই সামান্য বেবনতি লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন দার্শনিক ঢঙে: "no rose without a thorn". চৌঠা নম্বর: তারা একদিন অসিতকে বলেছিল: "দাদা, শিষ্যা হলে কি তাকে অবিকল গুরুর চলার তালে তালে পা ফেলতেই হবে?" অসিত আঁচ পেয়েছিল বৈ কি—ঐ একই প্রশ্নের মেঘ তার নিজের মনেও যে অশান্তির ছায়াপাত করত মাঝে মাঝেই। সব শেষে, দেবানন্দ চান নি মোটেই অসিত প্রেমলকে পেয়ে তাঁকে একেবারে ভুলে যায়। একদিন কথায় কথায় তাঁর চাপা ক্ষোভ ফাঁকা হয়ে পড়েছিল গানের আসরের পরে।

ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু বলবার ম'ত।

ডাক্তারবাবুর পায় একটা ছোট হাড়ে ঘা লেগেছিল। যাকে বলে dent, ফলে তাঁকে প্রায় শয্যা নিতে হয়। এ ঘর থেকে ও ঘরে আসতেন গানের সময়ে—কিন্তু চেয়ারে করে আনা হ'ত। কথা বলার সময় যন্ত্রণা থাকত না, কিন্তু উঠতে বসতে খচ খচ করত কখনো কখনো দমকা ব্যথা—spasm আসত। এজন্যেও অশান্তির ছায়া উঁকি দিত আনন্দ সভায়, কিন্তু প্রেমলের উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপের আলোয় টিকতে পারত না। দেখে অসিতও তারস্বরে গান গাইত সকাল সন্ধ্যায়। এত আনন্দের চাপে অশান্তি আর মাথা তুলতে পারত না।

কিন্তু স্বামীজি চাইতেন অসিত সন্ধ্যায় মিশনেও মাঝে মাঝে গাইবে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর অতিথি হ'য়ে অসিত কেমন ক'রে তাঁকে ফেলে যায় মিশনে? স্বামীজি মুখে বলতেন অবশ্য উদারভাবেই যে, ভজন কোথায় গাওয়া হচ্ছে সে নিয়ে তো কথা নয়—ঠাকুরকে শোনালেই হ'ল—যে চায় শুনে প্রসাদ পাবে। কারণ নিবেদিত হ'লেই ভজন-ভোগ হ'য়ে দাঁড়ায়—অর্ঘ্য, প্রসাদ।

শুনতে চমৎকার। কিন্তু অসিতকে একদিন বলেছিল স্বামীজির এক গুরুভাই যে, স্বামীজি এমন অনেক বৈষ্ণবকে ভরসা দিয়েছিলেন ডাকবেন—যাঁরা যেতে চান না ডাক্তারবাবুর ওখানে।

এরও আর একটা গূঢ় কারণ ছিল—যদিও অসিত প্রথমদিকে আঁচ পায়নি একটুও। তবে একদিন একা যমুনায় স্নান করতে গিয়ে শেঠজির সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি হঠাৎ মুখ ফস্‌কে ব'লে ফেলেছিলেন: "সাহেব সাধু বৃন্দাবনেও এসেছেন দিশি সাধুকে নেটিভ বলতে বুঝি?"

অবিশ্যি বৃন্দাবনে ভক্ত বৈষ্ণব অনেকেই প্রেমলকে দেখে মুগ্ধ হ'ত বৈ কি। অসিতের কাছে তারা বলত আন্তরিক ভক্তির সুরেই: "কী ত্যাগ! শুধু দেশ ছাড়া নয়—বেশভূষা চালচলন—এমন কি মাতৃভাষারও মায়া কাটানো! দিন রাত হয় সংস্কৃত, না হয় বাংলা হিন্দি—এ কি সহজ কথা!"...ইত্যাদি

সত্যি, অসিতেরও মনে হ'ত এ-ভাবের পুরোপুরি হিন্দু বনতে দেখে নি ও কোনো বিদেশীকে। তারা তো প্রেমলের হিন্দু আচার নিষ্ঠা দেখে উচ্ছ্বসিত। এ কী ব্যাপার? হয় স্বপাকে খাবে, নয় শিষ্যা ললিতার হাতে! স্বামী দেবানন্দ এতটা আচারী হওয়াও পছন্দ করতেন না, কিন্তু ওর নিষ্ঠার তারিফ না ক'রে করেন কি?

ললিতা তারার সঙ্গে "বকুল" সই পাতিয়েছিল দিদি বলাও ছেড়ে দিয়ে। বয়সের বেশী তফাৎ তো ছিল না: তারার ত্রিশ, ললিতার পঁচিশ। ডাক্তারবাবুকে ললিতা ডাকত দাদা, অসিতকে কখনো দাদাজি কখনো দাদু। তারা দাদাজি ব'লেই খুশী, দাদু ব'লে আরো কাছে আসতে ভরসা পেত না। বকুলের মতন সহজিয়া হ'তে পারে কজন? বলত তারা সইয়ের সম্বাদ বড় গলা ক'রেই। এ-সখিত্বে এতটুকুও ঈর্ষার আমেজ ছিল না। ললিতা যেমন তারার ধৈর্য, গৃহিণীপনা, স্নেহশীলতা প্রভৃতি গুণকে বড় ক'রে দেখত তারাও তেমনি ললিতার ব্যক্তিরূপের গুণ-গান করত অকুণ্ঠেই। ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ না থাকলে এ-ধরণের সহজ সখিত্বের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে না—বলত প্রেমল প্রায়ই অসিতকে—বিশেষ ক'রে এ দুই সইয়ের গলাগলির মাধুর্যের তারিফ করে।

* * *

সেদিন রথযাত্রা। প্রেমল চৈতন্যদেবকে গভীর ভক্তি করত; ধরল ডাক্তারবাবুকে: "আজ সন্ধ্যায় ঘটা ক'রেই কীর্তনের আসর বসাতে হবে, বিশেষ যখন অসিত হাজির।" ডাক্তারবাবু সানন্দেই সাড়া দিয়ে পঞ্চাশ ষাটজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তারা রাঁধল পায়স-ভোগ, ললিতা—মালপো।

বাধল শেঠজিকে নিয়ে। ললিতা বলল: চৈতন্যদেব প্রেমের ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর প্রিয় রথযাত্রার পার্বণে কাউকে বাদ দিলে অন্যায় হবে।" তারা বলল: "শেঠজি বড় দাম্ভিক ও বিশ্বনিন্দুক। যেখানে সেখানে প্রেমলকে ম্লেচ্ছ সাধু ব'লে হাসিঠাট্টা করেন।" ললিতা তুড়ি দিয়ে বলল: "বাপীকে ম্লেচ্ছ বলবে? ঈ—শ্! করো ওঁকে নিমন্ত্রণ—দেখি ওঁর কত মুরদ।" প্রেমল তো হেসেই উড়িয়ে দিল: "আমাকে ম্লেচ্ছ বলছে? বলুক না। words break no bones. তাছাড়া শেঠজি তো আমাকে খাতির করতে আসছেন না, আসছেন চৈতন্য-দেবের পূজোয়। তাঁকে যদি ভক্তি করেন তো আমাকে অভক্তি করলেনই বা—কী আসে যায়?"

অসিত মুগ্ধ হ'য়ে বলল: "ভাই প্রেমল, তোমার বৈষ্ণবমন্ত্র নেওয়া সার্থক হয়েছে। এরই তো নাম তরুর মতন সওয়া, আর তৃণের মত নিচু হ'য়ে থাকা।"

* * *

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। সেদিন নামল হঠাৎ বৃষ্টি! সে কী বৃষ্টি! অম্বুবাচী ছিল দুদিন পরে কিন্তু যেন এগিয়ে এল উৎসবকে মাটি করতে। সকাল থেকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। নিমন্ত্রিতেরা কেউই আসতে পারলেন না।

সন্ধ্যায় এলেন কেবল শেঠজি, তাঁর স্ত্রী আর স্বামীজি। স্বামিজীকে ডাক্তারবাবু মোটর পাঠিয়েছিলেন।

প্রেমল আরো খুশী। বলল: "ঠাকুর ভাবগ্রাহী তো। জানতেন আমরা কী চাইছিলাম। কী বলো অসিত? না, তুমি ভিড় না দেখে মুষড়ে পড়েছ?"

অসিত: "তা ঠাকুরের নাম তো শোনানো চাই ভিড়কেও—তাদের মধ্যেও কি ভক্ত নেই?"

প্রেমল: চিন্তাটাকে একটু সাফ করা চাই। নাম শোনাচ্ছ তুমি কাকে? ভক্তকেও নয় অভক্তকেও নয়—ঠাকুরকে।

ললিতা: এ তোমার কোন দিশি কথা বাপী?

তোমাদের দেশে গির্জায় স্তব গাওয়া হয় তো ভিড়ের জন্যেই।

প্রেমল: একথা ওদেশে গির্জার কোরাস গাইয়েরা বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশের কীর্তনীরা বলবেন না কথনই।

শেঠজি: মাপ করবেন সাধুজি, কিন্তু এ-দেশ তো আপনাদের দেশ নয়—হিন্দুস্থান হ'ল হিন্দুদের দেশ।

প্রেমল: মাপ করবেন জী। যে যেদেশে জন্মায় সে-ই তার দেশ নয়। যে দেশকে তার মনপ্রাণ বরণ করে আপনার বলে চিনতে পারে সেই দেশই তার স্বদেশ।

দেবানন্দ: স্বদেশের আপনি একটা নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন জী।

প্রেমল: শুনুন স্বামীজি। আমার এক মাসিমা ছেলে চান নি। কিন্তু খুব সাবধান হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ অবাঞ্ছিত অতিথি এসে উদয় হলেন। মাসিমা তাঁকে সঁপে দিলেন এক বিধবা বোনের হাতে। তার ছেলে ছিল না সে যেন হাতে চাঁদ পেল। ছেলেটিকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে কে তার মা তখন সে মাসিমাকে দেখিয়ে দিত। সে কি ভুল করত বলবেন?

দেবানন্দ (তার্কিক ঢঙে): এ আপনাদের দেশের কথা—

প্রেমল: না স্বামীজী, মহাভারতেও পাবেন একথা যে, কর্ণ কুন্তীকে মা ব'লে মানে নি—মেনে নিয়েছিল রাধাকেই যে তাকে লালন করেছিল। কিন্তু আসলে এ তর্কের কথা নয়। প্রেমের কথা। আমি আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম—আপনার মনে থাকতে পারে—যে, আমি ভারতবর্ষকেই মা ব'লে বরণ করেছিলাম এখানে এসেই। ছুটিতে আমি মাঝে মাঝে বিলেতে যেতাম বছর দশেক আগে যখন লক্ষ্ণৌয়ে ইংরাজি পড়াতাম। কিন্তু সেখানে যেতে না যেতে আমায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। যখন ফিরে আসতাম মন আমার আনন্দে গান গেয়ে উঠত। আমার বাবা মা এখনও বেঁচে, আমাকে দেখতেও চান, কিন্তু আমি আমার গুরুমাকেই বলি: ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। বলবেন কি—ভুল করি?

শেঠজি: আপনি উড়ো তর্ক করছেন জী—মাপ করবেন। কে কার বাপ মা মেশো মাসি সে নিয়ে তো তর্ক ওঠে নি, কোন দেশ কার আপন এই-ই হ'ল প্রশ্ন। that is the question.

প্রেমল: না জী। এ to be or not to be-র উড়ো তর্ক নয়। দেখুন, সংসারে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সাড়ে পনেরো আনা মানুষই বাপ মা-কেই সবচেয়ে আপন ব'লে জানে। সেই বাপমাও পর হ'য়ে যায় স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে। একথা যদি সত্যি হয় তাহ'লে প্রমাণ হয় না কি যে আপন পরের নিরিখ ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না?

শেঠজি: আপনার কথা শুনে ধাঁধা লাগছে জী! বাপ মাকে মানুষ সবচেয়ে আপন ব'লে জানে বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলছেন—মাসিমা বাপ মার চেয়েও আপন হ'তে পারে। যে-দেশে জন্মেছি খেলা করেছি যে-দেশের ভাষায় বলেছি সবপ্রথম সে দেশের চেয়ে বিদেশ আপন হয়ে দাঁড়ালো দুদিনে—এ কখনো হয়? মন যে শুনলেই হেসে উড়িয়ে দেয় মিথ্যে ব'লে।

প্রেমল: শেঠজি! বড় ফাঁদে পড়ে গেলেন। অনেক কিছুই অজ্ঞান মন মিথ্যে বলে হেসে উড়োয় যাকে জ্ঞানীরা চেনেন সত্য ব'লে। আর তাঁদের উপদেশ মেনেই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আমরা জ্ঞানের আলোয় উঠি। তাই তাঁদের কাছেই দরবার করি: "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" ঐ দেখুন, প্রদীপ জ্বলছে গৃহবিগ্রহের সামনে। যে শিখাটা আলো দিচ্ছে সেটা জ্বলছে ঐ প্রদীপেই বটে কিন্তু শিখা কি তাই বলে সত্যি ঐ মাটির আত্মীয় না সেই আলোর যে জ্বলছে কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারায়?

শেঠজি (বিব্রত): এ সব লম্বা লম্বা কথা সাধুজি। তাছাড়া উপমা যুক্তি নয়।

ললিতা: কিন্তু বুঝবার মস্ত সহায়। আপনি শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি কি উঠতে বসতে উপমার ফুলঝুরি কাটতেন না?

দেবানন্দ (খুশী): একথা ঠিক।

(প্রেমলকে) শেঠজির কথায় কিছু মনে করবেন না জী। আপনি যে আমাদের দেশকে মা ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এতে আমাদের মধ্যে এখন কোন্ মূর্খ আছে যে খুশী না হবে?

শেঠজি: আপনার অন্যায় স্বামীজি। আপনি যাকে ঠিক মনে করেন আর কেউ যদি তারে বেঠিক মনে করে তবে তাকে মূর্খ বলা চলে না।

তারা (উদ্বিগ্ন): থাক থাক এ সব তর্কাতর্কি। আপনার গান সুরু করুন দাদা। আজ রথযাত্রার দিনে কেন এ সব হাবিজাবি কথা?

ডাক্তারবাবু: হাবিজাবি নয় তারা! প্রেমল মহারাজ বড় চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন—(প্রেমলকে) জানেন সাধুজি, আমার নিজেরও সত্যি সময়ে সময়ে মনে হ'ত যে…কী ক'রে বোঝাব…প্রত্যেকেরই তার নিজের দেশ নিজের ধর্মকেই আপন ব'লে মনে করা উচিত। স্বামীজি সেদিন একটি ভাষণে মহাভারত থেকে একটি শ্লোক বলেছিলেন:

ন জাতু কামান্ ন ভয়ান্ ন লোভাদ্
ধর্মং ত্যজেদ্ জীবিতস্যাপি হেতোঃ

শেঠজি (সোৎসাহে): ঠিক ঠিক ডাক্তারবাবু। বাঁচালেন আপনি। সাক্ষাৎ মহাভারতের কথা—কাটবার জো নেই।

প্রেমল (হেসে): রসুন রসুন শেঠজি। আগে স্থির হোক ধর্ম কী বস্তু। আপনি বলতে চাইছেন—যে যে দেশে জন্মেছে তার সেই দেশের ধর্মকেই নিজের ধর্ম মনে করা কর্তব্য এই না? আচ্ছা আফ্রিকায় এখনো এমন জাত আছে যারা ধর্ম মনে করে মানুষকে রেধে খাওয়া।

দেবানন্দ: এ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে জী। আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন তাদের যারা অসভ্য আদৌ ভাবতেই শেখেনি।

প্রেমল: না স্বামীজি। যারা ভাবতে শিখেছে তাদের মধ্যেও ধর্ম সম্বন্ধে ঠিকে ভুল হ'তে পারে। বিল্বমঙ্গল এক বণিকের অতিথি হয়ে চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। বণিক অতিথিসৎকারকে ধর্ম মনে ক'রে স্ত্রীকে হুকুম করেছিলেন অতিথিকে তুষ্ট করতে। মহাভারতে এক ধার্মিক রাজা আরো দুঃসাধ্য সাধন করেছিলেন: নিজের ছেলেকে কেটে অতিথিকে পরিবেষণ করেছিলেন অতিথি চেয়েছিলেন ব'লে। এ ভাবা না ভাবার কথা নয়, শুভবুদ্ধির একটা স্বরে পৌঁছাব কথা—সে স্বরে না উঠলে ঠিকে ভুল হবেই হবে। অত দূরে যাবার দরকার কি? আমাদের এ যুগেও এই সেদিনও কি হিটলার জর্মনজাতকে Herrenvolk ব'লে ঘোষণা করেন নি যে, জর্মনদের স্বধর্ম কর্তা হওয়া, আর সব জাতের স্বধর্ম জর্মনদের তাঁবেদার হওয়া? বলবেন কি জর্মন জাতি অসভ্য? কিন্তু এর চেয়ে আরো সাংঘাতিক অধর্ম মানুষকে যুগে যুগে পেয়ে বসেছে ভূতের মতন—heretic বলে কত নিরপরাধ ধার্মিককেও ক্যাথলিক ইনকুইসিটরেরা পুড়িয়ে মেরেছে, এক এক ক'রে হাড় ভেঙেছে চাকার নিচে।

দেবানন্দ (কোণঠেশা হ'য়ে ঈষৎ আতপ্ত স্বরে): এ আপনি কী বলছেন জী? রাজনীতি রাষ্ট্র ইনকুইসিটর এসব তো অবান্তর।

প্রেমল: অবান্তর কিসে স্বামীজি। আপনি বলছিলেন কেবল অসভ্যেরাই ধর্মকে অধম থেকে তফাৎ করতে পারে না। আমি দেখাতে চাইছি এ ঠিক সভ্যতা ওরফে সভাভব্য যুক্তির—কথা নয়। এ বড় জটিল প্রশ্ন। মানুষ বহু সাধনায় তবে প্রজ্ঞার বোধির আলো পায় আর তখনই কেবল সে চিনতে পারে সত্যের স্বরূপ। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তই দেখুন না একবার ভেবে। স্বামী বিবেকানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে ভেবে কি তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন নি বিবাহ ভেস্তে দেবার জন্যে? আর স্বামীজির মাতৃদেবী কি ভাবতেন না যে, ছেলের সন্ন্যাসী না হ'য়ে গৃহী হওয়াই ধর্ম? তাহ'লেই দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাকে ধর্ম বা সত্য মনে করতেন স্বামীজির মা তাকে অধর্ম অসত্য ভাবতেন। এখানে স্বামীজির ধর্ম বা কর্তব্য কী ছিল—গর্ভধারিণীর মা-র কথা শোনা, না দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনা? (শেঠজিকে) মহাভারতের ঐ শ্লোকটি আওড়ে আহ্লাদে আটখানা হ'লে বিপদে পড়বেন শেঠজি। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হ'য়ে জন্মে তপস্যা ক'রে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন ব'লে বলবেন কি তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মকে হেনস্তা ক'রে পাপ করেছিলেন? স্বয়ং কৃষ্ণ কি গোপীদের ঘরছাড়া ক'রে স্বামীপুত্রকে পর মনে করার দীক্ষা দেন নি? অত কথার কাজ কি। যুগাবতার চৈতন্যদেব কি সন্ন্যাসী হ'তে চেয়ে গৃহত্যাগ করেন নি নিশুত রাতে—মার স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে? শেঠজি, কোনটা কার ধর্ম আর কতদূর পর্যন্ত সে ধর্মের কোন বিধান মান্য বা অমান্য

বুঝতে হ'লে চাই জ্ঞানের তপস্যা। এই জন্যেই মহাভারতেই যুধিষ্ঠির বলেছিলেন: ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। আর তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র, মনে রাখবেন।

ললিতা (খুশী হ'য়ে হাততালি দিয়ে) চমৎকার বলেছ বাপী। একা ল'ড়ে হারিয়ে দিলে শুধু শেঠজিকে নয়, স্বামীজিকেও করলে কোণঠেশা।

দেবানন্দ (অপ্রসন্ন): না, কোণঠেশা আমি হইনি মা। আর তোমার গুরুদেবকে তুমি বাহবা দিলেই যে সবাই সাবাস বলতে বাধ্য এমন কথাও মানতে পারি না। যে শ্লোকটি তিনি আওড়ালেন তাকেই আমি হানতে পারি তাঁর বিরুদ্ধে যে হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব বোঝা চাট্টিখানি কথা নয়। শুনেছি তিনি ছোঁওয়া ছুইয়ি মানেন। স্বামী বিবেকানন্দ একে নাম দিতেন ছুৎমার্গ। লোকাচারকে তিনি মনে করতেন অত্যাচার। বলবে কি স্বামীজিকেও প্রেমল বাবাজি কোণঠেশা করেছেন? কেউ অব্রাহ্মণের রান্না খাওয়াকে দূষ্য বললে তিনি হাসতেন, বলতেন আচারী গোঁড়াদের যে তাঁদের ধর্ম গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে। এখানে কে বেশি জ্ঞানী বলবে আমায়? স্বামী বিবেকানন্দ না প্রেমল মহারাজ?

প্রেমল (হেসে): কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধাচার মানতেন, অব্রাহ্মণের হাতের রান্না খেতেন না—তাঁকে কি বলবেন অজ্ঞান?

দেবানন্দ (উষ্ণ): আমাদের উপনিষদে বলেছে নৈষা তর্কেণ মতিরপণীয়া। আপনি দেখছি মনে করেন তর্কাতর্কিই জ্ঞানের পথ।

প্রেমল: না স্বামীজি। রাগ করবেন না। আমি যদি তাই মনে করতাম তবে আপনাদের শাস্ত্রকেই মেনে নিতাম না ধর্মের দিশারি ব'লে—আর এ-ধর্মের শাস্ত্রের বিধিবিধানের ভাষ্য চাইতাম না গুরুর চরণে শরণ নিয়ে—তাঁর উপদেশই শেষ কথা ব'লে শিরোধার্য ক'রে। পাশ্চাত্য দেশে তর্কাতর্কিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় ব'লেই ধর্মের আলো নিভে এসেছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আপ্তবাক্য এ নয়। "নৈশা তর্কেণ মতিরপণীয়া"—"হৃদয়ে হি এব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি" এই-ই হ'ল হিন্দুধর্মের সবচেয়ে অচল ভিৎ, অটল মুকুট। আমি আচারকে মেনে নিয়েছিও নিজের বিচার মেনে নয়—গুরুবাক্য মেনে—ভাগবতের কথায় আমার অন্তরাত্মার সায় আছে ব'লে যে, আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ। গুরু সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর মধ্যে সর্বদেবের অধিষ্ঠান এ তর্কাতর্কির আলোয় পাওয়া বাণী নয়, অন্তরে অবতীর্ণ গুরুকরুণারই বাণী, মহারাজ!

তারা (করযোড়ে): এবার ভজন সুরু হোক সাধুজি। আমার সত্যি মন খারাপ হ'য়ে গেছে।

প্রেমল (উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীজির কাছে করযোড়ে): আমি অপরাধ করেছি স্বামীজি! তর্কাতর্কি করা নিন্দনীয় ব'লে তবু রোখের মাথায় তর্কাতর্কিই করেছি। তবে জানেন তো আত্মাভিমান কেমন "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী"। তাই নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন—ছোটমুখে বড় কথা বলেছি আমি—গুরুমা শুনলে দুঃখ পাবেন যে, আমি গুরুজনের, সাধুর, কথা কাটতে চেয়েছি রোখের মাথায়।

দেবানন্দ (স্নিগ্ধ সুরে): কী বলছেন সাধুজি! আপনি যে কত বড় সাধক আমি জানি না কি? সাক্ষী দিন অসিতবাবু।

অসিত (হেসে): হ্যাঁ হ্যাঁ। দিচ্ছি। (প্রেমলকে) উনি সত্যি প্রথমদিনই বলেছিলেন আমাকে যে তুমি যে এদেশে এসে এমন অকুণ্ঠে গুরুকে মেনে নিতে পেরেছ এ একটা আশ্চর্য কীর্তি—দেখলেও মনে সম্ভ্রম আসে।

ললিতা (গাঢ় কণ্ঠে): ঠিক দাদাজি! বাপীর কি তুলনা আছে?

দেবানন্দ (হেসে): না সত্যিই নেই মা! আজ থেকে ওঁকে তুমি সর্বত্র রটিয়ে দিতে পারো যে, তোমার এ-মতে আমি সই দিয়ে ওকে বরণমালা দিতে রাজী আছি আমাদের মিশনে।

প্রেমল (হেসে): মানে আমাকে বৃন্দাবন থেকে তাড়াতে চাচ্ছেন এই তো?

তারা (খুশী): না সাধুজী—বাড়াতে বাড়াতে বাড়াতে চাইছেন। তাই না মহারাজ?

দেবানন্দ (হেসে): একেবারে ষোলো আনা।

শেঠজি (অপ্রসন্ন) : বাড়াতে চান বাড়ান আপনাদের মিশনে মহারাজ। কিন্তু মনে রাখবেন—বৃন্দাবন এখনো বৃন্দাবন। এখানে অনেক জ্ঞানী ভক্ত আছেন যাঁরা ধর্মত্যাগকে নেক নজরে দেখেন না, বলেন যে যে ধর্মে জন্মায় সে-ধর্ম ছাড়া তার পক্ষে মহাপাপ। তাই হিন্দুরা কাউকে কনভার্ট করতে চায় না খৃষ্টানদের মতন।

ললিতা : কিন্তু খৃষ্টান তো হিন্দুরাও হয় দলে দলে।

শেঠজি : দলে দলে তো লোকে গুণ্ডামিও করে দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়ে। তাই ব'লে কি সেটা ভালো বলতে হবে?

প্রেমল : এ আপনি কী বলছেন শেঠজি? বিশ্বাসের টানে কেউ কোনো বিশেষ ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে হবে না কেন?

শেঠজি : হিন্দুরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হ'তে চায় কি বিশ্বাসের টানে, না মিশনারিদের ঘুষে?

অসিত : এ আপনার রাগের কথা শেঠজি। অনেক হিন্দুকেই আমি জানি যাঁরা খৃষ্টদেবের পুণ্য প্রভাবের টানে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

শেঠজি : অবোধ লোকে কী না করে, অসিতবাবু? সত্যিকার সাধু পুরুষ করে কি? এই-ই হ'ল প্রশ্ন। দেখেছেন কাউকে যে নিজের ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হ'য়ে সত্যিকার সাধু বনল? আমি চ্যালেঞ্জ করছি—

তারা : শেঠজি—

অসিত : দাঁড়াও তারা, ওঁর গাজোয়ারি চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়াই চাই।

শেঠজি (আতপ্ত) : গাজোয়ারি? সত্যিকার সাধু কি কখনো ধর্ম বদলাতে পারে? কোনো প্রমাণ আছে?

অসিত : আছে শেঠজি। মহাসাধু সুন্দর সিং-এর নাম শুনেছেন কি?

শেঠজি : না।

অসিত : তাহলে একটু খোঁজ নেবেন। শুনুন তিনি ছিলেন শিখ—গোঁড়া শিখ। দিনরাত গুরু গ্রন্থ পড়তেন। বাপও ছিলেন তেমনি গোঁড়া। ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন এক মিশনারি স্কুলে। সেখানে বাইবেল পড়তে হ'ত ব'লে ছেলে ঘরে ফিরে এলেন রাগ করে।

শেঠজী (সোৎসাহে) : আমিও তো তাই—

অসিত : রসুন রসুন, শুনুন আগে। এহেন ধার্মিক গোঁড়া শিখ—যিনি আদিসব গুরুগ্রন্থ প'ড়ে মানুষ—তিনি বাইবলকে হেনস্থা করে একটুও শান্তি পেলেন না। যতই ধ্যান ধারণা আসন প্রাণায়াম করেন ততই মন কালো হয়ে আসে বিষাদে। শেষে একদিন আর সইতে না পেরে ভাবলেন—এই বাইবেলই যত নষ্টের গোড়া—দাও ফেলে আগুনে। কিন্তু বাইবল পুড়িয়ে মন তার আরো খারাপ হয়ে গেল। সারারাত ঘুম হ'ল না, পরদিন সকালে উঠে অশান্ত মনে প্রার্থনা করতে বসেছেন গুরুগ্রন্থের সামনে—এমন সময় ঘর ভ'রে গেল পাৎলা মেঘে—যাকে পাতঞ্জল নাম দিয়েছেন "ধর্মমেঘ।" আর সেই মেঘের মাঝে দেখলেন খৃষ্টদেবের দিব্য মূর্তি।

খৃষ্টদেব তাঁকে বললেন : "আমাকে তুমি কেন খেদিয়ে দিচ্ছ?" সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সি-এর দেহ উঠল শিউরে, চোখে জল উপছে পড়ল, আর মনে নামল অপার শান্তি। সে কী অপূর্ব শান্তি! যাকে বলে peace that passes all understanding—

শেঠজি : বাজে কথা—গুজব।

অসিত : না শেঠজি। আমি কেম্ব্রিজে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেছি। আমার ঘরে তিনি পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। কী চমৎকার সাধু যে কী বলব। সমস্ত বিশ্বে ঘুরেছেন খালি হাতে আলখেল্লা প'রে। তিব্বতে বারবার প্রাণকে পণ ক'রে খৃষ্টমহিমা কীর্তন করেছেন দু তিনবার তিব্বতীদের হাতে মরতে মরতে বেঁচে যান খৃষ্টদেবের অঘটনী করুণার বলে। এসব আমি তাঁর মুখে শুনেছি। তাঁর দুটি জীবনী আমার কাছে আছে—পড়তে চান ত দিতে পারি।

ললিতা : আমিও মা-র কাছে শুনেছি তাঁর কথা দাদু। মা বলেন; এমন নিরভিমান নির্মল ভক্ত তিনি কমই দেখেছেন জীবনে। আর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে তাঁর বাপমা তাড়িয়ে দেন এক কাপড়ে। ধনীর সন্তানকে গাছতলায় অনশনে কাটাতে হয়েছে কতদিন-—আমিও পড়েছি তাঁর জীবনী শেঠজি!

শেঠজী (রুষ্ট) : আমি চললাম ডাক্তারবাবু! আমি এখানে এসেছিলাম চৈতন্যদেবের গান শুনতে—খৃষ্টানিটির গুণকীর্তন শুনতে নয়।

তারা (করজোড়ে): রাগ করবেন না শেঠজি, কিন্তু বৈরাগী মহারাজের মতন সাধুজীর সামনে এ-ভাষায় কথা বলা কি—

প্রেমল (বাধা দিয়ে): না মা, আমি কিছু মনে করি নি। শেঠজি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সত্যিই ভক্তি ক'রে তাঁর নামকীর্তনে যোগ দিতে এসে থাকেন, তবে তাঁকে আমি বরণ করে নেব পরম বন্ধু ব'লেই। অসিত, গাও তাঁর গান—মহাপ্রভুর স্বরচিত পদাবলীটির যে অনুবাদ তুমি করেছ—সেই, আহা,

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ?

অসিত। (শেঠজিকে): শুনুন শেঠজি, আজই এ-শ্লোকটির তর্জমা করেছি এ-উৎসবে কীর্তনে গাইব ব'লে (গুন গুন ক'রে গায়):

কবে আঁখিনীর বুকে ঝরিবে, এ-মুখে ফুটিবে না কথা
তব স্মরণে ?
উঠিবে শিহরি' তনু কবে মরি, তোমার নামের উচ্চারণে ?

প্রেমল (গাঢ়কণ্ঠে): আহা! এরই তো নাম প্রেম—তাঁর নামের উচ্চারণেই এই চক্ষে ধারা! শেঠজি, আমারই অন্যায় হয়েছে। আজ রথযাত্রা।—আমার মনে রাখা উচিত ছিল—এ-পুণ্যদিনে তর্কাতর্কি শুধু অশোভন নয়, মহাপাপ। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আসুন এ-শুভদিনে দুজনে মিলে তাঁর ছবির সামনে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা করি—যেন তাঁর মহাবাণী মনে রাখি যে সাধককে হ'তে হবে "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা"—তৃণের চেয়েও নিচু, আর তরুর মতন সহিষ্ণু—আর সবার উপরে ভক্তির কাঙাল—দীন হ'তে দীন—

(উঠেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে)

শেঠজি (গলে গিয়ে): আপনি সত্যিই মহাত্মা জী! আমারই অন্যায় হয়েছে—আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।

ললিতা (আলিঙ্গনবদ্ধ যুগলমূর্তির দিকে চেয়ে): উলু উলু উলু—বলো ভাই বকুল! উলু উলু উলু—

তারা (সানন্দে): উলু উলু উলু। (ডাক্তারবাবুকে) বলো না !

ডাক্তারবাবু (একগাল হেসে): উলু উলু উলু! গানের পালা এল জয় গুরু, জয় !

অসিত (মহোল্লাসে নিত্যানন্দের বাণী গায় পদাবলীর নানা পদের সঙ্গে):

মেরেছ কলসীর কানা
তা বলে কি প্রেম দিব না ?

অপরূপ জ্যোতি গৌরাঙ্গমূরতি দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে···
দন্তে তৃণ ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দাস্য মুক্তি যাচে
প্রভু বারেবারে···

আয়, কিশোরীর প্রেম নিবি আয়···
প্রেমের জোয়ার যায় ব'য়ে যায়···
নিতাই ডাকে: "আয়"
গৌর ডাকে "আয়!"

(দেখ্‌) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়··
(প্রেম) কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়···ইত্যাদি

প্রেমল: ঠিক ঠিক···তাঁর সবই অদ্ভুত—গাও অসিত তুকড়া দাসের ভজনটি—অজব তমাশা তেরা সাঁবল···

অসিত (হারমোনিয়ম বাজিয়ে ধরে দেয়)

অজব তমাশা তেরা সাঁবল অজব তমাশা তেরা:
তূ দুনিয়ামে, দুনিয়া তুঝমে উলট পলটকা ফেরা!
তুম হী ভূত অভূত জগতকে, তম্‌হীনে জগ ঘেরা
তুম হী কীনা, তুম হী জীনা, সুখ দুখ সব হী তেরা।

(পরে ঐ সুরেই)

তোমার লীলার, শ্যামল, কে পার পায়—জাগে বিস্ময়!
বিশ্বে তুমি, তোমার মাঝেই বিশ্ব জেগে রয়।
আলোতে তুমি, কালোও তুমি, নয়কে করো হয়।
অনাগত, আজ, কাল—সব হয় তোমাতেই লয়।
দিতেও তুমি, নিতেও তুমি, অকিঞ্চন অক্ষয়।
বেদনায়ও চিরচেতন—প্রেমানন্দময়।

[ক্রমশঃ

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উচ্চ বর্গের ভাষা জার্মান—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সাহিত্যের ভাষা। জার্মানভাষীদের প্রাণের বাসনা ও বহু যুগের সাধনার বিষয়—এক অখণ্ড জার্মান-ভাষী রাষ্ট্র গঠন করা। প্রায় প্রত্যেক জার্মান মনীষী এ-বিষয়ে তাঁর প্রাণের আকূতি ও উদগ্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ফিথ্‌টে ও হার্ডারের মতো দার্শনিক ও সাহিত্যিক, বিসমার্ক-মোল্ট্‌কে-কাইজার-হিটলারের মতো সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক সকলেই ঐ স্বপ্ন দেখে এসেছেন। নাপোলেঅন বোনাপার্তের চেষ্টায় প্রথম অখণ্ড জার্মানির আভাস পাওয়া গেল। তাই অনেক জার্মান মনীষীই নাপোলেঅনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ইউরোপের মধ্যস্থলে পাশাপাশিভাবে অবস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান-অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড জার্মানি গঠনের স্বপ্ন দেখা একটি পরম সঙ্গত আশার অনুধ্যান করা।

জার্মানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট দুটি সম্প্রদায় থাকলেও তারা বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মতো এখন আর কোন সাম্প্রদায়িক বিভাগ চায় না। কোন কারণেই জার্মানভাষী ভূখণ্ডকে স্বাভাবিকভাবে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায় না রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে। অথচ জার্মান জাতির জীবন-সাধনায় অন্যায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে আসছে ঈর্ষাকাতর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ। পশ্চিম জার্মানি, পূর্ব জার্মানি, অস্ট্রিয়া বা দক্ষিণ জার্মানি ছাড়াও যে-ভাবে রুশরা লিথুয়ানিআ, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিআর পক্ষ থেকে জার্মান ভূখণ্ড গ্রাস করিয়ে জার্মানিকে বহুধাবিভক্ত রেখেছে, তা নিন্দা করার ভাষা নেই। এরই জন্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করা হয়ে আছে যার পূর্ণ দায়িত্ব রুশ জাতির। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধেরও আপাতপ্রতীয়মান কারণ ছিল জার্মানগরিষ্ঠ এলাকাকে স্বাভাবিকভাবে একত্র হতে না দেওয়া।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি-রুশদের সম্মিলিত প্রচারকার্যের জোরে জার্মানসমস্যার প্রকৃত রূপ আমাদের চোখে পড়ে না। জার্মানের সঙ্গত স্বাভাবিক জাতীয় বাসনাকে "আসুরিক" আখ্যা দিয়ে যে অদূরদর্শিতা ও হীনচিত্ততার পরিচয় দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত গর্হিত। আত্মপ্রকাশের সুস্থ পথ রুদ্ধ করায় জার্মানদের দারুণ প্রাণ-শক্তি বিকৃত পথে দিশাহারা হয়ে পর পর দুটি মহাযুদ্ধে আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়। এর জন্যে দুই মহাযুদ্ধের মিত্র-পক্ষীয় কূটচক্রকে দায়ী করা উচিত। ভারতে বিনয় কুমার সরকার ও নেতাজি ছাড়া খুব কম লোকই ব্যাপারটা প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন।

সর্বত্র ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর না হতে পারে। যেমন, ধর্মীয় স্বার্থের প্রতিবন্ধকতায় দুই আয়ারল্যাণ্ড, দুই বাংলা, দুই পাঞ্জাব, বেলজিঅম-নেদার-ল্যাণ্ড-লুক্সেমবুর্গ, সার্বো-ক্রোশিয়া এক হতে পারছে না। কিন্তু দুই কোরিয়া, দুই ভিএৎনাম, দুই জার্মানি, রুমানিয়া-মোলদাভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড-কারেলিয়ার ক্ষেত্রে সে-কথা খাটে না। প্রথম পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলি জনসাধারণের ঐক্যবুদ্ধির অভাবে একত্র হতে পারছে না। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলি বাইরের শক্তির চাপে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মিলিত হতে পায় না। রুশ-মার্কিন ও চীন-মার্কিন দুষ্ট স্বার্থদ্বন্দ্বই আজ কতকগুলি মিলনোন্মুখ জাতীয় রাষ্ট্রকে এক হতে দিচ্ছে না। সুতরাং জগতের কল্যাণে রুশ-চৈনিক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস একান্ত কাম্য।

সর্বদা একটি মাত্র ভাষাভাষী এলাকা নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব না হতেও পারে। যেমন সুইট্‌সারল্যাণ্ড বা চেকোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে কতকটা নিরুপায় হয়ে

একাধিক জাতিকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। স্বেচ্ছায় যা করা হয়, তার সঙ্গে বলপ্রয়োগে লব্ধ অবস্থার তুলনা চলে না। জার্মানরা স্বেচ্ছায় আলাদা হয়ে নেই। এমন অবস্থায় জোর ক'রে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখা গণতন্ত্রবিরোধী।

পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার নিম্ন বর্গের দুটি ভাষা প্রধান :—

(১) ইংরেজি (২) ডাচ বা ওলন্দাজ।

ইংরেজির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। মার্কিনরা আজকাল এই ভাষাটিকে আমেরিকান ভাষা বলতে চায়। খাস ইংল্যাণ্ডের চেয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এখন প্রায় চার গুণ বেশি।

ডাচ বা ওলন্দাজ ভাষা হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডে প্রচলিত। এর রূপান্তর ফ্লেমিশ বা ফ্লেমিং বেলজিঅমের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা। ডাচ ও ফ্লেমিশ একই ভাষা; কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ডাচেরা রোমান ক্যাথলিক বেলজীয়দের থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করেছে। ধর্মীয় কারণে বা অন্য স্বার্থে এই ধরণের স্বেচ্ছাবৃত বিভাগের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। জার্মানি-ফ্রান্স-ইতালির সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেয়ে সুইটসারল্যাণ্ডের জার্মান, ফরাসি, ইতালীয় আর রেতো-রোমানরা সুইস রাষ্ট্রে একত্র থাকতে চায় শান্তি লাভের আশায়, ভৌগোলিক কারণে আর অর্থনৈতিক সুবিধের লোভে। কিন্তু জার্মানদের দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে রাখার তেমন কোন কারণ নেই। সুইস জার্মানদের কথা বাদ দিলে বাকি সব জার্মান একত্র হতে চায়।

প্রোটেস্টান্ট হল্যাণ্ডের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক বেলজিঅম আর লুক্সমবুর্গকে মিলিত ক'রে বেনেলুক্স রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টাও চলছে। ডাচ ভাষায় দু কোটির কিছু কম লোক কথা বলে। ফ্লেমিশকে ধ'রে এই হিসেব দেওয়া গেল। বেলজিঅমের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা ফরাসি। বেলজিঅম ও কানাডার ফরাসীভাষীরা এখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেয়ে আন্দোলন করছে, এ-থেকেও হার্ডারের অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

টিউটনিক শাখার ভাষা ইংরেজির সাহিত্য সর্বোত্তম বটে। কিন্তু কেউই যেন না মনে করেন যে, তারই জন্যে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, তারাও সাধ ক'রে ইংরেজি শেখে। অনিংরেজদের মধ্যেও যে অন্য যে কোন বিদেশি ভাষার চেয়ে ইংরেজি শিখবার প্রবণতা ঢের বেশি, তার কারণ আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় বলেছেন :—

"কেবল উচ্চকোটির সাহিত্যের প্রসাদে আন্তঃ-প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে কোনও ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয় না; ভাষার প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের কারণ অন্য-বিধ। যাহারা ভাষাটি বলে তাহাদের কর্মশক্তি, প্রসার-শক্তি এবং অধিকারশক্তির উপরেই সেই ভাষার প্রতিষ্ঠা ও সর্বজন কর্তৃক তাহার স্বীকৃতি নির্ভর করে। শেক্স্‌পিঅর-মিল্‌টন-শেলি-ব্রাউনিং-ডিকেন্স্‌-স্কট পড়িবার আগ্রহে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকে ইংরেজি শিখে না—ইংরেজের কর্মশক্তি প্রসারশক্তি ও অধিকারশক্তির জোরেই ইংরেজের ভাষার এত প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়ক্ষেত্রে মূল্য না থাকিলে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূল্য না থাকিলে ভাষা বাহিরের লোকের কাছে অচল।" (ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা —১৬ পৃষ্ঠা।)

(৯) ইরাণীয় বা ইরাণীয়-আর্য ভাষাগুলির সঙ্গে ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে অনেকে এক আর্য শাখার দুই উপশাখারূপে—ইন্দো-ইরাণীয় বা ভারত-ইরাণীয় বা আর্য শাখার দুই উপশাখা ইরাণীয়-আর্য আর ভারতীয়-আর্য, এই দুই রূপে—ভাষাগুলিকে গণনা ক'রে থাকেন। জার্মান পণ্ডিতেরা অনেকেই যদিও "আর্য বলতে সমগ্র ইন্দো-হিত্তি বা ভারত-হিত্তি বা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেয়েছেন, তবু ইংরেজ ভাষা-তাত্ত্বিকরা আর তাঁদের মাছি-মারা ভারতীয় অনুকারকবৃন্দ এখন "আর্য" বলতে ইরাণীয় আর ভারতীয়-আর্য—এই দুটি মাত্র শাখাকে বুঝিয়ে থাকেন।

আইসল্যাণ্ড থেকে আসাম পর্যন্ত প্রসারিত পূর্ব গোলার্ধের ভারত-ইউরোপীয় বা আর্য জগৎ অখণ্ড থাকতে পারে নি ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতার দিক থেকে। তুর্ক-তাতার ভাষাগোষ্ঠির লোকেরা এসে এই মহৎ ভাষাগোষ্ঠীকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। ভারত-ইরাণীয় শাখার লোকেরা ককেশাস পর্বতমালার কাছে ইউরোপীয়-আর্য শাখাগুলির লোকদের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে আর্কের-বাইজানি-

দের মধ্যখণ্ডনের ফলে। অবশ্য রুশ জাতির কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েট রাষ্ট্রবর্গ আর পারস্য পাশাপাশি থাকায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দিক থেকে ভারত-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর লোকদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে।

ইরানীয় শাখার ভাষা এই ক'টি :—

(১) পারসিক বা ফার্সি (২) আফগান বা আফগান-ফার্সি (৩) কুর্দ (৪) তাজিক (৫) পশ্‌তো (৬) বালুচ।

ইরানীয় শাখার ভাষা ছ'টির বিস্তার পূর্বে সিন্ধু নদ থেকে পশ্চিমে তুরস্ক পর্যন্ত এবং উত্তরে রুশ-চৈনিক তুর্কিস্থান থেকে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ওমান উপসাগর আর আরব সাগর-উপকূল পর্যন্ত। আগে এশিয়া মাইনরে হিত্তি, গ্রিক আর আর্মেনীয় জাতি তিনটি এবং রুশ-চৈনিক তুর্কিস্থানে তুখার, কুশ ও আগ্নেয় জাতিগুলি থাকা কালে ভারত-ইরাণের আর্যদের সঙ্গে স্লাভ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য-আর্যদের ঘনিষ্ঠ স্থলপথগত যোগাযোগ ছিল। ভারত-ইউরোপীয় জাতিপ্রবাহ তুর্কি অভিযাত্রীদের আক্রমণে বারবার পর্যুদস্ত হওয়ায় ঐ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

ভারতীয় আর্যদের তুলনায় ইরানীয় আর্যদের বিস্তার সামান্য। ঐ ছ'টি ভাষায় এখন অল্প লোকে কথা বলে। তাদের অবস্থাও রাজনৈতিক দিক থেকে কুবিন্যস্ত। ইরান ও আফগানিস্থান রাষ্ট্র দুটি স্বাধীন হলেও বাদ বাকি ইরানীয় বা পারসিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী এলাকা সোভিয়েট রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পাকিস্থানের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। কুর্দ এলাকার কিছু অংশ ইরাক ও তুরস্কের হাতেও আছে। কুর্দ জাতি সমস্ত ভারত ইউরোপীয় জগতে সব চেয়ে হতভাগ্য; এদের কোন রাষ্ট্র বা প্রশাসনিক এলাকা নেই। কুর্দিস্থান ইরাক, তুরস্ক, ইরান সোভিয়েট ইউনিঅনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। এক সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বাদে বাকি তিনটি রাষ্ট্রই কুর্দ জাতির সঙ্গে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বহার ক'রে থাকে। কুর্দরাও সাংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হয়ে আছে।

বালুচদের অবস্থাও শোচনীয়। বালুচরা ইংরেজ-শাসিত অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যে একটি চিফ্‌ কমিশনার শাসিত প্রদেশের মর্যাদা পেয়েছিল। বালুচিস্থানের "গান্ধি" খান আবদুস সামাদ খানকে হয় তো সবাই এখনও ভুলে যান নি স্বাধীনতা-পরবর্তী খণ্ডিত ভারতে। পাকিস্থানের প্রকৃত শাসক পাঞ্জাবি মুসলমানরা বালুচিস্থান প্রদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাতিল করেছে। বর্তমানে বালুচ এলাকা ইরান ও পাকিস্থানের মধ্যে বিভক্ত।

কুর্দদের সংখ্যা ৫ মিলিঅন; এরা এখন স্বাধীন কুর্দিস্থান রাষ্ট্র গঠনের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। বালুচদের সংখ্যা ২ মিলিঅন। পশ্‌তো-ভাষী পাখ্‌তুন বা পাঠান জাতি সংখ্যায় ১১ মিলিঅন। কিন্তু তারা পাকিস্থান ও আফগানিস্থানের মধ্যে বিভক্ত। এদের নেতা আবদুল গফুর খাঁ একদা সারা ভারতের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন। তাজিক ভাষীরা সংখ্যায় ২ মিলিঅন। এরা একটি প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত।

ফার্সিতে প্রায় দু কোটি লোক কথা বলে। তার একটু পরিবর্তিত রূপ আফগান-ফার্সিতে ৭ মিলিঅনেরও বেশি লোক কথা বলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ফার্সিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ছিল। আধুনিক পারসিক ভাষাও সরল সুন্দর শ্রুতিমধুর এবং উন্নত সাহিত্যের ভাষা। মধ্য যুগে ফার্সি বেশি লোকের মাতৃভাষা না হলেও রাজকার্যে ও ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হয়ে ভারতের তুর্কি ও মুগল শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা এর বিশেষ প্রচার ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ হয়েছিল। তার ফলে ভারতে ফার্সিমিশ্র হিন্দি বা উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। উর্দুর কথা ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির প্রসঙ্গে আলোচ্য।

তুর্ক ভাষা যেমন এখন রোমক লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার করছে, আর্যভাষা ইরানীয় তেমনি সে-পথে অগ্রসর হচ্ছে। লাতিন লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করলে আধুনিক পারসিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হবে। অষ্টম শতকে ফার্সি ভাষার যে-আধুনিক রূপের জন্ম হয়, তার ওপর প্রচুর আরবীয় প্রভাব পড়ে। বস্তুত আরবীয় প্রভাবের ফলেই ফার্সির আধুনিক যুগের বিশিষ্ট রূপটি গ'ড়ে ওঠে। আরবীয় প্রভাবে এই ভাষাটি একেবারে জর্জরিত হয়। পারসিক ভাষার নিজস্ব লিপি নষ্ট হয়ে যায়। নিকৃষ্ট অবৈজ্ঞানিক আরবি লিপি ব্যবহার করতে গিয়ে আধুনিক ফার্সি ভাষার আর্য সুগন্ধ, ভারত-ইউরোপীয় সৌরভ অনেকখানি বিলীন হয়, ফার্সিতে গত ১২০০ বছরে আরবি শব্দ এত প্রচুর পরিমাণে গৃহীত হয়েছে যে, প্রথম নজরে ফার্সিকে সেমীয় ভাষা বলে মনে হয়, হঠাৎ ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা

ব'লে চেনা যায় না। আধুনিক ফার্সি ইরানের বাইরেও অনেকের মাতৃভাষা। এর ব্যাকরণ অত্যন্ত আধুনিক ও সরল। ইংরেজি ভাষার পর এই ভাষাটিই ব্যাকরণের জটিল জাল সব চেয়ে বেশি ছিঁড়ে ফেলেছে ভারত-ইউরোপীয় জগতে।

(১০) ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষাগোষ্ঠী ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা—প্রায় ইতালিক শাখার সমকক্ষ লোক সংখ্যার দিক থেকে। এই শাখায় প্রায় বিয়াল্লিশ কোটি লোক কথা বলে। ভারত, পাকিস্থান, নেপাল, সিংহল ও মাল দ্বীপপুঞ্জ—এই পাঁচটি রাষ্ট্রে এই শাখার ভাষাগুলি প্রচলিত। লোক সংখ্যার দিক থেকে এই শাখা দ্বিতীয় বৃহত্তম হলেও প্রথম ও তৃতীয় বৃহত্তম শাখা দুটি, জার্মানিক ও ইতালিকের মতো এর বহির্জগতে বেশি প্রসার নেই। চতুর্থ বৃহত্তম শাখা স্লাভিকের মতোই এটিও মুখ্যত স্থলপথে প্রসারিত। অথচ স্লাভিকের মতো বৃহৎ ভূখণ্ড এই শাখার লোকেরা অর্জন করতে পারে নি। সমুদ্র পার হয়ে উপনিবেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের সামর্থ্য ভারতীয়-আর্যদের অন্তত একালে দেখা যাচ্ছে না। ফলে অল্পপরিসর ভূখণ্ডে এদের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। খাস চীনে চীনাদেরও অনেকটা এই অবস্থা। কিন্তু তারা মহাচীনের বিস্তৃততর ভূখণ্ড বসতি প্রসারের জন্যে আয়ত্ত করেছে। উপনিবেশ ও বসতিবিস্তারের স্বর্ণযুগে ভারতীয়রা সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ ক'রে ঘরে বসে থাকায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি যে দুঃখজনক অর্থনৈতিক পরিণতির কারণ হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষাগুলিকে ভারতীয়-আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিশেষজ্ঞ জর্জ আব্রহাম গ্রিআর্সন তাঁর মহাগ্রন্থ The linguistic survey of India (২০ খণ্ডে সমাপ্ত)-তে যে-ভাবে ৮টি উপশাখায় ভাগ করেছেন এবং কাশ্মীরি ভাষাগুলিকে দার্দিক নামে এক পৃথক্ শ্রেণীতে নিক্ষেপ করেছেন, তাতে সর্বত্র তাঁর সঙ্গে সায় দেওয়া কঠিন। পশ্চিম পাঞ্জাবি আর পূর্ব পাঞ্জাবিকে দুটি স্বতন্ত্র উপশাখা ধরা প্রমাদপূর্ণ। বর্তমান কালে অসমিয়া-বাংলা-উড়িয়ার সংগে মগহি-মৈথিল-ভোজপুরিকে এক উপশাখাভুক্ত না করা সঙ্গত। আমরা সুইডিশ পণ্ডিত মর্গেন্স্টিঅর্নের মত অনুসারে কাশ্মীরিকে ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষা ব'লে ধরবো। কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে স্থাপনের ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রহ যে-কালে সক্রিয়, সে-কালে গ্রিআর্সনের অভিমত সেই আগ্রহের পোষকতা করে। দুই পাঞ্জাব সৃষ্টির স্বপক্ষেও তাঁর ভাষাভিত্তিক সাক্ষ্য কাজে লাগানো যায়। কিন্তু মন দিয়ে ভাষাগত বিশেষত্বগুলো বিচার করলে সংস্কৃত প্রভাব পরিপ্লুত কাশ্মীরিকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে না করার কারণ নেই। আর, দুই পাঞ্জাবি উপভাষাকে এক ভাষা ব'লে না ধরলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অবশ্য গ্রিআর্সনের মহাগ্রন্থ সকলের দিশারীর কাজ করে এবং তাঁর অক্ষয় অমর কীর্তির পরিচায়ক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বেও কোন ভারতীয়ই আজ পর্যন্ত গ্রিআর্সনের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি এবং হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের আমলে তা পারবে কি না, সন্দেহ।

সাহিত্যগৌরবে আধুনিক যুগে ভারতীয়-আর্য শাখার উৎকর্ষের স্থান জার্মানিক ও ইতালিক শাখার পরে স্লাভিক শাখার প্রায় তুল্য মূল্যের। প্রাচীন ভাষার সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় আর্য শাখার দুই প্রাচীন ভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতের কোন তুলনা নেই।

ভারতীয়-আর্য শাখায় এই ভাষাগুলি লক্ষণীয়:—

(১) অসমিয়া (২) বাংলা (৩) উড়িয়া (৪) মগহি বা মগধী (৫) মৈথিল (৬) ভোজপুরি (৭) কোশলি বা কোসলি বা পূর্বী হিন্দি (৮) হিন্দি বা পশ্চিমাহিন্দি বা হিন্দুস্থানি ৯) উর্দু (১০) ডোগরি (১১) কাশ্মীরি (১২) পাঞ্জাবি (১৩) সিন্ধি (১৪) রাজস্থানি (১৫) গুজরাতি (১৬) মরাঠি বা মারাঠি (১৭) নেপালি (১৮) সিংহলি (১৯) জিপ্সি বা রোমানি।

এই ভাষাগুলির মধ্যে যাযাবরদের ভাষা জিপসির কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই। বাকি আঠ'রোটি ভাষার প্রত্যেকটিতে কম পক্ষে এক মিলিঅন লোক কথা বলে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা বা অবস্থান ক্ষেত্র আছে। এগুলি বেশ সজীব ভাষা এবং প্রায় সব ক'টিতেই নিজস্ব প্রশাসনিক এলাকা গঠনের আন্দোলন প্রবল।

বাংলা, পাঞ্জাবি ও সিন্ধি ভাষাভাষী এলাকার

বৃহত্তম অংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে পশ্চিম-বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আন্দামান-নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। পাঞ্জাব সম্প্রতি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত অঙ্গরাজ্য লাভ করেছে। সিন্ধিভাষীরা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত লাভ করেছে। কিন্তু তারা যে কচ্ছ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তা এখন গুজরাটের অন্তর্গত, এখনও একটি স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্যরূপে গঠিত নয়। ভারত-বিভাগের সময় কয়েকজন সিন্ধি হিন্দু নেতার উদাসীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে হিন্দু বঙ্গ, হিন্দু-শিখ পাঞ্জাবের মতো হিন্দু সিন্ধু গঠন করা হয় নি। কিন্তু অনায়াসে দক্ষিণ-পূর্ব সিন্ধু প্রদেশে তা গঠন করা যেত। এখনও কচ্ছ এলাকায় তা করা যায়। তবে আগে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় বৃহত্তর হিন্দু সিন্ধু গঠন করা যেত।

নেপালি নেপালের রাষ্ট্রভাষা। সিংহলি সিংহল ও মাল দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রভাষা। উর্দু যদিও পাকিস্থানের কোন এলাকার লোকের মাতৃভাষা নয়, তবু ইন্দোনেশিয়া যেমন মালাই ভাষাকে তার রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করেছে "বাহাসা ইন্দোনেশিয়া" (ইন্দোনেশিয়ার ভাষা) নাম দিয়ে, তেমনি পাকিস্থানের উর্দুভাষী সেনাবাহিনী ও ভারতের মুসলিম উদ্বাস্তুদের বিশেষত বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে আসা উর্দুভাষী উদ্বাস্তুদের সুবিধার জন্যে পাকিস্থান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করেছে। উর্দু-প্রাক্-ব্রিটিশ আমলেও ভারতের মুসলিম যুগে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল না।

বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্থানের ভাষারূপে আন্দোলনের দ্বারা পাকিস্থানের অন্যতর রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত। পূর্ব পাকিস্থান বা পূর্ববঙ্গ বাঙালি-অধ্যুষিত এলাকা। পশ্চিম পাকিস্থানে পাকিস্থান গঠনের পরে প্রথমে পশতো-সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচভাষী বালুচিস্থান প্রদেশ, সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাব—এই চারিটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভাষা-আন্দোলনে ভীত পাকিস্থানের উর্দু-সাম্রাজ্যবাদী সরকার পশ্চিম পাকিস্থান নামের আড়ালে প্রদেশ চারটির স্বাতন্ত্র্য গায়েব করেছেন। পশ্চিম পাকিস্থানেই সিন্ধি এবং পাঞ্জাবীভাষীদের অধিকাংশ বাস করে। বেশির ভাগ বাঙালিও পূর্ব পাকিস্থানের বাসিন্দা।

ভারতে অসমিয়া, বাংলা, উড়িয়া, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাতি ও মারাঠি—এই আটটি ভাষা যথাক্রমে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র—এই আটটি প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতে গঠন করেছে। অবশ্য সীমারেখা এখনও নিখুঁতভাবে টানা হয় নি। কিন্তু তার জন্যে জোরালো আন্দোলন সক্রিয় আছে। হিন্দি-ভাষারা উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোশালি ভাষা মধ্য প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেও পারে, কিন্তু উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশ তিনটি অঙ্গরাজ্যকে একত্র ক'রে পূর্বী হিন্দি ও পশ্চিমা হিন্দি—দুটি ভাষার ভিত্তিতে মহাকোশল ও হিন্দ বা আর্যাবর্ত বা হিন্দুস্থান প্রদেশ গঠন না করা পর্যন্ত কোশলিভাষী ও হিন্দিভাষী অঙ্গ রাজ্যের রূপ স্পষ্ট হবে না। উর্দুভাষা উত্তর প্রদেশের কোন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির ভাষা কি না, তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। হিন্দি, উর্দু ও কোশলি ভাষা তিনটির ভিত্তিতে কোন প্রদেশ এখনও ভারতে গঠন করা হয় নি। কোশলি মধ্য ও উত্তর প্রদেশে বলা হয়। হিন্দি ও উর্দু উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায় ব্যবহৃত। বিহার একটি ত্রিভাষিক প্রদেশ যার মধ্যে আছে মগহি, মৈথিল ও ভোজপুরি ভাষা। এটিকে ভাষার ভিত্তিতে তিনটি প্রদেশে ভাগ করা উচিত। দ্রাবিড়ভাষী প্রদেশ চারটি ও নাগাল্যাণ্ডের কথা বাদ দিলে ভারতের অবশিষ্ট এলাকায় জিপসি বাদে আঠারোটি ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যে সিংহলি ও নেপালি বাদে বাকি ষোলটিই বলা হয়। এদের প্রত্যেকটিতে পাকিস্তান বাদে বর্তমানের ভারত রাষ্ট্রেই অন্তত এক মিলিয়ন ক'রে লোক কথা বলে। মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি কেন্দ্র শাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যকেও নাগাল্যাণ্ডের মতো পূর্ণ মর্যাদা-সম্পন্ন অঙ্গরাজ্যরূপে গঠন করা যেতে পারে। গুজরাতের অন্তর্গত কচ্ছ এলাকা নিয়ে সিন্ধিভাষী প্রদেশ গঠন করা সঙ্গত। কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য থেকে জম্মুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়ে ডোগ্‌রি ভাষাভাষী ডোগ্‌রাস্থান বা ডোগ্‌রাল্যাণ্ড গঠন করলেও দোষ হবে না। এ-সবই অঙ্গরাজ্যরূপে ভারতের অন্তর্ভুক্ত আছে ও থাকতে পারে। ষোলটি ভারতীয়-আর্য ভাষা নিয়ে যদি

ষোলটি ভারতীয় অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়, তা হলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

এই উনিশটি ভারতীয়-আর্য ভাষায় যত লোক কথা বলে, তার একটা আনুমানিক হিসেব দেওয়া যায়; কিন্তু নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তার জন্যে ভারত ও পাকিস্থানের উৎকট ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ দায়ী। এই দুই রাষ্ট্র কোন ভাষাকে কত লোক মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে তার প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করতে চায় না। তার বদলে কত বেশি লোক দায়ে অদায়ে সরকারি কাজে উর্দু বা হিন্দি ব্যবহার করে, তার ফিরিস্তি দেবার জন্য এই দুই রাষ্ট্রের আগ্রহ অশোভনভাবে দেখা যায়।

জিপ্‌সি ভাষা যাযাবরদের ভাষা হওয়ায় তাদের মোট লোকসংখ্যা বলা কঠিন, বাকীগুলির সংখ্যা এই রকম:

(১) সিংহলি—৮ মিলিঅন (২) নেপালি—৮ মিলিঅন (৩) ডোগ্‌রি—১ মিলিঅন (৪) কাশ্মীরি—২ মিলিঅন (৫) সিন্ধি—৫ মিলিঅন (৬) পাঞ্জাবি—২৫ মিলিঅন (৭) রাজস্থানি—২০ মিলিঅন (৮) গুজরাতি—২০ মিলিঅন (৯) মারাঠি—৩৫ মিলিঅন (১০) অসমিয়া—৫ মিলিঅন (১১) উড়িয়া—১৬ (১২) উর্দু—৫৩ মিলিঅন (১৩) বাংলা—৮৩ মিলিঅন (১৪) ভোজপুরি—২৩ মিলিঅন (১৫) মৈথিল—১৩ মিলিঅন (১৬) মগহি—৯ মিলিঅন (১৭) কোসালি ৩৫ মিলিঅন (১৮) হিন্দি—৬৫ মিলিঅন।

এই হিসেবে মারাঠির মধ্যে কোঙ্কনি এবং রাজস্থানির মধ্যে ভিলদের ভাষাকে ধরা হয়েছে। উর্দুভাষীদের সংখ্যা ভারতেই ২৩ মিলিঅনের মতো। তারা যদি কোন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তবে সেখানে তাদের প্রদেশ গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু এ-সন্দেহ করার কারণ আছে যে, এটি একটি সাম্প্রদায়িক ভাষা। দরবারি বা সরকারি কাজে কত লোক হিন্দি বা উর্দু ব্যবহার করে, তা বিচার্য নয়; মাতৃভাষারূপে কত লোক এদের ব্যবহার করে, সেটাই গণনীয়। নিঃসন্দেহে বাইরের জগতে এঁদের প্রসার অন্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির চেয়ে অনেক বেশি। মাতৃভাষারূপে বাংলা ভাষাই ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীতে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের ভাষা। ভারতীয় আদম সুমারির হিসেবে বিহারি অর্থাৎ মগহি, মৈথিল ও ভোজপুরি ভাষাভাষীদের মোট সংখ্যা ১৭ মিলিঅন। কিন্তু বিহারে ঘরে কেউ হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে না ব'লে এ-হিসেব গ্রাহ্য নয়। ভোজপুরিতে ৮ মিলিঅন, মৈথিলে ৫ মিলিঅন এবং মগহিতে ৩ মিলিঅন লোক কথা বলে, এই হল ১৯৬১ সালের ভারতীয় লোক গণনার সিদ্ধান্ত। এমন অপসিদ্ধান্ত খুব কম আছে। এই হিসেব মানতে হলে গ্রিআর্সন সাহেবের মূল্যবান্ গ্রন্থটিকে একেবারে বাতিল করতে হয়।

ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা-আসাম, বাংলা-বিহার, উড়িষ্যা-বিহার, উড়িষ্যা-মধ্য প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, মহারাষ্ট্র-মহীশূর ইত্যাদি সীমারেখাগুলি যথোপযুক্তভাবে সংশোধন করেন নি। সংশ্লিষ্ট ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলি নিখুঁতভাবে গঠিত হলে হিন্দি ভাষার সাম্রাজ্যবাদ ব্যাহত হবে এই তাঁদের আশঙ্কা। যে-ভাবে তাঁরা বিহার-রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ—উত্তর প্রদেশ—হরিয়ানা প্রদেশ পাঁচটিকে এক সঙ্গে হিন্দিভাষী অঙ্গরাজ্য ব'লে চালাবার চেষ্টা করেন তা ভাষাতত্ত্ব ও সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। গ্রিআর্সন, সুনীতি কুমার, সুকুমার সেন এঁরা প্রত্যেকেই মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, বিহারি ভাষাগুলিকে ভুল ক'রে হিন্দি বলা হয়। রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের জন্যে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে কিনা, এটা এক প্রশ্ন; বিহার, মহাকোশল ও রাজপুতানা বা রাজস্থানের ভাষাগুলি কোন্ বর্গে পড়ে, সেটা অন্য প্রশ্ন। বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন রাজনৈতিক স্বার্থে বিকৃত ক'রে মিথ্যা উত্তর রচনা করা চলে না।

বিহার অঙ্গরাজ্যে বাংলা, উড়িয়া, সাঁওতালি, মগধী, মৈথিল, ভোজপুরি ইত্যাদি নানা ভাষা বলা হয়। শেষ তিনটি ভাষাই "বিহারি ভাষা" ব'লে জনগণনার হিসেবে ধরা হয়। এদের মধ্যে ভোজপুরি ভাষা উত্তর প্রদেশের পূর্বতম প্রান্তেও বলা হয়। ভোজপুরি পত্রিকা ও চলচ্চিত্রের প্রকাশ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, ভাষাটি সম্পূর্ণ জীবন্ত। মৈথিল ভাষাতেও পত্রিকা ও সাহিত্যগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। মগহি ভাষাটি ভারতীয়-আর্য শাখার সব চেয়ে পশ্চাৎপদ ভাষা; কিন্তু তাই ব'লে সেটি মৃত বা হিন্দি ভাষার উপভাষা নয়।

রাজপুতরা শক্তিশালী জাতি এবং রাজস্থানি অতি সজীব ভাষা। উৎপত্তির দিক থেকেও রাজস্থানি বরং গুজরাতির জ্ঞাতি, হিন্দির কেউ নয়। যেমন, মগহি-মৈথিল-ভোজপুরি ভাষা তিনটি উৎপত্তির বিচারে বাংলার জ্ঞাতি ভাষা, হিন্দির তত নিকট সম্পর্কিত নয়। অবশ্য এখন আর রাজস্থানি গুজরাতির সান্নিধ্যে নেই, হিন্দির দ্বারা খানিকটা প্রভাবিতও হয়েছে, তবু তাকে হিন্দি বলা যায় না। অনুরূপভাবে, এখন আর মৈথিল-মগহি ভোজপুরিয়াকে বাংলার জ্ঞাতি ব'লে কোন লাভ নেই, তারা হিন্দির দ্বারা খানিকটা প্রভাবিতও বটে, কিন্তু তাই ব'লে তারা হিন্দির সামিলও নয়।

শান্তভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, হরিয়ানা, উত্তর ও মধ্য প্রদেশের বাইরে হিন্দি ভাষার কোন অস্তিত্ব নেই; বিহার ও রাজস্থান রাজ্যে ভিন্ন বর্গের ভাষাসমূহ প্রচলিত। সুতরাং ১৯৬১ সালের লোক গণনার হিসেব অনুযায়ী ঐ তিন রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা সাড়ে এগারো কোটির বেশি নয়। ঐ সাড়ে এগারো কোটি থেকে উর্দু, ভোজপুরি, কোশলি ও দ্রাবিড়ভাষী লোকদের বাদ দিতে হয় ব'লে হিন্দিভাষীর মোট সংখ্যা ১৩৩·৪ মিলিঅন হতেই পারে না, যা ভারত-সরকারের জনগণনার হিসেবে দাবি করা হয়েছে। কোসলি তথা ছত্রিশগড়িকে কেন হিন্দি ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তার কোন যুক্তি নেই। মগহি বা কোসলি ভাষায় এখন বড় সাহিত্যিক নেই, কাজেই তাদের লুপ্ত সাব্যস্ত করতে হবে, এ-সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রসূত. ভাষাতাত্ত্বিক এ-কথা কখনও মানবেন না।

১৯২১ সালের লোক গণনার হিসেব অনুসারে হিন্দি ভাষার লোকসংখ্যা ছিল ৪১ মিলিঅন; বর্তমানে তা ৬৫ মিলিঅন হতে পারে। সততার সঙ্গে হিসেব নিলে ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির প্রকৃত লোকসংখ্যার অনুপাত যে গ্রিআর্সন সাহেবের দেওয়া তালিকার মতোই আছে, তা বোঝা যায়; একথা ভারতের লোকগণনার পরিচালক মহাশয়ও ১৯৬৫ সালে স্বীকার করেছিলেন।

দেবনাগরি লিপিতে লেখা হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা; পারসিক-আরবি লিপিতে লেখা উর্দু তার অন্তর্ভূত হতে পারে না। স্বতন্ত্র লিপিতে লেখা সার্ব আর ক্রোট এক ভাষা নয়; তাদের মধ্যে যে-সাদৃশ্য, হিন্দির আর উর্দুর মধ্যে তাও নেই। উর্দুর মধ্যে ফার্সি—আরবি—তুর্কি শব্দ এত বেশি আর তৎসম শব্দ এত কম যে, তৎসম বহুল ফার্সি প্রভৃতি প্রায় বিবর্জিত হিন্দিকে তার সঙ্গে এক ভাষা বলা যায় না। দুই ভাষার লোকই তাতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে থাকে। বৈদেশিক জাতিগুলিও দুটিকে আলাদা ভাষা হিসেবে ধরে; রুশ-হিন্দি, রুশ-উর্দু, ইংলিশ-হিন্দি, ইংলিশ-উর্দু ইত্যাদি অভিধানগুলি তার প্রমাণ। লিপি ও শব্দ ভাণ্ডারের পার্থক্যই হিন্দি আর উর্দুকে দুটি স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত করেছে॥

কিছুদিন আগেও হিন্দি ভাষা-সাম্রাজ্যবাদীরা বিহারি ও পাঞ্জাবি ভাষাগুলিকে হিন্দির অন্তর্ভুক্ত দেখাবার চেষ্টা করেছে। গুরুমুখী লিপিতে লেখা পাঞ্জাবী একটি সুস্পষ্ট-ভাবে স্বতন্ত্র ভাষা। পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাব বা লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি-মুলতান অঞ্চল হয় তো উর্দুভাষী অঞ্চলে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু পাতিয়ালা-অমৃতসরের পাঞ্জাব চিরদিনই পাঞ্জাবীভাষী থাকবে।

কোশল বা মহাকোশলের ভাষা পূর্বী হিন্দি বা কোশলিও একটি স্বতন্ত্র ভাষা; ১৯২১ সালে এর লোক সংখ্যা ছিল ২৩ মিলিঅন; এখন তা ৩৫ মিলিঅন হতে পারে। মহাকোশল প্রদেশ গঠনের স্বীকৃতি কংগ্রেস ৪০ বছরেরও বেশি আগে দিয়েছিল। [ক্রমশঃ

পথের নিশানা

নাটক

নারায়ণ চক্রবর্তী

পাত্র পাত্রী

অতীন সান্যাল	...	নিষ্কাশনপুর বয়েজ স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক।
পঞ্চানন পাকড়াশী	...	নিষ্কাশনপুর বয়েজ স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক।
হেড্মাষ্টার	...	নিষ্কাশনপুর বয়েজ স্কুলের হেডমাষ্টার।
গণেশ, বিষ্ণুপদ, মাণিক, নন্তু, অশোক	...	নিষ্কাশনপুর বয়েজ স্কুলের ছাত্র।
মিষ্টার বিনায়ক বাসু	...	নিষ্কাশনপুর ইস্পাত কারখানার উচ্চপদস্থ অফিসার ও নিষ্কাশনপুর বয়েজ এবং গার্লসস্কুলের সেক্রেটারী।
আবদুল	...	মিষ্টার বাসুর বেয়ারা।
হারাধন	...	স্কুলের পিওন।
সুব্রত দত্ত	...	অতীনের বন্ধু।
শর্বরী দত্ত	...	সুব্রতর বোন। নিষ্কাশন-পুর গার্লস স্কুলের সদ্য নিযুক্ত শিক্ষিকা।
সুধাময়ী	...	অতীনের মা।
পলি বাসু	...	মিষ্টার বিনায়ক বাসুর কিশোরী মেয়ে।

ছাত্রদল, ডাক্তার, দারোগা, দু'জন কনেষ্টবল। সনাতনবাবু, বেগুনওয়ালা, ডিমওয়ালা, পানওয়ালা প্রভৃতি।*

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোনো স্কুলের হল ঘর।

[টেষ্ট্ পরীক্ষা হচ্ছে। লম্বা পরীক্ষার হল-এ ১০।১২টি বেঞ্চি ঘনভাবে সাজানো। প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন করে ছাত্র বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, একটু ঘেঁসাঘেসিভাবেই বসেছে ওরা। অতীন সান্যাল আর পঞ্চানন পাকড়াশী, এই দু'জন মাষ্টারমশাই ঘুরে ঘুরে গার্ড দিচ্ছেন। অতীন যুবক, বয়স ২২।২৩, পরনে ফর্সা মিহি ধুতি, গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি। পঞ্চানন, পায়ে পাম্প সু ও দড়ি বাঁধা ফুল মোজা, ধুতি হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি জায়গায়। গায়ে কোট, তার ওপর সুতী চাদর। মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে নিকেলের চশমা।]

সময়ঃ সকাল এগারোটা।

[পরদা উঠলে দেখা যাবে যে পঞ্চানন যথাসম্ভব ছেলেদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকছেন। অতীন কঠোর গাম্ভীর্যের সঙ্গে গার্ড দিচ্ছে বটে, কিন্তু সে মুখ ফেরালেই প্রায় সব পরীক্ষার্থী পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে, নয়তো পকেট থেকে কাগজ বার করে

* এই নাটকের চরিত্র ও ঘটনা সবই কাল্পনিক।

নকল করছে, কেউ কেউ ফাঁকতালে খাতাও বদল করে নিচ্ছে! এরা থাকবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে। সামনে থাকবে গার্ড দু'জন।]

অতীন। যাই বলুন পঞ্চাননবাবু, প্রত্যেক বেঞ্চে তিনজন করে ছেলে বসলেই টেষ্ট পরীক্ষাটা ভালো ভাবে নেওয়া যেতো। এখন এ হলে যে সব ব্যাপার চলছে তাতে আমাদের গার্ড দেবার কোনো মানেই থাকছে না, মনে হচ্ছে আমরা যেন পরোক্ষে দুর্নীতিরই প্রশ্রয় দিচ্ছি—

পঞ্চানন। কন কি অতীনবাবু। আপনের প্রস্তাব মত কাজ হইলে তো এন্তার ছেইলা ফেল করত—

অতীন। (চমকে উঠে) সে কি! তবে কি জেনে শুনেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে?

পঞ্চানন। (নির্বিকারভাবে) তা ছাড়া আবার কি? তবু দেইখেন অনে, কপি করণের এমন সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কত পোলা ফেল মাইরা যাইবো—

অতীন। আপনারা, মানে এই স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী কি তাহলে জেনে শুনেই এই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

পঞ্চানন। দুর্নীতি? দুর্নীতিটা আবার কোন খানে দেখলেন?

অতীন। এই যে ছেলেরা অবাধে কপি করছে,— এটা দুর্নীতি নয়? এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, এরাই তো একদিন বড়ো হয়ে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরবে, তখন কি এদের নীতিহীন দুর্বল মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে না? আর আমরাই কি দায়ী হব না তার জন্য?

পঞ্চানন। (বিরক্তির সুরে) আরে রাখেন মশয় আপনের ওই সব নীতিবাগীশী বক্তৃতা, অমন গরম বক্তৃতা আমরাও দিছি এক'দিন, কিন্তু এখন আর দেই না—

অতীন। আপনাদের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ কি পঞ্চাননবাবু?

পঞ্চানন। কারণ হইল দারিদ্র্য, বুঝলেন অতীনবাবু, দারিদ্র্য,—অভাবের আগুনে পুইড়া ছাই হইয়া গেছে বই পড়া ওই সব নীতির মালা। এই হলের সব ছাত্রই ইস্কুলের কোনো না কোনো মাষ্টারের কাছে প্রাইভেটে পড়ে, অরা ফেল করলে তাগো আয় খচ্ কইরা আধা হইয়া যাইবো না?

মাণিক। (উঠে দাঁড়িয়ে) স্যার—

অতীন। কী বলছ মাণিক?—

মাণিক। একটু বাইরে যাবো স্যার?

অতীন। আধ ঘণ্টা আগে তুমি জল খেয়ে এলে, আবার বাইরে যাবে কেন?

মাণিক। জল খেলাম বলেই তো দরকারটা বেশী হয়ে পড়েছে স্যার,—যাবো?

পঞ্চানন। যাউক যাউক, অরে যাইতে দেন অতীনবাবু—

অতীন। পাঁচ মিনিটে ফিরে আসতে হবে—

মাণিক। আচ্ছা স্যার— প্রস্থান

অতীন। (দ্রুত পদে একটি ছাত্রের কাছে গিয়ে) (ধমকের সুরে) এই—কী হচ্ছে? ও কি করছ গণেশ?

গণেশ। (নিরীহ ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) কিছু না স্যার—

অতীন। তোমার বাঁ হাতে ওটা কি? দেখি?—

গণেশ। (চট করে কোটের পকেটে বাঁ হাতটা পুরে তৎক্ষণাৎ বার করে আনল) কই স্যার, কিছু তো নেই—

[গণেশ বাঁ হাতটা সামনে দিকে প্রসারিত করে আঙুল পাঁচটা ঠিক অতীনের সামনে মেলে ধরে। তাড়াতাড়ি নাক বাঁচাবার জন্য দু'পা পেছনে হঠতে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে ধাক্কা খায় অতীন. সঙ্গে সঙ্গে সেই বেঞ্চের ছাত্র বিষ্ণুপদ কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বলে ওঠে বিষ্ণুপদ "আঃ,—কী করছেন স্যার,···লেখা খারাপ হয়ে গেল।]

অতীন। (গণেশকে) বটে! কিছু নেই দেখি তোমার পকেট,—না না, ওটা নয় ওটা নয়, বাঁ পকেট, বাঁ পকেট—

(চট করে গণেশের বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে চার পাঁচটা উত্তর লেখা কাগজ, একটি অর্থ পুস্তকের ছেঁড়া অংশ বার করে আনে অতীন)

(কঠোর স্বরে) এ সব কী?

গণেশ। [বিন্দু মাত্রও না ঘাবড়ে] কেন মিছিমিছি দিক করছেন স্যার,—জানেন তো সবই। একেতে এ্যাসা কঠিন প্রশ্ন করেছেন, তার ওপর যদি এমন সং হাঙ্গামা করেন তা হলে প্রাণ বাঁচে কি করে স্যার?

বিষ্ণুপদ। [উঠে দাঁড়িয়ে] এবারের মতো

ছেড়েদিন স্যার,—বেচারা চার বছর ধরে একই ক্লাসে পড়ে আছে—

গণেশ। হ্যাঁ স্যার,—খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মতো—

অতীন। (বিষ্ণুকে) চুপ্। তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে? (গণেশকে) বলো কেন নকল করছিলে? জানো, এক্ষুনি তোমার খাতা ক্যানসেল করতে পারি আমি? বার করে দিতে পারি পরীক্ষার হল থেকে—

বিষ্ণুপদ। দুর্ দুর্—এ স্যারটা কিচ্ছু জানে না। একদম নোতুন কিনা, গায়ে এখনো কলেজের গন্ধ লেগে আছে—

বসে পড়ল

গণেশ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখে মৃদু হাসি, ডাইনে বাঁয়ে তার দিকে তাকিয়ে-থাকা ছাত্রদের মুখের দিকে নির্ভয়ে তাকালো।

অতীন। ও পঞ্চাননবাবু,—

পঞ্চানন। (চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে) অ্যাঁ। কী হইল আবার? কী কইতাছেন অতীনবাবু?

অতীন। গণেশ নকল করছিল,—এ ব্যাপারটার কী করা যায়?

পঞ্চানন। (কাছে এগিয়ে এসে) অ। আমাগো গণশা! কারে গণশা, নকল করতাছস ক্যান?

গণেশ। কী আর করি স্যার,—যা কড়া কড়া কোশ্চেন করেছেন নকল না করে আমার বাবাও পাশ করতে পারবে না—

পঞ্চানন। (হালকা সুরে) বটে। প্রশ্ন বুঝি ভাল হয় নাই?

গণেশ। একদম না স্যার। ইম্পরটেন্ট্ দেখে পাঁচ পাঁচটা কোশ্চেন মুখস্থ করেছি,—একেবারে ঝাড়া মুখস্থ স্যার—কিন্তু তার একটাও যদি পরীক্ষায় আসে (কাঁদো কাঁদো সুরে) একেবারে পথে বসিয়ে দিলেন স্যার—

পঞ্চানন। যা যাঃ, বেশী ফাইজলামি করিস না। যা পারস ল্যাখ্ না ক্যান্। কই তোর অন্য পকেটে কি আছে সব বাইর কর—

(হাত ঢুকিয়ে অন্য পকেট থেকে বার করলেন দু'খানা আধ ছেঁড়া মানে বই, একগাদা উত্তর লেখা ছোট ছোট কাগজ).

নে ল্যাখ্ এখন স্থির হইয়া বইসা, খবরদার এদিক ওদিক তাকাবি না—

বলতে বলতে দূরে সরে এলেন

গণেশ। সবই তো কেড়ে নিলেন স্যার, আর লিখব কি গুষ্টির পিণ্ডী?

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল

অতীন পঞ্চাননের পেছনে পেছনে ফুট লাইটের কাছে এগিয়ে এল।

অতীন। এ কী করলেন পঞ্চাননবাবু? এই এক গাদা নকল করবার মাল মসলা গণশার পকেট থেকে বার হবার পর এক্সকিউজ করবার কোনো মানে হয়?

পঞ্চানন। [চাপা সুরে] এই সব ব্যাপার নিয়া বাড়াবাড়ি করবেন না অতীনবাবু—

অতীন। বাড়াবাড়ি!

পঞ্চানন। বাড়াবাড়ি না তো কী! আপনে গেছেন নিষ্কাশনপুরের গণ্শারে ঘাটাইতে। কই যে, আপনের প্রাণ একটা না দুইটা?

অতীন। একটা—

পঞ্চানন। তবে?

অতীন। কী তবে?

পঞ্চানন। তবে যে সেই পৈত্রিক প্রাণটা অকালেই খোয়াইতে চাইতাছেন—

অতীন। কী আবোল তাবোল বকছেন মশাই—

পঞ্চানন। কি কইলাম বুঝতে পারতাছেন না?

অতীন। না—একদম না—

পঞ্চানন। তবে অবধান করেন। ঐ যে গণ্শা—ও হইল এই নিষ্কাশনপুরের গুণ্ডা ছোকরাগো চাঁই। ওর খাতা ক্যান্সেল করলে আপনের একটা হাত বা পা-ও ক্যান্সেল হইয়া যাইতে পারে, বুঝলেন?

অতীন। তাই বলে চোখের সামনে এ রকম নকলবাজী দেখেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো?

পঞ্চানন। (বিরক্তির সঙ্গে হাত তুলে) আঃ—চোখের সামনে! চোখের সামনে—ত্যাখেন ক্যান্? কই যে, চোখ দুইটা অমন ড্যাবড্যাবাইয়া-চাইয়া থাকেন ক্যান অগ দিগে?

অতীন। আপনি বলছেন কি পঞ্চাননবাবু? চোখ বুজে গার্ড দেব নাকি?

পঞ্চানন। আরে না না, তা করবেন ক্যান্, তা হইলে তো আবার হেডমাষ্টার মশায়ের চোখে পড়বেন—

মাণিকের প্রবেশ

কী রে মাইন্‌কা, এতক্ষণ বাইরে কাটাইয়া আইলি? ত'গ' কি পরীক্ষা দেওনের ইচ্ছা-টিচ্ছা ন'ই নাকি?

মাণিক। লাইব্রেরী ঘরের ছেলেরা সব প্রশ্ন কঠিন হয়েছে বলে বেরিয়ে এসেছে স্যার—তারা এদিকেই আসছে—

পঞ্চানন। এঁ্যা, কস কি? নাই করিস বাবা, চেয়ার টেবিলগুলা ভাঙ্গিস না, এইটা কোম্পানীর ইস্কুল, আসবাব-পত্র ভাঙ্গলে জেনারেল ম্যানেজার সাহেব আমাগো আর আস্থা রাখবো না—

দরজার কাছে একদল ছেলের কলরব

ছাত্রদল। জুলুমবাজী—মানবো না।
প্রশ্নপত্র—সহজ হোক।
ছাত্র-দাবি—মানতে হবে।

একটি ছাত্র। এই গণ্শা—কী করছিস, বেরিয়ে আয় না, দল ভারী করি—

অতীন। এই কী হচ্ছে তোমাদের?—এখানে গোলমাল কোরো না, এদের পরীক্ষা দিতে দাও—

গণেশ। [উঠে দাঁড়িয়ে] আপনি থামুন তো স্যার, —এ হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন, এর মধ্যে নাক গলাতে আসবেন না—

অতীন। পরীক্ষা ভণ্ডুল করাটাও কি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে পড়ে?

গণেশ। নিশ্চয়ই। পরীক্ষার নামে আপনারা ছাত্র-মেধযজ্ঞ করছেন, মাথার ওপর বিরাট বইএর পাহাড় চাপিয়ে তাদের পঙ্গু করছেন, ক্লাসে সিলেবাস শেষ না করেও শক্ত শক্ত ছাত্র-ঠকানো প্রশ্ন সেট করছেন, এ সব জুলুম আমরা মানব না—

বাইরে ছাত্রদল } মানব না মানব না, জুলুমবাজী মানব না—

গণেশ। (বক্তৃতার সুরে) বন্ধুগণ, বাইরে আমাদের বিপ্লবী সঙ্গীরা ডাক দিয়েছে, এখনো কি তোমাদের পরীক্ষার মোহ ঘুচলো না?

ঘরের ভেতর ছাত্রদল। ঘুচেছে—ঘুচেছে—

গণেশ। চলো, তা হলে আমরা বেরিয়ে পড়ি—

হৈ হৈ করতে করতে ছেলেরা উঠে পড়লো। দু' একজন তখনো বসে লিখতে চেষ্টা করল, কিন্তু অন্য ছেলেরা তাদের খাতা তুলে ছিঁড়ে ফেলল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সম্মিলিত কণ্ঠে। জুলুমবাজী—বন্ধ হোক
প্রশ্ন পত্র—সহজ হোক
সহজ হোক
সহজ হোক—

(অতীন অবাক হয়ে পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল)

পঞ্চানন। খেইপা গেছে, একেবারে খেইপা গেছে—

অতীন। এই সব ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারেন পঞ্চাননবাবু?

পঞ্চানন। অন্ধকার—অন্ধকার—অগ' আর লগে লগে আমাগো। ল'ন এখন হেডমাষ্টারমশায়ের ঘরে—সেক্রেটারীর কাছে রিপোর্ট পাঠাতে লাগবো।

অতীন। চলুন—

উভয়ের প্রস্থান

পরদা নেমে এলো

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পথের ধারে বাজার বসেছে। আলু, কপি, মটর শুঁটি, ডিম, টমাটো, বেগুন ইত্যাদি নিয়ে মেয়ে ও পুরুষ বিক্রেতারা বসেছে। অনেক লোকের আনাগোনায়, দর দস্তরে বাজার সরগরম। পথ দিয়ে লোকজন, সাইকেল, রিক্সা প্রভৃতির আনাগোনা।]

(অতীনের প্রবেশ। হাতে বাজারের থলি)

অতীন। বেগুন কি দর হে—

বেগুনওয়ালা। বারো আনা কিলো বাবু—

অতীন। বারো আনা কিলো! বলো কি হে? এ যে কলকাতারও বাড়া হ'ল দেখছি—

সনাতন। (বাজার করতে করতে মুখ ফিরিয়ে) ঠিক বলেছেন মাষ্টার মশায়, সব জিনিষ যেন আগুন, হাত দেয় কার সাধ্য—

অতীন। মফঃস্বল শহরে তো এমনটি হওয়া উচিত নয় সনাতন বাবু,—সুধু হাট বাজারের কথাই বলছি না, বাড়িভাড়াটাই কি কম? দু' খানা আট বাই দশ ঘর

নিয়ে আছি, ভাড়া যাট টাকা, তাও জল নেই, লাইট নেই—

সনাতন। কারখানা সহর হলে এমনিই হয়, লোকের হাতে অঢেল কাঁচা পয়সা আছে কিনা, তাই কেউ আর গ্রাহ্যি করে না এ সব।

অতীন। হ্যাঁ, কারখানার লোকেরা ভালো মাইনে পায় শুনেছি, আমাদের মতো উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না তাদের—

সনাতন। শুধু কি মাইনে? ওভারটাইম আছে না? এমন অনেক লোক আছে যারা রবিবার ছাড়া ছেলের মুখ দেখতে পায় না—

অতীন। সেকি!

সনাতন। হাঁা, ভোর ছ'টায় ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে কারখানায় যায়, খেতে যখন ফেরে ছেলে মেয়েরা সব স্কুলে, আবার অনেক রাতে ওভার-টাইম খেটে যখন বাড়ি ফেরে ছেলেমেয়েরা তখন হয়তো বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে—

অতীন। বাপের শাসন বঞ্চিত এ সব ছেলেরা মানুষ হবে কি করে?

সনাতন। হবে না—হয় না—মানুষ না হয়ে বাঁদর হয়—

অতীন। কী বললেন?

সনাতন। ঠিকই বলেছি মাষ্টার মশায়, কারখানার বিষাক্ত পরিবেশে ছেলে মানুষ করা খুব কঠিন, চারদিকে অনাচারের স্রোত, এ সব দেখে শুনে ছেলে মেয়েগুলো সব বয়ে যাচ্ছে,—স্রেফ বয়ে যাচ্ছে—

শর্বরীর প্রবেশ

[বয়স কুড়ি একুশ। রুচিসম্মত সাজ সজ্জা, মোটা-মুটি সুন্দরী। চোখে কালো চশমা, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। সঙ্গে একটি বাচ্চা চাকর। অতীনের পাশে দাঁড়িয়ে ডিম-অলাকে]

শর্বরী। ডিম কত করে?

ডিমঅলা। দুশ আনা জোড়া—

অতীন। (গলার স্বর শুনে চমকে শর্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) একি! শর্বরী—? তুমি—

শর্বরী। (ঘুরে অতীনের মুখে তাকিয়ে) অতীনদা না? কী আশ্চর্য, তুমি এখানে?

অতীন। আমারও তো ঐ একই জিজ্ঞাসা শর্বরী। নিষ্কাশনপুরে কী করছ তুমি?

শর্বরী। বাঃ, আমি যে নিষ্কাশনপুর গার্লস স্কুলে চাকরী পেয়েছি—এসেছি দিন কুড়ি হল—

অতীন। সে কি! সঞ্জয় এ্যালাউ করল?

শর্বরী। আমার চাকরী করা না করার সঙ্গে সঞ্জয়ের কী সম্পর্ক? সঞ্জয় কে যে তার অনুমতি নিতে হবে আমাকে?

অতীন। তবে যে আমি শুনেছিলাম যে ভালোবেসে সঞ্জয়কেই বিয়ে করবে তুমি?

শর্বরী। তোমার শোনা কথাটাই অভ্রান্ত জেনে দূরে সরে গেলে অতীনদা? একবার আমাকে জিজ্ঞেসও করলে না?

অতীন। শর্বরী! এ তুমি কি বলছ শর্বরী? আমার অবসন্ন, ভাঙ্গা হৃদয় যে আবার জেগে উঠছে,—আবার জোড়া লাগছে, শর্বরী,—না এখানে নয়, এখানে অনেক লোক,—চলো না ওদিকের ঐ ছোট্ট পার্কটায় গিয়ে বসি, ওঃ, কতো কথা জমে আছে আমার বুকের ভেতরে—

শর্বরী। ঐ পার্কে? কিন্তু কেউ কিছু ভাববে না তো?

অতীন। কী আবার ভাববে,—চলো—

শর্বরী। বিশুয়া—

বিশুয়া। জী মাইজী—

শর্বরী। তুই এখানে একটু দাঁড়া আমি এখুনি আসছি—

বিশুয়া। বহুৎ আচ্ছা মাইজী—

শর্বরী। চলো অতীন দা,—উঃ, এতদিন পরে তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে, কতো জায়গায় তোমাকে খুঁজেছি, কিন্তু কোনো খোঁজ পাইনি। আচ্ছা, এমন ভাবে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় পালিয়েছিলে বলো তো?

অতীন। ঐ কারখানাটার মস্ত মস্ত চিমনিগুলোর আড়ালে—

দু'জনেই হেসে উঠল

কথা বলতে বলতে ওরা দু'জন উইংস-এর পাশে একটা লোহার বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

অতীন। শর্বরী—

শর্বরী। বলো—

অতীন। কতদিন, কতকাল পরে তোমার আমার দেখা হল, বলোতো!

শর্বরী। এক বছর সাত মাস বাইশ দিন—

অতীন। এর প্রত্যেকটি দিন যেন সুতীক্ষ্ণ তলোয়ার হাতে আমার জীবনে এসেছিল শর্বরী, আঘাতে আঘাতে আমার বুকটাকে একেবারে ফালা ফালা করে দিয়ে গেছে, সে যে কী যন্ত্রণা,—কী কষ্ট, কী দুঃসহ বেদনা—

শর্বরী। আর আমি? আমি বুঝি খুব আরামে ছিলাম? আমাকে ভুল বুঝে তুমি গা ঢাকা দিলে, আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম, সঞ্জয়কে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়ালাম—

অতীন। সঞ্জয়কে তাড়ালে?

শর্বরী। হ্যাঁ, সঞ্জয়কে আমি সহ্য করতে পারলাম না। দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ওর উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। দেশের মাটিতে পা রেখে, দেশের অন্নে শরীর পুষ্ট করে ও আর ওর দল দেশের সঙ্গে যে দিন বিশ্বাসঘাতকতা করল, শত্রুদেশকেই আপন বলে মনে করল, সে দিনই আমার মোহ ভঙ্গ হল অতীন দা, সঞ্জয়ের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে আমার ঘেন্না হল,—তা ছাড়া—

অতীন। তা ছাড়া?

শর্বরী। ওর কথার চটকে আমি সাময়িকভাবে একটু মুগ্ধ হয়েছিলাম এ কথা সত্যি, কিন্তু তারই ফলে আমাকে ভুল বুঝে তুমি যখন সরে গেলে তখন তোমার অভাবটা এত বড়ো হয়ে দেখা দিল যে সঞ্জয়ের সঙ্গ আর কোনোমতেই সহ্য করতে পারলাম না, তোমার অদর্শনই যেন আমার মনে তোমার স্মৃতির প্রদীপের সলতেকে উসকে দিল—

অতীন। (আবেগভরে) আমার বেলাও ঠিক তাই হয়েছিল শর্বরী। ভুল বুঝে আমি তোমার কাছ থেকে বহু দূরে সরে এলাম বটে, কিন্তু ভুলতে তোমায় পারলাম না। এই নির্বান্ধব নিষ্কাশনপুরের নিস্তরঙ্গ দিনগুলির পাশে কলকাতার সেই সব বর্ণাঢ্য, সুষমাময় দিনগুলো যেন আরও উজ্জ্বল আরও মায়াময় হয়ে উঠতো,—তাই তোমাকে এখানে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আমার বুকের ভেতরটা যে কেমন করে উঠল তা তোমাকে বোঝাতে পারব না শর্বরী, —এই যে তুমি আমি পাশাপাশি বসে আছি এই বোধই চিরন্তন হয়ে থাক—

শর্বরী। তুমি তো কখনো এত উচ্ছ্বাস-প্রবণ ছিলে না অতীনদা, মনে আছে তাই নিয়ে কতোবার কতো অনুযোগ করেছি আমি—

অতীন। অনেক দিন পরে দেখা কিনা, তাই বুঝি আবেগ আর কোনো বাঁধ মানতে চাইছে না,—তুমি আর আমি আবার একই সহরে থাকব ভাবতেও কী ভালোই না লাগছে—

শর্বরী। তুমি কি এখানে পার্টির কোনো প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছ অতীনদা? কুড়ি হাজার শ্রমিক কাজ করে এই নিষ্কাশনপুর ইস্পাত কারখানায়,—পার্টির পক্ষে এ সহরটা তো একটা চমৎকার ওয়ার্কিং ফীল্ড, তাই না?

অতীন। (গলা নামিয়ে) তোমাকে খুব গোপনে বলছি শর্বরী, পার্টির কাজ আর আমি করি না, পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে এসেছি—

শর্বরী। সত্যি? সত্যি বলছ অতীনদা? পার্টির কাজে আর কোনোদিন ফিরে যাবে না তুমি?

অতীন। না শর্বরী—

শর্বরী। আঃ—কী আনন্দ—কী আনন্দ—

অতীন। কিসের আনন্দ শর্বরী?

শর্বরী। আমার দাদা পার্টির একজন অন্ধ ভক্ত, তুমিও ছিলে তাই,—কিন্তু তবু আমার মনে একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধেছিল. তোমাদের পথ কি সঠিক পথ? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যেতো, ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারতাম না,—দেশের লোকের আর সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি দুষ্প্রবৃত্তি দেখে দেখে মন যখন বিষিয়ে উঠতো তখন ভাবতাম যে বুঝি তোমরাই সঠিক পথে চলছ, কিন্তু বিদেশী শত্রু যখন আমাদের উত্তর সীমান্তে হানা দিল তখন তোমাদের পার্টির সত্যিকারের স্বরূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, শিউরে উঠলাম আমি—

অতীন। শিউরে উঠলে?

শর্বরী। হ্যাঁ। দেশের স্বাধীনতার চেয়েও পার্টিকেই বড়ো করে দেখার জন্য তোমার ওপর, দাদার ওপর, তোমাদের দলের সমস্ত লোকের ওপর

আমার ক্রোধ আর ক্ষোভের আর সীমা রইল না। ঐ পার্টির এই স্বদেশবিরোধী নীতি তোমার আর আমার মাঝখানে বিরাট এক বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দিন,—আজ আর সেই বাধার প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই অতীনদা, আজ আমাদের মুক্তিস্নান—

অতীন। তুমি ঠিকই বলেছ শর্বরী. আজ আমাদের মুক্তিস্নান,—তোমার দাদা আমার বন্ধু, আমি তারই চলার পথ অনুসরণ করে চলেছিলাম, কিন্তু একদিন ঐ পথের প্রান্তে দেখতে পেলাম অন্তহীন খাদ, যে খাদে তুমি, আমি, আমার সমস্ত দেশবাসী তলিয়ে যেতে পারে। সুব্রত ঝাঁপ দিল, কিন্তু আমি পারলাম না, পারলাম না দেশবৈরীকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে, পালিয়ে এলাম—চুপি চুপি, চোরের মতো পালিয়ে এলাম শর্বরী, মৃত্যু গহ্বর পেছনে ফেলে জীবনের অমৃতময় পাথেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু এখানেও হতাশা, এখানেও বঞ্চনা, এখানেও দুর্নীতির গ্লানি, এ দেশের, এ জাতির ভবিষ্যৎ কি শর্বরী?

শর্বরী। মানুষ যা সৃষ্টি করে মানুষই তা ধ্বংস করতে পারে অতীনদা, তুমি হতাশ হয়ো না, পথ আমরা খুঁজে পাবোই একদিন—

অতীন। কিন্তু কবে? কবে? কবে আসবে সেদিন? এখনো যে শুধু জীবনধারণের জন্য জীবিকার অন্বেষণ মানুষের সমস্ত মহত্ত্বর প্রেরণাগুলো শুষে নিচ্ছে, তুমিও কি তার শীকার হয়েছ শর্বরী?

শর্বরী। হ্যাঁ অতীনদা, এম-এ পড়া ছেড়ে দিয়ে পড়ানোকেই পেশা করে নিতে হলো আমাকে—কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম এখানে।

অতীন। কিন্তু কেন? সুব্রতর আয়ে কি আর চলছিল না তোমাদের? আমি তো জানি বিদেশের সহযোগী পার্টি প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকে ওদের, তা ছাড়া ওর ভালো চাকরি ছিল।

শর্বরী। জেলের ভেতরে তো আর সে সাহায্য দেওয়া যায় না অতীন দা, চাকরিও থাকে না।

অতীন। সুব্রত কি এখন জেলে?

শর্বরী। হ্যাঁ, ছ' মাসের ওপরে হ'ল। দলের আরও অনেকেই তো এখন জেলে, কেন তুমি কি কিছু জানো না?

অতীন। একেবারে জানি না তা নয়, তবে সুব্রতর ব্যাপারটা জানতাম না—

হঠাৎ দূরে মাইকের ঘোষণা শোনা গেল

মাইক। মেরে প্যারে ভাইয়োঁ ঔর দোস্তো,—আজ শামকো ছে বাজে নেতাজী ময়দানমে এক বহোত বড়া জনসভা হো গা। ট্রেড ইউনিয়ান কা মজদুর নেতা ভেঙ্কটেশ চিদাম্বরম ভাষণ দেঙ্গে, আপলোগ জ্যায়দা সে জ্যাদা তাদাদ লে কে হাজির হোইয়ে গা—কম্পানী মজদুরো কা জায়েজ মাংগ ঠুকরা দিয়া হ্যায়, উসকা মোর্চা লেনা পড়ে—গা—

শর্বরী। আবার বোধ হয় স্ট্রাইক হবে নিষ্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড স্টীল কারখানায়—

অতীন। কতকগুলো গরীব লোক ছাটাই হয়ে মারা পড়বে আর কিছু চাঁই লোকদের পকেট ভরবে—

শর্বরী। চারদিকে শুধু দুঃখের ইতিহাস,—এ আমাদের কী হল বলোতো অতীনদা? দারিদ্র্য, দুঃখ আর বঞ্চনা যেন আমাদের হৃদয়ের তাপটুকুও শুষে নিচ্ছে—এই আকাশ, এই বাতাস, এই সবুজ ঘাস, এর মধ্যেও যেন সাপের মতো স্বার্থ লুকিয়ে আছে—

অতীন। সত্যি শর্বরী, এই পৃথিবীটা যেন বড়ো নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছে।

শর্বরী। অথচ কয়েক বছর আগেও এই পৃথিবীরই কী সুন্দর রূপই না আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, সোনালি স্বপ্নে ঘেরা সেই সব দিন আর রাত কতো সহজেই না কেটে যেতো, কেটে যেতো স্বচ্ছন্দ-প্রবাহ নদীর জলধারার মতো—

অতীন। একটা সময় সবার জীবনেই আসে, কাব্য তখন মধুর বলে মনে হয়, সুন্দর স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ়তাকে ঢেকে রাখে—

শর্বরী। তোমার সঙ্গ কতো মধুর লাগতো তখন। মনে পড়ে সেই আউটরাম ঘাটে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দু'জনের একই ঠোঙা থেকে চিনেবাদাম খাওয়া?

অতীন। কিংবা লাইটহাউসে দু'জনে পাশাপাশি সিটে বসে সিনেমা দেখতে দেখতে তোমার শাড়ির মৃদু খসখস শব্দ শুনতে শুনতে সামনের রঙীন পর্দার কথা ভুলে যাওয়া—

শর্বরী। সবই তো ঠিক তেমনই আছে, শুধু তেমনি নেই আমাদের মন, তাই না অতীনদা—

অতীন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এসো না আমরা চেষ্টা করি আবার সেই মনটাকে ফিরিয়ে আনতে—

শর্বরী। কোনো ফল হবে না অতীনদা, হারানো মুহূর্তগুলো আর ফিরে আসবে না—

অতীন। তা না-ই বা আসুক। আমরা তো নতুন মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারি শর্বরী, পারি ভবিষ্যতের হাত থেকে স্বপ্নের মণিহার ছিনিয়ে আনতে—

শর্বরী। অতীন দা, তোমার কথা শুনে আমার মনটা দুলে উঠ্‌ছে, সময়ের ব্যবধানকে লুপ্ত করে ফেলতে চাইছে—

অতীন। তা হলে এসো শর্বরী, আমরা নতুন কাল সৃষ্টি করি, সৃষ্টি করি নতুন পরিবেশ,—সময়ের কৃপণ মুঠি থেকে কেড়ে নিই সামান্য অবসর, যে অবসরটুকুতে আমি আর তুমি কাছাকাছি, পাশাপাশি থাকব ঠিক আগের মতো, আমাদের মাঝে আসবে না কোনো পার্টি, না আসবে কোনো সঞ্চয়ের অভিশাপ—

মিষ্টার বিনায়ক বাসুর প্রবেশ

(পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য বেশ। মুখে চুরুট। ভারিক্কি—প্রৌঢ় চেহারা।)

বিনায়ক। এক্সকিউজ মি,—মিস্ ডাট্ না?

শর্বরী। (চট করে উঠে দাঁড়িয়ে) মিষ্টার বাসু!—গুড্ মর্নিং স্যার—

বিনায়ক। গুড্ মর্নিং। গাড়ি করে এ রাস্তাটা ক্রশ করছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল বাতাসে-ওড়া আপনার সবুজ শাড়ির আঁচল—

শর্বরী। আঁচল সামলে) বড্ড হাওয়া দিচ্ছে এ জায়গাটাতে—

বিনায়ক। সুন্দরী মেয়েদের পেছনে শুধু মানুষই নয়, হাওয়াও ধাওয়া করে দেখছি,—হা হা হা,—সে যাক্ আমি একটু আগেই আপনাদের টিচার্স বোর্ডিংএ গিয়েছিলাম মিস্ ডাট্—

শর্বরী। কেন মিষ্টার বাসু?

বিনায়ক। আপনারই খোঁজে—

শর্বরী। আমার খোঁজে?

বিনায়ক। হ্যাঁ। (বক্র দৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকিয়ে) কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ায় আপনাদের ব্যাঘাত হল বলে মনে হচ্ছে,—আই অ্যাম সো সরি—

শর্বরী। না না, বিন্দুমাত্রও না। বোর্ডিংএর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ বহুদিন পরে অতীনদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই—

বিনায়ক। তাই পার্কের জনবিরল কোণে বসে, মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণে পূর্ব স্মৃতি ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন? হা হা হা,—ওয়েল, আপনি তো বয়েজ স্কুলের একজন টিচার, তাই না অতীনবাবু—

অতীন। হ্যাঁ স্যার—

বিনায়ক। ডু ইউ নো মি?

অতীন। হ্যাঁ, আপনি তো স্কুল দুটোর সেক্রেটারী—

বিনায়ক। শুধু তাই নয়, আমি এই কারখানার সিনিয়র সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, অথচ আপনি আমার সামনে দিব্বি বেঞ্চে বসে আছেন! আই অ্যাড্‌মায়ার ইয়োর চিক্‌স্—

অতীন। এটা পাব্‌লিক প্লেস মিষ্টার বাসু—এখানে শিক্ষক হিসেবে আমার সম্মান আপনার চেয়ে কম হবার কথা নয়. আপনার অফিসে আমি নিশ্চয়ই যথাযোগ্য সম্মান দেখাবো আপনাকে—

বিনায়ক। টেক কেয়ার অতীনবাবু,—এর আগেও আপনার ঔদ্ধত্য আমার বিরক্তির কারণ হয়েছে, ভবিষ্যতে আর তা সহ্য করব না আমি,—আপনি আশী টাকার নগণ্য স্কুল মাষ্টার হয়ে নিজেকে আড়াই হাজারি অফিসারের সঙ্গে তুলনা করেন?

অতীন। আমার ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও ঔদ্ধত্য নেই মিষ্টার বাসু। আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন—

বিনায়ক। হোয়াট? ডু ইয়ু ডেয়ার টু কনট্রাডিক্ট মি?

অতীন। ভুল তথ্যের প্রতিবাদ করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। ভুল তথ্য? ইউ ডেয়ার সে দিস অন মাই ফেস?

অতীন। আপনার খামখেয়ালী আদেশের প্রতিবাদ করেছিলাম সেদিন, তাই হয়তো প্রসন্ন চোখে দেখতে পারছেন না আমাকে, কিন্তু মনে রাখবেন যে সবাই মেরু-

দণ্ডহীন ক্লীব মানুষ নয়। কারখানার ভেতরে গরীব শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে যদি ভেবে থাকেন যে পৃথিবীর সব মানুষের ওপরেই অবিচার করবার অধিকার জন্মেছে তা হলে ভুল করবেন মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। শাট আপ অতীনবাবু,—জানেন, আই মে ক্রাশ ইউ দিস ভেরী মোমেণ্ট! আই ক্যান স্ম্যাক্ ইউ—

অতীন। মিষ্টার বাসু, মনে রাখবেন যে আমি আপনার বাংলোর বাবুর্চি বেয়ারা বা আর্দালি নই যে ওভাবে আমাকে চোখ রাঙাবেন—

শর্বরী। আঃ—অতীনদা, থামো না,—কাকে কি বলছ তুমি?

অতীন। তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে শর্বরী? বেশ আমি তা হলে চল্লাম— [দ্রুতপদে প্রস্থান

শর্বরী। (পেছনে পেছনে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে) অতীনদা, অতীনদা, যেওনা, শোনো শোনো,—নাঃ চলে গেল। চিরদিনই ও এমনি অভিমানী, এমনি করেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে—

বিনায়ক। [এগিয়ে এসে] আই অ্যাম অফুলি সরি মিস্ ডাট্,—একজন লেডির সামনে টেম্পার লুজ করা আমার উচিত হয়নি। দিস ইজ এ কার্স অব্ দি ওয়ার্কশপ—

শর্বরী। না না, আপনি কুণ্ঠিত হবেন না মিষ্টার বাসু,—আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, জীবনের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের জলে হঠাৎ ঢেউ ফুঁশে ওঠে বৈকি, তাকে স্বীকার করে না নিলেই বরং দুঃখ পেতে হয়—

বিনায়ক। ওয়েল মিস্ ডাট,—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল—

শর্বরী। বলুন মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। আমার মেয়ে পলির ভার আপনাকে নিতে হবে—

শর্বরী। আপনার মেয়ের ভার?

বিনায়ক। পলির সঙ্গীত শিক্ষার ভার—

শর্বরী। সঙ্গীত শিক্ষা? কিন্তু আমি তো—

বিনায়ক। আপনি লুকুলে কি হবে মিস্ ডাট,—আমি শুনেছি যে রবীন্দ্র সঙ্গীতে আপনার চমৎকার গলা, কলকাতার বিভিন্ন ফাংশানে আপনি গান গেয়েছেন—

শর্বরী। না না, তেমন কিছু নয়, এই সামান্য একটু চর্চা ছিল ছাত্রী অবস্থায়—নিশ্চয়ই কেউ বাড়িয়ে বলেছে আপনাকে—

বিনায়ক। দ্যাট উইল ডু, দ্যাট উইল ডু মিস্ ডাট। মানে ব্যাপার হচ্ছে যে আজকাল হাই সোসাইটিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়াটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এণ্ড দ্যাট ডিনোট্স্ দি হাই কালচার অব এ লেডী,—সো পলি ইজ জাস্ট ক্রেজি টু লার্ণ ট্যাগোরস্ সঙ্স—

শর্বরী। কিন্তু আমার সামান্য শিক্ষার পুঁজি নিয়ে—

বিনায়ক। হু কেয়ারস্ ফর হাই পারফেক্শন হিয়ার? নিষ্কাশনপুর একটা কারখানা শহর,—ফুল অব্ রিফ্‌র‍্যাফ্ অব দি সোসাইটি। অফিসারেরা কারখানা আর ওয়ার্কস্-পলিটিক্স নিয়েই ব্যস্ত, লেডীজরা শুধু পার্টি, পিকনিক আর ক্লাব নিয়েই আছেন—

শর্বরী। সে কি? ফাইন টেস্টের লোক নেই এখানে?

বিনায়ক। আছে, মাত্র একজন—

শর্বরী। এক জন?

বিনায়ক। মানে আই মাইসেল্ফ্—হা হা হা

শর্বরী। কেন? মিসেস বাসু?

বিনায়ক। (গম্ভীর হয়ে) ডোণ্ট মেনশন হার টু মি, প্লিজ,—তা হলে আজ সন্ধ্যায় আমার বাংলোয় আসছেন তো মিস্ ডাট! আই উইল ওয়েট ফর ইউ—বাই বাই দেন— প্রস্থান

শর্বরী। (হাতঘড়ি দেখে) উঃ দশটা বেজে গেছে, বাজার করতে দেরী হবার জন্য ললিতাদি নির্ঘাৎ বকবেন আজ,—

দেখি বিশুয়া আবার কোন দিকে গেল।

বিপরীত দিকে প্রস্থান

পর্দা নেমে এলো

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

[পথের মাঝ খানে একদল কিশোর ছাত্র। দু' এক জন পথচারী রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করছে। পথের পাশে একটা পান বিড়ির দোকান। কয়েকটি ছাত্র সিগারেট কিনে ধরাবে, আধা খাওয়া হলে সঙ্গীদের দেবে।]

ছুটির দিনের দুপুর

একটি ছেলে স্টেজে ঢুকেই দলটি দেখে থমকে দাঁড়ালো, তার পর পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেল।

গণেশ। ওরে মাণকে—ঐ ছাখ, আমাদের ফার্স্টবয় পালাচ্ছে ডাক—ডাক ওকে—

মাণিক। এই অশোক, পালাচ্ছিস কেনরে, গণশা ডাকছে শুনে যা—

অশোক। (ফিরে এসে) কী বলছিস? বল আমার তাড়া আছে—

গণেশ (একমুখ ধোয়া ছেড়ে) আরে বাপস, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস নাকি?

অশোক। বাজে কথা রাখ, বল কি বলবি—

গণেশ। আমাদের টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুচ্ছে কবে বল দেখি?

অশোক। তা জেনে তোদের লাভ? দল বেঁধে বাংলা পরীক্ষাটা তো ভণ্ডুল করলি, এখন আর রেজাল্টের জন্য হাঁ করে আছিস কেন?

মাণিক। হেড মাষ্টার মশাই বলেছেন যে, বাংলা পরীক্ষার জন্য কাউকে আটকাবেন না—

অশোক। দল বেঁধে বাড়িতে চড়াও হলে তা না বলে উপায় কি? তোমাদের জন্যই হেডমাষ্টার মশাই রিজাইন দেবেন ভাবছেন, তা জানিস?

গণেশ। যা যা:—মেলা বকিস নে। ভারি আমার মাষ্টার দরদী এলেন। আমাদের একটা বছর নষ্ট হলেই খুব ভালো হোতো, না?

অশোক। নষ্ট হবে কেন? মন দিয়ে পরলে পাশ করা তো ইজি—

বিষ্ণুপদ। তোমার মতো মাথা নিয়ে তো আর সবাই জন্মায় নি বাওয়া,—মাষ্টার মশাইরা ক্লাসে ঠিক মতো পড়ালে তো পাশ করব? আমরা যে পড়াশোনায় এত কাঁচা রয়ে গেলাম' তার জন্য তো মাস্টারমশাইরাই দায়ী—

অশোক। মাষ্টার মশাইরাই দায়ী? বলিস কি?

মাণিক। হ্যাঁ, ইস্কুলের প্রত্যেকটি মাষ্টারই তো, নিজের নিজের বাড়িতে এক একটি স্কুল খুলে বসেছেন—

গণেশ। এক এক ব্যাচে বারো থেকে পনেরোটি ছেলে পড়ে সেখানে—

বিষ্ণু। সকাল ছ'টা থেকে আটটা, আটটা থেকে দশটা, আবার বিকেল ছ'টা থেকে আটটা, আটটা থেকে রাত দশটা—তিরিশ টাকা মাইনে প্রত্যেকের—

মাণিক। মাষ্টার মশাইরা স্কুলে আসেন শুধু বিশ্রাম নিতে, বুঝলি অশোক,—স্রেফ বিশ্রাম নিতে—

গণেশ। যার বাবার পয়সা নেই, যে প্রাইভেটে পড়তে পারে না—তাকে জোর করে ফেল করিয়ে দেয়—

অশোক। কী আবোল তাবোল বকছিস। নেশা করেছিস নাকি?

বিষ্ণু। নেশা? আমাদের অবস্থা দেখলে পাকা নেশাখোরেরও নেশা ছুটে যাবে, বুঝলি অশোক—

অশোক। বুঝলাম, কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে গুলতানী করছিস কেন বলত?

মাণিক। একজন আসবে, তার আশায় দাঁড়িয়ে আছি—

গণেশ। (দূরে কাকে আসতে দেখে) আর দাঁড়াতে হবে না, ঐ এসে গেছে নন্তু—

হন হন করে নন্তুর প্রবেশ। গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার।

নন্তু। সর্বনাশ হয়ে গেল রে গণশা—

সবাই ঘিরে ধরল নন্তুকে। অশোক একটু তফাতে রইল।

বিষ্ণু। সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

নন্তু। দেখে এলাম, শুধু খচাখচ্ আমার খচাখচ—

মাণিক। খচাখচ?

নন্তু। হ্যাঁ। লালে লাল একেবারে। একটা খাতা ধরছে আর লালে লাল করে দিচ্ছে লাল পেন্সিলের খোঁচায়—এবারও ফেল হয়ে গেলাম রে—

অশোক। কে রে? কোন স্যার?

নন্তু। অতীন স্যার—

অশোক। তুই কি করে জানলি?

নন্তু। অতীন স্যারের জানালা বরাবর একটা ঝাঁকড়া জাম গাছ আছে না? তাতে উঠে এই দুরবীন দিয়ে নিজের চোখে দেখে এলাম—

গণেশ। (পিঠ চাপড়ে) সাবাশ—তুই আমার উপযুক্ত চেলা রে নন্তু, নে সিগারেট খা,—খাসা কায়দা বার

করেছিস। কিন্তু এখন উপায়? পাশ না করতে পারলে যে কারখানার চাকরীটাও হবে না—ম্যানেজার সায়েবকে ধরে বাবা যে সব ঠিক করে রেখেছে রে—এবার ফেল করলে বাবা আর আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না…

নন্তু। ফেল যদি করিস তবে ঐ অতীন স্যারের পেপারেই করবি—অন্যগুলো তো ম্যানেজ হয়ে গেছে,—

গণেশ। দেব নাকি অতীন স্যারকে ধরে আচ্ছারকম ঠ্যাঙ্গানী?

বিষ্ণু। গায়ের ঝাল মিটিয়ে?—সেই অনন্ত স্যারের মতো?

অশোক। আচ্ছা তোরা কী বলতো, উনি আমাদের গুরুজন না? তাঁর গায়ে হাত তুলবার কথা বলতে লজ্জা হয়না তোদের?

মাণিক। কী বললি? গুরুজন? হুঃ—গুরুজনের গজনে তোরাই শুধু ভয়ে মরিস, আমাদের অত ভয় নেই—

গণেশ। বলে, গার্জেনকেই মানি না, উনি আবার গুরুজন দেখাচ্ছেন।

নন্তু। গুরুজন যদি দুর্জন হয় তা হলেও তাদের মানতে হবে?

অশোক। দুর্জন?

নন্তু। দুর্জন না তো কী? যে মাষ্টার ছাত্রদের দুঃখু বোঝে না, লাল পেন্সিলের খোঁচায় আমাদের খাতাগুলোই শুধু নয়, আমাদের বুকের ভেতরটাও রক্তাক্ত করে দেয়, তাকে আবার খাতির কিসের শুনি?

অশোক। সারা বছর নেচে কুঁদে, পড়ায় ফাঁকি দিয়ে মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াবি আর আশা করবি যে পরীক্ষার খাতায় মাষ্টারমশাইরা ফুল মার্কস্ দেবেন, না? বারে মজা—

গণেশ। খবরদার অশোক, ঠেস দিয়ে কথা বলবি না, মেরে হাড় গুড়ো করে দেবো—

অশোক। ঐ একটি কাজই শিখেছিস ভালো করে—ঠাণ্ডা লোক ধরে ধরে ঠ্যাঙ্গানো। কর বাবা, যা তোদের খুশী তাই কর। আমি চললুম—

প্রস্থান

গণেশ। ছোঁড়া তো বেশ জ্ঞান দিয়ে চলে গেল; এখন আমরা কি করি বলতো? টেষ্ট পরীক্ষাটায় কোনো মতে উৎরে গেলে ফাইন্যালের জন্য ভাবি না,—সে প্ল্যান আমার ঠিক করাই আছে—

মাণিক। আমার মাথায় চমৎকার একটা আইডিয়া এসেছে রে গণশা—

গণেশ। চটপট ঝেড়ে ফেল ত বাওয়া—

মাণিক। ইঃ, মাগনা? জনতা কেবিনে চা খাওয়া আগে—

বিষ্ণু। ঠিক বলেছিস মাইরি। প্রাণটা অনেকক্ষণ ধরেই চা চা করছিল। পেটে কিঞ্চিৎ চা পড়লে বুদ্ধিও খুলবে ভালো—

গণেশ। তোরা খালি আমার ট্যাঁক খালি করবার তালে থাকিস। সিনেমা দেখব বলে আজ সকালে বাবার পকেট ফাঁক করেছিলাম, তা-ও দেখছি ফসকাতেই হবে, আমার কপালে কি সবই ফাঁকি? বেশ চ' তবে—

দলবলসহ গণেশের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

স্কুল ছুটি হওয়ার পর অনেকগুলো বাচ্চা ছেলে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। ওদের পেছনে পেছনে এলো অতীন। পরণে ধুতি, গায়ে কোট, হাতে বই। পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। সময় বিকেল।

অতীন। একটা পান সাজো তো হে—

দোকানী। কী পান বাবু, সাদা না জর্দা?

অতীন। সাদা—

অতীন পান কিনছে এমন সময়ে পঞ্চানন বাবু এসে ঢুকলেন।

পঞ্চানন। কী করতাছেন এইখানে,—অ অতীনবাবু?

অতীন। (চমকে) অ্যাঁ, কে? ও, পঞ্চাননবাবু? আসুন, পান খাবেন?

পঞ্চানন। ছ্যান্ একটা—

অতীন। আর একটা পান দাও তো হে—

দোকানী। দিচ্ছি বাবু,—এই নিন—

দু'জনে পান নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এলো

পঞ্চানন। গার্লস ইস্কুলের নতুন মাষ্টারণীর লগে আলাপ আছে বুঝি আপনের?

অতীন। হ্যাঁ,—কেন বলুন তো?

পঞ্চানন। ওনারে দেখলাম কিনা একটু আগে,—তাই জিগাইলাম—

অতীন। কোথায় দেখলেন শর্বরীকে?

পঞ্চানন। আমাগো সেক্রেটারী বাসু সাহেবের গাড়িতে, ওনারে একটু সাবধান কইরা দিয়েন অতীন বাবু—

অতীন। সাবধান করে দেব? কেন?

পঞ্চানন। (গলা নামিয়ে) মাইয়ালোকের ব্যাপারে আমাগো বাসু সাহেবের একটু দুর্নাম আছে,—ঘরে বউ না থাকলে যা হয় আর কি। গত বছর শিবাণী দাসেরে লইয়া কী কেলেঙ্কারী—সারা নিষ্কাশনপুরে ঢি ঢি পইড়া গেছিল—

অতীন। ঘরে বউ নেই মানে? বাসুসাহেব কি বিপত্নীক?

পঞ্চানন। আরে না,—বিপত্নীক হইবো ক্যান্—

অতীন। তবে?

পঞ্চানন। বড় ঘ্যরর কথা, দেইখেন, আমার নামটা আবার ফাঁশ কইরেন না—মেমসায়েব ভাগলবা—

অতীন। ভাগলবা! বলেন কি মশায়?

পঞ্চানন। হঃ। জেনারেল ম্যানেজার প্যাডী সায়েবের লগে বাসুসায়েবের বউএর খুবই মাখামাখি আছিল, প্রোমোশনের আশায় বাসুসায়েব তখন একটু রাশ ঢিলাও দিছিল, ফলে যা হওনের তাই হইল।

অতীন। কী হল মিসেস বাসুর?

পঞ্চানন। প্যাডী সাহেব কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়া কইলকাতায় চইলা গেল, মিসেস বাসুরেও লইয়া গেল তার লগে, আর এদিকে বাসু সাহেব তিন ডবল প্রোমোশন পাইয়া নিষ্কাশনপুরের হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া রইল।

অতীন। মিষ্টার বাসু হজম করলেন এই ব্যাপারটা? আমি হলে—

পঞ্চানন। আরে রাখেন মশায় আমি হলে,—মাস গেলে আড়াই হাজার টাকা মায়না পায় বুঝলেন, ঐ টাকার চাপে চাপা পইড়া গেছে যাবতীয় স্ক্যাণ্ডাল—

অতীন। তাও কি কখনো হয়?

পঞ্চানন। হয় মশায় হয়। এই নিষ্কাশনপুর কারখানা সহরে আরও কিছুদিন থাকেন কত কিছু দেখবেন। ঘরের বউ রে বড়সাহেবের বাংলোতে ডালি পাঠাইয়া প্রোমোশন আদায় করে অনেক হোমরা চোমড়াই—

অতীন। কী জঘন্য রুচি! মনুষ্যত্বের কী শোচনীয় অধঃপতন!

পঞ্চানন। আরে রাখেন মশায় মনুষ্যত্ব! নিজে বাচলে তবে না মনুষ্যত্ব! এই যে আমরা শিক্ষকতা করি যা পাই তাতে কি প্যাট চলে? পয়সা রোজগারের জন্য কত হীন কাজই না করন লাগে আমাগো।

অতীন। কিন্তু শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই তো জীবনের পরম সার্থকতা নয় পঞ্চাননবাবু। শিক্ষকতার একটা মহৎ আদর্শ আছে—আমরা জাতি সংগঠকদের পুরোধা—

পঞ্চানন। (উত্তেজিত হয়ে) আদর্শ! আদর্শ না ছাই,—বলে শরীলে নাই চাম্ মুখে রাধাকিষ্টো নাম,—স্ত্রী, পুত্র প্রতিপালন করতে হইবো না? অরা কি ভাইস্যা যাইবো চরম দারিদ্র্যের বন্যায়?

অতীন। প্রতি দেশে প্রতি কালে কিছু লোককে ত্যাগস্বীকার করতেই হয় পঞ্চাননবাবু—শিক্ষকরাই এ যুগের দধীচি—

পঞ্চানন। আরে রাখেন আপনের ঐ সব কেতাবী বুলি। পাঠ্যপুস্তকের পাতাতেই ও গুলি ভাল শোভা পায়,—আমরাও পড়াইয়া আরাম পাই। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় ঐ সব কথার কানাকড়ি মূল্যও নাই অতীনবাবু—

অতীন। এ আপনি বলছেন কি পঞ্চাননবাবু?

পঞ্চানন। ঠিকই কইতাছি। বর্তমান জগৎ টাকার বশ, তাই যেন তেন প্রকারেণ টাকা আয় করাটাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। চোরাকারবারীই হন আর কালাবাজারীই হন, দুশ্চরিত্র, লম্পট যাই হন না ক্যান, টাকা থাকলে আপনের সাতখুন মাপ, আপনে হবেন দ্যাশের মান্য গণ্য ন্যাতা, আপনে পাবেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, আপনের ফটো ছাপা হইবো দেশের খবরের কাগজে—

অতীন। আপনার কথাগুলো সাময়িকভাবে সত্য হলেও শাশ্বত সত্য থেকে বহু দূরে পঞ্চাননবাবু—

পঞ্চানন। বর্তমানেরে উপেক্ষা করনের মত এত বড় বোকামি আর নাই অতীনবাবু, খালি অতীত বা খালি

ভবিষ্যৎ নিয়া কোনো জাতি চলতে পারে না, বড় হইতে পারে না, বর্তমানের বিষ ভবিষ্যতেও সংক্রমিত হয়। সারা দেশ জোড়া অসাধুতা, কপটতা আর বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা ঝাটাইয়া সাফ না করতে পারলে আমাগো দ্যাশ কোনোদিনই নিজের পায়ে দাড়াইতে পারবো না—

[দূরে বহু লোকের হৈ হৈ চীৎকার—ধর ধর, ধর ব্যাটাকে,—নিশ্চয়ই মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে,—ইস, রক্তে রাস্তাটা একেবারে ভেসে যাচ্ছে।]

অতীন। (উৎকর্ণ হয়ে শুনে সে দিকে তাকিয়ে) ও কিসের গোলমাল পঞ্চাননবাবু?

[গণেশ, নিত্যানন্দ মানিক সহ এক দল কিশোর স্টেজে ঢুকে, বিপরীত উইংস দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে]

গণেশ। ছুটে যা, ছুটে যা মানিক, ট্রাকটাকে ধরা চাই— [ছেলের দলের প্রস্থান

পঞ্চানন। আরে এই গণশা,—কি হইলো? দৌড়াস ক্যান?

গণেশ। (বাধা পেয়ে থেমে দ্রুতকণ্ঠে) এক ব্যাটা ট্রাক ড্রাইভার স্যার—

অতীন। কী করেছে ট্রাক ড্রাইভার?

গণেশ। কি টি রোডের এই ভীড়ের ভেতর দিয়ে ফুলস্পীডে ট্রাক চালিয়ে যাচ্ছিল স্যার,—মেয়েটাকে বোধ হয় শেষ করে দিয়েছে—

পঞ্চানন। কী সর্বনাশ! কার মাইয়া?

গণেশ। নজর আলির বাচ্চা মেয়েটা স্যার,—একা রাস্তা পার হচ্ছিল—

অতীন। আ—হা—মেয়েটা কোথায়?—

গণেশ। ঐ তো নন্তু কোলে করে নিয়ে আসছে—

(একটি রক্তাপ্লুত বাচ্চা মেয়ে কোলে করে নন্তুর প্রবেশ)

নন্তু। গনশা—বেঁচে আছে রে,—বেঁচে আছে এখনো—

অতীন। ইশ্। চলো চলো, এখুনি হাসপাতালে চলো, দেরী হলে আর বাঁচানো যাবে না।

[অতীন, গণেশ, নন্তুর দ্রুত প্রস্থান

পঞ্চানন। মাসের আইজ সতেরো দিন, এর মইধ্যেই সাতটা এক্সিডেন্ট। যার যায় সেই জানে—

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মিষ্টার বিনায়ক বাসুর বাংলোর ড্রইংরুম আধুনিক রুচিতে সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট, এক কোণে রেডিওগ্রাম, একদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। ফায়ার প্লেসের কাছে কারুকার্যখচিত ঝক-ঝকে পেতলের কলস, ম্যাণ্টল পীসে কয়েকটি কৃষ্ণনগরের পুতুল। ঘরের মাঝখানে কাশ্মীরী কাজ করা নীচু গোল টেবিল ঘিরে সোফা সেটি, একটু ব্যবধানে একটি ডিভান। ডিভানে হারমোনিয়ামের সামনে শর্বরী বসে, পাশে পলি, বছর ১৪।১৫র ফ্রক পরা মেয়ে, ফর্সা, দোহারা, মাথায় বব-ছাট চুল। চঞ্চল চলনে।

সময়: প্রাক্ ন-টা]

শর্বরী। আমি আগে একা গাই, তারপর আমার সঙ্গে তুমিও গাইবে, কেমন?

পলি। আচ্ছা—

শর্বরী। (হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইল)

"পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্ত চোখে যাস্ নে দ্বারে॥
রত্নমালা আনবি যবে মাল্য বদল তখন হবে—
পাতবি কি তোর দেবীর আসন শূন্য ধুলায়
পথের ধারে॥
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন, বহে পবন দৈন্যজ্বালা,
হায় রে তখন শুকনো ফুলে ভরবি কি তোর বরণ ডালা
অতিথিরে ডাকবি যবে ডাকিস যেন সগৌরবে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥"

শুনলে তো, নাও ধরো এবার আমার সঙ্গে—

দুজনে। পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা—

শর্বরী। উঁহু, হলনা,—বলো, চাবার যাহা—

পলি। চাবার যাহা—

শর্বরী। হচ্ছে না,—চাবার যাহা—বলো বলো, গলা মেলাও আমার সঙ্গে—ওকি চুপ করে রইলে কেন? তুমি তো নতুন শিখছো না রবীন্দ্র সঙ্গীত, আগেও তো শিখতে—

পলি। ভালো লাগে না এ গান শিখতে, কিন্তু ড্যাডির হুকুম শিখতেই হবে—আমাদের কন্‌ভেণ্টে এসব বালাই নেই—

শর্বরী। কী ভালো লাগে তবে ?

পলি। নাচ,—বয় ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে নাচ—

শর্বরী। নাচ ?

পলি। হ্যাঁ নাচ, টুইষ্ট নাচ,—ভারি চমৎকার, আপনি নাচেন না ?

শর্বরী। না, তবে যদি নাচ শিখবার ইচ্ছে হোতো তা হলে বিদেশী নাচ না শিখে ভারতীয় নাচ-ই শিখতাম—

পলি। ভারতীয় নাচ ? সে আবার কি ?

শর্বরী। ভারতীয় নাচ দেখোনি ক্ল্যাসিক্যাল নাচ ? ভারত-নাটাম্, কথাকলি, কথক, মণিপুরী—কতো রকমের নাচ আছে—

পলি। ওসব আমার ভালো লাগে না, বাজে—টুইষ্টের কাছে লাগে না—কাম-সেপ্টেম্বর দেখেন নি ? শুনবেন তার নাচের রেকর্ড আছে আমার, নাচের সুরের তালে তালে কি সুন্দর নাচব দেখবেন ?—

[লীলায়িত ভঙ্গীতে পলি উঠে যায় রেডিওগ্রামের কাছে, রেকর্ড চালু করে, তারপর ঘরের মাঝখানে এসে নাচতে থাকে।]

পলি। আসুন না মিস্ দত্ত, আমার সঙ্গে একবার নাচবেন,—

শর্বরী। আমার রুচি হয় না—

পলি। কেন, মিসেস রায়, মিসেস সিন্‌হা তো প্রতি শনিবারই ক্লাবে গিয়ে নাচেন,—অফিসার মহলে কতো নাম তাঁদের—

শর্বরী। তাঁরা হলেন মেমসাহেব, তাঁদের সঙ্গে কি আমার তুলনা ?

[অফিসের পোষাক পরে মিষ্টার বিনায়ক বাসুর প্রবেশ]

বিনায়ক। হ্যাল্লো পলি ডারলিং, গান ছেড়ে হঠাৎ নাচ যে ?

পলি। আজ আমার বড্ড নাচতে ইচ্ছে করছে ড্যাডি—

বিনায়ক। দ্যাটস্ ব্যাড,—মিস্ ডাট্ কি মনে করবেন ?—দুষ্টুমি করে নিশ্চয়ই ওঁকে বিরক্ত করছ—

শর্বরী। না না, বিরক্ত করবে কেন ? পলি খুব ভালো মেয়ে,—সুইট গার্ল—

বিনায়ক। (হেসে) যাক, পলিকে ভালো বলবার তবু একটি লোক পাওয়া গেল—দ্যাটস্ ফাইন—

পলি। ওঃ, ড্যাডি—ডোণ্ট পুল মাই লেগ,—ইউ ডু সো সো অফন্—

বিনায়ক। ডু আই ? ওয়েল ওয়েল,—আমি কারখানার এ পোষাকটা ছেড়ে আসি—প্লিজ টেল আবদুল টু ব্রিং টি-থিংস্ হিয়ার— [প্রস্থান

পলি। আবদুল—আবদুল—

[খানসামা আবদুলের প্রবেশ]

আবদুল। জী মিসি বাবা—

পলি। সাব্ কে লিয়ে চা আউর খানা লে আও—

আবদুল। ডাইনিং রুম মে ?

পলি। নেহি নেহি, ড্যাডি ইহাঁ টেবিল লগানে কো বোলে হেঁ—

আবদুল। বহোত আচ্ছা মিসিবাবা, ম্যঁয় অভি হুকুম তামিল করতা হুঁ—(আবদুল বেরিয়ে গেল, পরক্ষণেই একটি Portable টেবিল ও চারটে হাল্কা চেয়ার এনে এককোণে বসালো, টেবিলের ওপর সাদা টেবিল ক্লথ পাতলো, আবার বেরিয়ে গিয়ে তোয়ালে ঢাকা একটি ট্রে এনে টেবিলের মাঝখানে বসালো)

শর্বরী উঠে দাঁড়ালো

পলি। ওকি মিস্ দত্ত, উঠলেন কেন ?

শর্বরী। তোমরা চা খাও, আমি ততক্ষণ তোমাদের বাগানে ঘুরে আসি—কত রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়—

[সাদা পাজামা, স্লিপার ও ড্রেসিং গাউন পরে মিষ্টার বিনায়ক বাসু ঘরে ঢুকলেন।]

বিনায়ক। কি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় মিস ডাটা ?

শর্বরী। আপনার ঐ বাগান—এথিং অব্ বিউটি—

বিনায়ক। ইয়ু থিংক সো ? বাগান করা আমার একটা হবি মিস ডাটা—কারখানার বর্বর লোকগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ থেকে মনটা যখন বিষিয়ে ওঠে তখন ঐ বাগানে নিজের হাতে ফোটানো ফুলের মাঝখানে বসে থাকতে খুবই ভালো লাগে—

শর্বরী। কারখানার লোকগুলোকে বর্বর বলছেন কেন মিষ্টার বাসু ? ওরাও তো আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ, ওরাও তো আমাদের মতোই সুখে দুঃখে

হাসি ও অশ্রুতে আন্দোলিত হয়, ওদের হৃদয়ও একটি তাজা ফোটা ফুলের চেয়ে কম সুন্দর নয়—

বিনায়ক। (খাবার টেবিলে বসে ট্রের ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনা সরাতে সরাতে) এ ধরণের কথা বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে বললে প্রচুর হাততালি পাওয়া যায়, শুনতেও রোমাঞ্চ বোধ হয়, কিন্তু আমাদের মনে এ সব কথা দাগ কাটে না মিস্ ডাটা, ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এ সব লেবারগুলো যে কী চীজ তা আমরা ভালো করেই জানি আর জানি কি করে ওদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে হয়—

[পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘন্টি বেজে ওঠে
আবদুলের প্রবেশ]

আবদুল। আপকা ফোন আয়া হ্যায় সাব্—

বিনায়ক। ওহ্ হ্যাং ইট অল, ঘরে ফিরেও শান্তি নেই? প্লিজ এক্স্‌কিউজ মি মিস্ ডাটা, আই'ল বি ব্যাক ইন এ মিনিট—

[প্রস্থান

পলি। ড্যাডির মতো বিজ্ঞ অফিসার আর একজনও নেই এই নিষ্কাশনপুরে, জানেন—ড্যাডি এখানকার তেত্রিশটা সংঘের প্রেসিডেন্ট?

শর্বরী। তাই নাকি? বাঃ—

পলি। হ্যাঁ, শুধু তাই-ই নয়, ড্যাডি—

[বিনায়কের প্রবেশ]

বিনায়ক। প—লি—

পলি। ইয়েস ড্যাডি

বিনায়ক। ইউ আর ওয়ান্টেড্ ওভার দি ফোন,—একটি ইয়ং ম্যানের গলা শুনলুম যেন—

পলি। এ নিশ্চয়ই জয়ন্ত! হাউ নাইস অব হিম টু রিং মি আপ নাউ – (ছুটে চলে যাচ্ছিল)

বিনায়ক। জয়ন্ত? হু ইজ দ্যাট্ ব্লোক?

পলি। বাঃ, জয়ন্তকে চেনো না? মিষ্টার বি সরকারের ছেলে—মাই বেষ্ট্ বয় ফ্রেণ্ড,—হি ইজ এ ডিয়ার, সো চার্মিং—

বিনায়ক। বি সরকার ইজ এ জুনিয়ার অফিসার, তার ছেলের সঙ্গে তোমার মেলামেশা আমি পছন্দ করি না পলি—বলে দাও আর যেন সে আমার বাংলোতে ফোন না করে—

পলি। (ক্ষুণ্ন মনে) অল্ রাইট ড্যাডি,—আই'ল্ টেল্ হিম নট টু স্পীক উইথ মি এগেন,—নেভার, নেভার, নেভার এগেন—

বিনায়ক। দ্যাটস্ রাইট মাই লভি',—উই মাষ্ট নট ফরগেট আওয়ার ষ্ট্যাটাস এ্যাণ্ড পোজিশন ইন সোসাইটি।

(পলির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, তাই সামলাতে মুখ ফিরিয়ে ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।)

শর্বরী। আপনার কথায় পলি বোধ হয় কষ্ট পেল মনে,—জয়ন্তকে ওর খুব পছন্দ, আর ছেলেটিও বেশ—

বিনায়ক। আই কাণ্ট হেল্প ইট,—নাউ, প্লিজ হ্যাভ্ সাম টি উইথ মি মিস্ ডাটা—

শর্বরী। নো থ্যাংকস,—আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি বোর্ডিং থেকে।

বিনায়ক। তাতে কী হয়েছে? এ্যানাদার কাপ ওণ্ট্ ডু ইয়ু এনি হার্ম –

[শর্বরী ইতস্তত করে]

প্লিজ কাম মিস্ ডাটা,—আমি এমন কিছু ভয়ঙ্কর লোক নই যে সর্বক্ষণ আমাকে এড়িয়ে চলবেন—

[দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল শর্বরী, একটি চেয়ার টেনে নিয়ে মিষ্টার বাসুর মুখোমুখি বসল।]

বিনায়ক। (টোষ্টে মাখন মাখাতে মাখাতে) জানেন মিস্ ডাট্,—চায়ের টেবিলে আপনার মতো একটি সুন্দরী মহিলা প্রেজেণ্ট থাকলে একটা হোমলি এ্যাটমোস্‌ফিয়ার গড়ে ওঠে, যে জিনিষটার অভাব আমি প্রতি মুহূর্ত অনুভব করি—মোষ্ট গার্লস আর এ বোর,—বাট ইউ আর এ নোয়েল,—ইউ আর রিয়েলি চার্মিং—আমার সঙ্গিনী-হীন জীবনে আপনার লজ্জা কুণ্ঠা ভরা মন্থর পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তেই কত না মাধুর্য নিয়ে আসে—

শর্বরী। (সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে) না না, এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন মিষ্টার বাসু,—আমি অতি সাধারণ মেয়ে—

বিনায়ক। (ডিম সেদ্ধ আর টোষ্টের প্লেট এগিয়ে দিয়ে) নট এ্যাট্ অল্, নট্ এ বিট্—আপনি বোধ হয় নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন নন মিস্ ডাট্,—

শর্বরী। (হাত গুটিয়ে নিয়ে) তার মানে?

বিনায়ক। ইয়োর আইজ আর সো বিউটিফুল, এ্যাণ্ড

ইয়োর লিপস্—সো রেড এ্যাণ্ড সো ফুল,—আঃ, এক্‌সাইটিং ভেরি এক্‌সাইটিং—

শর্বরী। এসব আপনি কি বলছেন মিষ্টার বাসু ?

বিনায়ক। কেন ? এর আগে কি কোনো মুগ্ধ পুরুষ আপনার রূপের স্তুতি করে নি আপনার কাছে ? ইউ হ্যাভ্ নো প্রিন্স চার্মিং ?

শর্বরী। সে প্রশ্ন এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। ওঃ, আপনি দেখছি ভয়ানক পিউরিটান মিস্ ডাটা—যে কথা শুনে খুশী হওয়া উচিত তা শুনে আপনি রেগে উঠছেন, অব্ কোর্স ইউ লুক লভ্‌লিয়ার ইন্ এ রেজ—

শর্বরী। মিষ্টার বাসু, আপনি আমাদের স্কুল-সেক্রেটারী, ইন্ এ ওয়ে আমার বস্, তাই এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো মনের ভেতর টগবগ করে ফুটছে তা মুখে প্রকাশ করি নি, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না, আমি আপনাদের সোসাইটি লেডী নই এ কথাটা মনে রাখবেন—

বিনায়ক। আপনি দেখছি ভয়ানক টাচি মিস্ ডাট্,—জোক্‌কে জোক্ বলে নিতে জানেন না,—হাউ এভার,— স্কুল লাইফ কেমন লাগছে আপনার ?

শর্বরী। ভালোই—

বিনায়ক। বাট্ দি পে ইজ রাদার পুয়োর, তাই না ?

শর্বরী। মন্দ কি,—সব মিলিয়ে দু'শোর মতো পাচ্ছি এখন—

বিনায়ক। নো নো,—আই ডিস্‌এ্যাগ্রি উইথ ইউ মিস ডাট্,—এই মাইনেতে একটি মডার্ণ গার্ল-এর ডিসেণ্ট লিভিং চলে না,—আই নো দ্যাট্ পারফেক্টলি ওয়েল্,—বাট্ আই অ্যাম হেল্পলেস মিস্ ডাট্, কোম্পানী এর চেয়ে বেশী টাকা স্যাংশন করছে না—

শর্বরী। সে জন্য আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। দ্যাটস নট গুড মিস্ ডাট্, আপনার কি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই জীবনে ? আপনি জীবনে বড়ো হতে চান না,—চান না যে আপনার হাতে অনেক, অনেক টাকা আসুক ! জানেন সেই কবিতাটা :—

মানি মানি মানি
সুইটার দ্যান সানশাইন
ব্রাইটার দ্যান হানি ?

শর্বরী। (হেসে) একটু ভুল হল মিষ্টার বাসু,—

বিনায়ক। ভুল ?

শর্বরী। হাঁ—ব্রাইটার দ্যান সানশাইন, সুইটার হানি—

বিনায়ক। ও একই কথা, আসল কথা হচ্ছে মানি, চান না আপনি মানি ? চান না আপনার মা, বাবা, ভাই বোন সবাইকে সুখে রাখতে, আরামে রাখতে ?

[শর্বরী নীরব]

টাকাটা একটা প্রচণ্ড শক্তি মিস্ ডাট্, টাকা যেন সেই আলাদিনের প্রদীপের দৈত্য ! টাকা হাতে থাকলে মানুষ কী না করতে পারে ? ঘর বাড়ি, আসবাব পত্র, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা সবই একমাত্র টাকা দিয়ে কেনা যায়। এই দেখুন না আমাকে, নন্ ম্যাট্রিক,—কিন্তু টাকা আছে বলে আমার আণ্ডারে বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়াররা মুখ বুঁজে কাজ করছে—গোটা নিক্কাশনপুরে আমার অপ্রতিহত প্রভাব,—আই এম দ্য লর্ড হিয়ার—

শর্বরী। সে কথা সত্যি মিষ্টার বাসু, আপনাকে বাদ দিয়ে নিক্কাশনপুরের কোনো ফাংশানের কথা ভাবাও যায় না—আপনাকে সবাই ভয় করে—

বিনায়ক। তবেই দেখুন, মূল কথাই হচ্ছে মানি। চান না আপনি ? ডোণ্ট ইউ লাইফ টু—আর্ণ মোর ?

শর্বরী। (হাসতে হাসতে) চাই বই কি মিষ্টার বাসু, কিন্তু এও জানি যে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান—

বিনায়ক। তা ঠিক, তবে আমি ইচ্ছে করলে সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারি মিস্ ডাট্—

শর্বরী। আপনি পারেন ? সত্যি সত্যি পারেন ?

বিনায়ক। হ্যাঁ, ওয়ার্কশপে আমারই ডিপার্টমেণ্টে একটি লেডী ষ্টেনোগ্রাফার নেবো, চারশো টাকা ষ্টার্টিং—

শর্বরী। (চমকে উঠে) চারশো টাকা !

বিনায়ক। (আত্মপ্রসাদের সঙ্গে) হ্যাঁ, চার শো টাকা থেকে শুরু আর সাড়ে সাতশোতে শেষ, হাউ ড ইয় লাইক ইট্ মিস্ ডাট্ ?

শর্বরী। আমি? আমার জন্য এত করবেন আপনি?

বিনায়ক। হ্যাঁ শুধু তোমার জন্য, ফর ইয়োর সেক ওনলি—

[শর্বরী "তুমি" সম্বোধন শুনল, কিন্তু কিছু বলল না]

শর্বরী। কিন্তু আমি যে শর্টহ্যাণ্ড বা টাইপরাইটিং কিছুই জানি না মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। তা হলে আমি একটা নতুন পোষ্ট ক্রিয়েট করব তোমার জন্য,—ইয়েস ইয়েস,—এডুকেশন অফিসার, নাইস আইডিয়া, কোম্পানীর এত কাজের পর এতগুলো স্কুলের কাজ দেখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন, ওয়েল, এডুকেশন অফিসার হিসেবে আমাকে হেল্প করবে তুমি—

শর্বরী। আপনার এত ক্ষমতা মিষ্টার বাসু? এক কথায় এত বড়ো পোষ্ট পাওয়াতে পারেন আমাকে?

বিনায়ক। ক্ষমতা! হাঃ হাঃ হাঃ, আমি জেনারেল ম্যানেজারের ডান হাত শর্বরী,—নাউ, আর ইউ প্লিজড্?

শর্বরী। প্লীজড্? কী বলছেন আপনি? চারশো টাকা মাইনে তো আমার পক্ষে একটা স্বপ্ন,—বাবা মাকে ভালোভাবে খাওয়াতে পরাতে পারবো, ছোট ভাইটাকে ভালো স্কুলে দিতে পারবো বাবার বাতের অসুখের চিকিৎসা করাতে পারবো—অতীনদা শুনলে কী খুশীই না হবে?

বিনায়ক। অতীনদা! হু ইজ্ দ্যাট্ ব্লোক?

শর্বরী। অতীনদাকে চেনেন না? সেই যে সুন্দর চেহারা, সেই যে সেদিন পার্কে—

বিনায়ক। ও ইয়েস,—দ্যাট্ ডার্টি স্কুল টিচার? আর ইউ ফ্রেণ্ডলি উইথ হিম?

শর্বরী। হ্যাঁ,—কিন্তু অতীনদা স্কুল-টিচার হলেও ডার্টি নয় মিষ্টার বাসু,—উনি একজন ফার্স্ট ক্লাস এম-এ।

বিনায়ক। হোয়াই আর ইউ সো কীন এ্যাবাউট হিম শর্বরী? সে তোমার কে হয়?

শর্বরী। কেউ না,—মানে,—অতীনদা আমার দাদার বন্ধু—

বিনায়ক। শুধুই দাদার বন্ধু? তোমারও বন্ধু নয়?

শর্বরী। (দৃঢ় স্বরে) হ্যাঁ—আমারও বন্ধু—

বিনায়ক। (হঠাৎ চীৎকার করে) না না,—শুধু বন্ধুই নও তোমরা, তোমার মুখ, তোমার চোখ বলে দিচ্ছে যে বন্ধুত্বের গণ্ডীর বাইরে পা দিয়েছ তুমি—ইউ লভ্ হিম, —ইজ্'ন্ট্ ইট্ ট্রু? স্পীক, স্পীক,—স্পীক আউট আই সে—

[শর্বরী নীরব

[বিনায়ক চেয়ার ছেড়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে পাইচারী করতে লাগল।]

ডোণ্ট্ সিট্ ষ্টিল লাইক এ স্ট্যাচু,—জবাব দাও,—জবাব দাও শর্বরী—

শর্বরী। হ্যাঁ, অতীনদাকে আমি ভালোবাসি—

বিনায়ক। অথচ আমি তোমাকে—সেই ইণ্টারভিউর দিন থেকে—ওঃ, হোয়াট এ শেম্, হোয়াট এ শেম্ শর্বরী—ইউ আর এ গার্ল ইন এ মিলিয়ন, সেই তুমি কিনা—

(হঠাৎ শর্বরীর সামনে এসে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে) ওয়েল, আই অ্যাম সরি, রিয়েলি সরি,—হঠাৎ বড়ো এক-সাইটেড্ হয়ে গিয়েছিলাম,—এক্সকিউজ মি,—প্লিজ এক্সকিউজ মি শর্বরী—

আবদুল। (বাইরে থেকে) সাব্—

বিনায়ক। কৌন হ্যায়? ক্যা মাংগতা আবদুল?

[আবদুলের প্রবেশ]

আবদুল। বড়া সাবকা চাপরাশি এক চিট্‌ঠি লে আয়া হ্যায় সাব্—বহোত জরুরী—

বিনায়ক। কাঁহা হ্যায় উও চিট্‌ঠি?—দো, জলদি দো—

আবদুল। লিজিয়ে সাব্ [চিঠি দিল

বিনায়ক। (চিঠি পড়ে) আমাকে এখুনি বড়ো সাহেবের বাংলোতে যেতে হবে,—জরুরী মিটিং আছে,—আবদুল—

আবদুল। জী সাব—

বিনায়ক। শোফার কো গাড়ি নিকালনে বোলো—

আবদুল। বহোত আচ্ছা সাব্— [প্রস্থান

বিনায়ক। ইট্ ইজ এ গুড্ অপারচুনিটি—তোমার জন্য এডুকেশন অফিসারের চাকরীটার কথাও আজই পাকা করে আসব—ওমাস থেকেই জয়েন করতে পারবে,—ওয়েল, বাই বাই—

[শর্বরীর হাতে একটু চাপ দিয়ে প্রস্থান

পরদা নেমে এলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অতীনের বাড়ির শোবার ঘর

দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে, একটা তক্তাপোষে বিছানা গুটানো। তার নীচে দুটি সুট কেশ। এক কোণে একটি টেবিল, খান দুই চেয়ার, টেবিলের ওপর পাঁচ সাতখানা বই, এক গাদা আ-সার পেপার, দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডার।

সময় : সন্ধ্যার পর

অতীন চেয়ারে বসে বিদ্যুৎ আলোতে পরীক্ষার খাতা দেখছে। ঘরে আর কেউ নেই।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ

অতীন। কে?

শর্বরী। আমি—

অতীন। (পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে) নম্বর জানতে এসেছ বুঝি? ও সব হবে না এখন, আমি ব্যস্ত আছি—

শর্বরী। নম্বর? কী বলছ অতীনদা? আমি শর্বরী—

অতীন। কী বললে? শর্বরী? (তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে) হ্যাঁ, তাই তো,—এসো এসো,—ভেতরে এসো—

শর্বরী ঘরে ঢুকলো, পরনে সুন্দর তাঁতের শাড়ি, গায়ে উলের কোট, মুখে হাল্কা প্রসাধন, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

শর্বরী। উঃ, বাইরে কী শীত, হাত পা সব যেন জমে গেছে—

অতীন। আমার বাড়িতে তো ফায়ার প্লেস নেই শর্বরী—

শর্বরী। (এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে) কী বললে?

অতীন। না শুনতে পাবার মতো নীচু গলায় তো আমি বলিনি শর্বরী, বলেছি যে মিষ্টার বাসুর বাংলোয় যেমন ফায়ার প্লেস আছে আমার এখানে তেমনটি নেই—

শর্বরী। হৃদয়ের উত্তাপ আছে তো? তা হলেই হবে—

অতীন। গরীব স্কুল মাষ্টারের কি হৃদয় থাকে, না সে হৃদয়ে উত্তাপ থাকে?

শর্বরী। তার মানে? এ সব বাঁকা বাঁকা কথার মানে?

অতীন। তার মানে এই চিঠি—(পকেট থেকে একটি খাম বার করল)

শর্বরী। চিঠি? কার চিঠি? কিসের চিঠি?

অতীন। তোমার মিষ্টার বাসুর চিঠি—

শর্বরী। মিষ্টার বাসু? আমাদের স্কুল সেক্রেটারী?

অতীন। হ্যাঁ, মিষ্টার বিনায়ক বাসু,—তিনি নাকি গোপন সূত্রে জানতে পেরেছেন যে আমি কোনো এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশেষ রাজনৈতিক মত বাদ প্রচার করে এখানকার আবহাওয়া পঙ্কিল করে তুলেছি।

শর্বরী। সে কি! তুমি তো পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেই এসেছ অতীনদা। আর সে জন্যই তো মতবাদ নিয়ে তোমার আমার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিরোধ ছিল তা আজ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার আমরা কাছাকাছি আসতে পারছি—

অতীন। কাছাকাছি আসছি, না দূরে সরে যাচ্ছি শর্বরী?—

শর্বরী। কি বলছ তুমি অতীনদা?—দূরে সরে যাবো কেন?

অতীন। আমি যা বলছি তা না বোঝবার ভান কোরোনা শর্বরী,—তুমি ছাড়া আমার অতীত ইতিহাস কে জানে এখানে? মিষ্টার বাসুর গোপন সূত্র সত্যি সত্যিই কিছু গোপন নয় আমার কাছে—

শর্বরী। অতীনদা, অতীনদা—এ কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে? রাজনৈতিক মতবিরোধ তোমার সঙ্গে আমার আজকের নয়, আমি ইচ্ছে করলে বহুদিন আগেই তোমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু দিই নি, কারণ মতবাদ থেকে আমার প্রেম অনেক বড়ো, অনেক মহৎ, অনেক উদার—

অতীন। হয়তো একদিন তাই সত্য ছিল, কিন্তু একদিনের সত্য চিরদিনের সত্য হয় না শর্বরী—

শর্বরী। কেন হয় না?

অতীন। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ তার হীন নোংরা আঙুল দিয়ে শুভ্র সুন্দর সত্যকে কলঙ্কিত করে, তার আসন থেকে ঠেলে নামিয়ে দেয়—

শর্বরী। ব্যক্তিগত স্বার্থ? কার ব্যক্তিগত স্বার্থ?

অতীন। তোমার। তোমার। কোম্পানীর এডুকেশন অফিসার হবার স্বার্থ তোমাকে প্ররোচিত করেছে আমাকে মিষ্টার বাসুর কাছে ধরিয়ে দেবার জন্য, তোমার মোটা-মাইনের চাকরী আমার সামান্য মাইনের চাকরীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে,—সুধু তাই নয়, আমার অজ্ঞাত-বাসের সব আয়োজন ব্যর্থ করেছ—

শর্বরী। অজ্ঞাতবাস? ও, হ্যাঁ, একদিন একথাটা আমাকে বলেছিলে বটে, কিন্তু আমি তো—

অতীন। তুমি ভালো করেই জানো যে আমার পার্টি থেকে সরে আসাটা পার্টির নেতারা সুনজরে দেখে নি। তারা এখন জেলে, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে জেল থেকে বেরিয়েই তারা আমাকে খুঁজতে বার হবে,—আমাকে শাস্তি দিতে চাইবে,—হয়তো—হয়তো তারা আমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে,—এটা—এটা আমার জীবন মরণের প্রশ্ন শর্বরী, আর তুমি—তুমিই কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলে? অফিসার হবার লোভে আমার জীবনটা একেবারে তছ-নছ করে দিলে!

শর্বরী। অতীনদা। এসব কী বলছ তুমি? আমি করব তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? তুমি পারলে,—পারলে আমাকে এত নীচ, এত কুটিল, এত স্বার্থান্ধ বলে ভাবতে?

অতীন। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কে তবে মিষ্টার বাসুর চর হয়ে কাজ করতে পারে শর্বরী, তুমি ছাড়া আর কে জানে আমার গুপ্ত পরিচয়—

শর্বরী। তা আমি জানি না অতীনদা, তবে এ কথাটাই শুধু বলতে পারি যে সে আমি নই। অতীনদা, আমাকে কি করে এত ছোট ভাবতে পারলে তুমি? আমাদের কলকাতার মেলামেশার দিনগুলির কথা কি একবারও মনে পড়ে না? [illegible] অজীবনের কথা? [illegible] এত কাছাকাছি থেকে এ ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানা মেয়েকে কী করে তুমি ভুল বুঝলে বলোতো—

অতীন। ভুল? সত্যিই কি আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি শর্বরী? না কি এ তোমার এক নতুন কোনো ছলনা?

শর্বরী। ছলনা? তোমার সঙ্গে ছলনা করতে কেন যাবো অতীনদা? তাতে আমার কী লাভ হবে বলো? তুমি যখন পার্টির এ্যাকটিভ মেম্বার ছিলে তখন দাদার সঙ্গে তোমার গোপন আলোচনার কতো কথাই তো আমার কানে আসতো, তোমাদের অনেক গুপ্ত প্ল্যানই তো আমার জানা ছিল, আমি তোমাদের পার্টির কেউ নই, ইচ্ছে করলে কি আমি তোমাকে এক্সপোজ করতে পারতাম না?

অতীন। তা পারতে শর্বরী, তুমি আমাদের গুপ্ত-মন্ত্রণার সময়ে প্রায়ই উপস্থিত থাকতে, আমি ভাবতাম যে দাদার মতো তার বোনও হয়তো পার্টিগত প্রাণ—

শর্বরী। তারপর চীনা বাহিনীর আক্রমণের পর এ্যারেষ্ট এড়াতে তুমি যখন গা ঢাকা দিলে দলের নির্দেশে, তখনও তো তোমার সেই গোপন আস্তানা অজানা ছিল না আমার—

অতীন। না, তা ছিল না,—অনেক শ্রান্ত সন্ধ্যার নির্জন মন যখন সঙ্গ খুঁজতো, তখন তোমার, তোমার সান্নিধ্য যেন স্বর্গ সুষমা বয়ে আনতো,—সে আনন্দের রেশ এখনো আমার মনে লেগে আছে—

শর্বরী। তবে? সেই শর্বরীর কাছে কি আজ স্বল্প পরিচিত মিষ্টার বাসুই তার চিরচেনা অতীনদা'র চেয়ে বড়ো হতে পারে?

অতীন। তবে কে—কে সেই বিশ্বাসঘাতক? কে আমার প্রতি এমন শত্রুতা করল?

(পাশের ঘর থেকে সুধাময়ীর প্রবেশ)

(বিধবা প্রৌঢ়া, এককালে সুন্দরী ছিলেন, এখনো সেই রূপের কিছু চিহ্ন তাঁর সর্ব অঙ্গে সুপরিস্ফুট। মুখে প্রশান্ত গাম্ভীর্য)

সুধাময়ী। কার সঙ্গে [illegible] ঝগড়া [illegible] [illegible]

শর্বরী। (সুধাময়ীর পা ছুঁয়ে [illegible]) [illegible] পরে চেনা বেশ শক্ত, তাই না মাসীমা?

সুধাময়ী। (শর্বরীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাতে চুমু খেয়ে) মনে রাখবার মতো মেয়েকে কি কোনো-দিন ভোলা যায় মা? ক দিন তুমি অতীনের সঙ্গে আমাদের

বাড়ীতে এসেছ—ঠিক তেমনটিই আছ, মুখখানা আরও একটু ভরে উঠেছে এই যা—

অতীন। মন ভরা থাকলে মুখ ভরে উঠতে দেরী হয় না মা—

শর্বরী। (অতীনের কথায় কান না দিয়ে) আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছেন মাসীমা—

সুধাময়ী। রোগা হতে হ'ত কবে যে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাবো সেই দিনটির জন্য শুধু অপেক্ষা করে আছি মা—

শর্বরী। অমন কথা বলবেন না মাসীমা—

সুধাময়ী। বলি কি আর সাধে শর্বরী? বলি অনেক দুঃখে। একমাত্র ছেলে সংসারী হল না, এতকাল তো নানা পার্টি না—কিসব করে বেড়াল, এখানে এসে চাকরীতে ঢুকল, মনে শান্তি পেলাম। ওমা, কোথায় কি! এখন শুনছি সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—

অতীন। মিষ্টার বাসুর এই অন্যায় অপবাদ আমি মুখ বুঁজে সহ্য করব না মা—তা তিনি যতো বড়ো অফিসারই হোন না কেন—

সুধাময়ী। ঐ দেখ, ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই ও লড়াইয়ে ঘোড়ার মতো কেমন ক্ষেপে উঠেছে—

শর্বরী। ও চিঠিটা আমাকে দাও অতীনদা, আমি মিষ্টার বাসুকে বুঝিয়ে বলব এখন—

অতীন। তোমার করুণার জন্য ধন্যবাদ শর্বরী, কিন্তু তার দরকার হবে না,—মিষ্টার বাসুর ওপর তোমার কতখানি প্রভাব তার প্রমাণের প্রয়োজন হবে না—

সুধাময়ী। আঃ অতীন! থাম তো তুই, মেয়েটা কতদিন পরে এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তুই ওর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলি—

শর্বরী। দেখুন না মাসীমা—

সুধাময়ী অনেকক্ষণ চা না পেয়ে ওর মাথা গরম হয়ে গেছে, তোমরা একটু বোসো, আমি চট্ করে চা, করে' নিয়ে আসি— [প্রস্থান

অতীন। মিষ্টার বাসুর বাংলোয় রোজ দামী চা-খাওয়া জিভে কি আর আমাদের বাড়ির সস্তা জোলো চা রুচবে?

শর্বরী। আচ্ছা অতীন দা, তুমি সেই তখন থেকে কী সুরু করেছ বলত? তুমি কি চাও যে এক্ষুণি আমি চলে যাই? আর কখনো না আমি?

অতীন। (তিক্ত কণ্ঠে) যে দিন তোমার আসবার কথা ছিল সেদিন এলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হোতো না শর্বরী, সেদিন তোমার জন্য মা চষির পায়েস রান্না করে রেখেছিলেন, আমার প্রতীক্ষার প্রহরগুলি বন্ধ্যা হয়ে রইল,—তুমি এলে না—

শর্বরী। আমি কি করব? সেদিন প্রথম গান শেখাতে গেছি মিষ্টার বাসুর মেয়েকে, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল, তাই আর আসতে পারলাম না—

অতীন। ওটাই একমাত্র কারণ নয় শর্বরী, আসল কারণ লুকিয়ে আছে তোমার মনের গভীরে,—

শর্বরী। আমার মনের গভীরে!

অতীন। হ্যাঁ,—নতুন পরিচয়ের মোহে পুরোণো পরিচয়টা ঝালিয়ে নেবার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে—

শর্বরী। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) তার মানে?

অতীন। তার মানে মিষ্টার বিনায়ক বাসু নিষ্কাশনপুর কারখানার বিরাট অফিসার, বিরাট তাঁর মাইনে, বিরাট তাঁর বাংলো, বিপুল তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি, আর আমি একজন নগণ্য স্কুল মাষ্টার;—চাঁদের আলোর পাশে টিমটিমে মাটির প্রদীপ—

শর্বরী। মিষ্টার বাসু যাই হোন না কেন, তাতে আমার কি?

অতীন। তোমার অনেক কিছু—তাঁর গাড়িতে চড়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো, তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খাওয়া তাঁর কৃপায় এক লাফে স্কুল মাষ্টারণী থেকে এডুকেশন অফিসার হয়ে যাওয়া—

শর্বরী। (তীব্র সুরে) অতীনদা, তোমার এখানে এলে অপমানিত হতে হবে জানলে আমি কক্ষণো আসতাম না—

অতীন। কিন্তু যেখানে রোজ যাও সেখানে তোমার জন্যে এর চেয়েও অনেক বেশী অপমান অপেক্ষা করে আছে, এ কথাটা মনে রেখো শর্বরী—

শর্বরী। কী বলছ যা তা—

অতীন। যা তা নয়—যা তা নয় শর্বরী, আমি জানি মেয়েদের ব্যাপারে মিষ্টার বাসুর অনেক দুর্নাম—

শর্বরী। ওঁর দুর্নাম ওঁকেই ঘিরে থাকবে অতীনদা, আমাকে তা স্পর্শও করতে পারবে না—

অতীন। তাও কি কখনো হয় শর্বরী? প্রলোভন যখন উপকারের ছদ্মবেশে আসে তখন তাকে চেনা যায়না—

শর্বরী। যায় অতীনদা, যায়, চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকলে বেশ চেনা যায়,—আচ্ছা তুমি আমাকে এত দুর্বল বলে ভাবো কেন বলতো?

অতীন। বাঘের গুহায় বনহরিণী চিরকালই দুর্বল শর্বরী,—

শর্বরী। মিছে কথা, মিষ্টার বাসুকে তুমি যা ভাবছো তিনি তা নন, তিনি একজন সত্যকারের ভদ্রলোক—

অতীন। ঐ ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে তাঁর আসল মুখ লুকিয়ে আছে, তা দেখলে তুমি শিউরে উঠবে শর্বরী—

শর্বরী। এটা তোমার হীনমন্যতা অতীনদা। তুমি ওঁর মতো বড়ো হতে পারোনি সে তোমার অক্ষমতা, সেই অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে অনর্থক তাঁর কুৎসা গাইতে শুরু করেছ—

অতীন। ও বাব্বাঃ, এ ক'দিনেই এত! তাহলে পঞ্চাননবাবু যা বলেন তা মিথ্যে নয়!

শর্বরী। এ ত কিছুই নয়,—অকারণে একজনের কুৎসা গাওয়া আমি পছন্দ করি না, আমার রুচিতে বাধে—

অতীন। (ব্যঙ্গের সঙ্গে) কিন্তু হঠাৎ এক লাফে এডুকেশন অফিসার হয়ে যাওয়াটা তোমার রুচিতে বাধে না?

শর্বরী। এডুকেশন অফিসার? এডুকেশন অফিসার? শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার, তুমি কি চাও যে এ চাকরীটা ছেড়ে দি আমি?

অতীন। (শান্ত স্বরে) হ্যাঁ আমি তাই চাই শর্বরী—

শর্বরী। (উত্তেজিত ভাবে) কেন? কিসের জন্য?

অতীন। কারণ তা তোমার প্রাপ্য নয়—

শর্বরী। প্রাপ্য নয়?

অতীন। না, প্রাপ্য নয়। তোমার চেয়ে ঢের বেশী কোয়ালিফায়েড্ শিক্ষিকা তোমাদের স্কুলে আছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে হঠাৎ তোমাকে এ পোষ্ট দেবার একটাই অর্থ হয় শর্বরী—

শর্বরী। অতীনদা, তুমি নীচ, হীন তোমার মনোবৃত্তি, মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে শুধু একটি মাত্র সম্বন্ধই তোমার চোখে পড়ে। যেখানে বিশ্বাস নেই ভালোবাসা সেখানে টিঁকতে পারে না,—তোমার সঙ্গে কথা বলাও পাপ—আমি চললাম, আর আসব না, কক্ষণো না—কক্ষণো না—

[দ্রুত প্রস্থান

[চা ও জলখাবারের প্লেট হাতে সুধাময়ী ভেতরের ঘর থেকে ঢুকলেন]

সুধাময়ী। একি! শর্বরী চা না খেয়েই চলে গেল?

[অতীন পাথরের মূর্তির মতো শর্বরীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিল, সুধাময়ীর কথায় মুখ ফেরালো।]

অতীন। হ্যাঁ মা—

সুধাময়ী। ঘরে চিনি ছিল না, তাই যোগাড় করতে একটু দেরী হয়ে গেল, এতেই কি রাগ করে চলে গেল শর্বরী?

অতীন। হ্যাঁ মা, ও ভুল বুঝে রাগ করে চলে গেছে, নিষ্কাশনপুরের চাকচিক্যময় বহিরাবরণ ওর চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যেদিন ওর ভুল ভাঙ্গবে সেদিন নিজে থেকেই আবার ফিরে আসবে,—নিশ্চয়ই ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে—

(ধীরে ধীরে পরদা নেমে এলো)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্কুল। হেডমাষ্টার মশায়ের আপিস ঘর। ঘরের সামনে ওপরের চৌকাঠে HEAD MASTER লেখা। বাইরে এক ফালি বারান্দা। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি টেবিল, টেবিলে বহু ফাইল ও কাগজপত্র। তিন দিকে খান তিনেক চেয়ার। ঘরের এক কোণে একটা আলমারি তার মাথায় একটা ধূলিধূসর গ্লোব্। দেওয়াল ঘেঁষে একটা বই-এ ঠাসা বুককেস। দেওয়ালে একটা দেওয়াল ঘড়ি, তার নীচে এশিয়ার একটা বড়ো ম্যাপ।

সময়: বেলা বারোটা

নিজের চেয়ারে হেড্মাষ্টার মশাই বসে আছেন। কী একটা কাগজ পড়তে পড়তে টেবিলে রাখা কলিং বেল বাজালেন।

স্কুল-বেয়ারা হারাধনের প্রবেশ]

হেডমাষ্টার। অতীনবাবু কোথায় হারাধন?

হারাধন। আগের পিরিয়ডে ক্লাস টেন 'এ'তে ক্লাশ নিচ্ছিলেন আইজ্ঞা—

হেডমাষ্টার। এখন তিনি কোথায়?

হারাধন। তা তো স্মরণ হচ্ছেন নাই আইজ্ঞা,—

হেডমাষ্টার। দেখে এসো শিগগির—

হারাধন। কেনে আইজ্ঞা—তেনাকে কেনে? তিনি তো চলে যাবেন শুইনলাম—

হেডমাষ্টার। আঃ, বিরক্ত কোরোনা হারাধন, দেখে এসো অতীনবাবু কোথায়—

হারাধন। তবে তাই যাচ্ছি আইজ্ঞা—

[হারাধনের প্রস্থান

[পঞ্চাননের প্রবেশ

বগলে পরীক্ষার খাতার বাণ্ডিল। হাতে খড়িমাটি আর ডাষ্টার]

হেডমাষ্টার। (মুখ তুলে তাকিয়ে) কী ব্যাপার পঞ্চাননবাবু?

পঞ্চানন। ব্যাপার কিছুই না। এই টেষ্ট পরীক্ষার খাতাগুলি জমা দিতে আইলাম, এই নেন—

[খাতার বাণ্ডিলটা হেডমাষ্টার মশাইর হাতে দিল]

হেডমাষ্টার। কোন্ সাবজেক্ট?

পঞ্চানন। সংস্কৃত—

হেডমাষ্টার। কেমন করেছে ছেলেরা?

পঞ্চানন। আর কন্ ক্যান্, দেবভাষার উপর কি আর শ্রদ্ধা ভক্তি আছে কেউর? সব দায়-সারা কাজ সারে তবে একটি ছেলে আছে, চেষ্টা করলে লেটার পাইতে পারে—

হেডমাষ্টার। বটে! কোন্ ছেলেটি?

পঞ্চানন। অশোক মুখার্জি—

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ, ছেলেটি ভালো, স্কলারশিপ পেতে পারে,—

পঞ্চানন। আমারও তাই অনুমান, অর বাবা খুব খাটে অর পিছনে। আসল কথা কি জানেন? অভিভাবকরা একটু নজর রাখলেই ছেলেরা আর ফাঁকি দিতে পারে না, কিন্তু নিষ্কাশনপুরের পনর আনা অভিভাবকই খালি কারখানা নিয়া দিবারাত্র ব্যস্ত,—ছেলেগুলা যে কি করতাছে না করতাছে সেদিকে হুশই নাই—

হেডমাষ্টার। ঠিক বলেছেন পঞ্চাননবাবু—

পঞ্চানন। ঘরের কোণে এতবড় ইস্পাতের কারখানা, হক্কলে ভাবে যে পোলা বড় হউক, সায়েবরে ধইরা কারখানায় ঢুকাইয়া দিলেই অইব, জীবনে শিক্ষার যে কী দাম তা অগ মাথায় ঢোকে না, পয়সা রোজগারটাই পরমার্থ বুইঝ্যা জ্ঞান করে—

হেডমাষ্টার। আপনার বিষয়ে ফেল করেছে ক'জন?

পঞ্চানন। ফেল আমি বড় একটা করাইনা, ছাইড়া দেই,—যাউক, অরা ভাগ্যপরীক্ষা করুক গিয়া ফাইন্যালে, পচা শামুকে আর পা কাটে ক্যান্—

হেডমাষ্টার। কিন্তু গতবার সেণ্ট্-আপ্ ষ্টুডেণ্ট্দের মধ্যে বত্রিশ জনই সংস্কৃতে ফেল করেছিল পঞ্চাননবাবু।

পঞ্চানন। হ হ, করছিল ঠিকই। ব্যাপার হইল এই যে বিজ্ঞান-প্রগতির এই যুগে সংস্কৃত আর পড়তে চায় না কেউ,—সে যাউক, টেষ্ট পরীক্ষার ফল বাইর করতাছেন কবে? ছাত্ররা তো আমারে খাইয়া ফ্যালাইতাছে—

হেডমাষ্টার। সাতাশে ডিসেম্বর,—কিন্তু মাষ্টারমশাইদের মধ্যে সবাই এখনো খাতা জমা দেন নি, তাই দেরী হচ্ছে। আজই একটা নোটিশ বার করে দিচ্ছ—

পঞ্চানন। তাই দ্যান, তাই দ্যান, চিন্তায় চিন্তায় ছেলেগুলি শুকাইয়া গেল, অগ' আর ঝুলাইয়া রাইখেন না—

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। অতীনবাবু লাইব্রেরী ঘরে বসে আছেন আইজ্ঞা—

হেডমাষ্টার। বেশ। (একটা কাগজে কি লিখে) এই স্লিপটা তাঁর হাতে দিয়ে এসো—

হারাধন। (স্লিপ নিয়ে) যাচ্ছি আইজ্ঞা—

পঞ্চানন। অতীনবাবুরে আবার ক্যান্? বড় মনমরা হইয়া গেছে ভদ্রলোক। মুখে হাসি নাই,—সর্বদা কী যেন চিন্তা করতাছে—

হেডমাষ্টার। আমিও তা লক্ষ্য করেছি পঞ্চাননবাবু। অতীনবাবু পড়ান ভালো, ব্যবহারও ভালো, বেশ সোবার টাইপ্—কিন্তু সেক্রেটারী মিষ্টার বাসুর বিষ নজরে পড়ে আমাকে ফেলেছেন বিপদে—

পঞ্চানন। আপনের আবার বিপদটা কি? এক মাষ্টার

যাইবো আর এক মাষ্টার আইবো। কিন্তু বিষনজরে পড়নের কারণটা কি? শুনছিলাম যে গার্লস্ স্কুলের কোন এক মাষ্টারনী ওনার বাড়ীতে যায় আসে,—তাই লইয়াই বোধ হয়—

হেডমাষ্টার। না না, সে সব নয়। অতীনবাবু নাকি ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করছেন, সেজন্য তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন মিষ্টার বাসু,—জবাবে অতীনবাবু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, আর আমিও তার সমর্থন করে মন্তব্য লিখেছি—

পঞ্চানন। ভাল করেন নাই হেডমাষ্টারমশায়,—কার মইধ্যে কি আছে তা কে জানে? মানুষটা সুবিধার না,—(নীচু গলায়)—আমাগো পিছনে বড় লাগছে উনি—

হেডমাষ্টার। কি করে বুঝলেন?

পঞ্চানন। এই যে আমরা অনেকগুলি ছাত্র লইয়া নিজেগো বাড়িতে প্রাইভেট ক্লাস লই তা ওনার চক্ষুশূল, শুনছিলাম যে উনি এ বিষয়ে শিক্ষাবোর্ডের কাছে কমপ্লেন করতে চায়,—ঝপ্ কইরা আয় পইড়া গেলে এই দুর্দিনে আমরা সংসার চালামু কেমনে কন দেখি। সেক্রেটারী সাহেব উচিত কাজই করছেন, অস্বীকার করলে হইবো কি, আমরা প্রমাণ কইরা দিমু যে উনি ছাত্রগো নাচাইতাছেন, টেষ্টের সময়ে পরীক্ষা ভণ্ডুলে ওনারই হাত আছিল—হুঃ, আমাগো লগে লাগাতে আসে,—মজাটা ট্যার পাওয়াইয়া দিমু না!

হেডমাষ্টার। না না,—আপনারা অতীনবাবুর ওপর অবিচার করছেন পঞ্চাননবাবু,—এমন একজন অনেষ্ট শিক্ষককে হারাতে চাই না আমি—

পঞ্চানন। সেক্রেটারী সাহেব যখন পিছনে লাগছে তখন শত চেষ্টাতেও তারে বাচাইতে পারবেন না এই আমি কইয়া দিলাম, মধ্যিখানে আপনে অপদস্থ হবেন—

হেডমাষ্টার। ঐ তো আমার দুঃখ পঞ্চাননবাবু। এটা কোম্পানীর স্কুল, এখানে সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার পাওয়া অসম্ভব। সেক্রেটারীর খামখেয়ালীই এখানে আইন। তা না হলে এতবড়ো স্কুল,—আটত্রিশজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক,—এর সেক্রেটারী কি না একজন নন-ম্যাটিক,—কেন? না উনি একজন বড়ো অফিসার, কোম্পানীর পয়সায় বিলেত ঘুরে এসেছেন—

পঞ্চানন। আই-সি-এসএর মতো এই কোম্পানীর অফিসাররাও সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্যাবিশারদ, হেন কাম নাই যা ওনারা করতে পারেন না—

(অতীনের প্রবেশ। হাতে খানদুই বই, পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবি, তার ওপর একটি চাদর)

অতীন। আমাকে ডাকছিলেন হেডমাষ্টারমশায়?

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ, বসুন অতীনবাবু—

(অতীন বসল)

পঞ্চানন। আইচ্ছা, আমি তা হইলে যাই এখন, পরের পিরিয়ডে ক্লাশ আছে—

হেডমাষ্টার। আচ্ছা—

(পঞ্চাননের প্রস্থান)

হেডমাষ্টার। অতীনবাবু—

অতীন। বলুন—

হেডমাষ্টার। আপনার কৈফিয়ৎটার কথা বলছিলাম—

অতীন। সে কি? সেটা এখনো পাঠান নি মিষ্টার বাসুর কাছে? আমি তো ভেবেছিলাম যে—

হেডমাষ্টার। কি ভেবেছিলেন অতীনবাবু?

অতীন। ভেবেছিলাম যে আমার বরখাস্তের নোটিশ এসে গেছে, তাই আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন—

হেডমাষ্টার। চিঠিটা যথাসময়ে পাঠালে, আপনার অনুমান অভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হ'ত অতীনবাবু,—আর আমি তা জানি বলেই সেটা এখনো পাঠাইনি—

(ড্রয়ার খুলে একটা ফুলস্কেপ টাইপ করা কাগজ বার করলেন) এই দেখুন—

অতীন। অবশ্যম্ভাবীকে বিলম্বিত করে লাভ কি হেডমাষ্টার মশাই?

হেডমাষ্টার। আপনার লাভ আছে কিনা জানি না তবে আমার বিলক্ষণ লাভ আছে অতীনবাবু—

অতীন। আপনার লাভ?

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ, আমার লাভ, আমার লোভ,—হেডমাষ্টারী করে চুল পাকিয়েছি অতীনবাবু,—একজন সৎ ও বিবেকবান শিক্ষক হারাবার ক্ষতি ইস্কুলের ভিত্তিমূলটাকে যে কতটা নড়িয়ে দেয় তা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ হয় তো জানে না—আমি—আমি আপনাকে ধরে রাখতে চাই অতীনবাবু—

অতীন। পারবেন না হেডমাষ্টার মশাই,—পারবেন না, —মিষ্টার বাসু আপনার কোনো অনুরোধই রাখবেন না—

হেডমাষ্টার। হয়তো রাখবেন যদি আপনি আমার একটি অনুরোধ রাখেন—

অতীন। অনুরোধ কেন আদেশ করুন হেড্‌মাষ্টার মশাই, আপনি আমার পিতৃতুল্য, যদি সম্ভব হয় আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব—

হেডমাষ্টার। (ফুলস্কেপ কাগজের এক অংশ দেখিয়ে) আপনি আপনার কৈফিয়ৎ থেকে শুধু এই অংশটি বাদ দিয়ে দিন—

অতীন। কোন্ অংশটি ?

হেডমাষ্টার। এই যে যেখানে স্বীকার করেছেন যে 'বর্তমানে পার্টির সদস্য না থাকলেও অতীতে এক সময়ে পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলাম'—এ কথা ক'টি কেটে দিতে হবে—

অতীন। কেটে দিতে হবে ?

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ,—সেদিন আপনি বেশ উত্তেজিত ছিলেন বলে এ কথাটা বলিনি আপনাকে, আজ আপনাকে অনুরোধ করছি,—এই মারাত্মক কথা ক'টি কেটে বাদ দিন—

অতীন। তা হয়না হেডমাষ্টার মশাই,—সত্যকে কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দিতে আমি পারি না, মিথ্যাচরণের জন্য শিক্ষকতার পবিত্র আদর্শ থেকে আমাকে তা হলে বিচ্যুত হতে হবে,—

হেডমাষ্টার। কোনো উপায়ই কি নেই অতীনবাবু ?

অতীন। মিথ্যার ওপর আমার জীবনের বুনিয়াদ গড়তে আমি চাই না হেডমাষ্টার মশাই —

হেডমাষ্টার। আপনার যুক্তিকে আমি অস্বীকার করতে পারছি না অতীনবাবু, অন্য কোন মাষ্টারমশাইর ক্ষেত্রে এত কথা আমি বলতাম না, এই স্কুলে মাষ্টারমশায়-দের মধ্যেই চারটে দল আছে, ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধন করতে গিয়ে তাঁরা সব সময়েই পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়ছেন, আপনি ছিলেন এ সবের বাইরে,—এ সবের ঊর্দ্ধে -

অতীন। এসব দলাদলির ব্যাপার আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি হেডমাষ্টার মশাই—

হেডমাষ্টার। আমি তা জানি অতীনবাবু, তাই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি,—আপনার বিরুদ্ধে কয়েকজন মাষ্টার-মশাই অনেক অভিযোগ করেছেন আমার কাছে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এদের মধ্যে কেউ কেউ সেক্রেটারী সাহেবের চর হিসেবে কাজ করেন, তাঁদেরই কেউ হয়তো আপনার সম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন—

অতীন। সে কি! এ ও কি সম্ভব ? এরা না আমার সহযোগী, সহকর্মী !

হেডমাষ্টার। সবই সম্ভব অতীনবাবু, সরস্বতীর কমল-বনের পবিত্র সলিল আজ শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু পাঁক, সেই পাঁক বিদ্যায়তনের পবিত্র শুভ্রতার গায়ে কলঙ্ক লেপে দিচ্ছে—

অতীন। এর কি কোনো প্রতিকার নেই হেডমাষ্টার মশাই ?

হেডমাষ্টার। যাঁদের হাতে আছে তাঁরা যে নির্বাক দর্শক হয়ে আছেন অতীনবাবু। ভালো শিক্ষকের অভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই অবনতির পথে গড়িয়ে চলেছে। শিক্ষকদের মাইনে কম আর সমাজে প্রতিষ্ঠা নেই বলে মেধাবী, সৎ আর আদর্শানুরাগী ছেলেরা এদিকে সহজে আসতে চায় না, এক আধজন এলেও কায়েমী স্বার্থের নাগপাশে বাঁধা পড়ে। তাই আপনাকে ধরে রাখবার জন্য এত চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আপনি যে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে চান না তা দেখে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। হয়তো ছোট্ট নিষ্কাশনপুর আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু বিশাল বিশ্ব আপনাকে আপনার করে নিতে যে দেরী করবে না এ বিশ্বাস আমার আছে—

অতীন। (বিচলিত ভাবে) আপনার স্নেহ ও প্রীতির কথা আমি কখনও ভুলব না হেড্-মাষ্টার মশাই আরও সাত আট দিন আপনার সাহচর্য পাবো এতেই আমার আনন্দ।

[নত হয়ে প্রণাম করতে গেল, হেডমাষ্টার মশাই
অতীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন
পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল : ঢং ঢং ঢং ঢং।]
(পরদা নেমে এলো)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অতীনের শোবার ঘর

সময় : সন্ধ্যার পর

ঘর খালি। একটা অল্প পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছে, তার আবছা আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে যাবার ভেজানো দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, গণেশের মাথা সতর্কভাবে ভেতরে উঁকি দিল, তারপর ঘরে কেউ নেই দেখে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল। তার হাতে পরীক্ষার খাতার সাইজের তিন খানা খাতা।

গণেশ। (চাপা সুরে) যাক বাবা, বাঁচা গেল, অতীন স্যার ঘরে বসে নেই। স্যারের মা গেছেন কীর্তন শুনতে। খাসা সুযোগ—(একটা ইঁদুর শব্দ করে ছুটে পালালো, শব্দ শুনে গণেশ লাফিয়ে উঠল, তারপর একটু হেসে) নাঃ, ও কিছু নয়.—একটা ইঁদুর। বাপ্‌স্, কী ভয়ই না পেয়েছিলাম—বুকটা ধড়াশ ধড়াশ করছে।

গণেশ। (চারদিকে আঁতিপাতি করে কী যেন খুঁজতে লাগলো) তাইতো, আমাদের টেষ্ট পরীক্ষার আনসার পেপারগুলো রেখেছে কোথায়? খাসা বুদ্ধি বাতলেছে মানকেটা,—পঙ্কু স্যারকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া এই নতুন খাতাগুলো রেখে আমার, মানকের আর নন্তর আগের খাতাগুলো নিয়ে সট্‌কান দেব, তা হলে আর আমাদের পাশ করা আটকায় কে? কিন্তু খাতার বাণ্ডিলটাই যে খুঁজে পাচ্ছি না ছাই—

(বাইরে জুতোর আওয়াজ)

ওকি! বাইরে পায়ের শব্দ! কে যেন এদিকেই আসছে,—লুকোতে হবে,—কোথায় লুকোই? ঐ যে,—ঐ আলমারীটার পেছনে লুকোই—

গণেশ আলমারীর পেছনে লুকিয়ে পড়ল

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো অতীন। সুইচ্ টিপে আলো জ্বালল। গায়ের র‍্যাপারটা খুলে আলনায় রাখল। গণেশ তার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

অতীন। (পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে) শর্বরী চিঠি দিয়েছে। সে দিন আমি মিছেই তার ওপর রাগ করেছিলাম। মিষ্টার বাসুর কাছে আমার সম্বন্ধে লাগিয়েছে আমারই সহকর্মী কোনো মাষ্টার মশাই—শর্বরী নয়—সে নির্দোষ! কি লিখেছে দেখি—

(পত্রপাঠ)

অতীনদা,

সেদিন রাগের মাথায় তোমার ওখান থেকে চলে আসার পর থেকে আমার মনে যে কী হচ্ছে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। এখন মনে হচ্ছে যে মিষ্টার বাসু সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। ওঁর চাউনীটা যেন কেমন কেমন,—যেন গিলে খেতে চাইছে। মাঝে মাঝে তাঁর কারএ করে প্লেজার ড্রাইভে নিয়ে যেতে চান, আমি অবশ্য যাই নি। রাজনৈতিক মতবাদ আমাদের মধ্যে একদা দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছিল, তুমি পার্টি ছেড়ে আসায় সে বাধা আজ অবলুপ্ত, কিন্তু একটা মিথ্যা ধারণা আবার তোমার আমার মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এ বাধা আমি দূর করব। আজই মিষ্টার বাসুর বাংলোতে গিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেব যে এডুকেশন অফিসারের চাকরী আমি নেব না, তাঁর মেয়েকেও আর গান শেখাব না। হয়তো এর ফলে ইস্কুলের চাকরীটাও আর থাকবে না, তা না থাক,—তুমি তো এখান থেকে চলেই যাচ্ছ, আমাকেও সঙ্গে নাও, পেয়ে আবার হারানো আমার সইবে না। নিজের হৃদয়ের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে আজ আমি অবসন্ন। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও অতীনদা, তোমার প্রেমে আমাকে সঞ্জীবিত করো।

আজ রাত আটটায় আসছি, আমার জন্য প্রতীক্ষা কোরো।

ইতি

শর্বরী

(চিঠি পড়ে অস্থির ভাবে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অতীন, কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, একবার চেয়ারে বসল, আবার উঠে দাঁড়ালো।)

একটু পরেই শর্বরীর আসার কথা, কিন্তু সে কি আসছে? যা লিখেছে তা কি সে করতে পারবে! মিষ্টার বাসু তাকে যেন যাদু করেছে—শর্বরী! শর্বরী! এসো তুমি, পাওয়ার মধ্যে আমার চিরদিনের চাওয়া

সার্থক করে তোলো,—আঃ, এ প্রতীক্ষা অসহ্য—অসহ্য—
চেয়ারে বসল

(অতীনের পেছন দিকে বাইরের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল, দরজায় চৌকাঠে এসে দাঁড়ালো এক দীর্ঘাকার পুরুষ, পায়ে রবার সোল জুতো, পরনে ট্রাউজার্স, ওভারকোর্ট, মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট,—ভুরু পর্যন্ত নামানো। ডান হাত ওভারকোটের পকেটে। আগন্তুক কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে অতীনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘরে ঢুকে দরাজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল ছিটকিনী এঁটে দিল। সেই শব্দে অতীন চমকে পেছনে তাকালো)

অতীন। কে? শর্বরী এলে?

আগন্তুক। না—তার ভাই এসেছে কমরেড্ অতীন—

অতীন। (চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে) এ কি? এ যে,—এ যে—সুব্রত!

সুব্রত। (এগিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়াল) চিনতে পেরেছ তা হলে কমরেড অতীন—

অতীন। তুমি নিষ্কাশনপুরে কি করে এলে সুব্রত? শুনেছিলাম তুমি জেলে—

সুব্রত। নিষ্কাশনপুরের নির্বাসনে লুকিয়ে থাকলেও পার্টি তোমাকে ঠিকই খুজে বার করেছে কমরেড অতীন। আমি জেলে থাকলেই তোমার খুব সুবিধা হ'ত, তাই না? আমি তোমার নেমেসিস, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে হাজির হয়েছি—

অতীন। কী বলতে চাও তুমি?

সুব্রত। ইউ নো ইট ওয়েল কমরেড—পার্টি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে তোমার কৈফিয়ৎ নিতে—

অতীন। কৈফিয়ৎ? কিসের কৈফিয়ৎ?

সুব্রত। পার্টির নির্দেশ অমান্য করবার কারণের কৈফিয়ৎ—

অতীন। পার্টি আমি ছেড়ে দিয়েছি সুব্রত, আমি লিখিতভাবে সে কথা হেড-অফিসে জানিয়ে দিয়েছি—

সুব্রত। ইউ আর এ ফুল কমরেড,—তুমি পার্টি ছাড়লেও পার্টি তোমাকে ছাড়ে নি, ছাড়তে পারে না। তুমি পার্টির বহু গুপ্ত রহস্য জানো, তোমার স্বাধীন সত্তা পার্টির পক্ষে বিপজ্জনক—

অতীন। কিন্তু আমি শপথ করছি যে আমার মুখ থেকে কোনো কথা বার হবে না—আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা—

সুব্রত। ছেড়ে দেব? হা হা হা,—

অতীন। হ্যাঁ আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের কথার চটকে ভুলে আমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ভেতরে ঢুকে আমার মোহ ভঙ্গ হয়েছে,—নিজের দেশের, নিজের জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যের চেয়ে যারা বিদেশের প্রতি, এমন কি আমাদের শত্রুপক্ষের প্রতি আনুগত্যকেই পার্টি শৃঙ্খলার চরম বলে গণ্য করে তাদের মধ্যে আমি নেই—

সুব্রত। বিদেশ তুমি বলছ কাকে কমরেড? সর্ব দেশের সর্বহারারা সর্বত্রই এক, তাদের দেশ নেই, জাত নেই, তারা একটাই শ্রেণী, আমাদের আনুগত্য তাদের প্রতি—ভৌগোলিক সীমার বাঁধন আমরা জানি না—

অতীন। এটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

সুব্রত। বিশ্বাসঘাতক তুমি কমরেড—

অতীন। আমি?

সুব্রত। হ্যাঁ, তুমি। পার্টি তোমার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছিল তা তুমি করনি কেন কমরেড? বলো, জবাব দাও—

অতীন। সে কাজ করা আমার বিবেক-বিরুদ্ধ সুব্রত, সে কাজ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—

সুব্রত। কী বললে? বিবেক-বিরুদ্ধ? হা হা হা—ইউ আর এ ড্যামড্ ফুল কমরেড অতীন। পার্টি-মেম্বারের বিবেক বলে কিছু নেই—থাকতে পারে না। তুমি একটি মেশিন কমরেড—অপারেটারের নির্দেশে নির্ভুলভাবে চলাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। বলো, কেন তুমি পার্টির সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করেছ বলো, —চুপ করে থেকো না—বলো,—স্পীক আপ আই সে—

অতীন। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ডিনামাইট দিয়ে একটা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী উড়িয়ে দেবার নির্দেশ ছিল আমার ওপর—

সুব্রত। কৃত্যাক্টিক্স সো—আমাদের বিপ্লব জয়যুক্ত করবার ঐ ছিল একমাত্র পথ, অনেক মাথা ঘামিয়ে তৈরী করা হয়েছিল ঐ মাষ্টার প্ল্যান, প্ল্যান মাফিক আমাদের ত্রাণকর্তা সৈন্য বাহিনী এ দেশের সামন্ততান্ত্রিক বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল আর তুমি—

অতীন। আমি পারলাম না সুব্রত,—দেশের এ চরম সর্বনাশ করতে আমি পারলাম না—

সুব্রত। তাই তুমি চুপি চুপি পালিয়ে এলে এখানে, —কমরেড অতীন তুমি পার্টি দ্রোহী—

অতীন। হাঁ, আমি পার্টি দ্রোহী, কিন্তু দেশদ্রোহী হবার চেয়ে সে অনেক ভালো সুব্রত,—দেরীতে হলেও আমার ভুল যে আমি শুধরে নিতে পেরেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ—

সুব্রত। ভালো কি মন্দ তা এখুনি বুঝতে পারবে কমরেড, হ্যাণ্ডস আপ—

(ওভারকোটের ডান পকেট থেকে রিভলবার বা'র করল, অতীনের বুকের দিকে তাক করল।)

অতীন। ওকি! ওকি করছ সুব্রত?

সুব্রত। হ্যাণ্ডস্‌আপ আই সে। পার্টিদ্রোহীর যোগ্য শাস্তি—মৃত্যু। তাই আমি পার্টির নির্দেশে জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি এখানে। নাউ আই উইল শুট ইউ কমরেড,—ওয়ান—

অতীন। সুব্রত, সুব্রত, তুমি আমার বন্ধু—

সুব্রত। বন্ধু? বন্ধু ছিলাম একদিন, আজ আর আমি তা নই, আজ আমি তোমার নেমেসিস্‌,—তোমার নিয়তি—

অতীন। বন্ধুর রক্তে নিজের হাত কলঙ্কিত কোরো না সুব্রত, তোমার বোন শর্বরীর কথাও একবার ভাবো, আমি না থাকলে অন্ধকার পাতালের কোন গহ্বরে তলিয়ে যাবে সে—

সুব্রত। শর্বরী?

অতীন। হাঁ হাঁ শর্বরী, তোমার ছোট বোন শর্বরী, সে আর আমি যে এক হয়ে যাচ্ছি কিছুদিনের মধ্যে. একটু পরেই যে তার এখানে আসার কথা!

সুব্রত। তা হোক, সে জন্য পার্টির দণ্ড স্থগিত থাকতে পারে না—প্রস্তুত হও কমরেড অতীন,—টু—

আলমারীর পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলে গণেশ

গণেশ। খবরদার—

সুব্রত। (চমকে পাশে তাকিয়ে) কে?

গণেশ। খবরদার, নামাও পিস্তল—

(গণেশ সুব্রতর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গেল।)

গণেশ। (হাঁপাতে হাঁপাতে) স্যার,—স্যার—শিগগির ওর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিন।

সুব্রত। (অবরুদ্ধ স্বরে) আই স্যাল ফিনিশ ইউ বোথ.

(অতীনের হতভম্ব ভাব কেটে গেল, সে এক লাফে সুব্রতর পিস্তল শুদ্ধ হাত চেপে ধরল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তলের আওয়াজ হ'ল—)

সুব্রত। ও আই অ্যাম ডান ফর—

(গণেশ আর অতীন উঠে দাঁড়াল। সুব্রত পড়ে রইল।)

গণেশ। (হাঁপাতে হাঁপাতে) স্যার, দেখুন দেখুন,—গুলিটা বোধ হয় ওর গায়ে লেগেছে—

সুব্রত উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না

সুব্রত। আঃ—কমরেড অতীন, তুমি যে ঘরে গুণ্ডা পুষে রেখেছ তা আমার জানা ছিল না, আগে জানলে নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতাম—

অতীন। সুব্রত, উঠোনা, উঠোনা, তুমি আহত। আমি একজন ডাক্তার ডেকে আনি, আর আনি শর্বরীকে—গণেশ, তুমি এখানে থাকো আমি এখুনি আসছি—

অতীনের দ্রুত প্রস্থান

পরদা নেমে এলো

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিস্টার বিনায়ক বাসুর ড্রইং রুম

সময়: সন্ধ্যার পর

(বেয়ারা আবদুল একটা ঝাড়ন হাতে আসবাব পত্র ঝাড়ছে। গুণ গুণ করে গান করছে)

আবদুল। মেরা জুত্তা হ্যায় জাপানী, পাৎলুন ইংলিশ-স্তানী, সরপে লাল টোপী রুশী ফির্‌ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী। নিকল পড়ে হাঁয় খুলি সড়ক পর, আপনা সীনা তানে,—

মঞ্জিল কাঁহা কাঁহা হ্যায় উপর ওয়ালা জানে।

মেরা জুত্তা হ্যায় জাপানী···

(শর্বরীর প্রবেশ)

শর্বরী। পলি কাঁহা আবদুল?

আবদুল। সেলাম মাইজি,—মিসিবাবা তো নেহি হ্যায়—

শর্বরী। নেহি হ্যায়? কাঁহা গিয়া?

আবদুল। মুঝে ক্যা মালুম। সাব আপকো বয়ঠনে বোলে হ্যাঁয়,—আপ বইঠিয়ে—

আবদুলের প্রস্থান

(ভেতর থেকে ভারি গলার শব্দ)

বিনায়ক। কৌন হ্যায় আবদুল—

শর্বরী। আমি শর্বরী, মিষ্টার বাসু—

(মিষ্টার বাসুর প্রবেশ। পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে সিল্ক-এর গাউন, পায়ে রবারের চটি। পা সামান্য টলছে। হাতের গ্লাসে মদ)

বিনায়ক। (ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে) ওয়েল কাম, ওয়েল কাম মাই গার্ল, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর্ ইউ—

শর্বরী। গুড্ ইভনিং মিষ্টার বাসু,—পলি নেই শুনলাম—

বিনায়ক। দ্যাট্স্ রাইট। শি ইজ আউট। আজ যে এক্সমাস ইভ, জানোনা?

শর্বরী। হ্যাঁ—জানি—

বিনায়ক। ক্লাবে আজ একটা চিল্ড্রেনস্ পার্টি আছে পলি গেছে সেখানে। বোসো, বোসো শর্বরী, প্লিজ্ বি সিডেট—(জোরে) আবদুল—

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। ফরমাইয়ে সাব—

বিনায়ক। তুম আউর বাবুর্চি ক্লাব রোডকা বেকারি মে যাও। দো পাউণ্ড কেক, কুছ প্যাটিজ আউর পেষ্ট্রি লে আও—

আবদুল। আভি যাতা হুঁ সাব্ [প্রস্থানোদ্যত

বিনায়ক। পহেলে বোতল আউর গ্লাস দে যাও হিঁয়া—

আবদুল। আভি লায়া সাব্—

(আবদুলের প্রস্থান ও একটু পরেই একটি মদের বোতল, কাচের গ্লাস ইত্যাদি এনে টেবিলে রেখে দরজা ভেজিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল)

বিনায়ক। হ্যাভ্ এ ড্রিংক শর্বরী—এ গুড্ ভিনটেজ, ইউ উইল লাইক ইট—

শর্বরী। আমি মদ খাইনা মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। জীবনের অনেক সুখস্বাদ থেকে বঞ্চিত আছ দেখছি, তবে নিজে মদ না খেয়েও অন্যকে মাতাল করতে পারো,—হা হা হা, লেট্ মি হেল্প মাইসেলফ্ দেন—

বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে নিল

শর্বরী। আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। একটা কথা? একটা কেন? দশটা বলো, আই অ্যাম অল ইয়ারস—

শর্বরী। এডুকেশন অফিসারের যে চাকরীটার কথা বলেছিলেন—

বিনায়ক। ডোণ্ট ওরি ফর দ্যাট। ইট ইজ অল সেটেল্‌ড্। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই তুমি চিঠি পেয়ে যাবে, জেনারেল ম্যানেজার শুধু একটি বার তোমার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে চান। ওয়েল, দ্যাট্ ক্যান বি ডান টু-নাইট কী বলো?

শর্বরী। এ সব কী বলছেন আপনি? নিভৃতে আলাপ! তার মানে?

বিনায়ক। কোনো ভয় নেই তোমার, আমার কার-এ যাবে, আধ ঘণ্টা বাদে আবার আমারই কার-এ ফিরে আসবে,—আওয়ার জেনারেল ম্যানেজার ইজ এ নাইস ফেলো, ইউ উইল এনজয় হিজ কম্পানী—হা হা হা—

শর্বরী। একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলবেন মিষ্টার বাসু—ও চাকরী আমি করব না ঠিক করেছি—

বিনায়ক। হোয়াট?

শর্বরী। আপনার মেয়েকেও আর গান শেখাতে আসব না—

বিনায়ক। আর ইউ ইন সেন্স্ শর্বরী?

শর্বরী। হ্যাঁ, সব দিক বিবেচনা করেই আমি এ কথা বলছি—

বিনায়ক। বোকার মতো কথা বোলো না শর্বরী, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, পরে আর আপশোষের সীমা থাকবে না, বাট্ ইট্ উইল বি টু লেট্ দেন—

শর্বরী। আমি মনস্থির করে ফেলেছি মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। আর একবার ভেবে দেখো শর্বরী,—প্রথমেই চারশ টাকা মাইনে, ফ্রি-ফারনিশড বাংলো,

গার্ডেন এ্যালাইন্স, ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স, বোনাস,—ইউ উইল বি রোলিং ইন্ মানি,—ইউ উইল লীড্ দি লাইফ্ অব্ এ প্রিন্সেস—

শর্বরী। তবু আমি তা চাইনা মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। চাও না?

শর্বরী। না, যে কাজে নারীত্বের মর্য্যাদা আহত হয়, শত লোভনীয় হলেও সে কাজ আমি চাই না—

বিনায়ক। ডোণ্ট্ বি পিউরিটান শর্বরী, বি মডার্ণ,—নিষ্কাশনপুরের সোসাইটি লেডীরা এ সব সামান্য ব্যাপার গ্রাহ্যই করে না। কাল খ্রীস্‌মাস নাইটে ক্লাবে গেলে দেখবে এখানকার এ্যারিষ্টোক্র্যাট লেডীরা কত দুঃসাহসী, কতো ফরোয়ার্ড, তবেই না তাদের স্বামীরা ধাপে ধাপে প্রোমোশন পেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দৈহিক শুচিতার শুচিবাই এ যুগে অচল—

শর্বরী। এই সব মহিলারা যে আমারই স্বজাতি এ কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হচ্ছে মিষ্টার বাসু। প্রগতির মোহে আর ব্যক্তিগত স্বার্থে তাঁরা নিজেদের, নিজের পরিবারের, নিজের দেশের কতো বড়ো ক্ষতি করছেন তা তাঁরা জানেন না,—কিন্তু আমার চাকরী না ছাড়ার জন্য আপনি অত জিদ ধরেছেন কেন বলুন তো?

বিনায়ক। কেন জানতে চাও শর্বরী? (কাছে এসে) বিকজ আই লাইক ইউ, তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার নিটোল শরীর আমাকে মুগ্ধ করেছে,—পাগল করেছে,—আর আশা করি যে, আমাদের জেনারেল ম্যানেজারকেও করবে,—হা হা হা—

শর্বরীর কাঁধে হাত দিল

শর্বরী। (তীর বেগে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে বিনায়কের হাত এক ঝটকায় নামিয়ে দিয়ে) এ সব কী বলছেন আপনি?

বিনায়ক। কি বলছি বুঝতে পারছো না মাই বিউটি? হাঃ হাঃ হাঃ এ তো প্রাঞ্জল কথা—আমি তোমাকে চাই—

শর্বরী। (তীব্র কঠিন কণ্ঠে) আপনি সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মিষ্টার বাসু,—আমাকে আপনাদের সোসাইটি লেডী বলে মনে করবেন না—

বিনায়ক। কাম্, কাম্, ডোণ্ট্ বি সিলি। ইউ আর ইয়ং এণ্ড বিউটিফুল, জাষ্ট এনুজম লাইক—

এক ঢোক মদ খেল, শর্বরীকে ধরতে এগিয়ে গেল

শর্বরী। (চীৎকার করে) মিষ্টার বাসু—

বিনায়ক। (মদের কণ্ঠে) আহ্, ইউ লুক লভ্‌লিয়ার ইন্ ইয়োর রেজ, ইয়োর বুজম্ ইজ হীভিং লাইক এ্যান্ ওশেন,—আহা এখানে যদি আমাদের জেনারেল ম্যানেজার থাকতো—

শর্বরী। আপনার প্রলাপ যখন থামবেই না তখন আমি চললাম,—আপনার ইতরতার সীমা নেই—

(ঘরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বিনায়ক বাসু চট করে এগিয়ে এসে তার যাবার পথ বন্ধ করে দাঁড়াল।)

বিনায়ক। টেক ইট ইজি, টেক ইট্ ইজি শর্বরী। আমার বাংলোতে আজ কেউ নেই, বেয়ারা বাবুর্চিও চলে গেছে,—কেউ কিছু জানবে না, আমি যে জেনারেল ম্যানেজারকে কথা দিয়েছি, তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন,—তোমাকে না নিয়ে গেলে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি। (হাত ধরতে গেল)

শর্বরী। (পিছিয়ে গিয়ে দুই চোখে ঘৃণাবর্ষণ করে) আপনি—আপনি একটা জানোয়ার—অতীনদা ঠিকই বলেছিল—

বিনায়ক। অতীনদা? ওহ্, দ্যাট্ ব্রোক্! তুমি তাকে ভালোবাসো, তাই না?

শর্বরী। আপনার কৌতুহল চরিতার্থ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই—

বিনায়ক। ওয়েল,—হোয়াট্ ইফ্ আই স্যাক্ হিম?

শর্বরী। বিনা দোষে অতীনদার চাকরী খাবেন আপনি?

বিনায়ক। হ্যাঁ খাব, কারণ আমার থাবা থেকে সরে যেতে চাও তুমি, অতীনের চাকরী গেলে তোমাদের প্রেমের স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে যাবে এ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

শর্বরী। আপনি,—আপনি একটা স্কাউণ্ড্রেল,একটা—

বিনায়ক। কারখানার কিছু লোক আড়ালে আমাকে তাই বলে বটে, কিন্তু শুধু কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ে না,—নাউ লেট মি ফোর্স ইয়ু ইনটু মাই কার—

বিনায়ক এক পা-দু পা করে শর্বরীর দিকে এগুতে লাগল, শর্বরী পিছাতে লাগল, হটতে হটতে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকল।

শর্বরী। আর এক পা এগুলেই কিন্তু চেঁচাব আমি—

বিনায়ক। চেঁচাবে? হাঃ, হাঃ, হাঃ, চেঁচাও, যত খুশী চেঁচাও,—এই বাংলোর বিরাট কম্পাউণ্ড পার হয়ে তোমার চীৎকার কোনো লোকের কানে পৌঁছুবে না শর্বরী,—তোমার অতীনদারও না—

শর্বরী। খবরদার,—আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন না—

বিনায়ক। এই ঘরে তোমার আগেও অনেক মেয়ে এসেছে, কিন্তু তারা কেউ তোমার মতো এমন বেয়াড়া ছিল না, কেউ কেউ স্বল্প স্বল্প বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু নন্ কুড্ এস্কেপ মি, এণ্ড নর্ ইউ শ্যাল—

শর্বরী। (কাছের টেবিল থেকে মদের খালি বোতলটা তুলে নিল) আর এক পা এগুলেই আমি এই বোতল ছুঁড়ে মারব—

বিনায়ক এক লাফে এগিয়ে এসে শর্বরীর বোতল শুদ্ধু হাত চেপে ধরল

বিনায়ক। ইউ আর এ ফুল। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না—অতীনকে আমি বি, টি, পড়তে পাঠাবো, তাকে হেডমাষ্টার করে দেবো, এণ্ড ইউ বোথ উইল বি হ্যাপিলি ম্যারেড—চলো, চলো,—আমার কার তৈরী—

শর্বরী। (হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে) উঃ, হাত ছাড়ুন,—হাত ছাড়ুন, আমাকে ছোঁবেন না আপনি, কী ভেবেছেন আমাকে? (চীৎকার করে) অতীনদা,—অতীনদা,—বাঁচাও আমাকে,—বাঁচাও বাঁচাও—

এক ধাক্কায় ভেজানো দরজা খুলে ঝড়ের মতো বেগে অতীন ঘরে ঢুকলো

অতীন। ভয় নেই,ভয় নেই শর্বরী,আমি এসে পড়েছি,—মিষ্টার বাসু,টেক দ্যাট্ ফর ইয়োর গ্যালাণ্ট্ শিভালরি—

অতীন বিনায়কের মুখে ঘুষি মারল

ছিঃ, একটি অসহায়া মহিলার অসম্মান করতে বাধল না আপনার? কাপুরুষ কোথাকার—

বিনায়ক। ট্রেসপাস, ট্রেসপাস,—আমার বাংলোতে ট্রেসপাস, আমি—আমি তোমাকে পুলিশে দেব—

অতীন। পুলিশে দেবেন? এখনো আপনার শিক্ষা হয়নি দেখছি—ঘাড়ে আর দুটো দিয়ে লাগাবো নাকি?

শর্বরী ছুটে এসে অতীনকে জড়িয়ে ধরল

শর্বরী। অতীনদা, তুমি আজ আমাকে চরম অসম্মানের হাত থেকে বাঁচালে—তুমি না এলে কী যে হোতো—

বিনায়ক। আই উইল ম্যাক ইউ বোথ—

অতীন। (শর্বরীকে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে) উই শ্যাল্ বি টু প্রিপেড—

বিনায়ক। টু প্রিপেড্?

অতীন। হ্যাঁ, আপনার মতো নারীমাংস-লোভী বিবেক-বর্জিত শয়তান যেখানে মাথা উঁচু করে চলে সেই জঘন্য কারখানা-শহর থেকে দূরে সরে যেতেই আমরা চাই,—চলো শর্বরী—

শর্বরী। (যেতে যেতে) তুমি ঠিক এ সময়টাতে এখানে এসে না পড়লে কী যে হোতো অতীনদা!—উঃ, ভাবতেও আমার মাথা ঝিমঝিম করছে—

অতীন। মাথা ঝিমঝিমের আর একটা ব্যাপার অপেক্ষা করছে আমার বাড়িতে—

শর্বরী। সে আবার কি অতীনদা?

অতীন। তোমার জেল-পালানো দাদা আমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিল একটু আগে—

শর্বরী। বলো কি অতীনদা?

অতীন। হ্যাঁ, স্কুলের একটি ছেলে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে—

শর্বরী। আর দাদা?

অতীন। সুব্রত নিজের রিভলবারের গুলিতে নিজেই জখম হয়েছে—

শর্বরী। কী সর্বনাশ? দাদা এখন কোথায়? কেমন আছে?

অতীন। আছে আমারই বাড়িতে। গুলিটা ঠিক কোথায় লেগেছে জানি না, আমি ডাক্তার ডেকেই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি তোমাকে খবর দিতে—

শর্বরী। চলো চলো, শিগগির চলো, ভুল পথে চলার ফলে দাদাকে বুঝি হারাতে হয়—

অতীন-শর্বরীর প্রস্থান

বিনায়ক। আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল! আচ্ছাঃ, আমিও বিনায়ক বোস, দেখাচ্ছি মজা, এক্ষুণি ফোন করে দিচ্ছি থানায়। সব কটাকে একসঙ্গে অ্যারেষ্ট করাবো। তারপর দেখে নেব ঐ অতীন আর শর্বরীকে—

বিনায়ক বোস ফোন করতে লাগল

হ্যালো, নিষ্কাশনপুর পুলিশ ষ্টেশন? আমি মিষ্টার বিনায়ক বাসু বলছি—হ্যাঁ হ্যাঁ—অফিসার ইন-চার্জ আছেন? শুনুন—

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো।

তৃতীয় দৃশ্য

অতীনের শোবার ঘর

(সুব্রত অতীনের বিছানায় শুয়ে আছে। একজন ডাক্তার তার বুকের ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। গণেশ পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। বিছনার পাশে একটা ছোট টুলের ওপরে ইনজেকশান দেবার সরঞ্জাম, গরম জলের কেৎলী প্রভৃতি রাখা আছে।)

সময়: রাত ন'টা

ঝড়ের বেগে শর্বরী-অতীনের প্রবেশ

শর্বরী। (বিছানার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে) দাদা—দাদা—

ডাক্তার। চুপ, গোলমাল করবেন না, পেশেণ্টের ক্ষতি হতে পারে—

শর্বরী। দাদা বেঁচে আছে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। হ্যাঁ, এখনো বেঁচে আছে বটে, কিন্তু একে এখুনি হাসপাতালে রিমুভ্ করা দরকার, অপারেশান করে গুলিটা বার করতে হবে—

অতীন। অপারেশান? হাসপাতাল? কিন্তু—

শর্বরী। কিসের কিন্তু অতীনদা? টাকার কথা ভাবছো?

(ডাক্তার সুব্রতকে একটা ইনজেকশান দেবার উদ্‌যোগ করলেন, গণেশ তাই দেখতে লাগলো, অতীন-শর্বরী সেখান থেকে একটু সরে এলো)

অতীন। (গলা নামিয়ে) না না টাকা নয় টাকা নয়,—

শর্বরী। তবে?

অতীন। সুব্রত ফেরারী আসামী, হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে, তখন ওর প্রাণ বাঁচলেও স্বাধীনতা বাঁচবে না—

শর্বরী। তা হলে কী হবে এখন অতীনদা? মতবাদ নিয়ে যতো সব বিরোধই থাক না কেন, মা-র পেটের ভাই, তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হলে নিজের কাছে দেবার মতো কৈফিয়ৎ-ই যে খুঁজে পাবো না—

অতীন। আমিও তো তাই ভাবছি শর্বরী। সুব্রত আমার প্রাণের বন্ধু, অদ্ভুত মেধাবী ছেলে ছিল ও, আমি জানতাম যে একদিন ও অনেক বড়ো হবে, ভারতখ্যাত হবে, আর আমরা ওর পরিচয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করব। আমি ছিলাম ওর অন্ধ ভক্ত, কিন্তু ভুল পথে চলার ফলে সেই সম্ভাবনাময় জীবনের কী শোচনীয় পরিণাম—

ইনজেকশন দেবার সময়ে সুব্রত অস্ফুট চীৎকার করল

শর্বরী। (ছুটে বিছানার পাশে গিয়ে) কী হ'ল দাদা? ডাক্তারবাবু, দাদা কথা বলছে না কেন? তবে কি—

ডাক্তার। অনবরত রক্তক্ষয়ে আপনার দাদা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন, আচ্ছন্নতা এখনো কাটে নি।

শর্বরী। ডাক্তারবাবু,—আমি আপনাকে মিনতি করছি, যে কোনো ভাবে হোক আমার দাদাকে আপনি বাঁচান, আমার চোখের সামনে দাদা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এ আমি কি করে সহ্য করব ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই আমাদের জীবনের ব্রত শর্বরী দেবী, আমার দিক থেকে চেষ্টার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হবে না, কিন্তু হাসপাতালে না নিয়ে গেলে—

শর্বরী! তবে তাই হোক, দাদার প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত,—

ডাক্তার। ঠিক কথা বলেছেন আপনি,—অতীনবাবু—

অতীন। বলুন—

ডাক্তার। একটা গাড়ি বা হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের জন্য কাউকে পাঠান—

গণেশ। আমি যাবো স্যার? ষ্টীল ওয়ার্কস্ রোডের মোড়ে লালজীর ট্যাক্সিটা থাকে, আমার সঙ্গে বেশ জানাশোনা আছে,—আমি বললেই চলে আসবে—

অতীন। না না, গণেশ, তুমি এখানেই থাকো, আমি যাচ্ছি—

[দু'জন কনেষ্টবলসহ থানার দারোগাবাবুর প্রবেশ]

দারোগা। কাউকে যেতে হবে না, কাউকে যেতে হবে না,—আমি সব ব্যবস্থা করছি, চিন্তার কোনো

কারণ নেই,—রামনগিনা—বাঁধো এই আসামীকো (অতীনকে দেখিয়ে দিল)।

[কনেষ্টবল রামনগিনা ও বচ্চন সিং দু' পাশ থেকে অতীনের দু' বাহু ধরে ফেলল।]

অতীন। এ কি! আমাকে এ্যারেষ্ট করছেন কেন দারোগাবাবু?

শর্বরী। অতীনদা কোনো অপরাধ করেনি, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন অতীনদাকে—

ডাক্তার। আঃ বড্ড গোলমাল হচ্ছে, আপনারা একটু থামুন তো,—পেসেণ্ট্‌কে বাঁচাতে দিন—

[দারোগা, কনেষ্টবল দু'জন, অতীন, শর্বরী বিছানার কাছ থেকে সরে এলো)

অতীন। নিরপরাধ লোককে এভাবে গ্রেপ্তার করবার মানে কি দারোগাবাবু?

দারোগা। সবই বলছি, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঐ লোকটিকে মারাত্মকভাবে আহত করবার চার্জে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করছি অতীনবাবু—

অতীন। আপনি কী করে জানলেন যে আমিই তাকে আহত করেছি?

দারোগা। চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়েছি—

অতীন। আবার গোপন-সূত্র?

[দারোগার চোখ ঘরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মেঝের ওপর পড়ে থাকা রিভলবারটা তার চোখে পড়ল]

দারোগা। হুর্‌রে—একটা রিভলবার দেখছি যে! (ছুটে রিভলভারটি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো) হুম্—ওয়েভ্‌লি স্কট। চিন্তার কোনো কারণ নেই, বারুদের গন্ধ লেগে আছে যে এখনো,—অতীনবাবু, আপনার ঘরে রিভলবার এলো কি করে?

(অতীন নির্বাক)

বলুন, জবাব দিন, এর লাইসেন্স আছে আপনার?

(অতীন নির্বাক)

অতীনবাবু, কেসটা দেখছি সাধারণ নয়, আর্মস্ এ্যাক্টও এসে পড়ছে,—চিন্তার কোনো কারণ নেই,—এখনো বলুন আপনি, এ রিভলবার কোথায় পেলেন? বলুন—নইলে আপনাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাব আমি—

(অতীন নির্বাক)

শর্বরী। না না, দারোগাবাবু—অতীনদা'কে আপনি ছেড়ে দিন, ও রিভলবার অতীনদার নয়,—অতীনদার নয়,—

দারোগা। অতীনবাবুর নয়? তবে কার?

[শর্বরী নীরব]

একি! চিন্তার কোনো কারণ নেই,—সবাই বোবা হয়ে গেলেন নাকি? বলুন,—বলুন, নইলে সবাইকে ধরে চালান দেব আমি,—শর্বরী দেবীর রাত কাটবে হাজত ঘরে—

গণেশ। ও রিভলবার মাষ্টার মশায়ের নয় দারোগাবাবু

দারোগা। তবে কার?

গণেশ। যে বিছানায় শুয়ে আছে তার—

দারোগা। তার মানে?—

গণেশ। ঐ লোকটিই রিভলবার নিয়ে মাষ্টার মশায়কে মারবে বলে ঘরে ঢুকেছিল—

দারোগা। আর নিজেই নিজেকে গুলি করল, কেমন? চিন্তার কোনো কারণ নেই—এ সব আষাঢ়ে গল্প বলে এই শোভানাল্লা মিঞাকে ভোলাতে পারবে না, বুঝলে হে ছোকরা—

শর্বরী। আষাঢ়ে গল্প নয় দারোগাবাবু, সত্যি কথাই বলেছে—ও রিভলবার আমার দাদার, অনেক দিন ওটা আমি দাদার হাতে দেখেছি—

দারোগা। দাদা! আপনার দাদা? চিন্তার কোনো কারণ নেই, কোথায় তিনি?

শর্বরী। ঐ বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তিটিই আমার দাদা—

দারোগা। ও, তাই নাকি? চিন্তার কোনো কারণ নেই, তা হলে অতীনবাবু আপনার কে?

শর্বরী! অতীনদা আমার—আমার—দাদার বন্ধু—আর—

দারোগা। চিন্তার কোনো কারণ নেই, বলুন বলুন,—থামলেন কেন, বলুন—

অতীন। শর্বরী আমার ভাবী স্ত্রী, দারোগা বাবু—

দারোগা। ও, আই সি,—থানার সহকর্মীরা বলে যে শোভানাল্লা মিঞা মাথামোটা দারোগা,—কিন্তু দেখুন

কিন্তু দেখুন কিভাবে ধাপে ধাপে রহস্য উন্মোচন করে চলেছি—চিন্তার কোনো কারণ নেই—গুলি ছুঁড়লো কে ?

সবাই নীরব

কী আশ্চর্য। আপনারা সবাই দেখছি আপন জন, তা হ'লে গুলি ছুঁড়লো কে ?

গণেশ। ইচ্ছে করে কেউ ছোঁড়ে নি দারোগাবাবু—

দারোগা। তবে কি অনিচ্ছার সঙ্গে ছুড়েছে হে ছোকরা ?

গণেশ। মাষ্টার মশায় আর ঐ লোকটির মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে হঠাৎ পিস্তলের গুলি ছুটে গিয়ে ঐ লোকটির গায়ে লেগেছে,—আমি নিজের চোখে দেখেছি—

দারোগা। চিন্তার কোনো কারণ নেই,—তার মানে এ্যাক্সিডেণ্ট ?

গণেশ। হ্যাঁ—

দারোগা। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তিই বা হ'ল কেন আর রিভলবারই বা এলো কেন, শোভনাল্লা মিনাকে এই কথাটি বুঝিয়ে দিন তো কেউ—

সবাই নীরব

চিন্তার কোনো কারণ নেই,—বলুন, কেউ কিছু বলুন, জবাব দিন,—চুপ করে থাকলে তো চলবে না—গুলি চলেছে, একজন লোক মর্টালি উনডেড্ হয়েছে, ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার—

সবাই নীরব

ও, মুখ তাহলে খুলবেন না কেউ ? আচ্ছাঃ,—দেখি আমি মুখ খোলাতে পারি কিনা,—এ্যাই ছোকরা, —তোমার নাম কি ?

গণেশ। আমার নাম গণেশ—

দারোগা। অ, তোমারই নাম গণেশ ? নামটা চেনাচেনা লাগছে,—চিন্তার কোনো কারণ নেই,—তুমি এই ঘরে কী করছিলে ?

গণেশ। আমি দারোগাবাবু ? আমি—আমি—

দারোগা। হ্যাঁ তুমি, তুমি,—কী করছিলে এ ঘরে ?

গণেশ। আমি ? (ঢোঁক গিলে) আমি—আমি ঐ আলমারীটার আড়ালে লুকিয়েছিলাম—

দারোগা। (ধমক দিয়ে) কেন ? চুরি করবার মতলবে ?

গণেশ। (আমতা আমতা করে) না দারোগাবাবু চুরি নয়, মানে, খাতা বদলাতে এসেছিলাম…

অতীন। খাতা বদলাতে ? কী বলছ তুমি গণেশ ?

গণেশ। হ্যাঁ স্যার, অন্যায় করে ফেলেছি স্যার, আমাকে মাপ করুন স্যার—

দারোগা। খাতা ? কিসের খাতা ?

গণেশ। পরীক্ষার খাতা দারোগাবাবু,—ফেল করব ভেবে নিজের লেখা আনসার পেপারে বদলে নির্ভুল উত্তর লেখা এই খাতা কটি রেখে যেতে এসেছিলাম—

অতীন। বলো কি গণেশ ? কই দেখি—

খাতা তিনটি গণেশের হাত থেকে নিল)

আশ্চর্য ব্যাপার এই খাতায় স্কুলের ষ্টাম্প আর হেড্ মাষ্টার মশায়ের সই রয়েছে দেখছি—এ খাতা তোমার হাতে এলো কি করে গণেশ ?—

(গণেশ নীরবে অস্বস্তি প্রকাশ করল) সত্যি কথা বলো গণেশ, এ খাতা তোমার হাতে এলো কি করে ?

গণেশ। পঞ্চু স্যার দিয়েছেন স্যার—

অতীন। পঞ্চু স্যার ! মানে পঞ্চাননবাবু ?—মাষ্টার মশাই !

গণেশ। হাাঁ, আমি, মানকে আর নন্তু তাঁর কাছেই প্রাইভেটে পড়ি কিনা, তাই—

অতীন। তাই তিনি তোমাদের দুর্নীতির পাঠ শেখাচ্ছেন ? এই কি শিক্ষাব্রতীর কাজ ? ছি ছি ছি—

গণেশ। (অতীনের পা ধরে) আমার অন্যায় হয়ে গেছে স্যার, আমি অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করুন স্যার,—এই আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আজ থেকে আমি আমার জীবনের মোড় ঘোরাবো, আপনার উপযুক্ত ছাত্র হতে চেষ্টা করব,—এই আমি খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলছি স্যার—

অতীন। (গণেশকে তুলে, বুকে জড়িয়ে ধরে) এই তো চাই গণেশ, টেষ্ট পরীক্ষাতে পাশ করতে পারাটাই বড়ো কথা নয়, সত্য আর ন্যায়ের পথে চললে জীবনের পরীক্ষায় তুমি পাশ করবেই করবে—

এরা যতক্ষণ কথা বলছে ততক্ষণ দারোগাবাবু বিছানার পাশে গিয়ে সুব্রতর মুখ খানা দেখবেন আর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন

দারোগা। অতীনবাবু,—এ লোকটিকে বেশ চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

অতীন নীরব

চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি একে বা এর ফটো কোথায় যেন দেখেছি,—কিন্তু কোথায়—কোথায়? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে (উৎফুল্ল স্বরে) চিন্তার কোনো কারণ নেই,—আজ এই রাতের দৌড় ঝাপটা নিতান্ত বৃথা যাবে না দেখছি,—রাম নগিনা—বচ্চন সিং—

কনেষ্টবল দু'জন। হজুর—

দারোগা। ছোড় দো অতীনবাবুকো—

বচ্চন সিং। বহোত আচ্ছা হজুর—

কনেষ্টবল দু'জন অতীনের কাছ থেকে সরে গেল

দারোগা। (অতীনের কাছে এসে) অতীনবাবু, মিষ্টার বিনায়ক বাসুর টেলিফোন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে এ্যারেষ্ট করেছিলাম—কিন্তু—

শর্বরী। মিষ্টার বাসু? কী সাংঘাতিক লোক,—আমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।

দারোগা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সে রিপোর্ট মিথ্যে—আমাকে আপনি মাপ করুন অতীনবাবু—

অতীন। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না দারোগাবাবু,—ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়, আমি, আপনি, গণেশ, শর্বরী সবাই ভুল করেছি—কিন্তু সে ভুল যে স্বীকার করে নিয়ে সংশোধন করতে পারে সে-ই তো মহৎ,—জানেন তো, জীবন-সৌধে ভুলের বুনিয়াদই সব চেয়ে মজবুত হয়ে থাকে—'

দারোগা। ঠিক কথা, ঠিক কথা, ভুল লোককে এ্যারেষ্ট করবার ভুল আমি এক্ষুণি শুধরে নিচ্ছি,—চিন্তার কোনো কারণ নেই,—আপনার বন্ধুর নামটি একবার বলুন তো—

অতীন নীরব

শর্বরী দেবী, আপনি বলুন আপনার দাদার নাম—

শর্বরী নীরব

কোনো ফল হবে না, কোনো ফল হবে না,—বন্ধু প্রীতি বা ভ্রাতৃভক্তি কোনো কাজেই আসবে না,—আমি আমার আসামীকে ঠিক চিনে নিয়েছি—

শর্বরী। চিনে নিয়েছেন? হায় ভগবান—

দারোগা। হ্যাঁ,—উনিই তো সুব্রত দত্ত, প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালিয়েছেন কিছুদিন আছে—

অতীন। আপনার ভুল হয়নি তো দারোগাবাবু—

দারোগা। চিন্তার কোনো কারণ নেই,—শোভ-নাল্লামিঞা জীবনে ভুল যে মাঝে মাঝে না করেছে তা নয়, কিন্তু এবারে সে একেবারে নির্ভুল—

শর্বরী। একেবারে নির্ভুল?

দারোগা। হ্যাঁ,—হুলিয়া বার হয়েছে সুব্রত দত্তর নামে, থানায় থানায় এসে গেছে ওর ফটোগ্রাফ,—ধরতে পারলে নগদ পাঁচশো টাকা পুরস্কার—

শর্বরী। (ছুটে বিছানার পাশে গিয়ে) দাদা—দাদা—এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না তোমাকে,—

ডাক্তার। শর্বরী দেবী, একটু অপেক্ষা করুন, আপনার দাদার জ্ঞান ফিরে আসছে, হয়তো এর পর ভালোর দিকে টার্ণ নেবে, নয়তো—

শর্বরী। না না, ও কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু,—ও কথা বলবেন, দাদাকে বাঁচাতেই হবে, জীবনের একটি মাত্র ভুলের জন্য কি প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

দারোগার কাছে ছুটে এসে

দারোগাবাবু, দারোগাবাবু,—আসামীই হোক আর যাই হোক, দাদা গুরুতর আহত, তাকে অন্তত: হাসপাতালে সুচিকিৎসার সুযোগ দিন—

দারোগা। নিশ্চয় নিশ্চয়,—একথা আগে বলেননি কেন ডাক্তারবাবু? আমি কি করে জানবো আপনার পেশেন্টের আঘাত কতখানি গুরুতর—

ডাক্তার। আপনি আসবার আগেই আমি এঁদের এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বলেছিলাম—

দারোগা। তাই নাকি, তাই নাকি? ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি তার ব্যবস্থা করছি, পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে রাখব সুব্রতবাবুকে—রামনগিনা—

রামনগিনা। কী হজুর—

দারোগা। হাসপাতাল মে ফোন করো,—আভি এ্যাম্বুলেন্স মাংগতা হ্যায়—

রামনগিনা। বহোত আচ্ছা হজুর, ম্যায় আভি যাতা

দারোগাকে স্যালুট করে রামনগিনার প্রস্থান

দারোগা। বচ্চন সিং—

বচ্চন সিং। হুজৌর—

দারোগা। থানামে ফোন করো,—ফেরারী আসামী সুব্রত দত্ত পাকড়াগিয়া,—ম্যায় আসামীকে লে কর অসপতাল যা রহা হুঁ—

বচ্চনসিং। বহোত আচ্ছা হুজৌর—

স্যালুট করে প্রস্থান

দারোগা। অতীনবাবু,—

অতীন। বলুন—

দারোগা। আসুন তো, ততক্ষণে আপনাদের জবানবন্দীগুলো লিখে নি, ঐ টেবিলটায় চলুন,—এসো হে গণেশ—

দারোগাবাবু অতীন ও গণেশকে নিয়ে কোণের দিকে টেবিলে চলে গেল, খাতা পেন্সিল বার করে ওদের জবানবন্দী নিতে লাগলো। শর্বরী সুব্রতর বিছানায় গিয়ে বসল, মুখের ওপর ঝুকে দেখল—

শর্বরী। ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার। কী বলছেন শর্বরী দেবী ?

শর্বরী। এই দেখুন, দাদার চোখের পাতা কাঁপছে,—জ্ঞান বুঝি ফিরে আসছে—

ডাক্তার সুব্রতর নাড়ি দেখল

দাদা,—দাদা,—এখন কেমন বোধ করছ দাদা ?

সুব্রত। (একটু নড়ে উঠলো) উঃ,—বড্ড পিপাসা,—একটু, একটু জল—একটু জল—

শর্বরী। জল ? এখুনি এনে দিচ্ছি দাদা—

উঠে ঘরের কোণে রাখা কুঁজো আর গ্লাসের কাছে গেল। গ্লাসে জল গড়িয়ে এনে সুব্রতর মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিল।

সুব্রত। (জল খেয়ে) আঃ–উঃ, বড়ো যন্ত্রণা, বড়ো যন্ত্রণা…উঃ…আমি কোথায় ? তুমি কে ? কে তুমি ?

শর্বরী। আমি—আমি শর্বরী দাদা—

সুব্রত। (উঠতে গেল, কিন্তু পারল না বুকে হাত দিয়ে) উঃ, কী ভীষণ যন্ত্রণা, শর্বরী ? তুই এখানে ? তুই এখানে কী করে এলি শর্বরী ? তবে কি অতীনের জন্য—

শর্বরী। আমি যে এখানে নিষ্কাশনপুর গার্লস স্কুলে চাকরী করছি দাদা—

সুব্রত। ও, বুঝলাম,—আমি জেলে, কে…কে তোদের খাওয়াবে ? শর্বরী…তুই ছেলের মতো হয়ে মা-বাবাকে দেখিস—

শর্বরী। ও কথা বোলোনা দাদা,—তুমি ভালো হয়ে উঠবে,—

সুব্রত। শর্বরী…শর্বরী…আমি…আমি তোর সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম রে…আমি অতীনকে খুন করতে এসেছিলাম…

শর্বরী। আর কথা বোলো না দাদা,—ডাক্তারবাবু তোমাকে কথা বলতে বারণ করছেন—

সুব্রত। বারণ করছেন ?…কিন্তু…আর হয়তো সময় পাবো না,…আমার সময় ঘনিয়ে আসছে…উঃ…উঃ (মুখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে লোকজন দেখে)…ওরা কারা শর্বরী …ওরা কারা ?

শর্বরী। থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন তোমাকে এ্যারেষ্ট করবেন বলে—

সুব্রত। এ্যারেষ্ট।…হ্যাঁ হ্যাঁ…করবেই তো এ্যারেষ্ট ! আবার এ্যারেষ্ট !…আবার জেল। উঃ…কী ভীষণ যন্ত্রণা… শর্বরী…কাছে আয়.…শোন—

শর্বরী। এই যে আমি দাদা—

সুব্রত। কোথায় ? কোথায় ? একি ! তোর মুখখানা অমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন ? শর্বরী… শর্বরী…

শর্বরী। (চীৎকার করে) ডাক্তারবাবু, দেখুন দেখুন, দাদা যেন কেমন করছে—

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দিলেন। টেবিলের কাছ থেকে অতীন, গণেশ আর দারোগাবাবু ছুটে এলো, বিছানার চার পাশে ঘিরে দাঁড়ালো।

সুব্রত। শর্বরী…উঃ… বড্ড ভুল করেছি রে…বড্ড ভুল করেছি…অতীন…অতীন পার্টি ছেড়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছে…পার্টির চেয়ে মানুষ বড়ো…দেশ তার চেয়েও বড়ো…এ কথাটা আমি আগে বুঝিনি…আঃ… বড্ডো দেরীতে বুঝলাম…আঃ…যন্ত্রণটা যেন কমে আসছে রে—বিদায়…বিদায়· শর্বরী…বিদায় অতীন…বিদায় জন্মভূমি…

শর্বরী। দাদা—দাদা—

শর্বরী সুব্রতর বুকের ওপর মুখ গুজে কাঁদতে লাগলো। ডাক্তার সুব্রতর নাড়ি দেখল।

ডাক্তার। (মাথা নেড়ে) সব শেষ—

অতীন। অত মুষড়ে পোড়ো না শর্বরী, দুঃখ বেদনার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতই তো জীবন—

কনেষ্টবল রামনগিনার প্রবেশ

রামনগিনা। (স্যালুট করে) এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আ গিয়া হুজুর—

দারোগা। আর এ্যাম্বুলেন্স গাড়ির দরকার নেই রামনগিনা.—সুব্রত দত্ত তার ভুলের মাশুল কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়ে গেছে—

শোকস্তব্ধ ঘরে ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল।

সমাপ্ত

কাতরে কবিতা কুতঃ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এবার কবিগিরি ছেড়ে আমায় দালালগিরি
ধ'রতে হবে,—
অন্নাভাবে নইলে নেহাৎ উপোস ক'রেই
ম'রতে হবে!
আমি জানি এটা ঠিক্ জানি—
গণেশ আমার উল্টে গেছে, তালেও নাহি
পাই পানি।

শুধুন আরে মশাই, যতো কসাই তাদের দলেই
ভিড়তে হবে
আপন হাতে নিয়ে ছুরি পরের পকেট
ছিঁড়তে হবে।
ছিল ভাগ্যে, কতই লাঞ্ছনা,—
বাইরে ঘরে গরীব ব'লে দিচ্ছে সবাই গঞ্জনা!

আমায় কলম ছেড়ে এবার আলুব আড়তদারি
ধ'রতে হবে,
যেন তেন প্রকারেণ উদরটাকে ভ'রতে হবে।
আর সয়না অভাব-যন্ত্রণা,
দুঃখ জানাই কাহার কাছে! কে দেয়
আমায় মন্ত্রণা!

এখন বিনা টাকা জীবন ফাঁকা এই কথাটাই
মানতে হবে,
কামাই করার নিত্য নতুন কায়দাকানুন
জানতে হবে।
এখন ভবনদীর কাণ্ডারী—
মুনাফাখোর-চোর-পাটোয়ার—কালো টাকার
ভাণ্ডারী।

হায়, ফুলের বাগান থেকে আমায় গো-ভাগাড়েই
নামতে হবে,
সকাল থেকে সন্ধ্যা কেবল ঘুরতে এবং ঘামতে হবে।
ঠাকুর, এইটে শুধু প্রার্থনা—
পরের জন্মে এই অভাগায় ক'রবে কবি
আর তো না!

আহা, কোকিল তোরে এবার ওরে বাস্তুঘুঘু
সাজতে হবে,
সবার সাথে আপন হাতে পুরাণো তাস
ভাঁজতে হবে।
এবার ক'রবি পূজা—লক্ষ্মীকে;—
সরস্বতীর আরাধনায় বাড়ছে নানান ঝক্কি যে!

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(আলোচনা)

অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষে "পদাবলী সাহিত্যে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি" পড়িলাম। লেখক "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" এই পদটি মিথিলার বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াছেন। আমি "বৈষ্ণব পদাবলী" গ্রন্থে এই পদটি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি। লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লেখকের বক্তব্য রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলে এ পদ তাহার রচিত হইতে পারে না। কারণ শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীঅদ্বৈত মন্দিরে শুভাগমন করিলে আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুর সম্মুখে এই পদ গান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর বোধহয় সে সময় বালক। সুতরাং যদিও ধরা যায় যে কবিরঞ্জন রঘুনন্দন অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, তথাপি ঐ সময়ে তাঁহার পদ রচনার খ্যাতি এমন প্রবল হইয়া ওঠা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর খ্যাতনামা না হইলে অখ্যাত কবির পদ অদ্বৈত আচার্য্য গাহিয়াছিলেন ইহা মানিয়া লওয়া যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য দিক্ দিয়া বিচার করা চলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস—শ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের বহু বৎসর পরে চরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে দিয়া স্ব-রচিত গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছেন। ইহার সমাধান এই যে শ্রীমহাপ্রভু ঠিক ঐ শ্লোকটীই আবৃত্তি করেন নাই। তবে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ ঐ শ্লোকে আছে। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবে শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" পদটি অদ্বৈত আচার্য্যের দ্বারা গান করাইয়া কবিরাজ গোস্বামী আচার্য্যের তৎকালীন মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময় কবিরঞ্জনের যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়াছিল। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অনুমান করিলে অন্যায় হয় না।

আমি স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে কবিরঞ্জনের পরিচয় লিখিয়া পাঠাইলে পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃঃ ১৬৩) লিখিয়াছিলেন "আমাদের চম্পতি রায় বিষয়ক আলোচনা প্রেসে দেওয়ার পর এখন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে বীরভূম প্রদেশেও বিদ্যাপতি উপাধিধারী কবিরঞ্জন নামক একজন প্রাচীন পদকর্ত্তার উদ্ভব হইয়াছিল" ইত্যাদি।

রায় মহাশয় অতঃপর আমার দেওয়া রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ের কবিতা ও শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুর ভূমিকাতেই কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধারের যে সমাধান রায় মহাশয় করিয়াছেন আমি এই নিবন্ধে পূর্ব্বেই তাহার অনুসরণ করিয়াছি। এইবার পদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কৈনু যতন।
অব হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
তব হাম দূর দেশে পিয়া না পাঠাও॥
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

এইবার সাধারণে বিচার করুন, ইহার মধ্যে মৈথিল কবির রচনার চিহ্ন কোথায় আছে? পদটি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি

মিশ্রিত পদ। অধিকাংশই বাঙ্গালা শব্দ। সুতরাং এ পদ যে মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত নহে সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

লেখক নিজ লেখার মধ্যে যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন ডক্টর বিমান মজুমদার ও ডক্টর সুকুমার সেনের মত তুলিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু যে পদ তুলিয়া তিনি আপন মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই "শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল" পদটী কোথায় পাইলেন উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। এই পদটি আমারই সম্পাদিত বৈষ্ণবপদাবলীর ভূমিকায় আছে। পদটী আমারই সংগৃহীত, অন্যত্র কোথাও ছাপাও নাই। আমার নাম না করুন, আকর গ্রন্থের উল্লেখ করা উচিত ছিল। অন্য পদাংশও—

পাই পরমাদ্রি দীন অধমজন
ধনি ধনি কলি যুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভণ ঐ হে নিবেদন
রঘুনন্দন পদ দ্বন্দ্বে॥

পদটীও আমারই সংগৃহীত। বৈষ্ণব পদাবলী হইতেই এই পদাংশও লেখক লইয়াছেন। অথচ আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। গোপালবিজয় রচয়িতা কবিশেখর পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু রায়শেখর নিজের পদে কবিশেখর ভণিতাও দিয়াছেন। সুতরাং এই রায়শেখর ও কবিশেখর একই ব্যক্তি। শেখর, রায়শেখর, শেখর রায়, কবিশেখর ভণিতার পদগুলি আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। গোপালবিজয় প্রণেতার কোন পদ বিশাল পদাবলী সাহিত্যে আছে কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক।

গুজব*

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

জনশ্রুতি।
তোমার গতিরে করে পরাভব
অন্য কোন অশুভ শক্তির
সাধ্য নেই।
যত তুমি চল,
শক্তি তব বেড়ে বেড়ে যায়,
বেড়ে যায় বিস্তৃতি তোমার,
তোমার গতির সাথে।
প্রথমেতে কত ক্ষুদ্র তুমি
কত ভীরু।
তারপর অকস্মাৎ আকাশের পানে
উচ্চশির তুলি,
চল তুমি জনপদ দলি
মেঘেতে আবৃত করি
ভয়ঙ্কর ভ্রূযুগল।
চঞ্চল চরণ তব
পক্ষে তব পবনের গতি।
শেষে ভীষণ দানব করে পরিধান
তোমার গলিত শব।
গাত্রেতে পালক তব
আর প্রতি পালকের মূলে
সব-দেখা চোখ,
উচ্চনাদী খল জিহ্বা,
অশ্লীল ওষ্ঠ নিম্নস্বর,
সর্বশ্রোতা কর্ণ সব,
জঘন্যতা আবিষ্কারে,
হানিকর অপরাধে,
অহর্নিশ লিপ্ত তুমি।
অথবা কখনও তোমার কথায়,
মিশাইয়া দাও কিছু যথার্থ সংবাদ।

[* Aenied—Book IV থেকে Theodore C. Williams কৃত ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে।]

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

শ্রীমতী সাধনা সেন

প্রাচীন একাম্রক্ষেত্র থেকে কিছুটা দূরে দুটো পরপর পাহাড় উঠে গেছে আকাশ ছুঁয়ে। এই পাহাড়ের বুকে প্রাচীন ভারতের যে অনুপম শিল্প-মাধুরী প্রস্ফুটিত রয়েছে, তা আজও পথিকের বিস্মিত দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করে। অতীত গৌরব এদের হয়তো অবলুপ্ত হয়েছে,—কিন্তু সেই গৌরবের অন্তরালে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে, তা অসামান্য, অতুলনীয়।

তখনো প্রাচীন উড়িষ্যাদেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর রীতিনীতির যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় নি। একাম্রক্ষেত্রের গগনচুম্বী বিরাট লিঙ্গমন্দির তখনো আত্ম-প্রকাশ করে নি। সেই সুদূর অতীতে সাধকরা ধর্ম্মতত্ত্বের ও উপযোগিতা স্বীকার করে তাঁদের বসবাসের জন্যে মঠের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন—, তা শুধু নিছক তাঁদের তত্ত্বব্যাখ্যার নিকেতনই ছিল না অথবা ধর্ম্মসাধনার আবাসও ছিলনা। ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম নীরস আলোচনাকে মনের মাধুরী দিয়ে নিঃশেষে বুঝি মিলিয়ে নেবার জন্যই এই পাহাড়দুটিকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। নীরস পাহাড়ের বুকে খনন কার্য্য দ্বারা যে রসানুভূতির উন্মেষ তাঁরা করে-ছিলেন, তার মধ্যে হয়তো নিহিত ছিল তাঁদের কঠিন কঠোরকে জয় করবার অভিযান। আর তাইতো দেখি কোন আলাদা পাথর নয়..., একই পাহাড়ের বুকে খোদাইকাজ চালিয়ে থাকবার যে আবাস ঘরের কল্পনা তাঁরা করেছিলেন তাতে কোন স্তম্ভকে তাঁরা আলাদা এনে যোজনা করেন নি। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি এঁদের হাতে সমর্পণ করে এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মাণের ইংগিত দিয়েছেন...; এগুলি দেখে তাই মনে হয় যেন এরা প্রকৃতিদেবীরই লীলারসের সার্থক প্রসারণ। এখানেই প্রাচীন কলিঙ্গ-শিল্পের উৎকর্ষ।

বলছিলাম উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির কথা! আজ এদের সে গৌরব আর নেই..., কিন্তু পরিসমাপ্তি যা আছে..., তাও কম বিস্ময়ের নয়!

উদয়গিরির গুহাগুলি বৌদ্ধ সাধকদের মঠরূপে ব্যবহৃত ছিল। এই গুম্ফাগুলির অভ্যন্তর ভাগে দেখা যায় একটি বড় বেদিকা হয় তো সাধকগণ এখানে নিদ্রা যেতেন। আর তার পাশে ছোট আর একটি বেদিকা আছে...; হয়তো তাঁদের সাধন পূজনের পুঁথি অথবা অনুরূপ প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যাদি রক্ষিত হত। গুম্ফাছাদের পালিভাষায় উৎ-কীর্ণ বৌদ্ধ ধর্ম্মমতগুলিও লক্ষ্যণীয় বিষয়। একটি গুম্ফাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক দুটি হস্তিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এ গুলির রচনা শৈলী এত উন্নত যে মনে হয় যেন প্রকৃতই দুটি হাতী দ্বারদেশে প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতটুকুও মলিন হয় নি..., যদিও মহাকাল দু'এক জায়গায় তার নিষ্ঠুর হাতের নির্ম্মম ছাপ রেখে গেছে। বৌদ্ধ-সাধকরা তাঁদের উপাসনার জন্য নিরিবিলি জায়গা বেছে নিলেও জনপদের খুব দূরে থাকতে চান নি। অথবা খণ্ডগিরি... যেখানে জৈন সাধকদের আবাসস্থল ছিল, তারই খুব কাছাকাছি বৌদ্ধ-ধর্ম্মমতের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য এই নির্জন পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত বলে বোধ করেছিলেন।

তখনো উড়িষ্যায় কেশরীবংশের দোর্দণ্ড প্রতাপ উদীয়মান সূর্য্যের দীপ্তিতে প্রকাশিত হয় নি। আজ থেকে হাজার বছরেরও আগে উড়িষ্যার জন-গণ-মনে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্যের জয়কেতন তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছিল। তখনো একাম্রক্ষেত্রে শিবের আগমন হয় নি। সন্ধ্যায় যখন উদয়গিরির বুক চিরে বৌদ্ধধর্ম্মের অভয়মন্ত্র শঙ্খনিনাদের সাথে ঘোষিত হত, পেছনের পাহাড় থেকে জৈন সাধকগণ হয়তো তখন তাঁদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে রত হতেন। হাজার বছরেরও আগে সেই

মিশ্রিত পদ। অধিকাংশই বাঙ্গালা শব্দ। সুতরাং এ পদ যে মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত নহে সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

লেখক নিজ লেখার মধ্যে যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন ডক্টর বিমান মজুমদার ও ডক্টর সুকুমার সেনের মত তুলিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু যে পদ তুলিয়া তিনি আপন মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই "শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল" পদটী কোথায় পাইলেন উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। এই পদটি আমারই সম্পাদিত বৈষ্ণবপদাবলীর ভূমিকায় আছে। পদটী আমারই সংগৃহীত, অন্যত্র কোথাও ছাপাও নাই। আমার নাম না করুন, আকর গ্রন্থের উল্লেখ করা উচিত ছিল। অন্য পদাংশও—

পাই পরমান্ন দীন অধমজন
ধনি ধনি কলি যুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভণ ঐ হে নিবেদন
রঘুনন্দন পদ দ্বন্দ্বে॥

পদটীও আমারই সংগৃহীত। বৈষ্ণব পদাবলী হইতেই এই পদাংশও লেখক লইয়াছেন। অথচ আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। গোপালবিজয় রচয়িতা কবিশেখর পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু রায়শেখর নিজের পদে কবিশেখর ভণিতাও দিয়াছেন। সুতরাং এই রায়শেখর ও কবিশেখর একই ব্যক্তি। শেখর, রায়শেখর, শেখর রায়, কবিশেখর ভণিতার পদগুলি আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। গোপালবিজয় প্রণেতার কোন পদ বিশাল পদাবলী সাহিত্যে আছে কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক।

গুজব*

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

জনশ্রুতি।
তোমার গতিরে করে পরাভব
অন্য কোন অশুভ শক্তির
সাধ্য নেই।
যত তুমি চল,
শক্তি তব বেড়ে বেড়ে যায়,
বেড়ে যায় বিস্তৃতি তোমার,
তোমার গতির সাথে।
প্রথমেতে কত ক্ষুদ্র তুমি
কত ভীরু।
তারপর অকস্মাৎ আকাশের পানে
উচ্চশির তুলি,
চল তুমি জনপদ দলি
মেঘেতে আবৃত করি
ভয়ঙ্কর জ্রূযুগল।

চঞ্চল চরণ তব
পক্ষে তব পবনের গতি।
শেষে ভীষণ দানব করে পরিধান
তোমার গলিত শব।
গাত্রেতে পালক তব
আর প্রতি পালকের মূলে
সব-দেখা চোখ,
উচ্চনাদী খল জিহ্বা,
অশ্লীল ওষ্ঠ নিম্নস্বর,
সর্বশ্রোতা কর্ণ সব,
জঘন্যতা আবিষ্কারে,
হানিকর অপরাধে,
অহর্নিশ লিপ্ত তুমি।
অথবা কখনও তোমার কথায়,
মিশাইয়া দাও কিছু যথার্থ সংবাদ।

[* Aenied—Book IV থেকে Theodore C. Williams কৃত ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে।]

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

শ্রীমতী সাধনা সেন

প্রাচীন একাম্রক্ষেত্র থেকে কিছুটা দূরে দুটো পরপর পাহাড় উঠে গেছে আকাশ ছুঁয়ে। এই পাহাড়ের বুকে প্রাচীন ভারতের যে অনুপম শিল্প-মাধুরী প্রস্ফুটিত রয়েছে, তা আজও পথিকের বিস্মিত দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করে। অতীত গৌরব এদের হয়তো অবলুপ্ত হয়েছে,—কিন্তু সেই গৌরবের অন্তরালে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে, তা অসামান্য, অতুলনীয়।

তখনো প্রাচীন উড়িষ্যাদেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর রীতিনীতির যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় নি। একাম্রক্ষেত্রের গগনচুম্বী বিরাট লিঙ্গমন্দির তখনো আত্ম-প্রকাশ করে নি। সেই সুদূর অতীতে সাধকরা ধর্ম্মতত্ত্বের য উপযোগিতা স্বীকার করে তাঁদের বসবাসের জন্যে মঠের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন—, তা শুধু নিছক তাঁদের তত্ত্বব্যাখ্যার নিকেতনই ছিল না অথবা ধর্ম্মসাধনার আবাস ছিলনা। ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম নীরস আলোচনাকে মনের মাধুরী দিয়ে নিঃশেষে বুঝি মিলিয়ে নেবার জন্যই এই পাহাড়দুটিকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। নীরস পাহাড়ের বুকে খনন কার্য্য দ্বারা যে রসানুভূতির উন্মেষ তাঁরা করে-ছিলেন, তার মধ্যে হয়তো নিহিত ছিল তাঁদের কঠিন কঠোরকে জয় করবার অভিযান। আর তাইতো দেখি কোন আলাদা পাথর নয়···, একই পাহাড়ের বুকে খোদাইকাজ চালিয়ে থাকবার যে আবাস ঘরের কল্পনা তারা করেছিলেন তাতে কোন স্তম্ভকে তাঁরা আলাদা এনে যোজনা করেন নি। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি এঁদের হাতে সমর্পণ করে এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মাণের ইংগিত দিয়েছেন···; এগুলি দেখে তাই মনে হয় যেন এরা প্রকৃতিদেবীরই লীলারসের সার্থক প্রসারণ। এখানেই প্রাচীন কলিঙ্গ-শিল্পের উৎকর্ষ।

বলছিলাম উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির কথা! আজ এদের সে গৌরব আর নেই···, কিন্তু পরিসমাপ্তি যা আছে·· তাও কম বিস্ময়ের নয়!

উদয়গিরির গুহাগুলি বৌদ্ধ সাধকদের মঠরূপে ব্যবহৃত ছিল। এই গুম্ফাগুলির অভ্যন্তর ভাগে দেখা যায় একটি বড় বেদিকা হয় তো সাধকগণ এখানে নিদ্রা যেতেন। আর তার পাশে ছোট আর একটি বেদিকা আছে···; হয়তো তাঁদের সাধন পূজনের পুঁথি অথবা অনুরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রক্ষিত হত। গুম্ফাছাদের পালিভাষায় উৎকীর্ণ বৌদ্ধ ধর্ম্মমতগুলিও লক্ষ্যণীয় বিষয়। একটি গুম্ফাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক দুটি হস্তিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এগুলির রচনা শৈলী এত উন্নত যে মনে হয় যেন প্রকৃতই দুটি হাতী দ্বারদেশে প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতটুকুও মলিন হয় নি···, যদিও মহাকাল দু'এক জায়গায় তার নিষ্ঠুর হাতের নির্ম্মম ছাপ রেখে গেছে। বৌদ্ধ-সাধকরা তাঁদের উপাসনার জন্য নিরিবিলি জায়গা বেছে নিলেও জনপদের খুব দূরে থাকতে চান নি। অথবা খণ্ডগিরি··· যেখানে জৈন সাধকদের আবাসস্থল ছিল, তারই খুব কাছাকাছি বৌদ্ধ-ধর্ম্মমতের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য এই নির্জন পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত বলে বোধ করেছিলেন।

তখনো উড়িষ্যায় কেশরীবংশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ উদীয়মান সূর্য্যের দীপ্তিতে প্রকাশিত হয় নি। আজ থেকে হাজার বছরেরও আগে উড়িষ্যার জন-গণ-মনে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্যের জয়কেতন তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছিল। তখনো একাম্রক্ষেত্রে শিবের আগমন হয় নি। সন্ধ্যায় যখন উদয়গিরির বুক চিরে বৌদ্ধধর্ম্মের অভয়মন্ত্র শঙ্খনিনাদের সাথে ঘোষিত হত, পেছনের পাহাড় থেকে জৈন সাধকগণ হয়তো তখন তাঁদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে রত হতেন। হাজার বছরেরও আগে সেই

সন্ধ্যামুখরিত হত দুই অহিংস সাধকের প্রেমমন্ত্রের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

এরপর ধীরে ধীরে পটপরিবর্ত্তন হয়েছে। কেশরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর তারই সাথে সাথে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মহাদেব। রাজতন্ত্র যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হল, জনমতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ হতাশা বয়ে আনল, ধীরে ধীরে যখন ভুবনেশ্বর ভারতজোড়া পুণ্যকামী ও তীর্থকামীদের বাসনা কামনা পরিপূরণের আশ্বাস নিয়ে এল, উদয়গিরিও তখন ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হতে লাগল। খণ্ডগিরির জৈনধর্ম্ম তো ইতিপূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্যই হয়েছিল।

আপন মহিমায় আপনি সমাহিত সেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবশেষে একদিন যেন সমাধি ক্ষেত্র থেকে সজীব হয়ে জেগে উঠল। বৌদ্ধসাধকরা প্রচার করলেন, জনমত যদি বৌদ্ধসংঘের কাছে তাদের সারা জীবনের সু অথবা কু কর্ম্মের স্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের কর্ম্মফল থেকে তারা অব্যাহতি পাবে। যারা এই প্রাচীন ধর্ম্মমতে আস্থাশীল ছিল, তাদের সংশয়ী মনের যন্ত্রণা গেল কেটে··· আর তাই দূর দূরান্ত থেকে এই মুক্তি কামীর দল আসতে লাগল উদয়গিরির সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাছে। তাঁরা জনগণকে দিলেন মালাজপের ব্যবস্থা···দিলেন নানারূপ তন্ত্রমন্ত্রের বিধান···, উদ্ভব হল গুরুবাদের। এইভাবে এক প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে অপর এক নতুন অমোঘ জালে জড়িয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সারল্য থেকে তাঁরা হলেন অপসৃত। ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা হল তান্ত্রিকতাবাদী বজ্রযানী সম্প্রদায়ের। আর সাথে সাথেই চলল বিবিধ অনুষ্ঠানের নানা বিচিত্র আয়োজন। অনুষ্ঠানের এই আয়োজন যতই বাড়তে লাগল, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সাথে ততই তার প্রভেদও রইল অতি অল্প। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গিয়ে আস্তানা পাতল এই সব বৌদ্ধ মঠধারীদের মাঝখানে। বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ হিন্দুকৌলতন্ত্রবাদের সাথে একই মর্যাদার আসন লাভ করল। ততদিনে তো বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে গণ্য হয়ে গিয়েছেনই। কাজেই উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি শৈলদেশে একে একে দু' একজন হিন্দু দেবতার আগমন হতে থাকল অনিবার্য্য ভাবেই। অনিবার্য্যভাবেই আজও এইসব গুম্ফাদেশে নানা বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি ভক্তের অনুলেপিত তেল ও সিঁদুরে রঞ্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে একদা যে শিল্প-সৌকর্য্য পাথরের গায়ে বৌদ্ধ শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছিলেন—আজ তাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের 'দেবদেবীত্ব' আরোপণ করে পাণ্ডাঠাকুর তার সারাদিনের রোজগারের হিসাব নিকাশ করতে ব্যস্ত।

একদিন ছিল যেদিন প্রাচীন কলিঙ্গে এমন কোন মন্দির বা মঠ ছিল না যেখানে এই পাহাড় দুটির পাথর কেটে না ব্যবহার করা হয়েছিল। আজ সেই মঠমন্দির সমৃদ্ধ প্রাচীন কলিঙ্গ আধুনিকতার অবগুণ্ঠন টেনে নতুন স্বপ্নের ইশারায় নবরূপায়ণে উন্মুখ। ধর্ম্মচেতনার স্বপ্নস্ত বিপ্লবী চিন্তাধারা আর্থিক সংকটের চাপে পড়ে বৃহৎশিল্প প্রসারণের উদ্ভাবনায় পরিবর্ত্তিত। তাই প্রস্তর শিল্পের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। লৌহদানব তার রথচক্রের নির্ম্মম ঘর্ঘর শব্দের পেষণে ললিতকলাকে নিষ্পেষিত করেছে বহু যুগ হল।

আজ তাই পরিত্যক্ত এই পাহাড় দুটির বিজন গিরি-গুহাগুলি অতীতকে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে আনতে চায়! প্রভাতী সূর্য্যের অরুণিম আশীষধারা যখন এই গুহাগুলিকে অনুরঞ্জিত করে, তখন সেই হাজার বছরেরও আগের সরল সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে যেন মুঠো মুঠো করে বর্ষণ করতে থাকে—; দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল ভাস্কর তার অনাবিল দীপ্তিময় তেজঃপ্রভা দিয়ে যেন এই শৈলশিখরের অনুপম মাধুর্য্যের অতীত গৌরবকে সুপ্রকাশ করে—; সন্ধ্যার অস্তাচলগামী সূর্য্যের নিভন্তলাল রশ্মিজাল যেন এই গুহাগুলির করুণ বিলুপ্তির খবর জানিয়ে যায়। আর তখনই মহান এক ধর্ম্মবোধের মহান এক অবলোপনের ইতিহাস বুকে বহন করে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি যেন রাতের আঁধারে নিঃসাম শূন্যতার মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে একেবারেই!!

চন্দ্র

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

লক্ষ বছর ধ'রে কি চন্দ্র,
লক্ষ হাজার বার
মোমের মতন নিজেরে গলায়ে
ধরোনি জ্যোৎস্না-ধার ?
কত প্রেমার্ত্ত ভীরু হৃদয়ের
তৃষিত আকাঙ্ক্ষার
তৃপ্তি সাধিতে, ধন্য করিতে
অনন্য অভিসার,
অলক্ষ্যে তুমি ধরিলে আলোক,—
তুলনা কি মেলে তা'র।

(২)

শঙ্কিত পথে অঙ্কিত করি'
আল্পনা অভিরাম,
ধন্য করিয়া কত না প্রেমের
পুণ্য-তীর্থ-ধাম,
সমপ্রাণতায় পূর্ণ করিয়া
কত দক্ষিণ—বাম,
সার্থক ক'রে তুলিলে লুব্ধ
ক্ষুব্ধ মনস্কাম ;
ভাবিতেও তাই বিস্মিত হই
তোমার সে গুণগ্রাম।

(৩)

থকিত পথের বাঁকে বাঁকে তুমি
চকিতে দিয়েছ দেখা,
পাছে ভীরু প্রেম ভীত হয় যেতে
অভিসারে একা একা।
কোথাও আদিম ছায়া-মায়া-ভরা
নিভৃত পথের রেখা
আপন প্রাণের পিপাসা ঢালিয়া
ভ'রলে ইন্দুলেখা ;
তুমি ছাড়া আর কা'র কাছে যাবে
অভিসার-পাঠ শেখা !

(৪)

পুরাণে পুরাণে সে পুরাণো-প্রেম
ছড়ানো গল্পাকারে ;
কত প্রেম-তরী ভাসাতে শিখালে
মহাপ্রেম পারাবারে।
উচ্ছ্বাসে-ভরা শত নদী-ধারা
ঘর-ছাড়া শত ধারে
ভাঙিয়া পড়িতে হেরিলে চন্দ্র ;
লক্ষ প্রাণের তারে
যে গান বেজেছে, পৌঁছে দিলে তা'
লক্ষ গোপন-দ্বারে।

(৫)

বসোরা গোলাপ ফুলের মতই
সুগন্ধে ভুরভুর
কত প্রেম-ফুল ফুটালে নীরবে ;
এখনো পৃথ্বী-পুর
তা'রই সুধা-বাসে অর্বুদ প্রাণ
করিছে যে নেশাতুর।
কত নিকটের সাথে তব টানে
মিশিল কত না দূর !—
মানুষ থাকে না, বেঁচে আছে তা'র
কোটি কোটি স্মৃতি-সুর।

(৬)

নোতুন মানুষ ঘর বাঁধে আজও,—
ঘর ভাঙে কত বার,
তুমি শুধু চাঁদ, অযুত বছর
রহিলে সাক্ষী তা'র।
হেথা আদি নাই, অন্ত কি আছে
কামনার—বাসনার !
উথাল পাতাল মাতাল নিত্য
চিত্তের পারাবার ;
গভীরতা তা'র মাপিতে কে পারে
তুমি ছাড়া হেথা আর !
দুনিয়ার লীলা জ্যোৎস্না মাখায়ে
কর বুঝি একাকার ?
তাই কি কেবল হাতাড়িয়া ফিরি
অনাদি অন্ধকার ?
বলো না চন্দ্র, কবে খুলে দেবে
হাজার যুগের দ্বার !
প্রেমের পূজায় নিয়ে যাবো সেথা
পরাণের উপহার।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নীলকান্ত আবার শুরু করলেন, 'শেষ পর্যন্ত রক্ত, অশ্রু, প্রাণবলি এবং দেশভাগের চরম মূল্যে স্বাধীনতা এল। অবশ্য দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে তার রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ আসুক, এ আমি চাই নি। এতে আমার সায়ও ছিল না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে যে প্রাপ্তি তার মধ্যে সাময়িক সুখ থাকতে পারে কিন্তু চিরন্তন আনন্দ অসম্ভব। তার ভেতর অনেক ফাঁক থেকে যায়।' একটু থেমে কি একটু চিন্তা করে বলতে লাগলেন, 'জানো লাহিড়ী, এ ব্যাপারে আমার একটা কথা মনে পড়েছে।'

'কী কথা?' জিজ্ঞাসু চোখে দীপেন তাকাল।

'তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে?'

দীপেন অবাক। যে প্রশ্নের উত্তর একটি শিশুও দিতে পারে হঠাৎ তা জিজ্ঞেস করার অর্থ কী? বিমূঢ়ের মত সে বলল, উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট।

নীলকান্ত হঠাৎ যেন দূরমনস্ক হয়ে গেলেন, 'উনিশ শ সাতচল্লিশের জানুয়ারীতে দেশবরেণ্য এক নেতা এই বোম্বাই শহরের ক্রশ অথবা আজাদ ময়দানে একটা জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম; শুধু বসেই থাকি নি। আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। যাই হোক, সেই বিখ্যাত জননায়ক কি বলেছিলেন জানো—'

'কী?'

'মুসলিম লীগ যতই স্বপ্ন দেখুক, এক বছর দু-বছর কেন হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও ভারতবর্ষকে ভাগ করা যাবে না। আমিও প্রাণ ভরে তাতে সায় দিয়েছিলাম। কিন্তু জাতির এমন দুর্ভাগ্য মাত্র ছ'টা মাস পার হতে না হতেই দেশ দু-টুকরো হয়ে গেলো। আর টুকরো হল কিনা সেই ঘৃণ্য দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। চিরদিন দেশের অধিকাংশ মানুষ যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে ঘৃণা করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তারই ফাঁকে পা দিলেন। আশ্চর্য, আশ্চর্য!' নীলকান্তর চোখ-মুখ এবং কণ্ঠস্বর বিমর্ষ হয়ে এল।

দীপেন চুপ। দেশভাগের মূল্যে স্বাধীনতা এসেছে, এটুকুই তার জানা। এর বাইরে আর কোন তাৎপর্যময় খবর সে রাখে নি। রাখার মত মানসিক গঠন তার নয়। রাজনীতির সামান্য একটু ইঙ্গিতে কোথায় তরঙ্গ উঠল, সারা দেশের মর্মমূল কোথায় দুলে উঠল, এত সব জটিলতা দিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলা দীপেনের পক্ষে অর্থহীন। ভাল একটি চাকরি, মসৃন নিশ্চিন্ত জীবন—এর বাইরের আর সমস্ত কিছুই অপরিচিত।

নিজের আবেগেই নীলকান্ত বলে যেতে লাগলেন, 'নেতাদের আর সবুর সইল না, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করলে, আমার ধারণা, দেশভাগটা এড়ানো সম্ভব হত। সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারের পর ব্রিটিশ তার নিজের ঘর

সামলাতেই ব্যস্ত। জার্মান বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত তার দেশের সামনে তখন পুনর্গঠনের প্রশ্ন; চূর্ণ বিচূর্ণ অস্তিত্বকে নতুন করে জোড়া লাগিয়ে আবার তাকে মাথা তুলতে হবে। সেই অবস্থায় হাজার হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষের মত বিশাল কলোনি হাতে রাখা সম্ভব নয়। এমনিই তাকে ছেড়ে চলে যেতে হত বলেই আমার বিশ্বাস। নেতারা তাড়াহুড়ো করার ফলে দেশটা মাঝখান থেকে চিরদিনের মত টুকরো হয়ে গেল। অথচ এ আমরা চাই নি। সম্ভবত যাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তিতে সই দিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও একদিন ও জিনিস চাননি।'

একটু চুপ করলেন নীলকান্ত। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে অস্থির উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। খানিক পর দীপেনের দিকে ফিরে আবার আরম্ভ করলেন, 'দেশভাগের পরিণাম কি হল? পাঞ্জাবে তো একরকম উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলাদেশে? সামগ্রিকভাবে নিজেকে যদি ভারতীয় মনে করি তা হলে কি দেখতে পাব বাঙলায়? ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রাণবন্ত অংশ হচ্ছে বাঙলাদেশ। স্বাধীনতার মন্ত্র সেখান থেকেই ভারতবর্ষ প্রথম পেয়েছিল, বাঙলাদেশই দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য সব চাইতে বেশি মূল্য কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে?'

দীপেন তাকিয়েই আছে।

নীলকান্তকে যেন কথায় পেয়েছে। তিনি সমানে বলে যাচ্ছেন, 'দেশভাগের পর কত বছর তো কেটে গেল কিন্তু সীমান্তের ওপার থেকে উদ্বাস্তু আসার বিরাম নেই; তারা আসছেই, আসছেই। উনিশ শ বাহান্নতে শেষবারের মত আমি কলকাতায় একটা কাজে গিয়েছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় আর শিয়ালদা স্টেশনে দেখেছি শুধু পূর্ববাঙলার রিফিউজি। এখনকার কথা অবশ্য বলতে পারব না।'

দীপেন এতক্ষণে মুখ খুলল, 'এখনও সেই একই অবস্থা।'

'কতকাল ধরে দেশভাগের প্রায়শ্চিত্ত যে এ জাতিকে করে যেতে হবে! একজন দু-জন করে না এসে যদি ওপার থেকে সব হিন্দু একসঙ্গে চলে আসত! স্বাধীনতায় বাঙলাদেশ মূল্য দিয়েছে সব চাইতে বেশি, এ কথা সত্যি। কিন্তু পূর্ববাঙলার হিন্দুরা যা দিয়েছে তার তুলনা নেই।' নীলকান্তর বুকের অতল স্তর ঠেলে ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

নীলকান্তর বেদনা যে আন্তরিক এবং গভীর সঞ্চারী তা বুঝতে অসুবিধে হল না দীপেনের। কলকাতায় থাকতে রাস্তায় রাস্তায় অর্ধ উলঙ্গ শীর্ণদেহ মানুষের মিছিল দেখেছে। সম্পূর্ণ মানুষ নয়; মানবতার সেই ধ্বংসাবশেষ অথবা ভগ্নাংশগুলোকে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়েছে দীপেন, ক্ষিপ্ত হয়েছে, ভ্রূ কুঁচকে গেছে তার। সীমান্তের ওপার থেকে এই মানুষগুলো এসে কলকাতাকে ভিকিরি আর মিছিলে ভরে দিয়েছে এবং সেখানকার আবহাওয়াকে নরক করে তুলেছে বলে দীপেনের অভিযোগের অন্ত ছিল না। কিন্তু কলকাতা থেকে বার শ' মাইল দূরে একজন অবাঙালীর সহানুভূতি, বেদনা, দুঃখ নতুন করে তার চোখ খুলে দিয়েছে যেন। ঘৃণিত কুৎসিত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মূল্য অন্যভাবে কষে দেখতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই মানুষগুলি তো এমনি এমনি আসে নি; এদেরও তো জন্মভূমি ছিল; নিভৃত ছায়া তরুর তলায় ছিল একটি করে স্নিগ্ধ শান্ত সংসার। হয়ত সে সংসারে পরিপূর্ণতা ছিল, সচ্ছলতা সেখানে উছলে উছলে পড়ত। তবে সব ফেলে, সাতপুরুষের ঠিকানা খুইয়ে কেন তারা চলে এসেছে? একটা জাতি যে ভিক্ষুক আর গণিকায় পরিণত হয়েছে, তার জন্য দায়ী কে? এ সব কথা ভেবে দেখতে হবে। দীপেনের মনে হল অনেক কিছুই সে জানে না। ছেলেবেলা থেকে যৌবনের এই মধ্যপ্রহর পর্যন্ত জীবনকে যেটুকু সে জেনেছে তা বোধহয় অসম্পূর্ণ, জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক জ্ঞান তার দরকার।

কতক্ষণ এক নতুন অভাবিত ভাবনার তরঙ্গে ভেসে ছিল, দীপেনের খেয়াল নেই। একসময় নীলকান্তর গলা আবার শোনা গেল। চমকে মুখ তুলল দীপেন।

নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'যত অনিচ্ছাই থাক, দেশভাগকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হল। ভাবলাম, যে ভাবেই হোক স্বাধীনতা তো এসেছে। ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। উনিশ শ' সাতচল্লিশের আগে জাতির সামনে একটা মাত্রই লক্ষ্য ছিল। সেটা স্বাধীনতা। যে কোন উপায়ে লক্ষ্যে

পৌঁছানোই ছিল জীবনের উদ্দেশ্য। সাতচল্লিশের পনেরই আগষ্টের পর আমাদের দায়িত্ব গেল হাজার গুণ বেড়ে। যে দুর্লভ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি প্রথমত তা রক্ষা করতে হবে। তার চাইতেও বড় দায়িত্ব জাতি গঠন। দু' শ বছর আমরা পদানত হয়েছিলাম, কলোনিয়ালিজমের অভিশাপ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। তা ছাড়া হীনম্মন্যতা ক্রীতদাস-মনোভাব—এ সব তো আছেই। জাতির জীবন থেকে এ সব উৎখাত করে সুখী, সমৃদ্ধ, অভিযোগহীন শোষণবিহীন এক আদর্শ দেশ গড়ে তুলতে হবে।

বলতে বলতে নীলকান্ত আবেগের স্রোতে ভেসে যেতে লাগলেন, 'বার বার আমাদের নেতারা বিভিন্ন অধিবেশনে যে প্রস্তাব পাশ করেছেন যে স্বপ্ন দেখেছেন, দেশকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাকে রূপ দিতে হবে। এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে বৈষম্য নেই, মানুষ সেখানে মানুষের মর্যাদা পাবে, না খেয়ে কেউ মরবে না, দেশের সমস্ত সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা হবে, অর্থের ব্যাপারে মানুষে মানুষে তারতম্য থাকবে না যাতে ক্ষোভ আর উত্তাপ বাড়তে পারে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিল দীপেন। বাবা সুধাময় লাহিড়ী তার সমস্ত চরিত্র এবং মানসিক গঠন 'কেওটিরাজেমের' বিচিত্র ছাঁচে ঢালাই করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে সে কথা যেন বিস্মৃত হয়ে গেল সে। নীলকান্তর কথাগুলো এমন গভীর সঞ্চারী, তাঁর প্রভাব এত অমোঘ যে জগতের আর কিছুই এখন মনে পড়ছে না। শুধু সম্মোহিতের মত আচ্ছন্ন সত্তা নিয়ে তাঁর কথা শুনে যেতে ইচ্ছে করছে।

দীপেনের মনে হতে লাগল, নীলকান্ত যেন নামে একটি মানুষ নয়, সমুদ্র বা অন্তহীন পর্বতের মত এক বিশাল প্রাকৃতিক বিস্ময়ের কাছে এসে সে বসেছে। তাঁর মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর বুঝি কিছুই করণীয় নেই। নীলকান্তর ব্যক্তিত্ব, কথা বলার মনোরম ভঙ্গি, দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা এবং দায়িত্ববোধ—সব একাকার হয়ে তার সমস্ত দায়িত্বকে গ্রাস করে ফেলছে।

নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'স্বাধীনতার আগে সারা দেশ জুড়ে ছিল মাতামাতির হাওয়া; স্বাধীনতার পর আমাদের আত্মস্থ হবার পালা এল। স্থির স্থিতধী হয়ে এবার এতদিনের স্বপ্নকে রূপায়িত করতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো লাহিড়ী, কিছুদিন আগেও আমাদের এই মহারাষ্ট্র আর গুজরাট নিয়ে ছিল বোম্বাই প্রদেশ।'

'আমি, জানি—' দীপেন মাথা নাড়ল।

'স্বাধীনতার পর বোম্বাই প্রভিন্স প্রথম যে মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছিল তাতে আমার ডাক পড়েছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও আমাকে দেওয়া হবে। প্রথমটা লোভ যে হয় নি তা বলতে পারি নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দমন করতে পেরেছিলাম। আমার বিশ্বাস—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থামলেন নীলকান্ত।

দীপেন কিছু বলল না; তাকিয়েই রইল। নীলকান্তকে কিছু বলার প্রয়োজনও নেই। আপন আবেগেই তিনি বলে যাবেন। দীপেন জানে এই বাড়িটার ভেতর বহু কাল নির্বাসিত হয়ে আছেন নীলকান্ত। এখানে তাঁর সঙ্গী নেই, স্বজন নেই, কেউ নেই। দীর্ঘ একাকিত্বের মধ্যে কারোকে ডেকে যে কথা বলবেন তেমন একটি মানুষকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে নিতান্তই সঙ্গীহীন শব্দহীন নিরুৎসব দিনযাপন। এতকাল পর দীপেনকে হাতের কাছে পেয়ে বুকের ভেতরকার একটা মরচে পড়া বন্ধ দুয়ার যেন খুলে গেছে। তার মধ্য দিয়ে এতকালের জমানো কথাগুলি ঢলের মত, স্রোতের মত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এতো আর দীপেনকে বলা নয়। দীপেনকে সামনে বসিয়ে নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলে যাচ্ছেন নীলকান্ত; বুকের ভেতরকার যত অভিযোগ যত পাষাণভার, সব নামিয়ে দিচ্ছেন।

নীলকান্ত আবার শুরু করলেন, 'আমার বিশ্বাস মন্ত্রী হয়ে শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে দেশকে আমি যতখানি সেবা করতে পারব, তার চাইতে অনেক বেশি পারব বাইরে থেকে। আমাদের এই দেশ দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে থেকে বিচিত্র এক জড়তায় ভুগছে। তা ছাড়া অধিকাংশ মানুষেরই শিক্ষা দীক্ষা নেই; সেই অন্ধকারে আলো জ্বালতে হবে। সাতচল্লিশের পনেরই আগস্টের পর যে নতুন জীবন-বোধ জাগ্রত হওয়া উচিত তাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। আমি ছুটতে লাগলাম কখনও

গ্রামে, কখনও সহরে, কখনও কুটিরে, কখনও বা বস্তিতে। কৃষানী থেকে শ্রমিক—সবার কাছে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। এতেই ছিল আমার আনন্দ, আমার তৃপ্তি।

'স্বাধীন হলাম, দেশের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে চলে এল। ব্যাস্, অমনি স্বর্গ নেমে এল! কিন্তু তা তো নয়, যাদের নিয়ে দেশ সেই সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশার শরিক হতে হবে। তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে হবে। যাকে বলে 'জন-সংযোগ' সেটা না থাকলে দেশকে সুখী করা যায় না।'

বলতে বলতে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন নীলকান্ত, 'ঐ দেখ, আমি শুধু বক্তৃতাই করে যাচ্ছি; এ সব নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগছে না। ভারি নীরস, না?'

'না-না, বেশ ভাল লাগছে। আপনি বলে যান।' দীপেন মাথা নাড়ল।

নীলকান্ত অবাক হবার ভঙ্গি করলেন, 'ভাল লাগছে! বলো কি হে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে শোন।' নীলকান্ত আবার ঘোরের জগতে ফিরে গেলেন। 'আমি যা করছিলাম তার ফল ভালই হচ্ছিল। নতুন শাসকদের সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে প্রথম দিকে খানিক অনিশ্চয়তা ছিল; আমার এবং আমার সহকর্মীদের জন-সংযোগের ফলে নতুন গভর্ণমেণ্টের ওপর ধীরে ধীরে আস্থা আসছিল। তুমি নিশ্চয়ই জানো লাহিড়ী আমাদের এই দেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যে রাজনৈতিক দল দেশের সর্বাধিক মানুষের সমর্থন পায় তাদের হাতেই গভর্ণমেণ্ট চালাবার অধিকার আসে।'

'ও সব কথা তো জানি।'

'জানো যে তা কি আর আমি জানি না? আমার বক্তব্য হচ্ছে দলের একাংশ যখন শাসন চালাবে, আরেক অংশ জনসাধারণের কাছাকাছি থেকে সংগঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাবে। এবং দুই অংশের মধ্যে সংহতিও রাখতে হবে। যারা কৃষাণগ্রাম থেকে শ্রমিকবস্তি পর্যন্ত ঘুরবে তারা দেশের মর্মমূলের খবর যেমন রাখতে পারবে তেমনটি আর কার পক্ষে রাখা সম্ভব? সেই সব ভ্রাম্যমাণ কর্মীরা এসে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কর্মীদের দেশের হৃদস্পন্দনের খবর এনে দেবে। সেই অনুযায়ী চলতি শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা সংস্কার ঘটানো যেতে পারে। এতে জন সাধারণেরও লাভ, দলেরও লাভ।'

'এ তো চমৎকার ব্যবস্থা।'

'হ্যাঁ।' নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'এইভাবে কয়েকটা বছর কেটে গেল। বোম্বাইয়ের প্রভিন্সিয়াল পার্টি, গভর্ণমেণ্ট এবং সাধারণ মানুষ সর্বত্র তখন আমার নাম। আমার নাম এই প্রদেশের ঘরে ঘরে। লোকের অফুরন্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি স্নেহ এবং ভালবাসা তখন অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। আমাকে ছাড়া এই অঙ্গরাজ্যের তখন সমস্ত কিছুই অচল। এই যে বাড়িতে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছ, এমন একটা দিন গেছে, যখন এর সামনে সারি সারি গাড়ির মেলা লেগে থাকত। গ্রামে গ্রামে কি শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে এখানে ফিরে আসতে না আসতেই ভিড় লেগে যেত। সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত্তির, সবসময় লোক আসছেই, আসছেই, আসছেই। বিশ্বাস করো লাহিড়ী, তখন সারা দিনে একটুকু বিশ্রাম পেতাম না; দু ঘণ্টার বেশি ঘুম ছিল না। তবু একটুকু ক্লান্তিবোধ করতাম না। দিনগুলো বিচিত্র এক নেশার মধ্যে কেটে যাচ্ছিল।' এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন নীলকান্ত। খানিক অন্যমনস্কও হয়ে পড়লেন। হয়ত, সুখ আর সাধের সেই স্বপ্নময় দিনগুলির ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

দীপেন চুপ করে রইল। শব্দ করে নীলকান্তর ধ্যান ভাঙাতে তার ইচ্ছা হল না।

একটু পর নীলকান্তই নীরবতা ভাঙলেন। বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'সেদিন আমাকে ঘিরে এত মানুষ, এত জনতা, এত উচ্ছ্বাস আর আজ? আজ পাশে কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে আমি একেবারে একা; ছায়াবাজির মত চারপাশ থেকে সব মিলিয়ে গেছে।' একটু চুপ করে আবার, 'যাক গে ও কথা। ক'টা বছর তো ভালই কাটল; তারপর দেখলাম আস্তে আস্তে কেমন যেন সব বদলে যেতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার আগে যে-দেশকর্মীরা ছিলেন, স্বাধীনতার পর তাঁদের পাশে নতুন দেশকর্মীরা দেখা দিতে লাগলেন। প্রাচীনেরা চিরদিন ঘাঁটি আগলে থাকবে, তা তো আর হয় না। নতুন মুখ, নতুন রক্ত, নতুন যৌবনকে দেশের

স্বার্থে নিয়ে আসতেই হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।'

'কী ব্যাপার?'

'স্বাধীনতার আগের দেশকর্মীদের মধ্যে সবারই কিছু কিছু ত্যাগ ছিল; সবাইকেই কমবেশী নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যারা দেশসেবায় নাম লেখাল তাদের বেশির ভাগই পাকা সোনা নয়; আদর্শের খাতিরেও তারা আসেনি। নতুন কর্মীদের অধিকাংশই এসেছে স্বার্থের সন্ধানে। আরো একটা দিকও লক্ষ্য করেছি।'

'কোন দিক?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল দীপেন।

ক্রমশঃ

তপস্যা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

আধুনিক যুগ থেকে গেলাম পিছিয়ে
ইতিহাস যা মানে না, যা জানে না সেই যুগে।
অনেক দেশ অনেক সাগর-নদী পার হলাম,
কত পায়গপুরীর নিঝুম দ্বারে দাঁড়ালাম,
পায়ের তলে পেলাম হারাণো সভ্যতার পথ,
মানুষের আদিম চলার পথ।
ধরিত্রী হেসে বলে: কার জন্যে তোমার এ ফিরে আসা?
আমি বলি: নারীকে পাবার জন্যে।
ধরিত্রী বলে: এ আকাঙ্ক্ষা যে যুগ যুগান্তের,
এ তপস্যা যে চিরন্তনী।
চলল আমার তপস্যা!
তপস্যা সার্থক হোল, যখন নারীরা এসে দাঁড়াল
কেউ জননী হয়ে, কেউ ভগ্নী হয়ে, কেউ প্রেয়সী হয়ে।
কেউ হোল বান্ধবী, কেউ অবগুন্ঠনা।
কিন্তু কোথায় সেই নারী, যার জন্যে আমার এ তপস্যা?
নিদাঘের তাম্রনীল আকাশে বাজল দামামা,
নেমে এল কালো মেঘের মিছিলে প্রাবৃট্।
শেষে একদিন আকাশ স্নিগ্ধ হোল শরতে;
হেমন্তের সবুজ ছায়া লাগল মনে ও বনে,
কুয়াশার স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়াল শীতের আকাশ,
ফুলে ফুলে দুলে উঠল বসন্তের উত্তরী।
তবুও চলল আমার তপস্যা।
কিন্তু সত্যটা ধরা পড়ল একদিন।
ওদের আড়ালেই বুঝি লুকিয়ে থাকে চিরন্তনী নারী,
তাই ওরা মুগ্ধ করে আমার মন।
ধরিত্রীরে বলি: দাও না তাকে চিনিয়ে।
ধরিত্রী হেসে বলে: সে তোমার অন্তরেই থাকে,
শুধু তাকে চিনতে পার নি এতদিন।
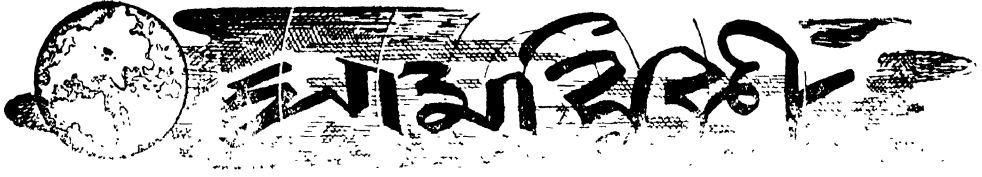
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়সে প্রাচীন হইলেও আজ পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সকলের নিকট অধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। গত ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীএম সি শীতলাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি বাংলা দেশকে সারা ভারতের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য এককালে বাঙালীর গৌরব তাহাকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। শ্রীশীতলবাদের কথা শুনিয়া বাঙালী আজ আর আনন্দ লাভ করিতে পারে না। যে কারণেই হোক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙালী আজ ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের হৃদয় ও মস্তিষ্কের কাছে পরাজিত হইতেছে। বর্তমান যুগের বাঙালী তরুণগণকে এই কথা মনে রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই কথাটি জাতিগত ভাবে বিচার না করিয়া আজ যদি প্রত্যেক বাঙালী ব্যক্তিগতভাবে বিচার করেন ও প্রতিকারে মনোযোগী হন তাহা হইলে হয়ত কিছু কাজ হইতে পারে। আমরা শ্রীশীতলাবাদের এই প্রশংসার তারিফ করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তরুণগণকে বলিব সত্যই তাঁহারা বাংলার গৌরব রক্ষায় মনোযোগী হইবেন। এই প্রসঙ্গে সমাবর্তন ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শ্রীমতী গান্ধী যাহা বলিয়াছেন তাহাও সকলের চিন্তনীয় বিষয়। গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের আর যাহাই শিক্ষা দিয়া থাকুক না কেন মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযুক্ত উপায় শিক্ষাদান করে নাই। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সেজন্য কাহারও গৌরববোধ করিবার কিছু নাই। দেশে কয়টি প্রকৃত মানুষ তৈয়ার হইয়াছে তাহার হিসাব আজ সকলের করা প্রয়োজন। শ্রীমতী ইন্দিরা যে এই আসল কথাটির প্রতি জোর দিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই। সমাবর্তন উৎসবে বাংলার দুইজন মনীষী সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি দেশীকোত্তম লাভ করিয়াছেন। একজন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয়জন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। তাঁহাদের সম্মান দান করিয়া বিশ্বভারতীই সম্মানিত হইয়াছেন।

খাদ্যাবস্থার অবনতি—

নূতন ইংরাজী বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বেই সর্বত্র খাদ্যাবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৬৬ সালের শেষ দুই সপ্তাহ কলিকাতা ও সহরতলীর লোক মোটেই চাল পায় নাই। পূর্বে চাল ও গম মিলিয়া প্রতি সপ্তাহে দুই কিলো করিয়া পাওয়া যাইত। তাহা কমাইয়া পৌনে দুই কিলো করা হইয়াছে। রেশনে চাল দেওয়া বন্ধ করায় গ্রামাঞ্চল হইতে যে চাল পাওয়া যাইত তাহার দামও প্রতি কিলো দুই টাকার বেশী হইয়াছে। এই খাদ্যাভাবের জন্য স্বাধীন ভারতের শাসকবৃন্দ মুখ্যতঃ দায়ী। যাঁহারা কুড়ি বৎসর শাসন ব্যবস্থা চালাইয়াও মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য সরবরাহ করিতে পারেন না তাঁহাদের কার্য্যের কেহই প্রশংসা করিবে না। ভারতবর্ষে চাষ যোগ্য জমির অভাব নাই। মানুষের সংখ্যাতো গত ২০ বৎসরে শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। বড় বড় পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণেরও শেষ নাই। কিন্তু ঐ সকল পরিকল্পনার টাকা যদি সাধারণ মানুষকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে না দেয় তাহা হইলে পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায়? সকল দিক দিয়া সাধারণ মানুষের মনে হতাশার ভাব আসিয়াছে। মুখে যতই ধন তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কথা বলা হউক না কেন ভারতের সকল অর্থ মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে চলিয়া

গিয়াছে এবং দেশের বর্তমান পরিচালকগণ তাহাদের হাতের পুতুলের মত খেলা করিতেছেন। আজ যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সংখ্যা গরিষ্ঠ দল কংগ্রেসের সমর্থক তাঁহাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। কিন্তু কেহই অপরের কথা চিন্তা করেন না।

কৃষিতে মনোযোগ দান—

দেশে এমন একটা অবস্থা আসিয়াছে যখন সকল লোক অল্প পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। সেজন্য যাহারা পূর্বে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহারা প্রায় সকলেই তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবার জন্য ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাহার ফলে কৃষিকার্য্য অবহেলিত হইতেছে। আমাদের সরকারও ব্যবসায়ের পরিকল্পনা ও বিস্তৃতির জন্য যেরূপ আগ্রহশীল কৃষির সম্প্রসারণে ততটা আগ্রহশীল নহেন। তবে সম্প্রতি সংবাদপত্র সমূহে কৃষি সম্বন্ধে নানারূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে এবং সরকারও যাহাতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সেবিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা এমন জটিলতাপূর্ণ যে কৃষিবিষয়ে সরকারী দপ্তরখানায় বসিয়া যাহা বলা হয় তাহা কার্য্যে কখনই পরিণত করা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেমন খরা অঞ্চলকে সাহায্য দানের জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া চাল গম সংগ্রহ করিতেছেন তেমনি যদি নিজে এবং মন্ত্রীসভার সকল সদস্যগণকে নিজ নিজ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাইয়া কৃষি সম্বন্ধে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে খাদ্য সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইত। নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের লোক কৃষি বিমুখ হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে সরকারী উৎসাহের অভাব তাহার প্রধানতম কারণ। বেতনভুক সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। দেশহিতকামী প্রচারকের দল যদি সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত নির্দ্দেশ লাভ করিয়া কৃষকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন তবেই কিছু কাজ হইবে। বীজ বিতরণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটী দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি। সরকারী টাকা খরচ হয় বটে কিন্তু কাজ কিছুই হয় না। আমরা বিষয়টির উল্লেখ করিলাম মাত্র ; এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপযুক্ত কার্য্যক্রম স্থির করিতে হইবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—

কি করিয়া কলিকাতা ও সহরতলীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা যায় তাহা আজ সকলের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে খরার জন্য দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দলে দলে মানুষ ঐসকল স্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। তাহারা অনেক সময় ট্রেন বা বাসের অপেক্ষা করে না, পায়ে হাঁটিয়া শত শত মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে। বাহিরের অশিক্ষিত জনসাধারণের ধারণা কলিকাতা বা সহরতলীতে যাইলেই কোন না কোন কাজ মিলিবে এবং খাইতে পাওয়া যাইবে। এই ধারণায় এঅঞ্চলের অবস্থা দিন দিন সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। গত একশত বৎসর ধরিয়া এখানে যে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ফলে এ অঞ্চলে বাঙালী অপেক্ষা অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। দেশ বিভাগের ফলে যে কোটি কোটি পূর্ববঙ্গ অধিবাসী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে তাহাদিগকেও পশ্চিমবঙ্গের লোক সাদরে স্থান দিয়াছে। কিন্তু অবাঙালীর দল কিছুতেই নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়া মনে করে না এবং পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। একশত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন এমন অবাঙালীর সংখ্যা কম নহে। কিন্তু তাঁহারাও পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হইবে কে জানে!

দেশ বিভাগের পরেও হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হয় নাই। যে সব অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সে সকল স্থানের হিন্দু প্রাধান্য নাই। বাঙালী অবাঙালীর সমস্যা তো আরও জটিল। সর্বশেষে "ঘটি" "বাঙাল" সমস্যা যে একেবারে নাই তাহাও নহে। এইরূপ অন্তর্বিরোধের ফলে দেশের অগ্রগতি সর্বদা ব্যাহত হইতেছে। পথ-ঘাট, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারে আমরা জনহিতের কথা চিন্তা না করিয়া সাম্প্রদায়িকতার কথা অধিক ভাবিয়া থাকি। সকল দিক দেখিয়া সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়।

পুলিশি ব্যবস্থার পরিবর্তন—

শ্রীওয়াই, বি, চ্যবন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর একটি বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তনের জন্য

সচেষ্ট হইয়াছেন। শ্রমিক ধর্মঘট ছাত্রধর্মঘট, প্রভৃতির ফলে দেশে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি যে অত্যাবশ্যক সে কথা সকল শাসক কর্তৃপক্ষই স্বীকার করিবেন। কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বাড়াইয়া কোন দেশের শান্তি রক্ষা করা যায় না। শ্রীচ্যবন সে কথা চিন্তা করিয়া সরকারী পুলিশের সহিত বে-সরকারী লোকদিগকে এক যোগে কাজ করাইবার জন্য চেষ্ট করিতেছেন যেমন যুদ্ধের প্রয়োজনে সৈন্যদলের সহিত সাধারণ মানুষকে একযোগে কাজ করিতে হয় এবং সেই জন্য সকল সভ্যদেশে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় তেমনি পুলিশকে সকলকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য হোম গার্ড এন, সি, সি, প্রভৃতির মত আরও ব্যাপক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজন। ঐ সকল বেসরকারী লোকদিগকে বৎসরে অন্ততঃ একমাস নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ ছাড়িয়া পুলিশের কাজ শিক্ষা করিতে হইবে ও তাহার মহড়া দিতে হইবে। তাহার পর প্রয়োজন মত তাহারা পুলিশকে সকলকার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। একটি থানায় যেমন এক শত কনস্টেবল রাখা হয়, তেমনি যদি আরও কয়েকশত বেসরকারী পুলিশকে শিক্ষিত রাখা যায় তাহা হইলে প্রয়োজনের সময় কখনও লোকের অভাব হইবে না এবং সরকারী ব্যয়ও কম হইবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যকরী হয় সকলের সেজন্য অবহিত হওয়া উচিত।

কংসাবতী পরিকল্পনা—

প্রায় সমগ্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার একটি বড় অংশ জলাভাবে চাষের কাজ করিতে পারে না। ফলে ঐ জেলাগুলিতে বহু পতিত জমি দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে কংসাবতী নামক একটি নদী আছে। বর্ষাকালে নদীর জলে মাঠগুলি ডুবিয়া যায়, এবং বর্ষার পরে ৭।৮ মাস জলাভাবে সে সকল জমিতে চাষ হয় না। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য কয় বৎসর পূর্বে সরকার কংসাবতী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৪।৫ বৎসর কাজের পর এখন শুনা যাইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য বন্ধ করায় কংসাবতী পরিকল্পনার কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহারা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ঐ সকল অঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন পরিকল্পনার ব্যবস্থা ছাড়া ঐ অঞ্চলের কৃষিকার্য্য ভালভাবে চালাইতে হইলে বার মাস জলসরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। অসংখ্য খাল কাটিয়া জলের ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি অর্থ সাহায্য না করেন তাহা হইলে কি করিয়া তাহা করা সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস ভুল বোঝাবুঝির ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের লোকসভার সদস্যগণ এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিলে কংসাবতীর কাজের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

কোলাঘাটে নূতন পুল—

১৯৬৯ সালে কলিকাতা হইতে হলদিয়া পর্যান্ত রেল নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে। পাঁশকুড়া-হলদিয়া শাখায় ৪৫ মাইল লম্বা নূতন রেল হইতেছে। ঐ রেলপথ নির্মাণে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। গত ১৭ই ডিসেম্বর কোলাঘাটের নূতন তৃতীয় রেলপুলটি খোলা হইয়াছে। এবং তাহার উপর দিয়া গাড়ীচলাচল আরম্ভ হইয়াছে। দেউলটি ও কোলাঘাটের মধ্যে এই নূতন পুল নির্মিত হইল।

দেশ বিভাগ—

পাঞ্জাবের একটি প্রদেশকে দুইভাগ করিয়া দুইটি রাজ্য গঠিত হইয়াছে। একটি রাজ্যের নাম পাঞ্জাব আছে; আর একটির নাম হইয়াছে হরিয়ানা। এখনও পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সীমান্ত সুনির্দিষ্ট হয় নাই এবং শাসন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ পৃথক করা হয় নাই। তাহার ফলে যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য সন্ত ফতে সিং অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। তিনি অনশন ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু উভয় রাজ্যের মধ্যে সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহাও বলা যায় না।

আসাম রাজ্যে সঙ্কট—

আসাম রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা লইয়া কিছুদিন হইতে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। সেখানে কয় বৎসর পূর্বে নেফা নামক উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। সীমান্তের নাগা অধিবাসীরা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহাদেরও হয়ত পৃথক রাজ্য গঠন করিতে হইবে। তাহার উপর মিজো সম্প্রদায় স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার

দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বেই মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্য পৃথক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক রাজ্য গঠিত হওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতি জনক। সকলের উপর পূর্বপাকিস্তানের লোকেরা আসাম রাজ্যের কোন কোন অংশ পাকিস্তানে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছে। যে সকল অংশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, পাকিস্তানীরা সে সকল অংশ পাকিস্তানের বলিয়া ঘোষণা করিতে চায়। ভবিষ্যতে আসামের যে কি অবস্থা হইবে তাহা চিন্তা করিয়া ভারতের হিতকামী ব্যক্তিরা শঙ্কিত হইয়াছেন।

ভাতা বৃদ্ধি—

১৩৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সকল কর্মচারীর মহার্ঘভাতা কিছু কিছু বাড়িল। যাহাদের মূল মাসিক বেতন ১২৭৲ টাকা তাহারা মাসে ১০৲ টাকা বেশী পাইবে এবং যাহাদের এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাহারা ১৫৲ টাকা বেশী পাইবে। ইহার ফলে পিয়নের বেতন মোট ১১৬৲ টাকা হইবে এবং নিম্নস্তরের কেরানীর বেতন মফঃস্বলে ২৪১৲ টাকা এবং সহরে ২৮১৲ টাকা হইবে। পূর্বে মফঃস্বলের কেরানীরা বাড়ীভাড়া পাইতেন না, এখন তাঁহারা তাহা পাইবেন। ব্যয় যে হারে বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় এই আয়বৃদ্ধি কিছুই নহে। তথাপি ইহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে।

হাঙ্গামায় বিদেশী হাত—

গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতনে আসিয়া বোলপুরে এক জনসভায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি খবর পাইয়াছেন যে, সারা ভারতের ছাত্র হাঙ্গামার পিছনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য রহিয়াছে। কথাটি বলা সহজ; কিন্তু ভারতের মত বিরাট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই কথা বলিবার পূর্বে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁহার মত লোকের মুখে হাল্কা কথা শোভা পায় না। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি। সকল শক্তি তাঁহার হাতে আছে। তিনি যখনই যে খবর পান না কেন, তখনই সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন্ বিদেশী শক্তি কিভাবে ভারতের ক্ষতি করিতেছে তাহা জানিয়াও তিনি যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন তবে তাহা অতীব পরিতাপের বিষয়। আমরা এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ্য সভায় এই কথা বলিবার পূর্বে শ্রীমতী গান্ধী ইহার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই।

দুঃস্থ নরনারী ও ছাত্রছাত্রীদিগকে শীতবস্ত্র দান—

গত ৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশ ঘটিকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঢোলকাট-পুকুরিয়া (ঝাড়গ্রাম) সেবাশ্রম হইতে দুঃস্থ নরনারীদিগকে ১৫০খানা কম্বল ও চাদর এবং সঙ্ঘ-পরিচালিত প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদিগকে ৮০খানা চাদর দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কিছু পুরাতন জামাকাপড়ও বিতরণ করা হইয়াছে।

সঙ্ঘের যুগ্মসম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজীর উপস্থিতিতে ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক শ্রীরঞ্জিৎকুমার চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও স্থানীয় এম-পি, শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র হাঁসদা এই বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীযুত হাঁসদা সভাপতির ভাষণে সঙ্ঘের এই সৎপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জনসাধারণকে সঙ্ঘের জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

বারাকপুর আনন্দপুর নিবাসী কবি শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাসে চড়িয়া হাওড়া রামরাজাতলা যাইতেছিলেন, সন্ধ্যায় পথে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে কয়েক ঘটা থাকার পর মধ্যরাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘকাল নিজেকে সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, এবং বারাকপুর মহকুমা সমিতি গঠন করিয়া সারা মহকুমা অধিবাসীদের নানাভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন স্থান ও দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষে' তাহার কতকগুলি প্রকাশিতও হইয়াছিল। তিনি অল্‌ইণ্ডিয়া রেডিওর পল্লীমঙ্গল আসরে কয়েকবৎসর ধরিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং পল্লী-শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার বহু কবিতা সকলকে আকৃষ্ট করিত। তিনি বিধবাপত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

পরোপকারী সহৃদয় শচীন্দ্রনাথ নিজের দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা নিজেকে পরোপকার ব্রতে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে দেশ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পূর্ণিমা মিলন—

ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নাট্যাচার্য্য ডি. এল. রায় সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করে'ছিলেন 'পূর্ণিমা মিলন' নামে এক সাহিত্য সংস্থা। ডি. এল. রায়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে সেই সংস্থার কার্য্যকলাপ স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল।

গত বৎসর বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোধা অর্থাৎ স্থায়ী সভাপতিরূপে গ্রহণ করে ও বৈদান্তিক ডঃ মতিলাল দাস সেই পূর্ণিমা মিলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ণিমা মিলনের নব-রূপায়ণে স্থায়ী সহসভাপতি রহিয়াছেন ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় এবং সম্পাদনার ভার লইয়াছেন অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগ্মসম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা চক্রবর্ত্তী (খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ জরাসন্ধের সহধর্ম্মিণী)। প্রতি মাসে পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তী রবিবার এই সংস্থার অধিবেশন হয়, সংস্থারই কোন এক সদস্যের আমন্ত্রণে তাঁহার বাসভবনে।

পূর্ণিমা মিলনের গত অগ্রহায়ণ অধিবেশন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কার্ত্তিক অধিবেশন ৩০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেকটাউনস্থিত বাসভবনে হইয়াছিল।

কার্ত্তিক অধিবেশনে আলোচিত হয় যে, অধুনা কতকগুলি পত্র-পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অশালীন বা অশ্লীল রচনা প্রকাশিত হয়ে তরুণ পাঠকমনে অবাঞ্ছিত ভাবের উদ্রেক করে তাহা নিবারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঐ অধিবেশনে তারাশঙ্করবাবু প্রস্তাব করেন যে, পূর্ণিমা মিলনের পক্ষ থেকে এক একটি বৎসরান্তে বাংলা ভাষার কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য এবং কাব্য সাহিত্যের সালতামামি করে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক সমালোচনা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ঐ অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে রবিবাসরের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার দে মহাশয় প্রস্তাব করেন যে এই সমস্ত সমালোচনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে প্রচার করাও আবশ্যক। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কতকগুলি কারণে এই কাজ অন্যান্য সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পূর্ণিমা মিলনের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী।

তারাশঙ্করবাবুর বাটীতে অনুষ্ঠিত অগ্রহায়ণ অধিবেশনে তারাশঙ্করবাবু পূর্ব্বসূত্র অনুসরণ করে বলেন যে, যেহেতু সাহিত্য মানব সমাজ ও মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি সেহেতু মানুষের সমাজ ও জীবনের ভালমন্দ সমস্তই সাহিত্যে স্থান পায় এবং পাবেও, অতএব অশ্লীলতা বলে কোন কিছুই থাকতে পারে না, কিন্তু কাহিনীর প্রকাশভঙ্গী যদি পাঠকের মনে কুসংস্কারজনক উত্তেজনা ও যৌনক্ষুধার উদ্রেক করে তবে তাহাই হইবে অশ্লীল। ঐ অপপ্রকাশকে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সাহিত্যে অশ্লীল ও অনুচ্চারণীয় শব্দ অথবা বাক্যসমষ্টির সংযোজন না করেও সমাজের ঘৃণ্যতম কাহিনী কত সুষ্ঠুরূপে ভদ্র সমাজের গ্রহণযোগ্য ভাবে পরিবেশন করা সম্ভব তাহার নমুনা স্বরূপে তিনি তাঁহার রচিত ও পূর্ব্বপ্রকাশিত 'তিনশূন্য' নামক গল্পটি পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানের কয়েকজন লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রয়োজনীয় অভব্য শব্দ ও বাক্যের চটক দেখিয়ে পাঠকমনের নিষিদ্ধ চেতনায় স্পন্দন জাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন যে, শুধুমাত্র নরনারীর দেহবিষয়ক বিবরণ বা দুষ্ট মনোবিকার বর্ণন করাই অশ্লীল নয়। শরীরতত্ত্ব বিষয়ক ডাক্তারী বইগুলিতে খোলাখুলিভাবে যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলেও ওগুলি অশ্লীলপদবাচ্য নয়। কিন্তু ঐ সমস্তের অহেতুক অবতারণা যদি কেবলমাত্র এক শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যই করা হয় তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই অশ্লীল এবং পরিত্যাজ্য। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, 'ভীতিকর পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, ঐ প্রকার রচনার মাধ্যমে লেখকদের এবং প্রকাশকদের মনোগত অভিপ্রায় বোধ হয় এক শ্রেণীর পাঠককে খুসি করিয়া বেশী পরিমাণ পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন। ব্যক্তিগত অর্থলালসায় জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করার অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার কোন প্রয়াস যদি আমরা না করি, তা হলে ভাবী

কালের কাছে আমাদের কোন কৈফিয়ৎই থাকিবে না। জাতির শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য খাদ্যে এবং ঔষধে ভেজাল নিবারণ করা যেমন দেশবাসী ও রাষ্ট্রশক্তির অবশ্য কর্তব্য, সেই রূপেই জাতির মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর ও নির্মল রাখার জন্য সাহিত্যের নোংরামি ও ভেজাল অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।"

বঙ্গীয় কবিপরিষদের আড়বনগর অধিবেশন—

নদীয়া জেলার শিমুরালী ষ্টেশনের অন্তর্গত আড়ব নগরে বঙ্গীয় কবিপরিষদের সারাদিন ব্যাপী অধিবেশনে কলিকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক সমবেত হন। উক্ত সভায় নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এবং উদ্বোধন করেন রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। এই উৎসব উপলক্ষে উক্তস্থানে নারিকেল বৃক্ষ রোপন করা হয়।

গত ২০শে কার্ত্তিক রবিবার সার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বঙ্গীয় কবি পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের বিজয়া সম্মেলন ও কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬২তম জন্মদিন পালন করা হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীচারু চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জরাসন্ধ) এবং উদ্বোধন করেন শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণ দান করেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিষ্ণুসরস্বতী, শ্রীমতী অমলা শঙ্কর, শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টচার্য্য ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য।

ফাঁকি

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফাঁকি আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা—সর্বত্রই ফাঁকির রাজত্ব। কে কাকে ফাঁকি দেবে তাই নিয়ে চলেছে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কর্মিরা বলছেন—মনিব তাঁদের ফাঁকি দিতে চান। আর মনিবরা বলছেন কর্মিরা তাঁদের ফাঁকি দিতে সদাই উন্মুখ। কিন্তু যাঁরা কর্মিও নন এবং মনিবও নন তাঁদের গলাতেও এই ফাঁকির ফাঁসি বড় করেই পরছে।

যদি সরকারী কি আধা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে আপনাকে কর্ম উপলক্ষ্যে যেতে হয় তাহলে দেখতে পাবেন এই কথাটা কত বড় সত্য। কোন কাজ সেখানে নিয়মমাফিক সুষ্ঠুভাবে চলছে না। কর্মিরা বলছেন—অফিসাররা অলস আর ফাঁকিবাজ তাই কাজ-কর্ম ভালভাবে হয় না। আর উপরওয়ালারা সমস্ত দোষই আরোপ করেন নীচের তলার কর্মিদের ঘাড়ে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার শিকল এসে জড়ায় আপনার আমার গলায়। শিক্ষক অধ্যাপকেরা দোষ দেন ছাত্রদের। আর ছাত্ররা বলেন—ওঁরা ফাঁকিবাজ, কিছুই পড়ান না, তাই পরীক্ষার ফল খারাপ হয়। এই ফাঁকির গোলক ধাঁধায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠি আমরা অভিভাবকরা।

উকিল-মক্কেল, ডাক্তার-রোগী, ব্যবসায়ী-দোকানদার বিক্রেতা-খরিদ্দার সবাই এই পাপচক্রের ঘূর্ণীতে ঘুরছে। কে কাকে কেমন করে ফাঁকি দেবে এই তাদের সকলেরই যেন প্রাণপণ প্রচেষ্টা। বিক্রয়কর, আয়কর, সম্পত্তিকর বৈদেশিক মুদ্রা আইন, কাষ্টম আইন ফাঁকি দেবার জন্য বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নানান প্রচেষ্টা চলছে, কি করে জাতীয় সরকারকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আবার দেশের সরকারও লেভিপ্রথা চালিয়ে নানা আইনের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত্ত চাষার মুখের গ্রাস ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নেন, স্বর্ণ শিল্পী, ছানাওয়ালা, খাবারওয়ালার রুজি রোজগার আইনের ফাঁকিতে বন্ধ করে দেন।

বাল্যকালে লেখাপড়ায় ফাঁকি আমরাও কিছুটা দিয়েছি। কাজকর্মে আমাদেরও যে গাফিলতি হয় নি এমন নয়। কিন্তু এখনকার মত এমন নির্মম ফাঁকি আমরা দিতে পারিনি। ফাঁকির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এমন হয়? এর উত্তর ঠিক কি ভেবে উঠতে পারি না। কখনও মনে হয় আমাদের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এর জন্য দায়ী। কখনও মনে হয় আমাদের আদর্শ চ্যুতি ও ধর্মহীনতাই এর অন্যতম কারণ। আবার কখনও মনে হয় এটাই বুঝি আমাদের জাতীয় চরিত্র, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর স্বকীয় প্রভাবে নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে!

কবি-প্রিয়া
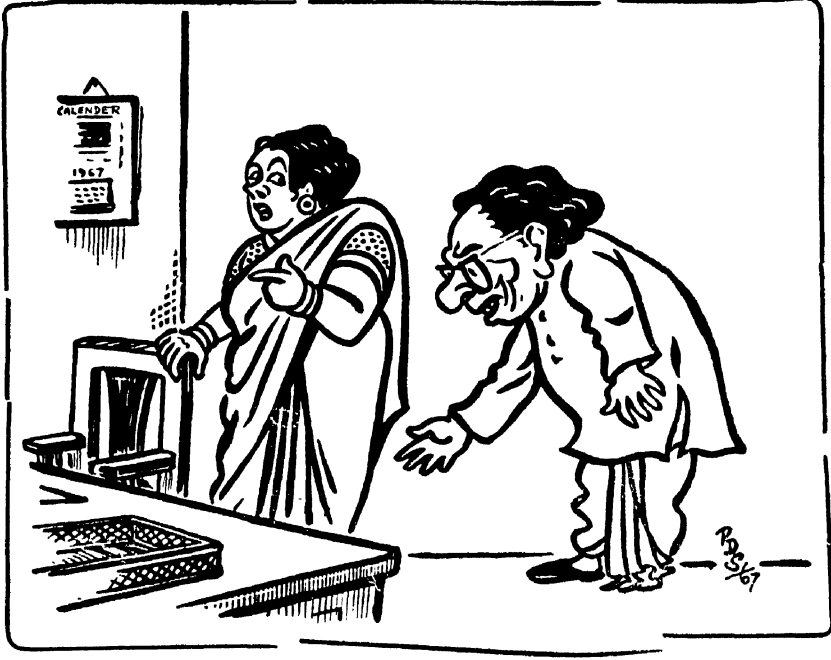
আধুনিক-কবি :—হ্যাঁগো, একটু আগেই লেখবার-টেবিলের ওপর আমার লেখা আধুনিক-কবিতার যে খাতাগুলো রেখে গিয়েছিলুম—সেগুলো আবার কোথায় সরালে তুমি!

কবি-পত্নী :—হুঁঃ!···ও সব আবার কবিতা বুঝি!···ছাই-পাঁশ কি যে লেখো তুমি আজকাল—কোনই মাথা-মুণ্ডু নেই তার!···বলি বয়স যত হচ্ছে, ততই দেখছি ভীমরতি বেড়ে চলেছে তোমার! কবে যে হুঁশ হবে—তাই ভাব'ছ!···বাড়িতে জঞ্জাল যথেষ্ট জমেছে—বাড়িয়ে আর কাজ নেই—রাখবার ঠাঁই জুটছে নাকো মোটেই! তাই হরিয়াকে বলেছি—ওগুলো দিয়ে আজ উনুন জ্বালাতে—বাড়ীতে কয়লা ছিল এতটুকু···এক পেয়ালা চা বানিয়ে দেবে—তার উপায় ছিল না সকালে!

শিল্পী :—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

শেষ রাতের ফুল

জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী
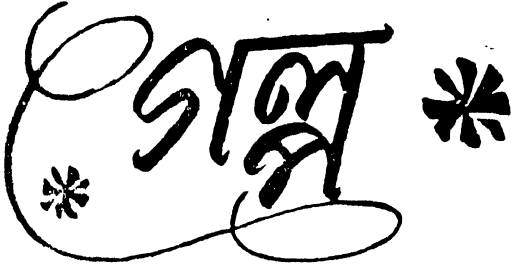
পূর্ববাংলার পদ্মার জলস্রোতেই যেন ভেসে এসেছিল—সেই একটি দিনের কাহিনী। পুরোন দিনের কোন গল্প কথার মতই মনে হয়। তবু, শুনে বিস্মিত হয়েছি—ভেবেছি যে ইতিহাস কখনো লেখা হয়নি—সেই অলিখিত কাহিনী কি আজ ধরা দেবে আমার কলমে?

পদ্মানদীর পার ভাঙা জলের শব্দে চম্‌কে ওঠে, ছোট্ট একটি গ্রাম। জনবসতিপূর্ণ সেই গ্রামরাজ্যটি—ছোট হলেও—অভিজাত পরিবারের অনেকের বাস ছিল।

সরকার বাড়ির নাম ছিল সর্বাধিক। যদিও কোন কারণে, বহু পুরুষ আগে তাদের বিশাল ধন গৌরব প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল এবং বাবু সরকারের আমলে দারিদ্র্যের চরমাবস্থা তথাপি তাদের আভিজাত্য গৌরব—তখনও সব লোকের মুখে মুখে ফিরতো। সাত গাঁয়ের লোক জানতো—সরকার বাড়ীর প্রসিদ্ধি। বাবু সরকারের সাত ছেলে, এক মেয়ে। অসময়ে তিনি সংসার সাজিয়ে পাড়ি জমালেন পরপারে।

মতি সরকার হোল, সবচেয়ে বড়। তারপর ছ' ভাইএর কোলে—একটি ফুলের মত বোন। নাম ওর রাগিণী। অসাধারণ এক রূপের অধিকার নিয়ে এসেছিল—এক অসুন্দর পৃথিবীতে। বিধাতা নীরবে একান্তে যে সৌন্দর্য প্রতিমা নিজের হাতে গড়েছিলেন—তার ওপর শেষ অবদান কি—সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত গ্লানির মধ্যে দিয়ে ভরিয়ে দিলেন?

মতি সরকারদের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও—রাগিণীকে বিয়ে দিয়েছিল বিশাল ধনী পরিবারে। অবশ্য তার সেই অসামান্য রূপলাবণ্যই তার এতবড় সৌভাগ্যের প্রথম সূচনা করেছিল।

কিন্তু জীবনের ভগ্ন বীণার সুর বাঁধতে পারল না রাগিণী। অনাঘ্রাত পুষ্পের মতই সে ঝরে যেতে এসেছিল এ পৃথিবীতে। দেবতুল্য স্বামী বড় এক রাজপ্রাসাদের রাণী রাগিণী—যেদিন সাদা কাপড়ে সর্বাংগ ঢেকে সাদা শিউলির মত সিঁথি নিয়ে ফিরে এল সরকার বাড়ীর আঙিনায়—তখন সাত ভাই আর এক মা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো—সব খুইয়ে এলি হতভাগিনী?

নিজের এই দুর্ভাগ্যের সাজ দেখে ঝরা ফুলের মতই কেঁপে উঠলো রাগিণী। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সমস্ত সুখ সৌভাগ্য কোন রাজ্যে যেন ফেলে এসেছিল। শুভ্র ফুলটি আর বোধহয় মানুষের কাজে লাগবে না—তবে বিধাতার চরণেই নিবেদিত হোক। রাগিণী এই ভাবে যেন উৎসর্গ করলো নিজেকে। ঠাকুর দেবতার সংসার নিয়ে সে মেতে উঠলো। আর কোন দুঃখ নেই। দেবতার উদ্দেশ্য বোধ হয় আরো বড় এইভাবে তাকে কাজে লাগাবার জন্যই বুঝি, দেবতার এই নিষ্ঠুর ছলনা। এই ভেবেছিল রাগিণী।

সেই পরিচিত পদ্মানদী। উচ্ছল জলতরঙ্গে—রঙ্গময়ী সে। কোন কোন রঙিন সন্ধ্যায় এখানে এসে থমকে যেত। তারও জীবনটা যেন ওই জলস্রোতের মত ভেসে গেছে। কোন এক অচিন রাজ্যে চলে গেছে—আর কি ফিরে আসবে না। জলভরা চোখে অন্যমনা মেয়ে উদাস হয়ে যায় পদ্মার পারে দাঁড়িয়ে।

অনেক ঝি বৌদের সঙ্গে এসেও রাগিণী একলা পড়ে যায় কোন কোন দিন। অনেক হাসি গল্পের পর হঠাৎ তার মনটা পদ্মার অতল জলে ডুবে গিয়ে হারিয়ে যায় যেন। সঙ্গিনীরা চলে যায়। ঘাটখানা শূন্য হয়ে যায়। চার পাশটা থম থম করে। আশপাশেরও ঝোপঝাড়ে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। চকিতে মুখ ফেরায় রাগিণী। তাই তো পারে যে একটিও মানুষ নেই—শুধু সে একা।

শুধু নির্জনতার ভয়ে জলের ভিতর নেবে গিয়ে কোন ক্রমে গা ধুয়ে বাড়ীর পথে ফেরে। মা অনুশাসনে ভেঙে পড়ে—সাঝ অন্ধকারে ঘাট থেকে ফেরে কোন সোমত্ত মেয়ে?

রাগিণী হেসে বলে—'আমার কি ভয় মা? আমি তো দেবতার চরণে নিবেদিত। তিনিই তো দেখছেন আমাকে।'

বিধাতার ভালবাসায় ছলনা থাকে কিনা জানি না। যে অকপট বিশ্বাস নিয়ে রাগিণী তার সর্বস্ব দিয়েছিল দেবতাকে—তার নিষ্ঠুর প্রতিদান কি ফিরে এলো?

সেই নিশ্চুপ ঘাট থেকে গা ধুয়ে রাগিণী ফিরছিল বাড়ীর দিকে। আনমনা মেয়ে সন্ধ্যে করে ফেলেছে। সেদিনও সে একলা। সঙ্গিনীরা সব অনেক আগেই সব কাজ সেরে চলে গেছে।

কিন্তু দেবতার ধন কে নেবে কেড়ে? কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপরই এলো বড় আঘাত! ঝোপের অন্ধকারে বিচিত্র এক শব্দ শোনা গেল। রাগিণী চেয়ে দেখলো রাজবেশী এক পুরুষ। কিন্তু কেন, এভাবে সে এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সভয়ে সে কেঁপে উঠলো। একজোড়া চোখ যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে।

দ্রুত পায়ে হেঁটে চললো রাগিণী। বাড়ীতে পৌছে তার বিশ্বাস হোল তার আরাধ্য দেবতা—এক ভীষণ বিপদ থেকে যেন রক্ষা করলেন। ঠাকুর ঘরে গিয়ে পাষাণ-দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

এত ভালবাসা তোমার? এত দয়া? এত বড় দান তোমার? রাগিণী কাঁদতে কাঁদতে দেবতাকে বলে। বিধাতার নিভৃত সংসারে একটি নারীর আকুল চোখের জলের ধারা স্রোত বয়।

কিন্তু তার পরের দিনই বনগাঁর বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর পেয়াদা এলো সরকার বাড়ীর দরবারে। জমিদার কুশল বসাকের ভয়ঙ্কর এক প্রস্তাব—একটি ছোট্ট চিরকুটে জানা গেল।

সাত ভাই পড়ে চমকে উঠলো। রাগিণীকে তুলে দিতে হবে কুশল বসাকের হাতে। যে পৃথিবীর জন্যে ঈশ্বর তাকে এত সুন্দর করে পাঠিয়েছে অথচ মানুষের অধিকারে তাকে পাওয়া যাবে না—এ যুক্তি মানবেনা সম্পদশালী, প্রতাপশালী জমিদার কুশল বসাক। তাহলে উপায় কি? এই সংগে আরো একটি হুঁসিয়ারী ছিল—যদি এই প্রস্তাব না মেনে নেওয়া হয়—সরকার বাড়ীর অনেক বন্ধকী সম্পত্তি, যা জমিদারের হেপাজতে ছিল—সবই ছলে বলে কৌশলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয় তাহলে সরকার বাড়ীর পুরাণ গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করবে কুশল বসাক। বিনা শর্ত্তেই ফিরিয়ে দেবে—তিন পুরুষের বন্ধকী যাবতীয় সম্পত্তি! নচেৎ অনেক রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাদের।

সরকার বাড়ীর আত্মমর্যাদার আঘাত মেনে নিতে পারবেনা সাত ভাই। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো তারা! কিন্তু ফলে দেখা গেল এক ভীষণ বিপদের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে।

রাগিণী তখন কেঁদে পড়লো সাত দাদার পায়—'আমি যদি বিষ খেয়ে মরি, তাহলে তোমরা মুক্তি পাবে—আমাকে যে ভাবে হোক মৃত্যুর আয়োজন করে দাও।'

সাত ভাইএর চোখে জল। বড় আদরের বোনটির মৃত্যুর আয়োজন করবে তারা? ঈশ্বর, তোমার পরিহাস কি নিষ্ঠুর?

তবে? তবে কি কুশল বসাকের অত্যাচার মেনে নিতে হবে দিনের পর দিন? ছোট্ট বোনটি তখন আবার কেঁদে বলে—আর এ কষ্ট আমার জন্যে তোমরা পেওনা আমি সহ্য করতে পারছিনা। মাত্র একটা জীবনের জন্যে তোমাদের এতগুলো জীবন আর আমি নষ্ট হতে দেবনা। ভগবানই যখন মুখ ফিরিয়েছেন আমাকে কি তোমরা রক্ষা করতে পারবে?

তবে? তবে কি বলছিস বোন? সাত ভাইএর কাতর স্বর কেঁপে ওঠে। সভয়ে তাকায় একটি শুভ্র ফুলের দিকে...

একটা জীবন আমার। যদি আমায় তোমরা না মারতে পারো—তবে দিয়ে দাও ওই কুশল বসাককে। তোমরা ধনে মানে প্রাণে রক্ষা পাবে—একটা জীবনের বিনিময়ে ফিরে পাবে সরকার-বাড়ীর ঐতিহ্য!

অবশেষে রাজি হোল সাত ভাই। বোনকে তারা তুলে দেবে বলেই খবর পাঠালো বনগাঁর জমিদার বাড়ীতে। বিধবা বিবাহ হয়তো অপরাধ নয়। কিন্তু রাগিণী তো

রাজরাণী হয়ে থাকবে। এই ভেবে সাত ভাই নিজেদের সান্ত্বনা দিল।

কিন্তু কুশল বসাক দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠালো—বিধবা বিবাহ করে কুশল বসাক নিজের দুর্নাম রটাবে না। রাগিণীকে চাই শুধু রাতের সঙ্গিনী হিসেবে। একটি নারীর অনন্ত সৌন্দর্য তৃষ্ণায়—শুধু মাত্র কাতর সে। কাজেই অন্ধকার রাতেই সে চুপি চুপি পাল্কী পাঠাবে—রাগিণীকে নিতে। আবার রাত শেষের আগেই পাঠিয়ে দেবে।

সাত ভাই শুনে শিহরিত হোল। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মা কাঁদতে লাগলো। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে রাগিণী—ম্লান হেসে বললো—আমি মরে গেছি এবার থেকে তোমরা জেনে রেখো। আমি অন্ধকারেই মরে থাকব। তোমরা দুঃখ পেওনা—তোমাদের সুখ সম্পদ ফিরে আসুক—শুধু একটি জীবনের বিনিময়ে। এই আমার হবে সুখ।

সোনার সম্ভ্রম সতীত্বের অবমাননা সব অন্ধকারে মিশিয়ে রাগিণী যেতো পাল্কী চড়ে। খুব গোপনে, চুপি চুপি!—সরকার বাড়ী থেকে জমিদার বাড়ী—প্রতি রাত্রে একটি পাল্কী আসা যাওয়া করতো।

অন্ধকারের যন্ত্রণা—একটি নারীর জীবনে এইভাবে ঘনিয়ে উঠলো। রাত ঘনিয়ে এলে—এক মা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে তুলে দেয় পাল্কীতে। দুঃসহ এক অন্ধকারে—লুকিয়ে কাঁদে সাত ভাই।

রাত শেষ হয়ে এলেই খিড়কী দোরে দাঁড়িয়ে থাকে মা। প্রতি শেষ রাতের ঝরা ফুল দেখতে—দাঁড়িয়ে থাকে আর এক নারী—আরো দুঃসহ যন্ত্রণায়।

রাত ফুরিয়ে এলে সব সাজ খুলে ফেলে রাগিণী। কুশল বসাকের নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া—রাতের সাজ। গলায় মণিহার, বাহুতে বাজু, সিঁথিতে চন্দ্রকান্তা, কোমরে সাত মোহরের সোনার বন্ধনী—চরণে নূপুর। শেষে বেনারসী শাড়ীটা খুলতে খুলতে—জীবনের নেই একটি দিনের সাজ খুলে ফেলার দৃশ্য তার মনে পড়ে যায়!

কিন্তু এই সাজ? যে নারীর সমস্ত বেদনা দিয়ে ভরা, নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় গড়া একটি পাথর প্রতিমা। শেষ রাতের ম্রিয়মাণ অন্ধকারে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদবে?

এদিকে সাত ভাইএর জীবনে ফিরে আসে ধন গৌরব, সরকার বাড়ীর পুরোণ মান, অপার প্রতিপত্তি! এক বোনের জীবন দিয়ে পাওয়া এত বড় তাদের প্রাপ্তি! শুধু এক বিচিত্র বেদনার আনন্দে রাগিণীর চোখে তৃপ্তি নামে। তাই তো শুধু একটি ফুলের মৃত্যুতেই—সমস্ত বাগানখানার সৌন্দর্য তো ম্লান হয়নি কোথাও—যেন আরো কত নতুন ফুল ফুটেছে—দিকে দিকে ভরে গেছে।

ভোর রাতে ফিরে আসে রাগিণী। জমিদার বাড়ীর রাতরাণী—রাজ সাজ খুলে সাদা কাপড়ে মুখ ঢেকে ফিরে আসে। পাল্কী থেকে চুপিসারে নামিয়ে নেয় মা। শেষ রাতের অন্ধকারে শুধু চোখের জল ঝরে! ঝরা ফুলটিকে যেন বুকে করে টেনে নেয় মা।

সাত ভাই রাজা হতে থাকে। সাত গাঁয়ের লোক চেয়ে দেখে—সরকার বাড়ী ধনে মানে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। কেউ জানে না, রাতের অন্ধকারে কার জীবনটা মরে গিয়ে এদের প্রাণ ফিরিয়ে আনে।

ওরা চেয়ে থাকে। সেই সরকার বাড়ী যেন! সেই দিনের হাল! দেউড়িতে প্রহরী। সরকার বাড়ীর নতুন ঐশ্বর্য পাহারা দেয়। অন্দরে দাস দাসীর অভাব নেই। সাত ভাই আর পায়ে হাঁটেনা, পাল্কী চড়ে। ঠাকুর দালানে দোল দুর্গোৎসব হচ্ছে—কাঙালীরা প্রসাদ পাচ্ছে পেট পুরে।

যেন অবাক আনন্দে চেয়ে থাকে এক বোনও। শুধু একটি জীবনের বিনিময়ে—শুধু একটি কষ্টের মূল্যে পাওয়া ওদের এই সৌভাগ্য!

তবু, সেই শুভ্র ফুলের একটি একটি করে পাপড়ি খসে যাচ্ছে···অবাক্ অলক্ষ্যে যেন ঝরে যাচ্ছে শেষ রাতের ফুলটি। যেন একান্তে, বড় চুপি চুপি। সহসা কেমন হয়ে যায় সব। রাগিণী যেন বুঝতে পারছিল না—আর কত দুঃসহ রাতের বিনিময়ে শেষ হবে এই অন্ধকারের ইতিহাস।

অনেক রাতের অন্ধকারে রাজ সাজে ঢাকা একটি কোমল ফুলকে নিয়ে খেলা করে—এক রাজাবাবু। একটি জীবনের দাম দিয়েছে সে অনেক ঐশ্বর্য দিয়ে। কাজেই সে জীবন শুধু খেলারই। সে যেন রাজাবাবুর খেয়ালের খেলা, ইচ্ছার খেলা জীবনের এক বিচিত্র খেলা।

খেলা শেষ করার পালা ত এলো—বুঝি এক রাতের অন্ধকারে। শেষ রাতে দাঁড়িয়ে সেই মা। পাল্কী

আসবে ফিরে, প্রতি রাতের মত সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা …সে রাতের আকাশে যেন আধখানা হয়ে ছিল চাঁদ। মেঘের মধ্যে যেন মুখ লুকিয়েছিল—সমস্ত রাতের জেগে-থাকা তারা। দূর পবনের উদাস সুর শোনা গেল, সরকার বাড়ীর নতুন গড়া রূপোর খাঁচায় বন্দী ময়না কেঁদে উঠলো। কোথায় যেন সব এলোমেলো সুর বাজছে।

পাল্কীর আসার শব্দ শুনে খিড়কি দোর খুলে দিল মা। দরজা খুলে মেয়ে নামাতে গিয়ে দেখলো পাল্কীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে রাগিণী। অনেক রাতের জেগে থাকা মেয়েটা—সত্যি বুঝি এবার ঘুমুলো।

সাত ছেলেকে ডেকে আনলো মা। ঘুমন্ত রাগিণীকে যেন কোলে তুলে সবাই নাবায়। খুব সন্তর্পণে যেন শুইয়ে দেওয়া হয় সমস্ত রাতে পেতে রাখা ওর বিছানায়। আহা! কত রাত ঘুম নেই মেয়েটার চোখে। খুব সাবধান, ঘুম যেন না ভাঙে।

সাত ভাই অতি সযত্নে ঘুমন্ত বোনকে পাল্কী থেকে নাবিয়ে নিয়ে গেল। বিছানায় তাকে শোয়াতে গিয়ে রাগিণীর বুকের জামার ভেতর থেকে কি একটা ঠক করে পড়ে গেল।

সাত ভাই চমকে তাকালো, পাকানো একটা কাগজের ডেলা। সেটা খুলে ফেলতে পাওয়া গেল রাগিণীর লেখা ছোট একটি চিরকুট!

মা গো, তোমাদের তো সব গুছিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ছুটি নিলাম। ভয় নেই তোমাদের—কুশল বসাককে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি, সরবতে বিষ মিশিয়ে, বাকী অর্ধেকটা নিয়ে পাল্কীতে উঠেছি। তার আগে এই চিঠিটা লিখে নিলাম। আমাকে ক্ষমা করো—রাগিণী।

শেষ রাতের ঝরে যাওয়া শুভ্র একটি ফুল যেন সারা বিছানায় ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বুক থেকে শেষ অন্ধকারটাও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে…

সাত ভাই চেয়ে আছে সেদিকে। সেই মুহূর্ত্তে সরকার বাড়ীর সমস্ত ঐশ্বর্যভরা সংসারটা যেন কেঁপে উঠলো সব কিছু যেন করুণ ভয়াবহ হয়ে উঠল সাত ভাইএর চোখে।

সব কাজই গুছিয়ে চলে গেছে বোনটি। কিন্তু যে ফুল ঝরে গেল শেষ রাতের অন্ধকারে—আর কী সে ফুটবে না? না, এমনি করে ফুটে, ঝরে যাবে বার বার?

নিষ্কৃতি

শ্যামাপদ বর্ম্মণ, কবিরত্ন

সুন্দর এ ধরণীর পরিপূর্ণ রূপ গন্ধ রসে
চির সত্য সুন্দরের অনাবিল মধুর আস্বাদে
বঞ্চিত ছিলাম আমি এতকাল মিথ্যা মোহবশে
উন্মত্ত মাতঙ্গ প্রায় বিকশিত যৌবন উন্মাদে।
সুন্দরের বেদীমূলে উপেক্ষায় পদাঘাত করি
আসিয়াছি অসুন্দরে, চিরন্তন অঞ্জলি দানিয়া
জীবনের সারা বেলা, শ্রান্তিহীন বিচিত্র সম্ভারে—
হৃদয়ের অন্তপুরে যাহা ছিল সবটুকু দিয়া।
প্রকৃতির মহাকাশে আমি আজ মুক্ত বিহঙ্গম্
কেটেছে বাঁধন মম, দূরে গেছে রাত্রি দুর্নিবার!

মুক্তির দুয়ারে হাসে একদীপ্ত সূর্য্য অনুপম্
জীবনের প্রান্তে: তাই চির সত্য দেয় অভিসার।
নাই আজ কোন দুঃখ, ব্যথা আর ক্ষোভ অভিমান
সকলি মিলায়ে গেছে প্রকৃতির ঘোর আবর্ত্তনে,
বিরহের তীব্র জালা হয়ে গেছে চির অবসান—
জাগে তাই পুণ্য জ্যোতিঃ জীবনের পূত সন্ধিক্ষণে।
আমি আজ গাহি গান মধুময় শ্রান্তি বিহীন—
আলোর পরশ লভি, বিকশিয়া হৃদি স্বর্ণবীণে,
দূরে গেছে সব গ্লানি, জাগে সত্য জীবন নবীন—
লভিব মুক্তির স্বাদ,—আজিকার এই শুভ দিনে।

দুপুর

অনিলকুমার সাধু

এই ঘুমন্ত দুপুরে হারালো
ভরা শ্রাবণের মন,
কালো দুটো চোখ কোথায় ছড়ালো
প্রেমের নিমন্ত্রণ।
ফাগুন রাতের তৃষা
মেঘ মন্থর তমালী দিনের
সজল বাদল নিশা
কার অভিসারে অন্তর জাগালো
মহুয়া বনের হারানো অতীত
আজ দুপুরে কেন মোরে রাঙালো।
এ ডাক আমার প্রেমের সায়রে
উতলা কলধ্বনি
সুর তোলে শুধু অপরূপ রিনিঝিনি
হৃদয়েতে আঁকে হৃদয়ের আল্পনা
ভাবনা দিনের অহেতুক ভালবোনা
একটি হাসির সোনার মুখের
অপরূপ মায়া ডাক—
এই ঘুমন্ত দুপুরে জাগালো
একি মধু অনুরাগ।
এই ঘুমন্ত দুপুরে হারালো
ভরা শ্রাবণের মন
সাগর তীরের নীড় বাঁধবার
চুপি চুপি আয়োজন ;
অস্তবেলার পাহাড় শিখর চুড়ে
আঁখি চেয়ে থাকা শুধু দুজনার
নিরালা পথের জমানো বুকের
উত্তাপটুকু জুড়ে
পাহাড় শিখর চুড়ে।
ঝর্ণার হাসি উদ্দাম হওয়া
খুশীর নীলেতে দুটি কথা কওয়া
সারা আকাশের নীল দিয়ে দিল ভরে'

তোমার মুখের ছবি আঁকা যে গো
এই কবিতার আবেশের থরে থরে।
বাধা পাওয়া মনে
জাগে নাত' আর গান,
তবু সুন্দরী, মন জুড়ে ওঠে
সাহানা বিভাস কানাড়া ও মূলতান।···
ভীমপলশ্রী জেগে ওঠে আর
কখনো বাঁশীতে জাগে পূরবীর সুর,
দিনের শেষের গোধূলি আকাশ
কারে হারাবার কান্নায় ভারাতুর!
তোমার ঠিকানা আজো ভুলিনি :
ভোরের ভৈরো জাগায় যে আজো তারে
জাগায় আমার খেয়ালী মনেরে
এই ঘুমন্ত, ভরা শ্রাবণের
দুপুর সে বারে বারে ;
জাগায় সজল রাতের করুণ গান,
মোহ সংগীতে মায়া মূর্ছনা
কোন সে কবির রচনা জীবন, স্বপ্নেতে দোলা প্রাণ
ঘুম জুড়ে নামে রাতের স্বপ্ন
মধু বসন্ত হারানো কালের
বন্দী হওয়া সে ভাবনা জালের
দূর যমুনার কালো করা তীর
শিউরে ওঠা সে তোমার হাসির
সেই কালো রাত!
কবিতা লিখতে পারি নাত আর
নীল হয়ে যায় মেঘ মন্থর
কাজল চোখের প্রথম দৃষ্টিপাত!
এই ঘুমন্ত দুপুরে হারালো
ভরা শ্রাবণের মন :
কালো দুটি চোখ স্মৃতির দেশের
জাগাল নিমন্ত্রণ!···

"রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী"

লীলা বিশ্বাস
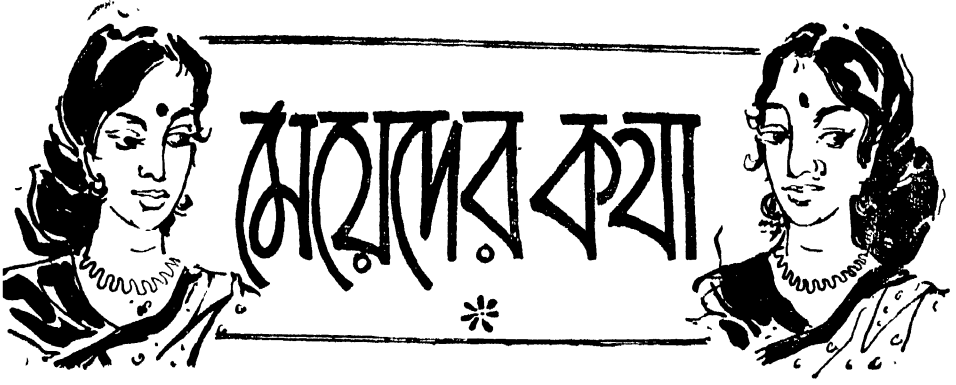
বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্য মেয়েদের কথায় ভরা। যেমন এই সুন্দরী-প্রকৃতি, যেমন এই বিশ্বরচনার আদি উৎস সেই লীলাময় পুরুষ, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তেমনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর প্রতি কবির পূজার অর্ঘ্য। কত রূপেই-না কবি নারীকে দেখেছেন। আর শুধু যে অন্ধ ভক্তের পূজাই নারী কবির কাছে পেয়েছে তা নয়, কবি তাকে সমালোচকের চোখেও দেখেছেন। তাই কবির পূজা যে সত্যদর্শনের অভাবে, মোহের প্রভাবে ঘটেছে তা নয়, সে পূজা উৎসারিত হয়েছে কবির সত্যকে দেখার ফলেই। কবি শ্রদ্ধা করে দেখেছেন বলেই সত্য করে দেখেছেন। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন 'শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্'। বিনা শ্রদ্ধায় সত্যকে কোনোখানেই জানা যায় না। নারীর মধ্যেকার সত্য কবি দেখেছেন নানারূপে। নানা দিক থেকে।

কবির লেখা মেয়েদের কথা পড়ে সব চেয়ে আগে যে কথাটা মনে পড়ে সে হ'ল কবির পৌরুষ। মেয়েদের প্রতি কবির দৃষ্টি পুরুষের দৃষ্টি, কাপুরুষের নয়। ইয়োরোপের সাহিত্যে একটা যুগ ছিল সিভ্যালরীর। ইয়োরোপের সমাজে সে সিভ্যালরী আজও আছে। বীরের বীর্য তখনি সার্থক, যখন সে নিজের চেয়ে দুর্বলকে প্রবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে। মেয়েরা-শারীরিক দিক থেকেও অন্ততঃ পুরুষের চেয়ে দুর্বল। এই দুর্বলতাই ইয়োরোপের পৌরুষকে মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিপরায়ণ ক'রে তুলেছে। ইয়োরোপীয় প্রকৃতির সেই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমরা দেখতে পাই কবির মনোভাবে।

আমাদের দেশের পুরানো সাহিত্যে আমরা নারী-চরিত্রের অতুলনীয় মহিমা দেখতে পেয়েছি। সেই মহিমান্বিত নারী চরিত্রের পাশে কোন কোন সময়ে পুরুষ চরিত্রগুলো দেখেছি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ক্ষমাশীল প্রেমের সংগে সংগে সুগভীর আত্মমর্য্যাদা বোধের কী সুন্দর উদাহরণ। সীতার চরিত্রে, দময়ন্তীর চরিত্রে কী অপরূপ বীর্য। দুঃখে দুর্দিনে আপন জীবন সাথীর পাশে পাশে থাকবার দুরূহ ব্রত থেকে তাকে বিচ্যুত করা যাবে না। আপনার জীবন সাথীকে দুঃখের মধ্যে ত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ীর আরাম ভোগ করতে যেতে তাকে কিছুতেই রাজী করান যাবে না, জেনেই নল তাকে ঘুমের মধ্যে ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তবু সেই একাকিনী অসহায়া নারী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে না গিয়ে পথে পথে বেড়াল, তারই সন্ধানে—যার সংগে একদিন সে সুখ ও দুঃখ, সুদিন ও দুর্দিন সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। সেই

পথে পথে কতনা দুঃখ, কতনা অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছিল।

তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে যে নারীর মহিমার বর্ণনা পাই, তার বীজ নিহিত আছে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের নারীর চরিত্রে। কিন্তু আমাদের দেশে স্মৃতির যুগে নারীর এই মহিমা স্বীকার করা হয়নি। মনুসংহিতায় নারীর অমর্যাদাকর অনেক কথাই পাওয়া যায়। আর যে জন্যে মনু নারীকে মহাভাগা বলেছেন "প্রজনার্থম্" অর্থাৎ বংশরক্ষা, সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে, সেখানে কবি মনুর সংগে একমত নন। একথা কবি বার বার বলেছেন। মেয়েদের প্রসংগে কবি আক্রমণ করেছেন সেই পুরুষ সমাজকে যা তৈরী হয়েছিল মনুর মত স্মৃতিকারদের প্রভাবে।

'চারিত্রপূজা' বইতে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন যে মেয়েদের প্রতি মমতাও তাঁর চরিত্রের পৌরুষের একটা প্রধান লক্ষণ। আমাদের এই কাপুরুষতার দেশে আমরা মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা ও অকৃতজ্ঞতাই সর্বত্র দেখতে পাই। কবি লিখেছেন যে কাপুরুষের এটাই প্রধান লক্ষণ যে সে যে পরিমাণ অযাচিত উপকার পায় সেই পরিমানে অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর ছোট বেলায় 'রাইমণি' নামে কোন মহিলার স্নেহ পেয়েছিলেন, তাই তিনি লিখেছেন যে, যে রাইমণির স্নেহ পেয়েছে সে যদি স্ত্রী-জাতির প্রতি পক্ষপাতী না হয় তো তার মত নরাধম আর কে আছে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—মেয়েদের স্নেহ, যত্ন, সৌজন্য পায়নি সংসারে এমন হতভাগ্য ক'জন আছে? কিন্তু আমরা এমনি কাপুরুষ যে আমাদের সমাজে মেয়েদের আরাম বিরাম, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এগুলোই হল আমাদের প্রহসনের প্রধান উপকরণ। এ জাতীয় প্রহসনের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে—

"গিন্নী চলেন টেনিস খেলতে
অনেক তাহার গুণ
ছেলে কেঁদে আকুল হ'ল
কর্তা ভেবে খুন।"

ব্যক্তি বিশেষের কথা কিছুই বলা যায় না, কোন একজন বিশেষ মেয়ে যদি বা কোন দিন ছেলেকে কাঁদিয়ে টেনিস খেলতে গিয়ে থাকে, তবু তা নিয়ে এমন ক'রে মাসিক পত্রে জাত তুলে অপবাদ দেওয়া নিশ্চয়ই আমাদের দেশের পুরুষ চরিত্রের কাপুরুষতার লক্ষণ।

কবি লিখেছেন,—আমাদের দেশের পুরুষ নারীর পূজা, তার সেবাকে নিজের পাওনা বলে অনায়াস তাচ্ছিল্যের সংগে গ্রহণ করে, প্রতিদানে তারও যে কিছু দেবার আছে একথা ভাবেনি। মেয়েরা যখন দেবতা বলে পূজো করতে এসেছে তারা তখন নির্বিকার চিত্তে অসংকোচে নিজেদের পংক কলংকিত পা তাদের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে।

যে সমাজ বালিকার ব্রহ্মচর্য, তার বৈধব্যের বিধান দিয়েছে কবি সেই সমাজকে আক্রমণ করেছেন। বালিকা যে বিধবা হওয়া মাত্র দেবীত্বে উপনীত হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ এই মিথ্যাকে সহানুভূতিহীন মিথ্যা ভাবালুতা ব'লে ধিক্কার দিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি বলেছেন—পুরুষরাও তো সমাজের মধ্যে মেয়েদের জন্যে দেবলোক সৃষ্টি ক'রে ব'সে নেই। মেয়েদের তো তারা বিপথে টেনে আনতে বাধা দেয় না।

বিদ্যাসাগর যে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে মেয়েদের প্রতি দরদ, তার একটা প্রধান কারণ।

মেয়েদের প্রতি সমাজের অবিচার দেখে কবি ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন। তাঁর সেই সুগভীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনেক রচনায়। কবি দেখিয়েছেন ব্যক্তি বিশেষ যখন মেয়েদের সংগে দুর্ব্যবহার করে তখনও সেই ব্যক্তি বিশেষ তার জন্য একা দায়ী নয়। তার উপরে প্রভাব ফেলে সমস্ত সমাজের মনোভাব। নারীকে অপমান করতে, অবজ্ঞা করতে সমস্ত সমাজ তার সমর্থন জানাচ্ছে পুরুষকে। এই জন্যেই যেখানে পুরুষ নারীকে আন্তরিক ভালোও বাসে, সেখানেও সে অনায়াসে নারীকে অপমান করতে পারে। এমনি করে আমাদের দেশের মেয়েদের অপমান করাটা যেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবগত হ'য়ে উঠেছে। এর কারণ এরকম অপমানে সমাজ কোন প্রতিবাদ করে না।

'যোগাযোগ' বইতে আছে, কুমুর বাপ জমিদার। তিনি কুমুর মাকে আন্তরিক ভালোবাসেন। কিন্তু

উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি নিজের বজরায় ক'রে তিন চার দিন বেশ্যাদের সংগে কটিয়ে বাড়ী ফিরলেন। স্বামী যদি ভালো না বাসতেন, তা হলে হয়ত কুমুর মা এ অপমান সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু স্বামীর আন্তরিক ভালোবাসা পেয়েছিলেন ব'লেই অভিমানিনী ব্রজরাণী সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। স্বামী জানতেন অপরাধ যত গুরুতরই হক না কেন স্ত্রীর ক্ষমা চাইলে পাওয়া যাবে। তার মানে মেয়েদের প্রতি অপরাধের কোন গুরুত্ব সমাজ দেয়নি। মেয়েদের প্রতি সমাজের এই অবহেলার মনোভাবই পুরুষকে যথেচ্ছাচারী হতে সায় দিয়েছে। তাই-কবি ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করেননি। তিনি দোষ দিয়েছেন সামাজিক দৃষ্টি ভংগির। কুমুও এই সমাজে মানুষ, তাই বাপের মৃত্যুর জন্যে সে নিজের মাকেই দোষী করে কিন্তু কুমুর দাদা বিপ্রদাস পুরুষ মানুষ। নিজের পৌরুষের মধ্যে সে নারীর প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ অনুভব করে। এতে তার সুমহৎ পৌরুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এর প্রতীকার কামনা করে। কুমুর স্বামী যখন কুমুকে অপমান ক'রে শ্যামার সংগে প্রকাশ্যেই অবৈধ আচরণ করতে থাকে, তখন বিপ্রদাস কুমুকে বলে যে এ অপমান একা কুমুর নয়। এ অপমান সমস্ত মেয়েদের। তাই সমস্ত মেয়েদের হ'য়েই এর প্রতিবাদ করতে হবে। এই প্রতিবাদে সমস্ত সমাজ প্রতিকূল হয়ে উঠবে, অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক প্রতিকূল মন্তব্য সমাজের চারদিক থেকে শুনতে হবে। এ সমস্ত সহ্য করে সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারলে তবেই একদিন এর প্রতিকার হবে। বিপ্রদাসের মুখেই কবি বলেছেন, মেয়েদের প্রতি এই হীন মনোভাবে একলা যে মেয়েরাই নীচে নেমে যাচ্ছে তা নয়, এতে পুরুষেরও অধঃপতন হচ্ছে আও বেশী করেই। যে যাকে নীচে রাখে সেই তাকে নীচে টেনে নামায় এটা কবির একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস। 'অপমান' কবিতায় কবি উচ্চনীচ জাতি ভেদের জন্যে 'সমাজের যে ঘোরতর অমংগল ঘটেছে সে কথা বলেছেন—

> "যারে তুমি নীচে রাখ
> সে তোমারে রাখিছে যে নীচে,
> পশ্চাতে ফেলেছ যারে
> সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তেমনি কবি, মেয়ে পুরুষের বেলাতেও, আমাদের সমাজ যে প্রভেদ, যে প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক ক'রে রেখেছে তাতেও যে সমস্ত সমাজের ঘোরতর অকল্যাণ ঘটছে, এ কথা বলতে চান। কোন একজন মেয়ে যখন বিনা প্রতিবাদে এই রকম অপমান সহ্য করে, তখন সে সমস্ত মেয়েদের এবং সংগে সংগে পুরুষ সমাজেরও অকল্যাণ করে। তাই বিপ্রদাস কুমুকে বলে যে তার এই অপমানকে ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে ভাবতে হবে, এবং এর প্রতিকারের জন্যে দুঃখ স্বীকার করতে হবে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের শেষে দেখি সন্তানের প্রতি কর্তব্য বোধে অবশেষে কুমুকে স্বামীর কাছেই—ফিরে যেতে হ'ল। কিন্তু কুমু একথা ব'লে গেল যে একদিন ওদের ছেলে ওদের মানুষ ক'রে দিয়ে সে মুক্তি নেবে! সেদিন সে দাদার কাছেই ফিরে আসবে। সে বলল, মানুষের এমন কিছু আছে যা সন্তানের জন্যেও খোওয়ানো চলে না। মানুষের অন্তরের সেই মুক্তি কামনা নিয়েই একদিন মীরা-বাঈ সংসার ছেড়েছিলেন। নিশ্চয় সেই রাজসংসারের মধ্যেও এমন কিছু ছিল যাতে তাঁর অন্তরের মানুষটি আপন স্বভাবটিকে চরিতার্থ করতে পারেনি, তাই তাকে বেরিয়ে আসতে হ'ল। সমাজের অবিচারের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা নিয়ে কবি লিখেছেন "স্ত্রীর পত্র" গল্প। মেয়ে মানুষ শুধুই সমাজের হাতের পুতুল নয়। যদি সে সংসারের মধ্যে নিজের মর্য্যাদা না পায় তা হ'লে একদিন সে সংসার ত্যাগ ক'রেও চ'লে আসতে পারে। সে শুধুই মেয়ে মানুষ নয়, মানুষও, কবি এই সম্ভাবনা নিয়ে এই গল্প লিখেছেন। যদিও কবি জানেন যে সংসার ত্যাগ করাটা মেয়েদের প্রকৃতির বিপরীত। মেয়েরা একটা কিছু জড়িয়ে ধরতেই ভালোবাসে। তাদের নিজেদের প্রাণের মমতাই তাদের সংসারের সংগে বেঁধে রাখে। এই মমতার সুযোগ নিয়েই পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের প্রতি প্রভুত্ব করবার সুযোগ পায়। তবু এমন কিছু

আছে যেখানে বাধা পেলে সেই মমতামুগ্ধ মেয়ে মানুষও সংসার ছেড়ে চ'লে আসতে পারে।

যেখানে সন্তানের বন্ধন, কুমু সেখানে তা কাটাতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নের মধ্যে যোগাযোগ উপন্যাস শেষ হয়েছে। কিন্তু যদি তা নাও পারে তবু মানুষের অন্তরের মধ্যেই সেই সম্পদ আছে যা নিয়ে সে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত অপমানের মধ্যেও মুক্তি পেতে পারে। এই আশ্বাস নিয়েই কুমু তার স্বামীর ঘরে যাত্রা করল।

আমাদের সমাজে মেয়েদের যে অপমান তা শুরু হয় স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সম্বন্ধের গোড়া থেকেই। বিয়ের যখন সম্বন্ধ হয় তখনই বর এবং বরপক্ষের আচরণে এটা প্রকাশ পেতে থাকে যে পুরুষই প্রভু, আর স্ত্রী তার একান্ত অধীন। এই ধারণা নিয়ে বরপক্ষ কন্যা-পক্ষের সংগে সমস্ত রকম অভদ্র আচরণ করতে এতটুকু চিন্তা করে না। সাধারণ ভাবে মানুষে মানুষে যতটুকু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে চলা দরকার হয় এই বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যে যেন কন্যাপক্ষ বরপক্ষের কাছে সেটুকু ভদ্রতাও আশা করতে পারে না। এর অর্থও এই যে সমাজ মেয়েদের অপমানের চোখে দেখে, তাদের নীচ ব'লে জানে। কুমুর মন যে ধীরে ধীরে কী ক'রে বিরূপ হ'য়ে উঠল কবি তা কুমুর বিয়ের আগে থেকেই নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন। প্রথম থেকেই মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল কন্যাপক্ষকে অপমান করা। তাই সে ষ্টেশন থেকেই বিপ্রদাসের আতিথ্য অগ্রাহ্য ক'রে তাকে ফিরিয়ে দিল। তারপরে বিয়ের দিন বিপ্রদাস যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন কুমু স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাল, আরো দুটোদিন দাদার কাছে থেকে যাবার। কিন্তু স্ত্রীর এই প্রার্থনা শোনার কোন দরকার আছে স্বামী একথা মানল না। এমনি ক'রে মধুসূদন স্ত্রীর ওপরে আপন প্রভুত্ব খাটাতে আরম্ভ করল। এমনি করেই মধুসূদনের সান্নিধ্য কুমুর কাছে মোটর গাড়ীতে ব'সে যেন তার কৌমার্য্যের পবিত্রতার কাছে একটা সংকোচ জাগিয়ে তুলল। কবি লিখেছেন—"যে একটি অতিশয় শুচিতা বোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অংগে অংগে গভীর ক'রে ব্যাপ্ত সেটা সে কর্ণের সহজ কবচের মতো কেমন ক'রে ও হঠাৎ ছিন্ন ক'রে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনও বেজে ওঠেনি।" কবি বলেছেন এমন মন্ত্র আছে যা দিয়ে কুমারীর এই সহজাত সংকোচের দুর্ভেদ্য বাধাকে জয় করা যায়। কিন্তু কুমুর স্বামীর সে মন্ত্র জানা ছিল না। মধুসূদন গরীব থেকে বড়লোক হয়েছে। ধনের প্রতি তার যেমন আসক্তি তেমনি তার বিশ্বাস যে ধনের ক্ষমতা দিয়ে সংসারে সব কিছুই জয় করা যায়। এমন কি ঐশ্বর্য্য বলেই স্ত্রীর ওপরেও অপ্রতিহত অধিকার জন্মায়। সে যখন বিয়ে করে তখন নিজের ধনগৌরব প্রচার ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপরে জয়লাভ করে পুরানো শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই করে। বিবাহের মধ্যে নর নারীর পরস্পরের প্রতি যে সম্ভ্রম থাকা উচিত, আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের মনে সে সম্ভ্রমবোধ থাকে না। কুমুর স্বামী মধুসূদনের মনেও তা নেই, কবি এটাই দেখাতে চেয়েছেন। মধুসূদন মনে করে স্ত্রীকে সে একেবারেই তার অধিকারের মধ্যে পেয়েছে, তার মন প্রাণ হৃদয়ের প্রতি কোন শ্রদ্ধা মধুসূদনের নেই। তার হৃদয় জয় করবার কোন প্রয়োজন আছে ব'লেই সে মনে ক'রে না। জমিদার মধুসূদন ধনী ব্যবসায়ী। সে তার প্রজা আর কর্মচারীদের সংগে যে ব্যবহার করে স্ত্রীর বেলাতে যে তার ব্যতিক্রম করতে হবে একথা তার মনের অগোচর। এই অধিকারজারী নিয়েই বেধে ওঠে বিরোধ। এমন অমর্য্যাদাকর সম্পর্কে মহীয়সী নারীর মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। মহীয়সী নারীর মন ক্ষমতা দিয়ে পাওয়া যায় না—ঐশ্বর্য্য দিয়েও নয়, সে পরাভব মানে শ্রদ্ধাশীল প্রেমের কাছে।

ছোট-শিশু হাবলু কুমুকে এলাচদানা এনে দিয়েছে। সেই-এলাচদানা মধুসূদনের চোখের আড়ালে লুকোবার জন্যে কুমুর প্রয়াস দেখে মধুসূদন ভাবে গরীবের মেয়ে কুমুর এলাচদানার প্রতি লোভ। কুমুর লোভ যে ঐ ছোট্ট শিশুর ভালোবাসার লোভ, ঐ তুচ্ছ এলাচদানার মূল্য যে শিশুর কোমল হাতখানির ছোঁয়াতে অমূল্য হয়ে উঠেছে, মধুসূদন তা বুঝবে

না ব'লেই কুমু ঐ এলাচদানা ওর চোখের আড়ালে লুকোতে চায়। কিন্তু ধনের লোভ, ক্ষমতার লোভ, যার চিত্তকে প্রেমের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে, সে হতভাগ্য কুমুকেও নিজের সমান লোভী, কুমুর লোভকে নিজেরই লোভের সমপর্য্যায়ের জিনিষ মনে করে তাকে খাবার জন্যে প্রচুর এলাচদানা এনে দিয়ে বলে—কত খাবে খাও। তবুও কুমুর মূল্য সম্বন্ধে একেবারে অচেতন থাকতে সে পারে না। ঘুমন্ত কুমুর নিটোল গৌর বাহু দুটির মাধুর্য্য তাকে দুর্নিবার আকর্ষণ করে। এই সৌন্দর্য্য এই গৌরবের কাছে এক একবার সে হার মানতে রাজি হয়, কিন্তু লোভই কুমুর সংগে তার সম্পর্ককে ব্যর্থ ক'রে দেয়। কুমুর হৃদয় জয় ক'রে তাকে পাওয়ার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারে না। লোভী প্রকৃতি ধৈর্য্য জানে না। এমনি ক'রে যেদিন সে সুসময় আসবার আগেই, কুমুকে তার দেহমন দিয়ে আত্মনিবেদনের জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই, অধিকার করল, সেদিন কুমুর চোখে যেন বিশ্বসংসার কালো হয়ে দেখা দিল। দেবতার প্রতিও সে বিশ্বাস হারাল। তার মনে হল "ঠাকুর নারী-বলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি? যে শরীরটার মধ্যে মন নেই—সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? ······তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রী করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে? —যে হাটে মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয় যেখানে নির্মাল্য পাবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সংগে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়···।" প্রেম দিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয় জয় ক'রে তবেই নারীর দেহমনের উপরে অধিকার পাওয়া যায়। প্রেমে এবং প্রতীক্ষায় যে পূজা নারী নিজে নিবেদন করবে, প্রেমহীন, প্রতীক্ষাহীন অধৈর্য্য নিয়ে সেই পূজা কেড়ে নিতে গেলে মহীয়সী—নারীর চিত্ত বিমুখ হয়ে ওঠে।

কিন্তু মহীয়সী নারীর এই সূক্ষ্ম চরিত্রের গৌরব সাধারণ মেয়েরা বুঝতেই পারে না। তাই তারা এই গৌরবকে অক্ষমার চোখে দেখে, এটাকে তারা অন্যায় অহংকার ব'লে মনে করে। 'চণ্ডালিকা' নাটকে চণ্ডালের মেয়ে প্রকৃতি বলছে—"রাজার বংশে দাসী জন্মায় কত, আমি নই সেই দাসী"। দাসীর মনোবৃত্তি নিয়ে অনেক মেয়ে জন্মায়, মহীয়সী নারীর সূক্ষ্ম আত্ম-মর্যাদা বোধ তাদের অনুভূতির অগোচর। এই জন্যেই যে তাকে সম্মান দিয়েছে প্রকৃতি তার কাছে আত্ম-নিবেদনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এই রকম আত্ম-মর্য্যাদা বোধ আছে যে মেয়েদের, তারাই জাতে রাজ-কন্যা। যাদের তা নেই তারাই হ'ল জাতে দাসী। রবীন্দ্রনাথ রাজকন্যা আর রাজপুত্র বলতে এই কথাই বলেছেন, যারা চারপাশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ। কুমু এই রকম অসাধারণ মেয়ে, সে রাজ-কন্যার জাত। কুমুর এই আত্মমর্য্যাদাবোধের সূক্ষ্মতা তার জা মোতির মা বুঝতে পারে না। সে জানে মেয়ে মানুষের একবার বিয়ে হয়ে গেলে সে বন্ধন যেন কোন কারণেই কোন অপমানেই আর খোলা যায় না। সে বলে সেই সাতপাক হাজার উলটো পথে চলতে চাইলেও কিছুতেই খুলবে না। মোতির মা জানে মেয়েরা পুরুষের দাসী। কিন্তু কুমু যে আবহাওয়ায় মানুষ, তাতে একথা সে মেনে নিতে পারে না। তার মনে পড়ে রঘুবংশে আজ ও ইন্দুমতীর কথা। সেখানে কবি কালিদাস—লিখেছেন—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

এর মধ্যে দাসীর উল্লেখ কোথাও নেই। নারী পুরুষের গৃহিণী, তার পরামর্শ দায়িনী সচিব তার সখী রসচর্চ্চায় তার প্রিয়শিষ্যা।

মধুসূদন যখন কুমুর হৃদয় জয় করতে না পেরে ব্যর্থ আক্রোশে শ্যামার প্রতি প্রকাশ্যেই নিজের আসক্তি প্রচার করেই চলতে লাগল, তখন কুমু ছিল তার বাপের বাড়ীতে। অবস্থা দেখে কুমুর জা মোতির মা এবং তার দেওর নবীন তাকে নিয়ে যেতে এল। সব শুনে কুমু যখন বলল যে সে যাবে না তখন মোতির মার কাছে এটা একেবারে বাড়াবাড়ি ব'লে বোধ হল। কবি দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের অপমানে এমনি অভ্যস্ত যে কোন মেয়ে যদি এই অপমান স্বীকার করতে না চায়, যদি প্রতিবাদ করে, তাহলে

অন্য মেয়েরাই তাকে সবচেয়ে বেশী দোষী করে। অনেক দিন থেকে যে জাতের অপমান অভ্যাস হ'য়ে গেছে তার মধ্যে এই চরিত্রের দৈন্য দেখা দেয় যে, তার অপমান বোধের অনুভূতিই চলে যায়, প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাই আর থাকে না। তাই আমাদের দেশের মেয়েদের চরিত্রে এই নীচতা, এই দৈন্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু কুমুর দেওর নবীন কুমুর মনোভাব বুঝতে পারে। মোতির মা যখন কুমুকেই স্বামীর ঘরে ফিরে না যাওয়ার জন্য দোষী করে, তখন নবীন বল্‌ছে—"যে চোখে খোঁচা দেয়, দোষটা যেন তার নয়, যার চোখ দিয়ে জল পড়ে দোষটা যেন তারই।"

কুমুকে কবি যে উঁচুতে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, তাতে আমাদের সমাজে অনেকেই তার প্রতি ঈর্ষ্যা করবে তাতে সন্দেহ নেই। একবার একটি ছোট মেয়ের মুখে সমালোচনা শুনেছি যে কুমুকে নিয়ে কবি যেন বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। কবি নিজেও জানেন যে আমাদের সমাজে কুমুর মত মেয়ে সচরাচর পাওয়া যাবে না। তাই কবি প্রথম থেকেই কুমুর একটা অসাধারণ আভিজাত্যের ছবি আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই আভিজাত্য কুমুর বংশগত সম্পদ। কুমুর দাদা বিপ্রদাস এই আভিজাত্যের প্রতিরূপ। যেমন তার রূপ তেমনি তার মানসিক স্তরের উদার সমুচ্চতা। দাদার সাহচর্য্যেই কুমুর শিক্ষা। সে সর্বতোভাবে তার দাদারই শিষ্যা। অন্য পাঁচ জন সাধারণ মেয়ে সংগিনীর সংগে সে যদি মানুষ হ'ত তা হলে তার প্রতি মধুসূদনের অমর্য্যাদাকর আচরণ তার কাছে এমন অসহ্য লাগত না। কিন্তু দাদার উদার চরিত্রের আবহাওয়ায় কুমু মানুষ। তার লোভ মানুষের স্নেহে, মানুষের শ্রদ্ধায়, উপহারের বস্তুতে নয়। দাদার প্রতি কুমুর যে শ্রদ্ধা তাতে মধুসূদনের একান্ত ঈর্ষ্যা। সে মনে মনে জানে বিপ্রদাস বড়ো জাতের মানুষ। তার সেই উঁচুতে মধুসূদন কিছুতেই উঠতে পারে না। তাই অক্ষম ঈর্ষ্যা নিয়ে সে কেবলি কুমুর ওপরে অত্যাচার করে।

উপন্যাসের উপসংহারে কবি লিখেছেন—মধুসূদন কুমুকে তার বাপের বাড়ী থেকে আনতে গেছে। কুমুকে সে বলে যে শূন্য ঘর কি ভালো লাগে? কিন্তু কুমু যেই বলে যে সে যাবে না, অমনি মধুসূদন তাকে পুলিশের ভয় দেখায়। কুমুর কাছে তার দাদার ঋণের কথা ব'লে তাকে অপমান করে। যদিও মধুসূদন জানে যে কুমুর রাগ করবার অধিকার আছে, কুমুর প্রতি সে অন্যায় করেছে, শ্যামার সংগে প্রকাশ্য আচরণে কুমুকে সে অপমান করেছে, তবু সে আশা করে যে তার প্রসন্নতার ইংগিত পাওয়া মাত্রই কুমু এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, নিজের প্রতিকূল ভাগ্যকে অনুকূল হতে দেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। সে যে আবার অভিযোগের কথা তুলবে, সুপ্রসন্ন ভাগ্যকে উপেক্ষা করবে এতে তার যে প্রভু, তার ধৈর্য্য থাকে না, কেন না সে জানে যে সে নিতান্তই তার প্রভু। স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে যে কোন ত্যাগ কোন সাধনা করতে হবে, অনেক সময়ে একথা পুরুষ মানুষের মনে থাকে না। সে জন্যে যে ধৈর্য্যের সংগে অপেক্ষা করতে হবে, একথা সে জানে না, প্রথম থেকেই অনুকূল আচরণ, সদয় ব্যবহার দিয়ে যে স্ত্রীর চিত্ত জয় করতে হবে, একথা অহংকারী পুরুষ অনেক সময় ভুলে যায়। ধন দিয়ে প্রতাপ দিয়ে অধিকার করতে চায় বলেই স্বামীর অনুদার মনের সংকীর্ণতা কুমুকে প্রতিপদে পীড়ন করতে লাগল।

কবি কুমুর যে ছবি এঁকেছেন তার থেকে মেয়েদের প্রতি তাঁর পূজার দৃষ্টিটি ভারি সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

কবি দেখিয়েছেন, নারী—যেখানে আভিজাত্য-শালিনী, চরিত্রের মহিমায় মহীয়সী—এবং যখন তার অন্তরের রূপে তার বাইরের রূপও উদ্‌ভাসিত, সেখানে পুরুষ অভ্যাস বশত হয়ত' তাকে অপমান করতে যায়, কিন্তু পারে না। তাকে উপেক্ষা করতেও সে পারে না। তাই বারবার দুর্নিবার আকর্ষণে তার কাছে ফিরে ফিরে আসে। তাই কবি দেখিয়েছেন—কুমুকে অপমান ক'রে তার স্বামীর চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। সে বারবার কুমুর কাছে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তবু সে যে কুমুকে তার পাওনা মর্য্যাদা দিতে পারে না, আদর করতে গিয়েও কেবলি

অপমান করে, কুমুর ভালোবাসা চাইতে গিয়ে কেবলি সেই ভালোবাসার উপরে উপদ্রব করে, কুমুর প্রাণের কাছে আবেদন জানাতে গিয়ে আবেদনের মাঝেই ধমকে ওঠে। কবি দেখিয়েছেন এর কারণ এই যে অভ্যাস বশতই মেয়েদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি-ভংগি বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। নিজের অজ্ঞাতেও, নিজের ইচ্ছার প্রতিকূলেও, আদর করতে গিয়েও সে মেয়েমানুষকে অপমান করে বসে।

কুমুকে মধুসূদন আর পাঁচজন মেয়ের মতই মনে ক'রে, সেই ধরণে তাকে খুশী করতে চায়। তাকে গয়না উপহার দিতে আসে। কিন্তু কুমুর উন্নত মন লোভের বশ নয়। লোভ দেখিয়ে সংসারে অনেক কিছুই অধিকার করা যায় কিন্তু অভিজাত নারী-চিত্ত অধিকার করতে হয় সদয় অনুকূল ব্যবহার দিয়ে। নববধূর সংগে প্রথম ব্যবহারে আমাদের দেশে অনেক সময়ই বর ও বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে অপমান করবার চেষ্টা করে। এই অপমানের মধ্যেই বর বধূর চিত্তকে বিমুখ ক'রে তোলে। কিন্তু আমাদের সমাজ মেয়েদের এমন তুচ্ছ ক'রেই দেখেছে যে এদেশে বিয়ে উপলক্ষ্যে বরপক্ষের সতত চেষ্টাই যেন কী ক'রে কন্যাপক্ষকে অপমান করবে! 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কবি তাই দেখিয়েছেন যে বরের এই ঔদ্ধত্য বধূ এবং তার আত্মীয়দের প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব, এর মধ্যেই ভাবী সম্বন্ধের ব্যর্থতার বীজ নিহিত রয়েছে।

কবি জানতেন সব মেয়েই কুমুর সমপর্য্যায়ের নয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কবি মেয়েদের নানা বিভিন্ন জাতের বর্ণনা দিয়েছেন। শ্যামা একজাতের মেয়ে, মোতির মা আর এক জাতের মেয়ে আর কুমুর আভিজাত্য এদের সবার থেকে আলাদা। শ্যামা সেই জাতের মেয়ে যে বাইরের দেহেও মোটা গোলগাল, সুপুষ্ট, সরস; অন্তরের কামনাতেও তার সেই একই স্থূলতা। এই স্থূল মাংসল কামনার বশেই সে ইংগিত পেলেই পুরুষের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। তাকে একদিন ধমক দিলে অন্যদিন উপহার দিয়েও খুশী করা যায়। যেমন রক্ত মাংসের প্রতি, তেমনি উপহারের স্থূল বস্তুর প্রতিও তার সেই একই লোভ। মধুসূদন এইখানেই ভুল করেছে যে সে যে ব্যবহার শ্যামার সংগে করেছে সেই একই ব্যবহার সে করতে গেছে কুমুরও সংগে। কুমুর আভিজাত্য সে উপলব্ধি করতে পারেনি। নরনারীর সম্বন্ধ শ্যামার চোখে যে রকম কুমুর চোখে তা অন্য রকম। তাই শ্যামার সংগে ব্যবহারে ধন, ঐশ্বর্য্য কাজে লাগে। কিন্তু কুমুর কাছে ঐশ্বর্য্যের কোন ক্ষমতাই খাটানো চলে না।

আবার মোতির মা আরেক জাতের মেয়ে। সে সব দিকেই ভালো। অনেক তার বুদ্ধি ও বিবেচনা। তবুও সে কুমুর মনের নাগাল পায় না। মেয়েদের অভ্যস্ত অপমান তার নিতান্তই অভ্যাস হ'য়ে গেছে। সে অপমানে তার চিত্ত অসাড়। বরং কারোকে এর প্রতিবাদ করতে দেখলেই তার কাছে সেটা বাড়াবাড়ি ব'লে ঠেকে। সে বলে ভাসুর যত অপমানই করুন কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে তো পারবেন না! ভাসুরের অন্নে তার যে অধিকার। এমনি অপমান স্বীকার করেও সে শ্বশুর বাড়ীর অন্নে আপন অধিকার মনে ক'রে সে খুশী থাকতে পারে। সে জানে শত অপমানেও মেয়েমানুষের শ্বশুরবাড়ী ছাড়া আর কোন গতি নাই।

এই জাতের মেয়েকে কবি করুনা করেছেন কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধা কুমুর প্রতি। যে মেয়ে আপন আত্মমর্য্যাদা শ্বশুর বাড়ীর পায়ে বিকিয়ে দিতে পারে না।

মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা, এই উপন্যাসে কুমুর বর্ণনায় ক্ষণে ক্ষণে কী সুন্দর হয়েই না ফুটে উঠেছে। অতি সহজ বেশে অতি নিরাভরণ দেহেও নারীর কী অপরূপ সৌন্দর্য্যই কবি ক্ষণে ক্ষণে দেখেছেন। কবি বর্ণনা করছেন—"এক রকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয়, যেন একটা দৈব আবির্ভাব। পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মত রাতের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে।"

"কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করল। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইল। সাদাসিধে একখানি লাল পেড়ে শাড়ি পরা। শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপরে টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব।"

"কুমুদিনী বেরিয়ে এল, যেন সে স্বপ্নে পাওয়া। যে কাপড় পরা ছিল তাই আছে। এতো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতাওয়ালা ব্রাউনরঙের সার্জের জামা। একটা লাল পেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল—একখানি অপরূপ ছবি।" নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকর মুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধহয় এক কালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারি বালা তার সুকুমার হাতকে যে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ওই অলংকারটা ওর শরীরে একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয়নি।

কবি লিখেছেন—"মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে একথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না।"

কবি লিখেছেন—"সংসারে যে সব লোকের সংগে মধুসূদনের সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ, তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধন গৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ওই যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হ'ল, যদি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হতুম, তা হ'লেই ওকে এ ঘরে মানাত।"

কবির আঁকা মহীয়সী—সুন্দরী নারীর আর একখানি ছবি—"গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনু দেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরণা, থেমে আছে মনে হয় না, কেবলই যেন চলছে—যেন কোন একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অংগকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, কিছুতে শেষ করতে পারছে না।" এই মুগ্ধ কালো চোখের দৃষ্টি কবির আপনার। নারীর রূপ দেখে, তার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখে কবির যেন কিছুতে তৃপ্তি হয়নি, আশ মেটেনি।

কবি লিখেছেন, ওদের দেওয়া দামী কাপড় পরেনি দেখে মধুসূদনের রাগ হ'ল কিন্তু তবু রাগ করতে পারছে না। সে ভাবছে—"কিন্তু হায়রে কী সুন্দর, কী আশ্চর্য্য সুন্দর। আর দৃপ্ত এই অবজ্ঞা, সে ও যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে, ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে—ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না—মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে।

আর একখানি ছবি—"কুমু চোখ নীচু ক'রে সোফার প্রান্তে নীরবে বসে রইল। শাড়ির লালপাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সংগে সংগে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন করে আছে এক গাছি সোনার হার।...তখনও জামা পরেনি। ভিতরে কেবল একটি সেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে ন্যস্ত। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ওইখানে যেন উদ্বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, আর চোখ ফেরাতে পারলে না, মোটা সোনার কাঁকন পরা ঐ দুখানি হাতের থেকে।"

এই যে শুভ্র সুকুমার রূপবর্ণনা, এর থেকেই বোঝা যায় নারীর সৌন্দর্যের মধ্যে কবির যে আনন্দ তাও ঐ রকমই শুভ্র এবং সুকুমার। নারীর এই রূপই একদিন দেখেছিলেন চণ্ডীদাস—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।"

কবির রূপ বর্ণনা থেকে আর একটা কথা আমরা বুঝতে পারি। কবির চোখে সহজ বেশেই মেয়েদের সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে। সাজে সজ্জায় আড়ম্বরে আসল রূপ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এই কবির মনোভাব। এ কথাটা কবি অনেক জায়গায় বলেছেন। 'চিরকুমার সভা' বইতে পুরবালা বলছে স্বামীকে, তুমি যেদিন আমায় দেখতে এলে মা বুঝি আমায় সাজিয়ে দেন নি? বেচারা পুরবালা—আপন সহজরূপের মাধুর্য্যটুকু জানেও না। তাই সে বেচারার ধারণা অক্ষয় তার সাজ দেখেই ভুলেছে। কিন্তু অক্ষয় জবাব দেয়—"আমি ভাবলাম, সাজেও যখন একে মানিয়েছে, তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কত শোভা হবে।" কবি বলতে চান সাজ নিয়ে সৌন্দর্য্যকে চাপা দেবারই কাজ হয়, তবু পুরবালার সৌন্দর্য্য এমনি যে তা সাজের মধ্য থেকেও সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না, ফুটে ওঠে। কবি বলেছেন—

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে,
নিজের ধন কি নিজে চুরি করে লবে?"

আভরণ শুধুই সৌন্দর্য্যের আবরণ। কবি গান গেয়েছেন—

"তুমি অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো—"

কজ্জল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো,
তুমি না কহিয়া কিছু
আপনার কাজ
নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো।”

নারী রূপের মোহিনী এমনিতেই বেশী। মনোহর সাজ দিয়ে তাকে বাড়াবার চেষ্টা নিষ্ফল। “তাসের দেশে” কবি ক্ষোভ ক’রে ব’লেছেন—“মানুষরা চ’তে চায় তাস। ওরা খুরওয়ালা জুতো পরে পায়, ঠোঁটে লাগায় রং।” এমনি ক’রে জুতো দিয়ে পায়ের সহজ সৌন্দর্য্য ঢেকে যায়। ঠোঁটের স্বাভাবিক লাবণ্য রংয়ের তলায় চাপা পড়ে যায়, এতে কবির দুঃখ। নারী তার সহজ রূপেই কবির মন ভুলিয়েছে। ‘শেষের কবিতা’য় কবি কেতকীর বর্ণনা করেছেন, কেমন ক’রে অন্তরের সত্য আবেগের মুখে তার কৃত্রিম রং করা দুই গাল বেয়ে সহজ চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। কেতকী মুখে রং মেখে তার সহজ রূপকে চাপা দিয়েছে। কিন্তু তার চোখের জলে এই কথাটাই প্রমাণ হ’ল যে রং মেখেও সে আপন স্বাভাবকে চাপা দিতে পারেনি। কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ ক’রে বেরিয়ে এল তার সহজ চোখের জল।

নরনারীর মধ্যে কবি দেখেছেন এক সাম্য। কিন্তু আমাদের সমাজে এ সাম্যবোধ নেই। এখানে পুরুষ প্রভু নারী তার দাসী এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু আমাদের পুরানো সাহিত্যে নরনারীর সাম্যের কথাই আমরা পাই। ‘রঘুবংশে’র আরম্ভে কবি কালিদাস বলেছেন—

“বাগর্থাচিরসম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।”

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে নর ও নারী জগতের মাতা ও পিতা। তারা বাক্য ও অর্থের মত পরস্পরের সংগে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এর মধ্যে নারীর প্রতি যে সাম্য, যে শ্রদ্ধার কথা আছে, আমাদের সমাজে কিন্তু তা নেই।

আমাদের ধনী ঘরেও অন্তঃপুরের যে অবস্থা, তার থেকেও এটাই প্রমাণ হয় যে আমরা মেয়েদের কতটা তুচ্ছ করি। কবি এই কথাটাই বোঝবার জন্যে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে অত্যন্ত ধনী ঘোষাল পরিবারের সদর ও অন্দরের এই বর্ণনা দিয়েছেন—

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠানে আবর্জনা, সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই। উঠানের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্নাঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে, তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙ্গা গামলা, ছিন্ন ধামা জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশীকৃত। অপর প্রান্তে গুটি দুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমছে এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। অন্তঃপুরে এই একটু মাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমি বাইরের দিকে, সেটা লতা মণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুড়কি দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্ত্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

কবি এই বর্ণনার মধ্যে কী বলতে চান? এই যে সদর ও অন্দরের ব্যবস্থা করেছে, এটা পুরুষ মানুষই করেছে। তারা মেয়েদের জায়গা করেছে রান্নাঘরের ধোঁয়া কয়লা, আস্তাকুড় আর গোয়ালেরই মধ্যে। যে ধনী, যে সুব্যবস্থা করতে পারে, সেও মেয়েদের জন্যে আলো হাওয়া আর খোলা মাঠ বাগানের ব্যবস্থা করে না। সে মনে করে না যে মেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখবার কোন দরকার আছে। মেয়েরা যেন গরু বাছুরেরই তুল্য। গোয়াল, রান্নাঘর আর আস্তাকুঁড়ের পাশেই যেন তাদের উপযুক্ত জায়গা। ঠিক এই বর্ণনাই কবি দিয়েছেন ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে। সেখানেও সম্পন্ন গৃহস্থের সদর ও অন্দরের এই রকম ব্যবস্থা। সেখানে আতুর ঘরের ব্যবস্থা দেখে ইংরাজ ডাক্তার বিরক্ত হ’য়ে বকাবকি করে। অন্দর মহলের প্রতি পুরুষের এই ঔদাসীন্য মেয়েদের প্রতি তাদের অবজ্ঞাকেই প্রকাশ করে। আর মেয়েদের এমনি অবজ্ঞা ক’রে আমাদের দেশের পুরুষ সমাজ তাদের পৌরুষের অভাবকেই ঘোষণা করে। তাদের যদি পৌরুষ থাকত তা হ’লে তারা মেয়েদের সুখ-সুবিধার প্রতি এমন উদাসীন হ’য়ে থাকত না।

‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে কবি আমাদের দেশের সমাজের ছবি এঁকেছেন। আমাদের সমাজে মেয়েদের দুর্গতির কথা লিখেছেন। (ক্রমশঃ)

সুপর্ণা দেবী

প্রাচীন হিন্দু-সমাজের সৌখিন-বিলাসী নর-নারীদের 'অঞ্জনধারণ' রীতির মতোই, পরবর্ত্তী আমলের ভারতীয় মুসলমান সমাজেও নেত্র শোভা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, সুর্ম্মা, কাজল প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারেরও ব্যাপক প্রসারতা ছিল। সে রীতি আজও ভারতীয় মুসলিম সমাজের সকল স্তরেই সাদরে অনুসৃত হয়ে আসছে। মহাকবি কালিদাসের মতোই প্রাচীন আমলের বহু মুসলমান কবি-গীতিকার স্বীনেত্রের সুর্ম্মা শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁদের অমর লেখনীতে যে সব সরস বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তার নিদর্শন আজও মেলে বিবিধ উর্দ্দু, ফারসী, শ্যের, বয়েৎ প্রভৃতির মাধ্যমে।

নেত্র-প্রসাধন কলারীতির মতোই। আলতা বা অলক্তক-রাগে পদ-রঞ্জনের প্রথাও সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় হিন্দু-সমাজে সুপ্রচলিত হয়ে আসছে। শুধু পদ-রঞ্জনই নয়, হাতে-গালে-কপালে প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে অলক্তক-চিহ্ন ধারণের অভিনব বিচিত্র যে রীতি প্রাচীন ভারতীয় সৌখিন-সমাজে সবিশেষ সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও, হিন্দুধর্ম্ম ও প্রসাধন-কলার সেই সনাতন ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রাচীন যুগের বিবিধ পৌরাণিক কাহিনী, লোক-গাথা, কাব্য সাহিত্য নাটকেও সেকালের এই বিশিষ্ট প্রসাধন কলারীতির প্রচুর উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন বৈদিক-যুগ থেকে অধুনাকালাবধি ভারতের হিন্দু-সমাজে সীমন্তে সিন্দুর-চিহ্ন ধারণের মতোই, অলক্তক রাগে পদ-রঞ্জনের অভিনব প্রথাটি প্রত্যেক সধবা নারীর পক্ষেই পরম সৌভাগ্য ও বিশিষ্ট গৌরবের লক্ষণ হিসাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। পরবর্ত্তীকালে ভারতে ইসলাম ধর্ম্ম সভ্যতা-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের মুসলমান-সমাজেও হিন্দুদের অলক্তক রঞ্জনানুরাগের মতোই মেহেদী পাতার বিচিত্র বর্ণে হস্ত পদ কেশ রঞ্জিত করার সৌখিন রীতি নিত্য নৈমিত্তিক প্রসাধন কলার অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ রীতির ব্যাপক প্রচলন ভারতীয় মুসলিম সমাজে আজও যথেষ্ট নজরে পড়ে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিলাসী-সৌখিন নর-নারীদের মধ্যে অঙ্গরাগ প্রসাধনের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ ছিল—বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি তৈল, গন্ধ-বারি, সুরভিত চূর্ণ প্রভৃতির ব্যবহার। এমন কি, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, পূজা আরাধনা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান ও লৌকিক উৎসবাদিতেও বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি উপকরণ ব্যবহারের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য নাটকেও সেকালের নর-নারীদের সুগন্ধি উপকরণাদি ব্যবহারের এই অভিনব-অনুরাগের যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। বিবিধ প্রকার সুগন্ধি তৈল অনুলেপনে অঙ্গ মর্দ্দন, গন্ধ-বারি ব্যবহারে স্নান, সুরভিত-চূর্ণ সহকারে গাত্র-সুবাসিত করা এবং বিভিন্ন মনোহর গন্ধদ্রব্য সেবনে অঙ্গরাগের রীতি প্রাচীন ভারতীয় সৌখিন-বিলাসী সমাজে যে সবিশেষ সমাদর লাভ করেছিল—মহাকবি কালিদাস, কাহিনীকার বাণভট্ট প্রভৃতি অমর-রচয়িতাদের রচনায় তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে ভারতের মুসলিম সমাজের বিলাসী-সৌখিন নর-নারীদের মধ্যে গোলাপ-জল, আতর, কেওড়া প্রভৃতি বিভিন্ন সুগন্ধি উপকরণাদি ব্যবহারের বহুল রেওয়াজ ছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সৌখিন বটুয়া-থলি

সুধীরা হালদার

সচরাচর বাড়ীতে সেলাইয়ের সাজ সরঞ্জাম, পশম বোনার উপকরণাদি রাখা কিম্বা বাজারে দোকানপাট ঘুরে টুকিটাকি নানা রকম জিনিষপত্র কিনে আনার জন্ম মহিলারা আজকাল বেত-কাঠির, চামড়ার, প্লাষ্টিকের, চট-ক্যানভাসের আর খদ্দর-জাতীয় কাপড়ের তৈরী বিভিন্ন ধরণের যে সব রঙীন সুন্দর সৌখিন বটুয়া-থলি, 'হোল্ডল ব্যাগ' প্রভৃতি ব্যবহার করেন, এবারে তেমনি ধরণের সুদৃশ্য অভিনব একটি কারু-শিল্প সামগ্রী রচনার মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে, যে সব মহিলারা নিজের হাতে সূচীশিল্প চর্চ্চা করতে ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে, এ ধরণের সৌখিন সুন্দর এবং নিত্য আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র রাখবার উপযোগী হোল্ডল ব্যাগ (Holdall Bag) বা 'বটুয়া থলি' রচনা করা এমন কিছু কঠিন নয়...বরং অল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প আয়াসে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন এবং পছন্দ মতো ছাঁদে এ সামগ্রী বানিয়ে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে—এমন কি, ইচ্ছা হলে, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী বা অন্য আরো নানা রকমের ঘরোয়া বা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আত্মীয় বন্ধুদেরও সানন্দে উপহার দিতে পারবেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় এই সৌখিন সুন্দর "হোল্ডল ব্যাগ' বা 'বটুয়া থলিটি' দেখতে কেমন ধরণের হবে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় নীচের ছবিতে দেওয়া হলো। এই ধরণের 'বটুয়া থলি' বা 'হোল্ডল ব্যাগ' রচনার জন্ম যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার মোটা-মুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। প্রসঙ্গালোচনার সুবিধার্থে, ধরে নেওয়া যাক যে সৌখিন সুন্দর এই 'বটুয়া থলিটি'

বটুয়া-থলির নক্সা

তৈরী হবে—১৫" ইঞ্চি লম্বা এবং ১১½" ইঞ্চি (১৫" × ১১½") মাপের। এই মাপ অনুসারে 'বটুয়া থলিটি' রচনা করার জন্য চাই—১৫" ইঞ্চি লম্বা ও ১১½" ইঞ্চি সাইজের দুইখানি রঙীন 'ফেল্ট' (Felt) কিম্বা ভালো পশমী কম্বল অথবা ক্যানভাস, খদ্দর বা দো-সুতী জাতীয় মজবুত মোটা এবং খাপি ধরণের কাপড়। 'বটুয়া থলির' চারপাশের কিনারায় সুদৃশ্য পাড় (Border) বসানোর উপযোগী ও সেলাইয়ের কাপড়ের সঙ্গে মানান সই দেখায়—এমন ধরণের গজ খানেক লম্বা কাপড়ের ফালি. 'বটুয়া থলির' চারিদিকে 'পাইপিং' (Piping) রচনার জন্ম ¾" ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ৬০" ইঞ্চি লম্বা মাপের আরো খানিকটা মানানসই ধরণের কাপড়ের ফিতা এবং সচরাচর দর্জ্জীরা পোষাক পরিচ্ছদের 'আস্তরের' জন্ম যে ধরণের মোটা 'আস্তরণ বস্ত্র' (Tailor's Canvas) ব্যবহার করে থাকেন, সেই জাতীয় ১৪¾" ইঞ্চি × ১১¼" ইঞ্চি মাপের খাপি মজবুত কাপড়। এছাড়া আরো চাই—'বটুয়া থলির' বহির্ভাগে (Outer Side) অর্থাৎ, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের সুদৃশ্য-সৌখিন ফুল-পাতা কিম্বা অন্য কোনো ছাঁদের আলঙ্কারিক কারুকার্য্যের নক্সা

এমব্রয়ডারী করার জন্য প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রঙের কয়েক 'ফালি' (Strands) রেশমী (Silk-thread) বা পশমী (Woolen chord) সুতো এবং 'বটুয়া-থলির' অন্তর্ভাগে (Inside) 'আস্তর' (Lining) সেলাইয়ের উপযোগী মজবুত-ধরণের ও প্রয়োজনানুযায়ী-মাপের কাপড়।

ফর্দ্দ মতো উপকরণগুলি সংগ্রহের পর, সেলাইয়ের কাজে হাত দেবার আগে, বড় একখানি কাগজের উপর প্রয়োজনানুযায়ী-মাপে ও আগাগোড়া নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে 'বটুয়া-থলির' নক্সাটি এঁকে নেবেন। তারপর সেলাইয়ের কাপড়ের টুকরোগুলির উপর নক্সা আঁকা সেই কাগজখানি বিছিয়ে, চিত্রিত-কাগজের নীচে পরিষ্কার একখণ্ড 'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon-Paper) রেখে পেন্সিলের রেখা টেনে নিখুঁত পরিপাটিভাবে সম্পূর্ণ নক্সা চিত্রটিকে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিতে হবে। তাহলেই সেলাইয়ের কাপড়ের উপর বেশ সুষ্ঠুভাবে 'বটুয়া-থলির' 'নক্সা-চিত্র' রচনার পর্ব্ব সারা যাবে।

এবারে কাপড় ছাঁটাইয়ের পালা। প্রথমেই 'সন্থ ট্রেসিং করা' নক্সা প্রতিলিপির রেখানুসারে পরিপাটি নিখুঁত ছাঁদে, 'ফেল্ট' বা 'বটুয়া থলির' বহিঃর্ভাগের কাপড়ের টুকরো দুটিকে ছাঁটাই করে নিন—১৫" ইঞ্চি লম্বা এবং ১১½" ইঞ্চি মাপে। তবে বহির্ভাগের কাপড়ের টুকরো দুটি-ছাঁটাইয়ের সময়, চারিদিকের কিনারায় ৮" ইঞ্চি 'বাড়তি কাপড়' (Additional Space) রাখবেন —পরে অন্তর্ভাগের 'আস্তরের' অংশ ও কিনারার চারিদিকে 'পাড়' ও 'পাইপিং' সেলাইয়ের জন্য। এ কাজ টুকু শেষ হলে নানা রঙের এমব্রয়ডারী সুতোর সাহায্যে 'বটুয়া থলির' বহির্ভাগের ছাঁটাই করা টুকরো দুটির উপরে ফুল পাতার বা পছন্দমতো অন্য কোনো আলঙ্কারিক নক্সার প্রতিলিপি সেলাই করে নেবেন। প্রয়োজনবোধে, এমব্রয়ডারি সেলাইয়ের বদলে নানা রঙের মানানসই কাপড়ের টুকরো সেলাই করেও অভিনব বিচিত্র ছাঁদে এ ধরণের আলঙ্কারিক নক্সার কাজ ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এমন কি, কাজের সুবিধার জন্য—'বটুয়া থলির' বহির্ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই 'অন্তর্ভাগের' ও 'আস্তরের' কাপড়ের টুকরোগুলিরও ছাঁটাই করে নেওয়া যায়। এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের সময় নক্সার লাইনগুলি রচনা করবেন—'চেন ষ্টিচ্' (chain Sitch)' 'ফেদার ষ্টিচ্' (Feather Stitch) 'বাটনহোল-ষ্টিচ' (Buttonhole-Stitch), 'কোরাল্ নট্' (Coral-Knot) এবং 'একানে ফ্লাই-ষ্টিচ্' (Single Fly Stitch) সেলাই পদ্ধতিতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে। এমব্রয়ডারীর কাজ সারা হলে, 'বটুয়া থলির' বহির্ভাগের কাপড়ের দুটি অংশের সঙ্গে ছাঁটাই করা 'আস্তরের' কাপড়ের টুকরো সেলাই করতে হবে। তারপর 'পাইপিঙের' লম্বা ফিতা কাপড়টিকে আধা-আধিভাবে দু'ভাঁজ করে 'বটুয়া-থলির দুদিকের দুই অংশের অন্দর ভাগে পরিপাটি ছাঁদে বসিয়ে সেলাই করে জোড়া দিয়ে নেবেন। এ কাজ শেষ হলে, 'বটুয়া থলির' অন্তর্ভাগের 'লাইনিং' বা 'আস্তরের' কাপড়ের অংশ দুটিকে সেলাই করে জোড়া লাগালেই, রচনার পালা মিটবে।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি সূচীশিল্প সামগ্রী রচনার কলা কৌশলের কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো। ———

।।। নিরুদ্দেশ ।।।

[বড় গল্প]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন দুপুরে সরোজ কোর্টে বেরিয়ে গেছে, অলক স্কুলে, অপু আপন মনে অনেকগুলো পুতুল নিয়ে বিড়বিড় করে বকছে আর খেলাঘর সাজাচ্ছে, বাচ্চা দুটোকে খাটে শুইয়ে রেণু দক্ষিণের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল এমন সময় কে যেন সদর দরজায় নাড়া দিলে। কান খাড়া করে রেণু শব্দ শুনে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলতে গেল। এ সময়ে কে আসবে? ঝি-এর আসার সময় নয়। তা ছাড়া ঝি বা সরোজ কেউই এভাবে দরজা নাড়ে না।

দরজা খুলে রেণু দেখলে অচেনা এক ভদ্রলোক; সঙ্গে একটি মহিলা, একটি আঠারো-কুড়ি বছরের মেয়ে এবং আরও দুটি ছেলে মেয়ে। ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের হাতে কয়েকটা পোঁটলা পুটলী, গাড়ীর গাড়োয়ান একটা বড় তোরঙ্গ গাড়ী থেকে নামাচ্ছে।

ভদ্রলোক রেণুকে দেখে বল্লেন, এটা কি সরোজ গাঙ্গুলীর বাড়ী, মন্সেফ সরোজ গাঙ্গুলী।

রেণু বলেছিল, হ্যাঁ।

তোমার নাম ত রেণু?

রেণু সবিস্ময়ে উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ।

রেণু ওদের কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারলে না।

ভদ্রলোক গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মহিলাকে বল্লেন চল চল, ভেতরে চল। ছেলেদের লক্ষ্য করে বল্লেন, ওরে তোরা সব ভেতরে চল্, একটা একটা জিনিষ হাতে করে নে। আর রেণু তুমি ঐ তোরঙ্গটা নিয়ে এস।

তোরঙ্গটায় হাত দিয়ে রেণু দেখলে ভয়ানক ভারী। একা এইটা নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে ইতস্তত: করতে লাগল।

ভদ্রলোক বল্লেন, কি ওটা নিতে পারবে না?

রেণু বল্লে, ভয়ানক ভারী যে।

ভদ্রলোক বল্লেন, ঠিক আছে, তুমি ঐ দিকে ধর আমি এদিকটা ধরছি।

মহিলাটি খেঁকিয়ে উঠল, আদ্‌সা! অত বড় গতর, ক্ষমতা নেই এক ফোঁটা। তারপর ধমক দিয়ে বল্লে, তুমি ছাড়ো, তোমাকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না, আমি ধরছি।

রোগা হাড়-বার করা মহিলার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। তোরঙ্গটা রেণুর সাহায্যে ভদ্রমহিলা শোবার ঘরে এনে রাখলে।

ভদ্রলোক নিজেই পরিচয় দিলেন। আমি হচ্ছি সরোজের আপন মামা শ্বশুর, উনি আমার স্ত্রী, এরা আমার ছেলে মেয়ে—

মহিলা খেঁকিয়ে উঠল, হয়েছে হয়েছে, ঢের হয়েছে। ঝি-এর কাছে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, লজ্জাও করে না।

ভদ্রলোক চুপ করে গেল। মহিলাটি বল্লে, তোমাদের কূয়াতলাটা কোথায়, হাত মুখ ধুতে হবে না?

রেণু ভয়ে ভয়ে আঙুল দিয়ে স্নানঘরটা দেখিয়ে দিলে।

হাত মুখ ধুয়ে আসতেই ছেলেটা মাকে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বল্লে। মা বল্লে হচ্ছে হচ্ছে, পোর পেট ভরাবার ব্যবস্থাই করছি। রেণুকে বল্লে, কি গো, তোমাদের চা-ফা করার ব্যবস্থা কোথায়?

হঠাৎ রেণুর ছেলেটা কেঁদে উঠল। রেণু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে চাপড়াতে লাগল।

মহিলাটি খাটের ধারে এসে দেখলে, দুটো ছেলে।

বল্লে, কোনটা কার ছেলে। পোষাক আশাক ত একই রকম দেখছি।

রেণু নিজের ছেলেকে চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লে, আ॰ কথা বলুন, জেগে উঠবে।

মহিলা সমানে চেঁচিয়ে বল্লে, তা বলা হচ্চে। কিন্তু কোনটা কার শুনি। কোনটাই বা বাবুর ছেলে আর কোনটাই বা ঝি এর ছেলে। তুই ত রাজপুত্তুর, খাটে শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

রেণু এ কথার কোন জবাব দিলে না। সমস্ত মন তার বিষিয়ে উঠেছে।

কি গো কথার জবাব দিলে না যে। বলি এত দেমাক কিসের শুনি?

রেণু বল্লে, ঐটি বাবুর ছেলে।

এই যে একসঙ্গে দুজনকে পালং-এ শুইয়ে রেখেছ, বাবু জানে?

বাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন, রেণু উত্তর দিলে।

ও বাবা, ফোঁস্ কেউটে! কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াত তার ঠিক নেই, এখন একেবারে—

তুমি থাম ত মা, বড় মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

কেন, থাম্‌ব কেন লো ছুঁড়ি, তোর বড় বাড় হয়েছে, গাছে না উঠতেই এক কাঁধি! রেণুকে লক্ষ্য করে মহিলাটি বল্লে, ওগো রাজরাণী, তুমি তোমার ছেলে নিয়ে সোহাগ কর, কিন্তু দয়া করে একবার রান্নাঘরটা দেখিয়ে দাও একটু চা তৈরী করে নি। এ সময় চা না হলে ওঁর আবার মাথা ধরে একসা হবে।

রেণু ছেলের গায়ে কাঁথা গাট করে চাকা দিয়ে খাট থেকে নেমে এসে ধীরে ধীরে বল্লে, চায়ের ব্যবস্থা ত কিছু নেই, এ বাড়ীতে কেউ চা খায় না।

খায় না? মিথ্যে কথা। আমি জানি সরলা রোজ দুবেলা চা খেত! চা না হলে তার এক দণ্ড চল্‌ত না।

সরলা নামটা রেণু আগেই শুনেছিল, সরোজের স্ত্রীর নাম সরলা। কিন্তু তাকে চা খেতে রেণু কোনদিন দেখে নি। অবশ্য রেণু তাকে শেষ অবস্থায় দেখেছিল, তখন হয়তো ডাক্তার চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কি গো, চায়ের ব্যবস্থা করে দেবে না?

রেণু বল্লে, চায়ের ব্যবস্থা কিছু আছে বলে আমি জানি না। এখন ত বাড়ীতে কেউই চা খায় না।

ভাল, হতাশ হয়ে মহিলা উত্তর দিলেন। তাহলে খাবার-টাবার কি আছে? যা হয় কিছু মুখে দিতে হবে ত, না বাবু আসা পর্য্যন্ত টাঙানো থাক্‌ব?

ভেবে চিন্তে রেণু বলে, তৈরী ত কিছুই নেই।

তা হলে আনিয়ে দাও, সন্ধ্যে অবদি ছেলেগুলো থাকবে কি করে?

রেণু বল্লে, কোথা থেকে আনব, আমি—

বাধা দিয়ে মহিলা বল্লে, শোন কথা একবার. এতবড় বর্দ্ধমান সহরে খাবার পাওয়া যাবে না। কি যে বল তুমি?

রেণু বল্লে, আমি ত বাইরে বেরুই না।

ওঃ, একেবারে কুলের কুলবধূ! কোথায় পথে পথে ঘুরে মরত, তার ঠিক নেই, এখন একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা হয়েছেন। স্বামীর দিকে মুখ করে বল্লে, ওগো, তুমি যা হয় ব্যবস্থা কর বাপু, আমি একে নিয়ে পারলুম না।

দম্ দম্ করে মেঝে কাঁপিয়ে মহিলাটি পাশের ঘরে স্বামীর কাছে চলে গেল।

ভদ্রলোক ও ঘর থেকেই বল্লেন, সরোজ কোর্ট থেকে ফেরে কখন?

সাড়ে পাঁচটা নাগাধ। রেণু এঘর থেকে উত্তর দিলে।

মহিলা স্বামীকে বল্লে, বোঝো ঠেলা; এখন বোধ হয় মোটে তিনটে, কি তাও বোধ হয় নয়।

রেণু ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে বল্লে, ঘি ময়দা আছে, তরকারীও আছে, কিছু তৈরী—

এতক্ষণ বলতে হয়? মহিলা খেঁকিয়ে উঠল! যা আছে বার কর, না হয় নিজেরাই তৈরী করে নিই। তুমি দুম্বো গতর নিয়ে বসে ছেলের সোহাগ কর গিয়ে।

অনেকগুলো ময়দা নিয়ে অনেকখানি ঘি-এর ময়েন দিয়ে মহিলা নিজেই মাখতে বসল। রেণু উনান ধরবার ব্যবস্থা করতে লাগল, মেয়েটি আলু কুটতে বসল। মহিলা মেয়েটিকে নির্দ্দেশ দিলে, আলুর দম হবে, ঘি গরম মশলা দিয়ে, সেই হিসেবে আলু কুটবি শৈলী।

ভদ্রলোক ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লেন, আবার সব হাঙ্গাম করতে—

তুমি থাম্ ত, হেঁজিপেঁজি হাঘরে ঘরে ত আসি নি যে পেট হাতে করে বসে থাকতে হবে।

ভদ্রলোক থেমে গেলেন। মহিলা বল্লে, তুমি বরং যাও। কাছাকাছি দোকানে-ফোকানে কোথাও যদি চা পাও ত খেয়ে এস। আচ্ছা বাড়ী বাবা, লোকজন এলে একটু চা দেবার মুরোদও নেই।

চারটে নাগাদ পেটভরে সকলেই লুচি আলুরদম খেয়ে নিলে। রেণু এখন দুটো বাচ্চা নিয়ে ওদের খাওয়া ও তদ্বির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে ঠিকে ঝি এসে বাসন মাজ্‌তে বসেছে।

মহিলা বল্লে, সরোজের সব তাইতেই বাড়াবাড়ি, ঝি-এর জন্য ঝি রাখা হয়েছে, ঘেন্নাও করে না।

এই সব ভিড়ের মধ্যে অপু যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ তাকে দেখতেও পায় নি। রেণু বাচ্ছা দুটোকে সাম্‌লাতেই সাম্‌লাতেই অলক স্কুল থেকে এসে বাইরের ঘরে বই পত্তর রেখে ভেতরে অচেনা লোক দেখে রেণুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা কারা দিদি?

মহিলা দৌড়ে এসে অলককে টেনে কোলে তুলে, ওরে আমার সরলা রে তুই কোথায় গেলি রে, এমন সোনার সংসার ফেলে তুই কেমন করে আছিস্ রে বলে সুর তুলে বিকট শব্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। অলক ওর কোল থেকে নামবার জন্য আকুলি বিকুলি করতে লাগল, কিন্তু মহিলার শোক এমন উৎকটভাবে উথলে উঠেছিল—

কি একটা কারণে সরোজ আজ সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরেছিল। বাড়ীর বাইরে থেকে কান্না শুনে দ্রুতপদে ভেতরে ঢুকে একেবারে তাজ্জব! কি ব্যাপার?

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে জিজ্ঞাসা করলে, এই যে বাবা সরোজ, কেমন আছ? এই এতক্ষণে ফিরলে?

সরোজ সংক্ষেপে হাঁ বলে তাড়াতাড়ি মহিলার দিকে এসে অলকের হাত ধরে বলে, নামিয়ে দিন, নামিয়ে দিন ওকে—

এ কি নামিয়ে দেবার জিনিষ বাবা, একি নামিয়ে দেবার জিনিষ? এযে আমার সরলা মায়ের বুকের ধন বাপ্—অলক তখন একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছে।

বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে সারাজ বলে, নামিয়ে দিন্ বল্‌ছি, অত বাড়াবাড়ি করবেন না।

মহিলা এবার আত্মসংবরণ করলে। অলককে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে, আহা বাছা আমার ইস্কুল থেকে এসে এখনও মুখে জলটুকু পর্যন্ত দেয়নি—

কি করে দেবে, সরোজ গর্জন করে উঠল।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মহিলা বল্লে, ওকে দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি বাবা, স্থির থাকতে পারিনি ওর মুখে যেন সরলার মুখখানা অবিকল বসানো রয়েছে, আহা ছেলেবেলায়—ভদ্রমহিলা পুনবায় চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

অলকের হাত ধরে সরোজ ঘরে ঢুকে রেণুকে দেখে বল্লে, কি হচ্ছে এ সব? ছেলেটাকে দেখ নি?

রেণু বল্লে, কি করব? ওঁরা যা করছেন—

সরোজ জুতো মোজা খুলতে খুলতে রেণুকে বল্লে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

রেণু দরজা বন্ধ করে দিলে।

সরোজ বল্লে, খাবার করা আছে।

আছে।

এ ঘরে নিয়ে এস, বলেই অলককে সঙ্গে নিয়ে সরোজ হাত মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে খাওয়া সরোজ একেবারেই পছন্দ করত না, কিন্তু সেই সরোজ শোবার ঘরেই খাবার আনতে বল্লে। রেণু একটু ইতস্তত: করে দুপুরের তৈরী হালুয়া, বড় ফ্লাস্ক ভর্তি দুধ, মর্ত্তমান কলার ছড়া এবং কালাকাঁদ সন্দেশের কৌটো ভাঁড়ার ঘরের জালের আলমারী থেকে এনে এ ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রাখলে। ও ঘর দিয়ে আসবার সময় ভদ্রলোক, মহিলা এবং ছেলেদের নজর পড়েছিল মর্ত্তমান কলার ছড়াটার ওপোর, বাকীগুলো, সমস্তই কৌটায় ছিল। ফ্লাস্কটাও তারা দেখতে পেয়েছে। রেণু বেশ বুঝলে, তারা পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে।

এ সব খাবারের ব্যবস্থা রোজই থাকে। সরোজ ও

অলক কল ঘর থেকে ফিরে এলে রেণু কয়েকটা প্লেটে ওদের খেতে দিল।

সরোজ হালুয়ায় চামচ লাগিয়ে রেণুকে বল্লে, তুমি নিলে না?

রেণু বল্লে, না থাক।

চোখ লাল করে সরোজ বল্লে, থাক কেন? ভয়ে?

রেণু আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, কথা হবে।

সরোজ ধমক দিয়ে বলেছিল, হোক কথা! তুমি নাও, নিতেই হবে।

বিনা প্রতিবাদে রেণু নিজে একটা ভাগ নিলে।

কিন্তু রেণুর গলা দিয়ে খাবার যেন নামে না। সে জানে, দুটো ঘরের মাঝখানের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওকে যেন শব্দভেদী বাণ দিয়ে খান্ খান্ করছিল।

এবং শেষকালে সেই দৃষ্টি এদিকের খোলা দরজা দিয়ে সশরীরে এ ঘরে এসে উপস্থিত হোল। মোলায়েম সুরে সেই মহিলা কণ্ঠে মধু ঢেলে বল্লে, খাওয়া হোল বাবা।

মুখ না তুলেই সরোজ বল্লে, হ্যাঁ, হোল।

অলক ভয়ে ভয়ে দিদিমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল।

জলযোগ শেষ করে সরোজ মুখ তুলে মহিলাকে বল্লে, তারপর আপনারা এখানে কোথায় এসেছিলেন?

মহিলা বল্লে, শোন কথা একবার ছেলের, কোথায় আসব আবার, তোমার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে? সরোজ যেন বিস্মিত হোল, বল্লে, আমার কাছে কেন?

ওমা তা আসব না! এখানে যে ঝিটা ছিল সে ত আমাদেরই দেশের মেয়ে। সে গিয়ে বল্লে, বাবু একলা রয়েছে, দেখা শোনা করার কেউ নেই, তিনটে বাচ্চা নিয়ে হেনস্থা হচ্ছে, তাই শুনে মায়ের প্রাণ কি করে স্থির থাকি বল? তাই ত দৌড়ে এলুম।

ঘাড় হেঁট করে সরোজ বল্লে, ভুল করেছেন। আমার এখানে এক রকম চলেই যাচ্ছে। আপনারা মিছামিছি কষ্ট করে এত দূরে এলেন। একখানা চিঠি দিলেই পারতেন।

প্লেট গ্লাশগুলো রেণু তুলছিল। সেইদিকে দেখতে দেখতে মহিলা বল্লেন, তোমার সঙ্গে আরও অনেক কথা আছে যে, সব সামনাসামনি না বসলে কি হয়?

কি কথা? বলুন।

মহিলা রেণুর দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার হোল মেয়ে? তুমি ওগুলো নিয়ে একটু বাইরে যাও এবং শেলী মানে আমার বড় মেয়ে আর তার বাবাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

সরোজ চুপ করে মেঝের আসনেই বসে রইল। রেণু নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অলক এবং অপুও রেণুর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল।

মহিলা সোজাসুজিই কথাটা পাড়লে, বল্লে, বাবা সরোজ, এই বয়সে এই ত হোল, তা এখন ত সারা জীবনই বাকী। ওঁর কাছে শুনলুম, তুমি ক্রমে ক্রমে জজ পর্য্যন্ত হবে, তোমার কত আশা, কত সাধ আহ্লাদ, কিন্তু বাড়ীতে এসে একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত থাকবে না, এটা কি ভাল?

ভণিতায় সরোজ মহিলার বক্তব্য কিছুটা অনুমান করেছিল, কিন্তু মনের কথা চেপে রেখে বল্লে, কি করতে হবে বলুন।

মহিলা অশান্বিত সুরে বল্লে, তোমাকে আর কি করতে হবে বাবা, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি বলছিলুম কি—

বলতে বলতেই শৈলর বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। পেছন পেছন শৈল, পায়ে পায়ে জড়াতে জড়াতে বাবার পেছন পেছন এসে ঢুকল।

বোসো তুমি বোসো, বোসো মা শৈল, আমার পাশে বোসো। পুরানো কথার জের টেনে শৈলর পিঠে হাত দিয়ে মহিলা বল্লে, এই মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, পয়মন্ত মেয়ে আমার। এ যে ঘরে যাবে সেখানে মা-লক্ষ্মী অচলা থাকবেন।

সরোজ চুপ করে রইল।

মহিলা শৈলকে বল্লেন—দাদাবাবুকে প্রণাম করেছিস্ রে, প্রণাম কর।

শৈল উপুড় হয়ে সরোজকে প্রণাম করে তারপর বাবা ও মাকেও প্রণাম করেছিল।

সকলেই চুপচাপ।

মহিলা স্বামীকে লক্ষ্য করে বল্লে, বল-না গো, কি বলবে বলছিলে—বল-না।

স্বামী অসহায় ভাবে বল্লেন, তুমিই বল।

হুঃ আমার যেমন বরাৎ, উনি কাউকেই কিছু বলতে পারবেন না। সোচ্চারে স্বগত-উক্তি শেষ করে মহিলাটি সরোজকে বলেছিল, উনি বলছিলেন যে, শৈলকে তুমি নাও। না হলে ধর, পরের হাতে ঐ কচি শিশু, ও কি আর মানুষ হবে?

আচ্ছা ভেবে দেখি, সরোজ ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, পরক্ষণেই হাকিমী সুরে সরোজ বলে উঠল, আর কিছু কথা আছে?

প্রশ্নের ভঙ্গীতে মহিলা কেমন সঙ্কোচ বোধ করলে, উত্তর দিলে, না বাবা, আর কি বলব বল, তুমি আমাদের নেহাৎ আপন জন, তাই—

সরোজ মামাশ্বশুরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বল্লে, তারপর কোন ট্রেনে যাচ্ছেন আপনারা। বি কে রেলের গাড়ী ত একটা আছে সাড়ে ছ'টায়, আর একটা যেন ন'টা ক'মিনিটে।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে পড়লেন। মহিলা বল্লে, ওমা, আজই যাব কি? তোমার একটা ঠিকঠাক ব্যবস্থা না করে এখান থেকে যাই কি করে বল। এসেই যখন পড়েছি—

সরোজ বল্লে, কিন্তু এখানে থাকার মুস্কিল যে, এই ছোট বাড়ী, এখানে—

মুখে হাসি এনে মহিলা বল্লে, কথা শোন ছেলের। এমন দুখানা বড় বড় ঘর রয়েছে, কথায় বলে, যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায়—

খাটের ওপোর সরোজের ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। মহিলা মেয়েকে বল্লেন, শৈলি, দেখ্ দেখ্। শৈল উঠে খাটের ধারে দাঁড়িয়ে সরোজের ছেলেকে টেনে তুলে নিলে। ছেলেটা ওর কাঁধে মাথা দিয়ে চুপ করে গেল।

মহিলা বল্লেন, আহা! সত্যিকার আপনজনের আদর ত পায়নি। বলতে গেলে আঁতুড়েই মা-হারা তারপর থেকেই ত ঝি-চাকরের হাতে,—নিজের লোক বলতে কেউ ত ওকে ছোঁয় নি।

সরোজ মামাশ্বশুরকে লক্ষ্য করে বল্লে, আপনাদের জলটল খাওয়া হয়েছে ত?

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ বাবা, তা হয়েছে।

তাহলে—সরোজ—বল্লে—তাহলে আর মিছামিছি রাত করে লাভ কি, এই সাড়ে ছ'টার ট্রেনেই—

মহিলা যেন মরিয়া হয়ে উঠল। বল্লে, তা ত হবে না বাবা সরোজ, আমার যে আর একটু কাজ আছে।

সরোজ বল্লে, কি?

মানে, তোমার ঐ শ্বশুর প্রায় একবছর ধরে অম্লশূলে ভুগছেন। তাই ভাবলুম, সদরে যখন যেতেই হবে তখন একটু ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে চিকিচ্ছে-পত্তর করিয়ে আসি। সেইজন্য জিনিষ পত্র সব নিয়ে মাসখানেকের মত থাকার ব্যবস্থা করেই যে এসেছি বাবা। মহিলা সকাতরে ভাবী জামাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

সরোজের বিপন্ন অবস্থা। শৈল ছেলে কোলে নিয়ে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর দিকে চেয়ে সরোজ বল্লে, রেণু কোথায়? তাকে ডেকে খোকাকে দিয়ে দাও, ওর বোধ হয় খাবার সময় হয়েছে।

মহিলা বল্লে, তুই খাইয়ে দে না শৈল। জান বাবা সরোজ, ছেলেপুলের যত্ন নিতে ও এমন ভালো পারে—ওর ঝিনুক বাটী, দুধ এ সব কোথায়?

রেণু বোধ হয় ঘরের বাইরেই ছিল, ধীর পায়ে ঘরে আসতেই মহিলা বল্লে, ও মেয়ে, খোকার ঝিনুক বাটী, দুধ, এ সব এনে দাও ত। শৈল ওকে খাইয়ে দিক। বোস্ মা শৈল, বোস্ এখানে।

সরোজ রেণুকে ডেকে বল্লে, ওকে নিয়ে যাও রেণু। ওর বোধ হয় খাওয়ার সময় হয়েছে।

এমন সময় সরোজ দেখলে রেণুর ছেলে খাটের ওপোর নড়ে চড়ে উঠল। সে জামা এবং বিছানা ভিজিয়ে ফেল্লে।

রেণু খোকাকে নিতে যাচ্ছিল, সরোজ বল্লে, থাক্

থাক্, আগে তোমার ছেলেকে দেখ। ওর জামা-টামা বদলাতে হবে বোধ হয়।

রেণু খাটের ধারে গিয়ে নিজের ছেলেকে কোলে তুলে নিলে। সরলার মামী ট্যারাচোখে দৃশ্যটা দেখে নিলে।

রেণু নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে ইঙ্গিতে শৈলকে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরোজ বল্লে, দেখুন মামাবাবু, আমি বলছিলুম কি, আপনার যদি চিকিৎসার দরকার হয়, তাহলে পরে আমাকে জানাবেন। আপনাদের জন্য একটা ছোট খাট বাড়ী ভাড়া করে খবর দেব, আপনি এসে এক মাস দু'মাস যা হোক থেকে আপনার চিকিৎসা করাবেন, কিন্তু আজকে আপনারা দেশেই চলে যান। বরঞ্চ একটা গাড়ী ডাকিয়ে দি, না হলে মিছামিছি রাত হয়ে গেলে আপনাদেরই কষ্ট হবে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মহিলা হঠাৎ কেঁদে উঠল, আজ যদি আমার সরলা থাকত, তাহলে কি এমনি ধুলো পায়ে বিদায় দিতে পারতে বাবা—

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সরোজ বল্লে, সে থাকতে ত আপনারা একদিনও আসেন নি—

কি করে আসব বাবা, কত ঝঞ্ঝাটে থাকতে হয়। মহিলা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল, সরোজ ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলে অলক, অপু ওদের বাচ্ছাগুলোর সঙ্গে উঠানের খেলা ফেলে ঘরের পাশে এসে এক সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সরোজ নিজের ছেলে-মেয়ের হাত ধরে অফিস ঘরের দিকে চলে গেল।

সরোজ বাইরে বেরিয়ে গেলে ভদ্রলোক রুক্ষস্বরে বল্লেন, হোল ত? তখুনি বলেছিলুম খবর টবর না দিয়ে একটা ঝিয়ের কথা শুনে হট করে গিয়ে পড়লে কোন লাভ হবে না। মিছামিছি এক কাঁড়ি খরচ করে—

তুমি, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। মেনীমুখো পুরুষের কোথাও ঠাঁই নেই, একটা কথা পর্যন্ত জামাইয়ের সঙ্গে ভাল ভাবে বলতে পারলে না।

রেণু বাইরে থেকেই শুনছিল। ভদ্রলোক বল্লেন, উঁচকা বয়সে বাইরের মেয়ে মানুষের স্বাদ পেলে তাকে কি আর ফেরান যায়। ঝিয়ের কাছে শুনে আমি তখনি বলেছি।

গিন্নী ধমকে উঠল, থামো আর বাহাদুরী করতে হবে না। দেনা পাওনা, বরাভরণ এসবের একটা কথাও কি তুমি তুললে! আমি মেয়ে মানুষ হয়ে কি এই সব ব্যাপার বলব নাকি?

কর্ত্তা বল্লেন, নাও—নাও। তোমার মত এ সবের লোভ ওদের নেই, তা জেনো।

নাঃ, নেই আবার! বলে নৈবিদ্যিতে দেবতা তুষ্ট হয়, এত একটা মানুষ—

রেণু আর শোনে নি। বাচ্ছাদের নিয়ে সে রান্না ঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

এদিনের কথা রেণুর এখনও মনে পড়ে। হাসিও পায়, দুঃখুও হয়। কিন্তু শৈল মেয়েটা ওদেরই মধ্যে ভাল ছিল। কোথায় তার বিয়ে হোল, কে জানে?

রাত্রে খেতে বসে রেণুর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটুকু শুনে সরোজ বলেছিল, সরলা চলে গিয়ে আমার যা বিপদ হয়েছে, মামাবাবুর বিপদ দেখছি তার চেয়েও অনেক বেশী। ভদ্রলোকের জন্য বড় মায়া হয়।

তা হলে ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা—রেণু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ওর মধ্যে আমি নেই, সরোজ সাফ জবাব দিলে।

কয়েক মাস এমনই ভাবে কাটল। রাজশাহীর ঠাকুর আসেও নি কোন খবরও দেয় নি। সরোজ আর একবার রাঁধুনী রাখার কথা তুলেছিল, রেণু সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ফেলেছিল। সরোজও ভাল রান্না খাবার লোভে রেণুর মতের বিরুদ্ধাচরণ করে নি।

সেদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল, প্রথম কাল বৈশাখী সরোজের ঘরের মেঝের জায়গায় জায়গায় জল, তাছাড়া পুরানো বাড়ীর ড্যাম্প মেঝের সবটাই স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে।

রেণু তার বয়স-উপযোগী স্বচ্ছন্দ গতি ফিরে পেয়েছে। মামার বাড়ীতে মামীর ভয়ে কুঁকড়ে থাকত, স্বামীর কাছে সে ছিল বধূযন্ত্র। এখানেও প্রথম প্রথম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই রেণু যেন স্বাভাবিক নারী-গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ

করেছে। এতদিন পরে সে যেন সত্যিই পরের বাড়ীতে আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করেছে।

ভোরে উঠে রান্না বাড়া শেষ করে সরোজের বিছানাটা তুলে পাট করে রাখতে রাখতে কি ভেবে সে ধীরে ধীরে অফিস ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলে, অলকের মাষ্টার চলে গিয়েছে, সরোজ অন্য দিনের মত লেখাপড়ার কাজ না করে অপু ও অলককে গল্প বলছে। ওরা দুজনে বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে গল্প শুনছে। রেণু ঘরে ঢুকে ডাকলো বাবা—

সরোজ বল্লে, কি, সময় হয়েছে বুঝি?

অল্প হেসে রেণু বল্লে, আমি কি বলব? আপনার কাছে ঘড়ি, সময়ের কথা আমি আর নতুন করে কি আর বলব?

সরোজ বল্লে, এই যে উঠছি।

অলক বল্লে, তারপর, তারপর কি হোল বাবা?

সরোজ বল্লে, আবার রাত্তিরে বলব, এখন নেয়ে খেয়ে নেবে চল—

অপু বল্লে, দিদিটা যেন কি? সব সময় কেবল তাড়া দিতেই আছে। না বাবা, তুমি বল।

সরোজ চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্লে, ছিঃ ওভাবে বলতে আছে! যে সময়ের যা। এখন নেয়ে খেয়ে নাও, আবার রাত্তিরে গল্প শুনো।

ভাত দিয়ে রেণু অপুকে খাওয়াতে খাওয়াতে বলে বাবা দুটো কথা বলব, আপনাকে রাখতে হবে কিন্তু।

কি কথা আগে শুনি, সরোজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

রেণু বল্লে সে আমি আগে বলব না, কথা রাখবেন আগে বলুন। ওর মুখের দিকে ছেলেমেয়েরাও উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল।

সকলেই চুপচাপ। হঠাৎ অপু বল্লে, ও আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, আমি জানি।

সরোজ ও অলক এক সঙ্গেই বল্লে, কি রে?

বলব? দিদি বলি? অপু দিদির অনুমতি চাইলো।

রেণু বল্লে, বলো কি বলবে?

অপু বল্লে জানলে বাবা, জানলে,—রোজ বিকেলে একটা ঠেলা গাড়ী করে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা লোক কত সব ভাল ভাল পুতুল বিক্রি করতে আসে। সব পুতুল, আয়না, চিরুনী, সাবান, তেল, বল, কত কি?

সরোজ উৎসাহ দিয়ে বল্লে ও-তাই বুঝি, তা বেশ ত, তুমি বুঝি কিছু নিতে চাও?

ঢোঁক গিলে অপু বল্লে, হ্যাঁ বাবা, দিদিও নেবে। জান বাবা, জান দিদি বলছিল—

সরোজ বল্লে, বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝতে পেরেছি,—দিদি তোমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে পুতুল খেলে—

হাসতে হাসতে রেণু বল্লে, তা ত হোল কিন্তু আর একটা কথা ত জান না অপু, আরও একটা কথা আছে।

অপু বল্লে, এঁ্যা? কি, কি কথাদিদি?

দিদি বল্‌লে, আগে এই ভাতগুলো খেয়ে নাও, তবে বলব। মাছ ছাড়িয়ে ভাতের সঙ্গে দিয়ে রেণু অপুর মুখে ভাত তুলে দিলে।

—ভাতটা গিলেই অপু বল্‌লে এবার বল।

রেণু বল্‌লে, বল্‌ছি কিন্তু বাবা যা বলুন তাতে আপনি 'না' করতে পারবেন না।

সরোজ বল্‌লে, আচ্ছা, তুমি যা বলবে তাই করব।

রেণু বল্‌লে, দুটো কথা, প্রথম আমার একখানা খাট চাই, বেশ বড় সড় হবে, বলেই রেণু থামল।

আর দ্বিতীয়? সরোজ প্রশ্ন করলে।

দ্বিতীয় খোকার বয়স হোল ছ'মাস, আসছে মাসে ওর মুখে ভাত দিতে হবে।

এই দুটো? আর কিছু নয়ত, সরোজের কথায় বোঝা গেল না সে বিরক্ত হয়েছে কিম্বা তামাসা করছে।

রেণু বল্‌লে, হ্যাঁ, মাত্র এই দুটো।

এক ঢোক জল খেয়ে সরোজ বল্‌লে, খাটে কে শোবে?

সে আপনি পরে দেখবেন, রেণু উত্তর দিলে।

সরোজ গম্ভীর হয়ে বললে, কি ব্যাপার সত্যি করে বল ত রেণু, হঠাৎ খাট কি হবে?

করুণ সুরে সে বলে, বাবা বর্ষা আসছে মেঝেটা

বড় সেঁতিয়ে যায়, তা ছাড়া আপনি মেঝেয় থাকেন এতে আমার বড় কষ্ট হয়।

সরোজ বলে, দেখ রেণু আমাদের চাকরী হোল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। আজ এখন বর্দ্ধমানে আছি, কালই হয়ত নোয়াখালি কি ময়মনসিংহ-এ ঠেলে দেবে। ঐ একখানা খাট নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়ি, এর ওপোর আর কিছু বাড়াতে চাই না।

কচি ছেলের মত বায়না নিয়ে রেণু বলে, ও একখানাও যা, দুখানাও তাই, তা ছাড়া এই বর্ষায় আপনার মেঝেয় শোয়া চলবে না। আজই বিছানা তুলতে গিয়ে দেখলুম তলার সতরঞ্চিটা যেন ভিজে গেছে।

সরোজ বল্‌লে জানি, আমিও সেটা দেখেছি। আমি ভাবছিলুম, একখানা ভাল ত্রিপল কিনব, সেইটে মেঝেয় পেতে তার ওপোর সতরঞ্চি তোষক পাতলে আর কোন অসুবিধে হবে না। খাট আমি কিনব না।

অপুর ভাতে দুধ মাখতে মাখতে রেণু বল্লে, তাহলে আজ আমায় কিছু টাকা দিতে হবে।

সরোজ বল্লে, ভাল কথা রেণু। তুমি এতদিন এসেছ। তোমায় ত টাকা কিছুই দেওয়া হয়নি। কি হিসেবে কত দিতে হবে তাও ত কিছু ঠিক কর নি। সেটা ঠিক করে ফেল ত আগে, নইলে তোমার কাছে আমার দেনা জমে উঠলে তখন—

ভাত মাখা হাতের দিকে চেয়েই রেণু আস্তে আস্তে বল্লে, দেনা আপনার জমছে না আমায় জমছে তাই বা কে বলবে। এই যে আমার ছেলেকে আপনি—

বাধা দিয়ে সরোজ বল্লে, তোমার আবার ছেলে কই রেণু? ও দুটোই ত আমার ছেলে, ওরা যে যমজ তা বুঝি মনে থাকে না?

রেণু চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিলে না। রেণুর মনে পড়ল, সেবার দুজনের একরকম জামা এনে সরোজ ঠিক এই কথাই বলেছিল।

সেদিন বিকেলে নিজের ঘরে ঢুকে সরোজ চম্‌কে গেল। দক্ষিণের জানলার পাশে বড় একটা তক্তপোষ পাতা হয়েছে, তার ওপোর তোষক, চাদর, বালিশ দিয়ে ওপোরে মশারী খাটিয়ে সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেণু যেন ইচ্ছে করেই কাছাকাছি কোথাও ছিল না। সরোজ ডাকলে, রেণু, রেণু কোথা রে?

রেণুকে ডাকবার জন্য অলক ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রেণু এসে ঘরে ঢুকল। সরোজ বল্লে, এসব কি? কোত্থেকে এল?

জানি না, রেণু উত্তর দিলে।

আমি জানি, সরোজ, উত্তর দিলে, রাস্তার মোড়ে ঐ যে তক্তপোষের দোকানটা আছে, ঐখান থেকে আনিয়েছ। কত নিলে?

কিছু নয়।

অমনি দিয়েছে বুঝি! গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, কত নিয়েছে ঠিক করে বল, ধারে আনিয়েছে ত?

রেণু জানে, সরোজ ধারে কোন কিছুই কেনা পছন্দ করে না, বল্লে, না বাবা, দাম দিয়ে দিয়েছি। সাড়ে সাত টাকা নিয়েছে।

টাকা কোথায় পেলে।

আমার ছিল।

সত্যি বলছ, তোমার টাকা? দোকানীকে দাম দেওয়া হয়ে গেছে?

রেণু এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। বল্‌লে, ওবাড়ী থেকে যখন আসি তখন ওরা আমায় বারো টাকা দিয়েছিল। দশ টাকা আমার স্বামীব বাকী মাইনে হিসেবে, আর দু'টাকা ওখানকার তক্তপোষ বিক্রীর দাম। এছাড়া আরও পাঁচটাকা আমার ছেলের হাতে দিয়েছিল, জামা কেনার জন্য। এই সাতের টাকা বরাবরই আমার কাছে ছিল, খরচ ত কিছুই হয় নি।

সরোজ গুম্ হয়ে রইল। বল্লে, এখান থেকে বদলী হবার সময় এই বিরাট তক্তপোষ নিয়ে কি করব বল ত?

বিক্রী করে দেব, রেণু স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলে।

হাকিম সাহেব তক্তপোষ বিক্রী করবেন, শুনতে খুব মিষ্টি লাগবে ত?

তবে কাউকে দান করে দেবেন।

কে নেবে?

কেন আপনার চাক্‌রাণীকে অথবা আমাদের ঐ ঝি'কে। আদর ক'রে মাথায় তুলে নেবে।

সরোজ থেমে গেল।

সন্ধ্যের পর রেণুর হাতে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে সরোজ বল্‌লে, সাড়ে সাত টাকাই পরেছে, না আরও বেশী? মুটে ভাড়া লাগে নি? মুটে ভাড়া কত?

রেণু বল্‌লে, তা ত জানি না। দোকানদারকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তারপর সে মুটে দিয়ে ঐখানা পাঠিয়ে দিলে এবং বল্‌লে সাড়ে সাত টাকা দিতে হবে। একথাও বল্‌লে যে, হাকিম সাহেবের

দরকার তাই সে পড়তা দামে সব চেয়ে সেরা জিনিষটা দিয়ে গেল।

সরোজ চুপ করে রইল। এটা ভালয় ভালয় উৎরে গেল দেখে রেণু বল্‌লে। বাবা, আর একটু কাজ আছে। একটা ধুনুরী ডেকে গদিখানা খুলিয়ে ওর তুলোগুলো রোদ্দুরে দিয়ে গদির কাপড়টা ভাল ভাবে সাবান দিয়ে কেচে আবার তুলো ভরে সেলাই করে খাটে পাততে হবে।

কেন? গদিটার আবার কি হোল?

রেণু বল্‌লে, হয় নি কিছু, কিন্তু আমি বলছি ঐ ভাবে ওটা পরিষ্কার করার পর ঐখানে আপনি শোবেন আর বাচ্ছাদের নিয়ে আমি এইখানে শোব।

যাতে গড়িয়ে মেঝেয় পড়তে সুবিধে হয়! আচ্ছা বুদ্ধি তোমার!

রেণু চুপ করে রইল, বুঝলে বেগতিক।

সরোজ বল্‌লে, দেখ রেণু, খাট, তক্তপোষ মেঝে যেখানেই শোবে সেই খানেই ঘুম হয়, ঘুমিয়ে পড়লে সব একাকার। তবে হ্যাঁ, মেঝেটা অস্বাস্থ্যকর হলে একটা উঁচু জায়গা চাই। এই যা।

রেণু বল্‌লে, দেখায় খারাপ যে! আমি খাটে শোব আর আপনি—

রেখে দাও রেখে দাও, ও সব বাজে মান সম্মান আমার নেই। একটু থেমে বল্‌লে, রেণু, তোমার হিসেবটা এবার করা দরকার। তোমার মাসিক কি হিসেবে দিতে হবে বলত?

রেণু নিরুত্তর।

সরোজ বল্‌লে, তুমি বলেছিলে, আমি যা ঠিক করব তাই হবে, কিন্তু আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। তুমি আসার আগে একজন নার্স রেখেছিলুম খোকাকে দুধ খাওয়াবার জন্য, আমাদের ডাক্তার বাবু তাকে দিয়েছিলেন। তাকে দিতে হোত মাসিক পঁচিশ টাকা। তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী এবং ভাল কাজ করছ, তারপর এখন আবার রান্নার ভার নিয়েছ। সব মিলিয়ে—

বাবা, রেণু ডাকলো।

কি?

আপনার মেয়ে অপর্ণাকে আপনি মাসে কত টাকা মাইনে দেন?

সরোজ চমকে উঠল।

রেণু বল্‌লে, আমি বুঝি আপনার মেয়ে নই?

আম্‌তা আম্‌তা করে সরোজ বল্‌লে, তাহলেও হাত খরচ বলে ত একটা জিনিষ আছে?

রেণু বল্‌লে, হাত খরচ কিছু তো আমার লাগে না বাবা লাগলে যখন যা দরকার হবে চেয়ে নেব।

সেদিন ছিল রবিবার। রবিবার সরোজের কাজ ছিল সকালে বাজার করে নিয়মিত সময়ে স্নানাহার সেরে বাইরের অফিস ঘরে বসে সারাদিন আইনের বই এবং বিশেষ করে সি ডবলু এন্-এর মত পত্রিকাগুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা। তার ধারণা, সুবিচার করতে গেলে উভয় পক্ষের উকীলের তুলনায় আরও অনেক বেশী পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টি দরকার, অন্যথায় বুদ্ধিমান উকীল বিচারককে ধাপ্পা দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে সরে পড়বে।

সেই রবিবারে সরোজ সকালে বাজার এনে মুটের মাথা থেকে তরী তরকারি মাছ ইত্যাদি নামিয়ে রেণুর রান্না ঘরের সামনে সমস্ত রেখে পকেট থেকে বার করলে প্রথম ভাগ বই এবং কাগজের মোড়ক খুলে একখানা শ্লেট এবং পেন্সিল। রেণুকে ডেকে বল্‌লে, রেণু, এই বই আর শ্লেট-পেন্সিল নাও, তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

আমাকে? ওমা সেকি? ও সব শিখে আমার কি হবে? রেণু প্রতিবাদ করলে।

গম্ভীর কণ্ঠে সরোজ বল্‌লে, মুখ্যু মেয়ে আমি চাই না। অপু এ সব শেষ করে ইংরাজী—ফার্ষ্ট বুক পড়ছে তা জান।

রেণু চুপ করে গেল।

সরোজ বল্‌লে, অলক, দিদিকে প্রথম ভাগ পড়িয়ে শ্লেটে লিখতে শেখাবে।

দিদির মত ধাড়ী ছাত্রী পেয়ে অলক হাততালি দিয়ে নেচে উঠল, বা, বা কি মজা, দিদি পড়া বলতে না পারলে—একটু থেমে বল্‌লে, দিদি পড়া বলতে না পারলে কি হবে বাবা?

হাসিমুখে সরোজ বল্‌লে, দিদির মাষ্টার কানমলা খাবে।

বা রে, মাষ্টার কেন কানমলা খাবে? মাষ্টার বুঝি কানমলা খায়?

মাষ্টার ছাত্র দুজনের মধ্যে যার বয়স কম হবে সেই কানমলা খাবে।

অলক বল্‌লে, হ্যাঁ, তা বুঝি আবার হয়? তোমার যেমন কথা!

বই শ্লেট তুলতে তুলতে দিদি বল্‌লে, কেউ কান মলা খাবে না, মাষ্টার মশাই আর একবার করে পড়াবেন।

হ্যাঁ, আর একবার করে পড়াবেন, সেই ঠিক। নইলে বাবার যেমন কথা—মাষ্টার কানমলা খাবে!

সরোজ নিজের ঘরে ঢুকল, জামা ছাড়তে।

[ক্রমশঃ]

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য

(মাঘ মাসের ফল)

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা বুধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে বুধ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

বুধ রজোগুণাশ্রিত গ্রহ। তার কামনা ও আসক্তি আছে। তিনি অত্যন্ত লোভী, বিষয়ানুরাগী ও ক্ষুদ্রচিত্ত। কর্মের প্রতি তার অত্যধিক অনুরাগ। সুতরাং বুধ প্রভাবান্বিত ব্যক্তির মধ্যে আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুনিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস। বুধ বালক—সরলতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি আড়ম্বরহীন, অপরিণামদর্শী ও অভিমান-পরিশূন্য। তার মধ্যে চঞ্চলতা ও প্রগল্ভতা বিদ্যমান। তিনি অসামান্য স্মৃতিশক্তি-বিশিষ্ট। তার শেখবার কৌতূহল অসাধারণ। কিন্তু তার হিতাহিত জ্ঞান নেই। তিনি যা দেখেন, তাই অনুকরণ করেন এবং তাই শেখেন। অর্থ বা উপযোগিতা বোঝবার চেষ্টা বা ইচ্ছা তার নেই। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন। তিনি খুব ভাল মিস্ত্রী। নির্দ্ধারিত সময়ে, পরপর কাজগুলো যথাযথভাবে, নিয়ম-মাফিক করে যেতে তিনি খুব পটু। তার কাজ কলের মত—একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। তাই ভাল কারিগর হতে গেলে বুধের অনুগ্রহ থাকা চাই। আবার বুধ শুধু বালক নন; তিনি ছাত্র, শিষ্য অথবা শিক্ষার্থী। সুতরাং বাপ-মা যা বলেছেন, শিক্ষক মহাশয় যা শিখিয়েছেন, বইতে যা লেখা আছে এবং গুরু যা উপদেশ করেছেন, তাই তার কাছে অভ্রান্ত সত্য—বেদ-বাক্য। তার যা কিছু বিদ্যা, সবেরই ভিত্তি মুখস্ত-করা জ্ঞান। যে সকল পণ্ডিত মহাশয়গণ কথায় কথায় ছাত্রদের 'বোঝার চেয়ে মুখস্ত করা ভাল'—এ-উপদেশ দান করেন, তাদের প্রভু বুধ। যে সকল ব্যক্তিদের কাছে আপ্তবাক্যের প্রমাণ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের শাসনকর্তা বুধ। আবার মুখস্ত করার ক্ষমতা বুধের চেয়ে কারো বেশী নেই। নকল-নবিশীতে বুধ সর্বশ্রেষ্ঠ। যে বাঙ্গালী অবিকল সাহেবের মত ইংরাজী বলে—যে বাঙ্গালীকে দেখে সাহেব বলে ভ্রম হয়, তার কোষ্ঠিতে বুধ গ্রহ প্রবল। কাজেই মাছিমারা কেরানীর কারক বুধ। যারা চিরাগত প্রথায় কাজ করেন, তাদের কারকও বুধ।

বুধের নিজের কোন নাম নেই—পরের নামেই পরিচিত। শেখা কথা যথাযথ বলবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। "আমি তোমার পড়াপাখী, যা শেখাও মা তাই শিখি" এই যে আত্মাভিমানের সম্পূর্ণ অভাব, এ বুধেরই বৈশিষ্ট্য। কাজের তিনি পক্ষযুক্ত বার্তাবহ; যেখানে রবি রাজা, চন্দ্র রাণী, মঙ্গল সেনাপতি—বুধ সেখানে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত। কর্মক্ষেত্রে তিনি এজেন্ট বা প্রতিনিধি। তার নিজের বক্তব্য কিছু নেই। পরের কথা পরের মত হয়ে বলাই তার কাজ। বুধের প্রধান গুণ তার পরিণামশীলতা। স্ফটিকের

মত, বহুরূপীর মত, তিনি যখন যে পদার্থের কাছে থাকেন, তখন তারই বর্ণ প্রতিফলিত করেন।

বুধ চঞ্চল বালক। সুতরাং বুধ হতে কার্য-তৎপরতা বা কার্যস্ফূর্তি, বালসুলভ চপলতা ও বাক্‌শক্তি বিচার্য।

'বুধ' শব্দই বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক। সুতরাং চিন্তার যাবতীয় বিষয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বুধ হতে বিচার করা যায়। বুধের একটা বিশেষত্ব এই, যে কোন কার্য বা কথা হবার পূর্বেই জাতকের মনে তার পূর্বাভাষ জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু বুধ যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি কখনও তার প্রকৃতিগত বুদ্ধির জ্যোতিকে ম্লান হতে দেন না।

বুধের কারকতার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—এ মাসে আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। অধৈর্য হবেন না। ব্যয় সংকোচ করুন। কারো টাকা গচ্ছিত রাখলে ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সর্দি-কাশি ও বাত পীড়াদিতে উৎপাত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটু গোলযোগ দেখা যায়। পিতার স্বাস্থ্য ভাল নয়। সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ আছে। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ কম। মহিলাদের মান-অভিমান সংযত করে চলা দরকার।

বৃষ—আপনি দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করুন। সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে আপনি বেশ বিব্রত হবেন এমাসে। টাকাকড়ির অভাব দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলীর সম্ভাবনা রয়েছে। স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা আসতে পারে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ নেই। সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের অনুরূপ ফল।

মিথুন—দোটানা মনোভাব এড়িয়ে চলুন। সন্দেহ, সংশয় ও খুঁত খুঁতে ভাব ত্যাগ করুন। তাতে কাজের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সুপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্য দুর্ভাবনা বাড়তে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। বন্ধুলাভের যোগ রয়েছে। ছোট খাট ভ্রমণ হতে পারে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল-মন্দ মেশান। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

কর্কট—এ মাস আপনার আগের চেয়ে অনেকাংশে ভাল। সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হবেন না। অসতর্ক থাকার জন্য জিনিষ পত্রের ক্ষতি হতে পারে। পারিবারিক বিরোধ দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অশান্তি ও উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার স্বাস্থ্য ভালই বলা চলে। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ বাড়বে। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

সিংহ—আপনার আত্মসচেতনভাব এবং মর্যাদাবোধ বর্তমানে ক্ষতিকর। বন্ধুরা এখন আপনার কুৎসা ও নিন্দা প্রচার করতে পারে। আর্থিক দিকটা ভাল। স্বাস্থ্য কিন্তু ভাল যাবে না। গুরুজনদের কারোর সংকট-জনক পীড়াদিরও যোগ দেখা যায়। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের গোলমাল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

কন্যা—আত্মম্ভরিতা ও অসহিষ্ণু মনোভাব এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিকটা ভাল। আশ্রিতজনের দ্বারা অশান্তি ভোগের লক্ষণ দেখা যায়। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। আন্ত্রিক রোগ দেখা দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের জন্য অর্থব্যয় হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে মত-বিরোধ হতে পারে। স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে তরুণদের বাধা আসতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। মহিলাদের সময়টা ভাল-মন্দ মেশান।

তুলা—এবার আপনার দুর্যোগপূর্ণ সময়ের অবসান হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধু লাভ হবে। প্রাপ্য অর্থ আদায় হবে। পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। কর্মপরিবর্তনের যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। গুরুজনদের কারো সংকটজনক পীড়াদিতে উৎকণ্ঠা ভোগ হতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল

যাবে না। বিদ্যার্থীদের পাঠধারা নির্দ্ধারণে গোলযোগ দেখা যায়। মহিলাদেরও প্রায় অনুরূপ ফল।

বৃশ্চিক—অভিমান ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে বদলীর সম্ভাবনা। দূর ভ্রমণ হতে পারে। জিনিষ পত্র হারানোর আশঙ্কা আছে। শত্রুতার অবসান হবে। স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করতে পারে। আত্মিক গোলযোগ দেখা যায়। প্রণয়মূলক বিবাহ সম্বন্ধে তরুণীদের সাবধান থাকা উচিত। গুরুজন হানির যোগ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। আর্থিক ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই। বিদ্যার্থীদের সময়টা অনুকূল। মহিলারা অপরিচিতকে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে সাবধান।

ধনু—কোন কারণে মানসিক ক্ষোভ বাড়তে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতিতে বাধা পড়তে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। মোটা রকমের অর্থ ব্যয় হতে পারে। গুরুজনের সহিত মতবিরোধ হতে পারে। কষ্টকর ভ্রমণ যোগ দেখা যায়। জমি কেনাকাটার সময় এখন নয়। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ছেলে মেয়েদের জন্ম দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। মহিলাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সময়টা অনুকূল।

মকর—আশার আলোক-বর্তিকা দেখা যাচ্ছে। নৈরাশ্য কেটে যাবার সময় এসেছে। অবশ্য স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেবে। গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ভূ-সংক্রান্ত গোলোযোগ মিটে যাবে। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগেব লক্ষণ দেখা যায়। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। মহিলাদের মনোমত কার্যে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

কুম্ভ—আপনার বিগলিত ভাব ত্যাগ করুন। তাহলে আপনি উন্নতির উচ্চশিখরে উঠতে পারবেন। অর্থ খরচের ঝমেলায় পড়তে পারেন। দূর ভ্রমণ হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। তরুণদের সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্চাট বৃদ্ধি পাবে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। মহিলাদের সময়টা প্রতিকূল।

মীন—ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করবেন না। আপনার আশ্রিতবাৎসল্য ও ভাবপ্রবণতা একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাবে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। শরীর কিন্তু ভাল যাবে না। আর্থিক উন্নতি হবে। নতুন গৃহাদি নির্মাণ যোগ দেখা যায়। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। গুরুজনদের পীড়ায় মানসিক শান্তি হ্রাস পাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের এ মাসে নানাবিধ যোগাযোগে কর্মব্যস্ততা বাড়বে।

মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্র

লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

Be careful in dealing with a man who cares nothing for sensual pleasures, nothing for comport or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy because his body which ycu can always conquer gives you so little purchase over his soul.

অধ্যাপক গিলবার্ট মারির এই কথাগুলি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, নেতাজী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা মনে জাগে। স্বপ্নাতুর-কল্পনা, রোমন্থন-প্রবণ বাংগালী জাতির মধ্যে নেতাজীর বজ্র দৃঢ় চরিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি না। তার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দৃঢ় সংকল্পের মেরুদণ্ড। আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার সংস্কারগত নিষ্ঠা। এর কারণ বিবেকানন্দের বাণী তাঁর মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। স্বামিজী প্রচারিত নব-মানবতাবাদকে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক প্রবক্তা ছিলেন স্বামিজী। নেতাজীর চরিত্র নির্ভেজাল ভারতীয় চরিত্র। ভারতীয় চরিত্র বলতে আমরা বলি মনুষ্যত্ব বোধের গৌরবানুভূতি। আত্মশক্তিবিকাশেই সেই বোধ জাগে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে, সেই মনুষ্যই বোধের প্রকাশ করাই আমাদের দেশের আদর্শ। সেই জন্যেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ —জীবনের এই চতুর্বর্গ অভীপ্সাকে একটি স্থির প্রত্যয়ী সুগভীর সমন্বিত আদর্শ বোধে উদ্দীপ্ত করেছে হিন্দু ধর্ম। ঋষি বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছেন একটি আদর্শ চরিত্র। বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বে এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভকেই আদর্শ করা হয়েছে। ভারতীয় মনীষা জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মাধ্যমে এক সুস্থ, সরল বলিষ্ঠ প্রাণ দীপ্ত জীবনের ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা আমাদের ইতিহাস জানিনা এবং জানতেও চাই না। তাই আমরা মনে করি ভারতীয় ঋষি শুধু সত্যসন্ধী ভূমা-উন্মুখ। সে জীবন শুধুমাত্র অপার্থিবত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর জীবন তরণী বেয়ে নেবার মত লৌহ-দৃঢ় ইচ্ছা সেখানে নেই। জীবন এখানে উচ্চৈঃস্বরে বৃহৎ আয়োজন ও আড়ম্বরের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে না। কিন্তু ইতিহাস একথা বলে না। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারত তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু ভারতে নয় বহির্ভারতেও তার বিজয় বৈজয়ন্তী দেখা গেছে। মানবতার সুবৃহৎ অধিকারে আমরা কোনদিনই বঞ্চিত ছিলাম না।

বৈদিক যুগের ইতিহাস থেকেই আমরা জানি আমাদের এক উন্নত জীবনবোধ ছিল। স্বামিজীর বাণীর মধ্যে আমরা-আবার আবিষ্কার করলাম সেই প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে। নব-জাগরণের মধ্য দিয়ে আমরা সেই গৌরবকে মানুষ্যত্বের বীর্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি-আধুনিক ভারতবর্ষে। বৈদিক যুগ থেকে আমরা সেই বীর্যেরই প্রার্থনা করে আসছি।

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি, বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।

বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যো ময়ি ধেহি।

মহ্যাসিস মহ্যং ময়ি ধেহি।

এই শেষ প্রার্থনার সাফল্যের জন্যেই বীর্য প্রয়োজন। এই শৌর্য বিধাতারই দান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"বিরাজে মানব শৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্তে সে অমর জয়ী প্রভু
অজেয় আত্মার রশ্মি তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।"

বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণে, মহাভারতে বীরধর্মের প্রশংসা আছে। যৌবনের পূজা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কীর্ত্তিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মানব জীবনের পূর্ণ আনন্দের উদাহরণ দিতে 'আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যৌবনকেই এই আনন্দের আদর্শ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ঈশোপনিষৎ উপদেশ দিয়েছেন এই জগতে অন্তত, একশত বছর বাঁচার জন্য অক্ষুণ্ণ কর্মক্ষমতা থাকার দরকার। তার জন্য আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। সত্যের মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্য, মাধুর্য, বীর্য ও ঐশ্বর্য। গীতার শেষ শ্লোকে ভগবান্ বলছেন যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থের মিলনেই আমাদের জীবনে চরিতার্থতা আসে। এখানেই পূর্ণ জীবনের ছবি পাই।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনই এই আদর্শের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে জীবন ধরা পড়েছিল। তিনি এঁকেছেন এভাবে:—

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম।
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত।
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক।

* * *

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মিলন এখানে। ইউরোপের নাইটদের মধ্যে একে আমরা পাবনা। টেনিসনের স্যার গালাহাড আদর্শ হতে পারে বাস্তবে তাকে পাওয়া যাবে না। প্লুটার্কের রচনায়, স্পার্টানদের জীবনে, জাপানে সামুরাইদের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির প্রশংসা আছে। সেখানে ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির মিলন হয়নি। তাদের মধ্যে ভারতীয় জীবন দর্শনের প্রকাশ নেই। ভারত চেয়েছে আত্মশক্তির সঙ্গে (soul force) দৈহিক শক্তি (physical force), অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে মানবীয়তা, দৈবের সঙ্গে জৈবের গ্রন্থি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আমরা সেই ভারতীয় আদর্শ দেখেছি। স্বামিজীর মানস সন্তান নেতাজীর জীবন বীর্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের জীবন। এই কর্ম কুণ্ঠ, বক্তৃতা প্রিয় সমাজে তাঁর চরিত্র সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। বীর্যের শুল্ক মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে অত্যন্ত তরুণ বয়সেই সবরমতী ও পণ্ডিচেরীর নিষ্ক্রিয়বাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

It is the passivism, not Philosophic but actual in calcated by these schools of thought against which I protest" তিনি একটি যুগধর্মী দর্শনের সাক্ষ্য পেয়েছিলেন স্বামিজীর মধ্যে। তাই বলেছেন: "এ যুগের প্রয়োজন একটি কর্মবাদের দর্শন— a philosophic activitism.

তাই নেতাজী রোঁলাকে একটি অত্যন্ত সত্য কথা বলেছিলেন।

I have decided that non violence cannot be the central pivot of our entire social activity. ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য দেয় "Without belittling any way the highly ethical ideal behind this cult (non-violence) it may by pointed out that non-violence was never known to have played any important role in practical politics specially where a struggle against a highly organised military power was concerned.......it is still an unknown factor of doubtful value whereas 'terrorism' has always and everywhere been recognised as an important factor in a fight for wresting independence from the unwilling hands of a powerful enemy"

Dr. R. C. Mazumdar
(History of freedom Movement.)

স্বামিজী এইরূপ শান্তিবাদের নামে অকর্মণ্য তামসিক নিষ্ক্রিয় জীবনের উপরে খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুদ্ধের সন্ন্যাসবাদকে এবং অশোকের অহিংসানীতিকে ভারতের অধঃপতনের কারণ বলেছেন। তিনি বলেছেন, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, পৃথিবী ভোগকর তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই।" অধ্যাত্মধর্মী মানবতাবাদী জীবন দর্শনে বলিষ্ঠ কর্ম-দ্যোতনা আছে রজোগুণের উদ্দীপনায়। তাই বলছেন বিবেকানন্দ "প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। কার্য সিদ্ধির জন্যে আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থ'কতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ।" আবার এক স্থানে বলেছেন "যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিলনা, যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই, চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতা বন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ প্রসারী দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ জীবনবাদের ভাব পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করে কোন ব্যক্তি ঐ দুটি আশ্রমের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে না। তাই নেতাজী সত্যের নামে পরম কল্যাণের বিদ্রোহে ঝাঁপ দিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠ কর্ম পদ্ধতির জন্য বীরের মতো লড়াই করেছেন। তাঁর ছিল প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। আর তার সঙ্গে ছিল নিজের আত্মশক্তির ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। জাতীয় কংগ্রেসের তথা জাতীয় জীবনের সেই আত্মিক সংকটের ঘোর দুর্দিন; অস্তিত্বের সেই নিরাবলম্বন নিদারুণ লগ্নে কে দিয়েছে প্রেরণা? মধুক্ষরা জীবনের প্রতিটি নিঃশব্দ মুহূর্ত দিয়ে দেশ জোড়া জড়ত্বের মধ্যে কে জাগিয়েছে প্রাণের বিদ্যুৎ বহ্নিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে কার আপোষহীন প্রচণ্ড সংগ্রাম সেদিনের জাতীয় জীবনকে করেছিল জ্যোতিষ্মান? প্রমিথুসের সেই মর্মান্তিক অন্তর্দাহের জ্বালা যুগদধীচির বুকের পাঁজরকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। বাইরে তার প্রকাশ ছিলনা বল্লেই হয়। সেই আবেগ-সংক্ষুব্ধ ইতিহাস অনেকেই জানেন না। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ঐতিহাসিক রামগড় অধিবেশনে দেশের উদ্দেশ্যে তিনি যে অমর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা দেশবাসী গ্রহণ করেনি। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি চিন্তার বিদ্যুৎ স্পর্শ, প্রতিভার হিরণ্ময় ঐশ্বর্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাক্‌বে।

নেতাজীর মত লোক চিরদিনই ইতিহাসের মহাপ্রাঙ্গণে একা। কারণ টয়েনবীর ভাষায়: "The "creator, when he arises, always finds himself overwhelmingly out-numbered by the inert uncreative mass of his kith and kin, even when he has the good fortune to enjoy the companionship of a few kindered spirits."

আর সেই জন্যেই অনিবার্যভাবে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের বাধে ভীষণ সংঘর্ষ। টায়েনবীর ভাষায়: "The emergence of a superman or a great mystic or a genius or a superior personality inevitably precipitates a conflict."

এলগিন রোডের বাড়ীতে নজরবন্দী সুভাষচন্দ্র। বেদনা, তিক্ততা ও নৈরাশ্যের উষ্ণ বাষ্পে জীবনের দিকচক্রবাল নিরন্তর আচ্ছন্ন। গীতা পাঠ করছেন, চণ্ডী পাঠ করছেন। আসন্ন মহাযুদ্ধের ঋত্বিক ধ্যান সমুদ্র থেকে উজ্জ্বলতর রত্ন নিয়ে এলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তাঁর তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ আর্ত অন্তরে জেগে উঠে ত্রাণমন্ত্রের শিখা—দেশ ছাড়ো। বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবনে আসে এই বোধির আলো। কন্যাকুমারীর শিলাপৃষ্ঠে ধ্যানমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দের চেতনায় ধরা দিয়েছিল এই জ্যোতির্ময় সঙ্কেত। সুভাষবাবুর কর্মপ্রতিভা তাঁর অগ্নিময় আন্তরিকতা আমরা

দেখেছি আজাদহিন্দ বাহিনী গঠনের মধ্যে। মণিপুর, কোহিমা রণাঙ্গনের ব্যর্থতাই সব নয়। লালকেল্লার আকাশে তাঁর মেঘমন্দ্র বাণী—দিল্লী চলো—দেশবাসীকে করেছিল মাতাল। একটি সনাতন মধ্যযুগ লালকেল্লার চারিদিকে প্রাচীরের মত অটল। আজাদ হিন্দ সেনানীদের উদার উপস্থিতি ভেঙেছিল অন্ধ জেদের প্রাচীর। নব জাগরণের ঐতিহাসিক প্রাণধারার মহা অনিবার্যতার প্রকাশে সে প্রাচীর গিয়েছিল ভেঙে, প্রাণশক্তির ঝড়ো হাওয়ায় অচলায়তনের মেঘকে দিয়েছিল উড়িয়ে। আজাদহিন্দ ফৌজ যেন নেতাজীর সহস্র দীপ দীপ্ত জীবনের এক একটি প্রদীপ। আকাশ চুম্বী তাদের প্রত্যাশা। বন্দীদের দিল্লী চলো ডাক যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত লাভাস্রোত রূপে, পুড়িয়ে দিচ্ছে রজোগুণের আগুনে তামসিকতাকে, ইংরেজের ও অন্যান্য দলের রাজনীতির গগনে আজাদহিন্দ ফৌজের আবির্ভাব প্রলয়ঙ্কর বিভীষিকার মেঘমালারূপে। সেই উত্তেজনার আগুনে শীতল সমাজজীবন তার দেহটাকে সেঁকে নিয়েছিল, বোম্বের নৌ বিদ্রোহে, পাটনার পুলিশ বিদ্রোহে, বাংলার প্রচণ্ড আন্দোলনে দেশবাসী তার জীবনের স্বাক্ষর রেখেছিল। সেই নব বীর্যের অনুভূতির বন্যাধারায় স্নান করে আমরা নেতাজীর সিংহ-সাহসিকতাকে বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। যুগচেতনায় আপ্লুত সেই নবতম প্রত্যয় ও উপলব্ধির সূর্য্যরশ্মি সে যুগ আলোকিত করেছে। আমাদের স্মৃতিতে সেই চিত্রটি অমিতায়ু হয়ে আছে সত্য কিন্তু আমাদের সাহিত্যে, কাব্যে, ইতিহাসে, গাথায় সেই সত্য রূপায়িত হয়নি এটি নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে শুধু একজন বিখ্যাত রাজ-নৈতিক নেতা বা প্রতিভাবান বীর সেনানায়ক বা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেখলে ভুল করব। তিনি একটি যেন বিমূর্ত ভাব, একটি আদর্শ—এক অদৃশ্য আত্মা (invisible soul) তাঁর শরীর মনকে কেন্দ্র করে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। স্বামিজী সিংহিনী নিবেদিতাকে ধার নিয়েছিলেন বিদেশ থেকে দেশের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন করতে, তাঁর সংকল্পের অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের তরুণদলের মধ্যে। দুর্বার সত্যের তেজে তাঁদের অমর জীবন সমুজ্জল। স্বামিজীর তারা ছিল বাণীবাহক, তাঁর বাণীর প্রতি তাদের উদ্দীপ্ত বিশ্বাসই তাদের করেছিল ঝড়ের মতো দুর্দান্ত, আগুনের মত লেলিহান। নবোদিত সূর্য্যের মতই তারা ছিলেন শক্তিধর। রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি বলছেন: মারাঠারা কেবল মাত্র বীরত্ব করে নাই, তাহারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি ভারতের বন্ধন ছেদনের জন্য নেতাজীর মত একজন অমিত শক্তিধর ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন ছিল। একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রতিভা শুধু তাঁরই ছিল। আত্মশক্তির অমোঘ তেজকে, তার মাধুর্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নেতাজীর জীবনে। আশিষ্ঠ, দ্রাঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যৌবনের মূর্ত প্রতীক নেতাজী। বহু শতাব্দীর পর আবার ভারত প্রত্যক্ষ করল মূর্তিমান এই ভারতীয় ক্ষত্রিয়কে। কারণ তিনি শুধু শৌর্যে বৃহৎ ছিলেন না, ছিলেন ঔদার্যেও মহৎ। ভারতবোধের অমিতলাবণ্যে তাঁর চরিত্র সূর্যোজ্জ্বল। সে চরিত্র পাশ্চাত্যের নাইটদের শিভালরির মধ্যেই শেষ হয়নি। তার উদার বীর্যের মাধুর্য ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই সবকটাকেই একত্রে চালনা করার শক্তিতে দীপ্যমান। ত্যাগের দ্বারা পবিত্র, ক্ষমার দ্বারা মহনীয়; কল্যাণের দ্বারা আলোকিত তাঁর চরিত্র। তাঁর চরিত্রের উত্তুঙ্গ বিস্ময় সন্ন্যাসীর আত্মিক মহত্ত্বকে, পবিত্রতার বিনম্র তেজস্বিতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কারণ তাঁর জীবনী শক্তির অমিত সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে ছিল উপনিষদের মন্ত্রে অভীঃতে। ভারতেরেও একান্ত প্রয়োজন ছিল নেতাজীর মানস দর্পণে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা। এখানেই তাঁর বেগবান মনুষ্যত্বের সাধনার সার্থকতা। সত্যিই তিনি দেশ গৌরব।

নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

নাগপুর অধিবেশন

শ্রীবারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কটক এবং এই বৎসর নাগপুর অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ আমার হয়েছে। বাঙ্গালোরের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মনোরম পরিবেশ, অভ্যর্থনা সমিতির আদর আপ্যায়ন,ভারতের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভাইবোনদের সঙ্গে মেলামেশার এবং ভাব বিনিময়ের সুযোগ ও সর্ব্বশেষে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আলোচনা আমাকে এই সম্মেলনের দিকে আকর্ষণ করে। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভ্য হিসাবে এবং কলিকাতা সহরতলির অধিবাসী হিসাবে সাহিত্য আলোচনা শুনার সুযোগ প্রতি মাসেই হয় কিন্তু উপরোক্ত পরিবেশ সব সময় পাওয়া যায় না।

১৯৬০-৬১ সালে বোম্বাই অধিবেশনের কথা কিছু না বল্লে আমার মনে হয় সম্মেলন সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। ভারতে প্রথম রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী অধিবেশন সম্মেলনের প্রচেষ্টায় বোম্বায়ে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বকবি ছিলেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন সেইরূপ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ থেকে সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, শিল্পী, চিত্রকর, এই অধিবেশনে যোগদান করে একে বিশ্ব সম্মেলনের রূপ দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের স্যাটারডে রিভিউয়ের সম্পাদক মিঃ নরম্যান কাসিন বলেছিলেন যে—আমেরিকায় তাদের কোন জাতীয় কবির সম্মানার্থে এই ধরণের সাহিত্য-বিষয়কসভার অনুষ্ঠান করতে তাঁরা পারেনি। আরও একজন সাহিত্যিক বিশ্ব পি, ই, এন, এর সভাপতি মিঃ এলবারটো মোরাভিয়াও ঐরূপ প্রশংসা করেছিলেন। বিশ্বের সমস্ত সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে এই সভার সাফল্য কামনা করে তাদের ভাষণ পাঠিয়েছিল। তাছাড়া বোম্বাই বড় ধনীর সহর—তাই প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালই হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে যোগদান করে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে আবার সম্মেলনের রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর শেষ অধিবেশন কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, কাব্য সাহিত্য, সংবাদ সাহিত্য, বিজ্ঞান সাহিত্য, ইতিহাস সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীত প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আলোচনা করেন। এখানের ব্যবস্থাপনায় অভ্যর্থনা সমিতির একটি সাব কমিটির সভ্য হিসাবে প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তারপর কটক অধিবেশন। এখানেও অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ভালভাবেই করেছিল। এছাড়া উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের বিশেষ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানকার সাহিত্য আলোচনায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের বিশেষ করে ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ ও ভাষার অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। কারণ ভাষাবিদ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন। উড়িষ্যার সাহিত্যিকগণ ওড়িয়া হরফের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্যও সুনীতিবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন।

এবারে আমরা নাগপুর অধিবেশনে যোগদানের জন্য ২৩শে ডিসেম্বর বম্বে এক্সপ্রেসে ও মেলে রওনা হই। কলিকাতার প্রতিনিধিগণ প্রায় সকলেই উক্ত দুইটি ট্রেনে করে ২৪শে সন্ধ্যার মধ্যে নাগপুর পৌছায়। অভ্যর্থনা

সমিতির তরফ থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা ষ্টেশনে বাস ও ট্যাক্সি প্রভৃতি নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিশিবিরে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশ্য সমস্ত অধিবেশনেই এরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রতিনিধিদের থাকার জন্য নাগপুর ওয়াই, এম, সি, এ হোষ্টেলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোষ্টেলটি বেশ বড় এবং একতলা দোতলা মিলিয়ে ২০।২৫টি থাকার ঘর, একটি সভার হল এবং একটি খাবার হল এবং উপযুক্ত সংখ্যক স্নানাগার ছিল। অধিবেশন হয়েছিল বিদর্ভ সাহিত্য সঙ্ঘের হলে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল ধনবতী রঙ্গমন্দিরে। আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয় প্রিন্সেপ নামে একটি মহারাষ্ট্র হোটেলে। তাই বাঙ্গালীর রুচিমত খাওয়ার ব্যবস্থার এখানে অভাব ছিল। এখানে সপ্তাহে দুই দিন চাল রান্না নিষেধ এবং রেশনের অভাবের জন্য ২৫ জনের বেশী অতিথি খাওয়ানও নিষেধ। এবারে প্রায় ৩০ প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের মধ্যাহ্ন ও রাত্রির আহারের ব্যবস্থা উক্ত প্রিন্সেপ হোটেলে হয়েছিল; সকালবেলার টিফিনের ব্যবস্থা ওয়াই, এম, সি, এ হোষ্টেলে ছিল। এবং এ ব্যবস্থাটা ভালই ছিল। তাছাড়া এখানে নাগপুরের বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্র অধিবাসীদের বাড়ীর নারী ও পুরুষগণ স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা হিসাবে আমাদের খাওয়ার তদারক করেছিলেন। এর জন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের কাছে শুনলাম যে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা উক্ত হোষ্টেলে করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সরকার শেষ মুহূর্ত্তে রেশন না দেওয়ায় তখন তাঁহারা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন।

সাহিত্য সম্মেলনের কথা যখন লিখতে বসেছি তখন এবারের অধিবেশনে কি শুনলাম এবং দেখলাম সেটা না বলে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে করি। আমি সাহিত্যিক নই তবে সাহিত্য অনুরাগী। তাই খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সমালোচনা করারমত ক্ষমতা আমার নাই। তবে যেটুকু উপলব্ধি করেছি সেইটুকুই লিখব।

এবারে অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাষণ পাঠ করেন সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ। দেবেশবাবু তাঁর ভাষণে বঙ্গ ও বিদর্ভবাসীদের সাহিত্যে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে, ধর্ম্মে, কবিতায় সামাজিক আচরণে ও ভারতের মুক্তিসাধনার যোদ্ধা হিসাবে বহুবিধ মিলনের বাণী শোনান।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে মহর্ষি বেদব্যাসের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে বলেছেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে সমাজে যে বিধি বিধান আচার আচরণ ছিল তা চিরকাল চলতে পারে না। কলিতে তার পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেছেন যে আজ রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, ব্যক্তি ও গৃহের দিকে তাকালে অক্ষরে অক্ষরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বাঙ্গালোর অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাষণকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, যে সাহিত্যে অমৃত না থাকে তাকে কয়েক মুহূর্ত্ত লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখে বা নেড়েচেড়ে মানুষ পরিত্যাগ করে। তিনি বলেছেন যে পরিবর্ত্তন চিরকাল আছে এবং হবে। আরও বলেছেন বন্যার মত মানুষের প্লাবন এ সমাজ এ বসতি সব উল্টে দেবে। কিন্তু মানুষ বাঁচবে, বাঁচতেই সে এসেছে এবং বাঁচবার জন্য সে বদলাতে জানে। তিনি আরও একটা কথা বলেছেন যে "আজও আমাদের মা বঙ্গভারতী সরকারী এলাকার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। উনিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কর্ত্তৃত্বের আসনে বসে আছেন, যিনি ছিলেন তিনিই। আরও বলেছেন যে মহাবিদ্যালয়েও বাংলাভাষার দ্বার এখনও উন্মুক্ত হয়নি এবং সেই কারণেই দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য দীনার মত একান্তভাবে লজ্জিতা।"

সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন যে মধ্যযুগের ধর্ম্মাশ্রিত সাহিত্য তর্জ্জা এবং মঙ্গলকাব্যের বন্ধন থেকে উনবিংশ শতকে যখন পশ্চিমের যুক্তিবাদ, রাজনৈতিক দর্শন, ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে নূতন চিন্তাধারার উদ্রেক করল এবং সেই সময় সামাজিক বিপ্লবের পটভূমিকায় যে শক্তিশালী লেখক সাহিত্যিক ও সংস্কারকামী নেতাগণ আবির্ভূত হলেন তারা এক সম্পূর্ণ যুগের প্রবর্ত্তন করলেন। তাদের রচনা কেবল নন্দনবাদী নয়, কেবল মনোরঞ্জনের জন্য নয়, সেটা মানব কল্যাণের জন্য। তিনি বলেছেন যে মানব কল্যাণই

সাহিত্যের ও শিল্পের সব চেয়ে বড় সার্থকতা। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের নানা বিচিত্র উপকরণ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে আধুনিক লেখকেরা গোটা মানুষের সন্ধান করছেন। মনুষ্যত্ব যেখানে অপমানিত, সুবিচার যেখানে প্রত্যাখ্যাত এবং জীবন যেখানে ধিকৃত সেইখানেই শিল্পী ও সাহিত্যিককে এগিয়ে আসতে হবে নির্মল বিবেক ও নির্ভয় চিত্তের বাণী নিয়ে। ভাষার ব্যাপারে তিনি দাবী করেছেন যে হিন্দীর সঙ্গে ভারতের আরও ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষার সমান মর্য্যাদা ও অধিকার দিতে হবে। সাহিত্য শাখার অধিবেশনে আরও যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জরাসন্ধ), শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। এঁরা সকলেই অল্প বিস্তর আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতাকে নিন্দা করে গেছেন। কারণ এতে সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটছে। আবার অনেকেই বলেছেন যে সমাজ জীবন নিয়েই সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাই সামাজিক চিত্র বাদ দিয়েও সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। তবে তার মধ্যেও আদর্শ বজায় রাখতে হবে।

সমাজ ও সংস্কৃত শাখার সভাপতি শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর ভাষণে বর্ত্তমান যুবক সমাজকে আমাদের পূর্ব্বের সমাজ ও সংস্কৃতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, দিন আবার আসবে যখন আবার বর্ত্তমান অবস্থা ছাড়িয়ে সমাজ উন্নত ও মধুময় হবে। তিনি আমাদের উত্তরসূরীদের স্মরণ করতে বলেছেন।

শিশু-শাখার সভাপতি শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) তাঁর ভাষণে শিশুদের পিতামাতাকে তাদের সর্ব্বক্ষণের সাথী হয়ে লেখাপড়া, খেলা, গল্প করা, গান, অভিনয়, ভ্রমণ করা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে তাদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন। তবেই শিশুর মন সুন্দর ও মধুর হবে। তাদের ফুল গাছের মত যত্ন সহকারে লালন পালন করে তুলে ফোটাতে বলেছেন। তবেই তাদের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

মহিলা বিভাগের উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমতী শারদা দেবী শর্ম্মা এবং সভানেত্রী ছিলেন মহাশ্বেতাদেবী। এ ছাড়া যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ শ্রীমতী উমা রায় ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সকলেই বর্ত্তমান অশ্লীল সাহিত্যকে নিন্দা করে গেছেন এবং যেমন পচা মাছ ও অখাদ্য জিনিষ আমরা বর্জ্জন করি সেই ভাবে বর্জ্জন করতে বলেছেন।

মারাঠী সাহিত্য শাখার উদ্বোধক ছিলেন শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ ও সভাপতি ছিলেন ডাঃ এম, জি, দেশমুখ। ইঁহারা দুজনে বাংলা ও মহারাষ্ট্র সাহিত্যের পরস্পর মিলন ও প্রভাব এবং উক্ত দুই ভাষায় যে সব পুস্তক বিদর্ভবাসীরা বাংলায় ও বাঙ্গালীরা মহারাষ্ট্র ভাষায় রচনা করেছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির কৃতী ছাত্র-ছাত্রীগণকে ডিপ্লোমা প্রদান করা হয় এবং "যুগান্তর" ও "অমৃত" পুরস্কারও ঐ দিন প্রদান করা হয়।

সম্মেলনের অধিবেশন ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে তিন দিন হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অধিবেশন হয়। প্রথম দিনে একটি মারাঠী নাটক, দ্বিতীয় দিনে লিটল থিয়েটারের "রাঙ্গা নূপুর" এবং তৃতীয় দিনে ধনঞ্জয় বৈরাগীর "রজনী গন্ধা" অভিনয় দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দান করে।

নাগপুর বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বলতে—ধানতলী কালীবাড়ী, বেঙ্গলী এসোসিয়েশন, বেঙ্গলী এডুকেশন সোসাইটি-এর অধীনে তিনটি বিদ্যালয় আছে। এই সমিতি ১৯১৮ সালে স্যার বিপিন বোস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া টেগোর মেমোরিয়াল স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারস্বত সভা লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে।

নাগপুরে থাকাকালীন আমরা মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম পরিদর্শনে যাই। দু খানা বাসে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি ওয়ার্দ্ধা যাই। ওয়ার্দ্ধা নাগপুর থেকে ৪৮ মাইল। সেখানে আশ্রম ছাড়া একটি হাসপাতালও আছে। সেখানে বর্ত্তমানে গান্ধীজির এক পুত্র ও পুত্রবধূ থাকেন এবং দু' একজন বাঙ্গালী আশ্রমবাসীও আছেন। এখানে গান্ধীজীর ব্যবহার্য্য বহু জিনিষ এখনও রাখা আছে।

নাগপুর থেকে ২৬ মাইল দূরে 'রামটেক' নামে একটি এক হাজার ফুট উচ্চ পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের তিন দিক দিয়ে উঠবার সিঁড়ি আছে। একদিকের সিঁড়ি প্রায় ৯০০টি হবে। এই মন্দিরের চূড়ায় রামচন্দ্র, সীতা-দেবী এবং লক্ষ্মণের মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি ভোসলারাজ রাঘোজী প্রথম কর্ত্তৃক ১৭৪৩ থেকে ১৭৫২ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্য থাকার সময় এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই রামটেক সহরে ২৭টি বিরাট পুষ্করিণী আছে। তার মধ্যে আম্বালা পুষ্করিণী সকলের বড় এবং এইটি উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে। এই পুষ্করিণীকে বিদর্ভবাসী গঙ্গার মত পবিত্র মনে করে। এখানে বাসে ও ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। এ ছাড়া নাগপুরের ভিতরে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ সীতাবালডি দুর্গ, মহারাজা বাগ, আম্বাঝাড়ি এবং তেলিংখেরি নামে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং এই সবগুলিই ভোসলা রাজাদের সময়ের। নাগপুরে বর্ত্তমানে সাত আট হাজার বাঙ্গালীর বাস এবং এখানকার বাঙ্গালী সমাজ এখনও বাঙ্গলা দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছেন। আমি তাঁদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

নীতি ও নির্ব্বাচন

শ্রীজ্ঞান

"গণতন্ত্র" বা 'ডেমোক্রেসী' কথাটার অর্থ তোমরা নিশ্চয়ই জান এবং আমাদের দেশ যে গণতন্ত্রীই শুধু নয়—বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ, তাও তোমাদের অজানা নয়। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ হচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ঐ দেশে গণতন্ত্র চালু হয়েছে অনেক-দিন। আমেরিকাবাসীরা যুদ্ধ করে ইংরাজ ঔপনিবেশিক-দের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে দেশে গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করে। বিশ্বের বহু দেশেই এখন রাজতন্ত্র (Monarchy) ও একনায়কতন্ত্রের (Dictatorial) উচ্ছেদ হয়ে এই গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়েছে। বেশীর ভাগ রাজনীতিবিদ পণ্ডিতের এবং সাধারণ লোকের মতে দেশ শাসনের পক্ষে গণতান্ত্রিক নীতিই এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এখনও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, কার্য্যতঃ দেখা যায় রাজ-শক্তি সে সব দেশে খুবই সীমিত এবং প্রায় গণতন্ত্র শাসনই প্রবর্তিত হয়েছে। এইরূপ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে গ্রেট বৃটেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংলণ্ডে যদিও বহুদিন ধরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছেও, সিংহাসনারূঢ় রাজা বা রাণীই সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা, তবুও আসলে কিন্তু দেশ শাসন করে বৃটিশ পার্লামেণ্ট, গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নির্ব্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের সাহায্যে। রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিকদল (Labour Party) এই দু'টি দল বৃটেনে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। তাঁরাই প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত করে মন্ত্রীসভা গঠন করে রাজ্য পরিচালনা করে থাকেন। এবং যে দল ভোটে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে থাকেন। আর বিজিত দল বিরোধী পক্ষ বা Opposition রূপে নির্দ্ধারিত হন। এখানে "ক্রাউন" বা রাজার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ যদিও তাঁকেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়।

আমাদের দেশে মার্কিণ গণতন্ত্রের আদর্শে এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতীয়গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এখানেও প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতিই দেশের সর্ব্বপ্রধান। আবার বৃটিশ পার্লা-মেণ্টের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বলে কিছু নেই, সেখানে প্রেসিডেণ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা এবং "সিনেট"-এ (Senat) নির্ব্বাচিত সদস্য বা সিনেটরগণ (Senater) প্রেসিডেণ্টকে রাজ্যপরি-চালনার সাহায্য করে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য, দুরপ্রাচ্য ও আফ্রিকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত বহুদেশেই এখন ভারতের ন্যায় গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে, অর্থাৎ সেখানে প্রেসিডেণ্টও আছে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাও আছে, আর গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সারা দেশে 'নির্ব্বাচন'ও হয়ে থাকে।

এই যে "নির্ব্বাচন" বা "Election" তা জনসাধারণের ভোটদানের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণ যে ব্যক্তি বা দলকে বেশী ভোট প্রদান করেন তাঁরাই নির্ব্বাচিত হয়ে রাজ্য পরিচালনার অধিকারলাভ করেন। এই অধিকার তাঁদের পুনঃ নির্ব্বাচনের সময় অবধি থাকে। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর (ভারতে পাঁচ বৎসর অন্তর) একটি নির্দ্ধারিত সময়ে এই "নির্ব্বাচন" আবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র শাসিত দেশে এই "সাধারণ নির্ব্বাচন" (General Election) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর দেশের শাসন ব্যবস্থা নির্ভর করছে। ভোটে যে দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবে, সেই দলের নীতি (policy) অনুযায়ই দেশের শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারিত হবে এবং সেই দলের ব্যক্তিদের কার্যকারিতার ওপরই রাজ্য পরিচালনা বহুলাংশে নির্ভর করবে। তাই গণতন্ত্রী দেশের অতি সাধারণ লোকেরও ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার আছে।

আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটাধিকার আছে। একে ইংরাজীতে বলা হয় Adult Franchise, তোদের মধ্যে অনেকেই এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হও নি বলে ভোট দিতে পারবে না। ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচন আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা এই 'নির্ব্বাচনে ভোট না দিতে পারলেও অনেকেই যে এই ইলেক্‌সন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় যে ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অধিকার তোমাদের নেই (তোমাদের অপরিণত মনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলেই এ অধিকার তোমাদের দেওয়া হয় নি।) সে ব্যাপারে তোমাদের মাথা না ঘামানই উচিত।

বড়দের ব্যাপার বড়রাই বুঝুক। তোমরা তোমাদের পড়াশুনা, খেলাধূলা, আনন্দ-উৎসব নিয়ে থাক—তাতে তোমাদের মঙ্গলই হবে। এই রাজনীতির ঘোরপ্যাচের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের মনকে কলুষিত কর না—শত্রুতা, হিংসা প্রভৃতির মধ্যে থেকে নিজেদের মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্যহানী ঘটিও না। যদি রাজনীতি চর্চ্চা করতে চাও, তাহলে রাজনীতি রাস্তায় ঘাটে না করে পাঠাগারে এবং বিদ্যালয়ে গ্রন্থপাঠে, আলোচনায় ও শিক্ষকের উপদেশের মাধ্যমেই করে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন কর। তাহলেই তোমরা সত্যকার রাজনীতি শিক্ষা করতে পারবে এবং অনেককে শিক্ষা দিতেও পারবে। কিন্তু সর্ব্বসময়ে চেষ্টা কর কোনও দলীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়তে এবং দেশের স্বার্থকে, দেশের মঙ্গলকে সর্ব্বোচ্চে রাখতে। তবেই তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

***
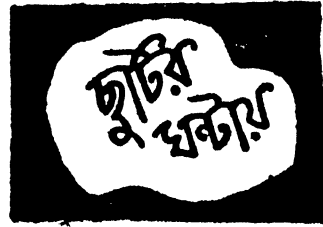
চিত্রগুপ্ত

এবারে যে রহস্যময় বিজ্ঞানের খেলাটির কথা বলছি, সেটি যেমনি আজব, তেমনি বিচিত্র মজার। এ খেলায় কলা-কৌশল রপ্ত করে, ছুটির আসরে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, শুধু তোমাদের সমবয়সী ছেলেমেয়েরাই নয়, বাড়ীর বড়রাও যে রীতিমত অবাক হয়ে যাবেন, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই।

এ খেলার কলা-কৌশল রপ্ত করা খুবই সহজ ব্যাপার এবং খেলাটি দেখানোর জন্যে যেসব উপকরণ জোগাড় করা দরকার, সেটিও এমন কিছু ব্যয়সাধ্য বা হাঙ্গামার কাজ নয়।

আসরে দর্শকদের সামনে এ খেলাটি দেখাতে হলে চাই—লাল-রঙের একটি গোলাপফুল, একবাক্স দেশলাই, একটি মোমবাতি এবং একপাত্র জল। এসব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, খেলার কসরৎ দেখানোর পালা।

দর্শকদের আসরে খেলার কসরৎ দেখানোর সময় উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে দেশলাই-কাঠি ঘষে জ্বালানো মোমবাতির শিখার উপরে লাল-গোলাপফুলটিকে ধরো। তবে হুশিয়ার, ফুলটিকে এভাবে মোমবাতির জলন্তশিখার উপরে ধরে রাখার সময়

অসাবধানতার ফলে, তোমার শরীরে বা জামাকাপড়ের কোথাও এবং ফুল, পাতা বা ডাটার কোন অংশেই যেন সরাসরি আগুনের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগে···লাগলেই শুধু খেলার মজাটুকুই যে মাটি হয়ে যাবে তাই নয়, নিজেরও শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। কাজেই এ বিষয়ে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ আগুনের জ্বলন্ত শিখার ঈষৎ তফাতে সাবধানে গোলাপ ফুলটিকে ধরে এ খেলার কশরৎ দেখিও—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে—তাহলেই বিপদের বা মজা-মাটি হবার বিশেষ আশঙ্কা থাকবে না।

মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখার উপরে এভাবে গোলাপ ফুলটিকে ধরে রাখার ফলে, কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—ফুল ও পাতার যেসব অংশে আগুনের আঁচ লেগেছে, সেই অংশগুলির রঙ ক্রমশঃ বদলে গিয়ে বিবর্ণ ও শাদাটে ধরণের (variegated or entirely white) হয়ে উঠেছে। তখন আসরে দর্শকদের সামনে সেই 'অগ্নিদগ্ধ বিবর্ণ' ফুলটিকে দেখিয়ে বোলো যে বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় যাদুমন্তরে, তুমি অনায়াসেই সেটিকে আবার তার আগেকার অবস্থায় ও রঙে ফিরিয়ে আনতে পারবে। দর্শকদের অনেকেই হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না—এমন কি, উপহাসচ্ছলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়বে না।

কিন্তু তাঁদের সেসব মন্তব্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়েই, আসরে সকলের চোখের সামনেই তুমি এবারে সদ্য অগ্নিদগ্ধ ও বিবর্ণ গোলাপফুলটিকে কিছুক্ষণ ভালোভাবে চুবিয়ে রেখে দাও—টেবিলের উপরে সাজানো জলের পাত্রে। তাহলেই সবাই অবাক-বিস্ময়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন যে 'সদ্যোদগ্ধ ও বিবর্ণ সেই গোলাপফুলটি ক্রমেই আবার আগের মতোই দিব্যি সুন্দর টুকটুকে লালরঙের হয়ে উঠেছে। তখন তাঁরা সবাই তোমার এই আজব কেরামতী দেখে, বিদ্রূপ ভুলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন।

এই হলো, এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য। এমন 'আজবব্যাপার ঘটে বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে—আগুনের তাপে ও জলের শীতল-স্পর্শে ফুলের পাপড়ির উপর বিশেষ ধরণের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে।

এবারে এই পর্য্যন্তই···আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। কার্ডবোর্ডের টুকরো সাজানোর আজব হেঁয়ালী :

উপরের ছবিতে ছোট, বড় আর মাঝারি সাইজের যেমন নক্সা নমুনা দেখানো হয়েছে, হুবহু তেমনি ছাঁদে পাতলা মজবুত ধরণের একখানা কার্ডবোর্ড ছাঁটাই করে বিভিন্ন মাপের দশটি আলাদা আলাদা টুকরো বানিয়ে নাও। বড় সাইজের কার্ডবোর্ডের টুকরো ছাটাই করো—৪ খানা, মাঝারি সাইজেরও বানাও—৪ খানা এবং ছোট সাইজের বানিয়ে নাও—২ খানা। এবারে মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে ছোট, বড় আর মাঝারি মাপের ঐ ১০খানা কার্ডবোর্ডের টুকরো এমন কায়দা মতো সাজাও যে সেগুলি জোড়া লাগালে দিব্যি পরিপাটি ছাঁদের একটি 'চতুষ্কোণ' বা 'sguare' রচনা করা যায়। তোমরা হয়তো ভাবছো যে এ আর এমন কি শক্ত কাজ।···ব্যাপারটা আসলে কিন্তু নেহাৎ সোজা নয়। ত্যাখো তো চেষ্টা করে—পারো কিনা, এই আজব হেঁয়ালির সঠিক সমাধান করতে। যদি পারো তো তোমাদের নাম-ধাম সমেত সাজানো নক্সার সঠিক প্রতিলিপিটি পাঠিয়ে দিও আমাদের দপ্তরে।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। খাই যারে দেখি নাই···
তবু করি খাই খাই !···
—বলো তো, সেটি কি ?

রচনা : দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা)

৩। তিন অক্ষরে নাম—রঙটি কিন্তু কালো। তবে চোখে দিলে, চোখ ভাল থাকে। প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে, পৃথিবীর সকল জীবজন্তু, গাছপালা—প্রত্যেকেরই

জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ বোঝায়। শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে, কর্তার কর্ম্ম বোঝায় এবং মাঝের অক্ষর ছাড়লে, সময়ের আভাস পেলে।

রচনা : ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালীর' উত্তর :

১	৬	৫	২৩	১৪
৩	২৪	১২	১৬	১০
১	২০	৮	৪	২২
৯	২	২১	১৫	১৮
৫	১৩	১৯	৭	১

২। আকবর

৩। রামধনু

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিভা, শোভা, বকুল, মিনতি, শ্যামানন্দ, আশানন্দ, যোগানন্দ মজুমদার (কার্শিয়ঙ), সুপর্ণা, সুলতা ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (লক্ষ্ণৌ), বিজয়া ও গৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), সঞ্জয়, মুরারি, অমিয়, সুনীল ও নমিতা (ভিলাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), প্রতুলচন্দ্র ও মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘাটশীলা), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), শর্ম্মিষ্ঠা ও শত্রুমিত্রা রায় (কলিকাতা), রিনি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), অমিয়, প্রশান্ত, রবি, অমৃত, সুনীত, তিনকড়ি, মানস, ভুবনমোহন, বিশ্বতোষ, অরবিন্দ, অমিতাভ, অভীন্দ্র, ভাস্কর, কৃষ্ণলাল, অনিল, রামসদয়, শুভেন্দু ও ধনেশ (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), অঞ্জলি ও সনৎ ভাদুড়ী (কৃষ্ণনগর), পিন্টু, ফণী ও খুকু সাহা (কলিকাতা), লক্ষ্মী, অজিত, দুর্গা, সরস্বতী ও সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বারাসত), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), মালা, চন্দন ও দ্বিজেনদা (কলিকাতা)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), জগদীন্দ্র, সদীশ, কল্যাণ, শচীন, রঞ্জিত, বিশ্বদেব, শৈলেন্দ্র, মাধুরী, নতা, শ্যামলী ও কাননিকা গুপ্ত (রাঁচি), সুষমা, সুধাংশু, মাংশু, সীতাংশু ও হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সন্তোষপুর), প্রাশ, নীলমণি, কালিদাস, রণজিৎ, আশুতোষ, নির্ম্মল সহদেব রায় (কলিকাতা), রবি, অশোক, সুমিতা, ন্টু, বুতাম ও বাপি (বোম্বাই), ইন্দ্রাণী, উত্তরা, উদয়ন, র্থ, গৌতম, কল্যাণ, শিবাজী, তিলক, ঋতা, রণি, শীলা, াণিক, পিণ্টু, মিনতি, বাপি, দীপা, সুস্মিতা ও মোহনলাল (উদয়পুর), সুধীর, চারু, নরেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও শ্যামলী ক্রবর্তী (কলিকাতা), শৈলেন ও শোভনা সেন (ভুবনেশ্বর), অজয়, হরিদাস, গোপী, বিজন, শান্তনু, প্রভবদেব রায়চৌধুরী (দুর্গাপুর), নির্ম্মলা, কান্তা, শান্তা, সীতা, মহেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, রত্নেশ্বর ও গোকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় (মালদা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

অজিত, অরুণ, মহামায়া, যোগমায়া ও শ্যামাদাস চৌধুরী (বিলাসপুর), পুষু, অপু, নেড়ু, কলু, ঝণ্টু ও ও কল্যাণী রাহা (চন্দননগর), অনন্ত, সুবোধ, কালীপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ ও শর্ম্মিলা রায় (কলিকাতা), সুকুমার ও রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা), পাহাড়ী, অতি, হীতেন, রমেন, বসন্ত, নির্ম্মলকুমার, অনাবিল, আনন্দ, ঋতেন ও বাসবী ঘোষ (গড়িয়া)।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ডেভিস কাপ :

মেলবোর্নে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৪-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনবার এবং মোট একুশবার (রেকর্ড) ডেভিস কাপ জয় করেছে। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৩৫ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক ২১ বার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড করলো। অপর দিকে ভারতবর্ষের এই প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৭ বছরের ইতিহাসে মোট ১২ বার খেলা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে ১০ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫) খেলা বন্ধ ছিল। তাছাড়া ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে খেলা হয়নি। এই আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা (সরকারী নাম) আরম্ভ হয় ১৯০০ সালে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত মাত্র এই চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া (২১ বার), আমেরিকা (১৯ বার), গ্রেটবৃটেন (৯ বার) এবং ফ্রান্স (৬ বার) ডেভিস কাপ পেয়েছে। এই চারটি বিজয়ী দেশ ছাড়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে পরাজয় স্বীকার করেছে ইতালী (২ বার) এবং একবার ক'রে বেলজিয়াম, জাপান মেক্সিকো, স্পেন এবং ভারতবর্ষ। যুদ্ধোত্তর কালের (১৯৪৬-৬৬) ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বছরই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ১৪ বার ডেভিস কাপ জয় করেছে। বাকি ৭ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে আমেরিকা (১৬ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলে)। অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এই দুটি দেশ উপর্যুপরি ১৩ বার (১৯৪৬-৫৯) পরস্পরের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে একটানা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই ১৪ বারের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ বার এবং আমেরিকা ৬ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছিল। পরবর্তী সাত বছরের (১৯৬০-৬৬) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা মিলিত হয়েছে দুবার (১৯৬৩-৬৪)। বাকি পাঁচ বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলেছে ইতালী ২ বার (১৯৬০ ৬১, মেক্সিকো ১ বার (১৯৬২), স্পেন ১ বার (১৯৬৫) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (১৯৬৬)।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলার প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া দুটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়ে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে ভারতীয় জুটি রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ডাবলসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম এবং টনি রোচকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করলে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার ফলাফল ২-১ দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনে বাকি দুটি সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হলে তারা ৪-১ খেলার ব্যবধানে ডেভিস কাপ জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম দিনে ফ্রেড স্টোলে (২ নং খেলোয়াড়) ৬ ৩, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। রয় এমার্সন (১নং খেলোয়াড়) ৭-৫, ৬ ৪ ও ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৪ ৬, ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে জন নিউকম এবং টনি রোচকে (১নং বিশ্বজুটি) পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিনে রয় এমার্সন ৬-০, ৬-২ ও ১০-৮ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। ফ্রেড ষ্টোলে ৭-৫, ৬-৮, ৬-৩, ৫ ৭ ও ৬-৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ :

দ্বিতীয় টেষ্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৯০ রান (কানহাই ৯০, সোবার্স ৭০, নার্স ৫৬ এবং হান্ট ৪৩ রান। চন্দ্রশেখর ১০৭ রানে ৩, বেদী ৯২ রানে ২ এবং সুর্তি ১০৬ রানে ২ উইকেট) ভারতবর্ষ : ১৬৭ রান (কুন্দরন ৩৯ এবং জয়সীমা ৩৭ রান। গিবস ৫১ রানে ৫, সোবার্স ৪২ রানে ৩ এবং হল ৩২ রানে ১ উইকেট)। ও ১৭৮ রান (হনুমন্ত সিং ৩৭, জয়সীমা ৩১ এবং সুর্তি ৩১ রান। সোবার্স ৫৬ রানে ৪, গিবস ৩৬ রানে ২, লয়েড ২৩ রানে ২ এবং হল ৩৫ রানে ১ উইকেট)।

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস এবং ৪৫ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয় এবং সেই সূত্রে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৬ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা পঞ্চম দিনের ৬৫ মিনিট পর্যন্ত গড়ালেও খেলার জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে তিন দিন ৬৫ মিনিটের খেলায়। কারণ দ্বিতীয় দিনে ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী খেলা আরম্ভই হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এবং আমাদের সামাজিক জীবনে ১৯৬৭ সালের এই ১লা জানুয়ারী তারিখটি এক অশুভ কলঙ্কিত দিন। খেলার প্রথম দিনেই দেখা যায়, কুড়ি টাকার সিজন টিকিটের গ্যালারী ছাপিয়ে মাঠের মধ্যে দর্শকরা ছিটকে পড়ছেন। পিছনের দর্শকদের প্রবল চাপে সামনের দর্শকদের তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা গ্যালারী ছাড়তে বাধ্য হন এবং মাঠের মধ্যে খেলার সীমানা রেখার বাইরে বসে খেলা দেখেন। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের যে মাটিতে বসে খেলা দেখতে হল তার জন্যে তাঁর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে খেলা ভণ্ডুল করেন নি। মাটিতে বসে এবং রোদে পুড়ে খেলা দেখার কষ্ট হাসিমুখেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষও দর্শকদের মাটিতে বসে খেলা দেখা এইদিন মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু খেলার দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল, শান্তি এবং শৃঙ্খলারক্ষার কাজে নিযুক্ত পুলিশ-বাহিনী কুড়ি টাকার সিজন টিকিটের দর্শকদের মাটিতে বসে খেলা দেখার বিরোধী। এদিকে গ্যালারীর মধ্যে ভীড়ের চাপে দর্শকদের সাংঘাতিক অবস্থা। মাঠের মধ্যে উপচে পড়া জনতাকে রুখতে গিয়ে পুলিশ এক সময়ে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। এই সূত্রধরে পুলিশের সঙ্গে দর্শকদের সংঘর্ষ বেধে যায় এবং মুষ্টিমেয় দর্শকদের রোষানলে মাঠে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তারই ফলে দ্বিতীয় দিনের খেলা ভণ্ডুল হয়। পুনরায় খেলা হয় ৩রা থেকে ৫ই জানুয়ারী। অর্থাৎ পাঁচদিনের টেষ্ট খেলা চারদিনের খেলায় পরিণত হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ২১২ রান সংগ্রহ করে। খেলার তৃতীয় দিনে (৩রা জানুয়ারী) ৩৯০ রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বাকি সময়ে ১ উইকেটের বিনিময়ে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮৯ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৬৭ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে ভারতবর্ষকে ফলো-অন করতে হয়। এই দিনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৫ মিনিট টিকে ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষ তার বাকি পাঁচটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৫ রান সংগ্রহ করে। ১৭৮ রানের

মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ব্যাটিংয়ে ভারতবর্ষের কি শোচনীয় ব্যর্থতা! শেষ পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের স্পিন বোলিংও ভারতবর্ষের কাল হয়ে দাঁড়ায়। আগে ছিল ফাষ্ট বোলিং।

তৃতীয় টেষ্ট:

ভারতবর্ষ: ৪০৪ রান (বোরদে ১২৫, ইঞ্জিনিয়ার ১০৯, সুর্তী নটআউট ৫০ এবং পাতৌদি ৪০ রান। গিবস ৮৭ রানে ৩, সোবার্স ৬৯ রানে ২ এবং হল ৬৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৩২৩ রান (ওয়াদেকার ৬৭, সুব্রহ্মণ্যম ৬১, হনুমন্ত সিং ৫০ এবং বোরদে ৪৯ রান। গিবস ৯৬ রানে ৪, গ্রিফিথ ৬১ রানে ৪ এবং হল ৬৭ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ৪০৬ রান (সোবার্স ৯৫, কানহাই ৭৭, হাণ্ট ৪৯ এবং বাইনো ৪৮ রান। চন্দ্রশেখর ১৩০ রানে ৪, সুর্তী ৬৮ রানে ৩ এবং প্রসন্ন ১১৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২৭০ রান (৭ উইকেটে। সোবার্স নট-আউট ৭৪ এবং গ্রিফিথ নটআউট ৪০ রান। বেদী ১ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১০৬ রানে ৩ উইকেট)

মাদ্রাজের চীপক মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় তথা শেষ পর্যন্ত টেষ্ট খেলাটি প্রবল উত্তেজনাসৃষ্টি করে শেষপর্যান্ত ড্রযায়। ভারতবর্ষটসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয় এবং প্রথম দিনের খেলায় পাঁচ উইকেট খুইয়ে ২৭৮ রান সংগ্রহ করে। প্রথম উইকেটের জুটি ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং দিলীপ সরদেশাই ১২৯ রান তুলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান করেন। এই খেলায় ইঞ্জিনিয়ারের ১০৯ রান (১৭টা বাউণ্ডারী সহ) টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে ৪০৪ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বোরদে ১২৫ রান (বাউণ্ডারী ১৪টা) করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই পঞ্চম সেঞ্চুরী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে তৃতীয় এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তিনি দলের অতি সঙ্কটকালে খেলতে নেমে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি দেড়ঘণ্টার খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না খুইয়ে ৯৫ রান তুলেছিল। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪০৫ রান (৯ উইকেটে) দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের খেলার সুচনা শুভ হয়নি। মাত্র ২১ রানের বিনিময়ে ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের তিনটে উইকেট পড়ে যায়। তখন খেলার গতি ভারতবর্ষের অনুকূলে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন উইকেট পড়ে ১১৫ রান। কিন্তু দলের ১২২ রানের মাথায় সরদেশাইয়ের হাত থেকে কানহাইয়ের সহজ ক্যাচ পড়ে গেলে কানহাই নতুন জীবন পেয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি শুধু ব্যক্তিগত ৭৭ রানই (বাউণ্ডারী ৯ এবং ওভার বাউণ্ডারী ২) করেন নি লয়েডের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ৭৯ রান এবং নার্সের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ৫২ রান তুলে দিয়ে খেলার ভিত খুবই শক্ত করে দেন। লাঞ্চের পর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলায় ভাঙ্গন ধরে, অল্প রানের ব্যবধানে তিনটে উইকেট পড়ে যায়। দলের অধিনায়ক সোবার্স এই অবস্থায় পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। সোবার্স অষ্টম উইকেটের জুটিতে গ্রিফিথের সহযোগিতায় ৩৭ রান এবং নবম উইকেটের জুটিতে হলের সহযোগিতায় ঝড়ের গতিতে ৬৭ মিনিটে দলের ৮০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৯টা উইকেট পড়ে ৪০৫ দাঁড়িয়েছে। খেলায় সোবার্স ৯৫ রান করে এবং গিবস খালি হাতে অপরাজিত। চতুর্থ দিনে ৪০৬ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা সামান্য ২ রানে অগ্রগামী হয়। সোবার্সের ৯৫ রানে ছিল ১০টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ৩০৩ রান তুলেছিল। ওয়াদেকার এবং বোরদের তৃতীয় উইকেট জুটির খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল—এই জুটিতে ৬২ রান উঠেছিল। পঞ্চম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২২ মিনিট টিকে ছিল—এই সময়ে ২০ রান উঠেছিল। ৩২৩ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের জন্য ২৮৫ মিনিটে ৩২২ রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। সকলেই আশা করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয় লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণবন্ত খেলার নজির সৃষ্টি করবে—যা তাদের খেলার বৈশিষ্ট্য। খেলার এক সময়ে তারা ঘড়ির কাঁটাকে ফেলে

রেখে রান সংগ্রহও করেছিল—এক ঘণ্টার খেলায় ৬২ রান। কিন্তু ১৩০ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ১৩১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে গেলে রানের গতি মন্থর হয়ে যায়। তখন খেলা ভারতবর্ষের অনুকূলে। কিন্তু তারা নিজের দোষে সেই সুযোগ হাত-ছাড়া করে। যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান ১৩৯ এবং সোবার্সের রান মাত্র ৬—সুর্তি এই সময় সোবার্সের 'ক্যাচ' ফেলে দেন। সোবার্স পুনরায় বেদীরই পরের ওভারে 'ক্যাচ' তুলেন—এবার তা হনুমন্ত সিং নষ্ট করেন। চা-পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৭ রান (৭ উইকেটে) দাঁড়ায় তখন খেলছেন সোবার্স (৩৭ রান) এবং গ্রিফিথ (৪ রান)। তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপদ কাটেনি। তখন তাদের প্রধান লক্ষ্য খেলা ড্র করা। শেষ পর্য্যন্ত অষ্টম উইকেটের জুটি সোবার্স এবং গ্রিফিথ দলের ৭৭ রান তুলে দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে অপরাজিত থেকে যান। সোবার্স ১৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ৭৪ রান (বাউণ্ডারী ৯ এবং ওভার বাউণ্ডারী ১) করেন। গ্রিফিথের ৪০ রান (বাউণ্ডারী ৮) তুলতে ৯০ মিনিট সময় লাগে।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পড়্‌পড়্‌তা:

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গারফিল্ড সোবার্স (মোট রান ৩৪২ এবং গড় ১১৪.০) এবং বোলিংয়ের লান্স গিবস (৯৭ রানে ১৮ উইকেট এবং গড় ২২.০) শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান পেয়েছেন উইকেট কিপার ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (মোট রান ১০৩ এবং গড় ৬৬.৫)। বোরদে ভারতবর্ষের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান এবং উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেছেন (মোট রান ৩৩৬ এবং গড় ৫৭.৬) বোলিংয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন বি এস চন্দ্রশেখর (৫১৩ রানে ১৮টা উইকেট)।

সেঞ্চুরী রান

ভারতবর্ষের পক্ষে (৩টি): চাঁদু বোরদে—১২১ রান (বোম্বাই) এবং ১২৫ রান (মাদ্রাজ); ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ১০১ রান (মাদ্রাজ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে: কনরাড হান্ট—১০১ রান (বোম্বাই)।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে পাঁচটি টেস্ট সিরিজ এবং ২৩টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই জয়ী হয়েছে। ২৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২ এবং খেলা ড্র ১১। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জয়ের ঘর এখনও শূন্য।

জাতীয় টেবল টেনিস:

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ২৮তম জাতীয় এবং ইণ্টার এসোসিয়েশন টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

ফাইনালে বিজয়ী

দলগত বিভাগ: পুরুষ, মহিলা এবং বালক—এই তিন বিভাগেরই ফাইনালে মহারাষ্ট্র জয়ী হয়। একই বছরে এই তিনটি বিভাগে মহারাষ্ট্র ইতিপূর্ব্বে ১৯৫৮ ও ১৯৬৫ সালে খেতাব জয়ী হয়েছিল।

ব্যক্তিগত বিভাগ: পুরুষদের সিঙ্গলসে ফারুক খোদাজি (মহারাষ্ট্র), মহিলাদের সিঙ্গলসে উষা সুন্দরাজ (মহীশূর), পুরুষদের ডাবলসে নিকোলাই নোভিকোভ এবং রোমণ্ড মিথনেভিচ (রাশিয়া), মহিলাদের ডাবলসে জাইমা এবং বেল্লা (রাশিয়া)।

ভারতবর্ষ বনাম রাশিয়া:

রাশিয়ান টেবল টেনিস দল ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে চারটি টেস্টের পুরুষ বিভাগে এবং পাঁচটি টেস্টেরই মহিলা বিভাগে জয়ী হয়। রাশিয়ার একমাত্র পরাজয়—পঞ্চম টেস্টের পুরুষ বিভাগে ২-৩ খেলায়।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা:

১৯৬৭ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার কুমারী ইভানভ-সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়ে দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ৬নং খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লাল। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে ২নং বাছাই টমাস কক (ব্রেজিল) এবং সেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ১নং বাছাই রমানাথন কৃষ্ণান চতুর্থ সেটে মাংসপেশীর টানে আক্রান্ত হয়ে খেলা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলে তিনি সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

ফাইনালে বিজয়ী: পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রেমজিৎ লাল পুরুষদের ডাবলসে কৃষ্ণান এবং জয়দীপ জুটি, মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী ইভানভ (রাশিয়া), মহিলাদের ডাবলসে কুমারী ইভানভ এবং শ্রীমতী আবজানভের জুটি (রাশিয়া) এবং মিক্সড ডাবলসে কুমারী ইভানিভ এবং আলেকজান্দার মেত্রেভেলী জুটি (রাশিয়া)।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩/১/১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) [illegible] ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৪।১।৬৭ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ব্রহ্মকর্মসমাধি

ঋষভচাঁদ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

গীতা—৪র্থ অধ্যায়, ২৪

জগতের ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে গীতার স্থান, এক হিসেবে অনুপম ও অদ্বিতীয়। এর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক সুবিশাল পরিধির অভ্যন্তরে বিভিন্ন যোগপ্রণালী, ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের সমাহার ও সমন্বয়। দ্বিতীয় বিশিষ্ট্য, বৈদিক অধ্যাত্মজ্ঞান ও যোগমার্গগুলির ঔপনিষদিক সমন্বয় প্রচেষ্টার পর এত বড় সমন্বয় আর হয়নি বহু দীর্ঘ শতাব্দী ধরে'। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, এই সুবৃহৎ সমন্বয়ের উৎস দার্শনিক চিন্তা নয়, এক সুগভীর, সুদূরপ্রসারী, অদ্বয় অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অবিভাজ্য যোগপন্থা। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, সাংখ্য-যোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদির বর্ণন ও বিবেচনই হয়নি, এদের সারতত্ত্বের নির্যাস গীতার প্রজ্ঞাভাস্বর যোগামৃতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। অবশ্য, এদের প্রচলিত রূপের বিশ্লেষণে অল্পবিস্তর পরিশোধন ও পরিবর্তন করতে হয়েছে। যেমন, নিরীশ্বর সাংখ্য সেশ্বর বা বৈদান্তিক সাংখ্যে পরিণত হয়েছে; রাজযোগের নির্দিষ্ট ধারার অনেকখানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে;

হঠযোগের আসনবাহুল্য বর্জন করা হয়েছে ইত্যাদি। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, গীতার বহুভঙ্গিম যোগ সক্রিয়, এক অপরিমেয় সর্জনশক্তিতে বলীয়ান। ইহা সন্ন্যাসপ্রবণ নয়, সংসারত্যাগ, কর্মত্যাগ ও নিষ্ক্রিয় শান্তির প্রচারক নয়, ইহা প্রাচীন বৈদিক ও ঔপনিষদিক কর্মনিষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনার শাস্ত্র। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ প্রথমে সাধকের মুক্তির সাধন, এবং পরে মুক্ত ও সিদ্ধ কর্মযোগীর জ্ঞানদীপ্ত আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। পরমাত্মার প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি মুক্তযোগীর ভাবের, চিন্তার ও সমগ্র জীবন-কর্মের মধ্য দিয়ে অজস্র ধারায় পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হয়। এ কর্ম তাকে বাঁধতে পারে না, কারণ সে জীবন্মুক্ত; শুধু লোকসংগ্রহ অর্থাৎ পার্থিব প্রাণীর উদ্ধার ও উন্নয়নই এর একমাত্র লক্ষ্য। জ্ঞানোজ্জ্বল, ভক্তিপ্লুত যৌগিক কর্ম সিদ্ধযোগীর আধারে ভগবানের নিরঙ্কুশ দিব্যকর্ম, তাঁরই ক্রমবিকাশশীল ইচ্ছার অমোঘ অভিব্যক্তি ও চরিতার্থতা। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যারা কেবল সন্ন্যাস ও নিষ্ক্রিয়তা দেখে, গীতার যোগ তাদের ভ্রান্তি নিরশনে অদ্বিতীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্য-সাধনের দ্বারা যে সর্বাবগাহী অধ্যাত্মসাধনা পৃথিবীর সন্তপ্ত মানবজীবনকে দিব্যজীবনে পরিণত করবে; তার ত্রিগুণময়ী, তমোগ্রস্ত অপরা প্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করবে; এই মর্ত্যধামেও, (ইহৈব) তাকে অমৃতের শাশ্বত আনন্দ প্রদান করবে, গীতা সেই সর্জনশীল অধ্যাত্মসাধনার বিশ্ববরেণ্য শাস্ত্র।

কর্মকুণ্ঠ, সংসারত্যাগী সন্ন্যাস যে মায়াবাদের পরিণাম, গীতায় তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। গীতা বলে না, "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ", গীতা বলে না, "মায়াময়-মিদং নিখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"। গীতা বরং বলে, "জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং"। ব্রহ্মের শান্ত, স্থির স্থিতি আর বিশ্বের চলমান, অফুরন্ত কর্মপ্রবাহ, গীতা এ সমস্তই দেখে এক অবিচ্ছিন্ন, দিব্যদৃষ্টিতে বাসুদেব রূপে,—'বাসুদেবঃ সর্বম্'। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মিলনসাধনের দ্বারা গীতা সেই "প্রজ্ঞা পুরাণী"র উদ্ধার করেছে যা সনাতন সত্যের ঊর্ধ্বমূলের সঙ্গে অধস্তন শাখাপ্রশাখাকে একই চোখে দেখে ও একই বলে জানে। "যদেবেহ তদমুত্র"—যা এখানে তাই সেখানে, কোথাও কোনো বিভাগ নাই, বিভেদ নাই। যা পর তাই অপর বা অবর, যা বিশ্বাতীত তাই বিশ্বগত, বিশ্বরূপ। অরূপ ও রূপ একই পরমাত্মার পরম সত্যের দুই বিভাব, তিনিই যুগপৎ নির্গুণ ও গুণভোক্তৃ। ঊর্ধ্বমূল সনাতন, সৎ অথচ তারই অধঃক্ষিপ্ত ডালপালা "সনাতনী", "মিথ্যাভূতা" মায়ার সৃষ্টি, অপরিণামী অমুত্রই সত্য, অথচ পরিণমনশীল ইহলোক মিথ্যা, মায়া—এ অযৌক্তিক যুক্তি গীতার সুসমঞ্জস শিক্ষাকে পঙ্গু করেনি। গীতার সুপ্রতিষ্ঠ, সর্বাঙ্গীন আদর্শই আজ মানবজাতির গ্রহণীয় ও সাধনীয় লক্ষ্য।

এই বিরাট সমন্বয় ছাড়াও গীতায় আছে ইতস্ততঃ নিহিত কয়েকটা অভিনব ইঙ্গিত, সক্রিয়, সমৃদ্ধ অধ্যাত্ম-জীবনের প্রোজ্জ্বল ব্যঞ্জনা। তাদের মধ্যে মাত্র একটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'—ব্রহ্মকর্মসমাধির দ্বারা সে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করে। "ব্রহ্মকর্মসমাধি", এই শব্দ গীতায় মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে, যেন পুনরুক্তিদ্বারা এর গূঢ়ার্থ তরল হয়ে না পড়ে! কর্মসমাধি—সাধারণতঃ কর্ম ও সমাধি 'এদুটো আপাতবিরোধী শব্দ বলে' সকলের ধারণা। কর্মনিবৃত্তি না হ'লে সমাধি হয় না, আবার সমাধির নিস্তরঙ্গ গভীরতায় কোনো কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কর্ম মানুষকে করে বহির্মুখ, আর সমাধি অন্তর্মুখী চেতনাকে নিয়ে যায় এক নির্বিকল্প, নিরঞ্জন আত্মস্থিতিতে। অবশ্য সমাধির প্রকারভেদ আছে, সব সমাধিই নির্বিকল্প নয়। তবে তাদের সকলের একটা সাধারণ লক্ষণ হ'চ্ছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং ধ্যেয় বস্তুর সহিত একত্ব বা তাদাত্ম্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি উনি যখন রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে পুরোহিতের কাজ করতেন, তখন এক একদিন পূজা করতে করতে কালীর সঙ্গে এমন তাদাত্ম্যলাভ করতেন যে কালীর চরণে নৈবেদ্য না দিয়ে নিজের পায়েই দিতেন। এই ভাব-গভীরতাও একপ্রকার সমাধি। বলা যেতে পারে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদিকর্ম প্রাথমিক চিত্তশুদ্ধির জন্য, যার সার্থকতা শঙ্করাদি সংন্যাসমার্গী বৈদান্তিকও স্বীকার করেছেন এবং এইসব কর্মের অনুষ্ঠানকালে এমন একটা অন্তর্লীনতা আসতে পারে যে তাকে কর্মসমাধি বলে স্বীকার করতে পারা

যয়। কিন্তু ভগবদ্গীতা যে কর্মের কথা বলছে তা' কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম নয়, তা আনুষ্ঠানিক পরম্পরাগত যজ্ঞাদি কর্ম নয়—গীতা বৈদিক বাহ্যানুষ্ঠানের নিন্দা করেছে—বরং মানবজীবনের, মানব-সমাজের সমস্ত কর্ম, (সর্বকর্মাণি) যা চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থায় করা সম্ভব নয়। লোকসংগ্রহ যে কর্মের উদ্দেশ্য, সে কর্ম "যুক্তস্য কর্ম", ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে কর্ম করতে হবে, যে কর্ম মুক্তস্য কর্ম, মুক্ত পুরুষের যে কর্ম, সে কর্ম তখনই সম্ভব যখন নিষ্কাম কর্মের দীর্ঘ সাধন দ্বারা বাসনার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়েছে, অহং ভাবের লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই প্রকৃতিতে, (যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো) সমস্ত "আরম্ভ" অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছায় আরব্ধ কর্ম পরিত্যক্ত হয়েছে, (সর্বারম্ভ পরিত্যাগী) তখনই মুক্তযোগী ব্রহ্মকর্মসমাধির দ্বারা ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়। সে তখন দেখে যে ব্রহ্মই তার মধ্যে কর্তা, ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই তার মধ্যে কর্মশক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলেছে। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ দ্বারা নয়, চিত্তবৃত্তির পূর্ণ রূপান্তরের দ্বারা এই কর্মসমাধি সম্ভব। তার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় স্বচ্ছন্দে জাগতিক বিষয়রাজির মধ্যে বিচরণ করে, অথচ কোনো বন্ধন নাই তার, কামনা-বাসনার পুনরুদ্রেকের ভয় নাই তার, পদস্খলনের সম্ভাবনার অতীত, মুক্তসঙ্গ হয়ে সে সমস্ত কর্ম করে। সব বিষয়কে সে ব্রহ্মেরই রূপায়ণ ("রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব") বলে' দেখে, ভূতে ভূতে সে ব্রহ্মেরই আনন্দানুভূতি পায়। এই অনুভূতির অন্তরে অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে কর্মসমাধি অবস্থায় সে কর্ম করে। তাই তার কর্ম "কুশল" কর্ম—নির্দোষ, অনবদ্য। সে কর্মের পরখ মানবমনের সাধ্যাতীত, মানুষের সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে তার ফলাফল বিচার করা চলে না। মানুষ যেখানে দেখে অশুভ, পরাজয়, ব্যর্থতা, নিরানন্দ, সে দেখে শুভ, বিজয়, সাফল্য ও সর্বাধার আনন্দের ক্রমবিকাশ। মানুষ যেখানে দেখে সর্বব্যাপী অমানিশা, সে দেখে দিনের বর্ধিষ্ণু সৌরদীপ্তি। সে যে আসন পেতেছে ভূমায়, সকল দ্বন্দ্বের বহু ঊর্ধ্বে।

অবশ্য, আমরা প্রকৃতির আমূল রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও পরিণতির বর্ণনা গীতায় দেওয়া হয়নি, সেটা গুহ্যতম পরম বা উত্তম রহস্য ব'লে আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র—ব্যঞ্জনা আছে, ব্যাখ্যা নাই।

সংক্ষেপে এই হ'ল গীতার ব্রহ্মকর্মসমাধি। গভীর তত্ত্ব, অথচ এমন অবলীলাক্রমে রেখে দেওয়া হয়েছে এক কোণে যে অভিনিবেশ ভিন্ন চোখে পড়ে না। সব গভীর তত্ত্বই হয়ত আমাদের ভাসা-ভাসা দৃষ্টির সামনে আত্মগোপন করে' থাকে। দৃষ্টিকে সুতীক্ষ্ণ, মর্মভেদী করলে তবে তারা আত্মোদ্‌ঘাটন করে ও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমাদের অন্তশ্চেতনায় প্রবিষ্ট হয়।

'দিল' দরিয়ার প্রাণের কথা বুঝতে পারে না

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

'দিল' চলেছে দরিয়াকে নিয়ে
জাহাজ চড়ে মেঘনা গাঙ্ দিয়ে
লালপুর থেকে চাঁদপুরে যাবে,
'দরিয়া' তার বাপের বাড়ীর কত কথা ভাবে!
'দিল' দরিয়ার মনের কথা বুঝতে পারে না।
বাপের বাড়ী গিয়ে দরিয়া কত খুশী মন,
দিলের কদর করে যত আত্মীয় স্বজন,
দরিয়াকে নিয়ে দিল সুখ শয্যায় বসে,
মসল্লাদার পান খেয়ে মুখ ভরে তার রসে।
'দিল' দরিয়ার মনের কথা বুঝতে পারে না।
খিড়কি দিয়া চায় দরিয়া দূর আকাশের পানে,
তেজী ঘোড়ার খুরের শব্দ আসে গো তার কাণে,
ময়দান দিয়ে যায় গো চলে সৌজোয়ান দরবেশ.
তৃষ্ণা-কাতর চাতক ভাবে 'না হোক পথের শেষ।'
দিল দরিয়ার মনের খবর জানতে পারে না।
দিল জিজ্ঞাসে, "কও দরিয়া কেবা ঘোড়ায় গেল।
তোমার চোখের রঙ্গ দেখে বুকে বাজে শেল।"
"ছি ছি। আমার দিলের 'দিল' তুমি তৃষ্ণার পানি,
দরবেশ চলে চাংকের চাঁদ, আমি কী তায় জানি?"
দিল দরিয়ার প্রাণের কথা বুঝতে পারে না।
চাঁদপুর থেকে জাহাজ চলে লালপুরেতে যাবে,
দিল দরিয়া রেলিঙ ধরে কত কথা ভাবে!
নদীর তীরে ঘোড়া ছুটে দরবেশ তারি পরে,
দ'রিয়া কয়, "দেখ দেখ," দিলের হাতটি ধরে।
'দিল' দরিয়ার মনের কথা বুঝতে পারে না।
দেখতে আমার হবে না গো দিল নাড়ে হাত জোশে।
ধাক্কা খেয়ে যায় গো দরিয়া নদীর বুকে পড়ে
মেঘনার স্রোতে দরিয়া ডুবে, ভাসতে নাহি পারে,
দরিয়াকে ফেলে দিল, যাত্রী সব চীৎকারে।
দিল দরিয়ার প্রাণের কথা বুঝতে পারে না।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নয়

ললিতা : দাদু ! এ-গানটি আমাকে কিন্তু শিখিয়ে দিতেই হবে—আমি গাইবই গাইব। বাপী বলে : ঠাকুর ভাবগ্রাহী—ভুল গাইলেও ভাব ঠিক থাকলে বর দেবেনই দেবেন।

ডাক্তারবাবু : কিসের? সুরের ?

ললিতা : নয়ত কি অসুরের ? তার জন্যে তো বরের দরকার নেই। তারা (করজোড়ে) : না, আর কথা নয় বকুল, লক্ষ্মী দিদি আমার ! বেসুরের পর সুর এসে গেছে রেশটা না মিলিয়ে যায় ফের অসুরের গলাবাজিতে।

প্রেমল : তারা ঠিক চিনেছে। তর্কের নামে আমি গলাবাজিই সুরু করেছিলাম (চৈতন্যদেবের ছবির সামনে মাথা নিচু ক'রে প্রণাম ক'রে) ঠাকুরের কৃপায় রবার আগে চৈতন্য হয়েছিল তাই হোমাপাখীর মতন ধূলিসাৎ হবার আগেই মোড় ফিরেছে। (অসিতকে) তুমি শোনাও তাঁর একটি স্তব। মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক—গজবের কাটান অজব নয়—গুজব গুজব দৈববাণীর। জয় শ্রীচৈতন্য ! গাও তোমার সেই স্তবটি দেবভাষায়। আহা কী ভাষা ভাই ! সত্যিই দেবভাষা !

অসিত (সুরু করল সংস্কৃত স্তব) :

প্রার্থয়ে চৈতন্যসুন্দর ! তব চরণরতিমবিচলাম্।
প্রেমকোমল ! দেবমানব ! দেহি ভক্তিং সুবিমলাম্।

তব কৃষ্ণলীনং চিত্তং
চিরকৃষ্ণপদযুগবিত্তং
শরণ্যং মে দেহি কৃপয়া কৃষ্ণনিষ্ঠামচপলাম্।
প্রেমকোমল ! দেবমানব ! দেহি ভক্তিং সুবিমলাম্ ॥
ভ্রান্তের্মুক্তিং তব হরিকথা প্রাণগেহায় দত্তে।
নিত্যাং শান্তিং নয়নমভয়ং চিত্তলোকে বিধত্তে।
তাপক্লিষ্টং বিধুরহৃদয়ং কীর্তনে তে প্রফুল্লং।
শ্লিষ্যাত্তান্তে তব পদতটং স্বর্গশুভ্রং হ্যতুল্যম্ ॥

তব সাধনরত্নমক্ষমবলমুদ্ধর কৃপয়া।
চরণাগতময়ি ! দেহিশরণমাননবিভয়া।
প্রিয় ! বাঞ্ছিত ! চিরবন্ধো !
বহুদুর্লভ ! করুণেন্দো !
যুগশোচনমিহ মোচয় তব লোচনশিখয়া ॥
প্রেম্ণা স্ববশমবশং বিধাতুং তূর্ণং শমিতুং চিরক্ষুধাম্।
অনাথবেশ ইহাগত ঈশ উদাসী দাতুং প্রেমসুধাম্ ॥

তারা (করযোড়ে) : দাদাজি, দেবভাষা খুবই চমৎকার ঝঙ্কারেও মনে আবেশ আসে, মানি। কিন্তু একটি বাংলা গৌরকীর্তন না হ'লে মেয়েদের অবোধ মন মানে না।

ললিতা : আমি বকুলের সঙ্গে একমত দাদু। কি জানেন ? যতই কেন না স্তব গাই দেবভাষায়—মনের সব জানলা খোলে কেবল মাতৃভাষার টোকায়। লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদের মুখে শুনতাম—কী চমৎকার :

কী যাদু বাংলা গানে !—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ডাক্তারবাবু (হেসে) : এ কথা কাটবার জো কি ?

(অসিতকে) তবে সংস্কৃত গানটির তো আপনি বাংলা অনুবাদও করেছেন স্বামীজি বলছিলেন—

অসিত : ঠিক অনুবাদ নয়—ভাবানুবাদ।

প্রেমল (একগাল হেসে) : তোমার কথা শুনে মনে পড়ল এক বিখ্যাত ছড়া :

Swange that such high dispute should be
Twint Tweedledum and Tweedledee

দেবানন্দ (হেসে) : আমাদের ঘরোয়া ভাষার উপমা বোধহয় আরো সরেস "তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল।"

ললিতা (হাততালি দিয়ে) : কিন্তু আরো সরেস ডি এল রায়ের "ধপাস ক'রে পড়ে, না প'ড়ে ধপাস করে ?"

ডাক্তারবাবু : কিন্তু ভজনের দেরি হ'লে ভোজনের থালা আসবে না—মনে রাখা ভালো।

শেঠজি : ঠিক ঠিক। গান অসিতবাবু এর অনুবাদ —যুড়ি ভাবান্তবাদ ভাবানুবাদই সই।

অসিত মহানন্দে গায় তার প্রাণের নিবেদন :

আজ প্রার্থনা করি—অন্তরে হরি, করো একান্তমতি।
এসো গৌরগোপাল, প্রেমের দুলাল, ঝরায়ে
অপার জ্যোতি !
স্মরি' কৃষ্ণ, আপনহারা,
তুমি ভাঙিলে পাষাণকারা,
গেয়ে : "প্রেমতন্ময় নামে হয় লয় শোক তাপ ক্ষয় ক্ষতি।"
ডাকি যেমনি ব্যথায় : "কৃষ্ণকথায় দাও সন্ধ্যায় দিশা,"
আসো বিছায়ে শান্তি, ঘুচায়ে ভ্রান্তি, মিটায়ে ক্লান্তি-তৃষা।
নাথ, মাটির মানুষ ম্লান
জাগে শুনি' তব নামগান,
আঁখি তোমার চরণ করিতে বরণ চেয়েথাকে অনিমিষা।

যেই অন্ধ নিশায় কাঁদি : "কোথা হায় অরুণানন্দ-
আলো ?
দাও ঠাঁই রাঙা পায় কান্ত, কৃপায়—এসো কাছে
বেসে ভালো—"
তুমি অমনি হে দীনবন্ধু,
বহু দুর্লভ সুধা-ইন্দু,
মনহরণ রূপে বিমোহন, বিজলি' কুরূপ কালো।

গান গাইতে গাইতে অসিতের ভাব এসে গেল। বুকে ভক্তি, চোখে জল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আঁখরও জুগিয়ে দেয় :

তুমি ব্রজের ব্রজেশ্বর এলে নদীয়ায় সুন্দর !
দিতে প্রেমহীনে নামমণি চির কাঙালে ক'রিতে ধনী !
এলে ভুবনমোহন রূপে অচিন্তনীয়
ধূলি ধরায় ঝরাতে নৃত্যগীত অমিয়,
ওগো দেবতা-দিশারি এলে বলো এত রূপ কোথা পেলে?
আমরা দেখেও দেখি না শুনেও শুনি না, দেবতা-
দীপালি জেলে
এলে তাই প্রেমশাখা মেলে ! ··

বৃন্দাবনে বুঝি কোনো ভজনে ওর এমন ভাব জমে নি। গাইতে গাইতে সত্যিই মনে হ'ল যেন মৃন্ময়কে চিন্ময়ের দীক্ষা দিতেই শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন। তাই না পেলেন যুগল উপাধি – শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! বদ্ধ জীবকে মায়ার ম্লান কূল থেকে হরিনামের অম্লান অকূলে টেনে এনে ভক্তির প্রসাদে জীবন্মুক্তির স্বাদ দিতেই বুঝি তিনি আরাম নিলয় সংসার স্বজন সব ছেড়ে ধুলায় পেতেছিলেন প্রেমের শেজ। ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রেমের ভিখারী হ'য়ে নামের আলয় চির অভিরামের পথদিশা দেখাতে দেবতা দীপালি জ্বেলেছিলেন ! এমন প্রেম এ-কলিযুগে আর কার মাঝে রূপ নিয়েছে—মাটির নিচুটান কাটাবার দীক্ষা দিয়েছে বৈকুণ্ঠের ডাকে সাড়া দিতে উড়ে চলার একান্তমতি দিয়েছে শরণাগতির মন্ত্র দিতে ? এও কি সম্ভব ? মাটির মানুষ কি পারে অমরাবতীর সভাসদ হ'তে ? কামনাবিলাসী জীব পারে কি নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব ফিরে পেতে, অকিঞ্চন হ'য়ে অমৃতের অধিকারী হ'তে ?

* * *

অসিত গান শেষ হ'তে চেয়ে দেখল : ললিতা দু হাতে মুখ ঢেকে ; তারার চোখে জল—দৃষ্টি নিবদ্ধ চৈতন্যদেবের ছবির পানে ; ডাক্তারবাবু মাটির দিকে চেয়ে ; আর প্রেমলের প্রায় ভাবসমাধির অবস্থা—চোখের দৃষ্টি উত্তান, যুক্তপাণি ঠিক চিবুকের নিচে ন্যস্ত—প্রার্থনার মুদ্রা। কিছু কি দেখেছে "দর্শন" ?

হবে। ও কখনো ভুলেও বলে না তো নিজের কোনো অনুভব উপলব্ধির কথা। বলে গুরু ছাড়া কারুর

কাছে এসব গুহ্য কথা বলায় প্রত্যবায় আছে। অসিতের মন সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এক আধবার ললিতা ওকে ঈষৎ আভাষ দিয়েছে বটে, কিন্তু সে কণিকা-প্রসাদে কি তৃষ্ণা মেটে? ললিতা শুধু বলেছে যে, প্রেমল কেবল পথের দিশাই নয়, প্রচুর পাথেয়ও পেয়েছে গুরুর প্রসাদে। সে উঠতে বসতে বলত জোর দিয়েই যে, এ-সংশয়গহন জীবনের নৈমিষারণ্যে গুরু বিনা গতি নেই। কিন্তু অসিতের গুরু কোথায়? আজ পর্যন্ত যে কাউকেই মনে ধরল না কেন? নাম শুনেছে দুমেলের স্বামী স্বয়মানন্দের, তাঁর লেখা "ভাগবতী বাণী" প'ড়ে আশাও জেগেছে বহুবার, কিন্তু শুধু যে তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে প্রাণ চায় না তাই নয়, "কেন চায় না"—এ-প্রশ্নের উত্তরও আজ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। তাই সময়ে বিষাদে মন ছেয়ে যায়: দুর্লভ মানব জন্ম কি বৃথাই যাবে?

হঠাৎ চমকে উঠল কান্নার শব্দে। এ কী? শেঠজির স্ত্রীকে ওরা কেউ লক্ষ্যই করে নি। তিনি ঘরের এক কোণে মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে বসেছিলেন, ব'লে সবাই মনে করেছিল পর্দানশীনা বুঝি।

তাঁর চাপা কান্না ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'য়ে উঠলে ক্রমশঃ সকলেরই দৃষ্টি পড়ল তাঁর 'পরে। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাই নয়, সারা দেহে সে কান্নার ঢেউ খেলে যায় হু হু ক'রে! প্রেমল যে প্রেমল সেও ভাব সামলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ব্যাপার: তিনি হঠাৎ উঠে প্রেমলের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন: "আমাকে মাপ করুন প্রভু, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার কত নিন্দা করেছি···বলেছি ম্লেচ্ছ, অনাচারী, অহঙ্কারী···আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি দেখলাম···দেখলাম···"

কিন্তু কথা শেষ হয় না—অশ্রু এসে ফের তাঁর কণ্ঠরোধ করে।

প্রেমল তাঁর মাথায় হাত রেখে বলল: "মন খারাপ কোরো না মা। আমরা ঝোঁকের মাথায় রোখের মাথায় ভগবানকেও কি গালমন্দ করি না? তাতে ঠাকুর যখন রাগ করেন না তখন আমি কে বলো তো?"

শেঠ গিন্নি: না প্রভু, আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না। আমি যে দেখলাম স্বচক্ষে···

ললিতা (কাছে এসে তাঁকে তুলে): বলো ভাই, কী দেখলে?

শেঠ গিন্নি (অশ্রুল কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে): দেখলাম দিদি···মহাপ্রভুর ছবির কপাল আলো হ'য়ে উঠল—আর সেখান থেকে একটি নীল রশ্মি এসে···প্রেমল মহারাজের··· কপাল ছুঁলো।···আমায় ক্ষমা করুন ঠাকুর। আমি পাপিষ্ঠা—

শেঠজি (সঙ্গে সঙ্গে এসে প্রেমলের পায়ে প'ড়ে): আমাকেও—আমাকেও ঠাকুর—আমাকেও—ক্ষমা—

প্রেমল (তার মাথা কোলে টেনে নিয়ে একটি হাত তার পিঠে রেখে অন্য হাত শেঠ গিন্নির মাথায় রেখে): ক্ষমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর আমি ঠাকুর নই—সামান্য ভক্ত মাত্র—

দেবানন্দ: মহারাজ! একটি শ্লোক হঠাৎ মনে পড়ল—ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন: যে, যারা আমার ভক্ত তাদের আমি ভক্ত বলি না, বলি তাদের যারা আমার ভক্তের ভক্ত—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তা হি তে নরাঃ॥

তাই ওদের মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না যে, এতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া অনুতাপ খুব ভালো জিনিষ—আগুনের মতন শোধন করে।

শেঠ গিন্নি: ঠিক কথা ঠাকুর। আমি নবদ্বীপের পণ্ডিতের মেয়ে—শুনেছিলাম তাঁর কাছে যে ঠাকুর আর সব অপরাধ ক্ষমা করেন কেবল বৈষ্ণব অপরাধ—মানে ভক্তের অপমান ক্ষমা করেন না। তাঁর কাছে শুনতাম অম্বরীষের কাহিনী। তাই আমাকে ক্ষমা করুন ঠাকুর আমি আর কখনো এমন পাপ করব না, করব না, করব না তিন সত্যি করছি।

প্রেমল (স্নিগ্ধ স্বরে): কোথায় অম্বরীষ আর কোথায় আমি মা! কী বলছ তুমি? যে দুর্বাসা কৃত্যা-রাক্ষস সৃষ্টি ক'রে তাঁকে মারতে চেয়েছিল তিনি তার হয়ে করেছিলেন প্রার্থনা নারায়ণের আজ্ঞাবহ শান্ত সুদর্শনচক্রের কাছে:

যদ্যস্তি দত্ত মিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতি বিজ্বরঃ।

(অসিতকে) বলো তো অসিত—এর যে অনুবাদ কাল শোনালে? মনে আছে?

অসিত: আছে, আমি যে কালই করেছিলাম এ অনুবাদ ললিতা শুনতে চেয়েছিল ব'লে (ব'লে একটু থেমে আবৃত্তি করে)

আমি যদি হরিপ্রেমপ্রার্থী হই তনুমন প্রাণে,
স্বধর্মে অটল হই মিথ্যামাঝে নিত্যের সন্ধানে,
ভক্তি শুধু চেয়ে থাকি, অষ্ট সিদ্ধি মুক্তি মোক্ষ নয়,
আমার চির পাথেয় হয় যদি প্রেমেরি অভয়,
কুলদেব আমাদের হয় যদি ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ
হোক করুণায় তব তাপিতের তাপনিবারণ।

প্রেমল (আবার স্নিগ্ধ স্বরে): ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দশ

রাত্রে পায়স-প্রসাদ পেয়ে অসিত ঘরে এসে চুপ ক'রে জানলার কাছে একটি আরাম কেদারা টেনে নিয়ে চেয়ে থাকে আকাশের পানে। মেঘ কেটে কয়েকটি তারা ফুটেছে। ভিজে হাওয়া এমন চন্দ্রকে লাগে! কোথা থেকে ভেসে আসে মেঠো বাঁশি। মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। নিশুদা বড় সুন্দর বাঁশি বাজাত। মনে পড়ে তার কৃষ্ণভক্তি। বলত কথায় কথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এসেছিলেন কৃষ্ণের অবতার হ'য়ে একাধারে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভাষা নিজের জীবনে মূর্ত করতে। বৈষ্ণব পরিভাষায় বুঝি একে বলে বিনয় ও আশ্রয়ের গলাগলি। কিন্তু এসবই ওর কাছে চিরদিন "কথা কথা কথা"ই মনে হয়েছে। প্রেমলকে ওর এত ভালো লেগেছে আরো এই জন্যেই তো—সে-ও ওর সঙ্গে এক মত—ব'লে যে, কথার মায়া, পরিভাষার আড়ম্বর প্রায়ই সরল উপলব্ধির অমল আলোকে ঢেকে দেয়। তৃণাদপি সুনীচেন—বলে প্রেমল প্রায়ই। আজও বলল। শুধু বলল না—ক'রে দেখাল। মহাপ্রভু কি সে এত বড় মনে করতো তো আরো এই জন্যেই: "আপনি আচার ধর্ম করিতে শিখায়"! তাই না মহাপ্রভু জীবকে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন নিজের দৃষ্টান্তের আলোয়। প্রেমলের মধ্যেও ও দেখতে পেয়েছে এই নিবিড় আন্তরিকতা—intense sincerity—শাস্ত্র বেদ গীতা সবই সে মানে কিন্তু সব আগে মানে গুরুবাক্য বলে না কি উঠতে বসতে! গুরুকরণ অসিতের হয় নি আজও, তাই হয়ত সে ঠিক বুঝতে পারে না—কেন গুরুর ঘটকালি বিনা ইষ্টের কৃপা পাওয়া অসম্ভব। অবশ্য অসম্ভব বলে না প্রেমল, তবে বলে—গুরু বিনা সাধনায় কৃতকৃত্য হয় "কোটিতে গোটিক" one in a million—যেমন রমণ মহর্ষি। বাকি সকলের গুরু বিনা গতি নেই নেই নেই। একথা অসিতের মন নিতেও পারে না অথচ ঠেলতেও পারে না। কারণ গুরুকৃপা বিনা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছে এমন কোনো মহাত্মাকে ও তো চাক্ষুষ করে নি। রমণ মহর্ষিরও দেখা পায় নি। আর পেলেই বা কী? ব্যতিক্রমের পথ তো গড়পড়তার পথ নয়—হ'তেই পারে না। আহা, যদি জানতে পারত গুরুকরণ করে প্রেমলের ঠিক কী ধরনের উপলব্ধি হয়েছে! আজ কী দেখল ও? ভাব যে ওর হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেয়েদের মধ্যে অনেক সময়েই সরল দৃষ্টি খুলে যায় দেখা গেছে। তাই শেঠ গিন্নি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলেন যার ফলে তাঁর মস্ত ধারণা ওলটপালট হ'য়ে গেছে। প্রতি বড় উপলব্ধিই কিছু না কিছু ওলট পালট আনে। অন্ততঃ কিছুদূর এগিয়ে দেয় এ নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রেমল গুরুকৃপার ফলে কতদূর এগিয়েছে? মনে ওর ক্ষোভ জেগে ওঠে। কেন বলতে চায় না ও? গুরুর বারণ? কেন গুরু বারণ করেন? মানুষ অন্তহীন শ্রীহীন হানাহানি দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির খবর রটিয়ে বেড়াতে পারে—কেউ বারণ করে না, কেবল সুন্দর গভীর পবিত্র অনুভূতি উপলব্ধি দর্শন শ্রবণ স্পর্শন—যার প্রভাবে তার পথের বাধা কেটে যায়, আঁধারে আলোর দিশা মেলে, সবার উপর, আত্মাভিমানের অষ্টপাশ থেকে মুক্তি লাভ হয়, সেই সব সৎকথা বলাই মানা? অসিত বার বার সংকল্প করেছে—ওর যদি কোনো মহৎ দর্শন হয় ও গোপন করবে না। বলবে সবাইকেই ডেকে ডেকে কোথায় কবে কী দেখেছে যার ফলে ও নানা পিছুটান কাটাতে পেরেছে। কী? গুরু যদি নিষেধ করেন? মন ওর বিমুখ হয়ে ওঠে: তাই তো ও চায় না গুরুবাদী হ'তে। আমার কিসে ভালো হবে জানতে আর কারুর কাছে দরবার করতে হবে কেন? তাছাড়া গুরুরও কি ভুল হ'তে পারে না? To err is human: গুরুও মানুষ তো। নাঃ, প্রেমলের গুরুভক্তিকে ও আন্তরিক শ্রদ্ধা করলেও ঈর্ষা করে

না। অন্ততঃ এখনো গুরুর পায়ে দাসখৎ লিখে দেওয়ার কথা ভাবতে বিষম ভয় করে।

কিন্তু দাসখৎ না লিখে দিলে যদি সারা জীবন শুধু ঝিনুক কুড়িয়েই কেটে যায়, মুক্তার হদিশ না মেলে—তবে? শূন্যতাও কি ভালো হ'তে পারে শুধু এই যুক্তিতে যে, আমি নিজের বর্তা থেকেই খালি হাতে চলছি—যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গুরুকে বর্ত করার ফলে প্রেমলের মতন কত শত মহাসাধকের শূন্য জীবন পূর্ণ হয়েছে, পতিত জমিতে সোনা ফলছে? কিন্তু—ফলেছে কি? দৃষ্টান্ত কই? শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? কিন্তু এঁদের তো ও চাক্ষুষ করে নি—কেবল বইয়েই পড়েছে। কিছুই দেখলাম না শুনলাম না, সরাসর মেনে নিলাম! এ কখনো হয়? এ যে পারে সে পারুক—অসিত পারবে না। না না না। সে আগে দেখবে বুঝবে চিনবে তবে মানবে—করবে আত্মসমর্পণ। নইলে নয় নয় নয়।

কিন্তু দেখতে পায় কে? না, যে সত্যি দেখতে চায়। অসিত সত্যিই দেখতে চায়। তাই কি ও প্রেমলের দেখা পেল? মোহন মহারাজের? শ্যাম ঠাকুরের? অমলের? শ্যামঠাকুরের গুরু আনন্দগিরিকে দেখতে ইচ্ছে হয়। হয়ত দেখবে কোনোদিন। খৃষ্টদেব বলেছেন: যে খোঁজে সে পায়ই পায়। অসিতের একটি ক্ষেত্রে অন্তত: সংশয়ের লেশও নেই—কোনোদিনই ছিলনা—যে ও সন্ধানী, জিজ্ঞাসু—দেখার তৃষ্ণা ওর সত্য। তাই হয়ত হঠাৎ প্রেমলের দেখা পেল। কিছু ও দেখতে পেয়েছে বৈ কি তার মধ্যে। শুধু অসিতই নয়। আরো অনেকে: দেবানন্দ, তারা, ডাক্তারবাবু এমন কি শেঠ দম্পতিও—ললিতার তো কথাই নেই যে তার পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। এমন তেজী বুদ্ধিমতী মেয়ে কি কিছু না দেখে নত হ'তে পারে? ললিতাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কী ঠিক দেখেছে। না, প্রেমল ওকেও মুখে চাবি দিতে হুকুম করেছে? কী জ্বালা! যেখানেই গুরু সেখানেই এই এক পরোয়ানা: খবর্দার!

হঠাৎ চম্‌কে উঠল: "টক টক টক"।

"কে?"

"আমি দাদু! আসতে পারি?"

অসিত খুশী হ'য়ে বলে:

"এসো দিদি এসো।"

ললিতা ঢুকেই প্রণাম করল।

"ব্যাপার কি দিদি?"

ললিতা মৃদু হাসে: "ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?"

অসিত (হেসে): আমি কি খুব ভয়াবহ মনিষ্যি?

ললিত: না দাদু,—

অসিত: তবু—কী?

ললিতা: কিছু বলতে চাই—যা বলার আছে—অবিশ্যি যদি শুনতে চান।

অসিত (হেসে): গরজ যে আমারই দিদি, শুনতে না চেয়ে পারি। এখুনি কী ভাবছিলাম জানো?

ললিতা: আমি জানি না; তবে বাপী জানে। না—অন্তর্যামী-টামী সে নয়। তবু সে অনেক কিছু ধরতে পারে বৈ কি। সেই কথাই বলতে এসেছি।

অসিত: এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া দিদি। আমি মাঝে মাঝে রেগে উঠি—কেন তোমরা কেউই কিছু বলে না যখন আ ম—মানে, শোনবার জন্যে এমন তৃষিত থাকি?

ললিতা: জানি দাদু! আপনি যে খাঁটি জিজ্ঞাসু—সবারই চোখে পড়েছে। তবু এতদিন বলার বাধা ছিল। আজ কেটে গেছে।

অসিত: কখন?

ললিতা: আপনার গানের পর। আমি কী দেখেছি জানেন?

অসিত: কী?

ললিতা: হাসবেন না তো? না, বাজে কথা যাক শুনুন। আপনার গান গাওয়ার সময় আপনার মাথার 'পরে আমি দেখেছি—নীল আলো।

অসিত (প্রফুল্ল): সেই জন্যেই কি বাধা কেটে গেছে?

ললিতা: না। বাপীও দেখেছে, নৈলে শুধু আমার দেখার জোরে বাধা কাটত না।

অসিত (চমকে): প্রেমলও দেখেছে? কী? নীল আলো।

ললিতা: না, আরো কিছু। কিন্তু বলে নি আমাকে খুলে। কেবল বলেছে আপনাকে বলতে কিছুটা অন্ততঃ—যা আপনি জানতে চান—মানে ওর সাধনার কথা।

অসিত (সবিস্ময়ে): তোমাকে বলতে বলেছে নিজে থেকে!

ললিতা: ঠিক বলতে বলেনি—তবে আমি বলতে চাই একথা ওকে বলায় বলবার অনুমতি দিয়েছে।

অসিত: ও।

ললিতা: কিছু মনে করলেন না কি দাদু?

অসিত (জোর ক'রে হেসে): মনে করার আমার কী অধিকার দিদি? বলা না বলা এ তো জোর জুলুমের ব্যাপার নয়। মনের আগল না খুললে দোর খোলা যায় কি?

ললিতা (হেসে): কিন্তু আমার মনের দোর আজ আপনা থেকেই খুলেছে, দাদু। তাই আপনাকেও দোর খুলতে হ'ল নিশুত রাতে। শোধ-বোধ!

[ক্রমশঃ

কাল্পনিক কথোপকথন

শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডার (Landor) সাধারণ পাঠক পাঠিকার কাছে সুপরিচিত না হইলেও তাঁহার প্রণীত "Imaginary conversation" (কাল্পনিক কথোপকথন) ইংরাজী সাহিত্যে একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যে কল্পনিক কথোপকথন ছাপা হইয়াছে তাহার সংখ্যা এক শত বাহান্ন (১৫২)। পাশ্চাত্য ইতিহাসে যাহাদের নাম আছে এমন ব্যক্তিরাই এই কাল্পনিক কথোপকথনেরবক্তা—অবশ্য পৌরাণিক কাহিনীর কয়েকটি নায়কের কথাবার্ত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং ভাব-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। বক্তারা তাহাদের স্ব স্ব দেশ-কালের প্রতীক ও প্রতিনিধি। তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া যে মতবাদ, ভাবধারা বা জীবন-দর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহা তাহাদের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে এবং খুবই অর্থ পূর্ণ। কথোপকথনের মধ্যে যুগ ধর্ম্ম কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। দান্তে ও বিয়াত্রিচের কথোপকথনই গ্রন্থকারের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যদিও পাঠকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সমসাময়িকদের মধ্যে সংলাপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তেমনই যাহাদের মধ্যে দেশ কালের ব্যবধান ছিল তাহাদের কল্পিত সংলাপও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথোপকথনের বক্তারা কেহই কল্পিত ন'ন, যদিও তাহাদের মধ্যকার কথোপকথন কাল্পনিক।

ল্যাণ্ডারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহারই অবলম্বিত নকসায় ও ছাঁচে কয়েকটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা আমার উদ্দেশ্য। এমন ব্যক্তিযুগলের মধ্যেও সংলাপ কল্পিত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে দেশ-কালের বিস্তর ব্যবধান। দুই বিভিন্নদেশের ও দুই বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতি ও ভাবধারার তাঁহারা ধারক, বাহক, প্রকাশক ও প্রচারক। কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মিল থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে অমিল আছে। ধরুন, গ্রীক পণ্ডিত সোক্রাটিসের সঙ্গে যদি পণ্ডিচেরীর অরবিন্দের সাক্ষাৎকার হইত, অথবা যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে দেখা হইত কার্লমার্ক্সের, বেদব্যাসের সঙ্গে মোলাকাৎ হইত বার্ট্রাণ্ড-রাসেলের অথবা রাজর্ষি জনকের সঙ্গে দেখা হইত প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের তবে তাঁহাদের আলাপ আলোচনা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইত? প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের অদ্ভুত মিলন! সুদূর অতীতের সমস্যার সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের সমস্যার সংঘাত। কল্পনা করুন সত্যযুগের তপোবনের ঋষির সঙ্গে আজিকার লণ্ডন নিউইয়র্ক বা কলিকাতার বাসিন্দার সাক্ষাৎকারের ফলে তাহাদের আলাপ—আলোচনার গতি প্রকৃতি কি হইতে পারে!

ধরুন, যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে কার্লমার্ক্সের দেখা হইয়াছে আধুনিক মহানগরীর এক বিশ্রামাগারে। এই দুই মহামানব পরস্পরকে বুঝিতে পারিবেন কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে Materialistic interpretation of history-র যোগ ও সংগতি কোথায়? এক সমস্যার সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো অপর সমস্যার উদ্ভব হয়। পেটের ক্ষুধা মিটিলেই চিত্তের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। হা অন্ন হা অন্ন বলিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানবের হাহাকার আর অমৃত-পিপাসু নারীর আর্তি দুইটিইত মানব-জীবনের সমস্যা। বঞ্চিত লাঞ্ছিত উৎপীড়িত শ্রমিকের যুগ-সঞ্চিত দুঃখ দুর্দশা, আর একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে অনাথা বিধবা জননীর মর্ম্মান্তিক বেদনা কি মানব জীবনকে সমভাবে অভিশপ্ত করিয়া রাখে নাই? ঐহিক জীবনে আর্থিক সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান করিতে চাহিয়াছে Das Capital, আর মৃত্যু-ভয়ভীত, বিয়োগ বেদনা বিধুর নরনারীর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা

করিয়াছে উপনিষদ্। ঐহিক তথা পারমার্থিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যই মানব সভ্যতার উদ্ভব ও প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, চিকিৎসা-বিদ্যা এবং technology এই পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবদ্দশায় তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি ও আনন্দ বাড়াইবার চেষ্টায় নিরত, আর উপনিষদ বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ মরণের পর মানুষের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ লইয়া ব্যস্ত। দীনা ভিখারিণী বুভুক্ষু পুত্রকে কোলে করিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া শিশু মাতৃ কোলে রোদন করিয়া মাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে, এই এক দৃশ্য। আর শ্মশানে শৈব্যা মৃত পুত্রের সৎকারের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, এ আর এক দৃশ্য। এক মুষ্টি অন্ন কোন রকমে যোগাড় করিতে পারিলে এক ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত সম্পদ দিয়াও শৈব্যার দুঃখের অবসান হয় না। বিজ্ঞানের বলে খাদ্য-সম্ভার বাড়িতে পারে এবং সরকারের সু-ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাও রহিত হইতে পারে, চিকিৎসা-বিদ্যার নৈপুণ্যে ও প্রসাদে অকাল-মৃত্যুও রোধ করা যাইতে পারে; কিন্তু মরণশীল জীব একদিন না একদিন এই ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেই। সেই বিদায়ের ক্ষণে বিচ্ছেদ ব্যথাতুর নর নারীর সান্ত্বনার বাণী কোথায়?

Knut Hamsun-এর Hunger নামক গ্রন্থে আছে জঠরানলের জ্বালা আর জন বোয়ারের Great Hunger এ আছে চিত্তের ক্ষুধার দাবী। দুই ক্ষুধারই নিবৃত্তি চাই—একটির নিবৃত্তিতে অপরটির নিবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল অভাব পূরণের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় মানসিক ও আত্মিক অভাবও পূরণ করিতে হইবে। যেমন কামানল নিভাইতে হইবে, তেমনই প্রেম-পিপাসাও মিটাইতে হইবে। মানুষের সত্ত্বা একই সঙ্গে দৈহিক এবং দেহাতীত। দেহকে বাদ দিয়া নয় মানুষ, আবার দেহের মধ্যেই একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধও নয় মানুষ। রূপ, অরূপ, স্থূল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-যুক্ত এবং অতীন্দ্রিয়ের এক অপরূপ মিলন-লীলা এই মানব-সত্ত্বায়। রামচন্দ্র অপত্য-নির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন, জনসাধারণের মত মাথায় পাতিয়া লইয়া সতী-শিরোমণি রাম মনোজীবিতা, প্রিয়তমা জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। সারা দিন রাত অতন্দ্রিত হইয়া তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, রাত্রির শেষ দিকে জীব-ধর্ম্ম বশে অল্পক্ষণ মাত্র নিদ্রা যাইতেন। "রাজা রাম" আজ পর্যান্ত অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। প্রজার সুখে তাঁহার সুখ, প্রজার দুঃখে তাঁহার দুঃখ—প্রজার সঙ্গে তিনি একাত্ম। রাজধর্ম্মের তিনি প্রতীক, আদর্শ রাজা। প্রজার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ওদিকে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সব করিতে ও সব কিছু দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি দাতার ভূমিকা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। জনসাধারণকে তিনি শুধু দিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন না, তাহাদিগকে তিনি পুরা মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা যেন তাহাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া নিজেরাই নিজেদের ভুক্তি মুক্তি বিধান করিতে পারে ইহাই ছিল এই কর্ম্মবীর লোকনায়কের জীবনের লক্ষ্য ও তপস্যা। কোন ব্যক্তি যত যোগ্য মহৎই হউন না কেন চিরদিন তিনি জাতীয়-তরণীর কর্ণধার থাকিতে পারেন না। জাতীয় তরণী পরিচালনার ভার কাহারও হাতে একচেটিয়া থাকিবে না—উহা হাত ঘুরিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে ভোগ করা তো বরণীয় নয়ই, দীর্ঘদিন উহা এক হাতে থাকাও গণতান্ত্রিক আদর্শ নয়।

স্বাধীনতার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, এবং পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা পরিচালনার আদর্শ নিজের জীবনে ও কর্ম্মে হাতেনাতে দেখাইয়া গিয়াছেন ওয়াশিংটন। Good goverment বা "রামরাজ" কখনও Self-Goverment বা "স্বরাজ" সমতুল্য বা সমমূল্য হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের আর একজন প্রেসিডেন্টও যে সূত্র আবৃত্ত ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাও ওয়াশিংটনের জীবন-বেদের ও মতবাদেরই ভাষ্য ও টিপ্পনী—তাহা হইতেছে 'Government of the people by the people and for the people-রাজসিংহাসনে বসিয়া অবতার-কল্প কোন মহামানব প্রজাপুঞ্জের সেবা এবং হিতসাধন করিবেন ইহাই শেষ কথা নয়, প্রজারাই স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সুশিক্ষিত ও সমর্থ নাগরিক রূপে নিজেদের ভাগ্য-বিধাতা হইবেন এবং সব কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিবেন—প্রজাদের এই স্বরাজ লাভই গণতন্ত্রের উদ্গাতাদের লক্ষ্য।

ফরাসী-বিপ্লবের, রুশ-বিপ্লবের এবং পৃথিবীর আরও অনেক অসফল বিপ্লবের ইহাই ছিল মূলমন্ত্র—জনগণের জাগরণ, মুক্তি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম পরিচালনা। 'রাম-রাজ্যের গঙ্গোত্রী হইতে যাত্রা করিয়া নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া মানবসমাজ মন্থর অথচ দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছে গণতন্ত্রের সেই সাগর-সঙ্গমে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই হইবে সমষ্টিগত জীবনের ভাগ্য-বিধাতা।

ল্যাণ্ডরের গ্রন্থ দান্তে ও বিয়াত্রিসের মত সম-সাময়িক নায়ক নায়িকার কাল্পনিক কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার সংকল্পিত কাল্পনিক কথোপকথন রচনার প্রথমটী হইবে সম-সাময়িক দুই ব্যক্তিকে লইয়া যথা ব্যাসদেব ও শুকদেব। মহাভারত (বিশেষতঃ মহাভারতান্তর্গত গীতা) এবং ভাগবতের উল্লেখ থাকিবে ঐ কথোপকথনে। যে সব কাল্পনিক কথোপকথন রচনা করিব তাহার মধ্যে নারী চরিত্রও থাকিবে। ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে কথাবার্তা হইবে জোয়ান্ অব আর্কের, গিরিধারীলালের প্রেমে পাগলিনী পরমবৈষ্ণবী মীরাবাঈর সঙ্গে ভাব বিনিময় হইবে মুসলমান-তাপসী রাবেয়ার। মধুসূদন দত্তের বিরচিত বীরাঙ্গনা কাব্যের কোন কোন নায়িকার ভূমিকাও হয়ত থাকিবে "কাল্পনিক কথোপকথনে।"

(১) ব্যাসদেব—শুকদেব

শুকদেব—তাত, দ্বাপরের শেষপাদে আপনি কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন আজ কলির সন্ধ্যায়ও কি তাহা তেমনভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণীয়? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে পৃথিবী যেখানে ছিল এখনও কি সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে? মানব সমাজে কি পরিবর্তন ঘটে নাই এবং ব্যক্তির জীবনে কি নূতন সমস্যা দেখা দেয় নাই?

ব্যাসদেব—বৎস, বাহ্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছে সত্য। কিন্তু মানুষের আন্তরপ্রকৃতি একই আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাইলেও পোশাকধারীর শরীরটা একই আছে। আত্মা দেহের খোলস বদলায়—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ "নূতন বোতলে পুরাতন মদ" বলিয়া একটী কথা আছে ইংরাজী ভাষায়। নূতনের নাম করিয়া পুরাতন সংস্কারের বাষ্প দিয়াই সমাজের গতিবেগ বাড়ানো হইয়াছে।

শুকদেব—পিতঃ, বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও কি বদলায় না? নূতন বোতলে পুরাতন মদ রাখা যায়, আবার পুরাতন বোতলের মধ্যেও নূতন মদ পুরিয়া দিয়া পুরাতনের নামে নূতন জিনিষ চালাইয়া দেওয়া যায় না কি? অনেক সংস্কারকই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তথাকথিত রক্ষণশীলদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিজ খপ্পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যাসদেব—এই দেখ না, গীতায় জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই ত্রিবেণীর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এই নীতিত্রয় গীতা রচিত হইবার আগেও ছিল, এখনও আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। আত্মিক গঠন অনুসারে কাহারও প্রকৃতিতে জ্ঞানের দিকে ঝোঁক, কাহারও কর্ম্মের দিকে উন্মুখতা, কাহারও বা ভক্তি-প্রবণতা বেশী। কোন এক ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটির সমান বিকাশ বা সামঞ্জস্য কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক আধারে এক একটির প্রাধান্য থাকায় ভারসাম্যের সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রতীকারকল্পে সামঞ্জস্য-বিধান ও সমন্বয়-সাধনের উপর এত জোর দিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের অনুকূল ও উপযোগী, জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের সমতাও তেমনই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন। ভোগ ও ত্যাগের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধানের কথা গীতায় উক্ত হইয়াছে। "যুক্তাহার বিহারস্য · যোগো ভবতি দুঃখহা।" অর্জ্জুনের মধ্যে কর্ম্মোদ্যম যত প্রবল, জ্ঞানস্পৃহা বা ভক্তির প্রবণতা ততটা ছিল কি?

শঙ্করাচার্য্যে জ্ঞানের মাত্রা বেশী, চৈতন্যে ভক্তির। শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এবং নেতাজীতে কর্ম্মের। গীতোক্ত সমন্বয়ের আদর্শ যাহাই হউক না কেন, বাস্তব জগতে যাঁহারাই উন্নত হইয়াছেন, তাঁদের মধ্যে তিনের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য তত দেখি না যত দেখি এক একটির অতিরেক। যোগবাশিষ্ঠের উদ্দেশও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। রামচন্দ্র যে পরিমাণে কর্ম্মযোগী, সেই পরিমাণে জ্ঞানী বা ভক্ত নহেন। কর্ম্মযোগীকে ধ্যানযোগীর চেয়ে ব্যক্তিত্বের মহৎ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এখানে প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে সনাতন ভারতের আদর্শগত মিল

আছে। "To die in harness" বলিয়া যে motto পাশ্চাত্য সমাজে এত লোকপ্রিয়, তাহার আদি উৎস রহিয়াছে গ্রীক-সংস্কৃতির আদর্শ নাগরিকের প্রস্তুতি ও কর্মময় জীবনের মধ্যে। রোমকদের গৌরবময় যুগেও কর্মযোগেরই পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে। আধুনিক ইউরোপ ও ইউরোপ প্রভাবিত দেশে এই classical tradition উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রীক-রোমক সভ্যতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে দাঁড়ায় সত্ত্ব-মিশ্র-রজোগুণের অনুশীলন ও পূর্ণ বিকাশ দার্শনিক প্লেতোর Republic গ্রন্থে বর্ণিত King-philosopher (রাজর্ষি)-এর মধ্যে যে আদর্শের চরম পরিণতি—Not a man of contemplation, but a man of action. আমাদের দেশেও দেখ—ভগবানের অবতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ এবং প্রধানতঃ কর্মযোগী, রাজর্ষি জনক সিংহাসনে বসিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ যোগী তপস্বীদের গুরু। আমি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডকে সুবিন্যস্ত করিয়াছি। ভাগবতে রাসলীলা ও ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি—সকলে আমাকে সর্বজ্ঞানের আধার ও সর্বজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। আমি তোমাকে সযত্নে সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া কেন রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম? হিন্দুধর্মঃ সারমর্ম কর্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি, realisation through action; কিছুক speculative thought নয়, প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে, বিবিধ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, বিচিত্র বিষয়ভোগের মধ্যে, সঙ্কট সংঘাত-সঙ্কুল সমস্যার মধ্যে, শোক, বিয়োগ বেদনার মধ্যে, বিভিন্ন কর্তব্য দায়িত্বের মধ্য দিয়া, কষায় কটু তিক্ত অম্ল মধুর প্রভৃতি নানারসে রসময় এই মানবজীবনকে আস্বাদন করিয়া তাহার সবখানি রহস্য আয়ত্ত করিতে হইবে। বহু বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, কপিল কণাদের চেয়ে জীবন-রসবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ বরীয়ান্ মহীয়ান, গরীয়ান, কেন না তিনি জীবনের সকল রস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিয়াছেন এবং জীবনের রহস্য সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাহার তলদেশে পৌঁছিয়াছেন, জীবনবেদ সম্পূর্ণভাবে অধিগত করিতে পারিয়াছেন। ভৌতিক ও প্রাকৃত জ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে যে হাতে-কলমে ধরিয়া-করিয়া, করিয়া-কর্মিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া, যাচাইয়া-বাজাইয়া লইতে হয় ইহাতো জানা কথা। যাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর তাহার জ্ঞানের ভিত্তি তত মজবুত। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অথবা অস্ত্রোপচার-কক্ষে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও যে ইহা সমভাবে প্রযোজ্য তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায়। অতীন্দ্রিয় লোকে অপ্রাকৃত যে অপরোক্ষানুভূতি সে ক্ষেত্রেও এই কর্মযোগযুক্ত জীবন-রসিকেরা কাহারো চেয়ে ন্যূন নহেন। মা হইয়া সন্তানকে প্রাণ দিয়া যে ভালোবাসিয়াছে, প্রিয়তমকে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সেই নিরক্ষর চাষীর মেয়েকে "প্রেমতত্ত্ব" বা "ভালবাসার দর্শন" শিখাইতে চায় যদি দর্শনে এম, এ, পি, এইচ, ডি, অনূঢ়া অধ্যাপিকা যে জীবনে কাহাকেও কখনও ভালবাসে নাই, তবে তাহা হাস্যের উদ্রেক করে নাকি? আশীবিষে যাহাকে কখনও দংশন করে নাই, সে কি করিয়া বিষের জ্বালা অনুভব করিবে? এই দেখ না, আমি মহাভারত ও ভাগবত রচনা করিলাম, কিন্তু বাৎসল্য রস যশোমতী যেমন বুঝিয়াছেন, আমি কি তাহা ধারণা করিতে পারি? আমি ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছি, তিনি সকল ইন্দ্রিয় দিয়া মন প্রাণ দিয়া প্রতি নিমেষে তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, আর আমিও ভাষার মাধ্যমে যেটুকু ফুটাইতে পারিয়াছি তাহাও তোমাকে বুক পাইয়াছিলাম বলিয়া। বাৎসল্যরসের ব্যাখ্যাতা আমি, কিন্তু তাহার প্রকৃত আস্বাদন ভোগ বা উপলব্ধি মা যশোদার। বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে দশরথের পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগের কাহিনী যে লিখিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি ঋণী রত্নাকরের কাছে—যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেইজন্যই ইংরাজীতে একটি কথা আছে—an onounce f action is worth more than a pound of thought. আর দেখ বৎস, মহাভারতে কত ভাবে, কত আখ্যায়িকা অবলম্বনে আমি সেবার, দানের, আতিথ্য-ধর্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন ও কীর্তন করিয়াছি। কিন্তু যিনি নিজ হাতে রাঁধিয়া ক্ষুধার্তকে অন্ন দিয়াছেন, রাত্রি জাগিয়া আতুরের সেবা করিয়াছেন, অনাথকে আনিয়া বর্ষার দিনে নিজের ভাঙ্গা কুঁড়েতে আশ্রয় দিয়া নিজে আঙিনায়

দাঁড়াইয়া ভিজিয়াছেন, শরণাগণকে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজে আততায়ীর ছুরিকার আঘাতে প্রাণ দিয়াছেন, সেই দান, সেবা, আতিথেয়তার উপলব্ধি কি বদরিকা-আশ্রমে বিবিক্তসেবী ধ্যান-সমাহিত বা যোগরত ব্যাসদেবের পক্ষে সুলভ বা সম্ভব? ব্রজপুরের একটি সাধারণ গোপবালার হৃদয়ে সঞ্জাত ও অনুভূত প্রেমরসের বিন্দুমাত্র আমি সমুদয় ভাগবতের মধ্যে ঢালিয়া দিতে পারি নাই; এবং তোমার মত ভক্তি রসে বিভোর, ভক্ত-বক্তার প্রেমাপ্লুত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে জনমেজয়ের তৃষিত চিত্তে সেই রসবিন্দুর এক দশমিকও সঞ্চারিত করিতে পারা যায় নাই। তত্ত্ব, দর্শন, ভাষা, ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনের দাবি যে তার চেয়েও বড়। কবি, দার্শনিক, যোগী, ধ্যানী, মুনি, জ্ঞানী এক—আর জীবন-রসের রসিক ও কর্মযোগী কর্মী আর অন্য। ভগবান তথাগতের সদ্ধর্ম কালক্রমে বিকৃত হইয়া যেমনষজ্ঞাগ্নি ক তেমনি কর্মাগ্নি কও নিভাইয়া দিয়া "পরম নির্বাণই আনিয়া দিয়াছিল। সমাজ-জীবনে তার পরিণাম ফল শুভ হয় নাই। চারি আশ্রমের মধ্যে শুধু রহিল চতুর্থ বা শেষ আশ্রম সন্ন্যাস—পূর্ববর্তী তিনটি সোপানই ভাঙ্গিয়া গেল— সাধারণ মানুষ যে হোঁচট খাইবে এবং পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? চারিবর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ টিকিয়া গেল তাহা ইতিহাস বলিতে পারিবে। শুধু সন্ন্যাস, নির্বাণ ও শান্তির প্রেরণা থাকিল বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ভারতীয় সভ্যতায়। রাজপুত্র যৌবনে সন্ন্যাসী হইলেন—তাহার গূঢ় প্রতিক্রিয়া সমাজ জীবনে ধীরে ধীরে দেখা দিল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সেই যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আজও তাহার পুনঃসংস্থাপন সমগ্রভাবে হইতে পারিয়াছে কি? জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস অতি জটিল, তাহার গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইতে হয়, কত চোরাগলির আঁকা বাঁকা কত না কুটিল গতি! আজ এই সংশয়পীড়িত অশান্তি ক্ষুব্ধ হিংসায় উন্মত্ত বেদনার্ত বিংশ-শতাব্দীতে বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, সাম্যের বাণী আমাদিগকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে। অমিতাভের সেই অম্লান জ্যোতি আমাদিগকে পুলকিত করে, নূতন আশায় অনুপ্রাণিত করে সন্দেহ নাই। বুদ্ধের ব্যক্তিত্বেরও সদ্ধর্মের মূল্য ও মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মানব-সভ্যতার বিবর্তনে যে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, ভারসাম্য প্রয়োজন এবং যাহার অভাবে এক যুগের প্রগতি অপর যুগের গতিমাত্রা দ্বারা ব্যাহত হয় তাহা বিবেচনা করি। আমরা গ্রীক সভ্যতার সেই balance এবং equilibruim, proportion, symmetry এবং harmony-এর সূত্র (ক মূল্য) প্রয়োগ করিয়া মানব সভ্যতার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য শুভ ছন্দ ফিরাইয়া আনিতে চাই। একদিকের আতিশয্য অপর দিকের ন্যূনতা দ্বারা দণ্ডিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মত, দ্বিপদক্ষেপের মত, জোয়ার ভাঁটার মত উদ্যম ও অবসাদের মত তাহার ছন্দ। ছন্দাপতনে দুর্গতি ও অধোগতি আনয়ন করে। কলিযুগে যিনি আমার ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিবেন, স্বয়ং শিবের অংশে যিনি অবতীর্ণ হইয়া অলৌকিক প্রতিভার বলে বেদ বিরোধী বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, সেই শঙ্কর হর শঙ্করাচার্যকে কাম-শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য অপরের দেহ আশ্রয় করিতে হইবে। পুঁথিগত তাত্ত্বিক জ্ঞান অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তব জ্ঞানের কাছে দাঁড়াইতে পারে কি? আর কর্মযোগই ঈদৃশ জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা নয় কি?

অথ দামোদর উবাচ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ছিল সুস্মিতা, একমনে শুনছিল সুললিত।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজায়ে—পিছনে অজস্র জলধারা কলরোলে। স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে নির্ঝরের, হেসে খল খল গেয়ে কলকল সে ছুটেছে পিছু পিছু খাল বিল মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে, যোষণ-কারা ভেঙে হরজটাভ্রষ্ট হয়ে, শঙ্কর প্রণয়িনী ভয়ঙ্করীর মূর্তিতে—ডাকে যেন, সিন্ধু মোরে ডাকে যেন, মহাসাগরের অভিসারে চলেছে সে। সুললিত হেসে বললে —ভাগ্যিস্ রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ লিখেছিলেন, তাও আবার খাস কলকাতার সদর স্ট্রীটের বাড়ী থেকে সে দর্শন, আচ্ছা ব্যাকরণের ষত্বণত্বে জ্ঞান আমার কম, সুস্মিতা ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—থামুন—নির্ঝর না বলে নির্ঝরিনী বললে হোত, এটাতে—ও সব আর্ষ প্রয়োগ—

না, না, পড়ুন—

গঙ্গাযমুনা গোদাবরী সরস্বতীনর্মদা সিন্ধু কাবেরীকে নিয়ে আমরা একটা সর্বভারতীয় আভিজাত্যের কল্পনা করেছি। সরস্বতী শুধু নদীর নাম নয়, তিনি বাক্, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপা। বৈদিক কবি তাঁর স্নিগ্ধ সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে চাননা, তাঁর সপ্তশাখা, তিনি সপ্ত বিভক্তা, তিনি সুষ্টুষ্টা স্তোম্যা, কাঞ্চনাক্ষী, সর্বশুক্লা—আজও নদীর প্রতীক হিসেবে হংস ও পদ্মকে দেখতে পাই বাণী বাগদেবীর পদতলে—

চমৎকার, সুন্দর লেখা, কিন্তু সারাজীবন যন্ত্র-মন্তর নিয়েই রইলুম, আপনাদের মত তো লেখাপড়া করলাম না, অনেক কথার মানেই জানিনা এই ধরুন না—সুষ্টুষ্টা, স্তোম্যা—এসবের অর্থ বুঝিয়ে দিন একটু; কিন্তু আপনি যে বললেন দামোদর সম্বন্ধে লিখেছেন—

একটু ধীর হয়ে বসে শুনুন না—আবার পড়তে আরম্ভ করলে সুস্মিতা।

কিন্তু দামোদরকে নিয়ে এসব জল্পনা কল্পনা নেই। তিনি নদী নন, নদ অর্থাৎ 'পুং', যেমন অজয়, ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ, যদিও প্রতাপে এরা কিছু কম নন। আজও গ্রাম্য কবি তটস্থ হয়ে গাইবে—'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' ইনি পুং না স্ত্রী, শিবঠাকুরের গলায় মালা দিলেন কোন তিন কন্যে, তারা রাধলেন বাড়লেন, রাগ করে বাপের বাড়ী যেতেন, এ সব খবরের মধ্যে দামোদর পুরুষ না স্ত্রী ঐ খবর অজানা ছিল। দামোদরকে বৈশাখের রুশদিনে দেখতে যেমন ক্ষীণতায় সাদামাটা, তেমনি আবার শ্রাবণী সন্ধ্যায় তিনি উন্মত্ততায় অধীর—

ও, আপনারা বুঝি 'অভিসার' কথাটা ব্যবহার করেন না—বৈষ্ণব কবিরা করেছেন—

তবে যে বললেন—অনেক বছর ইউরোপে আমেরিকায় থেকে বড় টেকনলজিষ্ট হয়ে এসেছেন, দেশের সাহিত্য কৃষ্টির ধার ধারেন না—কথাটা মিষ্ট শোনাচ্ছে না কিন্তু—

স্রেফ্ রবীন্দ্রনাথ চুরি—এবারে তো ধরা পড়া গেলেন—কী দণ্ড আদেশ করুন—

খাড়া চুপ করে বসে, স্পিক টি নট করে ধৈর্যধরে প্রবন্ধটা শুনে নিন, সঙ্গে সঙ্গে কফির পেয়ালায় চুমুক দিন—

অগত্যা নাম যার দামোদর তিনি কি সর্বভুক, না উদরে পোরেন সবকিছু, বিশ্বভাবন বিশ্বপাবন যে বিশ্বপ্লাবনও করেন সময় সময়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—বন্দেমাতরম বুঝিয়ে আর কী হবে, বলো, বন্দে উদরম। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু লালিমা পাল লিখে তার সঙ্গে 'পুং' যুক্ত করে দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। আমরা যদি সেই অচিন্ত্য ভেদাভেদে না গিয়ে শুধু অনির্বচনীয় দামোদরকে নদ বা নদী যা খুশী বলি, তাতে বোধ হয় পরশুরামের কাছে পাওয়া পাশুপতের অপব্যবহার নাও হতে পারে।' বিদ্যাসাগর মশাই—

হ্যাঁ একটা জলজ্যান্তো মানুষ বটে—

হ্যাঁ, এই একনদী বিশকোশ পেরিয়েছিলেন প্রখর স্রোতে সাঁতার দিয়ে। বড় মায়ের কোল থেকে খসে পড়া এক একটি মাণিকের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ঐ নদীর পারে। তন্বীতন্বু বর্ণশ্যামা শীর্ণকটি গভীরনাভি বহু যুবতীর আবেগসুপ্ততার লীলাখেলা ঐ দামোদরের ধারে। কতো নারীর ক্ষতি করেছে এই দুরন্ত রাক্ষস, কত পুরুষের অভিশাপ কুড়িয়েছে এই অশান্ত নদ। যুগ যুগ ধরে কতো বন্যায় কতো শস্যশ্যামল দিগন্ত ডুবে গেছে এর করালগ্রাসে, কতো মানুষ, কতো পশু দিয়েছে প্রাণ, তার সালতামামী শুদ্ধই থাকুক, তার হিসাব নিকাশ করতে মন রাজী নয়।

ব্রাভো—দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কী আপনাকে পাবলিসিটি অফিসার নিযুক্ত করেছে নাকি—টিপ্পুনী কাটলে সুললিত। কাগজপত্র মুড়ে উঠে পড়লো সুস্মিতা, গম্ভীর ভাবে বললে—আপনি কোন জিনিষ সিরিয়াসলি নেন না—থাক্গে—

না, না, আমি বড়ই লজ্জিত, মাফ করুন—রবীন্দ্রনাথের কাব্য তো বেশী পড়িনি লাগসই কথা দেখলেই উৎসাহে চনমন করে উঠি, দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে যাই—

না, আপনি ইঞ্জিনীয়ার,—থাক পরেই শুনবেন, একেবারে ছাপায় পড়বেন, কি বলেন—

হ্যাঁ, বৈবুদ্ধের খাতা চীনেম্যানকে শোনাতেও আপত্তি নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই বুড়োবয়সে সেদিনও ল্যাবোরেটরী গল্প লিখে ছাত্রছাত্রী অনুরাগী অনুরাগিণীদের শোনাবার জন্য কী উৎসাহ—

না: আপনাকে নিয়ে আর পারবার যো নেই—এই উঠলাম—

সত্যি, ক্ষম্যতাং মেহপরাধঃ

আর প্রবটিতবদন করে কাজ নেই, পড়ছি, কিন্তু শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধ্রুতবাক, মিতবচন হতে হবে, রাজী?

রাজী—

আবার পড়া সুরু হলো—

দামোদরের সঙ্গে নিম্ন পশ্চিম বাংলার গভীর সম্পর্ক, পাশে চলেছে রূপনারাণ যার কূলে ডুব দিলে দেখা যায় জগৎটা স্বপ্ন নয়—দূরে কংশাবতী। আরো দক্ষিণে একটু দক্ষিণাবান হলেই মিলবে দেখা সখী সুবর্ণরেখার সে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে লবণাম্বুরাশিতে যেখানে বনয়ন্তী-নীলা তালতমালী তলে লুকিয়ে গেছে বালিয়াড়ীর ফণি-মনসার ঝোপে। আরো দক্ষিণে চলেছেন বৈতরণী আর ব্রাহ্মণী—পুরুষোত্তমকে পাশে রেখে, জবাকুসুমসংকাশ দেবতাকে দূর থেকে প্রণাম করে চলে গেছেন যে মহানদী তার কথা হেথায় এহ বাহ্য, এহ বাহ্য। হীরাকুদে সে দিয়েছে বন্ধনে ধরা পরাদ্বীপে সে খুলেছে বাণিজ্যের দুয়ার।

যাক্, দামোদরের কথাই বলছি। একশো বছর ধরে কতো কমিটি কমিশন, আলাপ-আলোচনা। বাংলাদেশ মূলতঃ নদীমাতৃক, গাঙ্গেয় বদ্বীপ প্রভৃতি রেখায় তার ঝলমল রূপ। হিমগিরির শিখরে শিখরে প্রতিদিন জমে তুষারস্তূপ—আর প্রতিদিন নাবে সেই স্নিগ্ধ সলিল—হিমালয় শুধু পৃথিবীর মানদণ্ডই নয়, উত্তর ভারতের জীবনদণ্ড। প্রথম কোনদিন আর্যাবর্তের সমতলে এই জলধারা নেমেছিল তা কেউ জানে না। হয়তো ভগীরথ শুধু রঘুকুলতিলক নন, শুধু তপস্বী সাধক নন্, সেকালের একজন বড় ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়ারেরও প্রতীক। এই গঙ্গা হৃদি বঙ্গভূমিতে আবার এসেছে গণ্ডোয়ানা শিলাস্তূপের ছোটনাগপুর বাহিনীর জলরাশি। পালামৌ জেলার উচ্চ মালভূমিতে যখন দিগন্তে আষাঢ় ঘনিয়ে আসে, মৌসুমী বায়ুচালিত মেঘমালারা, দিঙনাগের সাথে জলকেলিতে হয় মত্ত, তখন সেই স্খলিত শৌর্যকে অঙ্গে ধারণ করেই দামোদরের জন্ম স্থষ্টি সোনাসাথীর কোলে, দেওনদ উঠলেন জেগে। তারপর হেসে ভেসে খলখল ছুটলো এই নদ হাজারিবাগের প্রান্তভূমি ছুঁয়ে—বর্ষায় সে মত্ত-মাতঙ্গ শীতে সে বিশীর্ণ কলেবর, বৈশাখে সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী—উন্মত্ত ভৈরবের কতো রূপ কতো রং, কতো ঢং। রাজরপ্পায় এসে শিলাসনে বসে দেবী ছিন্নমস্তার সঙ্গ হলো তার ক্ষণিকের প্রণয়গুঞ্জন—যিনি পিবন্তী রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতম্। তারপর ভেরা নদীর আলিঙ্গনকে তুচ্ছ করে মুখ ফিরিয়ে চললো সে উত্তরে, বোকারোকোনারকে খেলায় ডাকতে। তিন হাজার পাঁচশো ফুট থেকে নামতে নামতে মানভূমের সমতলে যখন সে এসে পৌঁছল বাংলার সীমান্তে দিশেরগড়ে তখন বরাকরের বর অঙ্গে দেবী কল্যাণেশ্বরীকে সাক্ষী

রেখে বরতনু মিলিয়ে দিল সে। মায়ের স্তন উঠলো জেগে, সামনে পঞ্চকূট। দামোদরের তিনশো সত্তর মাইল যাত্রাপথের প্রথমপর্বের উদযাপন এইখানে। উচ্চ ভূমির জলধারাকে মিলিত করে সে ঢুকলো বাংলাদেশে দুর্দাম চণ্ডবেগে। মানভূম, ধানবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান—কত কলকারখানা, জনপদ, গ্রাম, কোলিয়ারী—সে সব পেরিয়ে, ছুঁয়ে চলে এলো এই অশান্ত পথিক। সে মোড় নিয়েছে, 'হানা' দিয়েছে, 'কানা' হয়েছে, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে রূপনারায়ণে যেতে চেয়েছে। তারকেশ্বর, আরামবাগ, আমতা গেছে ভেসে। পার্বত্য উপত্যকায় ভূমিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রচুর শিলা বালি পলি—নদীর গর্ভ হয়েছে উঁচু, ক্ষতি হয়েছে রাজপথের রেলপথের, মরেছে মানুষগরুপশুরা, শস্যের হয়েছে হানি। বাঁকাবেহুলারা মুখ ফিরিয়েছে বর্তিরণে। বরুণবরে চিরতরুণ দামোদরের সঙ্গে অনুভ্রমী বুদ্ধারা যুঝতে পারে না, বন্যার উদ্বৃত্ত জল তারা নিতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশের নদীর খাত পরিবর্তন হয়েছে বারেবারে। ভাগীরথীর পরিত্যক্ত নিম্ন পথটিই এককালে ত্রিবেণীর ধারে সরস্বতীকে নিয়ে এসেছে। দামোদর নাকি কয়েক শতাব্দী আগে ঐখানেই মিশতো গঙ্গার সঙ্গে। মনভাগীরথীর উৎস সন্ধানে যাবে কোন বৈজ্ঞানিক।

তারপর—মুখে আঙুল দেখিয়ে স্মিতা বললে—চুপ—

১৮৫৫ সাল। তখন মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়ভেরী বাজছে—বর্ধমান (জানিনা, জৈনতীর্থংকর মহাবীর বর্ধমানের সঙ্গে এই নগরীর কোন সংযোগ অতীতে ছিল কিনা—অবশ্য কিছুদূরে পার্শ্বনাথের পদরজঃপূত গিরিমালায় ঐ মহাপুরুষের নাম কালের অক্ষয় অক্ষরে উৎকীর্ণ) ডুবুডুবু, কর্তারা চিন্তিত হলেন, কিন্তু দামোদরের ভূত নড়েও না, ছাড়েও না। কিছু কিছু বাঁধ দিয়েছিল রাজারা ও প্রজারা নদীর বাঁদিকে, ঠিক হলো দক্ষিণ দিকেও বাঁধ দিতে হবে নদীর সমান্তরালে, যাতে জলের চাপ ভাগ হয়ে যায়, ডাইনে বামে ছন্দ নামে। তখনও উইলকক্স-ভড্‌ইনরা আসেনি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথাই উঠছে, নদীনিয়ন্ত্রণের কথা নয়, সামান্য সমস্যা সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি। একটা বিরাট সেচ পরিকল্পনা বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবাই যায় না। ১৯১৩ সালে আবার এলো ঢল—ধ্বংসের দেবতা নামলেন পথে। ভয়ঙ্করকে শংকর করবার কোন সন্ধান কোন তন্ত্রাভিলাষী দেননি সেদিন। পরে একটা আংশিক ব্যবস্থা হয়েছিল রণ্ডিয়ায়, আড়াআড়ি বাঁধ বেঁধে আর খাল কেটে। ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিদের নামেই নামকরণ হয়েছিল ইডেন ক্যানেল ও পরে এণ্ডারসন ওয়্যারের।

১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখে দামোদরের জলে এলো বন্যা—গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু। নটরাজের হাসিকান্নায় অশ্রুনদীর তীরে ডুবে গেলো সৈন্যদের যুদ্ধ-সরঞ্জামের আড়ৎ, কলকাতা থেকে যাতায়াতের সমস্ত রেলপথ—রাস্তা। আর সাধারণ মানুষ, তারা শুধু চোখ মেলে দেখলে, কান বুজে শুনলে, ভগবানের দোহাই দিয়ে কাঁদলে, প্রাক্তন বলে বুক চাপড়ালে, কোনো নারী পতিপুত্র বিয়োগবিধুরা হয়ে শাপমন্যি দিলে প্রকৃতির দেবতাকে আর বিধাতাকে।

কিন্তু না, এবার টনক নড়লো কর্তাদের। আমেরিকার টেনেসিভ্যালী অথরিটির মতন একটি সর্বার্থসাধক প্রকল্পের পরিকল্পনা করবার জন্য সেখান থেকে এলেন ইঞ্জিনীয়ার ডব্লিউ এল ভুর্ডুইন্।

তারপর এলো সেইদিন, যে দিনটির জন্য ভারতপথপথিকরা অতন্দ্র সাধকের মত বসেছিলেন—কতো ব্যথা, কতো বেদনা, কতো আশা আকাঙ্ক্ষা—অত্যাচার অবিচার অনাচার নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দেশ যাত্রা—তবু অখণ্ড হলো খণ্ড, নদীর এপার ওপার হয়ে গেলো আলাদা—দেবী নামলেন আংশিক সিদ্ধি হাতে, আকাশপথ আলো করে, দিগন্ত উদ্ভাসিত করে, ধরিত্রী উজ্জ্বল করে। এক হাতে জ্বলজ্বল করছে নবীন আশার খড়্গ, আর এক হাতে বরাভয়। দুঃখদিনের অবসানে অশোকমন্ত্রে দীক্ষা নিলে স্বাধীন ভারতের সন্তানেরা।

যাই হোক্, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই তৈয়ারী হলো দামোদর উপত্যকা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা, সর্বপ্রথমে তৈয়ারী হলো বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া বাঁধ, সঙ্গে সঙ্গে জমির অবক্ষয় আর নদীগর্ভে পলিমাটি জমা বন্ধের জন্য বৃক্ষরোপণের কাজ। জলাধার তৈয়ারীর জন্য যে সব হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হলো. চাষের জমি হারালো, তাদের ক্ষতিপূরণ হলো শুধু নগদে

নয়, নতুনগড়া গ্রামে স্থান দিয়েও, যেখানে ছেলেমেয়েরা পেলো নতুন পাঠশালা, খেলার মাঠ—নতুন মন্দির উঠলো, দেবস্থানে বাজলো শঙ্খঘণ্টা। দেবতা হলেন প্রসন্ন।

কিন্তু আলো চাই। কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো। উচ্চচাপ তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র বসলো বোকারোতে—তখনকার দিনে সারা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান,—তিনটি ইউনিটে দেড় লক্ষ থেকে দুইলক্ষ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎশক্তি জনন করবার ক্ষমতা রাখে সে,—আরো একটা ইউনিট্ বসলো পরে—কয়লা এলো দামোদর উপত্যকা থেকেই। হাজার মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুদ্‌বাহী তার, মাঠ জঙ্গল পাহাড় প্রান্তর অতিক্রম করে, ট্রান্সমিশন্ লাইন।

ডি, ভি, সি, নাম তখন চালু হয়েছে শুধু বাংলাবিহারের গ্রামে নয়—পৃথিবীর অনেক জায়গায়। বরাকরের উপরে মাইথন বাঁধ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—লম্বায় পৌনে এক মাইল, উচ্চতায় ১৬০ ফিট্। এই বাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণ তো করছেই, আর জলবিদ্যুৎও উৎপাদন হচ্ছে, মাটির দুশো ফিট নীচে কঠিন প্রস্তর ভেদ করে আজকের ময়দানবরা বানিয়েছে এক গুহা। ঘুরছে চাকা বন্ বন্, চলছে টার্বো-জেনারেটর, যেন সেই ঊর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু নিয়ে কেলি করছে কিন্নরীর দল, বিদ্যুন্মালারা। আলোয় ঝলমল করবে দিগ্‌দিগন্ত, তামসী পালিয়ে যাবে দূরে—

প্রবন্ধ পড়ছিল সুমিতা, শুনছিল সুললিত। একজন শিক্ষিকা, একজন ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি আলাপ হয়েছে, দামোদরকে কেন্দ্র করে।

ও হরি, আপনাকে আবার এসব কি শোনাচ্ছি, এ সব তো অনেক দিনের জানা কথা, পুরোনো বস্তাপচা মাল, ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রোপাগাণ্ডা প্রচারের কথা বলছি বলবেন আপনারা, কয়লার শহরে কয়লা নিয়ে যাওয়া—

না, না আমরা যে চোখে দেখি, সে চোখে দেখা তো বিশেষজ্ঞদের দর্দ, কিন্তু সাধারণ মানুষ—ঐ যে ভানুমতী দেবী বা মোক্ষদা ঠাকরুণ, বা বিশু বায়েন কি চোখে দেখে সেই টাই আসল কথা, তাদের কতটুকু লাভ হলো—কত কোটী লক্ষ টাকা আমরা খরচ করলাম, আমেরিকা থেকে ধার নিলাম কত—শোধ দেবো কেমন করে, সে সবের চেয়েও বড় হচ্ছে, কতটুকু করতে পারলাম, কতটুকু দিলাম, আমাদের চেষ্টা, আমাদের সততা, নিষ্ঠা কর্মক্ষমতা কতটুকু ?

হ্যাঁ, লোকে বলে, বড় বড় স্কিম যতো, টাকার অপ-ব্যবহারেরও সুযোগ সুবিধে ততো, লোভী, মুনাফাখোর আর অসৎলোকেরা—সব জিনিষেরই ভালো মন্দ আছে—মানবিক চরিত্র এমনই যে বেদের যুগ থেকে আমরা বলে আসছি—মা, মা হিংসীঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্—হিংসা করোনা, লোভ করোনা, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, শুনছে কে—

তা আজকাল লাভের বেড়াজালে ফাঁপতি টাকার ছড়াছড়ি হচ্ছে, আমরা দ্রুত উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছি, নিজেদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, তাইতো—

হ্যাঁ, সেটা এক কারণ বটে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে দুঃসাহসা করা যায়, মহৎ কাজ হয়না। ত্যাগ তপস্যা নিষ্ঠাকে আমরা কবির কল্পনায় নিয়ে গেছি, ভুলে গেছি যে এগুলোও জীবনের পরম পরীক্ষিত সত্য।

তা সত্যি, জীবন চেতনার আর এক নাম দিয়েছি যুগ-যন্ত্রণ, কথাটা শুনি প্রায়ই, কিন্তু অর্থটা কি ?

যাঁরা বলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে হয় না—

হ্যাঁ; ভেবে আপনি একেবারে সেকেলে, ভারতবর্ষের সমাজচেতনা কল্পনা করতো, রাষ্ট্র, গণ, গোষ্ঠীর ঊর্দ্ধে দল নিরপেক্ষ হয়ে এক শক্তির কাছে নতি। সে শক্তি অন্তরের তাকে এক কথায় বলা হয়েছে 'ধর্ম' যা আমার ধারক ও বাহক। রাজধর্ম প্রজাধর্ম, সমাজ ধর্ম সবই সেই বৃহৎ 'ধর্মের' অন্তর্ভূত—এর জন্যই গুণ কর্ম বিভাগ।

আপনি দেখছি একটা মস্ত বড় বিদুষী, আমি হাতে-নাতে কাজ করি, কারিগর মানুষ। তর্কচুঞ্চু নই, বড় জোর প্রয়োগশিল্পী, কিন্তু হঠাৎ দামোদর সম্বন্ধে সমালোচনা লিখতে গেলেন কেন ? তাও যেন কাব্যগন্ধী কিন্তু মনের তামসী হরণ করবে কারা দন্তরুচি কৌমুদীর ফাঁকে,—

আপনি নেহাৎ বেরসিক—

কাটখোট্টা লোক, হাতুড়ী পিটি, নামেই ইঞ্জিনীয়ার, কবিতাটা ধাতে সয়না, কেমন—

তবু তো কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ 'কোট' করেন—

হ্যাঁ, 'যতোবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে, আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে—'

পড়া স্থগিত রাখলো সুস্মিতা।

মনে পড়ে এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার আলাপ কয়েকদিনের মাত্র। সেদিন সারাদিনের ছোটাছুটির পর সদ্যপ্রসাধনস্নিগ্ধা সুস্মিতা ডেক চেয়ারে বসে এই প্রবন্ধটা লিখছিল—বেশ একটা মোলায়েম মেজাজের সুর উপছে উঠছে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাকে ঘিরে—যে সরস পানীয় মনকে তাতায় কিন্তু মাতায়না। নিরালা বারান্দায় সন্ধ্যাসাঝের ঘন ছায়া তখনও নিবিড় হয়ে ফোটেনি, আলো কালোর গৈরিক মোহানায় সবিতার অন্তিম অধ্যায় সবে পশ্চিম দিকসাগরে ডুবে যাচ্ছে, দূরে পূরবীতে দিনশেষের তান। স্নেহস্পর্শের ঠাশ বুননে বেশ ভালো লাগছিল শ্রীমতী সুস্মিতার, পড়ছিল আরামের দীর্ঘশ্বাস, সে ভাবছিল যে তার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপ খানি কেউ যদি জেলে দেয় এমন সময় কিনা সেই মধুর মৌতাতের মাঝখানে বেজে উঠলো বেরসিক টেলিফোনটা—ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং। ঝি বিমলা এসে বললে—দিদিমণি, তোমায় ডাকছে।

অসময়ে ছন্দপতনে একটু অসন্তুষ্টচিত্তেই সুস্মিতা সামনের টিপয়টা সরিয়ে উঠে যায়। ঘরের ভিতর গিয়ে কলকলিতা যন্ত্রদেবীর বাণীরূপা বাহনটির পাণিগ্রহণ করে বলে—

হ্যালো, আমিই শ্রীমতী সুস্মিতা দেবী—

কে আপনি, কি নাম বললেন—ঠিক ধরতে পারলাম না সুললিত ভট্টাচার্য—গ্রিনীথার—টেনসীভ্যালী থেকে ফিরেছেন সম্প্রতি—দামোদরে কাজ করেন—আপনার ছবিই বেরিয়েছিলো না সেদিন কাগজে…

কৌতূহলী হয়ে ওঠে চিরন্তনী নারীমন—বেশ একটু সম্ভ্রমও জাগে—তা কী বলছেন বাঁকুড়া জেলার বকুলতলা গ্রামে দুর্গাপুরের আড়পারে—ভানুমতী দেবী হ্যাঁ চিনি বইকি—খুবই চিনি—ঠাকুমা যে—কৈবর্তদের মেয়ে হলে কি হয়—বাবাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন যে—কী হয়েছে তাঁর—বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই উঠেছিল তার কণ্ঠস্বর।

ওদিক থেকে তখন বলে চলেছে—নতুন ক্যানালের ধার দিয়ে আসতে আসতে দুর্গাপুরের আড়বাঁধের কাছে কাল রাতে আমার গাড়ীটা হঠাৎ বিগড়ে যায়। অচল স্থাবরটিকে সচল জঙ্গম করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলো, এমন সময় শুনি হৈ হৈ ব্যাপার পাশের গাঁয়ের এক বুড়ী বড় বাঁধ থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে। গেলাম ছুটে দেখতে। লোকে বললে—প্রতি সন্ধ্যায় নাকি বুড়ী এখানে আসতো, নদীকে উদ্দেশ করে গালিগালাজ দিতো, শাপমণ্যি করতো, তারপর বলতো—এবার কেমন জব্দ, আর করবে চালাকি—আমার স্বামী পুত্তুর সব খেয়েছিস্ মনে নেই—রাক্ষস। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে আমার গাড়ীতে তুলে হাসপাতালে দিয়ে আসছি—

তিনি, তিনি কিরকম আছেন—প্রায় চেঁচিয়ে কান্নাভেজা গলায় বলেছিল সুস্মিতা।

একটু ঘুরিয়েই জবাব দিয়েছিল সুললিত—ডাক্তার হেঁকে বয়স হয়েছে—তবে জ্ঞান হয়েছে দেখলাম—খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম—নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, তবে পাড়ারই একটি মেয়ে বললে—কলকাতায় নাকি একটি নাতনী আছে—রক্তের টান কিছু নয়, পাতানো সম্পর্ক, তবে,—

এদিকে তখন চোখ মুছছে সুস্মিতা—হায়রে ভালবাসার টান—রক্তের বীজাণু চেয়েও জোরদার।

টেলিফোনে তখনও চলেছে কথা—সেই আমায় পুরোনো একটা হাতবাক্স এনে দিয়ে বললে—খুঁজে দেখুন আপনি, যদি কোথায় কিছু থাকে—দেখলাম রয়েছে কনভোকেশনের গাউনপরা একটি মেয়ের ছবি—ভারী চমৎকার দেখতে আর একটুকরো কাগজ তাতে একটা নামধাম ঠিকানা,—হাতের লেখা যেন মুক্তার মত। কার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম—বলতে পারলে না পাড়ার মেয়েটি, নাম হাসির মা বললে ওর পাতানো ছেলে—নাকি মস্ত বড় ব্যারিষ্টার ছিল তারই মেয়ের, ভাবলাম কলকাতায় যাচ্ছি, খবরটা সুবিধে হলে দেবো—খবর নেবো—খুঁজে দেখি একটা টেলিফোন নম্বরও রয়েছে—ভাবলাম ফোন করেই দেখি—

ক্লাসে কলেজে সমিতিতে সভায় প্রেক্ষাগৃহে বাগ্‌বিভূতিভূষণা অধ্যাপিকা সুস্মিতা দেবী নির্বাক হয়ে রইলেন। শুধু দুটি কথা কানে বাজতে থাকে—ভারী চমৎকার দেখতে—আর মুক্তোর মত লেখা।

সামনের আরসীতে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি, ঝরণা কলমটা উঠিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নিজের নামটাও লিখে ফেলেন।

হঠাৎ ওদিক থেকে টেলিফোনটা আবার ঝনঝনিয়ে ওঠে—হাঁলো. হাঁ, কেটে দিয়েছিল—কী বলছেন, আপনি এই রাত্রেই ফিরতে পারেন—আপনার সঙ্গে আমি ইচ্ছে করলে আসতে পারি আপনার মোটরে—না, না অন্যায় আর কী—অপরিচয়ের বাধাটা তো কেটেই গেলো—আর রাত্রে আপনার সঙ্গে একলা যাবো, সে প্রেজুডিস্ আমার নেই, বিশেষ করে আতুরে নিয়মো নাস্তি—আচ্ছা ধন্যবাদ আমি তৈয়রী হয়ে থাকবো—একঘণ্টা পরে আসছেন, বেশ—

মুখে না বললেও সেদিন আনমনা হয়ে পড়েছিলেন, অতি আধুনিকা সুষমা দেবী। তাঁর উনত্রিশ বছরের নিযুক্ত জীবনে কোথায় যেন একটা চিড় খায়—বৈদ্যুতিক চঞ্চলতা জাগায়।

এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা মোটর এসে থামলো হাষ্টেলের সামনে। ব্যাগ হাতে নামলেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সুষমা দেবী। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন বছর বত্রিশের এক শান্ত সুদর্শন যুবা।

আপনি মিঃ ভট্টাচার্য—কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো জানিনা। ঈষৎ হেসে সুললিত বলেছিল—ধন্যবাদটা মুলতুবিই থাক, একেবারে শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সুদে আসলে দেবেন—আর আমায় তো যেতে হতোই কাল ভোরে, না হয় কয়েক ঘণ্টার হের ফের—

তবু আপনার কাজের হয়তো ব্যাঘাত ঘটলো—

আরে আমরা তো দুবেলাই যাচ্ছি আসছি বললেই হয়—

দুজনে দুজনের দিকে তাকায়, ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি মেলে। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে সুষমা—তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে বসে সুললিতের পাশে। একটু অন্যমনস্ক হয়েই এক্সিলেটারটা জোরে টিপে দেয় সুললিত।

গাড়ীটা বালীব্রিজ পেরোতে না পেরোতেই সহজ হয়ে এসেছিল দুজনে। স্তব্ধ নিশুতি রাত—জনবিরল পথ—হু হু করে বাদলছোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। দূরে একটা লরীর আলো যেন চক্ষুর মত ছুটে চলে গেলো। আকাশের লক্ষ লক্ষ মাণিকগুলো অঙ্গনে বহুযুগের ওপার থেকে চেয়ে দেখছে যুগ্ম তারার দল, অর্বাচীন মানুষদের কাণ্ডকারখানা।

নানা গল্প হয়, বেশীরভাগই ঐ বৃদ্ধা ও দামোদরকে কেন্দ্র করে—তার বাবাকে মানুষ করেছিলেন কেমন করে তার ঐ ঠাকুমা—শুধু বুকের দুধ দিয়ে নয়, স্নেহ মমতা ভালবাসা দিয়ে নয়, পরের বাড়ী খেটে, বেঁধে ধান ভেনে, কাঠ বিক্রী করে, সুতো কেটে পয়সা জমিয়ে, তেজারতী করে—কী না তার স্বামীকে দামোদর খেয়েছে—তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়েছে—তার পালিত পুত্র ইঞ্জিনীয়ার হবে ঐ দুষ্ট দামোদরকে শিষ্ট করবে—তার বাবা আজ নন ইঞ্জিনীয়ার, হলেন উকীল ব্যারিষ্টার বড়লোক নেতা। তবু স্বপ্ন দেখতো বুড়ী ঐ গাঁয়ের পাশে দামোদরের ধারে দাঁড়িয়ে। তার গর্ভধারিণী মা—সম্পর্কে পিসী রথতলা কোণাকার কে, পাড়াগাঁয়ের এক বুড়ী, যৌবনে কাকে কোলেপিঠে মানুষ করেছিল—স্বপ্ন দেখেছিল যে তাঁর বিশ্বজিৎ বড় হয়ে বিশ্ব নাহোক অন্ততঃ দামোদরকে জয় করবে—তা না পালিতা মায়ের অতিকষ্টে জমানো টাকায় কলকাতায় গিয়ে মানুষ হয়ে, শিক্ষিতা তরুণীকে বিবাহ করে সেই ছেলেই হয়ে গেলো পর—কালেভদ্রে কখনো দেখা হতো—দুচার টাকা মণি-অর্ডার প্রথম দিকে এ পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ওপক্ষ থেকে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কেননা তিনি লিখেছিলেন—আমার অভাব সামান্যই, ধানটা পাই ভাগে চালটা ভেনে নিই, আর সুতো কাটি নিজের হাতে—বাকী দু এক টাকা সে জোগাড় করে দেন তিনি অন্ন জোগান যিনি—তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো এই আশীর্বাদ করি, তবে মরবার আগে একবার আমার সুন্দরী রূপসী নাতনীটিকে দেখবো না...

মা কখনো যেতেন না দুর্গাপুরে বলতেন, বড্ড ম্যালেরিয়া,—বড্ড পাড়াগাঁ, গা ঘিন্ ঘিন করে—আমাকেও যেতে দেন নি—তবে বাবা, কেস করতে বা মিটিং করতে আসানসোল বা বাঁকুড়া গেলে দুএকবার মাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা করে এসেছেন শুনেছি, তাও গোড়ার দিকে যখন তিনি বড় নেতা বা বড় ব্যারিষ্টার হ'ননি। মা,

বাবা, মারা যাবার পরই তো তাঁকে আমি সত্যিকার চিনলুম—জানলুম, বুঝলুম যে 'মা' হওয়া শুধু ছেলেকে পেটে ধরা নয়, কষ্ট করে মানুষ করা নয়, অর্থ দিয়ে সাহায্য করা নয়, সমস্ত চিত্ত, মনন, সত্তা দিয়ে ঘিরে রাখা, তা সে কাছেই থাক আর দূরেই থাক্। মা কথাটা হচ্ছে এক অক্ষরী মহামন্ত্র, এর সাধনায় দুঃখকেই অতন্দ্র হতে হয়, নিষ্কম্প হতে হয়।

তবু থাক্, তথ্য বলুন—ভারী ভালো লাগছে আপনার ঠাকুমার গল্প শুনতে—

এই সেদিন দেখতে গেলুম ঠাকুমাকে, বললুম—চল না, নদীর ওধারে কত বড় বড় কাজ হচ্ছে—সমস্ত দুর্গাপুরটা বদলে গেল যে—

হ্যাঁ, তোদের সেই গল্পে আছে না, দৈত্য এলো, পিদিম ঘষলে—

না, তুমি চলো না—ঐ দেখো সমস্ত পাহাড় জঙ্গল ঝেঁটিয়ে সমগ্র উপত্যকার জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করছে ঐ যে ব্যারেজ, যার পাশে তুমি বসে থাকো, ওখান থেকে বেরিয়েছে দেড় হাজার মাইল খাল, বাঁদিকের খাল দিয়ে লোকজন নৌকো মাল চলাচল হবে—একেবারে ত্রিবেণী—

ওর ঠাকুমা উত্তর দেয়নি, শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—দুর্গাপুরের জঙ্গলগুলো গেলো কোথায়—

কেটে ফেলেছে, কত কারখানা হয়েছে, ঠ্যাঙ্গাড়েরা পালিয়েছে, কিন্তু আমি যে শুনতে পাচ্ছি কান্না, ঐ শালপিয়াল মহুয়াদের কাঁদচে, আর ওগুলো কী—

ঐ তো ইস্পাতের কারখানা, আর ঐটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র,—ওখানে তৈয়ারী হয় ভারী ভারী যন্ত্রপাতি, আর তার পাশে ঐ তো বিলিতী বয়লার ওয়ালাদেরকারখানা—

থাম্ বক্ বক্ করিস্নি—

কেন?

হবো ত সবই, কিন্তু আমার যা গেলো তা আর ফিরলো না—মনে হলো ঠাকুমা যেন বলছেন সেই আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই—

ষাট বছর আগে চলে গেছেন তিনি—এক তন্বঙ্গী ষোড়শী চুপি চুপি অপেক্ষা করছে রাতের গভীরে দুটি বলিষ্ঠ বাহুর আকর্ষণের জন্য—ঝড়ের রাতের অভিসারে সে পেরিয়ে আসছিল দামোদরের একটা বাঁক, হঠাৎ হড়পা বান ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই নওল কিশোরটিকে—কিশোরীভজন্ কিশোরীপূজন আর হলো না। দুপক্ষের বাপের মধ্যে দেনাপাওনা নিয়ে হয়েছিল রেষারেষি—সোমত্ত মেয়েকে পাঠাতে চায়নি তার বাপ ঘরবসতের জন্য, কিন্তু তোখড় সুমন্ত স্বাদু ফললাভের আশায় নদী পেরিয়ে ঘুর ঘুর করতো আড়ালে আবডালে, রাতের অন্ধকারে। সুযোগসুবিধে পেলে তার আশা দুরাশা হোতনা। পেটে এসেছিল একটা ছেলে—আঁতুড়ই চলে যায়—সন্ত মাতৃহীন আমার বাবা ওঁরই ভরা বুকের অমৃত পান করে বড় হ'ন সে কথা পূর্বেই বলেছি—

তারপর—

তারপর আর কী, কানে দিন তুলো, পিঠে দিন কুলো—

আপনি নিশ্চয়ই গল্প লেখেন, কেমন তরতর করে বলে যাচ্ছেন, ভারী ভালো লাগছে—

আর আপনি চন্দ্রবংশী কবি, পিদিম জ্বেলে বসে আছেন,—কিন্তু সভ্যতার পিলসুজ বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে—আজকাল ঐ ছোট্ট স্নিগ্ধ আলোতে আর চলেনা, চাই শৈলদলন লৌহগলন শক্তি, দশ হাজার ভোল্টের আলো—আজকে আণবিক যুগ—

কিন্তু মানবিক সত্তাকে ছাড়িয়ে নয়—

ও সব ভাঁপসা ভাবের কথা রেখে দিন, খেয়ে পরে বাঁচতে দিন, য এতদ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—অন্নই এখন অমৃত, অন্নই ব্রহ্ম!'

আপনার মুখে সংস্কৃত—

কেন শিরোমণি সার্বভৌমদের বংশধররা কি এতই বাজে। আমি মনে করছিলাম যে আপনি শুধু ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডেই বাস করেন, ট্রাঙ্কুইলাইজার খান, এগেক্রাইনকে শায়েস্তা করেন,—চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং বলে চন্দ্রাহত হননা—বরং পাড়ি দেন ঐ চাঁদমামাদের রাজত্বেই—

আর চন্দ্রাননীদের দেখে কি কবি, 'জীবনমরণ সীমানা পারায়ে, বন্ধু আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে' না বলি 'বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা।'

দুজনের মাঝখানে হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে আসে। কণ্ঠস্বরে গদ্যের বদলে পদ্যের রং, একটা ক্ষুধিত আত্মার অবরুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। অবদুর বড়ো দূ কঁহা লেআ খিঁইহয়া, গঙ্গাকে কিনারে যো লগা দে মৌর নৈয়া।

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সুদূর, বিপুল সুদূরের ডাক আমি ব্যাকুল বাঁশীতে শুনেছি। এবার পেয়েছি তার অতল জলের আকুল আহ্বান নয়, কর্ণকুহর দিয়ে মর্মে পশেছে তার অনন্ত অন্তরীক্ষের আহ্বান। নিজের ডানা নেই সত্য কিন্তু এবার ধূম্রপুচ্ছ দানব যন্ত্রপক্ষীর ডানায় ভর ক'রেছি। নিত্য নিয়মের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে ধূমকেতুর মতো বেরিয়ে এলাম অজানা, অচেনা অসমের আহ্বানে, যেখানে নবনব পরীক্ষা নিরীক্ষার বিপুল যজ্ঞশালা বসেছে। সেখানে চলেছে জ্ঞানের নব সমুদ্রমন্থন—কখনো উঠছে অমৃত ভাণ্ড, কখনও বা উগ্র হলাহল; লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা তো আছেই। কোথাও সৃষ্টি হ'চ্ছে সংহারের শত শত আয়ুধ, কোথাও বা আর্ত ও পীড়িতের দুঃখ ও যন্ত্রণা নিরসনের কত নব নব যুগান্তকারী আবিষ্কার।

কত অজানাকে জানতে চলেছি, কত অচেনাকে চিনতে চ'লেছি কত দূরদেশীকে নিকট করতে চলেছি এই পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প-সমৃদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, বাণিজ্য-বিভবের স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে। কালের-যাত্রার পথে এইসব উন্নতিশীল সুপ্রসিদ্ধ নগরীর উপর দিয়ে কত যে পরিবর্তনের লীলা ব'য়ে গেছে তা' চাক্ষুষ করার সুবর্ণ সুযোগ আজ আমার দুয়ারের প্রান্তে এসে উপস্থিত। সাড়া আমায় দিতেই হ'ল।

বিদেশীমুদ্রার অর্থনৈতিক দুর্যোগের দুঃখময় দিনে নিজ ব্যয়ে ভারতের বাইরে বর্তমানে সাধারণের পক্ষে যাওয়া শুধু সুকঠিন সমস্যা নয়, একেবারে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয়না। প্রথমে প্রবাস পত্র, আয়কর বিমুক্তি পত্র, রিজার্ভ ব্যাংকের ছাড়পত্র, বিভিন্ন দেশে প্রবেশ পত্র, বিদেশীমুদ্রা সংগ্রহ প্রভৃতি নানা জটিল করণ-কারণের বিস্তৃত দীর্ঘ কালাপহারী ব্যাপার। এবারে জাতীয় সংস্কার আমায় সেই দীর্ঘায়িত, বিরক্তি ব্যঞ্জক, কালক্ষয়ী পদ্ধতি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবার 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার' 'ফেলো' নির্বাচিত হওয়ায় এই বিভ্রান্তিকর, অশান্তিময়, উষ্মা-উদ্দীপক প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছি। ফরম্ সই করবার সাতদিনের মধ্যেই রেজেষ্ট্রী ক'রে বাড়ীতে এসে গেল সাদা মলাটের ছ'মাস আয়ুর সরকারী প্রবাসপত্র (Official Passport)। তাতে অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ইটালী, গ্রীস, মিশর, লিবিয়া, ইরাণ, ইরাক এবং পরে মেক্সিকোর নাম ঢোকানো ছিল। আয়কর, বিক্রয়কর প্রভৃতির দায়মুক্তির প্রমাণপত্রের এমনকি রিজার্ভ ব্যাংকের ছাড়পত্রের আর প্রয়োজন হ'লনা। সামান্য কিছু সময় ব্যয় হ'য়েছিল ফিলিপিনোর প্রবেশপত্র নিতে ও আধঘণ্টা মার্কিন দৌত্যাধিকরণে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট-ব্রিটেনের প্রবেশপত্রের (VISA) প্রয়োজন নেই। মার্কিন দূতস্থান থেকে পৌনপুনিক আগম-নির্গমের ছাড়পত্র নেওয়া হ'য়েছিল, যেটির প্রয়োজন অত্যধিক। এটির অভাবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মার্কিন দেশ থেকে কেউ যদি মেক্সিকো কি কানাডা, কি দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকদিনের জন্যেও যান এবং যদি তাঁর পুনঃ প্রবেশের নির্দেশপত্র না থাকে তখন তাঁর আর মার্কিন মুলুকে প্রবেশ করা চলবে না। অনুরূপ পরিবেশের সম্মুখীন যাতে হ'তে না হয় তাই এই উদ্যোগপর্ব ও ব্যবস্থা।

বৃহত্তর কলিকাতা মহানগরী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের নানা দেশের নানা পেশার বিদেশীদের সংগে, বিশেষ ক'রে বিদেশী উপদেষ্টামণ্ডলীর সংগে পরিচয় থাকায় আমার দর্শনীয় স্থানে তাঁদের বন্ধুবান্ধব বহুজনের সংগে মিলিত হবার সুযোগ এবং পরিদর্শন পর্ব সাবলীল, সুখময়, ও প্রীতিপ্রদ ক'রে তোলা সম্ভব হ'য়েছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশে আমার টিকিট কেটে দেবার ভার

প'ড়েছিল 'আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর' নির্দেশে 'এয়ার ফ্রান্সের' কর্মীদের হাতে ও পরিব্রাজন চেক (Traveller's Cheque) দেবার ভার পড়েছিল আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর ওপর।

এয়ার ফ্রান্সের লোক দেখা করতে আসায় আমার সদ্য মার্কিন প্রত্যাগত তরুণ বন্ধুদের অভিজ্ঞতার সুযোগ নিতে পরাঙ্মুখ হইনি। আমার যাবার কথা ম্যানিলা হ'য়ে সিডনি। পথে ব্যাংকক্, সায়গন পড়বে কিন্তু তাদের শুভার্থক দুষ্টবুদ্ধিতে তাকে বললাম, 'Round the World Ticket এ দেখুন দিকি 'টোকিও' হ'য়ে নিয়ে যেতে পারেন কি না?'

এয়ার ফ্রান্সের প্রতিনিধি বললেন, 'আপনার পৃথিবী-পাক দেওয়া টিকিট, আপনি শতকরা যে উপরি মাইল পাবেন তাতে টোকিও যাওয়া সম্ভব নয়। আরও কিছু খরচ আপনাকে করতে হবে। বরঞ্চ আপনাকে ব্যাংককে একদিন থাকার বন্দোবস্ত করছি।'

—'আমি কিন্তু হনলুলু ও প্যারিসে দু'একদিন ক'রে থাকতে চাই।'

জানেন তো আমেরিকায় বিমান কোম্পানীর খরচায় আমেরিকার কোন সহরে থাকা সম্ভব নয়। ওদের নিয়মই এই। কি ন্যাশনাল এয়ারলাইন, কি ইউনাইটেড এয়ারলাইন, কি প্যান আমেরিকান, কি ট্রান্স ওয়ার্লড্ এয়ারওয়েজ যে কোন কোম্পানীর বিমানপথে আপনার গন্তব্যস্থানে চলে যেতে পারেন, সেখানে কোন বাধা নেই। যে-বিমান কোম্পানীর নামে লেখা আছে তাদের একটা ছাপ মেরে নিলেই গেল। বিশেষ বিমান কোম্পানীর বিমানের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।'

'জানলাম তো সব, এখন যা সম্ভব তারই ব্যবস্থা করুন।'

আগেরদিন পাঁচখানা বইএ সারা পথের টিকিটের খাতা দিয়ে গেলেন নন্দী সাহেব। শনিবার ৯ই এপ্রিল ১৯৬৬ সাল আতভোরে উঠে দলবল বেঁধে বিমানবন্দরে এসে হাজির। বিদায় দিতে এসেছিলেন আসানসোল থেকে ভায়া, বালিগঞ্জ থেকে গৌরদেব (মুখোপাধ্যায়), গৃহিনীসহ ডাক্তার নারায়ণবাবু, খড়দহ থেকে কিশোর-কালের বন্ধু হিরন্ময় (গুপ্ত), বেংগল ক্লাব থেকে কর্ণেল পিয়ার্স ও যোগ দম্পতি, রাজা লেন থেকে সকলকে নিয়ে পিনাকী (গাংগুলি) ও মীরা ও বাড়ী থেকে জননী, গৃহিণী, পুত্র, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, উমাপদ, 'মৌরলা' (মুখুজ্জে) ওরফে মনোজকুমার। পথে উঠলেন সুরেন নিয়োগী ও অন্য সকলে। কাস্টমসের বেড়ার মধ্যে কাগজপত্র দেখিয়ে যখন এলাম তখন আমার স্ত্রীকেই শুধু গণ্ডির ভেতরে যাবার অনুমতি ক'রে নিয়ে এলেন আমাদের পরিচিত বিমান বন্দরের এক কর্মী।

সকলের কাছে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে উঠলাম জাপান এয়ার লাইন্স্ (JAL)এর বিমানে। সামান্য পেটিকোটপরা জাপবিমান সেবিকা অভ্যর্থনা ক'রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ধূমপুচ্ছ বিমানের কক্ষের ভিতরে নিলেন। সীটে বসতেই থাপে মোড়া জাপানী হাতপাখা ও জাপান এয়ার লাইন্সের শক্ত মলাট দেওয়া মানচিত্র সহ বহু প্রচার-পুস্তক দিলেন। ঠিক সকাল আটটায় ছেড়ে ঘণ্টা দুয়েক চলার পর আমরা এলাম শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাংককে। ব্যাংককে গোটা চারেক কুপন আমার হাতে দিয়ে দিল বিমানবন্দরের মহিলা তদারককারিণী। একটিতে বিমানবন্দরের থেকে হোটেলে যাওয়ার মোটর ভাড়ার, অপরটি হোটেলে থাকা ও খাওয়ার টিকেট। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ এয়ার ফ্রান্সের বিমানে ম্যানিলা যাওয়া।

ব্যাংকক

ব্যাংককে আমার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার অধিবাস।

আমায় 'কিংস্ হোটেলে' পৌঁছে দিয়ে আর দুজন সহযাত্রী নিয়ে মোটর অন্য হোটেলের দিকে চ'লে গেল। 'ডন মুয়াং' আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সহরে যাবার পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দমদম্ সুপার হাইওয়ের কথা মনে হ'ল। দীর্ঘ তিরিশ কিলোমিটার কংক্রিটের পথ আসতে আধঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগলো। রাস্তাটি পাশের জমির মাটি কেটে উঁচু ক'রে তৈরী করায় একপাশে বেশ চওড়া খাদের মত হ'য়েছে। এতে বৃষ্টির জলও বেরিয়ে যায়। ডানদিকে রেললাইন (রয়াল থাই রেলপথ) চ'লে গেছে পেনাং ও সিংগাপুরে। কংক্রিটের রাস্তা ব'লে ঢেউ খেলানো ভাব না থাকায় গাড়ী লাফায় না,

নগর পরিখা—ব্যাংকক

বরং চলে দ্রুত। রাস্তা চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউএর চেয়ে বেশী চওড়া। পাশের দীর্ঘ দীঘির জলে ফুটেছে রক্ত ও শ্বেত শতদল। সেই জলে ভেসে রয়েছে হংস মিথুন। হয়তো তারা পদ্মকোরকের অ ঘ্রাণে ব্যস্ত, হয়তো কোন বিরহিণী শ্যাম তুহিতা ঐ মরাল গ্র বার পেলব পরশ পাচ্ছে। রাস্তা থেকে দূরে গ'ড়ে উঠেছে বহু বাড়ী। কলকারখানাও গ'ড়ে উঠেছে। পথে বেশ গরম বোধ হ'তে লাগলো। প্যাগলিয়োথন রোড—এসে মিশেছে 'বিজ গুস্তে', 'রাজবীথি-রাস্তা'র সংগে। যাকে বলা হয় সাধারণভাবে রাজপথ। কালিদাস হ'লে লিখতেন 'নরপতি পথ', ইংরাজীতে যা 'কিংস্ ওয়ে'। সংস্কৃতে—'বীথি' মানেই রাস্তা। যাই হোক এটা 'রাজবীথি রোড'। রাজবীথি রোড পার হ'য়ে ফায়াথ ট রোড ধ'রে চললাম দক্ষিণমুখো। আর একটি চওড়া রাস্তা 'রাম রোড' পার হ'য়ে এলাম। ঐ রাম রোডের পূর্বাঞ্চলের নাম 'প্রায়েনচিৎ' বা 'পলায়ন চিৎ' রোড ও 'সুখাম্ভিৎ' রোড। এই 'ফাই ফাই' রোড এসে মিলেছে 'রাম IV রোডে'। 'রাম IV রোড' ধ'রে পূর্বমুখে গেলেই পড়বে স্যাটর্ণ রোড; মোড়ের কাছেই "কিংস্ হোটেল'। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ২৩১ নম্বর ঘরে আমার একদিনের বাস নির্দিষ্ট হ'ল। দুপুরে একটি Sight Seeing পার্টিতে যাবার ইচ্ছা হোটেলের ম্যানেজারের কাছে প্রকাশ ক'রলাম।

হোটেলের সংলগ্ন SINCERE TRAVEL SERVICEএর অফিস। এদের নানা রকমের 'টুর' আছে। কম ক'রে বারো রকমের। আমি ও একটি হাওয়াই দ্বীপের ভদ্রলোক দুজনে মিলে BEST BUDDHIST TEMPLE এই ভ্রমণ পর্বই পছন্দ ক'রলাম। দুপুরের খাওয়া চুকয়ে উঠতে যাই, সময় হ'য়ে গেল প্রায় ১টা বেজে ৪০ মিনিট। বিমান তো নেমেছিল কলকাতার সময় দশটা অর্থাৎ 'থাইল্যাণ্ডের' সময়ে বারোটায়। শুল্ক বিভাগের ছাড় করিয়ে আসতে প্রায় পৌনে একটা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটু 'কাক-স্নান' সমাধা করে আহারাদিপর্ব সেরে নিলাম। হোটেলের অফিসের সংলগ্ন আহার গৃহ। তবে এখানে নানা রকমের পানীয়ই চলে বেশী। আহারে একটি মুর্গীর রোষ্ট, তার সংগে কড়াইশুঁটি, গাজর সিদ্ধ ও আলুভাজা নিলাম। পরে কলা চিরে তার ওপর তিন রকমের আইসক্রীমের বল—একটি ভ্যানিলা, একটি র‍্যাস্প্বেরী এবং অপরটি চকোলট।

কিন্তু হোটেল থেকে ট্যাক্সি ট্যাক্সিতে আমাদের দুজনকে নিয়ে স্যাটর্ণ রোড ছাড়িয়ে 'রাম রোড IV' ধরে পশ্চিমমুখো ব্যাংকক রেল ষ্টেশনের দিকে চললাম। এই পরিদর্শনপর্বের মূল্য সাড়ে তিন (৩॥০) ডলার অর্থাৎ সত্তর বাহৎ বা ভাত। আমার স্ত্রী বিমান বন্দরে দুখানা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। তা' ভাঙিয়ে সত্তর বাহৎ দেওয়ার পরও পকেট কিছু উদ্বৃত্ত রইল। রেল ষ্টেশন ছাড়িয়ে 'ওয়াট ত্রিমূর্তি'র মন্দির ডাইনে রেখে 'যুবরাজ রোড' ধরে চললাম মূল প্রাচীন সহরের দিকে। 'মীনম ছাও' নদী এখানে হাঁসুলি বাঁকের মত বেঁকেছে। রাজপ্রাসাদটী এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি নদী মেখলার কুক্ষিতে। রাজ প্রাসাদ ও সংলগ্ন অঞ্চলকে আবেষ্টন করে পর পর তিনটী পরিখা খোঁড়া হ'য়েছিল। প্রাচীন কালে নগরীর শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করায় এই রকম পরিখা খননের পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ একটী পরিখাই নগরী বেষ্টন করে থাকতো। এখানে তিনটী আবেষ্টনী পরিখা। পরিখাগুলো মূল নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন পরিখাটী অল্প প্রশস্ত কিন্তু দূরের পরিখাগুলি অধিকতর প্রশস্ত। শেষ পরিখাটী স্যট হর্ন রোডের মাঝ-খান দিয়ে চলে গেছে। এই পরিখাগুলির অপর প্রয়োজ-

নীচতো হল বর্ষার জল নিষ্কাশন। পরিখার দু পাশ কোথাও ঢালে মাটী কাটা, কোথাও বা পাকা পাঁচিল তোলা। এতে দু পাশের রাস্তা বিশেষ চওড়া হয়েছে। সেখানে ফুট পাত তৈরি করা হয়েছে। কোথাও রেলিং দেওয়া। ঐ পরিখার পড়ে বসে বকা ছেলেরা ছিপে পুটী, ল্যাটা মাছ ধরছে।

ব্যাংকক সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু; অন্ততঃ নদীর জোয়ারের জলের উচ্চতা থেকে তো বটেই। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রথম পরিখার মধ্যেই। আমরা প্রথমেই এলাম যুবরাজ রোডের মোড়ে ওয়াট ত্রিমিত অর্থাৎ ত্রি-মিত্রের মন্দির। ত্রিমিত অর্থে ত্রি-মিত্র অর্থাৎ তিন বন্ধু। আগে এই মন্দিরকে বলা হত সাম চীনে অর্থাৎ তিন জন চৈনিক। ১৯১৪ সালে এক অদ্ভুত আবিষ্কার হয়। শ্যাম দেশ নানা সময়ে নানা প্রতিবেশী শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রতিরোধ করার জন্য দেবমূর্তিগুলিকে সিমেণ্ট ও স্টাকোর প্রলেপ দিয়ে গোপন রাখা হত। এমনি এক প্রলেপ লাগানো বুদ্ধমূর্তি শ্যামরাজ্যের অযোধ্যা থেকে এনে ব্যাংককে নদীর পশ্চিম তীরে রাখা হয়েছিল। এই প্রলেপ লাগানো মূর্তির কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছিল। নদীর ধারের ঐ জমিটা করাত কল বসানোর জন্য ইংরেজরা দেওয়ায় মূর্তিটিকে সরানোর প্রয়োজন হয়। 'ওয়াট ত্রিমিতে'র ব্যবস্থাপকেরা ত্রিমিতের মন্দিরের সংলগ্ন খালি জায়গাতে ঐ মূর্তি গ্রহণ করতে ও তার উপর মন্দির তৈরি করে দিতে রাজী হন। ঐ বিরাট ভারী মূর্তি-

স্বর্ণ বুদ্ধ—ব্যাংকক
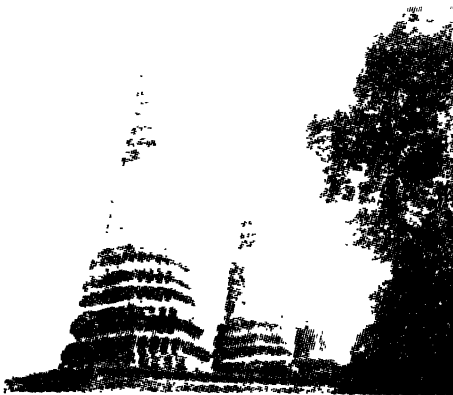
টীকে সরানোর সময় সিমেণ্টের চটা ওঠে যেতে দেবতার সোনার অঙ্গ বেরিয়ে পড়ে—সত্যই 'টনটনে কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' এর ওজন সাড়ে পাঁচ টন অর্থাৎ ভরিতে ৫'৫×২২৪০×৮০×৭০/১০০=৪৮ লক্ষ ভরি। এই বুদ্ধ মূর্তটী 'সুখথাই যুগের। মনে হয় সাতশো বছরের বেশী পুরাণো। বর্মা ও কম্বোজরাজ্য শ্যামদেশকে আক্রমণ ও পরিশেষে লুণ্ঠনের আশঙ্কায় এমনি বহু মূল্যবান বুদ্ধ মূর্তি নানা ভাবে গোপন রাখা হয়েছিল তার হিসেব কেউ রাখে। এমনি করেই হয়তো বহু দিন মাটী চাপা রাখা হয়েছিল যবদ্বীপের 'বড় বুদুরের' মন্দির ও ভস্বর্থকে। এই হেম বুদ্ধ মূর্তিকে দোতলায় বসানো হয়েছে।

শ্যামরাজ্য পাঠিয়েছিল চীনদেশে রেশম বস্ত্র ও স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতব অলংকার ও আভরণ। তার বদলে ফিরে পেয়েছিল পাথরের বহু বুদ্ধ ও নানা দেব দেবীর মূর্তি জাহাজের খোল বোঝাই করবার জন্য। বর্তমানে দু' লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও ঘন বনাকীর্ণ শ্যাম-দেশে ৩১০ তিনশো দশ লক্ষ লোক বাস করে। এর মধ্যে চীনে চল্লিশ লক্ষ। শ্যাম উত্তর দক্ষিণে এক হাজার মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫০০ মাইল বিস্তৃত। এখানের তাপ মাত্রা ৬৮° থেকে ১৮২° এর মধ্যে থাকে। এটী ৫ থেকে ২৫ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এর সমুদ্র কূল রেখার দৈর্ঘ্য তেরো শো মাইল (১৩০০)। বর্তমান রাজাদের নামে আজও রাম নাম চালু। শ্যামদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল অযো-ধ্যায়—উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় নয়।

মন্দির চূড়া—ব্যাংকক

এর পর আমরা এলাম 'ওয়াটপো'র মন্দিরে। এটা রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে। 'সণম্ ছাই রোড' থেকে 'সোয়াই ওয়াট পো' নামের গলি রাস্তা দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। প্রবেশ পথ যোলটী; মাত্র একটী-দুটী ছাড, সবই তালা বন্ধ। এ অঞ্চলে দর্শনীয় কেন্দ্র হ'ল তিনটী। মুখ্য মন্দির ও প্রদর্শশালা, চার মহাছেদী ও শায়িত বুদ্ধ। সূচ্যগ্র মন্দিরচূড়া নীলাম্বর ছেদ করতে চলেছে ব'লে এরা হ'ল 'ছেদী'। চূড়াগুলি মনোরম কারুকার্য খচিত। চারটী প্রধান মন্দির চারটী বিগত রাজার স্মৃতির প্রতীক। সবুজ রংয়ের ছেদীটী নির্মাণ করান প্রথম রাম, সাদা ও হলদে রংয়ের ছেদী দুটী তৃতীয় রাম ও নীলরংয়ের ছে'দটী চতুর্থ রামের কীর্তি।

মূল মন্দিরটি এক বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে। প্রাঙ্গণের আবেষ্টনী ঢাকা বারান্দায় তিনশো চুয়ানব্বইটী নানা আকৃতির বুদ্ধমূর্তি সাজানো রয়েছে। মন্দিরের উপপীঠে রামায়ণের কাহিনী শিলাঙ্কিত। এগুলি অযোধ্যার ধ্বংস স্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল। প্রাচীন রাজধানী যখন বর্মীরা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ ধ্বংস করে তখন কি ভেবেছিল যে বর্মার প্যাগোডা ইংরেজ বর্মা দখল ক'রে তুলে আনবে। রামায়ণের কাহিনী প্রকাশিত মূর্তিগুলির উপর কাঠ কয়লা ঘ'সে ঘুড়ির কাগজের মত পাতলা হাতে-তৈরি কাগজে ছাপ তুলে বিক্রী করছে। সুন্দর এ মন্দিরের ভাস্কর্য অতীব মনোমুগ্ধকর। মেঝে শ্বেত পাথরের। সারা দেওয়ালের গা বুদ্ধ জীবনের কাহিনীতে ভরা। দেবতার বেদীতে স্বর্ণাভ ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি।

পশ্চিমের প্রাঙ্গণ দিয়ে একটু গেলেই অর্ধশায়িত বুদ্ধ-মূর্তি: ইলোরার গুহায় জীবন্ত পাথর বেটে অর্ধশায়িত বুদ্ধমূর্তির অনুরূপ এক মূর্তি গঠিত। এখানে গঠন দ্রব্য, শিলার বদলে ইট পাথর চুন সুরকি ও সিমেন্ট। একশো ষাট ফুট (১৬০ ফুট) লম্বা ও উনত্রিশ ফুট চার ইঞ্চি (২৯⅓ ফুট) উঁচু মূর্তিটির উপরে পলস্তরা করা। ঐ পলস্তারার ওপর পাতলা সোনার পাতমোড়া, কয়েক জায়গায় মাত্র পাত খসে গেছে। শায়িত বুদ্ধের সমান পায়ের তলায় একশো আটটি (১০৮) শুভচিহ্ন আসল মুক্তো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই বিরাট মূল বুদ্ধ মূর্তিটি প্রস্তুতের পর এক বিরাট মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। বিরাট চওড়া চওড়া দেওয়াল ও বৃহৎ থামের উপর ছাদ ধরা।

এ ছাড়া দেখার বহু "ওয়াট" বা মন্দির রয়েছে, যেমন 'ওয়াট রাজাপ্রদিষ্ট', 'ওয়াট মহাথাও', 'ওয়াট রাজানন্দা', 'ওয়াট রাজারোপিত', ওয়াট বেণছমারোপীত (শ্বেতপাথরের মন্দির), ওয়াট সুতাত ও সুমিং, ওয়াট স্রাকেত, ওয়াট ইন্দ্র বিহারন, ওয়াট জানাওং, ওয়াট বোভোনিভস্, ওয়াট অরুণ (বা উষার মন্দির), ওয়াট কল্যাণমিত। এ ছাড়া রয়েছে রাজপ্রাসাদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় প্রদর্শশালা, শিল্পকর্ণ থিয়েটার, সিংহ দরবার।

জলকেলি উৎসব।

গ্রীষ্মে এখানের 'জলকেলি' উৎসবে বড়ই আনন্দমুখর হ'য়ে ওঠে সারা দেশটা, আমাদের দেশের হোলিখেলার মত। চিয়া মাইে সংক্রাণে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিতে চলে 'জল উৎসবে'র হুল্লোড়। কিম্বদন্তী আছে এপ্রিলে প্যারিসে থাকা মানে প্রেম, পর্তুগালে থাকা হ'ল রোমান্স, ওয়াশিংটনে চেরী পুষ্পোদ্গম দর্শনে পুলক, আর শ্যামদেশে হ'ল জলকেলি উৎসব। যে কেউ ঘটী, বাটী, ঘড়া ও পিচকিরি থেকে যার খুশি তার গায়ে জল ছিটিয়ে দেবে। পাঁচদিন ধ'রে এই উৎসব চলে। এত গরমে গায়ে একটু জল দিলইবা। নদীতে সুন্দরী শ্যামা যুবতীরা যখন স্নানে ব্যস্ত সেইসময় ভিজে পাতলুম নিয়ে জলে নেমে ওদের কাছে যান ও তাদের হাতের চুপড়ি নিয়ে গায়ে জল দিন ওরা কিছু বলবে না, শুধু হাসবে—এ যে সংক্রান্তি উৎসব। বোধহয় জলবিষুব সংক্রান্তির উৎসব। ওদের ঠুনকো সতীপণা নেই এই রক্ষে নইলে জানিনা কোন নীতিবিদ দর্শকের মনে—

'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।'

ভাবের উদয় হ'ত কিনা?

এখানে বহু 'নাইট ক্লাব', 'ককটেল বার', 'ক্লাব', 'রেস্তোরাঁ' রয়েছে। এমনকি মোগাম চাঁদ এণ্ড সন্সের বাঙালী রসগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া প্রভৃতি মিষ্টিও পাওয়া যায়, যা খোদ বাংলার কলকাতা মহানগরী থেকে উঠে গেছে। 'জলকেলি'র পর আসবে 'ওয়াট পোর' মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে সুরু হ'য়ে এক সপ্তাহ ধ'রে চলবে।

এখানে গায়ে জল ছেটানোর হাল্কা তামাসার চেয়ে শিল্পসংস্কৃতির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরকে পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পকর্ণের ছাত্র ও শিক্ষকেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ছবি দেন। শ্যামদেশীয় নৃত্যের জন্য সামান্য দর্শনী আছে।

শ্যামের খ্যাতি শ্বেতহস্তীর জন্য। ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংরিজিতে একটা প্রবাদ ছিল 'সাদা হাতী পোষা' মানে বহু অর্থ ব্যয়ে সাদা চামড়ার সাহেবদের রাখা বোঝাতো। যারা অপদার্থ তাদের বহুমূল্যে রাখার নাম 'শ্বেতহস্তী পোষা' বলতো।

প্রায় সন্ধ্যে পাঁচটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। মোটর চওড়া রাস্তা দিয়ে আশী থেকে একশো কিলোমিটার ঘণ্টায় চলায় পথের দুধারের বহু দর্শনীয় বস্তুর ছাপ ভাল ক'রে মনে বসে না। সামান্য উদ্বৃত্ত শ্যামদেশী মুদ্রা নিয়ে বাসে ক'রে সন্ধ্যায় নদীর ধারে ঘুরে এলাম। নদীর ধারে রামকৃষ্ণপুরের পাটকলের জেটীর মত কাঠের পাটাতন পাতা জেটি। সূর্যাস্তের চঞ্চল নদীর শোভা এক কর্মমুখরতারই আমেজ আনে। ষ্টীমলঞ্চগুলো নিয়তই তিন, চার পাঁচখানা মালবোঝাই গাধাবোট টেনে নিয়ে চলেছে। সবই চলেছে ক্ষিপ্রগতিতে। নদীর কাছে রাস্তার ধারে বহু খাবার দোকান ও নানা পণ্যের বিপণি। রাস্তার ধারে ও চাতালে টেবিল চেয়ার পাতা। সেখানে দোকানী খদ্দেরদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করছে। খোলা ফুটপাতে কোথাও বা হোটেল বসিয়েছে। মোটরগুলি সবই নতুন। শেভ্রোলে, ফিয়েট ও মার্কিন গাড়ী। হলদে প্লেটের ওপর কালো হরফে লেখা হ'লে বুঝতে হবে ট্যাক্সি। সাদা প্লেটের ওপর কাল রং দিয়ে নম্বর লেখা হ'লে বুঝতে হ'বে এগুলি প্রাইভেট গাড়ী। নম্বর ইংরিজিতে লেখা। ফেরার পথে খানিকটা হেঁটে এসে বসলাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জে। সেখানে টেলিভিশন চলেছে। টেলিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারই বেশী। মাঝে মাঝে বক্সিং খেলার ছবি, কখন বা সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। শোবার ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকায় নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নি। ঘুমের আগে রাতের আহার 'সীতাপতি বিহঙ্গে'র ঝোল ও অন্ন গ্রহণ করলাম। এখানের রান্না কেরালার ধরণে। সবেতেই কিছু না কিছু নারকোল দেওয়া। ভাত মাঝারি ধরণের। এখানের বাসমতী চালের মত নয়। সেইজন্য সাদাসিধে আলু ভাজা নিলাম। সবশেষে লম্বা বড় চেরা কলার ওপর তিন রকমের আইসক্রীম বল দেওয়া 'ডেসার্ট' নিলাম।

প্রথম যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভোর সাড়ে চারটে। আবার শুয়ে পড়লাম চাদর মুড়ি দিয়ে আর বন্ধ ক'রে দিলাম এয়ার কণ্ডিশনারটা ও রেডিও। ভোর পাঁচটায় উঠে লেখা সুরু হ'ল। ভোর সাড়ে ছ'টায় প্রাতঃকৃত্য শেষ করে প্রাতঃভ্রমণে বেরুলাম। পায়ে হেঁটে ভোরের ব্যাংকক দেখে এলাম। ভোর থেকে ট্যাক্সি অনবরত ছোটাছুটি করছে। সকালে চা কফি ও জলখাবারের দোকান খুলেছে। হোটেলে ফিরে স্নানপর্ব সেরে প্রাতরাশ হোটেলের সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় সেরে নিলাম। ঘরে ফিরে ব্যাগটা গুছিয়ে নিলাম। খানিকক্ষণ লেখা চলেছে এমন সময় টেলিফোন এল বিমান বন্দরে যাবার গাড়ী নিতে এসেছে। ব্যাগে তালা দিয়ে ট্যাক্সিতে চ'ড়ে বিমান বন্দরে এলাম। বলে "কুলি ভাড়া দিতে হবে।"

বললাম "দেবে বিমান কোম্পানী, যারা আমায় এখানে রেখেছে।"

এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টারে আসতে ভদ্রমহিলা বললেন যে আমাকে কুড়ি বাহাত দিতে হবে।

আমি বললাম—"কোম্পানী থেকে দিক, আমি কেন দোবো। আমি তো থাকতে চাইনি।"

—"নাঃ, এটা থাই সরকারের প্রাপ্য। বিমানবন্দরের শুল্ক।" কী আর করি। দশ ডলারের 'পরিব্রাজন চেক্' ভাঙিয়ে ২০ বাহাত অর্থাৎ এক ডলারের কাছাকাছি মূল্য দিলাম। পাশপোর্টের ওপর ছাপ মারা পর্ব সেরে লাউঞ্জে বসলাম।

পৌনে দশটায় লাউঞ্জ থেকে বাসে চ'ড়ে বিমানের কাছে এসে এয়ার ফ্রান্সের বিমানে উঠলাম। এটি বোয়িং সাতশো সাত ধূম্রপুচ্ছ বিমান। বেলা দশটা বারতেই বিমান ছাড়লো। সাঁ-সাঁ ক'রে বিমান উঠে পড়ল পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে। নীচে দেখা যায় জমি, নদী আর খাল। রাস্তার দুধারে গাঁ ও বসতি গ'ড়ে উঠেছে। জমির সীমানা সরলরেখা দিয়ে বিভক্ত, আমাদের দেশের মত আঁকাবাঁকা নয়। সমান্তরাল খেতের

মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে খাল ও তার উপখাল। দেখতে দেখতে এ দৃশ্য আর দেখা গেলনা। মেঘের স্তর কাটিয়ে আমাদের বিমান ওপরে উঠতে লাগলো। সাদা অলক মেঘ পেঁজা তুলোর মত তলায় ছড়ানো। এদের পৃথিবীর উপর থেকে দেখি আকাশে ভাসছে। এবার বিমান থেকে দেখছি কোন এক রাবণ-অপহৃতা সীতা আভরণের বদলে পেঁজা তুলো সারা পথটাই ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেছেন। কখন মনে হয় নীচে মেঘের পাহাড় সূর্যকিরণপাতে উজ্জ্বল ও শুভ্রতররূপ ধরেছে।

আমাদের প্রথম তেল নেওয়ার বিরতি হবে 'সায়গনে'।

বিমান এবার নামতে সুরু করেছে। মেঘের স্তরের কাছে প্রায় এসে পড়লো। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কর্মমুখর ধরণী—তার রাস্তাঘাট, নদনদী, ঘরবাড়ী। বিমান নামবার ঝোঁকে বায়ুশূন্য স্থানে প'ড়ে গা শিরশিরিয়ে ওঠে। নীচে টিনের চালের বাড়ী রৌদ্রপাতে চক্‌চক্ ক'রে উঠছে। সায়গন নদীর উপর নৌকো ও ষ্টীমার চলছে। নদীর ধারে বিরাট বিরাট তৈলাধার।

আমাদের বিমান 'সায়গনে'র মাটী ছুঁলো। বিমান দাঁড় করানোর জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। সারা বিমান বন্দরের বিমানস্থিতি-অঞ্চল বিমানে ঠাসা। সবই প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের জঙ্গী ও বোমারু বিমান। বহু হেলিকপ্টার ও ছোট ছোট কত যে বিমান রয়েছে তা' কহতব্য নয়। প্রায় প্রতি মিনিটেই হয় বিমান উঠছে নয় নামছে। শব্দের ও গতির যেন বিরাম নেই। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের এটী অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সর্বদরবরাহের স্নায়ুকেন্দ্র সায়গন বিমানবন্দর। ব্যাংকক থেকে সায়গন আসতে সওয়া একঘণ্টা লাগল। বাইরে বেজায় গরম। তাপমাত্রা ৯৫°F. বিমানের চাকার হাওয়া পরীক্ষা ও তেল নেবার জন্য পৌনে একঘণ্টা বিরতি। যারা এখানে একেবারে নামবে বা বিমানবদলির জন্য নামবে তারাই আগে নেমে গেল। তারপর পায়ের ব্যথা ছাড়াতে যারা নামলো তাদের হাতে ভিয়েৎনামী বিমানসেবিকা একখানি ক'রে কার্ড ধরিয়ে দিল যেটির বিনিময়ে বিনামূল্যে ফলের রস বা কোকাকোলা প্রভৃতি পানীয় দেবে।

এবার বিমান ছাড়বে। বিমান-সেবিকাকে 'গো-মাংস ছাড়া অন্য যা কিছু আহার মধ্যাহ্ন ভোজে দিতে পারেন' অনুরোধ করায় বিমান-সেবিকা ফরাসীসুন্দরী জিগ্যেস করলেন—বিমানে ওঠার আগে কি আপনি একথা জানিয়েছিলেন?

—ভুলে গিয়েছিলাম। বলা হয়নি। তোমায় দেখে মনে পড়লো।

—'দেখি কি করতে পারি' বলে চলে গেলেন ও কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন—'হাঁস চলবে?'

—'চলবে। অশেষ ধন্যবাদ।'

দুপুরের আহার যখন পেলাম তখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ম্যানিলার দিকে উড়ে চলেছি। যেখানে মেঘ নেই, নীচে সেখানে নীলসমুদ্রের জল দেখা যায়। ফরাসীদের বহুরকমের আহারের পদের জন্য খ্যাতি। আহারাদি পূর্ণমাত্রায় করা গেল। ফলে ম্যানিলায় সামান্য আহারেই নৈশপর্ব শেষ করা সম্ভব হল। পাতে ফেলা আমার অভ্যাস নেই।

দেখতে দেখতে আমরা ব্যাংকক সময়ের সাড়ে তিনটে নাগাদ ফিলিপিনো দ্বীপের মাটি স্পর্শ করলাম। বিমান বন্দরে প্রবাসপত্রে ছাপ মেরে নিলাম। ম্যানিলা বিমান বন্দরে বিমান কোম্পানীর কোন গাড়ী নেই। আমেরিকান কায়দা এখান থেকেই সুরু। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর 'লিমোশীন' গাড়ীতে কয়েকজনের সঙ্গে 'বে ভিউ' (Bay view) হোটেলে নেমে একটি দশ ডলারের ট্রাভলার্স চেক ভাঙিয়ে ছ 'পেশো' ড্রাইভারকে ট্যাক্সি ভাড়া দিলাম। হোটেল বয়েরা আমার মালপত্র নিয়ে ওপরে চ'লে গেল। আমায় একটি যুগল শয্যার ঘর দিল, সেটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তখন ম্যানিলা সময় সাড়ে পাঁচটা। ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রক (Air Master) যন্ত্রটি চালিয়ে ঘর ঠাণ্ডা করতে দিয়ে পথে নেমে এলাম।

পাশেই এক গির্জা। আজ ইষ্টারের মধ্যের রবিবার। সারা গির্জার বাইরে ও ভেতরে আলোয় আলোকময়। সবাই শুধু প্রার্থনায় আসেন নি। তিনটি যুগল এসেছেন বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করতে ও নব যুগলজীবনের লৌকিক পর্বের শুভ সূত্রপাতে আশীর্বাদও নিতে।

[ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

ধৃতেশ্চ মহিম্নো'হস্য অস্মিন উপলব্ধেঃ (১৬)
ধৃতি অর্থাৎ বিধারণরূপ মহিমা উল্লেখ আছে
অতএব দেখো দহর কথায় পরমেশ্বর রাজে
তাঁহারি ত মহিমায়
উপলব্ধি যে হয়
শ্রুতিতেও দেখো দহর কথার বিষয়ে তা বলা হয়
পার্থক্য বোঝাতে বিধায়ক সেতু সকলের নিশ্চয়।
শ্রুতিতে আছে—
"অথ স আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ
এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"
পরমেশ্বর এই জগতের বিধায়ক নিশ্চয়
শ্রুতির মাঝেতে অন্যস্থানেও এই কথা জেন কয়
"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ
বৃহদারণ্যকে বলেন গার্গি শোন মোর কথা এই
অক্ষর নামে ব্রহ্ম আদেশে চলে জেন সব এই
চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হয়ে অবস্থান যে করে
তাঁহারি আদেশে তাঁহারি শাসনে আছে এ জগৎ ভরে
পুনশ্চ বৃহদারণ্যকে আছে—
এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ
ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম
সম্ভেদায়"
ইনি সকলের ঈশ্বর জেনো রক্ষক জেনো হয়
পালক হইয়া সকলের মাঝে সেতুরূপ ধরি রয়
মিশিয়া যেন না যায়
দহরও তেমনি হয়
পরমেশ্বরে লক্ষ্য করিয়া দহর শব্দ হয়
রক্ষক তিনি পালক তিনিই তিনিই সকলময়।
প্রসিদ্ধেশ্চ (১৭)
আকাশ শব্দে ব্রহ্ম প্রয়োগ প্রসিদ্ধ জেন হয়

দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ শ্রুতির মাঝেতে কয়
আকাশ দহর ক্ষুদ্র জানিও
ব্রহ্মের কথা কয় অহরহ
শ্রুতিতে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জেন হয়
ছান্দোগ্যেতে তাই এই কথা বুঝায়ে সবারে কয়।
(আকাশো বৈ নামরূপয়োর্ নির্ব্বাহিতা) ছান্দোগ্য
আকাশ নাম ও রূপের কর্ত্তা দুই জেনো এক হয়
নাম রূপ ছাড়া নতুন বস্তু কোন কিছু আর নয়।
সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব
সমুৎপাদ্যন্তে
ইহার অর্থ সকল প্রাণীই আকাশ হইতে হয়
আকাশই ব্রহ্ম ইহার দ্বারায় বোঝা যায় নিশ্চয়
জীব সে আকাশ নয়
বলা কোথা নাহি হয়।
ইতর—পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন অসম্ভবাৎ
ইতর শব্দে অন্য বস্তু জীব নামে যাহা হয়
দহর শব্দে জীবকে বোঝায় যদি কারো মনে হয়
অসম্ভব তা হয়
জীব সে দহর নয়
দহর অর্থ বুঝাবার তরে শ্রুতি বাক্যতে কয়
দহর ব্রহ্ম, জীবের কথা সে কোনখানে নাহি রয়।
"অথ য এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়
পরং জ্যোতিঃ
উপসম্পদ্যস্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা"
ইহার পরেতে জীব দেহ ছাড়ি হয় সে পরম জ্যোতি
নিজ স্বরূপেতে পরিনিষ্পন্ন লভিয়া পরম গতি
দহর নিষ্পাপ হয়
জীব কভু তাহা নয়
অপহত পাপমত্ব বলিয়া দহরের কথা হয়
দহর ব্রহ্ম স্থির জেনে নিও জীব সে কখন নয়।

।।। নিরুদ্দেশ ।।।

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেদিন ভাত খাবার সময় রেণু বল্লে, বাবা, পাঁজিটা একবার দেখবেন ?

পাঁজি ? পাঁজি দেখে কি হবে। একাদশীর দেরী আছে।

রেণু বল্লে, একাদশী নয়, অন্নপ্রাশনের দিন দেখতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে সরোজ বল্লে, অন্নপ্রাশন এখন হবে না, একেবারে পৈতের সময় ওসব হবে।

রেণু বল্লে, তা কি হয় ? আমি রয়েছি, লোকে কি বলবে ? পিসিমা মাসিমাদের বলতে হবে—

রক্ষে কর। কাউকেই বলব না।

তবে ?

সরোজ একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, দিন আমি দেখে দিচ্ছি। কিন্তু পুরুত ডেকে অন্নপ্রাশন আমি দেব না এবং এ জন্য কোন লোককেও আমি ডাকব না। শুধু পাঁচ তরকারী ভাত নতুন থালায় সাজিয়ে খাইয়ে দিও।

কেন ? ওরা এলে কত আর বেশী খরচ পড়বে ?

অসহিষ্ণুভাবে সরোজ বল্লে, খরচের কথা নয় রেণু, খরচের কথা নয়। লোক, তা আমার আত্মীয়রাই বল আর আমার এখানকার বন্ধুরাই বল, এরা সকলেই তোমার আমার সম্বন্ধে যা বলে তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। লোক আমি কাউকে ডাকব না।

রেণু গুম্ হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে সরোজ নীরবে উঠে গেল।

রেণুর খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন সরোজ রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে বল্লে, অন্নপ্রাশনের একটা দিন আছে আসছে রবিবারে। সেই দিন হলেই আমার সুবিধে।

রেণু বলেছিল, তাই হবে।

সরোজ বল্লে, ছেলেদের নাম কি হবে ঠিক করেছ, ভাল নাম ?

ঘাড় হেঁট করে রেণু বলেছিল, আমি কি জানি, আপনি যা বলবেন।

সরোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বল্লে, এ-সব কাজ ছিল সরলার ; এ বিষয়ে তার ছিল দারুণ উৎসাহ। অলক অপুর নাম সেই রেখেছিল।

রেণুকে নীরব দেখে সরোজ বল্লে,সে ত এখন নেই। তার কাজ সবই আমি করছি। তা আমি বলি, অলকের ভাই হোক অমর। আর তোমার ছেলে হোক সমর। কি বল ?

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সরোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন স্বগতোক্তির সুরে বল্লে, ছেলেমেয়ের নাম সে 'অ' দিয়ে রাখতে ভালবাসত। বলতো, বাংলা এবং ইংরাজী বর্ণমালার আদ্য অক্ষর 'অ', 'অ' দিয়ে নাম রাখলে ছেলেরা সবার আগে যাবে, সে কখনও কোন বিষয়ে দ্বিতীয় হবে না, তাই ওর নাম রাখছি অমর। আর ও ত অমর বটেই, না হলে তুমিই বা কোথা থেকে এলে আর বেঁচে থাকার কোন সুযোগই যার ছিল না, সে বাঁচলই বা কেমন করে ?

রেণু চুপ করে এটো হাতে বসে বসে শুনছিল। সরোজ বল্লে, তোমার ছেলের নাম রাখছি সমর। ও যে ঘরে জন্মেছে তাতে অনেক লড়াই করে ওকে বাঁচতে হবে। তা ছাড়া আমারও একটু স্বার্থবুদ্ধি আছে। ওর নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আমার নামের প্রথম অক্ষরের মিল থাক। একটু থেমে বলে, ভালই হোল, অমর সমর দুই যমজ ভাই, তবে হ্যাঁ যখন পুরো নাম বলবে, তখন একজন হবে অমর গাঙ্গুলী, আর একজন হবে সমর ঘোষাল। তাহোক, তার জন্য যমজ হওয়া আটকাবে

না। নিজের রসিকতায় নিজেই মৃদু হেসে সরোজ বাইরের ঘরে চলে গেল। আজ রবিবার। আজ সে সারাদিন আইনের বইয়ের ভেতর ডুবে যাবে।

অমু সমুর অন্নপ্রাশনের কথা রেণুর স্পষ্ট মনে পড়ে। একরকমের জোড়া জোড়া থালা, গেলাস, বাটি এই সমস্ত এসেছিল। এক রকমের জামা, এক রকমের চেলির কাপড়, এক রকমের দু'খানা আসন। রেণুর অনুরোধে বড়বাবুদের বাড়ী থেকে পাওয়া পাঁচটি টাকা দিয়ে আরও একজোড়া এক রকমের জামা সরোজই এনে দিয়েছিল। রেণু কদিন ধরে দিনরাত খেটে একই রকম ফুল দেওয়া একজোড়া কাঁথা তৈরী করেছিল। অন্নপ্রাশনের দিন ওদের দু'জনকে একভাবে সাজাতে সাজাতে রেণুর চোখ দুটো বার বার জলে ভ'রে উঠ্‌ছিল। ওদের দু'জনের বরাতই বা কি! একজনের মা নেই একজনের বাপ নেই, কিন্তু একজন হাকিমের ছেলে, অন্যজন নিঃস্ব মায়ের। কিন্তু ছলনাময় ভগবানের কি খেলা, দু'জনে পাশাপাশি সমান আসনে বসে একই সঙ্গে জীবনের প্রথম অন্ন গ্রহণ করলে। শাঁখ বাজল, রেণু তার অপটু জিহবায় হুলুধ্বনিও দিলে, কিন্তু অপু, অলক, সরোজ ও রেণু ছাড়া আর কোন দর্শকই রইল না। লোকের দৃষ্টি সুন্দরকে উপেক্ষা করে কুৎসিতকে টেনে আনতে আগ্রহী, তাই বিচারক ও বিবেচক সরোজ সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে আজকের শুভদিনে দূরে দূরেই বর্জ্জন করে রেখেছিল।

একটার পর একটা করে দিন কেটে যাচ্ছে। দারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা এল। রাস্তায় রাস্তায় জল, বাড়ীর উঠানে জল। অফিস ঘর থেকে ভেতরে আসতে গেলে চটি খুলে হাতে নিয়ে আসতে হয়। তিনদিন ধরে বৃষ্টির বিরাম নেই। বাজার প্রায় বন্ধ বল্লেই হয়। রেণু যে কি রান্না করবে তার কোন ঠিক পায় না। একটু মাছ না হলে সরোজের ভাল খাওয়া হয় না, কিন্তু বাজারে মাছই আসে না। হঠাৎ মাংসের খবর পেয়ে ঠিকে ঝিকে দিয়ে রেণু মাংসই আনিয়ে নিলে। অন্নপ্রাশনের পর থেকে কেমন যেন অজ্ঞাতসারেই দৈনিক বাজারের ভার রেণুর ওপোরেই এসে গিয়েছিল। সরোজ তাকে কয়েকটা করে টাকা দিত, সে ঝিকে দিয়ে বাজার করিয়ে নিত। টাকা ফুরিয়ে গেলে সরোজের কাছ থেকে আবার টাকা নিত।

রেণু এ বাড়ীতে আসার পর দেখেছিল সরলার জীবনকালে প্রত্যহ মাংস আসত। সরলাকে ডাক্তার রোজ মাংসের ঝোল দিতে বলেছিল। সেই সিদ্ধ ঝোলটুকু সরলা চুমুক দিয়ে খেত, মাংসটা বেশীর ভাগ খেত সরোজ, ছেলে মেয়েরাও কিছু খেত, বুড়ী ঝিটাও খেত। ঠাকুর রান্না করত বটে কিন্তু খেত না। আর রেণুর ত কথাই নেই। সে মাছ মাংসের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত।

সরলার মৃত্যুর পর রেণু সরোজকে মাংস আনবার জন্য দু' একবার বলে সুবিধে করতে পারে নি। একদিন সরোজ বলেই ফেল্লে যে সরলা মাংস খেতে খুব ভালবাসত, অতএব এখন আর সরোজের মাংস খেতে ইচ্ছে নেই।

বর্ষায় মাছের অভাবের সময় রেণু যখন ঝিয়ের মুখে শুনলে বাজারের ধারে ছোট খাসি কাটা হয়েছে তখন সরোজকে জিজ্ঞাসা না করেই মাংস আনিয়ে রান্না করে একেবারে পাতের কাছে ধরে দিলে। তরী তরকারী তেমন কিছুই নেই, ভাত এবং মাংসের ঝোলই সম্বল।

খেতে বসে সরোজ বল্লে, একি? এ আবার কে আনলে?

রেণু মাছ পাওয়া যায় না সেই কৈফিয়ৎ দিয়ে মাংস খেতে অনুরোধ করলে।

সরোজ মাংস নিয়ে মুখে দিলে। একখানা, দু'খানা বেশ লাগছে। তৃপ্তির দৃষ্টি তুলে প্রশংসার সুরে বল্লে. বাঃ, বেশ হয়েছে ত! এমন সুন্দর রান্না কোথায় শিখলে রেণু?

রাজসিক উপচারে রেণুকে রান্না করতে শিখিয়েছিল শ্রীপতি, নিজে সামনে বসে থেকে, কখনও বা নিজে হাতা-খুন্তি ধরে সে রেণুকে রান্না শিখিয়েছিল তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে। অবশ্য নিয়মিতভাবে এ-সব রান্না হোত না, হাটের বিক্রেতাদের ধমক-ধামক দিয়ে বিনা খরচায় যেদিন যা পাওয়া যেত, সেইদিন তাই ঘরে আনত শ্রীপতি। শেষ বরাবর তাও আবার আনত না, হাট থেকে বিনা পয়সায় জিনিষ সংগ্রহ করে কোন খরিদ্দার পেলে শ্রীপতি অন্যের চোখের আড়ালে সেগুলো বিক্রী করে পয়সা নিয়ে হয়ত দুটো মাত্র বেগুন নিয়ে বাড়ী আসত। কিন্তু তা হলেও রন্ধন বিদ্যা রেণু যেটা শিখেছিল সেটা সে ভোলে নি।

সরলার মৃত্যুর প্রায় সাত আট মাস পরে এই প্রথম মাংস খেলে সরোজ। বড় ভাল লাগল। সরলার কথা যে মনে আসে নি তা নয়, কিন্তু সেই স্মৃতি সরোজের মাংস-ভোজনে এতদিন পরে কোন ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল বলে মনে হয় না।

এর পর থেকে রেণু প্রায়ই মাংস আনাত। সরোজ এক আধবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে, রেণু কোন উত্তর দিত না। শেষে অলক এবং বিশেষ করে অপু এমনই মাংসের ভক্ত হয়ে পড়ল যে, বাজারে মাংস পেলে আর মাছ কেনা হোত না।

ক'দিন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে বেশ যেন শরতের হাওয়া দিয়েছিল, কিন্তু আজ আবার সকাল থেকেই মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা চলছিল, সন্ধ্যের পর মুষল ধারে বৃষ্টি সুরু হোল, উঠানে জল জমে গেল।

সরোজ বরাবরই সন্ধ্যে রাত্রে খেয়ে নেয়, তারপর অনেকক্ষণ, রাত্রি প্রায় এগারটা বারোটা পর্য্যন্ত অফিস ঘরে বই কাগজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আজও সে খেয়ে উঠে অফিসে যাবার চেষ্টা করে ঘরে ফিরে এল। রেণুকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বল্লে, নাঃ, এ বাড়ীটা এবার না বদ্‌লালে আর চলছে না।

রেণু বল্লে, বাইরের ঘরে যাবার জন্য উঁচু রোয়াক গাঁথিয়ে দেবার কথা যে বাড়ীওলা বলেছিল, তা বুঝি আর দেবে না?

কই আর? ভাড়া নেবার সময় আসে। বলি, সে বলে নিশ্চয় নিশ্চয়, দু' একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তারপর আবার মাসকাবারে ভাড়া নিতে আসে। ভাড়াটে মরে মরুক। বাড়ীওলার টাকা পেলেই হোল।

আপনি ভাড়া বন্ধ করে দিন, রেণু উপদেশ দিলে।

সে সব হয় না রেণু, সে সব হয় না। এখনই কথা উঠবে, হাকিম সাহেব বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া দেয় না। আমাদের কি কোন কিছু করার জো আছে, সকলেই নিন্দে-বান্দা সুরু করবে। হয়ত হিতবাদী কাগজে এক কলম ছেপেই দেবে। তখন কৈফিয়ৎ দিতেই প্রাণান্ত।

রেণুর খাওয়া শেষ হোল। পরটা, ডাল, আলুর তরকারী ও দুধ। রেণুর খাওয়ার ব্যাপারে সরোজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রথম প্রথম রেণুর লজ্জা হোত, এখন সয়ে গেছে। একদিন ত রেণু বলেই ফেলেছিল যে, জীবনে সে এত ভাল ভাল জিনিষ এমন পর্য্যাপ্তভাবে কখনও খায় নি। তার জন্য মিছামিছি এত খরচ করার কোন দরকার নেই। সরোজ বলেছিল, সুলতান গরুকে পেট ভরে আপেল বেদানা খাওয়াত গরুর দুধ মিষ্টি এবং ঘন করার জন্য। দু'দুটো ছেলে যার ওপোর নির্ভর করে বাঁচে, তার খাওয়ার জোর না থাকলে চলবে কেন?

এখন অবশ্য ছেলেরা গরুর দুধ এবং ভাতও খাচ্ছে, কিন্তু রেণুর বরাদ্দ ঠিকই আছে। সরোজের বিশ্বাস, যার হাতে বাড়ীর সকলের খাওয়া নির্ভর করছে, তাকে অবশ্যই অবাধে ভাল ভাল জিনিষ খেতে দিতে হবে, না হলে সে চুরি করবে, কিম্বা তা না করলেও তার প্রচ্ছন্ন লোভের নিঃশ্বাসে সুখাদ্যও অপাচ্য হবে মনিবের পাকস্থলিতে। তবে বেশীর ভাগ রাঁধুনীদের হিসেবী মনিবরা এই মতবাদে বিশ্বাসী নয়। এই জন্যই বোধ হয় চুরি-চামারীর সংখ্যা আইন ও পুলিশ দিয়ে কমিয়ে রাখা যায় না।

কিন্তু এত সকাল-সকাল ঘুম আসবে কি? কাজ অবশ্য আজ রাত্তিরে না করলেও ক্ষতি নেই, কাল রবিবার। দুটো মামলার রায় লিখতে হবে, সেটা কাল ধীরে সুস্থে লিখলেই চল্‌বে, কিন্তু আজ এই সন্ধ্যে থেকে সরোজ করে কি? ছেলেমেয়ে দু'জনেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন ছুটোছুটি করে, খেয়ে উঠে এক মিনিটও বসতে পারে না।

সরোজ ডাকলে রেণু, অমু-সমু ঘুমিয়েছে?

রেণু বল্লে, হ্যাঁ।

তাহলে তোমার বই খাতা নিয়ে এস, কতদূর কি বিদ্যে হয়েছে একবার দেখি।

এটা নতুন নয়, এর আগেও দু'একবার খাতা সে দেখেছে, রেণু শেলেটে হাত মকসো করে পেন্সিল দিয়ে খাতায় লিখতে সুরু করেছে।

খাতা দেখে সরোজ অবাক হয়ে গেল। গোটা গোটা অক্ষর রেণু লিখেছে। গোপাল বড় ভাল ছেলে, যাহা পায় তাহা খায় ইত্যাদি।

মাত্র দু' আড়াই মাস আগে যার বর্ণ পরিচয় হোল, তার এই উন্নতি? বিস্ময়ের কথা। সরোজের প্রশংসায় রেণু মুখ নীচু করে নিলে।

সরোজ বল্লে, বাস্তবিক, Full many a gem of purest ray serene। সত্যি রেণু, তোমার মধ্যে যা আছে, তুমি যদি ছেলেবেলা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে—

রেণু বল্লে, এ বইটার সবটাই লিখেছি, কিছু ভুল হয় নি ত?

সরোজ বল্লে, কিচ্ছু ভুল নেই, চমৎকার হয়েছে। কাল তোমার জন্য দ্বিতীয় ভাগ বই এনে দেব, সেটা শেষ করতে পারলেই তুমি রামায়ণ পড়তে পারবে।

রেণু নীরবে উঠে গিয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া গোছের একখানা দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে এল। মুখে বল্লে, এইটা কি?

সরোজ লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, এইটাই ত, এ তুমি,—ও, এ বুঝি অপূর্ব পুরাণো দ্বিতীয় ভাগখানা?

রেণু বল্লে, হ্যাঁ, এটাও এই এতদূর পর্য্যন্ত পড়েছি। লিখেছিও,—বলে আর একখানা খাতা এনে দেখালে।

সরোজ বল্লে, ও, এর মধ্যে আর একটা খাতাও হয়ে গেছে।

রেণু বল্লে, হ্যাঁ। অলক বল্লে, এক একটা বইয়ের সঙ্গে এক একটা খাতা চাই।

বাইরে ঝম্‌ঝমে বৃষ্টিটা মুষলধারে চেপে এল। জানলার তলা দিয়ে বেশ জোরেই বৃষ্টির ধারা এসে ঘরের মেঝেয় ঢেউ দিচ্ছে। বিছানার ওপোর কাগজ পেতে তার ওপোর হ্যারিকেনটা বসানো ছিল। হ্যারিকেনের দু-পাশে দু'জন, ওধারে অলক ঘুমুচ্ছে। সরোজ বল্লে, আচ্ছা রেণু, তুমি সমস্ত কাজ সেরে এত সব লেখাপড়ার সময় পাও কখন?

কি আর কাজ, সারা দুপুরই ত আমার ছুটী।

রং ময়লা হলেও রেণুর নধর মুখ এবং সুগঠিত সর্ব্ব অবয়বের দিকে দেখতে দেখতে সুস্থ, সবল, নারীসঙ্গবর্জ্জিত, সরোজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল কি?

এতক্ষণ রেণু বেশ সহজ ভাবেই বসেছিল। এবার যেন হঠাৎ সে আতঙ্কিত হোল। একা একা এ বাড়ীতে অনেক দিনই ত সরোজের সঙ্গে সে কাটালে; এই ত এতক্ষণ তার কোন ভয়ই হয়নি, কিন্তু এবার যেন হঠাৎ সে শিউরে উঠল। সরোজ কি তাকে কিছু বলেছে, কোন অসঙ্গত আচরণ বা ইঙ্গিত কিছু এসেছে কি ওর তরফ্ থেকে? না ত, সরোজ যেমন ছিল তেমনই বসে আছে। রেণু নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলে; যাকে বাবার মত দেখি তিনি কিছু অন্যায় করতে পারেন না, কিন্তু তবুও রেণু যেন স্থির হতে পারলে না। ইতস্ততঃ করে, বিছানার কোণ থেকে মেঝেয় নেমে, যেন কৈফিয়তের সুরে বল্লে. দেখি, ওরা বুঝি জেগে উঠল, বলেই ছুটে ঘরের মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসে খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে বৃষ্টি সমানেই পড়ছিল। ছেলে মেয়ে তিনটেই রেণুর বিছানায় অকাতরে ঘুমুচ্ছিল।

হঠাৎ মাঝের দরজাটা ওধার থেকে সরোজ বন্ধ করে দিলে। রেণুর ভয় হোল, তবে কি বাবার রাগ হয়েছে। এ রকম ত কোনদিনই হয় না। সারা দিনরাত এ-দরজাও খোলাই থাকে।

রেণুর ভেতরটা কেমন যেন কাঁপতে লাগল। একবার মনে হোল দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, কিন্তু সেটুকু শক্তিও শক্তিও যেন নাই। মশারী ফেলা খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে একান্ত অসহায় বলে অনুভব করলে।

কিছুক্ষণ পরে সাহসে ভর করে সে দরজার কাছে চলে এল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলে, বিছানায় সরোজ নেই।

কোথায় গেল? সরোজের ঘর থেকে বাইরে যাবার যে দরজাটা ছিল সেটা বন্ধ করে ওরা বিছানায় পড়াশোনা করছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে দরজাটা খোলা। তবে কি সরোজ বেরিয়েছে? এই দুর্যোগে বাইরে কোথায় যাবে? আর গেলই যদি, তাহলে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে গেল কেন? অলক একলা ঘুমুচ্ছে। এই দুর্যোগে, দরজা খুলে রেখে—

রেণুর মনে এল প্রবল দুশ্চিন্তা! কি করা উচিত সে ভেবেই পেলে না।

সাহসে ভর করে রেণু নিজের ঘর থেকে বাইরে যাবার দরজাটা নিঃশব্দে খুলে অল্প ফাঁক করে দেখলে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। গভীর অন্ধকার, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাতেই স্পষ্ট দেখা গেল, কে একজন বৃষ্টির অঝোর ধারে উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজে হাপুস্থটি হচ্ছে।

ওকি? ও কে? ও যে সরোজ! বাবা—

তুমি বেরুচ্ছ কেন, নিষ্ঠুর কণ্ঠে সরোজ রেণুকে ধমক দিলে; ভেতরে যাও।

আপনি ভিজছেন কেন? শেষে অসুখ-বিসুখ—

ভেতরে যাও, দরজা বন্ধ কর, সরোজের প্রচণ্ড ধমক।

রেণু ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে।

কিন্তু শুতে পারলে না। একি? এ রকম ত কখনও হয় নি। শেষে কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।

দু'ঘরের দরজার ফাঁকে অনেকক্ষণ চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শেষে দেখলে সরোজ নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে। শীতে যেন বেচারী কাঁপছে। কাঁপবেই ত! বৃষ্টি এবং ঝড় দুই-ই সমানে চলছিল।

ঘরে এসে সরোজ গা' থেকে ভিজে গেঞ্জী খুলে আলনা থেকে গামছা নিয়ে মাথা গা মুছে শুকু কাপড় পরে ভিজে-গুলো নিংড়ে দেওয়ালের পেরেকে এদিক ওদিক করে টাঙিয়ে কলসী থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে হারিকেনটা বিছানা থেকে মেঝেয় নামিয়ে একটু কমিয়ে বিছানায় উঠে মশারীটা ফেলে চারিদিকে গুঁজে দিতে লাগল কিন্তু মাঝের দরজাটা খোলা ত দূরের কথা, ওধারের হুড়কোটাও নামিয়ে রাখলে না, অর্থাৎ দরকার পড়লে ও ঘরে যাবার কোন উপায়ই রেণুর রইল না।

খানিকক্ষণ পরে রেণু আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় গিয়ে শুল, কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ ঘুমোতে পারলে না এবং অনেক ভেবেও সরোজের এই উন্মাদ আচরণের কোন [illegible] সে খুঁজে পেলে না।

পরের দিন সকালে যথাপূর্ব্বম্। স্নান সেরে যথারীতি জলযোগ করতে করতে গম্ভীরভাবে সরোজ বল্লে, আমার জন্য মাংস-টাংস আর এনো না। ছেলেরা খায় ওদের দিও, আমি মাংস সহ্য করতে পারি না।

রেণু বল্লে, বাবা, কাল রাত্তিরে বৃষ্টির জলে ভিজলেন কেন?

সরোজ কোন উত্তর না দিয়েই অফিস ঘরে চলে গেল। আজকাল রবিবার সকালেও সে বাজার করতে যায় না।

সন্ধ্যেয় খেতে খেতে সরোজ বল্লে, আজ আমার অনেক কাজ আছে, অলক ঘুমিয়ে পড়লে তুমি তোমার ঘরের দুটো দরজাই বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। আমার ঘরের বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমি অফিস ঘরে চলে যাব, পরে কাজ চুকিয়ে এসে তালা খুলে ঘরে শোব। তোমায় জেগে থাকতে হবে না।

রেণু বল্লে, মাঝের দরজা বন্ধ রাখব?

সরোজ অযথা খিচিয়ে উঠল। বল্লে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দিক থেকে বন্ধ রাখবে, রাত্তিরে ভয়-টয় পেলে দরজা খুলে ডেক, নইলে ও দরজা বন্ধই থাকবে।

রেণু আর কোন প্রশ্ন করে নি। ভাবতে লাগল, এত-দিন পরে এ-দরজা বন্ধ হোল কেন?

এমনি ভাবেই বর্ষা কেটে শরৎ এল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবই ঠিক আগের মতই আছে, কিন্তু সরোজের কেমন যেন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। রেণু আকাল-কূল ভাবে; কি জানি, সে কি অন্যায় কিছু করেছে, সরোজ কি তার ওপোর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছে। সরোজ যদি তাকে তাড়িয়ে দেয় তাহ'লে ঐ ছেলে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কিন্তু সরোজ আজ-কাল এমনই গম্ভীর হয়ে গিয়েছে যে, কোন কথা তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেও যেন রেণুর ভয় হয়। কিন্তু কিসের যে ভয়, তাও সে বোঝে না। সরোজ ত এ পর্য্যন্ত কোন কড়া কথাই তাকে বলে নি।

অলকের মাষ্টারীতে দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে গেল। এবার অলক নিজের একখানা পুরাতন কথামালা দিলে রেণুকে পড়তে। খেতে বসে অলক বল্লে, বাবা, দিদিকে কথামালা দিয়েছি, দিদি পড়ছে।

সরোজ বল্লে ভাল।

সরোজ রেণুর দিকে চেয়েও দেখে না।

বাবা, দিদিকে ধারাপাত পড়াব? অলক প্রশ্ন করলে।

পড়াও।

ওদের আহারাদি শেষ হয়ে গেল।

রেণু স্পষ্ট দেখলে, সরোজের মুখের লালিত্য যেন কমে আসছে। মাংস একেবারেই খায় না, মাছও নামমাত্র, মোটের ওপোর খাওয়াই কমে গেছে, কিন্তু কেন?

আর একদিন খাবার সময় অলক বল্লে, বাবা এই শুক্রবার থেকে ত ইস্কুল বন্ধ হবে, তা বাবা, আমরা কোথায় বেড়াতে যাব না?

সরোজ বল্লে, কে যাচ্ছে?

অলক বল্লে, আমাদের ক্লাসের দুটো ছেলে দেশে যাচ্ছে, তার মধ্যে একজনকে ত তুমি চেন বাবা। ঐ যে ঐ চারু আসে, ওর বাবা ত তোমাদেরই কোর্টে কাজ করে—

সরোজ বল্লে, হ্যাঁ, রাজীববাবু; হ্যাঁ, রাজীবরা ত দেশে যাবেই। যাত্রার নামে সরোজের নিস্তরঙ্গ মনে কেমন যেন দোলা লাগ্‌ল।

অপু বল্লে, আমরা দেশে যাব না বাবা? দেশে?

সরোজ চুপ করে রইল।

অলক বল্লে, আমাদের ক্লাসের আর একজন শুনলুম, বদ্দিনাথে যাবে। বদ্দিনাথ কোথায় বাবা?

সরোজ বল্লে, বিহারে।

অলক বল্লে, তুমিও চল না বাবা বদ্দিনাথে। বেশ রেলে চড়ে যাব।

অপু খেতে খেতে হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌ল, কু—ঝিক্ ঝিক্, কু—ঝিক্ ঝিক্, কেমন মজা! বাবা আমি রেলে চড়ব।

সরোজের মনে পড়ল, মুন্সেফি চাকরীতে যোগদান করার পর থেকে প্রতি বছরই সে পূজার ছুটীতে এক মাস বেড়িয়ে আসত। কেবল গত বছরই যাওয়া হয় নি। তখন সরলার ন' মাস এবং সে দারুণ অসুস্থ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। সেজন্য বাইরে বেরোনোর কথা ভাবাই যায় নি।

কিন্তু এ বছর ছেলেদের আগ্রহ অত্যধিক। পুজোর ছুটিটাও এগিয়ে এসেছে। আগামী শনিবার মহালয়া, তারপর চতুর্থী থেকেই ওর দেওয়ানী আদালত বন্ধ হবে। খুলবে সেই ভাই দ্বিতীয়ার পর দিন।

সরোজের বধির অন্তরে যাত্রার আগমনী বাজ্‌ল না কি?

যাবে বাবা? অলক সরোজের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কোথায় যাবি? সরোজের প্রশ্নে বুঝি কথঞ্চিৎ আগ্রহের রেশ!

কোথায়,—অলক তার ভুগোলের বইখানা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

অপু বল্লে, দিদি, বল না গো কোথায় যাব?

রেণু অল্প হাসল, কোন উত্তর দিলে না। সে আজকাল সরোজের সামনে কেমন যেন কথা কইতে পারে না, ভয় পায়।

অলক বল্লে, হ্যাঁ বাবা, মনে পড়েছে, পুরী চল, সমুদ্র দেখব। দেখ বাবা, গরমের ছুটীতে আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে পুরী গিয়েছিল। সে বল্লে, সমুদ্রে কি প্রকাণ্ড ঢেউ আর কত বড় বড় ঠাকুর, রথ, কত কি? সে বাবা পুরী থেকে কি সুন্দর হাড়ের কলম নিয়ে এসেছে, আবার হাড়ের ছুরী, কেমন সুন্দর কচ্ কচ্ করে খাতার পাতা কাটে। আর মুঠো মুঠো ঝিনুক। আমাকেও কতকগুলো দিয়েছিল, আমি আবার তাই থেকে অপুকে, দিদিকে দিয়েছি। দিদি তাই দিয়ে ঘামাছি মেরে দেয়, না দিদি?

রেণু ঘাড় নাড়লে।

তুমি ত, তুমি ত আমার দুটো ঝিনুক ভেঙ্গে দিয়েছ গো, এবার কিন্তু আমি অনেক অনেক ঝিনুক নেব, তা বলে রাখছি। ঝিনুকের আনন্দে অপু খেতে খেতেই দাঁড়িয়ে উঠল।

রেণু এবার হেসে ফেল্লে। বল্লে, বোস, বোস, আগে খেয়ে নাও, তবে ত পুরী যাবে।

ঠিকে ঝিটা দু' কোলে দুই বাচ্ছা নিয়ে ঘরের দরজায় এসে বল্লে, দিদিমণি, এরা আর থাকতে চাইছে না।

রেণু বল্লে, এই আমার হয়ে গেছে। অপুকে বল্লে, নে নে, চট করে খেয়ে নে। ওদের আবার তেল মাখানো, চান করানো এই সব করতে হবে।

বাচ্ছাগুলো হামা টান্‌তে শেখার পর থেকেই ঠিকে ঝিকে আরও দু টাকা বেশী মাইনে দেওয়া হচ্ছে। সে সারা সকাল বাচ্ছাদের নিয়ে বাইরের বারাণ্ডায়, সামনের ছোট্ট বাগানে বেড়িয়ে খেলা করে বেড়ায়। তখন রেণু রান্না করে, এদের খেতে দেয়, অপুকে খাইয়ে দেয়। তারপর ঝি বিকেলে এসে বাসন মাজা শেষ করে এ দুটোকে নিলে রেণু রান্নার কাজ শেষ করে আবার বাচ্চাদের দেখাশোনা করে।

পুজোর পঞ্চমীতে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

সমুদ্রকে প্রথম দেখে অপু ও অলক অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বালির চড়ায় ওদের কি নাচ, ছুটোছুটি, আর ঝিনুক কুড়ানো।

রেণুও সমুদ্র দেখে অবাক।

সমুদ্রের প্রভাব সরোজের ওপোরও কম পড়ে নি, যদিও এর আগে সে পুরীতে এসেছিল। ইদানীং যে-সরোজ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, সেই সরোজই রেণুকে

বলেছিল, কেমন লাগছে রেণু? চান করবে, ঐ ওদের মত?

সরোজের গলার আওয়াজে রেণুর মনটাও অনেকদিন পরে এক মিনিটেই তরল হয়ে উঠল। বল্লে, নাইব না? এত দূরে এলুম, আর চান না করেই চলে যাব?

ভয় করবে না?

ওদের যখন ভয় করছে না, তখন আমারই বা ভয় করবে কেন?

গুড্, এই ত চাই, তা হলে আজকেই চান করা যাবে। আগে বাসা গোছ-গাছ সেরে ফেলি চল।

ওরা বাসায় ফিরে এল।

ভোরবেলা পুরীতে নেমে পরিচিত পাণ্ডার সাহায্যে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রের কাছে দু'খানা ঘর খোঁজ করে না পেয়ে অগত্যা একখানা বড় ঘর ও রান্নাঘর একমাসের জন্য তিন টাকায় ভাড়া করে জিনিষপত্র ফেলে ওরা প্রথমেই গিয়েছিল সমুদ্র দেখতে, রেণুর কোলে ছিল অমু আর সমর ছিল সরোজের কোলে। সমুদ্র থেকে কোন মতে অলক ও অপুকে টেনে নিয়ে ওরা বাসায় ফিরে দেখে পাণ্ডার ছড়িদার একটা উড়েনী ঝি নিয়ে ঘরের সামনের রোয়াকে বসে আছে। মধ্যবয়সী গাট্টা গোট্টা ঝি, ভাষা বুঝতে অসুবিধে হলেও ঝিটাকে সরোজের ভাল বলেই মনে হোল। এক মাসের জন্য তাকে বহাল করলে,—দু বেলা খাওয়া আর দু'টাকা মাইনে এর ওপোর মায়ের একখানা ফাটা কাপড় যদি সে পায়, তাহলে—

রেণু বল্লে, আমি মা নই দিদি।

সে ঘাড় নাড়লে, কি বুঝলে ভগবানই জানেন।

পদ্মনাভ ছড়িদার দুপুরে বলরামের ভোগ নিয়ে এল। জগন্নাথ ও বলরাম দুজনের ভোগের মধ্যে বলরামের ভোগটাই ভাল, দামও বেশী, সরোজ সেই ভোগই আনতে বলেছিল।

তার পরেই ছড়িদার নিয়ে এল চারখানা তক্তপোষ। প্রত্যেকটাই অত্যন্ত ছোট, এসে বল্লে, পাঁচখানার জন্য বলেছিলেন কিন্তু চার খানার বেশী পাওয়া গেল না, মু কি করিবে?

কিন্তু চারখানা তক্তপোষে কি ভাবে শোয়া যায়। দু'খানা তক্তপোষ জুড়ে রেণু হয়ত কোন মতে দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকতে পারে, তাতেও পড়ে যাবার ভয় আছে, তারপর ওরা তিনজনে দুখানা তক্তপোষে কি করে থাকবে!

ছড়িদার বল্লে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবু, কোন ভয় নেই। বলেই সে মুটেদের সাহায্যে ঘরের একদিকে এক সঙ্গে চারখানা তক্তপোষ জোড়া দিয়ে পাতলে। তক্তপোষগুলো যেন ঘরের মাপে তৈরী। চারখানা পাশাপাশি জুড়ে দেখা গেল ঘরের এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্য্যন্ত প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেল। সরোজ বল্লে, রেণু ঐ দেওয়ালের দিকে শোবে, তা হলে রাত্তিরে পড়বার কোন ভয় থাকবে না।

তাই হোল। দেওয়ালের দিকে শুলো সমর, তারপর রেণু। তারপর অমর, তার পাশে অপু, তার পর অলক এবং সব শেষে সরোজ। প্রথমটা রেণুর কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকল, কিন্তু বিদেশ বিভুঁই জায়গা, উপায় কি?

তা ছাড়া ব্যবহারের দিক দিয়ে সরোজ আজ সকাল থেকেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছে। স্থান মাহাত্ম্যই বলতে হবে।

সমুদ্রে স্নান করে, ঠাকুর দেখে, পথে পথে বেড়িয়ে অপু অলকের টুকটাক জিনিষ কিনে, ভোগ খেয়ে, বিকেল থেকে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ওদের দিনগুলো কাটছিল যেন রূপকথার দেশে। বিশেষতঃ রেণুর কি স্ফূর্ত্তি। সে তীর্থ করছে এবং বেড়াচ্ছে। দুটো ছেলে নিয়ে কোন কষ্টই তার নেই। ঝিটা একাই একশ, অত্যন্ত কাজের মেয়ে।

দিন কয়েক পরে সরোজ বল্লে, কোণারক যাবে? চল কোণারক বেড়িয়ে আসি। ওরা সকলে শোনামাত্রই রাজী হয়ে গেল। ওরা যেন রাজী হয়েই আছে। কোণারক কি এবং কোথায় ওদের জানার দরকারও নেই। দু'খানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে প্রয়োজনীয় মালপত্র, বিছানা, রান্নার বাসন, এমন কি দুটো নতুন মাটীর কলসী কিনে কলসীভর্ত্তি খাবারজল নিয়ে ওরা একদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ল। সামনের গাড়ীখানায় রইল সরোজ অলক আর ছড়িদার। পেছনের গাড়ীটায় রেণু, অপু, দুটোবাচ্ছা আর উড়েনী ঝি। এর আগের বারে সরোজের কোণারক যাওয়া হয় নি, সেই জন্য কোণারক যেতে তারই বেশী আগ্রহ।

পুরী সহরের মাঝখান দিয়ে গুণ্ডিচাবাড়ীর ধার দিয়ে ক্রমে ক্রমে লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা এসে পড়ল এক ধূ ধূ বিস্তৃত মরুভূমির ওপোর। দুপুরে এক সময় মাঠের মাঝখানে গাড়ী থামিয়ে কৌটো খুলে রেণু লুচি, আলুর তরকারি বার করে সকলকে দিলে, নিজেও খেয়ে নিলে। তারপর আবার যাত্রা। কিন্তু এ কি পথ! দিগন্ত বিস্তৃত বালির ওপোর দিয়ে এ যেন এক অনন্ত যাত্রা। এই বিরাট বালি পার হয়ে গাড়ী দুটো বিকেলের দিকে এসে হাজির হোল এক ছোট নদীর ধারে। দু' চারখানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ী, দু' একটা দোকান, বাজারের মতও একটু আছে। ছড়িদার বল্লে এখানে নদী পার হতে হবে। শালতি নৌকোর মত কয়েকটা ভাসছিল ঐ নদীতে। পারের ব্যবস্থাও বড় মজার। লোকেরা নৌকায় পার হবে, গরু যাবে সাঁতার দিয়ে এবং এক একটা গরুর গাড়ী মাল সমেত এক এক খানা নৌকোয় তুলে পার হবে। পার হবার সময় গরুর গাড়ীর চাকাগুলো অর্দ্ধেক নদীর জলে ডুবে থাকে।

সন্ধ্যের সময় ছড়িদার সরোজকে দেখিয়ে দিলে অনেকদূরে গাছপালার ঝোপের মাথার ওপোর দাঁড়িয়ে আছে কোণারকের মন্দিরচূড়া। অলক ছিল সামনের গাড়ীতে, সরোজ ও ছড়িদারের সঙ্গে। কথাটা শোনামাত্রই সে আর মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারলে না। পেছনের গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করে অলক চেঁচিয়ে বলে, দিদি, ঐ দেখ কোণারক মন্দির। গাড়োয়ানের কাঁধের পাশ দিয়ে রেণু ছইয়ের তলা থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে নিলে।

যাক্ বাবা, এতক্ষণে বালির মরুভূমি কাটিয়ে দূর দিগন্তে কিছু বনজঙ্গল দেখা দিয়েছে। তার ওপোর বিরাট উঁচু কালো মন্দির চূড়া।

তবুও প্রায় তিনঘণ্টা লাগল সেখানে পৌঁছাতে। রাত্রি প্রায় নটা নাগাধ ওরা গরুর গাড়ী থামিয়ে মাটির ওপোর নামল। এবার মাটি, বালি নয়, এ যেন এক দুর্লভ সান্ত্বনা।

কিন্তু কি জায়গা রে বাবা! ঘর বাড়ী বিশেষ কিছুই নেই। আছে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম। সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করে গোটা কয়েক চালা ঘর। কিন্তু সব ঘরেই সন্ন্যাসীর চেলা-চামুণ্ডাদের বাস। ওদের রাত্রিবাসের জন্য কোন ঘরই সরোজ জোটাতে পারলে না। একখানা নিকোনা মোছা মাটির রোয়াক মাত্র পাওয়া গেল। যাত্রী ওরা একটা দলই মাত্র গিয়েছিল, তাই রোয়াকে অন্য কোন ভাগীদারের অসুবিধা ভোগ করতে হোল না।

চারিদিকে সুন-সান ভোঁ-ভাঁ। প্রথমটা বেশ একটু ভয়-ভয়ই করেছিল।

সন্ন্যাসীর অনেক গরু ছিল। চেলা মহারাজের কাছ থেকে কিছু দুধ পাওয়া গেল, আর শুকনো কাঠ। রেণু তার ভাঁড়ার খুলে চাল ডাল বার করে খিচুড়ী বানিয়ে নিলে। ছেলেমেয়েরা ঘুমে অধীর হয়ে পড়েছিল। তাদের কোন রকমে খাইয়ে সে নিজেও কিছু খেয়ে নিলে। ওদিকের গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান ও ছড়িদারদেরও খাওয়া চলছে। সরোজ রেণুকে চুপি চুপি বল্লে, রেণু তুমি ওদের নিয়ে শুয়ে পড়, আমি প্রথম রাত্তিরটা জেগেই থাকব। তারপর তুমি জেগে থেক, আমি শুয়ে পড়ব। দুজনের এক সঙ্গে ঘুমানো উচিত হবে না।

কেন বাবা, কিছু ভয় আছে নাকি? এই ত এত লোক রয়েছে. রেণু বল্লে।

সবাই ত পর, নিজের লোক কে আছে বল, সরোজ উত্তর দিলে।

তা হলে আপনি ঘুমিয়ে নিন, আমি সারা রাত বসে থাকি, রেণু প্রস্তাব করলে।

জোর দিয়ে সরোজ বল্লে, তা হয় না, পারবে না। তুমি শুয়ে পড়, আমি ত বাড়ীতেও রাত্রি বারটা-একটার আগে ঘুমাই না, আমি একটা পর্য্যন্ত জেগে থাকি, তারপর তোমাকে ডেকে দেব।

ওরা রোয়াকের ওপোর বিছানা পেতে নিলে। ঝি ওদের সঙ্গেই রইল। গাড়োয়ান দু'জন রোয়াকের নিচে শুয়ে পড়ল, ছড়িদার রইল একখানা গরুর গাড়ীর ভেতর। গরুগুলো রোয়াকের কাছেই একটা গাছতলায় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটতে লাগল। হ্যারিকেনটা আজ আর কমানো হোল না, সমানেই জ্বলতে লাগল। ছড়িদার ওদের বার বার অভয় দিলে, এখানে কোন ভয় নেই। সন্ন্যাসীর চেলা বল্লে, এখানে জঙ্গলও নেই, কোন জানোয়ারও নেই, ভয় কিসের? বারাণ্ডার একটা খুটিতে ঠেস দিয়ে

বসে বসে সরোজ এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ওর কিন্তু গা'টা কেমন যেন ছমছম করছিল।

আগের বার সরলাকে নিয়ে ও যখন পুরী এসেছিল সেই সেদিনের কথা ওর মনে পড়ল। তখন অলক মাত্র দু'বছরের শিশু। সরলার দারুণ ইচ্ছে ছিল কোণারক আসতে, কিন্তু বিধাতা বিমুখ। সেবারেও পূজোর ছুটিতেই এসেছিল, কিন্তু সেবার কি বৃষ্টি। একদিন থামে ত দু'দিন হয়। এই বলভদ্র খটিয়াই ওর পাণ্ডা ছিল, এই পদ্মনাভ ছড়িদার সেবারেও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিল। ওরাই বলেছিল, এই বৃষ্টিতে কোণারক যাওয়া অসম্ভব। এক-মাসের মধ্যে একবারও কোণারক যাওয়ার মত আবহাওয়া সেবার হোল না। তাই সেবারে ছুটি ফুরোবার এক সপ্তাহ আগে সরোজ পুরী থেকে চিল্কায় গিয়ে সরলার কোণারকের দুঃখ চিল্কা দিয়ে ভুলিয়েছিল। সেদিনের সেই সব কথা একে একে সরোজের সমস্তই মনে পড়তে লাগল।

মনে পড়ল, সেবারের পাণ্ডার অভয়বাণী। পাণ্ডা বলেছিল, এবার হোল না বাবু,আসছে বারে এসে কো'ণা-রক যাবেন। তা এবারটা সেই আসছে-বারই বটে, সরোজ এখন কোণারকেই এসেছে, কিন্তু কোণারকের জন্য যার আগ্রহ সব চেয়ে বেশী সেই সরলা এখন কোথায় ?

নিশুতি রাত। সকলেই ঘুমিয়েছে। গাড়োয়ান, ছড়িদার, ঝি এবং ছেলেমেয়েরা শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে ছিল ; এতক্ষণে রেণুও ঘুমিয়ে পড়ল। ওপোরে শরতের নির্ম্মল আকাশ, তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে গেছে। কোজাগরী পূর্ণিমা হয়ে গেছে বেশ কদিন আগে। আকাশে চাঁদের আলো নেই। সরোজের ভুল হোল, কোজাগরী পূর্ণিমায় কোণারক এলেই ভাল হোত। ভাবতেই মনে হোল সরলার সঙ্গে শেষ বেড়ানো হয়েছে গত পূজোর আগের পূজোয়। এমনই শারদীয় কোজাগরীতে সেবার ওরা গিয়েছিল তাজমহলে। তাজমহলের বিরাট বিস্তৃত শ্বেত পাথরের চত্বরে বসে বসে সরলা বলেছিল, মমতাজ ও সাজাহান এখনও বোধ হয় এখানেই আছে। দু'জনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এবং দু'জনে এই তাজমহল ছেড়েও কোথাও যেতে পারে না। হ্যাঁ গো, সারা রাত জেগে থাকলে তাদের কি দেখা পাওয়া যাবে না ?

সরোজের দেওয়া উত্তর এবং সরলার প্রত্যুত্তর দুটোই সরোজের মনে আছে। সরোজ বলেছিল সম্রাট সাজাহান এখানে যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে আমাদের দেখে এখনই জল্লাদকে ডেকে বলবে, কাফেরগুলোকে কোতল কর, আমার ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করছে।

সরলা প্রতিবাদ করে বলেছিল, কখনও না। মমতাজের সঙ্গে সাজাহানের যে সম্বন্ধ ছিল, আমার সঙ্গে তোমার সেই সম্বন্ধ দেখলে সাজাহান নিশ্চয়ই আমাদের আদর করে বসিয়ে তোমার ভেতর দিয়ে সাজাহান নিজেকে নিরীক্ষণ করতেন।

সরোজ হেসে উঠে বলেছিল, তুমি এবার পদ্য লেখ, কবি হতে পারবে।

সুখে ও পূর্ণতায় সরলা সরোজের কাঁধে মাথা লুটিয়ে বসেছিল। টাঙ্গাওয়ালা এসে তাড়া না দিলে ওরা বোধ হয় সারা রাতই তাজের চত্বরে কাটিয়ে দিত।

সেদিনও এদিন, সরোজ বসে বসে ভাবতে লাগল, কত তফাৎ ! সে আজ কোণারকে জেগে বসে আছে, কিন্তু সরলা কোথায় ? আচ্ছা, সরোজ যেমন তার কথা মনে করছে, সরলাও কি তার কথা মনে করে না ? নিশ্চয়ই করে। হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করলে, মৃত্যুই যে শেষ তা নয়। গীতায় বলেছে মৃত্যু মানে পুরাতন কাপড় ফেলে দিয়ে নববস্ত্র পরিধান করা। সরলা এখন নতুন দেহ নিয়ে নতুন রূপে কোথায় জন্মেছে কে জানে। যদি জানা যেত তা হলে সরোজ নিশ্চয়ই তার কাছে যেত। নতুন সরলা নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পারত না, কিন্তু সরোজ তাকে দেখত, দূর থেকে একটিবার সে নিশ্চয়ই দেখত। নিশ্চয়ই পুরানো সরলার কিছু চিহ্ন সে নতুন সরলার মধ্যে খুঁজে বার করতে পারত। তবে শুধুই সে দেখত, কোন পরিচয়ই সে দিত না। আর পরিচয় দিলে লোকেই কি বিশ্বাস করত ? বলত. পাগল হয়ে গেছে। মুন্সেফবাবু বউয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে।

চোখ রগড়ে খাড়া হয়ে বসল সরোজ। ম্লান হাসি হাসল সে, সে বোধ হয় সত্যিই পাগল হয়ে গেছে, না হলে রাত দুপুরে জেগে জেগে পাহারা দিতে গিয়ে সে এ সব আবোল তাবোল কি ভাবছে !

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলে, রাত বারোটা।

হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে, কিন্তু না, ঘুমানো চলবে না। উঠে দাঁড়িয়ে রোয়াক থেকে নেমে হারিকেনটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে। তেল আছে ত। নেড়ে দেখলে আছে। রেণু কোন রকম বে-আক্কিলে কাজ করে না। বাস্তবিক, রেণুকে না পেলে সরোজের যে কি দুর্গতি হোত! সরলা বোধ হয় অন্তর্যামী ছিল। সেই ত বলেছিল, ওয়েট নার্স তাড়িয়ে দিয়ে পল্লীগ্রাম থেকে একটি ভাল মেয়ে জোগাড় করে আন। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, সে থাকবে না, তার দিন ফুরিয়া আসছে। তাই সে অত আগ্রহ করে এমন একজনের সন্ধান করছিল, যে তার সংসার গুছিয়ে রাখবে, তার ছেলে-মেয়েদের দেখবে, মানুষ করবে।

সকলেই ঘুমুচ্ছে। ছেলে বুড়ো সকলেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সারাদিনের খাটুনি, রোদ্দুর, ধুলো বালি, হয়রাণীর চূড়ান্ত। এখন রাত্তিরে ফাঁকা জায়গায় সুন্দর বাতাস, স্নিগ্ধ শান্তি, সরোজ সকলের তৃপ্ত নিদ্রার সুশান্ত দৃশ্য চোখ ভরে দেখতে লাগল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তাদের নীচেই দাঁড়িয়ে আছে কালো রঙের কোণারক মন্দিরের চূড়াভাঙ্গা শীর্ষদেশ, বাতাসে গাছের পাতার একটানা শির শির শব্দ আর দূরে, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটানা ঘুম-পাড়ানী সুর। ওটা বোধ হয় সমুদ্রের শব্দ, সামুদ্রিক ঐক্যতান।

এদিক ওদিক ঘুরে সরোজ পুনরায় নিজের জায়গায় এসে বসল। একটা বই টই থাকলেও পড়া যেত। না হয় বই পড়েই রাত কাটিয়ে দিত সে। কিন্তু বই ত কিছুই নেই যাও বা দু'খানা এনেছিল, তাও সে পুরীতে রেখে এসেছে, যদি বুদ্ধি করে একখানাও সঙ্গে নিয়ে আসত।

রেণুর কোলের ভেতর অমু শুয়ে আছে। অমর আছে পেছন দিকে বোধ হয় মশা কামড়াচ্ছে। না হলে পা ছুঁড়বে কেন?

রেণুর বুকের কাপড় সরে গেছে। জামার বোতাম খোলা। অমর তার খাদ্যের সন্ধানে রেণুকে আরও অবারিত করলে। র‍্যাফেলের বিখ্যাত ছবি ম্যাডোনার কথা সরোজের মনে পড়ল।

এমনই ভাবে বহু রাত্রে সরোজ সরলাকেও দেখেছে। দেখেছে অলকের বেলা, দেখেছে অপর্ণার বেলা। মা ও ছেলের ঘনিষ্ঠতম রূপ সে দেখেছে, কিন্তু ঐ বাৎসল্যের মধ্যে নিজের পরুষ অস্তিত্বে কোনরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করার সাহস সে কোনদিনও পায় নি। পবিত্র সুন্দর ফুলকে গাছের শাখায় দেখেই সে তৃপ্তি পেয়েছে, ফুল ও শাখার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজেকে উৎকটভাবে জাহির করতে সরোজ কোন বারেই লোভীর মত লোলুপহস্ত প্রসারণ করে নি।

কিন্তু এবারে ও কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ঐ সুন্দর নারী বল্লরীতে তার কোন অধিকার নেই। যে অধিকারবোধ পুরুষকে তৃপ্ত, শান্ত, সমৃদ্ধ করে সেই অধিকার বোধটুকু এখানে একেবারেই নেই। তাই বোধ হয় নাস্তিমনের হতাশায় সরোজ মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হয়ে পড়েছিল।

সরোজ ভাবতে লাগল, জীবন ক'দিনের? এই যে সরলা চলে গেল, দেখতে দেখতে প্রায় এক বছর হয়ে গেল। সে ত এখন শুধুমাত্র স্মৃতি, আর স্মৃতি মানে ছায়া। ছায়া নিয়ে সবলদেহ সুস্থ মানুষের কদিন চলে। দু'চার দিন চর্ব্বচোষ্য ভোজ খেয়ে বাকী দিনগুলো কি সেই ভোজের স্মৃতি নিয়ে দৈহিক মানুষের দিন কাটানো সম্ভব! খাদ্য তার চাই, সেটা যে প্রত্যহের প্রয়োজন, সেই খাদ্য যেমন পেটের তেমনি মনের এবং দেহেরও বটে। কিন্তু খাদ্যই যে দুর্লভ!

ঘুমের মধ্যেই রেণু একটু নড়েচড়ে উঠল। অভ্যাস বশে বুকের ওপোর কাপড় টানলে।

খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বসেই সরোজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। গাড়োয়ানগুলো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গরু-গুলোও স্থির হয়ে আছে, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা বড় পাখি, বোধ হয় কোন সামুদ্রিক চিল সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল। পূর্ব্বদিকে বোধ হয় একফালি চাঁদ উঠেছে, ওধারটা যেন বেশ আলো-আলো মনে হচ্ছে। হঠাৎ আলোর রেশে সরোজের কেমন ভয় হোল, সে চোখ বুজে ফেল্লে।

আপন বলতে রেণুর কেউ কোথাও নেই। সেইটাই হোল সরোজের প্রধান বিপদ। নিজের ক্ষুধার্ত্ত স্বার্থ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওকে ত কোথাও তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না। না হলে এ কথাও সে অনেকদিন ভেবেছিল। সেই

যে-রাত্রে বৃষ্টির জলে হাপুস্হুটি হয়ে সরোজ ভিজেছিল, সেই রাত্রিতেই ও ভেবেছিল, রেণুকে বলবে, তুমি অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাক, ইচ্ছে হয় দুটো ছেলেকেই তোমার কাছে নিয়ে রাখ, যা খরচ পড়ে সে-সব দিতেও সে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার ত থাকার কোন জায়গাই নেই, এবং তার কোন দোষও ত নেই। একজনের দুর্ব্বল মনের শাস্তি কি অপরকে নির্ব্বাসন দিয়ে পূরণ হবে। এই সব দুরূহ জটিল জীবন সমস্যার কোন মীমাংসাই সরোজ খুঁজে পায় না।

এক—এক মীমাংসা আছে। কিন্তু—কিন্তু সে কথা হয়ত মনের কোণে অজ্ঞাতসারে একআধবার তার মনে উদয় হলেও মুখ ফুটে সেই প্রস্তাব কি করা যায়! ছিঃ! হয়ত রেণু মনে করবে যে, তাকে সহায়-সম্বলহীনা অন্নদাসী ভেবে ধনবান সরোজ তার ওপোর অহেতুক করুণা দেখাচ্ছে, কিম্বা এও মনে করতে পারে যে, তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সরোজ তার ওপোর জুলুম করছে। তার দিক থেকে কোন রকম আভাসমাত্রও পাওয়া যায় নি, কাজেই বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব—না, না, সে হয় না, ছিঃ!

ছিঃ! সরোজেরও একটা সমাজ আছে। সে সমাজ পরের কুৎসায় সদাই মুখর। উকীল মহলে এবং সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে ওর অপকীর্ত্তির কাহিনী। গ্রামের লোক যারা ওর কাছে বিচারের জন্য আসবে, তারা হয়ত পূর্ব্বের মতই ভক্তি দেখাবে, কিন্তু মন থেকে ভক্তি আর করবে না, করতে পারে না। নিজের ওপোর নিজেই ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। আত্মীয় স্বজন সকলেই যেটা এতদিন ধরে সন্দেহ করে আসছে, সেই সন্দেহটাই প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওর মনে হয়েছিল, মূর্খ, গ্রাম্য, আত্মীয় পরিজনশূন্য যুবতী রেণু যদি অম্লানবদনে একক জীবন যাপন করতে পারে, তাহলে শিক্ষিত এবং রুচিবান সরোজই বা পারবে না কেন? রেণু আসার পর থেকে সরোজের পারিবারিক কোন অসুবিধাই ত নেই। সংসারের ভার, ছেলেমেয়ের ভার সমস্ত ভার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। বাজার করা, রান্না করা, ঘর-বাড়ী নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা, ছেলেমেয়েদের যত্ন নেওয়া কোথাও কোন অসুবিধাই ত নেই। সরোজকে এর আগে এত যত্নও ত কেউ করেছে বলে সরোজ মনে করতে পারে না। এমন কি সরলার আমলেও যেমন ছিল, এখন তার চেয়েও অনেক বেশী সুখে আছে, সুখ যদি পারিবারিক ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার বস্তু হয়। সরলা ওকে এত যত্ন করতে পারত না, এভাবে কাজ করতে সে জানতই না, উপরন্তু তার নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম চাহিদা এত বেশী ছিল যে, সরোজ মধ্যে মধ্যে সেই জন্যই বিব্রত বোধ করত। কিন্তু রেণুর নিজের বলে কিছুই ত নেই। অথচ যান্ত্রিক নিপুণতায় সকলের সব কিছু প্রয়োজন সে একাই পূরণ করে। সরলার আমলে ঝি এবং রাঁধুনীর জন্য যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট ছিল, রেণুর আমলে সেটা নেই বল্লেই হয়। অথচ আহার্য্যের মান অনেকখানি উন্নত হয়েছে।

সরোজের বিশ্বাস, রাজসিক আহারই ওর প্রধান শত্রু। বিধবা রেণু নিরামিষ ভোজনের ফলে যে ভাবে বৈধব্যের শুচিতা বজায় রেখে চলে, বিপত্নীক সরোজকেও সেই ভাবেই চল্‌তে হবে। যে রাত্রে সরোজ নিজের মনোবিকারে নিজেকে ধিক্কৃত করেছিল, বৃষ্টির অঝোর ধারে পাগলের মত নিজেকে অর্পণ করে শান্তি চেয়েছিল, সেই রাত্রেই সরোজ ঠিক করেছিল, বিধবার আহারই ওর পক্ষে এক-মাত্র প্রতিষেধক। তাই পরদিন থেকেই মাংস ভোজন একেবারে বর্জ্জন করেছিল এবং সেই সঙ্গে যথাসম্ভব রেণুর সান্নিধ্য বর্জ্জন করেই চল্‌তে চেয়েছিল।

আজকের নিশীথ রাত্রে কোণারকের গভীর সুষুপ্ত পরিবেশে সরোজ আত্মসমীক্ষায় উপলব্ধি করলে, যে-সাধনা ও এতদিন করেছে সেই সাধনায় ওর সিদ্ধি হয় নি। ওর পঁয়ত্রিশ বছরের বুভুক্ষিত যৌবন, অর্থ, প্রতিপত্তি, সুনাম, মর্য্যাদা সবের ওপোর আরও একটা এমন জিনিসের কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে যেটা মুখ ফুটে বলা হয়ত যায় না, কিন্তু সেটা না পেলে ওর চলবে না। মন থেকে সমস্ত দৌর্ব্বল্য ঝেড়ে ফেলে ও স্থির নিশ্চয় হোল যে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রথম সুযোগেই রেণুর কাছে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব ও করবে, তারপর রেণু যা বলে, সেই মতই কাজ হবে। ওর নিজের প্রয়োজনে রেণুর ওপোর জোর করে কোন দাবী ও করবে না। ও প্রার্থী হতে পারে কিন্তু দস্যু হতে পারবে না।

গা ঝাড়া দিয়ে সরোজ উঠে দাঁড়াল। রোয়াক থেকে

নেমে মাথার ওপোর হাত দুটো তুলে সশব্দে হাই তুল্লে। এইটুকু শব্দে যদি রেণুর ঘুম ভাঙ্গে ত ভাঙ্গুক, কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমজাত যে নিদ্রা, সেই নিদ্রায় কোনরূপ ব্যাঘাতই হোল না।

পকেট থেকে ঘড়ি খুলে সরোজ আর একবার ঘড়ি দেখ্লে। রাত্রি দুটো।

তাহলে রেণুকে ডাকার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। হ্যারিকেনের আলোটা কম বলে মনে গেল, সলতেটা একটু বাড়িয়ে রোয়াকে উঠে রেণুকে ডাকবে বলে মনে করে ডাকতে গিয়ে কেমন এক অপরিসীম মায়ায় ওর মনটা অভিভূত হয়ে উঠল। নিজের ব্যক্তিগত আরামের জন্য এমন একটা নিটোল ঘুম সে নষ্ট করবে! সারাদিন বেচারী গরুর গাড়ীর ধাক্কায় স্থির হয়ে বসতে পর্যান্ত পায় নি। এখন যদি আরামই সে পায়, তা হলে সরোজ কি নিজের স্বার্থে সেই আরামে বাধা দেবে। নাঃ, তা ছাড়া তার নিজের ঘুম ত ছেড়েই গেছে। এখন কি আর ঘুম তার আসবে?

আর এক কথা, বিয়ের প্রস্তাব করবে এইটে ঠিক করার পরই কে যেন ওকে আশ্বাস দিলে যে, রেণু এই প্রস্তাবে 'না' করবে না। ভাবতে ভাবতে, কিম্বা না ভেবেই ওর যেন মনে হোল, রেণুও তাই চায়, ওরা যেন দাম্পত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধই হয়ে গেছে। হ্যারিকেনের উজ্জ্বল আলোয় রেণুর দিকে অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে ওর যেন মনে হোল, রেণু ত ওরই জিনিষ, ওকে কাছে পাবার জন্য, ওর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ততার কারণ কি? সরোজের কাছে দেহমন সম্পূর্ণভাবে গচ্ছিত রেখে রেণু আজ পরম নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে নিক; সরোজই আজ বাকী রাতটুকু পাহারা দিয়ে স্বামী, প্রভু, পালনকর্ত্তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুক।

রোয়াক থেকে নেমে সরোজ পায়চারী করতে সুরু করলে। ঝির-ঝিরে হাওয়া, ঝাঁ-ঝাঁ রাত, দূরে এক ফালি চাঁদ, গরু ও মানুষের নিশ্বাসের শব্দ, মাঝে মাঝে গাছের মাথায় পাখীদের পক্ষ বিধূনন, অল্প দূরেই কোণারকের কৃষ্ণবর্ণ মন্দির, বিদেশীদের ভাষায় যার নাম Black pagoda, এবং সর্ব্বোপরি রেণু-লাভের স্বয়ংক্রিয় আশ্বাসে অপরূপ মানসিক শান্তি, সরোজ নিজেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই পৃথিবীর সেরা ভাগ্যবান বলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। অনিদ্রার ক্লান্তি তার একটুও নেই, অনেকদিন পরে দেহমনে সে আজ সত্যিই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

সমু হঠাৎ ছটফট করে কেঁদে উঠল। তার চারটে হাত পা দিয়ে সে রেণুর পিঠে ধাক্কা দিতে সুরু করলে। রেণু সজাগ হয়ে এ পাশ ফিরে অভ্যাসমত হাত দিয়ে দেখে সমুর ভিজে কাঁথাগুলো সরিয়ে পায়ের দিকে ফেলে দিয়ে ছেলেকে চাপড়াতে লাগল। এতক্ষণ বোধ হয় তার মনেই ছিল না যে সে বাড়ীতে নেই, সে কোণারকের রোয়াকে শুয়ে আছে এবং শেষ রাত্রে তাকে জেগে উঠে পাহারা দিতে হবে। সমু একটু শান্ত হয়ে ঘুমুতেই হঠাৎ রেণুর মনে পড়ল সে কোথায় আছে এবং কি তাকে করতে হবে। দু'পাশের দুই বাচ্চার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যাতে তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত না হয় এইভাবে সন্তর্পণে রেণু নিজের বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়ে দেখলে, সরোজ রোয়াকের নীচে দাঁড়িয়ে আছে এবং হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল সরোজের প্রশান্ত মুখে মৃদু মৃদু হাসি। ঐ মুখে এতখানি আন্তরিকতা সে বোধ হয় আর কখনও দেখে নি।

বাবা, আপনি আমায় ডাকেন নি, রেণুর কণ্ঠে অপরাধ ও ক্ষোভের সুর ফুটে উঠল।

সরোজ শিউরে উঠল, কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে বল্লে, ঘুমুচ্ছ, ডেকে আর কি হবে?

বাঃ, সারারাত জেগে থাকলে আপনার শরীর খারাপ হবে যে। নিন, শুয়ে পড়ুন, আমি এবার বসছি। আঙুল দিয়ে রেণু অলকের ওপাশে সরোজের জন্য যে জায়গাটা করা হয়েছিল সেইটে দেখিয়ে দিলে।

রোয়াকের ধারে পা ঝুলিয়ে সরোজ বসল। বল্লে, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর শুয়ে কি হবে?

না না, সে হয় না, আমি তাহলে—

তুমি তাহলে কি? স্মিতহাস্যে সরোজ প্রশ্ন করলে।

আমি মাথা খুড়ে মরব, যান, শুয়ে পড়ুন। কথাগুলো রেণু না ভেবেই বলে ফেল্লে, কিন্তু নিজের উচ্চারিত কথা নিজের কাণে যেতেই রেণু লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। ছি

ছি, এ-ভাবে বাবার ওপোর কোনদিনই জোর সে দেখায় নি। বাবা কি ভাববে ?

কিন্তু সরোজের মুখে কোন ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন মাত্রও নেই। অপরিসীম তৃপ্তি ও স্মিত হাস্যে সরোজ তার নিজের জায়গায় গিয়ে জুতো খুলে বসল। বল্লে, এখন আর ঘুম আসবে না রেণু, তার চেয়ে বরং বসে বসে গল্প করা যাক্।

রেণু রোয়াক থেকে নেমে অনেকখানি দূরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সরোজ বসে বসে ভাবতে লাগল, ভালোবাসার ভাষা সর্ব্বত্রই এক। সরলাও এমনই ভাবে মাথাখোড়ার হুম্‌কি দিত।

পায়ে পায়ে রোয়াকের ধারে এগিয়ে এসে রেণ্ দেখলে সরোজ এখনও বসে আছে। ধীর কণ্ঠে বল্লে, এখনও শোন্ নি। শুয়ে পড়ুন, আমি এখন বসি।

সরোজ বল্লে, বোসো না, বোসো,—ইচ্ছে হোল কাছে এসে বসার জন্য অনুরোধ করতে, কিন্তু বলতে পারলে না, মুখে আটকে গেল।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রেণু বল্লে, সত্যি আমারই অন্যায় হয়েছে। আপনিও ডাকেন নি, আমারও ঘুম ভাঙ্গে নি—

সরোজ বল্লে, তাতে কি, আমার কোন কষ্ট হয় নি, বেশ ভালই লাগছিল।

না বাবা, আপনি একটু গড়িয়ে নিন, না হলে কাল সকালে সত্যি আপনার শরীর খুব খারাপ হবে—

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সরোজ শুয়ে পড়ল। ভাবলে, আজ থাক, প্রস্তাবটি কাল পরশু সময় সুবিধে বুঝে করা যাবে।

পরের দিন সকালে সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে দুধ কিনে রেণু সেই দুধ জাল দিলে, হালুয়া তৈরী করলে, পুরী থেকে নিয়ে আসা কলা দিলে, ভরপেট প্রাতরাশ শেষ করে ওরা গেল মন্দির দেখতে।

মন্দিরের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখে ছোট সরু পাথরের ধাপ দিয়ে ওরা ওপোরেও উঠল। অমু ছিল রেণুর কোলে, ঝিয়ের কোলে সমর, ছড়িদার অলকের হাত ধরে যাচ্ছিল, সরোজের হাত ধরে উঠছিল অপর্ণা। খুব সাবধানে উঠতে হবে, একটু এদিক ওদিক হলেই নিশ্চিত মৃত্যু।

অলক ও অপুর তুলনায় রেণুও কম বিস্মিত হয় নি তবে ছেলেদের মত অসংখ্য প্রশ্নও করেনি। কেবল সবটুকু জিনিষ সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল এবং সেই সঙ্গে ঝিয়ের দিকে নজরও রাখছিল। পড়ে না যায়। ছোট বড় গোটা কতক ফিগার দেখে রেণু প্রথমটা বিস্মিত হোল, তারপর অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, দেবতার মন্দিরের কারুকার্য্যে ও যা ভাবছে তাও কি সম্ভব! ছিঃ, ও নিশ্চয় বুঝতে পারছে না।

কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়। ঝি'টা কি কোন সদুত্তর দিতে পারবে।

রেণু চেপে গেল। কিন্তু দেখলে, সরোজও ঐগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে নিরীক্ষণ করছে।

অপু বল্লে, কি বাবা, কি দেখছ ওগুলো ?

অলক বল্লে, কি রে অপু ? কি আছে ওখানে ? সে ছড়িদারের হাত ছাড়াবার জন্য টানাটানি সুরু করলে।

সরোজ বল্লে, কি আবার ? নানা রকম নক্‌সা, চিত্র-বিচিত্র করা। কিন্তু কথাগুলো বলার সময় সরোজ রেণুর দিকে পিট্‌পিট্ করে তাকাচ্ছিল। রেণু তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

সকাল-সকাল ভরপেট ভাত খেয়ে ওরা রওনা দিয়েছিল।

এবার অন্য পথে যাত্রা। একেবারে সমুদ্রের ধার দিয়ে, কারণ ছড়িদার বল্লে, সমুদ্রের চড়ায় আছে বেলেশ্বর শিব-মন্দির, তারপর যেন আরও একটা কি মন্দির আছে।

সমুদ্রের চড়া দিয়ে গরুর গাড়ীর যাত্রা কি চমৎকার! মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এসে গাড়ীর চাকা, গরুর পেট পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্চে। সরোজ, অলক, ছড়িদার সকলেই গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। খালি পায়ে ভিজে ভিজে বালির ওপোর হাঁটায় কি মজা!

দেখাদেখি অপুও নেমে পড়ল। রেণু তাকে আটকে রাখতে পারলে না। শেষে অলকের চেঁচামেচিতে রেণুকেও নামতে হোল। বাচ্চা দুটো ঝিয়ের কাছে গাড়ীর মধ্যেই রইল।

সূর্য্য তখন সমুদ্রের উল্টোদিকে বালুময় মরুভূমির কাছাকাছি, কিন্তু তার লাল আভা এসে পড়ছে সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউগুলোর মাথায় মাথায়। রেণু সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু অলকদের হুল্লোড় কলরব, ঐ

একটা ঐ একটা করে বালি থেকে ঝিনুক কুড়ানো সব মিলিয়ে রেণুর পক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা আর সম্ভব হোল না। সেও হেঁট হয়ে ঝিনুক কুড়োতে সুরু করলে।

সেই ঝিনুকগুলোর কি বাহার! এ অঞ্চলে লোকজন বড় একটা আসে না। এই যে ওরা আজ বিকালে এখান দিয়ে যাচ্ছে, বালুকাময় দিগন্তের পশ্চিম প্রান্ত থেকে দিক্-চিহ্নহীন সমুদ্রের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটা গাছ নেই, ওদের দল ছাড়া অন্য একটা মানুষ অবধি নেই, ও এক অদ্ভুত অনুভূতি। পুরীতে সমুদ্রের ধারে ভোর থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত নানা রকমের লোক, ভ্রমণকারী, স্নানার্থী, জেলে, নতুন স্নানার্থীর প্রতীক্ষায় নুলিয়া, সব সময় ভিড় আর ভিড়। পুরীতে ছেলে বুড়ো সকলেই ঝিনুক তোলে। ভাল ঝিনুক সেখানে দুর্লভ, কিন্তু রং-বেরঙের অসংখ্য লোভনীয় ঝিনুক এখানে লক্ষ লক্ষ ছড়িয়ে রয়েছে সৈকতের ওপোরে ওপোরে চতুর্দ্দিকে, কুড়িয়ে শেষ করতে কেউ কখনও পারবে না। কুড়াবার লোক নেই বলেই এখানে এগুলো এমনভাবে যেন গ্রহীতার জন্যই অপেক্ষা করছে।

ঝিনুক ওরা সকলেই কুড়োতে কুড়োতে এগুতে লাগল। ঝিনুক ও সমুদ্রের ফেনা, কুড়োচ্ছে, পরস্পরকে দেখাচ্ছে, তারিফ করছে। সরোজ অলককে দেখায়, রেণুকে দেখায়, ছড়িদার পর্য্যন্ত ঝিনুক কুড়িয়ে অলককে দেয়, সরোজকে দেয়। ওদের পকেট, রুমাল, রেণুর আঁচল সমস্ত ভর্ত্তি হয়ে গেল। শেষে রেণু গাড়ী থেকে বড় গামছা এনে, গামছার খুঁটে গেরো দিয়ে ঝোলা তৈরী করলে, সেই ঝোলাও প্রায় ভর্ত্তি। এমন সময় দূরে একেবারে জলের ধারে দেখা গেল খুব ছোট্ট ও নীচু একটা চুণকাম করা ঘর। ছড়িদার বল্লে, ঐ হোল বেলেশ্বর শিবের মন্দির।

মন্দির দেখে ওদের এমন কিছু ভাল লাগল না। রেণু উপুড় হয়ে প্রণাম করলে, অন্যেরা অভ্যাস মাফিক নমস্কার সেরে ভিজে বালির ওপোর দিয়ে এগিয়ে চলল। মন্দিরে পূজারী বা কোন লোক কেউই ছিল না। সরোজ একটি পয়সা দিয়ে নমস্কার করলে, ছড়িদার পয়সাটা তুলে ট্যাকে গুজল।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্তে গেল। গোধূলির আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। ওরা গাড়ীর কাছে এসে বিস্কুট ও জল খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী অভ্যস্ত গতিতে পূর্ব্বের ন্যায় চলতে লাগল।

অন্ধকারে রেণু দেখলে, সমুদ্রের কি বাহার! ঢেউয়ের মাথায় এবং গায়ে জলের ভেতর মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। জলে আগুন, কি অদ্ভুত। রেণু আপন মনেই দেখছে, এক একবার ক্লান্তি ও অবসাদে চোখ বুজে আসছে।

ছইয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বসে কেমন ওর তন্দ্রাই এসেছিল। হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বরে চোখ চেয়ে দেখলে, অনেকগুলো টেমির আলো এখানে ওখানে জলছে। অনেক সব লোকজন, গাড়ীটাও থেমে গেল। ও গাড়ী থেকে সরোজ, অলক এবং ছড়িদার নেমেছে। রেণু ভাবলে, তাহলে বোধ হয় পুরী এসে গেছে।

সরোজ এসে রেণুকে ডেকে বল্লে, রেণু, এইখানেই আজ রাত্রি কাটাতে হবে। কাল বিকালে যে নদীটা পার হয়েছিলুম, ঐ সেই নদী। রাত্রে পার হয়ে যাওয়া যাবে না, কাল সকালে নদী পার হতে হবে।

ঘুমন্ত শিশুদের গায়ে ঢাকা দিয়ে রেণু গাড়ী থেকে নেমে এল, ঝিটাও নামল। বল্লে, থাকা হবে কোথায়?

অলক বল্লে, গাড়ীতেই দিদি। রাত্তিরে গাড়ীতেই শুয়ে থাকব, কি মজা!

সরোজ বল্লে, অপু কোথায়, অপু?

রেণু বল্লে, সে ঘুমিয়েছে, অনেকক্ষণ থেকেই সে ঘুমুচ্ছে।

সরোজ বল্লে, তা হলে পদ্মনাভ, তুমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা দেখ—

বাধা দিয়ে রেণু বল্লে, বাবা, সঙ্গে চিড়ে মুড়কী আছে, কলাও অনেকগুলো আছে। এখান থেকে খাবার কিনে আর কি হবে?

ঢোক গিলে সরোজ বল্লে, আছে বুঝি? বা বা বেশ, সব গুছিয়ে এনেছ দেখছি। ছড়িদারের দিকে চেয়ে বল্লে, তাহলে পদ্মনাভ, আমাদের জন্য কিছু চাই না, তোমরা কি খাবে সেই জোগাড় করে নাও গিয়ে।

গাড়োয়ানগুলো গাড়ী দু'খানার সামনে পেছনে ঠেকো লাগিয়ে গরু খুলে দোকানের দিকে নিয়ে গেল, বোধ হয় ওদের খাওয়াতে। রেণু বল্লে, দুধ পাওয়া যাবে না?

সরোজ বল্লে, আর দুধে দরকার নেই। দোকান-গুলোর যা মূর্ত্তি, এখান থেকে দুধ কিনে খেতে প্রবৃত্তিই হবে না।

রেণু ওর পুটলী থেকে চিড়ে মুড়কী কলা এই সব বার করে ছোট ছোট রেকাবীতে সেইগুলো নিয়ে সরোজ ও অলককে দিয়ে গাড়ীর পেছন থেকে সকালের রান্নার পর যে শুকনো কাঠগুলো বাড়তি ছিল সেই তুলে-আনা কাঠের বাণ্ডিল থেকে সরু দেখে কয়েকখানা কাঠ নিয়ে গরুর গাড়ী থেকে একটু দূরে বসে কেরাসিন তেল দিয়ে ভিজিয়ে দেশলাই ধরালে। সরোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুকনো চিড়ে খাচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে বল্লে, ওকি, এখন আবার আগুন জেলে কি হবে, রান্না করবে নাকি ?

রেণু বল্লে, না, জল গরম করে হরলিক্‌স্‌ করব। আপনারাও খাবেন আর অপুকে একটু বেশী করে হরলিক্‌স্‌ই খাইয়ে দেব। ও যা ঘুমুচ্ছে, ওকে ঐ চিঁড়ে খাওয়ান যাবে না।

সরোজ খুসি হয়ে গেল। রেণুর এত বুদ্ধিও আছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে, কখনও বিদেশে বেরোয় নি, কিন্তু তার যা ব্যবস্থা, সরলাও এ রকমটা পারত না।

চিড়ে খেতে খেতে মনে হোল, সেবারও সরলাকে নিয়ে গিয়েছিল দার্জিলিং-এ। সেখান থেকে কার্সিয়ং-এ বেড়াতে গিয়ে ফেরার সময় ট্রেণ ফেল করে টোঙ্গায় দার্জিলিং ফিরতে গিয়ে সে কি এক বিষম বিভ্রাট।

সরলা রেগে কেঁদে হাত পা ছুড়ে কি অনর্থপাতই যে করেছিল।

সরোজ সেদিন বাধ্য হয়ে ধমকও দিয়েছিল তাকে, এবং তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞাও করেছিল যে আর তাকে নিয়ে কোথাও বেরুবে না। প্রতিজ্ঞা সে অবশ্য রাখে নি এবং প্রতিজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যেই যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তাও বোধ হয় না। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের তুলনায় রেণু সম্বন্ধে সরোজের প্রশংসা আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে দেখা দিল।

সে রাত্রিটা সংকীর্ণ গরুর গাড়ীর মধ্যে কোন রকমে কাৎ হয়ে কেটে গেল। ছড়িদার ও উড়েনী ঝিটা কোথায় যেন অন্যত্র গিয়ে শুয়েছিল। দুখানা গাড়ীর একটাতে সরোজ অলককে নিয়ে এবং অন্যটায় রেণু অপু ও বাচ্ছা দুটোকে নিয়ে আধা ঘুমে আধা জাগরণে রাত কাটিয়েছিল।

পরের দিন ভোর বেলায় সাল্‌তি নৌকায় নদী পার হয়ে পথে আর একটা মন্দির দেখে পুরী পৌঁছাতে বিকাল গড়িয়ে এল।

কিন্তু সরোজের মনের কথা রেণুকে বলার কোন সুবিধেই সে পুরীতে করতে পারলে না। ঠিক করলে এখন থাক, বর্দ্ধমানে ফিরেই না হয় বলা যাবে। [ক্রমশঃ

আকবর

শ্রীকালিদাস রায়

ইতিহাস বলে তুমি ছিলে নিরক্ষর
কিন্তু ছিলে অসামান্য কৌশলী ধীমান
হিন্দু দেশে তাই ক্রমে করি অভিযান
হইলে এ ভারতের রাজ রাজেশ্বর।
ক্ষুদ্র রাজ্য গড়েছিল বিজয়ী বাবর
দিল্লী হ'তে রাতারাতি তাড়ায়ে পাঠান
তুমি গ্রাসিলে ক্রমে সারা হিন্দুস্থান
তব হিন্দুগণ তব ভক্ত বরাবর।
ধন্য তব রাজনীতি প্রজা শুভঙ্কর
ধন্য তব নিরপেক্ষ শাসনবিধান।
প্রমাণ করিলে তুমি রাজদণ্ড ধর
যেই হোক—হিন্দু বৌদ্ধ মোসলেম খৃষ্টান
প্রজাহিত সাধে যদি সবাই সমান
না করিলে সুশাসন হিন্দুরাজও পর।

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

ফাল্গুন মাসের ফল

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত পৌষ সংখ্যায় আমরা বুধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে বুধ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

বুধের প্রধান কাজ বুদ্ধি-জগতে। এ-জগতে বুদ্ধির মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে বুদ্ধিই প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন। বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান হতে বুদ্ধি জন্মে। বুদ্ধি হচ্ছে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফল; অথবা নিজের উদ্ভাবিত কলা-কৌশল। বাক্‌চাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়োচিত আচরণ বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ রূপান্তর। কোন্ অবস্থায় কি করা কর্তব্য, বুধ সহজ বুদ্ধিবলে অনায়াসেই তা বুঝতে পারেন; এটি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি কোন কঠিন সঙ্কটে দিশেহারা হন না। বরং তিনি নিজ বুদ্ধিবলে অবস্থানুযায়ী নূতন কোন কৌশল বা উপায় উদ্ভাবন করে জয়ী হয়ে থাকেন। উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা তার অসাধারণ। তিনি সহজেই অনেক দুরূহ কাজ করতে পারেন, এমন কি নানা বাধা অতিক্রম করে অভীষ্ট সাধন করতে পারেন। সুতরাং যাঁদের বুধগ্রহ বলবান, তাঁদের বুদ্ধি প্রখরতর এবং তাঁরা মানবসমাজের পুরোধারূপে স্বীকৃত। পৃথিবীতে যত বড় বড় কবি, শিল্পী, চিকিৎসক, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা বুধের জাতক। আবার বুধ বুদ্ধির দ্বারা শারীরিক শক্তির অভাবও সচরাচর পূরণ করতে পারেন। তার শারীরিক শক্তি বহু পশুর তুলনায় নিতান্ত কম হলেও তিনি পশু সমাজের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন। তার বুদ্ধির শক্তির নিকট পশুশক্তি পরাজিত। সুতরাং বুধের জাতক শক্তিশালী সিংহ, হিংস্র বাঘ বা বিরাটদেহ হাতী প্রভৃতি পশুদের তার চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ রাখতে পারেন, এমন কি তাঁর সার্কাস খেলার উপকরণও করতে পারেন।

দৈনন্দিন জীবনেও বুধের বুদ্ধির পরিচয় সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তিনি পড়াশুনায় যেমন দক্ষ, খেলাধুলায় তেমন পটু; তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত—সকলের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে জানেন। কোন নূতন স্থানে যেতে তিনি হতবুদ্ধি হন না, বাজারের দোকানী তাকে ঠকাতে পারে না; সংসারে চলবার সব রকম বিদ্যাবুদ্ধি তার আছে। তিনি প্রাতরুত্থায়ী ও সময়নিষ্ঠ; স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে রোগের হাত হতে মুক্ত থাকেন। তিনি নীতিধর্মপরায়ণ ও সদাচারী। সে জন্য তার মধ্যে কতকটা পৌরুষ ও স্বাধীন মনোবৃত্তি লক্ষিত হয়। তিনি শোকদুঃখ বা বিপদাপদে সহজে মুহ্যমান হন না।

বুধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আলোচনা করছি!

মেষ—আপনার স্বাধীনতা একটু খর্ব হতে পারে। অথচ কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ব্যাপারে মনের ওপর চাপ পড়তে পারে। শরীর মাঝে মাঝে হয়ে পড়বে

অবসন্ন। দেখা দেবে অবসাদ। পিতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। মাতার স্বাস্থ্য কিন্তু ভাল যাবে না। বাইরে যাবার যোগ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অশান্তি ভোগ করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের সময়টা গোলমেলে। মহিলারা বান্ধবী সম্বন্ধে সাবধান।

বৃষ—আত্মতৃপ্তিতে কেটে যাবে এমাস। আর্থিক অবস্থা ভাল। কর্ম-প্রচেষ্টা বাড়বে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বৈষয়িক ব্যাপারে নৈরাশ্য কেটে যাবে। পত্নীর সহিত মতানৈক্য হতে পারে। বাইরে যাবার যোগ প্রবল। গুরুজন হানি হতে পারে। সন্তানদের জন্য কোন উৎকণ্ঠা ভোগের কারণ নেই। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

মিথুন—গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। আর্থিক উন্নতি হবে। অশান্তি কেটে যাবে। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করতে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সন্তানদের ব্যাপারে মনঃকষ্ট পেতে পারেন। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে। কষ্টকর ভ্রমণ হতে পারে। নতুন বন্ধু লাভ হবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের কোন জটিল সমস্যার সমাধান হবে।

কর্কট—মনোমত কার্যে বাধা পড়বে। মানসিক শান্তির অভাব হবে। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক অবস্থা ভাল। গুরুজনদের সঙ্গে মত-বিরোধ হতে পারে। পড়া শুনার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতি বিলম্বিত হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মহিলাদের মনের ওপর চাপ পড়তে পারে।

সিংহ—প্রিয়জন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ভোগের কারণ ঘটতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভাল। স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করবে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে মামলা-মোকর্দমার ভয় আছে। পত্নী ও সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা হতে পারে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জনে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। মহিলাদের কোন ভুলের ফলে অশান্তি বাড়তে পারে।

কন্যা—আর্থিক দিকটা ভাল। শরীর মোটামুটি ভাল যাবে। ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদ-মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার সহিত মত-বিরোধ হতে পারে। তরুণ-তরুণীদের বিবাহে বাধা আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের সময়টা প্রতিকূল। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলা কর্ম-প্রার্থীদের চাকুরী লাভের সম্ভাবনা।

তুলা—সামাজিক ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রতিপত্তি বাড়বে। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ আছে। তরুণ-তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র ভাল। বিদ্যার্থীদের সময়টা প্রতিকূল। গৃহে আত্মীয়ের সমাগম হতে পারে। মহিলাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির যোগ দেখা যায়।

বৃশ্চিক—আর্থিক ব্যাপারে অনটন দেখা দেবে। বৈষয়িক ব্যাপারে কোন গোলযোগ দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার আভাস দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সন্তানদের অসুখ-বিসুখ হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিদ্যার্থীদের পাঠ্যধারা নির্দ্ধারণে গোলযোগ দেখা যায়। মহিলাদের সময়টা আর্থিক দিক থেকে ভাল।

ধনু—কাজকর্মের দিক থেকে ভাল বলা যায়। নতুন বন্ধু লাভ হবে। প্রাপ্য টাকা আদায় হবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ব্যর্থ হবে। গুরুজন-হানির যোগ দেখা যায়। দূর ভ্রমণ হতে পারে। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না আর্থিক অবস্থা ভাল। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল বলা চলে না। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

মকর—আর্থিক উন্নতি হবে। নৈরাশ্য কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। শরীর ভাল যাবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। তরুণ-তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। নতুন বন্ধু লাভ হবে। এ মাসে আপনি কোন জিনিষ উপহার পেতে পারেন। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল্ল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা ভাল। কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্য কেটে যাবে। আত্মীয়দের সঙ্গে মিলন হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। তরুণ-তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা গোলমেলে। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

মীন—কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা যায়। আর্থিক ব্যাপারে মনের ওপর চাপ পড়বে। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। গুরুজনদের পীড়া মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষকের ভূমিকা

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, পিএইচ ডি

তাঁর করুণায় ভরপুর জগতে বিশ্বস্রষ্টার সৃজনময়ী শক্তি তাঁর প্রিয় মানুষের মধ্য দিয়েই বিকশিত, প্রকটিত। তাই মানুষের চিন্তা, কথা, ভাব কাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রধান কাজ হওয়া উচিত। যে সৃজনময়ী সুপ্ত শক্তি শিশুর অন্তরে লুক্কায়িত তার উদ্বোধনেই শিক্ষার সার্থকতা। 'তরবোঽপি হি জীবন্তি—জীবন্তি মৃগ পক্ষিণ। মনো জীবতি যস্য মননেন জীবতি যঃ সঃ। উপনিষদের এই আদর্শ শিক্ষায় সত্য হয়ে উঠেছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ মনন ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়। মানুষের অধ্যাত্ম-কেন্দ্রী সৃজনপ্রাণ কলহসিত মনোজগৎ তৈয়ারীর কাজই শিক্ষার বড় কাজ। 'নিবৃত্তরাগস্য গেহস্তপোবনম্'—বর্তমানের এই প্রগতির যুগে প্রাচীন তপোবনের ধ্যানশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ দুর্লভ। তাই ব্রহ্মচর্য্য ও দুঃখবরণ নীতির মধ্য দিয়ে কর্মব্যস্ত নগরীর পরিবেশ মাঝেই তপোবনের ধ্যানময় ভাব আবাহন করতে হবে—সেখানেই গড়ে তুলতে হবে নব যজ্ঞের কেন্দ্র। সে পথের অভিযাত্রী হবেন আমাদের আত্মত্যাগী, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক জাতীয় সেনাদলের ন্যায় শক্ত আদর্শমণ্ডিত যুগের নবদীক্ষায় দীপ্ত এক শিক্ষকদল তপোবন কেন্দ্রিক সভ্যতার দিনের প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির অনির্বাণ শিখা যাঁদের হৃদয়ে আজও জ্বলছে। তাঁরা বইএর বোঝা কতকটা হাল্কা করে শিক্ষণীয় বিষয়কে কতকটা পারিপার্শ্বিকের জীবন্ময় পশ্চাৎপটে ফুটিয়ে তুলে সার্থক করবেন। এইভাবেই শিশুর মনোজগৎ তৈয়ারীর কাজে শিক্ষকই হলেন দ্বিতীয় স্রষ্টা। 'এইচ, জি, ওয়েল্স তাঁর "Mankind in the making"—পুস্তকে নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিকের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। শিশুর মন যাতে বিক্ষিপ্ত হয়ে না যায় ও অভীষ্ট মঙ্গল পথে বিচরণ করে, তার জন্যে তাঁর প্রণালীতে শুধু বিদ্যালয়ের গণ্ডীটুকুই নয়, ঘরবাড়ী, পাঠাগার, ক্লাব, রাস্তাঘাট, সিনেমা পোষ্টার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত করার বিধান দেওয়া আছে। সমাজের বিবিধ কুপ্রভাব হতে ছাত্রমন যাতে মুক্ত থাকে তার জন্যে সতর্কতার সীমা নেই।

পারিপার্শ্বিক ও বংশধারার মধ্যে বংশধারার প্রভাবকে আগে শিক্ষায় যতটা স্থান দেওয়া হত এখন আর ততটা দেওয়া হয় না। বংশধারাকে একটা 'বেস' বা ভূমি বলে ধরা হয় মাত্র। একই প্রবীণ শিক্ষক পিতার দুই ছেলে তাঁর নিজের কাছে বসে শিক্ষায় বাড়ীর সাহায্য পেয়ে ভাল হয়েছে, আর দুজন তদভাবে ভাল করেনি। এভাবে পরীক্ষা চালালে শিক্ষকের অনুকূলে রায় প্রকাশের সম্ভাবনা খুবই বেশী। তাঁর প্রভাব 'inceptive'—অর্থাৎ, অন্তর-স্পর্শী স্যর জেহাঙ্গীরজী কয়েজী সাহেবের মতে। আমার কেম্ব্রিজের শিক্ষা প্রভাব সম্বন্ধে প্রশ্নের তিনি এইরূপ উত্তরই দিয়েছিলেন। শিক্ষক যে ছাঁচ দেন, অলক্ষ্যে এবং তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে তাতে তখনও যা জমাট বাঁধে নি ছেলে মেয়েদের সেই ঢালা তরল মতি ছাপা হয়ে উঠে ব্যক্তিত্বের পত্তনে সাহায্য করে বলে আমার বিশ্বাস। তখনও অবশ্য সেখানে পারিপার্শ্বিকের বিপরীত দিকের টান ততটা জোড়াল হয় নি—অর্থাৎ ক্লাসের মধ্যেই ডেস্কের নীচে সিনেমা আর্টিষ্টদের ছবির দিকেই মন দেওয়ার প্রবৃত্তি জাগেনি।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় স্যর জেহাঙ্গীরজী কয়েজী এক-দিন বলেছিলেন ডেমোক্র্যাটিক প্ল্যাটফরমে নেমে শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবেন, এই 'টিম্‌স্পিরিটে কাজ বেশী ফলপ্রদ হবে। স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের মত শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশতে পারলে'ই ভাল। অধ্যাপকের সান্নিধ্য সহায়তা ট্রেনিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় বিফলতার নগণ্যতার একটা বিশেষ কারণ; এর অর্থই দাঁড়ায় পরীক্ষার চান্‌স প্রণালীকে মেহৃবিত করতে 'পার্ফর্মেন্স' বা 'অ্যাচিভমেণ্টে'র উপর কিছুটা জোর

দেওয়া। নিছক চান্স প্রণালী পরীক্ষার বিভীষিকা সৃজনের জন্য দায়ী।

ইংরেজী, হিন্দী ও অঙ্ক বিষয়ে পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক মনে হয়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব একবার আমায় বলেছিলেন "বিজনেস ইংলিশ এক শ্রেণীর ছাত্রের জন্য রাখা চলে", এর মানে এই নয় যে অ্যাকাডেমিক ইংলিশের ষ্টাণ্ডার্ড একেবারে নামিয়ে ফেলা। তেমনই হিন্দীকেও 'ওয়ার্কি হিন্দী' ভাবে বাংলা দেশে রাখা যেতে পারে। অঙ্ক দেখা যায়, অনেক ছেলেমেয়ের পক্ষে "বাঘ"। আমার মামা এফ্‌ এতে সংস্কৃতে গোল্ড মেডালিষ্ট ছিলেন। কিন্তু হলে কি হয়? বি-এতে অঙ্কে ফেল করায় তিনি এফ, এ পাশই রয়ে গেলেন। মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এফ-এতে সংস্কৃতে দ্বিতীয় হন। তিনি পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। আমার বলার উদ্দেশ্য যে ইংরেজী হিন্দী বা অঙ্কের জ্ঞান অতি নিম্ন স্তরের হলেও বা তার অভাবে যেন কারও এগুবার পথ রুদ্ধ না হয়। স্যর জগদীশচন্দ্র অঙ্কে কমা হলেও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ হয়েছিলেন।

তর্কশাস্ত্র ও অর্থনীতির এতটা হাঁকুপাঁকু কেন? বুদ্ধি পাকার অপেক্ষায় আর দু তিন বছর কি অপেক্ষা করা যেত না?

স্কুলের বা কলেজের ভিতরের সঙ্গে বাইরের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে বর্ত্তমানের এ ঘূর্ণীবিপাকে। মাছ, ভাত, ঘি দুধ প্রভৃতি খাদ্যের অভাব। বেকারী বিভীষিকা। সিনেমাবাজ ও তার ওপর পঠিত বিষয় বাহুল্যের অসহনীয় বোঝার দরুণ পাইকারী ভাবে বিকৃতচিত্ত জন সংখ্যার মাঝে বাইরের প্রভাব ছেলে মেয়েদের ওপর অবাঞ্ছিত ভাবে বাড়তে দেওয়া চলতে পারে না। ছাত্র শিক্ষক, সাধারণ লোক-সকলকেই কোমর বেঁধে প্রতীকারের সন্ধানে সিরিয়াসলি আত্মনিয়োগ করে কাজে নামতে হবে। আর ঘুমুলে চলবে না—"ঘোর রোল গণ্ডগোল ঝমক ঝমক কাঁপিছে।" ব্রহ্মচর্য্য পরিবেশে "অধ্যয়নংতপঃ"—এ মটো বা মত আজ ধূলি—অবলুণ্ঠিত! এখানে সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে তাকে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কলেজ ত্যাগের মূল কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ খোলার দিন গঠনমূলক কর্মপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে ও অন্যান্য কাজের মধ্যে দিয়ে সকল মিস্‌আণ্ডারষ্টাণ্ডিং এর অবসান ঘোষণা করে আমার মত এক নগণ্য ছাত্রসেবক কলেজে নবযুগ আহ্বান শুনতে পান। তখন তাই দেখে জ্ঞান ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন 'মাইকেল মধুসূদনের সময় নবযুগ এসেছিল আর আসছে তা তোদের সামনেই "ফুটেছে উষার আলো, শোন ঐ চকিত পাখীর কাকলি!"—সুভাষ ও তার আর আর বন্ধুরা তখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সিউডো-পাটিকদের হৈহল্লা ও মকারী ছেড়ে গঠনমূলক কর্মধারায় শিক্ষাপ্রবাহকে জীবখয় করে তা বাঁধ দিয়ে ঠেকাতে হবে। ছেলে খেলার চাই অবসান; সময় নষ্ট করা আর চলে না, শত্রু শিয়রে ওৎপেতে বসে আছে। এঘোর ঘনঘটা তুফান মাঝে একমাত্র শিক্ষকই ভরসা, কাণ্ডারী তিনিই। তিনি রুশিয়ার শিক্ষক ট্রট্‌শ্‌কি ও নব-জার্মান গণতন্ত্রের ট্রাইটশকের মত এগিয়ে আসুন শিক্ষার নব বিধানে জাতিগঠনের কাজে। দেনমার্কের লোক শিক্ষায় যেমন তিনি স্কুল কলেজ কেন্দ্রিক জাতিগঠন প্রগ্রামে কার্য্যকারী অংশ নেন নিজের অষ্ট গণ্ডার হিসাব না করেও, সময় বিশেষে দেশের কল্যাণের জন্য সেরূপ সেণ্টার বা কেন্দ্র থেকে স্কুলের সময়ের বাইরে কাজ করে তাঁকেই মজ্জমান জাতিকে টেনে তুলতে হবে। তবে চাই এই নিষ্কলঙ্ক গুরুর সামাজিক তথা গভর্ণমেণ্টিক সম্মান মর্য্যাদা আর সুযোগ সুবিধা—আর তাঁর কাজে চাই সকলের একচিত্ততা, সহকারিতা ও সমবায়। ছাত্র বা দেশের ভবিষ্যতের জন্য আত্মদান করে তাঁকে যেন বাক্য-তর্পণসার হতে না হয়। দেশাত্মবোধের প্রভা-উজ্জ্বল জ্ঞানের সৃজনময়ী শিখা আবার জলে উঠুক—আশার আলোয় দিগন্ত গরিমময় হোক। প্রেটোর অনুভাবিত, স্বামিজী বাঞ্ছিত ক্ষাত্র তেজোদীপক পাচ স্কুলমিলে কমিউনিটি ড্রিলের ফ্লুটে রবের সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাজনা সহ নগর ও বহির্নগর পরিক্রমা শোভাযাত্রা দেশাত্মবোধের ভাব জাগরণে সহায় হবে। পাঠ্যতালিকার আবশ্যক তারতম্য বিধানে এ-ও দেখার দরকার যাতে সৎসাহিত্যের প্রতি ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ জন্মে। সেটা সম্ভব হয়েছিল স্যার আশুতোষের বাইরের বই পড়ার নীতিতে

ম্যাট্রিকুলেশনে। সে উৎস এভাবে খুলে দিতে পারলে তার মনের বিকাশপথ আত্মশক্তি প্রেরণা ও আদর্শের অনুভবে প্রাণময় হয়ে উঠবে।

বাইরের কাজের মধ্যে গ্রুপ প্রাণালীতে চাষ আবাদ করা, ফলের বাগান করা, মাছ ধরিয়ে পল্লীস্থ গৃহস্থদের সরবরাহ করা। তাঁতের কাজ, ডেয়ারী ও মিষ্টান্ন, লজেঞ্জ তৈয়ারী—অনেক কিছুই সমবায়ে করা চলে।

ছুতার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির কাজও অবহেলার নয়। স্কুলের সীমানার বাইরে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে একটী সমবায় পল্লীবাজার থাকলে মন্দ হয় না, যাতে করে The school, the home and the world"—এর মধ্যেকার সম্বন্ধের অঙ্গাঙ্গী অনুভব জীবন্ময় হবে।

মনে রাখার দরকার—যে জিনিসের উৎপাদন বা বিক্রয় যেখানে সুবিধাজনক সেখানকার কোর্সে সেইটেই নিতে হবে। মেটো বা মাটো বুদ্ধির ছেলেদের জন্য মিলিটারী স্কুল স্থাপন করা ভাল। তাতে জাতীয় সমপদের সদ্ব্যবহার হবে। সুবুদ্ধিই হোক আর মোটাবুদ্ধিই হোক, রাষ্ট্রের তরুণেরাই তার কাঠামো।

নারকেল ঝোড়ার মত এখনকার পাঠ্যকে কেটেছেঁটে কতকটা বহনযোগ্য করে নিতে হয়, যাতে এ দুর্দিনে ছেলে মেয়েরা টিউটর বা গৃহশিক্ষকের সাহায্য না পেলেও নিজের চেষ্টায় ও স্কুলে পাওয়া সাহায্যে পাঠ খানিকটা আয়ত্তের মধ্যে করে চলতে পারে। স্কুলে বিশেষ টিউ-টোরিয়লের কার্য্যকরী ব্যবস্থা থাকা উচিত। বড় ছেলে মেয়েরা কি পাড়ায় পাড়ায় ফ্রি টিউটোরিয়ালের কাজ আরম্ভ করবেন? মৎপ্রস্তাবিত দেশাত্মবোধ কোর্স দল নিরপেক্ষ ভাবে আরম্ভ করার সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। তবে এ রকমের কোর্স স্কুল সিলেবাসের অঙ্গীভূত করলেও পরীক্ষার আওতায় আনা সঙ্গত হবে না, পারফরম্যান্স ও ইম্প্রেশনের ওপর নজর দিলেই চলবে। আর সর্বোপরি স্কুল বা কলেজের সমষ্টি জীবন বা 'করপোরেট লাইফ' গঠন মূলক কর্ম্মসূচীও অনুষ্ঠানে প্রাণময় হবে।

অবার বলি, নব মানুষের মনোরাজ্যের অর্কিটেক্ট বা স্রষ্টা আমাদের আশার আলো ভাই-ভগিনী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, সময়ের আহ্বান ঐ এসেছে!

উষার আলোয় কাকলিভরা কলহসিত আকাশ বাতাস পবিত্র করা এ মঙ্গলমুহূর্তে "আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা" বলে নবীনের আবাহন হোক! যুগদেবতার অসীম শক্তি নেমে আসছে, তা ধরতে চাই এখন সমর্পিত তনুমন পবিত্র আধার সেই জ্ঞান যজ্ঞাগ্নির হোতাদের। তপোবনের আলো চলছে এখনও; সেই আলোতে নিজের আলো জ্বালিয়ে নিয়ে আমাদের দুঃখবরণের পথে জয়যাত্রা করতে হবে, কম্বুনিনাদের মত বিশ্বাকাশ পবিত্রকরা ঋষির ঐ ডাক শোনা যায় "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"

তবু

শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা

কেঁপেছিল পরম নিশ্চিন্তে একজোড়া শালিখের চোখ।
সূর্যম্লান পৃথিবীর শেষ,
নিথর আঁধার দিল ভ্রূকুটি বিশেষ।
তবু সকল দরজার বেজেছিল…"এক"
গভীর বিশ্বাসে।
হেসেছিল অদূরে যেন কে।

(২)

দুয়েকবার সূর্য প্রসন্ন হাসিতে তাদের মুল বিন্দু ছুঁল,
ক'বার ফুলের টবে মৌমাছি গুনগুন,
আবার রাত্রি ফিকে হ'ল স্বপ্নও।
রজনীগন্ধার টবে বারান্দায়
দুটিগুচ্ছ কখন শুকায়।
সৌধচূড়ায় শালিখ দুটোর কলসী খান খান;
কি হল?
জানবার আগেই শুরু স্মৃতিমাত্র রোমন্থন।
কেঁপেছিল
গভীর হতাশে একজোড়া শালিখের মন।
অন্তত: স্মৃতির সুরভি দিয়ে এখন ভরাট জীবন।

সরকারবাবু

(গল্প)

শ্রীপথিক

শীতের সোনালী সূর্য্য ডুবে গেছে পশ্চিম আকাশে। তারই শেষ আলোটুকু ছড়িয়ে পড়েছে মড়া গঙ্গার স্বল্প জলে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকারের আভরণ। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মনে হলো দরজার কড়াটা যেন আস্তে নড়ে উঠল।

প্রথমেই ভাবলাম—কে হতে পারে? এখানে যারা থাকে তাদের কাররই এখন ফেরার কথা নয়। অফিসের কাজ সেরে, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী হয়ে তারা আরও অনেক পরে ফেরে। সন্ধ্যার এ ঘনায়মান অন্ধকারে আমিই থাকি এখানকার নিত্যদিনের একমাত্র সজীব সচল প্রাণী। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে কারও কোন আভাস না পেয়ে জানালা দিয়ে গঙ্গার দিকেই মুখ ফিরালাম। গঙ্গার জল কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কড়াটা আবার ঈষৎ নড়ে উঠল। পায়ের একটা মৃদু আওয়াজ। দরজাটা খুললাম।

দরজা খুলে যাকে দেখলাম তাতে একটু বিস্মিতই হলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সরকারবাবু।

সরকারবাবু থাকেন আমার পাশের ঘরেই। ভাগলপুরের অনাদি মেসে। কিছুদিন হয় অধ্যাপনার কাজ নিয়ে আমি এখানে এসেছি। সরকারবাবু ছাড়া সকলের সাথেই আলাপ হয়েছে। একসাথে থাকি ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। কিন্তু সরকারবাবুর কথা আলাদা। আমি এখানে আসার আগে যেমন তিনি ছিলেন আমার দূরের, আজ এত কাছে এসেও তিনি রয়ে গেছেন দূরেরই। সামান্য আলাপ-পরিচয়টুকুও হয়নি তার সাথে।

মেসের সাথীদের কাছেই শুনেছি আমার পাশের ঘরের ভদ্রলোকের নাম সরকারবাবু। নাম ধরে ডাকেনা কেউ। সবাই বলেন সরকারবাবু। যদিও তিনিই নাকি এ মেসের সবচেয়ে পুরান বোর্ডার তবু তারই উপস্থিতি দেখি এখানে সব চেয়ে কম। অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটান বাইরে। কখন যে তিনি আসেন, কখন যে তিনি যান বলা কঠিন। গভীর রাতে জুতার শব্দে, দরজা খোলার শব্দ শুনে, ঘরে পায়চারি করার আভাস পেয়ে সরকারবাবুর উপস্থিতি বুঝি। আবার খুব ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েন। দুপুরে একবার মেসে আসেন খেতে। অল্প সময়ের জন্য।

সরকারবাবুকে দেখার সৌভাগ্যও আমার কমই হয়েছে। তবু বুঝেছি লোকটা খুবই ব্যস্ত। সময়ের অভাবে হাতের সিগারেটটাও তিনি কোনদিন ভাল করে খেতে পারেন না। সিগারেটটা ধরিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে সাইকেলে উঠতে উঠতেই তিনি একটা ব্যস্ততার আভাসে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। পাশে দণ্ডায়মান কেউ কেউ সহানুভূতির সুরে বলেন—সরকারবাবু 'সিগারেটটা অন্ততঃ একটু ভাল করে খেয়ে যান। সাইকেলে উঠতে উঠতেই সরকারবাবুর নির্বিকার চিত্তের জবাব আসে—না ভাই, সময় নেই। দেখতে দেখতে সরকারবাবুর সাইকেল গেট পার হয়ে যায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ একটু কালো। মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুল।

তবে সরকারবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। শুনেছি সরকারবাবু নাকি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছেন।

প্রেমে পড়াটা সরকারবাবুর দোষ নয়। পুরুষ নারীর রূপে ভোলে। নারী পুরুষের গুণে ভোলে। কিন্তু সরকারবাবুর ক্রটী তার বংশ পরিচয় নিয়ে। সরকারবাবু নাকি প্রতিপালিত হয়েছেন নীচু জাতির ঘরে। এ পাড়ারই রামাই মুচির কাছে।

সরকারবাবু পূর্ব্ববঙ্গের লোক। বাড়ী ছিল নোয়াখালিতে। দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদল লোকের সাথে কোলকাতায় পালিয়ে আসে। সেখানে তারাও তাকে ত্যাগ করে। রামাই মুচি তখন জীবিকার জন্য কোলকাতায় থাকে। রাতের

অন্ধকারে ফুটপাতে অসহায় ভাবে কাঁদতে দেখে রামাই মুচি তাকে সান্ত্বনা দেয়। এ অসহায় ছেলেটার প্রতি রামাই মুচিরও যেন কেমন একটা দয়া হয়েছিল। তার নিজেরও কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই রামাই মুচি তাকে নিজের কাছেই রাখে। হারিয়ে যাওয়া ছেলেটা রামাই মুচির কাছে তার যে নাম বলেছিল তার পদবীটা ছিল সরকার। সে থেকে রামাই মুচির কাছে সে সরকার বাবু বলেই পরিচিত।

কিন্তু সরকারবাবুকে নিয়ে রামাই মুচি কোলকাতায় বেশী দিন থাকতে পারল না। অনেকেরই সন্দেহ হলো সরকারবাবুকে রামাই মুচি চুরি করেছে। শুধু ভদ্রলোকেরাই নয় তার জাত ভাইদেরও এ ব্যাপারে সন্দেহ হতে লাগল। তারা রামাই মুচির কথায় বিশ্বাস করল না। বলল—যদি তাই হয় তাহলে একে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও। রামাই মুচি বা তার বউ কাররই এটা পছন্দ ছিল না। তাই একটা গণ্ডগোল বাধার আগেই কোলকাতা থেকে আস্তানা গুটিয়ে রামাই মুচি পাড়ি জমাল তার নিজের মুলুক ভাগলপুরে।

এ পাড়ার সবাই রামাই মুচিকে খুব ভালবাসত, তার কাজ ও ব্যবহার দুটোর জন্যই। সরকারবাবু একটু বড় হলে বাবুদের সহায়তায় রামাই মুচি তাকে অনাদি মেসে রাখল। স্কুলে ভর্ত্তি করে দিল। খরচপত্র রামাই মুচিই বহন করত। মাঝে মাঝে বাবুরাও সহায়তা করত। সেই থেকে সরকারবাবু অনাদি মেসেই আছে। লেখাপড়া শিখেছে। ভাল চাকরী করে, তাই স্বাবলম্বীও হয়েছে। রামাই মুচি ও তার স্ত্রী ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। সরকারবাবুর এ ত্রুটিটুকুর জন্য কেউই তাকে ঘৃণা করেনা। কিন্তু ভাল চোখেও দেখে না।

সরকারবাবু যে মেয়েটাকে ভালবেসেছে তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের। অভিভাবকরা এটা পছন্দ করেন না। মেয়েও পছন্দ করে না।

অভিভাবক ও বিশ্বস্ত লোকদের নাকি সরকারবাবু বলেন—আমি রীতাকে বিয়ে করতে চাই না। আমি তাকে ভালবাসি— বোনের মত। রীতা আমার বোন। কিন্তু লোকে সরকারবাবুর এ কথায় বিশ্বাস করে না। তারা বলে—বোনের ছলনায় এ অবৈধ প্রেম। এ চলতেই পারে না।

সরকারবাবু পিতৃমাতৃ হারা। দুঃখের কষ্টি পাথরে মানুষ। এ কথা শুনে তার প্রতি আমার একটা সমবেদনা জেগেছিল। কিন্তু সরকারবাবুর প্রেমের কাহিনীতে আমি নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

সরকারবাবু নীরব। সন্ধ্যার এ বিষণ্ণ অন্ধকারে সরকারবাবুকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি বলব ভেবে পেলাম না। অপরিচিত লোকটার সামনে আমি নিজেও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বলবেন ?

সরকারবাবু তবু নীরব। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সরকারবাবুর সাথে আলাপ নেই। কিন্তু তার চোখ মুখের ব্যস্ততার ভাবটা আমি দেখেছি। আজ সে চোখে মুখে ব্যস্ততার কোন আভাসই নেই। কেমন একটা থমথমে ভাব।

সরকারবাবু মাথাটা আরও একটু নীচু করে বললেন—আমি চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছি—কথাটা যেন আমার কাছে কেমন লাগল। সরকারবাবু কতক্ষণই বা আর এ মেসে থাকেন। দিনে কত বারই ত আসেন যান হঠাৎ আমাকে একথা বলার কি প্রয়োজন হলো ভেবে পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাবেন ?

—চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন আসব না। সরকারবাবু মাথাটা আরও নত করে বললেন কথাগুলো।

—চলে যাচ্ছেন। আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। সরকারবাবুর এ কথাগুলো যেন আমায় আরও হেয়ালীতে ফেলে দিল। যে মানুষটা আমার এত কাছে থেকে কোনদিন একটা কথা বলেন নাই, তিনি আজ কি বলছেন ? কিন্তু সরকারবাবুর মুখের থমথমে ভাব ও গলার আওয়াজে আমার মনেও যেন কেমন একটা বেদনার সুর বেজে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে সরকারবাবু ? কোথায় যাবেন ?

সরকারবাবু আমার কথার উত্তর দিলেন না। মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ত গল্প লেখেন ?

সরকারবাবুর কাছ থেকে আমি এ জাতীয় কথা শুনতে অপ্রস্তুতই ছিলাম। সরকারবাবুর মুখের থমথমে ভাব ;—

চলে যাবেন আর কোনদিন ফিরে আসবেন না ;—আমি গল্প লিখি—এজাতীয় কথা ও পরিস্থিতির মধ্যে আমি কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তবু মনে হলো কোথায় যেন একটা বেদনার সুর রয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলুন ত ?

আপনি নাকি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন ?

সরকারবাবুর একথায় আমি আরও একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

বিস্ময়ের চাহনী নিয়ে সরকারবাবুর দিকে তাকালাম। সরকারবাবুও আমার দিকে চেয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম একথা আপনি কোথায় শুনেছেন ?

—শুনেছি। সে জন্যই ত আপনাকে বলছি।

মনে পড়ল কথাটা আমার নয়। এখানে আসার পর অনেকেই জেনেছে আমি গল্প লিখি। খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকায় তারা সেগুলো পড়েছে। তাই মেসের অনেকেই সরকারবাবুর কথা প্রসঙ্গে বলেছেন—আপনি সরকারবাবুকে নিয়ে অবশ্যই একটা গল্প লিখবেন। সেকথা তারা পরিহাসচ্ছলেই বলেছেন। আমিও পরিহাসচ্ছলেই তা স্বীকার করেছি। হয়তো কি ভাবে সে কথা সরকারবাবুর কানে গেছে। সরকারবাবুর কথার মধ্যে ছিল একটা অভিমানের সুর। বেদনার সুর। মনে হল সরকারবাবু আমার কথায় ব্যথা পেয়েছেন। আমি সরকারবাবুর হাত দুটো ধরে ঘরে নিয়ে এলাম। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। বললাম—সরকারবাবু, একথা আমরা নিছক হাসির ছলেই বলেছি। সে কথা শুনে দেখছি আপনি খুব ব্যথা পেয়েছেন। আপনি আমাদের ক্রটী নেবেন না।

আমিও সরকারবাবুর পাশেই বসলাম। সরকারবাবু উদাস ভাবে বললেন—ব্যথা পাইনি। আমি আমার জীবনের গভীর ব্যথাকেই আপনার কাছে বলতে এসেছি। সে কথা কাকেও বলতে পারিনি। যাবার দিনে তাই আপনাকে বলতে এসেছি। কারণ আপনি লেখক।

সরকারবাবুর অজানা ব্যথায় আমার মনটাও যেন কেমন উদাস হয়ে এলো। সরকারবাবুর কি সে ব্যথা যা আজ আমায় বলতে এসেছেন ?

সরকারবাবু আগেরই মতন নীরব হয়ে বসে ছিলেন। তারপর একবার উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—আমার আগের কথা লোকের মুখে যা শুনেছেন তা প্রায় ঠিকই আছে। রামাই মুচিই আমায় কোলকাতার ফুটপাত থেকে কুড়িয়ে এনে আমায় বড় করেছেন। রামাই মুচির কাছেই আমি মানুষ। আপনি রীতার কথাও ত শুনেছেন। লোকে বলে আমি নাকি রীতার প্রেমে পড়েছি। আমি নাকি রীতাকে বিয়ে করতে চাই। আমাদের মধ্যে অবৈধ প্রেম রয়েছে ইত্যাদি। রীতাকে আমি ভালবাসি সত্যই। তবে রীতাকে আমি বিয়ে করতে চাই না। কারণ রীতা আমার বোন। আপন বোন। যে বোনকে একদিন আমি রাতের আঁধারে হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই বোন। আমার বোন সপু। আপনারও হয়তো কথাগুলো কেমন লাগছে। বিশ্বাস হচ্ছে না। না হবারই কথা। খুলেই বলছি।

রীতাকে আমি ভাগলপুরে প্রথম দেখি আজ থেকে প্রায় বছর তিনেক আগে। গ্রীষ্মের দুপুর। নির্জন পথ। প্রচণ্ড রোদ। স্কুল থেকে ফিরছে। হাতে কতকগুলো বই। কিশোরী মেয়ে। নির্জন পথ। স্বভাবতই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার মুখের দিকে।

চোখ আর ফিরাতে পারলাম না। বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আনন্দ আর ধরে না। এক নজর দেখেই মনে হলো এ আমার হারান বোন সপু।

ইচ্ছা হলো একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু পারলাম না। হয়তো চোখের ভুল। যদি কিছু মনে করে। যে কাজে যাচ্ছিলাম সে কাজেও আর যাওয়া হলো না। গুটি গুটি তারই পিছনে পা বাড়ালাম লক্ষ্য করার জন্য কোন বাড়ীতে যাচ্ছে। পরে খোঁজ নেব। তার গন্তব্যস্থল দেখে সেদিন মেসে ফিরে এলাম। দেখলাম সে ঢুকল আমারই এক পরিচিত বাড়ীতে।

মেসে ফিরে এসে সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। ঘুম হলো না। চোখের সামনে শুধু সে মুখটাই ভাসছিল। বারবারই মনে হচ্ছিল এ সপু ছাড়া আর কেউই নয়। কিন্তু সেই বা সম্ভব কি করে ? সপুকে ত আমি হারিয়ে এসেছি কোলকাতার ফুটপাতে বছর দশেক আগে। সপুর বয়স তখন পাঁচ।

দেশের সোনার সংসারে তখন আমরা মাত্র চারটি লোক। মা, বাবা, সপু আর আমি।

কিন্তু সে সোনার সংসারে একদিন আগুন লাগলো। সারা পুর্ব্ববাংলায় আগুন লাগলো। সে আগুনে সব পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। চোখের সামনে বাবাকে আততায়ীরা নির্ম্মম ভাবে হত্যা করল। বুক ফাটা চিৎকারে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে মা-ও আর ফিরলেন না। অসহায় ভাবে আমি আমার ছোট্ট বোন সপুকে নিয়ে জঙ্গলে পালালাম। বুদ্ধি তখনও আমার পরিপক্ক হয়নি। কিন্তু অন্তর দিয়ে বুঝেছিলাম এ জগতে আমাদের আর কেউ নেই। আছি শুধু আমি আর সপু। সপুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি জঙ্গলে জঙ্গলে পথ চলতে লাগলাম। দেখলাম আমি শুধু একা নই। এ পথে অনেকেই আমার সাথী। তারাও আমার মত প্রাণের মায়ায় পথ চলছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, বন্য পশুর ভয়ও নেই। আছে শুধু হিংস্র মানুষের ভয়। পায়ে লাগছে কাঁটার খোঁচা। ক্ষণে ক্ষণে সপু কাঁদছে মা মা বলে।

এমনি করে অপরিচিত মানুষের সাথে পথ ঘাট পার হয়ে কোলকাতায় এসে পৌছলাম। কোলকাতার হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তারাও একদিন হারিয়ে গেল। আমাদের পথে ফেলে রেখে যে যার পথে চলে গেল। আমি আর সপু দাঁড়িয়ে রইলাম ফুটপাতে।

মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও নিজেকে এতটা নিরাশ্রয় মনে করিনি। কারণ তখন সামনে একটা উদ্দেশ্য ছিল প্রাণের দায়ে পথ চলা। কিন্তু আজ? আজ সে উদ্দেশ্য ফুরিয়ে গেছে। নিজেদের অসহায়ের কথা আজ আরও বেশী করে অনুভব করলাম। কোলকাতার ফুটপাতের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আমরা দুটি ভাই-বোন উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলছি। পথ ঘাট চিনি না। এত লোক, এত দোকানপাট, এত গাড়ীঘোড়া, এত আলোর ঝলমলানি আর কোনদিনই দেখিনি। কোলতাতার সম্বন্ধেও কিছু জানি না। শুধু শুনেছি এরই নাম কোলকাতা।

সেই যে মা দেশের বাড়ীতে কবে পেট ভরে খেতে দিয়েছিলেন তারপর আর পেট ভরে খেতে পাইনি। খাবার কথা তেমন মনেও হয়নি। তখন ছিল শুধু বাঁচার তাগিদ। আজ মনে হলো বাঁচতে হলে এখন খাবারও প্রয়োজন। সপুর যে ক্ষিধে পেয়েছে তা আমি আমার নিজের ক্ষিধের কথা দিয়েই বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি? পথ চলতে চলতে কত জায়গায় রাশি রাশি খাবার দেখলাম। তার অল্প একটু হলেই আমাদের চলে যায়। ইচ্ছা হলো চাই। কিন্তু কোথায় যেন বাধে। মুখ ফুটে বলতে পারি না। কোনদিন কারও কাছে চাইনি। আজ চেতে লজ্জা হয়। ভয় হয়। সপুও দেখলাম সহ্য করতে শিখেছে। কতদিন পেট ভরে খায়নি। সম্পূর্ণ একদিন মুখে কিছু দেয়ওনি। তবু একবার বলে না—ক্ষিধে পেয়েছে। জীবনে দুর্দ্দিন যেদিন আসে; দুঃখ যেদিন নিবিড় ভাবে আসন পাতে তা সহ্য করার শক্তিও ভগবান মানুষের মাঝে দেন। সপুকে দেখে আমার বার বার সে কথাই মনে হচ্ছিল। সপু পথ চলতে চলতে শুধু মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল—দাদা! মা কোথায়? বাবা কোথায়? কখনও জবাব দিয়েছিলাম কখনও দেইনি। মা-বাবা কোথায় কি করে বলব সপুকে? কি করে বলব মা বাবা যে কোনদিনই আমাদের কাছে আর ফিরে আসবেন না!

ছেলেবেলায় মার কাছে শুনেছিলাম ভগবান দয়ালু। তাঁর দয়ার নাকি তুলনা নেই। সে কথাই আজ প্রত্যক্ষ করলাম যখন রাত্রে এক দোকানের মালিক আমাদের হাতে একটা খাবারের ঠোঙ্গা তুলে দিলেন। ক্ষিধায় পথ চলতে পারছিলাম না। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার একটা খাবারের দোকানের পাশে থরে থরে সাজান খাবারের দিকে চেয়ে। মনে হচ্ছিল যদি কেউ কিছু দিত। প্রাণ-পণে ডাকছিলাম ভগবানকে। দয়া কর। দয়া কর। কিছু খাবার দাও। আর যে ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের ত আর কেউ নেই। সপু যে এবার না খেয়ে মরে যাবে।

খাবার পেয়ে সে যে কি আনন্দ, সে যে কি পরিতৃপ্তি তা আর কি করে বলব? ভগবানের উদ্দেশ্যে বার বার মাথা নত করলাম। বললাম—ভগবান! আমাদের ত' কেউ নেই তুমিই আমাদের এমনি করে রক্ষা করো। সপুকে পেট ভরে খাওয়ালাম। আমার ক্ষিধেও অসহ্য, তবু বেশী খেলাম না। কিছুটা রেখে দিলাম সপুকে পরদিন খাওয়াবার জন্য। তারপর কল থেকে জল খেয়ে রাস্তার পাশের একটা বাড়ীর রকে শুয়ে পড়লাম।

সপূ আমার কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। নানা চিন্তা। নানান ভাবনা এসে মনের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়াল। সপূর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চেয়ে মনে হলো সে মুখে কত ক্লান্তির ছায়া। কত বিষাদের ছায়া। সপূর মত আমিও নিঃস্ব। কিন্তু সপূর নিঃস্বতাই যেন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল।

সকাল বেলা। চারদিকে আবছা আবছা অন্ধকার। অনেকক্ষণ থেকেই জল তেষ্টা পেয়েছে। সপূ তখনও আগেরই মত ঘুমাচ্ছে। বেশ গাঢ় ঘুম। ভাবলাম আহা বেচারী কতদিন থেকে ভাল ভাবে ঘুমায়নি। ঘুমুক। আমি একটু জল খেয়ে আসি। কাল রাত্রে যে কল থেকে জল খেয়েছি তা ত কাছেই।

ঘুমন্ত সপূকে রেখে এই যে আমি পথে নামলাম সপূর সাথে এই আমার শেষ দেখা। জল খেতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। প্রথমটা বুঝতে পরিনি। এই সামনেই, এই সামনেই এ ভেবে ভেবে পথ চললাম। কিন্তু কল আর পেলাম না। জল খাবার আশা ছেড়ে দিয়ে সপূর কাছে ফিরতে গেলাম। কিন্তু ফেরা আর হলো না। যত যাই সপূর আর দেখা পাই না। মা বাবাকে হারিয়েছিলাম দেশে অত্যাচারীদের হাতে। বুঝলাম সপূকেও আজ হারিয়েছি জল খেতে গিয়ে পথ ভুল করে। সপূ হয়তো ঘুম থেকে উঠে আমায় দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করছে। আমার দু' চোখ জলে ভরে এলো। আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি; সপূকে হারিয়ে ফেলেছি একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আরও বেশী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এ পথ সে পথ দিয়ে বার বার চেষ্টা করতে লাগলাম সেখানে যেতে, যেখানে সপূকে ঘুমিয়ে রেখে এসেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। পথ চলাই সার হলো। সপূকে আর পেলাম না। মা বাবার মত, দেশের মাটীর মত সপূও আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। তখন ফুটপাতে বসে চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর কোন উপায়ই রইলো না আমার। সে রাতেই রামাই মুচি আমায় পথ থেকে তুলে নিল তার ঘরে। তারপরে আমার জীবনে যা ঘটেছে তা ত' আপনারা জানেনই।

আগেই বলেছি রীতা যে বাড়ীতে ঢুকেছিল সেটা ছিল আমার পরিচিত বাড়ীর মধ্যেই। পরদিন অফিসের কাজ থেকে ফিরে গেলাম সে বাড়ীতে। বাড়ীর মালিক তপেশের বাবা। তপেশ রায়চৌধুরী আমার পরিচিত বন্ধুদেরই একজন। তপেশের কাছেই শুনলাম তাদের নূতন ভাড়াটে এসেছে। ভদ্রলোক কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। সোনার সংসার। ভদ্রলোক, স্ত্রী ও তাদের একমাত্র মেয়ে রীতা। রীতা এখানে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।

নূতন ভাড়াটে ভদ্রলোকের মেয়ে। নাম—রীতা। কলেজে পড়ে। মনটা যেন কেমন মুষড়ে গেল। অনেক আশা করেছিলাম এর নাম শুনতে পাব সপূ। পিতৃমাতৃহীন কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। হতাশ হতে হলো।

হতাশ হলুম।—রীতা। সপূ নয়। তবু রীতার মধ্যেই সপূকে দেখে, সপূর অস্তিত্বকে কল্পনা করে আমি একটা সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলাম। পেলামও।

এ ঘটনার পর থেকে প্রায়ই আমি তপেশদের বাড়ীতে যেতে লাগলাম। সময়ে অসময়ে। না গিয়ে থাকতে পারতাম না। রীতাকে ঘিরে আমার মনে একটা মমতা দানা বাঁধল। রীতাকে দেখে দেখে বিস্ময়ে নীরবে ভাবতাম, কে বলে এ সপূ নয়?—তবু রীতা সপূ নয়—রীতাই। ভাবতাম দুটো মানুষের মধ্যে কি আশ্চর্য্য মিল। আর আমিও সেজন্যই বার বার ভুল করেছি।

ইতিমধ্যে রীতাকে কেন্দ্র করে আমার কল্পনার মন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে কল্পনার মধ্যে ছিল মমতা। আমার হারান বোন সপূর স্বপ্ন। সপূকে ফিরে পাই নাই। পাবও না।—নাই পেলাম! তবু রীতাই আমার হারান বোন সপূ।

তপেশদের বাড়ীতে আমার নিত্য আনাগোণা। সে যাতায়াতকে কেন্দ্র করেই আমি রীতা, রীতার মা ও রীতার বাবা সুশান্ত মুখার্জ্জীর সাথে পরিচিত হয়েছি। সে পরিচয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে আমার নিবিড় সম্বন্ধ। রীতার মা বাবা খুবই উদার প্রকৃতির লোক। বেশ মিশুক। কাজেই তাঁদের কাছে আমি আদর আপ্যায়ন স্নেহ মমতা যতটা আশা করেছিলাম;—কল্পনা করেছিলাম, বাস্তবক্ষেত্রে পেলাম তার চেয়েও আরও অনেক বেশী। রীতার কোন ভাই ছিল না তাই আমাকে দিয়ে সে তার সে অভাবটাও

পূরণ করতে চেয়েছিল। রীতার মা বাবার কোন ছেলে ছিল না তাই তারাও আমাকে আপন করে নিয়ে সে অভাবটা পূরণ করতে চেয়েছিল। আমারও কেউ ছিল না তাই তাদের সে স্নেহে আমিও মুগ্ধ হলাম। আর রীতাকে ত' আমি বোনের মত পেতেই চেয়েছিলাম। আমার সে প্রয়াসও সার্থক হয়েছে। এমনি করে আমি তাদের সুখ-দুঃখের নিত্য ভাগী হয়ে উঠলাম। বন্ধুহীন বিদেশ বিভূঁইয়ে আমিও তাদের আপ্রাণ সেবা করতে চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করতাম রীতার যাতে কোন অসুবিধা না হয়। তবু আমার মনের কোণে সপুর কথা মাঝে মাঝে জেগে উঠত। রীতার মুখের দিকে চেয়ে আমি সপুর স্বপ্নই দেখতাম।

সেদিন বর্ষাকাল। সারা আকাশটা অন্ধকার। ঝির ঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। দুপুর বেলা। আমি ওদের ড্রয়িং রুমেই বসে ছিলাম। রীতা কলেজ থেকে এলো। এমন সময় ওর কলেজ থেকে ফেরার কথা নয়। জিজ্ঞাসা করলাম—এখনই কলেজ ছুটি হয়ে গেল ?

রীতা হাতের বই খাতাগুলো আমার সামনের টেবিলের উপর রেখে সোফার এককোণে বসে পড়ল। বলল—কি করব পড়াশুনা হয় না, চলে এলাম। ভাবলাম আকাশের যা অবস্থা বাড়ীতে এলে ভাল ঘুম হবে।

আমি টেবিলের উপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলাম। রীতা হাসতে হাসতে বলল—জানেন আমার এক বন্ধু ভাল হাত দেখতে পারে। সে আজ আমার হাত দেখে কি বলেছে জানেন ?—বলেছে আমার নাকি খুব টাকা হবে।

নিবিষ্ট মনে বইয়ের পাতা উলটাতে উলটাতেই বললাম—বেশ ত'। আমরাও যেন তখন কিছু ভাগ পাই। তবে এটা যেন মনে রেখো তোমার বন্ধুর চেয়ে আমি আরও বেশী ভাল হাত দেখতে পারি। যা বলে দেব একদম ঠিক। একটুও এদিক ওদিক হবে না।

রীতা হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।—আমার হাতটা দেখে দিন না।

হাসতে হাসতে হাতের বইটা টেবিলের উপর রেখে বললাম—না আজ নয়। অন্য দিন হবে।

রীতা কিন্তু ছাড়তে রাজী নয়। ও হাতটা আরও ঔৎসুক্য ভরে এগিয়ে দিয়ে কাছে সরে বসল। মুখে একটা আব্দার ও আকুতির ভাব।

আমি হাত দেখতে জানি না। কোন দিন কারও হাত দেখব এমন শখও জাগেনি। আজ রীতাকে যেটা বলেছি তা নিতান্তই পরিহাস ছলে। কিন্তু রীতা আমার কথায় বিশ্বাস করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমি ভাল হাত দেখতে পারি।

রীতাকে আমি জানি ও ভীষণ জেদী মেয়ে। আব্দারের পরিপূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছুতেই রেহাই নাই। অগত্যা তার হাতটা আমি আমার হাতে তুলে নিলাম। গাম্ভীর্য্য নিয়ে বেশ বিজ্ঞের মত হাতের রেখাগুলো নিবিষ্ট মনে দেখলাম। আমি ত রীতার মধ্যে সপুর ছবিকেই সব সময় কল্পনা করতাম যদিও জানতাম রীতা কখনও সপু নয়। তবু একটু রহস্য করে বললাম—তোমার একটা নাম হচ্ছে সপু।

একটা আচমকা টানে সপু তার হাতটা আমার হাত থেকে সরিয়ে নিল। বিস্ময়ের চাহনী নিয়ে আমার দিকে এক ঝলক চাইল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ রীতার এ রূপান্তরে আমিও বিস্মিত হলাম। যেন একটু অপ্রস্তুতও হয়ে গেলাম। ভেবে পেলাম না এতে এমন কি ঘটতে পারে যার জন্য রীতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সেদিন রীতা আর আমার কাছে এল না।

তারপরেও আমি যথানিয়মে রীতাদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু রীতার দেখা পাইনি। ও আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। ঘরে দরজা বন্ধ। ডেকেও কোন সাড়া পাইনি।

তারপর একদিন। সেদিনও ওদের ড্রয়িংরুমেই বসে ছিলাম। তাকিয়ে ছিলাম জানালা দিয়ে সামনের ইউক্লিপটাস্ গাছগুলোর দিকে। অনেক কথাই মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল মা বাবার কথা। মনে পড়ছিল সপুর কথা। মনে হচ্ছিল সপুর কল্পনার মূর্ত্তি রীতাকেও বুঝি হারাতে হবে।

দূরের আকাশে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি তেমনি বসে আছি। আর ভাবছি। রীতা যে কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারিনি।

পায়ের শব্দে রীতার উপস্থিতি বুঝলাম। ওকে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিতই হলাম। দেখলাম ওর চোখমুখে উদাসীনতার ভাব। বিষণ্ণতার ছায়া।

—মা বাবাকে কি আর দেখতে পাব না?—দাদাকে দেখতে খুবই ইচ্ছে হয়। বলুন ত আমার হারান দাদাকে কি আর কোন দিন খুঁজে পাব না?—আমার দিকে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিপুণ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতা কথাগুলো বললো। চোখে তার ছলছল জল।

রীতার কথায় আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। বুঝলাম রীতা সুকান্তবাবুর মেয়ে নয়। বুঝলাম তার মনের ব্যথা কোথায়। মনে হলো আমার সন্দেহ ঠিক হলেও হতে পারে। বুঝলাম আমার হাত দেখা সম্বন্ধে রীতার গভীর প্রত্যয় হয়েছে। বললাম তোমার দাদার কথা বল। সব শুনে আমি বলব কি করে তোমার দাদার সাথে দেখা হতে পারে।

যে কথা সুকান্তবাবুদের পরিবারে এতদিন মিশে জানতে পারিনি আজ এক নিমেষেই সে কথা জেনে ফেললাম। হারান দাদার কথায় সপু ভুলে গেল যে সে সুকান্তবাবুর মেয়ে। তার দু' চোখ জলে ভরে এলো। সপু আর নিজের কথা লুকাতে পারল না। লুকাতে চাইলওনা। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি ওর হাত দেখে সব জেনে গেছি; সব বুঝে গেছি। রীতাই বলেছিল সেদিন কি করে সে সপু হতে রীতা মুখার্জ্জীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কি ভাবে সপু আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তা'ত আপনি জানেনই। তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে রীতার কাছে যা শুনলাম তাই বলছি।

ঘুম ভাঙ্গতেই সপু দেখল দাদা তার পাশে নেই। দাদা পাশে নেই এ কথা যেন সপুর ভাবতেই কেমন লাগল। এদিক সেদিক ভাল করে চেয়ে দেখল। অনেক কিছুই আছে। নেই শুধু তার দাদা। অজানা একটা ভয়ে তার বুক ভরে কান্না এলো। পথচলা লোক তার কান্না শুনে এগিয়ে এলো। তারা কত কথাই জিজ্ঞাসা করল। সপু তাদের কোন কথারই উত্তর দিতে পারল না। সে শুধু কাঁদল।—সে শুধু কাঁদল। দাদা যে আজ তার পাশে নেই।

সে ফুটপাত থেকেই সপু এল এক অনাথ আশ্রমে। এ যে অনাথ আশ্রম, এ যে তারই মত নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল একথা সপু সেদিন বুঝতে পারেনি। বুঝেছিল পরে আরও একটু বড় হলে। সেদিন কে বা কারা তাকে এখানে এনে দিয়েছিল সে আজ আর তার মনে নেই। এখানে এসে সে দেখল এখানে রয়েছে তারই মত আরও অনেক ছেলেমেয়ে। সবই আছে নেই শুধু তার দাদা। বুঝল বাবা মার মত দাদাকেও সে হারিয়েছে। বুঝল এখন থেকে এই তার আশ্রয়স্থল।

সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে এখানেই তার দিন কাটতে লাগল। এ অনাথ আশ্রমে সপুর নিত্যদিনের সাথী ও সুখ দুঃখের সবচেয়ে বেশী ভাগী ছিল নমিতাদি। নমিতাদিও একদিন সপুরই মত এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ পরিচারিকাদেরই একজন। বয়স খুব বেশী নয়। সতের আঠার বছর। নমিতাদির স্নেহ-মমতার স্পর্শের মধ্য দিয়েই সপুর মায়ের কথা মনে হতো।

সেই নমিতাদিই একদিন সন্ধ্যায় নির্জ্জন ছাদে সপুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—সপু! আমি কয়েকদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব। এখন থেকে তোমাকে একাই থাকতে হবে। নমিতাদির চোখে জল। কথার মধ্যে কেমন একটা বিষণ্ণতার সুর।

নমিতাদি সপুকে ছেড়ে চলে যাবেন, সপুকে একা থাকতে হবে একথা ভাবতেই যেন সপুর কেমন লাগল। তার সমস্ত মনটা ভয় ও বেদনায় ভরে গেল। নমিতাদির দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলল আমিও তোমার সাথে যাব।

নমিতাদির হাত ধরেই একদিন সপু বেরিয়ে এল অনাথ আশ্রম থেকে। নমিতাদি কিন্তু সপুকে নিজের কাছে রাখলেন না। নিয়ে এলেন সুকান্তবাবুদের কাছে। আগেই নমিতাদি সপুকে শিখিয়ে রেখে ছিলেন সুকান্তবাবুদের কাছে তার নাম বলতে হবে রীতা ব্যানার্জ্জী।

—কেন? বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল সেদিন সপু নমিতাদিকে।

—আমার নাম ত সপু।

জীবন যাদের দুঃখে ভরা তাদের সব কেন'এর উত্তর হয় না সপু। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন নমিতাদি।

তাই-ই বলেছিল সপু সুকান্তবাবুদের কাছে। সেদিন থেকেই সে রীতা ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিত হতে লাগল। সপু নামের মৃত্যু হল তারপর আস্তে আস্তে ব্যানার্জ্জী অংশটাও মুছে গেল। সপু রীতা মুখার্জ্জীতে পরিণত হলো।

প্রথম প্রথম নমিতাদি সুকান্তবাবুদের বাড়ীতে আসতেন রীতাকে দেখতে। তারপর নমিতাদির সে যাতায়াতের মধ্যেও ছেদ পড়ল। তখন থেকে রীতা হয়ে উঠল একমাত্র সুকান্তবাবুদের। সুকান্তবাবুদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। রীতাই সে স্থান দখল করল। রীতা সুকান্তবাবুকে বাবা ও সুকান্তবাবুর স্ত্রীকে মা বলে ডাকত। একথা নমিতাদিদিই রীতাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

রীতার পরবর্তী ইতিহাস সুকান্তবাবুদের সুখ দুখ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। সুকান্তবাবুরা রীতাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। স্কুল থেকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন। তাদের আদর যত্নেই মানুষ। সুকান্তবাবুদের মেয়ে হিসাবেই রীতার পরিচয়। রীতাও তা মেনে নিয়েছিল। তার আচরণেও তাই মনে হতো রীতা সুকান্তবাবুদেরই মেয়ে।

সেদিন রীতা আমায় তার জীবনের ইতিহাস বলেছিল। দেখলাম এতদিন আমি রীতার মধ্যে যাকে কল্পনা করতাম সে আজ আর কল্পনা নয়; সে সত্য। সে'ই সপু। ইচ্ছে হয়েছিল তখনই বলি সপু! আমিই তোমার হারান দাদা। তুমিই আমার হারান বোন সপু। কিন্তু পারলাম না।

পারলাম না সপুর কথা ভেবে। যদি সপু বিশ্বাস না করে আমি তার হারান দাদা।—আর করবেই বা কি করে? সপু ব্রাহ্মণ। রীতা ব্যানার্জ্জী। আর আমি সরকার। কায়স্থ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কি আপন ভাই বোনের সম্বন্ধ হতে পারে? যদি পারেই তাহলে সপুকেও যে প্রতারক সাজতে হবে। সপু মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সুকান্তবাবুদের প্রতারণা করেছে।

পারলাম না সুকান্তবাবুদের কথা ভেবে। তারা সপুকে বড় করেছে। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে। আপন মেয়ের মতনই ভালবাসেন। সে ভালবাসার ধনকে আজ আমি কি করে কেড়ে নেব?

সেদিন থেকেই আমার সামনে প্রশ্ন এসে দাঁড়াল—সপুকে কি প্রতারক সাজাব?—সুকান্তবাবুদের কি বঞ্চনা করব?—না নিজের দুঃখের বোঝা নীরবে সহ্য করে যাব?

অনেকদিনই ইচ্ছে হয়েছে সপুকে বলি—আমি তোমার হারান দাদা। ইচ্ছে হয়েছে সুকান্তবাবুদের কাছে সব খুলে বলি। বলি সপু আমার হারান বোন। আমি তারই ভাই। সপু আপনাদের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বঞ্চনা করেছে। এমনি করে শুধু কল্পনার জালই বুনতে লাগলাম। স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে আমার ও রীতার সম্বন্ধ নিয়ে লোকমুখে একটু ভিন্ন ধরণের আলোচনাও সুরু হয়ে গেল। এক জাতীয় লোক আছে তারা সন্দেহবাদী। সব কিছুতেই তারা সন্দেহ করে। ভালকেও তারা খারাপ করে দেখে। আমার ও রীতার সম্বন্ধেও তাই ভাবল। তারা আমাদের এ মেলামেশাকে ভাল চোখে দেখল না।

প্রথম প্রথম এটাকে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। কিন্তু পরে দেখলাম উপায় নেই। নিন্দার পরিধিও বাড়ল। তাই সুকান্তবাবুরাও আমায় একদিন সে কথা জানালেন। ভাবলাম আর যাব না। কিন্তু না গিয়ে থাকতে পারতাম না। সপুকে আমি ভাই বলে পরিচয় দিতেও পারলাম না। কিন্তু মনের জগতে সে আমার হারান বোন হয়েই রইলো। তাকে না দেখলে কেমন অস্বস্তি বোধ করতাম। তাই শত অপবাদ সহ্য করেও যেতে হতো। সুখ এটাই যে আমার হারান বোন সপুকে দেখতে পেতাম।

ইদানীং সে অপবাদ চরম সীমায় উঠেছে। সুকান্ত-বাবুদের নিষেধ, আমার প্রতি অহেতুক ঘৃণা সত্ত্বেও তাদের বাড়ী গিয়েছি। অপমানের গ্লানিকে মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছি। তবু যাই। লোকেরই বা দোষ দেব কি করে? তারা ত আমাদের বাইরের সম্বন্ধটাই দেখেছে। ভিতরের কথা জানে নি। আমার মনটা তারা দেখেনি। আমি জানি সপুরও আমাকে না দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু উপায়ও কি?

এতদিন লোকের শত অপবাদ ও উপেক্ষাকে ঘৃণা করে চলেছি নিজের মনের দিকে চেয়ে।—সপুর মনের দিকে চেয়ে। কিন্তু কাল সপুর মুখেই শুনলাম সুকান্তবাবুরা নাকি সপুকে শাসিয়েছেন আমি যদি ওদের বাড়ী যাই এবং

সপু যদি আমার সাথে মেশে তাহলে তাকে নাকি তারা ঐ কলঙ্কের জন্য গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবেন।

এখন ভেবে দেখছি সপুর এ কলঙ্কের জন্য আমিই দায়ী। যে সপুকে আমি ভালবাসি; সে সপু আমারই বোন; যাকে আমি পথে হারিয়েছি; যাকে আমি সুখী করতে চেয়েছি। সে অসুখী হোক এটা আমি চাই না। কিন্তু আমি এখানে থাকলে সে সুখী হতে পারবে না। হয়তো বা আমি তার দুঃখকে আরও টেনে আনব। তাই ভেবে দেখলাম এ স্থান আমার ছেড়ে যাওয়াই উচিত। আজ চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছি। এখানে আর কোনোদিন আমার পায়ের চিহ্ন পড়বে না। সপু না'ই জানতে পারল আমি তার দাদা;—লোকে নাই বা জানল আমিই তার হারান দাদা, তবু প্রার্থনা করি সপু সুখী হোক। জীবনে বড় হোক। জয়ী হোক।

রীতা আমার হারান বোন সপু এ জীবনে তা আর কেউ জানবে না। কিন্তু কাউকে না জানাতে পারলে আমিও আমার এ জীবনে শান্তি পেতাম না। তাই আজ আপনাকে বলে গেলাম। সরকারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ জলে ভরা। কণ্ঠে শত বেদনার সুর।

বাইরে একটা রিক্সা এসে অনেক আগেই দাঁড়িয়েছিল। সরকারবাবু তার ঘরের জিনিষগুলো রিক্সায় তুলে নিলেন। বিমর্ষ ভাবেই বললেন—আপনার গল্পের বক্তব্য হয়তো এবার কিছু পরিবর্ত্তন হবে।

সমবেদনার কণ্ঠে উত্তর দিলাম—না সরকারবাবু, আপনাকে নিয়ে আর গল্প লিখব না।

কেন?—চলে যাওয়া রিক্সা থেকেই সরকারবাবু আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন।

—নিশ্চয় লিখবেন। যে কথা আমি বলতে পারিনি, যে কথা বললে লোকে বিশ্বাস করত না, তা আপনাকেই লিখতে হবে। তার মধ্যেই আমি আমার সান্ত্বনা খুঁজে পাব। লোকেও বিশ্বাস করবে। হয়তো বা কারও চোখে সমবেদনার অশ্রু ঝড়বে।

বাউল

কামাখ্যা সরকার

সমস্ত সকাল শুধু পথের ধুলোয়
একটি প্রত্যাশা নিয়ে কার লগ্ন আসে;
কার লাগি জীবনের সে মুহূর্ত শুধু,
একান্ত আপন করে সব ভালবাসে।

তুমি তো মনের রং প্রাণের বাউল,
সমস্ত প্রত্যাশা আর পূর্ণতার গীত;
প্রভাতী সংলাপ সুরে তুমিই আহ্বান
তুমিই তো আকাশের নক্ষত্র-সংগীত।

পথের ধুলোয় চলে পথিক বাউল
গানের মনের রংয়ে আকাশের নীল;
অসীম শূন্যতা ছুঁয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
সকল সুরের সুরে রেখে যায় মিল।

বাউল বেঁধেছে সুরে প্রত্যাশার ধ্বনি
গানে তার স্বপ্ন মাখা আকাঙ্ক্ষার ভাষা;
উদাসী মনের ঢেউ কাঁদায় ধরণী,
সে কাঁদে সকল ভুলে যে জানে পিপাসা।

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে যারা তাদের লোকসংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষা বৃহত্তম। তার পরে হিন্দি আর উর্দুর স্থান। অবশ্য নিজ এলাকার বাইরে হিন্দি আর উর্দুর যে প্রসার আছে, বাংলার তা নেই। তার কারণ, বাঙালির কর্মশক্তির দৌড় কম, ভাষার উৎকর্ষের অভাব নয়। বাংলা যে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষা এবং শ্রেষ্ঠ ভারতীয়-আর্য ভাষা, এ-বিষয়ে মতবিরোধ নেই।

অন্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিরও সাহিত্যগৌরব আছে নিঃসন্দেহে। উর্দু সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ; সম্ভবত বাংলার পরেই এর স্থান। মগহি বা মগধী ভাষা ছাড়া সব ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য আছে। মগহি ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা সবচেয়ে অবনত।

লোক সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয়-আর্য শাখার বৃদ্ধির হার প্রশংসনীয় হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে অতি নিন্দনীয়। এত অল্প জায়গায় এত বেশি লোকের বাস অসঙ্গত ও বিপজ্জনক। আজকাল ভারতীয়-আর্যভাষীরা আগের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বাইরে যাচ্ছে; কিন্তু এখন বহির্জগৎ তাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত নয়। উপনিবেশ বিস্তারের সুযোগলাভের স্বর্ণ যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে তারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে ঘরে বসেছিল। ফলে এখন এমন কোন ভারতীয়-আর্য উপনিবেশ নেই যেখানে তারা সমাদৃত হতে পারে। এ-ব্যাপারে অনার্য তামিলরা বরং উদ্যমশীল; তারা নিজেদের চেষ্টায় ব্রহ্ম, মালয়, সিংহল ইত্যাদি স্থানে যা একটু-আধটু থাকার ব্যবস্থা করেছিল, কালের গতিকে তাও ঘুচে যেতে বসেছে। ভারতীয়-আর্যভাষীদের মধ্যে বাঙালিদের প্রসার প্রচেষ্টাই শোচনীয়তম; তাদের না আছে উদ্যম ও সামর্থ্য, না রাষ্ট্রানুকূল্য বা ভাগ্যের সুদৃষ্টি।

সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষাগুলির মধ্যে মগহি আর জিপসি বা রোমানি ভাষা দুটির কথা বাদ দিয়ে হিসেব করলে দেখা যায়, বাংলা আর উর্দুর পরে গুজরাতি ও মারাঠির স্থান। সৃষ্টির আধিক্যের দিক দিয়ে অবশ্য হিন্দির স্থান সকলের উর্ধ্বে। কিন্তু কলকারখানায় প্রভূত পণ্য উৎপাদনের মতো প্রচুর লিখলেই সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় না।

জাতীয় আত্মার শক্তির ওপর ভাষার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তার রহস্য নিয়ে এবার বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। পৃথিবীর প্রধান-অপ্রধান ভাষাগোষ্ঠীগুলির এবং সব বড় ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার অতি সামান্য প্রাথমিক পরিচয় মাত্র দেওয়া অতঃপর শেষ হলো। এর পর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী কোন বিশেষ ভাষা বা ভাষাগোষ্ঠী নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা রূপবর্ণনা দেওয়া যাবে।

উপস্থাপনা

বর্তমান পৃথিবীর লিপি, ভাষা ও নৃতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কয়েকটি নরগোষ্ঠী, লিপিপদ্ধতি ও ভাষাগুচ্ছ ক্রমাগত অন্য কতকগুলি নরসমষ্টি, লিপিপ্রণালী ও ভাষাযূথকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করে বিজয়-অভিযান সম্প্রসারিত করছে। উদ্বর্তনের জন্যে এই সংগ্রামের ইতিহাসই সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস। এই সংগ্রাম কোথাও গোপনে নীরবে লোক-

চক্ষুর আপাত-অন্তরালে এগিয়ে চলেছে। কোথাও সশব্দে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক অথবা অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রকট রূপ ধরে এই সংগ্রাম লোকসমাজের নিতান্ত গোচরে আত্মপ্রকাশরত।

বিশেষ মনোযোগ দিলে দেখা যায়, জগতে কয়েকটি প্রধান প্রবণতা সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রসারের ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত। নরগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইউরোপীয় জাতি সমূহ অর্থাৎ জার্মানিক, লাতিনিক আর স্লাভ জাতিসমষ্টি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, সিবেরিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীদের উত্তরোত্তর পর্যুদস্ত করে নিজেদের প্রসার চলেছে বাড়িয়ে আর বাড়িয়ে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তর রূপ ওশিয়ানিয়া, আণ্টার্কটিকা—এই পাঁচটি মহাদেশ ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইউরোপীয় বর্গের ভাষাভাষীদের দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধ্যুষিত। সামান্য কিছু ফিন্-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোক, কিছু তুর্কি, নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ বা গোপন অরণ্যচর লাল মানুষ, মুক্তিপ্রাপ্ত অল্পসংখ্যক অধীর কিন্তু দিশাহারা নিগ্রো, অতি মুষ্টিমেয় ক্ষীণাবশেষ লুপ্তপ্রায় কয়েকটি অসংস্কৃত অবক্ষীণ জাতি যাদের লুপ্তি অনিবার্য এবং এমন আসন্ন যে, দয়াপরবশ হয়ে এক দল ইউরোপীয়ই তাদের রক্ষা করতে চায়, তবুও যারা রক্ষা পাবে না—এদের কথা বাদ দিলে ঐ পাঁচটি মহাদেশে ইউরোপীয়-বর্গের জাতিপুঞ্জ বা ভাষাগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোন মনুষ্য-সমাজের স্থায়ী নাগরিকরূপে অস্তিত্ব নেই। চীনা, জাপানি ও ভারতীয় কিছু লোকের কর্মব্যপদেশে ও-সব এলাকায় বসবাস আছে বটে, কিন্তু তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত। ইউরোপ ছাড়া আর চারটি মহাদেশ প্রকৃতপক্ষে জার্মানিক, লাতিন ও স্লাভ নরগোষ্ঠীর দখলে। প্রশান্ত মহাসাগরের অস্ট্রোনেশীয় জাতিগুলিকে প্রবলপরাক্রান্ত ইউরোপীয় সভ্যতা শীঘ্রই আত্মসাৎ করে নেবে। দুই আমেরিকা আর ওশিয়ানিয়ায় আদিম অধিবাসীদের শেষ মানুষটিরও বিলুপ্তি এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। দুই আমেরিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন ক্ষুদ্র অংশে চীন, জাপান ও ভারত প্রভৃতি এশীয় দেশের লোকদের কিছু বসতি আছে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত কর্ম উপলক্ষে, অস্থায়ী ভাবে, নিম্ন-স্তরের নাগরিক বা বৈদেশিক রূপে। ফিজি বা গুইয়ানাকে ভারতীয় জাতির রাষ্ট্র বলা যাবে না। কিন্তু দুই আমেরিকা ইংরেজ, স্পেনীয়, পোর্তুগিস, ফরাসি আর ডাচ—মাত্র এই পাঁচটি টিউটন ও লাতিন জাতিগুলির দ্বারা অধিকৃত।

আফ্রিকা মহাদেশ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত প্রায় সবটা ইউরোপীয় জাতিগুলির—আসলে মাত্র ছ'টি জাতির—অধীনে ছিল। আফ্রিকার উত্তরাংশের সেমীয় ভাষা-গোষ্ঠীর লোকদের কথা বাদ দিলে আফ্রিকার অবশিষ্টাংশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি নয়। কোন কোন অঞ্চলে যৌন ব্যাধির প্রসার এত উৎকট যে, স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই দ্রুত প্রজনন শক্তি হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। আফ্রিকার উত্তরেতর বা দক্ষিণ অংশের যেটুকু লোকবৃদ্ধি ঘটেছে তার অনেকটা আবার ইউরোপীয় প্রভু জাতিগুলির সুবিন্যস্ত শাসনপদ্ধতির কল্যাণে খণ্ডজাতীয় যুদ্ধবিগ্রহ আর লোকক্ষয় বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত থাকায়। স্বাধীনতা লাভের পর আফ্রিকার বেয়াড়া গড়নের রাষ্ট্রগুলি ঠিক কোন্ পথে কতটা উন্নতির দিকে যাবে, তা এখনও জোর করে বলা যায় না। আফ্রিকার ইউরোপীয়-অধিকৃত সব অঞ্চল এখনও মুক্ত হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ ঔপনিবেশিকদের কথা বাদ দিলেও পোর্তুগিস আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকেরা এখনও বিরাট এলাকা দখল করে আছে।

এশিয়াই ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র মহাদেশ যার লোকেরা আফ্রিকার উত্তরাংশ দখল করে সেখানে স্থায়ী বসতি বিস্তার করেছে, ইউরোপেও একাধিক স্বাধীন জাতির রাষ্ট্র স্থাপন করেছে এবং ছড়িয়ে গেছে আফ্রিকার অন্যান্য অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে আর দুই আমেরিকায়। সেই জন্যে এশিয়ার লোকদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংঘর্ষের ভাব অতি প্রবল। এশিয়ার উত্তরাংশ সাইবেরিয়া স্লাভ জাতির লোকেরা ক্রমশ দখল করে নিয়েছে। রুশ-চীন মৈত্রীর আপাতরম্য যবনিকার অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে স্লাভ জাতির ইউরোপীয়রা মঙ্গোল ও ও চৈনিক জাতিগুলিকে আরও দক্ষিণে ঠেলে নিয়ে যাবার সুযোগ পায়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি বিশেষ করে স্লাভ জাতির লোকেরা ইউরোপ থেকে অটোমান তুর্কিদের

প্রায় বহিষ্কৃত করেছে ; যে-সামান্য অংশে তুর্কিরা এখনও আছে, কোন এক সামরিক বিবাদে সে-অংশ থেকেও তারা বিতাড়িত হতে বা ইউরোপীয়তা স্বীকার করতে পারে, যেমন ফিন্ ও মাজ্যররা ভাষায় ও জাতিতে এশিয়ার লোক হলেও ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পুরোপুরি ইউরোপের লোক। এক্ষেত্রে তুর্কিদের মুসলিম ধর্ম কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। আলবানীয়রা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোক এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইউরোপীয় জাতি। তুর্কিরাও ইউরোপীয় জাতিরূপে পরিগণিত হতে চায়। ফিন ও মাজ্যর জাতি এশিয়া থেকে ইউরোপে গেলেও এখন তারা মুখ্যত খ্রিষ্ট ধর্মের কল্যাণে ইউরোপীয় জাতিতে পরিণত। বর্তমান পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্মকে এশিয়ার পরিবর্তে ইউরোপের ধর্ম বলতে হবে। তুরস্ক ইতিমধ্যে রোমক লিপি ও ইউরোপীয় বেশভূষা স্বীকার করেছে। স্পেনীয়রা আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে মুর সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে ইউরোপীয় সত্তার জাগরণকে করেছে পূর্ণ তেজে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্লাভরা মধ্য এশিয়ায় তুর্ক-তাতারদের, ককেশাসে ককেশীয়দের, রুশিয়া আর ইউরেশিয়ার নানা জায়গায় মঙ্গোল ও মাঞ্চুদের ইউরোপীয় সভ্যতার শাসন মানতে বাধ্য করেছে। ফিন্-উগ্রীয় জাতির বাসভূমি এস্তোনিয়া সম্পূর্ণরূপে রুশের অধীনে এবং ফিন্ল্যাণ্ড, লাপল্যাণ্ড ও মর্দভিন্ জাতির এলাকার বহু অংশ তার নিয়ন্ত্রণে। এ সবই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাধান্যের নির্দেশক।

পক্ষান্তরে ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকে এশিয়ার ঘুম ভেঙেছে। এশিয়ায় পাশ্চাত্য বা ইউরামেরিকার সাম্রাজ্যবাদ লুপ্তপ্রায়। সাইবেরিয়ায় স্লাভদের ছাড়া এশিয়ার অন্য কোথাও ইউরোপ-আমেরিকার উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারে নি। এশিয়ার নবজাগরণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সুরু হয়; ১৯০৫ সালে চীন ও ভারতে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। তার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে এশিয়া আজ প্রায় পূর্ণ স্বাধীন। অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মতোই প্রধান স্লাভ জাতি রুশ এশিয়ার মহা শত্রু। কিন্তু সে-কথা কোন কোন এশীয় জাতি ঠিক না বোঝায় এশিয়াতে অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে, রুশরা ইংরেজ-ফরাসি-মার্কিনদের মতো ঔপনিবেশিক নয়। ন্যায়সঙ্গত কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে এশিয়ার অধিবাসীরা অনেকে সন্ত্রস্ত। সেই সুযোগে তাদের মিত্র সেজে স্লাভ নরগোষ্ঠী এশিয়ায় ক্রমশ আত্মবিস্তার লাভের অবকাশ পাচ্ছে। এই শতাব্দীর প্রথমে জাপান এ-রহস্য ঠিক ভাবে উপলব্ধি করে কোরীয় আর চীনাদের সাহায্যে এশিয়াকে তথা নিজেকে এক দিকে শ্বেতকায় স্লাভ জাতি অন্য দিকে আমেরিকার ইউরোপাগত ঔপনিবেশিকদের কবল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু জাপ-চীন আত্মঘাতী মহাসংগ্রামের ফলে এশিয়ার আত্মরক্ষা ও নব অভ্যুত্থানের এক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। তার জন্যে চীনাদের এক কালের নেতা শ্যাং-কাই-সেক বা চিআং-কাই-সেক সবচেয়ে বেশি দোষী ও দায়ী। জাপানের সঙ্গে সময়মতো মৈত্রী না করায় চিআং-কাইসেকের যে-মূর্খতা ও আত্মঘাতী গোঁয়ার্তুমি দেখা গেল, তার মূল চৈনিক স্বভাবের গভীরে।

মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনারা স্লাভদের সঙ্গে এক আত্মঘাতী তথা এশিয়াঘাতী মৈত্রী স্থাপন করে। এর ফলে তুর্ক-তাতার, মঙ্গোল ও মাঞ্চু নরগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠী রুশ-চীনের সম্মিলিত চাপে অচিরে উৎসন্ন হতে আরম্ভ করে। উরাল-আলতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা মুখ্যত রুশ নেতৃত্বে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল এই শতাব্দীর আগে থেকেই। চৈনিক জাতিগুলির বা চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর এলাকাতে রুশ অনুপ্রবেশ ঘটতে পারত যদি অকস্মাৎ চীন স্বার্থরক্ষায় সজাগ হওয়ার ফলে রুশ-চীন মৈত্রী ক্ষুণ্ণ না হত। রুশ-চীন মৈত্রীতে রুশের অন্যতম স্বার্থ যে চীনের খরচে আত্মবিস্তার, এটা চীনারা এখন বুঝতে পেরেছে ব'লে মনে হয়।

আবার লক্ষ্য করলে বেশ দেখা যায় যে, চীনা নরগোষ্ঠী ও চীনা-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রমাগত বিস্তৃত করছে অষ্ট্রিক নর ও ভাষাগোষ্ঠীর পশ্চাদপসরণ তথা বিলোপসাধন ঘটিয়ে। উত্তর চৈনিক ও তার সঙ্গীসহচর বিভিন্ন সহ-জাতি মুখ্যত ঔপনিবেশিক জাতিগোষ্ঠী। জাপানীদের তুলনায় চীনারা অনেক বেশি ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী। "দ্বীপময় ভারত" গ্রন্থে

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে এক ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার সত্যতা আমরা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করছি, যখন দেখছি যে, মালয়ের আদিবাসীদের ক্রমশ হটিয়ে দিয়ে সেখানে চীনারা বসতি ও লোকসংখ্যায় নিজেদের অনুপাত বৃদ্ধি করছে। ইন্দো-চীন বা ভারত-চীন এলাকার টংকিং, আনাম ও কোচিন-চীন কার্যত চৈনিক প্রদেশ হয়ে গেছে। শ্যাম, কাম্বোজ, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ চীনা শ্রমিক ও বণিক্ শ্রেণীর ঔপনিবেশিকদের কাছে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ করছে।

জাতি ও গোষ্ঠীগত প্রাধান্যবিস্তারের এই প্রয়াস বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত যার দ্বারা দুর্বলের পরাভব আর যোগ্যতমের উদ্বর্তন সূচিত হয়। পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর এবং উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় আরবরা স্থানীয় অধিবাসী আর আফ্রিকান আদিবাসীদের পরাস্ত করে এগিয়ে চলেছে। ভারতে হিন্দু আদিবাসীদের—ভৌগোলিক ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের পর্যুদস্ত ক'রে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম ও ধর্মের প্রেরণায় গঠিত ভাষা ও লিপির জয় ঘোষণা করছে। আরবি লিপিতে লেখা উর্দু ভাষা ভারতীয়-আর্যভাষা পাঞ্জাবি, সিন্ধি ও কাশ্মীরিকে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত ক'রে দিচ্ছে। দাক্ষিণাত্যেও দকনি বা হিন্দুস্তানি বা উর্দুর প্রকারভেদ দ্রাবিড় ভাষাগুলির ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত। উর্দুর কিছু শব্দ আরবি এবং লিপিও সেমীয় বটে, কিন্তু উর্দু আসলে ভারতীয়-আর্য ভাষা—ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা তো বটেই। এতে ফার্সি ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডারের প্রভূত প্রভাব থাকলেও তার দ্বারা এর গোষ্ঠীবৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। গোষ্ঠীবহির্ভূত শব্দ আরবি ছাড়া তুর্কি ভাষা থেকেও উর্দুতে এসেছে। পাকিস্থানে এই ভারতীয়-আর্য ভাষা পাকিস্থানি জাতীয়তাবাদের ছলে সিন্ধি, বালুচ, পশ্‌তো, পাঞ্জাবি ও কাশ্মীরি—এই পাঁচটি ভাষার কণ্ঠরোধ করছে। সিংহল থেকে তামিল ভাষা ও তামিলভাষীদের অপসারিত ক'রে ভারতীয়-আর্য ভাষা সিংহলি জয়যুক্ত হচ্ছে। ভারতেও উর্দুর আধিপত্য পাকিস্থানের মতো সর্বত্র প্রবল না হলেও মগহি-মৈথিল-ভোজপুরি-কোসলি-হিন্দি-রাজস্থানি-পাঞ্জাবি-ডোগরি-কাশ্মীরি ভাষাগুলি পরস্পরসংশ্লিষ্ট যে বিস্তীর্ণ এলাকায় বলা হয় সেখানে এবং হায়দরাবাদে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য। রোমক লিপিতে লেখা হিন্দি-উর্দুর মিলিত রূপ হিন্দুস্থানি ভাষার দ্বারা সমগ্র ভারতে বাংলা-মারাঠি-তামিল ইত্যাদি ভাষাকে গ্রাস ক'রে কেবল একটি মাতৃভাষা দেখা যাবে—এমন স্বপ্ন এক কালে অনেকেই দেখেছেন এবং এখনও দেখে থাকেন। এমন সাধ যে মানবতার বিকাশধর্মের শোচনীয় বিরুদ্ধাচরণ, তা পরে ব্যাখ্যা করা যাবে।

কমিউনিস্‌মের চাপে কনফুশিআস ও লাও-ৎসের ধর্ম, ইসলামের চাপে ভারত, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার আদি অধিবাসীদের ধর্ম বিনষ্টপ্রায়। খ্রিস্ট ধর্ম ক্রম-প্রসারের উদ্দেশ্যে ফরাসীদের দ্বারা একদা-অধিকৃত লেভাঁ যখন স্বাধীন সিরিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন তা থেকে খ্রিস্টান-সংখ্যাগরিষ্ঠ লেবানন অঞ্চলকে পৃথক্ ক'রে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা গেল। বস্তুত এই ধরনের প্রক্রিয়া আবহমানকাল থেকে চ'লে আসছে। মহাকালচক্রের আবর্তনে এক এক সময় এক এক দলের প্রসার ও আর এক দলের অবনতি হয়ে থাকে। এখানে কে ভালো, কে মন্দ সে-প্রশ্ন অনেকটা অবান্তর। কত বড় বড় ভাষা ও জাতি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে, কত অজ্ঞাতপ্রায় ক্ষুদ্র ভাষা ও জাতি দেখতে দেখতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে।

বর্তমান জগতের লিপি, ভাষা ও নরতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়—ভারত-ইউরোপীয়, চীন-তিব্বতীয়, সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলি, রোমক, গ্রিক ও আরবি লিপিসমূহ এবং টিউটন, লাতিন, স্লাভ, আরব ও চৈনিক জাতিসমষ্টি ভাষা, লিপি ও ভূখণ্ড সমেত লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে। এদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অপর সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামেও সব রকমে এদের জয়লাভ অবধারিত। ভবিষ্যতে এদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলবে প্রবলতর হয়ে। ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীগুলিও তাদের তুলনায় দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলিকে ক্রমাগত কোণঠাসা করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে, এমন হামেশা দেখা যায়।

ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের প্রাধান্য এখন জগৎ জুড়ে। এদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট কলহ এবং

মতবিরোধ থাকলেও অন্য জাতীয়দের অপসারণকার্যে এরা প্রকৃতির হাতে নিপুণ অস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গোষ্ঠীর ইঙ্গ-মার্কিন অর্থাৎ মুখ্যত টিউটন জাতিকে স্বগোষ্ঠীর স্লাভ জাতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। এই বোঝাপড়া হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবকাশে। অন্যান্য জাতি এই যুদ্ধে কে কোন্ পক্ষে থাকবে, তা এখনই বলা না গেলেও এটা ঠিক যে, আগামী বিশ্বযুদ্ধ বা বিশ্ব-যুদ্ধগুলিতে দুই পক্ষের কোন একটিকে তারা বেছে নিতে বাধ্য হবেই। বিশ্বযুদ্ধগুলির পরিণাম আর যাই হোক, ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। যুদ্ধের প্রকৃত মূল্য দিতে হবে এই গোষ্ঠীর দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চৈনিক ও আরব নরগোষ্ঠীকে। বিশেষত চীনা জনসাধারণকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি দাম দিতে হবে। নাপোলেঅন-বর্ণিত ঘুমন্ত দৈত্য চীন জেগে উঠেছে। কাইজারবর্ণিত পীতাতঙ্ক এখন চীনকে উপলক্ষ্য ক'রে সব জাতিকেই করেছে বিচলিত ও সন্ত্রস্ত। সুতরাং ইঙ্গমার্কিন ও রুশদের উদ্যোগে পরিচালিত যুদ্ধ এমনভাবে সংঘটিত হবে যাতে পীতাতঙ্ক লুপ্ত হয়। চীনা ও আরব—দুটি মাত্র জাতি ভারত-ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীর পূর্ণ সাফল্য লাভের পথে অন্তরায়। অপর সকলে এখন বশ্যতা স্বীকার করেছে। সুতরাং প্রতিবন্ধক দুটিকে অপসারিত করার কাজ পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় আরম্ভ হবে।

আরবদের যে-প্রাধান্য একদিন তুরস্ক ও ইরানের, লেভাঁ ও ইথিওপিয়ার ওপর ছিল, এখন আর তা নেই। তুরস্ক কার্যত ইস্‌লামি রাষ্ট্র নয়; ইথিওপিয়া খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী; লেবাননে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; ইস্রাএলে অতি শক্তিশালী ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত যার আয়তন ও শক্তিবৃদ্ধি এখন ইঙ্গমার্কিন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তুরস্কে রোমক লিপির পূর্ণ ব্যবহার স্বীকৃত; ইরানে রোমক লিপির প্রচলন বাড়ছে। নাসের ও সাউদি রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে বাহ্‌রাইন দ্বীপ থেকে কাসাব্লাঙ্কা মহানগরী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় আরব জাতি সংহতিবদ্ধ হতে পারে নি। আরব জাতি সেইজন্যে খুব শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বাদে অবশিষ্ট সমস্ত আরব এলাকা এখনও পাশ্চাত্য প্রভাবের একান্ত বশম্বদ। প্রকৃত দুর্জয় বাধা হলো চীন। চীন এখন আর রুশ প্রভাবাধীন নয়। সুতরাং ইঙ্গমার্কিন শক্তির স্লাভ প্রতিদ্বন্দ্বী রুশের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় চীনের কথা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

সারা দুনিয়ায় ভারত-ইউরোপীয় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন কেবল চীনের বিনাশ বা বিপর্যয়ের পর সম্ভবপর হতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই আধিপত্য প্রায় স্থাপিত হয়েছিল। জাপান এই আধিপত্য স্থাপনের প্রবল বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী ভারত-ইউরোপীয় প্রভুত্বের প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে চীন। বৃহৎ পঞ্চশক্তির চারটিই পাশ্চাত্য ইউরামেরিকার শক্তি তথা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চীনের পরাভবের পর সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জের অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপিত হওয়ার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানের অভ্যুত্থান আবার দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে কেবল ভারত-ইউরোপীয়রা প্রভুত্ব করবে, অন্যেরা একেবারে লুপ্ত হবে কিম্বা দাসত্ব করবে, এ-ব্যাপার অসম্ভব ব'লে মনে হয়। সৃষ্টিলীলায় বৈচিত্র্যের স্থান অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক ধর্মে তা থাকবে ব'লে মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

সাধকের সাথে

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(হরিদ্বার)

কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর সাধুসঙ্গের ইচ্ছা ক্রমে অধিকতর প্রবল হইল, এবং বিখ্যাত বা অখ্যাত কয়েকটি সাধুদের বিষয় যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা অবলম্বন করিয়া, কোন কোন সাধুর সহিত সাক্ষাতের প্রয়াসী হইলাম। জানি না কোন সৌভাগ্য বশে বেলুড়ে একজন মহাত্মার দর্শন লাভ হইল, যাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই মনে হইল যে আর সন্ধানের প্রয়োজন হইবে না, ইনিই সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে, সাধন-পথের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করিতে, ও মার্গপ্রদর্শিত করিতে সমর্থ হইবেন। ক্রমে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধর্ম ও সাধনের কতিপয় বিষয়ের মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইল এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হইল। এই মহামানব সাধকবর শ্রীমৎ ভৈরবানন্দ পরমহংস নামে পরিচিত এবং অলৌকিক সাধন সম্পদ ও যোগসিদ্ধির অধিকারী। সূক্ষ্ম জগতে তাঁহার যোগ শক্তি অতুলনীয়। তাঁহার অমোঘ আহ্বান কোন দেব, দেবী, ঋষি, মুনি বা সূক্ষ্ম শরীরী অগ্রাহ্য করিতে পারবেন না। তাঁহারা আসিয়া মহারাজকে দেখা দেন এবং প্রয়োজনীয় কথা শুনেন ও বলেন।

মহারাজের সহিত ভারতের কয়েকটি স্থান ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। গত নভেম্বার মাসে আমরা স্থির করিলাম যে ডেরাডুনে আমার বাটিতে থাকিয়া, জনবিরল স্থানে শান্তিতে কিছু দিন একটু সাধন ভজনে কাটাইব। প্রস্তাবটি মহারাজকে জানাইয়া ডেরাডুনে তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলাম। যদিও ডেরাডুনে শীতে মহারাজের শারীরিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তবুও তিনি অনুগ্রহ করিয়া, রেলযোগে এই সুদূর পথের কষ্টকর যাত্রা করিতে এবং ডেরাডুনে আমাদের সহিত আমাদের বাটিতে কয়েকদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। আমরা স্থির করিলাম পথে হরিদ্বারে দুদিন থাকিয়া ডেরাডুনে যাইব।

১৪ই নভেম্বার কলকাতা হইতে রওনা হইয়া আমরা (মহারাজ, আমি ও আমার স্ত্রী) ১৬ই বুধবার প্রাতে হরিদ্বারে পৌছিলাম। হরিদ্বারে আমাদের একটি পুরাতন ভৃত্য (ব্রাহ্মণ) থাকে। সে আমার নির্দেশ মত রেলস্টেশানের রিটায়রিং রুমে আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া, যথা সাধ্য আমাদের সেবা করিবার জন্য উপস্থিত ছিল। আমার কর্ম জীবনে এবং পরেও আমি বহুবার হরিদ্বারে গিয়াছি ও থাকিয়াছি। মহারাজ কিন্তু স্থূল শরীরে এইবার প্রথম সেখানে পদার্পণ করিলেন, অতএব হরিদ্বারে কোথায় কি আছে, তাহা তিনি জানিতেন না, পথ ঘাটও চিনিতেন না।

রিটায়রিং রুমের প্রাঙ্গণে মহারাজ হস্তদ্বারা দিগ্‌ নির্দেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দিকে কি কোন প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন? একটি জ্যোতির্ময় শিব ঐ দিক হইতে আহ্বান করিতেছেন"। মহারাজ যখন কোন স্থানে যান, তথায় যদি কোন জাগ্রত দেবতা থাকেন, বিশেষতঃ শক্তি, শিব বা বিষ্ণু মূর্তিতে, তাহা হইলে তিনি শূন্যে উঠিয়া মহারাজকে দর্শন দেন ও নিজের উপস্থিতি জানান। মহারাজ যে দিকটি দেখালেন এবং যাহা বর্ণন করিলেন তাহা হইতে বুঝিলাম যে ভীম গোড়ার শিবের আহ্বান। মহারাজকে বলিলাম "ব্রহ্ম কুণ্ডে, "হর কী পৈড়ীতে" গঙ্গা স্নানের পর আমরা ভীমগোড়ায় যাব।"

আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাস্নান করিলাম। মহারাজ যখন স্নান করেন, তখন তাঁহার আহ্বানে তীর্থ উপস্থিত হইয়া দেখা দেয়। এখানে কিন্তু তিনি গঙ্গার সত্তা অনুভব করিলেন না। মা গঙ্গার অভাবে তাঁহার আকুল আহ্বানে গঙ্গাদেবী গঙ্গোত্রী গোমুখী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার হরিদ্বারে না থাকার কারণ এইরূপ বলিলেন:

"আমার শাস্ত্র সম্মত আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায়, আমি বিষ্ণু পাদ পদ্মে ফিরিয়া যাই, তবে আমার আত্মিক সত্তা কিছু তীর্থগুলিতে থাকে। এই হরিদ্বার তীর্থে আমার আত্মিক সত্তা যাহা ছিল, তাহা এখন নাই। আমাকে বন্ধন করায়, আর বিশেষতঃ আমার উপর বহু অনাচার করায়, এখন আমার সত্তা এস্থান হইতে সরিয়া গোমুখীতে আছে। তোমার আহ্বানে আমি গোমুখী হইতে আসিয়াছি।" এই তীর্থে গঙ্গার সত্তা আর থাকে না জানিয়া মহারাজ ও আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। গঙ্গা স্নানের পরে আমরা ঘাটস্থ দেব মূর্তিগুলির দর্শন করিলাম। মহারাজ কোথাও দেব সত্তা অনুভব করেন নাই। ঋষি, মুনি, দেব দেবী আদি কোন সূক্ষ্ম শরীরীদের মহারাজ হরিদ্বারে দেখিতে পান নাই যে রূপ বারাণসী প্রয়াগাদি তীর্থে দেখিয়াছিলেন—পরে যখন মহাবীর হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তিনিও বলিয়াছিলেন "এখানে গঙ্গা থাকেন না এবং অন্য কোন দেবতা, মুনি ঋষি আদি এখন আসেন না"।

এই প্রাচীন বিখ্যাত তীর্থ প্রাণহীন বলিয়া প্রতীত হইল। মা গঙ্গা যেন ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গঙ্গা সকল পাবনী ও পাপ বিনাশিনী। গঙ্গায় যখন কোন শক্তিমান সাধক স্নান করেন, তখন দেবীর সত্তা তিনি অনুভব করেন, কিন্তু হরিদ্বারে যখন পরমহংস মহারাজের ন্যায় শক্তিমান সাধক দেবসত্তার পরিচয় পান নাই, তখন বেশ বুঝিলেন মা গঙ্গার আত্মিক সত্তা হরিদ্বার হইতে অপহৃত হইয়াছে। মা গঙ্গার কথায় ইহা সমর্থিত হইল। মহারাজ বলিলেন, "দেবশক্তির যদি অনবরত ক্ষয় হইতে থাকে এবং শুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা বিধিমত পূজার অভাবে শক্তির পুনঃ সঞ্চার না হইতে থাকে, তাহা হইলে শক্তির অভাবে দেবতাও মৃতপ্রায় হইয়া যান—বিগ্রহ হইতে দেবসত্তা লুপ্ত হয়।"

ঘাটে দেব দর্শনের পরে, মহারাজের আদেশে পুষ্পাদি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, ভীম গোড়ার দিকে চলিলাম। মহারাজ এগিয়ে চলিলেন এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। মহারাজ শিবের আহ্বান লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। আমরা যখন ভীম গোড়ার নিকটবর্তী হইলাম তিনি বলিলেন, "স্থানটি ঐখানে আছে, খুব নিকটে"। ভীম গোড়ার কুণ্ডের কাছে যাইয়া মহারাজ কোন মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া সিঁড়ি উঠিয়া ভীমের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরে একটি শিবলিঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "জ্যোতির্ময় শিবের আহ্বান এই স্থান হইতে হচ্ছিল। কালের প্রভাবে মূল লিঙ্গটি ধ্বংস হইয়াছে। তাহার প্রকৃত স্থানটিও বর্তমান লিঙ্গের স্থানের অনেকটা নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান লিঙ্গটিতে সত্তা নাই, তবে ঐখানে বিধিমত পূজা, ধ্যান জপাদি করিলে, মূল শিবের পূজা হইবে"। মহারাজ সূক্ষ্ম পূজাদি করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে আমি স্থূল পূজা করিলাম। আমার স্ত্রীও সেখানে বসিয়া জপ করিবার সময় শিবসত্তা কিঞ্চিৎ অনুভব করিলেন।

ইহার পর আমরা সপ্তধারায় সপ্তর্ষি আশ্রমের দেবালয় ও আশ্রমাদি এবং শ্রীরামের মন্দির, ও পরমার্থ আশ্রমাদি দর্শন করিলাম। এখানে মন্দিরগুলির নির্মাণ কার্য সুন্দর এবং বিগ্রহগুলির শিল্প নৈপুণ্য উচ্চ কোটির নয়ন-রঞ্জন-কর। পরিবেশ বেশ শান্ত ও সুন্দর। আশ্রমগুলি দক্ষ ভাবে পরিচালিত মনে হইল। কোন দেবালয়ে বা স্থানে মহারাজ কোন দেবসত্তা অনুভব করেন নাই।

মহারাজ বলিলেন, "হিন্দু ধর্মে মন্দিরে দেব মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয় নর নারী যাহাতে উহার দর্শন ও পূজন করিতে পারে। বিগ্রহ সুন্দর ও নয়নরঞ্জনকর হইলে চিত্তাকর্ষক হয় এবং দর্শনে নয়ন সার্থক করে। তাই মূর্তিগুলিতে সৌন্দর্য ও শিল্প নৈপুণ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শুধু ইহা হইলেই চলিবে না। বিগ্রহে দেব সত্তা ও শক্তি যাহাতে সর্বদা বিদ্যমান ও অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা করা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা সম্ভব হয় যদি সাধকের সাধন শক্তি ও পূজকের পূজা শক্তির প্রয়োগ দ্বারা, বিগ্রহের নিয়মিত ও বিধিবৎ পূজা করা হয়। পূজার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—নর নারী নয়নরঞ্জনকর মূর্তি দর্শনে নয়ন সার্থক করিয়া, চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনাদি যদি করে তাহা হইলে দিব্য সত্তা দ্বারা তাহাদের মন, প্রাণ ও জীবনে সুখ শান্তির সঞ্চার হয়, এবং দেবশক্তিও অব্যাহত থাকে।

ইহার আর একটি দিক্ আছে। পরমাত্মা বা ভগবান তাঁহার নর নারী রূপ পুতুল সৃজন করিয়া, তাহাতে যে

যেমন অধিকারী সেই অনুযায়ী কর্মক্ষম শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। এই পুতুলগুলি কর্ম করিতেছে। হিন্দুরা দেবমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার, দিব্য সঞ্চার ও আত্মিক সঞ্চার করিয়া, নর নারীর সাধন পথের সহায়তা করে। কিন্তু উক্ত স্থানগুলিতে ইহার অভাব অনুভূত হইল। ওখানে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মানুষের আত্মিক উন্নতির কিছু নাই। হায়, হিন্দু ধর্ম আজ তুমি কোথায়! মানুষ আজ নয়ন রঞ্জনে মত্ত হয়েছে আত্মরঞ্জন ভুলেছে।"

ইহার পর আমরা বাসায় ফিরিলাম।

হরিদ্বার সম্বন্ধে মহারাজ বলিলেন ঃ—

"হরিদ্বার তীর্থকে হরিদ্বার বলা হয়, কারণ পরমাত্মা রূপ হরি, এই দ্বার হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় বিষ্ণুর পাদ পদ্ম হইতে গঙ্গা অবতরণ করিতেছেন—কিন্তু এই বিষ্ণু হচ্ছেন পরমাত্মা। পরমাত্মারূপী বিষ্ণুর পাদ পদ্ম হইতে গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডের শংখিনী নাড়ী দিয়া ও অন্যান্য বহু সূক্ষ্ম চক্রগুলির মধ্য দিয়া, সহস্রদল পদ্মের নিম্নস্থ দ্বাদশদল পদ্মে আসিয়া বিষ্ণু মার্গে উপস্থিতা হইয়াছেন। এই স্থান হইতে চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হইতেছে। সৃষ্টি ক্রিয়ায় গঙ্গা অপরিহার্য। তাই আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন বিষ্ণুর পাদপদ্ম। তথা হইতে গঙ্গা শক্তি পীঠ, নাদ পীঠ, বিন্দু পীঠের উপর দিয়া আসিয়া সৃষ্টির প্রকাশভূমি আজ্ঞা চক্রে উপস্থিতা হইয়াছেন। তাই বিষ্ণুর পরে ব্রহ্মার পাদপদ্ম বা (কোন কোন শাস্ত্রে) কমণ্ডলু হইতে গঙ্গা নামিতেছেন বলা হইয়াছে। উক্ত আজ্ঞা চক্র হইতে গঙ্গা ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া স্থুল ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়া করিতেছেন। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে গঙ্গা বলিয়াছিলেন তাঁর মর্ত্যে অবতরণের বেগ একমাত্র জগদ্‌গুরু শিব সহ্য করিতে সক্ষম এবং তাই তিনিই গঙ্গাকে ধারণ করেন। মানব শরীরে ও ব্রহ্মাণ্ডে আজ্ঞা চক্রে তাই শিব মহাকালরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা মহাতীর্থ গোমুখীতে স্থুলভাবে দেখা যায়। মানব শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রা, বজ্রা ও পরমাত্মা নাড়ী নামিয়া, মূলাধারে আসিয়া, এবং ব্রহ্মাণ্ডেও ছয় ধারায় নামিয়া আসিয়া উহার মধ্যে স্থুলরূপে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, এবং আর তিনটি বরুণা, অসি, আদি নামে পরিচিত।

তাই দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানব শরীর-ব্রহ্মাণ্ডেও তাহা আছে।

মানব সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ ও উদান বায়ু সহ আজ্ঞা চক্রে উপস্থিত হইলে, হরিদ্বার তীর্থের ফল পাইবে এবং হরিদ্বার মাহাত্ম্য অনুভব করিবে।

সন্ধ্যার সময় আমরা আবার ব্রহ্মঘাটে যাইয়া গঙ্গার আরাত্রিক দর্শন করিলাম এবং গঙ্গার ধারে বসিয়া জপ ধ্যানাদি করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

১৭ই নভেম্বর ১৯৬৬

পরদিন প্রত্যুষে মহারাজ যখন চা পানে উদ্যত তখন হঠাৎ মহাবীর হনুমান সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিলেন এবং মহারাজের নিকট হইতে পরমাত্মাকে নিবেদিত চা হইতে একটু গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থানে যাইতে ও পূজা দিতে বলিলেন। মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মারুতির মন্দির কোথায়। আমি বলিলাম তাঁহার মূর্তি অনেক স্থানেই পূজিত হয়, কিন্তু কোনটিতেই কোন সত্তা আমি অনুভব করি নাই। মহারাজ হাত দিয়া এক দিক দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দিকে মন্দির আছে, মারুতি দিগ্‌ নির্দেশ করিয়াছিলেন।" আমি বলিলাম, "ঐ দিকে কংখল। সেখানে একটি মূর্তি মহাবীরের জাগ্রত, আমার মনে হয়েছিল। আমরা এখন কংখলেই যাব।

কংখলে যাওয়ার পথে আমরা অবধূত মণ্ডলের মন্দিরে অতীব সুন্দর মূর্তিগুলি দর্শন করিলাম আর দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিলাম। কোন মূর্তিতে সত্তায় সাড়া পাওয়া যায় নাই।

কংখলে সতী কুণ্ড, দক্ষেশ্বর শিব এবং অন্য মূর্তিগুলির দর্শনাদির পরে মহারাজ মহাবীর পবননন্দনের আহ্বানে একদিকে চলিলেন এবং ইচ্ছাপ্রদ হনুমানজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এঁকেই আমার জাগ্রত বলিয়া মনে হইয়াছিল, যখন দুইবার পূর্বে ইঁহার দর্শন করিয়াছিলাম। মহারাজও বলিলেন ইনি জাগ্রত, ইঁহাতে সত্তা আছে এবং ইনিই প্রাতে রিটায়রিং রুমে দর্শন দিয়া পূজা করিতে বলিয়াছিলেন। মূর্তিটি সুন্দর, দুই পার্শ্বে অন্য বিগ্রহ আছেন।

মন্দির বন্ধ করিবার সময় হইয়া গিয়াছিল এবং পূজারী হনুমান মূর্তির দুই পাশের বিগ্রহগুলির সম্মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন। মহারাজ সূক্ষ্ম পূজা করিলেন। স্থূল পূজা করিবার সময় আমার মনে হইল মোদক নিবেদন করা উচিত। তাই লোক পাঠাইলাম বাজার হইতে মোদক আনিবার জন্য। এদিকে পূজারী বিলম্ব বুঝিয়া ব্যস্ত হইয়া দ্বার বন্ধ করিতে যাইয়া, উহা অল্প টানিয়াই হঠাৎ থামিলেন। মহারাজ বলিলেন, "দ্বার বন্ধ হইবে না কারণ পূজারী উহা বন্ধ করিবার জন্য যেমনই টানিয়াছিলেন হনুমানজী প্রহারার্থ নিজের গদাটি তুলিয়াছিলেন।" পূজারী নিশ্চয়ই ইহা জানিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার মনে কিছু হইয়াছিল যাহাতে তিনি থামিয়াছিলেন। মোদক আসিল। আমি উহা নিবেদন করিয়া, ফুল ও প্রসাদ লইয়া উঠিলাম, তখন পূজারী মন্দির বন্ধ করিতে পারিলেন। মহারাজ বলিলেন, "মারুতি পূজা গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন অনেক কাল পরে তাঁহার তৃপ্তিপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করা হইল। যতদিন আমরা উত্তরাখণ্ডে থাকিব হনুমানজী আমাদের সাথে রক্ষক রূপে থাকিবেন।"

মহারাজ বলিলেন, "মহাবীর হনুমান যখন গন্ধমাদন আনিতে যান, তখন এই স্থানে শিব স্থাপন করেন ও তাহার পূজা করেন। বর্তমান শিবমূর্তির দক্ষেশ্বর নামটি তাই সমীচীন নহে। সতীকুণ্ড ও দক্ষস্থান বর্তমান স্থানে ছিল না। উহা এই স্থানের পূর্বদিকে প্রায় পাঁচ শত হস্ত দূরে ছিল, এখন উহা গঙ্গার গর্ভে।" ইহা মহারাজ হনুমানজীর নিকট জানিলেন।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর আমরা প্রাঙ্গণে রৌদ্র সেবন করিতেছিলাম। আমি তুলসীদাসী (হিন্দী) রামায়ণ হইতে কিছু কণ্ঠস্থ চৌপাই ও দোহা মহারাজকে শুনাইয়া বাংলাতে অর্থ বলিতেছিলাম (কারণ মহারাজ বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেন না)। মহারাজ বলিলেন বিরাট দেহ হনুমানজী সূক্ষ্ম কলেবরে ছাদের উপর বসিয়া উহা আনন্দিত মনে শুনিতেছেন। শেষে তিনি বলিলেন যে এতক্ষণ রাম নাম শ্রবণ করিয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন। রামায়ণের কোন কোন ঘটনার বর্ণনা আমি যাহা করিলাম, মহারাজ তাহা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। আমি বলিলাম মহাত্মা তুলসীদাস ঐরূপই লিখিয়াছেন। মহারাজ তখন হনুমানজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন প্রকৃত ঘটনাটি মহারাজের বর্ণনারূপই এবং তুলসীদাস ভক্তির আতিশয্যে ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পরে মহারাজ এক দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, আর একটি শিব ডাকিতেছেন। সেদিকের কোন শিব মন্দির আমার জানা ছিল না। বিল্বকেশ্বর শিব ঐ দিকে হইতে পারেন শুনিয়া, বৈকালে আমরা গাড়ী করিয়া সেই দিকে চলিলাম। পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ হওয়ায় আমরা গাড়ি ছাড়িয়া পদব্রজে চলিলাম মহারাজকে অনুসরণ করিয়া। পথের বামে দেবস্থান দৃষ্ট হইল, মহারাজ কিন্তু সেথায় না দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইলেন ; পরে আর একটি স্থানে কয়েকটি দেবালয় দেখা দিল। মহারাজ তাহাদের মধ্যে একটি দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এখানে অল্প সত্তাযুক্ত একটি শিব লিঙ্গ আছেন, তিনিই ডাকিতেছেন।" মন্দিরে বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন, আমরাও বসিয়া মনে মনে পূজা, জপাদি করিলাম। মহারাজ বলিলেন, "ইনি তমোমিশ্রিত রজোগুণী ভৈরব, মণীপুরী ভৈরব (রুদ্র ভৈরব)।" সেখানে মহারাজ কিছু বলিতে লাগিলেন, যেন কাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তিনি আমাদের বলিলেন, "এই শিবের যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সাধকও সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম মহাদেব প্রসাদ। তিনি বলিতেছেন, আমার স্থাপিত এই শিব লিঙ্গের পূজাদি এখন ঠিকমত হয় না। আপনি এখানে লোকদের বলুন, বিধিমত, নিয়মিত পূজাদি করিতে।" মহারাজ মহাদেব প্রসাদকে জানালেন, তিনি ওখানে অপরিচিত, তাই কাহাকেও কিরূপে বলিবেন, আর যদি তিনি বলেনও, তাহারা অপমানিত মনে করিবে ও কলহ হইবে। তখন রুদ্রভৈরব বলিলেন, "মহাদেব প্রসাদের সূক্ষ্ম শরীরের আয়ু আর মাত্র দ্বাদশ বৎসর, তার পর তাহার জন্ম হইবে। ও বিভূতির দ্বারা অনাচার করিয়া সাধন শক্তি হারাইয়াছে। আমি আর এখানে থাকিব না, তোমার সঙ্গে যাইব।" তখন মহারাজ তাঁর (রুদ্র ভৈরবের) দিব্য সত্তাকে নিজ-দেহে ধারণ করিয়া লইলেন।

মহাদেব প্রসাদ অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন কিন্তু বিধাতার বিধানে হস্তক্ষেপ করা যায় না। তাই তাঁহার কোন সাধন সাহায্য করা সম্ভব হইল না। ঐ দেবালয়ের নিকটেই একটি মণ্ডপ আছে। ইহা সাধক মহাদেব প্রসাদের সাধন স্থান। ইহাতে এক স্থানে দেবনাগরী অক্ষরে মহাদেব প্রসাদ সম্বন্ধে কিছু লেখা যেন দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে।

ফিরিবার পথে আমরা কাল ভৈরব নামের সত্ত্বগুণী ভৈরবের মন্দিরে ভৈরব বিগ্রহ দর্শন করিলাম। ইহাতে আমরা দেব সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার সময় আমরা গঙ্গার ধারে বসিয়া জপ ধ্যানাদি করিলাম। চণ্ডী পাহাড়ের চণ্ডী বিগ্রহে সত্তা আছে। দেবী মহারাজকে তাঁর পূজা করিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। মহারাজ মা-কে জানাইলেন, স্থূল শরীরে তাঁহার স্থানে উঠিয়া পূজা করা সম্ভবপর হইবে না। রুদ্র ভৈরবকে চণ্ডী দেবীর মন্দিরে রাখিবার প্রস্তাবে চণ্ডী দেবী মহারাজকে বলিলেন, "ঐ ভৈরব তোমার কাছেই থাকুক।" তখন মহারাজ দেবীকে বলিলেন, "যদি এই ভৈরবের নিত্য পূজাদি করিতে না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি সাদরে লইব।" ভৈরব ইহাতে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রাতে আমরা রেলযোগে ডেরাডুনে চলিলাম। ভৈরব ও হনুমানজী আমাদের সাথে চলিলেন।

ডেরাডুন, হৃষীকেশাদিতে, মহারাজ সাথে থাকায় যাহা আমরা অনুভব করিলাম, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইবে। দিব্য শরীরীদের দর্শন ও তাঁহাদের সহিত কথা বার্তাদি যেরূপ উপরে লিখিত হইল, উহা আশ্চর্যজনক মনে হয়। মহারাজ বলেন, উহা তেমন অলৌকিক বা দুঃসাধ্য নয়। আমরা সাধন বিজ্ঞান হারাইয়াছি আর প্রকৃতিগত শুদ্ধ মন্ত্রে সাধন করি না, তাই আশানুরূপ পূর্ণ ফল না পাইয়া, ধর্মশাস্ত্রে আস্থা হারাইতেছি। সাধন অল্প অগ্রসর হইলেই দেবতাদের প্রত্যক্ষ দর্শন, ইষ্ট দর্শন আদি হইতে থাকে, উহা প্রায় গোড়ার জিনিস। মহারাজ বলেন, উহা বর্ণপরিচয়ের সমান। ইহার পর অনেকটা সাধন পথ অতিক্রম করিলে সবিকল্প সমাধি লাভ হয়। তার পর অতি কঠোর সাধনে নির্বিকল্প সমাধি। ইহার পর আরও সাধনে পরমহংসত্ব লব্ধ হয়, এবং শেষে তত্ত্বজ্ঞান সাধন দ্বারা সাধক তত্ত্বজ্ঞানী হয়।

দোপাটি

মিনতি নাথ

সাজিয়ে দেব তোমার খোঁপা
আজ দোপাটি ফুলে
রাঙা ঠোঁটে কেমন দেখ
হাসছে দুলে দুলে।

সুরমা পরা নয়ন দুটি
হেসেই যেন কুটোকুটি
লুটোপুটি খায় দোপাটি
আপন মনের ভুলে
কালো নয়ন তুলে।

ফুলের সারি সাজিয়ে দেব
আঁখির প্রদীপ জেলে
কবি যেমন ছন্দ মেলায়
উদাস নয়ন মেলে।

পাতার পাশে যেমন করে
ঐ দোপাটি আছে পড়ে
ওড়না ওড়ে মাথার 'পরে
আবেশ নয়ন ঢুলে
এসো খোঁপা খুলে।

তুম বিনা নহী ম্যাঁয়

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

পলস্তরা ছাড়ানো বাড়ীটার দোতলা ঘরের জানলার পাল্লা দু'টো নড়ে উঠল। খুলল আস্তে আস্তে অসিতা। সামনে-মাঠকোঠার সদর দরজার দু'পাশের রকে বাজিয়েদের আসর বসেছে। ব্যাগ পাইপের বাজনায় গানের সুর তুলছে ওরা। ওপরের জমজমাট ঘরের ভিতর চোখ পড়ায় হতভম্ব হয়ে গেল অসিতা। সমবেত কণ্ঠে গাইছে ঘরের সকলে বাজনার সুরে গলা মিলিয়ে। —তুম বিনা নহী ম্যাঁয় কিসিকো দেখুঁ কভী……। তুমি ছাড়া অন্য কাউকে যেন না দেখি জীবনে…।

* * *

মাস দু'য়েক আগে ব্যাগ পাইপের বাজনায় এই গান গেয়ে উঠেছিল ওই ঘরেরই লোকেরা একদিন। মালকিন জানকী বড় ভালোবাসতো এই গানটি। সর্বক্ষণ কাজকর্মের মধ্যে ও গুনগুন করে গাইতো। অসুস্থ অবস্থায়ও বলতো, মলে পরে—শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় যেন এই গানটিই বাজানো হয়। জানকীর অন্তিম ইচ্ছে পূরণ করেছিল বাঁকেলাল।

কনে বৌ-এর মতো লাল বেনারসী শাড়ী পরানো জানকীর নিষ্প্রাণ দেহটাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলো চারপাই-এর সামনে বাঁকেলাল। ফুলের সাজের চতুর্দোলা বানানো হয়েছে চারপাই-এর ওপর। ফুলশয্যা'র মাঝখানে শুইয়ে দিল জানকীকে। ঝুঁকে পড়ে ওর মুখখানা দেখতে লাগল বারবার। দু'চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল।

বাঁকেলালের অবস্থা দেখে, কান্না রুখতে পারেনি অসিতা। রাতে চোখেপাতায় এক করতে পারেনি একটুও। জানকীর শতদোষ ধুয়ে যাচ্ছিল চোখের জলে। ওর গুণের কথাই মনে পড়ছিল কেবল। ব্যথা দেওয়ার চেয়ে চতুর্গুণ ভালো করে গেছে। সে-সব দাগ মন থেকে মুছে যেতে পারে না কখনো বাঁকেলালের। জানকীকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা বুকে পুষে সারাজীবন কাটাতে হবে ওকে। জীবনের সেই নির্মম অধ্যায়ের সুরু হল সবে। কী সান্ত্বনায় ওর মনকে শান্ত করবে অসিতা।

ভোর না হতেই বাঁকেলালের ডেরায় গিয়ে হাজির হ'ল। সহানুভূতি জানিয়ে বলল, সুহাগন বজায় রেখে এয়োস্ত্রী হয়েই মরেছে জানকী। এটা ওরও কম নসিবের জোর নয়। তোমাকে রেখে যেতে চাইতো। সে আশা মিটেছে। তুমি ভেঙে পড়লে ওর আত্মা কষ্ট পাবে যে।

মনে হ'ল, অসিতার সান্ত্বনা স্পর্শ করল বাঁকেলালকে। ধীরে ধীরে জানকীর শোকে উতালপাতাল ভাবটা কমে এলো ওর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অসিতা।

জানকীর শ্রাদ্ধ-শান্তি না সারা অবধি নিজেকে সংযত করে রেখেছিল তবু বাঁকেলাল। কিন্তু পরে এক মুহূর্তও মন বসাতে পারেনি ঘরে। চারদিক শূন্য-অন্ধকার দেখেছিল। মনপোড়ার জ্বালা জুড়াতে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল শেষে। পথে ঘাটে সাধুসন্ন্যাসী দেখে, পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। প্রিয়জন হারানোর জগৎ থেকে তাকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করেছে। জানিয়েছে, আত্মঘাতী হয়ে পরপারে যেতে চায় সে। জানকীর কাছে যেতে চায়।

সাধুসন্তরা আশ্বাস দিয়েছেন, বেটা! ধৈরিয়সে মত হট! ও আজায়েগী তেরা পাশ জরুর। এ-সব আশ্বাস-বাণীতে আস্থা রেখেছে বাঁকেলাল।' ধৈর্যের পথ থেকে এক চুল সরেনি। ক্ষণ গুণে চলেছে অহর্নিশি।

নিদ্রাহীন চোখে অধীর প্রতীক্ষা। জানকী আসবে নিশ্চয়।

ফিরে এসে তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী শুনিয়েছে বাঁকেলাল অসিতাকে। নিজের দৃঢ়বিশ্বাস, অটুট মনোবল বজায় রাখবার জন্যে কাতরস্বরে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছে অসিতার কাছে। তার ডাক শুনে কখনো চুপ করে থাকতে পারেনি জানকী। এতো ডাকাডাকির পরও সাড়া দেবে না সে? আসবে না দিদিমণি?

মর্মছেঁড়া বেদনা অনুভব করেছে অসিতা। আড়ালে গিয়ে আঁচল চেপেছে চোখে। সামনে এসে বলেছে, আসতেই হ'বে ওকে।

অসিতা তখন ষোলয় পড়েছে সবে। কলেজের ফার্ষ্টইয়ার চলছে। বাঁকেলালদের ভাড়াটে নথনী-ঝি নিয়ে এলো জানকীকে প্রথম অসিতার বাবা ডাঃ দাশের কাছে। বোশেখের প্রথম প্রভাতে শুভ দিনক্ষণ দেখেই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে ওরা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার আশায়।

বাইশ বছরের তন্বী তরুণী সুন্দরী জানকী। বছর চারেক হল বিয়ে হয়েছে। তবু নববধূর সলজ্জ ভাবটুকু চোখমুখ থেকে বিদেয় নেয়নি। জানকীর বৌ হয়ে পাড়ায় আসার দিনটি মনে আছে অসিতার। জানলায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র ধরণের বধূবরণের দৃশ্যগুলি দেখেছিল নিবিষ্ট মনে। সেই জানকী। সন্তান লাভের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না ওর। তাই ডাক্তার সাহেবের কাছে ইলাজ করাতে নিয়ে এসেছে নথনী। চিকিৎসায় যদি কিছু সুরাহা হয়।

জানকীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন ডাঃ দাশ। সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। ডাক্তারদের অভিমত, জানকী সন্তানের জননী হতে পারবে না জীবনে। শুনল জানকী। বন্ধ্যার বোবাকান্না ডুকরে উঠল বুকের তলায়। বাঁকেলালের বিষণ্ণ কাতর মুখ দেখে, নিজের ব্যথা চেপে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে নিয়ে এলো জানকী। বলল, দেওরাণীর লাল— ছোটজার ছেলেই আমাদের ছেলে। বংশের দুলাল।

সন্তান হবে না। বুকভরা আশা ভেঙে খান খান হয়ে গেছল জানকীর। বাঁকেলালেরও। তবু ওদের কৃতজ্ঞতায় চিড় খায়নি একটুও। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে থাকতো ডাঃ দাশের কাছে। বাপ-বেটীর সম্পর্ক গড়ে তুলল ডাঃ দাশের সঙ্গে জানকী। ডাঃ দাশ জানকীর ধর্মবাবা। অসিতা ধর্মা বোন।

বেড়াতে এসে, সময় সময় তামাশা করে অসিতাকে বলতো জানকী, দিদিমণির শাদি হলে, লড়কা হলে, আমায় কিন্তু পালতে দিতে হবে। কাজ ফেলে রেখে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতো নথনী। বলতো, হামরা কাম তু লেবা কাহে রে?

নথনীর কাজে একদম ভাগ বসাতে দেবে না কাউকে প্রাণ থাকতে। দিদিমণিকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। দিদিমণির ছেলে মানুষ করার দাবিও তারই। নথনীকে খেপাবার জন্যে মুখ টিপে হাসতো জানকী। বলতো, বুড়ীর অক্ষয় বট হয়ে বাঁচবার সখ বড্ড বেশী। সে-সাধ মিটবে। চেহারাখানা যমেরও অরুচি।

উপস্থিতেরা হেসে কুটি কুটি হত। সব চেয়ে বেশী হাসির হুল্লোড় উঠতো বাড়িময়, যখন নথনী নথ নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলতো, দিদিমণির শাদিতে হম গানা গাবা। ভিস্তি পাইপোয়া বাজবা। হাততালি দিতে দিতে কাঁপা গলায় গাইতো নথনী, হমারি রাজরাণী বহিনিয়াঁ চলবা সসুরাল, সংগ চলবা নথনী মজুরণী···। আমার রাজরাণী বোন শ্বশুর বাড়ী যাবে যখন, সংগে নথনী ঝি যাবে কেবল।

হাসতে হাসতে অসিতার মা বলতেন, ফুল চন্দন পড়ুক মুখে। সে-দিন এলে মিঠাই শাড়ী আংটি দো'বো।

রাজ্যের লজ্জা ঘিরে ধরতো অসিতাকে। দালান থেকে ঘরের ভিতর পালিয়ে যেতো ও। একটা অজানা আনন্দের ঢেউ খেলে যেতো সর্বাংগে। ভালো লাগতো জানকী-বাঁকেলালের বিয়ের দৃশ্য মনের চোখে নতুন করে দেখতে। দেখতোও।

ব্যাগপাইপের বাজনা বাজছে। লাল পাগড়ি

পোশাক পরেছে বাঁকেলাল। দুলহা—বর সেজেছে। কোমরে তলোয়ার ঝোলানো। ঘোড়া থেকে নামল। পিছনের লোকটি লাল ভেলভেটের ছাতা ধরে রয়েছে মাথায়। পাশে হলুদ রঙের শাড়ী ওড়নায় মোড়া জানকী দুলহন · কনে। জাত বেরাদার মেয়েরা বিবাহ গীতি গাইছে। কোই নহী দেখে কিসিকো দুলহা বিনা···দুলহন বিনা···। বরের কনে ছাড়া, কনের বর ছাড়া যেন অন্য কাউকে না মনে ধরে কথনো···

এই গানের মর্মার্থ অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছে অসিতা। বাঁকেলালের অসুখে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে, সেবা-শুশ্রূষা করেছে জানকী। রাতের ঘুম ত্যাগ করেছে। পাগলের মতো ছুটে এসে বলেছে অসিতাকে দিদিমণি।' ওকে বাঁচাতে বল বাবাকে। আমার জীবন নিয়ে উনি বাঁচান ওকে। ওর আগে যেন মৃত্যু হয় আমার। কান্নায় ভেঙে পড়েছে জানকী।

বাঁকেলালও অস্থির হয়ে পড়তো জানকীর ব্যারামে। মরণ পণ করে সেবা করতো। একজন একজনকে ছাড়া সত্যিই অন্য কাউকে দেখতো না আর। দু'জনের অভিন্ন হৃদয়। একজন মলে আর একজন বাঁচবে না বুঝি। দুটি তরুণ তরুণীর একাত্মতায় আনন্দ পেতো অসিতা। ওদের হৃদয়ে নিজের হৃদয় বিলিয়ে দিয়েছিল অগোচরে। ওদের সুখে দুঃখে সেও সুখ দুঃখ অনুভব করতো মনে প্রাণে।

মাঝে মাঝে নিভৃতে বাঁকেলালের গাওয়া গান গেয়ে শোনাতো অসিতাকে জানকী। তুম বিনা নহী ম্যায় কিসিকো দেখুঁ কভী···। বাঁকেলাল জানকীকে ছাড়া কাউকে দেখতে চায় না আর—গাইতে গাইতে আনন্দে মুখখানা গোলাপ রাঙা হয়ে উঠতো জানকীর। অসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতো। বলতো, তোমার আদমির মুখেও ওই গান শুনবে তুমি।

এই কৌতুকপ্রিয়া হাসি খুশি জানকী একদিন একটি বিষাদময়ী তরুণীকে নিয়ে এলো। ওরই সম বয়সী। মুখখানা বড় করুণ। মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিল জানকী। রবিয়া সই। খেলার সাথী। মা মরে যাবার পর দেশে থাকতে মন টিকছে না ওর এক দণ্ডও। বাপ মেয়েকে নিয়ে তাই চলে এসেছে এখানে। বাঁকেলালের সংগে পরামর্শ করে এখানেই একটা কিছু ব্যবসা করবে। ওদের লোহার কারবারের অংশীদারও হতে পারে। বাঁকেলালদের মতো এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হবারও ইচ্ছে আছে।

রবিয়ার মাতৃবিয়োগের চিঠিতে সখির মনের অবস্থা বুঝেই, চলে আসতে লিখে দিয়েছিল জানকী ওদের।

রবিয়াকে ভালো লাগল অসিতার। ওর সরল মনের কাহিনী শুনে, সহানুভূতিতে ভরে উঠল মন।

বিয়ের আগে দেশে—জয়শালমেরে যখন থাকতো জানকী, তখন দুই সইয়ে মিলে প্রতি বছরই কুমারী ব্রতে 'গনগোর'—গৌরী পূজো করতো। হোলী উৎসবের আগুনের ছাই নিয়ে তৈরী করতো গনগোর মাঈ। হোলীর পর থেকে, ষোল দিন গান গেয়ে, ভোগ দিয়ে গনগোর পূজোয় মেতে থাকতো রবিয়া জানকী। দুই সখীর অন্তরের প্রার্থনা সকর্ণে শুনলেন বুঝি দেবী এক দিন। ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

একই সালে বিয়ে হল দুজনের। জানকী রবিয়ার—দুটি পরিবারের আত্মীয় স্বজনেরা বিয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে কাটিয়েছিল বেশ কিছুদিন। কেউ বুঝতে পারে নি, একটা বিপদের কালো মেঘ জমা হচ্ছে রবিয়ার নসিবে। বুঝতে পারল সকলে বিয়ের মাস দু'য়েক পরে। বিধবা হল রবিয়া।

বিয়ের বছরেই গনগোর পূজো উজমণের—উদ্‌যাপনের নিয়ম। শোকের দুঃসহ বেদনা নিয়েই, ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হ'তে হ'ল জানকীকে। রবিয়াও ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে নাছোড়বান্দা হ'য়ে উঠল। তার করা চলবে না। সে বিধবা। গুরুজন-সংগিনীদের—কারো কোনো আদেশ-উপদেশ কানে নিল না রবিয়া। আদমি মরার দিনে পণ্ডিতদের সান্ত্বনাই শিরোধার্য করে রেখেছে ও শুধু। মরার পর মানুষ এলোক ত্যাগ করে পরলোক থাকে।

যে কোনো একটা লোকে তো আদমি আছেই। অতএব রবিয়ার ব্রত পালনে দোষ নেই। খণ্ডন করতে পারে কার সাধ্যি!

ব্রত পালন করল রবিয়া। বিধিমতো সাসুজীকে

– শাশুড়ীকে, ষোল জন সধবা ব্রাহ্মণীকে টাকা-কাপড়-নথ দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কেউ নিতে চাইল না ওর দান। মুখ ফিরিয়ে স্থানত্যাগ করল সকলে।

নিজের অবুঝপনার জন্যে মনঃকষ্ট পেয়েছে খুব রবিয়া। সইকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। ওকে কেন অপমান করলে, কেন ঘৃণা করলে সকলে? ষোল বছরেও ছ'বছরের বুদ্ধি ছিল রবিয়ার।

কথাগুলো বলার সময় জানকীর দু'চোখের কোণ লাল হ'য়ে উঠেছিল। জলে ডবডবিয়ে উঠেছিল।

পরিচয়ের পর থেকে, প্রায় রোজই রবিয়াকে সংগে নিয়ে আসতো জানকী। জয়শালমেরের দুর্গের ভিতর হাজার বছর আগের পাথরের অক্ষত জৈনমন্দিরের বর্ণনা করে শোনাতো রবিয়া। এখানকার কাক-বেড়াল-কুকুরের মতো রাজস্থানের অনেক জায়গায় ময়ূর-হরিণরা ঘুরে বেড়ায় মানুষের আশেপাশে...। সহরবন্দী অসিতা দেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতো রবিয়ার এক একদিনের এক একরকম কথাবার্তা শুনে। এইভাবে রবিয়ার সংগেও বন্ধুত্বের নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠল অসিতার।

* * *

এক এক ক'রে আটটি বছর পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেক ঝড়ঝাপটার দাপট সহ্য করতে হ'য়েছে অসিতাকে। নির্দয় ঝড়ের চিহ্ন রয়ে গেছে ওর মনে, দেহে—বাড়ীর সর্বত্র ছড়িয়ে।

শেষটার দিকে শ্যামাংগী অসিতার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন বাবা। পাত্রপক্ষদের অনেকেরই চোখে বি-এ পাশ মেয়ের শিক্ষা-গুণের পাল্লা হালকা ঠেকেছিল। রূপের পাল্লাটাই ভারী হ'য়ে উঠেছিল বেশী করে। তাই নাকচ করে দিয়েছে ওকে বহু লোকে। অনেক সাধ্যসাধনায় এক ভদ্রলোক রাজী হলেন তাঁর পুত্রবধূ করতে। কিন্তু সবই ভবিতব্য। রক্তচাপে বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। বিয়ে বন্ধ হ'ল অসিতার। শুভকাজে বাধা পড়ায় নতুন করে আর এগুতে ভয় পেলেন ভদ্রলোক।

অসিতারও মন চাইছিল না আর বিয়ে করতে। বাবার অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করতে দৃঢ়সংকল্প হ'য়ে উঠল। ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে তুলতে হ'বে। বড় করে তুলতে হ'বে। রোজগারের চেষ্টায় বেরুতে হ'বে ওকে। অভাবগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনকে সাহায্যের ঠেলায় সঞ্চয়ের থলি খালি একেবারে বাবার।

দারিদ্র্যের সংগে লড়াই করে করে এক সময় সওদাগরী আপিসে কাজ পেল অসিতা। অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে, ক্রমে বড় সাহেবের পি-এ হ'ল। সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এলো একটু। নিশ্চিন্ত হল কতকটা অসিতা। তখন যে অন্তরালে আর একটি বিপর্যয় ঘনাচ্ছিল, টের পায়নি। টের পেল মায়ের অবস্থা সংগিন হ'য়ে পড়ায়। বাবার মৃত্যুর সময় অসহ্য বুকের যন্ত্রণায় বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছিলেন মা। সেই থেকে ওই ব্যাধির সূত্রপাত।

মাও গেলেন।

মা যাবার পর কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হ'তে হ'ল অসিতাকে। সংসার আর আপিস নিয়ে দোটানায় পড়ল। সংসারের ঝামেলা পোহাতে আর আপিসের কাজ সামলাতে পাড়াপ্রতিবেশী—কারো কোনো খবর রাখবার সময় পেতো না মোটে। বাড়ীতে এলেও ওর দেখা পাওয়া মুস্কিল হত অনেকের।

আগের মতো না হলেও, রবিয়া-জানকীর সংগে দেখা হ'ত ছুটিছাটাতে। ওরা দু'জনে একসংগে দেখা করতে আসতো না। একজন চলে যাবার পর অন্য জনের আগমন হ'ত। পরস্পরে তফাৎ তফাৎ থাকার কারণ—দু'জনে দু'রকম বলেছিল অসিতাকে।

জানকীর ধারণা—মস্ত ভুল করেছে রবিয়াকে আনিয়ে। পর হ'য়ে যাচ্ছে বাঁকেলাল। ব্যবসার অর্ধেক অংশীদার করিয়ে ঘরে খাল কেটে কুমীর পুষেছে। রবিয়াকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত-সমস্ত আদমি। ওর যত্নের কোনো ত্রুটি যেন না হয়। কথায় কথায় ধমক দিচ্ছে। এই ধমক দেওয়া চরমে উঠল সেদিন।

রবিয়ার মাথা ধরেছে। ডাকের পর ডাক চলছে বাঁকেলালের। যেতেই অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠল রাগে। যার টাকায় ডোবা ব্যবসা বাঁচল—তাঁকে এতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য? কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। নিমক হারামি অসহ্য!

বিস্মিত চোখে দেখল জানকী। লোকটা আগের মানুষ নয়। বদলে গেছে একেবারে। পাশের ভাড়াটে বুড়ী রামাইয়ার কথাই সত্যি ব'লে মনে হ'ল। বহিনিয়াঁ ভেজ দে রবিয়াকো দেশ। দেশে পাঠিয়ে দে রবিয়াকে বোন! ওর হাবভাব ভালো নয়। তোর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে আদমিকে। হুঁশিয়ার! বুড়ীর কথা বিশ্বাস কর! অনেক দেখেছে জীবনে।

বাঁকেলালের পা দু'টো ধরে, অঝোর ঝরে কেঁদেছে জানকী। রামাইয়ার কথা বলেছে অকপটে। জানতে চেয়েছে—এ ধারণা কী সত্যি?

জানকীর চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছে বাঁকেলাল! জোরে হেসে উঠেছে। হাসিটা ভালো লাগেনি জানকীর। ভয় ধরেছিল। বুক কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, বিদ্রূপ করছে তাকে বাঁকেলাল। সত্য গোপন করতে চেষ্টা করছে। অভ্যেস-মতো গানের কথা বলেছিল বাঁকেলাল। তুই ছাড়া কারো মুখ দেখবো না—শাদির দিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছি তো জানিস? পাগলী কোথাকার! রামাইয়াটা আস্ত শয়তান।

রামাইয়ার অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়ল। ওকে উৎখাৎ করবার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠল বাঁকেলাল। জাত-বেরাদার ডেকে পঞ্চায়েত বসাল। ওর বিরুদ্ধে আরজি জানাল। ঘরভাঙানি মেয়েলোক রাখতে নারাজ সে। মুখিয়া—প্রধান বাঁকেলালের পক্ষেই রায় দিল।

রামাইয়া চলে যাবার পর আরো অমিলের সৃষ্টি হতে লাগল বাঁকেলাল জানকীর মধ্যে। জানকীর কেবলই মনে হত, পথের কাঁটা নির্মূল করে নিশ্চিন্ত হ'ল বুঝি বাঁকেলাল। বাঁকেলাল দূরে সরে যাচ্ছে—অনেক—অনেক দূরে।

পাগলের মতো আসতো জানকী অসিতার কাছে। মনের বেদনা জানাতো। অনুরোধ করতো, রবিয়াকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মুলুকে যেতে রাজী করাতে। তার সমস্ত জেবর—গয়না বেচে, ওর ব্যবসায় ঢালা টাকা ফেরৎ দেবে জানকী। বাঁকেলালকে ফিরিয়ে দিক রবিয়া।

জানকীর আকুল আবেদনে টলেছিল অসিতার মন। গলেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

চেষ্টা করেছিল অসিতা। রবিয়াকে ডেকে বলছিল সব। গম্ভীর মুখে শুনেছিল রবিয়া। বলেছিল, জানকীর জন্যেই দেশে যাবো না। ওর দেমাক খারাপের জন্যে মন খারাপ খুব। অনেক করেছে ও। বেইমানি করতে পারবো না। ওর মন-মাথা সুস্থ-স্বাভাবিক হক আগে।

নিজের খানদানি বংশের পরিচয় জানিয়েছিল। 'নাতরায়েত' রাজপুত ওরা। ওদের বিধবা বিয়ে চলে আসছে প্রায় সাতশো বছর আগে থেকে, জালোরের মহারাজ কানড়দেবের মেয়ের বিধবা বিয়ের সময় থেকে। দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছে থাকলে—বাঁকেলাল কেন—আর কী কোনো পাত্র নেই? বিষণ্ণের হাসি হেসেছিল রবিয়া।

যাবার সময় ম্লান মুখে বলেছিল, সত্যিই দিদিমণি, জানকী নিষ্কলংক সীতার মতো। রামজী ওর বেমারী সারিয়ে দিকে শীগগির।

অসিতার ধারণা পাল্টে গেছল রবিয়ার কথায়। জানকীর মাথাটা খারাপ হয়েছে ঠিকই। সেদিনকার কথাগুলো কি রকম অসংলগ্ন ঠেকছিল যেন। দিদিমণি।' ডাক্তার বাবার লড়কী তুমি! অনেক দাওয়াই জানা আছে। এমন একটা দাও—খাওয়ালে আদমির মন আমার দিকেই থাকবে। অন্য কারো হবে না কখনো। আদমি বলে কি জানো? রবিয়াকে যত্ন করে নিজে-দের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা কর। অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেললে, ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে তার কুপরামর্শে। রবিয়ার বিয়ে বন্ধ রাখবার জন্যেই নাকি সদাসর্বদা আগলে থাকে আদমি ওকে। নিজের জরুর সংগেও মিশতে দিতে নারাজ।

জানকীর প্রলাপ-উক্তির সংগে নীলিমার কথার অনেকটা মিল খুঁজে পেল অসিতা।

নীলিমা।

একই আপিসের টাইপিস্ট পুলকেশের স্ত্রী নীলিমা। ছুটির দিনের এক দুপুরে অসিতার বাড়ীতে এসে হাজির

হল। গ্রাম্য কুলবধূ—ঘোমটা ঢাকা মুখ। কথা কইতে সর্বশরীর কেঁপে উঠছে। হাত ধরে চেয়ারে বসিয়েছিল অসিতা নীলিমাকে। বক্তব্য শুনেছিল নিবিষ্টমনে। উপায়ে পেট ভরে না। দেশ থেকে এসে বিপদে পড়েছে। ওঁর মুখের আহার কেড়ে নিতে হচ্ছে। দেশে পাঠিয়ে দিতে বললে, অরাজী হন। বলেন, এক-জনের আহার জুটলে, ভাগাভাগি করে চলবে দুজনের। ওর একটা কিছু উন্নতির ব্যবস্থা করে দিতেই হবে মেমসাহেবকে। অসিতার দু'হাত ধরে কেঁদেছিল নীলিমা।

এরকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না মোটে অসিতা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পুলকেশের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টি তুলে ধরল। মাথা নীচু ক'রে জানাল পুলকেশ, অসিতাই একমাত্র বড় সাহেবকে বলে কয়ে স্টেনোর কাজটার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। সে চাকরি পাবার জন্যেই টাইপিষ্ট বলে কাজে লেগেছিল। আসলে সে ষ্টেনো।

গালে হাত দিয়ে, চুপ করে বসেছিল খানিক অসিতা। চাকরির চক্রান্তে পড়ে বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে অসিতাকে এককালে। অভাব-অনটনের সংগে যুঝতেও হ'য়েছে। তাই ভর্ৎসনা করে ফেরাতে পারেনি ওদের। নিশ্চিত কথা দেয়নি বটে, কিন্তু বলেছিল, দেখা যাক—কি করা যেতে পারে।

পুলকেশের জন্যে অনেক করেছিল অসিতা। বড়-সাহেবের ষ্টেনো হয়েছিল পুলকেশ পরে। অসিতার এই উপকারের মর্যাদা দিতে শশব্যস্ত হ'য়ে থাকতো ও।

বড় সাহেবের পি-এ অসিতা আর ষ্টেনো পুলকেশ বছরের পর বছর কাজ করেছে এক সংগে। একজনের কাজের দেরীতে আর একজন অপেক্ষা করেছে। এক সংগে বেরিয়ে পড়েছে দু'জনে আপিস থেকে অনেকদিন। অনেকদিন অসিতা যেমন বাসার গলির মুখে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়েছে পুলকেশকে, তেমনি পুলকেশও অসিতাকে বাড়ী পৌছে দিয়েছে সযত্নে।

রাত করে বাড়ী ফেরা আর অসিতাকে বারবার পৌছে দেওয়া-দিয়ি নিয়েই, আস্তে আস্তে নীলিমার সংগে মন কষাকষি সুরু হল পুলকেশের। মন কষা-কসির ভিতের ওপর বিদ্বেষও বাসা বাঁধতে লাগল। ঠাণ্ডা মানুষ নীলিমা খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠল। স্পষ্ট বলে দিল, অসিতার সংগে মেলামেশা চলবে না। লোকের মুখে মুখে অনেক কথা কানে এসেছে। অসিতার সংগে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে নিজেরই সর্বনাশ করল! ঘরের লোককে হারাতে বসল।

অহর্নিশি এসব শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পুলকেশ। সমস্ত কথাই বলেছে অসিতাকে। খেদ করে জানিয়েছে, বাবার জন্যেই আজ বিষের জ্বালায় জ্বলতে হ'চ্ছে। গেঁয়ো মেয়ে বিয়ে করে এই হাল হ'ল। বড় নোংরা মন। শহুরে কর্মীমেয়ে হ'লে, ভবিষ্যতে দুর্গতি আসার আশংকা থাকতো না সংসারে। আর সন্দেহ-বাতিকের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পেতো সে।

পুলকেশের মতামতের গুরুত্ব দেয়নি ততটা অসিতা প্রথমে। কিন্তু একদিন দিতে হ'ল। নীলিমা এসে হাজির হ'ল অসিতাদের বাড়ী। প্রথম দেখার মতো হাত ধরে কান্না সুরু করে দিল।

ভেজাগলায় বলল, একমাত্র আপনিই ওঁকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠেছিল অসিতার। পাগলামো সহ্য করারও একটা সীমা আছে! ঘাড় ধরে বার করে দিতে গিয়েও থমকে গেছল। অভ্যস্ত ভদ্রতা বাধা দিয়েছিল। নিজেকে সংযত করবার জন্যে তরতর করে ওপরে উঠে গেছল। মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল, কতখানি জ্বালা ভোগ করছে পুলকেশ এই অজ্ঞ স্ত্রীকে নিয়ে।

জানকীকে নিয়ে রবিয়ার আর নীলিমাকে নিয়ে নিজের দশার এতটুকু পার্থক্য দেখতে পেল না অসিতা সেদিন। রবিয়ার সংগে একাত্মতা অনুভূত হয়েছিল তার। বিতৃষ্ণা এসেছিল জানকী-নীলিমার ওপর।

এরপর একটা বছর ঘুরে গেছে। দেশে পড়ে আছে নীলিমা। ওকে নিয়ে ঘর চলে না। স্বামী-স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ একেবারে। চিঠিপত্র দেওয়া-দিয়িও। ডাইভোর্স-মামলা রুজু করবার চেষ্টায় ব্যস্ত পুলকেশ।

আইনগত নানান অজুহাত খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে নীলিমার বিরুদ্ধে।

ডাইভোর্সের পরে—আরো পরে—স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হবে পুলকেশ-অসিতা। ওদের দু'টি মন খুব কাছাকাছি এসে গেছে কিছুদিন ধরে। সহানুভূতি-স্নেহ-প্রীতির সেতুর ওপর দিয়ে পরিণয়ের পথে এগিয়ে চলছে ওরা। শুভলগ্ন আগমনের প্রতীক্ষা করছে পুলকেশ। প্রতীক্ষা করছে অসিতা।

কিছুক্ষণ আগে এসেছিল পুলকেশ। মধুযামিনী ভ্রমণের নির্দিষ্ট দেশের ছবি দেখিয়ে গেছে এক এক করে। দর্শনীয় স্থানেরও মহিমা কীর্তন করে গেছে পঞ্চমুখে। পুলকেশের কীর্তনের রেশ ধরে, চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে সেই স্বপ্নই দেখছে অসিতা। কল্পনায় পুলকেশকে নিয়ে দেশে দেশে বেড়াচ্ছে। ব্যাগ পাইপের সুর ভেসে আসছে কানে। বিয়ের গানও শুনতে পাচ্ছে যেন। বড় ভালো লাগছে। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে অসিতা।

মনে পড়ছে নথনীর কথা। তার বিয়েতে নথনীই গাইবে বলেছিল। নথনী তো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে অনেকদিন! কে গাইছে? কারা গাইছে?

চমক ভাঙল অসিতার। সুখের নেশা কেটে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অসিতা। কান খাড়া করে শুনছে। বাজনা-গানের আওয়াজটা যেন জানলার দিক থেকেই আসছে। বাঁকেলালদের মাঠকোঠাটার দিক থেকে। প্রমাদ গণল অসিতা। জানকী ভালোবাসতো বলে ওর শবযাত্রায় গাওয়া হয়েছিল শাদির গান। বাঁকেলালও ও গান ভালোবাসে খুব। তবে কী—। বুকটা ধড়াস করে উঠল। মাসাবধি বাঁকেলালের সংগে দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। অসিতা কোনো খবর রাখতে পারেনি ওদের। ওদেরও কেউ আসেনিকো এবাড়ীতে।

জানলার ধারে এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে অসিতা। সন্তর্পণে বন্ধ জানলার পাল্লা দু'টো ঠেলল বাইরের দিকে।

* * *

জানলার ফ্রেমে আঁটা আবক্ষ-ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে অসিতা। নিজের চোখকে-কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি প্রথমে। একি দেখছে! একি শুনছে! জানকীর ঘরে—জানকীরই খাটে বসে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠছে বাঁকেলাল-রবিয়া। বিয়ের পোশাক পরণে ওদের দু'জনের! ওরা হাততালি দিয়ে দিয়ে জাত-বেরাদার মেয়েদের সংগে শাদির খুশীয়ালী গীত গাইছে। জানকীর প্রিয় গান। বাঁকেলালের প্রতিশ্রুত গীতি। তুম বিনা নহী ম্যাঁয় কিসিকো দেখুঁ কভী...। তুমি ছাড়া অন্য কাউকে যেন না দেখি জীবনে...।

জানকী ঠিকই বলেছিল, ম'লেই বিয়ে করবে দু'জনে। আমার নামে মিথ্যে সব বলে তোমার কাছে দিদিমণি! বাঁকেলালের জন্যে যে আত্মঘাতী হ'তে চলেছিল জানকী—বুঝতে পারেনি অসিতা। আদমিকে ফেরাবার জন্যে দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছে, দিনের পর দিন উপোস ক'রে কাটিয়েছে! অসম্ভব নির্যাতন করেছে নিজের ওপর। রক্তশূন্যতা রোগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

জানকীর অনুরোধ রাখলে, রবিয়াকে দেশে পাঠাতে পারলে, হয়তো বাঁচতো জানকী। চোখের কোণ টনটন করে উঠল অসিতার।

রবিয়ার নতুন রূপ দেখছে অসিতা। বিচিত্ররূপিণী রবিয়া। জানকীর কথা শুনতে পাচ্ছে যেন।...বাঁকে-লালকে ফিরিয়ে দিক রবিয়া। শিউরে উঠল ভয়ে অসিতা। রবিয়ার মধ্যে যেন নিজেরই রূপ দেখল—নিজেকে আবিষ্কার করল। নীলিমার কথা মনে পড়ছে। 'আপনিই একমাত্র ফিরিয়ে দিতে পারেন ওকে।'

অসিতার চোখে নীলিমা-জানকী এক হয়ে যাচ্ছে। বাঁকেলালের ভিতর পুলকেশকেও দেখছে ও। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে অসিতার বুকের মাঝখানটায়। না:, রবিয়া হ'তে কিছুতেই পারবে না অসিতা।

নিজের দু'কানে হাত চেপে অসিতা প্রায় ছুটে পালাল সেখান থেকে!

মহাপুরুষ শ্রীশ্রী১৮০ স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ

মা অরুন্ধতী

শ্রীগীতায় ৮ম অধ্যায় ভগবান পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়। সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ বাণীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুকালীন চিন্তাই জীব সকলের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ ধারণের কারণ।

পুরাণে আছে পুণ্যশ্লোক পৃথিবীপতি ভরত, যাঁহার অমর নাম হইতে আমাদের এই পবিত্রভূমি ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া জীবন সায়াহ্নে পুলহাশ্রম হরিক্ষেত্রে যাইয়া যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই সময় মহানদী গণ্ডকী তীরে জপকালীন তিনি দেখিতে পাইলেন সিংহ গর্জ্জন ভীতা আসন্নপ্রসবা একটী হরিণী ঐ নদী মধ্যে একটী শাবক প্রসব করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে করিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইল এবং ঐ মৃগ শিশু নদীর স্রোতে ভাসমান হইল। করুণার্দ্র হৃদয় ভরত তখন ঐ মৃগ শাবককে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া নিজাশ্রমে আনয়ন করতঃ অপত্যবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ মৃগ শিশুর চিন্তা তাঁহার কোমল হৃদয়ে এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিল যে, মৃত্যু সময়ে ঐ মৃগের চিন্তা তিনি পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেন এবং তাহার ফলে মৃগ শরীরে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন অবগত হইলেন যে, তিনি মহর্ষি শমীকের শৃঙ্গী নামক এক বালক সন্তান কর্তৃক অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু মুখে পতিত হইবেন, তখন তিনি সমাগত মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মৃত্যু দশায় পতিত মুমুক্ষু মনুষ্যের পক্ষে করণীয় বিশুদ্ধ কর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন মুনি বলিয়াছিলেন যাগ, কেহ যজ্ঞ, কেহ দান, কেহ তপস্যা কেহ যোগ। এই সময়ে ব্যাসনন্দন মহাযোগী শুকদেব যদৃচ্ছা ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন মৃত্যু—কালীন সর্ব্ব সময়ে মুক্তিপ্রদ শ্রীভগবানের নামানুকীর্তন শ্রবণ মননাদি মুমুক্ষু মনুষ্যের একমাত্র সিদ্ধিপ্রদ। যোগী বা ভোগী, কামী বা বিরাগী জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা মৃত্যু মুহূর্ত্তে শ্রীভগবানের নামস্মরণপথের পথিক হয় না। এজন্য পরমহংসদেব বল্‌তেন—গৃহস্থের ঘরে শালিক "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলে কিন্তু শমনরূপী বিড়াল যখন তাহাকে ধরে তখন তার মুখে বেরোয় শুধু ক্যাঁক্ ক্যাঁক্!

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি

মরণ মুহূর্ত্তে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ মনন উচ্চারণ একমাত্র সাধনপন্থী মহাপুরুষগণের পক্ষে সম্ভব অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকল মহাপুরুষ-গণের লক্ষণ প্রধানতঃ সত্যনিষ্ঠা। এই সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, এই সত্য সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ, পূর্ণ হইতেও পূর্ণ অখণ্ড অব্যয় চিরন্তন। জাগতিক আর সকল সত্য

আপেক্ষিক সত্য বা সত্যাভাস বা ব্যবহারিক সত্য। প্রথমোক্ত পারমার্থিক সত্যকে যিনি কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন, এই শাশ্বত সত্যকে যিনি স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহাতে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা স্থাপনে সক্ষম, তিনি মহাত্মা, তিনি মহাপুরুষ। তাঁহাদের জীবনে আরও কয়েকটী লক্ষণ স্বতঃই—প্রকাশিত হয় তাহা (১) ত্যাগ নিষ্ঠা (২) মন ও মুখের ঐক্য ভাব (৩) সর্ব্বজীবে প্রেম (৪) পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি (৫) পারমার্থিক বিষয়ে আসক্তি (৬) সর্ব্বাবস্থায় আনন্দ।

এই সকল মহাপুরুষগণের দ্বারৈষণা—বিত্তৈষণা, লোকৈষণা থাকে না, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা—শূকরী-বিষ্ঠাবৎ প্রতীয়মান হয়, মানাপমান তুল্য মূল্য মনে হয়, শত্রু মিত্রবোধের লোপ পায়, তাঁহাদের ভিতর বাহির এক হইয়া তাঁহাদের ব্যবহার সহজ সরল ও অমায়িক হইয়া পড়ে। "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ" এই বোধের উদয় হয়, পার্থিব সমস্ত বস্তু তাঁহাদের অনুভূতিতে চৈতন্যবৎ প্রকাশিত হয়, পরম ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপতা আস্বাদনে অভ্যস্ত হইয়া এক অতীন্দ্রিয় চিরানন্দময় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং মৃত্যু মুহূর্ত্তে আনন্দ স্রোতে ভাসমান হইয়া এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন করিয়া সাধুগণকে পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকি। এই পূত সময়ে তাঁহার লীলা সহায়ক বহু মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং জীবন্মুক্ত অবস্থায় লোক শিক্ষার্থে এই জগতে নর লীলা করিয়া যান। ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের লীলা পরিকর। পরম হংসের হংসদেবের কথায় ইঁহারা নিত্য সিদ্ধের থাক।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে আরো অনেক মহাপুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারা যোগভ্রষ্টের থাক। তাঁহারা তাঁহাদের পার্থিব জীবনে সম্পূর্ণ ভাবে যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেহান্তে বহুবর্ষ পুণ্যলোক সকল ভোগ করিয়া "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্ম পরিগ্রহ করেন। এরূপ জন্মও জগতে দুর্লভ। ইহারাও ভগবানের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মানন্দ পরায়ণ হন, এবং পরমার্থ বিষয়ে যত্নশীল হইয়া মরণ মুহূর্ত্তে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে পরমা গতি লাভ করেন।

সকলেই জ্ঞাত আছেন মহাত্মা গান্ধী আততায়ী হস্তে গুলিবিদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের পরম পবিত্র নাম 'রাম' নাম স্মরণ ও উচ্চারণে এই নরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পরমা গতি লাভের দ্যোতক।

আমি এখন একজন পরম ভাগবত মহাপুরুষের প্রসঙ্গ বলিব যাঁহার এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগের সময় তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে আনন্দময় স্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল শ্রীভগবানের নাম "ওঁ আনন্দম্ ওঁ" এই মহাত্মার নাম শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ।

আমাদের শাস্ত্রে আছে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং সংপ্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি চ। তিনি রসঃ বৈ সঃ, তিনি রস স্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দ স্বরূপ ভগবানের ইচ্ছায় জাগতিক পদার্থ সমূহের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় সাধিত হইতেছে। যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা জাগতিক নিত্য নৈমিত্তিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ভগবানের আনন্দ স্বরূপতা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যাহারা পার্থিব ক্ষণ বিধ্বংসী বিষয়কে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকে তাহাদের পক্ষে দুঃখের নির্ম্মম আঘাত অবশ্য ভোগ্য, তাহাদের পক্ষে অক্ষয় অব্যয় অখণ্ড আনন্দের অনুভূতি অসম্ভব।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আমরা যে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করি তাহা ক্ষণিক ও দুঃখগর্ভ। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে অধিকতম ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগে অধিকতম সুখ পাইতাম কিন্তু আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ রসনেন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদক অধিকতম মিষ্ট দ্রব্য আস্বাদনে অধিকতম দুঃখ প্রাপ্ত হই এবং পরিশেষে যম যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে মৃত্যু মুখে পতিত হই। এইরূপ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। এই জন্য বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের সুখ সসীম ক্ষণিক ও দুঃখগর্ভ, ঐ সুখ আনন্দ পদবাচ্য নহে। সুতরাং আমরা যদি মনকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পার্থিব বিষয় হইতে উদ্ধার সাধন করিয়া অতীন্দ্রিয় পরম পদার্থ সৎ চিৎ আনন্দ বস্তুর স্মরণ মনন নিদি-

ধ্যাসনে অভ্যস্ত হই তাহা হইলে আমরা প্রকৃত অসীম আনন্দরসের সন্ধান পাইতে পারি। অন্যথায় আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা—মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া জল প্রাপ্তির আশায় মায়া মরীচিকার উদ্দেশ্যে ধাবমানের মত বৃথা।

স্বামীজী মহারাজের সাংসারিক জীবনের নাম ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার—ইন্দ্রিয়াতন শরীরে তাঁহার সাংসারিক আশ্রমের কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্যেও অতীন্দ্রিয় পরম ব্রহ্মের আনন্দ রস আস্বাদানে সর্ব্বদা অভ্যস্ত ছিলেন এজন্য তাঁহার নশ্বর ভোগায়তন দেহ পরিত্যাগের কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ দ্বিবৎসর কাল সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুমুক্ষু মহারাজ পরীক্ষিতের মত জাগতিক সকল বিষয় হইতে মনকে সম্পূর্ণভাবে আহৃত করিয়া সদাসর্ব্বদা আনন্দ স্বরূপ অক্ষয় অব্যয় পরমব্রহ্মের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার এই নরদেহ পরিত্যাগের সময় তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আনন্দরস উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল ভগবানের আনন্দময় নাম "আনন্দম্ ওঁ"। স্বামিজী মহারাজ তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমে থাকা কালীন আনন্দময় পর-ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপতা উপলব্ধির জন্য যে কায়মনোবাক্যে সাধনা করিতেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহাপ্রয়াণের মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার চতুঃষষ্টিতম জন্ম দিবসে ১৩৫১ সালের আষাঢ়ের শুক্লা চতুর্থী দিবসে আমাদপুরে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের সম্মুখে তাঁহার জীবনের শেষ ভাষণে আমরা জানিতে পারি। সেইদিন তিনি বলিয়াছিলেন :—

"গর্ভবাস দুঃখের আমি বলি না—। আমি বলি এই আনন্দময়ের সৃষ্টিতে কোথাও দুঃখ নাই। যে অজ্ঞানাভিভূত সেই আনন্দকে দুঃখ বলিয়া মনে করে। গর্ভবাস সুখের, কেন তথায় আমি কাঁদিব? যতদিন না আমার বিশ্বানন্দ পূর্ণ না হইয়াছিল ততদিন আমি মাতৃগর্ভ পরিত্যাগ করি নাই। বাহিরে আসিয়াই পাইয়াছি মাতার স্নেহানন্দ, পৌরজনের উল্লাসানন্দ, বন্ধুজনের সৌহৃদানন্দ, স্ত্রী-পুত্রগণের নির্ভরানন্দ, সমাজের সাধুবাদানন্দ, শ্রীগুরুর কৃপানুবাদানন্দ, সাধনের চিদানন্দ সমাধি ভূমিকায় সদানন্দ।"

স্বামীজী মহারাজ তাঁহার সন্ন্যাস জীবনে শুধু দেখিতেন চারিদিকে সর্ব্বত্র আনন্দের প্রস্রবণ, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে, অনিলে, অনলে, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, পর্বত গহ্বরে শুধু আনন্দের উৎসব—চৈতন্য স্বরূপ আনন্দময়ের সত্ত্বা তাহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র। তাঁহার সচিদানন্দ নাম স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সার্থক করিয়াছিলেন। তিনি কোথাও দুঃখ দেখিতে পাইতেন না। মায়াচ্ছন্ন অজ্ঞানী নরনারী জীবজগৎ যাহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করে তাহা বিষয়কামীগণের প্রতি বিষয়ের বিক্ষোভ মাত্র। বিষয় হইতে মন বিযুক্ত হইলেই দুঃখের সমাপ্তি।

বাংলা ১৩৫১ সালের তাহার জন্মতিথিতে শেষ ভাষণের পর তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার মহাপ্রয়াণ আসন্ন। তজ্জন্য তিনি তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বে একমাস সময় কলিকাতায় তাঁহার বিভিন্ন ভক্ত শিষ্যগণের আলয়ে অবস্থান করিয়া দিবারাত্র আনন্দময় ভগবানের নাম কীর্ত্তনের আনন্দরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতেন। প্রতিদিন তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া সকলে সমবেত ভাবে উদাত্তকণ্ঠে বেদ পাঠ করিতে করিতে আনন্দরসে মগ্ন হইতেন এবং সেই সঙ্গে সেই স্থানের আকাশ বাতাস আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিত।

তাঁহার তিরোধান দিবসে স্বামিজী মহারাজ কলিকাতায় ১।এ মহেন্দ্র রোড, বেলতলা, ভবানীপুরে তাঁহার ভক্ত ধর্মপ্রাণ রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে। সেইদিন ছিল ১৩৫১ সালের শ্রাবণের ললিতা সপ্তমী। ঐ দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যখন উষারাজ্ঞী কেবলমাত্র তাহার আনন্দময় আলোক পৃথিবীর বুকে বিতরণের ব্যবস্থায় ব্যস্ত সেই পরমানন্দময় শুভ মুহূর্ত্তে বেদপাঠ মুখর আনন্দপূর্ণ স্বর লহরীর মধ্যে স্বামিজীর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল 'ওঁ আনন্দম্ আনন্দম্' আর সেই সঙ্গে তাঁহার আনন্দময় জীবাত্মা আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গেল।

পরমহংস দেব বলিতেন কিছু খাদ না দিলে স্বর্ণালঙ্কার গঠন করা যায় না। এইজন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ

সম্পন্ন ব্যক্তির কোন কার্য্য লোক শিক্ষার উপযোগী হয় না, এই কারণে ভগবান যখন ধরা ধামে অবতীর্ণ হন তখন যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই নরলীলা করেন এবং তদ্রূপ মহাপুরুষগণও কিছু মায়াচ্ছন্ন হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লোকশিক্ষার উপযোগিতা লাভ করেন।

স্বামীজী মহারাজ (সাংসারিক নাম দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ইংরাজী ১৮৮১ সাল বঙ্গীয় ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসের শুক্লা চতুর্থী দিবসে কলিকাতা সহরে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতামহ পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় নৈকস্য কুলীন ছিলেন, এবং স্বকীয় কৌলীন্য মর্যাদায় অষ্টাদশটি কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় আমাদ-পুরের শ্যামাসুন্দরী অন্যতমা। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী শ্যামাসুন্দরী রত্নগর্ভা ছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র গোপালচন্দ্র ও মহেন্দ্রনাথ দুইটী রত্ন ছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র ওকালতী ব্যবসা গ্রহণ করেন, কনিষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ (দেবেন্দ্রনাথের পিতৃদেব) তাঁহার পাঠ্যজীবনে কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারে অরবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন এবং পাঠোত্তর জীবনে সরকারী বিচার বিভাগে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কর্ম দক্ষতায় বিচার বিভাগের উচ্চপদ লাভে সমর্থ হন। তাঁহারা দুই ভ্রাতাই প্রভূত ধন অর্জন করিয়া তাহা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করেন। দুই ভ্রাতার গৃহ ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কালক্রমে গোপালচন্দ্রের ৯ পুত্র ও ৪ কন্যা জন্মে তাহার মধ্যে ডাঃ রাধাকুমুদ ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দুইজন বিদ্যাধুরন্ধর ভারত যশস্বী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। মহেন্দ্রনাথের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা হয়। সকল পুত্রগণই—উচ্চ শিক্ষিত এবং বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান। একই পরিবারে লক্ষ্মী সরস্বতী মা ষষ্ঠীদেবীর এরূপ সমবেত কৃপা প্রায়ই দেখা যায় না।

বালক কাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে মহা-পুরুষগণের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি সামান্য ভাবে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করে এবং তাহা উঁহার পরিণত জীবনে ফলে ফুলে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। শিশু দেবেন্দ্র-নাথের স্বভাব এতই সুমিষ্ট ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে তিনি তাঁহার সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন—সকলেই মনে করিত তিনিই দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়তম। দেবেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস জীবনেও তাহার শিষ্য ভক্তগণের মধ্যেও ঠিক এই ভাব পরিলক্ষিত হইত। এখনও সকলে ঐ ভাবে ভাবিত।

বালক দেবেন্দ্রনাথকে যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। বালক যে শুধু তাহার পিতামাতার ও জ্যেষ্ঠতাতের নয়নানন্দ ছিলেন তাহা নহে তিনি ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশিগণেরও নয়নের মণি। চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত তাহাকে স্নেহ করিত। বাড়ীতে একটী গাভী ছিল বালক দেবেন্দ্র সেই গাভীর বাঁটে মুখ সংলগ্ন করিয়া দুগ্ধ পান করিতে ভাল বাসিতেন। গাভীটী স্নেহ-পরায়ণা—মাতার মত বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হইয়া তাহার এই দুগ্ধ পানে আনন্দ বোধ করিত। একদিনও কোন প্রকার বাধা দানের প্রয়াস পর্যন্ত করিত না।

গৃহে আনন্দের মেলা। অর্থের কোন অপ্রতুলতা নাই। বালক-বালিকাগণের কলকল শব্দে গৃহ সর্বদা মুখর। তাহার মধ্যেও বালক দেবেন্দ্রনাথের মন কোন এক অতীন্দ্রিয় বস্তুর চিন্তায় সমাহিত হইয়া পড়িত। বালকের এরূপ অপ্রাকৃত ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা জ্যেষ্ঠ-তাত প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেন। বালকের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত দুই জনেই অত্যন্ত সরল প্রকৃতি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ এবং স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বালকের ঐরূপ স্বভাব দেখিয়া দুইজন তাহাদের প্রাণ ঢালা ভালবাসা তাঁহার উপর বর্ষণ করিতেন এবং সকল প্রকার আবদার পূর্ণ করিতেন।

এরূপ অবস্থায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হোষ্টেলে থাকিয়া ঐ কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার তিনি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডাক্তারী পাঠে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকায় মাতা ঐ পাঠ ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে শুধু

অকর্ত্তব্য মনে করিতেন না—অহিতকর এবং গ্লানিকর পাপ কাজ মনে করিতেন। এজন্য পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে আইনজ্ঞ হইতে উপদেশ দেন কিন্তু বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে তখনও অদম্য কৌতূহল এই শরীরকে জানিবার। আমরা যে দেহকে এত ভাল বাসি যাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় আমরা ধর্মাধর্ম বিস্মরণ হই বিবেক বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দান করি হিতাহিত কর্ত্তব্য স্থির করিতে অশক্ত হইয়া পড়ি, তাহার স্বরূপ কি তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন।

বিশেষভাবে তাঁহার মনে হইল সেবাধর্মী চিকিৎসা ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মী ও পরোপকারধর্ম্মী ব্যবসায় কলিযুগ নাই। অবশেষে বালকের আগ্রহাতিশয্যে তাহার পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ তাত তাঁহাকে ডাক্তারী পাঠে সম্মতি দান করেন। ডাক্তারী পাঠের সময় প্রতিদিন দেহের পরিণাম অকাল মরণ রোগ শোকের মর্ম্মভেদী দুঃখ দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে একদিকে যেমন এই ইন্দ্রিয়াতন দেহের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপর বিরাগ বদ্ধিতমূল হইতে লাগিল তদ্রূপ অপর দিকে—তাহার মনে অতীন্দ্রিয় অক্ষয় অব্যয় পরমার্থ বস্তুর চিন্তা দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। এই সময় সাধুসঙ্গ লিপ্সা তাঁহার মনে স্বভাবতঃ ভাবেই উদিত হইত। ক্ষেত্রজ্ঞ গুরু শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের প্রথম দর্শন এবং এর পর পরম প্রীতি তিনি এই সময়ে লাভ করেন। স্বামিজী তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "ফিন্ আইও" আবার এসো। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সেই সুমধুর বাণী দেবেন্দ্রনাথের অশান্ত প্রাণে আশার শান্তিবরি বর্ষণ করিত।

এই সময়ে তাঁহার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী দুইটী শিশু কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার মাতা কন্যাশোকে বিশেষ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। শোকের প্রথম আঘাত যখন মায়াচ্ছন্ন জীবের হৃদয়গ্রন্থীকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা করে তখন কোন সান্ত্বনা বাক্য শোকের প্রশমন করে না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত শোককে আরো উদ্বেল করে। মাতৃভক্ত দেবেন্দ্রনাথ শোকাচ্ছন্ন মাতার—শোকাপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে—তাঁহার শোক সন্তপ্ত মাতা তাঁহার মানসিক শান্তির আশায় পুত্রবধূ মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্র নাথের বিবাহে ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মানব জীবনে বিবাহ একটি প্রধানতম সংস্কার। ইহা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে ধর্মার্থে প্রযোজন ভারতীয় ঋষিগণের এই শাস্ত্রীয় বাক্য পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন তাঁহাকে বুঝাইতে সমর্থ হইলে তিনি বর্দ্ধমান জিলার শাঁকনাড়া নিবাসী স্বধর্মনিষ্ঠ ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী মায়াময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। তখন তিনি একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক মাত্র। এই বয়স হইতেই তিনি তাঁহার পত্নীকে মনে করিতেন স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মচারিণী।

অল্পদিন মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাব জাত মিষ্টস্বভাব এবং সহজ সরল ব্যবহারে পুত্রহীনা তাঁহার শ্বশ্রূমাতার নয়নানন্দ পুত্রস্বরূপ হইয়া উঠেন। বালিকা পত্নীর সুমধুর ভালবাসা এবং মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূমাতার অন্তরঙ্গ বাৎসল্য রসে এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ তাঁহার কাছে মধুরতম মনে হইতে না হইতেই—তাঁহার শ্বশ্রূমাতা এই সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। বালিকা পত্নীর পক্ষে মাতৃশোক কিরূপ মর্ম্ম প্রদাহী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কষ্ট হইল না। এই জনম মরণ শীল জগতে শোক দুঃখের নির্মম আঘাত সহ্য করিতে পরমার্থ চিন্তাই একমাত্র অমোঘ এই সত্য তাঁহার কাছে নূতন ভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মা মহামায়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে লইয়া একটু ক্রীড়া করিয়া জগতের চিরন্তন রূপকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রীড়া সাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন আবার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধাঙ্গিনী নবীনা পত্নীর দুঃখের সমভাগ নিজমনে গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিত্যশাশ্বত অক্ষয় অব্যয় পরমার্থ বস্তুর দিকে ধীরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মায়া দেবীও স্বামীর মনোবৃত্যানুযায়িনী হইয়া সংসারে আদর্শরূপে জীবন গঠন করিতে লাগিলেন।

এরূপ অশান্ত মন লইয়া ১৯০৪ সালে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাহার পাঠোত্তর জীবনে শ্ববৃত্তি (চাকরী) গ্রহণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু সাংসারিক জীবনে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার সহজ সরল রাজপথ সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র তখন প্রারব্ধ খণ্ডন জন্য পিতার আদেশে সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করেন।

তিনি সরকারী চাকুরীর অমোঘ ঘূর্ণনে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে স্থানে এবং পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া সেই সকল স্থানের রোগগ্রস্ত নরনারীর রোগ প্রশমনে বহু সাধুবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই চাকুরী জীবনে পিতৃশোকের অমোঘশেল তাঁহাকে বিদ্ধ করে—তিনি তখন শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরিমহারাজের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মাতা সংসারীর পক্ষে সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ অকল্যাণকর এরূপ মত পোষণ করায় এই দীক্ষাগ্রহণের বিপক্ষ হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের বংশগত গুরুর নিকট দীক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম বিষয়ে 'অন্ধেন নীয়মানঃ অন্ধবৎ' পরিভ্রমণে দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বহু বাধা অতিক্রম করিয়া ১৯০৯ সালের শ্রাবণ পূর্ণিমায় হরিদ্বার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভীপ্সিত শ্রীগুরু শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষাগ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক বাসনা ছিল যে দীক্ষাগ্রহণের পরে তিনি আর সংসার ধর্ম করিবেন না, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহার গুরুদেব তাহাকে বুঝাইলেন তাহার মাতা, পত্নী এবং নাবালক পুত্র কন্যা বর্তমান। এ সকলের প্রতি কর্তব্য ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ অকর্তব্য। স্বামীর কর্ত্তব্য, পিতার কর্তব্য, সমাজসেবীর কর্ত্তব্য, অনাসক্তভাবে কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিয়া পিতৃমাতৃঋণ, সমাজ ঋণ প্রভৃতি পরিশোধ করিতে আদেশ দিলেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ চিকিৎসক, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ সমাজসেবী, হিসাবে সংসার ধর্মের অক্লান্ত সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এবং এই নক্রকুম্ভীরাদি ষড় রিপু পরিব্যাপ্ত সংসার সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষত ভাবে রক্ষা করিয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার সাধনায় তিনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়া কর্মময় ভারতে একটি আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন তাহা জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুমধুর স্বভাব, সরলতাপূর্ণ-সুমিষ্ট অমায়িক ব্যবহার এবং সহানুভূতির কোমল স্পর্শে তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাত্র ভক্ত পরিচিত সকলের মানসমন্দিরে একটি স্থায়ী সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার যশঃ সৌরভ আজ ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার ধারা ছিল অদ্ভুত মর্মস্পর্শী। তিনি প্রকৃত পক্ষে রোগের চিকিৎসা করিতেন না—করিতেন রোগীর চিকিৎসা। তাঁহার চিকিৎসা রোগীর মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিত—তাঁহার দর্শনে স্পর্শনে রোগীর অধিকাংশ রোগ যন্ত্রণা আপনা আপনি চলিয়া যাইত। তিনি অর্থ বিনিময় অপেক্ষা প্রীতির বিনিময়ে চিকিৎসা করিতেন বেশী। মাতৃ বিয়োগের পর তিনি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিয়া পরামর্শ দাতা চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা ব্যবসায় গ্রহণ করেন।

ঐ সময় কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত বহু দীন দরিদ্র ও ভগবদ্ ভক্ত পরিবার ঔষধপত্রাদি সহ তাঁহার চিকিৎসায় রোগ যন্ত্রণার নির্মম হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরিহিত সৌম্য সদানন্দ মূর্তি দেখিয়া কেহই তাঁহাতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত এলোপ্যাথী ডাক্তার মনে করিতে পারিত না—আয়ুর্বেদীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ধর্মনিষ্ঠ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াই স্থির করিত। এজন্ত কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে তিনি 'ধার্মিক ডাক্তার' নামে পরিচিত হইয়া চিকিৎসক সমাজে একটি অবিস্মরণীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

দুঃখীর দুঃখমোচন, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান, কর্মহীনের কর্মসংস্থান, আর্তের সেবা, আশ্রয়হীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা, শাশ্বত ধর্ম প্রচার ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। পৃথিবীতে প্রচারিত সকল ধর্মের সারতত্ত্ব তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের বন্ধু ছিলেন। দীনদরিদ্রের শিক্ষার ব্যবস্থায় 'হরনাথ ফ্রি হাই স্কুল' তাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে—ব্যাধিতগণের ব্যাধির উপশমের জন্য তিনি বেলিয়াঘাটা হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৯ ৩ সালে বন্যা ও খাদ্য সঙ্কটের সময় সহস্র সহস্র হিন্দুমুসলমান নরনারী তাঁহার নিকট খাদ্য ও আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। ধর্মপ্রচারের জন্য আশ্রম স্থাপন ছিল তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। তন্মধ্যে বাঁকুড়া জিলার গঙ্গাজলঘাটি আশ্রম, বর্ধমান জিলার আমাদপুরে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী আশ্রম, উড়িষ্যার পুরীধামে শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম এবং কলিকাতা বেলেঘাটায় শ্রীশ্রীভোলানন্দের মন্দির অন্যতম।

পার্থিব এই সকল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা সাধুসঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ থাকিত। এজন্য তিনি বৎসরে দুএক মাস সমস্ত জাগতিক কার্য তাঁহার সহকর্মিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া হরিদ্বার আশ্রমে মহান্ আত্মা সাধুগণের সহিত একত্র বাস করিতেন।

১৯২৭ সালে তাঁহার গুরুদেবের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলেন—এখনও প্রারব্ধ খণ্ডিত হয় নাই—ভবিষ্যতে হইবে। কিন্তু ১৯২৯ সালে স্বামী শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি তাহার দেহরক্ষা করায় তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ বিলম্বিত হইয়া যায়।

বাং ১৩৪৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ দুরারোগ্য 'এনজাইনা' রোগে প্রথম আক্রান্ত হন। তখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন আসন্ন। এজন্য তিনি যাহাতে সংসারের সকল প্রকার দায় হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া সর্বদা সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনে অভ্যস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুহূর্তে রসস্বরূপ ভগবানের ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন থাকিতে সক্ষম হইতে পারেন তজ্জন্য সন্ন্যাসদীক্ষালাভের জন্য তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। ১৩৪৮ সালে বৈশাখমাসে হরিদ্বার যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইলে তিনি আকুলস্বরে তাঁহার গুরুদেবকে ডাকিতে থাকেন। ঐ সালে ৺পূজার পর তাঁহার রোগ আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের এক বিচিত্র আদেশ লাভ করেন—'ঘর ছোড় নহে তো দেহ ছোড়।—গৃহত্যাগ কর না হয় শরীর ত্যাগ কর। তারপর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অভিনবরূপে তাহার রোগশয্যার সন্ন্যাসমন্ত্রগ্রহণ সম্ভব হয়। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং মনে প্রাণে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ভাবাপন্ন হন। তারপর ঐ বৎসর পৌষসংক্রান্তি দিবসে তিনি পুণ্যক্ষেত্রে হরিদ্বার আশ্রমে অবস্থান করিয়া অনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার আজন্ম প্রতিপালিত আশার পরিসমাপ্তি করেন।

ইহার পর হইতেই কিঞ্চিদধিক সার্ধদ্বিবৎসর কাল তিনি সর্বদা আনন্দস্বরূপ ভগবানের ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন থাকিতেন। মুমুক্ষু ব্যক্তির এরূপ জীবন চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এরূপ জীবন যিনি যাপনে যত্নপর তিনি কায়মনোবাক্যে বলিতে পারেন—'মরণরে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান।' তার পক্ষে মরণ অতি আনন্দের—সেই পরম পরিপূর্ণ 'পূর্ণাৎপূর্ণ' আনন্দরসের আস্বাদন একমাত্র মহাপুরুষগণের পক্ষে সম্ভব—ইহা প্রকাশের ভাষা নেই—এই জনমমরণশীল জীবজীবনের যাহাদের ইহা শেষ লীলা তাঁহারাই মাত্র এই পরিপূর্ণ আনন্দরস ভোগের অধিকারী—অন্য কাহারো অনুভবের চেষ্টা বাতুলতা।

স্বামিজী মহারাজ তাঁহার মরজীবনের এই শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন যে—কি ভাবে আদর্শ সংসারী জীবন যাপন করা যায়। সুতরাং তাঁহার জীবনাদর্শ আমদের বিস্তৃতভাবে আলোচনা আবশ্যক। এই প্রবন্ধে তাহার স্থানাভাব। সংক্ষিপ্তভাবে ইহা বলা যায় যে তাঁহার অমূল্য জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে—আত্মকৃপা আগে, গুরুকৃপা পরে।

আমরা সাংসারিক জীব প্রায় সকলেই 'সস্তায় কিস্তিমাৎ' করিতে উৎসুক। কোন প্রতিষ্ঠাবান গুরুর সন্ধান পাইলে তাঁহার নিকট যে কোনও উপায়ে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া মনে করি—আমাদের ইহ জীবনের সাধনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল—এখন হইতে গুরুদেবের অহৈতুকী অমোঘ কৃপায় বিনা সাধনায় এই সংসার সাগর হেলায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব। উষর ক্ষেত্রে যেমন উপ্ত বীজ কোনরূপে অঙ্কুরিত হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফলবান হইতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের এই ত্রিতাপদগ্ধ জীবন কঠিন হৃদয় ক্ষেত্র নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের সাধনা দ্বারা সদা সর্বদা কর্ষণ না করিতে পারিলে এবং সদ্‌গুরুর কৃপা দ্বারা সবল ও সরস না রাখিতে পারিলে গুরুদত্তবীজ সফল হইতে পারে না। শুধু দীক্ষাগ্রহণে গুরু কৃপালাভ করিতে পারে না—ইহার জন্য আবশ্যক—গীতোক্ত সাধনা—(১) প্রণিপাত, (২) পরিপ্রশ্ন ও (৩) সেবা। সুতরাং ইহা আত্মকৃপা সাপেক্ষ। এ জন্য স্বামিজী বলতেন—যার আত্মকৃপা নাই তার পক্ষে গুরুকৃপা না থাকিবার মতো। পার্বত্যভূমি বা মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের মতো বৃথা।

আমরা যেন একথা ভুলিয়া না যাই—মহাপুরুষগণ ইহজগতে জন্ম পরিগ্রহ করেন—একমাত্র ভগবৎ ইচ্ছায়—করুণাময় ভগবানের—জীবগণের প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শনের জন্য। এই সকল মহাপুরুষ তাই শিষ্য ও ভক্তগণের জন্য এক একটী আদর্শ পথের সন্ধান দিয়া যান। যাহারা এই সকল মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও সাধনপন্থী হন তাহাদের পক্ষে সাংসারিক সকল সমস্যার সমাধান করিয়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব। অন্যথায় সকল সমস্যার চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো নিষ্ফল।

মনোকবিতা

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এক :

পিছে-ফেলে-আসা সুমধুর যৌবনে,
কেঁদেছি অভাগা আমি বঞ্চিত মনে।

বুকভরা মোর বহুবেদনার মাঝে,
আজিকে আমার বীণায় রাগিণী বাজে।

দুই :

অনেক হারিয়ে হঠাৎ একদা পথে,
যাকে জানিলাম তুলনা যে তার নাই।

পরশের লাগি ছুটিতেছি প্রাণরথে,
তোমার কুশল আমি আজীবন চাই।

॥ রাত্রি ॥

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

সারারাত বিছানায় একা একা শুয়ে
বিনিদ্র রজনী জানি চোখে নেই ঘুম।
আশেপাশের সব বাড়ী ঘুমেতে নিথর
যানবাহন বন্ধ হয়েছে পাড়াটা নিঝুম।
তুমিও কি ঘুমায়ে পড়েছো সকলের মত
মুছে গেছি আমি কি তব মন থেকে ?
জানিনা। আমার রাতের প্রতিটী প্রহর কিন্তু
তোমাকেই ঘিরে মনে স্বপ্ন যায় এঁকে।
জানালা দিয়ে চাঁদের হলুদে আলো
ছড়িয়ে গেছে আমার বিছানার পরে,
ফুলদানীতে রাখা রজনীগন্ধার সুবাসে মন
কি এক গভীর আকুলতায় উতলা করে।
সারারাত শুয়ে ভাবি শুধু তোমার কথাই
এই রাতটুকু বড় সুন্দর—তোমার মনের মাঝে পাই !

বন্ধুত্ব

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের সকলেরই নিশ্চয়ই বন্ধু আছে। কারও অনেক বন্ধু, কারও বা অল্প কয়েকটি, আবার কারও হয়ত একটিই। কিন্তু একেবারে বন্ধুহীন কাউকেই দেখা যায় না। ভাই, বোন, দাদা, দিদি, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলেমিশে সকলে থাকে, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে থাকে না কোনও আত্মীয়তা, অথচ দেখা যায় তার সঙ্গেই মনের মিলটি হয় সবচেয়ে বেশী। দেখা গেছে বন্ধু অনেক থাকলেও বিশেষ একজনের সঙ্গেই ঘটে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা। তার কারণ বোধহয় এই যে সেই বিশেষ একজনের চিন্তাধারা, কর্মধারা, পছন্দ অপছন্দ, বিশেষ কিছুতে আসক্তি বা অনাসক্তি ইত্যাদি আর একজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাওয়াতেই এই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা লাভ করে থাকে। একেবারে বাল্য বয়সের বন্ধু, স্কুল ও কলেজের সহপাঠী বন্ধু ও কর্মস্থলের বন্ধু—এই তিন প্রকার পর্য্যায়ে সাধারণতঃ বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। দেখা গেছে স্কুল ও কলেজ জীবনের যে বন্ধুত্ব তা অনেক সময়েই দীর্ঘস্থায়ী হয়, যদি না কেউ দূরে চলে যায়। একই স্থান থাকলে পাঠ্যাবস্থার এই বন্ধুত্ব সাধারণ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতেই দেখা যায়। তবে বাল্যকালের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এক সময়ে দুই বন্ধুতে যে মানসিক মিল ছিল, দেখা যায় পরে সে মিল আর থাকছে না। কারণ তখন হয়ত দু'জনের মনের গতি বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। একটু বড় হয়ে কলেজ জীবনে যে বন্ধুত্ব হয় তা অনেক সময় স্থায়ী হয়; কারণ বয়স বাড়ার জন্যে মনের কিছুটা স্থিতিশীলতা এসে যাওয়ায় মানসিক পরিবর্ত্তন কম হয় বলে।

দেখা যায় একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আরও অনেক বন্ধু প্রায় সকলেরই থাকে। এই বন্ধু থাকাটা ভালই, বন্ধুহীন একক জীবন কারুরই কাম্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব করার মধ্যে একটা ঝুঁকিও আছে। সেটা তোমরা সকলে বোঝ কি? নির্বিচারে যদি বন্ধুত্ব করে যাও তাহলে ভাল মন্দ সব রকম বন্ধুই আসবে। আর বন্ধুর প্রভাব যে কতটা তা তোমরা হয়ত এখন ততটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু এটা জেনে রাখবে যে ভাল বন্ধু যেমন তোমার ভাল করবে, তেমনি মন্দ বন্ধু তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে তার নিজের মান (Standard) অনুযায়ী। মন্দ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হয়ত তুমি বিপদেও পড়তে পার, হয়ত তোমার সমূহ ক্ষতি হতে পারে কিংবা মন্দের সঙ্গে মিশে তোমার মানসিক অধোগতি হতে পারে। যে বন্ধু পড়াশুনা করে না তার পাল্লায় পড়ে তুমিও হয়ত পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে আরম্ভ করবে। যে বন্ধু উচ্ছৃঙ্খল, অভি-

ভাবকদের কোনও কথা শোনে না, তার সঙ্গে মিশে তুমিও হয়ত অবাধ্য হয়ে উঠবে। যে বন্ধু অসভ্য—সভ্য আচার ব্যবহার যে শিক্ষা করেনি তার সঙ্গী হয়ে তুমিও হয়ত তেমনি অসভ্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করবে। অপরদিকে যদি তোমার বন্ধু ভাল হয়—লেখাপড়ায় মনোযোগী, সুসভ্য আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত, সচ্চরিত্র, বাধ্য, ভদ্র হয়, তাহলে তার প্রভাবে তুমিও সেইরকম হয়ে উঠবে। তাই বন্ধু নির্বাচনের সময় সব সময় সজাগ থাকবে। কোনও বন্ধু যদি তোমায় পছন্দমত না হয় বা তাকে মন্দ বলে মনে হয় তাহলে তার সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করে দেবে। খারাপ বন্ধুর চেয়ে বন্ধু না থাকাও ভাল। বন্ধুদের প্রভাব বা 'অ্যাস্-সোসিয়েশন্' (Association)-এর প্রভাব মানুষের ওপর বিশেষ কার্য্যকরী হয়। চরিত্র গঠনে এই "অ্যাস্সোসিয়েশন্" যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। তাই তোমার এই বান্ধব-পরিবেশ যাতে সুস্থ, সুন্দর, সৎ হয় তার দিকে নজর রাখবে এবং দেখবে তোমার ভবিষ্যৎ গঠনে এই পরিবেশ কতটা সাহায্য করছে।

———

কালিদাসের গল্প

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

ইতিহাসে তোমরা কালিদাসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। কথিত আছে, কালিদাস প্রথম জীবনে একটি গণ্ডমূর্খ ছিলেন পরে সরস্বতীর কৃপায় মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর মতো বুদ্ধিমান পণ্ডিত সে-যুগে আর দ্বিতীয়টি ছিলনা।

তবে দুঃখের বিষয় এতবড় পণ্ডিতের জীবন সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায়নি। তিনি আসলে কোন্ শতাব্দীর লোক এবং কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন ছিলেন তা' চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি। যাইহোক তার সম্বন্ধে তোমাদের আজ এমন একটা গল্প শোনাবো যাতে তার অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মিলবে।

কালিদাস ছিলেন যত বড় পণ্ডিত তত বড় কুৎসিত। তার গায়ের রঙ ছিল কালো। শরীরের গঠন কদাকার। মুখমণ্ডল শ্রীহীন।

তাই নিয়ে কালিদাসের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনরা কালিদাসকে হামেশাই ঠাট্টা-তামাসা করতো। মায় রাজা বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য আপশোষ করে বললেন, বড়ই মুশ্কিল, কালিদাস! তুমি এতবড় পণ্ডিত অথচ লোকের কাছে তোমার পরিচয় দিতে সত্যি লজ্জা করে—

কালিদাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই রাজা বললেন, শুধু তোমার কদাকার চেহারার জন্য।

কালিদাস লজ্জায় সসঙ্কোচে বললেন, কি করবো, মহারাজ! শরীর সৃষ্টি করেছেন ভগবান্। তিনি তাঁর খেয়াল খুশী মতো আমার দেহ গড়েছেন। অতএব, আমার কুরূপের জন্য আমি তো মোটেই দায়ী নই।

রাজা কালিদাসের যুক্তি বুঝেও বোঝেন না। তিনি সুযোগ পেলে আগের মতোই তাকে কুৎসিত চেহারার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।

কালিদাস নীরবে সব সহ্য করেন। তিনিও সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

একদিন রাজপ্রাসাদে রাজা তাঁর নবরত্নদের নিয়ে শুয়ে আছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। অসহ্য গরম। রাজার ঘন ঘন জল পিপাসা পাচ্ছে আর কালিদাস বারবার রাজাকে মাটির কুঁজো থেকে জল এনে খাওয়াচ্ছেন।

রাজা শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, এক কাজ কর কালিদাস, এক ঘটি জল এনে বরং আমার শিওরের কাছে রেখে দাও। পিপাসা পেলে আমি নিজেই নিয়ে খাব। তাতে তোমারও মেহন্নত কম হবে।

কালিদাস তাই করলেন।

কিছুক্ষণ বাদে রাজার আবার তেষ্টা পেল। কিন্তু ঘটির জল এক চুমুক খেয়েই তিনি মুখখানা বেঁকিয়ে বললেন, কালিদাস, বড্ড গরম হয়ে গেছে জলটা। জিবে নোনতা ঠেকছে। তুমি বরং কুঁজোর জলই খাওয়াও। কুজোর জলটা বেশ ঠাণ্ডা।

কালিদাস তখন মুচকি হেসে বললেন, দেখলেন তো মহারাজ, আপনার কত সুন্দর সোনার ঘটির জল গরম হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে গেলো। আর এই বিশ্রী সামান্য মাটির কুঁজোর জল এত স্নিগ্ধ—এত সুস্বাদু যে তা খাওয়ার জন্য আপনি এখন লালায়িত! এবার বলুন দেখি কোন্‌টা বড় – বাহ্যিক রূপ না ভেতরের গুণ?

রাজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, সত্যি কালিদাস, তোমার মতো বুদ্ধিমান জগতে অতি বিরল।

———

॥ পয়োধর প্রণয়ের পাণ্ডা ॥

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রসাবেশে কুতূহলী
উঠে হিয়া উচ্ছলি'
অপ্রতিম প্রেমহেম ক্ষেত্রে;
বিরহের গরলের
ছবি এক অমৃতের
হেরে সেথা অভিভূত নেত্রে। ১

যক্ষ এক লক্ষ এক
এক মাসেতে বেতন পায়।
তাহার প্রভু কুবের কভু
তার কাছে না হিসাব চায়। ২

সেই আনাড়ী কর্মচারী
কর্মে, তাই, দেয় না মন;
হর্ম্যতলে, নর্মজলে
ধর্ম করে বিসর্জন। ৩

প্রিয়ার মুখে, চক্ষে, বুকে
যখন যাহা দেখতে পায়
দশটা থেকে পাঁচটা তক
তাই সে লিখে তার খাতায়। ৪

ক'বার গায়ে লাগল তার
প্রিয়ার লীলা—আঁচল খান;
ক'বার প্রিয়া করল তায়
মিষ্টিমধু-পরশদান;—৫

হিসাব ক'রে জমার ঘরে
তাই সে লিখে তার খাতায়
খরচ লিখে, পরশ যেটি
হয় নি' দেয়া প্রাণ-প্রিয়ায়। ৬

এক দিবসে, কুবের প্রভু
হাস্য ক'রে হঠাৎ কয়,
"জলদি আনো হিসাব-খাতা,
দেখতে ভারী ইচ্ছা হয়।" ৭

যক্ষ কহে, "যে দিন মম
রাত্রে হ'ল ফুল-বাসর,
সে দিন থেকে হিসাব লেখা
চলছে এই চার বছর। ৮

হিসাব সব হয়নি লেখা,
চলছে লেখা, রাত্রিদিন;
চলবে লেখা জীবন-ভর
হিসাব সেই অন্তহীন।" ৯

"অন্তহীন হিসাব লেখ!"
কুটিল ভাষে কুবের কয়,
জলদি আনো হিসাব খাতা,
চাকরি যদি রাখতে হয়।" ১০

হিসাব-খাতা জলদি আসে।
কুবের পড়ে সবটা তার।
হাস্য ক'রে যষ্টি ধরে
বাক্য হানে সে এইবার, ১১

"সুকন্যার কেচ্ছা দিয়ে
হিসাব লেখা চলছে বেশ!—
লক্ষ টাকা বেতন পেয়ে
আর কি হবে লাভ বিশেষ!– ১২

নির্বাসন! নির্বাসন!—
অলকা ত্যজি' জলদি যাও।
নয় প্রিয়াকে, তার স্মৃতিকে
বক্ষে ল'য়ে রাত কাটাও।" ১৩

গৃহিণী ও গৃহ ছাড়ি,
সাথে ল'য়ে আঁখি বারি
যক্ষ সে বাহিরায় বক্ষে।
তৎক্ষণে, বাস ছেড়ে,
জায়া ছোটে নথ নেড়ে
পতিটির টিকি টেনে ধর্‌তে। ১৪
পতি কয়, "ওগো প্রিয়া,
মোরে সদা জীয়াইয়া
রেখে দিও আঁখি জল মধ্যে।
লয়ে সেই লোণা লোর,
জলছবি সদা মোর
এঁকো তুমি গদ্যে, ও পদ্যে।" ১৫
গিরিদরি বন দলি'
যক্ষ সে চায় চলি'
অভিরাম রামগিরি শৃঙ্গে।
সেথা সদা নীল সরে
ফুল সেজে কেলি ক'রে
ভাবে ভোর ভৃঙ্গী ও ভৃঙ্গে। ১৬
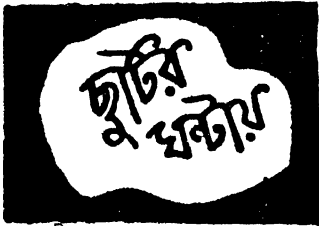
চিত্রগুপ্ত

এবারে বলছি—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা। এ খেলাটির কলা-কৌশল রপ্ত করা—এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয় এবং খেলাটি দেখাতে হলে, বিশেষ ধরণের যে কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলি অনায়াসেই সহরের যে কোনো ভালো রাসায়নিক ঔষধাদির দোকান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

খেলাটি আসলে হলো -রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র কারসাজি। তবে খেলা দেখানোর আগে তোমরা যেন ঘুণাক্ষরেও এ রহস্যের কথা তোমাদের দর্শকের দল··· অর্থাৎ, আত্মীয়-বন্ধুদের কারো কাছে ফাঁস করে দিও না। কারণ, তাহলেই খেলার মজাটুকু মাটি হয়ে যাবে!

এ খেলাটি দেখানোর জন্য উপকরণ চাই—মজবুত-ধরণের একটি কাঁচের গেলাস, হাত-খানেক লম্বা কাগজের ফিতা, এক বাক্স দেশলাই এবং খানিকটা 'ইথার' (Ether)—যেটি তোমরা অনায়াসেই যে কোনো ভালো ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান থেকে জোগার করতে পারবে।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে খেলার কেরামতী দেখানোর সময়, উপরের ছবিতে যেমন হদিশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সমতল একটি টেবিলের উপর কাঁচের গেলাসটিকে বসিয়ে রেখে, গেলাসটির $\frac{3}{4}$ অংশ ঠাণ্ডা-জল দিয়ে ভরে তোলো। তারপর সেই গেলাসের জলের উপর অল্প পরিমাণে 'ইথার' ঢেলে মিশিয়ে নাও। এবারে দেশলাই-কাঠির সাহায্যে লম্বা-ছাদের কাগজের ফিতাটিকে জ্বালিয়ে সাবধানে গেলাসের ভিতরের 'ইথার'-মেশানো জলের বুকে ধরো। তাহলেই দেখবে—

গেলাস-ভরা ঠাণ্ডা-জলের বুকে ক্রমশঃ সুরু হয়ে গেছে—জ্বলন্ত আগুনের শিখার নৃত্য-লীলা। গেলাসের জলে হিসাব কষে যদি 'ইথারের' পরিমাণ যথাযথভাবে মেশাতে পারো, তাহলে জলের বুকে অগ্নিশিখার এই বিচিত্র নৃত্যলীলা বেশ খানিকক্ষণ স্থায়ী হবে। দর্শকের দল জলের উপর জ্বলন্ত আগুনের শিখার নৃত্যলীলা দেখে শুধুই যে বিস্ময়ে মুগ্ধ হবেন তাই নয়, তোমাদের কেরামতীরও তারিফ করবেন পঞ্চমুখে!

এমন আজব ব্যাপার কেন ঘটে, জানো?... আসলে, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলেই এমন অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটে!

———

মনোহর মৈত্র

১। পাঁচিলের হেঁয়ালিঃ

গ্রামের সীমান্তে ছিল এক বিরাট পুকুর—কাকচক্ষুর মতো নির্ম্মল-স্বচ্ছ সে পুকুরের জল। সেই পুকুরের পাড়ে সবুজ ঘাসে-ঢাকা ডাঙা-জমির চারি-কোণে গ্রামেরই চারজন গরীব চাষী ছোট ছোট চারটি কুঁড়ে ঘর বানিয়ে যে-যার বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছিল এতকাল। কিন্তু এমন সুখ তাদের বরাতে টিকলো না বেশী দিন। কারণ, সহর থেকে সেবার হঠাৎ পাখী-শিকারে এলেন—জমীদার বাবুর চারজন বিলাসী সৌখিন ছেলে। গ্রামের পুকুর পাড়ের নিরালা সুন্দর প্রাকৃতিক-শোভা দেখে তাঁরা মোহিত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর পয়সা খরচ করে সেখানে চারজন চাষীর কুঁড়ে ঘরের পিছন দিকে নিজেদের বিলাস আরামের সখ মেটানোর উদ্দেশ্যে বানিয়ে তুললেন সুদৃশ্য সুন্দর চারখানি বিরাট বাগান বাড়ী। সখের বাগান বাড়ী বানানোর পর, সহরের সৌখিন বাবুরা সেখানে বেড়াতে এসে দেখেন যে পুকুর পাড়ের চার কোণে গরীব চাষীদের কুঁড়েঘর চারখানি নিতান্তই বেয়াড়া বিসদৃশ দেখাচ্ছে—তাঁদের প্রাসাদোপম পল্লী-ভবন চারটির পাশে। তবে মন খুঁত খুঁত করলেও প্রজাবৎসল-রাশভারী জমিদার বাবুর আপত্তির ভয়ে, তাঁরা কেউই তাঁদের বাগান বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর পাড়ের জমি থেকে গরীব চাষীদের কুঁড়ে ঘর চারখানি স্থানান্তরিত করতে ভরসা পেলেন না। তাই শেষ পর্য্যন্ত সবাই মিলে মতলব করলেন—পুকুরপাড়ের চারিদিকে তাঁদের বিরাট বাগান বাড়ী চারটি আর গরীব চাষীদের সামান্য কুঁড়ে ঘর চারটির মাঝখানের জমিতে আগাগোড়া লম্বা এমন কায়দায় উঁচু পাঁচিল গেথে তুলবেন যে বেয়াড়া বিসদৃশ দৃশ্যও কারো নজরে পড়বে না এবং পুকুরের পাড়ে যাতায়াত করারও কোনো অসুবিধা ঘটবে না—অথচ চাষীদের কুঁড়েঘর আর নিজেদের বাগান বাড়ী চারটির প্রত্যেকটির মধ্যে ব্যবধানও বজায় রাখা যাবে অনায়াসেই। বলতে পারো—তাঁরা কেমন কায়দায় লম্বা একটানা সেই পাঁচিল রচনা করেছিলেন—গ্রামের পুকুর পাড়ে তাঁদের বাগান-বাড়ী আর চাষীদের কুঁড়েঘরগুলির মাঝখানের জমিতে?
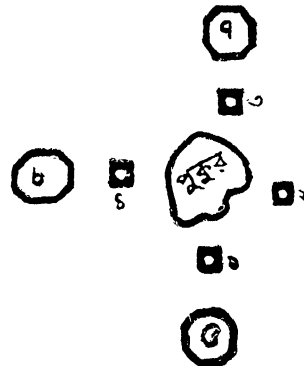
উপরের ছবিতে পুকুরের চারিদিকে কালো রঙের চৌকোণা ঘর চারটি হলো—চাষীদের কুটির এবং সেগুলির প্রত্যেকটির পিছনে শাদা-ঘর চারটি হলো—

শহরের সৌখিন বাবুদের চারজনের বাগান বাড়ী। তোমাদের মধ্যে যারা এই আজব হেঁয়ালির সমাধান করতে চাও, তারা একখানি শাদা কাগজে উপরের নক্সা মতো ছক এঁকে, সেই ছকে কালি কলমের রেখা টেনে লিখে পাঠিও পাঁচিল রচনার প্ল্যান এবং সেই সঙ্গে তোমাদের নাম ধাম পরিচয়। এ হেঁয়ালির সঠিক সমাধান নক্সা এঁকে দেখাতে পারলে, বুঝবো, সত্যিই বাহাদুর বটে তোমরা!

২। কিশোর জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

তিনবর্ণে নাম মোর—বৃক্ষজাত আমি ;
প্রথম ও দ্বিতীয় দেখে, লোকে পশ্চাদগামী।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দেখো—জন্তু অতিকায় ;
প্রথম ও তৃতীয়ে মিলে শশীরে বুঝায়।

রচনা: বিজন কুমার ঘোষ (জগৎবল্লভপুর)

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর:

১। [মুদ্রাকর-প্রমাদে গত মাসে এই হেঁয়ালির নক্সাটি মুদ্রিত হয় নাই। সেজন্য সভ্য-সভ্যাদের অনেকের পক্ষেই এ হেঁয়ালির সমাধান নির্ণয়ে অসুবিধা ঘটিয়াছে। তাই স্থানাভাবের কারণে বর্ত্তমান সংখ্যায় সম্ভবপর না হইলেও, আগামী ফাল্গুন সংখ্যায় এই হেঁয়ালিটি নক্সা সহ পুনরায় প্রকাশিত হইবে।

—পরিচালক]

২। হাওয়া

৩। কাজল

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

গৌর, লিপিকা, রাণা ও বুনা (চুঁচুড়া), আশানাথ, নিশানাথ, উষানাথ, রাকানাথ, ফেনিলা ও পদ্মজা বন্দ্যোপাধ্যায় (দার্জিলিঙ্), অমিয়, প্রশান্ত, মানস, রবি, সুনীত, তিনকড়ি, ভুবনমোহন, অভি, কৃষ্ণলাল, ভাস্কর মনোজ, অশোক, অনাবিল, মণিলাল ও রাধাশ্যাম (বর্দ্ধমান) সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিণি, রণি, মীরা ও লীন (কাইরো), পুপু, ভুটিন ও বাবুই মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, নিপু ও সঞ্জীব (হাওড়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, লক্ষ্মী, সুনীল, নমিতা, সঞ্জয়, অমিয়, মুরারি ও সুমোহন (ভিলাই), ফণী, পিণ্টু ও খুকুন সাহা (কলিকাতা), হারাণ, হিমাংশু, সুধাংশু, অলকা, শীতাংশু, সুষমা, হাসি ও শৈলেন (শিলিগুড়ি), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), বুবু ও মিঠু গুপ্তা (কলিকাতা), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (লক্ষ্ণৌ), ধামু ঘোষ (বর্দ্ধমান), বিশ্বনাথ রায় (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বিজয়েন্দ্র, বিনয়েন্দ্র ও অজয় সিংহ (হাজারীবাগ), অজয়, হরিদাস, বলাই, কানাই, রঘুনাথ, মহেশ্বর, কান্তা শান্তা ও নন্দা রায়চৌধুরী (বলাগড়), অশোক, বাপি, বুতাম,, পিণ্টু ও সুমিতা (বোম্বাই), ইন্দ্রাণী, উদয়ন, উত্তরা, পার্থ, গৌতম, কল্যাণ, অলক, তিলক, ঋতা, শীলা, মাণিক, মিনতি, বাপি, দীপা, সুস্মিতা, শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), রজত, কল্যাণ সুধীশ, শচীন্দ্র, বিশ্বতোষ, অনিল, শোভনা, মালা, মণি, চন্দন, সনৎ ও অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর), প্রতুল ও মিনতি দেবশর্ম্মা (ঘাটশীলা), পৃথ্বীশ, নীলমণি, কালিদাস, সুশীল, রণজিৎ ও আশুতোষ (কলিকাতা), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা)।

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে ভারতবর্ষে যে দল প্রায় ৭০ বৎসর সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল সেই কংগ্রেস দল সমস্ত ভারতে ক্ষমতা লাভ করে। জহরলাল নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সকল রাষ্ট্রে কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্যাগী কংগ্রেস নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কয়েক মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না পারায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হইয়া পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

তাহার পর ভারতের নূতন গঠনতন্ত্র প্রস্তুত হইলে ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল। তখন হইতে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রে ও সকল রাষ্ট্রে কংগ্রেসী শাসন চলিয়া আসিতেছে। মাত্র কেরল রাষ্ট্রে কয়েক মাসের জন্য কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। ইতিমধ্যে বহু নেতা পরলোকগমন করিয়াছেন, বহুপ্রকার উত্থান পতন হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কাজ করিয়া চলিয়াছে।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভাগ্য বিপর্য্যয় হইয়াছে। একমাত্র কেরল প্রদেশে বিধানসভায় কমিউনিষ্ট দল সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়াছে এবং সেখানে তাহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল স্থানে অন্য কোনও দল এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

তবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে।

কয়েকটি রাষ্ট্রে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইলেও তাঁহারা কাজের খাতিরে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নির্দেশ মানিয়া চলিবেন তাহা সুস্পষ্ট। ফলে কাজের কোন অসুবিধা হইবে না।

এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত হওয়ায় বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চিমবাংলায় বিধানসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০জন। ইহার মধ্যে বিভিন্ন দল আসন লাভ করিয়াছে নিম্নরূপ :—

কংগ্রেস—১২৭
বাম কম্যুনিষ্ট—৪৪
ডান কম্যুনিষ্ট—১৬
ফরোয়ার্ড ব্লক—১৩
বাংলা কংগ্রেস—৩৪
পি, এস, পি—৭
এস, এস, পি—৬
এস, ইউ, সি—৪
এল, এস, এস—৫
গোরখা লীগ—২
ওয়ারকারস পার্টি—২
জনসঙ্ঘ—১
স্বতন্ত্র—১
নির্দলীয়—১০
ফঃ বঃ মাঃ—১
মোট—২৮০

মেদিনীপুরের কংগ্রেসের আজীবন কর্মী বহু নির্যাতিত নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর মন্ত্রীসভার সদস্য রূপে কাজ করার পর কামরাজ পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গঠনমূলক কার্য্যে যোগদান করায় তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি

করা হইয়াছিল, কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং এক বৎসর পূর্বে বাংলা কংগ্রেস নামক নূতন দল গঠন করিয়া সেই দলের সংগঠনে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা কিছু পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। তাঁহার দলের ৩৪জন প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীদের হারাইয়া গত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে। তিনি নিজে তাঁহার বাসস্থান তমলুক কেন্দ্র হইতে জয়ী হইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, আরামবাগ কেন্দ্রেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকেও পরাজিত করিয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ও প্রবীণ নির্যাতিত দেশকর্মী শ্রীহেমন্তকুমার বসুও অজয়বাবুর মত দুইটি কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি বারাসত কেন্দ্রে জয়লাভ করিলেও তাঁহার পুরাতন কর্মস্থল কাশীপুর কেন্দ্রে তাঁহাকে কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে।

অজয়কুমারের এই অসামান্য সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিয়াছেন কারণ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সকল অকংগ্রেসী দল একত্র হইয়া তাঁহাকে নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন।

এবারের নির্বাচনে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়াছে—মানুষ ২০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী ভাত খায়; কিন্তু গত কয়েক বৎসর বাঙ্গালীর পক্ষে চাল সংগ্রহ করা সুকঠিন হইয়াছিল। দুর্নীতি দেশের সকলস্তরের মানুষের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে কংগ্রেসী সরকার দুর্নীতি দমনের কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই। ফলে মানুষের প্রত্যেক দিনের কাজে তাহারা অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। একই দল বিশেষ করিয়া একই লোক বহুদিন শাসন যন্ত্র চালাইলে মানুষ তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে। গত ২০বৎসরে মন্ত্রীসভার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ২।৪ জন নূতন মন্ত্রী আসিয়াছেন বটে কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ঈশ্বরদাস জালান, পুরবী মুখোপাধ্যায়, আভা মাইতি প্রভৃতিকে সকলেই ১৫ বৎসরের অধিককাল মন্ত্রীর কাজ করিতে দেখিয়াছে। এইরূপ নানা কারণে গত সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১২৭টি আসন পাইয়াছে। অবশ্য বিধানসভার অন্য কোন দল একক এত বেশী আসন লাভ করে নাই। তাহা হইলেও অকংগ্রেসীরা আজ সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রিসভা গঠনে আগ্রহী হইয়াছেন।

নূতন নেতা—

অ-কংগ্রেসী সকল দল মিলিত হইয়া যাঁহাকে তাঁহাদের নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন তিনি বাংলাদেশের সর্বজন পরিচিত শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। গত প্রায় ৫০ বৎসর কাল তিনি সকল প্রকার সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিয়াছেন। মেদিনীপুর তমলুকের খ্যাতিমান উকিলের পুত্র অজয়কুমার তরুণ বয়সেই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও সুন্দর আকৃতি তাঁহাকে প্রথম জীবন হইতেই জনপ্রিয়তা দান করিয়াছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর তিনি মন্ত্রী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মন্ত্রী অবস্থাতেই সকল প্রকার বিলাসিতা ও বাহুল্য বর্জন করিয়া অতি সাধারণ নাগরিক জীবন যাপন করিতেন। সেজন্য ২ বৎসর পূর্বে কামরাজ পরিকল্পনায় বাংলা দেশে মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম অর্থের মোহ ত্যাগ করিয়া গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তমলুক ও আরামবাগ দুইটি স্থান হইতে নির্বাচিত হইয়া তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। লোক আশা করে মুখ্য মন্ত্রীরূপে তিনি ঠিকভাবেই কাজ করিতে পারিবেন। এবং পথে যত বাধাই আসুক না কেন তিনি ত্যাগ ও বুদ্ধির দ্বারা সকল বাধা অতিক্রম করিবেন। সুখের কথা তিনি বাংলাদেশের আরও দুইজন খ্যাতনামা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ত্যাগী কর্মীকে মন্ত্রী সভায় গ্রহণ করিয়াছেন। (১) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তিনি একদিকে সুপণ্ডিত ও সর্বত্যাগী। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক মাস তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশে অতি অল্প সংখ্যক দেখা যায়। এবং (২) শ্রীহেমন্তকুমার বসু। তিনিও প্রথম জীবন হইতে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বন্ধু ও ভক্ত। তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয় বাংলার জনগণের নিকট সুবিদিত। হেমন্তবাবুও অসাধারণ কষ্ট সহিষ্ণু, ত্যাগী, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান দেশসেবক। এই তিন বীরের একত্র সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ তাহার হৃতগৌরব পুনরায় লাভ করুক। আমরা কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিব।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্মান—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলা দেশের দুইজন বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা আজ ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্র। ঐ পত্রে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হইয়া থাকে। কাজেই অশোক-কুমারকে সম্মানিত করিয়া দেশের জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা হইয়াছে।

খ্যাতনামা অধ্যাপক ও দেশকর্মী নিরঞ্জন সেন পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন। নিরঞ্জনবাবু প্রথম জীবন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে সর্বজন পরিচিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, অধ্যাপনার সহিত দেশ-সেবাও তিনি জীবনের অন্যতম কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং কয়েক বৎসর বিধান সভার সদস্য ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি এই সম্মান লাভ করায় সকলেই আনন্দিত হইলেন।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা—

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সভাপতি করিয়া একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সমিতি গঠন করিয়াছেন, গত ১২ই জানুয়ারী অতুল্য-ঘোষ দিল্লীতে জানাইয়াছেন আপাততঃ ঐ কমিটি ২০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। অতুল্যবাবু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে সকল বিষয় সকল খবর জানেন, কাজেই এই কমিটি কলিকাতা ও তাহার নিকট-বর্তী জেলা সমূহের উদ্বাস্তু সমস্যা ভালভাবে সমাধান করি-বেন বলিয়া সকলে আশা করেন।

ছাত্র সমস্যার সমাধান চেষ্টা—

সারা ভারতের ছাত্র চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য দিল্লীতে প্রায়শ নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। সকল রাজ্যের পুলিশের কর্তাদের লইয়া সে সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে পুলিশের কর্তারা নির্দেশ দিয়াছেন সকল বিশ্বদিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলারগণও এ জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মোটের উপর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে পরিবর্তন করা প্রয়োজন যাহাতে কলেজ সমূহের কর্তারা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কোনদিনই ছাত্র সমস্যার সমাধান হইবে না।

কাশীতে রেল ইঞ্জিন কারখানা—

বারাণসীতে যে নূতন রেল ইঞ্জিন কারখানা তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে রেলের ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ার হইতেছে। গত ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০০খানা ইঞ্জিন তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। আপাততঃ বৎসরে ৫৫খানা করিয়া ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে। ভারতবর্ষ পূর্বে বিদেশ হইতে ইঞ্জিন আমদানী করিত, ক্রমে সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়াই ভারতের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন—

এ বৎসর জানুয়ারী মাসে হায়দ্রাবাদ শহরে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক পি, আর, শেষাদ্রি সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা যদি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন তবেই বিজ্ঞান আলোচনা সার্থক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, "বিজ্ঞানীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত তাহাদের কার্য্যের দ্বারা যেন ভারতবাসীর দারিদ্র্য দূরীভূত হয়।" বিজ্ঞান একদিকে যেমন মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে অন্যদিকে তেমনি মানুষকে বাঁচাইবার জন্যও বিজ্ঞানীদের সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে।

চন্দননগরে নূতন মন্দির—

চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের স্মৃতিতে বোড়াইচণ্ডীতলার আশ্রমে গত পৌষ সংক্রান্তির দিন এক নূতন মন্দিরের উদ্বোধন হইয়াছে, সকলেই জানেন মতিলালবাবু প্রথম জীবনে রাজনীতিজ্ঞ হইলেও শেষে ধর্মনেতা হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন ঐরূপ একজন সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ। তিনিও প্রথম জীবনে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ধর্মহীন জীবনে এই রূপ মন্দির প্রতিষ্ঠা আশার বিষয় সন্দেহ নাই।

অকাল বর্ষণ—

গত জানুয়ারী মাসের প্রথমে কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় সে ভীষণ জলবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহা গত ১০০ বৎসরের মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই। পৌষমাসের এই অতিবৃষ্টি ধান ও আলুর চাষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, হয়ত কোন কোন রবি শস্যের সামান্য উপকার হইবে। আমরা কলিযুগে বাস করিতেছি, কলির প্রভাব হইতে রক্ষার উপায় নাই। দারুন খাদ্যাভাবের দিনে এই অকালবর্ষণ খাদ্যাভাবকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

ইঞ্জিনিয়ারীং গবেষণা সংস্থা—

রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থসাহায্যে গত ২০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারীং গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে, দুর্গাপুরে দুইটি ও উত্তর মাদ্রাজে দুইটি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে,রাষ্ট্রপুঞ্জ পৃথিবীর সকল দেশের অর্থ সাহায্য লইয়া এই উন্নয়ন কার্য্য চালাইয়া থাকেন। এবার ভারতের ভাগ্যে যে কয়টি ব্যবস্থা লাভ সম্ভব হইল আমাদের বিশ্বাস ভারতীয় ছাত্রগণ তাহা দ্বারা বহু ভাবে উপকৃত হইয়াছে।

নূতন বাসের রাস্তা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি নূতন বাস রাস্তায় বাস চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১) দমদম বিমান ঘাঁটী হইতে হাওড়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ, (২) দমদম বিমান ঘাঁটী হইতে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ, (৩)দমদম হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার। সকল বাসই দমদম বিমান ঘাঁটী হইতে যে রাস্তা লবণ হ্রদ, উল্টাডাঙ্গা ও বাগমারী হইয়া শ্যামবাজারে আসিয়াছে—সেই বড় রাস্তা দিয়া আসিবে।

গোয়া প্রভৃতি রাজ্য—

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত গোয়া,দমন ও দিউ তিনটি ক্ষুদ্র স্থান এক সময়ে পর্ত্তুগীজদের অধিকারে ছিল। ভারত স্বাধীন হইবার পর এইগুলি স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু তাহাদের দলীয় শাসন ব্যবস্থা স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। সম্প্রতি ভোটে স্থির হইয়াছে ঐ তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া থাকিবে। ভারতে বড় বড় রাজ্য ছাড়া মণিপুর, ত্রিপুরার মত বহু ক্ষুদ্ররাজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন আছে, ঐ অবস্থায় থাকায় তাহাদের অনেক সুবিধাও আছে। কাজেই তিনটি ছোট রাজ্যের অধিবাসীরা এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করায় তাহারাই উপকৃত হইবেন।

আবার আসাম ভাগ—

ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চল নানা সমস্যায় প্রায়ই তাহার রাজ্যশাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছে। সম্প্রতি আসামের পার্বত্য জেলাগুলি লইয়া একটি পৃথক রাজ্যগঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। গারো পাহাড়, খাসী, জয়ন্তীয়া পাহাড, নাকো পাহাড় বা উত্তর কাছাড় ও মিজো পাহাড় এই চারটি জেলা লইয়া পার্বত্য এলাকা গঠিত হইল। আসামের সমতল স্থানগুলি অপর একটি রাজ্যে পরিণত করা হইবে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহা এই নূতন ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন। সকল স্থানের অধিবাসীরাই এখন নিজেরা স্বতন্ত্র হইতে চাহিতে-ছেন, কাজেই নূতন নূতন রাজ্যগঠন স্বাভাবিক।

দক্ষিণেশ্বরে নূতন মন্দির—

গত ২৯শে পৌষসংক্রান্তির দিন দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠে নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া এই মন্দিরটি নির্মিত হইতেছিল। একদল ত্যাগী সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ইহার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, ১৩২১ সালে অন্নদা ঠাকুর এই নূতন মন্দিরের কথা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল পূর্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ৩ বিঘা জমির উপর আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে শ্বেত পাথরের বেদীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, অষ্টধাতু নির্মিত মাতৃমূর্তি ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ স্থানে বালকদের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বালিকাদের আর্য্য নারীর শিক্ষাদান, কুষ্ঠাশ্রম নির্মিত হইয়াছে। কোন ধনীর দান না লইয়া একদল ত্যাগী কর্মী ভিক্ষা করিয়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠান ও অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করিলেন তাহা তাহার বিস্তৃত জীবন কথা বাহির হইলে দেশের তরুণের দল উপকৃত হইবে।

কলিকাতা সহরে রেলপথ—

সহরতলীর রেলগুলি সম্প্রসারিত করিয়া শহরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত রেল চালাইবার জন্য কলিকাতা সহরের কর্তৃপক্ষগণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। জানুয়ারী মাসের মধ্য-ভাগে প্রয়োজনীয় তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে, শহরে লোকসংখ্যা এত অধিক বাড়িয়াছে যে ট্রাম ও বাসের বর্ত্তমান অবস্থায়

মানুষ যাতায়াত করিতে পারে না। সেজন্য হয় রাস্তা হইতে কয়েক ফুট উপর দিয়া না হয় মাটির নীচ দিয়া রেল চালাইয়া যাত্রী বহনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের শহরগুলিতে দুইরূপ ব্যবস্থাই বহাল আছে। লণ্ডনে মাটীর নীচের রেলপথ তাহার পরিবহন সমস্যাকে সহজ করিয়াছে। আমাদের দেশে সেইরূপ কিছু হইলে লোকের দুঃখ-কষ্ট কিছু কমিতে পারে। দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

হরিদ্বারে নূতন কারখানা—

গত ৩রা জানুয়ারী শিল্প মন্ত্রী শ্রীডি, সঞ্জীবায়া হরিদ্বারের নিকট রাণীপুর গ্রামে একটি বিশ্বের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ কারখানা তৈয়ার করিতে ৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। হরিদ্বার অঞ্চল পর্বত ও নদী বহুল। এতদিন সেদিকে কোন কারখানা ছিল না। বহু নূতন রাস্তা নির্মিত হওয়ায় দূরের পাহাড় হইতে লোকজনের হরিদ্বার যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। এই সকল সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া এবং জল ও বিদ্যুৎ অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া ভারত সরকার এই স্থানে নূতন কারখানা নির্মাণের চিন্তা করিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তক সমস্যা—

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা এযুগে দারুণ সমস্যার বিষয়বস্তু হইয়াছে। যে যুগে কয়েকজন মাত্র নামকরা লেখকের লিখিত অল্পসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক ছিল সে যুগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণকে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না। কিন্তু এখন ডিসেম্বর মাসে প্রতি বিদ্যালয়ে এত অধিক সংখ্যক নমুনা পুস্তক প্রেরিত হয় যে স্কুল কতৃপক্ষ ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া যান। হয়ত তাহারা পরীক্ষা করিয়া কয়েকখানি ভাল ভাল পুস্তক পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে সকল বই যথাসময়ে নির্দিষ্ট দোকানে পাওয়া যায় না ফলে শিক্ষকগণকে আর এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সরকার নিজে যে সকল পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন সেগুলারও বণ্টন ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় ক্রেতাগণকে দিনের পর দিন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া হায়রান হইতে হয়। অথচ সরকারী কর্মচারীরাও পূর্ব হইতে পাঠ্য পুস্তক ছাপিয়া উপযুক্তভাবে বণ্টনের ব্যবস্থায় মনোযোগী হন না। শিক্ষা বিভাগের এই অব্যবস্থা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক অভিভাবককে নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট দিতেছে। শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা অধিকর্ত্তা যদি বৎসরের প্রথম দিকে এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হন তাহা হইলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে তাহাদিগকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না—জানুয়ারীতে ক্রেতাদেরও কষ্ট পাইতে হয় না। প্রতি বৎসর শুধু যুক্তিতর্ক করা হয় কিন্তু কাজের বেলায় কেহ অধিক অগ্রসর হন না। এ বিষয়ে বর্ত্তমান বর্ষের অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস বিষয়টি সম্বন্ধে সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করিতেছেন।

ডক্টর রাধাবিনোদ পাল—

গত ১০ই জানুয়ারী মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন উকিল ডক্টর রাধা বিনোদ পাল ৮১ বৎসর বয়সে কলিকাতার বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন এবং বহুবার জেনেভায় আন্তর্জাতিক উকিল সমিতিতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি সমাজে সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। এইরূপ অসাধারণ জীবন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্ট ভাল থাকিলে মানুষ যে অতি নিম্ন অবস্থা হইতে সমাজের উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে ডাঃ পালের জীবন তাহার একটি নিদর্শন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘকাল উকিল ছিলেন এবং বহু বৎসর বিচারপতির কাজও করিয়াছিলেন।

যদুনাথ রায়—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ভাগ্যকুলের যদুনাথ রায় ৯৫ বৎসর বয়সে গত ১৫ই জানুয়ারী তাহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের তিন ভ্রাতা রাজা শ্রীনাথ, রাজা জানকী নাথ ও রায় বাহাদুর সীতানাথ কলিকাতায় আসিয়া নানারূপ ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তাহারাই এ দেশে প্রথম দেশী ষ্টিমার কোম্পানী, পাটকল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। সীতানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র যদুনাথ প্রথম জীবন হইতে ঐ ব্যবসায়ের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

তাহারা যেমন অর্থ উপার্জন করিতেন তেমনি তাহার নানাভাবে সদ্‌ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। যে প্রমথনাথ এক সময়ে এককোটী টাকা দান করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন রাজা শ্রীনাথের একমাত্র পুত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র—

বিশিষ্ট আইনবিদ্‌ ও শিল্পপতি শ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র গত ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে তাহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন,তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতায় এটর্নীর কাজ করিয়াছিলেন এবং পরে সরকারী বড় বড় পদেও অনেকদিন কাজ করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি বহু ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন।

পরলোকে পণ্ডিতকুলশিরোমণি রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বিদ্যার্ণব—

সংযুক্ত বাংলার প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতকুলতিলক মেদিনীপুর জেলার কাঁথি নিবাসী ও কাঁথি দর্শন চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বিদ্যার্ণব, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত ১১।৮।৬৬ তাং বুধবার অপরাহ্ণ ৫টা ৩১ মিনিটের সময় তাঁহার কাঁথি চণ্ডীতলাস্থ বাসভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অগণিত বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদ, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, সাধারণ দর্শন, বৈষ্ণব-দর্শন, কাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ ও বিভিন্ন ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী অধ্যাপক হইয়াছেন। অর্ধ শতাব্দীর উর্ধ্বকাল যাবৎ পবিত্র অধ্যাপনাব্রতে তথা সুরভারতীর সেবায় এবং ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম, প্রাচ্যকৃষ্টি ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রচার ও প্রসারে এই ঋষি পণ্ডিত নিজেকে একনিষ্ঠভাবে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কাঁথি পণ্ডিত দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন গভঃ সংস্কৃত কলেজ (১৯৫০), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি (১৯১০), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি জুবিলী সদন (১৯৩৫), কাঁথি ব্রাহ্মণ সভা (১৯২৭), কাঁথি বেদ বিদ্যালয় (১৯২৫) প্রমুখ বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নয়নে তাঁহার আজীবন প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম কৃতজ্ঞচিত্তে চিরস্মরণীয়। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। দেশবরেণ্য ঋষি চরিত্র এই শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, সুকবি ও সুবক্তার তিরোধানে দেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে বিপুল ক্ষতি হইল তাহা সত্যই অপূরণীয়।
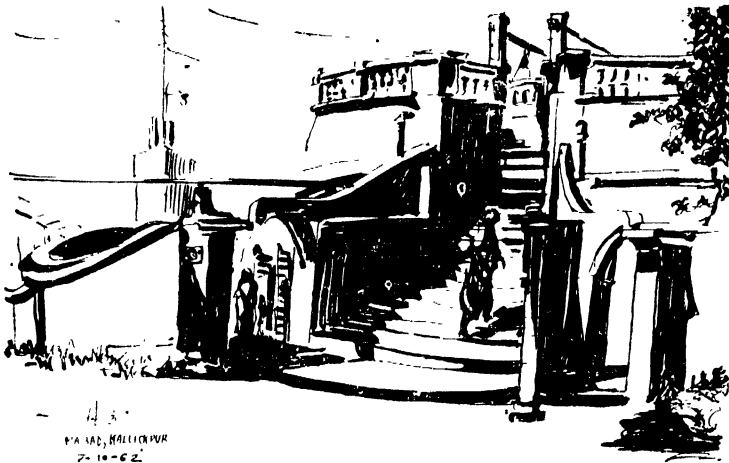
নির্ব্বাচন ঃ একটি নিরীক্ষা

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রী ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য অন্যবারের মতন একেবারেই নির্ব্বিঘ্নে হয় নি, হিংসাত্মক কার্য্য এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটেছে। এবারের নির্ব্বাচন ছিল বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এই প্রথম নির্ব্বাচন। আগের তিনটি নির্ব্বাচনে শ্রীনেহেরুর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কংগ্রেস দলকেই শুধু শক্তিশালী করে তোলে নি, ভোটদাতাদিগকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও অকস্মাৎ পরলোকগমন করায় কংগ্রেস দলে নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয় এবং দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে সুরু করে। অবশ্য দলাদলি শ্রীনেহেরুর জীবিতকালেই আরম্ভ হয়েছিল, তবে তাঁর এবং শ্রীশাস্ত্রীর অবর্ত্তমানে তাহা আরও প্রকট হয়ে পড়ে। নেহেরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রীত্বে অভিষিক্ত করা হয় নেহেরুর কন্যারূপে পিতার জনপ্রিয়তার কিছুটা লাভ করতে পারবেন বলে এবং পিতার সংগঠন শক্তির পরিচয়ও কিছুটা দিতে পারবেন বলে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দায়িত্ব হয়ত ঠিকমতই পালন করেছেন, কিন্তু তবুও কংগ্রেসের ভিতরের দলাদলি বন্ধ করতে পারেন নি। তাই দেখা গেল উত্তর প্রদেশে, বিহারে, উড়িষ্যায়, এবং পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস দল অন্তর্বিরোধে বিশেষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। বিরোধী কংগ্রেসীরা নতুন দল গঠন করে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং বহু স্থানেই এই বিরোধী কংগ্রেসীরা জয়লাভও করলেন।

মাদ্রাজে ডি-এম-কে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। এই রাজ্যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের এক ছাত্র নেতার নিকট পরাজয় ঘটেছে। ইহাই চতুর্থ নির্ব্বাচনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা চলে। সাধারণ একজন ছাত্র নেতার কাছে অসীম প্রভাবশালী কংগ্রেস সভাপতির অপ্রত্যাশিত পরাজয় সারা ভারতে আলোড়ন তুলেছে বলা চলে। ডি-এম-কে দলভুক্ত এই ছাত্রনেতা শ্রীনিবাসন হিন্দী ভাষাকে দাক্ষিণাত্যে চালু করার বিপক্ষে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই হিন্দী ভাষার বিরোধিতাই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং শ্রীকামরাজ সরকার পক্ষের হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দীকে চালু করিবার চেষ্টা করছেন এইরকম মতের সৃষ্টি হওয়াতেই মনে হয় শ্রীশ্রীনিবাসন শ্রীকামরাজের অপেক্ষা বেশী ভোট পেয়েছেন। আশা হয় এই ফলাফল থেকে উৎকট হিন্দী অনুরাগী হিন্দী ভাষীদের চৈতন্যোদয় হবে এবং ভবিষ্যতে অহিন্দী ভাষীদের উপর হিন্দী চাপাবার অবিরাম চেষ্টায় তাঁরা ক্ষান্ত দেবেন। যাই হোক শ্রীকামরাজের এই পরাজয় কংগ্রেস শক্তির উপর এক বিরাট আঘাত বলা চলে। উত্তর-পূর্ব্ব বোম্বাই এলাকায় এক মর্য্যাদার লড়াইয়ে শ্রীভারবের নিকট আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণমেননের পরাজয়ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমেনন কংগ্রেস টিকিট না পাওয়ায় নির্দলীয় সদস্য রূপে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীভারবের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেনন-বিজয়ী ভারবে ৭ই মার্চ নয়াদিল্লীতে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেছন।

পশ্চিমবঙ্গেও এই রকম অপ্রত্যাশিত ফলাফল কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতা এবং পার্লামেণ্টের সদস্য ও সর্ব্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষের পরাজয় এবং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের তাঁর নিজ এলাকা আরামবাগে বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট পরাজয় বরণ। আরও অনেক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং বিরোধী নেতার পরাজয় ঘটলেও এই দুইটি ফলাফলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীঅমিয়নাথ বসুর নিকট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরাজয়ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্ত বসু কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপালের নিকট কাশীপুর কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু বারাসত কেন্দ্রে তিনি জয়লাভ করেন। শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীমতী আভা মাইতি,

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা নির্বাচনে জয়লাভ করলেও, কংগ্রেস ২৮০টি আসনের মধ্যে ১২৭টি আসন লাভ করায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জনে অসমর্থ হন। অবশ্য একক দল হিসাবে কংগ্রেস অন্য দলগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। কিন্তু অ-কংগ্রেসী দল-গুলি যুক্ত হয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন (যা তাঁরা নির্বাচনের পূর্ব্বে করতে পারেন নি) এবং যুক্তভাবে কংগ্রেস অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে রাজ্যপালকে জানান তাঁরা সরকার গঠনে প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও এই যুক্তফ্রন্টের নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জিকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানান এবং শ্রীঅজয় মুখার্জ্জির নেতৃত্বে ফ্রন্টের অন্যান্য দল-গুলির নেতাদের নিয়ে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

ভারতের আরও চারটি প্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তিনটি সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এই প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হল। কেরল, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যাতেও অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হবেও। রাজস্থানে মনে হয় রাষ্ট্রপতির শাসনই প্রবর্ত্তিত হবে।

যাই হোক, এই চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচন যে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। নির্ব্বাচনের পূর্বে নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী অবস্থা যে এই রকম দাঁড়াবে তা অনেকেই আশা করেন নি। বিশেষ করে কংগ্রেস পক্ষ তো ভাবতেই পারেন নি যে এতগুলি রাজ্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করতে পারবেন না। শুধু কেরল সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ ছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সমেত আরও কয়েকটি রাজ্যে যে কংগ্রেস পরাস্ত হবে তা অনেকেরই ভাবনার বাহিরে ছিল। কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাই সম্ভব হয়েছে।

এখন কংগ্রেসের এই পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে কংগ্রেস পক্ষে এবং অন্য পক্ষেও আলোচনা চলছে। কংগ্রেস হয়ত মনে করছেন তাঁদের সংগঠনের ত্রুটির জন্যেই এই বিফলতা এসেছে। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায় যে শুধু সংগঠনিক ত্রুটিই নয়, আরও অনেক কিছু আছে যা কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য দায়ী। সাধারণ মানুষে চায় দু'বেলা পেটভরে খেতে, আর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সহজে লাভ করতে। কিন্তু কংগ্রেস যে সব রাজ্যে পরাস্ত হয়েছে, সেই সব রাজ্যে খাদ্যবস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা, বিশেষ করে চালের দুর্মূল্যতা এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির ঊর্দ্ধগামী দর সাধারণ মানুষের মনকে বহুলাংশে কংগ্রেস শাসনের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। বিরোধী পক্ষের অবিরাম প্রচার ও আন্দোলনও মানুষের মনকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছিল। এর ওপর কংগ্রেস সরকার জন-সংযোগের দ্বারা এই সব আন্দোলনের সুরাহা না করে জোর করে এই সব আন্দোলন দমন করতে গিয়ে জনসাধারণের আরও বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। জন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে কংগ্রেস সরকার যেন একঘরে হয়ে পড়েন। অপর পক্ষে বিরোধীদলগুলি সভা, শোভাযাত্রা, আন্দোলন, ধর্ম্মঘট প্রভৃতির দ্বারা সরকারকে আরও বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করে তোলেন। খরা ও অন্যান্য কারণে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটায় কংগ্রেস সরকারও প্রয়োজন মত খাদ্য যোগান দিতে অসমর্থ হন। এর ওপর কঠোর শাসনের অভাবে সর্ব্বত্র দুর্নীতি প্রবেশ করে—নিয়ম শৃঙ্খলারও অভাব প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই দেখা যেতে থাকে। দীর্ঘকালেও এই সব অব্যবস্থার কোনও প্রতিকার না হতে দেখে সাধারণ মানুষের মনে শাসক পরিবর্ত্তন করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং সেই জন্যই বহু 'ভোট' বিরোধী দলগুলির প্রার্থীরা লাভ করেছেন।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এবং আরও চারটি রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের প্রধান দু'টি কারণ হল—(১) খাদ্য সমস্যা সমা-ধানে অসমর্থতা এবং (২) দলের মধ্যে ভাঙ্গন। আগেই বলেছি এই দলের মধ্যে ভাঙ্গনই কংগ্রেস দলকে অনেক স্থলে বিশেষ করে দুর্ব্বল করে দিয়েছিল। বিরোধীদল-গুলির সম্মিলিত শক্তি যা করতে পারে নি, কংগ্রেস দলের নিজেদের মধ্যের বিরোধ তাই করেছে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে আসা নেতারা যে "বাংলা কংগ্রেস" দল গড়ে তোলেন তা এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস শক্তিকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করে কংগ্রেসের বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীহুমায়ুন কবীর প্রভৃতি নেতাদের যদি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য না করা হত তাহলে "বাংলা কংগ্রেস"-এর জন্ম

সম্ভব হত না এবং কংগ্রেস শক্তিও হয়ত এই নির্ব্বাচনে পরাস্ত হত না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস যে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি তার মূলে আছে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতারাই—একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না, অর্থাৎ কংগ্রেসের হাতেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে!

যাই হোক, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে 'কোয়ালিশন্' মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলেই মনে করি। নির্ব্বাচন-পর্ব্বে বামপন্থী বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলেও নির্ব্বাচনের পরে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে তাঁরা একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন তার জন্যে তাঁদের অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি তাঁরা এই ঐক্য বরাবরই বজায় রেখে চলতে পারবেনই শুধ্ নয়, তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসংখ্য সমস্যা-জর্জ্জরিত এই দুর্ভাগা পশ্চিমবঙ্গের প্রভূত উন্নতি সাধনে সমর্থ হবেন।

আজ ইংরাজ কবির বাণী মনে পড়ছে—"Old order changeth yielding place to new, lest one good custom should corrupt the world."

নতুন সরকার নব উদ্যমে, নানা প্রচেষ্টার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় নবীনতা এনে সজীব করে তুলুন শাসন যন্ত্রকে। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই প্রার্থনাই করি। আর কংগ্রেসদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েও প্রথমেই যে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা সরকার গঠন করবেন না, তাঁরা বিরোধীদলরূপেই কাজ করতে চান—তাঁদের এই দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন সুচিন্তিত কার্য্যের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশাকরি সুশৃঙ্খল, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, যোগ্য বিরোধী দলরূপে তাঁদের গণতান্ত্রিক কার্য্যের মাধ্যমে, বিরোধী দলের কি ভাবে কাজ করা উচিত তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তাঁরা স্থাপন করবেন।

দেহান্তর

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়—মন—প্রেম
আত্মগোপন রয়েছে—
তুলতুলে কয়েক তাল
রক্ত মিশ্রিত মাংসের মধ্যে!
লজ্জা চেয়েছে অন্ধকারের
চির সঙ্গিনী হ'তে,
আলোর সাথে নিত্য বিরোধ
কেননা সভ্যতার আলোর কাছে
আসামী রূপে জবাব দিতে অস্বীকার।
অগভীর থেকে গভীরে
অসুন্দর পরিবেশ সুন্দরের স্বর্গ,
কাছ হ'তে আরো কাছে
আহ্বান—কতো শতো আহ্বান!
উত্তেজনা—আত্মতৃপ্তি—ক্লান্তি
শাশ্বতমানবের সূচিপত্রে
গেঁথে দিলে বুঝি আরেকটি নাম—
দুটি মন—দুটি প্রাণ—দুটি দেহ প্রতীক
বিশ্ব শিশু যার পরিচয়॥

কামনা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

যৌবন যখন থাকে করে সবে যৌবন সাধনা।
　　তারপর আরেক কামনা
যৌবন যখন যায়, যায় যায়—
　　তখন প্রার্থনা,
ঝরে-যাওয়া পাতা দলে
ঝরে আয়ু পলে পলে
　　বসন্ত মিলায়
　　তখনো কুলায়
পাখিদের কলকণ্ঠে বিদায়ের গান।
রজনীগন্ধার দলে কি সর চেতনা?
　　ভ্রমরের মত্ত আনাগোনা
বিগত বসন্ত-শোক
　　সেতারের করুণ মূর্চ্ছনা।
তবু আছে আরো কিছু এই শেষ নয়।
　　বিগত যৌবন ফিরে আরেক প্রার্থনা
　　আরেক ফাগুন-গান
　　পাখিদের কলতান
কবিকণ্ঠে বার বার জাগায় আহ্বান॥

হাওয়া-বদল

অবহেলিত-জনসাধারণ : বলি, এতকাল তো মুখ বুজে আধপেটা খেয়ে, দুর্নীতির দাপট সহে চড়া-দামে চরম-অপমান বরদাস্ত করে রিক্ত-ভিখারীর মতো নির্ম্মম দুর্ভোগ-যন্ত্রণা ভুগে আসছি!...এবার আবার কোন অজানা-পথে টেনে নিয়ে চললেন, দাদা?

যুক্ত-ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা : এতকাল তো দেখলে নানান সোরগোল!...মিছে আলোচনায় লাভ কি ভাই!...বরং এসো...হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলি আমরা...হাওয়া যখন বদলেছে এবার!...
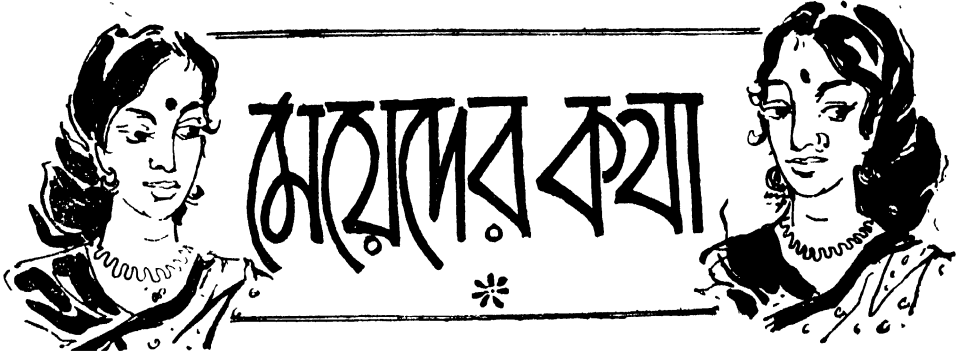
অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

একটি বিচিত্র প্রতিশোধ

কারা যেন বলছিল, ওই খালি বাড়ীতে তোমরা কেউ যেওনা।

প্রথম স্বপ্নারা বাড়ী খুঁজতে এলে—ওই খালি বাড়ীটা দেখে পছন্দ হয়। ছোট্ট একতলা বাড়ী। যদিও পুরোন দিনের ইমারৎ, তবু, একটা ঐতিহ্য ছিল বাড়ীটার মধ্যে।

আর এই শহর কলকাতার কোথাও বাড়ী তো দূরের কথা একখানা ঘর খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর ব্যাপার ছিল। যদিও এই খালি বাড়ীটার অপ্রত্যাশিত খবরটা দিয়েছিল—এক বুড়ো দালাল।

দেখতে একটু অদ্ভুত মতন। ভারি রহস্যময় চেহারা। প্রায় ইশারায় ইঙ্গিতে সে কথা বলতো। স্বপ্নার যেন দেখে কেমন লাগতো। কিন্তু স্বপ্নার স্বামী সুশান্ত বললো, যাই হোক যেমন দেখতেই হোক লোকটা আমাদের উপকারই করলো। ওই ছোট একানে বাড়ীটা আমাদের দু'জনের থাকার পক্ষে বেশ হবে কিন্তু স্বপ্না।

যেদিন ওরা বাড়ী দেখতে এলো, দু একজন অপরিচিত লোক সেই বাড়ীর আশে পাশেই থাকে তারা উপযাচক হয়ে এসে জানালো—বাড়ীটা নেবেন না, অভিশপ্ত ভিটে। কোন ভাড়াটে এসে তিন দিনের বেশী থাকতে পারেনা।

স্বপ্নার মনে সত্যিই একটা ঝড় উঠেছিল। কিন্তু সুশান্ত প্রায় হেসে উড়িয়ে দিল ওদের কথাটাকে। বললো, মশাই যা বলতে চাইছেন তা হোল যে ভূতের বাড়ী। তা ও' রকম বাড়ীতে আমার থাকার অভ্যেস আছে।

তার পরই ওরা এসে উঠলো সেই বাড়ীটাতে। সত্যি বাড়ীতে প্রবেশ করে—স্বপ্নার খুব আনন্দ হোল। সংশয়টা কেটে গেল। চারদিক খোলা মেলা—মাত্র খান তিনেক সাজানো ঘর। সামনে প্রশস্ত উঠোন তার ওপর খোলা আকাশ, হু-হু করা বাতাস। যেন একটা স্বপ্ন—পৃথিবীর এক প্রান্তে ওরা এসে পরেছে।

সেই বুড়ো দালালটার মুখে শুনেছিল, বাড়ীর মালিক বৃদ্ধ উমেশবাবু দেওঘরে থাকেন। সেখানেও একটা তাঁর বাড়ী। এবং জায়গাটা স্বাস্থ্যকর ও নিরিবিলি বলে সেখানে থাকেন বারো মাসই। ভাড়াটা মনিঅর্ডার করেই তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বেশ কয়েকটা দিন ওদের নিরুপদ্রবে কাটলো। নির্বিঘ্নে কেটে গেল কয়েকটা রাত। স্বপ্না বললো—দেখেছো কেমন সুন্দর একটা বাড়ী—আর ওই লোক-গুলো কেমন বাধা দিতে এলো—যেন ওদের আর ঘুম হচ্ছে না।

সুশান্ত হেসে উত্তর দিল—তাই হয় স্বপ্না! হিংসুটে লোকেরা আসে এমনি করে বাধা দিতেই। নিশ্চয় ওরা এই বাড়ীটা চেয়ে পায়নি। উমেশবাবু, হয়তো এই সব

প্রতিবেশীদের ভাল করে চেনেন বলেই—এদের ভাড়া দেননি, কাজেই আমাদের ভাংচি দিতে এসেছিল।

স্বপ্নাও সায় দিল ঐ কথায়।

এর পর, বোধ হয় সপ্তাহখানেক গেছে। শনিবারের এক মধ্যরাতে একটি শিশুর চাপা গোঙানো আর্তনাদের মত আওয়াজ শুনতে পেয়ে সহসা সুশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্না তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে তার পাশে। ব্যাপারটাকে জানবার জন্যে সুশান্ত একটু তৎপর হোল। ঐ ব্যাপারে সে বরাবরই দুঃসাহসী। অলৌকিক কোন অস্তিত্বের গন্ধ পেলে সে অমনি একটা আবিষ্কারের চেষ্টায় লেগে যায়।

সেই মধ্য রাতে সুশান্ত বিছানায় সোজা উঠে বসলো। ঘর-অন্ধকার। স্বপ্নার যাতে ঘুম না ভাঙে—সেই ভাবে সে নিঃশব্দে রইলো কেননা, স্বপ্না কিছু টের পেলে—তেমনি কেঁদে চিৎকার করে উঠবে। আর সুশান্তর এদিকে অলৌকিক রিসার্চটাই মাটি হয়ে যাবে!

যাইহোক আবার শিশুর কান্নাটা শোনা গেল। মনে হোল বাড়ীর উঠোনের ওপাশে একটু বাগানের মত রয়েছে যে জায়গাটা—ঠিক সেইখান থেকে আওয়াজটা যেন আসছে। ওখানে একটা পেয়ারা গাছ রয়েছে। মনে হোল—একটা প্রবল দমকা বাতাসে গাছের পাতা পড়ার শব্দ শোনা গেল—ঠিক তার পরেই।

কিন্তু শিশুর কান্নাটা এ' বাড়ীতে কেন শোনা যাচ্ছে? সুশান্তর মনে হোল হয়তো বা ভুলও হ'তে পারে—পাশের বাড়ী থেকে হয়তো কাঁদছে কোন শিশু! কিন্তু কান্নাটা ঠিক উচ্চরবে নয়। একটু চাপা, গোঙানোর মত।

ঠিক তার পরেই, মনে হোল ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে নিমেষে কে সরে গেল এবং হাতের এক গোছা চুরির শব্দ হোল।

তার পরেই নারী কণ্ঠের উল্লসিত হাসি সমস্ত নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে যেন চমকে দিল। সুশান্তর কেন জানি সে সময় বেশ ভয় হোল। অশরীরী অস্তিত্ব যে আছে সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো। এবং বোঝার পরই তার ভয় হোল।

সমস্ত রাত ধরে প্রায় এই কাণ্ড চললো। আতঙ্কে শেষ পর্যন্ত তার ঘুম হোল না। রাত যখন শেষ হয়ে গেল, ভোরের আলো উঁকি দিল, তখনই সুশান্ত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো।...

স্বপ্নাকে সে কিছুই জানতে দিলনা। কিন্তু সকালে পাড়ায় বেরিয়ে গিয়ে সেই লোক গুলোর একজনকে ধরলো, যারা এ বাড়ীতে না আসার জন্য বলেছিল।

ভদ্রলোকের নাম রমাপদ। তিনি সব শুনে হেসে বললেন ওই তো ব্যাপার! বিশ বছর আগে যে ঘটনা ঘটে গেছে—আজও তার ভৌতিক লীলা চলছে। যারাই আসে তারাই বলে এই কথা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? সুশান্ত সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে।

'ব্যাপার মশাই অনেক। আর আজকের ব্যাপার নয়। আমিও তখন ছোট। বাবা মার মুখে শুনেছিলাম—ওই উমেশবাবুদের কাণ্ড। আর এই বাড়ীর লাগোয়া তো আমাদের বাড়ী কাজে কাজেই অন্দরের খবরটা পর্যন্ত আমরা পেতাম।' বলে রমাপদ একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বিশ বছর আগের ঘটে যাওয়া যে গল্পটা বললেন তা শুনে সুশান্তর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। গল্পটা হোল এই:—

বাড়ীওলা উমেশবাবু তখন যুবক। সবে ওই বাড়ীটা করেছেন। বিয়ে করে মনের মত সংসার পাতলেন। পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল তাঁর একমাত্র আপন জন। বিয়ের ঠিক বছর দুই পরে, একটি সন্তান হতে গিয়ে স্ত্রী মারা গেল।

সন্তানটি বেঁচে রইলো। স্ত্রীকে তিনি অসম্ভব ভাল বাসতেন। কাজেই এই অভাবনীয় আঘাতে তিনি প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছিলেন।

আর স্ত্রীর এক খানাও ফটো ছিলনা বলে, তিনি আরো পাগলের মত হয়ে গেলেন। সেই একটি মুখ সব জায়গায় খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু কোথাও পাওয়া যেতনা। আসলে যে জিনিস হারায় ঠিক সে জিনিসটা আর আসেনা। এই সত্যকে বুঝতে তাঁর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল।

সেই তাঁর শিশু সন্তান—অর্থাৎ তাঁর একমাত্র কন্যাটি বড় হয়ে উঠেছিল। তার বছর চারেক যখন বয়স তখন একটা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় উমেশবাবু বিয়ে করে বসলেন। যদিও তিনি কোন সুন্দরীকে বিয়ে করেন

নি। শুধু মাত্র সংসার রক্ষা এবং শিশু সন্তানের সম্পূর্ণ দায়িত্বের জন্য তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিল।

মেয়ের নাম রেখেছিলেন পাখী। পাখীর মৃত মায়ের নাম ছিল রাখী। তার সংগেই মিলিয়ে নামটা রেখেছিলেন উমেশবাবু। আর আশ্চর্য পাখীকে দেখতে হয়েছিল ঠিক ওর মায়ের মত। অপূর্ব সাদৃশ্য ছিল মা-মেয়ের চেহারায়।

উমেশবাবু অনেক দিন পর যেন তাঁর রাখীকে খুঁজে পেলেন পাখীর মধ্যে। অন্ধ স্নেহে কন্যার প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ থাকতেন। মেয়েকে কোথাও এক পলকের জন্য চোখের আড়াল করতেন না।

এমন কি নতুন বিয়ে করা স্ত্রী সরসীকে পর্যন্ত সন্দেহ করতেন। তাঁর অনেক সময় ধারণা হোত তাঁর চোখের আড়ালে পাখীর সৎমা পাখীকে কষ্ট দেয়। এ জন্য মাঝে মাঝে তিনি স্ত্রীর প্রতি এমন রূঢ় ব্যবহার করতেন এবং যে অকথ্য নির্যাতন করতেন তাতে সরসীর মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সে সত্যিই ভাল বাসতো পাখীকে। এমন কি তাকে গর্ভজাত সন্তান বলেই মনে করতো। কিন্তু স্বামীর মনের অকারণ সন্দেহ বিষ তাকে শান্তি দিতনা। উমেশবাবুর ধারণা ছিল ছোট্ট পাখী কিছু বলতে পারেনা বলে—সরসী যা খুসী তাই করে তার ওপর।

প্রতিদিনই অফিস থেকে এসে কোন না কোন কারণ দেখিয়ে স্ত্রীকে নির্মম যন্ত্রণা দিতেন। সরসী প্রথম প্রথম খুব কাঁদতো। স্বামীর অপবাদ নীরবে সহ্য করে নিতো।

কিন্তু এমন একদিন এলো, যেদিন আর সরসী বিশ্বাস করতে পারল না সত্যি সে নিষ্পাপ, পাখীকে ভালবাসে। ধীরে ধীরে তার ভেতরে যে ঈর্ষা, যে ক্রোধ জাগছিল সেটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়লো পাখীর ওপর। একসময় তারও বদ্ধমূল ধারণা হোল—ওই পাখী তার জীবনের সমস্ত যন্ত্রণার মূল। পাখীকে নিয়েই স্বামী তাকে অকারণেই নির্যাতন করে।

এই বিশ্বাস যখন তার বদ্ধমূল হোল তখনই তার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল এক বিচিত্র প্রতিহিংসা!

মনে হোল ওই পাখী যদি না থাকতো নিশ্চয় তাকে স্বামী ভালবাসতো! নিশ্চয় তার পূর্ব স্ত্রীর কথাও ভুলে যেত। ওই পাখীর মধ্যে রাখী যেন এসে তার স্বামী, সংসার, সুখ, সবই কেড়ে নিচ্ছে—তাকে এক মুহূর্তও শান্তি দিচ্ছে না।

একদিন কি ভাবে যেন মরীয়া হয়ে উঠলো। দুপুরে বাড়ীতে কেউ থাকতো না। সে আর ছোট্ট পাখী থাকতো—উমেশবাবু অফিস গেলে।

কি একটা বিশ্রী দুপুর যেন নেবে এসেছিল। খেয়ে-দেয়ে পাখী ওর বাবার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছিল··· সেদিন ওর সৎ মা ওকে অনেক জিনিস রান্না করে খাইয়েছিল। যে দাসীটা ওদের বাড়ীতে ঠিকে কাজ করতো সেই দেখেছিল—পাখীকে পাত সাজিয়ে ওর মা খাওয়াচ্ছে।

চার বছরের মেয়ে সেদিন কি আনন্দে খাচ্ছিল··· সৎ মা ওর পিঠে হাত বুলাচ্ছিল। নিজে হাতেও কখনো খাইয়ে দিচ্ছিল। তারপর, আর কিছু জানে না দাসী।

সেদিন সন্ধ্যেতে উমেশবাবু অফিস থেকে ফিরে প্রথম ডাকলেন পাখীকে। পাখীর জন্য সেদিন এনেছিলেন অনেক খেলনা, অনেক খাবার। কেন না তারই পরের দিন পাখীর জন্মদিন। আর রাখীর মৃত্যুদিন।

আনন্দ আর বিষাদে ভরা আগামী দিনটার একটা বড় আয়োজন করে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন। কিন্তু পাখীর সাড়া পেলেন না। সরসী ম্লান মুখে জানালো পাখী পালিয়ে গেছে দুপুরে তার ঘুমনোর অবসরে—পাখী দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেছে।

পাখী অবশ্য এমন মাঝে মাঝে করতো। ভারি দুষ্টু ছিল। কোন সাথীর ডাক শুনতে পেলেই বেতের ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে তার উপর উঠে টপ করে খিল খুলে পালাতো—ওই দূরের মাঠে। উমেশবাবু তাকে ধরে নিয়ে আসতেন। কোলে তুলে আদর করে বলতেন—'পাখী, তুমি আর কখনো এমনি করে পালিয়ে যেও না। আমি ভীষণ কাঁদবো কিন্তু।'···

অবশ্য পাখী কোনদিনই দুপুরে খিল খুলতো না। ওর বাবা যখন বাড়ী থাকে তখনই পাখী এমনি করতো। ওই-টুকু মেয়ে হয়তো বুঝতো, সে পালিয়ে গেলে বাবা তাকে ধরে আনবে। বুকে তুলে আরো যেন কত আদর করবে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ পাখীর কি হোল? সরসী বললো, কখোন যে তার ঘুমের অবসরে পাখী পালিয়ে গেছে সে

জানেনা। ঘুম ভেঙে দেখে পাখী নেই। দরজা খোলা। দাসীটা কাজ করতে এলে তাকে পাঠায় খুজতে কিন্তু সেও খুঁজে পায় নি।

এরপর, উমেশবাবু, স্ত্রীর ওপর কটুকথা বর্ষণ করে পাখীকে খুজতে বেরোলেন পাগলের মত। কিন্তু কোথায় পাখী? পাখীকে কোথাও খুজে পাওয়া গেল না। যেন এ পৃথিবীর খাঁচা খুলে সে পালিয়েছে কোন দূর বনে।

উমেশবাবুর তার পরের অবস্থা প্রায় বর্ণনাতীত। পাগলের মত তিনি স্ত্রীকে মারধোর পর্যন্ত করতে লাগলেন। কেন সে একটু নজর রাখেনি পাখীর ওপর? পাখী কোথায় পালিয়ে গেল?

আর একদিন পাগলের মত বীভৎস হাসি হাসতে লাগলো সরসী। স্বামীর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে বললো 'চল পাখী কোথায় আছে তোমায় দেখিয়ে দিই।'

বলতে বলতে সে স্বামীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল উঠোনের ওপাশের ঝোপের দিকে। পেয়ারা গাছটার নীচে—একটা বড় বস্তার মুখ সে খুলে দেখালো পাখীকে। ঠিক তার নিরুদ্দেশের তিনদিন পর।

উমেশবাবু হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বস্তার মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে থাকা—কার যেন একটা ছোট্ট শরীর বস্তার ভেতর ডুবে আছে। সরসী হাসতে হাসতে বস্তা থেকে টেনে বার করলো একটা মৃতদেহ।

ওকি! পাখী? পাখী? পাখী? বলে উন্মাদের মত চেঁচাতে লাগলেন উমেশবাবু। যেন জ্ঞান হারার মত সারা বাড়ীময় ছুটোছুটি করে চিৎকার করতে লাগলেন।

সরসীও পাখীর মৃতদেহটা দেখিয়ে শুধু একটা কথাই বারবার বলতে লাগলো—'পাখীর গলা চেপে ধরতে গুমরে গুমরে একটু কাঁদলো। তারপর চুপ করতে তাকে বস্তায় পুরে ফেললাম। ব্যস, আর চেঁচালো না। পাখী পালিয়েছে···পাখী আর নেই···।'

বলে প্রাণ ফাটিয়ে হাসতে লাগলো। উমেশবাবুর চিৎকার শুনে পাড়ার সকলে ছুটে এসেছিল। তারা দেখলো দু'টো উন্মাদ মূর্তি। দু'জনের বিলাপ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে।···

আর পাখীর মৃতদেহটা পড়ে পেয়ারা গাছের নীচে। তার ওপর দু'টো কাক বসে ছিঁড়ে খাচ্ছে পাখীর মাংস। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

গল্পটা বলে রমাপদ নিজেও যেন একবার শিউরে উঠলেন। সেই ভয়াবহ অতীত যেন সেই দৃশ্যকে নিয়ে এসেছে তাঁর চোখের সামনে।

আর সুশান্ত ভীত হতবাক! শুধু একবার জিজ্ঞেস করলো। তারপর?

রমাপদ আরো একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন—তারপর আর কি! সরসী তো একেবারে ম্যাড! তাকে পাঠানো হোল পাগলা গারদে।

আর কিছুদিন পরে উমেশবাবুও খানিকটা সুস্থ হয়ে দেওঘরের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই যে, সেই বিশ বছর আগের খুনের ঘটনা—আজও যেন মধ্যরাতে ঘটে এবং তার কি উদ্দেশ্য ঠিক জানা যায়না। সেই খুনের বাড়ীটা এখন স্রেফ ভূতের বাড়ী হয়ে গেছে। তবু আপনাদের অনেক ধন্যবাদ পুরো একটা সপ্তাহ কাটিয়েছেন। এর আগে যারা এসেছে তারা তো তে-রাত্তিরও পার করেনি। বলে, বিচিত্র হাসি হাসলেন তিনি।

সুশান্ত এবার দৃঢ় গলায় বললো—'আর নয়। আজই আমি বাড়ী ছাড়ছি। আর আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!' বলে সুশান্ত বাড়ী ঢুকে—মাল পত্তর গোছাতে লাগলো।

স্বপ্না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'কি ব্যাপার?'

সুশান্ত বললো—বাড়ী ছেড়ে গিয়ে ব্যাপার বলবো। এখন তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও তো!···

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যায় শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্তের "রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী" প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

স্বপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিলাসী সৌখিন নর-নারীদের রূপচর্চ্চা এবং অঙ্গরাগ প্রসাধনের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ ছিল—বিভিন্ন ধরণের গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈলাদি, গন্ধ-বারি ও সুরভিত চূর্ণ প্রভৃতির ব্যবহার। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই মোটা-মুটি হদিশ দিয়েছি।

অঙ্গে সুগন্ধি তৈল-চন্দনাদি অনুলেপন ছাড়াও, বিবিধ ধরণের গন্ধ-বারি ব্যবহারে স্নান এবং স্নানান্তে বিভিন্ন সুরভিত চূর্ণ সহকারে গাত্র সুবাসিত করার রীতি যে প্রাচীন ভারতীয় বিলাসী সৌখিন সমাজে সবিশেষ সমাদর ও প্রসারতা লাভ করেছিল—মহাকবি কালিদাস, কাহিনীকার বাণভট্ট প্রভৃতির অমর-রচনাবলীতে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কবি কালিদাস-রচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যে—অভ্যঙ্গের পর 'লোধ্রচূর্ণ' ব্যবহারে অঙ্গ মার্জ্জনা ও গাত্র চর্ম্ম থেকে অনুলেপিত তৈল সাফ করা এবং 'কালেরক' নামে বিশিষ্ট এক ধরণের সুগন্ধি দ্রব্যেরও উল্লেখ আছে। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের বিলাসী সৌখিন নর-নারীদের মধ্যে 'হস্থস্' বা 'উশীর' ব্যবহারেরও খুবই সমাদর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার বাৎস্যায়নের প্রসাধনীবৃত্তে, বাগান-জমিতে 'উশীর' রোপণ করা সুগৃহিণীপণার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে উল্লিখিত আছে। এমন কি, বিলাসী সৌখিন নর-নারীদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে রাত্রে শয়নকালে শয্যাপার্শ্বের বেদিকায় 'Scent-box' বা 'সৌগন্ধ-পুটিকা' রাখার রীতি সম্বন্ধেও মনীষী বাৎস্যায়ন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন।

সৌগন্ধ পুটিকায় 'Pomade' জাতীয় সিক্থ-করণ্ডক-পাত্রাদি রাখার ব্যবস্থা রীতি দেখে, সহজেই ধারণা হয় যে প্রাচীন ভারতীয় বিলাসী সৌখিন সমাজে তখন সিক্থ ব্যবহারও বেশ প্রচলিত ছিল। শুধু নৈশ শয্যাপার্শ্বে সিক্থ-করণ্ডক রক্ষাই নয়, উপরন্তু প্রাতে বসনভূষণে সজ্জাকালেও সিক্থ গ্রহণের রীতি অনুসরণ করার জন্য শাস্ত্রকার বাৎস্যায়ন সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সেকালের এই 'সিক্থ' প্রসাধনী উপকরণটি সাধারণতঃ মোমের সাহায্যে প্রস্তুত করা হতো। এবং এটির অপর নাম ছিল —'মধুচ্ছিষ্ট'। কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যেও বিশিষ্ট প্রসাধনী উপকরণটির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন :—

"রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ কিঞ্চিন্মধুচ্ছিষ্ট-
বিমৃষ্টরাগঃ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যাদাসন্নলাবণ্যফলোঽধ-
রোষ্ঠঃ॥
(কুমারসম্ভবম্ ৭·১৮)

সৌগন্ধ পুটিকা, সিক্থ-করণ্ডক প্রভৃতি প্রসাধনী উপকরণাদি ব্যবহারের মতোই প্রাচীন ভারতীয় বিলাসী সৌখিন সমাজে স্নানকালে গাত্র-মার্জ্জনার উপযোগী সুগন্ধি 'ফেনক' বা আধুনিককালের সাবান জাতীয় উপকরণও যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো, মনীষী শাস্ত্রকার সুশ্রুত ও বাৎস্যায়নের রচনাবলীতে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট নিদর্শন মেলে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কেশ রচনা এবং পুষ্প-মাল্য-ধারণও ছিল প্রসাধন-কলার অন্যতম অঙ্গ। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন গিরি-গুহা চিত্রে ভাস্কর্য্যে এ ধরণের প্রসাধন-চর্চ্চার বিবিধ নিদর্শন নজরে পড়ে। আগামী সংখ্যায় সেকালের এ সব প্রসাদন কলারীতি সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।
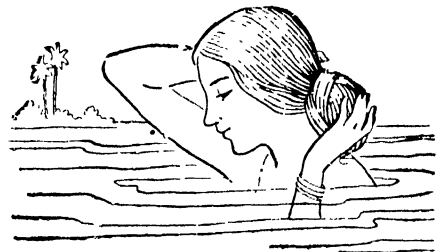
এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে অনেক মহিলাই আজকাল নানাধরণের সৌখিনসুন্দর সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা করেন। সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশেরই আবার বিবিধপ্রকার রঙবেরঙের বিচিত্র এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এজন্য তাঁদের যত্ন ও প্রয়াসের সীমা নেই। নিত্যই নতুন ও অভিনব ধরণের নক্সা-নমুনা রচনা এবং নানাধরণের বিচিত্র সেলাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণের দিকে তাঁদের যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা-অনুরাগ আর অদম্য-উৎসাহের দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে, তাই থেকেই সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়—এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পে পারদর্শিতা লাভের জন্য তাঁরা কতখানি আগ্রহান্বিতা। তাই সূচীশিল্পানুরাগিণী এই সব মহিলাদের সুবিধার্থে আপাততঃ, এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজের উপযোগী কয়েকটি বিশেষ ধরণের 'stitching' বা ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তোলার বিচিত্র-অভিনব কলা-কৌশল-পদ্ধতির প্রসঙ্গালোচনা ক'রছি। কারণ, মহিলাদের মধ্যে যাঁরা সচরাচর নিজের হাতে সেলাইয়ের কাজকর্ম করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে সুপটুভাবে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছুঁচ সুতোর ফোঁড় তোলার কলা-কৌশলের উপরেই সূচীশিল্প সামগ্রীর পারিপাট্য এবং রচনা-সৌষ্ঠব নির্ভর করে অনেকখানি। তাছাড়া সূচীশিল্প-সামগ্রীটিকে নিখুঁত-পরিপাটি ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে হলে, সুতী, রেশমী কিম্বা পশমী —কোন ধরণের কাপড়ের উপর কোন রকমের সুতো ব্যবহার করে কোন ছাঁদের নক্সা-রচনার জন্য বিশেষ-ধরণের কোন পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা একান্ত উপযোগী—সে প্রসঙ্গটিও সবিশেষ বিবেচনা করা দরকার। না হলে, অনেক যত্ন-পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে রচিত সূচীশিল্প-সামগ্রটি হয়তো এই অবিবেচনার দোষে শেষ পর্য্যন্ত 'শিব গড়তে বাঁদরের দশা' ধারণ করে নিছক পণ্ডশ্রমে ও হতাশায় পরিণত হবে। কাজেই সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা—বিশেষভাবে এমব্রয়ডারী-সেলাইয়ের কাজের সময়—এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মিহি-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাইকরলে এমব্রয়ডারী-নক্সাটি পরিপাটি সুন্দর হয়ে ওঠে—তেমনি অনেকক্ষেত্রে আবার মোটা-সুতোয় সেলাই করলে, এমব্রয়ডারী-কাজ বেশ মানানসই ও অপরূপ দেখায়।
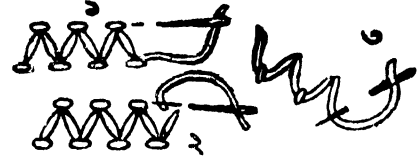
প্রসঙ্গক্রমে, উপরের ছবিতে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের বিশেষ উপযোগী তিন ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতির নমুনা দেখানো হলো। উপরের ১ এবং ২ নং ছবিতে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের যে বিশিষ্ট পদ্ধতির নমুনা দেওয়া হয়েছে, সে পদ্ধতির নাম—'শেভ্‌রন্‌-ষ্টিচ্‌' (Chevron Stitch)। এই ধরণের সেলাইয়ের রীতি হলো—ইংরাজী "V" অক্ষরের ছাঁদে সোজা এবং উ-ল্টাভাবে উপর-নীচে দুদিকেই সমান-সারিতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সূচীশিল্পের কাপড়ের বুকে আলঙ্কারিক-নক্সা, পাড় বা 'বর্ডার' (Border) রচনা করা।

উপরের ৩নং ছবিতে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের যে পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে, সেটির নাম—'ফ্লাই ষ্টিচ্‌' (Fly Stitch)। এ রীতিটি সেলাইয়ের কাজে সচরাচর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-সুন্দর সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতির হদিশ দেবার বাসনা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবের কারণে আপাততঃ সে পরিচয় দেবার সুযোগ মিলছে না। তাই আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল

রাজস্থান ঃ ২০৪ রান (হনুমন্ত সিং ৫১ এবং প্রকাশ পোদ্দার ৩৩ রান। এস নাথ ৪৪ রানে ৫, সুব্রত গুহ ২০ রানে ২ এবং দীপঙ্কর সরকার ৪০ রানে ২ উইকেট)

ও ২০০ রান (হনুমন্ত সিং ৪১, পি শর্মা ৩৪ এবং দুর্গাদাস সিং ৩১ রান। দীপঙ্কর সরকার ৬৫ রানে ৫, সুব্রত গুহ ৩২ রানে ২ এবং এস নাথ ৪১ রানে ২ উইকেট)

বাংলা ঃ ১০০ রান। (শ্যামসুন্দর মিত্র ‥ রান। সি জি যোশী ২৭ রানে ৫ এবং দুরানী ২৫ রানে ৩ উইকেট) ও ১৫০ রান (অম্বর রায় ৪৮ এবং চুনী গোস্বামী ৩১ রান। সি জি যোশী ১৬ রানে ৩, দুরানী ২৪ রানে ২ এবং দুর্গাদাস সিং ২৮ রানে ২ উইকেট)

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলা বনাম রাজস্থান দলের সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ১৫৪ রানে বাংলাকে পরাজিত করে বোম্বাইয়ের সঙ্গে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে। রাজস্থান এই নিয়ে ৬ বার ফাইনালে উঠলো। আগের পাঁচ বারেও তারা বোম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলে পরাজিত হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় রাজস্থান চার উইকেটের বিনিময়ে ৮৬ রান তুলেছিল। বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিন মাত্র ৩ ঘণ্টা দশ মিনিট খেলা হয়। লাঞ্চের পর মাত্র দশ মিনিট খেলা হয়েছিল। একই কারণে দ্বিতীয় দিনে একঘণ্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়। চা-পানের কিছু আগে ২০৪ রানের মাথায় রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বাকি এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট সময়ে বাংলা প্রথম ইনিংসের চার উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৭ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

তৃতীয় দিনের খেলায় উভয় দলের বোলাররা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। এক দিনে ১৪টা উইকেট পড়ে—বাংলার ৬টা এবং রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা। মাত্র ১০০ রানের মাথায় বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হলে রাজস্থান দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। ফলে তারা ২৪৮ রানে অগ্রগামী হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসের আরও দুটো উইকেট হাতে জমা থাকে। চতুর্থ দিনে ২০০ রানের মাথায় রাজস্থান দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলার বাকি ২৬০ মিনিট সময়ে বাংলার পক্ষে জয়লাভের জন্যে ৩০৫ রানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট আগে ১৫০ রানের মাথায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

প্রথম সেমি-ফাইনাল

মহীশূর ঃ ৩৪১ রান (সুব্রহ্মণ্যম ১০৫ এবং কৃষ্ণমূর্তি ৬৪ রান। বালু গুপ্তে ১১৭ রানে ৪ এবং দিয়াদকার ১০২ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৫৬ রান (বি কে কুন্দরন ৫৪, সুব্রহ্মণ্যম ৪২ এবং ডি কামাথ ৬৭ রান। নাদকার্নী .১ রানে ৩ এবং গুপ্তে ৯৬ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই : ৬০২ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অজিত ওয়াদেকার ৩২৩ এবং দিলীপ সরদেশাই ১১১ রান। চন্দ্রশেখর ১৭৯ রানে ২ এবং প্রসন্ন ১৮০ রানে ২ উইকেট)

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম সেমি ফাইনাল খেলায় বোম্বাই এক ইনিংস এবং ৫ রানে মহীশূর দলকে পরাজিত ক'রে ১৯ বার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ইতিপূর্ব্বে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দল ১৮ বার ফাইনালে খেলে ১৭ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাধিকবার ট্রফি জয়ের রেকর্ড এই বোম্বাই দলেরই (মোট ১৭ বার)। ফাইনাল খেলায় বোম্বাইয়ের একমাত্র পরাজয়—১৯৪৮ সালে হোলকারের কাছে ৯ উইকেটে।

প্রথম দিনের খেলায় মহীশূর দল ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৩১২ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের খেলার সূচনা খারাপ হয়নি। দলের অধিনায়ক সুব্রহ্মণ্যম তাঁর ব্যক্তিগত ১০৫ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী এবং দুটো ওভার বাউণ্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৪১ রানের মাথায় মহীশূর দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বোম্বাই খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৩৪৭ রান সংগ্রহ করে ৬ রানে অগ্রগামী হয়। হাতে জমা থাকে ৮টা উইকেট। বোম্বাই দলের দু'জন সেঞ্চুরী করেন—দিলীপ সরদেশাই (১১১ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার (নট আউট ১৮০ রান) দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে সরদেশাই এবং ওয়াদেকার দলের ২৭০ রান তুলে দেন।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই তাদের ৬০২ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। এইদিন বোম্বাই আরও পাঁচটা উইকেট খুইয়ে ২৫৫ রান যোগ করেছিল। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের ৬০২ রানের (৭ উইকেটে) মধ্যে অজিত ওয়াদেকারের একারই ছিল ৩২৩ রান। ওয়াদেকার ৪৫৬ মিনিট খেলে তাঁর ৩২৩ রানে ৪২টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। জাতীয় রঞ্জিট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসে অজিত ওয়াদেকারকে নিয়ে মাত্র পাঁচজন খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত তিনশত রান সংগ্রহ করার গৌরব অর্জন করলেন। আরও উল্লেখ, ১৯৪৮ সালের পর এই প্রতিযোগিতায় এক ইনিংসের খেলায় এই প্রথম ব্যক্তিগত তিনশত রানের নজির। মহীশূর দল ২৬১ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এইদিনের বাকি সময়ে দু' উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৮১ রান তুলেছিল।

চতুর্থদিনে এই খেলাটি লাঞ্চের পর একঘণ্টা কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। মহীশূর দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় শেষ হয়। ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে মহীশূর দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত ৩০০ রান

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার যে পাঁচজন খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত ৩০০ বা তার বেশী রান করেছেন :

৪৪৩* বি বি নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র), বিপক্ষে কাথিয়াবাড়, ১৯৪৮—৪৯

৩৫৯* ভি এম মার্চেণ্ট (বোম্বাই), বিপক্ষে মহারাষ্ট্র, ১৯৪৩—৪৪

৩১৯ গুল মহম্মদ (বরোদা), বিপক্ষে হোলকার ১৯৪৬—৪৭

৩১৬* ভি এস হাজারে (মহারাষ্ট্র), বিপক্ষে বরোদা, ১৯৩৯—৪০

৩২৩ অজিত ওয়াদেকার (বোম্বাই), বিপক্ষে মহীশূর, ১৯৬৬—৬৭

* নট আউট।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধূমপান

শিল্পী—বি, আর, পানেশ্বর

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফাল্গুন—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সকলি তোমার ইচ্ছা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

এইমাত্র সূর্য উঠিল। আলোয় ঝলমল করে আকাশ-মাটি। দুপুর আসে, প্রখর রৌদ্রে চক্ষু ঝল্সায়। ঝিমায় বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্ম। সূর্য ডোবে। সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার আসে। তারারা ঝিল্‌মিল্ করে। চাঁদ উঠে। জ্যোৎস্না ঝরে। স্নিগ্ধ আলোয় প্রাণ জুড়ায়। মন ভুলে। হৃদয় ভরে। তৃপ্ত হয় নয়ন। চিত্তে আসে শান্তি। চক্ষে আসে তন্দ্রা।

মেঘ উঠে। অন্ধকারে গগন ঢাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বজ্র নিনাদে হৃদয় কাঁপে। বাতাস বহে। জল ঝরে। ঝর্ ঝর্ শব্দে ঝরণা ছুটে। নালা ভরে, নদী বহে। মাটি হয় সরস। বীজ হয় অঙ্কুরিত। বৃক্ষ জন্মে। লতাগুল্ম হয় পল্লবিত। ফুল ফুটে। ফল ফলে। দূর্বা-ঘাস জন্মে। কোকিল তান তুলে। পাখিরা ধরে গান। ময়ূর নাচে। পারাবত উড়ে। গো-গোবৎস ছুটে। রাখালেরা ছুটে। মানুষ জাগে। শিশু হাসে। এ সব কী? কেন হয়? কোথা হইতে হয়? কাহার প্রেরণায়? উহা কী স্ব স্ব কর্মানুযায়ী? উহা কি পূর্বকর্মার্জিত? কিম্বা ঈশ্বরের কৃপায়? পর্বত, প্রান্তর, মেরুপ্রদেশ, নদী, সাগর, খাল, বিল, অরণ্য, আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, আলো, অন্ধকার এসব ঈশ্বরের বিচিত্র বিলাস নয় কী? ঈশ্বরের পরম ইচ্ছায় নয় কী? এই নর, এই ঘর, দেহ, পত্নী, পুত্র,

ন, ধন এসব কি? এ সকল কী আমারই? কিম্বা
ামার ইহ জন্মার্জিত কর্মফল অথবা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল?
। জন্ম-জন্মান্তরিণ কর্ম হইতে সঞ্জাত? এত টাকা, এত
া, এত বিদ্যা--প্রভুত্ব—প্রতিপত্তি—বিস্তার—প্রসার—
থ—সৌভাগ্য এসব কী আমারি কৃত? লোকে তাই তো
লে। এসব আমার, আমারই। আমার পুরুষকার বলে,
ামার বাহুবলে সম্পন্ন হইয়াছে। উহা পূর্ব পূর্ব জন্ম
ন্মান্তরিণ কর্মফল ভোগ। আবার দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট,
াগ শোক, জরা-বার্ধক্য-মৃত্যু এসব? কেহ বলে ভগবান
ড় নির্দয় তাই এগুলি আমাকে দিয়াছেন। আর সুখ-
ৌভাগ্যের বেলা (?) আমারি কৃত—আমারি পুরুষকার
লে, বাহুবলে অর্জিত তাই ভোগ করিতেছি—একথাও
হহ কেহ বলে। আবার কেহ কেহ বলে না—এসব আমার
র্মফল। ভাল করি ভাল পাই, মন্দ করি মন্দ পাই।
ই তো পরম বস্তু জীবনে জনমে। এই বিনে কিবা আর
াছে এ ভুবনে। অতএব ভাল খাও, ভাল পর। মরিলে
াবার জন্ম হইবে। আবার কর্ম, আবার মৃত্যু। আবার
র্ম আবার মৃত্যু। বারে বারে জন্মাইব। আশা মিটাইব।
াশাই জীবন। আশাই মরণ। আশাই করম, আশাই
ম। এই আনন্দ, এই তৃপ্তি। জীবনের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা
াটি কোটি কামনা এই ভাবে যুগ যুগান্তর ধরিয়া মিটাইব।
র শেষ পরিণাম যাহা হয় হউক। শুভ কর্মে স্বর্গে যাইব।
খ ভোগ করিব। নিজেই নিজের কর্তা। নিজেই
জের পরিত্রাতা। বুঝিবা তখন ঈশ্বর অলক্ষ্যে,
দূষ্টলোকে বসিয়া--চক্ষু বুজিয়া, উদাসীন হইয়া (?) রোদন
রেন। হয়তো বলেন—হা হতভাগ্য মানব! তোমার
কথা যথার্থ নয়। তুমি বুঝনা তাই এই কথা বলিতেছ।
মি নিছক অজ্ঞতার আবরণে আবৃত আছ বলিয়া এমন
থা কহিতেছ। কহিতেছ তোমার মন শুদ্ধ নয় বলিয়া।
স্থির চিত্ত তোমার, তাই এই কথা মনে ভাব। অস্মু
হঙ্কার তোমার মধ্যে যথেষ্ট রহিয়াছে, গর্ব তোমার পূর্ণ
ত্রয় রহিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ। অহঙ্কার দ্বারা
মূঢ় হইয়াছ তাই এত কথা। গীতা-৩।২৭ বলেন "অহঙ্কার-
মূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে," তোমার অহঙ্কার হেতু তুমি
জেকে কর্তা মনে কর। উহা হইতে তুমি যে নিজের
লে নিজে বাঁধা পড়িতেছ তাহা কি চিন্তা করিতেছ?

এই অহঙ্কার হেতু তুমি সকাম কর্মে লিপ্ত হইতেছ। প্রারব্ধ
কর্মভোগে সমাসক্ত হইতেছ। আর এই অহঙ্কার আসে
প্রকৃতির ত্রিগুণ শক্তি হইতে। প্রকৃতির বশে তুমি
চলিতেছ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ"
প্রকৃতি বা মায়া শক্তিতেই জগৎ-চক্র চলিতেছে মায়াশ্রিত
আছ বলিয়া ভুক্ত-অভুক্ত কর্ম করিয়া কর্মফল ভোগ
করিতেছ। কারণ, অহং সংস্কারে বদ্ধ আছ। এই অহং
সংস্কারে পলে পলে দিনে দিনে, মাসের পর মাস, বৎসরের
পর বৎসর, যুগের পর যুগ ধরিয়া জন্মে জন্মে আবদ্ধ হইয়াছ।
ঈশ্বর হাসেন তখন। অনুদাসীনভাবে জীবের প্রতি করুণা
পরবশ হইয়া বলেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উঠ জাগ। সংসার-
গতি লক্ষ্য কর। কতকাল আর এই অজ্ঞতার আবরণে
আবৃত হইয়া রহিবে? অজ্ঞানান্ধকারে ঢাকা থাকিবে?
আমাকে এর জন্য কত যে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তা
তো তোমরা জান না। এরূপে আর নয় এখন আগাইয়া
আইস। আমিও আগাইয়া যাইতেছি—যেমন করিয়া
সমুদ্র আগাইয়া আসে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নদীকে আত্মসাৎ
করিবার জন্য; গোমাতা গোবৎসের জন্য ছুটিয়া আসে;
মাতা যেমন সন্তানের জন্য আগাইয়া আসে; ভৃত্য যথা
প্রভুর জন্য আগাইয়া আসে; প্রজারা যেমন ছুটিয়া আসে
রাজার জন্য। তেমনি তিনি আগাইয়া আসেন আর বলেন,
—আমি এই মায়াশক্তি। আমারই এই মায়া শক্তি।
আমি একমাত্র কর্তা। আমি মায়াধীশ।

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্‌ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।"
শ্বেঃ উঃ ৩।৪

সেই কারণ দেব সকলের তাদের ঐশ্বর্য প্রাপ্তিতে।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।
শ্বেঃ উঃ ১।৩

কাল ও জীবের সহিত বিশ্বের সৃষ্টির যত কারণাদি।
সে সব ব্রহ্মের আপন সৃজিত শক্তিতে হ'য়ে আশ্রিত॥

"স কারণং কারণাধিপো।" শ্বেঃ ৬।৯ তিনি সকলের
কারণ। সর্ব কারণের কারণ।

"কর্মাধ্যক্ষসর্বভূতাধিবাসঃ" কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের আশ্রয়।

তিনি কর্তারূপে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া জীব ও
জগতকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। যেমন রথের
সারথি রথে উপবিষ্ট হইয়া রথ চালনা করেন, তেমনি ঈশ্বরও

সবার মধ্যে থাকিয়া সবকে নিয়ন্ত্রণ করেন, পরিচালনা করেন। লীলাখেলা করিবার জন্য ঈশ্বরই জীব হইয়াছেন। উহা তাঁহার পরম বিলাস। অরূপ রূপে তাঁহার প্রকাশ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ৬।২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বম্ জ্ঞ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততেহ পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানিচিন্ত্যম।

পরমেশ্বরে আচ্ছাদিত আছে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ,
সেই জ্ঞাতা আর কালের স্রষ্টা শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অন্বিত।
সেই প্রচোদক সকল কর্মের এবং ক্ষিতি, জল, অগ্নি, মরুৎ,
আর ব্যোমরূপে হয় আবর্তিত চিন্তনীয় এ সব তত্ত্ব॥

ভক্ত কবি গাহিয়াছেন, "তুমি আপনি নাচ আপনি গাও মা আপনি দাও মা করতালি।" সেই ঈশ্বরই জীব ও জগৎ হইয়াছেন। আবার তিনিই নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া আপনিই আপনাতে লীন হইতেছেন।

এই বিশ্ব সংসার অনাদি ও অনন্ত। কারণ তিনি যে অনাদি পুরুষ। তিনি যে অনন্তদেব। যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে! এখানে যাহা, সেখানে তাহা। "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" বিশ্বে যাহা, একটি অণুতেও তাহাই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঈশাবাস্য মিদংসর্বম" বিষ্ঠার কীটেও তিনি, আমাতেও তিনি। প্রস্তরে তিনি, সূর্যেও তিনি। এক কণা অগ্নির রং, গুণ যা, বিরাট অগ্নিরও তাই! এক কণা অমৃতের যা স্বাদ, গুণ, অমৃত সমুদ্রেরও তাই।

মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া ত্রিগুণ মায়াশ্রিত হইয়া মনে করে এসব আমারি কৃত। প্রকৃতপক্ষে—

"প্রকৃতেগুর্ণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।" গীতা ৩।২৯

প্রকৃতির গুণ দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিগণ গুণকর্মে সমাসক্ত হইয়া থাকেন। এই আসক্তি ভাব সহজে যায় না। গীতায় উক্ত হইয়াছে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানং কর্মসঙ্গিনাম্" গীতা ৩।২৬॥ কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতে কোনও প্রকারে ভিন্নভাব জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মাইবেন না। কেন? এই কর্মাসক্তি ভাব দূর করিতে গেলে আরো বিপদ ঘটে। সহজে এই কর্মাসক্তি বিদূরিত হয় না। কথায় বলে "চোরা কভু নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী" কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব জানা থাকিলে সব গোল চুকিয়া যায়। প্রকৃত কর্তাকে যদি জানা থাকে তাহা হইলে সকল কর্ম-বন্ধন দূর হইয়া যায়। গুণাতীত হইয়া শিবত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। সমস্ত সৃষ্ট ভুবনের প্রভু। সকল পদার্থের হিতৈষী, সুহৃদ এইরূপ আমাকে যিনি জানেন তিনি শান্তি লাভ করেন। গীতা ৫।২৯

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ গীঃ ৫.২৯

আবার বলিয়াছেন—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যং অহং অগ্নিরহং হুতম॥ গীঃ ৯।১৬

যজ্ঞাদি কর্ম করিবার দৃঢ় সংকল্প আমি। যজ্ঞ আমি। স্বধা আমি। সোমলতা আমি, মন্ত্র আমি, ঘৃত আমি, অগ্নিতে আহুতি দ্রব্য আমি। আবার "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্ বিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্" গীঃ ৩।১৫। ব্রহ্ম হইতে কর্মের উদ্ভব হয় এবং অক্ষর বা ভগবান অচ্যুত হইতে প্রকৃতির উদ্ভব।

ঈশ্বর কর্তা, ত্রাতা, ধাতা, নিয়ন্তা, সন্তা। সে কথা না বুঝিয়া অহং বশে জীব মনে করে, আমার দ্বারাই সব হইয়াছে ও হইতেছে। এই যে বোধ উহাও সেই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইতেছে। তিনি জীবকে স্বাধীনতা একটু দিয়াছেন সবক্ষমতা দান করিয়া সব প্রেরণা যোগাইয়া পরিশেষে একটু অন্ধকার দিয়া আবৃত করিয়াছেন। একটু কর্তৃত্বাভিমান দিয়া প্রলেপ দিয়াছেন।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

"দৈবং প্রমাণং সর্বস্য সুকৃতস্যেতরস্য বা।
অনন্যকর্মদৈবং হি জাগর্তি স্বপতামপি॥

মঃ ভাঃ দ্রোঃ ১৫০।৩০

সকলপ্রকার পুণ্য ও পাপ কর্মের ফলদাতা দৈব। কর্ম কর্তা নিদ্রিত থাকিলেও দৈব চির জাগ্রত। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে একটু বুঝাইয়া পাঠ দিয়াছেন। অঙ্কের দুই-একটি নমুনা দেখাইয়া অবশিষ্ট অঙ্ক করিতে দেন। এও তদ্রূপ। সকল অঙ্ক শিক্ষক করিয়া দেন না, ছাত্র চেষ্টা যত্ন করিয়া যখন অক্ষম হয়, যখন শিক্ষকের শরণ লয়, তখন শিক্ষকও সব বুঝাইয়া দেন। তেমনি ঈশ্বরও জীবকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। জীব সেই স্বাধীনতারূপ অহং বুদ্ধি খাটাইয়া কর্তৃত্ব বুদ্ধি আরোপ করিয়া যখন কোন কিছুর কূলকিনারা করিতে পারে না—তখনই সে ঈশ্বরের

শরণ লয়। হা ঈশ্বর! ও গড্! হো অল্লা! বলিয়া তাহার দিকে কাতর প্রাণে চাহিয়া থাকে। তখনই কেবল মাত্র তখনই তাহার সর্ব অহংকার সর্ব কর্তৃত্ব বুদ্ধি চলিয়া যায়, এবং সকলই তাহার কাছে সহজ হইয়া যায়। সবই বুঝিতে পারে যে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবার নয়। তাঁহার কৃপা না হইলে জগতে কী হইতে পারে? দৈবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হইলেন। দেবতাগণ জয়ী হইলেন। উহাতে দেবতাগণ গর্ববোধ করিলেন। ব্রহ্মা যক্ষরূপ ধারণ করিয়া দেবতাগণকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, তিনিই একমাত্র সর্ব কারণের কারণ। তাঁহারি শক্তিতে দেবতাগণ জয়ী হইয়াছেন। অগ্নি, বায়ু তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন না। অগ্নি নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডটিকে পুড়াইতে পারিলেন না। বায়ুও তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রদেব জানিতে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। মহামায়া রূপধারন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে বলিতে লাগিলেন—এই মহান পুরুষের শক্তিতে তোমরা জয়ী হইয়াছ। ইনিই সর্ব কারণের কারণ। এই পুরুষই ব্রহ্ম। উহাতে দেবতাদের গর্ব খর্ব হইল। অহং বোধ দূর হইল, এবং সমস্ত জানিতে পারিলেন।

বনে বনে এত বৃক্ষ, এত লতা পাতা, এত ফুল ফল, জল পড়ে, পাতা নড়ে, মেঘ ডাকে, ধূলি উড়ে, সূর্য উঠে, সূর্য ডোবে, চাঁদ জাগে, তারা জ্বলে, নিবে, এসব তাঁহারি বিধানে, তাঁহারি নিয়মে, তাঁহারি কৃপায় সম্পন্ন হইতেছে। অস্বীকার করিব কোন শক্তিতে উহার বিপরীত বলিলে তাহা হইবে নিবেদ। স্ব স্ব যে কর্ম সম্পাদন তাহাকে যদি স্ব স্ব শক্তির খেলা বলি, তবে দেবতারা যেমন অহঙ্কারের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তেমনি আমরাও মোহগ্রস্ত হইয়া অহঙ্কারের দাস হইব। আর এই অহংবোধ এই দুর্বুদ্ধি উহা তাঁহারই তমোগুণময়ী অপরাশক্তি বলিতে হইবে।

ঈশ্বরের কৃপায় প্রেরণায় সব সম্পন্ন হয়। উহা ঈশ্বর বুদ্ধি। শুদ্ধ সত্ত্ব বুদ্ধি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম উপযান্তি তে।" গীঃ ১০।১০ অর্থাৎ আমি এমন বুদ্ধি দিয়া থাকি যে যাহার সাহায্যে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

আশ্চর্য এই, পরমেশ্বর সম্বন্ধে আমরা সর্বদা থাকি উদাসীন। কিন্তু পরমেশ্বর তো আমাদের জন্যই সর্বদা উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হইয়া আছেন। প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। আমরা এক পা অগ্রসর হই তো তিনি দশ পা অগ্রসর হইয়া আসেন। সকলে তাঁহার তত্ত্ব জানুক, তাঁহাতে মিলিত হউক, স্বরূপ লাভ করুক এই তাঁহার পরম ইচ্ছা। তাঁহার পরম আগ্রহ। সকলে হউক মহৎ, সকলে হউক সুখী ফুলের মত উঠুক ফুটিয়া, আকাশের মত মহান, আলোর মত স্বচ্ছ; জলের মত সহজ, বায়ুর মত স্নিগ্ধ সরল, মাটির মত স্থির, বৃক্ষের মত নম্রসহিষ্ণু। সকলে হউক ন্যায়বান, জ্ঞানবান, শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান। সকলে হউক মহাভক্ত, মহা প্রেমিক। কর্মী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম, জগতের কল্যাণকর কর্ম করুক। ধার্মিক হইয়া ভাগবত ধর্ম পালন করুক, জ্ঞানী হইয়া পরম জ্ঞান, পরম তত্ত্ব অবগত হউক। ভক্ত হইয়া ভগবানের সেবা করুক। এই তাঁহার পরম কামনা, অভীপ্সা। তিনি দয়া পরবশ হইয়া জীবের অভাব দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া সহজ পথ ধরাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ" এক যে আমি, সেই আমিকে শরণ লও। আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব পাপ হইতে মুক্তি দিব। "অহং ত্বাম্ সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" গীতা ১৮।৬৬॥ তিনি ত্রাণ কর্তা, পালন কর্তা, জ্ঞান দাতা, কর্মের প্রচেতা, ভক্তি প্রেমদাতা, তিনি দাতা শ্রেষ্ঠ। এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁহার লীলামাত্র বৈচিত্র্যময় এই জগৎ, তাই গীতায় ৯।৩৪ এ উক্ত হইয়াছে—

"মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবম্ আত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥"

আমাকে চিন্তা কর, ভালবাস, মৎ প্রীত্যর্থে কর্ম কর, আমার কাছে আনত হও, এই ভাবে আমাতে মনোনিবেশ কর। এই স্থির বুদ্ধিতে স্থিত হইলে আমাতে মিলিতে পারিবে। হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ অর্জুন! যে সকল কর্ম আমার জন্য করে—আমাকেই যে পরম বলিয়া জানে—আমাকে যে ভালবাসে, সর্বত্র আসক্তিহীন সে ব্যক্তি সর্বভূতে শত্রু-ভাবহীন হইয়া আমাতে আসিয়া মিলিত হয়, যথা—

"মৎকর্ম কৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ গীঃ ১১।৫৫

আরো ব ়েছেন—অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা যিনি সেবা করেন, তিনি এই গুণ সকলকে সম্যকভাবে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব পাইবার যোগ্য হন।

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ, ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীঃ ১৪।২৬

প্রকৃতির যে গুণ তার বশেই জীব নিজেকে কর্তা মনে করে। কিন্তু এই গুণকে অতিক্রম করিলে সকলকেই তখন আত্মতুল্য দর্শন করে। কেহ আর পর থাকে না। অপ " সুখ-দুঃখে নিজেরও সুখ-দুঃখ বোধ জন্মে। তখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কল্যাণক'রী বলিয়া জানিতে পারে। সকলেই আমরা ভাই ভাই, এই জ্ঞান হয়। "অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরঃ" আমাদের মধ্যে কেহই বড় নয় বা কেহই ছোট নয়। আমরা সকলেই একে অন্যের ভ্রাতা। "যুবা পিতা স্বপারুদ্র" আমাদের সকলেরই সেই প্রেমময় ঈশ্বরই রক্ষক। ঋগ্বেদ ৫।৬০।৫॥ তিনিই সকলকে একই অন্ন ও ভোজ্য, ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিতেছেন, "বঃ সমানেন হবিষ্য জুহোমি" ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৩॥ তিনি দয়াবান হইয়া সকলকে আহার্য যোগাইতেছেন। আকাশে অগণন তারকা সজ্জিত করিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিতেছেন। সূর্যকে প্রকাশ করিয়া দিবস করিতেছেন। আকাশরূপ চন্দ্রাতপ রচনা করিয়া সকলকে ছায়া দান করিতেছেন। বাতাস হইয়া ব্যাজন করিয়া সকলের ক্লান্তি দূর করিতেছেন। প্রাণরূপে থাকিয়া দেহের দহন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন। অন্নরূপে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া শরীরের পুষ্টি বিধান করিতেছেন। মৃত্তিকারূপে সকলকে ধারণ করিয়াছেন। অনন্ত জীবরূপে থাকিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। কীট, পোকা, ফড়িং, মথ, বিচিত্র রং বেরং-এর প্রজাপতি কী অপূর্ব এই সৃষ্টি আর উহারা সকলেই কল্যাণকারী। আবার বেদরূপে জীবের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন। নাদরূপে জীবের আনন্দ দান করিতেছেন। নামরূপে শান্তি দিতেছেন, রূপ হইয়া নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। পিতা হইয়া মাতৃগর্ভে বীজ দান করিতেছেন। মাতা হইয়া গর্ভধারণ করিতেছেন। দাস হইয়া সেবা করিতেছেন। তথাপি আমরা তাঁহার স্বরূপ বুঝি না। হেথা হোথা খুঁজিয়া মরি। কত মতে শত পথে নানা দিকে বহু ভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করি। এই ভাবে তিনি নিজেই নিজের ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোজন। শ্বেঃ উঃ বলেন—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চমত্বা সর্বংপ্রোক্তং

ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।"

তিনি কাহারো অন্য অপেক্ষা করেন না। যাহা প্রয়োজন তাহাই দিতেছেন। তাহাই করিতেছেন। তাঁহারই প্রকাশ অনন্য মূর্তিতে। অতএব জীবের কী সাধ্য তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করে। তিনি যদি শুদ্ধ বুদ্ধি না প্রদান করেন, শুভ সংস্কারে না বদ্ধ করেন। তিনি বলেন—"বঃ মনাংসি জানতাম্" ঋগ্বেদ। তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হউক। তিনি বুদ্ধির বুদ্ধি, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়। তিনি না বুঝাইলে না জানাইলে এই গুহ্যতত্ত্ব কে জানিতে পারে? তিনি না করাইলে জীবের কী সাধ্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। অন্য কর্ম করা তো দূরে বহু দূরে। তিনি আছেন তাই আছি, তিনি ভিন্ন এমন কে আছেন যিনি এই দুনিয়ায় এই বোঝা-ভার বহন করিতে পারেন।

শিশুর জন্মের পূর্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নির্মলতা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। মেঘ, আলোক, জল, হাওয়া, মাটি, গাছ, গাছড়া কত কি দিয়াছেন ভাবিলে আকুল হইতে হয়। তিনি দয়াময়, প্রেমময় দাতা, না চাহিতে সব দিয়াছেন। কিন্তু আমরা একটু বড় হইলে আমাদের একটু বুদ্ধির উন্মেষ হইলে বলি আমিই কর্তা, আমি আমার সংসারের একমাত্র কর্মকর্তা। রাজা বলেন আমি শাসনকর্তা, প্রজাপালক। চিকিৎসক বলেন আমি রোগমুক্তির কর্তা, যদি না রোগীটাকে দেখিতাম তবে রোগীটি মরিয়াই যাইত। শিক্ষক বলেন আমি শিশুর জ্ঞানদানের একমাত্র কর্তা। এই যে বোধ উহাও সেই প্রেমময়ের খেলা। ভগবান মায়াজাল বিস্তার করিয়া এই বুলি বলাইতেছেন; এইরূপ কর্ম করাইতেছেন। কিন্তু এই কর্ম এই বোধ তিনিই সরাইয়া লন যখন তাঁহাকে আশ্রয় করা হয়, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। জীব ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলে ঈশ্বরই শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। মায়া অপসারিত করিয়া লন। এর ফলে জীব সকল কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারে। উহা হইতে অনন্ত

সুখ, অশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরের নামে তন্ময় হয়। এই ফুল, এই ফল, ঘাস, মাটি, ধুলি, ইট, পাথর, আলো, বাতাস সবই তাহার নিকট প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সকলের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখে। শুভ দর্শন করে। ঈশ্বর একমাত্র নিখিলবিশ্বের কর্তা, তিনি করাইতেছেন, চালাইতেছেন এই অনুভব করেন। জীব কেবল উপলক্ষ্য এই কথা জানিতে পারে। ভক্ত কবির গানে উক্ত হইয়াছে

"সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥'
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী যেমনি চালাও চলি তেমনি॥

এই তত্ত্ব যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা জানা যায় না। উহা কেবল তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারি করুণায় অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তবৈষ আত্মা বৃনুতে স্বাম॥"

"তিনি"ই যাহাকে বরণ করেন তিনি তাঁহাকে বরণ করেন। অন্যথায় কোনক্রমেই নহে। কি বিদ্যা কি শাস্ত্রপাঠ কি মেধা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না।

মহামায়া প্রসন্না হইলে তাঁহার আশীর্বাদে তাঁহার ইচ্ছায় জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। চণ্ডী ১-৫৬ যথা সৈষা, প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"।

শ্রীভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন তারফলে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। যশোদা রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে যাইয়া কী বিপদেই না পড়িয়াছিলেন। কোন মতেই কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। নাজেহাল হইয়া যাইতেছেন। মায়ের বিরসবদন দেখিয়া তাঁহার অন্তর করুণার্দ্র হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা সম্বরণ করিয়া অবশেষে মাতার স্নেহডোরে বাঁধা পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও মাতা শচীদেবীকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন এবং সত্যবস্তু যে কী, তত্ত্ববস্তুটি যে কী, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া দর্শন দেন তাই সাধক তাঁহাকে দেখিতে পায়। বাঁধা পড়েন ভক্তের ভক্তি ডোরে। এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কৃপা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখা দিয়াছিলেন।

একান্তভাবে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলে ঈশ্বরের শরণ লইলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া ভক্তের হৃদয়ে, সাধকের অন্তরে জ্ঞানবর্তিকা জ্বালিয়া দেন, দর্শন দেন। দিব্যবুদ্ধি, দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। তাইতো জীব সব জানিতে পারে। অন্যথায় শাস্ত্রবিচারে তাঁহার দর্শন মিলেনা। সত্য স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। শুধু অহং বুদ্ধিরূপ ব্যূহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই দুষ্ট বুদ্ধি ব্যূহ হইতে মুক্তি পাইয়া কয়জন লোক তাঁহাকে পাইতে বাসনা করে?

গীতায় বলে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গীঃ ৭।৪

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। এই চেষ্টাকারী বহুসিদ্ধের মধ্যে কোন একজন সত্য সত্যই আমাকে জানে। শ্রীকৃষ্ণ একথা অর্জুনকে বলিয়াছেন, আরো বলিয়াছিলেন—

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা॥ গীঃ ৭।৬

অর্থাৎ সকল পদার্থের সনাতন বীজরূপে আমাকেই জান। বুদ্ধিমানগণের আমি বুদ্ধি, তেজস্বিগণের আমি তেজ। সুতরাং জীব যে বুদ্ধি লইয়া কর্ম করে, চলে, বলে, তাহা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। উহাও আবার সকলে অবগত হইতে পারে না। কেন না—

দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীঃ ৭ ১৪

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা নিত্যক্রীড়াশীলা মায়া দুরতিক্রমণীয়া। আমাকে যারা প্রকৃষ্ট রূপে আশ্রয় করে তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকে। মানুষ কেন জীব মাত্রেই এই মায়া শক্তিকে সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। সেইহেতু নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। পরন্তু তাঁহার কৃপাই একমাত্র অস্ত্র যাহার দ্বারা এই মায়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই মায়া পাশ ছিন্ন হইলে জীব তখন বাসুদেব যে সর্বত্রই বিরাজিত তাহা অবগত হইতে পারে, তিনি যে সর্বকারণের কারণ তাহা বুঝিতে পারে।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ গীঃ ৭।১৯

'সর্বত্রই বাসুদেব' এই বোধ বহু সাধনার ফলে জন্মে

এবং এরূপ বোদ্ধা মহাত্মা সুদুর্লভ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃকালকারোগুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ সংসার মোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ॥
শ্বে ৬।১৬

তিনিই জীবের পালক এবং সত্ত্বাদিগুণের ঈশ্বর, আর তিনিই এই সংসার বন্ধন মুক্তির হেতু। তিনি ধাতা বিশ্বস্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর। সর্বগুণান্বিত কালকর্তা গুণী এবং চৈতন্য স্বরূপ। এই পরমজ্ঞান তাঁহার কৃপাতেই জন্মে, এই বুদ্ধি তিনিই প্রদান করেন। "দদামি বুদ্ধি-যোগং তাং যেন মাম উপযান্তি তে" যাহার ফলে সাধক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, "অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে" আমি সকলের উৎপত্তি স্থল আমা হইতে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে, "ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্য-সাচিন্।" গীঃ ১১।৩৩; অর্জুন! দেখ আমিই পূর্ব হইতে সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি এখন তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হইয়া আমার কর্ম কর।

অতএব অর্জুনের কথায় বলিতে হইবে "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" যাহা হইতে শাশ্বত সনাতন সংসারের প্রবৃত্তি ও বিস্তার হইয়াছে সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করিলাম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে জীব ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতির গুণযুক্ত হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ কর্মে আসক্ত হইয়া সংসারের মায়া পাশে বদ্ধ হয়, এবং জন্ম জন্মান্তরিন সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, আবার সেই জীব শুদ্ধ সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্য বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে পরমেশ্বরই যে নিখিল বিশ্বের কর্তা, সবই করিতেছেন, সবের প্রেরণা দিতেছেন, এই বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। যন্ত্রারূঢ় সারথির ন্যায় তিনি জীবের ও বিশ্বের নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি যোগক্ষেম তাই সকলের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সবই যোগান দেন, সকল অভাব সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। এ সবই ঈশ্বরের পরম লীলা খেলা। শিশু যেমন মাতাকে আশ্রয় করে তেমনি ভক্তও ভগবানকে আশ্রয় করে, ফলে ভগবানই তাহার সকল ভার, সকল বোঝা বহন করেন। ভক্তের মোক্ষাদিও তাঁহারি বিধানে, তাঁহারি ইচ্ছায় লভ্য হয়। তাঁরই ইচ্ছায় জীব শিব হয়। উহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার দয়া তাঁহার ইচ্ছা বিনা কিছুই হইবার নয়। অতএব বলিতে পারি "সকলি তোমারি ইচ্ছা" তোমার ইচ্ছা বলে আমাদেরকে আত্মসাৎ কর, তোমার আপনজন করিয়া লও।

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম॥

হে ঈশ্বর! তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক।
ও শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ব্রহ্মসূত্র-কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

উত্তরাৎ চেৎ আবির্ভূত স্বরূপস্ত। ১৯

পরের কথায় যদি মনে হয় কিন্তু তাহাত নয়
দহর শব্দ ব্রহ্মে বুঝায় জীবের স্বরূপ কয়
জীব মোক্ষকে পায়
এই কথা এতে কয়
শঙ্কর কন দহর সম্বন্ধে শ্রুতি বিচারেতে কন
ব্রহ্মা ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ উপদেশ দিয়ে কন
পরের কথায় জীবকথা হয়
দহর ব্রহ্ম জীব জেন নয়
তবে যদি বলো ব্রহ্ম ও জীব কখন ভিন্ন নয়
ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টি জীবেতে ব্রহ্ম নয়।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ (২০)

পরামর্শঃ জীব উল্লেখ অন্য অর্থে হয়
দহর বাক্য শেষে জীব আছে শঙ্কর তাহা কয়
অথ য এষ সম্প্রসাদ অকস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা।

অনুবাদ

এর পর জীব এই দেহ ছাড়ি উত্থিত জেন হয়
পরম জ্যোতি সে পরমাত্মারে তখন সে জেন পায়
পরি নিষ্পন্ন নিজ মাঝে হয়
ইহাই আত্মা শাস্ত্রেতে কয়
জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হয়
এই অর্থেতে জীব নাম হেথা উল্লেখ জেন রয়॥

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দশ

অসিত (হেসে সুর করে) : আধ রাত প্রভু দরশন দীজে—এ মীরার প্রার্থনা। তাই তুমি ঠিক সময়েই এসেছ দিদি—প্রায় অন্তরযামিনীর মতন।

ললিতা (ফের প্রণাম করে) : অমন কথা বলে দাদু ছোটবোনকে—যার সম্বল শুধু অহঙ্কার আর প্রগল্ভতা ?

অসিত : দিদি, ও চাল চলবে না। জানো, প্রেমল আমায় কী বলেছে আজ তোমার সম্বন্ধে! বলেছে—

ললিতা (অসিতের মুখ চেপে ধরে) : না দাদা, দুটি পায়ে পড়ি—বলবেন না। একেই অহঙ্কারে আমার মাটিতে পা পড়ে না। আরো ফুলে উঠলে হয়ত বেলুনের মতন উড়ে ঘুরে মরব মাটি ছাড়া ঘর ছাড়া হয়ে—কোথায় কে জানে ?

অসিত : না মরবে না। শুনতেই হবে। ওকে আমি একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও কেমন করে চৈতন্যদেবকে এত ভালোবাসতে শিখল। তাতে ও বলল : "তুমিই পাও নি কি আজ যে ঠাকুরের লীলা তামাশা আজব চীজ ? তাই ললিতার ছোঁয়াতেই আমার চোখের ঠুলি খুলল—দেখতে পেলাম চৈতন্যদেবের দীক্ষার মর্ম।" আমি হেসে বললাম : "কী দীক্ষা বলবে ? না, বলতে এবার শিষ্যার মানা ?" ও বলল : "না ভাই, কেবল ওকে বোলো না।" আমি বললাম "তবে থাক কাজ নেই ভাই বলে—এ চুপ-চুপ hush hush আমার ধাতে সয় না।" ও হেসে বলল : "আচ্ছা, ওকে বলতে পারো কিন্তু আর কাউকে নয়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম—যেমন প্রাণ জাগে প্রাণের ছোঁয়াতে, তেমনি প্রেম জাগে প্রেমের ছোঁয়াতে। ও ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসে এসেছে মহাপ্রভুকে। সেই ছোঁয়াতেই আমার মনেও দুলে উঠেছে তাঁর প্রেমের দোললীলা। না, শুধু প্রেমের নয়—দীনতার। তাই, সত্যি বলছি তোমাকে : আমি সব পারতাম—কেবল পারতাম না একটি জিনিষ—নিচু হ'তে। শোনো : অনেক দিন আগে যখন আমি প্রথম আসি লক্ষ্ণৌয়ে—ছিলাম অধ্যাপক—ব্রিলিয়ান্ট প্রফেসর—সব কিছুই বুঝিয়ে দিতাম সবাইকে সবজান্তার ঢঙে—তখন একদিন কবি অতুলপ্রসাদের মুখে তাঁর স্বরচিত একটি গান শুনি—যেটি পরে তোমার মুখেও শুনেছি :

> নিচুর কাছে নিচু হ'তে শিখলি না রে মন !
> নয় কো সোনার বনের কাঠেই হয় রে চন্দন।

কিন্তু বেশ মনে আছে যে, শুনে মনে হয়েছিল—এ একটা কথাই নয়। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই-ই হ'ল শক্তির প্রথম পার্ট—মৃন্ময়কে বর্জন না করলে চিন্ময়কে অর্জন করা যায় না—যেতে পারে না। কিন্তু তার পরে বহু পোড় খেয়ে ঠেকে শিখেছি ভাই যে, নিচুর কাছে নিচু হ'তে পারা চাট্টিখানি কথা নয়—দুর্বলের কর্ম নয় অহংকার টুঁটি চেপে ধ'রে বলা : উঁচু মাথা তোরে নোয়াতেই হবে। আর চৈতন্যদেবের দীনতা কী বস্তু চিনতে পেরে তবেই আমি পেরেছিলাম এ অসাধ্য সাধন করতে। নৈলে মনে করো কি—শেঠজি দম্পতিকে ডাকতে আমি তোমাকে পাঠাতে পারতাম ? মনে কি আমার হয় নি ভাবো : বিমুখদের ডেকে কাজ নেই, কেনই বা সুরের মাঝে

বেসুরাকে টেনে আনা সাধ করে? কিন্তু এমন কি জানতাম যে, দয়াল ঠাকুর পুরস্কার দেবেন—এই বেসুরাই সুরেলার ঝঙ্কার তুলবে এমন আচম্‌কা?" আরো ও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক এই সময়ে তারা এসে বলল—শেঠজি পাঠিয়েছেন একরাশ ফল আর শেঠ গিন্নি—ধূপ চন্দন আর একটি সোনার ধূপদানী। প্রেমল আমার দিকে চেয়ে বলল হেসে: "দেখলে তো ঠাকুরের কাণ্ড? ভাষ্য একেবারে হাতে হাতে!"

ললিতা (চকিতে চোখের জল মুছে) ও—এখন বুঝেছি কেন বাপী আমাকে অনুমতি দিয়েছে। ও শুধু বলল: আজ ভজনের সময় ও-ও এমন কিছু দেখেছে যা দেখবার মত—মানে, আপনার সম্বন্ধে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) শুনুন দাদু, আপনাকে আজ একটু খুলেই বলব—যদিও হয়ত বেশি বলে ফেলে ফের বকুনি খাব বাপীর কাছে। কিন্তু কতদূর বলা উচিত আর কোথায় থামা চাই আমি তো জানি না। তাই বাপী আমাকে যখন দূতী পাঠিয়েছে, তখন আমার স্বভাবের আর অজ্ঞানের জন্যে আমাকে দুষলে চলবে কেন বলুন? কাজেই শুনুন মন দিয়ে।

অসিত: কান খাড়া করেই শুনছি দিদি।

ললিতা (খিল খিল করে হেসে): লম্বকর্ণ? (বলেই জিভ কেটে) ঐ দেখুন—স্বভাব যায় না ম'লে তো—মাপ করবেন দাদু! (ঢিপ করে ফের প্রণাম)

অসিত (হেসে): প্রগল্‌ভতাও ছোঁয়াচে দিদি, তাই আমিও একটু রসিকতা করি শোনো। এক মোকদ্দমার পরে দুই উকিল জজসাহেবের সামনেই রেগে ঝগড়া বাধালো। এ ওকে বলল: "Ass!" সেও পিঠ পিঠ ফিরিয়ে দিল: "You are an ass!" জজ সাহেব রেগে ধমক দিলেন: "You both forget that I am here!"

ললিতা (হেসে গড়িয়ে পড়ে): এই জন্যেই, দাদু, বাপী আপনাকে তখমা দিয়েছে মনের মানুষ। হাসির মধ্যে এই একটা মস্ত যাদু আছে যে, সে সহজিয়া হবার পথ কেটে দেয় অজান্তে। তাই কান নিচু করেই শুনুন।

অসিত (হেসে): তথাস্তু। কেবল একটা কথা। প্রেমলের কাছে শুনেছি যে, তোমার বৈরাগ্য এসেছিল অল্প বয়সেই—যাকে বলে যৌবনে যোগিনী। এহেন তুমি তোমার মা-র কাছে দীক্ষা না নিয়ে প্রেমলের কাছে দীক্ষা নিতে গেলে কেন, বলবে?

ললিতা: সত্যের সোনার সঙ্গে মিথ্যের খাদ মিশিয়ে উত্তর দেওয়া চললে বলতে পারি নিখুঁৎ সুশীলা সেজে যে, মা বলেছিলেন। কিন্তু নিখাদ সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে দুঃশীলা হ'তে হবে—তাই ভয় পাচ্ছি।

অসিত: মাভৈঃ। আমি আর যাই হই দজ্জাল দাদু নই।

ললিতা: ব্যস, ভয় কেটে গেছে। বলি তবে সত্যি কথা: আমি মা-কে ধরেছিলাম যে আমি আটপৌরে শিষ্যা হতে চাই না মা-র নেওটো হয়ে। তাই নতুন কিছু করতে—বাপীকেও টেক্কা দিতে। ও যেমন খাস সাহেব লর্ড হয়েও মন্ত্র নিল নেটিভ হিন্দুর কাছে, তেমনি আমি শোধ তুলতে চাই হিন্দু লেডী হয়েও মন্ত্র নিয়ে সাহেব লর্ডের কাছে। এর পরে শুনলাম—আমার মন ভগবান্—মিথ্যে বলে নি যে, বাপীই আমার নির্দিষ্ট গুরু—যাকে বলে, appointed.

অসিত: ঠিক বুঝলাম না—

ললিতা: বাঃ! এ-ও কি আপনি জানেন না গুরুকে শমন জারি করে তলব করা যায় না, গুরুই চড়াও হয়ে শিষ্য শিষ্যাকে জাপ্টে ধরেন?

অসিত: হ্যাঁ, প্রেমলও একদিন এই ধরণের কথা বলেছিল বটে, এখন মনে পড়ছে।

ললিতা: কেন? কথামৃতেও কি পড়েন নি যে, পরমহংসদেব বলেছিলেন—তিনি শ্রীবিজয়কৃষ্ণের গুরু নন? স্বামীজিও পওহারি বাবাকে গুরু করতে যেয়ে করতে পারেন নি—ঠাকুর তাঁর দখলদার ছিলেন বলে?

অসিত: হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তবে ব্যাপার কি জানো? আমি দুটি "বাদ" ভালো বুঝি না: গুরুবাদ আর অবতারবাদ।

ললিতা: শেষেরটা আমিও বুঝি না দাদু, তবে প্রথমটা আমাকে বুঝতে হয়েছে প্রাণের দায়ে, না বুঝলে পরে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হয় বিলিতি রাণীর মতন অবলা হ'য়ে—অর্থাৎ "প্রেস্টিজ" আছে, কিন্তু "পাওয়ার" নেই।

অসিত (হেসে): কিন্তু gift of the job তো আছে।

ললিতা: সেই তো একমাত্র বাঁচোয়া দাদু! নৈলে ডবল গুরুর চাপে পিষে ছাতু হ'য়ে যেতাম যে! কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়—শুনুন।

বলছিলাম কি, গুরু কাকে বলে বুঝতে হয়েছে নিজের গরজেই। একথার মানে কী শুনবেন? মানে শুধু এই যে, বাপী মা-কে গুরুবরণ করে যখন ত্বদিনেই ফুলটি হয়ে ফুটে উঠলো, স্বচক্ষে দেখলাম, তখন বিষম লোভ আমাকে পেয়ে বসল। না, শুধু লোভই নয়—কেমন যেন ভক্তি সম্ভ্রম এসে গেল। কেমন করে এল কে জানে? কারণ আমি কোনদিনই কারুর কথায় চলতে পারি নি। ছোটবেলা থেকেই আমার ত্বটি নাম রটে ছিল—ডানপিটে আর উড়নচণ্ডী। ত্বদণ্ড কোথাও বসে ভালো কথা শুনতাম না—যা প্রাণে চায় তাই করতাম—উড়ে উড়ে, আজ এখানে কাল সেখানে। মা'র ভাই-বোন অনেকগুলি—আমারও কম নয়। মামা মামী, মেশো মাসী দাদা দিদি এদের উদ্ব্যস্ত করে মারতাম—কেউ থাকতেন বাংলা দেশে, কেউ আসামে, কেউ সিমলায়, কেউ বা দিল্লীতে। আমি এখানে ছ-মাস, ওখানে তিন মাস, সেখানে চার মাস করে ঘুরে বেড়াতাম গায়ে ফুঁ দিয়ে। সবচেয়ে আমার ভালো লাগত লণ্ডন আর প্যারিস। কেবল থিয়েটার আর সিনেমা—নাচ আর গান। আমি খুব ভালো নাচতে পারি, জানেন কি!

অসিত: শুনেছি—

ললিতা: কিন্তু দেখেন নি তো। সুন্দরী, আমি নই জানি দাদু, কিন্তু যৌবনে আমার চটক ছিল, তাছাড়া আমার নাম দেখে সবাই বলত—এ মেয়ে বিলেতে জন্মালে ইসাডোরা ডানক্যানের সঙ্গে সই পাতাতই পাতাত। কিন্তু হায় রে কপাল! (কপাল চাপড়ে) কোত্থেকে যে আমাকে বৈরাগ্য চেপে ধরল—একেবারে আধমরা, নোটিস না দিয়ে যে, আমার সব চঞ্চলতা উবে গেল। বসে থাকতাম আমি মনমরা হয়ে। এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না দাদু।

অসিত: জানি। প্রেমলও আমাকে বলেছে।

ললিতা: কিন্তু তারপর কী হ'ল কখনই বলে নি। আমি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় পারিসে বিয়ে করে বসলাম এক শিল্পীকে। সে এক ইতিহাস—আজ থাক। বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। অসুখী হয়ে আমি ফিরে এলাম মা-র কাছে। এসেই দেখলাম বাপীকে।

প্রথম দিকে ওকে কেমন যেন—কী বলব? ভারি অদ্ভুত লেগেছিল। এ আবার কী ঢং—খাস সাহেব জপমালা নিয়ে বসে, গুরুমার চরণামৃত খায়, মেয়েদের ছায়াও মাড়ায় না সুপুরুষ হয়েও! এ কী ব্যাপার? সত্যি দাদু, মনে হত যেন নাটুকে কাণ্ড! (থেমে) কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে দেখলাম ওর আর এক মূর্তি। সে যে কী সুন্দর কী বলব! সত্যি, চোখ জুড়োনো ধার্মিকের রূপ।

বুদ্ধিতে সে যে একজন দিকপাল এ আগেই শুধু আমার নয়, সকলেরই চোখে পড়ছিল। বলতে কি, দাদু, এমন ধারালো বুদ্ধি আমি দেখি নি কখনো। (মুচকে হেসে) অবিশ্যি present company excepted.

অসিত (হেসে): না না—spade-কে spade না বললে diamond-এর খাতির হবে কেন? ওর বুদ্ধি আমার কাছেও সত্যিই—কী বলব—মনে হয় যেন মাপতে গিয়ে হালে পানি পাই নে।

ললিতা (খুশী): দাদু, আমার আপনার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে আপনার এই উদার গুণগ্রাহিতা। অপরকে এত সহজে মান দিতে আমি কাউকে দেখি নি—এমন কি বাপীকেও না। জানেন ওকে? আমি বলেছি একথা—আর ও ও সায় দিয়েছে। বলেছে কী জানেন?—যে, আপনার মধ্যে ঈর্ষা—জেলাসি—জিনিষটা আদৌ নেই, তাই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

অসিত (হেসে): গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না দিদি—বলে চলো। তারপর?

ললিতা (ক্ষুণ্ণ): ভালো ভেবে বললাম, আপনি উল্টো বুঝলেন।

অসিত (সান্ত্বনার সুরে): না দিদি, আমি সোজা মানুষ, সোজাই বুঝেছি। কেবল একটা কথা জানতে চাই। শুনেছি—তোমরা পুরোপুরি কেতাদুরস্ত সাহেবি চালেই চলতে। গুজবটা কি সত্যি, না লোকে যেমন বাড়িয়ে বলে এ-ও তেমনি?

ললিতা: সত্যি দাদু। সে লজ্জার কথা বলব কী

বলুন? বিলিতি চলন-বলন ধরণ-ধারণ এই-ই যে আমরা দেখে এসেছিলাম ছেলেবেলা থেকে। নাচের পার্টি রে, সার্ল-তে গানের আসর রে, হল-ও বলডান্স রে, ডিনার, টেনিস, সুইমিং পুল—কী নয় রে? আর শুধু দিশি বিলাতফেরৎদের নিয়েই তো নয়, বাবা ছিলেন ডাকসাইটে ডাক্তার বলে তাঁর সারিয়ে-তোলা অনেক সাহেব-পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও আসত। তার ওপর, মা-ও ছিলেন দিলদরিয়া, hospitable par excellence, যাকে বলে। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে একটি annexe মতন ছিল—তাকে মা অতিথিশালা দাড় করালেন—ওদেশের নানা জাতের লোক এসে অতিথি হত। বাবা চাইতেন—আমরা নানা জাতের লোকের সঙ্গে মিশে হিঁদুয়ানির শুচিবাই থেকে মুক্তি পাই। তাই আমাদের চার বোনকে গভর্নেস ফ্রেঞ্চও শিখিয়েছিলেন। আর ফ্রেঞ্চের ফুটুনিতে আমি ছিলাম সবার শিরোমণি—মুখে আমার নানা ফ্রেঞ্চ বুলির খই ফুটত—ইংরাজির তো কথাই নেই। এ-হেন আমি দাদু, সেবার বিলেত থেকে ফিরে এসে থ হয়ে গেলাম দেখে যে, বাড়ীর হাওয়াও যেন বদলে গেছে। আর এ-বদলের মূলে—কে বুঝতে পারছেন?

অসিত: প্রেমল?

ললিতা: আর কে? দেখলাম আমাদের অতিথিশালায় সে বেশ কায়েমী হয়েই বসেছে। পড়ায় কলেজে দর্শন। সন্ধ্যায় আসর বসে বটে—কিন্তু হয় ভজনের, নয় হরিকথার, নয় ওর প্রফেসর বন্ধুদের। আর তাদের সঙ্গে ওর আলোচনা হত কী নিয়ে বলুন তো? বুদ্ধি যুক্তি তর্ক বড় না বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম বড়? ব্যক্তিত্ববাদ বড় না গুরুবাদ বড়? নিয়তি সত্য না পুরুষকার?—বিজ্ঞানের পথে কতদূর জানা যায় আর শ্রুতি স্মৃতি গীতা ভাগবতের পথে কী লাভ হয় এই সব। আমার বড় অভিমান ছিল ফরাসী জাতি বলে। ও চাল চালল ফ্রেঞ্চেই পাস্কাল আওড়ে: "Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point......Il n'y a rien de si conforme a la raison que ce desaveu de la raison"*

* হৃদয় যে যুক্তি মেনে চলে বুদ্ধির যুক্তি তার খবর রাখে না......বুদ্ধির যুক্তিবাদকে বাতিল করতে যাওয়ার মতন যুক্তিসঙ্গত কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

(Pensees—Pascal)

অসিত: শুনে তোমার কী মনে হত?

ললিতা: বললাম না—প্রথম দিকে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম! এ যে আমার চেয়ে ঢের ভালো ফ্রেঞ্চ জানে! ফলে যা হবার: মাথায় চড়ে গেল বিষম রাগ—ঈর্ষা। কারণ দেখলাম মা-ও "দুলাল দুলাল" করে অস্থির! ওর নাম দিয়েছিলেন প্রেমল, কিন্তু ডাকতেন ওকে "নন্দদুলাল" বা ছোট করে "দুলাল"।

অসিত: আর তোমার মা-র কি রকম বদল দেখলে?

ললিতা: সব বলতে গেলে "আদি রাত" পেরিয়ে ভোর রাত এসে যাবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

মা-র ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। গাজিপুরে তিনি পওহারি বাবার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে কুমারী পূজা করেছিলেন। এ ছাড়া নানা সাধু-সন্ত তাঁর কাছে মাঝে মাঝেই আসতেন নানা আলোচনা করতে। মার চরিত্রের দুটো দিক ছিল: একটা সদরের—সেখানে তিনি ছিলেন ফ্যাশনেবল্ মেয়ে—আমার যোগ্য মা-ই বলব। বলতে কি, ফ্যাশনে আমার হাতে-খড়ি হয় তারই হাতে। ইংরাজি বলতে, ডিনার দিতে—to make a party go—ইঙ্গবঙ্গদের মধ্যে তাঁর জুড়ি ছিল না। আমি আর এক কাঠি এগিয়ে শিখলাম ফরাসী বুকনি। মা বললেন খুশী হয়ে এই-ই তো চাই—মা কী বেটি সিপাই কি ঘুড়ী ইত্যাদি।

আমার দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মার আদরের দুলালের আবিভাবের আগেই। আমার দাদারাও যে যার কাজে ছরিয়ে পড়েছিলেন—কলকাতা দিল্লী বম্বে কোচিন। বাড়ীতে কেবল আমিই একটিমাত্র দুলালী—মা-কী বেটী। কিন্তু হা অদৃষ্ট! একেবারে নিভে গেলাম—কি না ঐ এক নষ্টচন্দ্রের ঝলকানিকে! মনে ধরল জ্বালা—সে কী জ্বলুনি দাদু! মা যেন আমাকে ভুলেই গেলেন ঠিক যেমন মেয়েরা মা হলে পুতুল ছেলেমেয়েদের ভুলে যায়। এ একটুও বাড়ানো না।

কিন্তু তার পরে বাপ্পীর নানা তর্কাতর্কির আসরে ওর কথা শুনতে শুনতে আমার দেহ মন একেবারে বদলে গেল। বলেছি আমি শেষবার বিলেত গিয়ে প্যারিসে বিয়ে করি। বিয়ের পরে—মানে কোনো কারণে খুব অসুখী হয়ে দেশে

ফিরি। যখন ফিরেছিলাম কেমন যেন সবই মনে হত ছায়াবাজি! কিন্তু মা খুশী হয়েই বললেন, ঠিক হয়েছে—বৈরাগ্যের ছোপ লেগেছে।

কিন্তু সংসার আর ভালো না লাগলেও বৈরাগ্য ভাবতে আমার মন ভয়ে যেন কুঁকড়ে যেত। সর্বনাশ! শেষে কি আমি বিধবাদের মতন হরি হরি করব না কি—মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে! কল্পনা করতেও শিউরে উঠতাম—এ ডেঞ্জার সিগনালে। ওদিকে ঘেঁষা নয়।

কিন্তু মুস্কিল হল আমার নিজেকে নিয়েই। কই, পার্টি টার্টিও তো আর ভালো লাগে না। এক আধদিন টেনিস খেলি বা সুইমিং পুলে সাঁতার দেই এর ওর তার সঙ্গে—অনেক দিনের অভ্যাস তো—যেমন স্টীম বন্ধ করলেও ট্রেণ থানিক দুর পর্যন্ত চলে না? অনেকটা সেই রকম। মানে, ঝোঁক আছে কিন্তু রোখ নেই, নৌকো আছে কিন্তু না আছে দাঁড়, না হাল কি পাল—গুণ টেনে চলা যায় কতক্ষণ শুনি?

এই সময়ে চোখে পড়ল মার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন! দেখতাম এক বৃন্দাবনের বাবাজি প্রায়ই আসতেন তাঁর কাছে। কিছুদিন বাদে—ওমা, মা হঠাৎ শাড়ী ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুলালও হ্যাটকোট ছেড়ে পরল আলখেল্লা। চমকে উঠলাম শুনে যে মা দীক্ষা নিয়েছেন বাবাজির কাছে, আর তাঁর আদুরে দুলালটি দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর কাছে।

অসিত: বৈষ্ণব দীক্ষা?

ললিতা: পরে শুনলাম তাই—যখন ঘরে হঠাৎ কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ এনে মা বসালেন তাঁর পূজোর ঘরে।

অসিত: আর তোমার বাবা?

ললিতা: সে আর এক কাণ্ড! বাবা অনেক আগেই গীতার সাধনা নিয়েছিলেন এক বেদান্তীর কাছে। কিন্তু সে কথা যাক—সব বলার সময়ও নেই, আর একদিন বলব না হয়। আজ বলি মা র কথা—বিশেষ করে তাঁর আদুরে দুলালটি কেমন করে আমার গুরু হলেন।

মা-র ঠাকুর ঘরে বাবা সচরাচর যেতেন না। কিন্তু মাকে তিনি শুধু যে ভালোবাসতেন তাই নয়, গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর দীক্ষায় মত দিয়েছিলেন সানন্দেই। তাঁর নিজেরও তো মনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল আসন প্রাণায়াম ধ্যাণ-ধারণা করে—অমত হবেই বা কেন? বলতেন তিনি প্রায়ই—যার যে-পথ তাকে সে-পথে চলতেই হবে। ফলে বাড়ীর মধ্যে যেন দুটো আলাদা সাধনার মহল গড়ে উঠল—মা বাসিন্দা হলেন বৈষ্ণব মহলের, বাবা বৈদান্তিক মহলে।

আমার তখন কী অবস্থা একবার ভাবুন। অর্থাভাব নেই অবশ্য। বাইরে থেকে দেখতে সংসার চলেছে ঠিক তেমনিই। অতিথিও আসে, মোটরও চড়ি, আসরও বসে, এমন কি টেনিসও খেলি মাঝে মাঝে। কিন্তু কোথায় যেন এক বাজিকর জাদু বোতাম টিপে দিয়েছে যার ফলে সব ভেস্তে গেছে। দুধে এক ফোঁটা টক পড়লে যেমন দুধের স্বাদ থাকলেও রস থাকে না আর, খানিকটা তেমনি।

মন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমি বাবাকে গিয়ে বললাম। বাবা হেসে বললেন: "মা, তোর বৈরাগ্য এসেছে। খুবই শুভ লক্ষণ। তবে তোর পথ কী আমি বলতে পারব না—কারণ আমি তোর গুরু নই।" কী করি? মা-কে গিয়ে বললাম। কিন্তু মাও ধরা-ছোঁওয়া দিলেন না। বললেন ধৈর্য ধরতে। পরে শুনেছিলাম এই সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কে আমার গুরু—কিন্তু আমার কাছে ভাঙেন নি।

তারপর সে অনেক কাণ্ড, টানাছেঁড়া, আগুপাছু, ওঠাপড়া: কখনো বাপীকে মনে হয় চমৎকার, আবার তার পরেই ধাঁধা লাগে। মনে হয়—বড় কঠিন ঠাঁই। তার বুদ্ধি চরিত্র কান্তি দেখে ভক্তি হয় কিন্তু ভয়ও করে। এই সময়ে ঘটল একটি অঘটন—যাকে বলে miracle. কী অঘটন আপনাকে বলতে পারব না—তবে বাপী হয়ত বলবে যদি জিজ্ঞাসা করেন ও কখন যে কী করে বসে কেউ জানে না, মা বলতেন প্রায়ই।

আমি সত্যি হতভম্ব হয়ে গেলাম দাদু! কারণ, আমি কী ভাবে গড়ে উঠেছি! হতভম্ব হব না? মন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মাকে গিয়ে বললাম ফের। কিন্তু যা দেখেছি তা ঠিক না বেঠিক সে সম্বন্ধে মা একটি কথাও বললেন না। শুধু বললেন বাপীকে গিয়ে বলতে।

আমার মন বেঁকে বসল। বাপীর কাছে যাওয়া ছেড়েই দিলাম। তারপর ঘটল আর এক অঘটন। দেখলাম এক

স্বপ্ন। কী স্বপ্ন তা বলতে পারব না, কিন্তু পর দিন দেখলাম সে-স্বপ্ন ফলল ঠিক যেভাবে দেখেছিলাম।

অসিত (ক্ষুণ্ণ): কিছুই যদি না বলতে পারো, এসব অঘটনের কোনো উল্লেখ না করলেই পারতে।

ললিতা (একটু ভেবে): ঠিক বলেছেন দাদু। আচ্ছা শুনুন বলি এ অঘটনটির কথা। স্বপ্ন তো অনেক সময়েই ফলে কাজেই হয়ত আপনার বিশ্বাস করতে বাধবে না। অন্ততঃ আমাকে 'ম্যাড ক্যাপ' ভাববেন না।

অসিত: আমি অঘটনকে ঠিক অবিশ্বাস করি না ললিতা, কি যাঁরা অঘটনের কথা বলেন তাঁদের 'ম্যাড ক্যাপ' উপাধিও দিই না। কারণ আমায় জীবনেও কিছু অঘটন ঘটেছে। কেবল বুদ্ধি দিয়ে তার তল না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক করেছি ও নিয়ে মিথ্যে মাথা বকাব না।

ললিতা: আপনার একথায় আমার খুব সায় আছে দাদু। কারণ বাপীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে বুঝতে পেরেছি কেন মানুষ অঘটনের নানা রটনাকে হয় গুজব নয় পাগলামি বলে বরদাস্ত করতে চায়। বাপী প্রায়ই পাস্কালের একটি মতের নজির দিত, বলত—তিনি অত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েও মিরাক্লে বিশ্বাস করতেন, কেন না তাঁর বুদ্ধি মনের কোঠা ছাড়িয়ে উঠেছিল বলে মনের উপরওয়ালা কোনো আলোর নাগাল পেয়েছিল। তাই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যা সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পান না।

অসিত: কী দেখতে পেয়েছিলেন ?

ললিতা: তার নজিরটি ছিল: "Il n'est pas possible de croire raisonnablement contre les miracles. * কিন্তু একথার অর্থ সহজ হলেও অঘটন যারা চাক্ষুষ করেনি তাদের সংশয় কাটে না কিছুতেই। তারা নানা তর্ক ফাঁদে হয়কে নয় করতে—অর্থাৎ যা ঘটেছে তাকে ঘটে নি বলে উড়িয়ে দিতে।

কিন্তু আমার পক্ষে এ-রকম তর্ক তোলা অসম্ভব ছিল এইজন্যে যে আমি স্বপ্নে যা দেখেছিলাম ফলল একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। অথচ ফলল যেন ঠিক উল্টোদিকে। কী হ'ল বলি তাহ'লেই এ হেঁয়ালি পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্বপ্নে দেখলাম কি যে, বাপীর সঙ্গে মা তাঁর পুজোর ঘরে জপ করছেন বিগ্রহের সামনে এমন সময়ে মা হঠাৎ বাপীকে বললেন: "এখন ওর মনের বাধা কেটে গেছে ওকে তুমি মন্ত্র দিতে পারো।"

ঘুম ভেঙে আমার মন আনন্দে ছেয়ে গেল! তখন ভোর সাড়ে চারটে। আমি উঠে পা টিপে গেলাম মা-র পুজো ঘরের দিকে। সন্তর্পণে দোর খুলেই দেখি মা আর বাপী ধ্যান করছেন। কিন্তু হবি তো হ হঠাৎ আমার শাড়ীর আঁচল বেধে গেল দোরের হাতলে, আমি ছাড়াতে যেতেই শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মা ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন: "আয় রে মেয়ে। তোর লগ্ন এসেছে। দুলালকে আমি খানিক আগে বলছিলাম তোর মনের সব বাধা কেটে গেছে এখন তোকে ও মন্ত্র দিতে পারে।

আমার মনের মধ্যে পুলক শিহরণ জাগল। আমি ছুটে এসে হুড়মুড় করে বাপীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললাম: "আর কক্ষণো অবিশ্বাস করব না—কথা দিচ্ছি। তুমি আমায় দীক্ষা দাও। বলে বললাম আমার স্বপ্নের কথা। বাপী আমার মাথায় হাত রেখে বলল শুধু: "আচ্ছা।" অমনি মা উঠে চলে গেলেন। আমি কেবলই কাঁদি আর কাঁদি—মানে আনন্দের কান্না অবশ্য—সে যে কী আনন্দ —কী বলব দাদু!

বাপী একটি কথাও বলল না, শুধু মাথায় হাত দিয়ে ওর গুরুমন্ত্র জপ করতে লাগল। খানিক বাদে আমি মাথা তুলতেই আমার মাথা ওর বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল আমার গুরুমন্ত্র।

সঙ্গে সঙ্গে দাদু, কী বলব আপনাকে—আমার মেরুদণ্ডের তলা থেকে শির শির করে একটা স্রোত উঠল— অসহ আনন্দের!...একটু পরেই চোখের সামনে ফেটে পড়ল সে যে কী অপরূপ নীল আলো—আর সব যেন মিলিয়ে গ'লে গেল সে আলোয়।...শুনলাম আকাশে বাতাসে বাজছে শুধু আনন্দের ঝঙ্কার গুরুমন্ত্রের ধুয়ায় ফিরে ফিরে।...

নীল আলোর কথা বলতে বলতে ললিতার কণ্ঠ অশ্রু আবেগে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে। শেষ কথাগুলির রেশ গানের মূর্চ্ছনার মতন যেন আকাশে বাতাসে হারিয়ে যায়।

---

* অঘটন যে ঘটতে পারে এমন কথা বিশ্বাস না করাই অযৌক্তিক। (Pensees—Pascal)

অসিতের মনে হয়: কী আশ্চর্য! ও ঠিক যখন তৃষিত হয়ে উঠেছিল শুনতে যা শুনলে সংশয় কাটে ঠিক তাই যেন অমৃতের ঝঙ্কারে বেজে উঠল এক সুভাগিনীর আত্মকাহিনীর মাধ্যমে! ওর মনে বেজে উঠল ফের খৃষ্টের অঙ্গীকার: "আকুল হয়ে চাইলে পাবেই পাবে।" মনে হ'ল হঠাৎ: কেন মিথ্যে ক্ষোভে অনুযোগ অভিযোগ করে মানুষ? অমৃত কি কেউ সত্যি চায়? চাইলে কি প্রাণ-পাত্র ভর্তি করে রাখত সস্তা সুরায়? মনে পড়ল স্বামী স্বরূপানন্দের একটি ভাগবতী বাণী:

প্রাণের পাত্র রাখি যদি রং লালসায় মর্ত্য সুরায় ভরে,
শূন্য তাকে না করলে নাথ স্বর্গসুধা ঢালবে কেমন করে?

ঘরের ঘড়িতে টুং টুং করে বারোটা বাজল।

অসিত চমকে উঠে ললিতাকে বলল: "রাত হ'ল। কেবল আর একটা প্রশ্ন।"

ললিতা: কী?

অসিত: মন্দির গড়ে উঠল কেমন করে?

ললিতা: মা দীক্ষা নেবার পরেই ঠিক করেছিলেন হিমালয়ে একটি মন্দির গড়ে বাপীকে নিয়ে চ'লে যাবেন সাধনা করতে। বাবা তাঁর এক ধনী বন্ধুকে ভার দিয়েছিলেন আলমোরায় একটি মন্দির গড়তে। বন্ধুটি তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি নিজে গিয়ে আলমোড়া থেকে ষোলো মাইল দূরে এক নির্জন বনস্থলীতে কয়েক বিঘা জমি কিনে মন্দির গড়ে বাবার হাতে কয়েক লক্ষ টাকা দেন গুরুদক্ষিণা। বাবা সে টাকা মাকে দেন। মন্দিরের খরচ তার সুদ থেকে কুলিয়ে যেত। মাত্র আমরা চারজন তো?

অসিত: চারজন?

ললিতা: ঐ দেখুন, বলতে ভুলে গেছি: যখন আমরা লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আলমোড়া যাই তখন বাপীর এক বাল্যবন্ধু ছিল লক্ষ্ণৌয়ের হাঁসপাতালের ডাক্তার—নামকরা সার্জন। বাপীর টানেই সে এসেছিল লক্ষ্ণৌয়ে কাজ নিয়ে। বাপী আমাকে দীক্ষা দেবার পরে সেও দীক্ষা চায়। বাপী তাকে বলল: "আমি তোমার গুরু নই, মা-কে ধরো।" মা তাকে মন্ত্র দিতে রাজী হলে সে কয়েক মাস বাদে ডাক্তারি ছেড়ে আমাদের আশ্রমে আসে সাধনা করতে।

অসিত: কী নাম?

ললিতা: পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সিডনি প্রেন্টিস। মা তাকে আশ্রমের নাম দিলেন—প্রণব। মা-র শরীর তখন খুবই খারাপ। প্রণবদা আসাতে সুবিধেও হ'ল কম নয়। কারণ সে ছিল সত্যিই নিপুণ ডাক্তার। কিন্তু (হেসে) আমাদের এই সংসার ছাড়ার খবরে লক্ষ্ণৌতে একের পর এক শুভার্থীর আক্রমণ সুরু হ'ল। বাপীকে তারা নাম দিল খ্যাতি, আমাকে সেন্টিমেণ্টাল, মাকে—ক্র্যাঙ্ক। তাদের সবচেয়ে আপত্তি ফেঁপে উঠল ব্রিলিয়াণ্ট প্রফেসরের পাগলামির বিরুদ্ধে। ওকে তারা কত করে বোঝালো যে, কয়েক বৎসর বাদে সে এমন কি য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারও হ'তে পারে। ছাত্রদের কাছে সে ছিল "আইডল" যাকে বলে। এহেন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ প্রিয়দর্শন পার্সনালিটি কি না এমন সোনার সুযোগ হারাবে এক ক্র্যাঙ্কের পরামর্শে? গুরু-ফুরু আবার কী? ও সব সেকেলিয়ানা চলবে না আর এ-বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক যুগে —ধর্মের ধামা বাজায় এখন কেবল অন্ধ গোঁড়া আর উন্মাদের দল···ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে আমার এক স্কচ সখীর পিতৃদেব—ওখানকার নামজাদা ম্যাজিষ্ট্রেট, আই, সি, এস,—আমাকে ধরলেন বাপীকে বলতে যে, এমন পাগলামি না করে থিতু হ'তে—অর্থাৎ আমার সখীকে বিবাহ ক'রে। এমন পরমাসুন্দরী কালচার্ড মেয়ে স্বয়ম্বরা হ'য়ে যার গলায় মালা দিতে উৎসুক সে-ভাগ্যবান্ কি না দ'য়ে মজবে এক ক্র্যাঙ্ক মহিলার ছলাকলায়? সখীও আমাকে কেঁদে ধরল: বাপীর জন্যেই ও লণ্ডন ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ে এসেছে—ছেলেবেলা থেকেই ওকে ভালোবাসত ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাপী ওকে হেসে বলল: "সেই জন্যেই তো আমাকে আরো মহাপ্রস্থান করতে হচ্ছে!"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: "কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের সব সুবুদ্ধি প্রফেসররাই না কি বলছেন যে, এর নাম sheer madness! এবার ও হো হো করে হেসে উঠল, বলল: "The boot is on the other leg, madame!—এক্ষেত্রে পাগল কে শুনি? যে-সওদাগর রঙিন ঝিনুক সিন্ধুকে পুরে গোঁফে চাড়া দেয় নিজেকে রাজা বলে? না যে ঝিনুক ছেড়ে মুক্তামণির ডুবুরি হয়? আর সবচেয়ে হাসি পায় আমার কাদের দেখে জানো? এই 'সুবুদ্ধি' প্রফেসরদের। এঁরা দর্শনের পাঠ দেন—বড় বড় ধ্যানীর

ধ্যানদর্শনের সত্যতার ভাষ্য করতে নয়—শুধু তাঁদের নানা উক্তির সম্বন্ধে 'নোট্স' দিতে। ভুলেও ভাবেন না কথনো যে, এই সব দার্শনিক জ্ঞানীর দর্শনবাণী থেকে কিছু শিথবার আছে। অমুক পি, এইচ, ডি, ডি লিট-কে জানো তো? তিনি একদিন উপনিষদে মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসার ভাষ্য করছিলেন: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" —সে সব ধনরত্ন নিয়ে কী করব যার প্রসাদে অমৃত হতে না পারি! চমৎকার বললেন প্রফেসর, parallel passage-ও দিলেন বাইব্ল্ থেকে:

"What is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?" বললেন "Man does not live by bread alone"—আরো কত অনবদ্য কথা! কিন্তু তাঁর কথনো ভুলেও মনে হয় নি যে দৈনন্দিন আচরণেও নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্যে সঞ্চয় ছেড়ে দান বা বদান্যতার দিকে ঝোঁকা ভালো? ক্লাসে বেকন পড়াতে পড়াতে কী নিখুঁত গবেষণাই না করেন—বোঝাতে বেকন কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন:

The world is a bubble and the life of man
Less than a span

কিন্তু তাঁর ভুলেও কথনো মনে হয় নি যে, তুচ্ছতার বেসাতি করতে করতে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—যেকথা বলেছেন পাস্কাল বড় সুন্দর ব্যঙ্গে:

"La sensibilite de l'homme aux petites choses et l'insensibilite pour les grandes choses marque d'um etrange renversement.

পাস্কালের এ-ধরণের অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা ও বাণী আমাকে অনুবাদ করতে বলত যাতে করে তাঁর বৈরাগ্যের নানা গভীর ঝঙ্কার আমার হৃদয়ের তারে রণিয়ে ওঠে। এ বাণীটির আমি অনুবাদ করেছিলাম ছড়ায়, জানো? শোনাই না কেমন ছড়া:

মানুষের মতিগতি বিচিত্র বিস্ময় লাগে ভাবিতে মনে:
নগণ্যদেরই নিয়ে মাতামাতি—বরেণ্যদের বিস্মরণে!

(থেমে) আর শুধু পাস্কাল না, ও আমাকে নানা ফ্রেঞ্চ বই পড়াত—ধমক দিয়ে: "ফ্রেঞ্চ যখন শিখেইছ বাহাদুর বনতে চেয়ে, তখন সত্যি বাহাদুরি দেখাও মপাসাঁ, ফ্লবেয়ার, দদে না পড়ে এমন বই প'ড়ে যাতে তোমার অন্তরে উদ্দীপনা জাগে। পড়ো মেটারলিঙ্কের Devant Dieu Sagesse et Destinée, শার্দ্যাঁর Le Milieu Divin, Phénomene Humain—আর বার বার পড়ো পাস্কাল-এর Pensées—যার তুলনা নেই।" আর শুধু আমাকে উস্কে দেওয়াই নয়—দিনের পর দিন এই সব কঠিন বই পড়াত আমাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে—ভাবতে পারো?"

[ক্রমশঃ

পুনর্ণব

হাসিরাশি দেবী

যে রাত্রি মৃত্যুর চিন্তা এনেছিল অন্ধকারে ঢেকে,
সে রাত্রি বিগত,—
এখন সকাল হ'ল, আলোর পাখীরা ডেকে ডেকে
ফেরে অবিরত।
যে সুর সেধেছি আমি একদিন জীবন-বীণায়,—
ওঠেনি ঝঙ্কার,—
আজ শুনি চারিদিকে তারই মূর্চ্ছনায়,
বসন্ত বাহার।

এখানে সবুজ ঘাস,—দুই একটা ফুটে ওঠা ফুল
ঊর্দ্ধপানে চায়,
হেমন্ত শিশির-বিন্দু স্পর্শ করে ও মর্মমূল
সলজ্জ-কুণ্ঠায়।
চারিদিকে নূতনের এ এক আনন্দ-ঘন
বিচিত্র সংবাদ,—
মৃত্যুর আতঙ্ক হ'তে এনে দিল নির্ভীক-চেতন,
অমৃতের স্বাদ।

এরে নিয়ে ভাবি বারবার,
এ জয় কি একেলা আমার!

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক থেকে বহু সত্তার আবির্ভাব, এ-তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তা হলে সৃষ্টির মূল কথা একীকরণ নয়; সেটা সৃষ্টির আগের কথা। সৃষ্টির মূল কথা একের বহুত্বে পরিণতি। এককে বহু করার দ্বারা সৃষ্টির চিরন্তন লীলা বিকশিত হচ্ছে। এটা যে ভাগবত সত্য, সব ধর্মে সে-কথা স্বীকৃত। সুতরাং বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন এক ভগবান্ অনুস্যূত হয়ে আছেন, এক ভগবানের মধ্যেও তেমনি অনাদি অনন্ত কাল থেকে নিজেকে খণ্ডে খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তায় বিভক্ত বলে অনুভব করার প্রবণতা নিহিত। তা না হলে জগৎসংসার সৃষ্টি হত না। গায়ের জোরে এই সৃষ্টিবিকাশ-বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার অর্থ ভগবানের অসম্মান করা। সে-রকম অনেক অপপ্রয়াস সমস্ত পৃথিবীতে—ভারতে ও ভারতের বাইরে অন্যত্র সক্রিয় আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে প্রাকৃতিক নিয়মে এ-সব অপচেষ্টা নিশ্চয় তিরস্কৃত ও দূরীভূত হবে। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত এশিয়া, সারা ভারত কোন দিন একভাষী হবে, এ-কথা কল্পনা করা চলে না। তার চেয়ে বড় কথা, তেমনটা হওয়া উচিত নয়। সব ভেদরেখা লেপে-মুছে একাকার করে যে ঐক্য, তেমন ঐক্য অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। বরং নতুন নতুন হাজার রকমের বিকাশেই মানব সভ্যতা ও জীবন ঢের বেশি সুখময় ও সমৃদ্ধ হতে পারে। মারাঠি ভাষা থেকে যদি কোঙ্কনি ভাষা বেরিয়ে আসতে চায়, আসুক না; তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। স্পেনের একাংশে যদি কাতালানভাষীরা কাতালোনিয়া রাজ্য গঠন করে, করুক না, তাতেও মানবতা বৈচিত্র্য সহযোগে উপভোগ্য হবে, ক্ষতির আশঙ্কা নেই। পূর্ববঙ্গে যদি নতুন একটা বাংলা ভাষা গড়ে ওঠে, তাতেই বা কি? মার্কিনি ইংরেজি ভাষা খাস ইংল্যাণ্ডের ধারা মেনে চলে না বলে আপত্তি করার কিছু নেই। তেমনি রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের স্বার্থে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা হিন্দিভাষাপুঞ্জের অবাস্তব লোকসংখ্যার আবরণ ভেদ করে যদি মগহি—মৈথিল—ভোজপুরি — কোসলি— রাজস্থানি—পাঞ্জাবি—ডোগরি—উর্দূ ভাষাগুলি আত্মপ্রকাশ করে, তাতে হিন্দি সাম্রাজ্য-বাদীদের বুক ফাটতে পারে, মহত্তর মানবতার বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

তুলনামূলক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের পাঠক ও ছাত্র স্বীকার করতে বাধ্য যে, যত রকম ভাষা ও সাহিত্য আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়, ততই পৃথিবীর ভাষা ও সাহিত্যের মঙ্গল। কারণ, একের তুলনায় অন্যকে বুঝতে পারার ফলে মানুষের মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, রস উপভোগের, বৈচিত্র্য আস্বাদনের আনন্দময় সুযোগও বেড়ে যায় অনেক বেশি। এক একটি ভাষা আমাদের মনের রুদ্ধ কক্ষের এক একটি বাতায়ন খুলে দেয়। সেই বাতায়নপথে প্রবেশ করে নব নব চেতনার সূর্যালোক, নবীন ভাবোদ্দীপনার দক্ষিণ বায়ু, অজানা আবেগের চন্দ্রকিরণ, অননুভূতপূর্ব ইঙ্গিত সঙ্কেতের তারকাদীপ্তি। এক একটি সাহিত্য আমাদের অন্তর্জগতে এক একটি রংমহল রচনা করে, ভাষার প্রসাদে যার তিমিরদ্বার উন্মোচন করে আমাদের অন্তর পুরুষের অশ্রুত বাণী হৃদয়ের গহনে শুনতে পাই; সুবিস্তীর্ণ মানব চেতনার সৈকতভূমে জীবনের লহরী-লীলা দেখতে পাই নতুন-শেখা ভাষার দূরবীক্ষণের সহায়তায়; নিজেকে নতুন করে রঙিয়ে-রসিয়ে নিতে শিখি নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের মণিকুট্টিমে বসে। সুতরাং আমরা চাইবো, দিন দিন বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ

হোক, একে অপরকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে। আরো নতুন ভাষা ও সাহিত্য আবির্ভূত হয়ে আমাদের মনোভাব বিকাশের সাধনায় অভিনব দিশা দিয়ে মানস চেতনার নব দিগন্ত উন্মুক্ত করুক।

আমাদের এই শুভ কামনা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে যেমন আগে অনেক ভাষা ও জাতি অপসারিত হয়েছে, পরেও তেমনি বহু ভাষা ও জাতি লুপ্ত হবে। কিন্তু মানুষের অত্যাচারে না হয়ে স্বাভাবিক প্রাণশক্তির অভাবে সেটা হোক, এটা বরং মেনে নেওয়া যায়। অত্যাচারী সাম্রাজ্য-বাদী ও ঔপনিবেশিকদের উৎপাতে ভাষাগুলির পুষ্পিত বিকাশ রুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত ক্রোধ ও লজ্জার বিষয়। জাতি-নাশের এই সব অপচেষ্টাই যুদ্ধবিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব, দেশ-বিভাগ প্রভৃতির কারণ।

খুব অল্প লোকের ব্যবহৃত ভাষাগুলি স্বভাবিকভাবে প্রতিবেশী বৃহৎ ভাষার অন্তর্লীন অনেক সময়ে হয়ে যায়। কিন্তু এ-প্রক্রিয়া চলুক সংশ্লিষ্ট ভাষায় যারা কথা বলে, সম্পূর্ণ ভাবে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। জোর করে কয়েকটি ছোট ভাষাকে একটি বড় ভাষার চাপে লুপ্ত করে দেওয়া হবে, এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষের প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এই মনোভাব মানবতা-বিরোধী, ভাগবত সত্য-নাশী এবং সৃষ্টিলীলার অকল্যাণকামী।

ভারতে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম কি পর্যায়ে উপনীত, তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে ভাষা ও সংস্কৃতির জগতেও যে প্রকৃতি নখদন্তে রক্তিম, এই ক্রূর সত্যের আভাসমাত্র দেওয়া হল। যাঁরা মনে করেন, ভাষার ভিত্তিতে, জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের কাজ স্থির শান্ত মস্তিষ্কে সাধুতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনার দ্বারা সুসম্পন্ন হবে, তাঁরা বড় বেশি ভালোমানুষ এবং বড় বেশি আশা করেন। ভাষা ও জাতি, জাতি ও দেশ তথা ভূমি, ভূমি ও রাষ্ট্র অতি ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং ব্যাপারটির সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ সাংস্কৃতিক দিক ছাড়াও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির নিকট-সংশ্রব আছে। এর পরের অধ্যায়ে কাজে কাজেই অনিবার্যভাবে সামরিক ব্যাপারটাও জড়িত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, "যার লাঠি, তার মাটি" কথাটা উড়িয়ে দেবার কোন উপায় নেই। যার মাটি নেই, তার ভাষার জীবিত থাকা শক্ত। যে ভাষার মাটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অধিকার আছে, কেবল তার অস্তিত্বই সুনিশ্চিত। কোন ভাষার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অধিকার শেষ পর্যন্ত সেই ভাষাভাষীদের যৌথ প্রতিরক্ষা ও সম্প্রসারণশক্তির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। ভাষার শক্তি প্রকৃতপক্ষে ভাষাভাষীদের জাতীয় আত্মার শক্তি।

সূচনা

ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী যে মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত, আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলো নিয়ে অনেক তুলনামূলক আলোচনা করে অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, গোথিক, স্লাভ, ইরানীয়, বৈদিক প্রভৃতি ভাষার পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বিচার করে এক ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষা কল্পনা করা বা আনুমানিকভাবে গঠন করা হয়। অধুনালুপ্ত হিত্তি বা হিট্টি বা হিটাইট ভাষার চার হাজার বছর আগের নমুনা দেখে এবং তথাকথিত ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষার সঙ্গে হিত্তির সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়, হিত্তি আর ঐ মূল ভাষা পরস্পরের জ্ঞাতি-ভাষা এবং উভয়ে এক ভাষাগোষ্ঠীর বংশধর। এই ধারণা এখন সত্য বলে প্রমাণিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান এশিয়া মাইনর ও তার নিকটবর্তী এলাকা হওয়া সম্ভবপর। হিত্তিবর্গের ভাষাগুলি এখন একেবারে অপ্রচলিত ও নির্বংশ হয়েছে; ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কোন কোন শাখা ঐ ভাবে ধ্বংস হলেও এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি এখন অর্ধেক পৃথিবী দখল করে আছে। সুতরাং এত বড় ভাষাগোষ্ঠীর মূল বা আদিম বাসস্থান জানার জন্যে প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক মহলে স্বাভাবিক কারণে একটা তীব্র আগ্রহ আছে।

ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠী থেকে ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষা কবে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তা আজ আর বলা যায় না। প্রাচীন হাতে-লেখা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন, শিলালিপি, তাম্রলিপি, অন্য সব প্রত্নলেখ প্রভৃতির অভাবে এখন যুক্তিসহ অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্ব সালে ভারত ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকেই তার প্রাচীন শাখা-ভাষাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং আরো আগে ভারত-হিত্তি মূল ভাষা থেকে ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষা আলাদা হয়ে যায়।

খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ সালে ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন ভাষার লোকেরা ইউরোপ ও এশিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে যার সর্বজন-সম্মত মীমাংসা হয় তো কোন দিন হবে না। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রাচীন শাখা-ভাষাগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে যে-মতবিরোধ আছে, তারও কোন সর্বজন গ্রাহ্য মীমাংসা হওয়া প্রায় অসম্ভব। তার একটি প্রধান কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকের উৎকট ভারত-বিদ্বেষ। তাঁরা ভারতীয় আর্যদের ঐতিহ্যকে খুব বেশি প্রাচীনতা মঞ্জুর করতে রাজি নন। তা ছাড়া ইহুদি ও খ্রীস্টান ধার্মিক পণ্ডিতদের একটি প্রধান অবৈজ্ঞানিক দুর্বলতা এই যে, তাঁরা বড় বেশি স্বধর্মনিষ্ঠ বলেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতা, জাতি ও ভাষাকে ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা বাইবলের চেয়ে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। ভারতীয় পণ্ডিতদের আবার হীনতাবোধ এত প্রবল যে, উপযুক্ত প্রমাণ থাকলেও তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সভ্যতার প্রাচীনতা ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করেন।

ভাষাগোষ্ঠীর ভ্রমণ পথ বিচার করলে, আধুনিক ভাষাগুলির প্রাচীনতাপূর্ণ বিশেষত্বসমূহ পর্যালোচনা করলে মনে হয়, লিথুয়ানিয়া বা ইউরোপের অন্য কোন স্থান, সম্ভবত মধ্য ইউরোপ ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষার আদি বাসস্থান ছিল। লিথুয়ানিয়ার ভাষা আনুমানিক মূল ভাষার সব চেয়ে নিকটবর্তী বলেই লিথুয়ানিয়ার কথা বিবেচনা করতে হয়। লিথুয়ানিয়ার পূর্বে স্লাভ ও পশ্চিমে টিউটনদের বাসভূমি। এখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মধ্য ইউরোপ বা অস্ট্রিয়া অঞ্চলকে বেশি গুরুত্ব দেন। অস্ট্রিয়ার দক্ষিণে ও পশ্চিমে ইতালিক, পূর্বে স্লাভ ও উত্তরে টিউটনদের বসবাস। ব্রাণ্ডেস্টেটরের মতে, উরাল পর্বতের দক্ষিণ দিকের ভূখণ্ডই সম্ভাব্য বাসস্থান। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতেও এই অঞ্চলটির গুরুত্ব খুব বেশি। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি উরালের পূর্বদিকে তিএন্‌শান্ পর্বতের পশ্চিমস্থ ভূখণ্ডকে আদি আর্য জাতির বাসভূমি বলে মনে করতেন। ভল্‌গা নদীর তীর থেকে গঙ্গার দিকে আর্যদের অভিযানের ধারণা অসঙ্গত নয়। উরালের দক্ষিণস্থ ভূখণ্ডের পশ্চিমে স্লাভ ও লিথুয়ানীয়দের বাসস্থান ছিল। দক্ষিণে হিত্তিদের এশিয়া মাইনরের দিকে চলে যাওয়া খুবই সম্ভবপর। ইরানীয় আর্যরা দক্ষিণে আর ভারতীয় আর্যরা দক্ষিণ-পূর্বে চলে যায়। তুখারীয় আর্য জাতি এই ভূখণ্ডের পূর্ব অংশে বাস করত। মোটামুটি রুশ চৈনিক তুর্কিস্থান অঞ্চলকে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষাভাষী আর্য জাতির আদি বাসস্থান এই জন্যে অনুমান করা যায় যে, এই অঞ্চলের মধ্যে ও চারপাশে কোন না কোন সময়ে ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর নানা শাখার লোকেরা বাস করত ও করে। অধুনালুপ্ত তুখারীয়, ভারতীয় আর্য, ইরানীয় আর্য, আর্মেনীয়, হিত্তি, স্লাভ ও লিথুয়ানীয় জাতিগুলি এই অঞ্চলে ও তার পাশের বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে বাস করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য কোন নিঃসংশয় প্রমাণ দেওয়া দুষ্কর।

ভারত ইউরোপীয় মূল ভাষার যে-রূপ গঠন করা হয়েছে, তার কোন লিখিত বা ঐতিহাসিক নমুনা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে অনুমিত রূপটির বৈশিষ্ট্যগুলি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুমানের দ্বারা গড়া হয়েছে। মূল ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল ছিল। গত সাড়ে চার হাজার বছরে দশটি শাখায় বিভক্ত এই ভাষাগোষ্ঠীর আধুনিক ভাষাগুলির ব্যাকরণ অবশ্য ক্রমশ সরল হয়ে এসেছে। বর্তমানে অন্তত এক মিলিয়ন লোক কথা বলে, এমন ভাষার সংখ্যা এই গোষ্ঠীতে প্রায় ষাটটি। মুখ্যত তুর্ক তাতারদের আক্রমণে এই গোষ্ঠীর কোন কোন ভাষা তো লুপ্ত হয়েছেই, সম্ভবত আদি বাসস্থানটিও হাত-ছাড়া হয়েছে। অবশ্য রুশ তুর্কিস্থান এখনও মস্কোর রুশ জাতির সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্বের অধীন। কিন্তু তুর্কিস্থানের স্থায়ী স্থানীয় অধিবাসীরা তুর্ক তাতার জাতীয়। গত সাড়ে চার হাজার বছরের ইতিহাস ধীর ভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মিশরের হামীয়রা, পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি, অসুর,

ব ালোনীয়, আরব প্রভৃতি সেমীয়রা এবং তুর্ক-তাতার জাতীয় নানা অভিযাত্রী দল ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতার কাজ করেছে।

ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে মূল ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী বা ইরানীয়-আর্য আর ভারতীয়-আর্য শাখা দুটি বহির্গত হয়। মূল ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীরই এখনকার ভাষাতাত্ত্বিক নাম "আর্য" ভাষাগোষ্ঠী। গ্রিআর্সনের মতো দৃষ্টিভঙ্গি যাদের, তাঁরা ভারত-ইরানীয় বা "আর্য" ভাষাগোষ্ঠীকে তিনটি শাখায় ভাগ করেন :—

(১) ইরানীয়-আর্য (২) দরদ-আর্য (৩) ভারতীয়-আর্য।

আমরা অবশ্য দুটি বিভাগ মেনে নিয়েছি—ইরানীয়-আর্য এবং ভারতীয়-আর্য।

যদি সমগ্র ভারত-হিত্তি বা ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে "আর্য" নাম না দেওয়া হয়, তা হলে ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর নাম "আর্য" দেওয়া যেতে পারে।

মিশ্রণের ফলে খাঁটি আর্য কেউ অবশিষ্ট আছে কি না, সে প্রশ্ন প্রায় অবান্তর। ইরানীয়রা এখনও আর্যামির গর্ব করে বটে, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে তুর্কো-ইরানীয়। ভারতের সম্ভ্রান্ত নবাব-বাদশাজাদাদের প্রায় সকলে তাই। আর ভারতীয় আর্যরা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্লীন হওয়ায় ভারতে নিগ্রোবটু, আস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোল, তুর্কি প্রভৃতি অনার্য জাতির সঙ্গে তারা প্রায় বেমালুম মিশে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মসঞ্জাত নব ভাবপ্লাবনের সময় এই মিশ্রণ খুব বেশি হয়েছিল। অন্তত অশোক ও হর্ষবর্ধনের সময় ও তাঁদের অব্যবহিত পরবর্তী কাল এ-সম্পর্কে লক্ষ্য করার মতো ঐতিহাসিক দুটি যুগ। ভারতের বৌদ্ধ ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটিতে শোণিতমিশ্রণ আধুনিক যুগের আগেই খুব বেশি পরিমাণে হয়েছিল। একমাত্র বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা শোচনীয় রক্তমিশ্রণের কুফল থেকে হিন্দুদের কতকটা রক্ষা করেছিল। এখন আধুনিক যুগে হিন্দু, খ্রীস্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়েই অবাধ শোণিতমিশ্রণ চলেছে। তাতে করে বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতির একতার হানি না হলেও মস্তিষ্কের উৎকর্ষের হানি যে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন "আর্য" বা ভারত-ইরানীয় ভাষাগুলির বসতি, বিস্তার, সঙ্কোচ ও বিবর্তন সম্বন্ধে দু-একটি বিষয় আলোচনা করতে হবে।

আদি-আর্য বা ভারত-ইউরোপীয় শাখার ভাষাগুলির আদি প্রসার এশিয়া মাইনর থেকে আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত মাতৃভাষারূপেই হয়েছিল। কিন্তু হিত্তি ও তুখার জাতিগুলি লুপ্ত হওয়ায় সেমীয় ও তুর্কদের আক্রমণের ফলে আর্য শাখার ভাষাগুলির অবস্থানভূমি কতকটা সঙ্কুচিত হয়। উত্তরে কাজাকস্থান পর্যন্ত এলাকায় এক সময়ে আর্যরা বাস করতেন। কিন্তু এখন আর্যদের বাসভূমি পশ্চিমে তুরস্ক থেকে পুবে ব্রহ্মদেশ এবং উত্তরে তাজিকিস্থান থেকে দক্ষিণে সিংহল ও মাল দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। এই অঞ্চলে ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান। ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রসার ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীনেও হয়েছিল ঔপনিবেশিকরূপে। ব্রাহ্মী লিপিচিত্রের প্রসার থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় আর্য সভ্যতা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশীয় অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার শ্রীবিজয়, ইন্দোচীনের চম্পা, কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের সভ্যতা সবটাই ভারতীয় আর্যদের দ্বারা প্রচারিত নয়; ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত বটে, যাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির লোকেরা সংখ্যায় অনেক ছিল এবং তারা ভারতীয়-আর্যভাষা সংস্কৃত ও তার পরবর্তী কোন কোন মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষাকেও ঐ সব ভূখণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল।

ইরানের মূল ভূখণ্ড তুরস্ক বা এশিয়া মাইনরের পুব থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এবং ককেশাস্ ও পামির থেকে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মূল ইরানীয়-আর্য ভাষার দুটি প্রাচীন রূপ ছিল :—

(১) আবেস্তীয় (২) প্রাচীন পারসিক।

জরথুস্ত্র-মতবাদীদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা আবেস্তীয়। এর সঙ্গে মূল ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বেদ ও তার ভাষা বৈদিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইরানের মূল ভূখণ্ডের উত্তর ও উত্তর-পুব অঞ্চলের কথ্যভাষা থেকে আবেস্তীয় এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের কথ্যভাষা থেকে প্রাচীন পারসিক ভাষা উদ্ভূত হয়।

আদি-আর্য (ভারত-ইউরোপীয়) মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময়ে অর্থাৎ সাড়ে চার হাজার বছর আগে আর্য (ভারত ইরানীয়) ভাষাগোষ্ঠীর দুই শাখার ভাষা-ভাষীদের অর্থাৎ ইরানীয় আর্য আর ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। এরা প্রথমে একটি নরগোষ্ঠী হিসেবে এশিয়া মাইনর থেকে পাঞ্জাব এবং কাজাকস্তান থেকে সিন্ধু নদের মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করত। পশ্চিমের প্রতিবেশী হিত্তিদের সঙ্গে এদের অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হিটাইট ও ইন্দো ইরানিয়ানরা একই আদিম মূল ভাষার লোক। বিশেষত সেই জন্যেও পারস্পরিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ হবার কথা। তুখার জাতির সঙ্গেও "আর্য" বা ভারত-ইরানীয় ভাষীদের সংশ্রব ছিল।

হিত্তিদের পরিত্যক্ত প্রচুরসংখ্যক প্রত্নলেখের মধ্যে অধুনালুপ্ত বাণমুখ লিপিতে লেখা যে সব শব্দসূচী ও গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায়, হিত্তিরা অধুনালুপ্ত সেমীয় জাতি আক্কাদীয় ও সুমেরীয়দের প্রভাবে জজরিত ছিল; কিন্তু তাদের পরিভাষায় ভারতীয়-আর্যভাষার বিশিষ্ট আদিম রূপও দেখা যায়। অর্থাৎ হিত্তিরা এবং ভারতীয়-আর্যভাষীরা একই যুগে বর্তমান ও পরস্পরের নিকট অবস্থিত ছিল। তুষার বা তুখার জাতি অর্থাৎ তুখারীয় বা তোখারীয়দের পুঁথিপত্র ও প্রত্নলেখগুলি ভারতীয় লিপিচিত্রের দুই শাখা খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির কোন না কোনটিতে লেখা। সুতরাং বেশ বোঝা যায় যে, এক সময় ভারতীয় আর্যসভ্যতা সমস্ত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিল। মেসোপোটেমিয়ার পূর্বদিকস্থ মিতান্নি রাজসভার ভাষাও যে ভারতীয়-আর্যভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এমন একটা সময় ছিল যখন হিত্তি ও ভারতীয়-আর্য পাশিপাশি বাস করত। ঐ দুই ভাষার লিখিত নিদর্শনই সব চেয়ে প্রাচীন আমাদের ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর জগতে। এই কারণে ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠী নামকরণ স্বীকৃত হয়েছে। এশীয়-আর্য ভাষাগুলিই প্রাচীনতর। ইউরোপীয়-আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব অপেক্ষাকৃত বিলম্বে। হিত্তি আর ভারতীয় আর্যরা একত্র থাকতে থাকতে ভারতীয় আর্যদের এক শাখা ধর্মীয় বিসংবাদ ও অন্য কারণে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এরাই ইরানীয় আর্য। এমন পণ্ডিতও আছেন যিনি মনে করেন, ভারতীয় আর্যরাই মূল আর্য বা আদিম আর্য বা ভারত-হিত্তি, ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রবর্তক আদি জাতি ছিল এবং হিত্তি, ইরানীয়, আর্মেনীয়, তোখারীয়, স্লাভ প্রভৃতি শাখা ক্রমে ক্রমে মূল ভারতীয় আয বা আর্য জাতি ও ভাষাগোষ্ঠী থেকে বহির্গত হয়ে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও রুশিয়া তথা ইউরোপের নানা অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। অবশিষ্ট ভারতীয় আর্য জাতি ভারতেই থেকে যায়। ভারত এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে মূল ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান। এঁদের মতে, ভারতীয় আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেন নি, তাঁরা প্রথমাবধি ভারতেই বাস করতেন। এ-সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সতেজ ভঙ্গিতে বলেছেন :—

"ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখান হচ্ছে। এ অতি অন্যায়। ····· ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ ক'রে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যেরাও তাই করেছে!····· বলি, এর প্রমাণটা কোথায়? আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখো গে। কোন্ বেদে কোন্ সূক্তে কোথায় দেখছ যে, আর্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—১০৮-০৯ পৃষ্ঠা।)

আমাদের মস্তিষ্ক আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে কি ভাবে বন্ধক রাখি, পরে বৈদিক সভ্যতার কালনির্ণয় প্রসঙ্গে তা আলোচনা করা যাবে।

পরবর্তী কালে সেমীয়-হামীয় ও তুর্ক-তাতার গোষ্ঠীর নানা জাতির আক্রমণে হিত্তি ও মিতান্নি জনপদগুলি বিধ্বস্ত হয়। খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ সালের যে-সব প্রত্নলেখ আসীরীয় ও আক্কাদীয় ভাষায় এবং বাণমুখ লিপিতে পাওয়া গেছে, তাদের সঙ্গে হিত্তি ও মিতান্নিদের লিপিগুলির তুলনা করলে বোঝা যায়, হিত্তিরা বহু কাল থেকে সেমীয় নরগোষ্ঠীর আক্রমণে বিব্রত আর তাদের প্রভাবে নির্জিত ছিল। তুর্ক ও মঙ্গোল-জাতীয় আক্রমণকারীদের দ্বারা তুখারীয় জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতীয় ও ইরানীয়, দুই

আর্য শাখার নরনারীরা অনেকের মতে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতক পর্যন্ত একত্র বাস করত।

খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী বিশ্লিষ্ট হতে আরম্ভ করে। এরও অনেক দিন আগে হিত্তিদের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের বিচ্ছিন্নতা সাধিত হয়েছে। ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে ভারত-ইরানীয় শাখার বিচ্ছিন্ন হবার কারণ, সম্ভবত কোন বর্বর জাতির আক্রমণে রচিত ভৌগোলিক ব্যবধান। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকে ভারতীয়-আর্য শাখা থেকে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখা পৃথক্ হয়ে যায়। খুব বেশি দেরি হয়ে থাকলে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইরানীয় আর্যরা ভারতীয় আর্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এই আলাদা হবার কারণ, ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আত্মকলহ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে বেদগ্রন্থের চূড়ান্ত সঙ্কলনকার্য সমাপ্ত হয়ে থাকবে। এর পর আমরা কিছু কাল সবাই বেদাচারী যজ্ঞোপাসক ছিলেন। কিন্তু জরথুস্ত্র মতবাদ তথা আবেস্তীয় ধর্মমত শীঘ্রই এমন একটা তীব্র সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করে যে, আর্যরা বেদ ও আবেস্তাকে অবলম্বন করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ইরানীয় আর্যরা প্রথমে কিছু ঐহিক ভোগসুখ লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে। ভারতীয় আর্যরা নানা ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে উঠে আজও সংখ্যায় ও প্রভাবে বাড়তির দিকে। কিন্তু ইরানভূমির দুর্গতির কথা সুবিদিত।

বিচ্ছেদের পরে ইরান ও ভারতের দুই শ্রেণীর আর্যদের মধ্যে এমন উৎকট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় যে, ভাষার ওপরও তার প্রভাব পড়ে। ভারতীয় আর্যরা নিজেদের সুর অর্থাৎ বেদ ও দেব-উপাসক বলে পরিচিত করেন। প্রতিবাদে ইরানের আর্যরা অসুর অর্থাৎ বেদবিরোধী দেবদ্রোহী আবেস্তাপূজক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হলেন। কিছু দিনের মধ্যে এই ধর্মকলহ দুই শাখার লোকদের এমন ভাবে পৃথক করে দিল যে, আবেস্তীয় ভাষায় দএব < দেব শব্দের অর্থ দাঁড়াল অপদেবতা এবং বৈদিক ও প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষার অন্য রূপে অসুর শব্দের অর্থ হল দৈত্য বা কদাচারী সত্তা। অথচ ঋগ্বেদের ভাষায় অসুর মানে দেবতার বিশেষণ সম্মানবাচক শব্দ; ঋগ্বেদ রচনার সময়ে ইরান ও ভারতের আর্যরা বিভক্ত হয়ে পড়েন নি। পরে অসুর শব্দের অর্থ প্রথমে "ইরানীয়" এবং পরে "অপকৃষ্ট সত্তা" হয়ে গেল। পক্ষান্তরে জরথুস্ত্রীয়রা ভারতীয় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে অপদেবতা আখ্যা দিলেন। দএব শব্দের অর্থ প্রথমে "ভারতীয়" এবং পরে "অপদেবতা" হল। আজ ফার্সি প্রভাবিত নবীন ভারতীয়-আর্যভাষায় "দেও," "দানা" দুটি শব্দই অপদেবতা বোঝায়। জরথুস্ত্রীয়রা অসুর বলতে ঈশ্বর ও পবিত্র সত্তা বুঝতে লাগল। ভারতীয় আর্যরা দেব বা সুর বলতে ঠিক তাই বুঝল। আবেস্তায় ঈশ্বরের নাম আহুর-মজ্দা অর্থাৎ অসুরমেধাঃ বা মহৎ জ্ঞান। এই ভাবে আর্য জাতির দুটি শাখা একে অপরের শত্রু হয়ে উঠে পরস্পরের শ্রদ্ধেয়দের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও কাব্যকাহিনীতে যে দেবাসুর-সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায়— দুই দল আর্যের মধ্যে যথেষ্ট যুদ্ধও হয়েছিল। আসীরীয় বা প্রকৃত অসুর, শক, হুন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিরা এই আত্মকলহের সুযোগে মাঝে মাঝে ইরান ও ভারত আক্রমণ করত। তখন এরা একে অপরের বিপদে উদাসীন থাকত। শেষে আরবদের প্রচণ্ড আক্রমণে পারসিকরা পর্যুদস্ত হলে কিছু সংখ্যক জরথুস্ত্রীয়-বেদাচারী ভারতে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করেন। তাঁদের এখন পার্সি সম্প্রদায় বলা হয়।

[ক্রমশঃ
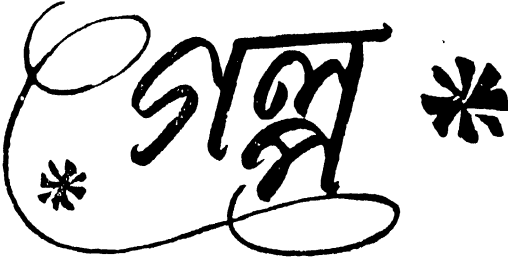
শবরী

মীরা রায়

চাঁদের আলোয় মেঠো রাস্তার ওপর ওদের চলমান ছায়া দুটো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ রাতের এই নিঃঝুম থমথমে আবহাওয়া কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। দুপাশের ঝোপঝাড়ের এক অদৃশ্য ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে সরু রাস্তাটাকে সামনে রেখে ওরা এগিয়ে গেল। যাত্রার প্যাণ্ডেল, গ্যাসের বাতি, লোকজনের কোলাহল ক্রমে পিছনে মিলিয়ে গিয়ে এক অখণ্ড নীরবতা ঘন হয়ে ওদের ঘিরে ধরল। যাত্রার আসর থেকে উঠে এসে হঠাৎ এই নিদারুণ নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে রমা যেন হাঁফিয়ে উঠল। বেশ তো যাত্রা শুনছিল, হঠাৎ বাড়ী ফেরবার তাড়ায় মন ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? মনের আনাচ-কানাচ হাঁতড়ে খুঁজল কারণটা কি সত্যিই বাড়ী ফেরবার তাড়া না বহুদিন বাদে অভিজিৎ দেশে ফিরেছে তাকে খানিকটা একান্তে পাওয়ার আশায় বাড়ী ফেরবার অছিলায় ওকে সঙ্গে নিয়ে সে উঠে এল? মেয়েদের চিকের এপাশে বসে সে চিকের ওপাশে বসে-থাকা অভিজিতের মূর্তিটাকে নিখুঁৎভাবে অবলোকন করছিল, একথা আর কেউ না জানুক তার নিজের কাছে তো আর গোপন ছিল না। এইজন্যই অভিজিৎ যেই সিগারেট খেতে উঠে গিয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়েছে, রমাও তখনি বাড়ী ফেরবার অছিলায় উঠে গিয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে গিয়েছে।

চলতে চলতে নীরবতা কাটিয়ে রমা বলে উঠল, "অভিদা, একলা অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে বেশ ভয় করত, তোমায় সঙ্গী হিসাবে পেয়ে বাঁচলাম।"

অভিজিৎ একটু থমকে দাঁড়াল, মৃদু হেসে বল্ল, 'সত্যিই কি তাই রমা? আজ কয়েক বছরই নাহয় কলকাতাবাসী হয়েছি, কিন্তু জন্ম থেকেই যে আমরা একসঙ্গে বড় হলাম, মানুষ হলাম, তাতে কি তোমার চেনবার ক্ষমতা আমার একটুও জন্মায়নি? রমা, চার বছর আগেও তুমি যেমন করে আমায় চাইতে, আজও ঠিক তেমনি করেই আমায় চাও। কিন্তু তোমার সিঁথির ঐ আর একজনের আয়ুর চিহ্নটুকু আমার সঙ্গে প্রকাশ্য মেলামেশায় বাধা দিচ্ছে, তাই তোমার এই গোপন অভিসারের জন্য বাড়ী ফেরবার তাড়া জেগেছে! একথা আর কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝি। তাই তো তুমি অনুরোধ জানাতেই তোমার সঙ্গে এলাম।'

মনে মনে রমা শিউরে উঠল, তার সযত্নে গোপন রাখা ক্ষতস্থানটায় অভিজিৎ বড় নিষ্ঠুরভাবে হস্তক্ষেপ করল। প্রকাশ্যে সে নিস্পৃহ উদাসভাবে বল্ল, 'ওসব কথায় আর কাজ কি অভিদা, তার চাইতে তোমাদের কলকাতার গল্প বল, শুনি। কি পড়াশোনা করলে, কি কাজকর্ম করছ?' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রমা। 'সত্যি অভিদা, বহুদিন বাদে তোমায় বাড়ী ফিরতে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে'।

অভিজিৎ একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে যেন অতীতের ছেঁড়া কয়েকটা পাতা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নীচু স্বরে বল্ল, 'তোমার এ আনন্দ বেশী দিন থাকবে না রমা, আমি কলকাতার যে ফার্মে কাজ করতাম সেই ফার্ম থেকে আমায় বিলাত পাঠাচ্ছে আরও উন্নতির জন্য। এক মাসের মধ্যেই আমায় রওনা হতে হবে। যাবার আগে বাড়ীর জন্য, বাবা মার জন্য মনটা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাই দশ দিনের জন্য এলাম সকলের সঙ্গে দেখা করে যেতে।

অভিজিতের কথাগুলো শুনতে শুনতে রমার পা দুটো বড় অবাধ্যতা সুরু করে দিল, তার চলার গতি ক্রমশঃই শ্লথ হয়ে এল।

রাস্তাটা মোড় ঘুরে গিয়েছে, বেশ কিছু ঘন গাছপালার জটলা এখানে। চাঁদের আলোর এখানে অবাধ সঞ্চরণ নেই। অন্ধকারের সঙ্গে রূপোলী রেখার লুকোচুরি খেলা চলছে। আলো আঁধারির এই দুর্বোধ্য হিজিবিজির মাঝে রমার মনেও স্মৃতির হিজিবিজি রেখাগুলোও দারুণ বিপ্লব

বাধিয়ে তুলল। গাঢ়স্বরে ও ডাকল, 'অভিদা, শুধুই কি বাবা মাকে দেখবার জন্য মন ব্যস্ত হল, আমাদের……তোমার ছোটবেলার সঙ্গীদের কথা কি একটুও মনে পড়ল না?' একটু চুপ করে থেকে আবার বল্ল, 'তোমরা, পুরুষ জাতটাই বড় নিষ্ঠুর।'

ছিটফিটে অন্ধকারে সন্ধানী দৃষ্টির অভিযান চালিয়েও অভিজিৎ রমার মুখের ভৌগোলিক রেখাগুলোর ব্যাখ্যা নির্ণয় করতে পারল না। রমার এ অভিযোগের উত্তর দিতে নিজেকে বড় অসহায় দুর্বল মনে হতে লাগল, রমার কাছে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। বিগত একদিনের এক করুণ রসঘন ছবি বার বার তার মনে ভেসে উঠতে লাগল।

সে তার কিশোর সঙ্গিনী রমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে কামনা করেছিল সত্য, কিন্তু যেদিন এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় একটি অসহায় আকুল কিশোরীচিত্ত আসন্ন বিবাহের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তার কাছে এসে আশ্রয় চেয়েছিল, তখন সাহস করে তাকে সে আশ্রয় দিতে পারেনি। নিজেই ছিল পিতার আশ্রিত, তাই আশা দিয়ে রমাকে ভুলিয়েছিল 'তুমি কি কিছুদিন প্রতীক্ষা করতে পারবে না রমা? আমায় তোমার ভার নেবার উপযুক্ত হতে দাও। আমি কলকাতায় পড়তে যাব, তারপর একটা কাজকর্ম করতে পারলে তোমার সব ভার নিতে পারব। আমার জন্য কি ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে পারবে না রমা?'

ডুবে যাবার সময় মানুষ এক মুঠো ঘাস ধরেও যেমন বাঁচবার আশ্বাস পায়, রমাও অভিজিতের এই আশ্বাসে একটা নিভরতা খুঁজে পেয়েছিল, সোৎসাহে বলেছিল, 'নিশ্চয় অভিদা, আমি তোমার সে দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকব। এ বিয়ে আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না।'

বিরাট একটা প্রতিশ্রুতির আনন্দ নিয়ে রমা চলে গিয়েছিল এবং সেই বিয়ে তো নয়ই, অন্য সম্বন্ধ পর্যন্ত বাবাকে করতে দেয়নি।

এরপর অভিজিৎ কলকাতায় চলে গিয়েছে, পড়াশোনায় মেতে উঠে নিজেকে সব ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। রমার পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, এবং রমার অভিযোগ অনুযোগ চোখের জলে-ধোওয়া অক্ষরগুলোর আবেদন ক্রমে ফিকে হতে ফিকে হয়ে স্মৃতিপটে মিলিয়ে গিয়েছে—অবশেষে রমার কালি-কলমের দৌড় এক নিঃসহায় বেদনার অন্তরালে থেমে গিয়েছে। মুখর অতীতকে কণ্ঠরোধ করবার জন্য অভিজিতের প্রয়াসের অন্ত ছিল না, দেশের সঙ্গে ও সমস্ত যোগাযোগ ক্রমেই খুব কমিয়ে দিয়েছিল।

ওদিকে রমাও অসীম প্রতীক্ষা ও সংশয়ের মাঝে দিশাহারা হয়ে বাধ্য হয়ে বাবার নির্বাচিত পাত্রে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। প্রতিবাদের ভাষা ব্যর্থতায় জরাগ্রস্তে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। এমন কি অভিজিৎকে পর্যন্ত জানাবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তার হয়নি। কলকাতায় অভিজিতের কাছে সংবাদ ঠিকই পৌঁছেছিল, কিন্তু তার কর্মব্যস্ত জীবনে রমার জন্য একটু সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু সঞ্চিত ছিল না, নীরবে শুধু কামনা জানিয়েছিল রমা সব ভুলে গিয়ে সুখী হোক।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা চিরদিনই মানুষের প্রার্থনায় বধির, তাই অভিজিতের কামনা এবং রমার বাবার সব মঙ্গল-চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সে রমার জীবনে এনেছিল মূর্তিময় অভিশাপ। বিবাহিত জীবনে রমার জন্য অপেক্ষা করছিল দাম্পত্য জীবনের এক চরম উপহাস। তার নব বিবাহিত স্বামীর আগের পক্ষের স্ত্রী বর্তমান থাকায় রমার কপালে স্বামীর ঘর করা আর হয়ে ওঠেনি। রমার বাবা সব জানতে পেরে সেই যে মেয়েকে কাছে এনে রেখেছেন আর তাকে পাঠাননি। পরন্তু এই দ্বিতীয় বিবাহ আইনতঃ অসিদ্ধ বলে জামায়ের বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছেন।

বাড়ী ফিরে এসে অভিজিৎ সবই শুনেছিল। ব্যথিত হওয়ার চেয়ে নিজের অপরাধের গুরুত্বটা যেন তাকে বেশী পীড়িত করে তুলেছিল। রমার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবার মত মনের জোর তার ছিল না, আজকের যাত্রা-সভায় রমাকে দেখতে পেয়ে ও খুশীই হয়েছিল এবং আরও অবাক হয়েছিল রমার আহ্বানে। আশ্চর্য! এত কাণ্ড হয়ে গিয়েছে অথচ রমার যেন কিছুই হয়নি, অত্যন্ত সহজ ভাবেই সে অভিজিতের উপস্থিতিকে মেনে নিয়েছিল। অভিজিতের খুব বিস্ময় লাগল এত সহিষ্ণুতা ও কোথা থেকে পেয়েছে? একটু আহতস্বরে বল্ল, 'আমার অপরাধের

কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে নতুন করে আঘাত দিও না রমা। তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা থাকলেও তোমার সামনে এগিয়ে এসে কথা বলবার মত মনের জোর খুঁজে পাইনি। আজকে হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।'

একটু থেমে আবার গাঢ়স্বরে বল্ল, 'তোমার বিবাহিত জীবন যে সুখের হয়নি এবং হতেও পারে না এ খবর তো আমার সবচেয়ে ভালো করে জানবার কথা, কিন্তু বড় নিরুপায় হয়েই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়েছিল! কিন্তু রমা, আজ এই অপরাধ ভারাক্রান্ত মনটা বড় অসহায় ভাবেই তোমার মনের কাছে একান্ত আশ্রয় চাইছে। বাহ্যতঃ আমরা পৃথক হলেও অন্তরে আজও আমরা এক আছি, এই দাবীটুকুতেও কি তোমার ক্ষমা আমায় এতটুকুও সান্ত্বনা দেবে না?'

আবার যেন একটা পুরাণো ব্যথা রমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রি-গুলোতে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে গেল। চাঁদে বোধহয় একটুকরা মেঘ জমে ছিল, একটা মুমূর্ষু আলোর রেখা রমার মুখে হোঁচট খেয়ে আটকে ছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে লেগেছে ঠাণ্ডার স্পর্শ, তার শিহরণে কিংবা দারুণ উত্তেজনা দমনে রমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সামনের একটা ঢিবিতে হোঁচট খেয়ে রমা থমকে দাঁড়াল। ত্রস্ত হাত বাড়িয়ে অভিজিৎ ওকে ধরে ফেল্ল, হাত দিয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাতেই ওর উত্তপ্ত হৃদয়ের গলিত বিন্দুগুলোকে চোখের কোণে মুক্তি পেতে দেখল।

সেই মুহূর্তের জন্য অভিজিতের মধ্যে এক রোমান্টিক নায়কের জন্ম হল। রমার হাতটা তখনো ওর হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে। এই স্পর্শটুকুর মধ্য দিয়ে তাদের হৃদয়ের গোপন বার্তার হয়ত কিছু আদান-প্রদান ঘটল। স্থানকাল পাত্র ভুলে নিছক একটি প্রেমিক মনের আকুলতা নিয়ে সে রমাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করল, 'আচ্ছা রমা, আমি কি তোমার কোন উপকারই আর করতে পারি না? যে জীবনটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে তাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে জীবনটাকে কি নতুন করে গড়ে তোলা যায় না?'

রমা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে বল্ল, 'দোষ তোমায় দেব না অভিদা', সবই আমার নারী জন্মের দোষ। এটুকু বুঝেছি, সব প্রাণীজন্মের প্রায়শ্চিত্ত জন্ম হল বাঙ্গালী ঘরে নারীজন্ম। অতীতকে মুছেই ফেলতে চাই কিন্তু কি ভাবে নতুন জীবন গড়ে তুলব তুমি বলে দাও। তুমি জান বোধ হয়, বাবা আমার বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা দায়ের করেছেন এবং শীঘ্রই আমি ডিক্রী পেয়ে যাব, তখন তো আমি মুক্ত। আমায় তো একটা কিছু পথ বেছে নিতেই হবে।

একটু চিন্তা করে অভিজিৎ বল্ল, 'তুমি যদি কলকাতার বোর্ডিংএ থেকে পড়াশোনা কর এবং তারপর কোথাও একটা চাকরীতে ঢুকে পড়তে পার, তাহলে তোমার বাকী জীবনটা কারুর গলগ্রহ না হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। তোমার কলকাতার থাকা ও পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে আমি বিদেশ রওনা হব। বেশ করে ভেবে দেখ রমা, পারবে কি তুমি এখানকার সব ছেড়েছুড়ে আমার ওপর নির্ভর করে চলে যেতে? আমি এক বছর পরে দেশে ফিরব, এই সময়টা তোমায় একলা বোর্ডিংএ থাকতে হবে।'

রমার বুভুক্ষু মনটা হঠাৎ যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় আনচান করে উঠল। এতদিন পরে তার বহুদিনের ঘুমন্ত বাসনটা যেন অজগরের মত ফুঁসিয়ে জেগে উঠল। তার আদিম ও একান্ত কামনার লোভার্ত নগ্ন রূপটা সব বাধা অস্বীকার করে উন্মত্তভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

'আমি তোমায় একান্ত আপনার করে আজও পেতে চাই অভিদা, আমি যাব তোমার সঙ্গে কলকাতায়। তুমি আমার যে ব্যবস্থা করে দেবে আমি সেই মত ঠিক থাকতে পারব। আমি তোমার দেশে ফেরার প্রতীক্ষায় থাকব, তারপর ফিরে এসে তুমি আমায় আপনার করে গ্রহণ করবে, আমার জীবনভোর প্রতীক্ষার সার্থক অবসান ঘটবে! প্রথম জীবনে নিষ্ঠুর ভাগ্য তোমায় আমায় পৃথক করে দিয়েছিল, কিন্তু তোমার আশায় আমার প্রতীক্ষার তো শেষ হয়নি। আজও যে তার সাধনা চলছে অভিদা! এ সুযোগ পেয়ে কি আমি ছেড়ে দিতে পারি?'

ওর বলার দৃঢ়স্বরে অভিজিৎ বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল 'এত শীঘ্র উত্তর দিওনা রমা, বেশকরে ভেবে দেখে পরে জানিও' বলতে বলতে ওর মুখ ফেরাতেই নজরে পড়ল রমার আগ্রহ উৎসুক মুখখানা, আধ অন্ধকারে চোখদুটো অস্বাভাবিক জলজল করছে। ঐ দৃষ্টির তীব্র আবেদন অভিজিতের মনের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

রমার উষ্ণ নিঃশ্বাস ও যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগল—এযেন একটি বুভুক্ষু আত্মার ব্যাকুল আবেদন নিবেদন বার্তা। এ নিবেদনের চরম আকুতিকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা অভিজিৎ সেই মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেল্ল।

চারদিকে যেন ওর মহাসংশয়ের ঘূর্ণ্যাবর্ত, এর মাঝে ও যেন তার অসহায় দ্বিতীয় শৈশবকে খুঁজে পেল, ওর সমস্ত বিচারশক্তি বর্তমানের এক ঘোর আবেশের জর-বিকারে অচৈতন্য হয়ে গেল। জটলা পাকানো বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে অতীতের ফেলে আসা এক ম্লান স্মৃতি সহসা আজ বিরাট আকারে সমস্ত মনটা দখল করে বসল। এই মুহূর্তে রমার জন্য একটা বড়রকম কিছু করবার নেশায় তার মনের বালক সুলভ জেদী প্রবৃত্তিটা অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠল।

'তোমার সব ভার আমি নেব রমা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার, যদি আরও এক বছর অপেক্ষা করতে পার, তাহলে বোধহয় সবই সম্ভব হয়।' কথা বলতে বলতে কি একটা গভীর চিন্তায় অভিজিৎ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর যেন কোন অতল গহ্বর থেকে ওর স্তিমিত স্বর ভেসে এল, 'যদিও স্ত্রী হিসাবে তোমায় নাও পাই পথ চলার সঙ্গিনী হিসাবেও তো তোমায় পেতে পারি? কিন্তু পারবে কি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে, নির্ভর করে প্রতীক্ষা করে থাকতে?'

রমা নিশ্চুপ। অভিজিতের এই ভাবান্তর তার লক্ষ্যে আসেনি, একটা অবিশ্বাস্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রঙীন নেশার মাদকতায় ওর সামনে উল্লাস নৃত্য সুরু করেছে। তারই অনাস্বাদিত পুলকে ওর মন বিভোর, ওর ভগ্ন স্বপ্ন যেন নবজন্ম লাভ করছে ঐ আগামী দিনের মধ্যে। অভিদার পাশে দাঁড়িয়ে ও পৃথিবীর সর্বত্র যেতে রাজী, এখানকার এই গ্লানিময় জীবনের প্রতি তার এতটুকুও স্পৃহা নেই।

'যাব আমি অভিদা তোমার সঙ্গে, তোমার জন্য প্রতীক্ষায় আমি যে আনন্দ পাব তার এতটুকু স্বাদও এখানে নেই—এ আমার পরম অভাগ্য বস্তু। তুমি আমায় নতুন করে বাঁচবার পথ ঠিক করে দাও, তারপর তোমার সঙ্গিনী হতে কোন বাধা থাকবে না।' রমার অবাধ্য ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে, অনেক অব্যক্ত কথা জমা হয়ে রইল চোখের কোণে জলবিন্দুগুলোর মাঝে, শুধু তার এই নীরব আত্মাঞ্জলির সাক্ষী হয়ে রাত্রির ভারী মুহূর্তগুলো হঠাৎ যেন হাল্কা হয়ে উড়ে যেতে লাগল।

অভিজিৎ ওর মাথায় হাতটা রেখে ওকে কিছুটা শান্ত করতে চাইল।

'উতলা হয়ো না রমা, আজ রাত্রিটা ভালো করে চিন্তা করে দেখ, তারপর যদি ভেবে স্থির কর আমার সঙ্গে যেতে পারবে, তাহলে একেবারে তৈরী হয়ে রবিবার দিন সন্ধ্যা সাতটায় ষ্টেশনের গায়ে শানবাধান বকুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থেকো, আমি ঐদিন কলকাতায় ফিরে যাব—তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব।

একটা উদ্বেল ভাবতরঙ্গ প্রাণপণে চেপে রমা নিঃশব্দে এগোল। রাত্রিটা ভেবে দেখবার কিছু নেই, ও এখনিই স্থির করে ফেলেছে যে কলকাতায় যাবে। অভিদা যখন সব ব্যবস্থাই করে দেবে তখন দেখাই যাক না জীবনের একটা মোড় ফেরানো যায় কি না। তাছাড়া এখানে থেকে এই দুঃখের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে আর সে রাজী নয়।

চাঁদের ওপর দিয়ে এবার বিরাট বিরাট মেঘের দলের মিছিল চলেছে, চারপাশ থেকে ঘন অন্ধকার চেপে এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে ধরল। রাস্তাটা ঘুরে যেতেই তার শেষ প্রান্তে আবছা ভাবে রমাদের পুরাণো নড়বড়ে বাড়ীটা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দিল। রমার হাতটায় একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে অভিজিৎ বল্ল, 'ঐ তো তোমাদের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, এবার তুমি যেতে পারবে। আমি এখানটায় দাঁড়াচ্ছি, তুমি একেবারে ঢুকে গেলে চলে যাব।' রমা আচ্ছন্নের মত চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। অন্ধকারে দণ্ডায়মান অভিজিতের দীর্ঘ মূর্তিটা যেন বড় বেশী অপরিচিত বলে মনে হল। হাওয়ায় লটপট করে উড়ছে ওর পাঞ্জাবীর খুঁটটা। রমার বাষ্পজড়ানো দৃষ্টির সামনে অভিজিতের মূর্তিটাও অস্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ রমার মনে হল ঐ অস্পষ্ট মূর্তিটাকে রাতের এলোমেলো বাতাস যেন সজোরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহু দূরে, যেখানে তার জীবনভোর প্রতীক্ষার কোন আবেদনই নাগাল পাবে না। মনের এই অমূলক কল্পনাকে জোর করে দূর করে, চোখদুটো কচলে পরিষ্কার করে নিয়ে রমা আবার পা বাড়াল।

মাঝের কয়টা দিনের দীর্ঘ মুহূর্তগুলো অত্যন্ত বিলম্বিত-

লয়ে ফুরিয়ে গেল। রমার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা সেই রবিবারের সন্ধ্যা যেন রঙিন পাখায় ভর দিয়ে উড়ে এল। পিছনের জীবনের কোন স্মৃতিই রমা সঙ্গে নিতে চায়নি, তাই প্রায় এক বস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল নতুন জীবনের সন্ধানে। ষ্টেশনের ধারে বকুল গাছটার শানবাঁধানো বেদীতে বসে সে আবিষ্কার করছিল সেই নবজন্মের সূতিকাগৃহ।

অনেকগুলো গাড়ী রমাকে চমকে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল, কিন্তু তার ঈপ্সিত গাড়ীখানাই যেন এপথের থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে কোথায় চলে গিয়েছে! অনেকক্ষণ পরে রমা দেখতে পেল অভিজিতের ছোট ভাই মণ্টু এদিকে এগিয়ে এসে কাকে যেন খুঁজছে। হাঁপাতে হাঁপাতে মণ্টু রমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'এই যে রমাদি তোমাকেই খুঁজছিলাম। দাদা কাল কলকাতায় চলে গেছে এই চিঠিটা তোমায় আজ দিতে বলে গেছে। এই নাও।'

একটা কাগজের টুকরা রমা হাত বাড়িয়ে ধরল। আশা-নিরাশার একটা প্রচণ্ড ঝাপটায় রমার হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে যেতে চাইল। ঐ সামান্য কাগজের টুকরোটায় তার জন্য রয়েছে অনেক সংশয়ভরা প্রশ্ন। রমার চোখের সামনে নিছক কালির আঁচড়ের হিজিবিজি ও অক্ষরগুলো নয়, ঐ আঁচড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে তার উত্তপ্ত হৃদয় নিংড়ানো জীবন্ত আশাস্মৃতির সশঙ্ক অভিসার চলেছে। ওর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। খোলা কাগজের টুকরোটার সামনে দিয়ে ওর ত্রস্ত দৃষ্টিটা দ্রুত চলে গেল—

'রমা, কাপুরুষের মত পালিয়ে গেলাম, দুঃখ তুমি পাবে জানি, কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যে কথা স্বীকার করতে পারতাম না, সেকথা জানাবার জন্য এই লেখার প্রয়োজন। সেদিন তোমার শবরী-মূর্তির তাপসী রূপের কাছে আমার সকল অভিমানের চরম পরাজয় ঘটেছিল। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ায় তোমার বড় রকম একটা কিছু উপকার করবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে, নিজের দিকের প্রতিবন্ধকগুলো সব ভুলে তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্যও অঙ্গীকার করেছিলাম। তোমার সব দায়িত্ব আমি এখনও নিতে পারি কিন্তু স্ত্রী হিসাবে নয়। এর যে মূল কারণ সেইটাই তোমায় বলা হয় নি। আমাদের ফার্মের মালিক-কন্যার সঙ্গে প্রজাপতির দলিলে স্বাক্ষর করে আমার বিলাত যাবার ছাড়পত্র যোগাড় করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছ আমায় লাল চেলীর আঁচল ধরে লাল ফিতার ফাঁসের মধ্যে ঢুকতে হবে, উচ্চপদ প্রাপ্তির এই আমার অগ্রিম মুনাফা। এই নির্মম সত্যটা সেদিন তোমার ঐ মূর্তির সামনে স্বীকার করবার মত মনের জোর খুঁজে পাইনি, তাই বলেছিলাম তোমার স্ত্রী হিসাবে না পেলেও তোমায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারলেও অনেক সান্ত্বনা পেতাম, এজন্যই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে তোমায় সব জানানো প্রয়োজন হিসাবে সব লিখলাম। এ সব জেনেও যদি আসবার মত মনের অবস্থা তোমার থাকে, তুমি আসতে পার কিন্তু এক বছর তোমায় প্রতীক্ষা করতেই হবে। ভেবে দেখলাম এই এক বছর কলকাতায় একা থাকার চেয়েও তোমার আত্মীয় স্বজনের মাঝে থাকাই সঙ্গত।

পুরাণের শবরীর প্রতীক্ষা তো ব্যর্থ হয়নি। প্রেমিকা নারীর প্রতীক্ষা যুগে যুগে সেই একই শবরীর প্রতীক্ষা! ইতিহাস যেমন তা কোনদিন ব্যর্থ হতে দেখেনি, ভবিষ্যতেও তা কোনদিন হবে না। তোমার মধ্যে যদি সেই শবরী জন্মলাভ করে থাকে, তবে তার সাধনা কোন দিন ব্যর্থ হবে না। যত অপরাধই তোমার কাছে করি না কেন, তোমার মহাপ্রাণ প্রেমের কাছে আমার অক্ষমতার দৈন্য যে ক্ষমা নিশ্চয় লাভ করবে এটুকু স্থির বিশ্বাস আমার পরম সান্ত্বনা। যে কঠিন বেদনা তোমার জীবনকে বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই সত্যের শুভ শক্তি তোমার সাধনায় সার্থকতা এনে দেবে, জীবনকে এই চরম সত্যের মাঝে আবিষ্কার করে তুমি নিশ্চয় এক দিন সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। ইতি—

অভিজিৎ।'

পড়তে পড়তে রমার কাছে সেই নীরব সন্ধ্যাটা যেন মুখর হয়ে উঠল, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা শরীরের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ থেকে পাক খেয়ে খেয়ে গুলিয়ে উঠতে লাগল। দ্যুলোক ভূলোক জুড়ে কোন এক বুভুক্ষু আত্মার চাপা বিলাপ ধ্বনি একটানা গুমরোচ্ছে, তারই রেশ বিস্তৃত গগনপট জুড়ে রয়েছে। বাতাসে বাতাসে বৃন্তবলয়ের মাঝে মাঝে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই আকুলতার

সুর। বকুল গাছের নীচে অপেক্ষমাণা এক শবরী হৃদয়ের ধীরে ধীরে সমাধি ঘটে যাচ্ছে। চারিদিকের আলোয় ভরা সন্ধ্যা প্রকৃতির আনন্দোৎসবের ব্যর্থ আবেদন সেই সমাহিত মূর্তির কাছে নিষ্ফল স্বাক্ষর রেখে গেল। হায় রে মানব প্রেম। কঠিন বেদনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তার রাজসিক রূপের আভরণ খসে, এবার তার বৈরাগীর গৈরিক ভূষণে রাঙা হয়ে বেদনার হাটে ভিক্ষাঞ্জলি নিয়ে দাঁড়াবার পালা। এখন সব কথাই স্তব্ধ, একটানা অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলোর মাঝে শুধু একটি নাম, একটি মুখকে আশ্রয় করে তার শবরী-জীবনের যাত্রা সুরু! এই মুহূর্তগুলিতে মৃত্যুর জড়ত্ব প্রত্যক্ষ করবে রমা—এক অতল বেদনাসমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে ওর সমস্ত সত্তা, তার আয়ু রেখার বোধ হয় এইখানেই আকাঙ্ক্ষার যতিচ্ছেদ! অভিজিতের সান্ত্বনা তো সর্বকালের সার সত্য, শবরীর প্রতীক্ষা তো ব্যর্থ হয়নি। দেবতার লীলাসঙ্গিনী শবরী সার্থক সাধিকা, কিন্তু মানুষের লীলাখেলায় উপহসিত শবরী বারংবার প্রতিহত প্রতীক্ষার লাঞ্ছিত মুখ ঢেকে রাখবার জায়গা কি এতবড় পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাবে?

মধু-মাসে

রণধীর গুপ্ত

(১)

ভরা ঘুমে তা'রে ডেকো না—ডেকো না,
ঘুমাক না কিছুকাল!
ফুটিবেই কুঁড়ি, র'বে না তখন
আর কো অন্তরাল।

(২)

গুন্ গুন্-গুন গুঞ্জন-গান
এখন শুনানো থাক;
বসন্ত তা'রে নিজেই আসিয়া
দিক না প্রথমে ডাক।
সে ডাকে যখন নিমীলিত আঁখি
বিকশিত সুখে হবে,
মধু-তৃষাতুর মুগ্ধ মধুপ,
মাতিয়ো গীতের রবে।
প্রগল্ভতারও পরিবেশ চাই;
ভরা-ঘুম ভেঙে গেলে,
কুসুম নিজেই গোপন পিয়াসে
সব দল দেয় মেলে;
ভীরু সঙ্কোচ—জড়তা কাটিয়া
প্রকাশের জাগে নেশা;
বেভুল ভ্রমর, সে মধু-মাসেই
প্রশস্ত মেলামেশা।

(৩)

রঙের নেশায় মধু মাস আসে;
মহোল্লাসেতে তা'র
বনান্তরালে এক লহমায়
মেতে ওঠে চারি ধার।
উতলা সে-প্রাণ-প্রবাহ-চূড়ায়
প্রবাহিয়া যায় যা'রা,
জীবন নিঙাড়ি' সঞ্চিত মধু
সবচেয়ে লভে তা'রা।

(৪)

বসন্ত গেলে, ধীরে ধীরে ফিরে
নেমে আসে ভরা ঘুম;
মধু-মাতনের উৎসবও শেষে
হয়ে আসে নিঃঝুম।
হে কালো মানিক—পথিক প্রেমিক,
উতল অমৃত পেতে
সহজ প্রাণের মুখর গানের
লগনেই উঠো মেতে।
মধূৎসবের মধু-ভাণ্ডার
লাজ-ভরে যাবে খুলে,
রোমাঞ্চময় চোরা-চুম্বন
এঁকে দিও তব ফুলে;
পরাগ মাখানো মুখেতে তোমার
মধু নিয়ো সুখে তুলে;
তার পরে সেই ফুলের বুকেই
পড়িয়ো না হয় ঢুলে!

বাংলা ছোটগল্পের ভূমিকা

অরুণ দে

বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব খুব বেশিদিনের কথা নয়। কথাসাহিত্যের এই নোতুন রূপটি উনবিংশ শতক থেকে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আজকের বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সংখ্যা-প্রাচুর্য দেখে একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প বলে কিছু ছিল না। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভাও ছোটগল্প রচনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করে নি। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত-লোক এদেশের 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', 'দশকুমার চরিত' এবং বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলিতে বাংলা ছোটগল্পের উৎস আবিষ্কার করেছেন। এমন আবিষ্কারে পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশিত হয় কিন্তু সত্য গোপন থাকে। আমার তো মনে হয় একথা সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে বাংলা ছোটগল্প পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ নোতুন রসদৃষ্টির ফল এবং আজকের দিনে যাকে আমরা ছোটগল্প বলি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার সর্বপ্রথম স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী কবিমানস মানুষের ভাবময় সত্তার চন্দ ছোটগল্পের মধ্যে স্পন্দিত করে তুলেছিল। আমাদের বৈচিত্র্যহীন বহির্জীবনের অন্তরালে রসের যে ফল্গুধারা "ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা"-কে কেন্দ্র করে প্রবাহিত তিনি তাকে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে ছোটগল্পের আকারে পরিবেশন করেছেন। শুধু মধ্যবিত্ত জীবন নয়, গ্রামে-গাঁথা বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের চিত্র তাঁরই ছোটগল্পে প্রথম ধরা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের পরে স্মরণীয় প্রতিভা হলেন শরৎচন্দ্র। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ছোটগল্প রচনায় তাঁর প্রতিভার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যে পরিপূর্ণতার আভাস ফুটিয়ে তোলা কিংবা স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির যে দক্ষতা শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের রচনায় দেখা যায়, শরৎচন্দ্রে তা প্রায় অনুপস্থিত। "মহেশ" ও "মন্দির" ছাড়া অন্য কোন রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প রচনা করতে তিনি পারেন নি।

এইকালে আর একজন কথাশিল্পী ছোটগল্প রচনা করে বিশেষ জনসমাদর লাভ করেছিলেন। সেই বিস্মৃতপ্রায় নামটি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর অধিকাংশ গল্প কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল। আমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তি, বৈষম্য অসংগতি এবং লঘু দিককে হাস্যরসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে তিনি কয়েকটি রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত অল্প বলেই ছোটগল্পের ইতিহাসে প্রভাতকুমারের নাম একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। প্রভাতকুমার যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালে পরশুরাম, পরিমল গোস্বামী, অজিতকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প লেখকরা সে ধারাটি পরিপুষ্ট ও সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের পর সদর্পে এগিয়ে এলেন একদল বলিষ্ঠ সাহিত্যিক। ছোটগল্প সাহিত্য যেন নোতুন চেতনা লাভ করে সচকিত হয়ে উঠল।

মনোবিজ্ঞানের নোতুন আবিষ্কার এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এ যুগে মানুষের জীবনাদর্শের পরিবর্তন সূচিত হল এবং সেই পরিবর্তনের ছায়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হল। কথাশিল্পীরা প্রচলিত আদর্শ ও নীতির নোতুন মূল্যায়নে ব্রতী হলেন, জীবন ও জগতকে নোতুন দৃষ্টিতে যাচাই করে নেবার জন্য লেখনী ধারণ করলেন। এই সময় কয়লাকুঠির কুলিমজুর ও সাঁওতালদের নিয়ে

কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনেকের প্রশংসা পেলেন। বীরভূম জেলার স্থানীয় ভাষা ও গল্প তাঁর লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে "আঞ্চলিক সাহিত্য" রচনার নিদর্শন সৃষ্টি করল। এই সময় অন্তর্মুখী বুদ্ধদেব বসু যখন ছোটগল্পে ঘটনাকে অপ্রধান স্থান দিয়ে মানুষের মনের ও দেহের রহস্য নিয়ে ব্যস্ত, তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র বস্তীবাসীদের নিয়ে লেখা কয়েকটি সুন্দর ছোটগল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদের জয় ঘোষণা করে জীবনের নগ্নসত্যের প্রকাশে উৎসাহী হয়ে উঠলেন কল্লোল সাহিত্য-গোষ্ঠী। কিন্তু এদের কারো হাতেই প্রকৃত বাস্তববাদী সাহিত্য গড়ে উঠল না। কুলি-মজুর, বারাঙ্গণা প্রভৃতি শ্রমিক-জীবনকে কেন্দ্র করে এরা রোমান্টিক ফাঁকি দিলেন। রোমান্সের তুলি দিয়ে বাস্তবের ছবি আঁকার চেষ্টা করলেন। ছোটগল্পের রসঘন নিবিড়তা, ঐক্য ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রই এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। প্রেমেন্দ্রের পর তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর ছোটগল্প লিখে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। বেদেনী, নারী ও নাগিনী, অগ্রদানী, ডাইনী প্রভৃতি ছোটগল্পে তিনি জীবনের যে গভীর রসোপলব্ধির পরিচয় দেন তা সহজেই রসিক সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনৈক সমালোচক বলেছেন, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হল—"to produce maximum effect with minimum material"—তারাশংকর তাঁর রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে রক্ষা করেছেন।

প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আর একটি বিশিষ্ট নাম "বনফুল"। গল্পের আঙ্গিকের নোতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনার মৌলিকতার জন্য তিনি প্রশংসার দাবী করতে পারেন। জগদীশ গুপ্ত ছোটগল্প রচনায় প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্প পাঠকের মনের গভীরে দাগ কেটে যায়। সমাজবোধের গভীরতায়, ভাব ও ভাবনার বিচিত্র রূপায়ণে তাঁর গল্পগুলি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশংকর ঐতিহ্যের বাহক হওয়া সত্ত্বেও গল্পের গঠনপদ্ধতিতে কারু-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নরেন মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচনার দ্বারা আর একবার প্রমাণ করেছেন যে ছোটগল্পের সঙ্গে গীতিকবিতার সমধর্মিতা আছে। সমরেশ বসু বা সন্তোষ ঘোষের মত বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তার দৃষ্টি অন্তরমুখী। সূক্ষ্ম মননশক্তি ও কল্পনাপ্রবণতা তার গল্পগুলিকে সুষমা মণ্ডিত করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কম লেখেন। তাঁরা জনপ্রিয় কিংবা অতি আধুনিক হবার জন্য কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা করেন না। গল্প রচনার পুরাণ ঐতিহ্যকে স্বীকার করে উচ্চশ্রেণীর কলাকৌশল আয়ত্তের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য। ছোটগল্প সৃষ্টিতে তাঁদের লিপিকুশলতা উল্লেখযোগ্য। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, কবিতা সিংহ ও বাণী রায় কয়েকটি ভাল ছোটগল্প লিখেছেন।

সাম্প্রতিক কালে যাঁরা ছোটগল্প রচনার জন্য কলম ধরেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের ও বিরাগের কথা শোনা যায়। অনেকেই বলেন সাম্প্রতিক ছোটগল্পলেখকেরা গল্প লিখতে বসে গল্প না-লেখার ভাণ করছেন। তাঁরা নিজেদের মগ্নচৈতন্যের লিপিকার কিংবা নোতুন রীতির প্রবর্তক আখ্যা দিয়ে ছোটগল্পের শিল্পকৌশল আয়ত্তের অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টায় উৎসাহী। গল্পসাহিত্যে দুর্দিন এসেছে। গল্পের কোন সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিণতি নেই। ছোটগল্প আজ ছোটও নয় গল্পও নয়, কতকগুলি অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও চিত্রের সমষ্টি মাত্র। এমন কি 'এই দশকের গল্প'-তে এই দশকের চরিত্র লক্ষণ ধরা পড়ছে না। অবচেতন অন্তর্লোকে শিল্পীর অনুসন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাত করে বিমল কর কয়েকটি ভাল ছোটগল্প লেখার পর তাঁকে ব্যর্থ অনুকরণ করার ফলে কয়েকজন তরুণ লেখক কতকগুলি 'জঞ্জালের সৃষ্টি করছেন'।

—এসব অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁদের সব কথাই হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবু তাঁদের কাছে সবিনয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বোধহয় লক্ষ্য করেছেন কোন যুগেই উন্নাসিক তকমাধারী সমালোচকেরা সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। অতীতের প্রতি অন্ধ মোহ এবং বর্তমানের সব কিছুকে নস্যাৎ করার এক ধরণের মানস-বিলাস অনেককেই পেয়ে বসে। হাই পাওয়ারের চশমা চোখে লাগিয়ে ভুলত্রুটি প্রদর্শনের সময় সমালোচকেরা প্রায়ই ভুলে যান যে, লেখকের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি না থাকলে—তাঁর চিন্তাধারা ও কল্পনার সঙ্গে অন্তত কিছুটা একাত্মতা বোধ না করলে—বিচার নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

যে সব তরুণ লেখক বর্তমানে ছোটগল্প লিখছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে এখনও পরিণতির অপেক্ষা রাখেন। তাঁদের সম্বন্ধে শেষ রায় দেবার সময় এখনও আসে নি, তবু একথা বলা চলে যে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কোন আন্দোলনের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে শিল্পীর স্বধর্ম রক্ষা করে ভাল গল্প লেখার চেষ্টা করছেন। তবে যাঁরা নোতুন রীতির লেখক বলে সদর্পে বগল বাজান, তাঁদের সবিনয়ে জানাতে চাই যে সাম্প্রতিক কালে ছোটগল্পের যে বিবর্তন ঘটেছে তা লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং গল্পের বিষয়বস্তুতে—রূপরীতি বা আঙ্গিকে নয়। গল্পের গঠন পদ্ধতির ব্যাপারে অধিকাংশ লেখকই আজও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-মাণিক প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন।

সাম্প্রতিক কালে যে সব নোতুন লেখকেরা গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাই কৃতিত্বের বিষয় বলে মনে করেন—তাঁদের Hudson সাহেবের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। Hudson বলেছিলেন, "Singleness of aim and singleness of effect are the two great canons by which we have to try the value of short story as a piece of art." হাডসনের একথা স্মরণ রাখলে ছোটগল্পের লেখকেরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন।

এ মাটি ছোঁয় না আকাশ

সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এ মাটি ছোঁয় না আকাশ; ছোঁবে না কক্ষণো কোনদিন!
জানি। তবুও স্ফুরিত চেতনা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়,
নিয়মের নিগড় ভেঙ্গে ইচ্ছারা ছুটে যেতে চায়,
বাসনার গোলাপে জাগে আকাঙ্ক্ষার সুর অমলিন।

অসহ্য আবেগে কাঁপে পুরাতন ফালগুনী প্রেম!
ডেকে ডেকে ফিরে গেছে কখন সবুজ শালিখ,
সব কিছু বাধাধরা একেবারে নিয়ম মাফিক,
তবু বুঝি বাকি থাকে জীবনের কিছু লেনদেন।

জলের আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখে কাটে সারাদিন,
ধীর-মন্থর-গতি হেঁটে চলে সর্পিল সময়,
কখন তরঙ্গ স্রোত মুছে দিয়ে গেছে সেই ছবি
সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়—
ফিরে যেতে হবে সেই পরিচিত কুঠুরীতে সঙ্গীহীন!

ফাল্গুন

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

ফাল্গুন এলো দোলা দিয়ে মনে বনে
সবুজ মাটিতে ছড়িয়ে নব জীবন।
কোন্ স্বপ্নের ঢেউ জাগে দু'নয়নে
মলয় স্পর্শে জাগে নব যৌবন।

মনে আর বনে মৌমাছি গুন্ গুন্
সুর তোলে আজ পুরানো স্মৃতির বীণ
মনে বাজে কার নূপুর ঝুনুর ঝুন?
মরু সাহারায় জেগে উঠে বেদুইন।

পীক পাপিয়ার সুর বাজে কুহু কুহু—
মিথুন চিত্তে রোমাঞ্চ শিহরণ!
রক্ত গভীরে ঢেউ জাগে মুহু মুহু
সোনালী স্বপ্নে ভরে ওঠে দু'নয়ন।
মদনের ধনু টঙ্কারে ভাঙে ধ্যান—
ফল্গু জীবনে ফাল্গুনের কলতান।

প্রাচ্যবাণী, দিল্লী শাখা

শ্রীমধুসূদন নন্দী

(বানান কপি অনুসারে)

প্রাচ্যদর্শনের মৌলিকত্বে, প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা-বিকাশের আদর্শেই; স্বনামধন্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মীনি প্রখ্যাতা দার্শনীক ডাঃ রমা চৌধুরী, ১৯৪৩ ইংরেজীতে কলিকাতায় "প্রাচ্যবানী" সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ ইংরেজীর সেপ্টেম্বর মাসে, নয়াদিল্লী কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে ডাঃ যতিন্দ্র-বিমল চৌধুরীর "বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাধনা" এবং "বৈদিক যুগের নারী" বিষয়ে সারগর্ভ পরপর দুই অভিভাষণে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলেই, দিল্লীতে প্রাচ্যবাণির এক শাখা প্রতিষ্টার প্রস্তাবে ডাঃ চৌধুরীর একাগ্রতা আমায় আকৃষ্ট করে। প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লীতে প্রাচ্যবাণির শাখা স্থাপনের সংকল্পে স্থানীয় ডাঃ সুধাংশুবিমল দাসের সভাপতিত্বে ১৯৪৬ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারী মাসেই সাময়িক শাখা কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয় এবং প্রাচ্যদর্শন ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক আলোচনা সভা, উপনীষদীয় তত্বের ভীতে পাক্ষিক পাঠচক্র, ছাত্রমহলে বিতর্ক সভা ইত্যাদি মাধ্যমে "প্রাচ্যবাণী"র আদর্শমূলক আনুষ্ঠানিক ধারায় প্রাচ্যবাণী ক্রমে ক্রমে স্থানীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং প্রাচ্যতথ্যান্বেষী স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ কৃষ্ণদত্ত ভরদ্বাজ, শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার, ডাঃ বাসুদেবশরণ আগরওয়াল, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, দার্শনীক রায় বাহাদুর নিশীকান্ত সেন, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সকসেনা, শ্রীহোসেন লাল প্রমুখ বিজ্ঞ সমাজের সক্রীয়তায় প্রাচ্যবাণী দিল্লী শাখা বিশেষ সুনাম অর্জন করে। ১৯৪৭ ইংরেজীর ২রা আগষ্টে প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে তৎকালীন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মরিস গয়ার পৌরহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে চৈনীক রাজদূত লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনীক ডাঃ চীয়া, লুয়েন, লো, "চীন-ভারতের সাংস্কৃতীক সম্বন্ধ" বিষয়ে গভীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ সৈয়দ হোসেন, ডাঃ পি, শরণ তথা রুষীয় রাজদূতাবাসের মিসেস্ ঈয়ারজীনা প্রমুখ সুধী মণ্ডলী প্রাচ্যসংস্কৃতীর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে বিশ্ববরেণ্যা সরোজিনী নাইডু ও ডাঃ কে, এম, পাণীকরের শুভেচ্ছাবাণী প্রতিষ্ঠানের সংগঠনায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে।

অতঃপর ডাঃ সৈয়দ হোসেন ১৯৪৮ সালে কায়রোতে ভারতীয় রাজদূত নিযুক্ত হয়ে যাওয়া অবধি, প্রাচ্যবাণী দিল্লী শাখার সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে সাহায্য করেন। উনি দিল্লী ত্যাগ করিলে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের র‍্যাজিষ্টার রায় বাহাদুর নিশীকান্ত সেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। দিল্লীতে প্রাচ্যবাণীর প্রচার ও প্রসারে রায়বাহাদুর সেনের প্রচেষ্টা ও প্রেরণা অতুলনীয়। ১৯৪৯ ইংরেজীতে তিনি স্থায়ী ভাবেই শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলে যথাক্রমে স্থানীয় হীন্দু কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সকসেনা, ডাঃ কৃষ্ণদত্ত ভরদ্বাজ, ডাঃ শশধর সিংহ, শ্রীসুবিমল দত্ত ইত্যাদি এই শাখার সভাপতি রূপে প্রাচ্যবাণীর বহুল প্রচারে সহায়ক হন।

প্রাচ্য ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ ও প্রাচ্যবাণীর কার্য্যাবলীতে আকৃষ্ট স্বনামধন্য ডাঃ বি, গোপাল, রেড্ডী, ডাঃ হরেকৃষ্ণ

মহতাপ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, কেন্দ্রীয় উপঃ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন, সংসদ সদস্য ডাঃ সরোজিনী মহীষি, শ্রীমতি সারদা মুখার্জ্জী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডাঃ প্রভাকর ম্যাচুয়ে, শ্রীরথীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমর নন্দী, শ্রীরঘুবীর মিশ্র সদৃশ সুধীকুলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ত্তমান সম্পাদক পূজনীয় স্বামী স্বহানন্দ মহারাজের সক্রীয় সহযোগীতা, আশির্ব্বাদ ও উৎসাহ, প্রতিষ্ঠানের ক্রমীক অগ্রগতির পরিপোষক।

ডাঃ বি, গোপাল, রেড্ডী সভাপতি এবং ডাঃ কৃষ্ণদত্ত ভরদ্বাজ, ডাঃ সরোজিনী মহীষি, শ্রীমতি সারদা মুখার্জ্জী, ডাঃ প্রভাকর ম্যাচুয়ে, শ্রীঅমর নন্দী ও শ্রীরথীশ ভট্টাচার্য ইত্যাদি সহঃ সভাপতি তথা শ্রীমধুসূদন নন্দী সম্পাদক, শ্রী এস, কে, গম্ভীর সংগঠন সম্পাদক এবং শ্রীশান্তি মজুমদার ও সর্দার ভগবান সিং সহসম্পাদক ও বিভিন্ন প্রাদেশীয় প্রাচ্যবিদ্‌দের সক্রীয়তায় প্রাচ্যবাণী দিল্লী শাখা নিখিল ভারতীয় সমন্বয়ে সাংস্কৃতীক প্রতিষ্ঠানরূপেই আজ রাজধানীতে বিশেষ ভাবেই সমাদৃত।

১৯৬৪ সালের ১০ জুলাই কলিকাতায় প্রাচ্যবাণীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থ প্রাচ্যবাণী দিল্লী শাখা গত ১৯৬৫ ইংরেজী থেকে বাৎসরীক ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী স্মৃতি বক্তৃতাবলী (Dr. Jatindra Bimal Choudhuri Memorial Lectures) এবং "ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা"র (Dr. Jatindra Bimal Choudhuri Memorial Essay Competition) প্রবর্ত্তন করে। প্রাচ্যদর্শন ও সাংস্কৃতীক পরিপ্রেক্ষীতে প্রখ্যাত মনিষীদ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক বক্তৃতায় দিল্লীতে প্রাচ্যবাণীর সার্ব্বজনীনতা প্রশংসার যোগ্য, (Fuudamentals of living faithes & cultural synthesis, Paths to Spiritual realisation, Dr. Jatindra Bimal Choudhuri & the critical approciation of his works, Mahakavi Kalidas & Bharatiya Sanskriti, Sanskrit Literature & Indian Culture, Rabindranath & Indian Culture, Fundamentals of Basic Education, Basic Unity of the Indian Literatures etc. etc) "ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা"র দুই বিভাগেই (College Group & School Group) স্থানীয় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করেছে।

বিগত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর স্থানীয় ওয়াই, ডবলিউ, সি, এ (Y. W. C. A,) হলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ গোপাল রেড্ডীর পৌরহিত্যে দুই দিবস ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতি কমলা রত্নম এবং আচার্য্য কপিলদেব শর্ম্মা যথাক্রমে প্রধান অতিথি রূপে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ও প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত পালী নাট্যসঙ্ঘ, কেন্দ্রীয় প্রাচ্যবাণীর সুযোগ্যা সম্পাদিকা ডাঃ রমা চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত "ভারতাচার্য্যম্" এবং "শঙ্কর শঙ্করম্" সংস্কৃত নাটকদ্বয় বিশেষ কৃতিত্বর সহিত অভিনয় করেন। উক্ত বার্ষিক অনুষ্ঠানেই "ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা, ১৯৬৬" সালের কৃতী প্রতিযোগীদের যথাক্রমে ৫০৲, ৩০৲, ১০৲, ২০৲ টাকা পুরস্কৃত করা হয়। অখিল ভারতীয় ভিত্তিতে প্রাচ্যবাণী দিল্লী শাখার অগ্রায়ণে জাতী বর্ণ নির্বিশেষে সুধীসমাজের সক্রীয় সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতই কামনা করি।

সাগর ও জয়পুরে প্রাচ্যবাণীর" সাংস্কৃতিক সফর

পণ্ডিত অনাথশরণ কাব্য-ব্যকরণতীর্থ

প্রারম্ভ

"ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়"—এই মহাকবি-বাক্যের সত্যতা আজীবন অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছে আমাদের পরমাদরের সর্বজনবরেণ্য, বিশ্বজনপ্রিয়, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গবেষক, নাট্যকার, সঙ্গীতকার ও কবি, "প্রাচ্যবাণী"—প্রতিষ্ঠাতা, পুণ্যশ্লোক ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী মহোদয়। সংস্কৃত-জননীর নিঃস্বার্থ সেবায় দত্তপ্রাণ এই পণ্ডিতপ্রবর ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন আনন্দে, সাগ্রহে, সগৌরবে; এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি শত শত পরমাত্মীয় লাভ করিয়াছেন সসম্মানে।

আমরা তাঁহারই ছায়াশ্রিত সামান্য জনমাত্র। তথাপি, তাঁহারই অমর প্রভাবে আমরাও এইভাবে দেশদেশান্তরে সগৌরবে পরিভ্রমণ করিবার মহাসুযোগ লাভ করিতেছি উত্তরোত্তর এবং সবত্রই প্রাণের বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয় লাভ করিতেছি অশেষ পুণ্যের ফলেই। তাহাদেরই মধ্য হইতে আমাদের দু'একটী সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সফরের বিষয় সবিনয়ে আপনাদের শ্রীচরণকমলে নিবেদন করিব আপনাদের সকলের সম্মিলিত আশীর্বাদ ও শুভ কামনা লাভের জন্য।

সাগরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

মধ্যপ্রদেশের সাগরস্থিত "সাগর" বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আজ সর্বত্র সুপরিচিত। অতিসুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভিত, পার্বত্য-ঐশ্বর্যে গরীয়সী এই মনোহর নগরীটী আজ শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সেজন্য এই সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের "কালিদাস সমারোহ—উৎসবে" যোগদান করিয়া তাহার পরে আমাদের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকদ্বয় ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "অমরমীরম্" ও অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত "শঙ্কর-শঙ্করম্" মঞ্চস্থ করিবার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া আমরা সকলেই পরমোৎফুল্ল হইলাম। সেই অনুসারে বিগত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ আমরা সদলবলে যাত্রা করিলাম সাগরের উদ্দেশ্যে।

যথেষ্ট দুর্গম ও কষ্টসাধ্য, সুদীর্ঘ পথ। তথাপি, মাতৃসমা অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী মহোদয়ার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে হাসিগল্পে, আমোদে, আহ্লাদে তাহা কাটিয়া গেল অতি সুন্দরভাবে। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬, ভোরে সাগরে উপস্থিত হইলাম মহাগ্রহভরে। ষ্টেশনে নামিয়াই দেখি যে আমাদের পূর্বপরিচিত বিশেষ স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী মনোরমা সাক্সেনা, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু গণ্যমান্যজন সানুগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য সমুপস্থিত ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে। দেখিয়া সকলেই পরম বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দ পরিপ্লুত হইলাম। শ্রীমতী মনোরমা সাক্সেনা "A Critical appreciation of Dr. Jatindra Bimal Chandhuri's works"—এই অতি সুন্দর, সুযোগ্য, সুষ্ঠু, শোভন বিষয়ে Saugar university Ph. D. Degree-র জন্য Thesis লিখিতেছেন সাগ্রহে।

সাগরে আমাদের বসবাসের জন্য একটা সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র বাড়ী নেওয়া হয়; এবং যে তিনদিন আমরা ওখানে ছিলাম, সেই তিনদিন ধরিয়াই যে আদর যত্ন স্নেহ ভালবাসার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার সত্যই তুলনা নাই।

সাগরে আমাদের সংস্কৃত অভিনয় হয় ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬। প্রথম দিন ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরা-

বাঈয়ের পুণ্য জীবনী মূলক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত অমর নাটক "অমর-মীরম্‌" অভিনীত হয় বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। অবশ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের গোলযোগের জন্য কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হইলেও আমাদের এই চিরনবীন নাটকটা শব্দের সৌন্দর্যে, গানের মাধুর্যে, ভাবের ঐশ্বর্যে উপস্থিত সুবিশাল সুধী-মণ্ডলীর মনোহরণ করে। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন, রেক্টর ডাঃ ঈশ্বর চন্দ্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

আমাদের দ্বিতীয় সংস্কৃত অভিনয় "শঙ্কর-শঙ্করম্‌" অধিকতর প্রশংসা অর্জন করে। সুবিখ্যাত অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শ্রীশঙ্করাচার্যের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে নূতন ভাবে ভঙ্গিমায় অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত, বহুবার ভূয়সী প্রশংসার সহিত অভিনীত এই উদ্দীপনাময় সংস্কৃত নাটকটি সর্বদিক হইতেই অতি জনপ্রিয়। সাগরেও তাহাই হইল।

সাগরে পূর্বে সংস্কৃত অভিনয় আর হয় নাই, অন্যান্য বহুস্থানে যেরূপ, সাগরেও ঠিক সেইরূপই, আমাদের সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় উপস্থিত সকলকে এক নূতন রসের সন্ধান দেয়, এক নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে, এক নূতন শক্তিতে বলীয়ান করে। ইহাতে আমরা নিজেদের পরমধন্যরূপে গণ্য করিলাম কৃতজ্ঞ চিত্তে।

তৃতীয় দিন আমরা হইলাম দর্শক, এবং সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমাদের একটি সংস্কৃত অপেরা দেখানো হইল।

শেষদিনে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আমাদের জন্য একটি বিশেষ অভিনন্দন সভার আয়োজন করেন সাদরে। তাঁহাদের অনুগ্রহের সীমা পরিসীমা নাই। "প্রাচ্যবাণীকে" সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বহু মূল্যবান পুস্তক প্রদান করা হয়।

স্বল্প তিনটি দিন! অথচ, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেও সাগরস্থ সকলের সঙ্গেই আমাদের যে শাশ্বত প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তাহা কোনোদিনও ছিন্ন হইবার নহে। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ রামজী উপাধ্যায়, রিডার ডাঃ শ্রীমতী বনমালা ভওয়ালকার, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রিসার্চ স্কলার ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী মনোরমা সাক্সেনা, লেডিজ হষ্টেলের মাসীমা শ্রীমতী বিন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির স্নেহের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

ফিরিবার পথে জব্বলপুরের বিশ্ববিশ্রুত "মারবেল রকস্" দেখিয়া পরমধন্য হইলাম।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন পণ্ডিত অনাথশরণ; সর্বশ্রী অনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, অসীম সুন্দর চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, হিমাংশু মজুমদার, অধ্যাপিকা শান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী চক্রবর্তী, শ্রীস্নিগ্ধ রায় চৌধুরী (গায়ক), শ্রীদিলীপ ঘোষ (রূপসজ্জাকর)।

জয়পুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে আমরা নিখিল-ভারত সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বানে জয়পুরে পুণ্যশ্লোক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্‌" ও "অমর-মীরম্‌" পরমাজননীর কৃপায় অতি সুন্দর ভাবে মঞ্চস্থ করি। এবারে আমাদের যেন বহুল পরিমাণে পদোন্নতি ঘটিল একদিক হইতে। কারণ, এইবার আমাদের অভিনয় হইল রাজস্থান সরকারের সঙ্গীত-নাটক এ্যাকাডেমির সাদর আহ্বান ও সস্নেহ সৌজন্যে। ইতঃপূর্বে কোনো সংস্কৃত অভিনয়ের দল এইভাবে কোনোস্থান হইতেই জয়পুরে আমন্ত্রিত হন নাই এটা আমাদের পক্ষে অতি সৌভাগ্য, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সংবাদ নিঃসন্দেহ।

আমাদের সংস্কৃত অভিনয় হয় জয়পুরের প্রাসাদোপম রবীন্দ্রমঞ্চে। দুদিনই সভায় বহু পণ্ডিত, ভক্ত, গণ্যমান্য জন উপস্থিত ছিলেন সাগ্রহে: এবং আমাদের আশাতীত সৌভাগ্য যে, তাঁহারা সকলেই আমাদের উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা ও অভিনয় নিপুণতা এবং নাটকদ্বয়ের ভাষার সারল্য, ভাবের গাম্ভীর্য সঙ্গীতের মাধুর্য ও আঙ্গিকের ঐশ্বর্যে বিশেষ তৃপ্ত হন। দ্বিতীয় দিন রাজস্থানের রাজ্যপাল পরমশ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসম্পূর্ণানন্দ উপস্থিত ছিলেন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীসর্বদানন্দ (রাজস্থান সঙ্গীত-নাটক-এ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ) উভয়েই একই সুরে আবেগভরে বলেন যে, অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী তাঁহার

অকালে মাতৃক্রোড়প্রাপ্ত পতিদেবতা ডাঃ যতীন্দ্র-বিমলের ভাবধারা ও আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য অসম্পূর্ণ ব্রত সার্থক করিবার জন্য, নাম অমর করিবার জন্য যাহা একাকিনী করিয়া চলিয়াছেন তাহার তুলনা সত্যই নাই।

আমাদের পূর্ববন্ধু শ্রীরঘুবীর চতুর্বেদী মহাশয়ের ঋণও অপরিশোধ্য।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন পণ্ডিত অনাথশরণ, সর্বশ্রী অনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, অসীমসুন্দর চাট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, অধ্যাপিকা শান্তি চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু রায় (গায়ক ও সুরকার), দিলীপ ঘোষ (রূপসজ্জাকর)।

পরিশেষ

জয় হোক ডাঃ যতীন্দ্র বিমলের। জয় হোক, তাঁহারই প্রাণ প্রতিম সংস্কৃত জননীর। ইঁহাদের কৃপায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমরাও কত সুন্দর সুন্দর স্থান ভ্রমণ করিবার, কত জ্ঞানিগুণিজনের স্নেহ সমাদর লাভ করিবার, কত সংস্কৃত প্রচার প্রসার করিবার মহা সুযোগ লাভ করিতেছি বারংবার আশাতীত, স্বপ্নাতীত, ধারণাতীত ভাবে। সমগ্র ভারতে এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান "প্রাচ্যবাণী" আছে, যাহা প্রতি বৎসর সম্পূর্ণ এ্যামেচার ভাবে প্রায় ৬০টি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিতেছে নানা দেশ বিদেশে সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে বিগত একযুগ ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে। ইহার আদরও ত' ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়াই চলিতেছে। ইহার চতুষ্পাঠী, প্রেস, পুস্তক প্রকাশ বিভাগ, গ্রন্থাগার, গবেষণা বিভাগ, প্রচার—প্রসার বিভাগও তুল্য প্রশংসার্হ নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার সংস্কৃত নাটক অভিনয় ও সংস্কৃত সঙ্গীত বিভাগ যেরূপ অল্প দিনের মধ্যেই সর্বভারতীয় যশ অর্জন করিয়াছে, তাহা সত্যই অতুলনীয়। আমরা ইহারই সামন্যাতিসামান্য সাধক হইবার সুযোগ লাভ করিতেছি, তাহাই আমাদের জীবনের পরমতম সৌভাগ্য, সুনিশ্চিত।

ঘুম

শ্রীনীরদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চল্ মন ঘুমাতে যাবি।
সারা জীবন জাগরণে
মায়ারূপী রাক্ষসী সনে
মত্ত হয়ে রঙ্গরসে কতদিন আর কাল কাটাবি॥

সর্ব্ব অঙ্গে ক্ষত রে তোর—
রাক্ষসী যে বেঁধেছে যে জোর—
বাহিরে সুন্দরী সে, আলিঙ্গনে সুখ কি পাবি॥

বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসীর ক্ষুধা—
ভিতরে বিষ বাইরে সুধা—
শত শত ছলনায় তার, এবে রে তুই প্রাণ হারাবি॥

আপনার জন অরূপ রতন
বাহির-যেমন ভিতর তেমন
তারে আজি দে আলিঙ্গন, সুখ নিদ্রায় মজা পাবি॥

পদ্ম গন্ধ গায়ে রে তার
আলিঙ্গনে সুখ যে অপার
পলকে তড়িৎ খেলে, রূপ দেখে তার মুগ্ধ হবি॥

(সেথা) তুই আর সে থাক্‌বি শুধু
প্রিয় প্রিয়ায় প্রেমের মধু
কর্‌বিরে পান ও অজ্ঞান সুষুপ্তিতে শয্যা নিবি।

নিরাপদ যে কক্ষ সেটী—
ইড়া পিঙ্গলা চেড়ী দুটী
প্রহরায় ব্যস্ত আছে, ঘুমিয়ে গেলে বেশ বুঝিবি॥

নাহি ঝঞ্ঝা, নাহি কল্লোল
মধু, মধু, শুধু, প্রেম হিল্লোল
সর্ব্বাপদ, শান্তি সেথা, তার মধ্যে বিকিয়ে যাবি॥

তারে যে পায়, জ্বালা জুড়ায়
আনন্দ স্রোত, বহে সেথায়
ডাক্ দেখি সেই সঙ্গিনীকে, তবে বাহুর ভিতর পাবি॥

নির্ব্বিকল্প সে সমাধি,
সে ঘুমের আর নাই অবধি
এক ব্রহ্ম, নাই দ্বিতীয়
একের রাজ্যে সুখে রবি॥

॥ নিরুদ্দেশ ॥

[বড় গল্প]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাই-দ্বিতীয়ার আগের দিন সকালে ওরা হাওড়ায় পৌছে বেলা এগারটা নাগাদ বর্দ্ধমানে এসেছিল। ঘর বাড়ী গোছ গাছ করে ডাল ভাত ফুটিয়ে খেতে বেলা হোল প্রায় তিনটে। এইদিন রেণুকে বিশেষ ভাবেই খাটতে হয়েছিল। এখানকার ঝি-কে বলে রাখা সত্বেও আজ দুপুরে সে আসে নি, বিকেলেও এল না। রেণুকে একাই সব কিছু করতে হয়েছিল।

বিকালে সরোজ রেণুকে প্রশ্ন করলে, কাল ভাই-দ্বিতীয়ার জন্য ছেলেদের কাপড় চোপড় কি আনব বলত? অপু ত ভাইদের ফোঁটা দেবে।

কি কি আনতে হবে সমস্ত পরামর্শ করে রেণু বল্লে আমার জন্যও একখানা সাত কি ছ'হাত ধুতি এবং আর একটা যত ছোট পাওয়া যাবে, পাঁচ কি চার হাত ধুতি আনবেন।

কেন? সরোজ প্রশ্ন করেছিল।

বাঃ, অলক আর অমরকে দেব যে, আমি ত ওদের দিদি।

অলক অপু সেখানে ছিল না, বাড়ীর সামনের ছোট্ট বাগানটায় গাছপালা দেখে ওরা বেড়াচ্ছিল এবং ভাবছিল বন্ধুদের কারুর দেখা পেলে পুরীর গল্প করবে।

সরোজ ভাবলে, ওর মনের কথাটা প্রকাশ করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। কিন্তু কিভাবে প্রকাশ করা যায় অনেক চেষ্টা করে নিজের বিছানায় বসে বসে তাই ভাবতে লাগল। শেষে তার মনের সমস্ত জোর একত্র করে বলেছিল, তুমি আর ওদের ফোঁটা দিও না রেণু—এই পর্য্যন্ত বলেই সরোজ থেমে গেল।

রেণুর মুখটা মলিন হয়ে গেল, ভাবলে, তাও ত বটে, আমিত আর কেউ নই, বাইরের লোক, দেখাশুনা করি, এই মাত্র।

সরোজ বোধহয় রেণুর মনের কথা আভাসে বুঝেছিল। তাই আর একবার মনে সাহস সঞ্চয় করে বল্লে, মানে বলছিলুম কি—

ঘাড় হেঁট করে রেণু বল্লে, হ্যাঁ বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। ওর গলাটা ধরা মতন, চোখ দুটো ছলছলে। সরোজ লাফিয়ে উঠল। না না না, আমি সে ভেবে বলি নি, আমি—মানে, আমি বলছিলুম কি—রেণু যেন কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরোজ বিছানা থেকে নেমে রেণুর পেছন পেছন ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ডাকলে, রেণু।

কি? রেণু সমুখ ফিরে দাঁড়াল। সরোজ এখানে বড় একটা আসে না, দরকার হলে চেঁচিয়ে ডাকে। ওকে আসতে দেখে রেণু একটু বিস্মিতই হয়েছে।

সরোজ বল্লে, তুমি অন্য কিছু ভেবো না রেণু, আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, সেই জন্যই—আমি বুঝতে পেরেছি বাবা, ও নিয়ে আমাকে আর কিছু বলতে হবে না—

আঃ হা, সরোজ অধীর ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, কথাটাই আগে শোন, তারপর যা বলার হয় বোলো, রেণু চুপ করে দাঁড়াল।

সরোজ বল্লে, দেখ রেণু, দুনিয়ায় আপন বলতে তোমার কেউ নেই; আমার অবস্থাও ত এতদিন ধরে দেখছ, আমারও কেউ নেই। তা আমি বলছিলুম কি, —তুমি ত এই এক বছর ধরে শুধু অ-রের নয়, অলক অপুরও মা হয়ে মায়ের মতই যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছ। তা হলে ন্যায় ধর্ম্মের দিক দিয়ে—মানে বিধবা বিয়ে ত আজকাল চলছে, তুমি কেন ওদের সত্যিকারের মা হয়েই যাও না। কথাগুলো উচ্চারণ করেই সরোজ নিজের অজ্ঞাতসারে ঘর থেকে পেছিয়ে আসতে লাগল।

রেণু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে, বাবা বলে কি !

স্তম্ভিত রেণুকে সরোজের ইচ্ছে হোল বলতে যে, এখনই এই কথার উত্তর সে চায় না পরে এক সময় ভেবে চিন্তে উত্তর দিলেই চলবে, কিন্তু সে সব কিছুই না বলে সে পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচল।

রেণু চুপ করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর কাঁপতে কাঁপতে জালের আলমারী ধরে সেই খানে সেই মেঝের ওপোরই বসে পড়ল।

শেষে কি সরোজের মনে এই ছিল ! যাকে সে বাবা বলে, সেই কিনা অবলীলায় এমন একটা প্রস্তাব উত্থাপন করে বসল !

সরোজের কাছে চাকরীতে আসার প্রস্তাব নিয়ে লক্ষ্মীর মা যেদিন মিটি মিটি হেসে বলেছিল, তুমি ত ভাই এমন সুন্দরী নও যে তোমাকে দেখে বাবুরা হাম্‌লে পড়বে, আর যদি পড়েই, তাহলে আর,—সে সব কথা রেণুর মনে পড়লেও ঘেন্না হয়। সেদিন সেই কথায় রেণু যেন মরে গিয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসহায় রেণু উপায়ান্তরহীন হয়েই পরের কাছে কাজে আসতে সেদিন বাধ্য হয়েছিল। আসবার সময় দেবতুল্য বড়বাবু যে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সেটাই রেণুর মনে পড়ে। ওর মনে হয় সেটা শুধু মৌখিক আশীর্ব্বাদই ছিল না, সেটা ছিল ওর রক্ষাকবচ। বড়বাবু বলেছিলেন, ধর্ম্মপথে থেক। রেণু সেই আশীর্ব্বাদকে দেবতার নির্দ্দেশ বলে সর্ব্বদাই মনে রেখেছে। সেই ভাবেই সে একটা বছর কাটিয়ে এসেছে। তবুও খুব লজ্জার কথা, মাঝে মাঝে কেমন সব অসতর্ক মুহূর্ত্তে রেণুর মনের মধ্যে অসংলগ্নভাবে এক জাতীয় অভাব যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। কি যেন নেই, কি যেন পেলে ভাল হয়, এই সব আকাঙ্ক্ষা এক এক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর রেণুর বুকখানা হু, হু করে উঠত। শ্রীপতি বুড়ো হোক, কৃপণ হোক, তার সঙ্গে যতই দুর্ব্যবহার করুক, তবুও যেন শ্রীপতির উপস্থিতি তার কাছে একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে হোত। তখন হৃতসর্ব্বস্ব রেণু আকুল হয়ে সমরকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলত, জোর করে স্তনপান করাত, সমু অমু দুজনকেই চিম্‌টি কেটে কাঁদিয়ে তাদের ভোলাবার, শান্ত করবার অছিলায় ব্যস্ত হয়ে বাৎসল্যের মধ্যে পালিয়ে বাঁচত, কিন্তু তবুও সে কোন দিন এ রকমের কোন কল্পনাও ত মনে আনতে পারে নি। মূর্খ, নিরক্ষর সংস্কারাচ্ছন্ন রেণু নিজের যৌবন পীড়া নিজের অন্তরেই সহ্য করত, কিন্তু এ ভাবে অন্যকে গ্রাস করার চিন্তাও করে নি। কিন্তু আজ? আজ এই অন্নদাতার দাবী সে ঠেকিয়ে রাখবে কিসের জোরে? যার কাছে নিজেকে সব চেয়ে নিরাপদ বলে তার বিশ্বাস, সেই কি না বলছে—। মনে পড়ল সেদিনের কথা, সেই যে দিন হ্যারিকেনের এ পাশে বসে ও সরোজকে নিজের খাতাগুলো দেখাচ্ছিল। সরোজের লোলুপ চাউনিতে ও কিছু না বুঝেই হঠাৎ পালিয়ে এসেছিল। তারপর সরোজের সেই উন্মত্ত আচরণ। অঝোর-ধার বৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় পায়চারি, এ সবের কোন অর্থই সে করতে পারে নি। কিন্তু এই বিশেষ রাত্রিটির আগে এবং পরে এই সুদীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে কই কোনদিন ত কোনরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কার কোন কারণই ঘটে নি। তা হলে, আজ, এই এতদিন পরে, এই তীর্থ-অন্তে এ কি এক অসঙ্গত প্রস্তাব! তবে—তবে কি রেণু ভুল শুনেছে, বোধ হয় সে ভুলই শুনেছে, না হলে 'বাবা' কি কখনও এমন কথা বলতে পারে!

মেঝে থেকে উঠে গুটি গুটি সরোজের ঘরে এসে দেখলে, সরোজ নেই, ওর জামা এবং বিকালে বেড়াতে যাবার জুতো জোড়াও নেই।

রেণু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। এখনই সরোজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হোল না।

সন্ধ্যার পর সরোজ ফিরে এসেছিল। ভাই-ফোঁটার জন্য রেণু যা আনতে বলেছিল, সবই সরোজ এনেছে এবং সেই সঙ্গে রেণুর ফরমাস-মত ছোট ধুতিও এনেছিল, কিন্তু দুখানা নয়, তিন খানা, আড়ং ধোলাই করা সুন্দর জরিপাড় ধুতি। রেণু তার অপরাহ্নের সমস্ত গ্লানি এই তিনখানা ধুতি পেয়ে সম্পূর্ণ ভুলে গেল।

বল্লে, তিনখানা কেন বাবা? বাবা শব্দটার ওপোর কেমন যেন জোর পড়ল।

রেণুর মুখের ওপোর ম্লান দৃষ্টি তুলে সরোজ বল্লে, সমুর জন্যও আনলুম। অপু ওকে দেবে ত!

রেণু যেন আবার শিউরে উঠল।

এর পর সরোজ ও রেণু কেউ কাউকেই কোন কথা বলে নি। বলবার অবকাশই বা কোথায়? নতুন কাপড়, জামা, সাবান, তেল, পাউডার এই সমস্ত নিয়ে অলক ও অপু এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে ওদের কাছ থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে গুছিয়ে তুলতেই রেণু ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে অলক-অপুকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে বাচ্ছা দুটোর গা মুছিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে আসনে বসিয়ে রেণু খুব ঘটা করে অপুকে দিয়ে ফোঁটা ও খাবার দেওয়ালে, নিজেও সরোজকে শুনিয়ে শুনিয়ে অলকের কপালে ফোঁটা দিয়ে 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যম দুয়ারে পড়ল 'কাঁটা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করলে এবং ওদের যেমন খাবার দিলে ঠিক তেমনইভাবে সরোজকেও এক থালা খাবার দিলে। সরোজ রেণুর সঙ্গে বিশেষ কোন কথাই বল্লে না, যা হয় দু'একটা ছাড়া ছাড়া কথা ছেলেমেয়ের সঙ্গে বলে বাজারে চলে গেল। এখানকার সেই ঝিটা আজ সকলেও আসে নি।

দুপুরে ভাত খাওয়াও রেণু বেশ ঘটা করেই করেছিল। সরোজ, অলক, এবং বাচ্চা দুটোকে পাশাপাশি জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল এবং ওদের সামনে জায়গা হয়েছিল অপুর। পিলসুজের ওপোর প্রদীপ জেলে দিয়েছে। অপুকে দিয়ে দাদার হাতে গণ্ডূষ দেবার উপক্রম করে রেণু বল্লে, বাবা সংস্কৃত মন্তরটা বলুন, ও ত আমি জানি না। ঐ মন্ত্র সে শুনত মামার বাড়ীতে এমনই সব ভাই-ফোঁটার দিনে।

সরোজ অপুকে বল্লে, ভ্রাতস্তবানুজাতাহম্ ইত্যাদি।

নতুন শাড়ী পরে জড়িয়ে-মড়িয়ে অপু কোন রকমে বোনের কর্তব্য সম্পাদন করে সরোজের নির্দ্দেশে টুক্ করে দাদাকে নমস্কার করেই নিজের আসনে খেতে বস্‌তে যাচ্ছে অলক বল্লে, এই, আমার পায়ের ধুলো নিলি না? নে, পায়ের ধুলো নে।

অপুর অপমান-বোধ হোল। বল্লে, ইঃ, আবার পায়ের ধুলো নেবে?

এই নিয়ে ভাই বোনে লেগে গেল ঝগড়া। ওদের ঝগড়া মেটান'র পর ওরা সকলেই খেতে সুরু করলে। রেণু আর গণ্ডূষ দেবার কোন চেষ্টা করে নি, কারণ মামার বাড়ীতে মামা রেণুকে দিয়ে নিজের ছেলেকে গণ্ডূষ দেওয়াতেন না বোধহয় স্ত্রীর ভয়ে, কিন্তু মুখে বলতেন সহোদর ভগ্নি ছাড়া গণ্ডূষ দেওয়ার বিধান নেই, ফোঁটা অবশ্য সকলেই দিতে পারে। সরোজ লক্ষ্য করলে, রেণু গণ্ডূষ দিতে চাইলে না, সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হোল। রেণু বেশ সহজ সুরে অপুকে বল্লে, অপু, আজ তুমি গণ্ডূষ দিয়েছ। এখন তুমি বড় মেয়ে, আজ নিজে নিজে খাও, আমি তোমার ভাইদের খাইয়ে দিই।

দরাজ গলায় অপু বলে, আচ্ছা।

সরোজ আর একবার আশান্বিত হোল, রেণু অপুকে বলছে তোমার 'ভাইদের' খাইয়ে দিই, 'ভাই'কে বলে নি।

বাচ্ছাদের খাওয়াতে খাওয়াতে রেণু দেখলে অপু নিজের কাপড়ে ভাত ফেলে কনুই পর্যন্ত ঝোল মেখে একশা করছে, এবং অলক হি হি করে হাসছে।

নিরুপায় রেণু এবার মাঝখানে বসে ওদের তিনজনকেই খাইয়ে দিতে লাগল। সরোজ খেতে খেতে তৃপ্তির সুখে শিশুদের ভোজন দৃশ্য দেখেছিল, কোন কথা সে বলে নি।

দুপুরে সোরগোল করে চারটে মেয়ে এবং একটা ছেলে নিয়ে সরোজের বোন ভগ্নীপতি এসে হাজির হোল।

ভগ্নীপতি অভিযোগ করলে, ভায়াকে চিঠি লিখেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না, অথচ ভায়ার দিদিটি ভাই ভাই করে অস্থির, তাই কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে এই এতদূরে দৌড়ে আসতে হোল।

সরোজের দিদি রেণুকে শুনিয়ে শুনিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলে, সতীলক্ষ্মী সরলা যখন ছিল তখন এই ভাই আমার এমন 'পর' হয়ে যায় নি, কিন্তু এখন সব হা-ঘরেদের পাল্লায় পড়ে—

সরোজ বল্লে, আমি এখানে ছিলুম না দিদি, মাত্র কালই আমি এখানে ফিরেছি—

তা কোথায় গিয়েছিলে ভাই সে কথা কি মনে করে এক লাইনের একটা চিঠিতেও জানিয়েছিলে? তোমার দিদি যে এখনও মরে নি সে কথা কি তোমার মনে ছিল?

ভগ্নীপতি বল্লেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

সরোজ বলে, পুরীতে।

এঁ্যা, এতদূরে? এই সব ছানা-পোনা নিয়ে? না একা?

সরোজ বলে, একা গেলে এরা আর কোথায় থাকবে বলুন। কাজেই সকলকেই নিয়ে যেতে হোল।

দিদি বলে, খুব কষ্ট হয়েছে ত? একলা একলা এই সব চ্যাঁ ভ্যাঁ নিয়ে? তা আমাকে যদি একটু জানাতে, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম। বিদেশ বিভূঁই জায়গা, যদি কারুর অসুখ-বিসুখ করে পড়ত? তখন একলা মানুষ, কি করতে তুমি?

সরোজ বল্লে, না; সে রকম কোন বিপদ হয় নি। ভালোয় ভালোয় সবই উৎরে গেছে।

অতিথিদের আহারাদির ব্যবস্থায় রেণু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রেণুর বরাৎ ভালো, ঠিকে ঝিটা আজ বিকালেই এসে পড়ল, দিদিমণিরা এসেছেন?

রেণু বল্লে, কাল আসনি কেন? ভাই-দ্বিতীয়ার আগের দিন আসতে বলেছিলুম না?

এসেছিলুম দিদিমণি। সকালে এসে দেখি দরজায় তালা দেওয়া বেলা আটটা পর্যন্ত বসে বসে চলে গেলুম।

সত্যই সে এসেছিল কি না কে জানে? রেণু বল্লে, আজ সকালেও ত' আসতে পারতে?

সে বল্লে, সকালে বাড়ীতে ভাইফোঁটার কাজে আর আসতে পারি নি। ভাবলুম বিকেলে এসে দেখব এসেছেন কি না।

বৃথা বাক্যব্যয় না করে ঝি কাজে লেগে গেল।

সরোজের বোন-ভগ্নীপতি এ বাসায় রয়েও গেল দু'দিন। সে দুটো দিন তারা রইল সরোজের ঘরে, অলক রইল পিসতুত ভাই-বোনদের কাছে, এবং সরোজ একা রাত্রি যাপন করলে বাইরের অফিস ঘরে চেয়ার টেবিল সরিয়ে মেঝেয় বিছানা পেতে। এতে বোন এবং ভগ্নীপতি দুজনেই প্রচুর অভিযোগ করেছিল। ঝি খাটের ওপোর গদিতে শোয় এ নিয়েও বোন বেশ পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে ছোট ভাইকে। ঝিয়ের ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে সমানে মানুষ হচ্চে এটাও যে খুব অন্যায় সে কথাও সে বলতে ছাড়লে না, কিন্তু সরোজ প্রথমটা এ বিষয়ে নীরব থেকে শেষে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশ জোর করেই বলেছিল, কার বাড়ীর কি ব্যবস্থা হবে সেটা সেই বাড়ীর লোককেই ঠিক করতে দাও দিদি। আমি এখন কচি খোকা নই যে না বুঝে কিছু একটা করে বসব। এ বিষয়ে কোন আলোচনা আমি চাই না।

ভগ্নীপতির ইঙ্গিতে বোন থেমে গেল। মেয়ে বড় হয়েছে, বোন-ভগ্নীপতির আশা, এই বড় মেয়ের বিয়ের সময় ধনী মামার কাছ থেকে বিয়ের খরচা হিসেবে মোটামুটি কিছু বাগিয়ে নেওয়া। অতএব সরোজের কাছে অপ্রিয় হবে এমন কোন আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবং ফাল্গুন মাসে মেয়েটার বিয়ে ঠিক করে চিঠির পর চিঠি লিখে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভগ্নীপতি দেড় হাজার টাকার চেক নিয়ে তবে উঠেছিল। রেণু শুনলে যে, সরোজ প্রথমেই হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু ভগ্নীপতি দু'হাজারের কম কিছুতেই নেবে না। শেষে দেড় হাজারে রফা হয়েছিল। সরোজ নিজের ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখিয়ে বলেছিল ওর মোট সম্বল এক হাজার পাঁচশ' ছিয়াত্তর টাকা তের আনা পাঁচ পাই।

এই বিয়েতে সরোজ যায় নি। তাদের সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও কেন গেল না, সে কথাও রেণু শুনেছিল। সেইদিন সেই কথার পৃষ্ঠেই রেণু অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, বাবা, আপনি পুনরায় বিবাহ করুন।

সরোজ ওর দিকে মুখ তুলে ম্লান কণ্ঠে বলেছিল, সেই কথাই ত বলেছিলুম তোমাকে, তুমি ত কোন সাড়া দাও নি।

নিজের বুড়ো আঙুলের নখটিকে নিরীক্ষণ করতে করতে রেণু বলেছিল, যা হয় না সে কথা বল্লে কি করে সায় দিই বলুন। আর তা ছাড়া এতে কি সমাজে

আপনার প্রতিপত্তি বাড়বে ? আত্মীয় স্বজনদের কাছে ? পিসিমা-মাসিমারা কি এটা সহ্য করবেন ?

সরোজ বল্লে, দেখ রেণু, ও কথা বোলো না, বিধবা বিবাহ আজকাল প্রচলিত হয়েছে। আমাদের জেলা জজ মিঃ দাস—

ও কথা বলবেন না। যাকে 'বাবা' বলে এতদিন মনে করে এসেছি—ঘাড় হেঁট করে রেণু বলছিল। পাতানো সম্বন্ধটাই যদি বড় বলে মনে কর, তাহলে সেই সম্বন্ধ নিয়েই থাক, সরোজ উত্তর দিলে।

রেণু বল্লে, তাই থাকতেই ত চাইছি বাবা। কিন্তু আপনার মুখের দিকে চেয়ে এবং সমাজের মুখ চেয়ে আমি বলছি, আপনি বিয়ে করুন, তাহলে আমাকে নিয়ে কেউ আর কোন সন্দেহ করবে না।

সরোজ নীরব ছিল। রেণু বলেই চলল, বাড়ীতে যদি আমার নতুন মা আসেন তাহলে আমাকে নিয়ে আর কোন কথাই উঠবে না। যেমন ঝি-রাঁধুনী থাকে, আমি তেমনই থাকব।

পারবে থাকতে? তোমার নতুন-মা যে আসবে, সে তোমাকে সহ্য করবে ?

কেন করবে না ? ছোট মেয়ে আসবে, ছেলে মেয়ে দেখা শোনার লোক না থাকলে সে একলা সামলাবে কি করে? আত্মপ্রত্যয় সহকারে রেণু উত্তর দিলে।

সরোজ ওর মুখের দিয়ে চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় জোর দিয়ে বল্লে, করবে না, করতে পারে না। সে যদি এ বিষয়ে কিছু মনে নাও করে, তাহলে ঐ যে সমস্ত আত্মীয়ের কথা বলছ, সেই তারাই তোমার নতুন-মায়ের মনকে এমনই ভাবে বিষিয়ে তুলবে যে, তোমাকে এ বাড়ীতে আর টিক্‌তে হবে না।

ধীরে ধীরে ম্লান মুখে রেণু বল্লে, টিক্‌তে না পারি, চলে যাব, কিন্তু আপনার ত—

বাধা দিয়ে সরোজ বল্লে কোথায় যাবে, সে কথা ভেবেছ কি ?

রেণু ঘাড় নেড়ে নেতি বাচক উত্তর দিলে।

তবে? আমার ছেলেদের তুমি বাঁচিয়ে তুল্লে, আর তোমাকে ঐ একটা বাচ্চা সমেত আমি তাড়িয়ে দেব, এই কথাই তুমি বলতে চাও? তুমি কি আমাকে এমনই জানোয়ার বলে মনে কর ?

জিভ কেটে রেণু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, ছি ছি, ও কথা বলছেন কেন। আমি কি তাই বলছি। আমি এখানেই থাকব। আর যদি একান্তই থাকতে না পারি তাহলে আপনিই আমাকে অন্যত্র কোথাও আপনার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যেখানে কাজের লোকের দরকার হবে সেই রকম জায়গায় ব্যবস্থা করে দেবেন।

অলক, অপু, সমুর জন্য মন কেমন করবে না? সরোজ ওর দিকে মিটিমিটি দেখতে লাগল, যেন পরীক্ষা করছে রেণুকে।

ম্লান হয়ে রেণু বল্লে, মন কেমন করলে আর কি করব? যাদের ওপোর অধিকার নেই তাদের ত জোর করে আঁকড়ে রাখা যায় না। একটু দম নিয়ে বল্লে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে এসে ওদের দেখে যাব।

ওরা তোমায় ছাড়বে? ওদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম প্রথম হয়ত কষ্ট হবে, তারপর নতুন মা পেয়ে ওরা ভুলে যাবে।

সৎমা ওদের যত্ন করবে ?

কেন করবে না। সে ত জেনে শুনেই আসছে যে তাকে তিনটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে থাকতে হবে।

তা হয় না রেণু, তা হয় না। যে বাড়ীতেই সৎমা আছে, সেইখানেই গণ্ডগোল। অশান্তির আগুন কোথাও গুমে গুমে জ্বলে, কোথাও ছাত ফুঁড়ে আগুনের শিখা দেখা দেয়, বাইরের লোক নিন্দে করে, মজা দেখে।

মুখের ওপোর মলিন হাসি টেনে এনে রেণু থেমে থেমে বল্লে, আপনি ত আমাকেই ওদের সৎমা করতে চেয়েছিলেন—

তাতে ওদের অসুবিধা হোত না, কারণ তুমি ওদের মা হয়েই আছ আজ দেড় বছরের ওপোর। সরোজ উত্তর দিয়ে আশান্বিত হোল।

রেণু চুপ করে গেল। সরোজ ভাবলে, এইবার প্রস্তাবটা পাকা করার শুভক্ষণ উপস্থিত। এই মাহেন্দ্র যোগ হারিয়ে ফেল্লে পরে হয়ত কোনদিনই আর সুবিধে

হবে না। কিন্তু কি ভাবে কথাটা পাকাপাকি বলা যায় ভাবতে ভাবতেই রেণু বল্লে, একটা কথা বল্‌ব?

আগ্রহ সহকারে সরোজ বল্লে, বল বল, নিশ্চয়ই বলবে। সব দিক ভেবে তবে কাজ করতে হয়।

রেণু বল্লে, বাবা, এই যে আমি রয়েছি, সংসারের সমস্ত ভার মাথায় নিযে আছি। ছেলে মেয়েদের কোন অভাব যাতে না থাকে সেজন্য প্রাণপণ খাট্‌ছি। আপনাকেও আমি যথাসাধ্য সেবা করছি, আর সেই সঙ্গে আমার গুঁড়োটুকুও আস্তে আস্তে বেড়ে উঠ্‌ছে। এইটাই কি ভাল নয় বাবা! যে কাজ আমার চোদ্দ-পুরুষে কেউ কখনও করে নি, খামোকা সেই কাজটা আমাকে দিয়ে না করালেই কি নয়? মাটীর দিকে চেয়ে ঘাড় হেঁট করেই রেণু বল্লে, বিয়ে হলে বেশী স্থবিধে আর কি হবে?

সরোজ হঠাৎ ঝেড়ে মেড়ে সোজা হয়ে বস্‌ল, সত্যিই ত, তুমি ঠিকই বলেছ রেণু। তারপর সরোজ স্বগতঃ-ভাবেই বলে উঠল—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্ বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্ট মস্বর্গ্যা মকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্মংগমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

রেণু—সরোজের ডাক শুনে বিস্ফারিত নেত্রে রেণু সরোজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর ভয়ে ভয়ে বল্লে, বলুন।

তোমার কথাই ঠিক। লেখাপড়া না জানলে কি হয়। তুমি আমার চেয়েও ঢের, ঢের বেশী জ্ঞানী, অনেক বেশী বিচক্ষণ। সাময়িক উত্তেজনা কমিয়ে সরোজ বল্লে, অনেক ভেবেছি রেণু, অনেক ভেবেছি। সব দিক বিচার করে দেখেছি। এও ভেবেছি যে, তোমার ছেলে বড় হয়ে কি ভাববে? সে কি আমায় 'বাবা' বলে কখনও কোনদিন ভক্তি করতে পারবে? কখনও না, কথ্‌খনো না। তোমার কথাই ঠিক। যেমন আছি তেমনই থাকব। আমরা সৎপথেই থাকব এতেও যারা অপবাদ দেবে তাদের অপবাদে তারাই ক্ষুণ্ণ হবে। দৈহিক কামনাকে বিবাহের আবরণ দিয়ে বিবাহ শব্দটা কলুষিত করতে চাই না।

একটু থেমে সরোজ বলেছিল, ঠিক আছে রেণু, তুই আমার বিধবা মেয়ে হয়ে চিরদিন বাপের কাছেই থাকবি। এ বাড়ীতে অপুর যে অধিকার, সেই অধিকার থেকে কেউ তোকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

দেড় বছর পরে এই প্রথম সরোজ রেণুকে 'তুমি' না বলে 'তুই' বলেছিল। রেণু গলায় আঁচল দিয়ে সরোজের পদধূলি গ্রহণ করলে। বল্লে, বাবা, বেলা হোল, চানটান করবেন না।

সরোজের স্নান করার সময় হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সে বল্লে, হাঁা, এই যাচ্ছি।

রেণুর মনের থম্ থমে কালো মেঘ নিমেষমাত্রেই সরে গেল। আজ মনে পড়ল, বড় বাবুর আশীর্ব্বাদ, সৎপথে, ধর্ম্মপথে থেকো। বড়বাবুকেও সে উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালে।

কিছুদিন পরে কোর্ট থেকে ফিরে জল খেতে বসে সরোজ বল্লে, রেণু, এবার সব গোছ গাছ করতে হবে রে। এ বাড়ীর মায়া কাটাতে হবে?

কেন বাবা? ছেলে মেয়ে রেণু সকলেই এক বাক্যে প্রশ্ন করলে।

অলক বল্লে, আবার বুঝি বেড়াতে যাব বাবা? আমাদের গরমের ছুটী পড়তে এখনও দেরী আছে কিন্তু, বোধ হয় দু তিন সপ্তাহ এখনও ইস্কুল হবে।

সরোজ বল্লে, সে বেড়ানো নয় রে, সে বেড়ানো নয়। এবার বর্দ্ধমান থেকে বিদায় নিতে হবে।

কেন বাবা? রেণুর প্রশ্নে ছিল আতঙ্কের সুর। ছেলেমেয়েরা খাওয়া ছেড়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

স্মিতহাস্যে সরোজ বল্লে, ভয় নেই গো রেণুমণি, ভয় নেই। চাকরীতে বদ্‌লির নোটিস এসেছে, এবার যেতে হবে ঢাকায়।

ঢাকা? সে কোথায় বাবা? কত দূরে? অলক প্রশ্ন করেছিল।

কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সরোজ রেণুকে লক্ষ্য করে বল্লে, তুই শুনলে খুসি হবি রে, চাকরীতে উন্নতিও হয়েছে। ঢাকায় সাবজজ হয়ে যাচ্ছি।

সাব জজ্? রেণু চুপ করে গেল।

সাবজজ কাকে বলে জানিস্? সরোজ প্রশ্ন করলে।

রেণু বল্লে, শুনেছি। জজ খুব মস্ত লোক, বলেই মুখ হেঁট করে ফেল্লে।

মস্ত লোক! হা হা করে সরোজ হেসে উঠেছিল, কোথায় শুনলি রে, কে বল্লে তোকে যে, জজ মস্ত লোক!

রেণু কোন উত্তর দেয় নি, কথাটা বলে সে লজ্জাই পেয়েছিল।

কই রে, বল্লি না? সরোজ পুনরায় প্রশ্ন করলে।

রেণু বল্লে, মামার বাড়ীতে যখন ছিলুম তখন মামার এক যজমানের মেয়ের শ্বশুর এসেছিলেন বেয়াই বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে। আমরাও পুজো-বাড়ী গিয়েছিলুম। পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেই চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। শুনেছিলুম তিনি জজ।

এইতেই তোরা বুঝে নিলি জজ মস্ত লোক।

সকলেই বল্লে, তাই শুনেছিলুম। আর চেহারাটাও ভারী জাঁদরেল ছিল। ইয়া ভুঁড়ি, এত বড় গোঁফ—

সরোজ বল্লে, সব্বোনাশ! তাহলে ত আমাকে জজ বলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। আমার ভুঁড়িও নেই, গোঁফও নেই। তবে গোঁফ না হয় আজ থেকেই রাখতে পারি, কিন্তু ভুঁড়ি কোথায় পাব রে?

বাবা, বাবা তুমি গোঁফ রাখবে, ঐ আমাদের মাষ্টার মশাইয়ের মত, অপু সরোজের হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

সরোজ বল্লে, রাখতেই হবে; না হলে তোমার দিদি যে আমাকে জজ বলে বিশ্বাসই করবে না।

ছিঃ বাবা, গোঁফ বিচ্ছিরী। জানো বাবা; মাষ্টার মশাই জল-খাবার সময় গেলাসের জলের ভেতরে গোঁফগুলো ডুবে যায়। কাঁচের গেলাসের এ ধার দিয়ে তখন সেই গোঁফগুলো কি বড় আর মোটা বলে মনে হয়। ঢোঁক গিলে গিলে অপু এতগুলো কথা বলে ফেল্লে।

তুই দেখেছিস্? সরোজ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ বাবা, সেদিন মাষ্টার মশাই পড়াতে এসে জল চাইলেন। তখন জল এনে দিলুম ত: তা সেই—সেই দিনেই দেখেছিলুম।

অলক বল্লে, হ্যাঁ বাবা, দেখ, অপুটা কি অসভ্য! মাষ্টার মশাই জল খাচ্ছেন, আর অপু আমাকে ঐ সব কথা ফিস্ ফিস্ করে বলছে। মাষ্টার মশাই শুনতে পাবেন না বাবা? শুনলে কি মনে করবেন বলত?

সরোজ অপুর মাথার চুলগুলো আঙুলে করে সরিয়ে দিতে দিতে বল্লে, ছি মা, মাষ্টার মশাই গুরুজন, তাঁর সম্বন্ধে ঐ রকম হাসাহাসি করতে নেই।

বা রে, আমি আবার হাসলুম কোথায়! আমি যা দেখলুম, তাই ত দাদাকে দেখাচ্ছিলুম। দাদাটা যেন কি, অমনি বাবার কাছে নালিশ করছে। অপু মুখখানা গম্ভীর করে নিলে।

পাঁচ সাত দিন ধরে চলেছিল-যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্ব। এত আর পুরী যাওয়া নয় যে বাক্স গুছিয়ে বিছানা বাঁধলেই কাজ শেষ। এখানকার পালা চুকিয়ে জিনিষ পত্র সমস্ত নিয়ে তবে এবার যেতে হবে।

খাটখানা খুলে খলে জড়িয়ে নাম লিখে রেলের বুকিং এ দিতে হবে, তক্তপোষটা এখানকার কাউকে দিয়ে যেতে হবে, ভাঁড়ার ঘরের জালের আলমারীটা—

সরোজ বল্লে, আলমারীটা নিয়েই যাব, ওটা সরলা বর্দ্ধমানে এসে খাবার রাখার জন্য জোর করে আমার কথা না শুনে নিজের হাত খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কিনে নিজের শোবার ঘরে রেখেছিল। তারপর তার অসুখের সময় ওটা ভাঁড়ার ঘরে রাখতে সে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, ওটা তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না, ওটা যেন কাউকে দাতব্য কোরো না, কাজেই—

রেণু বল্লে, হ্যাঁ বাবা, ওটা তাহলে মায়ের চিহ্ন, ওটা নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে হবে।

অতএব সেটাকেও চট মুড়ে রেলের বুকিং-এ দেবার ব্যবস্থা হোল।

কদিন ধরে ছুটী নিয়ে সরোজ এই সব কাজই করছিল। চেয়ার টেবিল সরকারী জিনিষ, মালখানায় চলে যাবে, কিন্তু বই কি সরোজের কম! রাস্তার মোড় থেকে তক্তপোষ ওয়ালাকে ডেকে সরোজ বল্লে, বেশ ভাল মজবুত গোছের তিনটে বড় প্যাকিং বাক্স

তৈরী করতে হবে, বই নিয়ে যাব। বাক্সগুলো যেন সেগুন কাঠের হয়।

তক্তপোষওয়ালা বাক্স তৈরীর অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

পরদিন সে বাক্স এনে হাজির করলে। তখন সরোজ বাসায় ছিল না। রেণু বাক্স তিনটে অফিস ঘরে রাখিয়ে তক্তপোষওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেল্লে। সরোজ এসে বাক্স দেখে খুসি হয়ে বল্লে, বাক্সগুলো দিয়ে গেছে দেখছি, কিন্তু—কিন্তু রেণু, ঝিকে দিয়ে লোকটাকে ডাকিয়ে পাঠাও ত, দামটা এখনই দিয়ে দি—নইলে পরে আবার কখন সময় হবে কি হবে না—

রেণু বল্লে, ওর কোন দাম লাগবে না বাবা, আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

কি রকম? কি কথা হোল?

রেণু বল্লে ঐ বাক্স তিনটের বদলে ও ওর তক্তপোষখানা নিয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে সরোজ বল্লে, তাই নাকি? রাজী হয়েছে?

হ্যাঁ বাবা, রাজী হবে না কেন? সাড়ে সাত টাকা দামের তক্তপোষ।

ঘাড় নেড়ে সরোজ বল্লে, ঠিকই হয়েছে। বাক্সগুলো ও তিনটাকা হিসেবে চেয়েছিল, আমি বলেছিলুম আড়াই টাকা হিসেবে দেব। লোকটা তখন কিছু বলে নি। আমি ওকে এক টাকা বায়না দিয়েছিলুম। তা হলে যাক্, ঠিকই হয়েছে। পুরানো তক্তপোষখানা আর নগদ একটা টাকা।

ঠিক হোল, ঘরের ছবিগুলো এবং দেওয়ালে ঝোলানো আরসীখানায় মোটা করে কাপড় জড়িয়ে ঐ বাক্সর যে কোন একটায় বইয়ের সঙ্গে দেওয়া হবে। ছবিগুলো নামাতে নামাতে সরোজ বল্লে, রেণুর উচিত ছিল ব্যবসাদারের বাড়ীর বউ হওয়া।

রেণু বল্লে, কেন? জজের মেয়েরা বুঝি এই সব ছোট কাজ করে না?

সরোজ হাসতে হাসতে ওর দিকে মুখ তুলে দেখেছিল, কোন উত্তর দেয় নি।

ষ্টীমারে উঠে অলক অপুর কি আনন্দ, রেণুও অবাক। ইণ্টার-ক্লাসের কামরার মধ্যে বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়তে অলকের টানাটানিতে রেণুকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হোল। সরোজ বল্লে, তুমি যাও, আমি এখানেই রইলুম, এদের দেখব।

সমুদ্রের মত ঢেউ তুলে গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমার পদ্মার বুকে পাড়ি জমিয়েছে। দূরে দূরে মাছধরা জেলে ডিঙ্গি, আর জল, জল, খালি জল। একপাশে অনেক দূরে গাছ পালা ও কুঁড়ে ঘর সমেত নদীর পাড় দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকের পাড় দেখাই যায় না। দূর দিগন্তের কাছে কালো রঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সেটা একটা ষ্টীমার, ওদেরই মত যাত্রীবাহী ষ্টীমার। দেখতে দেখতে সেখানা বেশ খানিকটা দূর দিয়ে ঢেউ কেটে চলে গেল। তার এপাশের বিরাট চাকাখানা জল কেটে যাচ্ছিল, ওরা এখান থেকে স্পষ্ট দেখলে। সেই ষ্টীমারের ঢেউগুলো ক্রমে ক্রমে এই ষ্টীমারের ঢেউগুলোর সঙ্গে মিশে গেল। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। অলক অপুর মাথার চুল, রেণুর থানধুতির আঁচল, জাহাজের রেলিংএর গায়ে মাঝি মাল্লাদের শুকুতে দেওয়া লুঙ্গি, পায়জামা সমস্তই প্রবল বেগে উড়ছে। পৃথিবীকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে যে প্রকাণ্ড নীল আকাশ, সেই আকাশ থেকে রৌদ্রের প্রখর কিরণ পদ্মার উদ্বেল জলের ওপোর পড়ে এমনই চক্‌চক্ করছিল যে, সেদিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। প্রথমটা দেখতে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু শেষে যেন এক ঘেয়ে হয়ে উঠল। ওরা ওদের নিজেদের জায়গায় ফিরে এল। আসবার সময় অন্য সব যাত্রীদের দিকে রেণুর নজর পড়ল। বাক্স, বিছানা, পোঁটলা-পুঁটলী, কত রকম বিচিত্র লট-বহরের মধ্যে মানুষগুলো বসে কথা কইছে গল্প করছে, ঝগড়া হচ্ছে। বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, তার মা বাজখাঁই গলায় ধমক দিচ্ছে, ঠেঙাচ্ছে। ওরই মধ্যে দাড়িওয়ালা মুসলমান পরম আরামে সট্‌কায় তামাক টানছে, বিড়ি ও তামাকের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ, দোক্তাপাতার বস্তা থেকে দোক্তার গন্ধ, মুরগী-ভর্তি ঝুড়ির গন্ধ, এবং সকলের

ওপোর এঞ্জিন ঘরের একটানা যান্ত্রিক শব্দ ও উত্তাপ সমস্ত মিলিয়ে জাহাজের পাটাতন যাকে বলে সরগরম। এরই মাঝে জাহাজের পেছনের একটা জায়গা দেখিয়ে অলক বল্লে, দেখ দেখ দিদি, কি করছে দেখ।

রেণু সেদিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। কয়েকটা বড় বড় মুরগী পা দিয়ে চেপে ধরে একজন লুঙ্গিপরা খালাসী-গোছের লোক ছুরি হাতে একটার পর একটা জবাই করছিল। মুরগীগুলো আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে—কঁক্ কঁক্ কঁক্। কিন্তু ঘাতকের ভ্রূক্ষেপই নেই। অত্যন্ত সহজ ভাবে মুরগীর গলায় আড়াই পোঁছ দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্ছা একটা ছেলের পায়ের কাছে দিচ্ছিল। সে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে কাটা মুরগীটাকে চেপে ধরছিল। কাটা মুরগী ধড় ফড় করছে। ছিট্‌কে ছিট্‌কে রক্ত বেরুচ্ছে। সেটা ঠাণ্ডা হবার পূর্ব্বেই আর একটা কাটা মুরগী এসে তার ওপোড় পড়ছে। জলে এবং রক্তে মাখামাখি হয়ে সুন্দর সুদৃশ্য মুরগী এক মিনিটেই বীভৎস হয়ে উঠছে। রেণুর মনে হোল, পৃথিবী সুন্দর, পৃথিবীর গাছপালা, জীবজন্তু নদী হাওয়া সমস্তই সুন্দর। কেবল সুসভ্য মানুষ নিজের স্বার্থে সুন্দর পৃথিবীকে বীভৎস করে তোলে।

ঘাড় হেট করে কেবিনের দিকে যেতে যেত রেণু সেই কথাই ভাবছিল। তার মনে হোল, মানুষই রাক্ষস। নিজের লোভটাই তার সব। অবশ্য রেণু যখন মাগুর মাছ কোটে, তখন কিন্তু এই কথাটা তার মনেই হয় না।

কেবিনে আসতেই সরোজ বল্লে। খাওয়া দাওয়া কি হবে? জাহাজের হোটেলে না হয় আমাদের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু তোমার?

রেণু বল্লে, না বাবা, হোটেলে খেতে হবে না। যা সব মুরগী নিয়ে কাণ্ড করছে—

তা ত করবেই। তবে মুরগী ছাড়া মাছ ভাতও পাওয়া যায়, সরোজ উত্তর দিলে।

রেণু বল্লে, ছি:, ওখানে কি খাবেন, সব মুসলমানের ছোঁয়া। তার চেয়ে আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে দি, মুড়কী আছে, চিনি আছে, তাই দিয়ে খেয়ে নেবেন। বাচ্ছারাও তাই খাবে। তারপর হর্লিক্স করব। তাইতেই হয়ে যাবে।

সরোজ বল্লে, তা ভাল, হয় মুরগী না হয় মুড়কী। ওরা সবাই হেসে উঠল।

কোন একটা ষ্টেশনের কাছে জাহাজ এসে ভিড়ছে। সে আবার কি ষ্টেশনরে বাবা? নদীর ভেতর একমাত্র জেটি। লোকজন, মালপত্র সেই জেটিতে নামল। যারা ওঠবার তারা সেই জেটি থেকে কাঠের বিট্ লাগানো পাটাতন দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজ উঠে এল। তারপর জেটির যাত্রীরা ছোট ছোট নৌকায় উঠে তবে কিনারায় যাবে। এধারে যখন লোকজনের চেঁচামেচি হট্টগোল চলছে, তখন জাহাজের আশে পাশে ও জেটির কাছাকাছি কয়েকখানা জেলে ডিঙ্গি মাছ বিক্রী করার চেষ্টা করছে। চক্‌চকে টাট্‌কা তাজা মাছ। এই মাত্র নদীতে ধরা। পশ্চিমবাংলার সরোজ মাছ দেখে লুব্ধ হোল বটে, কিন্তু এখন আর মাছ নিয়ে কি করবে।

ঢাকায় গিয়ে গোছগাছ করে বসতে বেশ ক'দিন কেটে গেল।

রেণু দেখলে, তিনটে কাঠের প্যাকিং বাক্স বাবা খুব বুদ্ধি করে তৈরী করিয়েছেন। ঐ বাক্স তিনটে পরপর সাজাতেই বেশ একটা বেঞ্চি তৈরী হয়ে গেল। এক হাত চওড়া আর প্রায় চার হাত লম্বা বেঞ্চি, তার ওপোর হোল্ডঅলের সরু তোষকটা পেতে চাদর মুড়ে দিতেই এক জনের শোবার মত একটা সরু বিছানাই বলতে গেলে হয়ে গেল। সরোজ বল্লে, কি রে, ভাল হোল না? বেঞ্চিকে বেঞ্চি, আবার ভেতরে ফালতু জিনিষ ফেলে রাখা যাবে এবং আবার যখন কোথাও বদলি হতে হবে তখন বই-টই নিয়ে যাওয়া যাবে।

রেণু জিনিষটার তারিফ্ করলে। গ্রাম্য রেণুর সপ্রশংস দৃষ্টিতে সব জন্য সরোজ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল।

আজ থেকে কতদিন, কত বছর আগে এই সব ঘটনা ঘটে গেছে। ঢাকা সম্বন্ধে রেণুর খুঁটিনাটি সমস্ত কথা তেমন কিছুই মনে পড়ে না, ভাসা-ভাসা গোটা কতক জিনিষই মনে আছে, কেবল বিশেষ ভাবে মনে

আছে দুটি ঘটনা, যে দুটির প্রথমটিতে ওর মত মেয়েও ভয় পেয়েছিল, মনে মনে প্রমাদ গণেছিল। এবং পরেরটায় সকলের সঙ্গে একত্রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

সেই প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল ঢাকা যাবার প্রায় তিন মাস পরে।

ঢাকায় এসে এখানকার স্কুলে অলককে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। ভর্ত্তির কিছুদিন পরেই স্কুলে গরমের ছুটী পড়েছিল। সেই ছুটী শেষ হয়ে আবার যেদিন স্কুল খুললো সেই দিনেই সরোজ কোর্ট থেকে ফিরে এল এক গা জ্বর নিয়ে। এসে কোন রকমে কোটটা গা থেকে খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল, জুতোর ফিতে খুলতেও পারলে না। সেদিন রেণুর মাথায় সত্যিই আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল!

এতদিন পরে ওর মনে পড়ল শ্রীপতির কথা। সেও ত এমনই জ্বর নিয়ে সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে ফিরে এসেছিল।

পাশের বাড়ীর ওঁরা এই অসুখে খুব সাহায্য করেছিলেন। ডাক্তার ডাকা, দেখাশুনা করা, দিনরাত সব সময় খবর নেওয়া। প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন ধরে সরোজ ভুগেছিল, তা এই এতদিন সমানে ওঁরা সাহায্য করেছিলেন। আর সাহায্য করেছিল সরোজের কোর্টের একজন। ওঁদের ঋণ রেণু কোনদিনও ভুলবে না।

সেরে ওঠার মুখে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়েরা সবাই ঘুমিয়েছে, হ্যারিকেনটা কমিয়ে খোলা জানলার তলায় বসিয়ে রেণু পাখা হাতে সরোজের বিছানার ধারে বসে ওর মাথায় আস্তে আস্তে বাতাস করছে এমন সময় সরোজ বলেছিল, এবার শুয়ে পড় রেণু। আর বাতাস দেবার দরকার নেই।

রেণু বললে, আপনি ঘুমান, তারপর আমি শোব'খন।

সরোজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছিল, এ ক'দিন তোর খুব কষ্ট হোল, না রে?

রেণুকে নিরুত্তর দেখে সরোজ বললে, ভয় পেয়েছিলি ত? আমি তোর চোখে জল দেখেছিলুম।

রেণু অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, ভয় আর কি, আপনি সেরে উঠুন, সব ভুলে যাব।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে সরোজ বললে, আমারও ভয় হয়েছিল। আমার কিছু হলে চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে—রেণু বললে, আপনি থামুন ত। যত সব অনাসিষ্টি কথা!

সরোজ বল্লে, শোন, তুই ত ইংরিজি লিখতে শিখেছিস্, নিজের নাম লিখতেও পারিস্—

পারি।

এবার সেরে উঠে আমি তোর নামে পোষ্ট অফিসে বই করে দেব।

কেন?

শুয়ে শুয়ে কেবলই কি মনে হোত জানিস্, যদি আমার কিছু হয়, তা হলে আমার তিনটে হয়ত ওদের মামার বাড়ী জায়গা পাবে; কিন্তু সমুকে নিয়ে তুই কি করবি? তাকে ত কেউ দেখবে না। তবুও যদি তোর কিছু টাকা থাকে—

মিছামিছি কি সব ভাবছেন! আমার জন্ম আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন বলুন ত?

সরোজের মাথার কাছে বসে রেণু ডান হাতে পাখা নিয়ে অল্প অল্প বাতাস করছিল। সরোজ ওর ডান হাত বাড়িয়ে রেণুর বাঁ হাতখানা ধরে নিজের হাতের মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে বল্লে, তুমি যে আমার কতখানি, তা কি আমি ভুলতে পারি।

রেণু শিউরে উঠল, কিন্তু দুর্ব্বল রোগীর হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়েও নিলে না, এমন কি সরিয়ে নেবার চেষ্টাও করলে না। যাকে বলে আত্মসমর্পণ, সে যেন সেদিন তাই করেছিল। কেন জানে না, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে তার মনে পড়েছিল শ্রীপতির কথা, বিয়ের কিছুদিন পরে শ্রীপতিও তার হাত ধরে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল।

সরোজ ধীরে ধীরে ডাকলে, রেণু।

অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, কি?

সরোজ আর কিছু বলে নি। ওর হাতখানাই যেন সরোজের সেই মুহূর্ত্তের পরম সম্পদ।

কিছুক্ষণ পরে সরোজ বলেছিল, আর বাতাস করতে হবে না, আমার মাথাটা একটু টিপে দাও। কথাগুলো বল্লে বটে কিন্তু বাঁ হাতখানা ছাড়লে না।

রেণু পাখা রেখে ডান হাত দিয়ে ওর কপালে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভাগ্যিস্ প্যারা-টাইফয়েডের ওপোর দিয়েই গেল, না হলে কি যে হোত? সরোজ যেন আপন মনেই স্বগতোক্তি করেছিল।

কেন যা-তা ভাবছেন বলুন ত। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, রেণু অনুযোগ করলে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সরোজ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, তোমাকে আমি পেলুম না, এই দুঃখই আমার রয়ে গেল।

এই ত আমি রয়েছি বাবা, আবার আমায় পাবেন কি করে?

বাবা-বাবা-বাবা, সরোজ বিরক্তির সুরে বল্লে, বাপ হতে কি চেয়েছিলুম! রেণু বুঝলে ওর বাঁ হাতটা দুর্ব্বল রোগী প্রাণপণে চেপে ধরেছে। রেণুর মনটা ভেঙ্গে পড়ল। আর একটু হেঁট হয়ে রেণু সরোজের কপাল, ভ্রূ, এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সরোজ চোখ বুঁজে ভোগ করতে লাগল সেবিকার সেবাসুখস্পর্শ।

কিছুক্ষণ কেটে গেল, শুন্‌সান্ নিশুতি রাত, ঘরের অপর প্রান্তে ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। বাইরে রাস্তায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী চলে গেল। ঘর থেকে সেই শব্দও স্পষ্ট শোনা গেল। কিছুক্ষণ স্থির থেকে সরোজ হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে রেণুর হেঁট হওয়া ঘাড়ের ওপোর সেই হাতটা তুলে ওকে আরও কাছে আকর্ষণ করে বলেছিল, তুমি কি আমার হবে না রেণু?

রেণু বললে, আমি কি কোনদিন আপনার অবাধ্য হয়েছি। কথাগুলো বলতে গিয়ে রেণু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ওর গলাটা অসম্ভব ধরে গেছে, এবং শব্দগুলো উচ্চারিত হোল নিতান্ত কেঁপে কেঁপে। লজ্জায়, সংকোচে, আবেশে ও চোখ বুঁজে ফেলেছিল।

সত্যি? ঠিক? রুগ্ণ সরোজ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠতে চেষ্টা করলে। রেণুর মনে হোল, লোকটা ত' চলেই যাচ্ছিল, ও না থাকলে সে যে কোথায় ভেসে যেত তার কোন ঠিকানাই নেই। রেণু মনে মনে স্থির করলে, আজ এই অসুস্থ প্রতিপালকের কোন বাসনাতেই সে ব্যাঘাত করবে না। ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্।

অস্বাভাবিক শক্তিতে সরোজ বিছানায় উঠে রেণুর মুখোমুখি হয়ে বসল। দু হাত বাড়িয়ে ওর দুটো হাত ধরে বললে রেণু! ওর কণ্ঠস্বরে রেণুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হোল।

সরোজ রেণুকে কাছে টানলে, আরও কাছে। রেণু আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করলে না, ওর আকর্ষণে এগিয়ে এল। সরোজও সরে এল। ওদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান নেই বললেই হয়—

এমন সময় হঠাৎ বিকৃতভাবে চেঁচিয়ে উঠল অপর্ণা।

কি-কি হোল, কি হোল? উৎকণ্ঠিত সরোজের শিথিল মুষ্টি থেকে নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে রেণু দৌড়ে এল অপর্ণার কাছে। অপু-অপু—

অপু নিজের কাঁধে হাত দিয়ে কাঁদছিল।

অপুকে তুলতেই রেণু দেখলে অপুর কাঁধের তলায় একটা কাঁকড়া বিছে; শুঁড় তুলে তাড়াতাড়ি বালিশের আড়ালে পালাচ্ছে।

অপুকে ছেড়ে বালিশ দিয়েই সেটাকে চেপে ধরলে রেণু, তারপর বিছানার সঙ্গে বালিশ দিয়ে বিছাটাকে ঘষতে লাগল।

সরোজ কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে খাট থেকে নামছিল। রেণু বললে, আপনি নামবেন না, নামবেন না, যা করার আমি করছি।

সরোজ বললে কি, হয়েছে কি?

রেণু বললে, বিছা।

সর্ব্বনাশ! সরোজ গুম্ হয়ে গেল। এমন কি অপুর উদ্দেশ্যেও একটি কথা উচ্চারণ করলে না।

কাঁকড়া বিছা মরে বিছানা ও বালিশের সঙ্গে চিপ্টে গিয়েছিল। রেণু বালিশটা ওদের তক্তপোষ থেকে মেঝেয় ফেলে দিয়ে অপুকে কোলে তুলে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সরোজ একটা কথাও কইলে না।

ভাঁড়ার ঘরে এসে জল দিয়ে কামড়ের জায়গাটা ধুয়ে চুণ এবং নারকেল তেল মিশিয়ে জায়গাটায়

লাগিয়ে বেশ করে ঘষতে লাগল রেণু। অপু নির্জ্জীবের মত ওর কাঁধে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভাগ্য ভাল যে এত গোলমালেও অন্য ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙ্গে নি।

কিছুক্ষণ পরে রেণু যখন এ ঘরে এল, তখন অপু ওর কাঁধের ওপোর প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, অবশ্য মাঝে মাঝে তবুও ফুলে ফুলে উঠছিল।

রেণু নীরবে একখানা ভাল কাঁথা নিয়ে বিছা মারার জায়গাটায় চাপা দিয়ে নিজের মাথার বালিশটা এনে তার ওপোর পেতে আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে অপুকে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে ওর বুকের ওপোর হাত দিয়ে রাখলে। কিছুক্ষণ পরে অপু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এতক্ষণে সরোজ ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুমিয়েছে ?

হ্যাঁ।

আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বিছানাটা ভাল করে দেখ, বিছা-টিছা আরও থাকতে পারে।

রেণু বিছানাটা ভাল করে দেখলে, বললে না, আর কিছু নেই।

তুমি ঐখানেই শোও, ঘুম ভাঙলেই আবার কাঁদবে।

রেণুও জানে, কাঁকড়া বিছার জ্বালা থাকে পুরো একদিন, হয়ত জ্বরও আসতে পারে।

পরের দিন অপুর জ্বরই হয়েছিল।

ক'দিন ভাত খাওয়ার পর সরোজ বললে, রেণু, অপুকে সে রাত্তিরে কাঁকড়া বিছায় কেন কামড়েছিল জান ?

কেন ?

আমি আমার বড় মেয়েকে অপমান করতে চেয়েছিলুম, সেই অপমানই কাঁকড়া বিছা হয়ে আমার ছোট মেয়েকে কামড়েছে। আমার পাপেই মেয়েটা দু'দিন ধরে কষ্ট পেলে।

রেণু কোন উত্তর দেয় নি।

পাপ আরও বেশী হলে সাপে কামড়াত, বাঁচানো যেত না, সরোজ ধীরে ধীরে বলেছিল।

রেণু এর কিছু একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারে নি।

সরোজ কোর্টে বেরুতে সুরু করলে। পোষ্ট অফিসের কাগজ এনে রেণুকে দিয়ে সই করিয়ে ওর নামে মাসের প্রথমেই পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা করিয়ে দিলে একশ' টাকা। বললে, পাস বইটা তোমার বাক্সে রাখ। এখন জমা দিলুম একশ', পরে যেমন যেমন সুবিধে হবে, তেমন তেমন রাখব।

এ সবের কি দরকার ছিল বাবা, রেণু অভিযোগ করেছিল।

দরকার তোমার নয়, দরকার আমার, সরোজের উত্তর।

এর পরের ঘটনা রেণুর মনে আছে, এ পাড়ার সমস্ত বাড়ীতে উৎসব। দূরে কেল্লায় তোপের আওয়াজ, রাস্তায় রাস্তায় লোকের আনন্দ কলরব, রাত্রে বাড়ী বাড়ী আলো জ্বালা, যেন কালীপূজার রাত; দূরে সাহাদের বাড়ী থেকে কত রকমের বাজী, হাউই, তারাবাজি, বোম্, তুবড়ী, কত কি ? অলকদের স্কুলেও উৎসব, সরোজদের কোর্ট ছুটী, সকলেরই মুখে চোখে কি নিবিড় তৃপ্তি! বিলাতে ইংরেজ-জার্ম্মানীর যুদ্ধ থেমে গেছে। জার্ম্মানী হেরে গেছে। আমাদের জিৎ হয়েছে। এবার তাহলে আবার জিনিষ-পত্র সস্তা হবে। (প্রথম) মহাযুদ্ধের অবসান।

সে যাত্রায় সরোজরা ঢাকায় এক নাগাড়ে বছর তিনেক ছিল। মাঝে একবার দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছিল বৈদ্যনাথে। কিন্তু বৈদ্যনাথ রেণুর তেমন ভালো লাগে নি। অবশ্য পাহাড়, পাহাড়ের গুহাঘর এবং বৈদ্যনাথ শিব মন্দির ওর মনে আছে, কিন্তু বাকী আর কিছুই মনে ধরে নি, খালি মাঠ আর মাঠ।

ছোট দেহাতী গ্রাম। গ্রাম্য রেণুকে আকর্ষণ করতে পারে নি, ছেলেমেয়েরাও তেমন উৎসাহবোধ করে নি। তা ছাড়া যাতায়াত ভয়ানক কষ্ট। ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বৈদ্যনাথ, এক নাগাড়ে দু'দিন দু'রাত বড়ই বিরক্তিকর। সরোজ বলেছিল, এইভাবে বেড়াতে গেলে শরীর ভালো হওয়ার চাইতে খারাপই হয় অনেক বেশী।

তারপর কত জায়গায় সে বদলী হয়েছে। ময়মনসিংহ, রাজশাহী, জলপাইগুড়ী, চট্টগ্রাম, শেষে আবার পশ্চিম

বাংলায় কৃষ্ণনগরে। এই এতগুলো জায়গায় মধ্যে চট্টগ্রামটাই রেণুর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল এবং এখান কার বাড়ীটাই যতগুলো বাড়ীতে ওরা বাস করেছে তার মধ্যে সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

উঁচু এক টিলার ওপোর জেলা ও দায়রা জজের বাংলো। চট্টগ্রামেই সরোজ প্রথম জেলা জজের পদে উন্নীত হোল। এইখানেই এসে সরোজ প্রথম গাড়ী কিনলে। হুড্ খোলা অষ্টিন গাড়ী। সেদিন ছেলে-মেয়েদের তুলনায় রেণুর আনন্দও কম হয় নি। যেন ওরই গাড়ী। রেণুর কোনদিনই মনে হয় নি যে সরোজদের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য আছে।

তখন ওরা পাঁচজনে ’বাংলোয় বাস করত। অলক রাজশাহী থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে প্রথমে রাজ-শাহীর কলেজে ভর্ত্তি হয় তারপর সরোজের বদলীর সময় সরোজ বিরক্ত হয়ে ওকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করে। ও সেখানেই পড়ত এবং ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে বাস করত, ছুটীতে বাবার কাছে আসত।

চট্টগ্রামে অপু ম্যাটিক দিলে, ভালভাবে পাসও করলে, অপুর পিসি লম্বা লম্বা চিঠি লিখে বারবার ভাইকে তাগিদ দিয়েছিল অপুর বিয়ের জন্য, কিন্তু সরোজ সে কথায় কান না দিয়ে চট্টগ্রামের কলেজে মেয়েকে ভর্ত্তি করে দিলে। অমর ও সমর চট্টগ্রামের স্কুলে পড়ত, প্রতিবেশী ও বন্ধু যারা আসত তারা জানত, রেণু সরোজের বিধবা ভাইঝি, ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়ীতে মানুষ, তাই সরোজকে কাকা না বলে ছেলেদের সঙ্গে বরাবর বাবা বলেই ডাকে। সমর সরোজকে দাদু বলত।

ছুটীতে অলক এসে মোটর দেখে ভারী খুসি। মুসলমান ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব করে তার কাছ থেকে মোটর চালানো শিখে নিজে গাড়ী নিয়ে দু’জনে মিলে সমুদ্রের ধার অবধি একদিন ঘুরে এল। আর একবার গেল ট্রেনে করে সীতাকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। গাছের শিকড় ধরে, হাতে প্রাণ করে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠার বিপজ্জনক কসরৎ রেণুর আজও মনে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে শেওলা হয়ে কি ভীষণ পিছলই যে হয়েছিল, আর ছিল জোঁকের উপদ্রব। সকলেরই দেহ থেকে কিছু পরিমান রক্ত সেদিন জোঁকের পেটে গিয়েছিল। আর একবার ছুটীতে এসে অলক :উৎসাহ করে সকলকে নিয়ে গিয়েছিল আদিনাথ তীর্থে। একবার কি একটা ছুটী উপলক্ষ্যে সরোজ সকলকে নিয়ে কক্সবাজারে ডাক বাংলোয় তিন রাত্রি কাটিয়ে এসে-ছিল। অলক তখন কলকাতায় ল’কলেজে পড়ছিল, তার কক্স্ বাজার যাওয়া হয় নি।

চট্টগ্রাম ছেড়ে কৃষ্ণনগরে বদলি হতে রেণুদের সত্যিই মন কেমন করেছিল, সরোজেরও ভাল লাগেনি।

কৃষ্ণনগরে এসে সরোজ বল্লে, কলকাতার কাছা-কাছি এলুম বটে, কিন্তু একটা অসুবিধা হোল, আত্মীয়দের উপদ্রব। এতদিন দূর দূরে ছিলুম, হঠাৎ কেউ ঘাড়ে এসে পড়তে পায়নি, এখানে কাছে এলুম, দিদি এসে ঝামেলা বাড়াবে।

রেণু বল্লে, ও কি বাবা, আপন বোন্, বড় বোন—

মৃদু হেসে সরোজ বল্লে, এতই বড় যে দূর থেকে ভক্তি করাই ভাল, বেশী কাছাকাছি এলেই বিপদ।

রেণু যেন কি একটা উত্তর দিয়েছিল। সরোজ বল্লে, হ্যাঁ, দূর থেকে কিছু টাকা প্রণামী পাঠিয়েই এতদিন দিদি-ভক্তি সারছিলুম, এবার যখন দিদি এসে নানাভাবে আমার এবং ভাইপো ভাই ঝিদের জন্য সদুপদেশ দিতে সুরু করবেন, তখন সেই তাল সামলানো শক্ত হবে। তারপর ওদের মামার বাড়ীর কুটুম্বিতা বজায় রাখা, সেও কি চাট্টিখানি কথা! ছেলেদের উদ্দেশেই সরোজ এই শেষের কথাটা বলেছিল।

কৃষ্ণনগরে সেই ফ্যাসাদই পোয়াতে হোল বেশ কয়েকবার। এখানে বদলি হয়ে এসে প্রথমে ও দিদিকে চিঠিই দেয় নি, একেবারেই ভগ্নীপতির চিঠি এল। সরোজ যে কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে এসেছে সেই সুসংবাদ খবরের কাগজে চাকরী বদলির স্তম্ভ থেকে সংগ্রহ করে ভগ্নীপতি এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। দিদির চিঠিতে চোখ-রাঙানি এবং চোখের জল দুয়েরই সং-মিশ্রণ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, বড়ই লজ্জার কথা,

যে, বংশের মধ্যে মুখ উজ্জ্বল করা একটি মাত্র ভাই যে কেষ্টনগরে এল, সেই খবর দুনিয়ার লোকের সঙ্গে একসঙ্গে খবরের কাগজ থেকে পেতে হোল, ভাই একবার দিদিকে একটি লাইনও লিখে জানাতে পারলে না, এই দুঃখু ইহজীবনে তিনি ভুলবেন না। হয়ত সেই দুঃখ ভুলতেই তিনি তাঁর ছেলে এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে কৃষ্ণনগরের বাংলোয় এসে হাজির হলেন। বড় তিনটে মেয়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষে!

ভাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দিদি অনেক দুঃখ করলে. চেহারা কি হয়েছে-রে তোর? তুই জজ্‌ই হোস আর যাই হোস্‌, এই রকম চেহারা নিয়ে তুই কদিন বাঁচবি? বুড়ো হয়ে গিয়েছিস্‌, চুল পেকেছে, দাঁত গেছে, আবার বুড়োদের মত দাঁত বাঁধিয়েছিস, চশমা নিতে হয়েছে, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটুও যত্ন নিস্‌ না। সরলা থাকলে কি তোর এই হাল হোত সরোজ! দিদি নিজের আঁচলটা নিয়ে চোখে চাপা দিলে, হয়ত বা বহুকালের মৃতা ভাজের শোকে, কিম্বা সরোজের বয়সোচিত বার্দ্ধক্যে।

কথাটা একদিক দিয়ে মিথ্যে নয়। সরোজের চেহারাটা পাকিয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। দেহতাত্ত্বিকরা হয়ত বলবেন, নিরুদ্ধ যৌনবৃত্তি, কিন্তু সরোজ ওর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী ছিল, দেহে এবং মনে।

দিদির কথায় সরোজ বলেছিল, সত্যি দিদি, এবার একটা বিয়ে করব, রেণুর দিকে চেয়ে চেয়েই কথাগুলো বলেছিল।

ধমক দিয়ে দিদি বলেছিল, থামো, আর বাক্যব্যয় করতে হবে না। যখন সময় ছিল তখন কত করে ভিখারীর মত বলেছিলুম, তা সেই তখন কি শুনেছিলে, যে এখন ও কথা বলা হচ্চে।

সরোজ পালিয়ে বাঁচল।

দিদি চেপে ধরলে অলক অপুর বিয়ের জন্য। বলে মা নেই বলে ছেলেগুলোর পৈতে দিলে এমনভাবে যে কাকপক্ষীতে টের পেল না, ভাইপোদের পৈতেতে যে সাধ আহ্লাদ করব, তা কোথায় কোন বন-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে গলায় একটা করে সুতো ঝুলিয়ে দিলে যে, ভালমত টেরও পেলুম না। তা সে তুমি যা করেছ কর, কিন্তু এবার বিয়ে দুটো ভাল করে দাও। মেয়ে ত দুটো পাস করেছে আর পড়ে কি হবে? মেয়েও কি তোমার মত জজ হবে না কি?

অপু বললে, পিসিমা, মন্দ কি? আমিও জজ হব। বাবার মত প্যাণ্ট কোট পরে—

তুই থাম্‌ বাপু, আর জ্বালাস নি, পিসিমা ধমক দিলে। অপু তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে।

অমর ও সমর তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছে। দু'জনকেই মাষ্টার এসে একই সঙ্গে পড়ায়, কিন্তু পড়াশোনায় সমর কিছুতেই সুবিধে করতে পারে না। সমর অপুকে মাসিমা বলে, কিন্তু অমরকে নাম ধরেই ডাকে, কিছুতেই মামা বলতে রাজী হয় নি। অলককে অবিশ্যি মামা বলে। সমু এসে অপুকে বললে, মাসিমা, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দাও না, আজ তিনদিন ধরে মাষ্টার মশাই আসেন নি।

পিসিমা মুখ বেঁকিয়ে বললে, আদিখ্যেতা দেখ না একবার! কোথায় জন্মেছে তার ঠিক নেই, তার আবার পড়া, তার আবার মাষ্টার। যা যা, নিজে নিজে দেখে নি গে যা।

সমর অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল। অপু ওর পেছন পেছন দৌড়ে ওকে পড়াবার জন্য খোসামত করতে গেল। রেণু একবার চেয়ে দেখেছিল মুখে কিছু বলে নি।

সরোজ ডাকলে, দিদি।

বলো কি হুকুম, দিদির কণ্ঠে ঝাঁজ।

তুমি দুদিনের জন্য এ বাড়ীতে এসে মিছামিছি একটা ছেলের মনে ঘা দিচ্ছ কেন বল ত?

ওমা, ঘা আবার কোথায় দিলুম? যা সত্যি কথা তাই ত বলেছি। তা এতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে—

দোষের কথা বলছি না, সরোজ নরম হয়ে গেল, কে কার কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করছে, সে সব দিকে তোমার নজর দেওয়ার কি দরকার?

ওমা, নজর আবার কোথায় দিলুম! তবে এও বলি, বংশ বলে ত একটা কথা আছে। আমড়া গাছে কি আম ফলে রে?

ফলুক না ফলুক, তোমার মাথা ঘামাবার কি দরকার? সরোজ জোর দিয়ে কথাগুলো বললে।

হতাশ হয়ে দিদি বললে, আমার ঝকমারি হয়েছে। তোমাদের কথায় থাকাই আমার ঝকমারি। তা তোমাকেও বলি সরোজ, এই যে আমার কেষ্ট, কেষ্ট দু'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে এখন যে মুখ শুকিয়ে বেড়ায়, তা তুমি তার আপন মামা হয়ে একবারও কি সেদিকে চেয়ে দেখেছ, না একটা মাষ্টার রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছ? এটা কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে?

কথায় কথা বাড়ে। সরোজ থেমে গেল।

এবছর পরীক্ষায় অলক প্রথম বিভাগে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোল, পরের বছর অপুও বি. এ. পাশ করলে, অমর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলে কিন্তু সমরের পরীক্ষায় সুবিধে হোল না, দুটো বিষয়ে ফেল করে মুখ চুন করে রইল। সরোজ বল্লে, ভয় কি, আর এক বছর পড়, ঠিক পাস করে যাবি।

অলক এসে কৃষ্ণনগরে ওকালতিতে নাম লেখালে। বাবা জেলা জজ, মক্কেলরা সেই সুবাদে ছোকরা উকীলের দরজায় আসতে সুরু করলে, বিশেষতঃ জজ কোর্টের মকদ্দমায়। ধনী মক্কেল বুড়ো উকীল নিযুক্ত করলেও জুনিয়ার হিসাবে অলককে সঙ্গে রাখত। সরোজ বুঝত, এটা তাকেই প্রকারান্তরে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। জেনে শুনেও সে চুপ করেই থাকত, ছেলের উন্নতিতে সে বাধা দিত না, কিন্তু তলে তলে অলককে মুন্সেফি চাকরীতে বসাবার জন্য ওপরওয়ালার কাছে প্রচ্ছন্ন দরবারও সে করত। না হলে উপায় কি, যা দিনকাল পড়েছে, বেকারীতে দেশটা ছেয়ে গেছে।

বি সি এস্‌ পাত্রের সঙ্গে অপুর বিয়ে হয়ে গেল। অপু যদি আর একটু সুন্দরী হোত, তাহলে আই সি এস-এর ঘরেই যেতে পারত, কিন্তু হোল না। বি সি এস জামাই নিয়েই সরোজ সন্তুষ্ট হোল। দিদি কিন্তু এতেও কথা শোনাতে ছাড়ে নি—নিজের মেয়ের বিয়ে দিলে হাকিমের সঙ্গে কিন্তু ভাগ্নীগুলোর বেলায়—। যাই বল বাপু, সরোজ যতই ভালো হোক, ওর এক চোখামি সহ্য করা যায় না।

কিন্তু সেই দিদি একেবারে ফেটে পড়ল যখন দুবছর ফেল করার পর সরোজ রেণুর সঙ্গে পরামর্শ করে সমরকে কেষ্টনগরে পেস্কারের চাকরীতে ভর্তি করেছিল। সেবার দিদি ওর বাড়ী বয়ে এসে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে গেল, বললে ও-ও দু'বার ম্যাট্রিক ফেল, আমার কেষ্টও দু'বার ম্যাট্রিক ফেল, ঐ জায়গায় কি কেষ্টকে নেওয়া যেত না?

সরোজ বললে কেষ্ট রেলে চাকরী পেয়েছে সেই চাকরী সে করছে, সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে এখানে বসাব না কি?

দিদি বললে, রেলের চাকরী কি আবার চাকরী! কেষ্ট বলে, সেখানে এক পয়সাও উপার নেই, কুল্লে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের ওপোর নির্ভর। আর কাছারীর কাজে? এখানে মাইনের কি আসে যায়! উনি বলেন কোর্টের কাজ বিনি মাইনেতেও করা যায়, উপরিতে লাল হয়ে যাবে।

বেচারী সরোজ আর কি উত্তর দেবে! জেলা জজের সামনে তারই দিদি কোর্টের উপরি সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠেছে। সেবার দিদি কিন্তু শুধু হাতে যায় নি। ছোট মেয়ের বিয়ের জন্য বেশ কিছু টাকা ভাইয়ের ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করে নিয়েছিল।

এরপর অলকের বিয়ে এবং মুন্সেফি চাকরী প্রায় একই সঙ্গে হয়েছিল এবং সেই বছরেই ফাল্গুন মাসে কেষ্টনগর কোর্টের নাজির বাবুর পিড়াপিড়িতে তার মেয়ের সঙ্গে সমরের বিয়ে দিতে হোল। নাজির বাবু সমরের সত্যিকার পিতৃপরিচয় শুনেও পিছপা হন নি।

রেণুর মনে পড়ে কেষ্টনগরের দিনগুলো নানা ঘটনার ভিড়ে একেবারে সরগরম।

বিয়ের পর বিয়ে, নানা লোকের নানা কথা, নানা ব্যবহার। রেণুর হাতেই সব, সেই রেণুকে কেউ অবজ্ঞা করে, কেউ ভালবাসে। কেউ উপদেশ দেয়, কিন্তু ছেলেমেয়েরা "দিদি" বলে, সকলেই যত্ন করে, কথা শোনে। সরোজ ও ছেলেমেয়েদের কাছে রেণু ভাবতেও পারে না যে সে বাইরের লোক।

কিন্তু অলকের শাশুড়ী ও বড় শালী রেণুকে জামাইয়ের দিদি বলে মনে করতে পারেনি। অপুর শাশুড়ী ও বিধবা পিস্‌শাশুড়ী রেণুকে ভাল চোখে দেখে

নি; পিসশাশুড়ী ঠারে ঠোরে বিকৃত ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে নি। তবুও সেগুলো যা হোক্ সহ্য করা যায়, কিন্তু সময়ের শাশুড়ীর বাঁকা বাঁকা কথা রেণুর বুকের মধ্যে বিঁধে গিয়েছিল। ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের শাশুড়ীর মুখে এই সব শুনে রেণু সেদিন উত্তর কিছুই দেয় নি, কিন্তু ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এবং সেই চোখের জল আরও প্রবল হয়ে দেখা দিল সেদিন, যেদিন সরোজ বদলি হোল কেষ্টনগর থেকে কলকাতার আলিপুরে।

দু'মাসের ছোট এক শিশুকে ন্যাকড়া জড়িয়ে সদ্য বিধবা নিঃস্ব রেণু যেদিন বড়বাবুদের বাগানের পেছনের ঘরখানিতে আকুল হয়ে দু'চোখ ভরে কেঁদেছিল এবং তারপর যেদিন সে বড়বাবুর ভিক্ষের দান সতেরটি মাত্র টাকা এবং স্বামীর রেখে যাওয়া সাড়ে তের আনা পয়সার অবশিষ্ট একটি মাত্র আনি সিঁদুর কৌটায় পুরে আঁচলে বেঁধে বুকের ভেতর ঝুলিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক মুলুকের কাছে শুধু মাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকার দুরন্ত আশা নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে যাত্রা করেছিল, সেই সেদিন থেকে এক মিনিটের জন্যও ছেলে ছেড়ে সে থাকে নি। আজ এই এতদিন পরে বোধ হয় বিশ বাইশ বছরই হবে, আজ তার সেই সমস্যাই দেখা দিয়েছে। সে কি ছেলে বউয়ের কাছেই থেকে যাবে, না সরোজের সঙ্গে কলকাতায় যাবে? কি করবে সে? একটিমাত্র চিন্তা তার একমুখী হয়েই চলেছিল, সরোজকে সে ছাড়বে না, ছাড়তে পারে না। যে লোকের টাকা পয়সা, হিসাব পত্র, ব্যাঙ্কের পাশ বই সমস্তই তার জিম্মায় রয়েছে আজ এতগুলো বছর ধরে, যার সব কিছু পরামর্শ সর্ব্বাগ্রে তারই সঙ্গে হয়ে থাকে, এই পরিণত বয়সে সেই এতকালের অন্নদাতাকে সে কার হাতে ছাড়বে! অলক বউ নিয়ে কর্ম্মস্থলে চলে যাবে, রেণু জানে তার প্রথম কর্ম্মস্থল বরিশালে। অপু গেছে জামাইয়ের সঙ্গে তার কর্ম্মস্থল নোয়াখালিতে, একমাত্র অমরকে নিয়ে মাইনে করা ঝি রাঁধুনীর ওপোর সরোজকে কি ছাড়া যায়? অথচ সমুকে না দেখে সেই বা থাকবে কি করে! অকালকুল ভেবে প্রৌঢ়া রেণু কোন সিদ্ধান্তই করতে পারে না।

এই প্রশ্নই সরোজ তাকে করেছিল। কি করবি রে, তুই এবার থাকবি কোথায়, কেষ্টনগরেই ত?

না বাবা, আমি আপনার সঙ্গেই যাব, রেণু উত্তর দিয়েছিল।

গেলে অবিশ্যি আমার ভালই হয়, সরোজ ভাবতে ভাবতে উত্তর দিলে, কিন্তু তুই তোর ছেলে বউ নিয়ে স্বাধীনভাবে সংসার করবি না?

আপনার কাছে আরও বেশী স্বাধীন থাকি যে বাবা, রেণুর উত্তর।

তা হতে পারে, কিন্তু এখনও যদি আমার কাছে থাকিস্ তা হলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা কি ভাল দেখায়? তোর ছেলে যা হোক্ উপায়-পত্র করছে, সে তার মাকে যদি ছাড়তে না চায়?

ছেলের চেয়ে ছেলের দাদু যে আগে বাবা। দাদু না থাকলে ছেলে এতদিন থাকত কোথায়?

সরোজ রেণুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। শেষে ধীর কণ্ঠে বলেছিল যা ভাল বোঝ কর, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার অবিশ্যি কোন দুশ্চিন্তাই থাকে না, কিন্তু তোমার দিক চেয়েই বলছিলুম। বিচারক সরোজ সুবিচারের জন্য বিচারক মহলে বরাবরই সুনাম পেয়ে এসেছে।

কথাটা সমরের কানে আসতে সে এতটুকুও বিচলিত হয় নি। বরঞ্চ মা তার কাছে থাকবে শুনলেই সে বিব্রতই হোত, কারণ তার স্ত্রী এবং শাশুড়ী তাকে ভালো ভাবেই বুঝিয়েছিল যে, সে শ্বশুর বাড়ীতেই থাকবে এবং সেখান থেকেই চাকরী করবে, আলাদা বাসা নিয়ে থাকা ঝঞ্ঝাট ও খরচ কি কম নাকি? কিন্তু সেই শ্বশুর বাড়ীতে মায়ের স্থান কোথায়?

ছেলে মাকে বিনাদ্বিধায় ছেড়ে দিলে। ছাড়তে না চাইলে রেণু বিপদে পড়ত, কিন্তু এতে যেন রেণু একেবারেই মুষড়ে পড়ল। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে রেণু ছেলে বউয়ের দাড়িতে আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুল নিজের ঠোঁটে দিয়ে চাপা গলায় বলেছিল, সাবধানে থেকো, ছুটীছাটা পেলেই বউমাকে নিয়ে কলকাতায় যেয়ো, দূর ত বেশী নয়।

সমর ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

অথ দুর্নীতি উচ্ছেদ কথা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে দুর্নীতি উচ্ছেদ সম্পর্কে খুব নরম গরম গাল-ভরা বক্তৃতা মাঠে ঘাটে দোকানে বাজারে বড় বাজারে পল্লীতে পট্টিতে শোনা যাচ্ছে। সবাই আজ কায়মনোবাক্যে পঞ্চমুখে বলছে দেশ থেকে দুর্নীতি বিতাড়ন করে সুনীতি আনয়ন করা হলে দেশে প্রকৃত সুখ শান্তি ফিরে আসবে, অলক্ষ্মী দূর হয়ে মা লক্ষ্মী ঘরে আসবেন।

নীতিগতভাবে কথাটাকে আমরা সবাই আনন্দিত অভিনন্দন জানাই অন্ততঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা সৎ বলে অপ্রমাণিত হচ্ছি। কিন্তু যে কোন মন্দ জিনিষকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেই ঝক্কি চোকে না। 'আমি তোমার কোন তোয়াক্কা করি না' বা 'নেই মাংতা' বলে ঝোঁকের মাথায় োক দেখিয়ে একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমূলক দুর্নীতিকে একদিনে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া যায় বটে কিন্তু তারপরে এক দুর্দ্দিনে বেকায়দায় পড়ে তারই অভাবে অসহায় অবস্থায় যে নিজেকে কাঁদতে হতে পারে সেদিকটাও সবিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন। সুনীতিই হোক আর দুর্নীতিই হোক পৃথিবীতে কোন কিছুই যে অপ্রয়োজনীয় নয় তা আমরা শৈশবে নীতি কথায় পড়েছি, যৌবনে হাতে নাতে শিখেছি এবং বার্দ্ধক্যে এসে তার মূল্যায়ন করছি। কোন কোন বস্তু আপাত চক্ষে একেবারে নির্গুণ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি একেবারে সেন্ট পার্সেন্টই নির্গুণ নয়। হয়তো গুণ আর নির্গুণের অনুপাতের হার আকাশ পাতাল ফারাক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো এক হিন্দীওয়ালা যাদব ভাইয়ের কথা। তাকে বুঝি কে একবার দুধে জল মেশানোর অভিযোগ এনে অনেক গালাগাল দেওয়ার পর বলেছিল 'নির্ব্বুদ্ধি'। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাদব ভাই এত আকথা-কুকথা সত্ত্বেও মাথা তুলে তেমন কোন জোরালো প্রতিবাদ জানায়নি কিন্তু এই 'নির্ব্বুদ্ধি' কথাটাতেই তার আপত্তি। সে যথাশক্তি প্রয়োগ করে তার যুক্তিটাকে দাঁড় করিয়েছিল যেটা অমান্য করা যে কোন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের পক্ষে পক্ষপাত দুষ্ট বলে গণ্য হবে। সে বলেছিল যে সে গো-সেবা তথা দুধের ব্যবসা করায় মগজে ঘিলুর পরিবর্ত্তে গোবর ভর্ত্তি থাকা অসম্ভব নয়। বুদ্ধির অনুপাতে নির্ব্বুদ্ধির হার তার মাথায় বেশী থাকতে পারে। কিন্তু এটাও সে হলফ করে বলতে পারে একটু অন্ততঃ বুদ্ধি তার আছে, নয়তো দুধে জল মিশিয়ে দুধের উৎপাদন পরিমাণ বাড়াবার সুবুদ্ধি মাথায় জন্মায় কি করে! তাকে 'বুড়বাক' বললে সে হতবাক থাকবে কিন্তু 'নির্ব্বুদ্ধি' বললে সে নির্ব্বাক থাকবে না, প্রতিবাদ করবে।

তাই যা বলছিলাম সবার ঘৃণ্য যে নরবর তারও সরবরাহের কোন বিশেষ খাদ্যের উৎপাদন ব্যাপারে বিশেষ চাহিদা। ঠিক তেমনিই দুর্নীতি আছে বলেই এই দুর্মূল্যের বাজারে পঁয়তাল্লিশ কোটির এক সুবৃহৎ জনতার একটা বৃহদংশ একবেলা একমুটো এবং অপর বেলা এক টুকরোর সংস্থান করতে পারছে। তা যদি না হত অর্থাৎ যদি দুর্নীতি বহাল তবিয়তে দেশে বিরাজমান থেকে রাজত্ব না করতো অর্থাৎ যদি রাম-রাজত্ব হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটি লোক সৎ হয়ে যেত তাহলে পুলিশ, দারোগা, চৌকিদার, হাবিলদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আইন, আদালত এ সবই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তো। ফলে বেকারের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত। তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যেত। নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। তার ফলে আরও কিছু লোক বেকার হত। সব কটি ক্ষতি কারক অর্থনৈতিক কারণ দেখা দিত। দেশে মহামারী থেকে মারামারি বেধে যেত।

সামাজিক নীতির সংজ্ঞা অনুসারে দুর্নীতিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ—(ক) ঘুষ যার

সাধুভাষা উৎকোচ এবং আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার ভাষা চা খাওয়ান', (খ) খাদ্যে, ঔষধে ভেজাল, চোরা কারবারী, কালো বাজারী ইত্যাদি, (গ) চাকরিতে আত্মীয় পোষণ অর্থাৎ উপযুক্ত পদে সাধারণ গৃহপালিত চতুষ্পদের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট অনুপযুক্ত দ্বিপদের নিরাপদে একটা মোটা অঙ্কের মাসকাবারিতে নিয়োগ ইত্যাদি।

আর এই ত্রি-প্রধানের মধ্যে জ্যেষ্ঠপ্রবর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হল উৎকোচ।

দুটি উপায়ের দ্বারা যে কোন মহৎ ও অসৎ কার্য্য উদ্ধার করা চলে। একটি ঘুষ অপরটি ঘুষি। এই দুইটির তুলনায় অবশ্যই প্রথমটা বাঞ্ছনীয় কারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক আঘাতের প্রত্যাঘাত আছে। সুতরাং ঘুষি দিলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঘুষি পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। হীনবুদ্ধির মত ঘুষাঘুষি থেকে যোদ্ধাযুদ্ধিতে শেষ করে কার্য্যসিদ্ধি করা যায় না, তাতে মিত্র শত্রুতে রূপান্তরিত হয় এবং শত্রু পরম শত্রুতে পরিণত হয়। প্রবাদ আছে মারে নাকি বনের বাঘ জব্দ হয়। কিন্তু আজকের এই সভ্য (?) জগতে এই চলতি প্রবাদের প্রতিবাদ করবার সময় এসেছে। মারের চোটে বনের কোন বাঘ শিক্ষা পেয়ে জব্দ হয়ে সাদা নিশানা তুলে কোনদিন সন্ধি ভিক্ষা করে কিনা এবং তাকে ভয় দেখিয়ে ইপ্সিত কোন হুকুম তামিল করানোর দীক্ষা দেওয়া যায় কি না সে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। বলের দ্বারা অতি দুর্ব্বলকে দিয়েও কিছু করানো যায় না। সাময়িকভাবে কিছু করানো গেলেও মনে তার ঠিকই বিদ্বেষের বাসা বাঁধবে এবং সময় পেলে সে ছোবল মারবেই।

কিন্তু ঘুষ?—জলের মত বিনা বাধায় সস্‌সড় করে গলাধঃকরণ হ'য়ে অন্তঃকরণে সুড়সুড়ি দিতে দিতে সোজা একেবারে পাকস্থলীতে গিয়ে বেমালুম পরিপাক হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মত তার প্রতিক্রিয়া সুরু হবে। এতক্ষণ যে ফাইল এত সাধ্য-সাধনা করেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই ফাইল-ই কোন তীব্র পারগেটিভের মত সুড় সুড় করে ঠিক বেরিয়ে আসবে। শিবের বাবাও জানতে পারবে না কি করে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হল। তাছাড়া ঠিক কাকে ঘুষ দিলে তথা চা খাওয়ালে কার্য্য উদ্ধার হবে সেই আরাধ্য ব্যক্তিটির সন্ধান পেতে অনেককে চা খাওয়াতে হবে। তার ফলে ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর সমষ্টিগত অধিক উন্নতি সাধন হচ্ছে।

তাই নিঃসঙ্কোচে বলি এই উৎকোচ পদ্ধতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা রীতিমত একটা সামাজিক অন্যায়। এর দ্বারা গ্রাহক ও প্রদায়ক উভয়েই অপকৃত হচ্ছে অথচ এতে কোন পক্ষেরই কোন ক্ষতি নেই। যে কোন জটিল দুঃসাধ্য কাজ সহজেই এর যাদু-স্পর্শে ত্বরিৎ-গতিতে সম্পাদিত হয়ে যাচ্ছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ সুবিধালাভের যে পরিশ্রমিক তা দিতে অথবা নিতে কোন বাধা থাকা উচিত কি? আর্জেন্ট, সেমি আর্জেন্ট এবং অর্ডিনারী জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। তবে এ ক্ষেত্রে একটু গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এই যা তফাৎ।

উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারে যদি তিনটি নীতি অনুসরণ করে চলা যায় তবে উৎকোচ প্রদানে কোন বাধা নেই। এই তিনটি নীতি যথাক্রমে (ক) উৎকোচের হার কখনও অত্যধিক হবে না এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সবার উপরেই সেই একই হার ধার্য্য করা হবে। এতে গড়পড়তা আয় কম হলেও সামগ্রিক আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

(খ) উৎকোচ গ্রহণ করলে যথাযথ ভাবে মুস্কিল আসান করে দিতে হবে। অন্যথায় ঘরে বাইরে সবার বিদ্বেষ ভাজন হয়ে দৈনিক খাকান্নের সংস্থান করা দায় হয়ে উঠবে এবং এরকম কয়েকবার অধর্ম্ম করার ফলে একদিন অকালে কর্ম্ম হতে বিদায় গ্রহণ করে এই আকালের বাজারে নাকালের একশেষ হতে হবে। (গ) চার চক্ষু কর্ণ খোলা রেখে সদা জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন উৎকোচ গ্রহীতার বিপক্ষে কোন অভিযোগ না আসে।

ঘুষ সবাই দেয় এবং সবাই নেয়। সাধু অসাধু উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত স্বল্পবিত্ত বিত্তহীন বিচারপতি সমাজপতি সভাপতি থেকে সুরু করে একেবারে উপপতি পর্য্যন্ত। এদিকে বুদ্ধিজীবী মসীজীবী চাকুরিজীবী ব্যবসায়িক কায়িক শ্রমিক নেতা অভিনেতা জোচ্চর চোর পুলিশ

একধারে সবাই। এ সম্পর্কে একটা ঘটনা মনে পড়লো।

একদিন একটি পুলিশ একটি পকেটমারের ঘাড়ের কলার বজ্রমুষ্টিতে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুদূর এমনি আসার পর এক নির্জ্জন জায়গায় এসে পকেট-মারটি হঠাৎ চার ভাঁজ করা দু'টো দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিতেই পুলিশের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে এলো। এতক্ষণ যে পরম শত্রুর মত তার ঘাড়ের কলার ধরে থানায় নিয়ে যচ্ছিল সে-ই তখন পরম বন্ধুর মত কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে গজেন্দ্র গমনে চলতে লাগলো। পুলিশটি তখন যাই যাই করছে এমন সময় পকেট-মারটি তার ছবি বসানো একটি কার্ড পুলিশটিকে দেখাতেই তার চোখ দুটো ক্ষণেকের জন্য মরা মাছের চোখের মত স্থির হয়ে গেল। পকেটমারের ছদ্মবেশে লোকটি যে একটি গুপ্তচর তা আর তার জানতে বাকী রইল না। তারপর পকেটমারটির হাত দু'খানা ধরে তার সে কি আকুলি বিকুলি কিন্তু পকেটমার এখন পুলিশকে কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে পুলিশকে আবার সামনের বিড়ির দোকান থেকে চারটি দশ টাকার নোট নিয়ে তার সঙ্গে আগের দু'টি দশ টাকার নোট যোগ করে পকেটমারের পকেটে গুঁজে দিতে তবে নিষ্কৃতি।

ঘুষ আবার নানা প্রকার মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়। অর্থে সামর্থ্যে সামগ্রীতে স্তুতি কথায় যার চলতি বাংলা হল তৈলমর্দ্দন, ইন্দ্রিয় সেবা পরায়ণার্থে এই মর্ত্তভূমির অপ্সরা মেনকা ইত্যাদি যৌবন বিলাসিনী সোসাইটি ইভদের উপহার প্রদানে ইত্যাদি নানা উপায়ে। এদের মধ্যে আর্থিক মাধ্যমে ঘুষ আদান প্রদানটাই প্রধান। সামর্থ্যে ঘুষ প্রদানের অর্থ হল বিনা অর্থপ্রদানে বিনিময় কার্য্যদ্বারা পরিশোধ। ঘুষের মধ্যে সামগ্রীতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এতে দায়িত্ব অতি কম অথচ মালেও অনেক সময় বেশী পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক কেউ হয়তো গরমকালে ঘরে একটা পাখা ঝুলিয়ে দিয়ে গেল কি কেউ হয়তো একটা রেডিও সেট বসিয়ে দিয়ে গেল কিম্বা একটা রেফ্রিজারেটর অথবা নিদেন পক্ষে এক জোড়া শাড়ী বা শীতকালে একটা ফজলি আমের টুকরি ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার এ সব কিছু না দিয়েই শেরেফ তৈল প্রদান অথবা চাটু বাক্যের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করে। এই যেমন 'আপনি আছেন তাই চন্দ্র সূর্য্য উঠছে,' 'আপনিই আমাদের মা-বাপ,' 'আমরা সাধারণ অশিক্ষিত গরীব মানুষ—কীটস্য কীট, পরমাণুস্য পরমাণু' ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে যেটি সুন্দরতম রোমান্সের গন্ধে ভরপুর যেন প্যারিসের একটি মিষ্টি সন্ধ্যা—সেটি হোল ফেয়ারি ল্যাণ্ডের ফেয়ার সেক্সের ব্যাপারীদের এই ব্যপারটি। এটি সাধারণতঃ যাঁরা রূপোর পালঙ্কে শুয়ে পা নাচান তাঁরাই এক অদ্ভুত অপরূপ রূপের—কাঙাল সেজে নাচবার ঘুষ প্রার্থনা করেন। ঘরে যদি তাঁদের অগ্নি সাক্ষী করা সুন্দরী স্ত্রী থাকে তা থাকুক তাতে ক্ষতি কি?—সন্দেশ খেয়েছি বলে কি রসগোল্লা খাবো না? হোক না তা সেই একই ছানার তবু ছাঁচটা তো আলাদা, স্বাদটাও তো এক নয়। চাকুরী লাভের বা চাকুরীতে উচ্চ পদ প্রাপ্তির সহায়তা করার ব্যাপারে এটি একটি ধন্বন্তরি মহৌষধ। এর জন্য নিজের স্ত্রী অথবা কন্যাকে ঘুষ দেওয়ার নজীর আগেও দেখা গেছে এবং আজ কালও ভূরি ভূরি দেখা যায়।

এ সমস্ত উপায় ছাড়াও বড় বড় রাষ্ট্রনায়কেরা এক অভিনব প্রথায় ঘুষ দেওয়া—নেওয়া করে থাকেন। এটি একটি উচ্চ মার্গের রাজনীতি। যেমন ধরা যাক কোন একটি গ্রামের প্রভাবান্বিত মোড়ল যার কথায় সবাই ওঠে বসে, তাকে বেশ একটু প্রতিষ্ঠাবান পদে অভিষিক্ত করা হোল অর্থাৎ এই পদটি তাকে ঘুষোপহার দেওয়া হোল যাতে এই গ্রামটি রাষ্ট্র-নায়কদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়।

একবার কোন একটি গণতান্ত্রিক দেশে কোন একটি জায়গায় ভোটের প্রচার কার্য্য চালাতে গিয়ে শাসকদলের কয়েকজন নেতাকে কয়েকটি দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেই জায়গাটির ভোট সংখ্যা শাসকদলের ঠিক অনুকূলে ছিল না। বক্তৃতা শেষে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন নেতা পরিচালিত

একটি বিরোধী দল এসে শাসকদলের বক্তাদের ঘিরে বললেন, মশাইরা, আপনাদের দলকে যদি আমরা ভোট না দিই এ জায়গাটা কি কোন প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, না এখানে কোন উন্নতি হবে না? কেন মোরগ না ডাকলে কি প্রভাত হয় না? শাসকদলের হর্ত্তা কর্ত্তা বক্তারা আঁই আঁই করে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন এমন সময় তাঁদের মধ্যে থেকে একজন কথাটার উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, শুনুন মশাই তাহলে বলি। মোরগ না ডাকলেও প্রভাত হয়। যখন দেখবেন পাশের গ্রামে টিউব ওয়েল বসছে এক'শ গজ অন্তর, চকচকে কালো পিচের রাস্তা হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ফুলঝুরি ঝরছে রাস্তায় বাড়ীতে, স্কুল কলেজ বসছে, আর আপনার গ্রাম যে মহাতিমিরে সেই মহাতিমিরেই পড়ে আছে—তখন বুঝবেন মোরগ ডাকেনি অথচ প্রভাত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আপনি জানতে পারেননি আর যখন জানতে পারলেন তখন দেখলেন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বক্তাটি একটু দম নিয়ে বললেন, তাই বলি মশায় সুবুদ্ধির পথ ধরুন। আপনাদের ভোট আমাদের ঘুষ দিন আর আপনাদের এই মহামূল্য ভোট পাওয়ার জন্য আমরাও আপনাদের এই সব পথ আলো জল ঘুষ দিচ্ছি।

তাই সমস্ত দিক সুচিন্তিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে যে কোন দেশেই যে দুর্নীতির অবস্থান অবশ্যই প্রয়োজনীয় তা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। সব 'ভাল'ই যে 'ভাল' ফল বহন করবে এমন কোন কথা নেই। আজ দেশে খাদ্য সমস্যা অতি প্রকট। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলসেচের অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আমদানী বন্ধ ইত্যাদি এরকম অনেক সামাজিক ভৌগলিক এবং অর্থনৈতিক কারণ-আমাদের জানা আছে। কিন্তু অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এ সমস্ত কারণ গুলি ছাড়া আরও একটি মারাত্মক কারণ এই সমস্যার পিছনে আছে এবং যেটি উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়—তা হচ্ছে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ। মানুষের এই ভালোটি করতে গিয়েই অনেকটা খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হয়েছে। আগে এই ধর্ম্মপ্রাণ দেবভূমির প্রতিটি মানুষ ম্যালেরিয়া দেবীর পূজার ব্রত উপবাসে বছরে দু মাস করে অন্নসেবা না করে ক্রম বর্দ্ধমান উদরের প্লীহা সেবা করতো। আজকাল আধুনিক সভ্যতা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারাও অনাদি কালের সেই মন্ত্র তন্ত্র ভুলে গিয়ে নব অদ্ভুত অনেক 'তন্ত্র' এবং 'বাদে'র মধ্যে নাস্তিকতাবাদটাই বেছে নিয়েছে। তাই তারা সরকার বাহাদুরের কৃপায় আর ম্যালেরিয়া পূজার অনুষ্ঠান হিসাবে আগের মত ছেঁড়া কাঁথার তলায় আত্মসমর্পণ করে অন্ন সমর্পণ করে না। তারা সকলেই আজ সারা বছর দুবেলা বেশ তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে বলেই দেশে এই প্রকট খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেটি সমাধান করতে আমরা কয়েক বছর ধরে নাকানি চোবানি খাচ্ছি। এর ওপর আবার একটি 'ভাল'—এই দুর্নীতি উচ্ছেদ করলে 'গোদের ওপর বিষ ফোড়া'র মত বিষাক্ত ফল দেখা দেবে।

বাংলা নাট্যলোক ও শিশিরকুমার

—দিলীপ কুমার মিত্র

দেহপট সনে নটের পূর্ণ- বিলোপ বা বিস্মরণ ঘটে না।—তাঁর ব্যক্তিত্ব মহিমার অসহ্য তেজ সুচির দীপ্তি বিকীরণ করে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বাংলা জীবনে সুদূর স্মরণীয়, তিনি কর্তাভজার দেশে এক স্পর্দ্ধিত ও বিস্মিত ব্যতিক্রম। অকম্প্য আত্মপ্রত্যয় ও সুতীব্র ব্যক্তিত্ব তথা গম্ভীর আত্মনিমগ্নতা শিশির প্রতিভাকে বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আত্মতন্ত্রতা অর্থাৎ স্বস্থবিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রবণতা তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ্যে যা অহমিকার রূপান্তর, অসামান্যে তাই প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ চরিত্রবল। আরও স্মর্তব্য শিশিরকুমারের অনমনীয়তার সঙ্গে শিল্পবোধের সাযুজ্যকরণ, কামনায়, প্রয়োজনে, নিষ্পেষণে এই শিল্পসত্তা উভয়তঃ অবিকৃত ও অবিক্রীত। তাই শিশিরকুমার অসামান্য অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

গিরিশচন্দ্র বাংলার শেক্‌সপীয়র। অতিশয়োক্তি নিঃসন্দেহে। এটা সাহিত্যক্ষেত্রে অনৃতভাষণ যদিও বাংলার রঙ্গলোক সম্বন্ধে নয়। গিরিশচন্দ্র যে জোয়ার এনেছিলেন তার সুগতি সমন্বিত প্রবাহ দানীবাবুর কালেও উচ্ছ্বসিত। শিশিরপূর্ব যুগ নাট্যলোকের ক্ষেত্রে এক ক্লান্তি ও অবসাদের অধ্যায়। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অমৃতলাল মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত, রসরাজ অমৃতলাল অবসৃত, দানীবাবু শেষের যাত্রী। এই যুগের নাট্যধারায় আধুনিকতা বা অগ্রগতির চিহ্ন দুর্লক্ষ্য প্রাচীন রোমান্টিকতার উগ্র অকারণ আস্ফালন ও বাস্তববিচ্যুত আতিশয্যই প্রাধান্য পেয়েছে। হাস্যরস ভাঁড়ামিতে, শৃঙ্গাররস যৌনাবেদনে, ও বীররস হস্তপদআস্ফালিত চীৎকারে পর্যবসিত হত। অভিনয় শিল্পকলা নয়, আসবোন্মত্ত বারাঙ্গণা শোভিত শিক্ষাহীন ধনী যুবকবৃন্দের অবসর বিনোদনের উপায়-মাত্র। দর্শকের রুচিহীনতা, পরিচালকের শ্রীহীন ব্যবসায়বুদ্ধি ও সংশয়ক্লিষ্ট গতানুগতিকতাবদ্ধ অভিনেতার জীর্ণ গতানুগতিক শিল্পপ্রয়াস রঙ্গমঞ্চের পরিবেশকে অকাম্য করেছে। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, দানীবাবু, মন্মথলাল ও কার্ত্তিক দে, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, প্রবোধ ঘোষ, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারীর আবির্ভাব সত্ত্বেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই বেদনাজীর্ণ ম্লানরূপ বিস্ময়কর। এতগুলি অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাবও রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করেনি তার কারণ নির্ণয় সম্ভব। প্রথমতঃ দায়ী স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তিনি যুগবদ্ধতার প্রয়াসী হননি, একক অভিনয়কে প্রাধান্য ও অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। সমগ্রিক উন্নয়নে তিনি ব্যর্থ। শেষাংশে রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে তাঁর নাটক বাস্তববিচ্যুত এক অপার্থিব লোকে প্রয়াণ করে নাটককে অলৌকিক স্বাদু করেছে, জীবন সম্পৃক্ত করেনি। তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের অন্তর্দৃষ্টি নিগূঢ় কল্পনার অভাব চরিত্রের ব্যঞ্জনা, অন্তঃস্বরূপের নিবিড় বিশ্লেষণ তাঁদের উপলব্ধির অতীত ছিল। চরিত্রের প্রতিটি স্পন্দন উপলব্ধি সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ চেতনার রূপায়ণে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যুগচেতনাও সংশিল্প রূপায়ণের প্রতিকূল ছিল।

শিশির কুমার এলেন—কি বিপুলবিস্মিত সেই অবির্ভাব। ছাত্রজীবনের চন্দ্রগুপ্ত অশোক প্রভৃতিতে সার্থক অভিনয়ের পর ষ্টারে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে অভিনয় করেন কলিকাতা ওল্ড ক্লাবের সদস্য হিসাবে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিদ্যুৎশিখা নয় তমসাচ্ছন্ন উপান্ত রাত্রির ক্ষীণ অথচ নিশ্চিত সৌরশিখা। অতঃপর ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীরে নামভূমিকায় ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর ম্যাডান কোম্পানীর পক্ষে শ্রী থিয়েটারে (কর্ণওয়ালিস্) তাঁর অভিনয় নাট্যলোকে প্রভাতের সৌরকিরণ বিকিরণ—বাংলা নাটকের অবরুদ্ধ

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, নেপথ্যচারিণী—ক্লিষ্টা নাট্যসরস্বতীর হিরন্ময়পর্ণ সৌন্দর্য্যভাব দ্যুতিময় চিত্তকমলে অধিষ্ঠান। শিশিরকুমার ঘটনাবিন্যাসে নাট্যভাবনাকে তরঙ্গায়িতই করলেন না, ভাবময়তায় আবেগস্পন্দিত করলেন; এর জটিলতা বহির্দ্বন্দ্বে নয়, মনন চেতনার সংক্ষুব্ধ উত্থান পতনে, নিছক প্ল্যানে প্যাটার্ণে নয়, ব্যঞ্জনায় অবচেতন ভাবকল্পনার মূর্ত রূপায়ণে এর সার্থকতা। শিশিরকুমারের আবির্ভাব বাংলা রঙ্গলোকের এক অপরূপের সোনালী দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। অতঃপর রঘুবীর (১৯২১, ১১ই মার্চ রঘুবীর), চন্দ্রগুপ্ত (১-৮-২২ চন্দ্রগুপ্ত), সীতা (ডিসেম্বর ১৯২৩ র'ম), সীতা (৬—৮—২৪), পাষাণী (১০—১২—২৪, ইন্দ্র, গৌতম), জনা (৩-৭—২৫ প্রবীর), নরনারায়ণ (১—১২—২৬) প্রভৃতি শিশিরকুমারের বিজয়অভিযানকে অব্যাহত রাখে। তাঁর সর্বশেষ অভিনয় মহাজাতি সদনে ৮ই মে ১৯৫৯ আলমগীর ও ১০ই মে রীতিমত নাটক। শিশির-কুমারের এই আশ্চর্য সার্থকতার উৎস যেখানে তাই নাট্যাচার্যের বৈশিষ্ট্য। শিশিরকুমার সৃষ্টির মূল-ভূমিতে উপনীত। স্রষ্টার সৃষ্টির কেন্দ্রাতিশায়ী বক্তব্য, ভাবকল্পনার উপলব্ধি, চরিত্রের অন্তরতম সত্তার প্রতিটি স্পন্দন: আকৃতির অনুভব, শিশিরকুমারের চেতনায় জাগ্রত। তিনি চরিত্রের মর্মরহস্য আত্মার সুগভীর অনুভূতিকে রূপায়িত করেছেন। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্যচরিত্রের উত্তপ্তলাভার স্ফুটন জ্বলন্ত অগ্নিস্রাবের উদ্গার অসহ্য চিত্তদাহের অগ্ন্যুৎক্ষেপকে প্রকাশের সঙ্গে তারহৃদয়ের তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকার মরুভূমির দহনজ্বালাকে রূপবদ্ধ করেছেন। সীতা নাটকের রামচরিত্রের উচ্ছ্বাস, তটপ্লাবী হৃদয়াবেগের বিপুল বিকাশ, কর্তব্য নিষ্ঠতার সঙ্গে অন্তঃস্বরূপের সংগ্রাম, শিশিরকুমারের অভিনয়ে সুরূপায়িত। মাইকেল চরিত্রের সুতীব্র হৃদয়যাতনা ও মর্মচ্ছেদী হাহাকার, নিয়তি নিপীড়িত মানবাত্মার বিদীর্ণবেদনার যথার্থ উপলব্ধি তাঁর ছিল। এইভাবে আলমগীর, জীবানন্দ, নিমচাঁদ, কর্ণ, রাস-বিহারী, বিক্রমদেব প্রভৃতির অন্তর রহস্যকে প্রতিভার স্বর্ণকুঞ্চিকায় উন্মোচিত করেছেন—জীবনের নবমূল্যায়ন, আত্মস্বরূপের রূপান্তরীকরণ, মানবচেতনার বিশ্লেষিত বীক্ষণ এখানে লব্ধ। শিশিরকুমার চরিত্রায়ণে চিরায়ত বোধকে উপলব্ধি করেছেন। চিরকালের যে মানুষ সুখদুঃখহাসিকান্নায় সামগ্রিক শাশ্বত তিনি তারই রূপবিম্ব। প্রকৃতকথা শিশির কুমারের যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রতিভার মূলে উল্লেখিত তাই চরিত্রচিত্রণে কার্যকরী। তাঁরই চেতনার রঙে অনুভূতির পান্নাকে সবুজ করেছেন চুণীকে করেছেন রক্তিম।

শিশিরকুমার সম্মিলিত সামগ্রিক অভিনয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছেন। কনসার্টের সুর সমন্বয়ের মত বিচিত্র সুরের বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র ব্যাপক অনুভূতিকে আভ্যন্তরীণ ঐক্যে বিধৃত করে অখণ্ড সুরপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। রসিক সমালোচক শিশিরকুমারের এই সামগ্রিক সংহত নৈপুণ্যের কৃতিত্ব নিরূপণ করেছেন—সপ্ততন্ত্রী বিশিষ্ট বীণায় যেমন যে তারে সুর বাজে তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য তারগুলিতে শিহরণ জাগে ও সমস্ত মিলিত হয়ে একটা বিচিত্র জটিল ঐকতান কম্পন সৃষ্ট হয়, তেমনি অভিনয় ক্ষেত্রেও একের ভাব অন্যের মুখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে ও নানাবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এক পরস্পরনির্ভর অথচ বহুমুখী ভাব সমবায় গঠিত করে। শিশিরকুমার প্রযোজক হিসাবেও অসামান্য। নটীশ্রেষ্ঠা তারাসুন্দরীর মতে তিনি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা উন্নততর প্রযোজক। মনীষা ও শিল্পবোধের সমন্বয়, উন্নত শিক্ষা ও রুচি, সৃষ্টির অন্তর উন্মোচনকারী রহস্যময় তৃতীয় নয়ন ও সৃজন প্রতিভায় তিনি প্রযোজক হিসাবে পূর্ণ সফল। অভিনয় প্রতিভায় শিশিরকুমার গ্যারিক ও স্যার হেনরী আভিংএর সমতুল, প্রযোজনা পরিচালনায় তিনি স্তানিস্লাভস্কি, নাট্য আন্দোলনে তিনি বার্টল্ট ব্রেখ ট। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় দেশীবিদেশী সমালোচক মুখর। সোভিয়েত প্রতিভা পুস্‌কিন ও চেরকাশোভ, বৃটিশ স্যার লুই ক্যাসন ও সিভিল থ্‌নডাইক শিশির প্রতিভাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার সমতুল বলে অভিহিত করেছেন। শিশিরকুমারের মঞ্চসজ্জাও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি চিত্রপট অপেক্ষা চিত্তপটের উপর অধিকতর জোর দিতেন। অভিনয়ই তাঁর কাছে মুখ্য। প্রযুক্তির

আধিক্যে সাম্প্রতিক নাট্যকলা ক্লিষ্ট। শিশিরকুমার আঙ্গিক অপেক্ষা অন্তরেই বেশী মনোযোগী। তিনিই প্রথম ফুটলাইট উঠিয়ে সাইড লাইটের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথম সীতা নাটকে আলোর প্রক্ষেপণে দৃশ্যপটে অপরূপ মঞ্চমায়ার নির্মাণ করেন—তা রঙে রসে স্বপ্নে সুরভিতে শিল্পের অপরূপ ইন্দ্রধনুকে সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি নিপুণ কুশলী শিল্পীবৃন্দ— অনেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ ও শিষ্য—সার্বিক অভিনয়কে নিটোল পরিপূর্ণ করেছে। নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, প্রভাদেবী, চারুশীলা, রবি রায় প্রমুখ শিল্পী প্রত্যেক অভিনয়কে মুক্তার মত দীপ্ত উজ্জ্বল পরিপূর্ণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিশিরকুমারের অভিনয় মননাতিরেক ও অসংবরণীয় হৃদয়োচ্ছ্বাসের সাযুজ্যকরণে, জীবন সংবেদনার গভীরতায়, রূপদক্ষ স্রষ্টার সৃজননৈপুণ্যে হিরণ্যদীপ্ত—তা শিল্পের চিরায়ত মহিমায় দীপ্যমান। শিশিরকুমার রোমান্সরসের সাধক। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের বন্ধন। ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসকে তিনি রঙে রসে অপরূপ করেছেন। প্রাচীন জীবনবোধ থেকে ঋক্থ গ্রহণ করে তাকে সুন্দর বিচিত্র বিলসিত করেছেন। কিন্তু প্রাচীনত্বের রূপনিবিড় সহজসুন্দর চিত্রণ নয়, শিশিরকুমার আধুনিক যন্ত্রণাকাতর জীবনের রূপশিল্পী। নবনাট্য আন্দোলনের তিনি অন্যতম উদ্গাতা। যুগের যন্ত্রণা জীবনের বিষণ্ণ-বেদনার অনুভূতিতে জাগ্রতচিত্ত গণজীবনবোধ ও যুগবাণীকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করেছে। তাই দুঃখীর ইমান 'জীবনরঙ্গ' 'পরিচয়' প্রভৃতি নাটকের রূপসৃজনে তিনি নিষ্ঠ। যারা নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের প্রবক্তা অধিকাংশই তাঁর ভাবশিষ্য বা অনুরাগী। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যাঁরা গণনাট্যের নামে কোন ইজম্ যা সৎসাহিত্যের পরিপন্থী—প্রচার করতে চেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসের কোন যোগাযোগ ছিলনা। তিনি বিকৃত রাজনীতির ধ্বজাধারীদের ব্যঙ্গে কৌতুকে তীক্ষ্ণ আঘাতে জর্জরিত করেছেন। এখানেও তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব কার্যকরী। তিনি শিল্প সং-আদর্শে স্থির স্থিত, জীবনভাবনায় নিষ্ঠাবান্। তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র প্রমুখ দিক্‌পাল স্রষ্টারা নাট্যাচার্যের ভালবাসায় ধন্য। শিক্ষায় তৎপর। নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে শিশিরকুমারের আত্মিক সংযোগ ও তদনুযায়ী শিল্পরূপায়ণে তাঁর সৃজনশীল চিত্তের নবসিসৃক্ষাই প্রমাণিত।

———

যৌবনের জয় যাত্রা না অগস্ত্য যাত্রা ?

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

যৌবনের কাজ সৃষ্টি করা। পুরাতনের বাঁধন ভেঙ্গে নূতন সমাজ, নূতন বন্ধন, নূতন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা। কিন্তু আজ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখি যুব-সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অরাজকতা। সব দেশেই দেখি ঐ একই রোগ। এর কারণ নিয়ে বিভিন্ন দেশে রীতিমত অনুসন্ধান, পরিসংখ্যান, আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। সব দেশের পুলিশের বড় কর্তারাও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সত্য কথা বলতে কি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, ফিলিপাইন, ইণ্ডোনেশিয়া, কোরিয়া ও অন্যান্য দেশে যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন যে হারে বেড়েছে সে হারে আমাদের দেশে এখনও দেখা দেয়নি। দেখা দেয়নি বলে যে দেখা দেবে না এমন কোন ভরসা নেই। আমার মনে হয় বিপদ আসবার আগে থেকে আমরা যদি না সতর্ক হই পরে পস্তাতে হবে।

কেন আজ যুব সমাজের মধ্যে এই নৈতিক অধঃ-পতন? তার উত্তরে প্রায় সমস্ত দেশেই দায়ী করা

হয়েছে পিতামাতা আর অভিভাবকদের। তাঁদের কর্তব্যে শিথিলতা ও সন্তানপালনে অমনোযোগিতাই এই সংক্রামক অরাজকতা ও যুব উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ঐ-সবদেশে দেখা গেছে মধ্যবিত্ত এবং অবস্থাপন্ন সমাজের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক অবনতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেশী। অভাবগ্রস্ত এবং বস্তি-বাসীদের চেয়ে যাদের খাওয়া পরার অভাব নেই সেই সব যুবকরাই অসামাজিক ও উচ্ছৃঙ্খল কাজে বিশেষ পটু এবং দক্ষ। কর্মব্যস্ত কর্মবীর পিতা তাঁর ব্যবসা বাণিজ্য, কাজ-কর্ম, ক্লাব, পার্টি নিয়ে ব্যস্ত। মহীয়সী মাতা হয়তো তাঁর সেবা সমিতি, বাগান পার্টি, চা-চক্র ও নানান জনহিতকর কাজ নিয়ে সারাদিন রাতে ছেলে মেয়েদের দেখবারই সময় পান না। এই স্নেহের কাঙাল ছেলেমেয়েরা বাপ মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের ধারণা এবং বিশ্বাস, অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার উপকরণ দিয়েই তাঁরা ছেলেমেয়েদের ন্যায্য প্রাপ্য স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার দেনা পরিশোধ করছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? মানুষের চিরাকাঙ্ক্ষিত স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার কোন বিকল্প আজ অবধি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও আবিষ্কৃত হবে কিনা তা বলা সম্ভব নয়। কল বা যন্ত্র দিয়ে মানুষের অন্য কাজ হয়তো সম্ভব হবে কিন্তু হৃদয়কে জয় করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।

আমাদের দেশেও পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের আজ ভেবে দেখবার দিন এসেছে। শুধু দেশ, কাল এবং যুগধর্মের উপর দোষারোপ না করে সন্তান পালনে তাঁদের দায়িত্ব এবং ছেলেমেয়েদের উপর তাঁদের নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণের। রীতিমত পয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুল কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে এবং বাড়ীতে মোটা মাহিনার শিক্ষক অধ্যাপক রাখলেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হল না। ভাল জামা-কাপড়, আসবাবপত্র এবং না চাইতেই বিলাসিতার উপকরণ যোগালেই ছেলেমেয়েদের উপর পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয় না। তারা চায় আরও কিছু—স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসা। পিতামাতার নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবেই সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সৎ পিতা মাতার অসৎ সন্তান এবং চরিত্রহীন পিতা-মাতার চরিত্রবান পুত্র কন্যার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকলেও পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়া ও পরিবারের নৈতিক চরিত্রের প্রভাব ছেলে-মেয়েদের মনে বিশেষভাবে বিস্তার করে। সেই জন্যই আগের দিনে বিয়ের আগে সমাজ, কুল ও বংশ পরিচয় বিচার করে বিয়ের ব্যবস্থা করা হত।

আজ আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে এবং সংসারে অনটন ও অস্বচ্ছলতার জন্য পিতামাতা উভয়কেই আজ চাকরী করতে হচ্ছে। বাড়ীতে ঝি চাকরের কাছে হয়তো ছেলেমেয়েদের থাকতে হয় নয়তো স্কুল কলেজ থেকে ফিরেই তারা ঝি চাকরের কাছ থেকে কিছু খেয়েই আবার উধাও হয়। বাপ মা তাদের কর্মব্যস্ত কর্মসূচীতে ছেলে মেয়েদের ভাল ভাবে দেখতেই পারেন না। তাঁদের অবসর কই? ছুটির দিনে হয়তো তাঁরা অফিসের পিকনিক, সিনেমা, স্টীমার পার্টি বা অন্য কোন সামাজিক কাজ নিয়ে মেতে উঠেন। আর হতভাগ্য স্নেহের কাঙাল ছেলে মেয়েরা নানান অসামাজিক ও নীতি বিরুদ্ধ কাজে তাদের উন্মুখ যৌবনের ডাকে সাড়া দেয়। ধর্ম ও নীতির বালাই আজ আমাদের সমাজ সংসার কোথায়ও নেই। স্কুল কলেজে সেই একই দশা। সততা আজ বোকামির নামান্তর। সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, নভেল ও গল্পে প্রচলিত নীতিবোধ প্রাচীন ধর্মবোধের বিপক্ষে রীতিমত জেহাদ চালান হচ্ছে। সুকুমার মতি ছেলে-মেয়েরা তাই আজ বিভ্রান্ত। বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা আজকাল রাজনীতি নিয়েই মেতে আছেন। আমাদের দেশের সংবিধান সিকিউলার—ধর্মনিরপেক্ষ। কাজেই আমাদের দেশের যুবসমাজ যদি নানান অসামাজিক নীতিবিরুদ্ধ কাজে মেতে উঠে তার জন্য দায়ী তারা নয়, দায়ী আমরা।

কৃষ্ণ চরিত্রে রঙ্গরসের প্রভাব

অধ্যাপক শ্রীগজেন্দ্র নারায়ণ বের।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র একটা রঙ্গরসের উৎস। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই রঙ্গরসরাজ। পদাবলীর মধ্যে আমরা দুটী রসের প্রাধান্য দেখতে পাই—আদিরস ও করুণ রস। আদি-রসের মধ্যেই রঙ্গরসের প্রাধান্য বিদ্যমান। এজন্য পদাবলী পাঠে শুধু যে চোখে জল আসে তা নয়, মুখে হাসিও ফোটে।

রঙ্গরস বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়েছে দানলীলা, মানলীলা, সুবলমিলন, নৌকাবিলাস, দোললীলা, জলকেলি, বংশীহরণ, ছদ্মবেশ, পাশাখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে।

পদাবলী সাহিত্য প্রকৃষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছে রাধা শ্যামের উপভোগ্যা। আয়ান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। এজন্য শ্রীরাধা লোকচোক্ষে ব্যভিচারিণী হলেও সতী বলে খ্যাতি। বাসনা চরিতার্থের জন্য যে সকল অলৌকিক ছলনা, চাতুরী, বঞ্চনা, নির্লজ্জতা, দুঃসাহসিকতার আশ্রয় নিতে হয় শ্যাম তাহার কোনও কিছুরই ক্রটী রাখেন নি। এইসব রঙ্গরস সৃষ্টির অংশ বিশেষ।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবাধ ও নিরুপদ্রব হতে পারে না। পতি আয়ান, ননদ কুটিলা, শাশুড়ী জটিলার কড়া পাহারার বেষ্টনী ভেদ করে রাধাকে শ্যামের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে হত। কখনও কখনও ধরা পড়ে লাঞ্ছনার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যও নানা ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করতে হয়েছে। এই কৌশল-গুলিতেই রঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছে। লোচন দাসের ধামালীগুলি এই প্রকার রঙ্গরসে ভরপুর।

কুটীলার উক্তি—

শুন শুন ওগো সই দণ্ড চাইর রহিতে।
দাদা ঘরে নেই গেলাম বৌ এর কাছে শুইতে॥
প্রদীপ লইয়া শুধালাম বৌ তোর কোলে কে।
ঢাক করিয়া বলে তোমার দাদা আস্যাছে॥
দাদা আমার শুয়া আছে আমি মরি ডাক্যা।
বসন তুল্যা দেখলাম আরে নন্দ ঘরের কানু।
ধর বোলতে দৌড়্যা পালায় কাড়্যা রাখ্যাছি বেণু॥

নন্দের পো নিজেই কুটিলার উক্তি সমর্থন করেছেন একটী পদে—

সুবল বলে গোঠে আল্যা হাতের বেণু কোথা॥
হেঁট মাথে রৈছ কেন কওনা মনের কথা॥
তোমাকে কহিতে ভাই নাহি কোন ডর।
সে দিন গেছলাম আমি আয়ানের ঘর॥
আয়ানের না দেখি ঘরে নির্ভয় হৈয়া।
রাই কোলে শুয়্যাছিলাম কাপড় মুড়ি দিয়া॥
নিদ্রায় বিভোর আমি আনন্দিত মনে।
কি জানি পাপিষ্টা মাগী ছিল কোন খানে।
আচম্বিতে আসি মাগী তুলিল কাপড়॥
বেণু ফেল্যা পালাইলাম হৈয়া ফাঁকর॥

শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা এক এক সময় এতই প্রবল হত যে তাকে সময়ে সময়ে নানা ছদ্ম-বেশ ধারণ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হয়েছে—যেমন নাপিতানী, বণিকিনী, বাজিকর, মালিনী, দেয়াশিনী, বাদিয়া, পশারী ইত্যাদি। রাধা ও তার সখীদের এই ছদ্মবেশীকে চিনে ফেলতে বেশী সময় লাগত না। ছদ্ম-বেশ ধারণের দুইটী মুখ্য কারণ—একটী রঙ্গলীলার দ্বারা রাধিকার মনে ভাবান্তর ঘটান, দ্বিতীয় দিবাভাগে শ্রীমতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে মিলনের স্থান ও কাল নির্দ্ধারণ। তাছাড়া নারীবেশ ধারণে গৃহে অবাধ প্রবেশাধিকার শুধু নয়—অঙ্গ সেবা, প্রসাধন ইত্যাদিতে অধিকার পরিজনগণের অনুমোদিত। পশারী বেশে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রসাধনের কতকগুলি দ্রব্যের দোকান মেলে বসেছেন। গোপীরা দুই একটী জিনিষ কিনে দাম দিয়ে চলে যাচ্ছে। একজন গোপী একটী সোনার সূঁচ কিনে দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

লেই চলি যায় বেতন না দেয়।
পশারী ধরিল কুচ॥

বলা বাহুল্য এ নারী হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরাধা—নইলে দাম না দিয়ে জিনিষ নিয়ে চলে যাওয়ার সাহস আর কার আছে?

বাদিয়া বেশে সাপ খেলানোর পুরস্কার নিয়ে রাধা-শ্যামের বাদানুবাদ উপভোগ্য।

রাধা ধমক দিয়ে বললেন—

বটের ভিখারী হও　　বহুমূল্য নিতে চাও
　　বলিলে শোভিত নহে বটে,
বনে থাক সাপ ধর　　তেনা পরিধান কর
　　সদাই বেড়াও নদী তটে।

বাদিয়া—

চুরি দারি নাহি করি　　ভিখ মাগি পেট ভরি
　　আমি ভয় করিব কাহারে?

বাদিয়া চায় শ্রীঅঙ্গের শাড়িখানি। বাদিয়ার স্পর্দ্ধা কম নয়। তার এই স্পর্দ্ধা শুধু রাধাই সইতে পারে। আয়ান জানতে পারলে প্রহার দিত।

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কপট দানী সেজে মথুরার হাটের পথে পশারিণী রাধা ও তার সখীগণের পথ আটকিয়েছেন। শুল্ক না দিলে তাদের হাটে যেতে দেবেন না। রাধা প্রথমে কান্নাকাটি পরে গালাগালি করলেন—তাহা পদাবলীতে রস-কলহে পরিণত হয়েছে। দুই পক্ষের বাক বিতণ্ডা উপভোগ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে খানিকটা ঘায়েল করলেন।

শ্রীরাধা আক্ষেপ করে বললেন—

মণি আভরণ দিল　　ডরে ডরে সব দিল,
　　তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
　　যো হইলাম সোনার গাছ
　　দানীতে না ছাড়ে কাজ,
　　ডালে মূলে নেবে উপাড়িয়া।
ঘরে বৈরী ননদিনী　　পথে বৈরী মহাদানী,
　　দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ　　যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ,
　　না রাখিব এ ছার জীবন॥

কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ শ্রীমতী নিলেন মানলীলায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে ফিরে এলেন তখন শ্রীমতীর শ্লেষ ভরা উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে উপভোগ্য—

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজ দেখি বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বসো আঁচলেতে মুখখানি মুছাই॥

শ্রীকৃষ্ণ অপবাদ স্খালনের জন্য বললেন—

মিছা কথা কহ পাপ জানোতো আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী॥

শ্রীরাধা বললেন—

কেন দাঁড়িয়ে আছ পাপিনীর কাছে
.. ..পাপেতে ডুবো বা পাছে।
যাও চলি যেথা ধর্ম্মের থলি আছে॥
ভালো ভালো ভালো কালিয়া নাগর
　　শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী মজালে যখন,
　　ধরম আছিল কোথা।
চলিবার তরে দাও উপদেশ,
　　পাথর বাঁধিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা দাও,
　　তাহাতে নুনের ছিটে॥
আর না দেখিব ঐ কালা মুখ
　　এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যেথা মনের মানুষ
　　যেখানে ও মন টানে॥

ললিতা সখীও ঝোপ বুঝে কোপ দিতে ছাড়লেন না।

শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি,
সে কি রয় কভু ধৈর্য্য ধরি।

শ্রীকৃষ্ণের আত্ম সমর্থনের জোর না থাকায় অগত্যা তাকে বাঁশী স্পর্শ করে শপথ করতে হল।

তোমা বিনে দিবা নিশি কিছু না জানি যে। এরূপ দুর্ব্বল উত্তরে মানের দুর্জ্জয় অভিমানকে জয় করা যায় না।

গোবিন্দ দাসের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু রাধার অনুযোগের চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। শ্রীমতী রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন তোমার উচ্ছৃঙ্খল রূপ দেখে তোমাকে শঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। আমার মনের মনসিজকে তুমি দগ্ধ করলে।

মাধব, অব তুঁহু শঙ্কর দেখা।
জাগর পুন ফলে প্রাতরে ভেটিলুঁ
দুরহি দূর রহু সেবা॥

দূর থেকে তোমাকে প্রণাম জানাই।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমিত শঙ্কর তুমি যে ক্রোধে চণ্ডী বনে গিয়েছে।

সুন্দরি, অব তুঁহু চণ্ডী বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ॥

তুমি একটু হাসলেই দগ্ধ মনসিজ আবার পুনর্জীবিত হবে।

এরূপ রঙ্গরসের মধ্য দিয়া মানিনীর মান ভঞ্জন হয় না। ছল-ছুল কৌশল প্রয়োজন। হঠাৎ শ্যাম আমাকে বিষধর সর্প দংশন করল বলে চিৎকার সুরু করে দিলেন।" রাধা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দৌড়িয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। রঙ্গরসের দ্বারা রঙ্গিণী বশীভূত হলেন। কল্পিত সর্প শ্রীমতীর দর্প চূর্ণ করল।

সুবল মিলন রঙ্গরসের একটী উপজীব্য। একদিন রাখালরাজ একাকী রাধা কুণ্ডের ধারে বাঁশি বাজাচ্ছেন। রাধার কথা হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি ব্যস্ত কাতর হলেন। ঠিক এই সময় সুবল এসে হাজির। সুবলকে শ্যাম বললেন "ভাই সুবল, রাধার জন্য প্রাণ কাতর হয়েছে। তুমি সত্বর তাকে লইয়া এস।" সুবল বলল "এই দিন দুপুরে ঘরের কাজ ছেড়ে আসবে কি করে?" কৌশলে আনতে পারি কিনা দেখি।

রাধার বাড়ী গিয়ে দেখে শ্রীমতী রন্ধনে ব্যাপৃতা। সুবল রান্নাঘরের দুয়ারে ধর্ণা দিল। রাধাকে কৃষ্ণ [illegible] থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে সব কাজে ব্যাপৃত রাখার জন্য তার ওপর দুইবেলা রন্ধনের ভার পড়েছিল। বনে গোঠে রাধা রাধাসুরে বাঁশি বাজত—আর রাধা রান্না করতেন। মন কি তখন রান্নায় থাকতে পারে? সে রান্না কেমন হত তার বর্ণনা বড়ু চণ্ডিদাস দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধার মুখ দিয়ে।

ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিম—ঝোলে ক্ষেপিলুঁ।
বিনি জলে চড়াইলুঁ চাউল।"

আবার কখনও কখন রাধাকে কৃষ্ণ বিরহে লোক চক্ষুর অন্তরালে অশ্রু বিসর্জ্জনের নিমিত্তও রান্না ঘরে—যেতে হত—যেন উনুনের ধোঁয়ায় তার দুই চক্ষু বয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

রাধা বললেন "সুবল, এই দিন দুপুরে রান্না ফেলে যাই কি করে? লাঞ্ছনার যে আর অবধি থাকবে না। শ্যামের দেখছি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।" শ্যামের বুদ্ধির ভাণ্ডারী সকল সমস্যার কাণ্ডারী সুবল বলল "এক কাজ করি এস—তোমার বেশ ভূষা অলঙ্কারাদি আমাকে দাও—আমি পরি; আমার সাজ তোমায় দিচ্ছি, তুমি পর। আমি তোমার বেশে রান্না করি, তুমি আমার বেশে কৃষ্ণ মিলনে চলে যাও।" সুবলের সম্বন্ধে একটু এখানে বলে নিই। সুবল ছিল ছেলে মানুষ, গোঁফ দাড়ি কিছুই বেরোয়নি এবং চেহারাটা ছিল মেয়েলী ধাঁচের। গায়ের রংও ছিল খুব ফরসা।

সুবল বললে—"তোমার বেশ আমায় দাও আমি রই ঘরে,
আমার বেশে যাও তুমি কানু ভেটিবারে।"

সুবলের বুদ্ধিমতে দু'জনের বেশভূষা পরিবর্ত্তন হ'ল। সুবলের বেশ পরিধান করে রাধা সতী ত হেসে কুটি কুটি। সুবল দেখল দু'জনের বেশভূষা বিনিময়ে একটি মুস্কিল হয়েছে,

"উচ্চতায় পয়োধর ঢাকা নাহি যায়।"

তখন সুবলই বুদ্ধি দিল "কোলেতে করিয়া লও নবীন বাছুর।" শ্রীমতী রাধার এহেন নিখুঁত ছদ্মবেশ এমন কি শ্যাম পর্য্যন্তও ধরতে পারিনি। এদিকে সুবল যে ছদ্মবেশে পরিবেষণ করছে জটিলার মত কড়া শাশুড়ী একেবারে ধরতে পারেন নি। তা না হলে রঙ্গরস জমত না। বৃন্দাবনে ছদ্মবেশ প্রায়ই ধরা পড়ত না।

নৌকা-বিলাসের রঙ্গলীলা শুধু যৌবন নিয়ে নয় রাধার দেহ নিয়েও খেলা, মথুরার হাটে দধি ঘৃতের পশরা নিয়ে সখীদের সঙ্গে রাধা চলেছেন সেজেগুজে, সামনে যমুনা পার হতে হবে। কৃষ্ণ একটি ভাঙ্গা নৌকার কাণ্ডারী সেজে তাদের পার করে দিচ্ছেন।

"হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান—চড় সবে পার উতরব হাম।"

আরোহিনীরা দেখল কানু অত্যন্ত আনাড়ি মাঝি। সে নৌকা তীরের দিকে নিয়ে যেতে পারছে না, নৌকা ডুবু ডুবু। আরোহিনীরা চেঁচামেচি করতে লাগল। কানু বলল—

তখনই ত বলেছি ভাঙা নায়ে দিই পাড়ি।
তোরা গোয়ালিনী ছানা দধি খেয়ে অঙ্গ হয়েছে ভারী॥

কানু এত ভারী দেহ ও এত ভারী যৌবন পার করতে পারবে না। তাই সে বলল—

এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার।

জ্ঞান দাসের শ্রীরাধিকা স-খেদে সখীদের বলল—

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করে নিল॥

তারপর রাধা নায়্যাকে সম্বোধন করে বলল—'

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বলহ ছলে॥

এই লীলায় রাধাকৃষ্ণের বাদানুবাদে রঙ্গরস বেশ জমেছে।

দোললীলা ত রঙ্গরসেরই খেলা। কাজেই এই লীলায় রঙ্গরস ছাড়া আর কিছুই নাই। পিচকারীর দ্বারা রং-জল নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় রঙ্গরসই উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ঝুলন লীলাতেও রঙ্গরসের অবকাশ আছে। জলকেলিতেও রঙ্গরস বিশেষ উপভোগ্য।

বংশীহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে জব্দ করবার পরিকল্পনাও রঙ্গরসের সৃষ্টির জন্য। শ্রীকৃষ্ণের বংশীই সম্বল। তাহা ফিরে পাবার কাতর আবেদনে ললিতা সখী বলল—

তরল বাঁশের শুক্নো কাঠতো
তাহাতে কাহার কাজ।
ফোঁরা কাঠিখানা কি তার বাখান
কহিতে না বাসো লাজ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সকল সখীদের অঙ্গ তল্লাস করতে হল। কেউ স্বীকার করে না চুরি। এটা একটা সমবায়মূলক হরণ।

পদাবলী সাহিত্যে শ্যামের সখীগণের সঙ্গে পাশা খেলার কল্পনা করা হয়েছে। বাজী রেখে পাশা খেলার বৈচিত্র্য প্রেমলীলারই অঙ্গীভূত। হার, জিত দুইই রঙ্গরস দ্বারা সংবর্ধিত। বাজীর সামগ্রী ছিল শ্যামের সর্ব্বস্ব-ধন বাঁশরী আর রাধার বেসর। বাঁশী ও বেসর পণের সামগ্রী হিসেবে সমতুল্য হতে পারে না বলে দুই পক্ষে তুমুল বচসা—এক রঙ্গরসের সৃষ্টি করেছে। যে বংশীর ধ্বনি পাষাণ দ্রব করে তার সমতুল কি ঐ সামান্য বেসর হতে পারে!

শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ দ্রবয়ে যার গানে।
এত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেসর তোর
সমান করহ কোন্ গুণে॥

রাধা ছাড়বার পাত্রী নহে। সে তার বেসরের কত গুণগান গাহিল।

রাই কহে শুন শ্যাম বেসর যাহার নাম
সতত দোলয়ে নাসা মাঝে।
যে বেসরে মুখ আলা যাহাতে তুলেছ কালা
হেন বেসর নিন্দ কোন লাজে॥

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে তার গলার গজমুক্তার হার পণ রাখতে হল। শ্যাম তখন বললে আমি জিতলে হার চাই না রাধাকে একশত চুমা দিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে এই প্রকার নগ্ন রঙ্গরসেরও অভাব নেই।

কি গোষ্ঠের খেলা, কি কুঞ্জের খেলা কোন খেলাতেই শ্যাম কোনও দিন জেতেন নি। পাশা-খেলাতেও শ্যাম হারলেন। সখীরা শ্যামের বাঁশী কেড়ে নিয়ে বলল স্নানঘাটে, দান ঘাটে, দধিঘাটে, নদীঘাটে, এই বাঁশী আমাদের কত দুঃখ দিয়েছ—আজ এ বাঁশী যমুনার জলে নিক্ষেপ করে তার শোধ নেব। বাঁশীর জন্য শ্যাম প্রত্যেকের পায়ে ধরে বেড়ান। সখীরা রঙ্গরস উপভোগ করে।

রঙ্গরসের কবি অকিঞ্চন দাসের মঞ্জুষিকা মিলন ও আয়ান বেশে মিলন—দুইটি কবিতাই রঙ্গরসে ভরপুর। রাধিকার জন্ম দিনে উপহার পাঠাবার জন্য যশোদা মঞ্জুষা সাজাচ্ছেন। শ্যাম দাঁড়িয়ে দেখছেন। যশোদা যেমনই গৃহান্তরে গেলেন শ্যাম সেই ফাঁকে মঞ্জুষার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। যশোদা আয়ানকে ডেকে পেটিকাটা নিয়ে গিয়ে রাধাকে দিতে বললেন। তুলতে গিয়ে বুঝল পেটিকাটা বেশ ভারী। সে ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। পেটিকাটা রাধার কাছে পৌঁছিলে রাধা সখীগণকে বললেন—

এ কি পেখি সুলক্ষণ
কাঁপে বাম বাহু নাচে বাম আঁখি
পুলকিত দেহ মন।

পেটিকা খুলে দেখলেন কেন সুলক্ষণের সূচনা হয়েছিল। যে আয়ান শ্যামের ভয়ে রাধাকে কড়া পাহারা দিয়ে বেড়ায়, সে নিজেই তাকে ঘাড়ে করে এনে রাধার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। শ্যামের এই প্রকার অভিসার চমৎকার রঙ্গরসের উৎস। রঙ্গরস সৃষ্টি ছাড়া এ ধরণের চিত্র সৃষ্টির আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। যার ধন তারে সমর্পণ। যশোদার পক্ষ থেকেও বটে আয়ানের পক্ষ থেকেও বটে।

আয়ান বেশে মিলনে আয়ানের কপালে আরও দুর্ভোগ দেখান হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ আয়ান বেশে জটিলা, কুটিলাকে বলল "দেখ, সেই লম্পট নন্দের বেটা আমার রূপ ধরে আসতে পারে। তোমরা তাকে ঘরে ঢুকতে দিওনা। আমি পরিশ্রান্ত শুতে চললাম। "কিছুক্ষণ পরে আসল আয়ান এসে দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু মা, বোন দরজা না খুলে গালিগালাজ সুরু করল। আর ও-দিকে রাধাশ্যাম হেসে গড়া গড়ি দিচ্ছিলেন।

এই প্রকার রঙ্গরস মোটেই মার্জিত রুচি সম্মত নহে। লীলা-বৈরীদের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা করতে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণকে অনেক দুঃসাহসিকতার কাজও করতে হয়েছে। শ্যামকে মাঝে মাঝে বেশ জব্দ ও নাকাল হতে হয়েছে। এগুলিও রঙ্গরসের বিষয়ীভূত। এমন কি ধরা পড়বার ভয়ে রাধার বাড়ীর উঠানের কোণে কুলগাছে আত্ম-গোপন করে সারারাত কাটাতে হয়েছে কৃষ্ণকে। গোবিন্দদাসের সখী বলেছে—

সজনী কি কহিব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলি বদরী কোরে হরি,
রজনী পোহায় জাগি॥

———

শিকারী
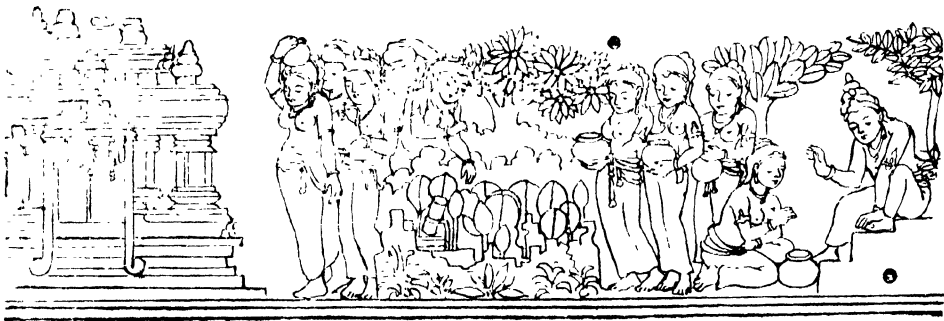
সুধীররঞ্জন গুহ

বশ কিছুদিন পরে অমিতাভ আবার কলকাতা ফিরে ়সেছে। বদলীর চাকরী। কলকাতা থেকে দিল্লী এবং ল্লী থেকে আবার কলকাতা। অফিস করছে সপ্তাহ-ানেক। রোজই ফেরার সময় অসুবিধা। সেদিন ট্রামে ঠ্তে গিয়েও উঠতে পারল না। লোকে লোকারণ্য। ফিসগুলো সব ভেঙ্গে ভীড়!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অমিতাভের চঞ্চল চোখ টো থেমে গেল একবার। চেনা মুখ! সেই বকুল য়েটা না! ভালো করে তাকাল অমিতাভ। হাতে ড়, ডান হাতে একগাছি সোনার রুলি। চক্চকে ানিটী ব্যাগ।

একটু এগিয়ে গেল অমিতাভ। গিয়ে দাঁড়াল কাছেই। মেয়েটিও লক্ষ্য করেছিল অমিতাভকেই। অমিতাভের কান দেখে মনে জোর পেল; পেল সাহস। সুযোগ ়ল না সে। মুখের হাসিতে নমস্কার জানিয়ে বল্ল,— নকদিন পরে কিন্তু···ভালো আছেন?

প্রতি নমস্কারের সংগে জানাল অমিতাভ, হ্যাঁ।— জ্ঞেস করল, চাকরী নিয়েছেন বুঝি?

না।

অমিতাভ মনে করল, আগের দিনেও সে হয়তো দেখে-ওকে। সে রকমই মনে হয়েছিল। শুনল চাকরীও নি। ভাবতে ভাবতে বকুলের সংগে একটি কথাও ও ইচ্ছা হ'ল না অমিতাভের। সে এখন এড়াতে চায় ়। যে কোন একটা ট্রামে বা বাসে যদি একটু জায়গা তবে বাঁচত যেন সে! করলও তাই। যাবে ভবানী-উঠ্ল ওয়েলেস্লীর ট্রামে।

এড়িয়ে এল বকুলকে। কিন্তু সত্যি সত্যি পারল কোথায়! অমিতাভের সারা মন জুড়ে বকুল—যেন বকুলের গন্ধ ছড়ান! মনের চোখের সাম্নে ছায়া ছবির মতো পর পর ভেসে উঠতে লাগল সব ছবিগুলো।

তখন ডালহৌসি স্কোয়ারে অমিতাভের ম্যাগাজীনের অফিস। কাগজ ভালো না চললেও বেশ জাঁকজমক ছিল অফিসের। সে আজ কয়েক বছর আগের কথা।

একদিন দুপুর বেলা। অর্দ্ধেক দরজার একখানা পাল্লার পাশ থেকে ভেসে এলো সুর, ভেতরে আসতে পারি কি?

কাজে ব্যস্ত অমিতাভ, লেখা পড়ছিল। মিহি গলার মাদকতায় তাকাল দরজার দিকে। বল্ল, আসুন।

সেদিন খবরের কাগজে অমিতাভের ম্যাগাজীনের বিজ্ঞাপন বের হ'য়েছিল। বিজ্ঞাপন এনে দেওয়ার জন্যে লোক চাওয়া হ'য়েছিল উপযুক্ত কমিশনে। অমিতাভ মনে করল, মেয়েটা হয়তো সেটাই দেখে তাতে সাড়া দিতে এসেছে। তাড়াতাড়ি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, কি চাই আপনার!

দুপুরে বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ-করা রোদ। সে-রোদ মাথায় করেই এসেছে। ঘাম চিক্‌চিক্ করছিল বকুলের সারা মুখে। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বল্ল,—চা···ই···

ওটুকু বলেই চুপ্। মনের কথাকে চট্ করে বল্ল না বকুল। সময় নিতে লাগল রুমালে মুখ মুছতে মুছতে।

অমিতাভ বকুলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। দেখ্ল, তা'র শাড়ী ব্লাউজ দামী নয় কিন্তু পরিষ্কার। ধবধবে সাদা। ডান হাতে একগাছি সোনার রুলি, বাঁ হাতে ঘড়ি। ভ্যানিটী ব্যাগটা তখন টেব্‌লের ওপর।

একটু নীচু গলায় বকুল বলল, আমি কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছি।

অবাক হ'ল অমিতাভ! দেখতে ভদ্র ঘরের মেয়ে। পোষাকে অভাবের স্বাক্ষর নেই,—রয়েছে যথেষ্ট মার্জিত রুচির পরিচয়। অথচ সে এসেছে সাহায্য চাইতে,—অফিস পাড়ায়! কথাটাকে সহজভাবে মনে না করেও জিজ্ঞেস করল অমিতাভ, কি সাহায্য আপনি চান?

বাবা দীর্ঘদিন অসুস্থ। মা আছেন, আর আছে এক ছোট ভাই,—আমি। দিন আমাদের চলে না।

তবুও কি ভাবে চালান?

আপনাদের মত পাঁচজনের দয়ায়।

কিন্তু এ-ভাবে···আচ্ছা! কতোদূর অবধি আপনি লেখাপড়া করেছেন?

স্কুল ফাইনাল।

নিজের ম্যাগাজীন অফিসেও নিতে পারে তাকে মনে করল অমিতাভ। নয়তো বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেও পেতে পারে কমিশন। বকুলকে তাই অমিতাভ বলল, আজকাল তো কতো মেয়ে চাকরী করে। আপনিও যখন লেখাপড়া শিখেছেন কোথাও চাকরী নেন না কেন?

সে ইচ্ছা নিয়ে অনেক জায়গা ঘুরেছি, কোথাও সুবিধে হ'ল না।

আমি যদি আপনাকে কোথাও একটি ঠিক করে দি?

কোথায়?

ধরুন আমার অফিসে,—এখানে। অমিতাভ দিল অফিসের পরিচয়: বিজ্ঞাপন যোগাড় করে মেয়েরা অনেক টাকা আয় করছে, বলল সে-কথাও।

বেশ স্বচ্ছ হাসি ফুটে উঠল বকুলের মুখে। কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। চোখ দুটো অমিতাভের দিকে রেখে বসে রইল চুপ করে।

অবাক হ'ল অমিতাভ বকুলের নীরবতায়। জিজ্ঞেস্ করল, চুপ করে রইলেন যে?

চিন্তা করছি।

অনেকটা নিজের মনে মনেই বলল অমিতাভ, ক্ষুধার সময় খাদ্য পেলে খাব-কি-খাবনা তা' কেউ চিন্তা করে না। বাইরেও জিজ্ঞেস করল আবার, কি চিন্তা করছেন?

কালকে যদি আপনাকে বলি?

কালকে অফিস ছুটী, পরশুদিন বলবেন।

কালকে আপনার অন্য কোন এনগেজমেণ্ট নেই তো?

না, জানাল অমিতাভ।

তবে আর পরশুদিন কেন,—কালকেই। বলুন কোথায় আপনাকে পাব?

একটু আপত্তি তুলল অমিতাভ, সাধারণত ছুটীর দিনে আমি···

···না···না কালকেই। বুঝতেই তো পারেন··· আমার প্রয়োজন। একদিন না হয় বাড়ীতে বিশ্রাম না-ই নিলেন।

এতোই যদি প্রয়োজন তবে তো সঙ্গে সঙ্গেই চাকরী নিতে পারে—কথাটা জিভের ডগা পর্যন্ত এলো অমিতাভের কিন্তু বলতে পারল না। ভাবল, বাড়ীতে বাবা মা রয়েছে। তা'দের কাছে জিজ্ঞেস করা দরকার। তা' করুক। সে শুধু জিজ্ঞেস করল কোন্ দিকে থাকেন আপনি?

শ্যামবাজার।

তা হ'লে যে মোড়ে সাধনা ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে সেখানেই থাকবেন।

হাসির রেখায় একটু আলোকিত মুখ বকুলের, ক'টায়?

গোটা পাঁচেক নাগাদ।

আচ্ছা···কিন্তু···কালকে ছুটীর আনন্দে আবার ভুলে না যান, আমার কিন্তু বড় প্রয়োজন।

না-না, হেসে উঠল অমিতাভ। কথা দিলাম, ভুলব কেন। বলেই অমিতাভ মন দিল তা'র কাজে।

বকুল কিন্তু উঠতে গিয়েও উঠল না। নির্বাকভাবে যেন আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে বোঝাতে চাইল তার আরও কিছু বলার আছে। অমিতাভ তাতে সাড়া না দিতে নিজে থেকেই বকুল বলল আমার তো সবই শুনলেন! আজকের দিনটা চালিয়ে নেবার জন্যে যদি কিছু···

পকেট থেকে ব্যাগ বের করল অমিতাভ। পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে বকুলের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নিন।

খুব খুশী বকুল। লোলুপতার হাতখানা। টাকা পাঁচটা নিতে নিতে অমিতাভকে জানাল ধন্যবাদ। বলল আরও, এমন করে টাকা নিতে যে কি লজ্জা!

পরের দিন। বকুল দাঁড়িয়েছিল ঠিক জায়গামত। দেরী হল অমিতাভের। তবুও অমিতাভকে দেখে এক-

মুখ হাসি হেসে বলল, আপনার দেরী দেখে' ভেবেছিলাম হয়তো আসবেন না।

তা' কি করে হয়। আগেই তো বলেছি, কথা দিলে কথা রাখি। কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার পথ। পথে একটা একসিডেন্ট হ'য়েছে। সব জাম। তাতেই দেরী হয়ে গেল।

অমনই একটা আমিও ভেবেছিলাম। যাক্ গে'। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা ভালো লাগে না। কি বলেন ?

কোথায় যাবো ?

রেষ্টুরেণ্টে আপনি যান কি-না জানি না। তারচেয়ে একটু হেঁটে চলুন দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে বসি।

কথা বলতে বলতে ওরা গিয়ে পৌছাল পার্কে। একখানা বেঞ্চ তখনও খালি ছিল। তা' দেখেই বকুল বলে উঠল, একটু তাড়াতাড়ি পা ফেলুন, ঐ যে খালি বেঞ্চ।

অমিতাভ শুধু একবার তাকাল বকুলের মুখের দিকে, পা' অবশ্য বকুলের সংগেই ফেলল তাড়াতাড়ি।

বিকেল। রোদ পড়ে গেছে। বাতাস বইছিল ঝির-ঝির করে। সূর্যের বিদায়ী মুখে বারে বারে পড়ছিল মেঘের ছায়া। ফাঁকে ফাঁকে লালরশ্মি পড়ছিল চারদিকে। সে আলোতেই অপূর্ব দেখছিল বকুলকে। তা' ছাড়া সেদিন তাকে সুন্দরতর দেখাবার চেষ্টাতেও ত্রুটী করেনি সে। খুব সুন্দর শাড়ীখানা গায়ের রংয়ে মিশে গিয়েছিল। নূতন রকমের ব্লাউজ। নূতন ছাঁদে কবরী বাঁধা। আলতো করে কাজলটানা চোখ। চোখের তাকানও স্বপ্নমাখা! নির্বাক ইসারা!

যে বেঞ্চে ওরা বসেছিল তার পেছনের পটভূমিকাটিও সুন্দর। লোহার জালে লতার বেড়া। লতার রাজত্ব। সবুজ পাতার মিছিল। নীচে শ্যাম শ্যামলিমা। বর্ষাকাল। সজলধারায় স্নান করে লতাগুলো লতিয়ে উঠেছিল মনের আনন্দে। কচি কচি ডগা বাতাসের আদরে হেলেদুলে পড়ছিল এ-ওর গায়ে। কেউ কেউ আবার তাকিয়ে রয়েছিল নীচের দিকে।

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে এলেও পার্কে বসে ওরা দু'জনেই হ'য়ে রইল চুপ। অমিতাভ তাকিয়েছিল আকাশের দিকে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল বকুলের দিকেও। ভাবছিল বকুলের সম্বন্ধেই। মেয়েটা ভিখারিণী! অভাবকেই বড় ক'রে দেখে বেরিয়েছে পথে! কতখানি সাহস! দুঃসাহস!

কিন্তু সন্ধ্যা সাতটায় আবার অন্য কাজ রয়েছে অমিতাভের। চুপ করে থেকে সময়কে বৃথা যেতে দিতে আর ইচ্ছা করল না তা'র। ঘড়ির দিকে একবার চোখ ফেলে বল্ল, কি ঠিক করেছেন।

এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি।

সে কি! আপনার অভাব। চাকরীর চেষ্টা করেও এতদিন পাননি, সে অবস্থায় চাকরী পেয়েও তা নিতে…

একটু ম্লানহাসি হাসল বকুল। জানাল, খুব বেশী অভাব বলেই চাকরী নেব-কি-নেব না তা' ঠিক করতে পারছি না। একটা সমস্যায় পড়ে গেছি আমি।

আশ্চর্যরকম কথা বলছেন আপনি!

শুনতে তাই লাগে বটে কিন্তু অভাবে পড়েছি বলেই অনেক অভিজ্ঞতায় এমন কথা বলছি।

বিস্মিত অমিতাভ, কেমন ?

কতো আর আপনি আমাকে মাইনে দেবেন। একে তো আমি নূতন! যা' দেবেন তাতে আমার প্রয়োজন মিটবে না।

চোখের দৃষ্টিতে দূরবীণ আনতে চেষ্টা করল অমিতাভ। বকুলকে দেখতে চাইল তা'র অন্তর পর্যন্ত। ভাবল, ওর জন্যই গতকাল থেকে কতো চিন্তা ক'রেছে সে। ভেবেছে, ওকে সাহায্য করে যদি ওদের পরিবারকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু বকুলের কথা শুনে তা'র মন যেন কেমন হ'য়ে গেল! উঠল বিরক্ত হ'য়ে। সুরেও একটু রাগের ছোঁয়া নিয়ে বল্ল, কম হ'ক বেশী হ'ক তবুও মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট টাকা আপনি পেতেন। নিশ্চিত সে-টাকা ছেড়ে অনিশ্চিতের পেছনে চলতে চাইছেন! আপনার এ হিসেব সত্যিই আমি বুঝতে পারি না।

এই অনিশ্চিতের মাঝেই তো কাটাচ্ছি।

অমিতাভের চোখে চাপা আগুন—কা-টা-চ্ছে-ন! কিন্তু কা'র কতো আছে যে আপনাকে রোজ রোজ দয়া করবে ?

মনোহারী একটি তাকান তাকিয়ে বকুল বলল, সহরে কতো লোক…

কিন্তু আপনার তো রুচিতে বাধা উচিত। আমার চেয়েও অনেকের কুরুচির পরিচয় পাই বলে বাধছে না।

আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল অমিতাভের মাথায়। চুপ করে রইল সে। গর্জে উঠল মনে মনে। কিন্তু কা'র ওপর সে গর্জন? বকুলের ওপর না সে-জঘন্য রুচি লোকগুলোর ওপর?

ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছোঁয় ছোঁয়। আর দেরী করার সময় নেই অমিতাভের। বকুলের সম্বন্ধে যা' বোঝার তা' বুঝে নিয়েছে সে। তবুও আবার জিজ্ঞেস করল, তা' হ'লে আপনি চাকরী না নিয়ে এমন ভিখারী-রাণী হ'য়েই থাকতে চান? চমৎকার! পোষাকের বিন্যাস! রিষ্ট ওয়াচ, সোনার রুলি।

হেসে উঠল বকুল। দেবতার পূজায় ফুল লাগে। অনেক অভাবেও তাই এ-দুটোকে আমায় রাখতে হয়েছে। না রাখলে আপনারা···

থামুন আপনি একটু একটু করে অনেক এগিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল বুঝে। আমি আপনার সে-দেবতা নই, আমি অপদেবতা! আচ্ছা নমস্কার, বলেই উঠে দাঁড়াল অমিতাভ। চালাল পা।

গোধূলির ম্লান ছায়া নেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। আবছা আকাশের বুকে উড়ে গেল কয়েকটা পাখী। ডানা চলেছে তা'দের। তা'রা উড়ে গেল তা'দের কুলায়। বকুল কিন্তু নিশ্চল, ফুটতে পারল না সে। সেখানেই পাথরের স্তূপের মতো বসে রইল সে। ভাবতে লাগল অমিতাভের কথা; অদ্ভুত লোক। পয়সা আছে, আছে যৌবন কিন্তু নির্বিকার। তাকিয়েও তাকাল না! টাকা দিল আগের দিন। ছুটীর দিনে ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কেরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরে দিব্যি জামাই সেজে এলো দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতা—তা কি শুধু উপকার করতেই!

মনে মনে একেবার লজ্জা হ'ল বকুলের। সত্যি অদ্ভুত লোক। ব্যতিক্রম। সংগে সংগে বকুল চঞ্চল হ'য়ে উঠল আবার—একটা পয়সাও নেই হাতে। কি হবে? আবার মনের পটে ভেসে উঠল অমিতাভ। খুবই ভুল করেছে সে নিজে। এমন ধরণের লোকই বেশী ভাব-প্রবণ হয়। যাওয়ার সময় যদি মুখ ফুটে চাইত তবে নিশ্চয়ই দিয়ে যেত কিছু। মরালিষ্ট! বোকা! হয়তো ব্যাগটাই ছুঁড়ে দিত মুহূর্তে!

পার্ক থেকে বেরিয়ে আসার সময় অমিতাভ কিন্তু একবারও ফিরে তাকায়নি বকুলের দিকে। কিন্তু না তাকালেও অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়েছে! মনে মনে হাসল সে। ভাবল, কি রুচি! চাকরী করতে না চেয়ে···যাক আর ভাবতে চাইল না অমিতাভ। ঘৃণা হ'ল তার!

কিন্তু চেষ্টা করেও বকুলকে ভুলতে পারল না সে। ম্যাগাজীন উঠে যাওয়ার পর চাকরী নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সেখানেও বকুল ছুঁয়েছিল তার মনকে। তা'র ছবি লাগান ছিল তার মনের এলবামে। কখনও নীরব সন্ধ্যায়, কখনও ঝিরঝিরে হাওয়ায় খোলা বারান্দায় বসে এলবামের পাতা উল্টে সে বকুলকে দেখেছে। দেখেছে বকুলের গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে নয়—রূপে মুগ্ধ হ'য়ে নয়—শুধু কুরুচির জীবন্ত ছবি হিসেবে! অদ্ভুত মন, —মনের গতি! জীবনের কতো মধুর ছবি ভুলে গেছে সে, প্রিয়জনের মধুর সান্নিধ্যের কথা মন থেকে মুছে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু ভুলতে পারল না যা'কে চাইল না, যাকে ঘৃণা করল সেই বকুলকে।

ধর্মতলাতে ট্রাম বদল করে বাসায় চলে গেল অমিতাভ। কোন রকমে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। কি বিপদেই পড়েছিল —একেবারে সামনে, চোখাচোখি!! চাকরী করে না— তবুও কলকাতার চাকরী জগতের পুণ্যভূমি ডালহৌসির অফিস পাড়াতেই চলেছে তার চলাফেরা। অফিসের ভিড়ে স্রোতের মতো আসে আবার অফিস-ভাঙ্গার ভিড়ে ভাঁটার টানে যায় ফিরে। এই জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানে কিছু পলিমাটী,—ওর আসা যাওয়ার মাঝখানে কিছু আয়। চাকুরে! লোকেও নিশ্চয়ই মনে করে, কোন অফিসের লেডি-টাইপিষ্ট, নয়তো টেলিফোন অপারেটার, নয়তো কেরাণী। ভাবতে ভাবতে হাসি এলো অমিতাভের। কিন্তু সে তো তা' মনে করতে পারে না। সে যে তা'কে চিনেছে। চিনেছে বলেই দিনে দিনে সব কিছুর পরিবর্তনের মাঝেও বকুলের যে পরিবর্তন হয়নি একটুও সেটুকুও বুঝতে পেরেছে সে।

জাতকের উপকরণ

শ্রীজয়দেব রায়

জাতকের কাহিনীগুলি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি ও অনুশাসন প্রচারের জন্যই রচিত হয়। সেগুলির সাহিত্যিক, ধর্মগত ও নৈতিক উপযোগিতা ছাড়া অন্য মূল্যও আছে। সুখপাঠ্য গল্প ও গাথার ছলে সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জাতক-কথাগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ এইগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

জাতকের পটভূমিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাহাতে সাধারণ মানুষেরই জীবনযাত্রা, ঘর-সংসার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি গল্পগুলিতে রূপ লাভ করিয়াছে। গল্পগুলিতে বলা হইয়াছে, ভগবান বুদ্ধ বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছেন—প্রত্যেক জন্মে কোন একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ দেখাইতেছেন।

কেবল মানব জন্মই নয়, পশুরূপে, পাখীরূপে আরও কতরূপেই তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। ইতর জীব হইয়াও তিনি সৎকর্ম ও সদাচারের দ্বারা ধর্মনীতির নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। প্রত্যেক গল্পেই দেখা যায়—তিনি যে কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, নানা-জনের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, বহুবিধ বাধা বিঘ্নের অবসানে সেই কর্মে, সেই ব্রতে সিদ্ধকাম হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল আদর্শ-জীবনের কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বজন বন্ধু, প্রতিবেশীদের জীবনালেখ্য ও মনস্তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এমন অনেক গল্প আছে, যেগুলি নিছক গল্পই—তাহাতে বোধিসত্ত্ব একটি চরিত্র মাত্র।

জাতকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তৎকালীন সমাজ ও পরিবারের নানা ঘটনাবলী হইতে। তাহা ছাড়া তখনকার বহুল প্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত প্রচলিত কাহিনীগুলি জাতকে নবরূপ পাইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্রম্, প্রভৃতির বহু গল্পই ভগবান বুদ্ধের জীবনে আরোপিত হইয়াছে। জাতক কথার জনসমাদর এই রূপান্তর হইতেই অনুমান করা যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি কালিদাস যে কাহিনী অবলম্বনে তাঁহার অমর নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' রচনা করিয়াছিলেন, সেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার গল্প আছে মূল মহাভারতের আদিপর্বে। বৌদ্ধ জাতকের 'কট্‌ঠহারি-জাতক' কাহিনীতে সে গল্পটি রূপায়িত হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনীর হুবহু অনুসরণ অবশ্য জাতকে করা হয় নাই; 'কট্‌ঠহারি-জাতক' এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল—

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার বনে মৃগয়া করিতে গিয়া এক অপরিচিতা রমণীকে গোপনে বিবাহ করেন। রমণী গর্ভবতী হইলে তিনি তাহাকে একটি অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্বয়ং রমণীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

বালক তাঁহার পিতৃপরিচয় জানিতেন না। সত্যকাম জাবালির কাহিনীর ন্যায় বোধিসত্ত্ব লাঞ্ছিত হইলে রমণী তাঁহার সত্য পরিচয় দান করিয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন।

রমণী অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করা সত্ত্বেও লোকলজ্জার ভয়ে রাজা তাহাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। রমণী তখন সত্যক্রিয়া করিলেন—শিশুটিকে ঊর্ধ্বে বেগে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

—"এ যদি আপনার সন্তান না হয়, তবে এর পতনের ফলে মৃত্যু হোক্।"

বালক আকাশে উঠিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"রাজা, আমি আপনারই পুত্র, আমাকে সর্বজন সমক্ষে

পুত্রবলে স্বীকার ক'রে আমার ও আমার মাতার মর্যাদা রাখুন।"

ব্রহ্মদত্ত বিস্মিত এবং সে সঙ্গে আন্তরিক লজ্জিত হইয়া পুত্রকে কোলে লইলেন এবং সেই সঙ্গে রমণীকের রাণীর মর্যাদা দান করিলেন।

মূল দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর ন্যায় জাতকে নাটকীয়তা নাই। তবে উভয় কাহিনীর সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয় গল্পেই বর্ণিত রাজার মৃগয়া, অপরিচিতা কন্যার সঙ্গে পরিচয়, গান্ধর্ব বিবাহ, অঙ্গুরীয় দান, রাজসভায় প্রত্যাখ্যান, শেষে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন লক্ষণীয়।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার শাপ এবং তাহার ফলে রাজার স্মৃতিভ্রংশ ও অঙ্গুরীয়কের রোহিত মৎস্যের উদরে বাস প্রভৃতি যে ভাবে নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অনুসৃতি জাতকে নাই। রাজসভায় রমণীর পরীক্ষাদান রামায়ণের সীতার অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। কবি কালিদাসের আগেই হয়ত জাতকটির সৃষ্টি হইয়াছিল।

মূল রামায়ণের কোন কোন কাহিনীও জাতকে রূপান্তরিত হয়। 'দশরথ জাতক' কাহিনী রামায়ণের রাম-সীতার কাহিনীরই অভিনব রূপ। জাতক রচকরা সেকালের সকল গল্পকেই আপনাদের মনোমত করিয়া বোধিসত্ত্বের কল্পিত গত জীবনে আরোপ করিয়াছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

বারাণসীতে দশরথ নামক এক রাজার পাটরাণীর গর্ভে রাম ও লক্ষ্মণ নামক দুইটি পুত্র ও সীতা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। পাটরাণীর মৃত্যুর পর দশরথ বৃদ্ধ বয়সে আর একটি পরমাসুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িলেন। সেই রাণীর গর্ভে রাজার ভরত নামে এক পুত্র জন্মিল।

দশরথ রাণীর অনুরোধে সপত্নীসন্তান রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে যৌবরাজ্য দিলেন। রাম লক্ষ্মণ বনে গেলেন। ভরত পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। দশরথ রামকে দ্বাদশ বৎসর পরে রাজ্যে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, তখনও কাল পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি ভরতকে তখন ফিরাইয়া দিলেন। ভরতও তাঁহার পাদুকা দুইটি সিংহাসনে রাখিয়া রামের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তারপর যথাসময়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাস হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে ভরত তাঁহার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন।

মূল রামায়ণের কেন্দ্রীয় ঘটনা সীতাহরণ ও রাবণবধকে জাতক কথা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, জাতকে সীতা রামের সহোদরা, সহধর্মিণী নন! রামের নাম জাতকে রামপণ্ডিত, রামচন্দ্রও নয়। রামায়ণের পিতৃ আজ্ঞা রক্ষার জন্য রামের বনগমন ও ভরতের ঐকান্তিক ভ্রাতৃবৎসলতাই জাতককারককে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। 'দশরথ-জাতক' উক্ত দুইটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত।

রামায়ণ মহাভারতের বহু উপাখ্যানই এইভাবে জাতকে রূপান্তরিত হইয়াছে। শিবি ও উশীনরের গল্প, অণি-মাণ্ডব্যের উপাখ্যান প্রভৃতি সে প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের একটি গল্পে আছে যে মাণ্ডব্য নামে এক ঋষিকে চোর অপবাদে শূলে দেওয়া হয়, এই গল্পটি 'কণহদীপায়ন জাতকে' গৃহীত হইয়াছে।

মাণ্ডব্য ও দ্বৈপায়ন দুই ঋষি ছিলেন। একবার মাণ্ডব্য শ্মশানের প্রান্তে বাস করিতে ছিলেন, সে সময় পশ্চাদ্ ধাবিত এক চোর চুরির জিনিস তাঁহার কুটীরে ফেলিয়া পলাইল। নগররক্ষীরা মাণ্ডব্যকেই চোর বলিয়া রাজসমীপে লইয়া গেলে রাজা তাঁহার শূলদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু শূলবিদ্ধ হইয়াও তাঁহার মৃত্যু হইল না, তিনি যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বৈপায়ন খোঁজ করিতে আসিয়া তাঁহার দুরবস্থা দেখিলেন। প্রশ্ন করিলে জাতিস্মর মাণ্ডব্য তাঁহার পূর্ব-জন্মের এক দুষ্কৃতির কথা বিবৃত করিলেন—তিনি খেলার ছলে একটি মাছিকে ঠিক অনুরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, সেই পাপে এ জন্মে তাঁহাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে।

ভাগবতের মূলকাহিনীও জাতকে 'ঘটজাতক' নামক আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই জাতকে সহোদর ভ্রাতা। কংস তাঁহার ভগিনী দেবগর্ভার গর্ভজাত সন্তানের হস্তে প্রাণ হারাইবেন জানিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরে কংস বাধ্য হইয়া দেবগর্ভার সঙ্গে

উপসাগর নামক রাজকুমারের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদের পুত্রসন্তান জন্মিবা মাত্র দেবগর্ভা নন্দগোপা নামিকা একটি নারীর রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদের প্রেরণ করিতেন। দশটি পুত্রের মধ্যে বাসুদেব হইলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং নবম পুত্রের নাম হইল ঘটপণ্ডিত।

ঘটপণ্ডিতের সহায়তায় ক্রমে ক্রমে বাসুদেব কংসকে বধ করিয়া সারা পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিলেন, তারপর অমিত পরাক্রমে রাজত্ব করিয়া জরা নামক এক ব্যাধের হাতে পরিণত বয়সে প্রাণ হারাইলেন। তারপূর্বেই নিজেদের পাপে তাঁহার বংশ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল।

ভাগবতের পূরাপূরি কাহিনীর চুম্বক এই জাতকে আছে। তবে বহু স্থলেই উল্লেখ যোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধজাতকের ঘট পণ্ডিত একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ভাগবতে তাঁহার অনুরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই। কংস এখানে অত্যাচারী রাজা মোটেই নহেন, পরন্তু বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতারাই দুর্জন বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জাতকে বলদেব বাসুদেবের অগ্রজ ন'ন, অনুজ; বৌদ্ধজাতকে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অভিশাপেই যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে, মহাভারতে দুর্বাসার অভিশাপে। জাতকের বাসুদেব তাঁহার সহোদর ভ্রাতাদের সাহায্যে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, মহাভারত ও ভাগবতের ন্যায় কেবলমাত্র নিজের বিক্রমেই নয়।

কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্পই জাতক কথায় রূপ ধরিয়াছে। অনুমান করা যায় বৌদ্ধজাতকের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের বহু গল্প দূর দূর দেশে এক-কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশ বিদেশের সঙ্গে যখন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, বণিক, ব্যবসায়ীরা মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অন্য বহু বস্তুই বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ছিল এ দেশের অক্ষয় গল্প ভাণ্ডার।

পশুপাখীর জবানীতে কথা বসাইয়া হিতোপদেশ দেওয়ার প্রথা সুপ্রাচীন; বিদেশী সাহিত্য আরব্য রজনী ও ঈশপের গল্পের মত। জাতকেও তাহার অনুবর্তন হইয়াছে।

ঈশপের 'The tortoise and the eagle' ও পঞ্চতন্ত্রের 'হংস ও কূর্মের গল্পের অভিনব রূপ 'কচ্ছপ-জাতকে' দেখা যায়। এক কচ্ছপের সঙ্গে দুইটি হংসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। কচ্ছপের আকাশে উড়িবার সখ হইলে একটি দণ্ডের সাহায্যে তাহাকে লইয়া হংস যুগল ঊর্ধ্ব আকাশে উড়িল, পথে বাচালতার দোষে নীচে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়।

'জবসকুণ জাতকে'র গল্প এবং ঈশপের The wolf and the crane গল্পের অভিন্নতা লক্ষণীয়। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে ঈশপের গল্পই এদেশে আসিয়া জাতক কাহিনীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। উক্ত জাতকের গল্পটি এই: বোধিসত্ত্ব এক কালে হিমালয় প্রদেশে কাষ্ঠকুট্ট (কাঠঠোকরা) পাখী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন সেই বনের এক সিংহের মাংস ভক্ষণ কালে গলায় হাড় ফুটিয়া যায়। সিংহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তীব্র চীৎকার করিতে লাগিল। কাষ্ঠকুট্ট তাহাতে ব্যথিত হইয়া তাহার বন্ধুত্ব কামনা করিয়া নিজের লম্বা ঠোঁট তাহার মুখে প্রবেশ করাইয়া হাড়টি সযত্নে বাহির করিয়া দেয়। সুস্থ হইয়া সিংহ একটি শিকার করিয়া মাংস খাইতেছিল, কাষ্ঠকুট্ট তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আহারের সামান্য ভাগ প্রার্থনা করিল। তাহাতে সিংহ গর্জন করিয়া বলিল "তুই পশুরাজের কণ্ঠে তোর ঠোঁট ঢুকিয়েও বেঁচে আছিস্ এই তোর ভাগ্যি, আবার কোন মুখে পুরস্কার চাস্?"

এই ভাবে জাতক নানা সূত্র হইতে গল্পের কাহিনী আহরণ করিয়াছিল।
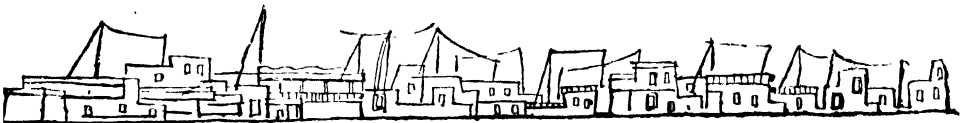
বিশ বছর পরে

রচনা-ও, হেনরী

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

টহলদার পুলিশের লোকটা গম্ভীর ভাবে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে চওড়া রাস্তাটা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। পাঁচজনকে দেখাবার জন্যেই যে গম্ভীর হয়ে পথ চলছে তা নয়। কারণ তখন পথ দিয়ে খুব কম লোকই চলাফেরা করছিল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, রাত প্রায় দশটা। বৃষ্টি-ভেজা দমকা হাওয়া বইছে, পথ ঘাট জনশূন্য।

হাতের লাঠিটা নানারকম কায়দায় ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলে লোকটা, প্রতিটি দরজা লক্ষ্য করে এগোতে থাকে। এটা ব্যবসার জায়গা, তাই বেশির ভাগ বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে পানবিড়ি ও সিগারেটের দোকানে আলো জলতে দেখা যায়।

বড় বাড়িটার কাছে এসে লোকটা ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে। লোহা লক্কড়ের দোকানের প্রবেশ পথে অন্ধকারের মধ্যে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, মুখের চুরুটটা তখনও ধরায়নি। পুলিশের লোকটা ওর কাছে এগিয়ে যেতেই ও বলে ওঠে "এই যে আসুন! কুড়ি বছর আগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি আমার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি। মজার কথা মনে হ'চ্ছে, তাই না? বেশ আপনি যদি শুনতে চান আমি সব কথাই বলব, খুব সাদাসিধে ঘটনা। এই যে বাড়ীটা দেখছেন, কুড়ি বছর আগে এখানে একটা রেষ্টুরেণ্ট ছিলো—নাম, বীগ্ জো ব্রাডিস্।"

'পাঁচ বছর হ'লো বাড়ীটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।" পুলিশের লোকটা বলে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা চুরুট ধরায়। ঐ আলোতে দেখা যায়-লোকটার ফ্যাকাসে রঙ, হাড় বের করা চোয়াল, ধূর্ত চাহনি চোখের। আরও দেখা যায় ডান চোখের ভ্রূর ওপর ছোট একটা সাদা দাগ। গলাবন্ধের বড় হীরের পিন্‌টা বেখাপ্পা ভাবে আঁটা।

লোকটা বলতে সুরু করে "ঠিক কুড়ি বছর আগে আমি এবং জিমী এখানে এক সঙ্গে বসে খাই। জিমী আমার প্রাণের বন্ধু। এই নিউইয়র্কে আমরা দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হই, যেন দু'টী ভাই। তখন আমার বয়স আঠারো, জিমীর কুড়ি। পরেরদিন সকালে আমি পশ্চিমে যাত্রা করব—ভাগ্যের সন্ধানে। জিমীকে কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে কিছুতেই টেনে বার করা যাবে না। পৃথিবীর মধ্যে ও কেবল নিউইয়র্কটাই জানে। আমরা পরস্পর প্রতিশ্রুত হই—প্রতিশ্রুত হই যে, যে অবস্থায় এবং যত দূরেই থাকিনা কেন, ঠিক কুড়ি বছর পরে ঐদিন এবং ঐ সময়ে আমরা দু'জনে আবার এই জায়গায় এসে মিলব। বিশ্বাস ছিল যে, কুড়ি বছরের মধ্যে আমরা যা-হোক কিছু একটা করতে পারব এবং ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন হবে।"

পুলিশের লোকটা বলে খুব মজার ব্যাপার তো! অনেক বছর পরে আবার দু'জনের দেখা। ছাড়াছাড়ির পর আপনার বন্ধুর কাছ থেকে কোন খবর পান নি?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি। কিছু'দিন ধরে আমাদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান চলে। একবছর কী দু'বছর পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়। এর পর আর আমরা কোন খোঁজ খবর রাখি না। পশ্চিম অঞ্চলটা নানারকম সমস্যায়

ভরা। তাই সেখানে আমায় যথেষ্ট দৌড়ঝাপ করতে হয়েছে। আমি মনে করি, বেঁচে থাকলে জিমী নিশ্চয় আসবে। কথার খেলাপ্ সে করবে না। কিছুতেই ভুলবেনা সে প্রতিশ্রুতির কথা। হাজার মাইল দুর থেকে এসে রাত্রি বেলায় এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আমার সার্থক হবে যদি জিমী আসে।

একটা সুন্দর ঘড়ি বার করে লোকটা দেখে—ঢাকনার ওপর হীরে বসান ঘড়িটার। "দশটা বাজতে এখনো তিন মিনিট দেরী আছে। ঠিক দশটার সময় আমরা এই দরজা থেকে বিদায় নি।"

"পশ্চিমে গিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছেন, তাই না?" পুলিশের লোকটা জিজ্ঞেস করে।

"তা কামিয়েছি। আমার মনে হয় জিমীও মন্দ কামায় নি। জিমী বড় ভালোমানুষ, কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো করতে চায় না। ওদের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাতে হ'য়েছে। নিউইয়র্কে নিশ্চিত মনে দিন কাটানো চলে, কিন্তু ওখানে বেশ সতর্ক হয়ে চলতে হয়।"

পুলিশের লোকটা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে "আমি চললাম, আশা করি আপনার বন্ধু যথাসময়ে এসে পড়বেন। কাঁটায় কাঁটায় দশটা পর্যন্ত কী আপনি বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন?"

লোকটা উত্তর করে "না, অন্ততঃ আরো আধঘন্টা তাকে সময় দেব। বেঁচে থাকলে সাড়ে দশটার মধ্যে সে নিশ্চয় এসে পড়বে।"

নমস্কার জানিয়ে পুলিশের লোকটা নিজের পথে চলে যায়।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। দমকা হাওয়ার বদলে এখন জোরে জোরে হাওয়া বইছে। গায়ের কোটের "কলার"টা ওপর দিকে তুলে দিয়ে এবং হাত দু'টো পকেটে পুরে দু'একজন লোক নিঃশব্দে ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত চলাফেরা করছে। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটা কথা রাখবার জন্যে হাজার মাইল দূর থেকে এসে লোকটা লোহা-লক্কড়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে চুরুট টানছে, বন্ধুর পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা।

কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করবার পর রাস্তার ওদিকের ফুটপাথ থেকে একটা লম্বা গোছের লোক—গায়ের লম্বা ওভারকোটের কলারটা কান পর্যন্ত তোলা—তাড়াতাড়ি এ ফুটপাথে চলে আসে। যে লোকটা বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছে সোজা চলে আসে তার কাছে।

"তুমিই কী বব্?" ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করে।

"তুমিই কী জিমি ওয়েলস্?" দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জানতে চায়।

নবাগত লোকটা বন্ধুর হাত দু'টো নিজের হাতের মধ্যে ধরে বলে "কী সৌভাগ্য আমার! বব্ তুমি! আমি জানতাম যে, বেঁচে থাকলে তুমি নিশ্চয় এখানে আসবে। বেশ, বেশ,…কুড়ি বছর একটা যুগ। পুরোন রেষ্টুরেন্টটা নেই, ওটা যদি থাকতো তাহ'লে আমরা ওটাতে ঢুকে আবার খেতাম। ওহে বন্ধু, পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করলে?"

"তুমি অনেক বদলে গেছ জিমি। মাথায় যে দু'তিন ইঞ্চি বেড়ে যাবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি।"

"ঠিক তাই। কুড়ি বছর বয়সের পর থেকেই আমি কিছুটা মাথায় বেড়ে যাই।"

'জিমি, তুমি নিউইয়র্কে বেশ ভালোই আছ, না?"

"মন্দের ভালো। সহরের একটা দপ্তরে চাকরি করি। বব্ চলো, আমার একটা জানা জায়গা তোমায় দেখিয়ে আনি। যেতে যেতে পুরোন দিনের কথাবার্তা হবে।"

হাত ধরাধরি করে ওরা দুজনে চলতে আরম্ভ করে। পশ্চিম থেকে ফিরে আসা লোকটা তার ইতিহাস বলতে আরম্ভ করে—সৌভাগ্যের অহংকারে যেন ফেটে পড়ছে। অপর লোকটা মন দিয়ে ওর কথা শোনে।

রাস্তার মোড়ে ওষুধের দোকানে আলো জ্বলছে। ঐ আলোর কাছে এসে ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

পশ্চিম অঞ্চল থেকে ফিরে আসা লোকটা হঠাৎ থেমে পড়ে, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। রুক্ষস্বরে বলে ওঠে "আপনি জিমি নন! সত্যি কথা কুড়ি বছর অনেকটা সময়, কিন্তু এমন কিছু বেশী সময় নয় যে যার মধ্যে একজনের খাঁড়া নাক চ্যাপ্টা হয়ে পড়বে।"

লম্বা লোকটা উত্তর করে "সময় সময় কুড়ি বছরের মধ্যেই একটা লোক বেমালুম বদলে যেতে পারে, সৎ লোকও অসৎ হয়ে ওঠে। ওহে বব্, দশ মিনিট আগেই তুমি

গ্রেপ্তার হ'য়েছ। চিকাগোর পুলিশ মনে করে যে, তুমি আমাদের পথে এসে পড়তে পার এবং "তার" করে জানায় যে ওরা তোমার সঙ্গে একটু খোস গল্প করতে চায়। চুপ-চাপ শান্ত ছেলের মত যেতে চাও কী? আমার মনে হয় মুখ বুজে যাওয়াই শ্রেয়। হ্যাঁ দেখ ওয়েলস্ তোমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। ষ্টেশনে যাবার আগে জানলার কাছে এসে চিঠিটা পড়তে পার।"

পশ্চিম অঞ্চল থেকে ফিরে আসা লোকটা কাগজটা খুলে পড়তে আরম্ভ করে। হাত দু'টো থরথর করে কাঁপছে।

বব,

পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী আমি যথা সময়ে যথাস্থানে হাজির হ'য়েছিলাম। চুরুট ধরাবার সময় তুমি যখন দেশলাই কাঠি জাল তখন সেই আলোতে দেখলাম যে, চিকাগোর পুলিশ যে লোকটাকে খুঁজছে, তুমিই সেই লোক। যা হোক আমি নিজে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি, তাই ওখান থেকে চলে এসে তোমাকে ধরবার জন্যে সাধারণ পোষাক-পরা এই লোকটাকে পাঠিয়ে দিলাম।……

জিমি।

নদী

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ঝিরঝিরে হাওয়া—উজান ঠেলেই
একটি অবাক নদী
হেঁটে হেঁটে যায় দূর বনপথ
হাতছানি দেয় যদি।
আঁচলে জড়িয়ে বালির চুমকি
কপালে সোনার টিপ
দু'পায়ে ঘুঙুর—হঠাৎ জ্বালে কি
অধরে সন্ধ্যাদীপ?
সলাজ নয়ন, একটু দাঁড়ায়
একটু আকাশ খোঁজে
ঝিরঝিরে হাওয়া পালটিয়ে পাখা
যেন সমস্ত বোঝে।
নদী হেঁটে যায় কামরাঙ-মুখ
জলের ভেতর নড়ে
হঠাৎ একটি মেয়েকে আমার
আচমকা মনে পড়ে।

জাগরণ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

ভিসুবিয়স আর ফুজিয়ামার
আগুন দেখি কোটর চোখে।
রুদ্ধ রোষের উদ্গীরণে বিচ্ছুরিত
লাভা স্রোত দিকে দিকে॥
ফ্যাকাশে মুখেও এল আজ ঐ
রক্ত জোয়ার ক্ষোভের জ্বালায়।
পুঞ্জিত ক্ষোভ বিস্ফোরণে
লুঠের ঘরের ভিত কাঁপায়॥
কুবের তনয় শঙ্কায় কেঁপে
অর্গল দেয় শোষণ কারার।
ক্ষেতে ও খামারে কলে কারখানায়
কঠিন শপথ আগল ভাঙার॥
নূতন প্রাণের দীপ্ত পরশে
উদ্যত বাহু শিকল ছেঁড়ার।
ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোল
দিন শেষ আজ বেঁচে মরার॥
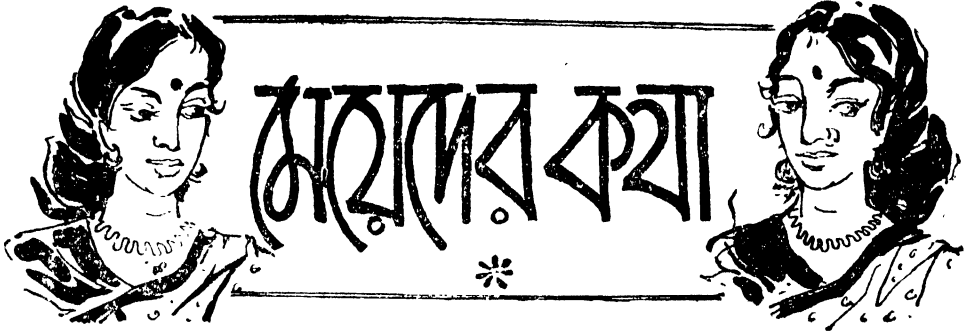
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

পূর্বপ্রকাশিতের পর

বাপ মা মরা-অনাথা বিন্দু ব'লে মেয়েটি আশ্রয় নিয়েছে তার বড় বোনের বাড়ীতে। প্রথম থেকেই বিন্দু ভালোবেসেছে মেজ বৌকে। আপদ বিদায় করবার জন্য বিন্দুকে বিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বিয়ের রাতেই বিন্দু বুঝতে পারল তার বর পাগল।

বিন্দু যখন সেই পাগলের সংগে একা একা রাত কাটাতে ভয় পেল, তখন তার শাশুড়ী সেটাকে একটা অপরাধ ব'লে মনে করল। সে বল্ল কত লোকের কত দোষ থাকে, তার ছেলের একটু মাথা খারাপ বৈতো নয়। পাগল স্বামীর ভয়ে বিন্দু যখন পালিয়ে এল মেজবৌ-এর আশ্রয়ে, তখন সকলে বিন্দুকেই দোষী করল। বিন্দুর দিদি নিজের ছোট বোনকে যে ভালোবাসত না তা নয়, কিন্তু নিজের বোনকে আশ্রয় দেবার কোন দাবী যে তার আছে, একথা সে মনে করত না। তাই তাকে নিয়ে সর্বদাই সে ভয়ে সসংকোচে থাকত। তার পক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে কোন কথা বলবার সাহস তার ছিল না। তাই সে গোপনে চোখের জল ফেলত। আমাদের সমাজে মেয়েরা যেন কোন কিছুতে তাদের দাবী আছে বলে মনেই করতে পারে না। সমাজের লাঞ্ছনা তাদের এমনি অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে যে তারা এর অন্যথা কল্পনাই করতে পারে না। চিরদিন ধরে সমাজের অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে করে আমাদের মেয়েরা তার প্রতিবাদের কথা আর ভাবতেও পারে না। যখন প্রাণে বাজে, তখন সে গোপনে চোখের জল ফেলে, কিন্তু প্রকাশ্যে বিদ্রোহ জানায় না, প্রতীকারের দাবী করে না। কিন্তু দৈবাৎ যে মেয়ে অসামান্য বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে, সে সমাজের এই সমস্ত বিধান বিধাতার বিধান ব'লে মেনে নিতে পারে না। সে প্রতিবাদ করে। প্রতীকারের চেষ্টা করে। এমন মেয়েকে পুরুষ মানুষও একটুখানি ভয় ক'রে চলে। তাই মেজবৌ বিন্দুর প্রতি সমাজের অত্যাচারের প্রতীকার করতে চায়, বিন্দুকে সমাজের অত্যাচার থেকে সে বাঁচাতে চায়। কিন্তু এই নিয়ে মেজবৌ-এর দুর্ভাবনা দেখে, বিন্দু তাকে মুক্তি দিয়ে যায়। সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। মেয়েদের এমনি আত্মহত্যার কাহিনী আমাদের দেশে সুপ্রচলিত। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষ মানুষরা বলে যে এমনি আত্মহত্যা ক'রে মরাটা মেয়েদের একটা ফ্যাসান। মেজ বৌ বলে ফ্যাসান যদি, তা হ'লে এটা কেবল মেয়েদের সাড়ীর ওপর দিয়েই হয় কেন? পুরুষের কোঁচার ওপর দিয়ে হয় না কেন? আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রতি এমন নিদারুণ অবিচার যে এখানে অবস্থা বিশেষে মেয়েদের মরণ ছাড়া আর মুক্তির কোন উপায় থাকে না। নিজের হাতে নিজের প্রাণ নষ্ট, মানুষ যে কোন অবস্থায় করে সেটা ভেবে দেখলে আর কেউ আত্মহত্যাকে একটা ফ্যাসান ব'লে ভাবতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষ

মেয়েদের আত্মহত্যার এত ঘটনা দেখেও মেয়েদের দুঃখের প্রতীকার করার বদলে উল্টো তাদেরই প্রতি দোষারোপ করে।

এমনি সমাজের মধ্যে কোন বুদ্ধিমতী মেয়ের থাকা কষ্টকর। তার নিজের বিশেষ কোন অসুবিধা যদি নাও ঘটে—তবু মেয়ে জাতের হ'য়েও সে প্রতিবাদ করতে আসে। এমনি ক'রে হয়ত সে এই সমাজ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাইতেও পারে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন। আমাদের সংকীর্ণ বিধি বিধানের গণ্ডীটানা—সমাজ ত্যাগ ক'রে কোন মেয়ে উদার বিশ্বের খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতেও পারে, যেখানে মানুষে মানুষে অধিকারের কোন ভেদ নেই। যেখানে মেয়ে ও পুরুষের সম্মান সমান। তাই মেজবৌ চ'লে এসেছে পুরীর সমুদ্রতীরে। সে লিখেছে আর সে কলকাতায় ফিরে যাবে না।

বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যেই মেয়েদের প্রতি যে অপমানের ভাবনা আমাদের সমাজে রয়েছে, তা নিয়ে কবি অনেক ছোট গল্প লিখেছেন। একটি গল্পে কবি লিখেছেন ধনীর ছেলে গরীবের সুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। বাপ শিক্ষিত ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে মত দিল। কিন্তু পণের টাকার যে লোকসানটা ঘটল তার আক্রোশ গিয়ে পড়ল মেয়ের বাপের ওপরে। বরকর্তা এবং সমস্ত বর যাত্রীদের সংকল্প কী করে মেয়ের বাপকে জব্দ করা যায়। বিয়ের রাতে ঘন বর্ষায় খাওয়ানোর সমস্ত আয়োজন নষ্ট হ'ল। আর বর যাত্রীও এত বেশি গিয়েছিল যে তাদের জন্যে আর নূতন ক'রে আয়োজন করাও চলে না। সে গ্রামের গোয়ালাদের ছানা বিখ্যাত ছিল। এই বিপদ দেখে তারা এসে বলল কোন ভাবনা নেই আমরা ছানা যত লাগে এনে দেব। তখন বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে তারা ছানা পরিবেশন করতে লাগল। কিন্তু বরযাত্রীরা—সেই ছানা পিছন দিকে কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে অন্তঃপুরে মেয়েরা কাঁদতে লাগল। মেয়ে কাঁদতে লাগল। তখন বর উঠে এল বিয়ের আসর থেকে। সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম করল গোয়ালাদের পরিবেশন করতে, আর বলল যে যদি কেউ ছানা কাদায় ফেলে তো সেই ছানা যেন তার পাতে তুলে দেওয়া হয়। বাপকে সে বল—'বাবা আপনিও বসে যান, রাত অনেক হ'লো।'

বরযাত্রীদের হাতে কন্যা পক্ষের এমনি নিষ্ঠুর অপমান আমাদের সমাজে বহুদিন ধ'রে চ'লে এসেছে। কবি বলতে চেয়েছেন এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছে আমাদের সমাজে মেয়ে ও পুরুষের সম্মান সমান নয়। মেয়েরা অপমানিত। এই জন্যেই সব চেয়ে নিকটতম যে সম্পর্ক সেখানেই বরপক্ষের হাতে কন্যাপক্ষের এমনি অপমান ঘটে। আর সমাজ তা সমর্থনও করে, এবং কোন প্রতীকার করে না। মেয়েদের প্রতি অপমানের ভাবনা আমাদের সমাজের মজ্জাগত অভ্যাস।

কিন্তু কবির পৌরুষ এই দেখে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। কেউ কেউ ব'লে থাকেন—রবীন্দ্র সাহিত্যের সুর মিহি, তা অনেকটা মেয়েলি। কিন্তু তারা যে কত বড়ো ভুল করেন তা বোঝা যায় মেয়েদের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর সমবেদনায়। এই খানেই তো পুরুষের পৌরুষের সত্য পরিচয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে আমরা দেখি অপমানিতাদের পক্ষ নিয়ে কবির বিক্ষোভ, তাঁর বিদ্রোহ। যে কালে ও যে সময়ে যে সমাজে বসে কবি এই বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করেছেন সেটা কবির পৌরুষ, তাঁর পরম দুঃসাহস-কেই ঘোষণা করে। সেদিন আমাদের সমাজে ব'সে এমন দুঃসাহসিকতা করতে আর কেউ সাহস করত না। মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কে আজ যে নূতন যুগের সূচনা হয়েছে, তার প্রথম জয়ধ্বজা তুলে ধরেছেন পুরুষকবি রবীন্দ্রনাথ। কবির গানের সুর যত মিষ্টিই হ'ক না কেন, মেয়েদের পক্ষ নিয়ে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণার বাণী সমাজের কানে খুব মিঠে লাগেনি। মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কবির বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে তাঁর অনেক ছোট গল্পে।

উদ্ধত বর এবং বিশেষ ক'রে বরকর্তা মেয়ে পক্ষের হাতে জব্দ হয়েছে, এটা ছিল কবির একটা আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। যারা নিরপরাধকে দুর্বল ব'লেই জব্দ করতে চায়, সেই নিরপরাধ দুর্বলের পক্ষ নিয়ে কবি নিজে নেমেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সাহিত্য আসরে। মেয়েদের হ'য়ে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন পুরুষের কাপুরুষতাকে, তাই বরপক্ষ জব্দ হবার গল্প আমরা পাই কবির আর একটি ছোট গল্পে।

খুব ভালো ছেলে। কনের বাজারে তার দাম খুব

চড়া। অবশেষে অনেক বাছাবাছির পরে বিয়ে যখন ঠিক হ'ল, তখন বরের অভিভাবক, তার মামা, কনের বাবাকে বললে যে বিয়ের আগে মেয়ের গয়নাগুলো নিজেদের স্যাকরা দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবে সেগুলো খাঁটি সোনা কিনা। কনের বাপ সমস্ত গয়না এনে দিলেন। সাবেক কালের ভারী সব গয়না। স্যাকরা দেখে বললে এ সমস্ত সাবেক কালের জিনিষ একেবারে খাঁটি। এমন জিনিষ আজকাল পাওয়া যাবে না। তখন মামা খুশী হ'য়ে বললেন, তাহ'লে এবার বর আসরে নিয়ে চলুন। কিন্তু কনের বাপ বললেন, এবার আপনারা খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিন্। তখন বর-যাত্রীদের খাওয়ানো সারা হ'ল। মামা যখন আবার বরকে আসরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন, তখন কনের বাপ বললেন—যারা ভাবতে পারে যে আমার মেয়ের গয়না আমি ফাঁকি দিতে পারি, তাদের ঘরে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। তখন অপমানিত বরপক্ষ রেগে আগুন।

কবির এই ধরণের গল্প থেকে বোঝা যায় কবি মেয়েদের অপমানে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছেন আর অন্যায়-কারীর প্রতি প্রতিশোধ নেবার কী দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। তিনি তাই এই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের আসরে। আমাদের সমাজে যে পণ-প্রথা রয়েছে তারও কারণ এই যে সমাজ পুরুষ ও নারীকে নিতান্তই অসমান ক'রে দেখেছে। এ অসাম্য কোন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষের জন্য নয়। পুরুষ পুরুষ ব'লেই শ্রেষ্ঠ আর মেয়ে মেয়ে ব'লেই নিকৃষ্ট। এ যুক্তি কবির মন মেনে নিতে পারে নি। মেয়েদের প্রতি সমাজের অন্যায় আচরণের ছবি কবি এঁকেছেন 'দান প্রতিদান' গল্পে। গরীব বাপ তার অতি আদরের একটি মাত্র মেয়ে নীরুর সম্বন্ধ করলেন রায়বাহাদুরের ছেলের সংগে। মেয়ের প্রতি স্নেহে অন্ধ হ'য়ে তিনি পণের টাকার হিসাব করলেন না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সমস্ত টাকাটা যোগাড় করতে পারলেন না। বর জিদ করাতে বিয়ে তো হ'য়ে গেল, কিন্তু কনের বাপের এই অপরাধ রায়বাহাদুর এবং তার গিন্নী ভুলতে পারলেন না। নীরুর বাপ যখন মেয়েকে দেখতে যেতেন, তখন তাঁর মনে হ'ত, বাড়ীর চাকররা পর্যন্ত যেন তাঁকে অপমানের চোখে দেখে। বরের বাপের তো কথাই নেই। সাধারণ ভাবে আত্মীয় আত্মীয়ের কাছে যে সম্মান প্রত্যাশা করতে পারে, অপরাধী কনের বাপকে সে সম্মান বরের বাপ দেওয়া দরকার ব'লে মনে করে না। তাকে যেন যথেচ্ছ অপমান করবার অধিকার সমাজ দিয়ে রেখেছে। এই অপরাধে নীরু বাপের বাড়ী আসার অনুমতি পেত না। কবি লিখেছেন—শাশুড়ী যে বধূকে খাওয়া-পরার কষ্ট দিতেন তা নয়। কিন্তু বধূর প্রতি এমন নির্মম উদাসীনতা দেখাতেন যে বধূ বাপের অপরাধের বোঝা নিয়ে, শ্বশুর বাড়ীতে নিজের অনধিকার প্রবেশের লজ্জায় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। তাতেও শাশুড়ী খোঁচা দিয়ে দিয়ে বললেন যে এ কোন বড়মানুষের মেয়ে যে আমাদের বাড়ীর খাবার ওর মুখে রোচে না। অবশেষে যেদিন বাপ মেয়ের কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে তাঁর ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে পণের বাকি টাকাটা নিয়ে এলেন দিতে, সেদিন নীরু তাঁকে বললে—'বাবা এ টাকা তুমি কিছুতে দিতে পাবে না। তোমার মেয়ের কি কোন মূল্য নেই, কেবল টাকার জন্যেই তার দাম।' তখন এ খবরও দাসীর মুখে রায়বাহাদুর গিন্নীর কানে গেল—এর ফলে বধূর নির্যাতন আরও বেড়ে গেল। অবশেষে যখন সে মারা গেল তখন শ্বশুর বাড়ীর ঐশ্বর্যের অনুরূপ তার সৎকার এবং শ্রাদ্ধ করা হ'ল। রায়-বাহাদুরের ছেলে যখন লিখলে স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে তখন গিন্নী লিখে পাঠালেন, তোমার দ্বিতীয় বিয়ের সম্বন্ধ করেছি, এবার দ্বিগুণ টাকা পণ আর হাতে হাতে আদায়। আমাদের সমাজে বধূর এতটুকু মূল্যও যেন নেই। তার মৃত্যুও যেন কোন গুরুতর ক্ষতি নয়।

কবি তাঁর 'বিচারক' গল্পে মেয়েদের প্রতি সমাজের অবিচারের বিচারাসনে বসে—রায় দিয়েছেন কাপুরুষেরই বিপক্ষে। তিনি কাপুরুষকেই আসামী বলে নির্দেশ করেছেন। সমাজের চোখে অপরাধিনী নারীকে তিনি গভীর সমবেদনার সংগে নির্দোষ ব'লে অভিমত দিয়েছেন। অথচ আমাদের সমাজে এই কাপুরুষরাই বিচারাসনে বসে বিচারক সেজে নিরপরাধিনী নারীকে দুর্ণাম দিয়ে তাকে নির্যাতন করে। এই গল্পে জজ মহিমচন্দ্র যে অপরাধিনী ক্ষীরোদাকে ফাঁসীর হুকুম দিয়েছে তার মধ্যে একটা রূপক আছে। জজ মহিমচন্দ্র হ'ল আমাদের কাপুরুষের সমাজ। আর ক্ষীরোদা হ'ল নির্যাতিতা নারীর প্রতিনিধি। আমাদের সমাজ নিজেরই অপরাধে নারীকে যে সাজা

দেয়, সে তার মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম দণ্ড নয়। মানুষকে সমাজের চোখে ঘৃণ্য ক'রে তোলা তার মরণের বাড়া শাস্তি। অথচ নারীর এই যে পথভ্রান্তি এর ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখতে পাব, সে কোন কাপুরুষেরই কুকীর্তি। নারী আপন প্রাণঢালা ভালবাসা নিয়ে যার জন্যে ঘর ছেড়েছিল, সেই বিশ্বাসঘাতক তাকে পথের মধ্যে ত্যাগ করেছে ব'লেই নিরুপায় নারী নর্দমার পাঁকের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। নারীর সেই প্রথম ভালোবাসা কবির চোখে পবিত্র ব'লে লেগেছে। ভালোবাসার জন্যে যে নারী তার কুলমান সব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছে এটাকে কবি নারীর প্রাণের ভালোবাসার উৎকর্ষ ব'লেই জেনেছেন। তাই এই সর্বস্ব-ত্যাগী প্রেমকে, নারীকে, কবি প্রনাম জানিয়েছেন। এদের কথা বল্‌তে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"মর্ত্যে কলংকিনী, স্বর্গে সতী শিরোমণি।" মর্ত্যের বিচারে এদের নাম কলংকিনী হ'লেও স্বর্গের বিচারে এরা সতীশ্রেষ্ঠ। পুরুষের প্রতি আত্মত্যাগী প্রেমেরই নাম যদি সতীত্ব হয় তবে এই অভাগিনীদের চেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার, ক্ষতি স্বীকার, আর কে করেছে?

'বিচারক' গল্পে কবি দেখিয়েছেন সমাজের পুরুষ বিচারক কেমন করে নিজের অপরাধের জন্যে নারীকে অপরাধিনী করে। কেমন করে আসল অপরাধী সমাজের কাছে ছাড়া পায়, আর নিরুপায় নারীর ওপরেই অপরাধের সমস্ত বোঝা গিয়ে পড়ে। কেমন ক'রে অপরিণত বয়সের একটি মাত্র অবুঝ প্রেমের অপরাধের জন্যে নারীর সমস্ত জীবন নষ্ট হ'য়ে যায়, আর কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শত শত অপরাধেও পুরুষ কোন সামাজিক সুবিধা, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। অথচ নারীর প্রেম এতই গভীর যে পুরুষের সমস্ত অপরাধকে সে ক্ষমা করে, আর তার প্রেমের স্মৃতিকে সে পূজার আসনে বসিয়ে গোপনে তারই আরতি করে। যে তার সর্বনাশ করেছে তাকেও নারী ভুলতে পারে না, এমনি গভীর তার ভালোবাসা।

কবি বর্ণনা দিয়েছেন—মোহিতমোহন এখন জজ, বয়সে প্রৌঢ়। এখন পূজা অর্চনায় তাঁর অনেক সময় কাটে, কিন্তু যৌবনে তিনি অন্য মানুষ ছিলেন। যুবতী বিধবা মেয়ে হেম যখন তাঁকে দূর থেকে দেখত, তখন তাঁকে তার দেবতার মত মনে হ'ত। এমনি করে দেবতার ছদ্মবেশে কাপুরুষ নারীকে ভুলিয়ে পথে নিয়ে এল। তখন হেম তাঁকে অনেক মিনতি করল তাকে ঘরে ফিরে রেখে আসবার জন্যে। তখনো রাত ভোর হয়নি, তার বাপ, দুটি ছোট ভাই তখনো জেগে ওঠেনি। সে পথে বেরিয়েই তার কৃতকার্যের সমগ্র ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়ে ভয় পেল। কিন্তু তখন তার সমস্ত আকুল মিনতি ব্যর্থ হ'ল। এর পরে পরিত্যক্তা নারী—নিরুপায় হ'য়ে পাপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'ল। এমনি করেই পুরুষের প্ররোচনায় আশ্রয়চ্যুতা নারী—সমাজচ্যুতা হ'য়ে পাপের পঙ্কে নামতে বাধ্য হয়। অবশেষে সেদিনের হেম যখন আজকের ক্ষীরোদাতে পরিণত হ'ল তখন একদিন আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শিশুসন্তান হত্যায় অপরাধে জজ মোহিতমোহনের কাছেই তার বিচার হ'ল। বিচারক ফাঁসীর হুকুম দিলেন। কারণ তার বিচার বড় কড়া। তার মতে, মেয়েদের এই সমস্ত পাপে কোন প্রশ্রয় দিলে, সমাজের তাতে সর্বনাশ হবে। সর্বনাশের আসল কারণ যে তিনি নিজে এবং তাঁর মত অন্য বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষেরা, পাপের সূচনা যে তাঁরই মত পুরুষদের দ্বারা ঘটে, একথা আজ আর তাঁর মনে পড়ল না। নিজের অভিজ্ঞতার জন্যে তিনি নিজের বাড়ীর মেয়েদেরও খুব কড়া শাসনে রাখতেন। অর্থাৎ শাসন এবং বিচারটা শুধু মেয়েদেরই বেলায়, পুরুষের বেলায় শাসনও নেই, বিচারও নেই।

কবি দেখিয়েছেন মোহিতের লোভী প্রকৃতি। নারী-দেহের প্রতি তার যে লোভ, সেই লোভই ফুটে ওঠে তার ভোজনের লোভে। ভোজনবিলাসী মোহিত জেল-খানার বাগান থেকে নিজে রোজ তরিতরকারী তুলে নিয়ে আসতেন। ক্ষীরোদাকে ফাঁসীর হুকুম দেবার পরদিন, তিনি যখন জেলখানার বাগানে গেলেন, তাঁর ইচ্ছে হ'ল খবর নিতে যে ক্ষীরোদার নিজের পাপের জন্যে অনুতাপ হয়েছে কিনা। মেয়ে কয়েদীদের কয়েদখানার দিকে এগিয়ে তিনি শুনতে পেলেন প্রহরীর সংগে একজন কী নিয়ে ঝগড়া লাগিয়েছে। মোহিত সেখানে যেতেই ক্ষীরোদা তাকে ব'লে উঠল,—'ওগো, জজসাহেব, ও

আমার আংটি নিয়েছে। ওকে ফিরে দিতে বলো।' ক্ষীরোদার চুলের মধ্যে একটা আংটি লুকোনো ছিল, প্রহরী সেটা দেখতে পেয়ে নিয়ে নিয়েছে। মোহিত ভাবলেন—মেয়েমানুষের এমনি গয়নার লোভ যে কাল ফাঁসী হবে জেনেও আজ আংটির জন্য ঝগড়া করছে। যখন তিনি সেই আংটি চেয়ে নিয়ে দেখলেন—তার গায়ে তাঁরই ক্ষুদ্র ফটো আর তাঁরই নাম খোদানো রয়েছে, তখন সেই পতিতা নারীর মধ্যে, তিনি সেই দিনের প্রীতিতে স্নিগ্ধ, ভক্তিতে মুগ্ধ, একখানি সুকোমল মুখের ছবি দেখতে পেলেন। মুহূর্তের মধ্যে পতিতা নারী—তাঁর চোখে দেবীর মত প্রতিভাত হ'ল।

পতিতা নারী তার সমস্ত পাপের মধ্যেও প্রথম প্রেমের সেই স্মৃতি চিহ্নটিকে সযত্নে রেখে দিয়েছে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার সেই প্রেম ভুলতে পারে নি। অযোগ্য পুরুষ, অধম পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ—সেও নারীর কাছে এমনি পূজো পেয়ে থাকে। এই প্রেম, এই পূজো রয়েছে নারীর প্রকৃতিতে। এরই সুযোগ নিয়ে অধম পুরুষ নারীকে প্রতারিত করে।

'চতুরংগ' উপন্যাসে কবি দেখিয়েছেন ননীবালা কেমন করে এমনি প্রেমের জন্যে নিজের প্রাণ দিল। ননীবালা বিধবা যুবতী, হরিমোহনের বড়ছেলে পুরন্দরের চোখে সে পড়ল। একদিন কোন কারণে বিরক্ত হ'য়ে পুরন্দর ননীকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিল। পুরন্দরের ছোট ভাই নাস্তিক শচীশ এই সমস্ত জানতে পেয়ে নিরাশ্রয় মেয়েটিকে আশ্রয় দেবার জন্য তার জেঠার কাছে এসে সব কথা জানাল। শচীশের জেঠামশাই নাস্তিক জগমোহন তখনি ননীকে নিজের বাড়ী নিয়ে এলেন। এই খবর পেয়ে পুরন্দর হিংসায় জ্বলতে লাগল। নিজের মন হিসাবে সে ভাবতে লাগল শচীশ বুঝি ননীকে নিজের ভোগের জন্য এনেছে। একদিন যখন জগমোহন বাড়ী ছিলেন না, পুরন্দর তখন দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে ননীকে গাল দিয়ে শাসাতে লাগল। এই খবর পেয়ে জগমোহন ছুটে এসে পুরন্দরকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দিলেন। তখন তিনি প্রস্তাব করলেন যে তিনি ননীকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন। তাতে শচীশ বলল যে—অন্যত্র গেলেও পুরন্দরের হাত থেকে ননীকে বাঁচানো যাবে না। ননীকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় যদি শচীশ তাকে বিয়ে করে। তখন জগমোহন শচীশকে বললেন যে তাহ'লে সে ননীর সংগে একদিন নিরালায় সব কথা আলোচনা করে নিক। সেদিন সন্ধ্যায় জগমোহন ননীকে ব'লে গেলেন যে তিনি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন, ফিরতে দেরী হবে। তাঁর উদ্দেশ্য এই যাতে নিরুদ্বেগে ননী শচীশের সংগে সমস্ত কথা আলোচনা করতে পারে। কিন্তু শচীশ গিয়ে তাঁকে খবর দিল ননী আত্মহত্যা করেছে। জগমোহন ফিরে এসে দেখেন ননী তাঁর দেওয়া শাড়ী পরে বিছানায় শুয়ে আছে, তার হাতে একখানি চিঠি। তাতে লেখা—"আমাকে ক্ষমা করবেন, তাকে যে আজও ভুলতে পারিনি।"

কবি দেখিয়েছেন নারীহৃদয়ের প্রীতি কত সুগভীর। সহস্র পাপের মধ্যে, পুরুষের শত অপরাধের মধ্যে সে কেমন ক'রে নিজের প্রাণের আলো দিয়ে প্রেমের দীপটি উজ্জ্বল ক'রে জ্বালিয়ে রাখে। অযোগ্য অধম পুরুষকেও সে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করে। প্রেমের এই শক্তি, পূজোর এই নিষ্ঠা—নারী হৃদয়ের নিজস্ব সম্পদ। বাইরের ব্যাঘাত একে নষ্ট করতে পারে না। তাই কবি সমাজের বিচারে যে নারী ভ্রষ্টা, তাকেও মমতার চোখে এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। পতিতা নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং দরদ আমরা শরৎচন্দ্রের লেখায় পাই সেই দরদের প্রথম পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের লেখায়। রবীন্দ্রনাথের মতে পুরুষ কামনা সর্বস্ব, নারী প্রণয়ে আত্মহারা। প্রেমে আত্মহারা নারী পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার আত্মসমর্পণ কামনার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে নয়। যাকে সে ভালোবাসে তাকে তার অদেয় কিছু নেই ব'লেই সে নিজেকে দান করে। কিন্তু কামনাসর্বস্ব পুরুষ তার কামনা চরিতার্থ ক'রে নারীকে দুর্গতির মধ্যে ত্যাগ করে চ'লে যায়। আপন পাপের ফল নারীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। এখানে প্রকৃতি এবং সমাজ দুই-ই তার স্বপক্ষে। এইজন্যেই এই রকম ঘটনার জন্যে কবি দায়ী করেছেন কাপুরুষকে যে এমন ক'রে প্রণয়ের প্রতিদানে নারীর সর্বনাশ করে। কবি শ্রদ্ধা করেছেন প্রণয়শালিনী আত্মসমর্পণ পরায়ণা নারীকে। তাই ননীকে দেখে জগমোহন বলছেন—ও তো নির্মল সুন্দর

ওর মধ্যে তো পাপ কোথাও স্পর্শ করেনি। কবি আত্মহারা প্রণয়ের মধ্যে পুণ্যকেই দেখেছেন, পাপ দেখেছেন বিশ্বাসঘাতকতারই মধ্যে। নারী তো পুরুষকে ত্যাগ করে না, পুরুষই তাকে ত্যাগ ক'রে যায়। এই ত্যাগ ক'রে যাওয়ার মধ্যে, এই নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই রয়েছে এই ব্যাপারের সমস্ত পাপ। প্রেমের আত্মদানের মধ্যে পাপ কোথায়? তথাকথিত ভ্রষ্টা নারীর এই আত্মদানপরায়ণ-প্রেম কবিকে শ্রদ্ধায় মমতায় বিগলিত করেছে। কবি লিখেছেন—"নারীর জীবন কাটে ভালোবেসে। তার খ্যাতি কীর্তি অর্জন করবার অবসর নেই। তাই ইতিহাসে পুরুষের নাম থাকে, নারীর নাম থাকে না। নারী শুধু প্রীতিধারা ঢেলে দিয়ে, আপনার নামটুকু মুছে নিয়ে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ বা ছিল ধনীগৃহিণী কেউ বা ছিল দরিদ্রের ঘরে, কেউ বা ভালোবাসার প্রতিদানে ভালোবাসা পেয়েছে, কেউ বা ভালোবাসার প্রতিদানে পেয়েছে শুধুই অনাদর। এই সমস্ত খ্যাতিহীনা, কীর্তিহীনা মেয়েদের মধ্যেই আছে সেই কলংকিনী মেয়েরা যারা প্রেমের জন্যে একদিন কুলমান ঘর সংসার আত্মীয় পরিজন সব ত্যাগ ক'রে এসেছিল। তাদের প্রেমের এত গভীরতা না থাকলে তারা এমন করে সব কিছু পিছনে ফেলে চ'লে আসতে পারত না। সংসারের বিচারে তারা কলংকিনী। কিন্তু যদি প্রেমের মূল্য কোন খানে দেওয়া হয়, তবে সেখানে নিশ্চয় তারা তাদের সর্বত্যাগী প্রেমের জন্যে পুরস্কার পাবে। পুরাণে যে সমস্ত সতীদের নাম চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে প্রেমের জন্যে ত্যাগস্বীকার করার জন্যেই তো তাদের নাম। মানুষের সমাজের সংকীর্ণ বিচারে শুধু কয়েকজন নারীই সতী বলে খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু যেখানে বিচারের এই সংকীর্ণতা নেই, যেখানে প্রেমকে উদার দৃষ্টিতে, তার সত্য মূল্যে বিচার করা হয়, তেমন স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সেখানে একজন পতিতা নারীও ঐ সতী শিরোমণিদের সমান অথবা তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তার জীবনের ত্যাগ ও দুঃখ সমাজের বিচারে মূল্য পায়নি। কিন্তু স্বর্গের বিচারে এই সর্বত্যাগী আত্মবিসর্জন প্রেমের জন্যে সর্বস্ব বলিদান কথনো তুচ্ছ হ'তে পারে না।

(সতী, চৈতালি।)

এই কথাই বলেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর অনেক অসতী নারীর চরিত্রে। সমাজ যাদের অসতী বলে ত্যাগ করেছে ত্যাগে ও দুঃখে তারা যে কারো চেয়ে কম নয়, বরং অনেক সময় বেশী এই কথাই বার বার ক'রে বলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। 'শ্রীকান্ত' বইয়ের অন্নদা দিদি, 'দেবদাসের' চন্দ্রমুখী, 'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী 'আঁধারে আলোর' পতিতা মেয়ে এরা সবাই সংসারের চোখে পতিতা। কিন্তু যে স্বর্গে দরদী সাহিত্যিকের বাস, সেখানকার বিচারে এরা প্রেমের গৌরবে গৌরবান্বিতা!

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে লেখেননি। ওরকম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কথনো অনুকরণের ফল হ'তেই পারে না। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী, তাই আমি একথা বলব যে নারীর প্রতি যে দরদ আমরা দেখেছি শরৎচন্দ্রের মধ্যে, তার পূর্ণ বিকাশ আগেই হয়েছিল রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালির' 'সতী' কবিতায় আর 'গল্পগুচ্ছের' 'বিচারক' গল্পে যে কথা বলেছেন শরৎচন্দ্র সেই একই কথা বলেছেন তার দরদভরা অতুলনীয় সাহিত্যে। কিন্তু তবু শরৎ সাহিত্য অনুকরণও নয় পুরানোও নয়। জগতের যত চিরন্তন মহাসত্য তা কথনো পুরানো হয় না। তার বার বার পুনরাবৃত্তি করলেও তা চির নূতন, যেমন সকাল বেলার সূর্যোদয়, তা প্রতিদিন দেখেও মনে হয় তা চিরনবীন। সত্যও তাই। তাকে যত ভাবে যত বিচিত্র রূপে দেখি ও শুনি ততবারই মন মুগ্ধ হয়।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমাজের মনের কথাকেই প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক সময় সমাজ তার অজ্ঞাত মনের খবর আপনি জানে না। এই অজ্ঞাত মনের কথাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখানোই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কাজ। তাই প্রথম প্রথম অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে সমাজবিরোধী ব'লেও লোকে ভাবে। তার কথা যে সমাজের নিজেরই কথা এটা বুঝতে সমাজের সময় লাগে। সমাজের মধ্যে যে দরদ অস্ফুট আকারে ছিল, যা ফুটবার আকুলতায় আকুলিবিকুলি করছিল, তাকেই প্রথম ভাষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার পরে সেই দরদই ভাষা পেল অমর শরৎসাহিত্যে। বোবা সমাজ চেতনার মুখে ভাষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কিন্তু

তবু এর সূচনা হয়েছিল বংকিমচন্দ্রের মধ্যেই। প্রেমের জন্য নারী যে কেমন ক'রে কলংককে মাথার ভূষণ ক'রে পরে তা দেখেছি আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার চরিত্রে। সবাই জানে বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের রক্ষিতা। এই অপমান সে সহ্য করেছে একমাত্র প্রেমের দায়ে। বীরেন্দ্র সিংহ গোপনে বিমলার কাছে যেত, কিন্তু প্রকাশ্যে তাকে সে বিয়ে করবে না। তাতে তার সামাজিক অপমান ঘটবে কারণ বিমলা ছিল জারজ!

কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ বলল যে সে তাকে বিয়ে করতে পারে যদি এ বিয়ের কথা চিরদিন গোপন রাখে বিমলা। রক্ষিতা হিসাবে পুরুষ যে কোন মেয়ের সংগে সম্পর্ক রাখতে পারে, তাতে সমাজ কিছু বলে না, কিন্তু বিয়ে করতে হ'লে তাকে আপনার অনুরূপ কুলমান দেখে তেমন ঘরের মেয়েই বিয়ে করতে হবে, এই হ'ল সমাজের বিধান। তাই বীরেন্দ্রসিংহ যার কাছে কামনাপরবশ হ'য়ে যেত, তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে পারে না। দরকার হ'লে সে মেয়েমানুষকে ত্যাগ করতে খুবই রাজি, কিন্তু সামাজিক সম্মান সে ত্যাগ করবে না। কিন্তু হৃদয়সর্বস্ব নারী না বোঝে সমাজ, না বোঝে সংসার, না ভাবে আপনার মান-অপমান। সে আপন হৃদয়ের ভারে ভারাক্রান্ত, প্রেমের দায়ে সে যেকোন দুর্গতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বিমলার মত যে প্রেমে পড়েনি সে বলবে বীরেন্দ্র সিংহের মত প্রেমিকের মুখে ঝাঁটা। মেয়েমানুষকে যে কাপুরুষ সম্মান দিতে পারে না, সে তাকে প্রণয় নিবেদন ক'রে তাকে ভোগ করতে যায় কোন মুখে? কাপুরুষের এই ভোগ-লালসাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। অথচ বীরেন্দ্র সিংহ বীর। সে অকুণ্ঠিত চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে জানে। মৃত্যুর মুহূর্তেও সে শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করে না। কিন্তু মেয়েমানুষের বেলায় এই বীরও কাপুরুষ। এটা এই জন্যেই সম্ভব হ'তে পেরেছে যে এর জন্য বীরেন্দ্র সিংহ একা দায়ী নয়। তার এ মনোভাবের মূলে রয়েছে সমস্ত সমাজের মনোভাব। সমাজ মেয়েকে সম্মান দেয়নি। মেয়ে-মানুষকে অসম্মান করাটা, একদিন তাকে ভোগ করা আর পরদিন তাকে ত্যাগ করা, এটা সমাজের চোখে কোন অপরাধই নয়। এই কারণে সমাজ পুরুষ মানুষকে ধিক্কার দেয় না। তা যদি দিত তা হ'লে বীরেন্দ্র সিংহ বিমলাকে বিয়ে না করতেই ভয় পেত, তাকে ত্যাগ করতে ভরসা পেত না। কিন্তু সমাজ এখানে ভয় দেখায় না, ভয় দেখায় অন্যদিকে। সমাজের চোখে মানুষের কুলমানের মূল্য একটা মেয়েমানুষের মূল্যের চেয়ে বেশি। মেয়েমানুষ সমাজের চোখে এতই সস্তা। আর মেয়েমানুষও নিজেকে সস্তা করেই রেখেছে, সে কখনো নিজের মূল্য দাবীও করেনি, তার কারণ সে বেচারা নিরুপায়, আপন হৃদয়ের ভালোবাসা নিয়েই সে পড়েছে দায়ে। ভালোবাসার দায়ে সে নিজেকে, নিজের আত্মসম্মানকে, বিকিয়ে দিয়ে ব'সে আছে। তাই তো তার ওপরে সুযোগ পেয়ে গেছে পুরুষ। সংসারে এর যে ব্যতিক্রম কোথাও হয়না তা নয়। সব মেয়েমানুষই যে অগাধ প্রণয়শালিনী, তা হয়ত' নাও হ'তে পারে কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়ের স্বভাবই এই। পুরুষ মেয়েকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছে এটা যত সাধারণ ঘটনা, মেয়েমানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এ ঘটনা তার তুলনায় নিশ্চয় অনেক কম।

বিমলার মতই হৃদয়ভারাতুরা নারী যুগে যুগে বারে বারে কলংক স্বীকার ক'রে পথে নেমেছে। নিরাপদ কূল ছেড়ে অজানা অকূলে ঝাঁপ দিয়েছে। তাকে অসতী নাম দিলেই কি এতখানি প্রেমের এতখানি ত্যাগ মিথ্যা হ'য়ে যাবে?

এমনি করে আমরা দেখি বংকিমচন্দ্রের মধ্যে যা ছিল আভাসে তাই পরিস্ফুট হ'য়েছে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত অনু-ভবে, সংহত সংযত ভাবে ও ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে। রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ব'লেছেন তার ব্যঞ্জনা সেই স্বল্প আয়তনকে ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত। রবীন্দ্র সাহিত্যে বাক্যের চেয়ে অর্থ বেশী। সংস্কৃত আলংকারিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ ব'লতে গিয়ে এই কথাটাই বলেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যতটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ করে। অসার সাহিত্যের মধ্যেই কথা বেশী আর অর্থের গভীরতা কম। আমরা দেখি কবির 'বিচারক' গল্পে কবি সমাজের যে বিচার করেছেন তাই বেদনার সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে শরৎ সাহিত্যে। শরৎ সাহিত্যে বুদ্ধির চেয়েও দরদ বেশী, তাই তা কূলপ্লাবী। রবীন্দ্রনাথ 'সতী' কবিতায় ও 'বিচারক' গল্পে যেমন ক'রে নারীর পথভ্রান্তির সমস্ত ইতিহাসটাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন—শরৎচন্দ্রের অশ্রুপ্লুত

চোখের দৃষ্টি অতখানি স্বচ্ছ নয়। কিন্তু তবু শরৎচন্দ্রের কথা যতখানি প্রকাশ করেনি, তার চোখের জল তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছে। প্রকাশের বাহন হিসাবে মুখের কথার চেয়ে চোখের জলের মূল্য কম নয়, বরং অনেক সময় বেশি। তাই মেয়েদের প্রতি দরদের যে সমাজ চেতনা আজ জেগে উঠেছে তা শরৎ সাহিত্যের প্রভাবেই অনেকখানি ঘটেছে। শরৎ সাহিত্যের চোখের জল পাঠক সমাজ সহজে বোঝে। রবীন্দ্রনাথের সংহত লেখনীর গভীর ব্যঞ্জনা বুঝতে পাঠক সমাজের সময় লাগে। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তারিখ হিসাবে শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী হ'লেও আসলে তাঁর লেখা ভাবীকালের পাঠকেরই জন্যে। এই জন্যে লেখার কাল হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখকের চেয়েই পরবর্তী। যে কাল রবীন্দ্র সাহিত্যকে সমগ্রভাবে বুঝবে সে কাল আজও আসেনি। এই জন্যেই সমসাময়িক সমাজকে মেয়েদের প্রতি দরদে সজাগ ক'রে তুলতে শরৎ-চন্দ্রের অবদান যতখানি, রবীন্দ্রনাথের ততখানি নয়। এই জন্যেই শরৎচন্দ্র আখ্যা পেয়েছেন 'দরদী' বলে। রবি সূর্য্যের দরদ তার আলোকচ্ছটার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। সেই অভাবনীয় প্রতিভার অতি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাকে ভেদ ক'রে দেখতে আমাদের দুর্বল চক্ষুর সময় লাগে। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ আখ্যা পেয়েছেন 'বিশ্বকবি' বলে। তাঁর কাব্যের বিশ্বজনীনতাটাই আমরা বেশি ক'রে বুঝেছি তাঁর অন্তরের দরদ আমরা ঠিক ক'রে এখনো বুঝিনি। আমরা দেখেছি তাঁর প্রসার, তাঁর গভীরতা আজও আমাদের অগোচর।

রবীন্দ্রনাথের কথা যে শরৎচন্দ্রের কথার চেয়েও সু-অভিব্যক্ত, তার লেখনী যে আরও বেশী দুঃসাহসী তার প্রমাণ 'চৈতালি'র 'সতী' কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি :—

'মর্ত্তে কলংকিনী স্বর্গে সতী শিরোমণি
হেরি তারে সতী গর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কি জানিবে বার্তা অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী।'

শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন নারীর অন্তরের প্রেম শত দুর্বিপাকের মধ্যেও মরে না। যতদিন সে সত্যিকার ভালোবাসতে শেখেনি ততদিনই সে দুর্গতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে। যে মুহূর্তে সে ভালোবাসে সেই মুহূর্ত থেকে সে পবিত্র জীবন আবার যাপন করতে শুরু করে। এই কথাই তিনি বলেছেন 'চরিত্রহীনের' সাবিত্রীর চরিত্রে, 'দেবদাসে'র চন্দ্রমুখীর কথায় 'আঁধারে আলো' গল্পে।

সাবিত্রী যেদিন থেকে সতীশকে ভালোবাসল সেদিন থেকে সে সংযতচারিণী। সে সংযমের গভীরতা এতখানি যে প্রেমকে পবিত্র রাখবার জন্য সে যাকে ভালোবাসে তাকেও ত্যাগ করল। সে বলল, যে দেহ নিয়ে আমি অনেককে ভুলিয়েছি, সেই উচ্ছিষ্ট আমার দেবতার পূজার থালায় ধরে দিতে পারি না। শরৎচন্দ্র বলেছেন পতিতা নারীর অন্তরের অমর প্রেমের অংকুরের কথা। অনাবৃষ্টিতে সে শুকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় সে মরে গেছে। কিন্তু প্রেমের প্রথম রসবর্ষণেই সে পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। শরৎ-চন্দ্র নারীর পথভ্রান্তির ইতিহাসের উৎসের কাছে যাননি। তিনি লিখেছেন পতিতা নারীর পরবর্তী জীবনের ইতিহাস। আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন নারীর পথভ্রান্তির ইতিবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ জানতেন একবার বিপথে পড়লে অকুল থেকে কুলে ওঠা অত সহজ নয়। তাই তিনি দেবতার ছদ্মবেশ ধরে যে কাপুরুষ নারীকে বিভ্রান্ত করে তাকেই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই কাপুরুষকেই সমাজের দণ্ডিত করা উচিত, নিরপরাধিনী নারীকে নয়, এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র আসামীর প্রতি আমাদের দরদ জাগিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু সে যে আসামীই নয়। সত্যিকারের আসামী যে সমাজের বিচারে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল, আর তারই অপরাধের দায়ে ধরা পড়ল নিরপরাধ, একথাটা শরৎচন্দ্র খুব স্পষ্ট করে যেন বলেননি। অবশ্য একেবারে যে বলেন'নি তাও নয়। অন্ততঃ একখানা বইতে আমরা শরৎচন্দ্রের এই কথাটি পাই। 'বামুনের মেয়ে' বইতে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন অসৎচরিত্র ভগ্নীপতি বিধবা শালীর সর্বনাশ করল। তার পরে সেই মেয়েটি একদিন আপনার দুর্গতির ভার নিয়ে ভোর রাতে এল রেল ষ্টেশনে, তাকে অকূলে ঝাঁপ দিতে হবে। তার জন্যে শ্বশুর কুলে বা অন্য কোথাও আর ঠাঁই ছিল না। অথচ যে তাকে ভ্রান্ত করেছে সে সমাজের বুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে থাকতে পারল। সমাজ তাকে চোখ রাঙাল না।

নারীর প্রতি পুরুষের অবিচারকে কবি নানা দিক থেকে নানা রূপে দেখেছেন। কখনো বা সে অবিচার, অত্যাচার, কখনো বা তা উদাসীনতার অনাদর। পুরুষের উদাসীন অনাদরও মহীয়সী নারীর চিত্তকে ক্ষুব্ধ করে। সে তার যোগ্য আদর, তার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ যদি পুরুষের কাছ থেকে না পায় তা হ'লে তার সংসার বৃথা হয়ে ওঠে। কবি জানতেন সব মেয়ে সমান জাতের নয়। বরং বেশির ভাগ মেয়েই খেতে পরতে পেলে এবং সোনা গয়না পেলে তাতেই খুশী থাকে। কিন্তু শুধু খাওয়া পরা আর গয়নার জন্যেই পুরুষের সংসারে বন্দী হ'য়ে থাকতে চায়না এমন মেয়েও কদাচিৎ জন্মায়। এমনি এক মেয়ের গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ তার 'গল্প গুচ্ছের' '১লা নম্বর' গল্পে। শুধু বিয়ের মন্ত্র পড়েই মেয়েদের উপরে চিরদিনের অধিকার পুরুষদের জন্মায় না। তার হৃদয় জয় ক'রে তাকে নিজের আয়ত্বে আনতে হয়। কিন্তু অনেক সময় পুরুষ মানুষরা এটা বোঝে না। তারা মনে করে যাকে ঘরে এনেছে, সে এতই তার ঘরের, যে তার প্রতি আর কোন মনোযোগ দেবার যেন কোন দরকারই নেই। অন্তঃপুরের চারটে দেয়ালই যেন তার মন শুদ্ধ তাকে বন্দী ক'রে ধ'রে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট, তার জন্যে আর কোন চিন্তা বা চেষ্টা করে কোন হৃদয় বন্ধন রচনা করবার আর কোন দরকার নেই। এমনি ক'রে পুরুষের চিত্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। তখন সে শুধু বাইরের সমাজ আর তার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েই মত্ত হ'য়ে কাল কাটায়। তার বেশির ভাগ সময় কাটে বাইরের ঘরে, বন্ধুদের সাহচর্যে। অন্তঃপুরের নিঃসংগ নারীর কথা তার উদাসীন চিত্তে উদয়ই হয় না। কবি নিপুণতার সংগে অনিলার স্বামীর এই রকম চিত্র এঁকেছেন। সে যে অনিলার প্রতি কোন অত্যাচার করে তা নয়। সে যে অন্য কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত বা দুশ্চরিত্র তাও নয়। অনিলার সে রকম কোন দুঃখই নেই বা তার স্বামীর ওরকম কোন দোষও নেই, কিন্তু তবু অনিলার জীবন ব্যর্থ! স্বামীর এই একান্ত উদাসীনতার মধ্যে সংসারে বন্দী হ'য়ে যে কাল কাটাতে পারে সে মেয়ে অনিলা নয়। যে তার প্রতি অমন একান্ত উদাসীন তার সংসারে নিষ্ফল বন্দী হ'য়ে থেকে অনিলার মত মেয়ের জীবনে কোন সার্থকতা থাকতে পারে? মহিয়সী নারী তার যোগ্য সমাদর চায়। অনিলার স্বামী দিনরাত তার মতবাদ তার তত্ত্ব আলোচনা আর তর্কসভা নিয়েই মত্ত। ঘরের মধ্যে যে স্ত্রী আছে তার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না। কিন্তু অনিলা অবহেলা করবার যোগ্য নয়। যে তার স্বামী নয় স্বামীত্ব অর্থাৎ অকারণ এবং অনায়াস মালিকানার দাবী তার প্রতি যার নেই এমন পুরুষ মানুষের চোখে তার সত্যিকারের মূল্য প্রতিভাত হ'তে বাধা পায় না। তাই পাশের বাড়ীর মালিক অনিলাকে দেখে মুগ্ধ হয়। অনিলার প্রাণের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার খবর তার স্বামী রাখে না। একদিন সে অন্তঃপুরে এসে দেখল অনিলার ঘরের দুয়ার বন্ধ ডাকতে সে বাইরে বেরিয়ে এল, তার চোখে কান্নার চিহ্ন। স্বামী এসেছিল তার বন্ধুদের ভোজের কথা স্ত্রীকে বলতে। কিন্তু বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে অনিলার স্বামী শুনতে পেল যে কাল রাতে অনিলার মা-মরা ভাইটি সংসার অত্যাচারে আত্মহত্যা করে মরেছে। আরও খবর পেল যে ১লা নম্বর বাড়ীর মালিক সিতাংশুই গিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা নিজে গিয়ে করেছে। অনিলার স্বামী যে অনিলাকে বলবে যে সে একথা তাকে বলেনি কেন, সে মুখও তার ছিল না, কারণ সে তো অনিলার কোন সুখ দুঃখের সাথী ছিল না। তাই অনিলা নিজের এই গভীর দুঃখে তার কাছে সমবেদনা চাইতেও আসেনি। দ্বিতীয়বার অন্তঃপুরে গিয়ে অনিলার স্বামী দেখল যে অনিলা ভোজের জন্য রান্নার আয়োজন করছে। তখন স্বামী তাকে বলল, আজ এ সমস্ত থাক। কিন্তু অনিলা বলল—"না থাকবে কেন? আমি সমস্ত আয়োজন করেছি।" স্বামী ভাবল—তার মহৎ সাহচর্যের গুণে অনিলার মন সুখে দুঃখে এমনি সমাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। অনিলার স্বামী তার সংগে এক বাড়ীতে থেকেও মনে মনে তার থেকে এতই দূরে আছে যে অনিলার গভীরতম দুঃখ এবং তার নিবিড়তম অভিমানও সে নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ যার প্রতি উদাসীন, তার মনের গোপন খবর সে পেতে পারে না। ভালোবাসার গভীর মনোযোগ নিয়েই একজন আরেকজনের

মনের গোপন কথা জানতে পারে। আধুনিক সাহিত্যের বস্তিবাসীর কাহিনী আর কেরাণীর জীবনী সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—যে ওদের সংগে থেকেছে এবং ওদের ভালো-বেসেছে সেই ওদের কথা লিখতে পারে। যারা দূর থেকে ওদের দেখেছে তারা যেন ওদের কথা না লেখে। তা যদি লেখে তা হ'লে সে হবে মিথ্যে ভেজাল। কবি লিখেছেন,—

'তা না হ'লে মিথ্যা পণ্যে
ব্যর্থ হবে গানের পসরা।'

কবি লিখেছেন মানুষের কথা—

'সে অন্তরময়,
অন্তর মেশালে পরে তার অন্তরের পরিচয়।'

অন্তরময় যে মানুষ তার কথা বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। অন্তর না মেশালে তার অন্তরের কথা জানা যায় না। তাই অনিলার স্বামীও অনিলার সম্বন্ধে ভুল করল। সেইদিনই রাতে অনিলা আপনার মর্মান্তিক দুঃখ একলা বহন ক'রে উদাসীন স্বামীর সংসার ছেড়ে চ'লে গেল। লিখে রেখে গেল—"আমাকে খুজো না, খুজলে পাবে না।" সিতাংশু অনিলাকে দূর থেকে পূজো জানাত। সে অনিলাকে চিঠি লিখত। কিন্তু কখনো তার উত্তর পায়নি। কবি লিখেছেন যদি উত্তর পেত, তা হ'লেই পূজোর সুরে বেসুর বেজে উঠত। কিন্তু মহীয়সী নারীর মহিমায় ভক্তের পূজোয় সে ব্যাঘাত ঘটল না। শুধু যাবার সময় অনিলা তাকে প্রথম এবং শেষ চিঠি লিখে রেখে গেল—'আমাকে খুঁজো না, খুজলে পাবে না।' সিতাংশুর যে চিঠিগুলো অনিলা দেরাজে রেখে গিয়েছিল অনিলা চ'লে যাবার পরে অনিলার স্বামীর কাছে যেন সেগুলো তার নিজের জিনিস হ'য়ে উঠল। ঐ চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে আজ সে অনিলাকে তার সম্পূর্ণ মহিমায় দেখতে পেল। অনিলা যেদিন জানল যে তার মর্মান্তিক দুঃখের দিনেও স্বামীর কাছে সান্ত্বনার কোন প্রত্যাশা নেই সেদিন সে বিবাহিত জীবনের ব্যর্থ বিড়ম্বনার মধ্যে আর বন্দী হ'য়ে থাকতে চাইল না। কিন্তু অনিলার স্বামী অনিলাকে হারিয়ে এতদিনে তার মূল্য বুঝতে পারল। মানুষ যা বিনা চেষ্টায় হাতের মুঠোর মধ্যে পায়, তার প্রতি সে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করে না। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের মনোভাব ঠিক এই জাতের। কিন্তু যা মূল্যবান হারিয়ে গেলেই মানুষ তার মূল্য বোঝে। অনিলার স্বামী অনিলাকে হারিয়ে বুঝতে পারল যে তার ভেতরে যে একটা প্রাণ আছে সেই প্রাণটাকে শুধু তত্ত্বজ্ঞানের খোরাক দিয়ে রাখা চলে না, সেই অবুঝ প্রাণীটা কেবল আকুল হ'য়ে অনিলার সংগ কামনা করতে লাগল। অবশেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সে সিতাংশুর কাছেই গেল অনিলার কুশল জানতে। তার ধারণা অনিলা সীতাংশুর কাছেই আছে। যখন সিতাংশু বলল যে অনিলা তার কাছে নেই, তখন অনিলার স্বামী ভাবল বুঝি সিতাংশু অনিলাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজে সে একদিন অনিলার অনাদর করেছে কিন্তু আজ যে আর কেউ তাকে অপমান করবে এটা সে সহ্য করতে পারে না। অনিলাকে সে অপরাধী করে না, সে স্বীকার করে অনিলাকে তার যোগ্য মূল্য না দেওয়ায় তার নিজের অপরাধ। সিতাংশু জানত মনস্বিনী এই নারী কখনোই তার পূজা নিবেদনের বদলে তাঁর উঁচু আসন থেকে নীচে নেমে তার কাছে আসবে না। তাই অনিলাকে কাছে পাওয়ার লোভ বা দুরাশা তার ছিল না। কিন্তু সে অনিলাকে দেখে, সংসারে তার এই অনাদর সহ্য করতে পারে না। যা পরম আদরের তার যদি অনাদর ঘটে তবে তা চুপ ক'রে দেখা কষ্টকর। সিতাংশু অনিলাকে লিখেছে "বাইরের দিক থেকে আমি তোমার কিছুই জানি না, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানেই আমার কঠিন পরীক্ষা। আমার পুরুষের বাহু কিছুতে নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না, ইচ্ছা করে ঐ অনাদরের দুর্গ থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আনি।"

সিতাংশু প্রাণবন্ত মানুষ। সে গান বাজনা, ঘোড়ায় চড়া এ সবের অনুরাগী। তাই সবাই সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তার ভোজসভার আহ্বান উপেক্ষা করে অনিলার স্বামীর তর্কসভায় যোগ দিতে খুব কম লোকই আসে।

কবি বলতে চান সিতাংশু নিজে প্রাণবন্ত বলেই নারীর মূল্যও সে বোঝে। কিন্তু যাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের আড়ালে প্রাণ চাপা পড়ে আছে সে নিজের প্রাণহীনতার দৈন্যের জন্যই জীবনকে যথেষ্ট উপভোগ করতে শেখেনি বলেই যেমন জীবনের অন্য সমস্ত সুখ ও সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন, তেমনি নারীর প্রতিও তার উদাসীনতা। কিন্তু নারী যেদিন

চ'লে যায় সেদিন তাদের সুপ্ত প্রাণ ক্ষুধার্ত হ'য়ে জেগে ওঠে।

এই একই ধরণের আইডিয়া নিয়ে কবি লিখেছেন 'নষ্টনীড়' গল্প। এই গল্পের ভূপতিকে কবি দেখিয়েছেন সে খুব ভালো মানুষ, মানুষ হিসাবে তার মধ্যে কোথাও কোন দোষ নেই, তার স্ত্রীর তার প্রতি অভিযোগ করবার কোনো কারণ কোথাও কিছুমাত্র নেই, কিন্তু তবু একটা মস্ত বড় ভুলের জন্য ভূপতি স্ত্রীর হৃদয়নীড়ের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ল। এটা যে কেমন করে ঘটল তা সে নিজেও জানে না, তার স্ত্রীও জানে না। দুজনেরই অজ্ঞাতসারে এই দুজনের নীড় রচনা হ'তে পারল না, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নিরালা নিভৃত একান্তই দুজনের একখানি নীড় গড়ে ওঠে, ভূপতির অন্যমনস্কতার জন্যে সে নীড় গড়া হ'য়ে উঠল না, নষ্ট হয়ে গেল সেই নীড়। হঠাৎ যখন একদিন বাইরের সংসারের ধাক্কায় ভূপতি সন্ধান করল সেই নীড়খানির, তখনই সে জানতে পারল যে সেখানে তার জায়গা নেই, সেখানে জায়গা জুড়ে বসে আছে তারই আশ্রিত ছোটভাই অমল। অথচ এর মধ্যে কোন গোপন প্রেম, কোন অবৈধ আসক্তির কথা অমল বা চারু নিজেরাও জানতে পায়নি। এর মধ্যে দেহের স্থূল কামনার কোন স্থান ছিল না। ভূপতি তার খবরের কাগজ সম্পাদনা নিয়ে মশগুল। স্ত্রী চারুর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেবার তার সময় নেই। চারুর যত খেলা যত গল্প সবকিছুর সাথী তার দেওর অমল। অমলের যতকিছু আবদার চারুর কাছে। এমনি ক'রে চারুর নারী প্রকৃতির কাছে আবদার ও উপদ্রব করে অমল চারুর ভালোবাসা আকর্ষণ করে। অন্যদিকে ভূপতির কোন আবদার নেই, কোন উপদ্রব নেই। তাই চারুর নারী প্রকৃতিতে যে স্নেহের ক্ষুধা অমলের আবদার ও উপদ্রবের মধ্যেই তার তৃপ্তি হয়। নিরুপদ্রব নির্দোষ ভূপতি চারুর মনে অমলের স্থান নিতে পারে না। নারী যে দিতেই চায়, যে নিতে চায় না তাকে নিয়ে সে কী করবে, যে নিতে চায় তাকে দিয়েই নারীর জীবন সার্থক। এই জন্যেই বুঝি আমাদের কাহিনীতে দেখি অন্নপূর্ণার দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন মহেশ্বর। ঐ ভিক্ষাপাত্রটির প্রতিই মেয়েদের লোভ। যে ঐ পাত্রটি তার দিকে বাড়িয়ে দেয়, মেয়েরা তাকেই আপনার হৃদয়-সুধা উজাড় ক'রে দান ক'রে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। যার হাতে এই ভিক্ষাপাত্র নেই, সে মেয়েদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একদিন ভূপতির সমস্ত সম্পত্তি তার খবরের কাগজের ব্যবসার তলায় তলিয়ে গেল। সেদিন সহসা ভূপতি দেখতে পেল যে সংসারের যত পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে ত্যাগ করেছে, সবাই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তখন পীড়িত ক্ষুব্ধচিত্ত নিয়ে ভূপতির চারুকে মনে পড়ল। সে ভাবল যে সম্পদ আমার নিজের ঘরে আছে সেই চারুর অন্তর-সাম্রাজ্যের মধ্যে তো আমারই একমাত্র অধিকার, তার মধ্যেই আমি আশ্রয় নেব। সেদিন ভূপতি অসময়ে ঘরে এল চারুর কাছে। কিন্তু চারুর কাছে ভূপতি কোনদিন কিছু চায়নি, তাই আজ যখন সে চাইতে এল তখন চারু যেন তার হৃদয় ভাণ্ডারের চাবি কোথাও খুঁজে পেল না। যে কোনদিন কিছু চায়নি, আজ চাওয়া মাত্রেই চারু যে তাকে আপন অন্তরের গোপন সুধা দান করবে তার আর উপায় ছিল না। মানুষের প্রাণের গোপন সম্পদ, যে বহুদিনের অনভ্যাসের পরে সহসা একদিন চাইলেই দেওয়া যায় না। তার জন্যে প্রতিদিনের অভ্যাস প্রতিদিনের সাধনা দরকার হয়। নারীর অন্তর যেন লতাটির মত। মাটির যে দিকে সে রস পেয়েছে সেদিকেই আপনার হৃদয়মূলটি প্রসারিত করে দিয়েছে। যে দিকে রস পায়নি সেদিককার মূলগুলো যেন শুকিয়ে গেছে। চারু আর ইচ্ছে করলেও সেই শুকনো মূলে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। বহুদিন বিনা জল সেচনে সে মূল শুকিয়ে গেছে, সে একেবারেই শুকিয়ে গেছে। তাই ভূপতির প্রতি চারু নিজের কর্তব্য পালন করবার জন্য যতই প্রাণপণ করে, ততই তার প্রাণের রিক্ততা ভূপতিকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ভূপতি আর চারুর সংগ কিছুতেই সহজ হ'য়ে আনন্দিত হয়ে ওঠে না। অমল যখন একদিন ভূপতিকে চারুর কাছ থেকে শূন্য প্রাণে ফিরে আসতে দেখল, তখন তার মুখের চেহারা দেখে সহসা অমলের চমক লাগল। অমল প্রশ্ন করল—"দাদা, তোমার কি অসুখ করেছে?" ভূপতি ম্লান হাসি হেসে বলল "না কিছু হয়নি তো।" তখন

অমল চারুর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু চারু ভূপতির মনের কোন খবর রাখে না। ভূপতির মনের খবর রাখা চারুর অভ্যাসের বাইরে। তাই অমল দাদার মুখে যে দুঃখ ও নিরাশার ছবি দেখে আতংকিত হ'য়ে উঠেছে চারু তার কিছুই বুঝতে পারেনি। সে অমলকে বলল "হয়ত" অন্য কাগজে তোমার দাদার কাগজের নিন্দা বেরিয়েছে।" কিন্তু অমল বুঝতে পারল যে ভূপতি কোন গুরুতর দুঃখে পড়ে চারুর কাছে সান্ত্বনার আশায় এসেছিল, চারুর কাছে সেই সান্ত্বনার আশ্রয় না পেয়ে সে গভীর বেদনা নিয়ে ফিরে গেছে। এক মুহূর্তে অমলের যেন চেতনা হ'ল যে সে যেন না দেখে গভীর গহ্বরের কাছে গিয়ে পড়েছিল। তার কিনারা থেকে সে যেন ফিরে এল। আর এক পা গেলেই সে সেই গর্তে পড়ে যেত। তখন অমল বিয়ে ক'রে বিলেত চ'লে গেল। বিয়ের আগে ভূপতি তাকে কনে দেখার কথা বলায় সে তাতে কানও দিল না, যত তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায় এই তার মতলব। এ নিয়ে চারু মনের গোপন অভিমান বশে ঠাট্টাও করল, বলল "তোমার যে আর না হ'লে চলছিল না। এ কথা আগে বলনি কেন?" কিন্তু অমল সে ঠাট্টারও কোন জবাব দিল না। আর সে চারুর কাছে এল না। শুধু যাবার দিনে তাকে প্রণাম ক'রে চলে গেল। বিলেত গিয়েও সে চারুকে কোন চিঠি দিল না। অমল বুঝতে পেরেছিল যে সে নিজেরও অজ্ঞাতে চারুর মন তার আশ্রয়দাতা দাদার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। সেই ভুল সংশোধন করবার জন্যেই সে চারুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে চাইল। আর তাকে এতটুকু প্রশ্রয় দিল না। এটা পুরুষের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নারীর পক্ষে নয়। আপন হৃদয়াবেগের কাছে সে একান্তই অসহায়। চারু তার শুকিয়ে যাওয়া হৃদয়মূলে আর রস সঞ্চার করতে পারল না। যে দিকে তার হৃদয়মূল প্রসারিত করেছিল যখন সেইখানে আঘাত পেল তখন লতাটি একেবারে শুকিয়ে উঠল। ক্রমে ভূপতি সব বুঝতে পারল। মানুষ যে দিকে মনোযোগ করে সে দিকটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন ভূপতির মনোযোগ চারুর দিকে তাই তাকে বুঝতে তার দেরী হ'ল না। অবশেষে এই শোকাতুরা নারীর সংগ এড়াবার জন্য ভূপতি বিদেশে যেতে চাইল। কিন্তু চারু যেন ভয়ভীতা হরিণীর মতোই অমলের পরিত্যক্ত তার স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায়। তাই সে ভূপতিকে বলল তাকেও সংগে নিয়ে যেতে। সে কথা ভূপতি বুঝল। সে ভাবল সেই দূর প্রবাসে নির্জন সন্ধ্যায় এই হৃদয়ভার পীড়িতা নারীর সংগ সে কেমন করে সহ্য করবে। যে নারী তার হৃদয়ের মধ্যে অন্যের শোক লালন করছে সে কি তার সংগ থেকে মুক্তিও পাবেনা। তাই সে বলল—সে আমি পারব না। কিন্তু পর মুহূর্তে এই শোকার্ত নারীর প্রতি করুণায় তার মন ভরে উঠল। সে অনুতপ্ত চিত্তে বলল—আচ্ছা, আমার সংগেই চল। কিন্তু অভিমানিনী চারু বলল—না থাক। তার পরে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল! প্রথমে চারু তার শোককে গোপন করতে চেয়েছে, অন্ধকারে লুকিয়ে চাপা কান্না কেঁদেছে। কিন্তু অবশেষে নিজের প্রবল হৃদয়াবেগের সংগে যুদ্ধ করে দুর্বল নারী অবসন্ন হয়ে পড়ল। আর তার যুদ্ধ করবার শক্তিও রইল না। সে এই শোকের কাছে কাছে আত্মসমর্পন করে দিল। হৃদয়াবেগ নারীর কাছে এমনি প্রবল যে তার সমস্ত শক্তি নিয়েও সে এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। এই কাহিনীতে ভূপতি চারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনে নি। সে তাকে দয়াই করেছে। অর্থাৎ কবি চারুকে দোষী করেন নি। ভূপতির অনবধানতাই এর জন্য দায়ী। আর সে জন্যেও ভূপতি একা দায়ী নয়। সামাজিক দৃষ্টি ভংগী এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। বিবাহের মন্ত্র বাঁধা নারীকে যেই অন্তঃপুরে নিয়ে আসে অমনি পুরুষ মনে করে যে তার উপরে তার অধিকার পাকা হয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়ের অধিকার এত সহজেই পাকা হতেই পারে না।

কবি বলতে চান—নারীর হৃদয় সাধনার ধন।

[ক্রমশঃ
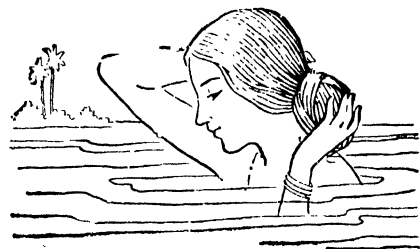
অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

একটি রক্ত খেলার অন্তরালে

রাণী পিসীর মুখে শুনেছিলাম এই গল্পটা—

বরগাছি গ্রামের সেই ভয়াবহ সত্য ঘটনাকে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনা। কিন্তু সভ্য সমাজের গোপন অন্ধকারে কত ভয়ঙ্কর নৃশংস কাণ্ড ঘটে থাকে—তার কিছু না কিছু কাহিনী প্রত্যেকেরই জানা আছে। ইতিহাস যদিও তার স্বাক্ষর রাখেনি—কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনলে মনে হবে ইতিহাসের আরো বড় জীবন্ত স্বাক্ষর—কানে শোনা এই সব কাহিনী।

রাণী পিসীর বাপের বাড়ীর দেশের গল্প। বরগাছি গ্রামের সবচেয়ে গোঁড়া নামজাদা পরিবার হোল ঘোষাল বাড়ী। রাম ঘোষালের একমাত্র শিক্ষিত ছেলে রাজেনের বিয়ে দেওয়া হোল এক অনিন্দ্যসুন্দরীর মেয়ের সংগে। কিন্তু ছেলের বিয়ে দেবার পর রাম ঘোষাল মারা গেল। রাম ঘোষালের বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ রাজেনের মা শুভদার ধারণা হোল—ছেলের বৌ বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই তার সিঁথির সিঁদুর মোছালো। তার স্বামীকে খেয়ে তবে বউটার যেন শান্তি হোল।

কাজেই সে নতুন বৌ মনোরমার ওপর খুবই খারাপ ব্যবহার করতো। মনোরমার বয়স তখন খুবই অল্প। এবং শিশুর মত সরল আর নিষ্পাপ মন ছিল তার। কিন্তু ভীষণ কুটিল ঈর্ষাপরায়ণা—দজ্জাল শাশুড়ী তার—নানা রকম সুযোগ সুবিধে খুঁজতো তাকে জব্দ করবার।

শুভদার ঈর্ষা এবং ক্রোধটা তখনই বেশী বাড়তে লাগলো—যখন ছেলে রাজেন বউকে নিয়ে মাতামাতি করতো। অবশ্য রাজেন বাড়ীতে থাকতো না। সে থাকতো সে গ্রাম থেকে অনেক দূরের শহরে যেখানে চাকরী করতো। ছুটিতেই সে আসতো বাড়ীতে। কিন্তু বিয়ের পর তার আসা যাওয়াটা অতি মাত্রায় যখন বাড়লো—তখন শুভদা ছেলেকে বশ করবার জন্যে অনেক রকমই চেষ্টা করলো।

সে যুগে ছেলেরা মা বাবার পোষা জীবই ছিল। বিয়ে করা বৌকে তারা শুধু রাতের সঙ্গিনীর মত মনে করতো। এবং সে যুগে কোন কোন মা বাবার কু-নীতির অনুগত হয়ে থাকাটাও একটা ধর্মের মত তাদের মনে হোত।

এমনি একটা দিনই—সেইদিন। রাজেনও খুব অনুগত ছিল তার মায়ের। যদিও সে তার দেবী প্রতিমার মত রূপসী বউকে অসাধারণ ভাবেই ভালবাসতো নিজের জীবনের একটা বড় অংশ বলে মনে করতো—একদিন সেই অন্ধ প্রেম কি ভাবে যেন চুরমার হ'য়ে গেল যদিও সে রহস্য তার কাছে উন্মোচন হয় ঘটনার অনেক পরে। কিন্তু জীবনে আর কোনদিনই তার প্রানের চেয়ে বড় জিনিস মনোরমাকে কাছে পায়নি।

সেই ভয়াবহ দুঃখবহ ইতিহাসটির স্রষ্টা একজন নারী—সে হোল রাজেনরই মা শুভদা। কিন্তু একদিন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রাজেন। মায়ের প্রতি অন্ধ ভক্তি আর বিশ্বাসই এক পাষাণ প্রতিমাকে—তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এনে দিল ঘটনার এক চরম পরিণতি!

বিরাট অবস্থাপন্ন ঘরের গিন্নী ছিল শুভদা। টাকা পয়সা ধন রত্ন সবই তার হাতের মুঠোর জিনিস। কাজেই এই অর্থবলে সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটি কাজে লাগাতে পেরেছিল এবং সে পাপের দণ্ডও তাকে পেতে হয়।

যখন শুভদা দেখলো ছেলেকে সম্পূর্ণ বশে আনা যাচ্ছেনা অর্থাৎ মনোরমার অসাধারণ রূপ তাকে বিভোর করে তুলছে এবং সে যুগেও রাজেন বৌ এর মুখ দেখবার জন্যে দিনের বেলায় ঢুকতো ঘরে—তখনই শুভদা বুঝলো ছেলেকে বশ করার চেষ্টা বৃথা! তার মন ভাঙাবার চেষ্টাই করতে হবে।

একদিন রাজেনকে চুপি চুপি বললো—বৌ তোর কিন্তু সুবিধের নয়। বিয়ের আগে কারো সংগে নিশ্চয় ভাব ভালবাসা ছিল। রাজেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'তার মানে?'

'মানে কি আর অত সত বুঝি রে রাপু, ঊর্মি (বাড়ীর ঝি) এসে আমায় একদিন বললে, বৌদিমণি আমায় ডেকে চুপি চুপি বললো সন্ধ্যের সময় পেছনের বাগানের ওপাশে গিয়ে দেখবি এক বাবু—দাঁড়িয়ে তাকে গিয়ে আমার এই চিঠিটা দিবি বলে কি একটা কাগজ দিল।

আবার বললে, 'খবরদার কাকপক্ষীও যেন না জানে আর এই যে আমার গলার হার!'

শুনে রাজেন প্রায় চমকে উঠলো। সে যুগে বিয়ের আগে কোন মেয়ের ভালবাসার কাহিনী একটা ভয়াবহ ব্যাপার বলে গণ্য হোত এবং সে সময় এ ঘটনার নজির তেমন পাওয়া যেত না। কাজেই তার গায়ে প্রায় কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনোরমাকে সে যখন বললো, ব্যাপারটা তখন শুনে সে কেঁদে ফেললো। স্বামীকে বললো —'এর এক বর্ণও সত্যি নয়—আমার বিরুদ্ধে কেউ নিশ্চয় শত্রুতা করছে।'

রাজেন কিন্তু স্ত্রীকে ঠিক অবিশ্বাসও করতে পারল না আবার মা যে কোন শত্রুতা করতে পারে এ' কথাও বিশ্বাস হোল না। বরং উর্মিকে সে সন্দেহ করলো।

কিন্তু শুভদার আগেই শেখানো পড়ানো ছিল উর্মিকে। সেও এ ব্যাপারে মিথ্যে সাক্ষী দিল রাজেনকে। রাজেন সব শুনে একটা সন্দেহদোলায় শুধু দুলতে লাগলো। অথচ বাড়ী থেকে সে ব্যাপারটা সত্যি মিথ্যে যাচাই করবে সেটাও উপায় ছিল না। কেননা শুভদা তাকে বলেছিল—সে চাকুরীস্থলে চলে গেলেই মনোরমা এই সব কাণ্ড করে।

যাই হোক ঘটনা যে আরো ভয়াবহ হ'য়ে উঠবে মনোরমা তা জানত না। তার কিছুদিন পর রাজেন তার কর্মস্থল থেকে তার মাকে চিঠি লিখলো অমুক দিন রাত দশটার সময় সে বাড়ী আসছে ছুটিতে। কেন না, সেদিনের গাড়ী পেতে গেলে রাতই হবে।

এদিকে চিঠি পেয়ে শুভদা ঠিক করলো ওই দিনে একটা সুযোগ নিতে হবে। কারণ রাজেন কখনো রাত্রে বাড়ী ফিরতো না। মনোরমাকেও জানালো না—রাজেনের আসার কথা।

সেই উর্মিদাসীকে দিয়ে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে একটা বাইরের ভাড়া করা লোক ঠিক করলো। লোকটা উর্মির দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাকে শেখানো হোল সে যেন মনোরমার অনেকদিনের পরিচিত প্রেমিক। এবং রাজেন যে রাত্রে ফিরবে সেই রাত্রেই অর্থাৎ রাজেনের আসার আগে এবং মনোরমা তার ঘরে শুতে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে গোপনে গিয়ে মনোরমার খাটের নীচে লুকিয়ে থাকবে। মনোরমা রোজ যেমন ঘুমুতে যায়—সেইভাবে সে শুতে যাবে।...

তারপর, জানা কথাই রাজেন বাড়ী এসে প্রথম ঢুকতে যাবে নিজের ঘরে। যখন সে দরজা ঠেলবে—তখনই যেন সে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে সহসা দরজা খুলে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এবং কাজটা যেন অতর্কিতে হয়।

পরিকল্পিত এই ষড়যন্ত্রটা প্রায় সাফল্য লাভ করলো। সময় সুযোগগুলোকে এমনভাবে শুভদা সাজিয়ে রেখেছিল যে কাজের ফলটা হাতে হাতে মিলে গেল...। রাজেন যখন দরজায় টোকা দিল—লোকটা দরজা খুলে সেইভাবে অতর্কিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনোরমা তখনো জেগে ছিল। সেও দরজা খোলবার জন্য খাট থেকে নীচে নেবেছিল। কিন্তু তারই চোখের ওপর দিয়ে মুহূর্তে যে লোকটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল—তাতে সে থতমত এবং ভীত হ'য়ে পড়লো।

রাজেনও স্তম্ভিত! আরো দূরে দাঁড়িয়ে শুভদা মজা দেখছে। সেই মুহূর্তে যা হবার তাই হোল। রাজেন গম্ভীর রূঢ়স্বরে মনোরমাকে বললো—তুমি কি জানতে না, আজ আমি আসবো?

মনোরমা সত্যিই জানত না। কাজেই সে অবাক হয়ে বললো কই না তো?

'ও! তাই বুঝি এমন একটা অবাধ সুযোগে বাইরের পুরুষ নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিলে না?' রুদ্ধ কঠিন গলায় রাজেন বললো।

তার মানে? মনোরমার গলায় অবাক সুর।

তার মানে? মানে তোমায় বুঝিয়ে আর বলতে হবে নাকি! এই মুহূর্তে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সেটাও কি মিথ্যে?

মনোরমা একটু থতমত খেয়ে গেল, বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ কে যেন বেরিয়ে গেল কিন্তু আমি তো কিছুই জানিনা। নিশ্চয় বোধহয় কোন চোর টোর হবে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে-ছিল—তুমি আসতে সে চলে গেল...।

'চোর? দিব্যি ভদ্রলোকের মত পোষাক পরে বুঝি শুধু তোমার ঘরেই চুরি করতে এসেছিল? আর তাই দেখেও এতক্ষণ চুপ করে ছিলে বুঝি?

এ' কথার উত্তর আর মনোরমা দিতে পারেনি। শুধু

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সে কেঁদেছিল কিন্তু রাজেন আর অভিভূত হতে পারেনি স্ত্রীর চোখের জলে। সে বদ্ধমূল ধারণায় নিশ্চিত হোল—তার মায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য।

এরপর, শুভদাও তাকে জানালো, ঐ ঘটনা নাকি প্রায় রাত্রে ঘটে। উর্মি এসে সবই বলে তাকে। কাজেই সে যুগের গোঁড়া অভিজাত পরিবারের কুলবধূর যদি এই কেলেঙ্কারী চলে গোপনে গোপনে, তাহলে তার প্রকৃত শাস্তি কি হওয়া উচিত?

রাজেন তার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর বিচারের ভার তার মায়ের হাতেই তুলে দিয়ে তার কর্মস্থলে চলে গেল —অত্যন্ত মর্মাহত হ'য়ে। এদিকে শুভদার ষোলআনা আশা পূর্ণ হবারই সুযোগ!

এদিকে মনোরমারও বুঝতে বাকি ছিলনা যে—ঐ ষড়যন্ত্র তার শাশুড়ীর। কিন্তু মুখ ফুটে সাহস করে মাতৃভক্ত স্বামীকে সে ঐ নালিশ জানাতে পারেনি। এবং জানালেও সে যুগের ছেলেরা বিশ্বাস করতো না তাদের বৌদের কথা।

শুভদা শাস্তির আয়োজন করেছিল এক অভিনব উপায়ে। যে রূপের জন্য দরিদ্র অনভিজাত পরিবারের মেয়ে মনোরমার বিয়ে হয়েছিল ধনীগৃহে সে রূপেই প্রথম আগুন দিল শুভদা।

নাপিত এনে জোর করে ন্যাড়া করে দিয়ে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পুরে দিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিল। শুধু দু'বেলা তাকে আধপেটা খেতে দেবার ব্যবস্থা করা হোল।

তখন মনোরমা অন্তঃসত্ত্বা! তার একমাত্র ভরসা ছিল ঈশ্বর। মনোরমা দিনরাত অন্ধকার ঘরে কাঁদতো—তার ভগবানকে ডেকে ডেকে। ঐ ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিলনা। কেননা তার বাপের কুলে কেউ তখন ছিলনা। মা বাবা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিল। এক পিসী তাকে বিয়ে দিয়েছিল। সে পিসীও বিয়ের পর ইহলোকের সংসার ছেড়ে যায়।

কাজেই সেই যুগে,সেই অন্ধকার ঘরখানায় আবদ্ধ একটি অসহায় নারীর প্রতিমুহূর্তের বেদনায় যে ভয়াবহ দিনগুলো কাটতো—সে দৃশ্য আমাদের কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

রাণী পিসী শুধু বলেছিল, ওরে ভগবান ঠিকই আছে—ওই অবলা নারীর বুকে কি বলই না ছিল। যে মেয়ের মুখ ফুটতো না, বুক ফাটতো—একদিন সে, কি কাণ্ডই না করে ফেললো! ভগবান যেন ওর পেছনে ছিল—নইলে অমন সাহস পায়?

তাহলে কি হোল ব্যাপারটা? রাণী পিসীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

যা বললো, তা এই—একদিন কি ভাবে ঘর খোলা পেয়ে মনোরমা বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। সেই ন্যাড়া মাথা—ময়লা কাপড়ে ঢাকা একটা শীর্ণকায় শরীর না খেয়ে খেয়ে আধখানা হ'যে গিয়েছিল, দেহে তার এক-কোঁটাও শক্তি ছিলনা। কিন্তু মনে তার কি এক অপরিসীম সাহস জেগেছিল। এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য তার ভেতরের এক আদিম মানবিকতার শক্তি ফিরে এসেছিল এক পৈশাচিক রূপে।

শুভদা দালানের ওপর বসে ছিল পেছন ফিরে। কিছু পূর্বে পারানী এসে ডাব পেরে দিয়ে কাটারীটা রেখে গিয়েছিল দালানের ওপর। কেউ কোথাও তখন আশেপাশে ছিলনা।

সেই কাটারীখানা তুলে নিয়ে সজোরে কোপ বসিয়ে দিল শুভদার ঘাড়ের ওপর। একটা বীভৎস রক্তকাণ্ড শেষ করে পাগলের মত হাসতে লাগলো মনোরমা।

একটা বিকট উন্মাদগ্রস্ত হাসির শব্দেই দশদিক থেকে লোক ছুটে এলো। কিন্তু একি। ন্যাড়া মাথা, মলিনবেশী, অনাহারক্লিষ্ট মনোরমাকে যেন অনেকেই চিনতে পারল না রাজেনের বৌ বলে।

যাই হোক, এর পরে তার হাত থেকে রক্তমাখা কাটারীটা কেড়ে নিতে খুবই বেগ পেতে হয় সকলের। কিন্তু শেষমুহূর্তে কাটারীটা দেবার আগে মনোরমা আরো একটি কাণ্ড করে ঘটনার সমাপ্তি ঘোষণা করলো।

নিজের গলায় কোপ বসিয়ে সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ঘোষাল বাড়ীর নির্যাতিতা বধূ—আর তার চোখ খুললো না কোন দিনও। একই সংগে শাশুড়ী-বৌয়ের মরণ হয়েছিল রক্তশয্যায় শুয়ে।

এক সংগেই তাদের চিতা সাজানো হয়েছিল। সেই অভিশপ্ত আকাশমুখী সহস্র লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে রাজেন তার শেষ চোখের জল ফেলছিল নিঃশব্দে…

ঠিক সেই সময়ে উর্মি দাসী এসে পায়ের ওপর কেঁদে আছড়ে পড়লো। বললো সমস্ত ঘটনা। টাকার লোভে পড়ে সেও যা পাপ করেছে—তারও যেন শাস্তি হয়। সে শাস্তি ঐ পৃথিবীর মানুষ তাকে না দিলেও—ভগবান দেবেন। কাজেই···

রাজেন স্তব্ধ! চিতার আগুন শেষ হয়ে আসছিল। শেষ হয়ে আসছিল রাত।

রাত শেষের ধূসর অন্ধকারে এসে দাঁড়ালো তার সেই মনোরমা। যেন ধীরে ধীরে তার পা দুটো ছুঁতে আসছিল, বলছিল, স্বর্গে যাবার আগে তোমার পায়ের ধুলো নিই···

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো রাজেন। আশ্চর্য, শ্মশানে বসে ঢুলতে ঢুলতে সে যেন এমনি করে স্বপ্ন দেখছিল তার প্রেয়সীকে।

কিন্তু চোখ খুলে মনে হোল—মনোরম আর কখনো আসবেনা তার কাছে ফিরে। আর আসবে না অভিশপ্ত ঘোষাল বাড়ীতে সেই পাষাণ প্রতিমা।

আবদার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমারি গরবে আমি করেছি দম্ভ,
মর্ত্ত্যেই হইবে মোর স্বর্গ আরম্ভ।
আসিয়াছে জরা পথ নাহি বেশীদূর,
এই ধরা থাকে যেন তেমনি মধুর।
অটুট আনন্দ রহে, রহে প্রিয়জন,
গৌরবে আমারে লয়ে যাউক মরণ।
যত দিন থাকি যেন হরির কৃপায়,
প্রতিটি মুহূর্ত মোর কাটে তপস্যায়।
নিকটে থাকেন যেন সদা ভগবান,
ধরণীর সুধা করি শেষাবধি পান।
বুকভরা থাকে প্রেম পরিতৃপ্ত মন—
হউক অখণ্ড পুণ্য মোর এ জীবন।
যাইতে প্রস্তুত আমি প্রস্তুত সদাই।
তবে তাঁর হাত ধরে নিয়ে যাওয়া চাই।

ধরিত্রীর রঙ

শ্রীবংশী মণ্ডল

বিবর্ণ আঁধার কাঁপে অফুরন্ত সাগরের কণা
আমার আকাশে আন একবিন্দু আলোর স্বপন
আজো কি পেয়েছি প্রিয় প্রমূর্ত্তির মিলন এষণা
প্রভাত রহস্যে খুঁজি সকাতর দিগন্ত জ্বলন।
কোকিল নিবিড় রাত্রে জানে কি সে শিশুর হতাশা
হিমাদ্রি বিস্ময় প্রিয় স্মরে তার কাব্যের আলোক
নিষ্করুণ পাষাণের বক্ষে আজি অবলুপ্ত ভাষা
পাবে কি নূতন ছন্দ সকরুণ সুরাভ বাসক ?
দিন হয়ে এল শেষ আজি কার ফলোন ফসল
সহস্র যোজন তীরে আজো কাঁদে জীবন কামনা
বালুকার শূন্য তটে ফিরে পাক ঐশ্বর্য্য অঞ্চল
মনের আকাশে তার সূর্য্য বুকে পরমাণু কণা।
হেমন্ত শিশির স্নাত ধরিত্রীর দিনান্ত আকাশ
হতাশার স্বপ্ন মাঝে ছুটুক না সৃষ্টির মিছিল
শ্যামলে সতেজ হোক প্রিয়তম সশ্রদ্ধ বাতাস
নিবিড় প্রাণের স্বপ্নে স্নিগ্ধ হোক অপার নিখিল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেতকীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভ্রা দেখল তখনো বেশ বেলা আছে। এই বিকাল বেলাটা বাড়ি ফিরে যেতে তার আর ইচ্ছা করল না। রোজই তো এই সময় গাড়িতে গাড়িতেই কাটে। ভিড় ঠেলে ওঠা নামা। তারপর ট্রামে বাসেও ভিড়। বাড়িতে ফিরে সেই একই পারিবারিক পরিবেশ, সংসারের হিসাব নিকাশ মায়ের কিছু না কিছু অভিযোগ, আর উপদেশ বর্ষণ। সব মিলিয়ে কেমন যেন একঘেয়ে কাটে দিনগুলি।

কিন্তু আজ কিছু না ভেবে চিন্তে বেরিয়ে পড়া এই দিনটিতে যেন কিসের একটা নতুনত্বের স্পর্শ আছে। শুভ্রার মনে হল এই দিনটি যেন যা খুশি তাই করবার দিন।

বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে বাস ধরল শুভ্রা। নামল এসে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। দুদিকে দোকানপাটগুলি খোলা। ক্রেতারও অভাব নেই। দলে দলে ঢুকছে বেরোচ্ছে। মাঝে মাঝে যুগলমূর্তিও দেখা যাচ্ছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। কোন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে একটি পুরুষকে দেখলে সহজেই তার স্বামী বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু দুটি কুমার-কুমারীকে দূর থেকে হঠাৎ তাদের সম্বন্ধ বুঝবার জো নেই। ছেলেটি মেয়ের সাধারণ বন্ধুও হতে পারে, প্রণয়ীও হতে পারে, আবার মাসতুতো পিসতুতো ভাইও হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ধরণের সম্পর্কই থাক না, তারা যে পরস্পরের সঙ্গী, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হঠাৎ শুভ্রার মনে হল একজন সঙ্গী থাকা যেন নিজেই দ্বিগুণ হয়ে থাকা। আর অনেক সময় একা একা নিজেকে বড় নিঃসহায় মনে হয় শুভ্রার। একা যেন পুরো একজন না, একজনের অর্ধেক।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পুরোণ বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভ্রা।

পিছনে নতুন বইয়ের সারি সারি বড় বড় দোকান। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এসব বইয়ের দোকানে সহপাঠিনীদের নিয়ে ঢুকত। কোনদিন বা শুভ্রা নিজে কিনত, কোনদিনবা অন্য কেউ। যেই কিনুক না এই কেনাটাই যেন এক উৎসব ছিল। দিনগুলিই যেন ছিল উৎসবের কাল।

সেই উৎসবের দিনগুলিকে আজ আর যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সব সঙ্গী সাথী কোথায় কে রয়েছে

কে জানে। কলেজে পড়তে পড়তেই কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ বা এরই মধ্যে ছেলেমেয়ের মাও হয়েছে। যারা ছিল এক সময় অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের অনেকেরই সঙ্গেই এখন আর যোগাযোগ নেই।

শুভ্রাকে দেখে স্টলওয়ালা ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে উঠল 'কী বই চাই।'

শুভ্রা বলল, 'দেখছি।'

কোন নির্দিষ্ট বইয়ের নাম তার এই মুহূর্তে মনে পড়ল না। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই হঠাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল শুভ্রা।

'আরে আপনি যে এখানে।'

শুভ্রা মুখ ফিরিয়ে দেখল সমীরণ।

তার বগলে একটি বইয়ের প্যাকেট।

শুভ্রা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি যে এখানে।'

সমীরণ হেসে বলল, 'আমার তো এইই জায়গা। আমি তো প্রায়ই আসি এখানে। আমাদের লাইব্রেরীর জন্যে বই কিনতে আসি। আপনার বুঝি আজকে ছুটি?'

'হ্যাঁ। আপনার?'

সমীরণ বলল, 'আমার অফিস ছিল। অফিসের পর আমি মাঝে মাঝে এদিকে চলে আসি। পুরোণ বইয়ের স্টল ঘাঁটা আমার এক অভ্যাস। লাইব্রেরীর বহু বই আমি এসব দোকান থেকে কিনেছি। আবার আমাদের লাইব্রেরীর কিছু কিছু বই হাত ঘুরতে ঘুরতে এসব দোকানে বিক্রি হয়েছে তাও দেখেছি।'

সমীরণ একটু হাসল।

স্টলের মালিক প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমাদের দোকানে কিন্তু ওভাবে আমরা বই কিনিনে। আমরা দেখে শুনে নিই।'

সমীরণ বলল, 'আমি আপনার দোকানের কথা বলছিনে। কিন্তু এমন হারিয়ে যাওয়া বই আমি এসব জায়গায় এসে ফিরে পেয়েছি।'

কারো বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ নেই। হারাণো আসলে চুরি করা বই যে ফিরে পেয়েছে তাতেই আনন্দ সমীরণের।

শুভ্রা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। সমীরণের চেহারা সুন্দর নয়। গায়ের রং কালো। মুখের গড়ণেও খুঁৎ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন খুঁৎ চোখে পড়লনা শুভ্রার। স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তাই যেন প্রত্যক্ষ করল শুভ্রা।

খুঁজে খুঁজে একখানা বই বের করল সমীরণ! শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন।

হাতে নিয়ে বলল, 'এ বইখানা আমাদের লাইব্রেরীতে ছিল। হঠাৎ দেখি উধাও হয়েছে। ভেবেছি বইখানা কিনে নেব।'

স্টলওয়ালা বলল, নিন না। দাম তো বেশি নয়। কণ্ডিশন খুব ভালো আছে বইয়ের। চার টাকাতেই দিচ্ছি আপনাকে নিন।'

সমীরণ বলল, 'না, আরো কিছু বই আজ কিনে ফেলেছি। অত টাকা সঙ্গে নেই।'

শুভ্রা বলল, আমি দিচ্ছি দাম। নিন না আপনি।'

বলে দশ টাকার একটি নোট সে বের করে দিল। হাত খরচের জন্যে রাখা শেষ নোটখানা।

সমীরণ বাধা দিয়ে বলল,'সে কি, আপনি কেন দেবেন।'

শুভ্রা হেসে বলল, দিলামই বা আপনাদের লাইব্রেরীকে একখানা বই। পারিনে কি দিতে?'

সমীরণ বলল, 'কেন পারবেন না? লাইব্রেরীর সঙ্গে আপনারও নিশ্চয়ই যোগ আছে। আপনিও তো আমাদের একজন পৃষ্ঠপোষিকা, শুভানুধ্যায়িনী।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'অত বড় বড় কথা বলবেন না। আমি শুধু একজন সাধারণ সদস্যই হতে পারি।'

বইখানি কেনা হয়ে গেলে সযত্নে নিজের প্যাকেটের মধ্যে বেঁধে নিল সমীরণ। তারপর কয়েক পা এগিয়ে বলল, 'নতুন সদস্যাকে আমি যদি এক কাপ চা খাওয়াতে চাই তিনি কি বিশেষ আপত্তি করবেন?'

শুভ্রা বলল, 'আপত্তি কিসের?'

সমীরণ বলল, 'অবশ্য আমি শুধু এক কাপ চা-ই খাওয়াতে পারি। বই কিনে একেবারে ফতুর হয়ে গেছি।'

শুভ্রা বলল, 'তা হলে আরো কেন ফতুর হতে চাইছেন?'

সমীরণ বলল, 'যে ধনী হয় সে চায় আরও ধনী হতে। যে ফতুর হয় তার ঝোঁক ফতুরতর হওয়ার দিকে। এইই অগ্রগতি।'

দুজনে ঢুকল রেষ্টুরেন্টে। এখানে ক্লাসমেটদের সঙ্গে শুভ্রা এর আগেও দুএকবার এসেছে। কিন্তু এমনভাবে অর্ধ পরিচিত যুবকের সঙ্গে একা একা আসা এই প্রথম। শুভ্রার পক্ষে এ যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান। এতে শুভ্রা যেন নিজেই রোমাঞ্চিত।

পর্দা ঢাকা কেবিনে দুজনে বসল মুখোমুখি। শুভ্রা বলল, 'কী খাবেন বলুন।'

সমীরণ বলল, 'সে কি! ডেকে আনলাম আমি আর আপনি খাওয়াতে চাইছেন?'

শুভ্রা হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। ফতুর মানুষের কাছ থেকে বাসভাড়াটা কেড়ে নিয়ে লাভ কি।'

সমীরণ বলল, 'এই অকিঞ্চনকে চিনতে আপনার আর কিছু বাকি রইল না।'

শুভ্রা বলল, 'ও কি কথা। এত অল্পেই কি কেউ কাউকে চিনতে পারে।'

খাবারের অর্ডারটা শুভ্রাই দিল। সমীরণ বলল, 'আমার পৌরুষের আর কিছু বাকি রইল না।'

শুভ্রা বলল, 'ছেলেরা যতই আধুনিক হোক সেই পুরাকালের সংস্কার ছাড়তে পারে না। পৌরুষ বুঝি শুধু রেষ্টুরেন্টের বিল শোধ করার মধ্যেই।'

খেতে খেতে লাইব্রেরীর কথা উঠল, নৈশবিদ্যালয়ের কথা উঠল। গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। শিক্ষাই হল সব কিছুর মূল। কুসংস্কার আর দারিদ্র্য শিক্ষা ছাড়া কিসে দূর হবে।

অন্যসময় হলে এসব কথায় হয়তো শুভ্রার হাসি পেত। সেই পুরোন ধরণের গ্রাম সংস্কারের কথা। একটি গ্রাম তো সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একক চেষ্টায় কি কয়েকজনের উদ্যোগে একটি গ্রামকে কি এমন আলাদা ভাবে সোনার গাঁ করে তোলা যায়?

কিন্তু এই মুহূর্তে সে সব তর্ক শুভ্রার মনে এল না। সে যেন এক মূর্ত আদর্শবাদকে এই যুবকের মধ্যে দেখতে পেল। সেই আদর্শ তার বাবারও তো ছিল।

সমীরণ বলল, 'আপনারা যদি এগিয়ে আসেন, আপনাদের সাহায্য যদি পাই তাহলে আরো অনেক কিছু যেন করা যায়।'

শুভ্রা সেই মুহূর্তেই সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল না। কিন্তু সমীরণের এই চাওয়ার ভঙ্গিটুকু ভালো লাগল।

শুভ্রা বলল, দেখা যাক। রোজই তো আমাকে যেতেই হয় আপনাদের গ্রামে। মুখের কথা ছাড়াও আমি আরো কোন কাজে লাগতে পারি কিনা, কি আপনি আমাকে লাগাতে পারেন কিনা তা আমাদের কাজের সময় আর সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে।'

সময় আর সামর্থ্য কিন্তু ইলাষ্টিক দুইই চেষ্টা করলে বাড়ানো যায়।'

শুভ্রা একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি?'

একটু বাদে দুজনে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল। কে কাকে আগে বাসে তুলে দেবে তাই নিয়ে মধুর মতান্তর।

সমীরণ বলল, 'পুরুষের এই কাজটুকু আমাকে করতে দিন, না হয় আমার সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত চলুন।'

শুভ্রা বলল, 'তা হলে আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আজ থাক। আর একদিন বরং আপনাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেব। আজ বাসে তুলে দেওয়ার দায়িত্বটা আপনার ওপর দিলাম। আশা করি আপনার পৌরুষের অভিমান এতে তৃপ্ত হবে।'

বাসের ভিড়ের মধ্যে শুভ্রা কোনরকমে একটু দাঁড়াবার জায়গা করতে পারল। তাকে দেখে দুজন ভদ্রলোক লেডিজ সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নিজে জানালার ধারে বসে তাঁদের একজনকে বসবার জায়গা করে দিল শুভ্রা। তারপর ভাবতে ভাবতে চলল।

সমীরণের স্নিগ্ধ সৌজন্য, আর মধুর সান্নিধ্য ছাড়া সেই মুহূর্তে শুভ্রার চিন্তাজগতে আর কিছুর স্থান ছিল না।

[ক্রমশঃ
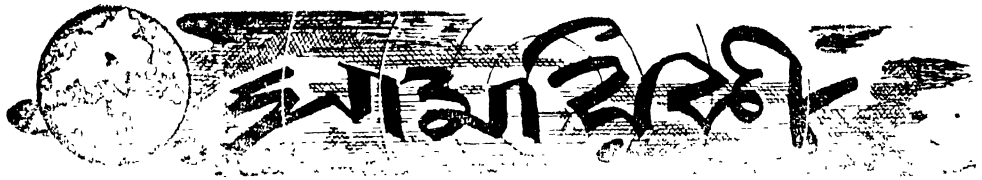
পশ্চিমবাংলার নূতন মন্ত্রীসভা—

গত সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১২৭টি আসন দখল করে। তখন সকল বিরোধীদল একত্রিত হইয়া শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। সে দলের সদস্য প্রায় ১৫০ জন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অজয়বাবুকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাইলে তিনি গত ৩রা মার্চ নিম্নলিখিত রূপ মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র ও সমবায়।

২। শ্রীজ্যোতি বসু—সহকারী মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ ও যানবাহন।

৩। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—খাদ্য ও কৃষি।

৪। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ি—প্রচার, পরিষদীয় বিষয় ও স্বায়ত্ব শাসন।

৫। শ্রীহেমন্তকুমার বসু—পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ।

৬। শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর—উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বন।

৭। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব।

৮। শ্রীসুশীল ধাড়া—শিল্প ও বাণিজ্য।

৯। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—সেচ।

১০। শ্রীননী ভট্টাচার্য্য—স্বাস্থ্য।

১১। শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রম।

১২। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পশুপালন ও মৎস্য।

১৩। শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী—আইন ও আবগারী।

১৪। শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত—পঞ্চায়েত ও সমাজ কল্যাণ।

১৫। শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য—শিক্ষা—

১৬। শ্রীদেওপ্রকাশ রায়—উপজাতি উন্নয়ন।

১৭। শ্রীনিরঞ্জন সেন—পুনর্বাসন ও ত্রাণ।

১৮। শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু।

বলা বাহুল্য অজয়বাবু নূতন বাংলা কংগ্রেস দলের নেতা। জ্যোতি বসু বামপন্থী কমুনিষ্ট দলের নেতা এবং সোমনাথ লাহিড়ি দক্ষিণ পন্থী কম্যুনিষ্ট দলের নেতা। দুইটি কম্যুনিষ্ট দল হইতে আরও দুইজন করিয়া মন্ত্রী লওয়া হইয়াছে। হেমন্তকুমার বসু পুরাতন দেশকর্মী বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পর কংগ্রেসের বিরোধী দলে যোগদান করেন। জাহাঙ্গীর কবীর ও সুশীলধাড়া এক বৎসর পূর্বে কংগ্রেস ছাড়িয়া বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন দেশকর্মী এবং বিভূতি দাসগুপ্ত পুরুলিয়ার ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুত্র ও খ্যাতনামা গঠনকর্মী। কাশী কান্ত মৈত্র প্রসিদ্ধ দেশকর্মী লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পুত্র এবং শিক্ষিত যুবক। শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক মনি ভট্টাচার্য্যের পুত্র উচ্চশিক্ষিত ও তরুণ বয়স্ক।

কাজেই মন্ত্রীসভা যদি একযোগে কাজ করিতে পারে তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের লোক উন্নতির আশা করিবে। মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর বয়স ৬৩ বৎসর অবিবাহিত ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং সারা জীবন দেশসেবা করিয়াছেন ১৯৪২ সালে তাঁহার নেতৃত্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারত ছাড় আন্দোলন চলিয়াছিল। তিনি গত ১৭ বৎসর মন্ত্রীর কাজও করিয়াছেন। মাত্র এক বৎসর পূর্বে মতভেদের জন্য কংগ্রেস ছাড়িয়া বাংলা কংগ্রেসদল গঠন করিয়াছেন এবং তমলুক ও আরামবাগ দুইটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার জয়লাভ নির্বাচন ইতিহাসে অসাধারণ বলা যায়।

নিশীথবাবু বর্তমানে পি, এস, পি দলভুক্ত। তিনি

আজীবন দেশসেবক বয়োবৃদ্ধ এবং প্রবীন কর্মী। মন্ত্রী-সভায় প্রফুল্লবাবু এবং হেমন্তবাবুর মত নিশীথবাবুরও মতের মূল্য থাকিবে। কাজেই নূতন মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গের নিরাশার কারণ নাই।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার—

গত ৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীবিজয় ব্যানার্জী স্পীকার (সভাপতি) ও শ্রীহরিদাস মিত্র ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিজয়বাবু কলিকাতার হাজরা রোডের প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান এবং কয়েকবার মেয়র হইয়াছিলেন। হরিদাস মিত্র মহাশয় পূর্ব্বে যশোহরের অধিবাসী ছিলেন ও আজীবন নির্যাতীত দেশকর্মী। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী বেলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেলার মৃত্যুর পর তাঁহার নামে হাওড়া ডালকুনির নিকট বেলানগর উদ্বাস্তু কলোনী স্থাপিত হইয়াছে। উভয়েই পরিচিত ব্যক্তি কাজেই তাহাদের নির্ব্বাচনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

নূতন মন্ত্রীদের কর্মতৎপরতা—

নূতন মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াই কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে মাছ সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি একদিন কলিকাতার সকল বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীদের ডাকিয়া শহরে কি করিয়া সুলভে বেশী মাছ সরবরাহ করা যায় তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কয়েকটি জেলায় বিল অঞ্চলে ঘুরিয়াও বেশী পরিমাণ মাছ আনার ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য্য মন্ত্রী হইয়াই কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে বিনা নোটিশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার ফলেও হয়ত কিছু ভাল কাজ হইতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্যও কলিকাতার সকল কলেজের খবরগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। এবং কি করিয়া কলেজের শিক্ষা উন্নত করা যায় সে জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী—

ভারতে ৫।৬টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হইলেও দিল্লীর কেন্দ্রীয় লোকসভায় কংগ্রেস দলের সকল বিরোধী দল অপেক্ষা সদস্য সংখ্যা অধিক হইয়াছে। তাহা হইলেও এবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সমস্যা কঠিন হইয়াছিল। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় শ্রীমোরারজী দেশাই শ্রীমতী গান্ধীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন এবার সেজন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ ও অন্যান্য নেতারা বহু চেষ্টা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। ফলে পূর্বেই স্থির হইয়াছিল শ্রীমতী ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হইবেন ও শ্রীমোরারজী দেশাই সহকারী প্রধানমন্ত্রীর কার্য করিবেন। শ্রীমোরারজী দেশাই-এর এই সুবুদ্ধিতেই সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীদেশাই পুরাতন কংগ্রেসকর্মী, তিনি বহুদিন কেন্দ্রে মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন কাজেই শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত একযোগে কাজ করিলে দেশ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে।

কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা—

গত ১৪ই মার্চ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হইয়াছে। আগে মন্ত্রী সভায় ছিলেন পুরা মন্ত্রী ১৫ জন এবং রাষ্ট্র মন্ত্রী ১৮ জন। এবারে হলেন ১৯ জন পুরা মন্ত্রী ও ১৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী। নূতন মন্ত্রী সভায় ১১জন নূতন লোক আসিয়াছেন তাহার মধ্যে ৫জন পুরা মন্ত্রী ও ৬জন রাষ্ট্র মন্ত্রী। ৫জন পুরা মন্ত্রী হলেন ডাঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ করণ সিং; ডাঃ ভি, কে, আর ভি, রাও, শ্রীকে, কে সাহা ও শ্রীচন্না রেড্ডি।

৬ জন রাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন ডঃ এস্ চন্দ্রশেখর, শ্রীকে, সি পন্থ, ডাঃ ফুলরেণু গুহ। শ্রীপরিমল ঘোষ অধ্যাপক সেপা সিং ও শ্রীরঘুনাথ রেড্ডি। মন্ত্রী সভায় শ্রীমতী ইন্দিরার পর শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ দ্বিতীয় মহিলা। তিনজন বিশেষজ্ঞকে নূতন মন্ত্রী করা হইয়াছে। (১) শিক্ষাবিদ ডাঃ ত্রিগুণা সেন, (২) অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি, কে, আর ভি রাও ও (৩) জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্রশেখর।

১২ই মার্চ সারা রাত্রি শ্রীমতী ইন্দিরা নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই তালিকা সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, শ্রীজি, এস পাঠক ও শ্রীসুশীলা নায়ার আগে মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। এবার তাঁহারা আর মন্ত্রী রহিলেন না।

বাংলার তিনজন—

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডাঃ ত্রিগুণা সেন এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রী হওয়ায় বাঙ্গালীর মনে বিশেষ আনন্দ হইয়াছে।

তিনি সারা জীবন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং গত ১৫ বৎসর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার বা ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে তিনি সে পদ ত্যাগ করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সালার হইয়াছিলেন। তাঁহার মত সহৃদয় ও পরিশ্রমী শিক্ষাব্রতী অতি অল্প দেখা যায়।

একদিকে যেমন তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান অন্যদিকে তেমনই দরিদ্রদের প্রতি দরদ খুবই বেশী। কাজেই তিনি নূতন মন্ত্রী হওয়ায় বাঙালীর গৌরব ও আনন্দ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাঃ ফুলরেণু গুহও সমাজসেবা ক্ষেত্রে বাঙালী জনগণের সুপরিচিত। তাঁহার স্বামী ডাঃ বীরেশ গুহ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ছিলেন ও শ্রীমতী গুহ দীর্ঘকাল বাংলা দেশে নারী কল্যাণ আন্দোলনে কাজ করিতেছেন। শ্রীপরিমল ঘোষ বয়সে নবীন হইলেও উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরাতন লোক বাদ দিয়া এই তিনজন নূতন সদস্যকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করায় সকলেই তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।

লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন—

গত ১৭ই মার্চ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরোধী অপেক্ষা ৭১ ভোট বেশী পাইয়াছেন। লোক সভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫২৫ জন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য বৃদ্ধি—

গত ১৮ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিনজন নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) মহীশূরের শ্রীএম, এস গুরুপদস্বামী

(২) বিহারের শ্রীভগবদ ঝা আজাদ এবং

(৩) দিল্লীর শ্রীআই কে উজরাল।

এখন পূর্ণমন্ত্রী ১৯জন, রাষ্ট্রমন্ত্রী ১৭জন ও উপমন্ত্রী ১৫ জন মোট ৫১জন লইয়া কেন্দ্রের মন্ত্রীসভা গঠিত হইল।

অন্যান্য রাজ্যের কথা—

কেরলরাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল একা বিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়াছেন। কাজেই সেখানে তাঁহাদের মন্ত্রীসভা গঠনে কোন অসুবিধা হয় নাই। উড়িষ্যায় ও বিহারে কিছু কিছু কংগ্রেসী নেতা বিরুদ্ধ দলে যোগদান করায় কংগ্রেস বিরোধীরা বিধানসভায় অধিক আসন লাভ করিয়াছেন এবং বিহারে পুরাতন কংগ্রেসকর্মী শ্রীমহামায়া প্রসাদকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া নূতন মন্ত্রীসভা এবং উড়িষ্যায় পুরাতন দেশীয় রাজা শ্রী আর এন সিংহ দেওকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজে কংগ্রেস বিরোধী যে ডি-এম-কে দল জয়লাভ করিয়াছে তাঁহাদের দাবি হিন্দীকে যেন রাষ্ট্রভাষা করা না হয়। মাদ্রাজের এই দল কংগ্রেস বিরোধী হইলেও তাঁহারা কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত সকল বিষয়ে একযোগে কাজ করিবেন বলিয়াছেন। আরও দুই তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণ না থাকায় তথায় স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনে অসুবিধা হইতেছে। পাঞ্জাব পুরাতন গঠনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া তিনটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। সেখানেও সর্বত্র কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা হয় নাই। উত্তরপ্রদেশে পুরাতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত অতি কষ্টে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। কাজেই এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে সাবধানতার সহিত কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। সে জন্য মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গত ২২শে মার্চ দিল্লী গিয়াছিলেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা ও আর্থিক দুরবস্থার কথা দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্য অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কেন্দ্রের গুদামে যথেষ্ট খাদ্য নাই। কাজেই তাঁহাদিগকে পশ্চিম বাংলার চাষীদের নিকট হইতে বেশী দামে ধান-চাল কিনিয়া কম দামে তাহা রেশনের দোকানে বিক্রয় করিতে হইবে। এইভাবে কতদিন খাদ্য সরবরাহ চালান যাইবে তাহা বলা কঠিন। খাদ্যের উৎপাদন বর্দ্ধিত না হইলে এই সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি—

গত ১৭ই মার্চ শনিবার বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির নিজস্ব গৃহে বালিগঞ্জের নূতন পুলের কাছে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হইয়াগিয়াছে। সম্পাদক ৮০ বৎসর বয়স্ক শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘ কাল ধরিয়া এই সমিতির পরিচালন করিতেছেন। এবং তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার অবাঙালী বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। জ্যোতিষবাবু প্রায় একার চেষ্টায়ই সমিতিকে শুধু বাঁচাইয়া রাখেন নাই নানাভাবে সমিতির কার্য্য করিয়া এবং কলিকাতায় সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেশের একটি বড় উপকার করিয়া চলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

বিশ্ব-বন্ধুত্ব

শ্রীজ্ঞান

গতবারে তোমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেছি। এবারেও বন্ধুত্ব সম্বন্ধেই আরও কিছু—বলছি, তবে তা আরও বড় ধরণের বন্ধুত্ব। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এই বন্ধুত্বের বিস্তৃতি বিরাট বিশ্বের দিকে দিকে। আজ মানুষ শুধু নিজ সীমানার মধ্যে, নিজ এলাকার মধ্যে বন্ধুত্ব করেই তৃপ্তি পাচ্ছে না—তার মন ছুটে চলেছে দূর থেকে দুরান্তরে, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, সীমা থেকে অসীমের মাঝে! আকাশ পথে, জলপথে, স্থলপথে এখন যেন গতির ঝড় বয়ে চলেছে। তাই আগে যে দেশে যেতে লাগত এক মাস, এমন সেখানে যেতে লাগে একদিন! মানুষ এখন মহাশূন্য জয়ের স্বপ্নে বিভোর—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সে ছুটে যেতে চায়, চন্দ্রে পাড়ি জমাবার প্রস্তুতিতে সে এখন মগ্ন! তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের এই পুরাণ পৃথিবীর সীমানা বিংশ শতাব্দীর এই মধ্য-ভাগে যন্ত্রযানের অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষে যেন খুবই ছোট হয়ে এসেছে।

মানুষও ছুটে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে—তার পরিচিতের পরিধিও পরিব্যাপ্ত হচ্ছে—বেড়ে চলেছে তার বন্ধুর সংখ্যা। কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে না পারলেও দেশ দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, বন্ধুত্ব করতে চায়। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় চিঠির মাধ্যম। এই পত্রের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে যে বন্ধুত্ব হয় তাকে যে "Pen-friend" বলা হয় তা তোমরা অনেকেই জান। এই "পেন-ফ্রেণ্ড" বা "লেখনি বন্ধু" আজকাল অনেকেই করছে। এতে করে দূর বিদেশের একটি ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা চাক্ষুষ না হলেও তার মূল্যও বড় কম নয়। ছবির মাধ্যমে অবশ্য চেহারা দেখতে পাওয়া যায়, আর পত্রের মাধ্যমে ঘটে ভাব বিনিময়। এই ভাবে অনেকেই অল্প খরচায় নিজের ঘরে বসে সুদূরের বন্ধুকে জানাতে পারে তার নিজের কথা, তার দেশের কথা, তার ঘরের কথা এবং আরও অনেক কিছুই।

বিদেশীরা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারে না। ওদেশের কাগজে-পত্রে আমাদের দেশের কথা বিশেষ প্রচারিত হয় না। অথচ ওসব দেশের জ্ঞানী গুণীদেরই শুধু নয়—কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীদেরও প্রাচ্যের এই বিরাট ঐতিহ্যময় দেশ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ রয়েছে। ব্যয়বহুল ভ্রমণের সুযোগ অনেকেই পায় না, অথচ অপর দেশকে জানবার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। তাই তারা অনেকেই তাদের বয়স উপযোগী আমাদের দেশের থেকে "পেন্ ফ্রেণ্ড" চায়। তারা জানতে চায় আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কার, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার এবং আরও অনেক কিছুই—বিশেষ করে তোমাদের ছোট্ট মনের ভাব, ভাবনা, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদিও। তোমরা কি তাদের ডাকে সাড়া দেবে না? তোমাদেরও কি জানতে ইচ্ছে করে না ওদেশের ছেলে মেয়েদের নিজেদের

কথা? নিশ্চয়ই করে—তাই না? সুতরাং তোমরাও উঠে পড়ে লেগে যাও ঐ রকম বিদেশী "পেন্-ফ্রেণ্ড"-এর সন্ধানে। পেয়ে গেলে তার সঙ্গে যোগাযোগ কর এবং নিয়মিত ভাবে তার সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ কর। ডাক টিকিটের জন্যে খরচা কিছুটা হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই তোমাদের বাবা, মা বা অভিভাবকেরা তা দিতে কার্পণ্য করবেন না। কারণ এও এক ধরণের শিক্ষা। শুধু পুস্তক পাঠের মধ্যে দিয়ে নয়, টাটকা চিঠির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় পাচ্ছ আর একটি দেশের নানা বিষয়ের। শুধু তাই নয় সে দেশের একটি তোমার সমবয়সী সজীব মনের অনেক কথাই তুমি জানতে পারছ, আর জানাতে পারছ তোমার নিজের কথাও। এটা কি কম আনন্দের, কম উপভোগের?

তবে একটা বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রেখ। তোমরা যা কিছু তাদের জানাবে তা যেন সত্য, সঠিক, সঙ্গত হয়। আজে বাজে বিষয় নিয়ে লিখ না বা যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের সঠিক ধারণা নেই, সে সব সম্বন্ধোন্দ আজে কিছু জানাতে যেও না। যদি জানাতেই হয় তাহলে বিশেষ খোঁজ খবর নিয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে সঠিক খবরই দেবে। তা নইলে, ভুল খবরে আমাদের দেশের সম্বন্ধে বা তোমাদের সম্বন্ধে তাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আর একটা কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান যে বিদেশীদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে হলে বিদেশী ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলতে একমাত্র ইংরাজী ভাষাই আমরা বুঝি। ফরাসী, জর্ম্মন, রাশিয়ান্ প্রভৃতি ভাষা আমাদের দেশে অল্প সংখ্যক লোকেই জানেন। তোমাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই জান না। কিন্তু ইংরাজী তোমরা শিখছ—আর বিদেশীরা, যারা ভারতীয়দের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চায় তারাও, ইংরাজী তাদের মাতৃভাষা না হলেও, কথা চালান গোছের ইংরাজী জেনে তারা ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই চিঠি লিখে থাকে। তোমরা যদি সুযোগ পাও তাহলে ইংরাজী ছাড়াও অন্য বিদেশী ভাষা শেখবার চেষ্টা কর। আর সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষাটাকেও ভাল করে শিক্ষা করবার চেষ্টা কর। তা না হলে "পেন্-ফ্রেণ্ড"-এর সঙ্গে পত্রালাপ করতে বিশেষ অসুবিধা হবে।

আশা করি তোমরা, যারা পত্রালাপ করতে চাও তারা অচিরেই উপযুক্ত "পেন্ ফ্রেণ্ড" লাভ করতে পারবে এবং পত্রালাপে যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দও লাভ করতে পারবে।

* * *

সুবুদ্ধি

—কালু পাল

এক কৃষক ছিল। সে খেটে খেতে চাইত না।

সে দিনের বেলায় ঘরে বসে থাকত, আর রাতের বেলায় ঘুরে ঘুরে দেখত যে কার ক্ষেতে ভাল ফসল ফলেছে।

যার ক্ষেতে ভাল ফসল ফলত তার ক্ষেতে রাতের অন্ধকারে গিয়ে সে ফসল চুরি করে আনত।

এই ভাবেই কৃষকের দিন চলে যাচ্ছিল।

একবার কৃষক তার পুত্রকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে একজনের ক্ষেত থেকে ফসল চুরি করে আনতে গেল।

ক্ষেতে প্রবেশ করার সময় কৃষক তার পুত্রকে বলল, দেখত, কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা!

কৃষকের পুত্র চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে তার পিতাকে জানাল যে, সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর কৃষক নিশ্চিন্ত মনে ক্ষেতে প্রবেশ করে ফসল কাটতে সুরু করে দিল।

কৃষকের যখন বেশ কিছু ফসল কেটে বস্তা বোঝাই করা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ কৃষকের পুত্র চীৎকার করে বলে উঠল, পিতা, একটা কথা আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে।

কৃষক থতমত খেয়ে ফসল কাটা বন্ধ রেখে তার পুত্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি কথা?

কৃষকের পুত্র মাথার ওপর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, পিতা, ওপরের দিকে ত দেখা হয়নি!

ভগবান সেখান থেকে আমাদের চুরি করা লক্ষ্য করছেন কিনা, তা ত দেখিনি।

পুত্রের কথায় কৃষকের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হল, সে ভাবল, তাইত, এটা ত সে কখনো ভেবে দেখেনি। সে কেবল লোকচক্ষুকেই এতদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছে। ভগবানের কথা ত তার একবারও মনে হয়নি। ভগবানের চক্ষু ত সদা জাগ্রত। সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ নয়। তিনি ত তার চুরি করা অবশ্যই লক্ষ্য করছেন।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের মনে ভয় দেখা দিল।

সে ফসল কাটা বন্ধ করে দিল। কাটা ফসল সেখানেই ফেলে রেখে দিয়ে পুত্রের হাত ধরে ঘরে ফিরে এল।

করজোড়ে তার কৃত অপরাধের জন্যে সে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

শ্রমের দ্বারা অর্জিত অপরের সম্পদ ফাঁকি দিয়ে ঘরে আনা থেকে কৃষক অতঃপর বিরত হল।

সে নিজেও পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়ে এরপর থেকে জীবিকানির্বাহ করতে লাগল।

* * *

ছোট্ট ছেলে বুবু

শ্রীরঞ্জিত বন্দোপাধ্যায়

ছোট্ট ছেলে বুবু আপন খেয়াল খুশী মতো
কাটা পেঁয়াজ মশলা-বাটা আটা ভুষি যত-
যত্ন করে মিশিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসে
শব্দ শুনে মা যখন তার রান্নাঘরে আসে।
"দস্যিপনার দেখছি তোমার একটু বিরাম নাই-
কোনটা ছেড়ে বলতো এখন কোনদিকে সামলাই।
বাবা যে তোর অফিস যাবে, দিদি যাবে ইস্কুলে
কেমন করে রান্না হবে সব যদি তুই নিস্ তুলে।
বারে বারে বারণ করি আসবেনাকো কদাপি
রান্নাঘরে আসা তোমার থামলনাকো তথাপি।
একটু গেছি পাশের ঘরে চোখের আড়াল সামান্য
সেই সুযোগে করলে তুমি মাতৃআজ্ঞা অমান্য!
বেটাছেলে নয়কো তুমি, নাইকো হেন সন্দেহ
রান্নাঘরের পানে তবে ছুটছে কেন মন-দেহ।
যাক সে কথা, এখন তোমার বাঁধতে হবে হাত দুটো,
নইলে তুমি ঘাঁটবে এবার কয়লা কিম্বা কাঠ-কুটো।"
শাস্তি শুনে ভয় পেল না, আস্তে আস্তে এগুলো
দুই হাতে তার কাটা পেঁয়াজ হাসতে হাসতে সে গুলো
মেঝের পরে ছড়িয়ে দিয়ে মায়ের পানে তাকিয়ে—
এক পা এক পা করে বুবু পড়ল শেষে ঝাঁপিয়ে।
বন্দী হল অপরাধী সন্ধি হল স্বাক্ষর—
মায়ের সাদা শাড়ীর গায়ে হলুদ-বাটা অক্ষর।
কিছুপরেই শোনা গেল বুবুর দিদির উচ্চরব
"আমার বই এর বাক্স খুলে তোমার এ কী হচ্ছে সব।
এ সব তুমি ঘাঁটছ কেন, নাইকো তোমার এক্তিয়ার-
তোমার মতো বিরক্তিকর দেখিনিকো ব্যক্তি আর।
বই ছিঁড়েছ কালি মেখেছ এবার কিসের মতলব-
দেখতে নেহাৎ ছোট্ট হলেও নয়কো তুমি সৎ লোক।
দয়া করে বিদেয় হও হাতের বইটি—নামিয়ে-
তোমায় নিয়ে আর পারি না, সত্যি বলছি আমি এ।"

একটি বছর বয়স বুবুর, একটি বছর পূর্বেতে—
গৃহে আমার শান্তি ছিল ভ্রান্তি নাইকো খুব এতে।
যেখানকার যা সেখানটিতে থাকত সবই ফিটফাট।
পরিচ্ছন্ন মেঝের পরে ফেলত না কেউ ইট কাঠ।
জুতোগুলি ঘরের কোণে ছাতিটি ঐ বাঁ' ধারে—
হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত আলোয় কিম্বা আঁধারে।
টেবিলেতে খাতা কলম যা তা জিনিষ থাকত না
লাইনবন্দী বইগুলি সব ধুলা কাদা মাখতো না।
—মধ্যিখানে ফুলদানীতে রাখত মেয়ে ফুল ভরে—
ওলট পালট কোন কিছু করত না কেউ ভুল করে।
থালা বাসন ঘাঁটত না কেউ, হাত দিত না খুন্তীতে—
পেয়ালা পিরিচ—ঘন ঘন কমতোনাকো গুন্তিতে।
যথাস্থানে রাখত মেয়ে বই খাতা আর বাক্স তার
লণ্ডভণ্ড করত না কেউ দিনের মধ্যে একশ' বার।
সে সব দিনের সাথে আজি মস্ত সত্যি তফাৎটা
কারণ তখন ছিলনাকো ছোট্ট দস্যি ডাকাতটা।

ঠাণ্ডা ছিল মেজাজ সবার নিয়ম করে কাজ হত
গণ্ডগোলটা ছিলনাকো শুনছি ঘরে আজ যত।
শান্তি ছিল প্রতিষ্ঠিত একটু খানিক টলত না
—কিন্তু আমার আঁধার ঘরে লক্ষ মানিক জ্বলত না।

দ্বন্দ্ব

নীলিমা চক্রবর্তী, বি-এ

জানালার দিকে মুখ করে ছোট্ট Valia ঘাড় উঁচু করে একান্ত মনোনিবেশে প্রায় তার আধা মাপের একটা প্রকাণ্ড বই পড়ছিল। কালো অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল রেখে পড়ছে ও, পাছে হারিয়ে যায় ওর পড়ার খেই। রাজকুমার Bova এক অসম্ভব বীর ছেলে, আর তারই বীরত্ব কাহিনী পড়তে পড়তে Valia চলে গেছে সেই প্রিন্স Bova'র স্বপ্নরাজ্যে—এমন সময় পড়ায় পড়ল বাধা, ওর মা ঘরে ঢুকলেন সঙ্গে একটি অপরিচিতা মহিলাকে নিয়ে।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখে valia সত্যকান্নায় ওর মার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করছে। এখনো তিনি তাঁর লেসের রুমালটি দিয়ে চোখ মুছছেন। অপর মহিলাটি Valia'র গলা জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় একটি চুমা দিয়ে বললেন 'Valichka বাচ্ছা, বাচ্চারে আমার, কি সুন্দর মিষ্টি সোনামণি আমার। Valia'র কিন্তু মোটেই এ আদর ভাল লাগছিল না। মুখ শক্ত করে, ভুরু কুঁচকে শুধু ভদ্রতার খাতিরেই Valia তাঁর আদর সহ্য করছিল। কেমন যেন মহিলাটি। শক্ত সরু ছুঁচলো প্যাটার্ণের মুখ। উঁচু শিরা বার করা সরু লম্বা লম্বা হাত দিয়ে কেমন করে যেন উনি আদর করেন—কিন্তু Valia'র মা কি সুন্দর নরম, আর কি চমৎকার তাঁর আদর। মা কাছে এলেই কি সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ Valiaকে আচ্ছন্ন করে ফেলে কিন্তু এর গা দিয়ে কেমন যেন ঘামের ভিজা ভিজা গন্ধ। হঠাৎ মহিলাটি ওর হাতদুটি ধরে মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে সুরু করলেন। টপ্ টপ্ করে বড়বড় জলের ফোঁটা ওঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল একের পিছনে আর একটি—যেমন তিনি হঠাৎ কান্না সুরু করেছিলেন, তেমনিই আবার হঠাৎ কান্না থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেন 'Valichka, তুমি আমাকে চেন? চেন না? কেন আমিত তোমায়—দুবার দেখতে এসেছিলাম।"

V. lia'র ভারী বিরক্তি লাগছিল, কতকগুলা বাজে প্রশ্ন করে শুধু অমন চমৎকার গল্পটা উনি তাকে শেষ করতে দিচ্ছেন না।

Valia বাবা আমি তোমার মা। বলেন মহিলা আগ্রহান্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে ওর মুখে। আশ্চর্য্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে Valia দেখে ওর মা যেন কখন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেছেন—বিরক্ত হয়ে ও উত্তর দেয় 'কি বলছেন, মা আবার কারো দুটো হয় নাকি? মহিলা হেসে উঠলেন এক অস্বাভাবিক হাসি। ভারী বিরক্তি লাগে Valia'র। না Valia মা দুটো হয় না তবে আমিই তোমার মা, এরা শুধু তোমায় প্রতিপালন করেছে, কিন্তু আমিই তোমার আসল মা—আচ্ছা কি বই পড়ছ তুমি, গল্পটা বল না আমাকে। Valia ছোট্ট হলে কি হবে। ওঁর গলার আগ্রহহীন কৃত্রিম সুর ঠিক ধরা দেয় ওর কানে। তবু কি আর করে, অনিচ্ছা সত্বেও Valia সুরু করে তার গল্প। কিন্তু কিছুদূর বলেই ও বুঝতে পারে যে উনি মোটেই ওর, গল্প শুনছেন না, কি যেন এক চিন্তায় ডুবে রয়েছেন মন দৃষ্টি চলে গেছে যেন কোথায় ওকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে। ভারী রাগ ধরে Valiaর, ওর মনে হয় রাজকুমার Bova'র অসম্মান করছেন উনি তাই ও তাড়াতাড়ি কোনরকম গল্পটি শেষ করে চলে। এইত আর কি।' 'বেশ সুন্দর, সোণামণি আমার, বলে আবার তিনি তাঁর রুক্ষ ঠোঁট চেপে ধরেন Valia'র গালে এবং বলেন "আজ যাই, আবার আসব আমি আমি এলে তুমি খুশী হবেত Valia'.

ওঁকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য Valia বলে, হ্যাঁ, আবার আসবেন, আমি খুব খুশী হব। আগন্তুক চলে যায়; এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢোকেন ওর মা। এবং তিনিও ছেলের দিকে চেয়েই কাঁদতে সুরু করেন। অচেনা মহিলাটির কান্নার তবু একটা কারণ থাকতে পারে। কারণ তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত বোধ করেন যে তিনি অমন নোংরা ও অদ্ভুত মত—কিন্তু তার মা,

অমন মিষ্টি মা। কাঁদবে কেন? সব যেন কেমনই লাগে Valia'র।

কেমন একরকম সুর টেনে টেনে ও বলে "শো··ও ··না, মা, ঐ মহিলাটি কি অদ্ভুত। কি যে বলেন। কারো আবার দু দুটো মা হয় নাকি? কিসসু জানেন না উনি। 'না বাবা তা পারে না, তবে উনিই তোমার সত্যি মা'। তবে······তবে, তুমি কি? অর্ত্তস্বরে যেন কেঁদে ওঠে Valia. আমি···আমি···তোমার পালিতা মা। 'অদ্ভুত, অসম্ভব অদ্ভুত, সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায় ওর মাথায়—তবু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্থির করে বলে 'তা হওনা তুমি পালিকা মা। নামের মধ্যে কি আছে? তবু তুমি···তুমিই আমার সব, ও আমার কেউ না।

তবু ওর মা বোঝাতে চেষ্টা করেন। 'অনেকদিন আগে যখন তুমি এই এৎটুকুন ছিলে তখন তোমার মা কোন কারণে বাধ্য হয়ে তোমাকে দিয়ে দেন আমার হাতে। কিন্তু এখন যখন Valia আমার সুন্দর বড় হয়ে উঠেছে তখন ওর মা আবার ফিরে এসেছেন সেই ফেলে যাওয়া শিশুকে অধিকার করতে। যাবে কি valia তাঁর কাছে?'

'না, না, কিছুতেই না। বিশ্রী, বিশ্রী বিশ্রী লেগেছে আমার ওকে।' ওর মা ওর মাথায় ছোট্ট একটা চুমা দিয়ে অশ্রু ঝরান হাসি হেসে চলে যান ঘরের কাজে। আর Valia নিঃশেষে ডুবে যায় আবার তার খেই-হারানো গল্পে—মন থেকে মুছে যায় সেই হঠাৎ দেখা মা—কিন্তু ছোট হলে কি হবে Valia বুঝতে পাবে যে সারা বাড়ীটার আবহাওয়া তিনি বদলে দিয়ে গিয়েছেন।

যখন তখন ওর মা ওর দিকে চেয়ে টপ্ টপ্ করে চোখের জল ফেলতে সুরু করেন। আর বারে বারেই ওকে জিজ্ঞাসা করেন 'Valia কি ওদের ছেড়ে যেতে চায়? বাবাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। মা কাছে না থাকলেই তিনিও টাকে হাত বুলাতে বুলাতে ওকে জিজ্ঞাসা করতেন নানান কথা—'Valia ওকে কতখানি ভালবাসে, ওর কি এই বাড়ীতে থাকতেই সবচেয়ে ভাল লাগে, অন্য কারো বাড়ীতে থাকলে কি ওর মন খারাপ করবে? এইরকম সাত সতেরো প্রশ্ন। সেদিন রাতে ওর বিছানায় শুয়ে কেন জানি ওর ঘুম আসছিল না। এমন সময় বাবা মার কথায় ওর নিজের নাম শুনে কান খাড়া করে শোনে valia ওঁদের কথাবার্তা—'Nostarisa তুমি বড্ড যা তা বকছ, Valiaকে আমরা কিছুতেই দেব না"। "না Grisha, সেটা অন্যায় হবে, ওর মা সত্যিই ওকে ভালবাসে।"

"তাই নাকি? আর আমরা—আমরা ওকে ভালবাসি না, তাই না? সত্যি আজকাল তুমি এমন বোকার মত তর্ক করতে শিখেছ যে মনে হয় যেন ওকে এবাড়ী থেকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ।" "ছিঃ ছিঃ Grisha এমন কথা বললে তুমি, বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন ওর মা—লেপের তলায় শুয়েও বুঝতে পারে valia."

ওর বাবা কেমন যেন একটু লজ্জিত সুরে বলেন "আরে, আরে, কাঁদছ কেন? না, তুমি আজকাল একেবারে ছোট্ট খুকীর মত অবুঝ হয়ে গেছ। কিন্তু বলত কেন দেব ওকে আমরা। হৃদয়হীনা মা যখন নিজের সুবিধার জন্য নিজের সন্তানকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল পরের কাছে, তখন কোথায় ছিল এই মাতৃস্নেহ! আর আমরা যখন আমাদের অন্তর নিংড়ে সব স্নেহ দিয়ে ওকে বড় করে তুললাম তখন ফিরে এসে মা বলছেন কিনা ফিরে নিয়ে যাব আমার সন্তান, কারণ আমার সুসময়ের আমোদের বন্ধুরা আমার ত্যাগ করেছে, আমি এখন একা—বড় একা।"

আবার শোনে মমতা ভরা কণ্ঠে মা বলেন "না না এমন অবিচার কর না, তুমি বেশ ভাল করেই জান ও কত একাকী।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ জানি বইকি, আর এটাও খুব ভাল করে জানি যে ঐ পরিবেশে গিয়ে পড়লে আমাদের Valia শেস পর্য্যন্ত একটা গুণ্ডা হয়ে উঠবে, তুমি আমায় বড্ড বিরক্ত করছ Natashia, সে ভারী বেচারী, আর আমরা, আমরা কি একা নই, কে আছে আমাদের ঐ মিষ্টি Valia ছাড়া?" যেমন তুমি ঠিক তেমনই হয়েছে আমার ঐ উকিলটা—বলে কি জিততেও পারি, হারতেও পারি—আহা হা! যেন কি মস্ত কথাই না বলেছেন। যাক্ আর

আমি তোমার সঙ্গে বকতে পারি না। এখন একটু ঘুমুতে দাও আমাকে।"

শুয়ে শুয়ে Valia ভাবে কেমন ধারা মানুষ ঐ অচেনা মহিলাটি, যার কাছে গেলে ও চোর বদমাস হয়ে যাবে। এইরকম ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ও ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা ওর মনে হয় ও যেন কোন্ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বাবা মা দুজনেই ক্ষণে ক্ষণে ওর দিকে এমন এক করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন যেন ওর একটা ভয়ঙ্কর অসুখ করেছে। মৃত্যু ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যার দিকে যখন বাড়ীটা নিঝুম হয়ে প্রায় ঝিমোতে থাকে, আর Vaila পড়ার ঘরে গল্পের বই এর মধ্যে ডুবে যায়, তখন ঘরের কোণে রাখা দেয়াল বাতির আলোর ছায়ায়, ফুলদানির ফুল আর লম্বা পাতার দীর্ঘ ছায়ায় ঘর যেন হয়ে ওঠে মায়াময়—সে ছায়ার মায়া সুন্দর নয় সে ভয়ঙ্কর বিশ্রী ভীতিপূর্ণ Valiaর মনে হয় কোথায় যেন লুকিয়ে আছে সেই ভয়ানক কুৎসিত জানোয়ারটা আর এখুনি এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। লাইব্রেরী ঘরে বাবা একটা বই খুলে বসে থাকেন, পড়েন কিনা কে জানে। ঐ ঘরেরই একটা সোফায় মা একটা বোনা নিয়ে বসে থাকেন কিন্তু সে বসার মধ্যে নেই কোন প্রশান্তি—যেন একটু জোরে চললে, কথা বললে বা কাঁসলে এখুনি কিছু হয়ে যাবে। রাতে বিছানায় শুয়ে আধ-ঘুমে ও টের পায় বাবা মা পা টিপে টিপে এসে প্রদীপের আলো তুলে নিমিমেষে চেয়ে আছেন ওর দিকে! Valia বোঝেন বাড়ীর এ অস্বাভাবিক আবহাওয়া শুধু ঐ সেদিনের দেখা অদ্ভুত মহিলার আগমনের ফল। ভারী রাগ হয় ওর তাঁর ওপর। কেমন লম্বা সরু ছুঁচলো মুখখানা, না, ওঁর সঙ্গে থাকতে হলে valia মরেই যাবে! ওর এই এমন সুন্দর মাকে ও কিছুতেই ছেড়ে যাবে না। কেমন যেন এক ভয় বাসা বেঁধেছে ওর মনে। গল্পের বইতে মন বসে না, সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গ আনন্দ দেয় না, দেয় বিরক্তি।

হঠাৎ একদিন রাতে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে Valia মা ডাকেন 'Valia Valia সোনা, আমার" Valia ঘুম ভেঙ্গে দুহাতে মার গলা জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে—মাগো আমার ভয় করছে, তুমি আমায় ধরে রাখ, আমি—আমি যাব না তোমাদের ছেড়ে কিছুতেই যাব না। সে রাতটা সবার কি ভাবেই যে কাটে gregoryর এ্যাজ্‌মার প্রকোপ এত বেড়ে গেল যে সে নিজে বা Nostasia সারারাতেও দুচোখের পাতা এক করতে পারল না।

কয়েকদিন পর সকালে Valia মার সঙ্গে বসেছে খাবার খেতে, এমন সময় gregory একেবারে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে Valiaকে দুহাতে তুলে ধরে বলতে লাগলে হু—র্‌—রে—হুর্‌—রে, অস্বীকার করেছে কোর্ট—অস্বীকার করেছে Valia আমাদের। আনন্দে gregoryর গলা দিয়ে আর সুর বার হয় না, শুধু দুচোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে বড় বড় মুক্তার মত—সত্যি! সত্যি বলছ তুমি ভগবানকে অশেষ—ধন্যবাদ। Nastasia আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ গম্ভীর করে কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চায়" নিশ্চয়ই এত হবেই, আরে এত জানা কথাই—বাবা কি উকীলই লাগিয়েছিলাম। ওকে বোকা বানাবে এমন হাকিম তোমার এদেশে নেই!

হঠাৎ Nastasia চীৎকারে থেমে যায় gregoryর valia জ্ঞান হারিয়ে চেয়ার থেকে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে ওর শিশুমনের যত ভীতি আজ তা অবাস্তব জেনে নিজেকে সাম্‌লিয়ে রাখতে পারেনি। পরদিন বাড়ীতে যেন নবজীবনের বন্যা এল। বইয়ের পোকা নিরীহ valia পাড়ার ছেলেমেয়েদের সর্দার হয়ে দাঁড়াল Nastasia রকমারী রান্না করে খাওয়ায় আর gregory টাকে হাত বুলায় আর হাসিমুখে শিশুদের খেলায় যোগ দেয়। Valia এখন শোনে প্রায়ই ওর বাবা মা সেই অচেনা মহিলাটির সম্বন্ধে "আহা বেচারী" কথাটা ব্যবহার করেন। Valiaও তাঁকে আর ভয় করে না বরং মার কাছে শুনে শুনে ও-শুদ্ধ ভাবে আহা বেচারী!"

কিন্তু হাকিমের বিচারও পাল্টায় হাইকোর্টের বিচারে। আবার Valiaর সত্যিকারের মা পেল তার অধিকার এবং একদিন সাড়ম্বরে তিনি উপস্থিত হলেন Valiaকে নেবার জন্য। gregory তার আগেই

বাড়ী ছেড়ে কোথায় যেন বেড়িয়ে গেছে। Valiaকে নিয়ে যাবে ঐ দৃশ্য তিনি সইতে পারবেন না। Nastasia যে কোন্ ঘরের কোণে লুকিয়েছেন তা কে জানে। ফার্ কোট্ গায়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে ঝি এর হাত ধরে বেড়িয়ে আসে Valia। মুখ তুলে ও চায় না, চুপ করে দাঁড়ায় একপাশে। মহিলা একটু হেসে তরল সুরে আদর করতে চান্ ওকে কিন্তু ছোট্ট Valia কোন উত্তরই দেয় না। ওর কথায় গম্ভীর মুখে মাটির দিকে চেয়ে বলে আমরা এখন যাই"। এমন সময় Nastasia দুহাত বাড়িয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে Valiaকে, কেঁদে কেঁদে ওর চোখ মুখ ফুলে গেছে—কথা সে বলতে পারে না, শুধু Valia-কে বুকের কাছে চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদে। দৃঢ় কঠিন ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলে মহিলাটি "Valia, চলে এস। তোমার মাকে যারা এত কষ্ট দিয়েছে তাদের কাছে আর এক মুহূর্ত্তও নয়। হায় ভগবান! আমার নিজের সন্তানকে ফিরে পেতে এরা আমায় কি দুঃখই না দিয়েছে! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে Nastasia "ওকে দেখবেন। যত্ন করবেন, উ; Valia সোনা আমার!

ভাড়ার্যে শ্লেজ্ গাড়ী নিঃশব্দে গাড়িয়ে চলে নরম তুষারের ওপর। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে Valiaর অতি পরিচিত শান্তিময় গৃহ। গাছের ছায়ার ঢাকা বাতায়ন চেরী জেরিমিয়াম-এর পুষ্পশয্যা আস্তৃত বাড়ী—ডুবে যায় চিরতরে Valiaর সামনে হতে—গাড়ী এগিয়ে চলে। নিঃশব্দে মসৃণভাবে। Valia বসে আছে ঠোঁট চেপে, শুধু একই দিকে চেয়ে। অনুভূতি নেই সে মুখে—মনে হয় যেন সব ঠিক পরীর গল্পের মতই অবাস্তব। ও নিজে এবং ওর পাশের এই না-চেনা-না-জানা মা।

তবুও শেষ হয় যাত্রা। পৌছয় এসে এরা একটি অগোছাল ভাপ্‌সা ঘরে। বিছানাটা কেমন নোংরা—কোথায় ওর পরিচিত হাল্কা নীলের আব্‌ছা ছায়া মেশা ঘরে সুদৃশ্য খাটে লেপের ঝালর লাগান নরম বালিশ, পুরু গদী তোষকের বিছানা।

ওর মা কেমন যেন জোর করে টেনে আনা হাসি হেসে বলেন, বড় ঠাণ্ডা লাগছে—তাই না? আচ্ছা দাঁড়াও তোমায় গরম গরম চা খাওয়াচ্ছি। এতদিনে Valia তার নিজের মার ঘরে এসেছে। valia বাবা, তোমার জন্যে কত খেলনা আমি কিনেছি। অনিচ্ছুক দৃষ্টি ফিরিয়ে Valia দেখে কতগুলো কি সব বাক্সে খেলনা। কাগজের নৌকা, টিনের রংচটা সৈনিক। এগুলো আবার খেল্‌না নাকি? তবু বলে বেশ ভাল। কিন্তু ওর দৃষ্টির ভঙ্গী দেখেই মা বুঝতে পারেন যে ও খুসী হয়নি—"অনেকদিন আগে শুধু তোমার কথা ভেবেই ওগুলো কিনেছিলাম। আমিতো জানি না তুমি কি ভালবাস। আর Valia আমার নিজের বলতে কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে এমন একটি লোক নেই যার কাছে জেনে নেব কি খেলনা পেলে আমার Valia সুখী হবে"। হঠাৎ সেই সরু ছুঁচলো লাইনা পড়া মুখের মাংস পেশী কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। আর টপ্ টপ্ করে একটির পর একটি অশ্রু বিন্দু দ্রুত ঝরে পড়তে লাগল তার ভাঙ্গা গাল বেয়ে—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে বলতে লাগল আপন মনেই ও সুখী "হায় ভগবান" ও খুসী হয়নি।

করুণ অনুভূতি জাগে ছোট্ট Valiaর ছোট্ট অন্তরে—ও এগিয়ে আসে। দারুণ শীতে আগুণহীন ঘরে প্রায় জমে আসা হাতটি ওর রাখে মায়ের মাথার পরে আর গম্ভীর গলায় বলে। কেঁদ না মা, আমি তোমায় ভালবাসব। খেল্‌না আমি ভালবাসি না, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসব। যদি তুমি চাও তবে তোমার আমি জলপরীর গল্প পড়েও শোনাতে পারি।

থাকতো যদি দু'টী ডানা

—শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

খোকা ভাবে—পাখীর মতন
থাকতো যদি দুটী ডানা,
আকাশ পানে যেতাম উড়ে।
তুচ্ছ করে সকল মানা।
উঁকি দিয়ে দেখে নিতাম
সূর্য্যি মামার দেশটা কেমন,

নিত্য উড়ে চিল শকুনে
দেখে আসে গিয়ে যেমন।
চাঁদের দেশের খবর আমি
এনে দিতাম সবার কাছে,
'রকেট' ছেড়েও বিজ্ঞানীদের
জানতে যাহা বাকী আছে।
রাশিয়া, চীন, আমেরিকা
জার্ম্মাণী আর বিলাত গিয়ে,
বই-এপড়া দেশগুলো সব
দেখে নিতাম চোখটী দিয়ে।
দেশ বিদেশের খবর শুনে।
হোত সবাই অবাক পানা,
পাখীর মতন উড়ে যাবার
থাকতো যদি দু'টী ডানা।

———

শুশুকের কথা

—সলিল মিত্র

শুশুক। এক জাতের জলজন্তু। এদের জল কপিও বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস-কারী স্তন্যপায়ী জীব এরা। জলের নীচে তিন-চার মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। কিন্তু তাহলে কি হয়—এরা এতো চমৎকার সাঁতার জানে যে সব রকম মাছকেই সাঁতারে হারিয়ে দিতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাবার জন্যে এরা প্রতি ৩০ থেকে ৪০ সেকেণ্ডে এক একবার জলের ওপর ভেসে ওঠে।

এদের পেট থেকে মাথার দিকটা ক্রমে মোটা আর লেজের দিকটা সরু। নাক বেশ লম্বা আর ছুঁচলো। সমুদ্রের বিরাট জন্তু যে হাঙ্গর—তারাও এই শুশুকদের কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য।

শুশুক আর হাঙ্গর 'সামনা সামনি হলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হয়। শুশুক তার ছুঁচলো নাক দিয়ে হাঙ্গরের বড় বড় ফুল্‌কো একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে—তাতে হাঙ্গর পরাজয় মান্‌তে বাধ্য হয় এবং এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই তার মৃত্যু ঘটে।
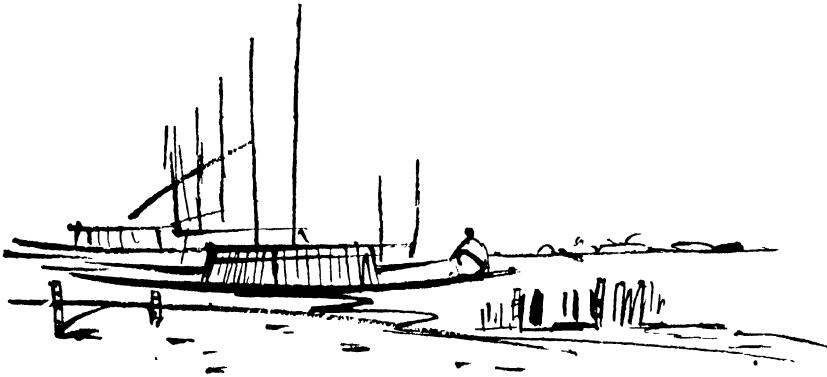
সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺শুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

রোভার্স কাপ ঃ

ভারত বর্ষে প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতা ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়ে ২৫শে মার্চ্চ শেষ হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ১-০ গোলে গোয়ার ভাস্কো ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে ফুটবল খেলায় বাংলা দেশের মুখ রেখেছে। এবার নিয়ে মোহনবাগান আটবার রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে দু'বার রোভার্স কাপ পেল। মোহনবাগানের প্রথম রোভার্স কাপ জয় ১৯৫৫ সালে। এখানে উল্লেখযোগ্য, মোহনবাগান এবার নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার রোভার্স কাপের ফাইনালে খেললো। আগের দু'বারের ফলাফল—১৯৬৪ সালে বি, এন. আর. এবং ১৯৬৫ সালে মফৎলাল দলের কাছে পরাজয়।

একদিকের সেমিফাইনালে মোহনবাগান এবং লিডার্স ক্লাব (জলন্ধর) উঠেছিল। এই খেলাটি তিন দিন ড্র (১—১, ১—১ ও ০—০) যায়। শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান টসে জয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে গোয়ার ভাস্কো ফুটবল দল ১—১ ও ২-১ গোলে বোম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দলকে পরাজিত করে ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যে একাধিক অঘটন ঘটেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দলের হাতে ১৯৬৬ সালের ডুরাণ্ডকাপ বিজয়ী গোর্খা ব্রিগেড দলের তৃতীয় রাউণ্ডে ৫১৫ আর্মিবেস ওয়ার্কসপ দলের কাছে ০—১ গোলে ১৯৬৬ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দলের এবং কোয়ার্টার ফাইনালে লিডার্স ক্লাবের কাছে ১—২ গোলে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয়।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্দ্ধের সতের মিনিটের মাথায় মোহনবাগানের কানন প্রায় ত্রিশ গজ দূর থেকে জয়সূচক গোলটি দেন। এই গোল ছাড়া মোহনবাগান একাধিক গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন ঃ

লণ্ডনের উইম্বলীতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৭ সালের অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচটি বিভাগের ফাইনাল খেলার মধ্যে ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা চারটি বিভাগের ফাইনালে খেলে চারটিতেই খেতাব জয় করেন। পুরুষ এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে সকল খেলোয়াড়রাই ছিলেন ডেনমার্কের। পুরুষদের সিঙ্গলসে ডেনমার্কের আরল্যাণ্ড কপসের খেতাব জয় লাভের সূত্রে তিনি এই নিয়ে গত ৯ বছরে ৭ বার সিঙ্গলস খেতাব জয়

করলেন। অপর দিকে আমেরিকার শ্রীমতী জুডি হাসম্যান গত ১৪ বছরে এই নিয়ে ১০ বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন। এর মধ্যে উপর্য্যুপরি ১১ বারের ফাইনাল খেলায় ৮ বার জয়—উপর্য্যুপরি জয় ৫ বার (১৯৬০—৬৪)। শ্রীমতী জুডি হাসম্যানের এই ১০ বার সিঙ্গলস জয় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্ব্বাধিক সংখ্যক সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড বলে গণ্য।

ফাইনাল ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস্ : আরল্যাণ্ড কপস (ডেনমার্ক) ১৫—১২ ও ১৫—১০ পয়েন্টে গত বছরের বিজয়ী তান আইক হুয়াংকে (মালয়েশিয়া) পরাজিত করে এই নিয়ে সাত বার খেতাব জয়ী হন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা) ৫—১১, ১১—৮ ও ১২—১০ পয়েন্টে কুমারী নোরিকো তাকাগিকে (জাপান) পরাজিত করে গত ১৪ বছরে ১০ বার খেতাব জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আরল্যাণ্ড কপস এবং এইচ বোর্চ (ডেনমার্ক) ১৫—৮ ও ১৫—১২ পয়েন্টে স্বদেশের এস এ্যাণ্ডারসেন এবং পি ওয়ালসোকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী ইমরী রিটভেল্ড (হল্যাণ্ড) এবং শ্রীমতী উল্লা স্ট্র্যাণ্ড (ডেনমার্ক) ১১—৫, ১৫—৮ ও ১৫—৪ পয়েন্টে শ্রীমতী জি হাসম্যান (আমেরিকা) এবং জে ব্রেনানকে (ইংল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সেভেন এ্যাণ্ডারসেন এবং উল্লা স্ট্র্যাণ্ড (ডেনমার্ক) ১৫—২ ও ১৫—১০ পয়েন্টে পি ওয়ালসো এবং কুমারী পি এম হানসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

১৯৬৭ সালের রেলওয়ে বনাম মাদ্রাজ দলের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে উভয় দলকেই রঙ্গস্বামী কাপের যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই নিয়ে তিনবার যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হল। ইতিপূর্ব্বে ১৯৫৫ সালে সার্ভিসেস মাদ্রাজ এবং ১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস রেলওয়ে দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। রেলওয়ে দল এই নিয়ে ৯ বার (সরাসরি জয় ৭ বার) এবং মাদ্রাজ দল ২ বার (দু'বারই যুগ্ম-বিজয়ী) জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেতাব জয়ী হল।

জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা ঃ

জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার ফ্রি ষ্টাইলে সার্ভিসেস দল ৩৩½ পয়েন্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি ১৩ বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ৩১ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আর্স হয়েছে রেলওয়ে। গ্রিকো রোমান বিভাগে রেলওয়ে দল ২৭½ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান এবং সার্ভিসেস দল ২৫ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আপ খেতাব লাভ করেছে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নতুন দিনের ভোরে—

চিত্র :
অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্র—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বৌদ্ধধর্ম্ম

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ "শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন অবতার বুদ্ধদেবও তেমনি, যদিও নিব্যক্তিক শক্তি চেতনায় বুদ্ধ এদের চেয়েও ক্ষমতাবান।" "কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন; উহা একটি অবস্থা বিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইযাছি। এসো তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।"—স্বামী বিবেকানন্দ। মোক্ষমূলর—"পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরল ভাবে এমন অতি প্রাকৃত বর্জ্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই।"—শ্রীশরৎ কুমার রায়। সম্যক্ সম্বোধিতে এ সৌদম্য সম্ভব বলেই বুদ্ধদেব লোকোত্তর নির্ব্বাণ পদে আরূঢ় থেকেও কর্ম্মের প্রচণ্ড আন্দোলন তুলেছিলেন জগতে অন্তশ্চেতনার নৈর্ব্যক্তিক হয়েও সার্থক ব্রতের উদযাপনে ব্যক্তি চেতনার চরম চমৎকার দেখিয়ে গেছেন পৃথিবীতে।" — অনির্ব্বাণ।

বুদ্ধদেব লিখিত কিছুই রাখিয়া যান নাই, তাহার কথিত উপদেশগুলিই পরে পিটক রূপে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব নিজেকে তথাগত (Transmitter) বলিতেন, যিনি সম্প্রদায় সিদ্ধসত্য পরম্পরার প্রচার করেন (Transmitter of

Ancient Wisdom) সেই পুরাণী প্রজ্ঞার প্রচারক। বুদ্ধ বলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ও মন্বন্তরে বুদ্ধগণ যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন আমিও সেই তত্ত্ব প্রচার করি।"—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্য দর্শনের ন্যায় অতি সুপ্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেকের মতে সাংখ্য দর্শনই আদি এবং ভারতীয় প্রায় সব দর্শনেই সাংখ্য দর্শনের প্রভাব অল্পবিস্তর দেখা যায়। দুঃখপদই ভারতীয় প্রায় সব দর্শনের মূল সূত্র এবং বৌদ্ধ দর্শনও তাহাই। বুদ্ধদেব নিজেকে চতুর্থ বুদ্ধ বলিয়াছেন। রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উল্লেখ আছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন বুদ্ধদেবের মূল লক্ষ্য ছিল নিম্ন প্রকৃতির অজ্ঞানতাকে জয় করা (Buddha stands for the conquest over the Ignorance of the lower nature—Sri Aurobindo)। এরূপ অবশ্য মনে রাখা দরকার পরলোক সম্বন্ধে তিনি কখনও আলোচনা করিতে চাহিতেন না। কিন্তু অল্প যা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা হইতে বোঝা যায় তিনি বেদান্তের পরব্রহ্মকে (বৌদ্ধদের আদি বুদ্ধ বা তন্ত্রের পরম শিব, গীতার পুরুষোত্তম) জানিতেন কিন্তু এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। নেতি বা শূন্যবাচক নির্ব্বাণ বুদ্ধদেবের নহে, তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধদের (Buddha, it must be remembered, refused always to discuss what way beyond the world. But from the little he said it would appear that he was aware of a permanent beyond equivalent to the Vedantic Para—Brahman, but which he was quite unwilling to describe. The denial of anything beyond the world except a negatie statev of Nirvana was a later teaching, not Buddha's—Sri Aurobindo) অর্থাৎ বুদ্ধদেব নির্ব্বাণের অতীত গীতার পুরুষোত্তমকে জানিতেন (ব্রহ্মজ্ঞানটি আমার নিকট হইতে নিবার পর হতাশ হইয়া তাঁহার অভয় প্রার্থনা করি, পরব্রহ্ম আমার মস্তকে আমার প্রার্থনা মত অদৃশ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার অভয়দান করিয়াছেন, অবশ্য সূক্ষ্ম শরীরে সবিকল্প সমাধি কালে : বুদ্ধদেব বলিয়াছেন প্রজ্ঞাপারমিতাকে লাভ করা সুকঠিন, এই প্রজ্ঞাপারমিতা নিরাকার সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপা। এর স্তুতি পড়িলে মনে হয় ইনি মূল পরা প্রকৃতি বা পুরুষোত্তমের মূল আদ্যা শক্তি, কারণ নির্ব্বাণে শক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

"তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নাম করেন নি, আত্মা পরমাত্মার জটিল তত্ত্বকে তিনি একেবারেই আমলই দিলেন না, অতি প্রাকৃত কোন কিছুর কথা কহিলেন না, অথচ সকলেই আগ্রহ সহকারে স্বীকার করিল। শিষ্যরা তাঁর কাছে যা পাইলেন তা শূন্য নয়, "না" নহে, তাহা আশা ও আনন্দ, অভয় ও অশোক, ঋষিরা যাকে বাক্যের ও মনের অগোচর বলিয়াছেন, সেই পরম সত্য বুদ্ধের শুদ্ধ শান্ত উপলব্ধির গোচর হয়। সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সাধকের স্বাধীনতা কোন দিকে খর্ব্ব হয় নাই বিন্দুমাত্র। তিনি আপনি আপনার অবলম্বন এবং আপনার বীর্য্যকে ও শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তিনি আপন অধ্যবসায় বলেই নির্ব্বাণ লাভ করেন।"—শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বুদ্ধদেব খৃষ্টপূর্ব্ব ৬২৪ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর মহর্ষি অসিত বলেন "ভবিষ্যতে দেবলোক ও পরলোকের হিতের জন্য এই কুমার ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। তিনি সংসার পিঞ্জরাবদ্ধ ও ক্লেশবন্ধনে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিবেন। বিশ্বের মুক্তিদাতা ও সকলের কল্যাণের নিদান হইবেন।" যশোধরার সঙ্গে ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; কথিত আছে ইহারা কয়েক জন্ম ধরিয়া স্বামী স্ত্রীরূপে জন্ম নিয়াছিলেন ("life after life she was the wife of future Buddha")। ২৯ বর্ষ বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় রাহুলের জন্মের পরই সংসার ত্যাগ করেন। ইহার পর ৬ বৎসরকাল নানাদেশ ভ্রমণ, শাস্ত্রপাঠ ও কঠোর হঠযোগ তপস্যায় অতিবাহিত করেন নানা গুরুর কাছে। "গুরু আড়ার বুদ্ধকে উপদেশ দেন "আত্মা" সম্বন্ধে অনেকটা উপনিষদের মত; রুদ্রক "কর্ম্মবাদ"; তথাগত আত্মাকে স্বীকার করেন নি কিন্তু কর্ম্মবাদ ছাড়া উপনিষদের আর একটা শিক্ষা তিনি নেন ব্রহ্মচর্য্য।" শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব। "অরাড় তাকে বিবেকজ, বিতর্ক বর্জিত প্রীতি বর্জিত ও সুখ দুঃখ বিবর্জিত চাররকম ধ্যানের কথা উল্লেখ করেন। এই চারপ্রকার ধ্যানে সিদ্ধ ব্যক্তি হৃদয়স্থিত আপনাকে ভাবনা করিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত আত্মাকেই অনন্তরূপে দর্শন করে। আবার কেহ আত্মার দ্বারা আত্মাকে বিবর্জিত

করিয়া "কিছুই নাই" বা "শূন্য" দৃষ্টি লাভ করেন, ইহা অকিঞ্চনায়তন ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। এ অবস্থাই পিঞ্জর হতে পক্ষী যেরূপ নির্গত হয় সেইরূপ দেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গত হইলে উহাই মুক্তি বা নির্বাণ নামে খ্যাত হয়। অরাঢ় সাধনের বিভিন্ন অনুভূতিতে আস্থাবান হলেও ক্ষেত্রজ্ঞরূপী অহং জ্ঞান তাহার বণিত নির্বাণে বিদ্যমান থাকায় বুদ্ধ তাকে চরম অনুভূতি বলেন না।" অরাঢের নির্বাণ লাভ হয়নি। এরপর রুদ্রক মুনির কাছে যান এর অবস্থাও তদনুরূপ, ইনি অরাঢের এক স্তর উর্দ্ধে, উহার নাম নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান, ইহাও মৃত্যু নিরোধে অক্ষম। বৌদ্ধরা যাহাকে বলেন আত্মা হিন্দুরা তাহাকে বলেন অনাত্মা আবার বৌদ্ধরা যাহাকে বলেন অনাত্মা হিন্দুরা তাকে বলেন আত্মা।

তত্ত্ব একই বিভেদমাত্র প্রকাশের ভাষায়। বৌদ্ধরা আত্মা মানেন না তাহা সত্য নহে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার নাথ (অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহিনাথ পরোসিয়া)। তেবিজ্জ সুত্তে বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে বলিয়াছেন—"হে বশিষ্ঠ! আমি তথাগত, আমাকে যদি কেহ ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে আমি ঐ লোকের কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, কোনপথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহাও বলিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি।" শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বুদ্ধদেব যাহা চাহিয়াছিলেন গুরুদের কাছে তাহা পান নাই ইহার পর কঠোর তপস্যা ছাড়িয়া মধ্যমপথ অবলম্বনে ৩৫ বর্ষ বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার মনে হয় নত্থি উত্তরী করণীয়ং "এর পর তাঁহার করণীয় আর কিছুই নাই। তখন দৈববাণী হয় "যাহা পাইয়াছ তাহা বিশ্বহিতে দান কর।" ভগবানের আদেশেই বুদ্ধদেব তাঁহার পরম কল্যাণধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। কথিত আছে তাঁহার দেহজ্যোতিঃ (aura) ২৫ মাইল ("Buddha's aura extended to 25 miles" T. Sorabji) বিস্তৃত ছিল কারো মতে আরো বেশী। ইহার পর ৬০ জন সন্ন্যাসী শিষ্যকে এবং পরে ২৫০ জন শিষ্যকে অর্হত্ব পদে উন্নীত করেন এবং চারিদিক একাকী "বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য ধর্মপ্রচার করিতে আদেশ করেন যাহার 'আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ (চরথ ভিকৃথকে চারিকং বহুজন সুখায়; দেশাথ সংধমং আদিক কল্যাণং কজ্জেকল্যাণং পরিযোগ কল্যাণং)। এই সদ্ধর্মের অপর নাম দুঃখ নিরোধবাদ যাহার অপর নাম নির্বাণ ('নিরোধ নাম নির্বাণং)। বুদ্ধদেবের সঙ্গী প্রায় ১২৫০ অর্হৎ শিষ্য ছিল। সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করেন। "ব্রহ্মজাল সুত্রে আছে তখন মগধে প্রায় ৬৩টি ধার্মিক ও দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। তখন মগধে ৬টি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এরা মকৃখলি গোশাল, মহাবীর, কাত্যায়ন নিগণ্ঠ, অজিত কেশকম্বলী (নাস্তিক) ও যশঞ্জয়। বুদ্ধদেব যে, বাংলায় অর্থাৎ পুণ্ড্র নগরে, সমতটে, কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্রাট অশোকের নির্মিত বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত রাজসাহীতে পাহাড়পুর গ্রামের সোনপুর বিহার, মালদহের জগদ্দল মহাবিহার, দিনাজপুরের বাণগড়, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি গ্রামের রক্তমিতি সংঘারাম।

"বুদ্ধ নিজে ও পরবর্তী কালে অশোকের সময় পর্যন্ত সঙ্ঘ নায়কেরা কোশল মগধের ভাষায় ধর্মের আলোচনা করতেন মাগধী প্রাকৃতে। জৈনরাও ঐ প্রাকৃতেই শাস্ত্র লেখেন। পালি কোশল মগধের ভাষা নয়, পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রের রূপ, অশোকের পর এর মধ্যে অনেক মাগধী শব্দ আসে। অশোকের পূর্বে বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা সুরু হয় মাগধী প্রাকৃতেই। ধর্মপদ প্রধান এর পালি, সংস্কৃত ও প্রাচীন প্রাকৃতে পাওয়া গেছে প্রাচীন অর্দ্ধ মাগধী-রূপে।" শ্রী-প্রবোধ চন্দ্র বাগচী। "বুদ্ধদেবের ধর্মে দুটি বিশিষ্ট ধারার সমন্বয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পবিত্রতা সহকর্ম সাধনার সহিত ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য কৌশল ও কর্ম নৈপুণ্য।" শ্রীশঙ্কর রায়। বুদ্ধদেব নিজে বীর ছিলেন এবং তাঁহার অহিংসার অর্থ আমরা যাহা মনে করি তাহা নহে। এই সম্বন্ধে সিংহ নামে জনৈক সেনাপতি তাহাকে প্রশ্ন করেন যে যদি কেহ তাহাদের আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য কি? তাহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে— "তোমরা কাহাকেও আক্রমণ করিও না কিন্তু যদি অপর কেহ তোমাদের আক্রমণ করে তোমরাও আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাতে যে পাপ হইবে তাহা আক্রমণকারীর, আত্মরক্ষার্থীর নহে।" অনেকে অনুযোগ করিয়া

থাকেন যে বুদ্ধদেবের অহিংসা ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিয়াছে, এ অনুযোগ মিথ্যা। বুদ্ধদেব চাহিয়াছিলেন মানুষ মুক্ত হউক, দুরদৃষ্ট তাহা হয় নাই। তাঁহার ধর্ম পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যেমন অন্যান্য সব ধর্মেরও অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে এবং তাহার জন্য বুদ্ধদেবকে দায়ী করা যায় না। বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে ৫৪৪ খৃষ্ট-পূর্বঅব্দে বৈশাখী-পুর্ণিমায় দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব বাস্তববাদী ছিলেন। উদ্ভট কল্পনা বা আকাশ-কুসুম তিনি রচনা করিতেন না। "As the wise test gold by cutting and rubbing (on a piece of touch-stone) so you are to accept my word after examing them not merely out of regard to me." Buddha) তিনি আরো বলেছেন "শ্রদ্ধা ভালো কিন্তু শ্রদ্ধাকে দৃষ্টির (উপলব্ধির) দ্বারা সুদৃঢ় করিতে হইবে ("Faith is useful but it must be grounded in sight Because one has to realise the supreme truth in his own person.")

আনন্দকে বুদ্ধদেবের শেষ উপদেশ মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারেনা তাহা তপস্যা করিয়াই অর্জন করিতে হয় ("None can help you, helf your selves, work out your own Salvation. Buddha is the name of infinite knowledge, infinite as the sky. I, Gautama have reached that state, you will all reach that too, if you struggle for it."—Swami Vivekananda) বুদ্ধ কথার অর্থ মহাকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান, আমি গৌতম, ঐ অবস্থায় পৌছিয়াছি। তোমরাও সকলে তাহা পাইতে পার যদি সাধনাকর।"

শ্রীঅরবিন্দ—নির্বাণ বা মোক্ষ সত্তার মুক্তির অবস্থাকে বলে কোন জগৎ নহে ("Nirvana or Moksha is a liberated condition of the being, not a world-Sri Aurobindo)। নির্বাণে কারো বলে কিছুই নেই, কাজেই এক ঘেয়ে লাগবে কার? নির্বাণের অভিজ্ঞতায় ব্যষ্টি সত্তার লোপ পায়।··· ওখানে "পাওয়া" বলে কোন জিনিস নাই। আছে "আমি" যা তা মুছে যাওয়া খসে পড়া। "তুমি" থাকতে নির্বাণ হতে পারেনা, সমস্ত আসক্তি, সমস্ত প্রকৃতি সত্তা খসলে তবে নির্বাণ প্রাপ্তি।...বিবেকানন্দ নির্বাণের শান্তি ও স্থিরতার কথা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে বোধ হচ্ছে পৃথিবীটা যায়। আমার যে নির্বাণের অভিজ্ঞতা তাতে দ্বৈতাশ্রিত প্রকৃতি লোপ পায়, ব্যষ্টি অহং দূর হয়ে নির্বাণে সেই এক (The one) হয়ে যায়। এই দ্বৈতাশ্রিত প্রকৃতির হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে নির্বাণের উপলব্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। খুব জোরালো অভিজ্ঞতা সেটা।···তখন এই জ্ঞান আসে যে একই সর্বত্র, একই আবার বহু এবং সেই একই তিনি বহু-সংখ্যক একত্ব" নীরদবরণ। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হন, ইহার সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মর কোন পার্থক্য নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন বৌদ্ধ নির্বাণ এবং অদ্বৈততত্ত্ব একই তত্ত্ব, গীতার ব্রহ্ম নির্বাণও তাহাই ("The Buddhist Nirvana and the Aditya Moksha are the same thing. It in the same as the Brahma Nirvana of the Gita" – Sri Aurobindo)। যখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ব্রহ্মে কোন চেতনা নাই তখন বলিতে চাহিয়াছেন তাহা মানবীয় চেতনা, যাহা আমরা জানি, তাহা নহে; ব্রহ্মসত্তা, চিৎ ও আনন্দ, স্বয়ং প্রকাশ (when Yajnavalka says there is no Consciousness in the Brahman state, he is speaking of consciousness as the human being knows it. The Brahman state is that of a supreme existence, supremely aware of itself. "Swayam prakasha" it is Sacchidananda-Existence,-Conscionness-BissSri Aurobindo)। চীনা "তাও" এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে জানা যায় যে এমন এক শূন্যতা যাহার মধ্যে সকলেই স্থিত অর্থাৎ সর্বব্যাপী। ভগবান সদ্ধর্ম, পুণ্ডরীকে স্বীয় মতকে "ব্রহ্মযান বলিয়াছেন অন্যত্র ইহাকেই আবার ব্রহ্ম-বিহার বলিয়াছেন। "ব্রহ্ম-বাদীরা বলেন যে কেহ ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম হন। বৌদ্ধেরা বলেন প্রত্যেক ব্যক্তিই বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ হইতে পারেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ। বুদ্ধদেবের পথ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি এমন একটি পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা অবলম্বনে বা অনুশীলনে প্রত্যেকেরই পক্ষে অপরের সাহায্য ছাড়াই বুদ্ধত্ব লাভের বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভবনা ছিল।

"সর্বতাথাগতং জ্ঞানং বজ্রযানমিতিস্মৃতং"—জ্ঞান সিদ্ধ। তথাগত বা বুদ্ধেরা যে জ্ঞান লাভ করেন তাকে বলা হয় তাথাগত জ্ঞান। যার পারমার্থিক সত্য হচ্ছে "তথতা" কারণ যে সত্যকে মৌলিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ("of course, a spisitual experience can not be proved in that way (like a chain) for it does not belong to the order of the physical facts and is not Physically visible or touchable"—Sri Aurobindo) বেদান্তের "নেতি-নেতি"দের মত বৌদ্ধেরা "তথা" বা "সেই রকম" বলে সত্যের আভাস দিতে পারেন।"

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বাগ্‌চী।

"বিনয় পিটক অবলম্বনে পণ্ডিতেরা এই মুক্তি বা নির্বাণকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) নির্বাণ, শূন্য, বিনাশ, মহাবিনাশ, অহংবোধের বিলোপ সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন। (২) নির্বাণ এক পরম রহস্য স্বয়ং বুদ্ধ ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নি। (৩) নির্বাণ মানবজীবনের গৌরবময় ও কল্যাণকর পরিণাম।"

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

"বিশুদ্ধি" মার্গের মতে "পঞ্চস্কন্ধের" ধ্বংসকে নির্বাণ বলে। নির্বাণ অর্থে কাম, মদ, তৃষ্ণা, আসক্তি ও সকল ইন্দ্রিয় সুখের ধ্বংসকে বুঝায়। ধ্যান, প্রজ্ঞা শীল ও আরব্ধ-বীর্যের দ্বারা তাহা লাভ করা যায়। নির্বাণগামী পুরুষ মুক্তির পথে ধাবিত।" অর্থশালিনীর মতে "সমস্ত তৃষ্ণা এবং পাপের উপশমকে নির্বাণ বলে।" সুমঙ্গল বিলাশিনীর মতে "নির্বাণ শব্দের অর্থ সমস্ত কাজ কর্ম হতে আপনাকে মুক্ত করা এবং পরম শান্তি লাভ করা। মিলিন্দার মতও তাই। নির্বাণ দুইপ্রকার (১) স উপাধি বিশেষ নির্বাণ (২) অনুপাদিবিশেষ নির্বাণ। অর্হত্বলাভের পর প্রথমটি পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর পর। প্রথমটি শান্তির পরম অবস্থাকে বুঝায়, দ্বিতীয়টি পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। বুদ্ধঘোষের মতে অর্হত্ব বলিতে শান্তির পরম অবস্থাকে বুঝায় এবং যখন তিনি নির্বাণ অর্থে শূন্যতাকে বুঝেন দ্বিতীয়টির অবস্থা। সমস্ত সংযোজন দূর করিয়া মনের (অন্তশ্চেতনার) যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা পরিনির্বাণ। নির্বাণের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য ও সুখ।" ডাঃ বিমলাচরণ লাহা।

নির্বাণ "অস্তি নাস্তির অতীত "(Nirvana is the lan of Silence"—The Voice of the Silence), নির্বাণ পরমং সুখং (ধম্মপদ) নির্বাণ পরা শান্তি, "যত্র কা পরাগতাঃ, সমস্ত কামনা বাসনার শেষ, ইহাই "সুখং অন্তং গ অক্ষয়সুখ, ভূমা, ইহাই সাংখ্যের মুক্তি, পরমপদ, গীত অক্ষয়সুখ, অতিক্রিম, এই ব্রহ্মধামে প্রবেশকে বুদ্ধ শূন্যতা নিরোধ সমাপত্তি বলিয়াছেন......এই শূন্য উপনিষদের নে নেতি ব্রহ্ম (স এষ নেতি নেতি আত্মা)। ব্রহ্মস্থিত বা এই ব্রহ্ম পুরুষকে যাজ্ঞবল্ক্য—"প্রতিবুদ্ধ" "স্বরূপপ্রতিষ্ঠা" "প্র আত্মা" বলিয়াছেন, ইহাই উপনিষদের "উত্তম পুরুষ "বুদ্ধদেব—'I have in this life entered Nirvan while the life of Gautama has been exti guished"—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এখানে নির্বাণে লীন লয় হইবার কোন সঙ্কেত নাই, বুদ্ধদেবও লয় হইয়া য নাই। তার সঙ্গে একত্ব লাভেরসৌভাগ্য আমার হইয়াছি যদিও আমরা মনে করি নির্বান অর্থ বিলয় কিন্তু লয় যে (extinguish) অতো সোজা নহে এখানে বেশী থাকা যায় না, যতই মহাশক্তিশালী—ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরু হউন অতীতে আমি বহুবার তাহা গভীরভাবে পরীক্ষা করি দেখিয়াছি। লয় যোগ (প্রায়) অসম্ভব।

শ্রী অরবিন্দ—"মুক্তি দু'রকমের সাধারণ ধারণা শর ত্যাগের পর মুক্তিলাভ বা জীবিত অবস্থায় চেতনামুক্ত হ প্রকৃতির খেলা চলে পুরো, থামে না, শরীর চেতনা অবিদ্যার খেলাঘরে থাকে মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মুক্তি আ অন্য মুক্তি হ'ল জীবন মুক্তি সেটা দেহের ও কাজক মাঝেই পাওয়া যায়। বড় শক্ত।"

অন্যমতে বিমুক্তি তিনপ্রকার—'তদঙ্গ, বিক্খম্ভণ সমুচ্ছেদ। রূপাবরে সমাধিকে তদঙ্গবিমুক্তি, অরূপাব সমাধিকে বিক্খম্ভণ বিমুক্তি, বিদর্শণ ভাবনায় যারা সম বিমুক্ত তারপর সমুচ্ছেদ বিমুক্তি ' ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড় এইসকল বিমুক্তির সঙ্গে সাংখ্যের "ত্রিবিধো মোক্ষঃ" পার্থক্য নাই।

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করিয়াছেন মৃত্যুর পর জীবন্মু নির্বাণে একেবারে লয় (extinguished) হইয়া গে আবার তাঁহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া জন্ম নিবার সম্ভা রহিয়াছে ("Souls which have passed ir

Nirvana may return (not must) to complete the larger upward curve"—Sri Aurobindo) এবং এই সম্ভাবনা না থাকিলে কেহই আর নির্বাণ হইতে ফিরিতে পারিতেন না বা তাঁহার অবস্থার কথা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কি করিয়া অন্তশ্চেতনা ব্রহ্মসহ একীভূত হয় বা তাঁহাতে স্থিত থাকে বা তাঁহা হইতে ইচ্ছামাত্র আবার নামিয়া আসে তাহা এক বিরাট প্রহেলিকা। কি করিয়া বা কোনভাবে এগুলি সম্ভব হয় তাহা আমি বহুবার চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারি নাই। এগুলি আমার অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমানের নহে (ব্রহ্মজ্ঞান কেহ হারায় না, তত্ত্বটি আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে)। সম্ভবতঃ এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না।

প্রকৃত নির্বাণে বা নির্গুণ ব্রহ্মে কি আছে? সেখানে আছে মাত্র গভীর অন্ধকারসহ ভয়াবহ নিস্তব্ধতা (Silence) ইহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে কালহীন সীমাহীন এক অনন্ত অখণ্ড শুদ্ধ চেতনা (Pure Consciousness)। এখানে দ্বৈতের কোন স্থান নাই অথচ ইহারা সকলেই আছেন কিন্তু পৃথক কাহারো কোন অস্তিত্ব নাই। অতীতে আমি বহুবার এই নির্বাণে গিয়াছি প্রত্যেকবারই ঐ একই উপলব্ধি করিয়াছি (এখানে বেশীক্ষণ থাকিলে দম বন্ধ হইয়া আসিবার মত হয়, বেশীক্ষণ থাকা যায় না) কোনবারই এর ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার শূন্যবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধদের শূন্য বা অসৎ (অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম) এবং আনন্দবাদী অদ্বৈত বেদান্তীদের ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহারা স্বীকার করেন ব্রহ্মে আনন্দের অনুভূতি আছে এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম বা বুদ্ধদেবের বা মহাযানীদের নির্বাণ বা "তাও", এর তত্ত্ব এক নহে। হীনযানী বৌদ্ধদের অসৎ বা শূন্য অর্থাৎ অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অসৎ এবং আনন্দবাদী বেদান্তীদের ব্রহ্ম বা ব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যাহা হইতে সত্যলোক, তপলোক ও জনলোক উদ্ভূত, ইহারা উভয়েই নির্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের দুটি বিভাব মাত্র, মূল বা আদি ব্রহ্ম নহে। নির্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন পুরুষ, তাঁহা (It, That), শুদ্ধ চেতনা; রমণ মহর্ষি (আমি রমণ মহর্ষি ছাড়া আর কাহাকেও খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞানী দেখি নাই) এঁকে বলিয়াছেন শুদ্ধ চেতনা (Pure Consciousness), ইহাই সাংখ্যের 'পুরুষঃ'।

এই শুদ্ধচেতনা এবং নির্বিকল্প সমাধির শ্রেষ্ঠতা ও সার্থকতা এইখানেই যে এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যায় সমাধিতে, তাহা হইতে ইচ্ছামাত্র নির্বাণে যাওয়া যায় এবং যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যায় বা তাহা হইতে নামিয়া স্থূলদেহে ফিরিয়া আসা যায় বা নির্বিকল্প সমাধি হইতে সবিকল্প সমাধিতে যাওয়া যায়, যাহা মাত্র নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া অন্য আর সব সমাধিতে অসম্ভব। এই সব উপলব্ধি অবশ্য অন্তশ্চেতনায়ই মাত্র ঘটিয়া থাকে শারীরচেতনায় নহে। অন্য আর সব সমাধিতে ইচ্ছামাত্র যাওয়া যায়, সমাধি হইতে ফিরিয়া আসার ক্ষমতা নির্ভর করে অন্যত্র নিজের নহে, এখানে মানুষ অসহায় কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে এ অবস্থা হয় না। অবশ্য তাহার একমাত্র কারণ নির্বিকল্প সমাধির অর্থ সমস্ত সৃষ্টির অতীত তত্ত্বে যাওয়া, তাহা মাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পর্যন্ত কিন্তু সবিকল্প সমাধিতে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া আর সব লোকেই যাওয়া যায়। সবিকল্প সমাধির মধ্য দিয়া প্রাণময় জগতে (Vital worlds) বহুবার আমি অসহায় অবস্থায় মার খাইয়াছি, সবিকল্প সমাধি কয়েক বছর আমার ছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা। সেই জন্যই শাস্ত্রে নির্বিকল্প সমাধিকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। এইগুলি নিজে বহুবার গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়াছি ইহাতে ভ্রমের বা মিথ্যার স্থান নাই।

Sri Aurobindo—"Heaven's call is rare, rare is the heart that heeds."

অধ্যাত্ম পথের সত্যকার পথিক অতি মুষ্টিমেয় (But they are rare indeed, who know that the search for the truth.. Few are there who enquire about the truth, about the Self···Fewer still are the Self—Realised."—T. Sorabi. সিদ্ধিলাভও ঘটে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই মাত্র, কারণ এই উত্থান পতনময় ক্ষুরধার দুর্গম পথ অতিক্রম করা অতীব সুকঠিন (Straight is the gate and narrow is the way and few there be that find it.—Christ). আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান (Such a realisation of the personal Divine or the impersonal Brahman or

of the Self does not usually come at the begining of a Sadhana or in the first years or for many years...It comes to a very few"—Sri Aurobindo) লাভ করিতে মাত্র এক জন্ম নহে কয়েক জন্মও পর্য্যাপ্ত নহে (The whole life and several lives are often not enough to achieve it"—Sri Aurobindo) কারণ ইহা লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন (Therefore conditions have to be satisfied, the work to be done has to be wrought out step by step...Therefore there is a Sadhana to be done...There is a resistence to overcome—Sri Aurobindo) সুদীর্ঘকাল গভীর তপস্যার প্রয়োজন (স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সৎকার — সেবিতো দৃঢ়ভূমি—পতঞ্জলি) এবং তদুপরি উপযুক্ত আধারেরও বিশেষ প্রয়োজন। এ তত্ত্ব কেহ কাহাকেও দিতে পারে না (It is also a fact that nobody can give you spiritual experience—Sri Aurobindo) দিতে পারেন না এই অর্থে যে মহাপুরুষগণ তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত আধার পান না (যে সত্য) সার্ব্বজনীন তারও গ্রাহক ও ধারক মুষ্টিমেয়ই হয়। যা বিজ্ঞানগম্য, তার গ্রাহক কোটিকে গোটিক—অনির্ব্বাণ)। প্রকৃত নির্ব্বাণ লাভ করা সুকঠিন (All authorities assure us that the exclusive Nirvana business is a most difficult job—Sri Aurobindo) ইহার অর্থ এ নহে যে শক্তিশালী সদ্গুরু বা দৈব কৃপায় বা ব্যক্তিগত সাধনায় ইহা অসম্ভব তবে এরূপ কৃপা লাভ কদাচিৎ কোন মহাভাগ্যবানের অদৃষ্টেই মাত্র ঘটিয়া থাকে। মুক্তি বা নির্ব্বাণ এক জন্মেই লাভ করা সম্ভব এবং তাহা স্বাভাবিক এবং তাহা বিনা গুরু বা অন্য কাহারো সাহায্য ছাড়াও সম্ভব আমার অভিজ্ঞতা তাহাই প্রমাণ করে।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার বহু উপায় বা পথ আছে, সোজা কথায় বলা যায় মধ্যম পথ ছাড়া, দুটি পথ আছে। একটি সহজ, সরল ও আশুফলপ্রদ, অন্যটি সুদীর্ঘ প্রসারিত উত্থান পতনময় বন্ধুর দুর্গম পথ, যাহা অতিক্রম করিতে মাত্র এক জন্ম নহে বহু জন্মও পর্য্যাপ্ত নহে। এক কথায় বলা চলে একটি মন্ত্রযান অপরটি আর্য্য অষ্টাঙ্গিকযান। মন্ত্রযান হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শৈব, সাংখ্য মতে উত্তমরূপে স্বীকৃত। মহাযানী বৌদ্ধদের 'মন্ত্রযান' নামে এই সম্প্রদায়ই ছিল আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাহা বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন বা সাংখ্য হউক, যম, নিয়মাদি অবলম্বনে সমাধি লাভ করা এক জীবনে প্রায় অসম্ভব। মন্ত্রসিদ্ধ আমার জানিত কেহ নাই। মন্ত্রজপ সম্বন্ধে আমার মনে হয় যাহারা মন্ত্রজপ করেন তাহারা জপের পদ্ধতি ঠিকমত জানেন না বা মানেন না, জপের বিজ্ঞানসম্মত পথে চলিলে সিদ্ধিলাভ করিতে একবৎসর যথেষ্ট, ইহা শুধু আমার নহে সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও অভিমত। মন্ত্রজপে সিদ্ধি লাভ করা এক জন্মেই সম্ভব, যাহাদের ব্যাকুলতা অতি প্রবল (তীব্র সম্বেগানামাসন্ন—পতঞ্জলি) তাহারা অতি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যাহারা এঁটেক সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাদের একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত (When you fix your heart on one point then nothing is impossible for you—I. Chin) তাঁহাদের পক্ষে খাটি নির্বাণ বা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে এক বৎসর পর্য্যাপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "মন্ত্রটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (তজ্জপস্তদর্থভাবনম্—পতঞ্জলি) জপ করিতে পারিলে মন্ত্রটি নির্ব্বাণ বা নিগুণ ব্রহ্ম সহ একীভূত করাইতে পারে কারণ মন্ত্রটি স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ মন্ত্রটি কোন গুরু বা কাহারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নহে। শ্রীঅরবিন্দের পত্রটি পড়িয়া বিশ্বাস করিয়া অবিরাম জপ করিয়াছিলাম। দৈবকৃপা অবশ্য বহু আগে পাইয়াছিলাম মহাকালীর ও অন্তরাত্মার, বহু আগে, মহাকালীর স্পর্শে আমার কুৎসিৎ কালো রং বদলে যায়, প্রায় ৪০ বর্ষ আগে, জপকালীন নহে, আমি জপ কালে কাহারো সাহায্য বা কৃপা পাই নাই, মন্ত্রদাতা গুরু আমার নাই, মন্ত্রটির প্রায় ১০ মাস লাগে আমাকে নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্য দিয়া নির্ব্বাণে বা নির্গুণ ব্রহ্মসহ একীভূত করাইতে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিতাম ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অন্তশ্চেতনাকে শরীরের বাহিরে লইবার জন্য। অন্তশ্চেতনাকে একবার শরীরের বাহিরে আনিতে পারিলেই, তাহা যে কোন প্রকারেই হউক, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবেই, অবশ্য সমাধির মধ্য দিয়া, জাগ্রত অবস্থায় নহে, এবং তাহা পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। নির্ব্বাণ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে (It is safest not to speak of experiences

except to a Guru or to one who can help you. The passing away of experience as soon as it is spoken is of a frequent happening and for that reason many Yogis make it a vow never to speak of what happens within them -Sri Aurobindo), শ্রীমা আমার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন যে আমি যেন দেহ ত্যাগের চিন্তা না করি (He must not think of leaving the body — The Mother) আরো বলিয়াছেন শুনিয়াছি বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে "আমি যদি তোকে এই উপলব্ধি দেই তাহাতে দোষের কি আছে ?" শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টই বহুবার লিখিয়া গিয়াছেন শ্রীমা আদ্যাশক্তি অতএব তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানাদি দিবার ও নিবার ক্ষমতা কিছু আছে বৈকি। ব্রহ্মজ্ঞান কাড়িয়া নেবার ফলে আমার বর্তমানে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা, ভণ্ড প্রতারক বহু লোকে বলে, আশ্রম হতে বহিষ্কার করার প্রস্তাবও হইয়াছে, কালে কালে হয়তো তাহাই হইবে, আমার এখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" এর অবস্থা। বুদ্ধদেব সহ-একীভূত হইবার ও তাহার কৃপায় একটি বিশেষ অবস্থা লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, তাহার স্পর্শে আমি রোগ মুক্ত হই।

নির্বাণ বহু প্রকারের সম্ভব কারণ তাঁহা সন্দবাদী বলিয়া স্তর বা অবস্থা ভেদে উপলব্ধির তারতম্য ঘটা সম্ভব এইমাত্র প্রভেদ হইতে পারে। নির্ব্বাণ স্থূল দেহে নামিয়া আসিতে (descent) অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় তাহা উপলব্ধ করা সম্ভব তবে তাহা আংশিক পূর্ণ নহে ("It is not really the plane that descends, it is the power and truth of it that descends"—Sri Aurobindo); খাঁটি নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র নির্বিকল্প সমাধির মধ্যদিয়াই তাহা সম্ভব অন্য কোন পথে নহে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও নির্ব্বাণের মত ব্যষ্টি চেতনা থাকে না, যাহা অন্য আর সব সমাধিতে থাকে, ফলে নির্বাণের সঙ্গে একীভূত হওয়া স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া আসে যাহা অন্য আর সব সমাধিতে অসম্ভব। অন্য আর সব সমাধিতে ব্যষ্টি বা অহং বোধ কম বেশী থাকিবেই যাহা নির্বিকল্প সমাধিতে অসম্ভব। এগুলি আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যাহাদের অহংভাব বা কামনা বাসনা প্রবল তাহার পক্ষে নির্বিকল্প সমাধি বা নির্বাণ লাভ অসম্ভব। জাগ্রত সমাধি আকাশকুসুমের মত অলীক। ইচ্ছা করিলে সমাধিস্থ অবস্থায় কিছুকাল থাকা যায়। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার সমাধি একটি মধ্যবর্তী চেতনার অবস্থা বা পথ যাহার মধ্য দিয়াই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইয়া থাকে। হঠযোগীরা সমাধিস্থ হইয়া বহুকাল থাকিতে পারেন সেই সমাধি কিন্তু উচ্চস্তরের বা সবিকল্প সমাধি নহে, ঐরূপ সমাধির সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। সমাধি হইলেই, যদিও তাহা সহজ নহে, খাঁটি নির্বাণে যাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন "দুর্লভ এমন কোন বস্তুই জগতে নাই যাহা উদ্যমশীল বীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন চেষ্টা সাধককেই করিতে হইবে, তথাগতেরা পথ প্রদর্শক মাত্র; এ তত্ত্ব কেহ কাহাকেও দিতে পারেনা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ যে যোগ (যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ—পতঞ্জলি) তাহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কোন প্রকারেই হউক তাহা করিতেই হইবে তাহাও সত্য, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি পাইয়াছি, আগে চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করিয়াও তাহা সম্ভব, তাহা সম্ভব না হইলে ভগবানকে লাভ করা অসম্ভব হইত তবে নির্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞানের পর তাহা আপনিই আসে তাহার জন্য অযথা সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিতে হয় না। ব্রহ্ম উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে রমণ মহর্ষি বলিয়াছেন "দৃশ্যময় জগতের বিলোপ ঘটিলেই তবেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়" অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক অন্তশ্চেতনাকে একবার সহস্রার ভেদ করিয়া শরীরের বাহিরে আনিতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং ইহাও শ্রীঅরবিন্দেরও অভিমত। এই ব্রহ্ম উপলব্ধি যে স্থূল দেহে, স্থূল চেতনায় অসম্ভব তাহাও রমণ মহর্ষি বলিয়াছেন ("ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু জগতে দেখার অবস্থায় ব্রহ্মোপলব্ধি কি সম্ভব ? মহর্ষি "কখনোই না") ইহাকেই তিনি আমি কে ? ("Who am I") বলিয়াছেন। তাহার সঙ্গে এ বিষয়ে বহুক্ষণ আলাপ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কেউ এনে দিতে পারবেনা এই তৃষ্ণার বিমুক্তি, তৃষ্ণার তমসা দূর করতে হবে নিজেই, আলোও জ্বালাতে হলে নিজেকেই, নিজের প্রদীপ নিজে জ্বালাতে হবে। নিজেকেই প্রদীপও হতে হবে

নিজেকেই। অনণ্যশরণ হতে ধর্মের দীপ জ্বালিয়ে ধর্মগত হয়ে লাভ করতে হবে তৃষ্ণা-বিবর্জিত মুক্তি" (অত্তদীপা বিহরথ অত্ত শরণা অনঞ্ঞশরণা। ধম্ম দীপা ধম্ম শরণা অনঞ্ঞ শরণা।

—শ্রীসমর গুহ

শ্রীঅরবিন্দ—গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শিষ্যকে তিনি পরিচালনা করেন তার স্বভাব অনুযায়ী। গুরু ভার হয়ে তার উপর চেপে বসেন না। "আমি গুরু" এই অভিমান থাকলে গুরু হওয়া যায় না…তিনি পথের সাথী, পথের শেষ নন। কিন্তু এইখানে এসেই সিদ্ধেরও ভরাডুবি হয়ে যায়। গুরুগিরির অহঙ্কার হল মহামায়ার শেষ বন্ধন। তাকে কাটিয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।" গুরু সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মত—আত্মাই আত্মার গুরু। সরল ও সত্যকার ভাবে ভগবানের কাছে চাহিলেই ব্রহ্মস্থান বা নির্বাণ লাভ করা যায়। ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সাধনায় তাহা সম্ভব তবে ইহা সত্য দৈব-কৃপায় বিনা কষ্টে তাহা লাভ করা সম্ভব, আমার অভিজ্ঞতা তাহাই বলে ("It is a lesson of life that always in this world every thing fails a man only the Divine does not fail him if h turns entirely to the Divine."—Sri Aurobindo মানুষকে ইচ্ছামত লোকে যাইবার অধিকার দান, অবশ্য তপস্যাবলেই মাত্র, ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। মানুষ ছাড় কোন দেবদেবীর পক্ষে তাঁহাদের নির্দিষ্ট লোক অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিবার ক্ষমতা নাই, অধঃ নহে পুরুষোত্তমের অংশ আমরা সকলেই। তিনিই আমাদের আসল স্বরূপ এবং এই স্বরূপ উপলব্ধি করিবার অধিকার সকলেরই আছে, আমরা সকলেই ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই বলিতে পারি—

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনে সন্ধান,
সে কোথা গোপন আছে, এই গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
এ গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবার আর,
ভেঙেছি তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

—সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অতীত আসে

অসীম কুমার মাহাতো

আমার আঁখি জানি না কোন্ দিনে
তোমার আঁখির কাজল মায়ায় পড়ল ধরা,
সেদিন তোমায় অপলকে নিইনি চিনে,
তুমি উদাসী চোখ মেলেছিলে আকাশ জোড়া।

কালিদাসের কাব্য বোধহয় তোমায় দেখে
লিখেছিলেন অমর প্রেমের কাব্যকথা,
তৃষ্ণা বুকে তোমায় ডাকি প্রপালিকে—
পিপাসা যে আমার বুকে জুড়াও ব্যথা।

অতীত যদি ভবিষ্যতে এসেই মেশে
কি দোষ আমার বল না গো নিঠুর তুমি?
কালের বাঁশি যদি ডাকে আমায় এসে,
তোমায় শুধু ভালবেসে বলব চুমি—

আবেগ আমার নীল আকাশের হাওয়া
হাসি তোমার নতুন দিনের গান,
হৃদয়-নদী তিয়াস-ঢেউয়ে ছাওয়া
সবুজ আলোয় সূর্য শিখার স্নান।

হয়তো তুমি বলবে তখন অশ্রু ফেলে
আমার গড়া বকুল-বীথি গেলে ভুলে,
চেয়ে দেখ শুধু দুটি আঁখি মেলে
বাগান আজি গেছে ভরে ঝরা ফুলে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্প দেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

অল্প শ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ (২১)

"অল্পশ্রুতেঃ" অল্প বিষয়ক বাক্য শ্রুতিতে যে আছে
ইতি চেৎ এ কথায় ঈশ্বর না রাজে
তৎ উক্তং এ কথার
দিয়াছি উত্তর আর
আবার বলিতে তাহা কিবা প্রয়োজন
সত্য যা সত্যই রয় বৃথা আলোচন
শ্রুতিতে আছে—দহর অস্মিন্ অন্তরাকাশ এই কথা জেনো হয়
ক্ষুদ্রাকাশ মানে এর জানিও নিশ্চয়
ক্ষুদ্র মানে ব্রহ্ম নয়
ইহা জেনো ভুল হয়
জীবকে লক্ষ্য করিয়া তা হয় ব্রহ্মের কথা কয়
অনন্ত সেই উপাসনাতরে আকারে ক্ষুদ্র হয়।

অর্ভকৌকাস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ ন নিচায্যত্বাদেব ব্যোমবচ্চ (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৭)

এই সূত্রে ইহার আপত্তির কারণ দেয়া হইয়াছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ (২২)

অনুকৃতেঃ মানে অনুকৃতি হেতু "তস্য চ" মানেতে তার
শঙ্কর কন মানে হয় ইহা উপনিষদেতে এ বিচার
"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয় মগ্নিঃ
তমেব ভান্ত মনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
(মুণ্ডক ও কঠোপনিষদ)

সূর্য সেখানে প্রকাশ না পান না জ্বলে চন্দ্রতারা
বিদ্যুৎ সেথা প্রকাশিতে নারে অগ্নি সে জ্যোতিহারা
ব্রহ্ম আপনি হইলে প্রকাশ
তারপরে হয় সকলি বিকাশ
তাঁহারি শক্তি লভিয়া উজল সূর্য্য চন্দ্র তারা
বিজলির মাঝে তারি জ্যোতি রয় অগ্নিও সেই ধারা।
অনুকৃতি এই শব্দের অনুভাতি মাঝে রয়
"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তস্য চ এই হয়
সূর্য্যের চেয়ে উজ্জলতম
ব্রহ্ম ছাড়া কে আছে নিরুপম

যাঁহার আলোয় ভূলোক দ্যুলোক আলোকে আলোকময়
ব্রহ্মের এই অপরূপ দ্যুতি শঙ্কর জেনো কয়।

অপি চ স্মর্য্যতে (২৩)

স্মর্য্যতে মানে স্মৃতি গ্রন্থেতে উল্লেখ এর আছে
গুরুর নিকটে শিষ্য যা শোনে তাই শ্রুতি হইয়াছে
বেদের সহিত বিরোধ যা নয়
স্মৃতি বাক্যকে প্রমাণ তা হয়
শঙ্কর কন ব্রহ্মতেজেতে এ জগত প্রকাশিত
অপরূপ তেজ প্রদীপ্ত হয়ে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত।
গীতা ১৫।১২ "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি
মামকম্"

কন নিজে তিনি সূর্য্যের তেজে জগৎ প্রকাশময়
সেই তেজ জেনো আমারই শক্তি সূর্য্যের মাঝে রয়
চন্দ্র অগ্নি যথা যাহা রয়
সব জ্যোতি জেনো শুধু আমাময়
যেখানে যা কিছু জ্যোতি ও বিভূতি সকলি জানিও এই
ব্রহ্মের এই জ্যোতির্ময় দ্যুতি এতে কিছু ভুল নেই।

শব্দাদেব প্রমিতঃ (২৪)

প্রমিত অর্থে পরিমাণ যার ঠিক হেন হইয়াছে
অপরিমেয়রে পরিমাপ দ্বারা ব্রহ্মই জানা গেছে
কঠোপনিষদে আছে
এই শ্লোকে কহিয়াছে
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি
বুড়ো আঙুলের আকার পুরুষ আত্মা অবস্থিতি।
পুনশ্চ : অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো জ্যোতিরিবাধূমশ্চ
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্ব এতদ্বৈতৎ।
ধূমহীন সেই জ্যোতির সমান পুরুষ যেজন হন
অঙ্গুষ্ঠ সমপরিমাপ যিনি সবার কর্তা হন
ভবিষ্যৎ ও অতীতকালের
ঈশ্বর যিনি সর্ব্বকালের
আজো রন ইনি রহিবেন কালও ব্রহ্ম ইঁহারে কয়
পরিমাপ শুনে করিও না ভুল জীব কখনই নয়।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

এগারো

ললিতা ওকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাবার আগে হেসে শুধু বলেছিল: "যেসব কথা গলগল করে বলে গেলাম ব'লে ভালো করতে গিয়ে মন্দ করলাম কি না কে জানে? তবে আপনার আজকের গান শুনে বপী প্রথম বলল যে আ নার গুরু আসতে না আসতে সব সংশয় কেটে যাবেই যাবে।"

কিন্তু অসিতের মনের অন্ধকার আলো হ'য়ে উঠল কই। ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল—শুধু শুনলে কি আর হয়? কিন্তু দেখা চাই! আর দেখা চাই সব আগে—অঘটন। নৈলে দিনের পর দিন শুধু থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়ের বিরস চাপে মনের কালি ঘুচতে পারে না বোধহয়। অঘটনকে ছোট ক'রে দেবার সে ফ্যাশন বুদ্ধিমন্ত ইদানিন্তদের পেয়ে বসেছে যে-ফ্যাশন গুলি মুহূর্তে উবে যাবে, যদি তাঁরা সত্যি চাক্ষুষ করেন দৈবী করুণার অসম্ভবকে সম্ভব করা। পাস্কাল ঠিকই ধরেছেন মানুষের দিনের পর দিন কাটায় তুচ্ছতার ভারবাহী হ'য়ে। ফলে যে-কোনো গড়পড়তা বুদ্ধিমন্তকে শুধাও না কেন, দেখবে তার মন যেন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে মেনে নিয়ে যে, জীবনে এই তুচ্ছ ভার ছাড়া আর কোনো কিছু বেসাতি করবার নেই। এইজন্যই বুঝি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন বড় গলা করেই:

> অদ্যাপিহ নিত্যলীলা করে গৌর রায়
> কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়!

ওর মন আরো খারাপ হয়ে যায় ভাবতে এই মুচারজন বিরল অধিকারীর কথা যাঁদের উপাধি "পরম ভাগবত।" কেন সবাই পায় না এ-অধিকার? যাঁর জন্যে আমাদের জন্ম কেন তাঁর সঙ্গেই সব চেয়ে কম পরিচয়? —কেন সে-পরিচয়ের পথ এত দুর্গম! গুরুকরণ! কিন্তু গুরু তো শুনি কেবল ঐ ভাগ্যবানদের দরবারেই হাজিরি দিতে আছেন: ললিতা, প্রেমল, শান্তিদেবী, মোহন মহারাজ, শ্যামঠাকুর...। তাহ'লে খতিয়ে উপনিষদের দুঃখবাদী শ্লোককেই মেনে নিতে হয় না কি যে, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—তিনি শুধু তাঁদেরই ধরা দেন যাদের তিনি ছুঁতে রাজী? কিন্তু এই মুচারজন অধিকারী কৃপাধন্য ছাড়া আর সবাই কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

ভাবতে ভাবতে ওর মনে নিরাশা এসে যায় ফের। বিপদের গান গুনগুনিয়ে ওঠে ক্লান্ত মনে:

> সবাই পেল তোমার প্রেমের প্রসাদ,
> আমিই শুধু রইব চির তৃষায়?
> সবাই পেল দিশা পারের হে নাথ,
> শুধু আমার মিলবে না কৃষ্ণ নিশায়?

সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য ব্যথামধুর শান্তি নামতে ঘুমিয়ে পড়ল শেষ রাতে। দেখল এক আশ্চর্য স্বপ্ন:

একটি সুন্দর মন্দির সমুদ্রের ধারে। ও প্রেমের সঙ্গে চলেছে নৌকায় পাল তুলে। তটের কাছে এসেই বাতাস ফিরে গেল উল্টো ঝড়ে। হায় হায়, শেষটায় কূলে এসে ভরাডুবি! চেয়ে দেখে ওর আগের অনেকগুলি খেয়া তীরে

পৌঁছে গেছে। ঝড় উঠতেই তারা ছুটে মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল। অসিত তাদের ডাকল আর্তস্বরে। কিন্তু উত্তর দিল শুধু ঝড়ের অট্টহাসি। যখন নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু তখন শুনল: "ভয় কি? সামনে চেয়ে দেখ।" চাইতে দেখে—কী আশ্চর্য!—জলের উপরে একটি লোহার দীর্ঘ নল ভাসছে। অসিত প্রেমলকে বলল আশ্চর্য হ'য়ে: "জলে লোহা ভাসে?" প্রেমল শুধু বলল: "ধরো চেপে।" অসিত চেপে ধরতেই নলটি ভেসে চলল গাছের গুঁড়ির মতন। দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছল তটে।

মহানন্দে অসিত ও প্রেমল মন্দিরে ছুটল। সবাই অবাক্। প্রশ্ন করল: "কেমন ক'রে এলে তোমারা? আমরা যে সবাই স্বচক্ষে দেখলাম নৌকা ডুবে যেতে! এ-ঝড়ে কি সাঁতার দিতে পারে কেউ?"

প্রেমল বলল হেসে: "আমরা সাঁতার দিয়ে অকূলে কূল পাইনি।"

"তবে?"

অসিত ওদের বলতে যাবে এমন সময় প্রেমল হাত তুলে বারণ করল: "ওরা শুধু যে বিশ্বাস করবে না তাই নয়, মন্দিরের পুরুত ঢুকতে দেবেন না তোমাকে মিথ্যুক ব'লে দেগে দিয়ে।"

অসিতের ঘুম ভেঙে গেল। দিগন্তের ভালে শুকতারাটি জ্বল জ্বল করছে। চোখে জল নিয়ে উঠে প্রণাম করে: তারা তো নয়,—যেন তুফান-তারিণীর আশিস-চাহনি।

বারো

সকালে ললিতা প্রেমলকে দিল শুধু লেবুর সর্বৎ ও একটি আম। আর তারা অসিতকে পরিবেষণ করল চা রুটি টোস্ট ও একটু পনীর। ডাক্তারবাবু তখনো ওঠেন নি।

চা খেতে খেতে অসিত হেসে বলল প্রেমলকে: "তোমার শিষ্য গীতার কথা না মেনে অপাত্রকে বলে ফেলেছে তোমাদের সাধনার নানা গুহ্য কথা।"

প্রেমল হেসে: তোমাকে বলতে তো আপত্তি নয় ভাই!—তুমি যে সবাইকেই ডাক দাও শুনতে যারা চায় না শুনতে, ভয় পায় জানতে, দুঃখ পায় শাস্ত্রের কথা মানতে! এইজন্যেই গীতা বলেছে গুহ্য কথা গোপন রাখতে। ডিমক্রাসির বুলি মিল খায় না তো সাধুসন্তের বাণীর সঙ্গে।

অসিত (চায়ে চুমুক দিয়ে): তুমি সময়ে সময়ে ভারি ভাবিয়ে দাও, সত্যি!

প্রেমল (ভুরু তুলে): চৈতন্যদেবের ভাষায়—আগে কহ আর।

অসিত তখন বলল ওর স্বপ্নের কথা। ললিতা শুনে হাততালি দিয়ে বলল: "কী চমৎকার!"

তারা: তবু আপনি কেন ঘড়ি ঘড়ি মন খারাপ করেন দাদা?

প্রেমল: কারণ ও যে ভাবে স্বপ্নে পাওয়া বাণী সবই ফ্রয়েড সাহেবের subconscious-এর খেলা, কাজেই জাগরণে নামঞ্জুর।

অসিত: কী বিপদেই পড়েছি! জীবনের হাজারো দুঃখ তাপ দ্বন্দ্ব গ্লানি কি স্বপ্নে-পাওয়া বাণীতে কাটে, না কাটতে পারে কখনো?

প্রেমল: তোমাকে নিয়েও কি কম বিপদ? তুমি চাও সাততিতে গোলকধাম। আলো আসে একটু একটু ক'রেই—বিশেষ ক'রে মনের ওপারে আলো। প্রথমদিকে না, শুধু প্রথমদিকেই বা বলি কেন, অনেক দিন ধরেই—এ-আলো আসে স্বপ্নচেতনায়—অন্ততঃ সাধকদের ক্ষেত্রে। এ আমার কথা নয়—আমার গুরুর মুখে শুনেছি অগুন্তিবার। তোমার এ স্বপ্নটির মধ্যে দিয়ে ঠাকুর ভরসা দিতেই বাজিয়ে দিলেন ওঁর বাঁশি, কিন্তু তুমি কান পাততে না চাইলে শুনতে পাবে কেন সে বাণী?

ললিতা: কী বাণী বাপী, বলো না, লক্ষ্মীটি!

প্রেমল: ওকেই জিজ্ঞাসা করো না।

অসিত: অমন কোরো না, আমি কি জানি এ-সব বাণী-ফাণীর গুহ্য তত্ত্ব যে বলব?

প্রেমল (ললিতাকে) ঐ—শুনলে তো? ঠাকুর ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যে আলো চায় সে দিশা পায়ই পায়—তবু ও বলবে ও কিছুই জানে না! যে জেগে ঘুমুতে চায় তাকে জাগাবে কে বলো? —এই যে আসুন ডাক্তার বাবু! (উঠে দাঁড়ায়)

ডাক্তার বাবু (লাঠি ধ'রে ঈষৎ খুঁড়িয়ে এসে নিজের চেয়ারে ব'সে): আমি বলতে এলাম সাধুজি, যে আমি জেগে ঘুমতে নারাজ তাই শুনতে—খুড়ি, শিখতে—এলাম। হ্যাঁ—ঢালো চা,—বেবল টোস্ট নয় আজ। কাল

পায়েসের পরে আর চলবে না এসব। শুধু এক পেয়ালা চা। (তারা চা ঢেলে দিতে) এবার বলুন, সাধুজি। দাদাজির স্বপ্নের কথাটা কানে গেছে—কিন্তু ভাষ্য চাই বৈ কি—বিশেষ এ-যুগে।

প্রেমল: এ ঠিক কথা ডাক্তারবাবু। কারণ শাশ্বত তত্ত্ব এক হলেও দেশ কাল পাত্রের পারিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্য টীকা আরো ফলাও ক'রে না তুললে যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হ'য়ে ওঠে। এ-বদলের নাম কেউ দেন সংস্কার—মানে reform—কেউ বা দেন নবজন্ম—renaissance—কেউ দেন পুনরুজ্জীবন—revival—কিন্তু যে-নামই দিন না কেন, মানুষ যুগে যুগে প্রতি সত্যকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রসে রসিয়ে, রঙে রঙিয়ে, রূপে ফলিয়ে ভোগ করতে চাইবেই নিত্যনতুন ঢঙে। অসিতের স্বপ্নটি অতি চমৎকার। ওর মনে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন আসে যে সবাইকেই কেন সাধনার ভালো কথা বলাও মানা? তারই চমৎকার উত্তর মিলল—কেবল খৃষ্টের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—those who have ears to hear let them hear.

ডাক্তার বাবু: কিন্তু এরই তো নাম অধিকারিবাদ।

প্রেমল: বাদ কথাটা আমার কর্ণশূল: গুরুবাদ, অদৃষ্টবাদ, শক্তিবাদ, অবাতরবাদ...কারণ যে-কোনো সত্যকে একটা নামের কাঠামোয় ফেললে—মানে লেবেল মারলেই তার অঙ্গহানি হয়। আমি বলব অধিকারী অনধিকারীর মধ্যে যে তফাৎ আছে এই বাণীটিই ঠাকুর ওকে শোনাতে চেয়েছিলেন স্বপ্নের ছদ্মবেশে। আর তাই তো সাধুসন্তরা পই পই ক'রে মানা করেছেন অশ্রদ্ধাকে আমল দিতে। কারণ কেবল শ্রদ্ধার প্রসাদেই অন্তঃশ্রুতি খোলে, অন্তর্দৃষ্টি ফোটে। শুনুন বলি আজ আমার একটি সঙ্কটকাটার কথা। (হেসে) বলি ওর চৈতন্য স্তবের পরে আমার মুখও বুঝি খুলল বা তাছাড়া এখানে তো বৈজ্ঞানিক "জনগণ মন" নেই যে আমাকে মিথ্যুক বলে দেগে দিয়ে ঠাকুরের মন্দিরের প্রসাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে। এখানে যা বলছি, সবাই শ্রদ্ধা নিয়েই শুনবে, অবিশ্বাসের জেরায় কেউ আমাকে নাকাল করতে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে না।

আমি প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলাম বোমারু পাইলট। জর্মনিতে বোমা ফেলা ছিল আমার কাজ। পেটিবুর্টদের বাহবার লোভে তোড়জোড় বেঁধে আবালবৃদ্ধবণিতার মাথায় বোমা ফেলতে একটুও মন চাইত না, কিন্তু তখন আমার বয়স কম, একটু আধটু ভাবতে শিখলেও পথ খুঁজে পাই নি তো, তাই ভেসে চলতে হত গড্ডালিকা প্রবাহে। উপায় কি?

ভগবানের কৃপায় অঘটন ঘটে একথা পাস্কালের লেখায় পড়েছিলাম। পাস্কালের লেখা আমার মন খুব বেশি টানত—কিন্তু কেন, ভেবে পেতাম না। কারণ আমি তাঁর মতন খৃষ্টভক্ত ছিলাম না। কিন্তু ওঁর একটি যুক্তি আমার মন নিয়েছিল। তিনি বলতেন মিথ্যা ভিত্তি অঘটনই বেশি ঘটে বলেই বলা চলে না যে, সত্যভিত্তি অঘটন ঘটে না। বলতে কি, সত্যি অঘটন ঘটে বলেই সাজানো অঘটন মিথ্যা বলে ধরা পড়ে। কেমন? ঐ পাস্কালেরই একটি উপমা দিই শুনুন। অনেক বাজে ওষুধেই অসুখ সারে না বলে কি বলবে নেই নেই নেই এমন সাচ্চা ওষুধ যা অসুখ সারায়? না, বলবে—সত্যি ওষুধ আছে বলেই আমরা অধম ডাক্তারের কাছে না গিয়ে উত্তম ডাক্তারের কাছে যাই? যা একেবারেই নেই কোনকালেই ছিল না তাকে নিতে কেউ মাথা ঘামায় না। যা আছে কিন্তু বিরল, পথে ঘাটে মেলে না, তার জন্যই মানুষ তৃষিত হয়ে ছুটোছুটি করে থাকে

Si jamais il n'y eut eu re'mede a au'un mal, et que tous les maux eussent e'te' incurables, il est impossible que les hommes se fussent imagine qu'ils en pourraient donner; et encore plus que tant d'autres eussent donne croyance a ceux qui se fussent vante's d'en avoir......

Il en est de meme des proph'eties, des miracles des divinations par les songes, des sorti le'ges etcetera. Car si de tout cela il n'y avais jamais eu rien de ve'ritable, on n'en aurait jamais cru: et ainsi, au lieu de concluse qu'il n'y a point de vrais miracles parce qu'il y en a tant de faux, il faut dire au contraire qu'il y a certainement de vrais miracles, puisqu'il y

en a de faux, et qu'il n'y en a de vrais. Il faut raisonner de la me'me sorte pour la religion : car il ne serait pas possible que les hommes se fussent imagine' tant de fausses religions, s'il n'y en avait une ve'ritable.

Blaise Pascal...Pensees (Les miracles)

তাই পাস্কাল সেন্ট অগষ্টীনের কথায় পুরোপুরি সায় দিয়েছেন উদ্ধৃত ক'রে : Je ne serais pas chre'tien sans les miracles—অর্থাৎ খৃষ্ট দৈবী অঘটন না ঘটালে আমি কখনই খৃষ্টান হতাম না।

(থেমে) কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি দু-চারটে ছোটখাট অঘটন চাক্ষুষ করলেও কোনো বড়গোছের মিরাক্ল দেখি নি। বড়গোছের মিরাক্ল বলতে আমি একটি এমন কোনো অঘটন যা মানুষের আত্মার মঙ্গল করে—ভগবানে ভক্তি বিকাশের খোরাক জোগায়—যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এ জগতে নিষ্ঠুর নিয়তির প্রবল শক্তিকেও নাকচ করতে পারে পারে পারে ভাগবতী করুণা। মা এই সময়ে আমার আর একটা মস্ত উপকার করেন দেখিয়ে দিয়ে যে, অঘটন দুরকমের আছে : এক, নেপথ্যশক্তিদের ঘটকালিতে ঘটা মিরাক্ল, আর এক ঐশী শক্তির তরফে দৈবী করুণার ঘটকালিতে ঘটা মিরাক্ল। আমি চাইতাম এই দ্বিতীয় থাকের ভাগবতী মিরাক্ল চাক্ষুষ করতে যাতে আমাদের মনের একটা গভীর ক্ষোভ কাটে—না, শুধু ক্ষোভ কাটাই নয়, একটা আশ্বাসও পাওয়া যায়—এই আশ্বাস যে, গড়পড়তা মানুষ অসহায় হ'লেও সে সাধনার বলে সত্যি জীবন্মুক্ত হতে পারে।—আর যখন সে জীবন্মুক্ত পদবী পায় তখন সে আর নিয়তির হাতের খেলার পুতুল থাকে না ব'লে প্রকৃতির নানা অসংখ্য বিধান—law—তাকে কিছুতেই আর পিষে মারতে পারে না—নিয়তির চাকার নিচে পড়লেও সে তার ঊর্ধ্বে চলবার শক্তি পেতে পারে কী ? বেশি বকছি না তো ?

অসিত : না না বলো—খুব ভালো লাগছে।

প্রেমল : এইরকম যখন আমার মানসিক অবস্থা—মনে বেশ ক'রে ছ'কে নাও তোমার—অর্থাৎ যখন একদিকে মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস টলমল করে উঠেছে, অথচ অন্যদিকে ভগবানের কৃপারও কোনো প্রত্যক্ষ অকাট্য আশ্বাস মিলছে না—তখন ঘটল যা আমি চাইছিলাম—যাকে বলতে পারি (মৃদু হেসে) প্রেমালাপের পরে ড্রামা শোনো।

[ক্রমশ:]

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হখামনীষীয় বা আকাইমেনীয় রাজবংশের মাতৃভাষা প্রাচীন পারসিক ইরানের রাজভাষারূপে পরিগণিত হয়। প্রাচীন পারসিক লিপিগুলিও বাণমুখ লিপির প্রকারভেদের দ্বারা লিখিত হত। তখন সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর আক্রমণকারীরা সাময়িকভাবে হখামনীষীয় সম্রাটদের কাছে পরাভূত ছিল। পরবর্তী কালে গ্রিক আক্রমণে পারসিকেরা হেরে গেলেও শেষ পর্যন্ত আবার তারা সামলে নেয়। সম্রাট অশোকের আমলে এবং তার পরে তারা বৌদ্ধ ধর্মও অল্পাধিক পরিমাণে গ্রহণ করে।

প্রাচীন পারসিক ভাষা খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে মধ্য-পারসিক ভাষা পহ্লবী ও শক ভাষায় পরিণতি লাভ করে। মধ্য-পারসিক শক ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হয়। সপ্তম শতকে পারস্যের পতন হল ইসলামের উপপ্লবে। অষ্টম শতকে জাত আধুনিক ফার্সি ভাষার মতো প্রাচীন পারসিক ও মধ্য-পারসিক ভাষাগুলিও এখন সামান্য পরিবর্তিত আরবি লিপিতে লেখা হয়।

ইরানীয়-আর্য শাখার ভাষাগুলির রাজনৈতিক দুরবস্থা থেকে বোঝা যায়, কোন ভাষার নিজস্ব রাষ্ট্র তথা সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক সীমা না থাকলে সেই ভাষাভাষীদের জাতীয় শক্তির সুষম বিকাশ হতে পারে না। একটি প্রধান আর্য জাতির লোক হয়েও আজকের জগতে ইরানিদের প্রভাব যৎসামান্য। তার কারণ, সেমিটিক প্রভাবে ও তুর্কি আক্রমণে ইরানীয়দের রাষ্ট্রীয় সংহতি বারবার নষ্ট হয়ে যায়। ইরানীয়-আর্য শাখার ছ'টি ভাষার জন্যে ছ'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হ'লে ভাষাগুলির তথা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর যে-উন্নতি হতে পারত, বর্তমানে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যেও আফগান ও অন্য কোন কোন ইরানীয় আর্য জাতির উন্নতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছে।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, দেবশক্তির আরাধনা ত্যাগ ক'রে অসুরশক্তির উপাসনায় ব্রতী হওয়ার ফলে ইরানীয়রা স্বধর্মচ্যুত ও বিপথগামী হয়। তাতে তাদের জাতীয় আত্মা ক্রমশ সেমিটিক প্রভাবের বশীভূত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের ভাষা ও রাষ্ট্র তরল ও অস্থিরভাবাপন্ন হয়ে যায়।

ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষাগুলি সেমীয় ও তুর্কি প্রাধান্যের কালগুলিতে চিনি, মিশরি ও ইরানি সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লেও ভারতের সিন্ধু নদ থেকে পাতকোই পর্বতশ্রেণী, কারাকোরাম পর্বত থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকায় বিশিষ্ট ধারায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ-বিকাশ লাভ করেছিল। তার একটা মস্ত কারণ এই যে, বিজাতীয় আরব ভাষা, লিপি ও ধর্ম ইরানীয় আর্যদের যেমন এক রকম নিঃশেষে বিধ্বস্ত করেছিল, ইরানীয় আর্যদের ভাষা ফার্সি যেমন সেমিটিক-আরবি ভাষার দ্বারা শোচনীয়ভাবে জর্জরিত, ভারতীয় আর্য জাতিসমূহ কোন বৈদেশিক ভাষা, লিপি ও ধর্মের দ্বারা তেমন অভিভূত হয় নি, ভারতীয়-আর্য ভাষা সংস্কৃত ও তার বংশধর ভাষাগুলি সেমীয় ভাষার কুপ্রভাব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পেরেছিল।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ও জাতিবিভাগ প্রথার আশ্রয়ে ভারতীয়-আর্যভাষী জাতিগুলি আপেক্ষিকভাবে অবিকৃত ও অমিশ্রিত থাকতে সমর্থ হয়েছিল। তা ছাড়া ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বহির্ভূত কোন ভাষার রাজনৈতিক

প্রাধান্য ভারতীয়-আর্যভাষা সমষ্টিকে কোনদিন সহ্য করতে হয় নি। যে-ফার্সি ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা তা মুসলিম আমলে অনেক দিন অনেক ভারতীয় অঞ্চলে রাজভাষা ছিল বটে, কিন্তু তা কোন ভারতীয়-আর্যভাষাকে তেমন ভাবে বিকৃত করতে পারে নি যেমন পেরেছিল আরবি ভাষা ফার্সি ভাষাকে। পারসিক-গ্রিক-শক-কুশান-হুন—মঙ্গোল—তুর্ক—মুগল—ইংরেজ নানা বৈদেশিক আক্রমণ ও শাসন ভারত ও ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠী এবং ভারতীয় আর্য জনসমাজকে সহ্য করতে হয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ও তার বংশধর ভাষাগুলি তথা বর্ণাশ্রমী-হিন্দু সমাজ সে-সবের দ্বারা কলুষিত বা বিকৃত হয় নি। উদার-পন্থী আধুনিক সভ্যতার লোভে যাঁরা হিন্দু হয়েও হিন্দুর বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ এবং সংস্কৃত ভাষাকে উপহাসের চোখে দেখেন, তাঁরা ইতিহাস ভালো ক'রে পড়লে সবিস্ময়ে দেখবেন, এইচ. জি. ওয়েল্‌স. আডলফ্‌ হিটলার রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ও পথের পথিকরাও ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয়-আর্যদের বর্ণসঙ্কর ও শোণিতমিশ্রণ-বিরোধিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। ভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠী এই কারণে শোচনীয় দুর্গতি থেকে রক্ষা পায়। শোণিতমিশ্রণ না হওয়ায় ভাষা ও লিপির সাঙ্কর্যও সাধিত হয় নি। ভারতীয়-আর্যভাষী মুসলমানদের ক্ষেত্রে শোণিতমিশ্রণের অনুপাতে ভাষা ও লিপিগত সঙ্কারতা দেখা গেছে। পরে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। লক্ষ্য করা যাক যে, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে শোণিতমিশ্রণ পশ্চিম পাকিস্থানের তুলনায় অনেক অল্প ব'লে যত সহজে পাঞ্জাবি, সিন্ধি ও কাশ্মীরি মুসলমানরা তাদের মাতৃভাষা ও আদি লিপি বিসর্জন দিতে পেরেছে, বাঙালি মুসলমান তা তো পারেই নি, বরং সে তার মাতৃভাষা ও লিপিকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করেছে।

ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর উনিশটি প্রধান আধুনিক ভাষার মধ্যে যাযাবর জিপ্‌সি বা রোমানি ভাষার কথা বাদ দিলে বাকি আঠারোটি ভাষার মধ্যে এক মাত্র উর্দু ভাষা আরবি লিপিতে বা ঠিক ভাবে বলতে হলে পারসিকমিশ্র আরবি লিপিতে লেখা হয়। হিন্দি ভাষার ব্যাকরণের ভিত্তিতে গঠিত এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষাকৃত কম এবং ফার্সি শব্দ খুব বেশি। কিন্তু ফার্সিও ভারত-ইউরোপীয় তথা ভারত-ইরাণীয় বা ব্যাপক কিম্বা সঙ্কুচিত যে কোন অর্থে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা। ফার্সির দৌলতে আরবি আর তুর্কি শব্দও উর্দু ভাষায় প্রচুর পরিমাণে গৃহীত। তা সত্ত্বেও সব-বলা হয়ে গেলেও উর্দু যে একটি সংস্কৃতমূল ভাষা, ভারতীয়-আর্য গোষ্ঠীর ভাষা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। উর্দুর ওপর যে-ফার্সির প্রভাব খুব বেশি, সে-ফার্সিও ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা হওয়ায় উর্দুকেও সেমীয় ভাষা ব'লে মনে হয় না। উর্দুর প্রচলন হিন্দি ও সগোত্রভাষাভাষী এলাকার মুসলমানদের মধ্যেই মুখ্যত সীমাবদ্ধ হলেও কিছু সংখ্যক হিন্দুও উর্দুকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। অসমিয়-বাংলা-উড়িয়া-সিংহলি-মারাঠি-গুজরাতি-রাজস্থানি- কোসলি- ভোজপুরি-মগহি- মৈথিল-নেপালি হিন্দি-ডোগরি,এই চোদ্দটি ভাষার মধ্যে কিছু ইসলামি শব্দ থাকলেও আরবি লিপি ও বিজাতীয় অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের কোন সম্পর্ক নেই। আলবান, গ্রিক, বুলগার প্রভৃতি ইউরোপীয় আর্য ভাষায় যে পরিমাণ তুর্ক প্রভাব আছে, সে-রকম কিছু ইসলামি বা সেমিটিক বা আরবি-ফার্সি-তুর্কি ভাষার প্রভাব ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিতে পড়েনি, এক উর্দুতে ছাড়া। বাকি তিনটি ভাষা অর্থাৎ কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি ও সিন্ধি ভাষা-গুলির বেলায় দেখা যায়, হিন্দুরা শারদা ও গুরুমুখী লিপি ব্যবহার করে, কিন্তু মুসলমানেরা উর্দু লিপি (ফারসি-আরবি লিপি) ব্যবহার করে। যেহেতু কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি ও সিন্ধি জাতি তিনটির বেশির ভাগ লোক মুসলমান, সেহেতু কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে শারদা ও গুরুমুখী লিপির পরিবর্তে ক্রমশ উর্দুলিপিই সমস্ত সরকারি কাজে প্রযুক্ত হয়। তার পর পাকিস্থান গঠিত হওয়ায় উর্দু ভাষা পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার কণ্ঠরোধে প্রবৃত্ত হওয়ায় একমাত্র উর্দু ভাষা ও লিপির প্রচলন সেখানে বলবৎ হল। ভারতে পালিয়ে-আসা হিন্দুরা সিন্ধি ও পাঞ্জাবি ভাষা দুটি দেবনাগরি লিপিতে লেখে। যে-গুরুমুখী লিপি শারদা লিপিরই প্রকারভেদ, শিখরা তার সাহায্যে পাঞ্জাবি ভাষা লেখা পছন্দ করে। কাশ্মীরি ভাষা সরকারি কাজে উর্দু লিপিতেই লেখা চলছে বটে, কিন্তু হিন্দুদের দাবি, শারদা কিম্বা নাগরি লিপিতে কাশ্মীরি লেখা হোক। বে-সরকারি কাজে কাশ্মীরে শারদা লিপির প্রচলন এখনও আছে। অবশ্য সব সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে কাশ্মীরি ও পাঞ্জাবি

ভাষা দুটি সম্পূর্ণভাবে রোমক লিপিতে লিখলে। বাংলা-ভাষীর বেশির ভাগ মুসলমান হলেও বাঙালি মুসলমানের আরবি লিপি ব্যবহারের দুর্মতি হয় নি। ফার্সি, আফগান-ফার্সি, পশ্‌তো, বালুচ, তাজিক ও কুর্দ ভাষা ছ'টির দুর্ভাগ্য-বশত ঐ সব ভাষাভাষীরা নিজেদের লিপি বিসর্জন দিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত লিপি গ্রহণ করেছে যা ধর্মীয় গোঁড়ামির চাপে সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতে আর্য তথা হিন্দু সমাজের প্রতিরোধ শক্তি ঢের বেশি তীব্র হওয়ায় ১৩০০ বছরের ইসলামি সান্নিধ্য এবং পাঁচ শতাধিক বছরের ইসলামি প্রভুত্ব সত্ত্বেও ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি ইরানীয়-আর্য ভাষাগুলির মতো জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি হারিয়ে বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে পড়েনি।

এখন ইরাণীয় ভাষাগুলি বিশেষত ফার্সি ও আফগান-ফার্সি নিজেদের হারানো আত্মগরিমা পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হয়েছে। সেমীয় প্রভাব বা আরবি ভাষা, লিপি ও সাহিত্যের প্রভাব ঝেড়ে ফেলে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে পাশ্চাত্য জাতীয় সাহিত্যের মতো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পথে পদার্পণই এদের লক্ষ্য। পাকিস্থানের উর্দুভাষীদের মধ্যে এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙালী মুসলমান এ-ব্যাপারে অনেকটা সতর্ক ও সজাগ। বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ, এমন-কি ফার্সি শব্দও যতটা খাপ খায়, বিজাতীয় ও গোষ্ঠীবহির্ভূত আরবি ও তুর্কি শব্দ তেমন শোভা পায় না। "জিন্দা" বিশেষণটি প্রয়োগ ক'রেও দিলীপকুমার একবার লিখেছিলেন :—

শেষের এ বিশেষণটি হ'ল যে নজরুল-সম বিশ্রী,
খুন, চিন্ময় ! বাংলায় রস নয় যার মধু-মিশ্রি।

"জিন্দা" শব্দটি ফার্সি হলেও বাংলা গদ্যে তার প্রয়োগ যে সুশ্রাব্য নয়, এ-বিষয়ে মতভেদ হওয়া কঠিন। কবিতায় এ-রকম প্রয়োগ তবু চলে, কিন্তু গদ্যে অত্যন্ত শ্রুতিকটু।

ভারতীয় আর্য এবং বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমাজের এই বিস্ময়কর প্রতিরোধশক্তির রহস্য এই যে, হিন্দু আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণীকে নিয়েই সমাজবন্ধন করেছে অথচ জাতিবিভাগ প্রথার দ্বারা শোণিতমিশ্রণ ও বর্ণসঙ্করতাকে যথাসম্ভব প্রতিরুদ্ধ করেছে, প্রতি গোষ্ঠী, প্রতি উপজাতিকেই বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছে বাইরের দিক থেকে তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার ক'রে না ফেলে, প্রতিটি স্বতন্ত্র বর্ণের আশ্রয়ে প্রত্যেক নবাগত জনগোষ্ঠীকে বিশিষ্ট স্থান ও নিজস্ব ক্ষেত্র দিয়ে। সুতরাং বর্ণভেদপ্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজের ক্ষতি নয়, পরম কল্যাণের কারণ হয়েছিল। অস্পৃশ্যতা ও সমাজবহির্ভূত অন্ত্যজেরা না থাকলে ভারতে ভিন্ন ধর্মগুলির যে কোন সুবিধে হত না, সে কথা Murray T. Titus এই ভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন :—

"'The Hindus were so well organised in their social and religious life under the domination of priests and caste that comparatively litte could be effected towards the overthrow of their religion. Had they been as well organised in their palitical affairs, and had there been no outcaste groups to welcome Islam as a release from social bondge, it is safe to say that even a partial victory for Islam would not have been so easily won in the land of the Hindu." (Islam in India and Pakistan —pp 8)

"পুরোহিতবর্গ আর বর্ণবিভাগ প্রাধান্যে হিন্দুরা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এত চমৎকার সংগঠিত ছিল যে, তাদের ধর্মনাশের জন্যে তুলনামূলকভাবে সামান্য কিছু কার্যকর করা গিয়েছিল। তারা যদি তাদের রাজনৈতিক বিষয়সমূহেও সমান সুন্দরভাবে সংগঠিত থাকত এবং সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ইসলাম-বরণে প্রস্তুত অন্ত্যজগোষ্ঠী না থাকত, তাহলে নিরাপদে বলা যায় যে, হিন্দুর দেশে ইসলাম এমন-কি আংশিক বিজয়ও এত সহজে লাভ করতে পারত না।"

ভারতীয় হিন্দু সমাজের ঐ ধর্মীয় ও সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্যে শুধু যে হিন্দু তথা আর্য জনসমাজ মিশ্রণ তাণ্ডবের কবল থেকে রক্ষা পায় তাই নয়, মুখ্যত হিন্দুদের তৈরি ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিও বেঁচে যায়। বাংলাদেশে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে ইসলামি শাসন কায়েম হবার আগেই বাংলাভাষা এত সুগঠিত হয় যে, সাড়ে পাঁচশো বছরের নবাবি-বাদশাহিতে অধিকাংশ বাঙালি ধর্মে

মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির ভাষা তুর্ক মুগল প্রভাবে তেমন কাবু হয় নি। উনিশ শতকের প্রথমে আবার বাঙালি হিন্দু মনীষীদের হাতে বাংলা গদ্যকে এমন মজবুত ক'রে গড়া হয় যে, সে-ভাষা আজ অনায়াসে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের বড় আদরের প্রাণের ভাষা হতে পেরেছে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক ব্যবধান উপেক্ষা করে।

ভাষার শক্তি যেমন জাতিকে বলবান্ করে তেমনি জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় হলে সেইজাতির মুখের ভাষারও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ভাষা ও জাতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং শক্তি-সঞ্চার পারস্পরিক। কোন ভাষা লুপ্ত হলে সেই ভাষাভাষী জাতিরও অস্তিত্ব থাকে না। হিত্তি ভাষার অপহ্নুতির সঙ্গে সঙ্গে হিটাইট জাতিও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আবার, কোন জাতি লুপ্ত হলে তার ব্যবহার্য ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে যায়। সুমের জাতির লুপ্তির পর এখন আর তাদের ভাষার অন্যত্র কোন প্রচলন বা চর্চা অকল্পনীয়। এখনও পর্যন্ত সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন প্রমাণ করে যে, ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মতোই ভারতীয় আর্য জনসমাজ হিন্দু নামের অন্তরালে সমধর্মী অনার্যদের সঙ্গে আজও জীবন্ত ও বাড়ন্ত। হিন্দু সমাজের বিরাট আশ্রয়ে যেমন চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ও দুটি মঙ্গোল অনার্য জাতি শান্তিতে ও নিরাপদে ক্রমবর্ধমান, তেমনি উর্দুভাষী মুসলিম ও জিপ্‌সিজাতি বাদে সিংহল সমেত সতেরোটি প্রধান আর্যভাষী জাতিও স্বচ্ছন্দে রয়েছে। এ-কথা বলা ন্যায়সঙ্গত যে, হিন্দুসমাজের আশ্রয় ভিন্ন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠী এত দীর্ঘকাল স্বাভাবিকপথে অগ্রসর হতে পারত না।

যেখানে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন ভাষাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধবাদী প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি, সেখানে তার বিশুদ্ধি ও উৎকর্ষ রক্ষায় বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু অতি হিংস্র ধর্মান্ধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোন ভাষা যখন শত শত বছর ধ'রে নিজের গোষ্ঠীলব্ধ স্বাভাবিক রূপটি অব্যাহত রাখে তখন সেই ভাষাভাষী যে সমাজের অন্তর্গত, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। সেই সমাজভুক্ত লোকের পক্ষে নিজের সমাজের প্রতিরোধশক্তির নিন্দা করা অকৃতজ্ঞ স্বজন-দ্রোহিতার তুল্য। আশা করা যাক যে, পাকিস্তান গঠনের পর এই অকৃতজ্ঞ আত্মঘাতী মনোভাব থেকে হিন্দুসমাজ রক্ষা পাবে। পাঠান, মোগল, শক, হূন ইত্যাদির রক্ত যে সার্বভৌমিক উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও প্রতি হিন্দু আর্য বা অনার্যের দেহে একসঙ্গে বইছে না, তা হিন্দুর সৌভাগ্যের বিষয়। হিন্দু সমাজেও বৌদ্ধ প্রভাবের জন্যে শোণিত মিশ্রণ হয়েছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার পরিমাণ প্রতিকূল পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব কম।

মুখবন্ধ

ভারতীয় আর্য জাতি অর্থাৎ ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষা বা প্রাচীনতম রূপ ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই প্রকৃত আর্য জাতি। ইরানীয় আর্যজাতি অর্থাৎ ইরানীয়-আর্য ভাষাসমূহ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী এদের থেকে খুব বেশি দেরি হয়ে থাকলে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে আলাদা হয়ে যায়। তার আগে ভারতীয় আর্যজাতির ভারতে প্রবেশ ও বিস্তার কিভাবে হয়, ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের আধুনিক বর্তমান স্তর কিভাবে বিবর্তিত হয়, সে আলোচনা সংক্ষেপে করা যাক।

ভারতীয় আর্যরা তাঁদের আদি বাসভূমি যেখানেই হয়ে থাক না কেন, হিত্তিদের থেকে পৃথক্ হবার পর, ইউরোপীয় আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র হবার পর, নিজেদের আদি বাসস্থান থেকে ক্রমশ দক্ষিণ-পূবে ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করতে লাগলেন। ভারত-হিত্ত ভাষাগোষ্ঠী থেকে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের বিচ্ছিন্ন হবার সময় এবং ভারত-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ থেকে ইউরোপীয় ভাষাবর্গের স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার সময় এখন ঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। প্রায় অসম্ভব। ভারতীয়-আর্য ভাষাবর্গের বিশিষ্টতার আত্মপ্রকাশ কবে এবং এই বর্গের ভাষাভাষীদের ভৌগোলিক ভারতে প্রবেশ-কাল কখন্—এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে বরং আলোচনা করা যেতে পারে। তার দ্বারা আমরা ভারতীয় আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর বিবর্তন ও বিস্তারের রহস্য বুঝতে পারব।

এ-ব্যাপারে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমতের ওপর নির্ভর করা শোচনীয় ভ্রান্তি ও আত্মঘাতের সামিল হবে। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি ইত্যাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ছদ্মবেশে যে-সব ইহুদি মনীষী আছেন, তাঁরা কোন অ-সেমীয় জাতি বা ভাষাকে ইহুদিদের চেয়ে বেশি প্রাচীনতার মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ভারতীয় আর্যজাতির বিরুদ্ধে উৎকট বিদ্বেষ দেখা যায়। সুতরাং আমরা তাঁদের

মতের অন্ধ দাস্য না ক'রে যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য নিজস্ব সিদ্ধান্ত গঠন করব।

আলোচনার সুবিধের জন্যে এখন থেকে ভাষার নামেই জাতির পরিচয় দেওয়া হবে। এ-সম্বন্ধে বিনয়কুমার সরকার যুক্তিসম্মতভাবে লিখেছেন :—

"সেমিটিক শব্দে একপ্রকার বিশেষ ভাষায় কথাবার্তা বলে এরূপ জনগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝায়। এইরূপ আর একটি শব্দ আর্য। আর্য বলিলে পণ্ডিতেরা আর্য ভাষাভাষী জনগণকে বুঝিয়া থাকেন। ভাষাব্যবহারের সঙ্গে রক্ত-সংমিশ্রণ অথবা বংশমর্যাদা কিম্বা জাতিকৌলীন্য ইত্যাদির কোন সম্বন্ধ নাই। নৃতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আর্য বা সেমিটিক ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয় না। ভাষাবিজ্ঞানের জাতিবিভাগ অনুসারেই এই সমুদয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" (বর্তমান জগৎ চতুর্থ খণ্ড ইয়াঙ্কিস্থান, ২৬৬ পৃষ্ঠা।)

ভারতীয়-আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপটি একরকম নিঃসংশয়ে ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তগুলির মধ্যে ধরা আছে। কিন্তু সেগুলি পড়লে তাতে যে-উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও ভাষা-গঠনের পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা এ যুগেও দুর্লভ। তাদের সাহায্যে সহজেই বোঝা যায় যে ওগুলি লিখিত বা রচিত হবার বহু আগে থেকে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ভারতীয়-আর্যভাষার প্রয়োগ হয়ে আসছে। ভারতীয়-আর্যভাষার প্রথম বিকাশ-কাল নির্ণয় করা না গেলেও যে-ঋগ্বেদ সমস্ত ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন, তার কাল কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদগ্রন্থ থেকে ভৌগোলিক ভারতে আর্যদের প্রবেশ-কালও কতকটা বোঝা যায়। সুতরাং বৈদিক গ্রন্থসমূহের কাল নির্ণয়ের দ্বারা আমরা আগে উল্লেখ করা দুটি প্রশ্নেরই উত্তর পাই। ঋগ্বেদ রচনার সময়ে ভারতীয়-আর্যভাষা সুপরিণত আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে এবং ঋগ্বেদ রচনার বেশ কিছুকাল আগে ভারতে আর্যবিস্তার শুরু হয়েছে যার ফলে গুছিয়ে বসার পর আর্য জাতি এমন উৎকৃষ্ট কাব্যময় গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন।

আর্যরা ভারতে যত দিন আগে প্রবেশ ক'রে থাকুন না কেন, তাঁরা এদেশে আসার আগে দেশ জনহীন ছিল না। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি নিগ্রো জাতি অবস্থান করত, যারা পরে-আসা অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়, সম্ভবত আরো-পরে-আসা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের মিশ্রণ ঘটে। চীন-তিব্বতীয় ভাষা-গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শাখার বোড়ো উপশাখার লোকেরা আর্যদের ভারতে আসার আরো পরে এসে থাকতে পারে। কিন্তু ভারতে সব সময়েই আর্য ভাষাগুলি ছাড়া অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বতীয় শাখার ভাষাগুলি বর্তমান আছে, একথা ভুললে চলবে না।

আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের অনেক আগে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, একথা মনে করার বহু কারণ আছে। সম্ভবত: খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন অথবা আরো আগে ভারতে প্রবিষ্ট বা জাত হয়ে থাকলে ঐ সময়ে তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তারলাভ আরম্ভ করেন। এখানে একটা কথা মনে রাখা নিতান্ত দরকার যে, ভারতীয় আর্যরা ইরানীয় আর্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি, ইরানীয় আর্যরাই ভারতীয় আর্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান। ভারতীয় আর্য জাতির সাহিত্যিক নিদর্শন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং তুলনায় ইরানীয় আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বা সাহিত্যের নিদর্শন অর্বাচীন। পরলোকগত অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষের মতো সুপণ্ডিত অধ্যাপকও ১৯৪৮-৪৯ সালে আর্যোদয় প্রবন্ধে ভুল ক'রে লিখেছেন যে, ভারতীয় আর্যরা ইরানের খাস আর্য জাতির কাছ থেকে পৃথক্ হয়ে যান। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক বিপরীত।

এই পৃথক্ হওয়ার কাল সম্বন্ধে সকলে একমত পোষণ করেন না। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে, সময়টা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দী; ওয়েলস, বটকৃষ্ণ এবং আরো অনেকের মতে, ঐ বিচ্ছেদ-কাল খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতকের কাছাকাছি। যাবতীয় লিখিত নিদর্শন দেখলে বোঝা যায় যে, ভারতীয় আর্যরা হিত্তিদের, মিতান্নিদের এত নিকট প্রতিবেশী ছিলেন যে, তাঁদের ভাষা, দেবতার নাম, রাজা বা মানুষের নাম, ধর্মোপাসনার পদ্ধতি—এ-সমস্তের প্রভাব হিত্তি ও মিতান্নির ওপর পড়েছে; অথচ মাঝখানে ব্যবধানরূপে ইরানীয় আর্যদের থাকার কথা। কিন্তু তা না থাকায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতীয় ও ইরানীয় আর্যরা এক জাতিরূপেই হিত্তি ও ও মিতান্নিদের সমকালে বর্তমান ছিলেন। আরো পরে ইরানীয়রাই মূল "আর্য" বা ভারতীয় আর্যজাতি থেকে পৃথক্

হয়ে যান। এই পৃথক্ হওয়ার ব্যাপারটা বেদের চূড়ান্ত সঙ্কলনকার্য সমাপ্ত হওয়ার পরে ঘটে থাকবে। কারণ ইরানীয়রা বেদ মানতে রাজি ছিলেন না। যখন বেদ লিখিত আকারে সংগ্রথিত হল, তখনই তাকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের রূপ রচিত হল। ইরানীয়রাও সেই সময়ে মত পার্থক্যের জন্যে আলাদা হয়ে যান। সম্ভবতঃ মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের সমকালেও মূল ভারত-ইরানীয় আর্যজাতি একত্র বসবাস করত। ১৪০০—৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অসুর জাতি প্রবল পরাক্রান্ত থাকার সময়ে সম্ভবত অসুরপ্রভাবে বিকৃত ধর্ম গ্রহণ ক'রে ইরানীয় আর্য জাতিই যে মূল ভারতীয় আর্যজাতি হিন্দু এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলেই বসবাস করত স্মরণাতীত কাল থেকে, তাদের ত্যাগ ক'রে হিন্দু ও ভারতীয় এলাকার মাঝখানে ব্যবধানরূপে পরিণত হয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে সময়টা মাত্র খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ সালের কাছাকাছি। জরথুস্ত্র ঐ বিচ্ছেদ বিশেষভাবে কার্যকর করেন। তিনি আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লোক। সুতরাং ভারতীয়-ইরানীয় আর্য-বিচ্ছেদকাল মোটামুটি ধারণা করা যায়।

বৈদিক গ্রন্থসমূহের কালনির্ণয় এবং তার দ্বারা ভারতে আর্যদের প্রবেশ ও ভারতীয়-আর্যভাষার বিশিষ্ট স্ফূরণ কবে হয়েছিল, তা ঠিক করা অবশ্য অত সহজ নয়। তবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ ও ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা ও সম্মিলিত প্রয়োগে ভারতীয় আর্য ঐতিহ্যের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। ইউরামেরিকার অনেক পণ্ডিত ও তাদের ভারতীয় পণ্ডিতম্মন্য দাসসম্প্রদায় রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহাসিক দামমূল্য স্বীকার করেন না। অথচ ইলিআদ ও অদিসি মহাকাব্যদুটি অবলম্বন ক'রে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় আর্য গ্রিক জাতির ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন এবং ঐ কাব্য দুটির দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে খননকার্য চালিয়ে সুফলও পাওয়া গেছে। যাঁরা রামায়ণ ও মহাভারতকে মাত্র মহাকাব্য ব'লে মনে করেন, তাঁদের বোঝা উচিত, ও-দুটি মহাকাব্য তো বটেই, কিন্তু বিশেষ ক'রে মহাভারত ঐ সঙ্গে ইতিহাসও বটে। রামায়ণ ইতিহাস না হলেও ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী নিঃসন্দেহ। যে-প্রমাণে ট্রোজান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ স্বীকৃত হয়েছে তার চেয়ে অনেক জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর অনুকূলে আছে। কোন মহাকাব্যে কোন বিশুদ্ধ কাল্পনিক চরিত্রের জন্মকাল ও কোষ্ঠী নির্দেশ করা থাকে না। রামায়ণ ও মহাভারতে রামাদি চার ভাই ও কৃষ্ণসহ পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মকাল ও কোষ্ঠী নির্দেশ করা আছে। সুতরাং জ্যোতিষিক প্রমাণ ঐ দুই মহাকাব্যের কাহিনীর সত্য ভিত্তি নির্দেশ করে। তা ছাড়া কোন দেশে কোন জাতি অনৈতিহাসিক মহাকাব্যের কাল্পনিক চরিত্রকে সেই দেশে এক কালে আবির্ভূত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র বা ভগবানের অবতার বা পরম পুরুষরূপে পূজা করে না, সেই চরিত্রের জন্মস্থান, বসবাসের ক্ষেত্র, মৃত্যুস্থান প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা ও নির্দেশ করে না। রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি চরিত্র সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থাননির্দেশ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে অনেক ভুলচুক হতে পারে, কল্পনার অতিরঞ্জনেরও অভাব নেই, মহাকবির ব্যবহৃত বিশিষ্ট রূপক ও অলঙ্কার-চাতুর্যের অন্তরাল তো আছেই। এ-সব সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসে দিগ্‌দর্শনরূপে পুরাণগুলির সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থদুটিকে অবশ্য গ্রাহ্য করতে হবে। এ-ব্যাপারে লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, গিরীন্দ্রশেখর বসু, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীই ঠিক বলেছেন।

সুনীতিকুমারের মতো লোকও লিখেছেন সাহিত্য, ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ আর পুরাণের প্রমাণগুলির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে চলে আসা ভারতীয় ঐতিহ্য ও লোকস্মৃতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে :—

"যাঁরা প্রাচীন ইতিহাস যথারীতি আলোচনা করেন, তাঁদের কেউই রামায়ণের কোনও ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না; মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত আর পুরাণের অনেক উপাখ্যানের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকতে পারে, এইটুকু স্বীকার করেন মাত্র।" (হিন্দু সভ্যতার পত্তন।)

প্রাচীন ইতিহাস যথারীতি আলোচনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র আর বিবেকানন্দ দু'জনেই রামায়ণ মহাভারত-পুরাণ থেকে ভারতের ইতিহাসে কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সুনীতিবাবু নিজেই তাঁর প্রবন্ধটিতে অনতিবিলম্বে স্বীকার করেছেন :—

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে হইয়াছিল, এইরূপ মত দুজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইংরেজ Pargiter (পার্জিটর) সাহেব আর ভারতীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি—এঁরা প্রকাশ করেছেন, এঁদের আলোচনা পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দেবার নয়!"

Dynasties of the Kali Age গ্রন্থে পার্জিটার অবশ্য ১৪৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম বলেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুনীতিবাবুর মতে বিশিষ্ট ব'লে গণ্য হতে পারেন এমন অন্তত দু'জন ঐতিহাসিক তা স্বীকার করেন, সুতরাং তর্ক যা কিছু, তা ঐ যুদ্ধের কালনির্ণয় নিয়ে হতে পারে, যুদ্ধটার অস্তিত্ব বা ঐতিহাসিকতা নিয়ে নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সংঘটন ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন, মানতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে যে-পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, তার চেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর কিছু হতে পারে না। পার্জিটার যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ স্বীকার করছেন, তখন সেই যুদ্ধে কৌরবপক্ষে রামচন্দ্রের বংশধর বৃহদ্বলের উপস্থিতি কোনমতে অস্বীকার করা চলে না। বৃহদ্বল রামচন্দ্র থেকে ত্রিশ পুরুষ পরবর্তী, এ-কথাও পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত। সুতরাং রামায়ণের কাহিনীর কালনির্ণয়ও অনুমানের সীমায় সহজে এসে যাচ্ছে। তার ঐতিহাসিকতা উড়িয়ে দেওয়ার মতো গুড়ির জোর কারো নেই; তা করতে হলে সমগ্র মহাভারত ও তার কাহিনীর সুশৃঙ্খল পৌর্বাপর্য অস্বীকার করতে হয়। সুনীতিবাবু ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে মুশকিল হচ্ছে যে, ঘটনাবলী ও চরিত্রসমষ্টির অস্তিত্ব তথা ঐতিহাসিকতা একেবারে অভ্রান্ত, একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতও নিরুপায়ভাবেই স্বীকার করেছেন। প্রশ্নটা জটিল হয়েছে ঘটনাবলির কাল নির্ণয় করা নিয়ে। সে-ব্যাপারে সুনীতিবাবুদের মতো অনেকেই বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীনতা যে বুদ্ধদেব ও আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময়ের অনেক আগের ব্যাপার, এটা স্বীকার করতে বিব্রত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন—পাছে পাশ্চাত্য গুরুরা রাগ করেন কি হেসে ওঠেন! যাই হোক, সত্য সকলের চেয়ে বড়, এই নীতি অনুসারেই আমরা চলব।

আমরা তাঁদের ভাষা নিয়ে হিত্তিদের থেকে যবেই আলাদা হয়ে থাকুন এবং ভৌগোলিক ভারতে প্রবেশ করুন, একটা কথা মোটামুটি ঠিক যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দী নাগাদ তাঁরা সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমি বরাবর বিস্তারলাভ করতে থাকেন। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ আলোচনা ক'রে বোঝা যায় যে, তাঁরা ভারতে এসে দীর্ঘকাল বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে ও ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত পাঞ্জাব বা পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশে বাস করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ তো দূরের কথা, সমস্ত উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর যুগেও আর্য প্রাধান্য বা আর্যবিস্তার সম্ভবপর হয়নি। বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিত ও সুনীতিবাবু প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীও স্বীকার করেন যে, ঋগ্বেদের একেবারে প্রথম দিকের শ্লোকগুলি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের দিকে রচিত এবং আর্য রচয়িতৃগণ আরো কিছুকাল আগে ভারতে এসে থাকবেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সাল নাগাদ আর্যরা এক দলে বা নানা দলে পর্যায়ক্রমে ভারতে আসতে আরম্ভ করেন। এ-কথা এখন প্রায় সব ঐতিহাসিক স্বীকার করছেন।

সাল-তারিখ নিয়ে অত বেশি দিন আগের ব্যাপারে যত মতভেদ থাক না কেন, দিগ্‌দর্শন হিসেবে আমরা ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাচ্ছি যাদের সংঘটন-কাল মুখ্যত বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য এবং গৌণত আরো অনেক দেশি-বিদেশি বই থেকে নিরূপণ করা যায়। এ-সব ব্যাপারে উইলসন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, টিলক, দয়ানন্দ, গিরীন্দ্রশেখর প্রভৃতির আলোচনা-পদ্ধতি ও মতামতের মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হবে। তুলনায় ম্যাকডোনেল, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন মশাইদের মত এই জন্যে উপেক্ষা করা যায় যে, আমাদের আলোচনায় নাম-খ্যাতি-যশ-পাণ্ডিত্যের চেয়ে যুক্তি-প্রমাণ-সত্যনিষ্ঠার মূল্য ঢের বেশি।

[ক্রমশঃ]

পরিবর্ত্তন

(গল্প)

চারুলতা রায় চৌধুরী

সুবিমলের বিয়ে হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। সে তখন এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কাজে ঢুকেছে। কলেজে মেধাবী ছাত্র বোলে তার সুনাম ছিল। কর্ম্মস্থলেও নিজের কাজ দেখিয়ে অল্পদিনের মধ্যে বেশ একটা প্রতিপত্তি জমিয়ে ফেলেছিল। কর্ত্তাব্যক্তিরা তার কর্ম্মদক্ষতায় খুসী হওয়ার দরুণ কাজে বাহাল হবার কয়েক বছর পরেই তার উন্নতি হয়ে গেল। তার ইচ্ছা বিদেশ থেকে একটা বড় ডিগ্রী নিয়ে আসে। কিন্তু মার মত না পাওয়ায় ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত কোরতে দেরী হচ্ছিল। সুবিমল তার ছাত্র-জীবন শেষ করবার আগেই তার বাবা মারা যান। মা নিজের দুঃখ চেপে রেখে ছেলেটিকে মানুষ কোরে তোলেন, তাকে স্বাবলম্বী হবার পথে অগ্রসর কোরে দেন। তাই মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা তার পক্ষে কঠিন ছিল।

ছেলে উপার্জ্জনক্ষম হয়েছে। মায়ের ইচ্ছা মনের মত একটি বৌ এনে ঘরের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। এ পর্য্যন্ত সে রকম কাউকে চোখে না পড়ায় একথা মুখ ফুটে কারো কাছে প্রকাশ করেন নি।

আধুনিক কালে বাস করলেও এঁদের পরিবারস্থ কেহই যাকে বলে নতুন চালের মানুষ তা ছিলেন না। মাকে "মা" বোলে সম্বোধন করাটাই ছিল এঁদের বাড়ীর রীতি। গুরুজনদের প্রণাম করা এবং সম্মান দেখানর প্রথাও চলতি ছিল। অধিক মাত্রায় আধুনিক পন্থী মানুষদের কাছে তাই এঁরা ছিলেন অত্যন্ত সেকেলে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও চলত। কিন্তু তাহ'লে কি হয়, বিয়ের দাঁড়িপাল্লায় সুবিমলের ওজন তার জন্য বিন্দুমাত্র কম হয়নি। সে সুপুরুষ, তার ওপর প্রতিষ্ঠাবান্। তাই ঐ দলভুক্ত বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং তাঁদের অভিভাবকরা তার কাণের কাছে গুনগুন্ কোরতে ছাড়তেন না। সুবিমলের মার তাই বড় ভয় ছিল পাছে ঐ জাতীয় কোন মায়াবিনী তাঁর ছেলেটির ওপর জাল বিস্তার কোরে ফেলে।

সুবিমলের এক দিদি ছিলেন, নাম সর্ব্বাণী। তিনি থাকতেন সহরের অন্য প্রান্তে, স্বামীর সংসারে। প্রতি রবিবার মা ও ভাইয়ের কাছে এসে কাটিয়ে যাওয়া তাঁর প্রায় নিয়মের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে আসতে না পারলে এঁদের ডাক পড়ত তাঁর বাড়ীতে। সর্ব্বাণীর স্বামী ছিলেন ডাক্তার, সদা ব্যস্ত মানুষ রসিক লোক, সভা জমাতে ওস্তাদ কিন্তু তাঁর দর্শন পাবার সম্ভাবনা ছিল কম।

কোন এক শনিবার ফোন বাজতে মা গিয়ে ধরলেন। শুনতে পেলেন সর্ব্বাণীর গলা—মা আমি কাল যাচ্ছি না। তুমি ও সুবু এস। খাবার ব্যবস্থা এখানেই হ'বে। একটি খুব ভাল জিনিস তোমাদের দেখাব।

তাই নাকি? তা বোলেই ফেল না কি জিনিস। অত হেঁয়ালী কেন?

একটি অতি সুন্দর মেয়ে, ঠিক তুমি যে রকমটি চাও। সুবুর সঙ্গে ভারি মানাবে। তুমি কিন্তু ওকে কিছু বোলো না। ও যা ছেলে! তাহ'লে কখ্খন আসতে রাজি হ'বে না।

আচ্ছা, তা বোলব না কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি এল কোথা থেকে? এতদিন তো কই ওর কথা কিছু শুনিনি তোর মুখে।

অত কথা কি ফোনে বলা যায় মা? এস তো কাল তারপর সব শুন'খন।

রবিবারদিন মায়ের সঙ্গে সুবিমল যখন সর্ব্বাণীর

বাড়ী গিয়ে পৌঁছিল তখন সে একা ছিল না। তার পাশে বসে একটি ১৭।১৮ বছরের মেয়ে—পশমের কাজ কোরছিল এবং সেই সঙ্গে গল্প। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কোরতে সর্ব্বাণী দরজার কাছে এগিয়ে গেল। সকলে ঘরে এলে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বোললে, সর্ব্বাণীদি আমি তাহ'লে এখন যাই।

সর্ব্বাণী তার হাত চেপে ধরে বোললে, নিশ্চয় না। আমার মা, ভাই কি বাঘ, ভালুক যে তাঁদের দেখে তোমায় পালাতে হ'বে। যাবে তো নাই এবং আমার এখানেই আজ খাবে।

মেয়েটি সলজ্জ হেসে বোললে,—না সর্ব্বাণীদি মাকে যে বোলে আসিনি।

সে ভার আমার। তোমার সে জন্য ভাবতে হবে না। আমি ফোন কোরে বোলে দিচ্ছি এক্ষুণি।

অগত্যা মেয়েটিকে বসতে হ'ল। কোন পক্ষে আড়ষ্ট ভাব ছিল না সুতরাং কথাবার্ত্তা বেশ সহজ ভাবেই এগিয়ে চলল।

মা জিজ্ঞাসা কোরলেন, তোমার নাম কি বলো তো মা? পরিচয় হ'ল কিন্তু নামটি এখন পর্য্যন্ত শোনা হ'ল না।

মেয়েটি উত্তর করবার আগে সর্ব্বাণী বোলে উঠল নাম হ'ল "কল্যাণশ্রী" কিন্তু অতবড় নামে কে ডাকছে। বাড়ীতে সবাই লক্ষ্মী বলে, আমিও তাই।

লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখখানি। আমিও ঐ নামেই ডাকব। তোমার আপত্তি নেই তো মা?

লক্ষ্মী মুখ রাঙ্গা কোরে বোললে, ঐ নামটাই তো চলতি। অন্য নাম কাগজে কলমেই যা লেখা হয়। ও-নাম ধরে বড় একটা কেউ ডাকে না।

নাওয়া খাওয়া চুকে গেলে লক্ষ্মী বোললে, এইবার তাহ'লে আমি যাই সর্ব্বাণীদি।

এত তাড়া কিসের বল দিখিনি? বাড়ীতে কি কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা কোরে বসে আছেন নাকি?

মা একা আছেন যে।

তুমি বুঝি গিয়ে পাহারা দেবে? যেদিন তুমি কলেজে চলে যাও সেদিন কি হয়? তারপর ভাইএর দিকে চেয়ে বোললে,—এই সুবু ওঠ, তোর গাড়ীতো হাজির, চল পৌঁছে দিয়ে আসি।

লক্ষ্মী আপত্তি কোরে বোললে,—না, না, তার কিছু দরকার নেই। এইটুকু পথ আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

তা তুমি পারবে নিশ্চয় কিন্তু সুবিধা যখন রয়েছে তখন এই রদ্দুরে আমি তোমাকে হেঁটে যেতে দেব না।

সুবিমল বোললে,—দিন না একটু পরোপকার কোরতে। তাতে আমার কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় হবে এবং আপনারও লোকসান নেই।

যাবার বেলায় লক্ষ্মী সর্ব্বাণীর মাকে প্রণাম কোরলে তিনি তাকে আদর কোরে বললেন চিরায়ুষ্মতী হও।

গাড়ী থেকে নামবার সময় সুবিমলকে নমস্কার কোরে লক্ষ্মী বোললে, মিছে আপনাকে গরমের মধ্যে কষ্ট দেওয়া হ'ল। সর্ব্বাণীদির যেমন কাণ্ড!

সুবিমল হেসে উত্তর কোরলে,—মোমের পুতুল হ'লে এতক্ষণে গলে যেতুম সে বিষয় সন্দেহ নেই।

সর্ব্বাণীকে বাড়ীতে পৌঁছে সুবিমল বোললে, আমি এখন চললাম দিদি। টেনিস খেলে ফেরবার পথে মাকে তুলে নিয়ে যাব। ততক্ষণ তোমার একচেটিয়া অধিকার, মনের সাধে পরচর্চ্চা কর।

সর্ব্বাণী বোললে বড় টিপ্পনী কাটতে শিখেছিস, না? দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি।

সুবিমল হাসতে হাসতে গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

সর্ব্বাণীর মাধ্যমে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। কার আকর্ষণে যে সুবিমল ঘনঘন দিদির বাড়ী যাওয়া সুরু কোরেছে সেটা কাহারও বুঝতে বাকি রইল না। লক্ষ্মীর বাড়ীতেই প্রায়ই তার নিমন্ত্রণ থাকে। তার বাবার সুবিমলকে ভারি পছন্দ। তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা হয়। তিনি বলেন ছেলেটি কেবল বই মুখস্থ কোরেই শেষ করেনি। ওর মধ্যে চিন্তাশক্তি আছে। বিনা বিচারে সব কিছুকে গ্রহণ করে না। ওর সঙ্গে কথা বোলে আনন্দ পাওয়া যায়।

অলক্ষ্যে থেকে এইভাবে প্রজাপতি দুটি অজানা পরিবারকে অতি নিকটে টেনে আনলেন। অনঙ্গদেবও পিছিয়ে রইলেন না। দুটি নবীন প্রাণীর চোখে অঞ্জন লাগিয়ে তাঁর কাজ সুরু কোরে দিলেন। শুভলগ্নে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল এবং সুবিমলের গৃহের কল্যাণ বৃদ্ধি কোরতে কল্যাণশ্রী বধূরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

সুবিমলদের কয়েকটি বাড়ী পরেই থাকতেন অভিজিৎ পাল, বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, খাঁটি নব্য চালের মানুষ। সেখানে দেশী কোন কিছুই প্রশ্রয় পেত না। বাড়ীটি ছিল দুইভাগে বিভক্ত। উপর তলায় থাকতেন অভিজিৎ, তাঁর স্ত্রী কেতকী এখন কেটি, এবং শিশুপুত্র অমিত বা অমিট। নীচের তলার বাসিন্দা ছিলেন তাঁর প্রৌঢ় পিতামাতা। একবাড়ী হ'লেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। প্রতিদিন যে দেখা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। অভিজিৎকে নিয়মিত Court-এ হাজিরা দিতে হ'ত। কেটিও শিশুমঙ্গল সমিতি, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি নানা Social work সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কাজের মানুষদের সব দিক রক্ষা করা কি সম্ভব? শ্বশুর, শাশুড়ীর তত্ত্বাবধান করবার সময় সে পায় কোথা থেকে? ছেলের জন্য দস্তুর মত কায়দা দুরস্ত আয়ার ব্যবস্থা ছিল। মার চেয়ে ছেলে তাকেই চিনত বেশী। অসুখ বিসুখ হলে আয়াকেই সে কাছে পেতে চাইত। সুতরাং ছেলের জন্য তাদের ভাবনার কোন কারণ ছিল না।

অপরাহ্নের দিকে প্রায়ই তাঁদের আঙ্গিনায় টেনিসের মজলিস বসত। অভিজিতের বাবামার সেখানে দর্শক হিসাবে যোগ দেওয়ায় কোন বাধা ছিল না। কোন বিষয় যাকে বলে interfere করা, সেটুকু না কোরলেই হল। ঐ খেলাটি ছিল সুবিমলের অত্যন্ত প্রিয় এবং সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে নামও কোরেছিল। এই টেনিস উপলক্ষ্যেই অভিজিতের সঙ্গে তার পরিচয়। কোন এক বাড়ীর টেনিস আসরে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। এই খেলার সূত্র থেকেই অভিজিতের বাড়ী তার যাওয়া আসার সুরু হয়।

একে প্রতিবেশী তাতে আবার পরিচিত সুতরাং বৌভাতের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাতে হ'ল। স্বামীর সঙ্গে কেটি যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা কোরতে এল তখন সে সাজসজ্জার বাহারে ঝলমল কোরছে। অতি আধুনিক চালে কেশ বিন্যাস করা। ঠোঁট, গাল, নখ সব কিছু লালে লাল। বাহিরের এই আক্রমণে আসল রূপটি কোথায় যে হারিয়ে গেছে খুঁজে পাবার জো নেই। কনের কাছে এসে চেষ্টার দ্বারা অভ্যাস করা মনমজান হাসি হেসে কেটি বোললে, Oh, what a pretty bride! Wedding parties শেষ হলে আপনি নিশ্চয় ওঁকে নিয়ে আসবেন to our tennis parties. তারপর নতুন বধূকে উদ্দেশ কোরে বোললে, অল্পদিন পরে আপনি আসবেন আমাদের বাড়ী আপনার husband-এর সঙ্গে।

কেটি যে সমাজে মানুষ সেখানে মাতৃভাষা বলার চলন ছিল কম। সেই জন্যই বোধহয় বাংলা উচ্চারণটা তাকে একটু বাঁকা কোরে কোরতে হচ্ছিল। তার কথায় লক্ষ্মী তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি কোরে একটু হাসলে শুধু, বোললে না কিছু।

বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেলে কেটি এক সন্ধ্যায় তাদের উভয়কে টেনিসের আসরে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাঠালে। লক্ষ্মী ঠোঁট ফুলিয়ে বোললে, না, আমি যাব না, কখখনো না। ওদের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই! ওরা আমায় ডাকছে তামাসা দেখবার জন্যে।

সুবিমলের মা বোললেন, ওরা আমাদের নিমন্ত্রণে এসেছিল সুতরাং তুমি একবার না গেলে ভাল দেখাবে না বৌমা। ভয় কি? সুবু তো সঙ্গে রইল। ইচ্ছা হলেই ফিরে আসতে পারবে।

বাড়ী এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে মুখ ভার করে লক্ষ্মী বোললে, ছিঃ!

সুবিমলের মা একটা বই পড়ছিলেন। মন্তব্য শুনে মুখ তুলে ছেলেকে প্রশ্ন কোরলেন,—কি হল রে! বৌমা এত বিরক্ত কেন?

সুবিমল হেসে বোললে, ওরা যে কি চালের মানুষ তা তো দেখেইছ। এক ভদ্রলোক ওকেও ঐ দলের মনে করার দরুণই বোধহয় একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কোরেছিলেন তাই ও গেছে চটে।

লক্ষ্মী বোললে,—ওরা ভীষণ অসভ্য। আমি আর কখনই যাব না।

মা বোললেন,—আর যাবার দরকারই বা কী? ওরকম সব জায়গায় বৌমাকে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। তুই একা যেতে হয় যাস্।

লক্ষ্মী মুখ গম্ভীর কোরে বোললে,—হুঁ, আর গেলে তো। তার ভাবগতিক দেখে শাশুড়ীও না হেসে পারলেননা।

বছর দুই পরে লক্ষ্মীর কোলে এল একটি ফুটফুটে মেয়ে। নাত্নী পেয়ে মায়ের মন খুসীতে ভরে উঠল। আদর করে নাম রাখলেন নন্দিনী।

এই অনাবিল আনন্দের মধ্যে বাড়ীর সকলেই ভুলেছিল যে পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। নন্দিনী যখন বছর তিনেকের মেয়ে তখন একটি অঘটন আচমকা সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। লক্ষ্মীর দ্বিতীয় সন্তান মৃত্যুর দূত হয়ে মাতৃগর্ভে এল। পৃথিবীর আলো চোখে পড়বার আগেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার মাকে এ-লোক থেকে। এক মুহূর্তে বাড়ীর হাওয়া বাতাস গেল বদল হয়ে। আনন্দময় পুরীতে নামল বিষাদের ছায়া।

মাতৃহারা শিশু ও শোকার্ত পুত্রের মুখ চেয়ে আর একবার মাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হল। কিসে তারা সান্ত্বনা পায় এই হল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সুবিমলের কাছে গৃহের আকর্ষণ শূন্য হয়ে গেল। অধিকাংশ সময়ই এখন তার বাহিরে কাটে। রাত্রে মা আহার সাজিয়ে অপেক্ষা করেন। কোনদিন সামান্য কিছু মুখে দেয়, কোনদিন বা বলে খেয়ে এসেছি। ছেলের এই উদাস ভাব মাকে বিপন্ন করে। কি এর প্রতীকার ভেবে ঠিক কোরতে পারেন না। সন্ধ্যাণী বলে, মা তুমি সুবুর আবার বিয়ে দাও।

মা উত্তর করেন, সে কথা ভাবিনি যে তা নয়। কিন্তু ভয় হয় সখি। মেয়েটা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। কি জানি ফলে কোথায় জল, কোথায় গড়ায়।

প্রসঙ্গটা তাই ওখানেই থেমে রইল, আর অগ্রসর হল না।

মাস ছয়েক বাদে সুবিমল মাকে এসে বোললে অফিসের কাজে কিছুদিনের মত দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে। ওখান থেকে একটা ডিগ্রী আনবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তাই কাজ শেষ হবার পরও আর একবছর থাকব ছুটি নিয়ে। পিসীমা বাইরে থাকেন বোলে সঞ্জয়কে মেস থেকে কলেজ কোরতে হয়। তাকে বোলেছি আমি না ফেরা পর্যন্ত সে তোমাদের কাছে থেকে কলেজ কোরবে। তাতে সে রাজি তাছাড়া দিদি ও তপনদা তো রইলেনই।

প্রস্তাবটা মায়ের অপছন্দ হ'ল। হাওয়া ও জায়গা মনও বদলাতে পারে এই হল তাঁর আশা। চলে গেল সুবিমল।

বছর দুই তিন পরে সে যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল তার ভিতরকার পুরাণ মানুষটি গেছে হারিয়ে। এ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন সুবিমল। তার আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ সব কিছুই গেছে বদল হয়ে। মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরাজি বুলিটাই যেন তার কাছে সহজ এমনিতর ভাব।

অল্পদিনে এতখানি পরিবর্তন আশা করে নি কেউ। সন্ধ্যাণী তাই নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না, বোলে ফেললে,—তুই যে একেবারে সাহেব বনে গেছিস রে সুবু। চেনবার জো নেই।

দাঁত দিয়ে সিগারেট চেপে সুবিমল বোললে, Really? তা ওদের মধ্যে এমন অনেক ভাল জিনিস আছে যা আমাদের মধ্যে নেই। সেগুলো যদি নিয়ে আসতে পেরে থাকি তাহ'লে আমার যাওয়া সার্থক হ'য়েছে বলতে হবে।

ভাই অনেকদিন পরে ফিরেছে সুতরাং এখন এ নিয়ে বচসা কোরতে তার প্রবৃত্তি হল না। একটু মুচকি হেসে সে চুপ করে গেল।

লণ্ডন থেকে আসার পর সুবিমলের টেনিস পার্টি আরো জমকাল ভাবে সুরু হ'ল। প্রায়ই তার এখানে সেখানে নিমন্ত্রণ থাকত। কাজের পর বাড়ী ফিরেই আবার বেরিয়ে যেত, অধিকাংশ দিনই ফিরত বেশ রাত কোরে। মা খাবার নিয়ে অপেক্ষা কোরতেন কিন্তু বেশীরভাগ দিনই সে অন্যত্র কাজটি সেরে আসত। ছেলের এই পরিবর্তন মাতা-পুত্রের সহজ ভাবটিকে অনেকখানি ব্যাহত কোরলে এবং এর ফলে ব্যবহারের মধ্যে লুকোচুরি দেখা দিল।

একদিন টেনিস ফেরতা সুবিমল যখন বাড়ী ফিরল তখন তার সঙ্গে এল একটি হাল ফ্যাসানের যুবতী। দূর থেকে তাকে সুরূপা বোলেই মনে হয় কিন্তু তার রেখা এবং রংএর কতখানি নিজস্ব এবং কতখানি ধার করা সেটা তফাৎ থেকে আন্দাজ করায় অসুবিধা ছিল। সুবিমল তাকে নিয়ে নিজের ঘরে গেল এবং খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আবার দুজনে বেরিয়ে গেল। বেয়ারাকে বোলে গেল তার জন্য যেন 'খানা' না রাখা হয়, সে খেয়ে আসবে।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে দেখা হ'লে মা জিজ্ঞাসা কোরলেন,—কাল তোর সঙ্গে কে এসেছিল রে? দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেটিদের কেউ হয় বুঝি?

না। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হল লণ্ডনে। আমরা এক জাহাজে ফিরেছি। তারপর একটু ইতস্তত কোরে বোললে,—এ পর্য্যন্ত তোমাকে বলাই হয়নি, আমাদের যে বিয়ের ঠিক হয়েছে।

মা সন্দেহ কোরেছিলেন, তবু লাগল একটা ধাকা। এমন একটা খবর আগে তাঁর কাছে থেকে লুকান থাকতে পারত কি?

একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর প্রশ্ন কোরলেন, মেয়েটির নাম কি? কবে বিয়ে?

নাম নিলীমা তবে নেলী নামটাই চলতি। বিয়ে হবে আগামীমাসের শেষে।

ছেলে অফিস চলে গেলে মা মেয়েকে ফোন্ কোরে বোললেন—আজ দুপুরের দিকে একবার আসিস কথা আছে।

সর্বাণী এলে বোল্‌লেন, সুবুর যে বিয়ে!

তা যেন হ'ল কিন্তু অমন একটা সুখবর তুমি অত গম্ভীর মুখ কোরে বোলছ কেন? খুসী হওনি কী?

খুসী হ'বারই কথা সব্বি। সংসারে থেকে ছেলে সংসারী হবে না, সন্ন্যাসীর মত থাকবে একি কোন মা চায়? তার ওপর সুবু যে আমার কতখানি তাত তুই জানিস?

কিন্তু মেয়েটিকে দেখে পর্য্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছি, আনন্দ কোরব কী? ওযে একেবারে নতুন চালের মানুষ।

তুমি আগে থাকতে এত ঘাবড়িও না তো মা। বৌ হয়ে আসুক, দেখই না কি হয়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

তুই তো বোলে খালাস হলি। আমাকে যে ঘর কোরতে হবে রে।

শাশুড়ী, ননদের সঙ্গে নেলীর প্রথম পরিচয় হ'ল সে যেদিন ঘরের বৌ হয়ে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে সুবিমল স্ত্রীকে বোললে, আমার মা ও দিদি। প্রণাম কর। কোনরকমে কাজটা সারলে সে; তারপর আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। বাক্যালাপের চেষ্টা মাত্র কোরলে না।

প্রশ্ন যা করা হ'ল তারই উত্তর দিলে দু'এক ছত্রে। খানিক পরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বোললে;—বড় tired লাগছে। Can I go and rest?

বৌ চলে গেল নিজের ঘরে। শাশুড়ী ও ননদ আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আসছিলেন তাদের আতিথেয়তা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন।

খানিকবাদে কেটিরা এল। বিয়ের আগে থেকেই তাদের পরিচয় জমে উঠেছিল। তারা সোজা চলে গেল নেলীর ঘরে। সেখান থেকে তাদের হাসিগল্পের রেশ ভেসে এল হাওয়ার সঙ্গে। মা ও মেয়ে দুজনে দুজনার দিকে তাকালে। চোখ ইসারায় তাদের কথা হ'ল।

নতুনবধূর আগমন উপলক্ষ্যে সুবিমল এক বড় হোটেলে পার্টির আয়োজন কোরেছিল। মাকে এসে বোললে, যাবে তো মা তুমি?

মা বোললেন,—না বাবা। আমি কি রকম সেকেলে মানুষ সে তো জানিস। ওখানে গিয়ে খাপ খাওয়াতে পারব কেন? শেষে তুই পড়বি লজ্জায়।

দুই যুগের দুটি নারীর একই গৃহে বসবাস সুরু হ'ল কিন্তু কেউ কাহারো মনের নাগাল পেলে না। নেলীর ধারণা তুলনায় সে উচ্চস্তরের মানুষ সুতরাং বৌ হয়ে এসে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে সে কৃতার্থ কোরেছে।

মা ভয় পান, নতুনের আমদানীতে এতদিনের পুরাতন শান্তি ও শৃঙ্খলা বুঝিবা নষ্ট হয়। পাছে অনিচ্ছাকৃত কোন ঘটনা অমঙ্গল ডেকে আনে তাই নন্দিনীকে নিয়ে তিনি যতদূর সম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা কোরতেন কিন্তু এত কোরেও নতুনকে বশ করা গেল না। চিরাভ্যাসমত ছেলের খাবার সময়টিতে তিনি কাছে গিয়ে বসতেন। কোন কারণে তিনি অনুপাস্থিত থাকলে সুবিমল তাঁকে ডাক দিত; অপরপক্ষের এটা পছন্দ হ'ত না। সে চেয়েছিল একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হ'তে। অন্যে হ'বে তার আজ্ঞাবাহী। বাধা পাওয়ায় অনুযোগ পৌঁছাতে সুরু হ'ল স্বামীর কাছে।

যত দিন যায় সুবিমল বোঝে নতুনের জলুস তাকে ভুল পথে টেনে এনেছে। এ ভুল শোধন করবার উপায় যখন নেই তখন তাকে মেনে নিয়েই চল্‌তে হ'বে। গৃহের আনন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার বিক্ষুব্ধমন অন্য নানা উপায়ে আনন্দ আহরণের চেষ্টা দেখলে। ফলে, শরীর ও মন উভয়ের ওপর জুলুম চলল।

একদিন চোখমুখ রাঙ্গা কোরে নেলী স্বামীকে বোললে, Listen, why don't you send that girl of yours to a boarding school? সারাদিন এমন চ্যাচামেচি করে যে আমার মাথা ধরে যায়। তোমার মা ওকে thoroughly spoil কোরেছেন।

স্ত্রীকে খুসী কোরতে সুবিমল যখন এই প্রস্তাব নিয়ে মার কাছে গেল তিনি উত্তেজিত হয়ে বোল্‌লেন,

—বলিস কি সুবু? তুই কি কোন boarding school-এ মানুষ হয়েছিস যে ঐ কচি মেয়েটার বেলায় ওরকম পরামর্শ দিচ্ছিস? আমি থাকতে তা হ'তে পারবে না। আমি মরে গেলে তোরা যা হয় করিস।

ঘটনাগুলি চরম মুহূর্তে এসে পৌঁছল যেদিন দুপুরে কেটির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এসে নেলী নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম কোরছিল। নন্দিনীর শরীরটা সেদিন ভাল ছিলনা। ঘুম ভেঙ্গে পিতামহীকে দেখতে না পাওয়ায় "ঠাকুমা, ঠাকুমা" কোরে কাঁদতে কাঁদতে সে নেলীর ঘরের দিকে গিয়ে পড়েছিল। বিশ্রামে ব্যাঘাৎ ঘটায় নেলীর মেজাজ গেল বিগড়ে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে "you wicked girl।" বোলে সজোরে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। নন্দিনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল কোরে নেলীর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঠাকুমার কোলে মুখ লুকিয়ে অভিমানী মেয়ের সে কি কান্না! সেই রাত্রেই তার প্রবল জ্বর দেখা দিল এবং সে জ্বর মারাত্মক ব্যাধিতে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে বাঁচান গেল না।

এরপর সংসারের নানা ঝড় ঝাপটের মধ্যে বাস করা মায়ের পক্ষে কঠিন হয়ে প'ড়ল। তাঁর অশান্ত মন শান্তি পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরে তিনি কাশীবাসী হবার ব্যবস্থা কোরলেন। যাবার আগের দিন ছেলেকে ডেকে বোললেন,—শেষ জীবনটা বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ কোরব ঠিক কোরেছি সুবু। কালই রওনা হ'ব।

সুবিমল আশ্চর্য্য হয়ে বোললে,—বাঃ, তা কি কোরে হয়? কোন ব্যবস্থা না কোরে গেলেই হ'ল নাকি?

সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে বাপ, তপন সব ঠিক কোরে দিয়েছে। সন্দি যাবে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল সুবিমল। মার কাছে আজ সে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তারপর বুকচিরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

মা বোললেন,—মনে কোন দুঃখ রাখিসনে সুবু। ভবিতব্য খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যের অতীত। আশীর্ব্বাদ করি তুই যেন সুখী হ'তে পারিস।

পরদিন ট্রেনের সময় নিকট হ'লে সুবিমল গাড়ী প্রস্তুত রাখবার হুকুম দিলে শুনতে পেয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত নেলী ঘর থেকে এসে স্বামীকে উদ্দেশ কোরে বোললে,—I need the car now. তোমার মাকে taxi কোরে যেতে বল please.

এই প্রথম সুবিমল সংযম হারিয়ে ফেললে। চিৎকার কোরে সে উত্তর কোরলে Certainly not আমার মা আমার গাড়ীতেই যাবেন। You can jolly well take a taxi!

এই দেহ তার দাহ

সনতকুমার মিত্র

যতদিন দেহ আছে, ততদিন দাহ আছে তার,
যা নিয়ত ধিকিধিকি অন্তরের অন্তঃস্থলে জলে;
মিথ্যা কথা বোলোনা বা করতে চেয়োনা অস্বীকার,
লজ্জাতে বলোনা তুমি, দুঃসাহসী কেউ কেউ বলে।

অগ্নিস্রাবী দেহ তুমি জেগে থাক প্রখর উত্তাপে,
নিজে তুমি ভস্ম হও অথবা অন্যাকে ভস্ম করো,
থেকোনা নপুংসক, কারো ভয়ে, শোকে অভিশাপে:
নিয়ত ক্ষরিত হও, ভস্ম হও, রক্ত হয়ে ঝরো।

আমি জানি এ দেহের প্রান্তে প্রান্তে কত তীব্র জ্বালা,
কত তৃষ্ণা, কী ভীষণ, কী গভীর তার অনুভব;
আমি তাই দুঃসাহসী, হোক সে আগুন, তার মালা
সারা অঙ্গে যদি পাই, বিনিময়ে দিতে পারি সব।

তোমার পূজারী আমি, দেহ তুমি তোমার ভাণ্ডারে
রেখেছ অনন্ত মধু; আমি তার কতটা পেলাম
জানিনা, তবুও যাতি অন্তহীন রতির শৃঙ্গারে
এবং দেহের তটে প্রতিদিন জানাই প্রণাম।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাট ও বিচিত্র বৈষ্ণব কাব্যদর্শন ইতিহাস সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যপ্রেয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে নীরবতা বিস্ময়জনক ও অস্বস্তিকর। যেখানে চৈতন্যের ক্ষুদ্রতম ভক্তও পাদপ্রদীপের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার নেপথ্যলোকে নির্বাসন এক অভাবনীয় অবিচারের মতই অনুভূত হয়। ধর্ম সাধনার গুহ্যতম মন্ত্রের ন্যায়, ধর্ম রহস্যের গুহাতলে নিহিত নিগূঢ় প্রেরণার ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্যের প্রকাশ হইতে চির অবগুণ্ঠিত। এমন কি নিমাই-বিচ্ছেদের মানবিক বেদনাও শচীমাতায় কেন্দ্রীভূত। পুত্রবিচ্ছেদবিধুরা জননীর মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাসের পিছনে বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যাকুল আর্তি আত্মগোপন করিয়াছে। সে যেন শচীমাতার শোক-বিগ্রহমূর্তির অনুগামিনী এক ধূসর ছায়ামাত্র। সে বৈষ্ণবকাব্য ও বৈষ্ণবজীবনকাহিনী উভয়েরই উপেক্ষিতা। মনে হয় এই বিস্ময়কর নীরবতার পশ্চাতে চৈতন্যদেবের কোনও অমোঘ অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞা সক্রিয় ছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহার অন্তরের রক্তসিক্ত হৃদয়স্মৃতি অনাবৃত করিতে চাহেন নাই। তিনি তাঁহার দিব্যোন্মাদের অন্তরালে যে মানবিক আকুতি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার অলৌকিক সাধনার সেই লৌকিক দিকটি বহির্জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাধাবিরহোন্মত্ত এমন কি লোকপাবন হরিনামমন্ত্রের মধ্যেও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের জ্বালাময়ী স্মৃতি সমুদ্রজলে বাড়বানলের ন্যায় অহরহ বর্তমান ছিল। নিরুদ্ধ প্রেমের এই পরিপাকেই তাঁহার মিশ্র লৌকিক জীবন বিশুদ্ধ হেমকান্তি দিব্য জীবনে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

“দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া” কাব্যে চৈতন্যদেবের সমস্ত জীবন সাধনা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার বঞ্চিত জীবনের সংযমিত বেদনাবোধ কোমল স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে আলোচিত হইয়াছে। বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে কোনদিন একটি কথাও বলে নাই, নিজ হৃদয় বেদনা লইয়া অন্তরালে পরিপাক করিয়াছে, বৈষ্ণব চরিতকর্তারা যাহার মর্মবাণী তাঁহাদের অপরূপ কাব্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে অনুরণিত করেন নাই, বৈষ্ণবজীবনীকার গোষ্ঠী না তথ্য, না তত্ত্ব কোনও দিক দিয়াই যাহাকে মূক অভিনন্দন অতিরিক্ত কোনও প্রকাশ মর্যাদা দেন নাই, পাঁচশত বৎসর পরে আধুনিক যুগের এক কবির রচনায় সেই ভাষাহীন বিষাদ প্রতিমা আজ কথা কহিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় বৈষ্ণব ভাব মহিমার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য এই শূন্যতা-পূরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমরা বৃন্দাবন লীলার অপ্রাকৃত ক্ষেত্র হইতে রাধাকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া চৈতন্য-লীলার কেন্দ্রস্থলে বসাইয়াছি। কিন্তু এই অপরূপ নাট্যাভিনয়ে আমাদের ঘরের মেয়ে অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তুচ্ছতম স্থানও ছাড়িয়া দিই নাই। হয়ত আমরা মনে করিয়াছিলাম ঘরের কথার অনুপ্রবেশে দেবী লীলা মর্যাদা হারাইবে কিন্তু চৈতন্যলীলার মর্মকথা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ হয় কারণ—

—“কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা।”

কবি বিষ্ণু সরস্বতীর এই খণ্ডকাব্যটি সূক্ষ্ম অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশে ঐশ্বর্যময়। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ কথা এ যুগে প্রকাশ করিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যের ভাবাবেগ ও প্রথাগত কাব্য উপমা সম্বল থাকিলেই চলিবে না। দীর্ঘ অবগুণ্ঠিত মুখের ঘোমটা খসাইতে গেলে অতীতের ভাবচ্ছটার সঙ্গে বর্তমানের ভাবব্যঞ্জনা মিশাইতে হইবে। লেখক এই কাব্যে এই উভয়ের চমৎকার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দোবৈচিত্র্যও তাঁহার ভাব-তরঙ্গ সচলতার উপযুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভক্তিরসের সহিত আধুনিক কাব্য সৌন্দর্যের যে নিপুণ সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা কবির ভক্তি প্রবণতা ও শিল্প কৌশলের যুগপৎ পরিচয় বহন করে। প্রাচীন ভাব-ধারাকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহন করিয়া আনিতে হইলে ভগীরথের মত যে অভিনব ইঞ্জিনিয়ারিং-দক্ষতার প্রয়োজন তাহার নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রচুর। তাই যিনি এক অতীত যুগের মধু আস্বাদনকে এই মিষ্টরসবঞ্চিত আধুনিক যুগের ভোজনপাত্রে পরিবেশন করিয়াছেন তিনি আমাদের বিশেষভাবে অভিনন্দনীয়।*

* দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া—লেখক শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী, মূল্য দুই টাকা, প্রাপ্তিস্থান—এম সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দীনবন্ধু মিত্র ও কৌলীন্য প্রথা

অজিত ভট্টাচার্য

জাতীয় জীবনে প্রাচীন সাহিত্য দেশের সমাজ চিত্রকে নানা ভাবে উদ্ঘাটিত করেছিল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বহুবিবাহ প্রথার উপর অশ্রদ্ধা ও বিজাতীয় ঘৃণার ভাব লক্ষিত হয়।

এ সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখব সে সময় দেশীয় সমাজ নীতিকে ভেঙ্গে চুরে নূতন করে এক সমাজ ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রবল বাসনার উদ্ভব হয়েছিল। সে সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজসংস্কারের জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার যোগ্য।

মুসলমান শাসনের শেষ ভাগে দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়, এ সময় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নানা কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়ে তাঁদের নৈতিক জীবনকেও ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছিল। সেই যুগ সন্ধিক্ষণের সমাজ সংস্কারক সাহিত্যসেবি-গণের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সমাজ সংস্কারে বিশেষ করে বহুবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে সে সময় যে সব সাহিত্যিক সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের অন্যতম।

দীনবন্ধু মিত্র লিখিত (১) নবীন তপস্বিনী (২) বিয়ে পাগলা বুড়ো (৩) লীলাবতী (৪) জামাই বারিক (৫) কমলে কামিনী সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক আলোচনা করলে আমরা দেখব জমিদার হরি গোপাল চট্টোপাধ্যায় নির্গুণ চরিত্রহীন কুলীনবরে কন্যাদান করতে স্থিরসঙ্কল্প, তিনি কুমারীকে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ করতে চান।

তাই "কৌলীন্য শ্মশান কালী
হৃদয় ভূষিতে
দেবেন্দ্র দুহিতা বলি অপাত্র
অসিতে।"

পক্ষান্তরে সর্বগুণাকর ললিত কুলীন নহে, তাকে কন্যা দান করতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাথা কাটা যায়। বহু অনুনয় বিনয় উপদেশ তর্কেও তাঁর প্রতিজ্ঞা অটুট থাকে।

অবশেষে কন্যার শোচনীয় অবস্থা প্রাণসংশয় ভাব লক্ষ্য করে ললিতকেই তিনি কন্যাদান করতে প্রস্তুত হলেন।

অপর পক্ষে হেমচাঁদ ও তার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভাই নদের চাঁদ দুই মাণিক জোড়। এরা বিবাহে বণিক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত ও কুলীন কুল সম্ভব নাটকে বর্ণিত বরের মতই গুলিখোর।

নদের চাঁদ নিতান্ত অপদার্থ। লীলাবতীর সঙ্গে নদের চাঁদের বিবাহ প্রস্তাব প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মীর মুখ থেকে লেখক বলিয়েছেন—"বিমাতা সতীনটিকেও এমন পাত্র দিতে পারেন না।" কিন্তু পাত্র হিসাবে নদের চাঁদ "কুলীন চূড়ামণি, ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, কেবল চক্রবর্তীর সন্তান।" কুলীন হিসাবে অদ্বিতীয় তাতে সন্দেহ নাই।

লেখক শেষকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যে নদের চাঁদ "কুলীনের কালপেঁচা।" গ্রন্থের বহু স্থানে নাট্যকার ললিত সিদ্ধেশ্বর মামাবাবু ও শ্রীনাথের মধ্যদিয়ে কুলীনের শ্রেষ্ঠ নদের চাঁদের নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয় সিদ্ধেশ্বরের মুখ দিয়ে কৌলীন্য প্রথার যে ধর্মের সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব নাই তাও

বুঝিয়েছেন। গ্রন্থে নদের চাঁদের উদ্ভট বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বহুবিবাহের কথাও উল্লিখিত হয়েছে—

—"বিধবার বিয়ে হবে...

জাতিভেদ উঠে যাবে..." ইত্যাদি।

দীনবন্ধু মিত্রের—"নবীন তপস্বিনী"র বিষয়বস্তু সপত্নী বিদ্বেষের নিদারুণ পরিণতি। এখানে ছোটরাণীর প্ররোচনায় রাজার হাতে বড়রাণীর অমানুষিক নির্য্যাতনের কাহিনী শুধু মর্ম্মস্পর্শী—নয় হৃদয় বিদারক। বড়রাণীর অন্তর্ধানের পর হতে পুনর্মিলন পর্য্যন্ত ঘটনা রূপকথার মতই শোনায়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজা রমণীমোহনের কাহিনী—প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

বড়রাণীর অন্তর্ধানের কয়েকবছর পরে ছোটরাণীর মৃত্যুর পর রাজার আবার তৃতীয়পক্ষে পঞ্চদশী কন্যার সঙ্গে বিবাহ উদ্যোগে আমাদের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বহু-বিবাহ প্রথার আর একটি কুৎসিত দিককে প্রকটিত করে।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর লেখনীকে অত্যন্ত সুকৌশলে চালনা করে কন্যাকে দেখার পর রাজার মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় করিয়েছেন এবং শেষে রাজকুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ কার্য্যের সমাধা করেছেন।

এই গ্রন্থে আমরা জলধরের মুখ দিয়ে—"কুলীনের সুজনী" বিবাহের উল্লেখ পেয়েছি। দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক "কমলে কামিনী"। এই নাটকখানিতে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একখানি জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকে 'নবীন তপস্বিনী'র মত রাজরাজাদের ঘরে সপত্নী বিদ্বেষের কথাও যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বৈধব্যযন্ত্রণা বিবাহরূপ বলিদানের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

বৈধব্য যন্ত্রণা সম্বন্ধেও নাটকে বর্ণিত হয়েছে। বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে লীলাবতীর সেই আলোচনার জের এখানেও। সেই একই সুর—"অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল।"

এ প্রসঙ্গে কবিতার উচ্ছ্বাস বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

"কুলের গৌরব কত
পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার
জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা
কমল কলিকা,
অবিরত পাপে রত
অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা
জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান
অভিমান বশে,
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা
শমনে তর্পণে ?
সযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখি দেহ ধর্ম্মজ্ঞান।
পরিণয় কালে তার দেহ অনুমতি,
আপনি বাছিয়া লতে আপনার পতি।"

২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

প্রসঙ্গক্রমে বরপণের কথাও উঠেছে। একথাও বলা হয়েছে—পূর্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রী হত এখন ছেলে বিক্রী হয়। মেয়ের বিয়ে নয়তো যেন সত্যভামার ব্রত করা।

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'জামাই বারিক' প্রহসনখানিতে সপত্নী বিদ্বেষের মিলনান্ত ভূমিকা হলেও—অতীব মর্মান্তিক। অপরদিকে 'জামাই বারিকে' সপত্নী বিরোধের বিবরণী অতীব হাস্যকর।

এ প্রহসনে অঙ্কিত সতীনের ঝগড়ার চিত্র যথার্থই বাস্তব জীবনের অনুকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই কাহিনী সত্য ঘটনা হতেই গৃহীত।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা। পদ্মলোচনের দুই বিবাহ কনিষ্ঠার একটি সন্তবং: জ্যেষ্ঠার বন্ধনে নিবন্ধন। এদের সপত্নী কলহ ও স্বামী নিগ্রহের বিবরণ ২য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

স্বামী মহাশয় শেষকালে বিবাদ বিদ্বেষ ও অত্যাচারের জ্বালায় গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন করে বৈষ্ণব চূড়ামণি পদ্মবাবাজীর রূপ ধারণ করেন।

এদিকে স্বামীর পলায়নে সপত্নীদ্বয়ের জ্ঞানের উন্মেষ হল। পরিত্যক্তা হয়ে তাঁরা উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ

ভুলে সমপ্রাণ নটীর মত পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দবতী হয়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে পদ্মলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্রখানি এখানে উল্লিখিত হল—"(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)..." অবস্থার পরিবর্তনে স্বভাবের পরিবর্তন হয়।...সর্বাচ্ছাদক স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল বিগলিত জল ধারাকুললোচনে গলাগলি করিয়া রোদন করিতেছেন।

ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড়খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোটখুড়ীকে খাওয়াইতেছেন।

একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন; দেখলে মনে হয় যেন দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা। কেবল হে নাথ! তুমি কোথা গেলে' বলিয়া বিষাদে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এবং বলিতেছেন, পাপীয়সীরা সম্পূর্ণ শাস্তি পাইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে হইবে না।"

বলাবাহুল্য এ সংবাদ শুনে স্বামী বৃন্দাবন ত্যাগ করে—পত্নীদিগকে গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন, সপত্নী বিরোধ ও দাম্পত্য কলহের অবসান হল।

কিন্তু সপত্নী বৃত্তান্ত প্রহসন খানি মূলত আখ্যান নহে। জামাই বারিকের মূল গল্প আমাদের সমাজে স্থল বিশেষে প্রচলিত বিবাহ প্রথার একটি অদ্ভুত অঙ্গ ঘর জামাইকে কেন্দ্র করে।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ প্রথার যেমন দোষোদ্ঘাটন করা হয়েছে তেমনি 'জামাই বারিকে' কায়স্থদিগের 'আদিরসের' কুপ্রথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (প্রহসন) গ্রন্থখানিতে কুলীনদিগের বিবাহ প্রথার একটি কদর্য্যদিককে দেখান হয়েছে।

গৃহশূন্য হলে 'ষষ্টি বৎসরের ষষ্ঠীর বৎস কুলীন চূড়ামণি, রাজীব মুখুজ্যে প্রৌঢ়া ও যুবতী কন্যা বর্তমানে এবং বিবাহ যোগ্য দৌহিত্র বিদ্যমানে ষোড়শী বিবাহের জন্য লালায়িত। যুবতী, বিধবা কন্যার দুর্দশার দিকে একবার তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। এরূপ বিবাহ লালসার হাস্যকর দিকটা পরিস্ফুট করবার জন্য নাট্যকার ডোমনী পেঁচার মাকে বিয়ে পাগলী বুড়ী সাজিয়ে বিয়ে পাগলা বুড়োর কনে বানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে প্রহসন খানিতে বিধবা বিবাহের আলোচনাও করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কুলীন কুল সর্বস্বের বুড়ো বরের কথাও মনে পড়ে, তবে বিবাহ বাসনা উভয় ক্ষেত্রে একই কারণে সমুদ্ভূত নয়।

দেশে তৎকালীন সামাজিক কুপ্রথার অবাধ প্রচলনের দুদিনে সমাজ সংস্কারের ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যে তীব্র বাদ প্রতিবাদের অশনি নির্ঘোষের সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য-জগতে আবির্ভাব দেশের তৎকালীন সমাজ জীবনকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।

দর্পণ

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়

অনেকেই ভালোবাসে দর্পণে নিজের মুখ
দেখতে, নিখুঁত অবয়ব
দুচোখে তৃপ্তি আনে,—কেউ
অন্যের দৃষ্টিতে করে নিজেকে অনুভব।
জীবনের সুখ দুঃখ জ্বালা ও যন্ত্রণা
অহরহ নাড়া দিচ্ছে, নাড়া—
স্বচ্ছ কাচের গায়ে তবু
হৃদয়ের নেই কোন সাড়া।
দর্পণে নিজের মুখ দেখেছি, সেখানে
মিথ্যার বেসাতি নিয়ে ভরা;
নির্বাক ছবির মত কত নড়ে চড়ে
কখনো তো দেয়নি সে ধরা!
তার চেয়ে ঢের ভালো হৃদয়-দর্পণে
মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে দেখা;
পরিচিত মুখগুলি স্মৃতির উদ্যানে
ঘোরে ফেরে বড় একা একা।
হারিয়ে গিয়েছে যারা আসে এইখানে
হৃদয়-দর্পণে পুনরায়
অল্প দিনের অবকাশে
হাসে কাঁদে জীবনের কথা বলে যায়।

।।। নিরুদ্দেশ ।।।

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সরোজের পুরানো এক বন্ধু সরোজের জন্য ছোট্ট নতুন বাড়ী ভাড়া করে দিয়েছিল চেৎলায়। একতালায় একখানি ঘর, একটি গ্যারেজ, গ্যারেজের ওপোর একটি নিচু ছাতের ঘর এবং দোতালায় দুখানি ঘর এবং ছাতে উঠানের এক পাশে রান্না, ভাঁড়ার। ছোট পরিবারের পক্ষে সুন্দর বাড়ী, ভাড়া একটু বেশী, পঞ্চান্ন টাকা। তা হোক্ নতুন বাড়ী ত বটে।

অমর পছন্দ করে আগেই নিলে গ্যারেজের ঘরখানা। তার পড়াশুনা, শোয়া বসা, একেবারে তার নিজস্ব। দোতলার একখানায় সরোজ, অন্যটায় রেণু, দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজাও ছিল। ছাতের চিলে কোঠায় ঠাকুরঘর এবং নিচের ঘরটা বৈঠকখানা, সমু বলে ড্রয়িং রুম। সরোজ হাসতে হাসতে বলে, আজকালকার ছেলে, 'বৈঠকখানা' বলতে লজ্জা হয়, তা বলুক ড্রয়িং রুমই বলুক।

কিন্তু শুধু ড্রয়িং রুম নাম দিলেই ত হয় না। নামের সঙ্গে উপযুক্ত সাজও ত চাই। বৈঠকখানায় একখানা তক্তপোষ কিম্বা প্যাকিং বাক্সর ওপোর সতরঞ্চি পেতে বেঞ্চ বানিয়ে আগন্তুকদের বসতে দেওয়া যায়, কিন্তু ড্রয়িংরুমে কি আর সে ব্যবস্থা রাখা যায়! ড্রয়িংরুম নামকরণের সঙ্গে সোফা-সেটি চাই, সেণ্টার টেবল, টিপয়, কাঁচের ক্যাবিনেট, বাইরে হ্যাট স্ট্যাণ্ড, এসব চাইই-চাই। ছোট্ট একটা নাম, কিন্তু হলে কি হয় সেই নামের সঙ্গে একরাশ পরিবর্ত্তন, এক গাদা খরচ।

অমু বাবার কাছে ঐ সব ফর্দ্দ দিলে। বাবা এক কথায় সমস্ত নাকচ করে বল্লেন, নিজেদের বাড়ী হোক তারপর ফার্ণিচার হবে।

কিন্তু অমরের তর সয় না। জেলা জজের ছেলে সে, কলেজের বন্ধুরা তার বাড়ী হামেশাই আসে, তার প্রেস্টিজ থাকে কি করে!

অমু তার দিদির কাছে ধরনা দিলে।

দিদি বল্লে, না রে, অত টাকা খরচ করলে বাবা রাগ করবেন, আর তা ছাড়া আড়াইশ টাকা এখন আমি পাই কোথায় বল্ ত!

অমু দোকান থেকে জেনে এসেছিল, সব শুদ্ধ আড়াইশ টাকাই পড়বে। সে দিদিকে চেপে ধরলে, বল্লে, তোমার পোস্ট অফিস থেকে তুলে দাও। কেষ্টনগর থেকে পোস্টাফিসের পাশ বই যখন চেৎলা পোস্ট অফিসে আনা হয়েছিল তখন অমু দেখেছিল, ঐ বইয়ে প্রায় ন'হাজার টাকার মত জমা পড়েছে। বল্লে, তোমার ত অনেক টাকা দিদি, আমি মোটে আড়াইশ টাকা চাইছি।

রেণু বল্লে, কত টাকা আছে তা আমি দেখেও দেখি না। ও সব তোমার বাবারই টাকা, বাবারই জিনিষ, আমার কিছু নয়।

তা বল্লে আমি শুনবো না, অমু জেদ করতে লাগল।

সমুর অনুপস্থিতিতে রেণু বোধ হয় সমুর স্নেহের অংশটাও অমুরও ওপোর ঢেলে দিয়েছিল। দু'দিন ধরে রাগারাগি মান অভিমানের ফলে রেণু বল্লে, দিতে পারি কিন্তু বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে দেব না, বাবা রাগ করবেন।

অমু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, তাহলে হবে না, বাবা কিছুতেই দিতে দেবে না।

তবে আমি দেব কি করে, বাবা যদি আমাকে বকেন?

তোমাকে বাবা কখনও বকে না, আমি জানি। তুমি

টাকাটা দাও, আমি নিয়ে আসি, বাবা কিছু বল্লে তুমি ম্যানেজ করে নিও।

আদর? স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনার পর রেণু পোস্ট অফিসের ফরমে সই দিয়েছিল। এবং সেইদিনেই ড্রয়িং রুমের সমস্ত সজ্জা এসে পৌঁছাল। সমস্ত ঘর নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে বাবার আসার প্রতীক্ষায় অমর নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসে রইল।

সরোজ বল্লে, বা বে, এত সব জিনিষ এল কোত্থেকে? রেণু—

রেণু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে বললে, ভাল হয় নি বাবা? বাইরের ঘর,—আপনার কাছে কত বড় বড় লোক আসে—

বুঝেছি। এ সব অমুর কাণ্ড! সে আমায় দু'দিন ধরে এই সবই বলেছিল বটে। কিন্তু দেখ্ রেণু, বেহিসেবী বিলাসিতা ও বড়মানুষীতায় বড় বড় জমীদারগুলোকেও তলিয়ে যেতে দেখেছি, আমরা ত সামান্য চাকুরে মাত্র।

রেণু ধমকে উঠল, আপনার যেমন কথা! এই কটা জিনিষ কিনতেই যা খরচ হোল, এদেরত খেতে পরতে দিতে হবে না।

হবে। জোর দিয়ে সরোজ বলেছিল। বিলাসিতার কোন শেষ নেই রে। গদি-আঁটা চেয়ারের ফাঁক দিয়ে শনি ঢকে নিঃশব্দে বাড়ীর ভিৎ শুদ্ধ ফোঁপরা করে তবে ছাড়ে।

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে রেণু বলেছিল, বেশ, তা হলে ওগুলো ফেরৎ দিয়ে আস্তে বল্‌ব।

ম্লান মুখে সরোজ বললে, তা আর হয় না। অলক্ষ্মী একবার ঢুকলে তাকে আর ফেরৎ দেওয়া যায় না।

অতঃপর ড্রয়িং রুমের সোফা-সেটি রয়েই গেল। সরোজও এইগুলোয় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হোল।

সেদিন খেতে বসে সরোজ খোঁজ করলে, অমু কোথায়? তাকে ভাত দিলি না?

রেণু বললে, সে নেই বাবা, আজ ভোরবেলায় সে কেষ্টনগর গেছে।

বিস্মিত হয়ে সরোজ বলল, আবার গেছে? এই ত সেদিন কেষ্টনগর গিয়েছিল। আজ কি তুই পাঠিয়েছিস্ বুঝি? তার কলেজ নেই?

রেণু বললে, না বাবা, আমি পাঠাই নি, আমার কি দরকার ওকে রোজ রোজ পাঠাবার? তবে ও বললে, ওর কলেজে নাকি তিনদিন ছুটী আছে, তাই বললে, একটু ঘুরে আসি। আহা বরাবর দু'জনে এক সঙ্গে থাকত, তাই বোধ হয় মন কেমন করে, টুক্ টুক্ করে চলে যায়।

সরোজ বললে, ওর লেখাপড়ার দফা-রফা। ভয়ানক আড্ডাবাজ হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় থাকলেও ত প্রায়ই বায়োস্কোপ দেখে, রবিবার হলে ত এক মিনিটের জন্য গাড়ী পাবার যো নেই, বাবু কোট প্যাণ্ট পরে সারাদিনই গাড়ী নিয়ে হুল্লো হুল্লো করে বেড়ান্। গেল রবিবার পাঁচ গ্যালন তেল পুড়িয়ে নাকি বন্ধু নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলেন পিক্‌নিক্ করতে। এ ভাবে আড্ডাবাজী করলে পড়াশুনা করবে কখন?

একটু থেমে বললে, তোর প্রশ্রয় পেয়েই এতটা বাড়াবাড়ি করছে।

রেণু এ কথার কোন উত্তর দেয় নি।

কিন্তু সেই রেণুই অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল যখন নিচের কাজ সেরে রাত্রিতে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়ি থেকে অমুর বন্ধ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সিগারেটের গন্ধ পেলে। দরজায় দুম দুম করে ঘা দিতে অমু বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলে দিলে। সারা ঘর জুড়ে সিগারেটের গন্ধ ভর্ ভর্ করছে।

গম্ভীর কণ্ঠে রেণু বলেছিল, অমি!

কি?

দরজা বন্ধ করে বিড়ি খাচ্ছিস্? তোর বাপ দাদা কখনও খেয়েছে? বল্, উত্তর দে।

মুখ কাঁচুমাচু করে অমর বললে, ও কিছু নয় দিদি, বড্ড ঘুম পায়, রাত্তিরে পড়তে পারি না, তাই একটা—

মিথ্যে কথা! তোর বাবা এখনও রাত বারোটা-একটা পর্য্যন্ত কাজ করেন, অলক এতগুলো পরীক্ষা পাশ করলে, পড়াশুনা কাকে বলে আমি জানি না?

রেণুর হাত দুটো ধরে কাঁধের উপর মুখ লুকিয়ে অমু বললে, চেঁচিও না দিদি, বাবা উপরে আছে; শুনতে পাবে। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আর খাব না। এই বলছি আমি, আর কখনো খাব না।

আজকের এই কথা যেন মনে থাকে, আর কখনও যেন এরকম না দেখি, গম্ভীরভাবে রেণু ধমক দিয়েছিল।

আর একদিন সরোজ বেশ রাগতভাবেই বল্লে, জানিস্, রেণু, তোর ছোট ভাইয়ের কাণ্ড শুনেছিস্ ?

কি ? ভয়ে ভয়ে রেণু চোখ তুলেছিল।

বাবু পোষাক বানিয়েছেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে। সবচেয়ে সেরা পাম-বীচের পোষাক।

অল্প হেসে রেণু বলেছিল, তা পরবে না বাবা ? ছেলেমানুষ, একটু সাধআহ্লাদ করবে না ?

সরোজ বল্লে, ও, তুইও প্রশ্রয় দিয়েছিস ! তুই মনে রাখিস যে ওর বাপ কখনও এত দামী পোষাক পরে নি।

ওর বাবা ত জজের ছেলে ছিল না বাবা, রেণু হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল।

এই করেই তুই ওর মাথাটা খাচ্ছিস্। হতাশ হয়ে সরোজ বল্লে, চিরটাকাল দুঃখে মরবে, আমি আর কি করব ?

ব্যস্ত হয়ে রেণু বলেছিল, ছি ছি বাবা, আপনি বাবা হয়ে এরকম কথা বলবেন না। ক্ষণে অক্ষণে কখন যে কোন কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—

সরোজ গুম হয়ে গেল।

রবিবার বিকালে সরোজ নিজের ঘরে বসে অফিসের কাজ সেরে রেণুকে ডেকে বল্লে, তোর পোস্ট অফিসের বইটা দেখি রে।

রেণু বাক্স থেকে পাশবইগুলো বার করে নিজের বইখানা সরোজের দিকে এগিয়ে ধরলে।

সরোজ বল্লে, শোন্। এই চেৎলায় শঙ্কর বোস রোডে একটা জমি কেনার কথা আমি ভাবছি। রাস্তাটা ভাল, বেশ চওড়া আছে। ঐ রাস্তার ওপোর একসঙ্গে সাড়ে সতেরো কাঠার একটা প্লট আছে। দাম চাইছে হাজার টাকা করে কাঠা। আমি বলেছি সাড়ে সাতশ। হয়ত, আটশ, সাড়ে আটশয় দাঁড়াবে। তা আমি কি ভাবছি জানিস্। এ জমিটা সব নিয়ে নি। ওর মধ্যে সাড়ে চার কাঠা কিনব তোর নামে, তোর পোস্ট অফিসের টাকা তুলে, এবং বাকী তের কাঠা কিনব আমার নামে। তারপর আমার তেরকাঠায় তিনখানা দোতলা বাড়ী করব। তিন ছেলেমেয়ের জন্য এবং তোর জমিতেও একটা আলাদা বাড়ী করে দেব। তোর বাড়ীতে তিনতলায় একখানা ঘর, একটা বাথরুম এবং একটা রান্নাঘরও থাকবে। যদি আমি না থাকি, তাহলে তুই একতালা দোতলা ভাড়া দিয়ে নিজে তিনতালার ঘরে থাকবি, তাতে তোর ভালভাবেই চলে যাবে।

ম্লান হয়ে রেণু বল্লে, এসব কথা বলছেন কেন বাবা—

সব ভেবে কাজ করতে হয়রে, তুই ভুলিস নি যে, তোর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী। আর এটাও জেনে রাখিস, আমি না থাকলে তোকে কেউ দেখবে না, আমার মনে হয় সমরও তোকে তেমন যত্ন-আত্তিও করবে না।

রেণু বল্লে, এখন থেকেই আমার নামে কিনবেন কেন বাবা, আমি ত আপনার সামনেও যেতে পারি।

তাহলে সমর পাবে। ওরা যে যমজ তা কি ভুলে গেছিস।

একটু থেমে সরোজ বল্লে, আমার নামে যে তিনখানা বাড়ী হবে সেই তিনটে আমি উইল করে তিনজনকে দিয়ে যাব। আমার অবর্তমানে ওরা তিনজন ঠিক ঠিক নিয়ে নেবে, কিন্তু তোর নাম আলাদা করে এখন থেকেই তোর পোস্ট অফিসের জমা টাকা তুলে না কিনলে পরে নানারূপ আইনের প্যাঁচ কষে কে তোকে ফাঁসিয়ে দেবে তার কিছু ঠিক আছে কি ? হয়ত বলে বসবে, ওটা আমার বেনামীতে কেনা। তখন তোর হয়ে লড়বে কে ?

এ আপনি অন্যায় বলছেন বাবা, রেণু অনুযোগ করলে ; আমার অলক, অপু, অমু কি আমাকে ফেলে দেবে, না ফাঁকি দেবে ?

ম্লান মুখে সরোজ বল্লে, সারাজীবন সম্পত্তি ও টাকা নিয়ে কতরকমের ফাঁকি ও ধাপ্পা যে দেখেছি, তা আর তোকে কি বলব ? অবিশ্যি এ কথা বলছি না যে, আমার ছেলেরা অসৎ, কিন্তু মানুষ বদ্‌লাতে কতক্ষণ ? কাজেই বুঝে-সুঝে চলা দরকার। তোর নামে যে জমি কেনা হবে, সেই জমির দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র তুই আলাদা করে সাবধানে রাখবি, তার সঙ্গে আমি নিজে হাতে লিখেও একটা কাগজ রেখে যাব ; ছেলেদের জন্য যে উইল তৈরী করব, তাতেও তোর বাড়ীর উল্লেখ করে যাব, যাতে কেউ কোন দিক দিয়ে চেষ্টা করলেও যেন ফাঁকি দিতে না পারে।

সরোজ থাকবে না এমন দুর্দিনের উপলব্ধি করে রেণু ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু কোন কথা সে বলেনি।

বাড়ী তৈরী আরম্ভ হোল। আগে শুরু হোল রেণুর বাড়ী। সরোজের এক বন্ধু পি ডবলু ডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আগাগোড়া সরোজকে যেভাবে সাহায্য করেছিল তা আপন ভাই কিম্বা ছেলেও করে না। সে ভদ্রলোক জানতই না যে, রেণু সরোজের আপন ভাইঝি নয়।

বাড়ী তৈরীর কথা শুনে সমর সস্ত্রীক এবং পরে আরও একবার শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়েই চেৎলায় এসে দুদিন থেকে গেল। এর কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গীতে রেণু বুঝে নিলে, ও আর সেই ছোট্ট সমুটি নেই; সেই মা-সর্বস্ব ছেলে! ওর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, চালচলনের মধ্যে নিজের স্বার্থবোধ জেগে উঠেছে; সরোজ যে তার কেউ নয়, অলক অমু যে পর, এমন কি মাও যে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য নয় এরকম আভাসও তার কথার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশ গেল। সমু হঠাৎ বলেই ফেল্লে যে জমি কেনা, এবং প্লান করা যখন হয়েই গিয়েছে, তখন জমির দলিলপত্রে রেণুদের আর কি দরকার, সেটা ওর কাছেও ও রাখতে পারে।

কথাটা রেণুর কানে ভাল লাগেনি। সে বল্লে, কেন? তুমি বিদেশে পড়ে আছ, তোমার কাছে দলিলপত্র কোথায় রাখবে?

সমু বল্লে বা রে, বিদেশ আবার কোথায়? সারাজীবন ঐখানেই ত আমায় কাটাতে হবে। আর তা ছাড়া দামী জিনিষ আমার শাশুড়ীর সিন্দুকে থাকে, খোয়া যাবার কোনই ভয় নেই।

আমার কাছেও দামী জিনিষ থাকে রে। রেণু গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছিল।

সমু বল্লে, তা থাকে, কিন্তু এখানে—ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না মা, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না, কিন্তু কোর্টের ব্যাপারে দেখি ত, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি? রেণু প্রশ্ন করলে।

সমু বল্লে, না,—মানে আমার শ্বশুরই বল্লেন। অর্থাৎ তিনি ত একজন বিচক্ষণ লোক, তিনি বল্লেন, তোমার মা একলা মেয়েমানুষ থাকেন, কি করতে কি হবে, তুমি দলিলখানা তোমার কাছেই রেখ।

রেণু বল্লে, ও, তোমার শ্বশুর বিচক্ষণ আর তোমার দাদু বোকা, এই ত কথা!

সমর রাগ করে উত্তর দিলে, দাদু দাদু আর দাদু, আমি তোমার পর, আর দাদু হোল আপন! আমাদের ও বাড়ীতে ওরা ঠিকই বলেন—

ও বাড়ীর কথা আর শুনিয়ো না সমর! পার ত ওদের বলে দিও যে, মানুষ ভগবানকে কখনও চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু যদি কেউ সত্যিই দেখতে চায় তাহলে সে যেন এসে তোমার দাদুকে দেখে যায়।

সমর হতাশ হয়ে চলে গিয়েছিল।

অমর জানত, যে বাড়ীটা তৈরী হচ্ছে, সেটা রেণুর সম্পত্তি। অমর কোন আপত্তিও করে নি, উৎসাহও দেখায় নি।

কিন্তু রেণুর বাড়ীর গাঁথুনী দোতলা পর্যন্ত শেষ করে যেমনই সরোজের একখানার জন্য ভিত কাটা শুরু হোল, তখন যেন অমরের উৎসাহ একটু বাড়্‌ল। একদিন চুপি চুপি রেণুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি, কোন বাড়ীটা কার নামে দেওয়া হবে বল-না।

রেণু বলেছিল, জানি না।

তুমি জান না তাও কি হয় নাকি? বল না দিদি কোন্‌টা কার হবে।

রেণু বল্লে, সত্যি জানি না রে। বোধ হয় এখনও কিছু ঠিক করা হয় নি।

অমু বল্লে, দক্ষিণের ঐটে কিন্তু আমার নামে হওয়া চাই এই আমি তোমাকে বলে রাখছি, বুঝলে দিদি।

রেণু বল্লে, ছিঃ, তুই কি হয়েছিস বল্ ত অমু? বাবা তিনখানা বাড়ী করছেন; এক একজন এক একটা পাবে। একরকমে তৈরী হবে, ওর মধ্যে তুই যদি বলিস, ঐটে নেব এবং অলক অপুও যদি ঐটের ওপোর ঝোঁক করে তাহলে কি হবে বল্‌তো? ওসব করতে নেই।

অমর চটে উঠল, বল্লে, তা ত তুমি বলবেই। নিজের খানা হয়ে গেছে ত! আগে ভাগে নিজেরটা বেশ করে বাগিয়ে নিয়ে—

রেণু অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়েছিল। এইটুকু ছেলে, এখনও লেখাপড়া শেষ হয়নি, এরই মধ্যে এই এইসব কথা?

বাড়ীগুলো সব শেষ করতে তিন বছরের ওপোর কেটে গেল। এর মধ্যে অলক বাবা এবং অপু মা হয়েছে। সরোজ জেলা জজের পদ থেকে অবসর

গ্রহণ করেছে এবং সরোজের জীবন বীমার টাকা ও অর্দ্ধেক পেন্সন পর্য্যন্ত রাজ সরকারে ছেড়ে দিয়ে সেই (অর্দ্ধ) পেন্সনের নিষ্ক্রত মূল্যও (commuted value) বাড়ীর মধ্যে ঢালতে হয়েছে। বলতে গেলে সরোজের সারা জীবনের সমস্ত পরিশ্রমের সঞ্চয় একত্র করে চেৎলার শঙ্কর বসু রোডে সরোজ স্বেচ্ছায় তৈরী করলে চার মহলের পিরামিড্।

ওদিকে য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগে গেছে এক বছরের ওপোর। তার বিরাট ও ব্যাপক তোড়জোড় ভারতেও চলছে। সেই তোড়জোর চালাবার জন্য পেন্সন পাওয়া লোকদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে পুনর্নিয়োগ করছেন ভারত সরকার। সরোজ তেমনই একটা পদে যোগদান করার আমন্ত্রণ পেলে রাজসরকার থেকে। সে মনে মনে অবসর জীবন যাপন করার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু নতুন কাজের সন্ধান পেয়ে সত্যই বিচলিত হয়ে উঠল। কি করবে, নতুন চাকরী নেবে কি? নিলেও হয়, মাত্র দু'বছরের কণ্ট্রাক্ট সার্ভিসতো!

ঠাকুর ঘর থেকে পূজো সেরে একতলার ভাড়ার ঘরে এসে প্রাতরাশরূপে চিঁড়েভাজা এবং দুধ খেতে খেতে সেই কথায় সরোজ রেণুকা বল্লে। বল্লে, কাল দুপুরে চিঠি পাওয়ার পর থেকে নানা দিক ভাবছি; কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারছি না, কি করা উচিত বল্ ত?

রেণু বলেছিল, আমার কথা যদি শোনেন বাবা, তাহলে আর মিছামিছি খেটে কি হবে। সারাটা জীবনই ত পরিশ্রম করলেন। টাকা-টাকা করে চিরটা কাল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালেন, এখন যা হোক, ভগবানের ইচ্ছেয় ব্যবস্থা ত এক রকম হয়েছে, তাই বলছি কি, এখন একটু আরাম করে থাকুন। ঠাকুর দেবতা দেখে গল্প-গাছা করে, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে—সরোজের মুখের ভাব দেখে রেণু ওর কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল।

নীরবে চিঁড়ে ভাজা শেষ করে গরম দুধ আস্তে আস্তে পান করে বেশ কিছুক্ষণ পরে সরোজ বল্লে, তুই কাশীবাস করতে রাজী আছিস্? তোর এখানকার বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দে, ভাড়াটেরা মাসে মাসে মানিঅর্ডারে কাশীতে টাকা পাঠাক, তুই আরাম করে কাশীতেই থাক না কেন? ঠাকুর দেবতা দেখে, গল্প-গাছা করে, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে—

রেণু হেসে ফেল্লে। বল্লে, বুঝেছি, আর বলতে হবে না বাবা। আপনার যা ভাল লাগে তাই করুন।

সরোজ বল্লে, কাজকর্ম্ম না থাকায় মনটা বড় ফাঁকা হয়ে গেছে রে, তাই ভাবছি, দু'বছরের জন্য কাজ যদি পাওয়াই যায়—

রেণু বল্লে, ঠিক আছে। তা এই কাজ কি কলকাতায় বসেই হবে, না আবার বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে।

সরোজ বল্লে, ঠিক জানি না। আজ দুপুরে গিয়ে সেই সব কথাই বলব বলে ঠিক করছি। বাইরে যেতে হলে পারব না, এই বাড়ীগুলোই আমাকে যেতে দেবে না। বাড়ী, বাড়ীর ভাড়াটে, জলের পাম্প এমন কি গরু দুটো কেউই আমাকে ছাড়বে না। নতুন বাড়ীর মধ্যে গোয়াল ঘর বানিয়ে সরোজ দুটো গরুও কিনেছিল। খাটি দুধ সম্বন্ধে সরোজের দুর্ব্বলতা চিরকালের।

সরোজের চাকরী হোল কলকাতার অফিসে। সেই দশটা-পাঁচটা। বহুদিন পরে সে আবার তার পুরাতন প্যান্ট-কোট ঝেড়ে-ঝুড়ে বার করলে।

এরপরই সুরু হোল বিভীষিকার সংবাদ। সিঙ্গাপুরের পতন, ব্রহ্মা আক্রান্ত, সমগ্র ব্রহ্মা জাপানী বোমায় পর্য্যুদস্ত। আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে লোক পালাতে শুরু করল। কোথায় বোমা, তার ঠিক নেই, কিন্তু লোক পালাচ্ছে দলে দলে, কাতারে কাতারে।

রেণুর ভয় হয়েছিল খুবই। বল্লে, বাবা, পাড়ার সবাই চলে যাচ্ছে, আপনি কি করবেন?

কোথায় যাব?

কেন, কেষ্টনগরে। সমুকে খবর দিলে সে একটা বাড়ী না-হয় ভাড়া করে দেবে, আমরা গিয়ে—সরোজ বল্লে, আমার চাকরী? ঘরবাড়ী? গরু-বাছুর?

একটু থেমে সরোজ বল্লে, পালানোর কথা ভুলে যাও। এবারে অমুর বি. এ. পরীক্ষার জন্য দু'জন ভাল প্রফেসার রাখা হয়েছে। বার বার দু'বার ফেল করেছে। এবার

শেষ চেষ্টা করতে হবে। এ সময় পালাপালি করলে এ-জীবনে আর তার বি. এ. পাস করা হবে না।

রেণু থেমে গেল, কিন্তু ভয় তার খুবই হয়েছিল। ভয় বা আতঙ্কটা সংক্রামক। পাড়ার লোক সবাই যদি ভয় পায় তাহলে রেণুরও ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু বোমার নাম-গন্ধও নেই। বোমা শুধু খবরের কাগজে। শীত পার হয়ে গেল। পালানো লোকেরা একে একে ফিরে আসতে লাগল। অমুর পরীক্ষা হয়ে গেল।

এবার পরীক্ষায় অমু কোনরকমে পাস-কোর্সে বি.এ. পাস করেছিল, এবারে, এই তৃতীয়বারের চেষ্টায়। সরোজ বল্লে, কি রে, ল' পড়বি ? না এম. এ, ক্লাসে ভর্তি হবি ? অলকের মত এম. এ. ল একসঙ্গে পড়া তোর দ্বারা হবে না।

এম এ র দিকে না গিয়ে অমু শুধু ল'ক্লাসেই ভর্তি হোল, সকালে পৌনে আটটা থেকে পৌনে ন'টার ক্লাস, কিন্তু ক্লাস খোলার আগেই শুরু হোল আগষ্ট আন্দোলন, কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো দাবী।

কলকাতায় ট্রাম-বাস জ্বলতে লাগল। সারা ভারত জুড়ে রেলগাড়ী পুড়তে লাগল, রেলের লাইন উপড়ে, পোস্ট অফিস পুড়িয়ে সে এক ধুন্ধুমার বেধে গেল। বহু ধর-পাকড়ের পর দেশ একটু ঠাণ্ডা হতে না হতেই শীতের মুখে সত্যিকার বোমাপড়া স্বরু হোল। এবার কিন্তু লোক আর তেমন পালাল' না। গতবছর পালিয়ে তারা পালান'র মজা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

খিদিরপুরে যেদিন দুপুরে বোমা পড়ল, সেদিন রেণুদের নতুন বাড়ীগুলোও ঝনঝন্ করে কেঁপে উঠেছিল। এ আর পি'র নির্দেশমত সে একতালায় সিঁড়ির নীচে বসে বসে আকালকুল চিন্তা করেছিল সরোজের জন্য। সরোজ তখন অফিসে, অমুও বাড়ী ছিল না, কোথায় যেন গিয়েছিল। আকুলভাবে ভগবানকে ডেকে রেণু বলেছিল, ভগবান প্রথম বোমা যেন আমার ওপোর পড়ে, আমি যেন অন্যের বিপদ দেখার আগেই চোখ বুজতে পারি।

এ ধাক্কাও কেটে গেল। শীত কেটে বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এল।

দেখা দিল মন্বন্তর। কলকাতার কাছাকাছি পল্লীতে এক সময় যারা সুখী গৃহস্থরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করেছে, সেই তারাই সপরিবারে দলে দলে ভিক্ষাপাত্র হাতে কলকাতার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ফেন দাও, ভাত দাও।

ওঃ, সে সব কি দিনই গেছে! পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে অন্নসত্র; ঘরে ঘরে কায়েম হয়েছে র‍্যাশন কার্ড। চাল নেই, আটা নেই, অধিকাংশের হাতে পয়সাও নেই, লোকে খাবে কি, বাঁচবে কি করে। তারপর কাপড়ের অভাব। মিলের কাপড় বছরে মাথা পিছু বরাদ্দ মাত্র বিশ গজ। মানুষ কেমন করে চালাবে ?

ব্যাপার এমনই ঘোরালো হয়ে উঠল যে সরোজ পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ল। অলকের অপর চিঠি নিয়মিত আসে না। তারা সব কে কেমন আছে সে জন্য সদা সর্ব্বদাই মানসিক উদ্বেগ। তারপর সংসার খরচ। বাড়ীগুলো তৈরী করে হাত একেবারে খালি, কিছু কিছু দেনা এখনও আছে। চাকরীর মাইনে থেকে সেই দেনা শোধকরা এবং দুর্মূল্যের বাজারে সংসার খরচ; পুরানো পোষাক আর চলছে না, অন্ততপক্ষে দুটো নতুন সুট করতেই হবে। মোটরখানা আর রাখার ক্ষমতা হচ্ছে না, রেখেই বা কি হবে ? শুধু শুধু ড্রাইভারকে মাইনে দিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ পেট্রল পর্য্যন্ত বরাদ্দ হয়ে গেছে। কুপন দিয়ে যেটুকু তেল পাওয়া যায় তাতে দশ পনর দিনের বেশী গাড়ী চড়া যায় না। সরোজ ঠিক করলে গাড়ীটা বিক্রী করে দেবে। কিন্তু রেণু এতে রাজী নয়; বল্লে, বাবা এতদিন গাড়ী চড়ে এখন কি আর ট্রাম বাসের ভিড়ে উঠতে পারবেন ?

সরোজ বল্লে উঠতেই হবে।

অমর বল্লে, না বাবা, কিছু বেশী দিলে ইচ্ছামত তেল পাওয়া যায়। এমন কি মিলিটারীরাও তেল বিক্রী করে।

সরোজ বল্লে, জানি। সেটা কালো বাজার, চুরি। আমি এই বুড়ো বয়সে চুরি করতে পারব না। গাড়ীর মায়া কাটাতে হবে। তা ছাড়া চল্লিশ টাকা মাইনেয় ড্রাইভার আর কাজ করতে চাইছে না। এখন না কি ষাট সত্তর এমন কি পঁচাত্তর পর্য্যন্ত মাইনে হয়েছে ড্রাইভারদের।

অমু বল্লে ঠিক আছে বাবা তুমি ড্রাইভার ছেড়ে দাও। গাড়ী আমি চালাব।

তারপর ?

তারপর আর কি ? আমার কলেজ ত সকালে। আমিও কলেজটি মেট-মর্নিংয়ে করে নেব। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে অফিসে বেরুবে। আমি তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে কলেজ সেরে বাড়ী এসে গাড়ী তুলে ফেলব। সারাদিনে আর গাড়ী বেরুবে না। এ ভাবে চালালে যা তেল আমরা পাই, তাতে হয়ত তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলে যাবে। তারপর তুমি দেখ, হয়ত তোমার অফিস থেকে কিছু বাড়তি কুপন বরাদ্দ করিয়ে নিতে পারবে। অফিসাররা বাড়তি তেল পায়।

এই ব্যবস্থাই বহাল হোল। ড্রাইভারকে এক মাসের নোটীশ দিতে সে সঙ্গে সঙ্গেই বল্লে, নোটীশ লাগবে না স্যার। যদি দয়া করে আজই ছেড়ে দেন, তাহলে খুব উপকার হয়। আমি এখনই সত্তর টাকা মাইনের কাজ পেয়ে যাচ্ছি।

সরোজ বল্লে, তাই নাকি ? তা একথা ত আমাকে বল নি।

ঘাড় হেঁট করে ড্রাইভার বলেছিল, এতদিন আপনার কাছে রয়েছি, আপনি এত স্নেহ করেন, তাই হঠাৎ ছেড়ে যাবার কথা বলতে পারি নি স্যার, কিন্তু আপনি যখন নিজে থেকেই বলছেন—

ড্রাইভার কাজ ছেড়ে চলে গেল।

সরোজ ভাবে, দেশটা কি হোল। সব যেন রাতারাতি বদলে যাচ্ছে। বাড়ী আমার, ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভাড়া দিয়েছি, কিন্তু এর মধ্যে তৈরী হোল নতুন বাড়ী ভাড়া আইন, সাধারণ কন্ট্রাক্ট আইনে আর চলবে না। সারা দেশ জুড়ে এমন একটা অশান্তির তাণ্ডব চলছে যে, ল' এণ্ড অর্ডার বলে কোন কিছু আর থাকবে না না-কি ?

সুরাহার মধ্যে যেটুকু ছিল, সেই বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান যৌথ মন্ত্রিসভাও আর বুঝি টেঁকে না। জজিয়তী জীবনের শেষ দিকে সরোজ মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের দাপট বেশ কিছুদিন হাড়ে হাড়ে ভোগ করেছিল। যদিও তার বিচার বিভাগে বিশেষ কিছু আঘাত সে পায় নি, কিন্তু আশ-পাশের দুর্নীতিতে তার আইন-প্রেমিক মন বারবার বিচলিত, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। যা হোক, পেন্সনের পর সরোজের নতুন চাকরী-জীবনে বাংলা দেশে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ও স্যার আশুতোষের ছেলে শ্যামাপ্রসাদের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, সেই মন্ত্রিসভার আমলে দেশে অনেক বিপৎপাত সত্ত্বেও যতটা সম্ভব সুষ্ঠুভাবেই রাজ্যপরিচালনা দেখে সরোজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, কিন্তু এখন যেন মনে হয়, ঐ মন্ত্রিসভাও টলমল করছে। বাড়ীঘর তৈরী করে সরোজ যখন ভেবেছিল, শান্তিতে শেষ জীবনটা কাটাবে, তখন ঠিক সেই সময়েই এমন সব ঝঞ্ঝাট এসে পড়ল, যা সে তার বিগত জীবনে ভোগ করা ত দূরের কথা, ভাবতেও পারে নি।

তবুও একটা মাত্র সান্ত্বনা এই যে ছেলে মেয়ে তিনটের ব্যবস্থা সে একরকম করে দিয়েছে, বাকী আছে অমু। বি-এ পরীক্ষায় উপর-উপরি ফেল না করলে এতদিনে সেও দাঁড়িয়ে যেত, কিন্তু অদৃষ্টও বটে, আর নেহাৎ ফাঁকিবাজ সে। এখনও দু'বছর লাগবে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

কিন্তু দু'বছর লাগল না। বোধ হয় পড়াশুনায় অমু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন সে মনে মনে অনেকখানি সাহস নিয়ে বাবার কাছে এসে বললে, একটা কথা বলব ? বলছিলুম কি, একটা কারবারে লেগে পড়ি, যদি কিছু টাকা দাও—

সরোজ বললে, কারবার ? কি কারবার করবি রে। কারবারের কি জানিস তুই ?

অমু বললে, বাবা, এখন যা বাজার চলছে, এতে কারবারের জানাজানির কিছুই নেই। আমার এক বন্ধুর বাবা বলেন, দু'চোখে যা দেখবে, কিনে ফেল। এক মাস পরেই ডবল দামে বিক্রী হয়ে যাবে। এই দেখ না কেন, তিনি বাজার থেকে প্রায় শ'খানেক প্রাইমাস ষ্টোভ কিনেছিলেন, শুনলাম, তাঁর নাকি গড়ে সাড়ে চার টাকা হিসাবে পড়েছিল। দু'মাস পরে সেই ষ্টোভ তিনি মিলিটারীকে সাপ্লাই দিলেন দশ টাকা পিস্। সাড়ে চারশ' টাকা মূলধনে দুমাসে সাড়ে পাঁচশ' টাকা নিট্ লাভ। কত পার্সেণ্ট হোল একবার হিসাব করে দেখ ত ?

কথাটা সরোজের মনে ঠিক না লাগলেও প্রতিবাদ করতে পারলে না। ব্যবসার এই অবস্থা তিনি সর্ব্বদিকেই উপলব্ধি করছেন।

অমু বললে, তুমি নিজেই ত দেখেছ বাবা, দু'গাছা জি

আই পাইপ আমাদের বাড়তি পড়েছিল, বাড়ী বয়ে এসে ওরা আড়াই গুণ দাম দিয়ে নিয়ে গেল ত। দু'আনা ফুট কেনা হয়েছিল নতুন পাইপ, পাঁচ আনা ফুটে নিয়ে গেল ময়লা, মাটীমাখা, মরচে-ধরা অবস্থায়।

কথাটা ঠিকই। সরোজ বললে, সবই ত হোল, কিন্তু হঠাৎ যদি কোন মাল ঘাড়ে পড়ে যায়, কিম্বা—

এর ভেতর কোন 'কিম্বা নেই বাবা। চাল বল, কাপড় বল, ওষুধ বল, লোহা-লক্কড়, কাঠ-কাঠরা প্রত্যেকটি জিনিসের দাম প্রত্যহ বেড়ে যাচ্ছে। করোগেট টিনের দাম পর্য্যন্ত কি ভাবে রোজ রোজ বাড়ছে। আমি বলি কি বাবা, কয়েক বাণ্ডিল করোগেট টিন কিনে এখানেই আমাদের ঐ পেছনের জমিতে একটা গুদামের মত তৈরী করে ওখানে মাল কিনে রাখতে সুরু করি, তারপর সুবিধে বুঝে সেই সব মাল বিক্রী করব, আবার কিনব। বাজারে টাকা এখন উড়ছে।

একা একা পারবি সব সামলাতে? আমি কিন্তু ও সব কিছুই বুঝি না, তা ছাড়া আমার সময়ও নেই।

অসহিষ্ণু অমর বললে, একা নই বাবা, আমার সেই বন্ধুর বাবা আমাকে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি ও তাঁর ছেলে একই সঙ্গে কাজ করব। গুদাম তৈরীর কথা তিনিই আমাকে বলেছেন।

তিনি কি রকম লোক? তাকে কতদিন দেখছিস্?

খুব ভাল লোক বাবা। তিনিও তোমারই মত চাকরী করতেন। সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় কারবার সুরু করেছেন। এখন বহু টাকার মালিক।

তা হলে তিনি তোমাকে স্বেচ্ছায় ভাগীদার করতে চাইছেন কেন? তিনি ত একাই সবটা লাভ নিজে নিতে পারতেন।

তা ত পারতেনই। কিন্তু তিনি যে আমাকে ছেলের মতই ভালবাসেন।

অল্প হেসে সরোজ বললে, কারবারে ভালবাসা-বাসির কোন স্থান নেই অমু, ভালবাসা-টাসা কিছু নয়। এর আসল ব্যাপারটা কি বল ত শুনি।

অমু বললে, না বাবা, তিনি বলেন, এত কাজ এবং এত টাকার দরকার যে, তাঁর একার পক্ষে সবটা সামলানো সম্ভব নয়। তাই তিনি আমাকেও পার্টনার নিতে চাইছেন। তুমি একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলনা, তাহলেই বুঝতে পারবে।

ছেলের উৎসাহ এবং ভবিষ্যৎ লাভের আশায় সরোজ বলেছিল, ঠিক আছে, সামনের রবিবারে তাকে নিয়ে এস। কথা বলে দেখব। কিন্তু অমু, নগদ টাকা আমার তেমন কিছুই হাতে নেই, একথা আমি প্রথমেই বলে রাখি।

অমু একটু হতাশ হোল। তবুও ঠিক হোল, সামনের রবিবারে সেই ভদ্রলোককে সে নিয়ে আসবে।

ভদ্রলোকের কথা বলার ক্ষমতা ছিল। ব্যবসার প্রথম মূলধন যে বাক্যবিন্যাস সেটা সেই ভদ্রলোককে বাণী-সরস্বতী ষোল আনাই দিয়েছিলেন।

সরোজ তার কথায় বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু নগদ টাকা ওর হাতে তখন একেবারেই ছিল না, কোনক্রমে পাঁচশ' টাকা দিয়েছিল। প্রফুল্ল বাবু পাঁচশ টাকা নিয়েই অমুকে পার্টনার করে নিলেন। অমু কলেজে ইস্তফা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। কলকাতায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অবসান, লী। মন্ত্রিসভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও চাকরে বাবুদের হাতে নতুন পয়সা, বেকারীর প্রায় অবসান, দ্রব্যমূল্যের ক্রমিক বৃদ্ধি, অমুদের কারবারে মোটা লাভ, মিলিটারীতে মাল সরবরাহ, সরোজের অফিসে উদয়াস্ত কাজ, এরই মধ্যে লোকমুখে একটা সংবাদ শুনে রেণু নিতান্তই বিচলিত হয়ে পড়েছিল,—অমু নাকি আজকাল মদ খাচ্ছে। এটা ঠিক যে, অমু আজকাল প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফেরে না; জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, রাত্রে অফিসের কাজ সমস্ত সেরে না রাখলে পরদিন সকালের কাজ সময়মত করে উঠতে পারা যায় না, কিন্তু তাই বলে সারা রাত বাইরে থাকা কি ভাল?

সরোজ বলে, যত রাতই হোক গাড়ী রয়েছে, বাড়ী আসবি।

সে বলে, আমি বাড়ী ফিরলে অন্যেরা কাজ করবে কেন বাবা? তা ছাড়া ওখানে ত সারারাত জাগি না, ঈজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে নিই।

অমু দেখায় এ মাসে ওর নিজস্ব লাভ হয়েছে বারো শ' টাকা।

সরোজ চুপ করে যায়। এক মাসে এত টাকা সে নিজে ঐ বয়সে উপার্জন করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী ফিরে জল খেয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইল সরোজ। রেণু বারবার ওর দিকে লক্ষ্য করে শঙ্কিতকণ্ঠে ডাকলে, বাবা!

সরোজ কোন উত্তর দিলে না।

রেণু কাছে এসে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর খারাপ না কি? ওরকম করে বসে আছেন কেন বাবা?

সরোজ বলেছিল, না, শরীর ঠিকই আছে।

ইতস্তত: করে রেণু বলেছিল, কি হয়েছে বাবা, এরকম ভাবে বসে আছেন কেন?

তা হলে কি করতে হবে শুনি, সরোজের কথায় বেশ একটা বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

ছোট মেয়ের মত আবদারের স্বরে রেণু বলেছিল, কি হয়েছে বলুন না বাবা, যদি কোন অন্যায় করে থাকি—

সরোজ ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হতাশ হয়ে বলেছিল, অন্যায় তোমাদের কারুরই নয় রেণু, অন্যায় আমার, এতদিন বেঁচে থাকাটাই অন্যায়।

রেণু চুপ করে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে সরোজ বললে, রেণু—

কি?

ভাবছি, এবার কলকাতা ছেড়ে, চাকরী ছেড়ে, বাকী জীবনটা কাশীবাস করব। কাশী ছাড়া আর আমার জায়গা নেই রে!

রেণু কাছে এসে দাঁড়াল, কেন বাবা কি হয়েছে আমায় বলুন না।

হয়েছে তোমার ছোট ভাই অমরকে নিয়ে। আজ আমি স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি—আর তারই বা দোষ কি, সারা দেশে যা চলছে, ও ত আর দেশ ছাড়া নয়, কেবল আমরাই দেশছাড়া হয়ে পড়েছি—

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ বিশ বাইশ বছর ধরে সরোজকে সে দেখছে। ও ঠিক জানে সরোজ ওকে সব কথাই বলবে, তবে নিজের খেয়ালমত, আস্তে আস্তে,—জিজ্ঞাসা করলেই থেমে যাবে।

ঠিক তাই হোল। সরোজ বললে, অফিস থেকে একটু দরকারে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলুম। দেখি, অমু বাবু মুখে এক পাইপ লাগিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে আর বাজার করছে। কি কিনছে জানিস, বিলাতী মদ, এক সঙ্গে ছ' বোতলের কেস্। ও আমায় দেখতেই পায় নি, এক ছোকরাকে দিয়ে মুটের মাথায় মদের কেস্টা গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে ও সেই মেয়েটার হাত ধরে গিয়ে ঢুকল একটা কাটা কাপড়ের দোকানে এবং তার পছন্দমত জিনিস নিতে বললে—সরোজ থেমে গেল।

তারপর?

তারপর আর কি? আমি নিঃশব্দে বাজার থেকে বেরিয়ে এলুম। ছেলে বড় হয়েছে, দু'হাজার টাকা উপায় করছে, এখন যদি কোন কথা বলতে যাই তা হলে কি আর মান রেখে কথা কইবে! আমি ঠিক করছি, কলকাতায় আর আমার থাকা চলবে না।

পরের দিন সকালে সুবিধে বুঝে রেণু সেই কথাই বলেছিল অমুকে। কার কাছে শুনেছে সেটা না বলে রেণু বললে, হ্যাঁরে অমু, তুই নাকি—

সব শুনে অমু বলেছিল, কে বললে তোমাকে? তোমার বিশ্বাস হয় যে আমি এই সব করেছি—

রেণু বললে, হয়। যার কাছে শুনেছি সে কখনও মিথ্যে বলবে না।

অমু বললে, হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই, কিন্তু ও-সব কিনেছি আমার অফিসের জন্য। যে সব বড় বড় সাহেবদের ধরে লাখ লাখ টাকার কারবার চালাতে হয়, সেই তাদের মাঝে মাঝে ভেট দিতে হয় ঐ সব জিনিষ।

রেণু বললে, মেয়েটা কে? সঙ্গে যে ছিল?

অমু বললে, ও আমাদের অফিসে কাজ করে। ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম, পছন্দ করে মেয়েদের গাউনের কাপড় কেনার জন্য। ও খুব শিক্ষিত এবং ওর পছন্দটা খুব ভাল।

কার জন্য কাপড় কেনা হোল, রেণু জিজ্ঞাসা করলে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমর বললে, কার জন্য আবার? ঐ যে বললুম সাহেবদের ভেট দিতে হবে। সেই ভেটের সঙ্গে মেমসাহেবের জামার কাপড় দিতে হবে না?

রেণু চুপ করে গেল। অমু তার কণ্ঠে বেশ খানিকটা তিক্ততা ঢেলে বলেছিল, যা জান না, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না।

রেণু বললে, আচ্ছা বেশ। তা তুই পাইপ খাচ্ছিলি কেন? ওটাও কি সাহেবদের জন্য?

ঠিক তাই। বড় বড় জায়গায় মিশতে হয়, তাদের সঙ্গে সমান চালে চলতে হয়, ও-সব না হলে তারা আমল দেবে কেন?

তোর বাবা বুঝি বড় জায়গায় মেশে না? তোর দাদা—

ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওদের দিন আর নেই। তা ছাড়া এটা মনে রেখ, বাবা দাদা এখন যে মাইনে পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী মাইনে দিয়ে আমরা সব লোক রাখছি আমাদের অফিসে। তারা আমাদের কাছে চাকরী করে, আমাদের সামনে এসে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, বসতে সাহস পায় না।

ও, তুমি এত বড় হয়েছ! তা বেশ ভালো, রেণুর সমস্ত মনটা বিরক্তি ও তিক্ততায় ভরে উঠেছিল।

এর রেণু এতই মর্মাহত হয়েছিল যে, কথাটা সরোজকে না বলে থাকতে পারে নি। সব শুনে সরোজ বলেছিল, কম বয়সে বেশী টাকায় ছেলেটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। দেওয়ালে টাঙানো পরমহংসদেবের ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরোজ।

অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে, সরোজের হুঁস নেই। আজকাল তাড়াতাড়ি বেরুতে হয়। শঙ্কর বসু রোড থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে কাঠের পোল পার হয়ে রাসবিহারীর মোড়ে এসে বাস ধরে অফিসে যেতে হয়, কারণ ধনী অমর কখন কোনদিন যে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায় তার কোন ঠিকই নেই। আগে আগে সে বাবাকে অফিসে নামিয়ে দিত, এখন বেশীর ভাগ দিনই তার সময় হয় না। কাজেই বৃদ্ধ পিতা চরণ-সম্বল করে বেরিয়ে পড়েন, নেহাৎ বিপাকে পড়লে ট্যাক্সি ভাড়া করেন, কিন্তু চেৎলার এই অঞ্চলে ট্যাক্সিও সচরাচর পাওয়া যায় না, সেজন্যও কাঠের পোল পার হয়ে যেতে হয়।

রেণু এসে সরোজকে ডাকলে, বাবা বেলা হয়ে যাচ্ছে, উঠবেন না?

হাঁ উঠব। কিন্তু উঠে আবার সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

রেণু বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে বললে, শুলেন যে, শরীরটা খারাপ লাগছে?

সরোজ বললে, না, এমন কিছু নয়, উঠছি।

রেণু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুয়ে শুয়েই সরোজ বললে, জানিস রেণু, আজকাল কি হয়েছে জানিস? ভদ্রঘরের মেয়েরা বিকেলে সাজগোজ করে চৌরঙ্গীর পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এমেরিক্যান্ মিলিটারী সাহেবদের সঙ্গে ভাব করে তাদের নিয়ে হোটেলে ঢুকে মদ পর্য্যন্ত খায়, তারপর সেই সাহেবদের কাছ থেকে টাকা পয়সা উপায় করে মাঝ-রাতে বাড়ী ফেরে। সেই সব মেয়েদের গরীব বাবারা নিজেদের হাতে সেই টাকা নিয়ে সংসার খরচ করে, কিন্তু গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ে না।

অবাক হয়ে রেণু বলে, সেকি বাবা? তারা কি সব ভাল ঘরের মেয়ে?

ভাল ঘর, তোমার আমার মত ঘর, কেবল পয়সা কম। পেটের জ্বালায় এই সব কারবার চালু হয়েছে। সবাই সব জেনেও মুখ বুঁজে আছে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ থেকে রেণু বললে, যাক বাবা, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, যেখানে যা হচ্ছে হোক্ গে যাক্ আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।

কিন্তু সেদিন সরোজের মনটা এমনই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সে আর বেরুতে পারে নি, আহারাদি সারলে বটে কিন্তু বেরুল না। নীচে ড্রয়িংরুমে নেমে অফিসে টেলিফোন করে দিলে। অমু এ বাড়ীতে ফোন নিয়েছিল কয়েকমাস আগে।

সেইদিনেই সন্ধ্যার পর রেণুর বাড়ীর দোতলা ও তিন-তালার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছিল যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক এসে সরোজকে ডেকে বলেছিলেন, তাঁর এ পাড়ায় সুবিধে হচ্ছে না, তিনি মধ্যকলিকাতায় চলে যেতে চান, অর্থাৎ একমাসের নোটীশ দিলেন যে তিনি বাড়ী ছেড়ে যাবেন।

সরোজ নোটীশ গ্রহণ করলে।

খবরটা অমুর কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল। পরম উৎসাহে বল্লে, ওটা খালি হচ্ছে বুঝি, তাহলে খুব ভাল হোল, আমাদের দু'জন কর্ম্মচারীকে ঐখানে এনে বসাব। বেচারীরা বহু দূর থেকে আসে, এখানে থাকতে পেলে

তারাও বেঁচে যাবে এবং আমারও কাজের খুব সুবিধে হবে।

সরোজ বল্লে, ভাড়া? ভাড়া দেবে ত?

নিশ্চয়ই। ওরা যা দিত, এরাও তাই দেবে।

কিন্তু সরোজ ভেবে চিন্তে অন্যরকম ঠিক করলে। রেণুকে বল্লে, কি রে তোর কি মত?

সে বল্লে, আমি আর কি বলব বাবা, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে।

সরোজ বল্লে, ও দুটো বাড়ী ত পুরো রি ভাড়া হয়ে রয়েছে। এ বাড়ীটা আমি উইলে অমুর নামেই দিয়েছি। আমার মনে হয় বেশী না জড়িয়ে এক কাজ করি। এ বাড়ীটা ছেড়ে আমরা তোর বাড়ীর দোতলা-তেতলায় গিয়ে উঠি এবং এটা পুরোপুরি অমিকে ছেড়ে দি। এখানে ওর অফিসের লোক নিয়ে ও রাখুক, ভাড়া দেয় না-দেয় সে তখন যা হয় হবে। বুঝলি। না হলে পরে অসুবিধে হতে পারে।

রেণু বল্লে, ও বাড়ীর একতালায় যাঁরা আছেন ওঁরা কি খালি করে দেবেন?

কি দরকার? ওরা যেমন আছেন তেমনই থাকুন। ওঁরা ত খুব ভালো লোক, কোন ঝঞ্ঝাট নেই, গোলমাল নেই, নিয়মিত ভাড়া দিচ্ছেন, ওরা একতালায় যেমন আছেন থাকুন, দোতলায় তোমরা থাকবে, আর তিনতালার ঘরখানায় আমি থাকব। তবে তোর ভাড়া, ওরা যা ভাড়া দিতেন, সেই ভাড়া আমিই তোকে দেব।

বাবা, রেণু গম্ভীর কণ্ঠে সম্বোধন করেছিল।

কি?

আর কত জালাবেন বলুন ত?

কেন?

আপনার বাড়ী, আপনি থাকবেন, ভাড়ার কথা তুলে মিছামিছি জ্বালাচ্ছেন কেন বলুন ত।

হাসি হাসি মুখে সরোজ বল্লে, এই বল্লুম। তুই এখন বাড়ীওয়ালী—

ক্ষুব্ধকণ্ঠে রেণু বল্লে, দলিলপত্র সব ছিঁড়ে আমি আপনার পায়ে ফেলে দিয়ে যাব কিন্তু—

সরোজ বল্লে, শোন, রাগ করিস নি। যা বলছি, মনে রাখিস্। অমুর হাল চাল ভাল নয়। ও যে লোক আনবে, তাকে আমি তোর বাড়ীতে ঢোকাতে চাই না, পরে নানা অসুবিধা হতে পারে। তাই দুদিন ধরে ভেবে আমি এইটাই ঠিক করেছি। তারপর আমি যদি তোর বাড়ীতে ভাড়া না দিয়ে থাকি, তাহলেও তোর অসুবিধা হবে—

হোক্, রেণু ঝাঁঝিয়ে উঠল।

সরোজ গম্ভীরকণ্ঠে বল্লে, যা বলছি শোন্, কথার ওপোর কথা বলিস্ নি। তোর একতালার ভাড়াটের সঙ্গে বাড়ীভাড়ার ব্যাপারে যেমন লেখাপড়া হয়েছে, ঠিক সেইরকম লেখাপড়া আমার সঙ্গেও তোর করতে হবে। সেইসব কাগজ তুই তোর দলিলপত্রের সঙ্গে একসঙ্গে রাখবি। মাসে মাসে আমি তোকে ক্রশ চেকে ভাড়া দেব, সেজন্য তোর পোষ্ট অফিসের পাস বইয়ে চলবে না, যে কোন একটা ব্যাঙ্কে হিসাব খুলতে হবে। অর্থাৎ কেউ যেন ভবিষ্যতে বলতে না পারে যে, তোর বাড়ীতে আমার কোন অধিকার ছিল, বুঝলি। মনে রাখিস্, আমার পরে আমার লেখা কাগজগুলো ছাড়া তোর আর কোন বন্ধু থাকবে না।

রেণু চুপ করে গেল।

সরোজের নয়া ব্যবস্থায় অমুও খুসি। বল্লে, ঠিক আছে। একতালার ড্রয়িং রুমে যেখানে টেলিফোন আছে ঐটে আমার অফিস ঘর হবে এবং বাকী দুটো ঘরে এবং ওপোরের ঘরগুলোয় আমার অফিসের ওরা সব থাকবে।

সরোজ বল্লে, ভাড়া কে দেবে? তোমার অফিস না ওরা, যাঁরা থাকবেন?

অসন্তুষ্ট অমু কোন প্রতিবাদ না করে বল্লে, যা বলবে।

সরোজ বল্লে, তোমার অফিসের নামে এই বাড়ীটা গোটা ভাড়া করে নাও, তারপর ওদের যেন কোয়ার্টার্স হিসেবে দিচ্ছ এইভাবে ওদের মাইনে থেকে টাকা কেটে নিও।

অমু রাজী হয়ে গেল। মাসিক একশ' টাকা ভাড়ায় অমুর অফিস সরোজের কাছ থেকে গোটা বাড়ীটা ভাড়া করে নিলে। রেণুর সঙ্গে সরোজের লেখাপড়া হোল, মাসিক পঁয়ষট্টি টাকায় সরোজ রেণুর দোতলা তিনতালা ভাড়া নিয়ে নিলে। রেণুর একতালার ভাড়াটে একতালার জন্য ভাড়া দেয় মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা। পূর্বের ভাড়াটে দোতলা তিনতালার জন্য দিত ষাট টাকা, রেণু যেন পাঁচটাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে। কাগজপত্র পরিষ্কার রইল।

অফিস থেকে ফিরে এসে সরোজ বল্লে, দিনকাল কি হোল রে। প্রথম মহাযুদ্ধও ত আমরা দেখেছি আর

এখনও দেখছি। এখন যেন লোকগুলো সব পাগল হয়ে গেছে।

সরোজকে খেতে দিয়ে রেণু সামনে বসে বসে কথাগুলো শুনছিল। সরোজ বল্লে, আজকে অফিস থেকে আমাদের আর একজন অফিসারের গাড়ীতে আসছিলুম। হঠাৎ দেখি এক বিরাট মিছিল। কলেজের ছাত্র বলেই মনে হোল তাদের। কি বলে চেঁচাচ্ছে জানিস্? বলছে, 'জাপানকে রুখতে হবে, কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ'।

তার মানে? রেণু প্রশ্ন করলে।

হাসতে হাস্তে সরোজ বল্লে মানে? মানে ওর কিছুই নেই। আমাদের গাড়ী গেল আটকে। আমরা বসে বসে কত হাসব? বোমা, কামান, প্লেন, জাহাজ, ট্যাঙ্ক নিয়ে হচ্ছে যুদ্ধ, আর ওরা কি-না কলকাতার রাস্তায় চিৎকার করে জাপানকে রুখ্‌বেন। আমার সেই বন্ধু বল্লেন, আমরা কি জাপান না কি? ছোকরারা ত আমাদেরই রুখে দিয়েছে দেখ্‌ছি। একটু থেমে সরোজ বল্লে, শিক্ষিত ছেলেরা কি বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে, কে জানে?

লড়াইয়ের কাহিনী ও সহরের পাগ্‌লামীতে সরোজের এ রকম হাসি গল্প মাঝে মাঝেই চলে. কিন্তু সরোজের এক বন্ধু যেদিন তার মেয়ের সঙ্গে অমুর বিবাহের প্রস্তাব করলে, এবং সেই প্রস্তাবে রেণুর মাধ্যমে অমু যখন দাবী করে বসল বিশ হাজার টাকা নগদ সেদিন সরোজ একেবারে মুষড়ে পড়ল। বল্লে বন্ধুর কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। কিন্তু অমু ছাড়বার পাত্র নয়, ঐ নিয়ে রেণুকে দু'তিন দিন তাগিদও করেছিল। তার ব্যবসার মূলধন চাই, আরও চাই, এবং দাবী তার অফুরন্ত।

সরোজ বল্লে, কি যে করে ছেলেটা তা ও-ই জানে। আমার গাড়ীটা ত পুরোপুরি দখল করে বসে আছে। আরও একটা গাড়ী এবং লরী ত কিনেছে দেখছি, কিন্তু বাড়ী ভাড়া বলে আজও পর্য্যন্ত একটা পয়সাও ত দেয় নি।

সে কি বাবা? দুহাতে পয়সা খরচ করে, আর আপনার বাড়ীভাড়া দেয় না?

ম্লান হেসে সরোজ বলেছিল, না।

আমি বলব? রেণু অনুমতি চেয়েছিল।

ছিঃ, ও সব বলতে যাস নি। আর তা ছাড়া ও বাড়ী ত ও ই পাবে। যা ভাল বোঝে করুক।

মেয়ের বাবা সরোজের কাছে এসেছিল। সরোজ বল্লে, আমায় কিছু বোলো না ভাই, আমি কিছু জানি না।

বন্ধু বল্লে, ব্যাপার কি? তোমার নিজের অমত আছে বুঝি?

সরোজ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে চেয়ে ম্লান মুখে উত্তর দিলে, ছেলে আমার ভাল নয়। টাকা হয়ত উপায় করে, কিন্তু স্বভাব চরিত্র কি রকম আছে আমি জানি না. বোধ হয় মদ-টদও খায়। তুমি ভাই তোমার মেয়েকে মাঝারী গোছের চাকরী করে এমন ধারা একটি ছেলে দেখে পাত্রস্থ কর, আমার ছেলের হাতে দিও না।

এর পর দুই বন্ধু বহুক্ষণ নীরবে বসে ছিল।

সরোজ তার নূতন চাকরীতে আরও দু'বছরের একস্‌টেন্‌সন পেয়েছিল. কিন্তু শরীর আর বয় না। নানারকম ছোটখাট অসুখ তার লেগেই আছে। পনরদিন ছুটী নিলে বিশ্রামের জন্য।

এই পনেরটা দিন বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সারাটা দিন ধরে তেতলার ঘরে শুয়ে বসে কত গল্পই সে রেণুর সঙ্গে করেছে। সরোজের সেই সমস্ত কথার মধ্যে স্থায়ী একটা বিপদের আভাসই রেণু পেয়েছিল।

সরোজ একদিন বলেছিল, রেণু, তোর মনে আছে কোনারকের সেই সমস্ত মূর্তিগুলো, সেই সমস্ত বীভৎস ব্যাপার?

ঘাড় হেঁট করে রেণু উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ।

শুধু কোনারকে নয়, আমি জানি কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দির থেকে সুরু করে খাজুরাহো, ভুবনেশ্বর, কোনারক, সিংহাচলম পর্য্যন্ত বরাবর এক টানা দেব মন্দিরে ঐ রকমের দৃশ্য তৈরী করিয়েছিল হিন্দু রাজারা আজ থেকে প্রায় 'বারো তেরশ' বছর আগে। মনে হয় যে, তারা বোধ হয় দুটো জিনিষই জানত। ঘরোয়া যুদ্ধ আর স্ত্রীবিলাস। এ দুটোয় তারা এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, দেব মন্দিরের বাইরে এমন কি ভেতরেও

এ ছুটোর স্থায়ী মূর্তি তৈরী করতে তারা দ্বিধা করে নি। ফল কি হোল জানিস্ ?

রেণু জানত এ সমস্ত কথা সরোজ তাকে বলছে না, সে বলছে তার নিজেকে। তবুও সরোজের মন রেখে রেণু প্রশ্ন করলে, কি ?

সরোজ বল্লে, যেমনই বিদেশী শত্রু এসে দরজায় ঘা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতি ভেঙ্গে পড়ল। স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব যবনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল শুধু মাত্র একটি কারণে, সেটা হোল চরিত্রবলের অভাব।

রেণু চুপ করে শুনছে। সরোজ বল্লে, জাতির দুর্দশা রইল ততদিন, যতদিন তার ভাবধারায় চরিত্রগত উজ্জ্বলতা কায়েম ছিল। সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর, ধর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, আনন্দ উৎসবে খেউড় ও ঝুমুর গান, শিক্ষিত সমাজ কবিয়ালের খিস্তি শুনে বাহবা দিত। জাতি মাথা তুলতে পারেনি। তারপর এলেন মাইকেল, বঙ্কিম, ভূদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, ইংরেজের হাতে পরাধীন থেকেও মেরুদণ্ড সোজা করে বাঙ্গালী উঠল দাঁড়িয়ে। তুই জানিস, আমরা যখন ছাত্র ছিলুম, তখন আমরা প্রত্যেকেই গীতা পাঠ করতুম, গীতার শ্লোক এবং ব্যাখ্যা আমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু এবার দেখছি, বাঙ্গালী আবার ডুববে। আবার যেন ফিরে আসছে খাজুরাহো কোনারকের যুগ। বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও সমাজজীবনে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। এটা শুধু আর্থিক নয়, মানসিক এবং নৈতিক অবনতির জন্যও বটে, না হলে বাঙ্গালীর মেয়েগুলো মিলিটারীতে চাকরী নিয়ে খোলা লরীর ওপোর লাল মুখো গোরাদের সঙ্গে যেভাবে কলকাতার রাস্তা দিয়ে দিনের বেলা যায় এবং অন্য সব মেয়েরা যেভাবে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে তারিফ করে, তাতে মনে হয় দেশের গোটা নারীসমাজ তলিয়ে যেতে আর বেশী দেরী নেই। সেই সঙ্গে ডুববে গোটা দেশ।

সরোজ চুপ করে গেল।

আর একদিন সরোজ বল্লে, মানুষ বলে কিছু আর নেই রে। আছে শুধু টাকা। টাকার জন্য যে কোন মানুষকে দিয়ে যে কোন কাজ করানো যায়। আমার ঐ ছেলেটাকেই দেখ না, বুঝতে পারবি। তুই জানিস, মিলিটারীতে ও এখন গোমাংস যোগান দিতে সুরু করেছে !

সে কি বাবা ? এ আপনি শুনলেন কোথায় ? এসব নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা।

ঘাড় নেড়ে সরোজ বলেছিল, মিথ্যে নয় রে, মিথ্যে নয়। খাটি সত্যি। সব খবরই কানে আসে। সার্বর্ণ গোত্রীয় অমর গঙ্গোপাধ্যায় নিজে গোয়ালাদের খাটালে খাটালে ঘুরে ভাল গরু বাছাই করে কিনে সেই গরু কাটিয়ে সেই মাংস মিলিটারীকে যোগান দেয় টাকার জন্য। দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ সেদিনের অপরাধে রেণুর সামনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

অমু এখন প্রায়শঃই ও বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে। রাত্রে নিয়মিত ভাবে, সকালে কোন দিন এবাড়ীতে রেণুর কাছে, কোনদিন বা ও বাড়ীতে। অনেক রাত পর্যন্ত ও বাড়ীতে আলো জেলে কাজ হয়। টাইপের খট্‌খট্ শব্দ রেণুরা শুনতে পায়, লোকজনের আসা যাওয়া সন্ধ্যের পর থেকে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত চলে। কর্মচারীর মধ্যে ও বাড়ীর দোতলায় একভদ্রলোক সস্ত্রীক শ্যালীকে নিয়ে বাস করেন, নীচে এক ছোকরা একা থাকে, আর একখানা ঘরে ড্রাইভার, চাকর, ঠাকুর প্রায় তিন চারজন লোক থাকে। একজন দারোয়ান পিছনের গুদামে থাকে। ওবাড়ীর দোতলার সামনের ঘরে অমুর খাট পাতা আছে; বেশীর ভাগ রাত্রে সে ওখানেই থাকে, মাঝে মাঝে কোথায় যায় রেণু তা টের পায় না। কিন্তু এবাড়ীতে তার ঘরখানা নিয়মিতভাবেই খালি থাকে।

ওর অফিসের সেই মেয়েটা রোজই সন্ধ্যের পর ও বাড়ীতে আসে। নীচের অফিস ঘরে বসে কাজ করে, রাত্রে ওপোরের ঘরে বসে কথা কইতেও রেণু দেখেছে। কখন সে চলে যায় তা রেণু দেখতেই পায় না, দেখার কোন আগ্রহই তার নেই। যে ভদ্রলোক সস্ত্রীক শ্যালীকে নিয়ে বাস করেন সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং শ্যালিকা দুজনেই বোধহয় কোথাও কোন কাজ করে, কারণ তারা নিয়মিত-ভাবে সাজগোজ করে বেরোয়, বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরে। মাঝে মাঝে নতুন নতুন লোকও সব আসে কোন কোন দিন গান বাজনাও হয়। সেই সব দিনে খাওয়া দাওয়ার ধুম পড়ে যায়, কিন্তু একটা বিষয় রেণু এবং পাড়ার সকলেই লক্ষ্য করে যে, ও বাড়ীর কোন লোক পাড়ার কারুর সঙ্গে

মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত করে না। এমন কি চাকর বা দারোয়ানকে পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা কোন উত্তর দেয় না, বলে জানি না। ও বাড়ীর ভাবগতিক দেখে সরোজ নিয়মিতভাবে ওর ঘরের ওদিকের তিনটে জানলাই চেপে বন্ধ করে রেখেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবারও খোলে না। সেদিন বলেই বসল, মিস্ত্রী ডাকিয়ে জানলাগুলো খুলে ইট গাঁথিয়ে দেব।

পুজোর ছুটিতে অলক ও বউমা ছেলে নিয়ে এসে হাজির, সঙ্গে অপু ও তার বাচ্চা মেয়ে। জামাই কর্ম্মস্থল ছাড়ার হুকুম পায় নি, তাই অলক সেখানে গিয়ে অপুকে এক সপ্তাহের জন্য বাবার কাছে এনেছে। বেচারী অপু অনেকদিন বাপের কাছে আসতে পায়নি।

অপু ও তার বউদি অমুকে নিয়ে পড়ল, এবার বিয়ে কর।

অমু প্রথমে আপত্তি করেছিল, বলেছিল, সময় নেই। কিন্তু শেষে অপুর পীড়াপিড়ীতে বল্লে, পঁচিশ হাজার টাকা নগদ পেলে বিয়ে করতে রাজী আছি।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই অপু নিদারুণ বিরক্ত হয়ে পড়ল বল্লে, তোমরা কাছে থেকেও অমুলাকে এমনইভাবে গোল্লায় যেতে দিলে!

পুজোর সপ্তমীতে সমর এল বউ নিয়ে। বাড়ী গুলজার সকলকে শোবার জায়গা দেওয়াই মুস্কিল, তারপর রেশনের চাল। সেও এক বিভ্রাট!

চালের কথা শোনামাত্রই অমু এক বস্তা ভাল মিহি চাল আনিয়ে দিলে। রেশনের আমলে এক বস্তা মিহি চাল এল, নিরুপায় সরোজ গুম্ হয়ে গেল। সব বুঝেও সে যেন কিছুই বুঝল না।

অমু তার নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাতে ছাড়ে নি। গাড়ী চাওয়া মাত্রই অমু একখানা বড় গাড়ী ড্রাইভার সমেত হাজির করিয়ে দিলে। বল্লে, যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও, তেলের টানাটানি করতে হবে না।

এর পর একদিন বোন, বউদি ও বাচ্ছাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে ওদের সকলের জামা কাপড় আনলে প্রায় তিন শো টাকার মত। বাবা ও দাদার ধুতিও কিনেছিল, সমর ও বউয়ের কাপড়, কেবল রেণুর কথা বোধ হয় ওর মনে ছিল না!

পূজার দ্বাদশীতে অপুর দেওর অপুকে নিয়ে গেল। দুদিন অপুকে নিজেদের বাড়ীতে রেখে দাদার কর্ম্মস্থলে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েই গেল সে। সমরও বউ নিয়ে চলে গেল। সমর বোধ হয় আরও কিছুদিন থাকবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু বেণুই তাকে তেমন আমোল দিলে না। সুবিধে পেলেই সে কতটাকা বাড়ীভাড়া, রেণুর হাতে জমেছে কত, দলিলপত্র কোথায় আছে এই সব প্রশ্নে রেণুকে বিরক্ত করত, এমন কি রেণুর ভয় হোলো, সে হয়ত' ওর বাক্স থেকে দলিলখানা চুরি করতেও পারে। ওরকম ছেলে মানে-মানে বিদেয় হলেই বাঁচি! অন্যদিক দিয়ে সমরও খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অমর ওর বউকে যত্ন করে ভাল কাপড় একখানা দিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের কারবারের ব্যাপারে সমুকে কোন আমলই দিলে না। সমরের এমনও ইচ্ছে ছিল যে, কোর্টের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সে অমরের সঙ্গেই কাজ করে, কিন্তু অমর সে কথায় কানই দিলে না। বেচারী সমর কোন দিক দিয়েই সুবিধে করতে পারলে না, এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছেও নয়। স্ত্রীকে বলেছিল, এখন দেখছ ত, বাড়ীখানা কত সুন্দর হয়েছে?

ঠোঁট উল্টে স্ত্রী বলেছিল, বেল পাকলে কাকের কি? তুমি ত যে ঘরজামাই সেই ঘরজামাই-ই।

চটে উঠে সমর বলেছিল, ঘরজামাই ঘরজামাই কোরো না, সমস্ত খরচ আমি দিই-না?

তাচ্ছিল্য সহকারে স্ত্রী বলেছিল, খরচ কে দেয় তা আর কে দেখছে। লোকে বাস করে কোথায় সেইটেই সবাই দেখতে পায়।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে সমু তার স্ত্রীকে বল্লে সারাদিনে কত মটর চড়া হোল বল ত?

স্ত্রী বল্লে, তবু যদি নিজের গাড়ী হোত! মায়ের মনিবের ছেলের গাড়ী নিয়ে আর জাঁক দেখাতে এস না।

সমু চেপে গেল।

তবুও হয়ত বউ নিয়ে জোর করে দেওয়ানী আদালতের ছুটীর শেষপর্যন্ত সমু তার মায়ের কাছেই থেকে যেত, কিন্তু থাকতে পারলে না বউ-এরই জন্য। যে-বউ স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করে, সেই বউই অমরের সঙ্গে হেসে

হেসে মিষ্টি করে আবদারের স্বরে অক্লান্তভাবে গল্প করে। অমু যে বিশেষ আমল দেয় তা মনে হয় না, কিন্তু বউ নাছোড়বান্দা। সমুকে শুনিয়ে শুনিয়ে অমুকে অনুরোধ করে সিনেমা দেখবার জন্য। অমুও নিমরাজী হয়। সমুর সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে।

অমুর দেওয়া কাপড়খানা পরে আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে নিজেকেই নিজে দেখছিল। সমু হঠাৎ বলে ফেল্লে, বেশ মানিয়েছে।

বউ বলে, থামো, আর টিপ্পনী কাটতে হবে না। নিজের মুরোদ ত এমন একটা কাপড় দেবার ক্ষমতা হয়নি।

সমুর বউকে নিজের পছন্দমত দাঁড় করিয়ে অমু ক্যামেরায় নিজে হাতে ফটো তুল্লে। সমু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে অমুকে অভিসম্পাত করছিল, কিন্তু পয়সার দোষে অমু হয়েছে বেপরোয়া এবং সমুর বউ সমুকে গ্রাহ্যই করে না, কাজেই ফটো তোলায় কোন বাধাই সমু দিতে পারে নি।

ফটো তোলার পর বউ অমুর কাছে গিয়ে বল্লে, শুধু ফটো তুল্লেই হবে না, আমাকেও ফটো তোলা শিখিয়ে দিতে হবে, আর সেই সঙ্গে ক্যামেরাটাও আমার চাই, আমার ত ক্যামেরা নেই।

এক গাল হেসে অমু বলেছিল, তথাস্তু। ফটো তোলা শিখতে তোমার লাগবে এই ধর দুদিন, কিম্বা তিনদিন, আর ক্যামেরা—তা তুমি এটাও নিতে পার, অথবা —। মানে আমার অনেকগুলো আছে, যেটা খুসি নিতে পার।

সেইদিনই সব লোভ সংবরণ করে সমু তার মাকে বলেছিল, আগামীকাল সকালের ট্রেণেই কেষ্টনগর যাব, অনেক কাজ আছে সেখানে।

রেণুও তাই চাইছিল। ওর যাবার কথায় কোন প্রতিবাদ করেনি।

গজ্ গজ্ করতে করতে বউ সমুর সঙ্গে যেতে বাধ্য হোল। তবুও যাবার আগে সে ছুটে গেল ও বাড়ীতে, অমুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দেখা হোল না। দোতলার ঘরের কর্ম্মচারীটি বল্লে, বাবু ঘুমাচ্ছেন, দরজা বন্ধ, পরে আসবেন।

বউ নাছোড়বান্দা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে অমুকে না তুলে ছাড়বে না।

কর্ম্মচারী ভদ্রলোক নিতান্ত কড়া মেজাজের। অভদ্রভাবে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার এত গরজ কেন কে জানে? মোটের ওপোর অমুর সঙ্গে বউয়ের বিদায়কালীন দেখাটা মুলতুবী রইল। সেজন্য সে অনেকখানি ঝাল ঝাড়লে স্বামীর ওপোর, কিন্তু যেতে তাকে হোলই। ছেলে বউকে বিদায় দিয়ে রেণু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। হঠাৎ কি মনে করে দৌড়ে গিয়ে নিজের বাক্স খুলে দেখেছিল। কাগজপত্র পাশবই যথাস্থানে সমস্তই ঠিক আছে দেখে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

অলক বল্লে, দিদি, অমুটার জন্য কি করা যায় বলত? ওর চালচাল মোটেই ভাল বলে মনে হচ্চে না।

রেণু বল্লে, আমি কি বলব? বাবাকে বল।

না, বাবাকে কিছুই বলব না। বাবার বয়স হয়েছে। এ বয়সে দুশ্চিন্তা, মন খারাপ এ সমস্ত হলে অন্য দিক দিয়ে বিপদ হতে কতক্ষণ।

রেণু বল্লে—ব্যবসা ব্যবসা করে ও উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। বড় একটা দেখাই ওর পাই না, তা কি বলব বল।

অলক বল্লে, বাবাকে টাকাকড়ি কিছু দেয়? না বাবা আবার ছেলেদের টাকা ত কিছুই নেবে না।

রেণু বল্লে, না, বাবা তোমাদের টাকা নেবেন না জানি, কিন্তু ওকে বলেছিলেন, ঐ বাড়ীটার ভাড়ার দরুণ ওর অফিস থেকে মাসিক একশ' টাকা হিসেবে দেবার জন্য। ও দিতে রাজী হয়ে গোটা বাড়ীটা ভাড়াও করেছিল কিন্তু শুনলুম, এক পয়সাও নাকি দেয় নি।

তাই নাকি? আচ্ছা বেয়াড়া হয়েছে ত? এদিকে ত শুনছি নেশাভাঙ্ করতে খুব ওস্তাদ হয়েছে।

রেণু চুপ করে রইল।

অলক বললে, আচ্ছা দিদি, ও বাড়ীতে ঐ যে ভদ্রলোক দোতলায় থাকে, ওর স্ত্রী আর শালী বলে যে দু'জন মহিলা থাকেন ওদের সম্বন্ধে কিছু জান?

প্রশ্নের ধরণে রেণু বিস্ময়বোধ করেছিল। মুখে বলেছিল, না ত, ওদের সম্বন্ধে নতুন করে জানার কি আছে?

অলক বললে, মহিলাটি ভদ্রলোকের বিবাহিত স্ত্রী নয়, এবং শ্যালিকাটিও মহিলার ভগ্নী নয়।

বলিস্ কি রে অলক, রেণু চোখ কপালে তুল্লে।

অলক বলেছিল, বাবাকে কিছু বোলো না, কিন্তু এর চিকিৎসা কি জানো,—পাড়ার ছেলেদের বলে বেশ ঘা-কতক প্রহার দিয়ে ওদের পাড়া ছাড়া করলেই তবে ওরা শায়েস্তা হয়।

রেণু বললে, যাক্ গে যাক্, যার যা খুশি হয় করুক গে, আমার কি?

তুমি বলতে পারলে দিদি? এমন ধারা কথা তুমি বলতে পারলে? অলক ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল। তুমি-না মায়ের মত অমুকে মানুষ করেছ?

রেণু বললে, ওরা খারাপ তাতে অমুর কি?

অলক বললে, এটুকুও বুঝলে না দিদি। ঐ শালী বলে পরিচিত মেয়েটাকে দিয়ে ঐ লোকটা অমুকে দু'হাতে দুয়ে নিচ্ছে। আমি এই ক'দিনে যা দেখলুম, অমির স্বভাব মোটেই ভাল নয়, অথচ বিয়ের নামে ঐ যে মোটা টাকা ও দাবী করছে, এও কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের শিক্ষায়, এটা মনে রেখ। ও লোকটা কে ঠিক বুঝতে পারছি-না, কিন্তু লোকটা খুব বড় গোছের জোচ্চোর বলেই মনে হয়।

অলক এত সব কথা বলেছিল বটে কিন্তু প্রতিকার সে কিছুই করতে পারে নি। এমন কি ভাড়ার টাকাটাও আদায় করতে পারে নি। পূজার ছুটী ফুরিয়ে যেতে অলক সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে চলে গেল।

কিন্তু পৌষ মাসেই অলককে দৌড়ে আসতে হোল, চেৎলার টেলিগ্রাম পেয়ে, 'বাবা অসুস্থ, শীঘ্র এসো'।

টেলিগ্রাম পাবার পর ছুটীর বন্দোবস্ত করে বেরুতে অলকের একদিন মাত্র দেরী হয়েছিল। এল বটে, কিন্তু বাবার সঙ্গে দেখা তার হয় নি।

একে একে সকলেই এসেছিল। অপু এবং জামাই, সমু ও তার শাশুড়ী, অলকের পিসিমা, পিসতুত ভাই কেষ্ট, বড় এবং মেজ মামা, এক মাসিমা, এবাড়ী এবং অমুর বাড়ী দুটো বাড়ীই ভর্ত্তি হয়ে গেল।

প্রথম দুটো দিন কান্নাকাটির ভেতর দিয়েই কাটল। কেঁদেছিল সবাই, কেবল রেণু ছাড়া। এতে পিসিমা খোলাখুলিই বলেছিল যে, কাঁদবে কেন, ওরই ত পোয়া-বারো! যা গুছিয়ে নেবার নিয়েছে, এখন বুড়ো মড়া গেছে, না ওর গায়ে বাতাস লেগেছে। সব গুছিয়ে নিয়ে ছেলের কাছে গিয়ে উঠবে।

এসব শুনেও রেণু নীরব ছিল। তিনতলার ঘরটিতে যেখানে পদিশূন্য খাটের মাঝখানে গঙ্গাজলের একটি কলসী ছিল, সেখানে সেই খাটের পাশে মেঝেয় একটি কম্বল পেতে আর একটি কম্বল গায়ে দিয়ে এই দারুণ পৌষমাসের শীতে একা একাই রেণুর কেটে গেছে দু'দুটো দিন। সংসারের কোন কাজেই ও হাত দেয় নি। অমুর ঠাকুর চাকরই এ বাড়ীর সব কিছু করেছিল।

রেণুর খাওয়া সম্বন্ধে অলকই প্রথম খোঁজ নিলে। কেউ কোন উত্তরই দিতে পারে নি।

অলক এ ঘরে এসে অনেক চেষ্টা ও বকাবকির কোরে দিদিকে স্নান করতে পাঠালে। স্ত্রীকে দিয়ে দুধ, ফল, মিষ্টি আনিয়ে জোর করে রেণুকে খাওয়ালে, যে-কাজটা এমন কি সমরেরও মনে পড়ে নি। সে দিন সকালে অলক আসার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই সমর তার শাশুড়ীকে নিয়ে এ বাড়ীতে এসেছিল। সমরের বউ আসে নি, কারণ তার তখন বেলে চড়ার অবস্থা ছিল না।

সমর ছিল নিতান্ত কেঁদো-লোক। মায়ের তুচ্ছ খাওয়া নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে রেণুর কাছে নানাভাবে টাকা পয়সার খবর নিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রেণু সে সব কথার কোন উত্তরই দেয় নি, যেমন অমুকেও সে বাবার আর্থিক সংবাদ কিছুই দেয় নি। শ্মশানের কাজ সেরে এসেই অমু রেণুর কাছে বাবার বাক্সের চাবি চেয়েছিল। বাবার কোথায় কি আছে সমস্তই বার করে দেবার জন্য রেণুর উপর জেদ করেছিল। রেণু অমুকে কিছুই দেয় নি, বলেছিল, অলক, অপু আসুক, সকলের সামনে বাবার যা আছে সমস্ত একসঙ্গে বার করব।

এতে অমর তাকে যে খুব সহজে ছেড়েছিল তা নয়। অমরের বাড়ীর সেই ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং শালীকে নিয়ে রেণুর কাছে এসে অনেক অনুনয় করে শেষে যখন ভয় দেখিয়ে এমন কি জোর খাটাবার উপক্রম করেছিল, তখন রেণু বেশ কড়া ভাবেই ওদের প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল যে প্রাণ গেলেও সে কিছু বার করতে পারবে না, উল্টে চিৎকার করে পাড়ার সকলকে ডেকে এর ব্যবস্থা করবে।

রেণুর কড়া মেজাজে অমর সেদিন নিরস্ত হয়েছিল।

আজ বিকেলে ফল, দুধ খেয়ে ধরা গলায় রেণুই

বলেছিল, অলক, তুমি অমূকে আর অপুকে ডাক, বাবার বাক্সের চাবি সব আমার কাছেই আছে, এক সঙ্গে খুলে দেখ, কি আছে, কি নেই, যা করবার হয় তোমরা কর।

অলোক বলেছিল, এখন থাক দিদি, পরে হবে।

বেণু জিদ্ করে বলেছিল, পরে নয় অলক, এখনই তোমরা বোসো, নইলে আমি যে রেহাই পাচ্ছি না।

ডেকে পাঠানোমাত্রই অমু এল দৌড়ে, সমরেরও দেরী সইছিল না। অলক বল্লে, ঠিক আছে, তাহলে এখন সবাই মিলে দেখে নাও, কিন্তু জিনিষপত্র দিদির কাছে যেমন আছে, দেখার পর ঠিক তেমনইভাবে দিদির কাছেই থাকবে।

একমাত্র সমু ছাড়া এ কথায় আর কেউ সায় দেয়নি।

বাক্স খুলে বেরুল ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের পাশ বই, রেণুর পাশ বইও বেরুল। আর বেরুল দুখানা দলিল, একখানা সরোজের একখানা রেণুর এবং মোটা খামের মধ্যে সরোজের সই করা উইল।

অমু হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সমর পাশ বইগুলো তাড়াতাড়ি ওল্টাতে লাগল। অলক নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। অপু চোখে আঁচল চাপা দিলে। পিসিমা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ওরে আমার সরোজ রে, তুই কোথায় গেলিরে—। বেণু মাকে ধমকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগল।

দেখা গেল, সরোজের ব্যাঙ্কের পাশ বই সরোজ ও রেণু দুজনের নামে, দুজনের মধ্যে যে কেউ অথবা একজনের মৃত্যু হলে অপর জনে তুলতে পারবে। টাকা ছিল প্রায় দেড় হাজারের মত। পোস্ট অফিসের বইয়ে সামান্যই ছিল, এবশ'র মত। রেণুর পাস বইয়েও ছিল হাজার দেড়েক টাকা সেটা রেণুর একার নামে। সমু পাশবইটা দেখে হাতেই রেখে দিলে।

উইলের খাম খুলে একটা চিঠি বেরুল, বাংলাভাষায় লেখা। তাতে সরোজ লিখছে ব্যাঙ্কের টাকা রেণু তুলে সরোজের শ্রাদ্ধাদি যাতে করতে পারে সেইজন্যই দু'নামে বইটা করা হয়েছে। তারপর নানাকথা। উইল-মত কাজ কোরো, রেণুর বাড়ীর দেখাশুনা কোরো, তার সম্পত্তি এবং টাকা যেন কেউ ঠকিয়ে না নেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। মজা এই যে, চিঠিটা কাউকে সম্বোধন করে লেখা হয়নি। উইলের এক্সিকিউটার ছিল অলক এবং জামাই, এক্সিকিউটার হিসাবে অমুর নাম ছিল না।

সমস্ত কাগজ দেখে অলক ব'ল্ল, ঠিক আছে দিদি, তুমি এগুলো যেমন ছিল তেমনইভাবে রেখে চাবি দিয়ে চাবি তোমার কাছে রাখ, কাল যা হয় করা যাবে।

সমু কিন্তু রেণুর পাশ বই এবং দলিলখানা হাতের মধ্যেই রেখেছে। অমুর হাতে বাবার পাশবই ও উইল।

অলক বল্লে, দেরে, ওসব দিদিকে দিয়ে দে।

অমু বল্লে, পাশবইটা ত কালই দরকার হবে। টাকা তুলতে হবে ত!

যখন দরকার হবে তখন দিদির কাছ থেকে নেওয়া যাবে। দিদি ত পালাচ্ছে না। অলক ওর হাত থেকে ওগুলো একরকম জোর করেই নিয়ে সমুকে বল্লে, কইরে সমু, ওগুলো দে।

সমু ব'ল্ল, এসব ত মায়ের জিনিষ—

মায়ের জিনিষ মাকে দিয়ে দে, অলক হাত বাড়িয়ে ওগুলো নিতে গেল।

সমু হাত সরিয়ে বল্লে, মায়ের জিনিষ আলাদা থাকবে, দাদুর জিনিষের সঙ্গে—

একসঙ্গেই থাকবে, যেমন এতকাল ছিল, অলক নির্দেশ দিলে।

সমুর শাশুড়ী ফোঁস করে উঠল। এ তোমার কিরকম বিচার বাবা? এতকাল তিনি ছিলেন, যা হয়েছে হয়েছে। এখন যখন সকলে সকলেরটা বুঝে নিচ্ছে—

অলক রেণুর মুখের দিকে চাইলে। সে মুখে কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অলক সমরের দিকে চেয়ে বল্লে, বাবার চিঠিতে নির্দেশ আছে, দিদির সম্পত্তি বা টাকা কেউ যেন ঠকিয়ে না নেয়, বাবার কথা আমরা নিশ্চয়েই অমান্য করব না। ওগুলো দিদির কাছে অবশ্যই থাকবে।

সমুর শাশুড়ী বল্লে, ওমা, ছেলের কথা শোন একবার। বেয়ান আর বেয়ানের ছেলে কি আলাদা নাকি?

অলক বল্লে, নয়ই ত। সেইজন্যই ত বলছি ওগুলো দিদির কাছেই থাক, তাহলে সমুরই রইল।

ঢোক গিলে শাশুড়ী বল্লে, সেটা ঠিক, তবে কিনা শোবাতাপা মানুষ, কোথায় ফেলবে, তাই ওর ছেলের কাছেই রাখা ভালো। বাবা সমর, ওগুলো তুমিই যত্ন করে রেখে দাও।

অলক ছোঁ মেরে সমুর হাত থেকে দলিল ও পাশ বই কেড়ে নিয়ে ধমকের সুরে বল্লে, শোকাতাপা মানুষ যদি আমাদেরগুলো রাখতে পারে তাহলে নিজেরগুলোও রাখতে পারবে। ওর ধমকে সকলেই চুপ হয়ে গেল।

অলক নিজে সমস্ত কাগজ হাতে নিয়ে রেণুকে বল্লে, দিদি, যেখানে যেমন ছিল সব ঠিক করে রেখে চাবি তুমি নিজের কাছে রাখবে, আর এই ঘরেই যদি থাক, তাহলে শোবার সময় ঘরে দরজা বন্ধ করে শোবে। এ চাবি তুমি একমিনিটের জন্যও কাউকে দেবে না।

শূন্য দৃষ্টি নিয়ে রেণু উদাসীর মত বসেছিল। যে বড় বাক্স থেকে ওগুলো বেরিয়েছিল, অলক নিজে হাতে সেই বাক্সে ওগুলো রেখে তালা বন্ধ করে চাবিটা রেণুর হাতে দিয়ে দিলে।

পিসিমা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, একটি কথাও বলেনি। এবার বল্লে, হ্যাঁরে, কাগজই সব বেরুল, কিন্তু নগদ টাকা, গয়নাপত্র? সরলার গয়না ত অনেক ছিল।

অলক বল্লে, বাবার কাছে নগদ টাকা বিশেষ কিছুই থাকত না। আর গয়না বাবা বাড়ী করার সময় সমস্ত বেচে দিয়েছিলেন আমি জানি।

রেণু এবার মুখ তুলে বল্লে, না ভাই অলক, বলতে ভুলে গেছি, তোমার মায়ের একজোড়া বালা বাবা আমার কাছে দিয়ে বলেছিলেন, অমুর বউকে দিতে। বাকী গয়না তিনি সমস্তই বিক্রী করেছিলেন।

আর—আর দুই বউকে, মেয়েকে? সমুর শাশুড়ী প্রশ্ন করেছিল।

রেণু বেয়ানের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে ধরে আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, ওদের বিয়ের সময় তিনি নিজের হাতে যাকে যা দেবার সমস্তই দিয়ে গেছেন।

বোন, ভাগ্নে এদের কিছুই দেয় নি, এইকথাই তুমি বলতে চাও, পিসিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

রেণু ধীর ভাবে বল্লে, জানি না, যা দেবার যা করবার সমস্তই লিখে গেছেন ঐ কাগজে।

রেণুর মনে পড়ল সরোজের কথা, আমার অবর্তমানে আমার লেখা কাগজ ছাড়া তোর কোন বন্ধু আর থাকবে না রে।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কিভাবে হবে সেই আলোচনায় বসে অলক বল্লে, বাবা জীবদ্দশায় আমাদের উপার্জনের একটা পয়সাও নেন নি। আমার ইচ্ছে শ্রাদ্ধের খরচ আমাদের টাকায় হবে।

অমর বল্লে, তাতে বাবার তৃপ্তি হবে না। তিনি জীবদ্দশায় নেন নি, শ্রাদ্ধেও যাতে না নিতে হয় সেইজন্য দিদির সঙ্গে একত্র নাম দিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন, চিঠিতে লিখেও গেছেন সেই কথা।

অলক বল্লে, শ্রাদ্ধে কত খরচ করতে চাস্, কি আন্দাজ তোর?

হাজার, বারোশ', অমু উত্তর দিলে।

ঠিক আছে, ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ঐ টাকাই খরচ করা হবে, কিন্তু সে ছাড়া তুমি দেবে বারোশ' আর আমি দেব বারোশ' এই চব্বিশশো বা আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বাবার নামে ধর হাসপাতালে একটা বেড্ করে দিতে, তুমি রাজী আছ কি? কিম্বা অন্য কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে—

অমু বল্লে, সে,—সেটা পরের কথা।

অলক বল্লে, পরের কথা নয়, এখনই।

অমু বল্লে, ঠিক আছে। তাই দেব। ভেবে চিন্তে যা ভাল হয় তাই করা যাবে।

পরদিনই অপুর্ব চতুর্থী হয়ে গেল। এগার দিনে শ্রাদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত বাবার ব্যাঙ্কের টাকা রেণুর সই দিয়ে তুলে সেই টাকাতেই কাজ হোল। কিন্তু দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিছুই দেওয়া হয়নি। অমু কিছুতেই রাজী হোল না। অপু ও জামাই নিয়মভঙ্গের দিন বিকালেই চলে গেল। উইল সম্বন্ধে করণীয় সব কিছুই জামাই অলককে ভার দিয়ে গেল।

সমু ও তার শাশুড়ী রেণুকে চেপে ধরলে, বাড়ীর দোতলা তিনতালাটা ভাড়া দিয়ে কেষ্টনগরে যাবার জন্য। আগ্রহ দেখিয়ে অমু বলেছিল, সেই ভাল, আমার অফিসের জন্য আরও কিছু জায়গা দরকার, আমিই ভাড়া নিয়ে নেব।

সকলের সব কিছু উপেক্ষা করে অলক ওদের সকলের সামনেই রেণুকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি ইচ্ছে দিদি? কোথায় থাকতে চাও তুমি?

রেণু কোন উত্তর দেয় নি।

অলক বল্লে, শোন, আমার মনে হয় কোন এক জায়গায় তুমি বাধা হয়ে থাকতে পারবে না। তাই বলি, এবাড়ীর

দোতলাটা তুমি ভাড়া দিয়ে দাও, তিনতালার ঘরখানা তোমার নিজের জন্য রাখো। একতালা দোতলায় ধর একশ টাকার মত ভাড়া পাবে, ট্যাক্স বাদ দিয়ে আশী পঁচাশি টাকা তোমার থাকবে। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিসেও দেখছি তোমার প্রায় দু'হাজার টাকার মত আছে। এতে তোমার বেশ চলে যাবে। তুমি এখানেই থাকবে, তবে যখন খুসি হবে, কিছুদিন সমুর কাছে কিছুদিন আমার কাছে কিছুদিন বা কোন তীর্থে গিয়ে, এইভাবে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে—

রেণু মুখ তুলে চেয়েছিল। কথাগুলো কে বলছে, অলক? না ওর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল সরোজের নির্দেশ! সে চুপ করেই রইল।

পিসিমা গায়ে পড়ে বল্লে, এখানে নিছক একলা কি কি করে থাকবে ও? সমুও শ্বশুরবাড়ী থাকে, সেখানে রেণুর বারো মাস থাকা চলে না, তুমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও, তোমার কাছেও ওর পোষাবে না। সব চেয়ে ভাল, ও আমার কাছে থাকবে। আমার কোন বঞ্ঝাট নেই। অত বড় বাড়ী, প্রায় খালিই বলতে হয়, উনিত এখন ঘরে বসে আছেন, তীর্থে যেতে ইচ্ছে হলে আমরাই ওকে নিয়ে যাব। কি গো রেণু, এইটেই ভাল হবে না? বাড়ী-ঘর, পুকুর বাগান বেশ হাত পা ছড়িয়েই থাকতে পারবে। কি বল?

রেণু একথারও কোন উত্তর দেয় নি।

সমুর শাশুড়ী বল্লে, না বাপু, এ আমি ভাল বুঝছি না। কেউ যখন ছিল না, তখন যেখানে খুশি থেকেছে, যা খুসি করেছে, কি করেছে না করেছে কেউ তা জানতেও চাইছে না, কিন্তু এখন যখন পেটের ছেলে রয়েছে, যা হোক দুপয়সা রোজগার করেছে, আজ বাদে কাল নাতি-নাত্নী হবে তখন কি আর এর-দোর ওর-দোরে ঘুরে বেড়ান ভাল দেখায়। তীর্থে যাবার ইচ্ছে হয়, আমারও নিয়ে যেতে পারি, উনিও ত শিগ্গির রিটায়ার হবেন। কি গো বেয়ান, তোমার ইচ্ছেটা কি তা মুখ ফুটে বলেই ফেল না।

রেণু নিরুত্তর।

অলক বল্লে, দিদি?

রেণু মুখ তুলে চেয়েছিল।

অলক বল্লে, আমি আর ধর হপ্তাখানেক থাকতে পারি। এর মধ্যে ভেবে চিন্তে যা হয় বোলো। রেণু ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, ভাবব আর কি ভাই, তুমি যা বলেছ তাই করে দাও।

তাহলে আমার কাছে যাবে না, সমু ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

মাকে আর জ্বালাস্ নি রে, অলক সমুকে কথাগুলো বলেই উঠে দাঁড়াল।

চিরকাল পর নিয়েই যার সংসার,—গজ্গজ্ করতে লাগল সমুর শ্বাশুড়ী।

অলকের বন্ধু, আলিপুর কোর্টের এক মুন্সেফ সরোজের শ্রাদ্ধে এসে কথায় কথায় বলেছিল, কোর্টের কাছাকাছি বাড়ী পেলে সুবিধে হয়। সে থাকত, পাইকপাড়ায় সেখানে থাকে আলিপুর কোর্টে আসা তার পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। অলক তার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলে। রেণুর দোতলাটা নিতে সে রাজী হয়ে গেল। ভাড়া দেবে ষাট টাকা।

অমু আর থাকতে পারলে না, ফেটে পড়ল। আপন ভাই থাকতে বাইরের লোককে ভাড়া দিলে, এটা তোমার কিরকম বিচার হোল দাদা?

অলকের কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ অনেকটা ওর বাবার মত। ধীর কণ্ঠে বলেছিল, দিদির ত অন্য কোন আয় নেই ভাই, ভাড়ার টাকাটা দিদির যে মাসে মাসে হাতে পাওয়া চাই।

কেন, আমি কি ভাড়া দিতে পারব না? অমু গর্জ্জে উঠল।

বাবাকে দাও নি ত, তাই ভয় হয়।

বাবা কি ছেলের কাছে কখনও ভাড়া নেয়? তাছাড়া ওটা ত আমারই বাড়ী। নিজের বাড়ীতে নিজে ভাড়া দেব কি?

অলক বল্লে, যাকগে, যাক, ও সব তর্কে আর দরকার নেই। এখন ত ভাড়া হয়েই গেছে। আবার যখন খালি হবে, তখন দেখা যাবে।

এমনি করেই আপন হয় পর, বলতে বলতে অমু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার পায়ের শব্দে ফুটে উঠেছিল ঘৃণা ও বিরক্তি!

তারপর আরও প্রায় ছ'মাস কেটে গিয়েছিল।

এরপর সমু বেশ কয়েকবার এসেছিল। সমুর ছেলে হয়েছে, স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ, ধার দেনা হয়ে গেছে, নানা কাঁদুনি গেয়ে রেণুর কাছ থেকে তিন-চার দফায় প্রায় ছশো টাকার মত বাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রেণু কিন্তু নাতি দেখার জন্য একবারও কেষ্টনগরে যায় নি।

এই ছ'মাসের মধ্যে কি জানি কেন, অমু ভীষণভাবে দিদি-ভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন একবার ত আসবেই, কোন কোন দিন দুবারও আসত। এটা ওটা কিনে আনা, যত্ন আত্তি করা। রেণু প্রথম প্রথম বিস্মিতই হয়েছিল। শেষে অমুই ওকে বলেছিল, তোমাকে 'দিদি' বলি তাই দিদি না হলে তুমিই ত আমাদের মা। বাবা যতদিন ছিলেন, ততদিন ঠিক বুঝিনি, এখন তোমার সত্যিকার দাম বুঝছি। সত্যি অনেক অন্যায় আমি করেছি। আমাকে ক্ষমা কোরো দিদি। রেণু বুঝলে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অমুর সুবুদ্ধি হচ্ছে। হবেই ত, সরোজের ছেলে, যতই কুসঙ্গে মিশুক, চিরদিন খারাপ থাকতে পারে না।

রেণু বলেছিল, এবার একটা বিয়ে করে সংসারী হ' অমু, আর কতদিন এভাবে কাটাবি ?

রেণুর কথায় সায় দিয়ে অমু বলেছিল, হ্যাঁ দিদি, তাই হবে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব।

রেণু বলেছিল, ভাল ঘর দেখে তাহ'লে একটি সুন্দরী মেয়ে আনি। এবার যেন দুই পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে বসিস্ নি। ভগবানের ইচ্ছেয় তোর ত অভাব কিছুই নেই।

অমু বলেছিল, না দিদি, এবার সব দিক গুছিয়ে নিতে হবে। কারবারও একটু গুটিয়ে নেব, কারণ লড়াই বোধ হয় আর বেশীদিন চলবে না। আর লড়াই থামলেই বাজার মন্দা হয়ে পড়বে।

সেই লড়াই সত্যিই থেমে গেল! আবার সেই আলো দেওয়া, বাজী পোড়ানো, আমোদ, আহ্লাদ—রেণুর মনে পড়ল, ঢাকায় প্রথম মহাযুদ্ধের জয় ঘোষণা, যখন অলক স্কুলের ছুটী পেয়েছিল আর অমু সমু হাঁটতে শিখেছিল। [ক্রমশঃ

খোদার বিচার

(কাব্যকাহিনী)

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

মোগলপাঠান আমল থেকে মস্ত বড় বোকাইনগর গ্রাম,
ময়মনসিং জেলার মাঝে বিখ্যাত এই নাম,
এইখানেতে একটা ছিল কেল্লা,
ছিল তাহার জলুস্ এবং জেল্লা,
জাহাঙ্গীরনগর থেকে আসতো বহুৎ সেনা,
জানে এসব কে না!
ভাঙা কেল্লার স্তূপ রয়েছে, আছে ভাঙা বুরুজ,
নমাজখানা, দর্গাহ্, গম্বুজ ;
আছেন পরবর্তীকালের আগ্ড়াতে এক বনমালী,
পঞ্চমুণ্ডীর আসনেতে প্রতিষ্ঠিত কালী ;
এইতো সেদিন দেখে এলাম জাগ্রত এই মাকে,
হিন্দু-মুসলমান সকলে মানৎ করে' বিপদকালে ডাকে।

সুবিস্তৃত গ্রাম কিনা তাই আছে অনেক টুলি—
মোগলটুলি, পাঠানটুলি,
আর সব নাম বেবাক্ গেছি ভুলি।'
এই গ্রামের এক জংলীপাড়ায় জাফর মিঞার বাড়ী,
সংসারও তার নয়কো তেমন ভারি,
একটা ছেলে একটা মেয়ে এবং রোগা জরু,
নাদুস্-নুদুস্ আর একটি দুগ্ধবতী গরু।
আধি-বর্গায় জমিন্ চাষ, কামলা খেটে খায়,
রোজ সকালে দুধ বেচ্তে গৌরীপুরে যায়,
পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ শুধু চায়
দীনের দুনিয়ায়।

যেইখানে যাক্ যেথায় থাকুক্ কামাই তাহার নাই,
পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়া চাই।

৩

খোদার দোয়ায় গরীব পেলো খুবসুরৎ এক মেয়ে,
চিকণ-চাকণ আস্‌মানীকে সবাই দেখে চেয়ে,
ঠোকর মার্‌তে অনেকে উৎসুক;
পাড়ার একটা মাতব্বরের ছেলে বাড়ায় মুখ!
ঠার-ঠোরেতে নানান্‌রকম ফন্দি-ফিকির করে'
মন ভুলিয়ে আন্‌লো তাকে ধরে',
গুম করে' ফের্ ফেল্‌লো দূরে যেয়ে মামুর বাড়ী!
খোঁজাখুঁজির চল্‌লো বাড়াবাড়ি।
রাষ্ট্র যখন হোলো চতুর্দিক,
বদমায়েসটা আসমানীকে বাড়ীর কাছে পৌঁছে'
দিলো ঠিক।

৪

আর কিছুতেই হায় মেয়েটা হোলো না সংযত!
জাফর সাদীর কোশিশ্ করে,
দুল্‌হা শুধু খুঁজেই মরে;
বর জোটে না তাদের মনের মতো।
বিত্তশালীর ছেলের ভয়ে সবাই সরে' পড়ে;
কাঙাল জাফর কেবল চিন্তা করে।
খলীল বাড়ীর খুব নিকটে জঙ্গলের মাঝখানে
ক্ষুদ্র একটা আম্র অসন্মানে,
সার্দ্ধ তিন হাত গর্ত রাতে রাখলো খনন করি';
সঙ্গোপনে কাটিয়ে বিভাবরী,
পরেরদিনের দুপুরবেলায় আসমানীকে নিয়ে,
ছল-কপটে গহন বনে কাঠ কাটতে গিয়ে,
খুব ত্বরন্ত গর্ত্তে তাকে ফেললো ধাক্কা মেরে,
ভূত ভবিষ্যৎ সকল চিন্তা ছেড়ে!
স্তূপাকৃতি মৃত্তিকাতে কোদাল দিয়ে গর্ত্ত ভরাট্ ক'রি'
লোক-দেখানো কবর রাখে গড়ি'!
আস্‌মানীকে জ্যান্ত কবর দিয়া
খলীল সদা চুপ করে' রয়, এম্‌নি কঠিন হিয়া!

৫

জাফর থানায় গেল অতঃপর,
হুলিয়া বাহির করতে হোলো একান্ত তৎপর।
তদন্ততে এক দারোগা খলীলকে খুব করলো সন্দেহ,
চালান্ দিতেই কাঁপলো সারা দেহ,
থানায় যেয়ে মারের চোটে হয়ে জরদ্গব
স্বীকার করলো সব!
সেথায় যেয়ে জেল্‌খানাতে করলো হাজত্‌বাস
পাঁচ ছয়টা মাস।

৬

ইতিমধ্যে জান্ খাঁ এলো আরেক মাতব্বর;
বুদ্ধি তাহার অত্যন্ত প্রখর।
আমার কাছে রাত্রে এলো বদ্ উপদেশ নিতে,
কসুর মোটেই হয়নি তাহা দিতে।—
"যা হবার তা হয়ে গেছে, খলীলটাকে বাঁচাও!
তাহার দিকে তোমরা সবে তাকাও!
আসমানীকে আর পাবে না ফিরে!
দায়রা-জজের কাছে যেন কয় সে ধীরে ধীরে,—
'মারের চোটে হুজুর, থানায় মিথ্যে বলেছিলাম!
মার বাঁচাতে সবাই চাহে ইনাম!
কেউ জানি না বোনের কোনো খবর!
হুজুর, আমি মার খেয়েছি জব্বর।'
দেখা-সাক্ষী নেই সুতরাং হচ্ছে না আর ফাঁসি,
শেখানো-সাক্ষীরা ভুল করবে রাশি রাশি,
হয় না তাতে মোটেই দ্বীপান্তর;
জেল যদি হয়, ঠিক তা হবে মাত্র দু-এক বছর।"
আর কিছু না বলি'
আদাব্ দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে জান্ খাঁ গেল চ'লি।'
সেসন্-জজের রায় শুনতে রইনু কৌতূহলী।

৭

আর ক'টা দিন বাদে এসে জান্ খাঁ হেসে কয়,—
"কত্তা, খলীল বাঁচ্যা গেছে, কাট্যা গেছে ভয়!
খোদার বিচার চাপ্‌লো ব্যাডার ঘাড়ে,
পাগল হইয়া এক্‌লা বইয়া কান্দে বারে বারে!
কয় সে ক্যাবল, 'আমার ফাঁসি চাই!
আর তো আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই!'"

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(২)

মানিলা ও সন্নিহিত অঞ্চল

গির্জের ভিড় আর গরম কাটিয়ে বাইরে এসে ধীরে ধীরে সমুদ্রের উপকূলের পথ ধরে হাঁটছি। যেমনি এক বহুতল বাড়ী তৈরি দেখতে থেমেছি একটা বে-ইস্ত্রি করা কোট গায়ে ছোকরা পকেট থেকে ছবি বের ক'রে দেখাবার ভঙ্গীতে খাটো গলায় বললো—'ঘোড়ায চড়া বিবসনা সুন্দরী দেখাবো।'

—কেটে পড়।

—চলুন দেখবেন। দেখে খুসী হবেন, বাজী রাখতে পারি।

—একটু ভুল করেছ। ছোকরা দেখে পাকড়াও কর।

বলে চলতে লাগলাম। এ চলার যেন থামা নেই। যেমনি এক জায়গায় রাস্তা পার হ'তে থেমেছি, অমনি কোথা থেকে রক্তবীজের মত বেরিয়ে এসে খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গোপনে বলে—ষোল সতেরো বছরের বেশী নয়। মাত্র পনেরো 'পেশো'। যদি আজ থাকতে না চাও, দেখে আসবে চলো। দেখে খুসী হবে। কাল আমি নিয়ে আসবো।

—কোথা থেকে ?

—আপনার হোটেল থেকে।

—সেটা কোথায় ?

আন্দাজী বলে বসল—কেন ? 'বে-ভিউ' হোটেল।

—ঠিক আন্দাজই করেছ। স'রে পড় এখন। বড় ভুল খদ্দের ধরেছ।

আদিম ব্যবসার দালালরা বড় হোটেলের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। মার্কিণ সৈন্য মজালোটা পর্যটকেরা এমনকি রাজনৈতিক নেতারাও তাদের বদ অভ্যাস চরিতার্থ ক'রে নেয় তাদের ব্যস্ততা ও ক্লান্তির অবকাশে।

পরেরদিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ টেলিফোন করলাম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তরে। আশ্চর্য! এত সকালে টেলিফোনের মেয়েটী সাড়া দিলেন। আমার বৃত্তান্ত শুনে ডাঃ রেইসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। অফিসে আসার পথের নিশানাও ব'লে দিলেন। হেঁটে সাত মিনিটের পথ—এক কিলোমিটারেরও কম। অতএব ট্যাক্সীর জন্যে অপেক্ষা না ক'রে পদব্রজেই চললাম। উপায়ই বা কি! মোট চোদ্দ ডলারেরও কিছু কম দৈনিক ভাতা। তার থেকে [illegible] বিছানা ভাড়া পঁয়ত্রিশ পেশো। [১৯ পেশোতে পাঁচ ডলার] অর্থাৎ দশ ডলার খালি। বাকী চার ডলারে অন্ততঃ তিনবার খাওয়া। তার ওপরে ট্যাক্সী ভাড়া যতদূর সম্ভব না করলে চলে, তা'না করাই ভালো। ফিলিপিনোয় যদি অর্থব্যয়ের এই হার তবে মার্কিন মুলুকে যে থই পাওয়া যাবেনা! অতএব হেঁটেই চললাম ইউনাইটেড নেশন এভিন্যুতে WHO অফিসে। পূর্বনির্দেশ মত প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যাপারের অধিকারী ডাঃ রেইসের সংগে দেখা করলাম। ভদ্রলোক ফিলিপিনো। তিনিই আরও কয়েকজন ভারতীয় ভদ্রলোকের সংগে WHO অফিসে সাক্ষাৎ করতে বললেন ও আমায় ফিলিপিনো রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার মহিলার সংগে দেখা করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এই অবসরে আমি দেখা করলাম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বাড়ীতেই কলকাতার ডাঃ বড়ুয়া ও ডাঃ রামকৃষ্ণনের সংগে। গত সপ্তাহ ভোর এখানে ছুটি থাকায় আগে থেকে নির্দিষ্ট স্থানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। তাই সোমবার আমার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জলসরবরাহ সম্বন্ধে উপদেষ্টা 'আরবুথনট' সাহেবের সংগে পরিচয় হ'ল। তিনি 'উলম্যান কমিটী' কলকাতায় আসার আগে 'কলিকাতা মহানগরী পরিকল্পনা পরিষদ' সংস্থাপনের আদি পর্বে টেকনিক্যাল কোঅপরেশন মিশনের হ'য়ে কিছু প্রস্তুতি কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার সারাদিন

সমাধি প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে—ম্যানিলা

কাটাবার ও পড়ার জন্য বসার জায়গা ঠিক ক'রে প্রচুর কাগজপত্র দিলেন। পরশু তিনি চলে যাবেন স্যানফ্রান্সিসকোয় তার ছেলের মৃতদেহের স্বস্তি ও শান্তি বাচনে যোগ দিতে। বেচারীর বড় দুর্ভাগ্য! একমাত্র ছেলে ভিয়েটনাম যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল মাত্র কয়েকমাস আগে। আজ আর সে নেই। একটি মেয়ে, ছেলের চেয়ে ছোট। ম্যানিলাতেই কাজ করে মেটকাফ্ এণ্ড এডীর হ'য়ে উড্রো উইলসন। তারও ছেলে গেছে ভিয়েটনাম যুদ্ধে। দুজনেই পাইলট। পরে উইলসনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম যে তার ছেলের বয়স কুড়ি। স্কুল ফাইন্যালের পর তার আর পড়তে ভালো লাগলো না, তাই সে পাইলট হবার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। যোগ দেবার পর তার বাবা-মাকে জানিয়েছে। মৃত্যুর দুর্নিবার টানে মানুষকে যখন নিয়ে যায় তখন মহৎ বাণী, শান্তির বাণী কাজ করে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হয়তো অমৃতের সন্ধান মিলবে। দেখলাম আরবুথনট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাজে খুশী নয়। কয়েক মিনিট আলাপের পরই বললেন যে তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন। মাসখানেকের মধ্যেই চলে যাবেন ও কিছুদিন বাদে পাকিস্তানে এক কনসালটিং এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম দুজনে খুলে তিনি 'ঢাকায়' আসবেন। মেয়েটির জন্যেই ভাবনা। তাকে কোথাও হষ্টেলে বা কনভেন্টে রাখতে হবে।

সারাদিন ধরে তাঁর দেওয়া কাগজ পত্র পড়লাম ও যা টুকে নেবার টুকে নিলাম। দুপুরের ফাঁকে একসময় গিয়ে 'বেভিউ হোটেল' থেকে লুনেটা হোটেলে' উঠে এলাম, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ মত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অতিথিদের লুনেটা হোটেলেই সাধারণতঃ থাকার ব্যবস্থা হয়। সেখানে হোটেলের চলতি মূল্য থেকে শতকরা দশভাগ কম নেওয়া হয়। কিন্তু এখানে থাকার ব্যবস্থা যে আমার হ'য়েছিল সে সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছনোয় আমার এই দুর্ভোগ। ট্যাক্সীওলাটাও অচেনা পেয়ে সাতপাক ঘুরে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ ট্যাক্সীতে পনেরো মিনিটে নিয়ে এলো। 'বেভিউ'এ সমুদ্রের দৃশ্যের বদলে দেখতাম পেছনের বাড়ীগুলোর নোংরা উঠোন। 'লুনেটা' হোটেলের চারতলায় যে-ঘর পেলাম সেখান থেকে দেখা যায় লুনেটা পার্ক ও ম্যানিলার গত যুদ্ধে বিধ্বস্ত বন্দর। সামনে ও পাশের রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে মটর অনবরত চলেছে। নিরন্তর শব্দের স্রোত বাতাসে তুলে দ্রুতগামী গাড়ীগুলো ছুটেছে।

আজ রাত্রে বিশ্বস্বাস্থ্যের উদ্‌যাপন দিবস। সকালে আমায় নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গোলমত হ'লে গেলাম। বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও কূটনীতিবিদদের আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল, অফিসের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অফিসারদের গৃহিণীরাও নানা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে এনেছিলেন, এমন কি সিংঙ্গাড়া পর্যন্ত। মাইসোরী পাক, বেগুনী ইত্যাদি তো আছেই। ম্যানিলায় অবস্থিত শ্রীমালিক এসেছিলেন সস্ত্রীক। মহিলা সুন্দরী তন্বী ও উন্নাসিকা।

মালিক সাহেবকে স্বাগত জানিয়ে যখন বললাম—প্রায় পনের বছর আগে দেখা যখন আপনি ক্যানাডার হাই কমিশনার ছিলেন।

—আমি ক্যানাডায় ছিলাম না। যিনি ছিলেন তিনি আমার কাকা।

অর্থাৎ উত্তরাধিকারী সূত্রে আপনারা ভারতের রাষ্ট্রদূতগিরি কায়েম করেছেন, আগে যেমন নবাবরা করতেন।

—'দাঁড়াচ্ছে তাই।' ব'লে হেসে উঠলেন।

—কতদিন আছেন এখানে?

—বছর খানেকের বেশী।

—কেমন লাগছে এ জায়গা ?

—আমাদের পছন্দ অপছন্দের বালাই নেই।

তন্বীশ্যামা শ্রীমতী মালিক সমবেত ভারতীয় ভদ্র-মহিলাদের সংগে তেমন আন্তরিকতার সগে কথা কননি, শুনলাম। তাতে শ্রীমতী বড়ুয়ার অত্যন্ত মনমেজাজ খারাপ। পায়ে হেঁটে তাঁর বাসায় যাবার পথে কয়বার একথাটি'ই শুধু উল্লেখ করতে লাগলেন। হাত বাড়াতেও কেন যে এই উন্নাসিকা মালিকানী এঁদের করমর্দন করেননি, তা' আমি জানি না, বুঝি না। কারণও অনুমান করা সুকঠিন। তবে এটা যে ভব্যতা ও সৌজন্যের অভাব এবিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীর সরকারী চাকরীর তকমা ও তলব দিয়ে রাষ্ট্রকর্মচারীদের গৃহিণীরাও যে নিজেদের সামাজিক মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করেন, বিদেশে এটা বিষম বিসদৃশ ঠেকে। সরকারী অফিসের বাইরেও যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে অধস্তনদের চাটুকারিতায় তারা ও তাঁদের সহধর্মিণীরা সেকথা বিস্মৃত হন। হয়তো বিদেশে মেয়েদের পর্দানশিনতার অভাবে অধস্তন রাষ্ট্রকর্মী ও তাঁদের গৃহিণীদের দপ্তরের কর্তাস্থানীয়-দের ও পরোক্ষভাবে তাদের বনিতাদের তোষামোদেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ব'লে দাবী করার গোপন ইচ্ছাই যত অসন্তোষের মূলীভূত কারণ।

পৃথিবীর বহুদেশের লোকের সংগে পরিচয় হ'ল। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার আহ্বানে বহুলোক এসেছিলেন। এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতির সংগে দেখা হ'ল। তিনি যদিও ক্যানবেরার লোক তবুও সিডনীর খবর তিনি র'খেন। তিনি বললেন—'এপ্রিল মাসে ঋতু ওখানে মনোরম। পৃথিবীর অপর গোলার্ধ ব'লে এখন ওখানে শীতের আগমন হবে। তাই হেমন্ত ঋতুতে না-বেশী ঠাণ্ডা না-বেশী গরম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—বৃষ্টি পেতে পারি কি সেখানে ?

—ওহো! সিড্নী সম্বন্ধে একথা নিশ্চয় ক'রে কেউ বলতে পারে না, এমনকি আবহাওয়া পণ্ডিতেরাও। যে-কোন সময়ে একপশলা বৃষ্টি হ'তে পারে সিড্নীতে।

নানারকম টুকিটাকি আহার ও নরম গরম পানীয় যে কেউ যত ইচ্ছে গ্রহণ করতে পারেন। একটু হেসে কাউকে 'কেমন আছেন', কাউকে 'কতদিন আছেন', 'কেমন লাগছে এ জায়গা', 'কতদিন থাকবেন', 'এখান থেকে কোথায় যাবেন' ইত্যাদি সামান্য কথাবার্তায়, আলাপ ও মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত কার্ড বিনিময় সেরে যখন বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অফিসের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ ফাং এর সংগে শেষ করমর্দন সেরে বড়ুয়াদের অনুরোধে তাদের বাসায় গেলাম তখন রাত সাতটা। বড়ুয়াদের বাড়ীতে দু'টি ছেলে; ইংরেজীর মাধ্যমেই তারা লেখাপড়া করে। তাঁদের ফ্ল্যাটের বিপরীত দরজায় আর একজন বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার কর্মী রামকৃষ্ণাণ সপরিবারে বাস করেন। তার মেয়ে দুটি; একটি এখন এখানে আছে। এদের একটি ছেলে আজকালের মধ্যে ম্যানিলা আসবার কথা। আসতে বিলম্ব হওয়ায় বাপ মায়ের মন পুত্রের পথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত। রাতের গল্পগুজব সেরে যখন উঠলাম শ্রীমতী ও ডাক্তার বড়ুয়া আগামীকালের নৈশভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বিদেশে বাঙ্গালী বাড়ীর আহারের নিমন্ত্রণ কে প্রত্যাখ্যান ক'রে রমণীহৃদয়ে বেদনা দেবে ?

পরের দিন বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার অফিসে এসে তাদের গাড়ীতে গেলাম ফিলিপিনো রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের দপ্তরে। সেখান থেকে তাদের লোকের সংগে এলাম জাতীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধান সংস্থার অফিসে। এটিকে বলা হয় ন্যাশনাল ওয়াটার ওয়ার্কিং ও সুয়াবেজ অথরিটি। ঐ সংস্থায় বিভিন্ন বিভাগের এঞ্জিনিয়ারদের ও জেনারেল ম্যানেজারের সংগে সাক্ষাৎ ও আলাপ হ'ল। জলসরবরাহ বিভাগের এঞ্জিনিয়ার 'অস্কার ইলাস্ট্রে' আমায় মধ্যাহ্ন ভোজে নিয়ে চললেন এক্ষি হোটেলে। তখন বেলা প্রায় দেড়টা। আমাদের সংগে আরও দুজন অফিসার যোগ দিলেন। আহারের প্রচুর পদ। যত খেতে পারা যায় তা এক জায়গায় রাখা আহারের সংগ্রহ থেকে তুলে নিয়ে এসে টেবিল চেয়ারে বসলেই হ'ল। শুধু চা বা কফি বা অন্য পানীয় দেবার জন্য মেয়েরা পরিবেশনে আসে। বৈকালে ফিরে এদের অফিসেই বইয়ের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা 'মেটকাফ এডি' কোম্পানীর সাহেবদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন 'ইলাস্ট্রে' সাহেব। এখানের ভাষা মূলতঃ স্প্যানিশ। তবে উচ্চশিক্ষিতরা সকলেই ইংরাজী

বলতে পারে। এদের কর্মীরাও কোন কোন পরিকল্পনায় কাজ করছেন তার একটা বিবরণী চুম্বকে দিলেন। বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একজন NWSAর এঞ্জিনিয়ার আমায় 'লুনেটা হোটেলে' পৌছে দিয়ে গেলেন। হোটেলে এসে সাবান দিয়ে গেঞ্জী মোজা কেচে দিয়ে স্নান সারলাম। দিনের বেলায় বেজায় গরম। বিছানায় শুয়ে খবর কাগজ পড়ছি এমন সময় টেলিফোন এলো—আমি ডাক্তার সুব্রহ্মনিয়াম। কখন ডাঃ বড়ুয়ার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন?

—কেন সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বেরুলেই চলবে। ওরা সাড়ে সাতটায় যেতে বলেছেন। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

—এই হোটেল থেকেই।

—কত নম্বর ঘর আপনার? চলে আসুন নীচে আমার ৩১৬ নম্বর ঘরে।

কিছুক্ষণ বাদে দরজায় টোকা। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম ও বসতে বললাম। তিনি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—তুমি তৈরি?

—শুধু জামাটা পরে নেওয়া বাকী।

—তোমার ড্রিংক করা হ'য়েছে?

—এঘরে সে পর্ব্ব নেই।

—সিগারেট খাবে?

—না, ধন্যবাদ।

রোগা, কালো, চোখের কোল বসা মুখ, কাঁচা-পাকা চুল ডক্টর সুব্রহ্মনিয়াম খাদ্যপুষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বিশ্বসংস্থা FAO-এর তরফ থেকে ম্যানিলায় আছেন। নারকোলের শাঁসের পুষ্টির ওপর তাঁর গবেষণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর গবেষণার বর্ণনা ক'রে ও তাঁর ছবি ছেপে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল। ইনি ভারতের নানা জায়গায় নানা কাজ করেছেন। বাঙ্গালোরে ওঁর কাজ সুরু। মহীশূরে তিনি ছিলেন ডিরেক্টার। তাঁকে তদানীন্তন মন্ত্রী যে উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি রাখেন নি। তবে এ ব্যবহারে আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত নই কেননা এই রকমই হয়। বয়স এখন পঁয়ষট্টি। স্ত্রী সব সময়ে তাঁর সংগে ঘোরেন না। তাঁরও বয়স হ'য়েছে। বিদেশে এত ঘোরাঘুরি তাঁর আর ভাল লাগে না। তাই তিনি এবার আসেন নি।

নানা ঘরোয়া কথাবার্তার পর দুজনে পদব্রজেই বেরুলাম। উনি সামনে সমুদ্রের ধারে 'লুনেটা পার্কে' রোজ বৈকালে বেড়াতে যান। বেরিয়ে ট্যাক্সী নেবার জন্য ডঃ সুব্রহ্মনিয়াম ব্যস্ততা দেখাতে আমি রাজি হ'লাম না। বললাম—মোটর তো অনবরতই চড়ছি। যখন পথ মাত্র আধ কিলোমিটার হবে তখন দুজনে গল্প করতে করতে পথের দুধারে দেখতে দেখতে চলা যাক।

ডাঃ বড়ুয়ার বাড়ীতে আরও দুজনের নিমন্ত্রণ ছিল—ডাঃ সত্যমূর্তি ও তাঁর দুর্বলা স্ত্রী। শ্রীমতী সত্যমূর্তি বিশেষ কিছুই খান না। ফলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। সুব্রহ্মনিয়মের চোখে নেশা লেগেছিল। তাই তিনি একটু বেশী কথা অনর্গল ব'কে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ঠাণ্ডা জল দিয়ে হুইস্কি দেওয়া হ'ল। সুব্রহ্মনিয়ম ও সত্যমূর্তি সামান্য পান করলেন। ইউনাইটেড নেশনসের কর্মীরা বড়দিনের সময়ে বিনাশুল্কে একবোতল ক'রে মদ পেয়ে থাকেন। ডাঃ বড়ুয়ার প্রাপ্যটি তিনি এনেছিলেন অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য। নিমন্ত্রণ করলেই নাকি আহারের পূর্বে কিঞ্চিৎ সুরাদান করাই নিয়ম। বড়ুয়া দম্পতির দুজন ছোট ছেলে এসে দেখে কি হ'চ্ছে। বাঙালী বাপমায়েরা কিছু অস্বস্তি বোধ করেন। শ্রীমতী বড়ুয়া প্রচুর রান্না ক'রেছিলেন ফুলকপি বাঁধাকপির তরকারী, ডাল, মাছ, মুরগী, চাটনী, ফ্রুট, স্যালাড, ডিমের পুডিং ইত্যাদি। আহারের পর্বশেষে এল ছোট কাপে কফি।

রাত যখন সাড়ে ন'টা তখন আমি ও সুব্রহ্মনিয়ম উঠে পড়লাম। আমায় আবার তাদের কাজ দেখাতে রাত সাড়ে নটায় নিতে আসবে NWSA (NATIONAL WATER SANITATION AUTHORITY) থেকে। তাই দুজনে আমরা ট্যাক্সী করেই চলে এলাম আগে। ভাড়া মাত্র পঁচিশ সেন্ট লাগল।

NWSA-এর লোক এল না দেখে আমি শুয়ে পড়লাম। রাত পৌনে এগারোটার সময় হোটেলের কাউন্টার থেকে ভদ্রলোক টেলিফোন করছে এসে। ম্যানিলা হোটেলে আমায় খোঁজাখুজি ক'রে পরে যখন 'লুনেটা হোটেলে' খবর নিয়েছে তখন রাত সাড়ে এগারোটা। অত রাত্তিরে বেরুতে আমার ইচ্ছা নেই ব'লে তাদের বিদায় দিলাম।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার জাতীয় জল সরবরাহ

সংস্থা থেকে আমায় পরিদর্শনের জন্য তুলে নিতে গাড়ী এসেছিল। ভোরবেলায় উঠে স্নানাদি সেরে প্রাতভ্র্মণ ও সকালের আহারাদি সেরে অপেক্ষা করছিলাম। টেলিফোন পেতে নীচে নেমে গেলাম।

আমার পথপ্রদর্শক এঞ্জিনিয়ারের সাথে চলেছি বৃহত্তর ম্যানিলায় জলসরবরাহ দেখতে। ম্যানিলার দক্ষিণ বন্দরের কাছে আমার হোটেল থেকে বেরিয়ে সাঁ লুই রাস্তা ধরে ফিলিপাইন নর্থ কলেজ, N.W.S.A অফি ও YMCA ডাইনে রেখে কেঁসো (Quezon) সেতু পার হ'য়ে কেঁসো বলেভার্ড, আস্তালুসিয়া দিয়ে ডাইনে ঘুরে লারোৎ রাস্তা ধ'রে পাঁচ মাথা রাস্তার মোড় বেঁকে ডিমাসালাং রাস্তা দিয়ে সামান্য যেতেই ম্যানিলা সহর পার হ'য়েই কেঁসো সহরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথের দুটি থামে 'ম্যানিলার সীমানা' ব'লে লেখা; যেমন চন্দননগরে আছে সহরে ঢুকবার মুখে দুটী থাম দেওয়া, বোধ হয় আগে ফটক ছিল, সেইরকম। তারপর ভিড় কম হ'তে লাগলো। পীচ ও কংক্রিটের রাস্তা পার হ'য়ে শুধু পাথরের রাস্তায় পড়লাম, যার ওপর এখনও পীচ পড়েনি। এইরকম রাস্তা ধ'রে প্রায় ১৪ কিলোমিটার যেতে হবে ইপো বাঁধের কাছে। পথে পড়ল ইস্পাতের কারখানা, এখানে ইস্পাত পাথর গলিয়ে তৈরি করে না; মোটা ইনগট থেকে সরু রড ও নানা হালকা সেকসান্ তৈরী করে। ইস্পাতের কারখানা বাঁয়ে রেখে চললাম ইপো নদীর দিকে। যে পথ দিয়ে চলেছি তার ডাইনে বাঁয়ে আমগাছ, পেয়ারাগাছ, কলা, পেঁপে সুপুরী প্রভৃতি গাছে ভরা, আমাদের বাংলাদেশের মত। তবে থাকার ঘরগুলো কাঠের তৈরি। সামনে ফুলবাগান। গরীব হ'লেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা রয়েছে। এখানে হোটেলের মেয়েরা সব সময় আয়নায় মুখ দেখছে, চিরুনি দিয়ে চুল একটু ঠিক ক'রে নিচ্ছে।

এখানে নদীতে আড়বাঁধ দিয়ে জল আটকেছে আর সেই জল সুড়ঙ্গ দিয়ে বয়ে চলেছে। এ্যাংগট ও ইপো নদী যেখানে মিলেছে তারও কিছু নীচে ১৯৪ মিটার লম্বা ও ১১.৫ মিটার উঁচু এই 'ইপো' ড্যাম। এর জল ইপো থেকে ৬.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬.৪ মিটার খাড়াই অশ্বখুরাকৃতি সুড়ঙ্গ 'বিবটি' পর্য্যন্ত যাবে ও তারপর সামান্য সুড়ঙ্গ কিছু কিছু খোলা জায়গার ওপর কংক্রিটের পাইপ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 'বালারা' পরিশোধনাগারে। এই ইপো আড় বাঁধের জল 'নোভালিসি' হ্রদে থিতোবার জন্য নিয়ে যাবার বিকল্প ব্যবস্থাও আছে। নইলে ইপো থেকে পাইপে 'বালারা' পরিশোধনাগারেও যেতে পারে। এর জন্য একটা সুড়ঙ্গ ছিল। আর একটা নতুন ক'রে তৈরি হচ্ছে। প্রায় মাইলখানেক সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে গেলাম বিস্ফোরণের পরে। যেখানে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হ'য়েছে সেখানে রেল লাইন পাতা। সুড়ঙ্গের গা দিয়ে বিজলীর তার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে অন্ধকার দূর করার জন্য ও কাজের অসুবিধা যাতে না হয়। পাশাপাশি গেছে ঠাণ্ডা হাওয়ার পাইপ। রেলে চ'ড়ে চললাম সুড়ঙ্গের ভেতরে। এখন সেখানে বিস্ফোরণ-বিচ্ছুরিত পাথর ছোট রেলের মালগাড়ীতে তুলছে। প্রথমে 'জাম্বো' দিয়ে লম্বা লম্বা ফুটো (৮.১০ ফুট দীর্ঘ) করে নিতে হয়। তারপর বিস্ফোরক ঐ ফুটোয় পুরে বিস্ফোরিত করা হয়। বিস্ফোরণের ফলে পাথর খ'সে পড়লে সেগুলিকে মালগাড়ীতে চড়িয়ে বাইরে এনে ফেলা হয়। 'জাম্বো' তখন একধারে সরিয়ে ফেলা হয়, সেখানে ডবল লাইন পাতা। ভাঙ্গা পাথর ও কাদায় ভর্ত্তি মালগাড়ী এনে সুড়ঙ্গের মুখে খালাস করা হয়। কাছেই নির্গত মালগুলো ফেলার জায়গা যথেষ্ট আছে। সুড়ঙ্গের ভেতরে গরম হওয়ার কথা। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া সুড়ঙ্গের ভেতরে পাঠাবার জন্য আবহাওয়াটি সুখকর হ'য়েছে। তবুও আলোর মাত্রা আরও একটু বাড়ানোর দরকার আছে বলে আমার মনে হয়। বিস্ফোরণের পর তাড়াতাড়ি ধোঁয়া বার করবার প্রয়োজন। দু'প্রান্ত দিয়ে ফুটো ক'রে চলেছে। মিলবে এসে একই জায়গায়।

আরও দুটি উৎস থেকে বৃষ্টি ও নদীর জল নেওয়া হয়। নোভালিস্ আড় বাঁধ বহু জল ধ'রে রাখার উপযোগী। কিন্তু এবার জল শুকিয়ে গেছে। এখানে জল পরিশোধনাগার কলকাতায় পলতার জলকলের চেয়ে বড়। সহরে ময়লা জল ও বৃষ্টির জল নিকাশের পৃথক পাইপ। বর্ষায় জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব পৌরপ্রতিষ্ঠানের। এখানে ময়লা পরিশোধন করা হয় না। সমুদ্রের ভিতর বেশ কিছুদূর নল নিয়ে গিয়ে ময়লা ছেড়ে দেওয়া হয়।

ম্যানিলায় যখন রয়েছি তখন ম্যানিলার প্রাচীন ইতিবৃত্তের কিছু খোঁজ নেয়া যাক। প্রাচীনকালে

তাগালোগসের রাজা নাকান্দুলা ও সোলিমান তাদের রাজত্বকে 'মেনিলাভ' ও 'মেনিলাব' বলত। তাগাইলাগ অর্থে জলে যারা বাস করে তাদের বোঝাতো। কারও কারও মতে ম্যানিলা শব্দটির উৎপত্তি হ'য়েছিল 'মালয়' ও 'সংস্কৃত 'নীলা' শব্দ থেকে। এ স্থানটি নীলার জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক পর্যটকদের মতে এই সহর স্পেনীয় পর্য্যটক ও স্পেনরাজার সৈনিক 'মিগুয়েল দি লেগাজ্পী (Miguel de Legazpi) ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুন স্থাপন করেন। তিনি তার ডায়েরীতে লেখেন এ জায়গাটীকে 'May Nilad' বলে। কিন্তু সংবাদ যখন স্পেনে পাঠালেন তখন নাম হ'ল Maynilad। পরে স্পেনীয়েরা 'y' ও 'd' এর উচ্চারণের জড়তা এড়াবার জন্য বাদ দিয়ে হ'ল 'ম্যানিলা'। ফিলিপিনেরা বলে 'Maynile'। স্পেনীয় রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এই নগরীকে বলেন 'INSIGNE Y SIEMPRE LEAL CINDAD' বিশিষ্ট ও চির রাজভক্ত নগরী।

প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী সুরক্ষিত করতে নগরের চারধারে প্রাচীর তুলতে হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলকে INTERMURAS বলা হয়, সেখানে প্রাচীর তোলা হয়। এখানেই সুরক্ষিত হ'য়ে মূল ম্যানিলার জন্ম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পরিধি বেড়েই চলল এবং ফিলিপিনো রাজ্যের রাজধানী ব'লে পরিগণিত হল।

কম ক'রে সাত হাজার দ্বীপ সম্বলিত ফিলিপিনো স্বাধীন রাজ্যের সর্ববৃহৎ দ্বীপ 'লুজনে' ম্যানিলা অবস্থিত। এর সংলগ্ন ম্যানিলা উপসাগর জাহাজের বন্দরের উপযোগী অতিসুন্দর জায়গা। এখানের লোকসংখ্যা প্রায় বিশলক্ষ; তার মধ্যে অনেক ফিলিপিনো-চীনে, আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, দক্ষিণ এশিয়ার বাসীরা।

১৫৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিপিনো রাজ্য স্পেনীয় রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। এমিলিও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমেরিকা মধ্যস্থতা করতে এসে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আগষ্ট নিজেরাই ফিলিপাইন দখল করল। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে জাপানী বোমায় হনলুলুর উপকণ্ঠে পার্ল হারবারের ধ্বংস ক'রে ফিরে এসে জাপানীরা ফিলিপিনো দ্বীপ অধিকার ক'রে বসলো। শোনা যায় জাপানীরা এখানের রাস্তার ট্রামের লাইন তুলে দেশে নিয়ে গিয়ে গলিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে। ওদের পরিশ্রম ক'রে ট্রামের লাইন তোলার পর্ব আর করতে হ'ল না। ফিলিপিনো রাজ্য আবার জাপানী অধিকার থেকে মুক্ত করা হয় ১৯৪৫, ৩রা ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৬ সালে আমেরিকা ফিলিপিনোর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করা হয়।

যদিও রাষ্ট্রীয় মতে কেঁসো সিটি (Quezon City) হ'ল ফিলিপিনোর রাজধানী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজ চলে ম্যানিলা থেকেই। কেঁসো নগরীতে রাজধানীর জন্য বহু কাজ সুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা বন্ধ আছে।

ম্যানিলা সহর চোদ্দটী অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে দিয়ে 'হেলে' সাপের মত এঁকে বেঁকে ব'য়ে গেছে 'পাশিগ' নদী। পৌরাঞ্চলগুলি হ'ল, টোণ্ডো, বিনোণ্ডো, স্যান নিকোলাস সান্টাক্রুজ, কুইয়াপো, স্যান্ মিগুয়েল, স্যাম্পালয়, ইন্ট্রামুরোস, বন্দর অঞ্চল, এরমিটা, মালাতে, পাসেটা, পান্দাকাল, ও সান্তাআনা।

বৃহত্তর ম্যানিলার মধ্যে কেঁসো সিটি (Quezon City) পাসে নগরী (Pasay City), সাঁ জোয়ান (San Juan), মান্দালুয়ং (Mandaluang), মাকাতি (Makati), কারুয়ান পারাকুয় (Paranqune), লা পিনাস (La Pinac), মোলাবন (Molabon), ও নাভোটাস (Navaotas) প্রাচীন প্রাচীর ঘেরা নগরীছিল, আজ যার নাম ইন্ট্রামুরোস। চারদিক পরিখায় ঘেরা ছিল। আজ তা রাস্তা ও উদ্যানে পরিণত। নগরী পরিচালিত হয় মেয়র ও তাঁর কাউন্সিল দিয়ে। কাউন্সিল প্রতি চার বছর অন্তর বাছাই করা হয়। স্পেনীয়রা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত, ওখানে অধিকাংশ অধিবাসীকে খৃষ্টান করেছে। ইংরেজ এসেছিল ভারতবর্ষে। প্রথমে কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিল। তারপর তারা পৃথক ছিল। কিন্তু স্পেনীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেছে। বিবাহ বা নিকে করেছে—সন্তান উৎপাদন করেছে। এমনকি স্পেনীয় নাম দিয়েছে দো-আঁসলাদের। এখানে জন্মের হার অধিক। বিষুবরেখার সন্নিকটে বলে দেশটি গরম। তাই কামনার ভাব বোধহয় শীঘ্র ও সহজেই অল্পবয়সেই জাগে বলেই

বোধ হয় এখানে সন্তান জন্মের হারও অধিক, তাব'লে মৃত্যুর হারও কম নয়।

ম্যানিলায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মের জন্য বহু গীর্জা গড়ে উঠেছে। 'স্যান অগাষ্টিন' চার্চ ফিলিপিনোর অতি প্রাচীন গীর্জা। গত মহাযুদ্ধে বহু ঘরবাড়ী গীর্জা নষ্ট হ'য়েছে।

এখানে লেখাপড়ার চর্চাও খুব। বহু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও নানাস্তরের স্কুল গ'ড়ে উঠেছে। এখানে চিড়িয়াখানা, এ্যাকোয়ারিয়াম। গোটা ষোল নামকরা পার্ক, তারমধ্যে লুনেটা জাতীয় উদ্যান বিখ্যাত। এখানে খোলা পার্ক—লালনীল মাছ লিলি পদ্মে ভাসছে। রাত্রে সেখানে ফ্লোরেসেণ্ট আলো জলে। কেউ চুরি ক'রে নেয় না বা ভেঙ্গে চুরে দেয় না। বন্দরে জাহাজ লাগাবার জন্য চোদ্দটা পিয়ার আছে। আমেরিকার মতো এখানে পুরুষে রান্না করে। এখানে মদ সস্তা বলে বহু মদের দোকান। মাতলামির ফলে মাঝে মাঝে খুন জখমও হয়। ম্যানিলার উপকণ্ঠে রেস্তোরাঁতে—অনেক মদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। নগর-পিতারা মনে করেন সস্তায় মদ খেয়ে ছেলে ছোকরারা বেজায় বকাটে হ'য়ে যাচ্ছে। 'রক' নেই তবুও রকবাজির মতো ব্যবস্থা রাস্তার মোড়ে দেখা যায়। চেহারা ধরণ-ধারণ দেখলেই বোধ হবে বদমাইস। সমুদ্রের ধারেই মার্কিন দূতাবাস। আমাদের দূতাবাস নেব্রাস্কা ষ্ট্রীটে। সব দূতাবাসগুলিই কাছাকাছি।

পরেরদিন বৈকালে মেটকাফ এণ্ড এডীর ইঞ্জিনিয়ার আর্থার ক্রয়েষ্টেল তাদের আফিস থেকে ফিরে আসার সময় আমায় জিগ্যেস্ করল আমার আগামী কাল শনিবার কোন বিশেষ কাজ আছে কিনা?

—দেখছি না তো কোন। কেন জানতে চাইছ?

—ভাবছিলাম আগামী কাল 'লস্ বেনিয়াসে' ইণ্টার-ন্যাশানাল রাইস্ রিসার্চ কেন্দ্র দেখে আসবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—সে কতদূর? 'তাল' হ্রদে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখা সম্ভব?

—দূরত্ব প্রায় ষাট কিলোমিটার হবে। লস বেনিয়াস্ লেগুনা উপসাগরের দক্ষিণে। কিছু ঘুরে গেলে তাল হ্রদেও যাওয়া যায়।

—ঠিক আছে। আমরা যাব। কটার সময় বেরুতে হবে?

—সকাল আটটা হ'লে কেমন হয়? তুমি কি ওখানের কারুকে চেনো?

—আমি চিনি না। তবে ডঃ সুব্রামনিয়ম্ নিশ্চয় চিনবেন। আমি জেনে রেখে দেবো। যত সকাল হয় ততই ভাল। তুমি তা'হলে সকাল আটটায়ই আসছ?

রাতের বেলা হোটেলে রাইস রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউকে চেনেন কিনা ডঃ সুব্রমনিয়ামের কাছে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন। 'ডঃ চ্যাণ্ডলার হলেন ওখানের ডিরেক্টর। তাঁকে আমার নাম করবেন।'

ঠিক সকাল আটটায় প্রাতঃকৃত্য, স্নান ও জলযোগ সেরে লিফ্‌টে নীচে নেমে দেখি, ক্রয়েষ্টেল ব'সে।

—কি খবর? তুমি কতক্ষণ ব'সে। ব'সে আছ, কেন খবর দাওনি? —এ খুব খারাপ।

ক্রয়েষ্টেল একটু হেসে বলল—আটটা যে এখনও বাজেনি। মাত্র মিনিট কয়েক হ'ল এসেছি। আমি আমার ক্যামেরা ও পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। NWSA যে মোটর মেটকাফ এণ্ড এডীকে দিয়েছে সেই গাড়ী করেই এসেছে ক্রয়েষ্টেল।

ম্যানিলা থেকে দক্ষিণে যাওয়া সুরু করলাম। একটা পথ চ'লে গেছে 'তাগেতাই' (TAGAYTAY)র দিকে। সেখান থেকে 'তাল' হ্রদ দেখলাম। আর একটি রাস্তা চ'লে গেছে দক্ষিণে 'কাতাঙ্গাস' প্রদেশের মধ্যে। তার একটি শাখাপথ সারা 'লেগুনা' উপসাগরের চারিদিকে ঘুরে 'তাই-তাই' (TAY TAY) হ'য়ে ম্যানিলায় গিয়েছে। ম্যানিলা থেকে রেলপথ আমাদের পথের পাশাপাশিই চলেছে। গাওনা উপসাগরের ধার দিয়ে চললাম। শুধু রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে গাদা গাদা ফলের দোকান। সেখানে কত রকমের কলা। মর্তমান জাতীয় কলার একজোড়ার দাম ৫ সেণ্টাভো। কি বড় বড় আনারস, পেঁপে, তরমুজ! মৌরানী-পুরের হাটে ঐরকম রক্তের মত লাল তরমুজ দেখেছিলাম। আর এইখানে দেখলাম হলদে শাঁসের তরমুজ। পথে এক জায়গায় থামলাম। সেখানে মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বাল দিয়ে ধান সেদ্ধ হ'চ্ছে। আর সেই ধান ডমরুর মত বিরাট মুগুর দিয়ে মেরে মেরে চিড়ে তৈরী করছে।

চিড়েতে গুড় দিয়ে প্লাষ্টিকের কাগজে মুড়ে মুড়ির চাকতির মতো বিক্রী করছে। মেয়েদের আঙ্গুলে নেকড়া বাঁধা আর পুরুষরা সেই মুগুর হাতে খাড়া—একবার এহাতে; এ-হাত ভেরিয়ে গেলে ওহাতে মেরে চলেছে। উল্টোদিকের দোকানে চাল তৈরীর জন্য ধান থেকে তুষ বার ক'রে দিচ্ছে। তুষ বিক্রী করার জন্য জমা ক'রে রেখে দিয়েছে।

শুধু ফলের দোকান। ফলের চাষও ডাইনে বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে। কলার গাছের সারি, নারকোল গাছের সারি। তাছাড়া আম কাঁঠাল আনারস পেঁপের চাষ তো রয়েইছে। সেখানে গিয়ে IRRC দেখার জন্য ডিরেক্টারের সন্ধান ক'রে হতাশ হ'য়ে সহকারী অধ্যক্ষের সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি খুশী হ'য়ে দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি আমাদের গাড়ীতে এলেন না। নিজের গাড়ীতে আমাদের চড়িয়ে ধানের ক্ষেত দেখাতে লাগলেন। কত হাজার রকমের ধান চাষ হ'চ্ছে। বছরে তিনবার ধান হ'তে পারে তার উপরও পরীক্ষা চলেছে। নানারকমের রাসায়নিক সার দিয়ে ফলন বাড়াবার ও ক্রস্ ব্রিডিং ক'রে ধানের বীজের আকৃতি বাড়াবার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রায় শতখানেক হেক্টায়ার জমি। এক পেশো প্রতি হেক্টারের অনুপাতে ইজারা নিয়েছেন ফিলিপিনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছ থেকে। অধ্যাপকদের থাকার জায়গাটি মনোরম। যেমন বাড়ী ও তার পারিপার্শ্বিক উদ্যান, সন্তরণাগার প্রভৃতি। তাঁদের বিনামূল্যে মোটর দেওয়া হ'য়েছে। পেট্রোল ঢালো আর চলো। গাড়ী চড়ার জন্য দেওয়া হয় মাত্র। দুজন ভারতীয়ের সংগে দেখা হ'ল। একজন হ'লেন ডাঃ পাঠক, উত্তর প্রদেশের। আর একজন বাঙ্গালী সুরজিৎ দে-দত্ত। কাজের নানা পদ্ধতির কথা বললেন তিনি। এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ চাল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক গবেষণাগার। ভারতবর্ষে এটা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা' সম্ভব হয়নি। সব ঘরই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের দুজনায় পাঁচ পেশো লাগলো কাফেটেরিয়া ব'লে। এখানে দেখার পর্ব সেরে ম্যানিলায় এসে, 'তাল হ্রদ ও আগ্নেয়গিরি দেখবো না, কখন হয়। তাই সেখানে যাব একথায় আলোচনা হ'ল। অতিযুক্তি ক'রে ব্রাকেটল সাহেব তাঁর সঙ্গে একটা Geodetic Surveyএর ম্যাপ এনেছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে "লস বেনিয়াস (LOS BENAS," থেকে ফেরার পথে 'কালাম্বা' নামে ছোট সহর থেকে রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে ১নং রাজপথ ধ'রে দক্ষিণে কিছুদুর নামলেই 'তানাউয়ান' সহর। 'তানাউয়ান' থেকে ৪১২ নং রাজপথ ধ'রে পশ্চিমমুখো গেলে সে পথ 'তাগতইে'এর কাছে ১৭ নং রাজপথের সংগে মিশেছে। এ পথটি 'তাল হ্রদে'র গা দিয়ে আসছে। এখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছবি নিলাম। অঞ্চলপ্রধানের সঙ্গে কথা হ'ল যে তারা এ অঞ্চল খালি ক'রে চলে যাচ্ছে কবে?

—'সবাই না গেলে আমি তো যেতে পারবো না। অঞ্চলপ্রধান জানালেন।'

—তাতো বটেই। তোমার মুখ চেয়েই তো সবাই আছে।

'কালেসন' সহর থেকে রাস্তা পাহাড়ী, মেটে ও খারাপ। অঞ্চল প্রধান বললেন মাত্র কয়েক কিলোমিটার খারাপ। আমরা চললাম সেই দুর্গম পথ ধ'রে। ধুলোতে গাড়ীর চাকা হড়কে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নেমে ঠেলে দিতে হচ্ছিল।

সহযাত্রীকে বললাম—আমরা যখন ঠেলছি, ড্রাইভার যদি গাড়ী নিয়ে চলে যায়—'গুমনাম' ছবির মত, তা' হ'লে এই বিভুঁয়ে আমাদের দশা হবে কি?

সে হাসে।

প্রায় হাজার ফুট পাহাড়ে উঠে—ও পরে নেমে পৌছল'ম আগে তাই। অনেক ছবি নিলাম। ফেরার পথে অজস্র ফলের দোকান, পেঁপে, কলা আর আনারস। দুদিকে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা হ'য়ে গেছে। এরা তাই জমিতে তিনরকম ফসল ফলাচ্ছে। নারকেল আনারস ও পেঁপে। তাল হ্রদের মাটিতে বহু বড় বড় ধানের আবাদ র'য়েছে। মাটি আগ্নেয়গিরির চূর্ণ লাভা থেকে উৎপন্ন বলে মনে হ'ল।

'তাল' ধোঁয়াচ্ছে! সবারই ভয়, যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত হ'তে পারে। সবাই সতর্ক হ'য়ে আছে। Volcanologist-রা তো বটেই, সংগে Scismologist-রাও রয়েছেন। জাপান থেকে আগ্নেয়গিরি বিশারদ এসে এখানে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফেরার পথে NOMAD

ইপো নদীতে জাড় বাঁধ

ক্লাবে এলাম। কয়েকটি সাহেব-মেমের সংগে দেখা হোল। আর একজন পাঞ্জাবী মালেয়েশিয়ার সংগে আলাপ হ'ল। এখানে আসার আগে মার্কিনী সৈন্যদের—কবরস্থানে গিয়েছিলাম। দেখে চোখে জল এসে গেল। শ্বেত পাথরের ক্রশ ও যার সমাধি তার পরিচয় ক্রশে লেখা। তার গরুর গাড়ীর চাকার মতন বিরাট হলঘর, কেন্দ্রে বিরাট সবুজ ভেলভেটের গালচের মত শ্যামলক্ষেত্র। এই হলটি দুভাগে বিভক্ত, তাতে কত লোক না মারা গেছে যাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের নামও তোলা আছে। সতের হাজার লোকের কবর ও সত্তর হাজার লোকের নাম এ হলঘরে—পার্টিশানের দেওয়ালে দেওয়ালে খোদা আছে। আমেরিকান সরকার এটি নিজব্যয়ে—নিজেদের দেশের লোকেদের নাম খুঁদে রেখেছেন। আর আঁকা আছে—Mc Arthur-এর সংগে—বিভিন্ন দিনের যুদ্ধের কাহিনী নানা রংএর মোজেকের ম্যাপে দেখানো।

দেখলে চোখে জল এসে যায়। কেন এই অকারণ মৃত্যু? কার কি লাভ হ'ল! আজ WHO-এর আরবুথনটের উনিশ বছরের ছেলেটা যে যুদ্ধে মারা গেল তার কি? এই অফিসেরই Woodrow Wilson এর ছেলে গেছে ভিয়েটনাম যুদ্ধে, কেন?

ভোরে উঠে চিঠিপত্র ও ইত্যাদি কাজকর্ম সেরে চললুম অমিতাভ চৌধুরীর সংগে দেখা করতে। ঠিকানা জানিনা। ঠিকানা দেবার কথা ছিল ডাঃ বড়ুয়ার শুক্রবার। তার সংগে নানা চেষ্টা ক'রেও দেখা হয়নি। তাই সকালে একবার দেখা ক'রে যাই ও অমিতাভ চৌধুরীদের ঠিকানাও নিয়ে যাই।

মেয়েদের রান্নার সুখ্যাতিতে যেমন দুর্বলতা দেখা যায় তেমনি এক অপ্রকাশিত কারণে শ্রীমতী বড়ুয়া বললেন, দুপুরে খেয়ে যেতে। কতদিন যে বাঙ্গালী বাড়ীর রান্না পেটে পড়বে না, জানি না। অকারণে শ্রীমতীকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা দিতে আমি নারাজ, তাই লোভও ছাড়তে পারলাম না। ডাঃ বড়ুয়ার কোমরে সটকা ধরেছে। তিনি আমার সহগামী হ'তে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম ভদ্রমহিলার সংগে দেখা ক'রে আসি, কেন না তিনি একলা আছেন, ছেলে-বৌ হংকংয়ে। যে বাড়ীর ঠিকানা দেওয়া আছে সেখানে চৌধুরীর নাম নেই। কি করা যায়! এক বুড়ো এখানে ঘোরাঘুরি করছে তাকে বললাম। তিনি কিছু বলতে পারলেন না তবে দূরে যে লোক (আমাদের দেশে হ'লে যাকে বলতাম মালী) তাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন। সে বললে যে তিনতলায় চ'লে যান।

—মিঃ চৌধুরীর নাম নেই কেন?

—কি ক'রে থাকবে। উনি তো অন্যলোকের ফ্লাটে আছেন।

—'ঠিক আছে।' ব'লে অটোম্যাটিক লিফ্‌টে ক'রে চ'লে গেলাম যথাস্থানে।

পলিনেশীয় যুবতী দাসীদ্বয় বেরিয়ে এসে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললে সাহেব নেই।

—সাহেবের মা আছেন?

—আছে।

—ডেকে দাও।

সে ভিতরে গিয়ে 'মামী' 'মামী' ক'রে ডাকতে লাগলো এবং আমায় বসার বিরাট ঘরে এনে এক সোফায় ব'সতে বললো। কিছুক্ষণ বাদে থান ধুতি প'রে ভদ্রমহিলা এলেন। তাঁকে বললাম আমার পরিচয়। আজ রাতে চ'লে যাব অষ্ট্রেলিয়া। আজ রবিবার ব'লে ছুটি; তাই আপনি একা একা আছেন একবার দেখা ক'রে যাই। অমিতাভবাবু এলে বলে দেবেন।

তিনি আনালেন ঠাণ্ডা ফলের রস। আধ ঘণ্টা বসে কার মধ্যে অতি আত্মীয়ভাবে তার সংসারের মত কথা স, ব'লে চললেন। একটু আধটু ইংরাজী ব'লে বুঝিয়ে চ্ছেন—কি আনতে হবে বা কি রাঁধতে হবে। তিনি ন নির্লিপ্ত পূজা-আহ্নিক নিয়ে আছেন—একখানি াণও এনেছেন। ওঁর বৌমা আর্টিষ্ট, দেয়ালে টাঙ্গানো ছে তাঁর আঁকা ছবি। বৌমার বাবা মৈত্র। ওঁকে টি পাত্রেরও সন্ধান দিলাম। ম্যানিলার কিছু দূরে ন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণাকেন্দ্রে কাজ করে। উনি মাকে তাঁর ঠাকুরঘরে ও ছাদে নিয়ে গেলেন ও সব ঘর-ার দেখালেন। অন্ততঃ বাংলা কথা কিছুক্ষণ কইতে পেয়ে শান্তি পেলেন। ডাঃ বড়ুয়ারা যে ওঁদের খব করেন কথা বার বার বললেন।

ওঁর সংগে আলাপাদি শেষ ক'রে কাছে এক বাজার কে একডজন আম ও ছেলেদের জন্য লজেন্স ইত্যাদি নিয়ে াম। তা না হ'লে ভাল দেখায় না। বিদেশী মুদ্রার চার পথে বড অস্বচ্ছলতা রয়েছে, একটু ধ'রে বেঁধে না লে আখেরে মুস্কিল হবে। তবে তেমন কিছু নয়। া মহাদেশে আমার আপন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব য়ছেন। বিপদে পড়লে কি আর না উদ্ধার করবেন? পদ না হ'লে কেনই বা চাইব? বিবেকানন্দের দশা— কালীর কাছে যা চাইব তাই পাব বলে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ; তবে তিনি তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই ইতে পারলেন না।

দুপুরে আহারাদি সেরে ডাক্তার বড়ুয়াদের সংগে কিছু াহারোত্তর আলাপাদি ক'রে হোটেলে এসে দেখি—সী মেসেজ'। আমার সহকারী সন্তোষ ঘোষাল মেরিকা থেকে ভারতের পথে টোকিও হ'য়ে ম্যানিলায় স গেছে। দামী হোটেল ছেড়ে সেও ওকাম্পোর কাছে র নিয়ে আমারই হোটেলে উঠেছে। দেখা করতে চায়। াম্পো মেসেজ দিয়ে গেছে যদি দেড়টার মধ্যে আমি মার নেমন্তন্ন সেরে আসি, তাহ'লে যেন তাদের খাবার াটেলে যাই। আমাকে সস্ত্রীক ওকাম্পো এসে বিমান রে পৌছে দেবে। ওকাম্পোর সন্ধান সন্তোষ লস্ ঞ্জলসে হার্ভের কাছ থেকে পেয়েছে। গতকাল য়ারষ্টেল এসেছিল আমার হোটেলে। বিয়ারষ্টেল বার ওকাম্পোর বন্ধু। এ সূত্রে আমায় খুঁজে বার রেছে। আমার হোটেলে, এসে হাজির। কেন যে আমার ভোর রাতে মনে হয়েছিল পাশের ঘরে সন্তোষ কথা কইছে। সে এসে আমায় খুঁজে বার করবে, এই ইচ্ছে তারও ঐকান্তিকতার জন্য সফল হয়েছিল।

আমি প্রায় বেলা দুটোর সময়ে এলাম। অতএব নেমন্তন্ন ফসকে গেল। কেউ কোথাও নেই। অতএব আমি বেরিয়ে পড়লাম ম্যানিলার আর্ট গ্যালারি দেখতে। অনেক প্রাচীন মানচিত্র এখানে টাঙ্গানো। তার একটার ছবি নিলাম। চারতলা ভরে ছবি ও পুতুল, প্রাচীন তৈজসপত্র অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি। সেখান থেকে ফিরে হোটেলে এসে খোঁজ নিলাম ঘোষাল এসেছিল কিনা। তখনও সে আসে নি।

সমুদ্রের ধারে—ধীরে ধীরে চলে এমনি এক বাসে ব'সে রইলাম ৫০ সেণ্টাভো দিয়ে। আমি হোটেলের ঘর ছেড়ে দিয়েছি বেলা তিনটেয়। ব্যাগ ও মাল রেখেছি হোটেলের জিম্মায়। ঘোষালের সংগে কাজের কথা, অফিসের কথা, ওর ঘোরা-ফেরার কথা সব হ'ল। ও গিয়ে—আলাদা ভাবে চার্জ নেবে লিখে দিয়ে এসেছি।

রাত্রে কি জানি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে মনে হ'ল ঘোষাল বুঝি অত রাত্রে এল এবং এই হোটেলেই। আশ্চর্য! সেইরাত্রেই ঘোষাল এসেছিল এই ম্যানিলায়—তবে সকালে সে এসেছে Lunete হোটেলে। পছন্দ না হওয়ায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেননা বড় আওয়াজ হয় এয়ার কনডিশনার চললে। আর বাড়ীতে তো আমাদের ঘরে এয়ার কনডিশনার নেই য দণ্ড অফিসে আছে। ঘোষাল বলল— তা 'ওকাম্পো আপনার সংগে দেখা করবার জন্য আসছে, ছেলে বৌ নিয়ে। আপনাকে বোধ হয় ডিনারে... নিয়ে যাবে ও গাড়ী ক'রে বিমানবন্দরে পৌছোবে। WHOর গাড়ী বলা ছিল। যথাসময়ে সে গাড়ী এল। ওকাম্পোর আসতে দেরী হ'চ্ছিল। তবে প্রায় পৌনে আটটায় ওরা এল। এ-দেশী স্পেনীয় ওকাম্পো। বউটি অতি ভদ্র ও সুন্দরী। ছেলেটি হ'য়েছে বাপের মত বাদামী রংয়ের। আমরা সবাই মিলে ওকাম্পোর এয়ার কনডিশন করা গাড়ীতেই সহর ছেড়ে গেলাম বিমানবন্দরে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার গাড়ীতে নিয়ে গেল আমার মালপত্র। মধুর ক্ষণিক পরিবেশে আমি সঙ্গ দিতে অরাজী নই, আর অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচয় এ আমার উপরি পাওনা।

[ক্রমশঃ]

প্রাচীন ভারতে আইনের উৎস

বিশ্বনাথ রায়

বাংলা ভাষায় যেটাকে আইন বলি ইংরেজীতে তাকে 'ল' (Law) বলে। এই 'ল' কথাটি এসেছে টিউটনিক ধাতু 'লগ' (Lag) থেকে। 'লগ' কথার অর্থ হোল কোন কিছু যেটা নির্দিষ্ট। অধ্যাপক হল্যাণ্ড বলেন, "A law is a general rule of external action enforced by a sovereign political authority."। অনেকেই আইন বা ইংরাজি 'ল' শব্দটি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ও এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংজ্ঞা নিয়ে এখন মাথা ঘামালে চলবে না। আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় তাতে চাপা প'ড়ে যাবে। প্রাচীন ভারতের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আইনটা কি তা জানা দরকার। তাই ভূমিকায় একটিমাত্র সংজ্ঞা বসিয়ে দিলাম। আলোচনাকে এবার সরাসরি প্রাচীন ভারতেই ফিরিয়ে নিচ্ছি।

প্রাচীনভারতে আইনকে সমাজ অপেক্ষা, এমনকি রাজা বা রাষ্ট্র অপেক্ষা বড় ক'রে দেখা হোত। বিশেষ করে হিন্দু আইনগুলো ছিল 'রাজার রাজা'। অনেকক্ষেত্রেই রাজা যদিও সবার উপরে ছিল, তাহলেও এমন কতকগুলো বিষয় ছিল যাতে অন্যায় করলে সাধারণ লোকের চেয়ে রাজার দণ্ড বেশী হোত। মনু বলেছেন,—

"কার্যাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।

তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণাঃ॥"

অর্থাৎ, যেখানে সাধারণ লোকের দণ্ডমাত্র এক 'কার্যাপণ' সেখানে রাজার দণ্ড হবে হাজার 'কার্ষাপণ।' বস্তুত রাজাকে আইনের উপরে ব'লে চিন্তা করা হোত না।

প্রাচীন ভারতে 'ধর্ম' কথাটা আইনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হোত। সমাজকে খাঁটি রাখতে যা কিছু আইনের দরকার হোত সবই এই 'ধর্ম' কথাটি দিয়ে বোঝান হোত। নৈতিক এবং ধর্মীয় আইনও এর মধ্যেই বোঝাত। তবে, ধর্ম নিরপেক্ষ আইনের উদ্ভব তখনো হয়নি বলেই এমন ধারণা মানুষ পোষণ করত। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে ধর্ম-নিরপেক্ষ আইনেরও দরকার হোল। এগুলোকে তখন 'ব্যবহার' নাম দেওয়া হোল। পরবর্তীকালে এই 'ব্যবহার' ও ধর্মের মতই কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। চাণক্যসূত্রে বলা হয়েছে,—'ব্যবহার' ধর্মের থেকে প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে নিই,—মুনিরা আইন প্রণেতা নন, ব্যাখ্যাতা মাত্র (ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ)।

আইনের উৎস হোল বেদগুলি এবং বেদজ্ঞদের আচার অনুষ্ঠানের গতানুগতিকতা। গৌতম বলেন, "বেদো ধর্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে।" গৌতম তাঁর এই কথাকে প্রতিষ্ঠা দিতে আরো বলেছেন, রাষ্ট্রনৈতিক এবং নৈতিক আইনগুলির একটি দিব্য উৎস (divine origin) আছে এবং সেগুলি ধর্মীয় পুস্তকের আকারে দেখা দিয়েছে। অন্যত্র গৌতম বলেছেন,—"বেদো ধর্মশাস্ত্রাণ্যঙ্গান্যুপবেদাঃ পুরাণং দেশ-জাতিকুলধর্মাশ্চাম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণং কৃষি বণিক পাশুপল্য কুসীদকারবঃ॥" XI. 19-21 এখানেও গৌতম বলতে চান,—আইন ও বিচার হবে বেদ দ্বারা, বেদাঙ্গ দ্বারা, পুরাণ দ্বারা পরিচালিত; দেশ জাতি, কুল, ধর্মের এবং নামের অবিরুদ্ধ, এবং কৃষক, বণিক, পশুপালক ও যন্ত্রশিল্পীদের আদর্শ (প্রমাণ)।

আপস্তম্ব উল্লেখ করেছেন, বেদই হোল আইনের প্রাথমিক উৎস। শিক্ষিতের চুক্তি, তাঁর মতে গৌণ উৎস।

বৌধায়নও প্রায় একই কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় আইনের উৎস তিনটি, বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টদের আচরণ।

মনু বলেন,—

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।

আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" II. 6

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণং॥" II. 12.

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, ভাল আচরণ এবং আত্মতুষ্টি এই চারটি হোল আইনের উৎস। যাজ্ঞবল্ক্য এই চারটি ছাড়া আরো দশটি উৎসের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়,

"পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ॥" I. 3.

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্॥" I. 7.

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাড়তি দশটি উৎস তত উজ্জ্বল নয়। তাই পরবর্তী চিন্তাবিদদের চিন্তায় এর ছায়া পড়েনি।

প্রাচীন ভারতের আইনের উৎস কি কি মোটামুটি জানা হোল। এবার ঐ উৎসগুলির একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। বেদকে যদিও প্রাথমিক এবং মুখ্য উৎস বলে ধরা হয়েছে, তবু ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনগুলির দিক থেকে বিচার করলে এবং ব্যবহারিক আইনের ক্ষেত্রেও তাকে বেশী মূল্য দেওয়া যায় না।

আইন সাহিত্য হিসাবে স্মৃতির যথেষ্ট দান আছে।

এগুলো সূত্রাকারে লেখা, কিন্তু তার খুব কম অংশই কালের চক্রান্ত এড়িয়ে আমাদের হাতে এসেছে। কালক্রমে নানা ধর্মশাস্ত্র উদ্ভূত হওয়ার ফলে স্মৃতির অনেক অংশই চাপা পড়ে গেছে। অনেক সময় আবার স্মৃতিগুলোই সংকলনের ছাঁচে নানা ধর্মশাস্ত্রে ঢালাই হয়েছে। কালের পরিবর্তনে আইনও যে রূপ বদল করে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রই তা প্রমাণ করে। যাজ্ঞবল্ক্য মোট কুড়িজন সংকলয়িতার নাম করেন,—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥" 1.4-5.

কিন্তু, এই কুড়িজন ছাড়াও সংকলনের ক্ষেত্রে আরো অনেকের নাম করা চলে। তাদের মধ্যে নারদের নামটাই আগে উল্লেখ করা দরকার। আইনজগতে তাঁর প্রভাব ছিল খুব বেশী—অবশ্য সংকলয়িতা হিসাবেই। জে, জলি (J, Jolly) তাঁর প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ করেন।

এইবার আইনের উৎস হিসাবে শিষ্টজনের আচরণ বা প্রথার কথায় আসি। আইনের উৎস হিসাবে প্রথা বা আচরণগুলির গুরুত্ব কম নয়। আপস্তম্বকে, "অনুসরণ করে 'Sacred books of the East' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, "It is difficult to learn the sacred law from the Vedas; but following the indications, it is easily accomplished These indications are the practices of the sages". (II. 11. 29, 13) এখন কথা হোল শিষ্ট কারা? শিষ্ট হোল তারাই যারা বেদ ও তার আনুসঙ্গিক গ্রন্থে সুপণ্ডিত এবং জানেন কি করে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বিদ্যা থেকে বাস্তবে নিজেকে সুপরিচালিত করতে হয়। বৌদ্ধায়নে তাই বলা হয়েছে,—

ধর্মেণাধিগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
শিষ্টাস্তদনুমানজ্ঞাঃ শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষহেতবঃ।" I, 1.1.6.

প্রথাজাত আইন সবদেশেই এখনো আছে, আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। রোমে এগুলিকে বলা হয় Jus moribus constitutom; এবং ইংলণ্ডে বলা হয় 'Common law'. ব্যবহারশাস্ত্র শিষ্টদের প্রথাগুলিকে আইনের উৎসের দিক থেকে খুব বেশী বস্তুপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। দেশে প্রচলিত সকল প্রথাই আবার আইনে পরিণত হওয়ার দাবী রাখে না। মনু বলেন, পুরোণ প্রথা বা আচরণ হোল অত্যুৎকৃষ্ট আইনের উৎস। মনু আরো এক জায়গায় বলেছেন, মানুষের আচরণের মধ্যে সদাচারই কেবল আইনের উৎস বলে গণ্য হতে পারে (—আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মতুষ্টিরেব চ)। যাজ্ঞবল্ক্যও একই ধাঁচের কথা বলেছেন।

আত্মতুষ্টি হোল আচরণের শাসন মাত্র, কিন্তু সরাসরি আইনের উৎস নয়। দৈনন্দিন জীবনে বিবেকের নির্দেশ একটি বড় অংশ দখল করে। এই বিবেকের নির্দেশ যথাযথ পালিত হলেই আত্মতুষ্টি আসে। আত্মতুষ্টিকে নৈতিক আইনের উৎস বলে ধরে নিলে ভুল করা হোত না। কিন্তু প্রাচীন ভারতের কোন লেখকই তা করেন নি।

রাজারা কখনই আইন তৈরী করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নেননি। তবে তাঁরা আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সর্বদাই চরম অধিকারী ছিলেন। 'পরিষদ' আইন প্রণয়ন করত। 'পরিষদ'কে আর এক কথায় 'সভা' বলা হোত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সভা' ছিল ধর্মাধিকরণের নামান্তর; অপর পক্ষে 'পরিষদ লোভমুক্ত জ্ঞানী বেদজ্ঞদের একটি সংঘ' মাত্র। বৌদ্ধায়নে আছে—

"চাতুর্বৈদ্যং বিকল্পী চ অঙ্গবিদ ধর্মপাঠকঃ।
আশ্রমস্থা স্ত্রয়ো বিপ্রাঃ পর্ষদেষা দশাবরা ॥
পঞ্চবা স্ত্রয়ো বা স্যুরেকো স্যাদনিন্দিতঃ।
প্রতিবক্তা তু ধর্মস্য নেতরে তু সহস্রকাঃ ॥ 1, 9, 10

অর্থাৎ যাঁরা চারটি বেদের অন্তত একটিতে অভিজ্ঞ, একটি মীমাংসায় অভিজ্ঞ এবং যারা বেদাঙ্গ পড়েছে তারাই পরিষদ বা আইনসভা গঠন করতে পারত। কমপক্ষে দশ জন নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হোত। গৌতম (XVIII 48) এবং বশিষ্ঠ (Ch. III) একই ধরণের কথা বলেছেন। তাহলেও ঠিক এমন আইনসভা পাওয়া খুব কঠিন ছিল। তাই বশিষ্ঠ বলেছেন,—

"চত্বারোঽপি ত্রয়ো বাপি যং ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরেষাং সহস্রশঃ ॥" III 7.

এর অর্থ হচ্ছে, যেটা তিন চারজন পূর্ণবেদজ্ঞ অনুমোদন করেন সেটা হাজার জন মূর্খ অনুমোদন না করলেও অবশ্যই শ্রেয় বলে ধরে নিতে হবে। পরের শ্লোকেই বশিষ্ঠ একথাকে আরো দৃঢ়ভাবে বলেছেন। শ্লোকটি,—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পর্ষত্বং নৈব বিদ্যতে ॥" III. 8.

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কখনো ব্রতহীন, মন্ত্রহীন, জাতিগত পেশায় যারা নিযুক্ত থাকে (অর্থাৎ নীচ জাতি), তারা হাজার জনে মিলেও একটা পরিষদ গঠন করেছে এমন নজির নেই।

তাছাড়া আরও একটা কথা বলার মত আছে। এমনও দেখা গেছে একজনের মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ও তার মতামত অনেক সময় পরিষদের মতামতের ঠিক সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেখানে সংশয় আছে, সেখানে গুণী হলেও একজনের মাত্র মতামতকে আইন তৈরী ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। বৌদ্ধায়নে ঠিক এই কথাই আছে, –
"হ্যেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ে।" 1. 3.

গোয়েন্দার হার

প্রভাস মল্লিক

বনবিহারী বসু, প্রসিদ্ধ জুয়েলার, কলিকাতায় যে কয়জন সব চেয়ে ধনী ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের অন্যতম। সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের অসচ্ছল পিতার অযত্নে মানুষ হয়েও তিনি যে এই খ্যাতির ও বিত্তের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তার পেছনে আছে তাঁর অদমনীয় উৎসাহ, বিচক্ষণতা আর তাঁর দূরদৃষ্টি। তাই তাঁর "বি, বি, বি, জুয়েলারী" প্রতিষ্ঠানের কর্মচারির সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচশরও উপর। কিন্তু এই প্রতিটি কর্মচারির উপর তিনি রেখেছেন প্রখর দৃষ্টি। তিনি এও জানেন যে তাঁর কর্মচারিদের মধ্যে কজন আছে, তাঁর আত্মীয় ও সমব্যবসায়ী বিজন দত্তর ভাড়াটে লোক। বিজন দত্তর সঙ্গে তাঁর রেশারেশি বরাবরই। আর এই রেশারেশি ক্রমেই বেড়ে চলেছে যতই তিনি ব্যবসায় উন্নতি করে চলেছেন আর বিজন দত্ত ব্যবসার পাল্লায় পেছিয়ে পড়ছে। বিজন দত্তর লোক জেনেও কিন্তু তাদের বরখাস্ত করেননি তিনি, শুধু তাদের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছেন একটু বেশী।

সেবার তাঁর কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হ'ল। তিনি দেশে মস্ত সুগার ফ্যাক্টরী বসাবেন। তাঁর একমাত্র পুত্র আমেরিকা থেকে সুগার টেকনোলজিস্ট হয়ে শীঘ্রই দেশে ফিরবে। বহু মূল্যবান তিনটি হীরে তিনি এতদিন ধরে রেখেছিলেন, সে কয়টি বোম্বাই-এর এক প্রসিদ্ধ সিন্ধি জুয়েলারের কাছে বিক্রী করার পাকা বন্দোবস্ত করে তিনি প্লেনে একটা সিট বুক্ করলেন। মনে তার সন্দেহ হয়েছিল যে হাজার সতর্কতা অবলম্বন করলেও তার গতিবিধি আর হীরে বিক্রী করার কথা হয়ত বিজন দত্তর অজানা থাকবে না। তাই ভেতর ভেতর রেলের ফার্স্ট ক্লাসের একটা সিটও তিনি রিজার্ভ করে রাখলেন বোম্বাই মেলে। যেদিন বোম্বাইর পথে রওনা হবার কথা তিনি সেদিনও তাঁর রুটিন মাফিক তাঁর অফিসে হাজির হয়ে প্রত্যেক কাজের তদারক করলেন যাতে কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে যে তিনি কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলেছেন।

স্টেসনে তাকে পৌঁছে দিতে এল, বৃদ্ধ ম্যানেজার ও তার অতি বিশ্বস্ত ড্রাইভার। ম্যানেজার তাকে অনুরোধ করেছিল বটে সঙ্গে লোক নেবার কিন্তু তিনি রাজি হলেন না এই বলে যে, যত সঙ্গে লোক নেবেন ততই গোলমাল সৃষ্টির সম্ভাবনা। এত সতর্কতা অবলম্বন করেও ট্রেনে উঠে তার অনুসন্ধিৎসু চোখ গিয়ে পড়লো তার এক কর্মচারি, অনুকূলের দিকে সে ভিড়ে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেও বনবিহারীবাবুর দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি চিন্তিত হলেন, কারণ অনুকূল বিজন দত্তের লোক ও আজ সে কারখানাতে অনুপস্থিত ছিল। তিনি কিন্তু ম্যানেজার বা ড্রাইভারকে কিছুই বল্লেন না। ফার্স্ট ক্লাসটা পুরো রিজার্ভ করেননি তিনি ইচ্ছে করেই, কারণ তার মতে খালি গাড়ীতেই বিপদের আশঙ্কা বেশী। কামরায় আর কোন রিজারভেসান না থাকায় তিনি একটু চিন্তিত হলেও মুখে প্রকাশ করলেন না কিছু। গাড়ী ছাড়বার মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, একজন ভদ্রলোক এক রেলওয়ে কর্মচারির সঙ্গে এসে উঠলেন তারই কামরাতে। রেলওয়ে কর্মচারি যে রিজারভেসান্ স্লিপ এটে দিয়ে গেল তাতে লিখা আছে—অনিল গুপ্ত। সুপুরুষ চেহারা সুন্দর দেহের গঠন ও সঙ্গে জিনিস পত্তরে লণ্ডন, প্যারি, রোম প্রভৃতি লেবেল দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বনবিহারীবাবু এই ভেবে যা হোক একজন ভদ্র সহযাত্রী পাওয়া গেল। গাড়ী ছাড়লে তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। ভদ্রলোক কিছুদিন হ'ল বিলেত থেকে ফিরেছেন, বোম্বাই এ কোন ফার্মে একটা এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট পেয়ে

চলেছেন বোম্বাই এর পথে। মিঃ গুপ্তর চালচলন ও কথাবার্ত্তা বনবিহারীবাবুর ভালই লাগলো। ট্রেন চলেছে। বর্দ্ধমান এলে বনবিহারীবাবু এসে দাঁড়ালেন দরজায়। সীতাভোগ মিহিদানার বরাবরই ভক্ত তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখ গিয়ে পড়লো অনুকূলের দিকে সে জলের কলের সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। "তবে কি অনুকূলও এই ট্রেনেই চলেছে।"—ট্রেন ছেড়ে গেলে অনেক এলোমেলো ভাবনা এসে তাঁকে অস্থির করে তুললো। এই লোকটার সঙ্গে অনুকূল কি বিজন দত্তর কোন যোগ থাকতে পারি কি! তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেলো এই লোকটা বলেছিল বটে তার বাড়ী কেয়াতলা রোডে, বিজনও থাকে ওই রাস্তাতেই। তিনি একটু বিচলিত দেখলে হয়ে পড় লেন ভাবলেন এ লোকটাকে একটু যাচাই করে কি হয়!

সঙ্গে বড় 'থারমসে' চা নিয়ে এসেছিলে বনবিহারীবাবু। গুপ্তকে চা পান করবার অনুরোধ করায় প্রথমটা আপত্তি করলেও শেষে অনুরোধ এড়াতে পারলে না সে। বনবিহারীবাবু সুচতুর হাতে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন ঘুমের ঔষধ। তিনি ইনসমনিয়ার রুগী, তাই ট্রেনে ঘুমের বড়ী সঙ্গে আনেন যখনই ট্রেন ভ্রমণে বার হন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। গুপ্ত খানিকক্ষণ 'ফরেন' জার্নালগুলো নিয়ে এপাশ ওপাশ করে পরে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো। বনবিহারীবাবু ভাবলেন হয়ত তার ঔষধের কাজ সুরু হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুপ্তর নাসিকা গর্জ্জন শুনে তাঁর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। ট্রেন দুর্ব্বার গতিতে ছুটে চলেছে,পরের স্টেশন আসতে অনেক দেরি। তিনি প্রথমেই গুপ্তর পায়ের কাছে ঝোলানো কোট হাতড়ে দেখলেন তাতে কিছু নেই, এমন কি একটা কাগজের টুকরোও। শুধু বুক পকেটে একটা বাহারী রুমাল উঁকি মারছে। কি মনে হ'ল তাঁর রুমাল তুলে নিলেন পকেট থেকে। একটা বিলিতি সেণ্টের গন্ধ তার নাকে এল ও হাতে লাগলো একটা ছোট্ট পাতলা কাগজ। কাগজটা টর্চ্চের উজ্জ্বল আলোতে মেলে ধরে অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করলেন।

"মিত্তির" বোম্বাই মেল, শুক্রবার। বড় ধুরন্ধর লোক। গয়ায় আমার লোক দেখা করবে। অনুকূলও চলেছে। প্রাণে মেরো না। বখরা 50।50। হাতে খড়ি কর;—স্কটল্যাণ্ড ফেরৎ। ইতি

বি, ডি

বনবিহারী বাবুর শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো। তবে তাঁর ধারণা ঠিকই। বি, ডি—মানে বিজন দত্ত তবে স্কটল্যাণ্ড ফেরৎ গোয়েন্দা লাগিয়েছে তাঁর পেছনে। রুমালের ভাঁজে চিঠিটা যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে রেখে তিনি আড়চোখে দেখলেন লোকটার দিকে, সে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মনের জোর তাঁর অসাধারণ। তিনি ভাবলেন এখন ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেলেই তাঁর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। খুব সন্তর্পণে গুপ্তর মাথার কাছের এটাচি কেস থেকে চাবির রিংটা তুলে নিলেন। তারপর খুললেন গুপ্তর সুটকেশটা। প্রথমেই চোখে পড়লো একটা 'লোডেড' রিভলবার ও কয়েকটা গুলি। তিনি রিভলবার থেকে গুলিগুলো বার করে জানলা দিয়ে বাহিরে ফেলে দিলেন। সুটকেশে অন্য কোন সন্দেহজনক জিনিস নেই। কয়েকটা চিঠি প্রত্যেকটা অনেক প্রশংসা করে লিখেছে অনেকে তাকে, তার বিলেত থেকে ফেরার পর। তার আসল নাম সুরজিৎ মিত্র। বুঝলেন, পাকালোক কারণ সুটকেশে দুরকম ছাপানো কার্ড আছে, কয়েকটা অনিল গুপ্ত নামে আর কয়েকটা সুরজিৎ মিত্র নামে। সুটকেশ বন্ধ করে যথাস্থানে রাখলেন চাবির রিংটা। নিজের বিছানায় এসে চিন্তা করতে লাগলেন এই ভাড়াটে পাকা গোয়েন্দার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁর পক্ষে কি সম্ভব! হীরে তিনটে রেখেছিলেন তিনি একটা সাধারণ কোরা কাপড়ের টুকরো জড়ানো তাঁর ফ্ল্যানেলের ফতুয়ার ভেতরের দিকের পকেটে। সেগুলো একবার হাতে করে দেখে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, দুদিন দুরাত্রি এর সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে যদিও প্রথম রাউণ্ডে তিনি গুপ্তকে হারিয়ে দিয়েছেন। গুপ্ত অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একেবারে দুটো বড়ি মিশিয়ে দিয়েছিলেন, 'ডোসটা' তার পক্ষে বেশীই হয়েছে বোধহয়। অনেক রকম চিন্তা বনবিহারী বাবুর মনে এলোমেলোভাবে এসে ভিড় করতে লাগলো। গুপ্ত তার এই B. O. A. C মার্কা 'এয়ার' ব্যাগে রেখেছে সিগারেটের টিন, পার্শ, টুথপেষ্ট প্রভৃতি দরকারি জিনিদ ছাড়া কতরকম চাবি,

ছোট বড় স্ক্রু ড্রাইভার ও অনেক ছোট ছোট মেসিন যা তিনি কখনও চোখে দেখেন নি। এই দু'দিন দুরাত্রি জেগে কাটানোর কথা তাঁর পক্ষে চিন্তাও করা যায়না, একেতো ব্লাড্‌প্রেসারের রুগী তিনি। অনেক উপায় চিন্তা করতে করতে তাঁর মাথায় একটা অদ্ভুত উপায় খেলে গেল। তিনি বুঝলেন এতে মার খেলে তিনি ডুবে যাবেন অতল জলে। তবুও একবার দেখাই যাক না। একটু শীত শীত করতে লাগলো। তিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বারটা বাজতে বেশী দেরি নেই। গয়া এ'সে পড়বে শীঘ্রই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গয়ায় এসে থামলো। চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখলেন একটা লোক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে গুপ্তর মাথার কাছে জানলায় 'ট্যাপ্' করতে সুরু করলে। গুপ্ত ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো ও ভেতর থেকে 'লক' খুলে প্ল্যাটফরমে নেমে গেল। তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। নামবার সময় আড় চোখে বনবিহারী বাবুর দিকে দেখে নিলে। বনবিহারী বাবু ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে রইলেন। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত উঠে পড়লো ট্রেনে একাই ও ভেতর থেকে 'লক' করে দিলে। বনবিহারী নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলেন। হাজারিবাগেই সঙ্গে আনা লুচি, তরকারি ও মিহিদানার সদ্ব্যবহার করে নিয়েছিলেন। অভ্যাসমত ঘুমের বড়িও খেয়ে ছিলেন গয়া আসার কিছু আগে। গাড়ী ছাড়ার কিছু পরেই তাঁর চোখে নেমে এল ঘুম।

সারা রাত্রি গভীর নিদ্রার পর, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে 'ডাইনিংকার'-এর 'বয়' অর্ডারমত চা বিস্কুট নিয়ে তাঁকে ডাকাডাকি করছে। গুপ্ত তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই 'সুপ্রভাত' জানালে, কেটলি থেকে তখন কাপে চা ঢালছে। বনবিহারীবাবু তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে চা খেতে লাগলেন। দুজনেই খবর কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, দু-একটা সাধারণ কথার বিনিময় হল। দুজনেই পাকা অভিনেতা। মনের ভেতর যে ঝড় বইছে তার কিছুই প্রকাশ পেল না। গুপ্ত আরো কিছুক্ষণ বই এর পাতা উল্টে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। যখন তার নাক ডাকার শব্দ কানে এল তখন বনবিহারীবাবু হাসতে লাগলেন এই ভেবে যে লোকটা নিশ্চয়ই সারা রাত্রি জেগে কাটিয়েছে।

'ডাইনিংকার'-এর বয় যখন দুপুরের খাবার নিয়ে এল তখন একটা বেজে গেছে। গুপ্ত ঘুম থেকে উঠে মাংস ভাতের সদ্ব্যবহার করলে। বনবিহারীবাবুর অর্ডার দেওয়া ছিল ভেজিটেবল তরকারি আর রুটির। খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে মামুলি দু একটা কথার আদানপ্রদান হ'ল। বনবিহারীবাবু লক্ষ্য করলেন যে গুপ্ত খুব চিন্তিত। সে ইংরেজি ডিটেকটিভ্ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলে। দু একবার আড়চোখে দেখলে সে বনবিহারীবাবুর দিকে। তিনি তখন হেমেন রায়ের এড্‌ভেনচারের গল্প পড়ছেন এক মনে। গুপ্ত কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়লো। বনবিহারীবাবু মনে মনে আবার হাসলেন এই ভেবে যে গুপ্ত রাত্রির জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। রাত্রি নটার সময় বনবিহারীবাবু আগের দিনের মত রাত্রির খাওয়া সেরে চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন গুপ্ত ঘুম থেকে উঠে আবার বই নিয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, বনবিহারীবাবু তাঁর অভ্যাসমত ঘুমের বড়ী খেতে ভোলেননি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে পরের দিনের মত বয় এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল চা মাখন রুটি। গুপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বনবিহারীবাবু মনে মনে হাসলেন, নিশ্চয় সে সারা রাত্রি জেগে কাটিয়েছে। সম্ভবতঃ কামরার কোন জায়গাই সে বাদ দেয়নি খানাতল্লাসী করতে। ট্রেন প্রথম থেকে লেটে চলেছে। বেলা দুটোর আগে যে বোম্বাই পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। গুপ্তকে দেখে মনে হ'ল সে অস্বাভাবিক গম্ভীর। বনবিহারীবাবু দু-একটা কথার অবতারণা করলেন বটে কিন্তু ওর কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে টাইমটেবল, ঘড়ি ও মাইল পোষ্ট দেখে গাড়ী কত লেট যাচ্ছে তার হিসেব নিকেশ করতে লাগল। তাঁকে চিন্তিত ও ক্লান্ত বোধ হতে লাগলো ও বিছানায় আড় হয়ে শু'য়ে পড়লো। আগের দিনের মত 'বয়' খাবার দিয়ে গেল। গুপ্ত খাওয়াদাওয়া সেরে বেডিং গুটিয়ে জিনিসপত্তর সব গোছাতে লাগলো। বোম্বাই আসতে বড় দেরি নেই। হঠাৎ গুপ্ত প্রশ্ন করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই, "আচ্ছা, আপনি বোম্বাই চলেছেন কেন, বল্লেন না ত?" বনবিহারীবাবু হেসে বল্লেন, "আমি

কেন চলেছি, সত্যিই কি আপনি জানেন না?" গুপ্ত মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বল্লে, "কি বলছেন আপনি? আপনি কেন চলেছেন আমি কি করে জানবো?" বনবিহারীবাবু শ্লেষের সঙ্গে বল্লেন--

"সত্যি আপনার এতটা পরিশ্রম কাজে এল না।"

"মানে? কি বলছেন আপনি?"

"মিঃ সুরজিৎ মিত্র, স্কটলাণ্ড ফেরৎ ডিটেকটিভ, প্রসিদ্ধ জুয়েলার বিজন দত্তর বন্ধু আপনি। সত্যিই এতটা পথ আসা পণ্ডশ্রম হল না?" বলে বনবিহারী হাসতে লাগলেন।

গুপ্তর মুখে কোন কথা নেই। সে পরে গম্ভীরভাবে বল্লে, "হ্যাঁ, তা হলে সবই জানতে পেরেছেন। 'বিজন ঠিকই বলেছিল যে আপনি ধুরন্ধর লোক। নিশ্চয়ই হীরেগুলো প্লেনে আর কারুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে ভুল পথে টেনে এনেছেন। সত্যিই আমি হার স্বীকার করছি।"

বনবিহারীবাবু হাসতে লাগলেন। পরে বল্লেন "আপনারা এও জানেন যে আমি প্লেনে একটা সিট বুক করেছিলাম। সত্যি আপনারা কম ধুরন্ধর নন, আমি এত সতর্কতা অবলম্বন করলেও দেখছি যে আপনাদের কাছে কোন খবরই অজানা নেই! যাক্, আপনার অনুমান কিন্তু ঠিক নয়। আমি হীরেগুলো আমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছি।"

"আমি বিশ্বাস করি না, এই দুদিন দুরাত্রি আমি এ কামরার কোন জায়গাই বাদ দিইনি", উত্তেজিত ভাবে গুপ্ত বল্লে। বনবিহারী বাবু ফতুয়ার পকেট থেকে কোরা কাপড়ের ভেতর নীল কাগজে জড়ানো হীরে তিনটে বার করে হাসতে লাগলেন। গুপ্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো হীরে তিনটের দিকে। তার মুখে কোন কথা সরলো না। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, "আচ্ছা আপনি এগুলো কোথায় রেখেছিলেন বলবেন কি? নিশ্চয়ই এই ট্রেনেই অন্য কামরায় আপনার লোক চলেছে কারণ আমি হলফ্ করে বলতে পারি এগুলো এ কামরায় ছিল না।"

হীরেগুলো যথাস্থানে রেখে তার গতিবিধির দিকে নজর রেখে বনবিহারী বাবু বল্লেন, "মিঃ মিত্র, এগুলো এ ঘরেই আছে, সেই কলকাতা থেকে যখন ছেড়েছি সেই সময় থেকেই। আপনি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছেন না? আশ্চর্য্যান্বিত হবারই কথা। পরশু সন্ধ্যার পর আমি যখন শুতে যাই সেই সময় থেকে এগুলো ছিল আপনার মাথার কাছে ঝোলানো আপনারই কোটের ভেতরের পকেটে। যখনই আমি ঘুমিয়েছি তখন আপনি সব জায়গা ও জিনিসপত্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন কিন্তু আপনার নিজের ঝোলানো কোটের পকেট যে দেখবেন না সেটা আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম বলেই এতটা ঝুঁকি নিতে পেরেছি। হ্যাঁ, আজ সকালে আপনি যখন ল্যাভাটরিতে ঢোকেন সেই সময়ে এগুলো আবার আপনার কোটের পকেট থেকে নিজের ফতুয়ার পকেটে ফেরৎ নি।"

ট্রেণ তখন ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনাল পেরিয়ে ষ্টেসনের দিকে ছুটেছে। গুপ্ত হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বার করে বনবিহারীবাবুর মাথার কাছে ধরে বল্লে ওগুলো আমার হাতে দিন, না হলে আপনার মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।" বনবিহারীবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে উচ্চ হেসে বল্লেন, "ডিটেকটিভ সাহেব, এ বারেও মানে ফ্যাইনাল রাউণ্ডেও আপনি হেরে গেলেন। আপনার রিভলবারে একটাও গুলি নেই।"

গুপ্ত তখন পাগলের মতন রিভলবার খুলে বিস্মিত হয়ে দেখলে যে সত্যিই এতে একটাও গুলি নেই। বনবিহারীবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখে তাঁর হাতের লাঠির ভেতরের গুপ্তি বার করে নিজেকে কোন আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাইরে সিদ্ধি জুয়েলার উত্তমচাঁদের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে বনবিহারীবাবু নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর তিনি হেসে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। গুপ্ত বজ্রাহত বনস্পতির মত নিশ্চল বসে রইলো। নামতে তার পা সরলো না।

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

(বৈশাখ মাসের ফল)

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত মাঘ সংখ্যায় আমরা বুধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে বুধ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

বুদ্ধির কারক বুধ। সুতরাং যুক্তি, বিচার ও অনুমান প্রভৃতি যা কিছু বুদ্ধির কাজ সব বুধের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তিনি বিচার-বিবেচনা করে যুক্তি তর্কের সাহায্যে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য জানার চেষ্টা করেন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুধ তাকে বিচার করেন এবং যাচাই করেন—তারপর তার প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জ্ঞানাহরণের প্রতি পদক্ষেপে তার অনুসন্ধিৎসু মন বিচার-বুদ্ধির মাপকাঠিতে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়। তার মধ্যে কুসংস্কার নেই। তার মন পক্ষপাত ও ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত নয়। তিনি জানেন, বিচার-বুদ্ধি যদি সংস্কারমুক্ত, পক্ষপাত শূন্য ও যুক্তিসংগত না হয়, চিন্তাধারা যদি সঠিক পথে পরিচালিত না হয়, বিশুদ্ধজ্ঞান ও সত্যলাভ সম্ভব হতে পারে না।

বুধে জ্ঞান প্রত্যক্ষের সীমায় আবদ্ধ। তার অনুসন্ধানী মন প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়িয়ে অজানা ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। এবং অতীতের কথাও তিনি চিন্তা করেন। কিন্তু অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুপস্থিত বিষয়ের বিচার তার সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল হয় না।

বুধের এই প্রকৃতির জন্য, প্রত্যেক জিনিষকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করেন—তারপর তার জ্ঞানগুলো নিজের ভাণ্ডারে জমা করে রাখেন। যা কিছু জ্ঞান এ-পর্যন্ত লব্ধ হয়েছে, সব তার খাতায় জমা আছে। তিনি হিসাব-রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ। জ্ঞানের প্রত্যেক দফাটি তার স্মৃতির খাতায় ও ভাণ্ডারে জমা থাকে। বুধের কাজ শুধু জমা করা। জিনিষের ভাল-মন্দ বা উপযোগিতা-অনুপযোগিতার বিচার তিনি করেন না। তিনি যা পান, তাই সংগ্রহ করেন। তিনি প্রত্যেক দফাটির স্বতন্ত্রভাবে হিসাব রাখেন। কার সঙ্গে কার সাদৃশ্য বা বিরোধ তা তিনি জানেন না।

বুধ সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করতে পারেন; এবং তা থেকে ছোট ছোট সত্য তৈরী করতে পারেন। তিনি কোন বিষয়ের সারাংশ লিখতে পারেন, কোন ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারেন কিংবা কোন কর্মের সূচীপত্র তৈরী করতে পারেন। আর বৃহস্পতি আশ্লেষণ করতে পারেন এবং ব্যষ্টিকে সমষ্টি করতে পারেন; অর্থাৎ গুটিকতক দৃষ্টান্ত হতে সমগ্র শ্রেণীবিশেষের প্রকৃতি নির্বাচন করতে পারেন। কাজেই বুধের ভাণ্ডারে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে বসানো রয়েছে—তার মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য নেই। আর অনেক জিনিষের মধ্যে ঐক্য, অসম পদার্থের মধ্যে সাম্য এবং অসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা বৃহস্পতির কাজ। সেজন্য বুধের চক্ষে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প, মূল

ও কাণ্ড প্রভৃতি সব আলাদা জিনিষ। আর বৃহস্পতির কাছে তারা সবগুলি মিলে একটি সমগ্র বস্তু হয়ে উঠেছে—পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট এক বৃক্ষ—সবই তার অঙ্গ। বুধ জিনিষকে চোখের সামনে ধরে তার প্রত্যেক খুটিনাটিটি আলাদা করে দেখেন এবং মনে করেন, কত রকমের অসংখ্য জিনিষ—বৃহস্পতি দূর থেকে দেখেন এবং জানেন, তারা সব একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, আলাদা করে দেখলেও তাদের মধ্যে একত্ব আছে।

বুধের কারকতার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—মর্যাদাবোধ বাড়িয়ে তুলুন। বন্ধু হতে দূরে থাকুন, ভ্রমণযোগ রয়েছে। আর্থিক দিকটা ভাল না। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করবে। গুরুজনদের কারো সংকটজনক পীড়াদিরও যোগ দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের গোলমাল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে তরুণদের বাধা আসতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা ভাল-মন্দ মেশান।

বৃষ—সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হবেন না। আপনার সুদিন ফিরে আসছে। আপনার অর্থপ্রাপ্তি যোগ দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়-বিরোধ মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্র ভাল। সম্বন্ধ লাভ হবে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের গোলযোগ দেখা যায়। গুরুজন হানি হতে পারে। বিবাহে যৌতুকাদি প্রাপ্তি যোগ রয়েছে। মনোমত ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

মিথুন—এবার আপনার দুর্যোগপূর্ণ সময়ের অবসান হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। ছেলেমেয়েদের বিবাহ হবে। প্রাপ্য টাকা আদায় হবে। পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ব্যবসায়ীদের সুবর্ণ-সুযোগ। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ বাড়বে। কর্ম পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। মহিলাদের অনুরূপ ফল।

কর্কট—দোটানা মনোভাব এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সুপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। বন্ধুলাভ হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মের চাপে মাঝে মাঝে বিব্রতবোধ করবেন। অসতর্ক থাকার জন্য জিনিষপত্রের ক্ষতি হতে পারে। দূর ভ্রমণ হতে পারে। মাতৃহানির যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা যায়। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

সিংহ—কর্ম পরিবর্তনের যোগ দেখা যায়। আর্থিক দিকটা ভাল। মাঝে মাঝে খরচের ঝামেলায় বিব্রত বোধ করবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। আত্মীয় বিরোধ হতে পারে। মামলা-মোকদমা এড়িয়ে চলুন। ছেলে-মেয়েদের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের কারণ নেই। গুরুজনদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। যে কোন কারণে শোক পেতে পারেন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

কন্যা—ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করবেন না। কোন কারণে মানসিক ক্ষোভ বাড়তে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতিতে বাধা পড়তে পারে। আত্মীয় বিরোধ হতে পারে। গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। বিবাহে বাধা আসতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

তুলা—আপনার বিগলিত ভাব ত্যাগ করুন। কারো ঝামেলায় না থাকাই ভাল। সম্মান হানির যোগ রয়েছে। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক দিকটা ভাল। পারিবারিক শান্তির কিছুটা হ্রাস হবে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কিছুটা উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ আছে। গুরু-জনদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। বিদ্যার্থীদের সময়টা গোলমেলে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। মহিলাদের সময়টা প্রতিকুল।

বৃশ্চিক—ভাল এবং মন্দ দু'রকম ফলই পাবেন। কর্ম-ক্ষেত্রে শত্রুতার অবসান হবে। বাইরে যাবার যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মপরিবর্তনের যোগও দেখা যায়। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

ধনু—অপরের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। আশ্রিত ব্যক্তির দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। গুরুজন হানির যোগ আছে। শরীর সম্বন্ধে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের নানাবিধ যোগে কর্মব্যস্ততা বাড়বে।

মকর—আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে। দূর ভ্রমণ হতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। সন্তানদের ব্যাপারে মনঃকষ্ট পেতে পারেন। লটারীর টিকেট কাটুন, টাকা পাবেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করুন। পত্নীর সহিত মতানৈক্য হতে পারে। নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। ভূ-সম্পত্তি কেনা-কাটার ব্যাপারে সময়টা ভাল। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। মহিলাদের মনোমত কার্যে বাধা আসতে পারে।

কুম্ভ—ভ্রাতৃ বিরোধ হতে পারে। মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। আয় বাড়বে। কর্ম পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। মাতৃহানির যোগ দেখা যায়। সন্তাব্যক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। মামলা-মোকর্দমা এড়িয়ে চলা দরকার। দূর ভ্রমণ হতে পারে। বিদ্যার্থীদের পাঠধারা নির্ধারণে গোলযোগ দেখা যায়। মহিলাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সময়টা অনুকূল।

মীন—আনন্দকর পরিবেশের মধ্যে সময়টা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে সুপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতি হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য-হানির যোগ দেখা যায়। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভ ভাব বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। সন্তাব্যক্ষেত্রে তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। মহিলাদের সময়টা মন্দের ভাল।

সংবিত্তি

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

কত দিন কেটে গেছে কত মাস হয়েছে অতীত
কত বর্ষ দেখা নেই কত নূতন হয়েছে পুরানো,
অঘটন কত ঘটে, চেয়েছি যা ঘটেনি তা কত
কালের চরণাঘাতে কত পাওয়া কত না হারানো,
মিলায়ে গিয়েছে সবি জনতার বিস্মৃতি প্রান্তরে,
অসংখ্য তারার মাঝে একটি নক্ষত্র যেন তবু
বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে আছে কুতূহল ভরে
সে তোমার হাসি যেন চিরন্তন মিলাবে না কভু।
আজো যদি একবার কোন এক অবসর ক্ষণে
দখিন গবাক্ষ খুলি চেয়ে দেখ আকাশের নীলে
সহসা আমার কথা মনে পড়ে সেথা আনমনে
সেদিন এ বীণাখানি কোন সুরে তুমি ভরেছিলে!
প্রতিটি নিশ্বাসে আজো যার স্পর্শ বাতাসের সনে
যে ছায়া চাঁদের বুকে নক্ষত্রে তারার মালায়
সে যদি আচম্বিতে ঘুম ভাঙা রাতে কোন ক্ষণে
এসে বলে আগন্তুক পারিবে কি চিনিতে আমায়;
কি বলে ফিরাবে তারে ভেবে দেখ স্মৃতি অবগাহি
কায়া নিয়ে একদিন সামনে যে ছিল সে তোমার
ছায়া হয়ে আজো ঘোরে সদা পিছু মুখপানে চাহি
তাহারে স্মরিয়া তবু আঁখি কেন অকারণে ভার?
কেন হিয়া দুরু দুরু ওষ্ঠ কেন শুষ্ক কম্পমান
শ্রাবণের কালো মেঘ কেন জমে মনেতে তোমার
মুখের সলাজ হাসি কেড়ে নিতে চায় অভিমান
বারে বারে খুলে পড়ে যত্নে ঢাকা আবরণ তার।
যে প্রেয়সী গাঁথে বসি বিরহেতে অশ্রুমালাখানি
পঞ্চ প্রদীপ জ্বালি কামনারে দিয়ে তোমা ডালি
সে কি তবে ব্যর্থ হবে উপচারে এত হাতছানি
বনফুল ঝরা সার সাজিবে না কভু বনমালী?

ইংরাজী উচ্চারণ শিক্ষার ভূমিকা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রথম পরিচয়ের প্রভাব বা "first impression"-টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। প্রথম পরিচয়েই যদি একটা বিমুখতার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা কাটিয়ে সম্মানের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠবে। এটা যেন বিরাট ঋণ-ভার নিয়ে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবার মত কঠিন ব্যাপার। সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম দেহ, অভিজাত চালচলন, সুন্দর হস্তাক্ষর, সুস্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ, এই সবগুলিই হচ্ছে প্রথম পরিচয়ের সার্থক সার্টিফিকেট।" সাধারণ 'ইন্টারভিউ" থেকে আরম্ভ করে জীবনে সুউচ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার পর্য্যন্ত এইগুলির অবদান সামান্য নয়।

এখন সুন্দর মুখশ্রী বা সুঠাম দেহ প্রভৃতি জিনিসগুলি দৈবায়ত্ত ব্যাপার, কর্ম্মায়ত্ত জিনিস নয়। কাজেই সাধনা বা নিষ্ঠার দ্বারা সেগুলিকে ভাল করা যায় না। কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের উচ্চারণকে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল করতে পারি। বেশী বয়সে সেটা কঠিন কাজ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বেশী বয়সে ব্যবহারিক সাফল্যটা কঠিন হলেও "উচ্চারণ-বিজ্ঞানের" "থিয়োরি" (theory)টা আয়ত্ত করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। বয়স্ক লোকেরা থিয়োরিটা আয়ত্ত করলে সেটা তাঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাতে পারেন এবং তার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রভূত উপকার হবে। বেশী বয়সে বিকৃত উচ্চারণ-ভঙ্গীর সংশোধনটা যে একেবারে অসম্ভব, তা নয়? তবে সেটা অল্প বয়সে করলে যতটা নিখুঁত সম্পূর্ণতা আশা করা যায়, বেশী বয়সে ততটা আশা করা যায় না।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন

এইজন্যই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্ততঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণটা শিখে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। নিজেদের ব্যক্তিগত পেশার সুনামের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করবার জন্যও শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে উচ্চারণ-তত্ত্বের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

অন্যান্য পেশাতেও বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণের মূল্য কম না। অভিনেতা, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, রাজনৈতিক বক্তা সাহিত্যিক, ধর্মগুরু, অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, সেলস্‌ম্যান্ এমন কি কেরাণী পর্য্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই ভালভাবে কথাবার্তার ক্ষমতার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মানুষের সংজ্ঞা—"ভাষা-ভাষী জীব"

একটি ছোট্ট বাক্য দিয়ে মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া সহজ কথা নয়, তবে মানুষকে "একটা ভাষা-ভাষী জীব" নামে অভিহিত করলে খুব ভুল হয় না। মানুষের সকলের চেয়ে বেশী বাহাদুরির কাজ হচ্ছে কথা কওয়া। বর্তমান বিজ্ঞানের বলে মানুষ নানারকমের কাজ করছে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তার বাহাদুরি প্রতিষ্ঠিত করছে, কিন্তু এত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও সে একটা নূতন উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারে না। শুধু তাই নয়, অনেক চেষ্টা করেও ছেলে বয়সের ভুল উচ্চারণগুলির সংশোধন করতে পারে না।

অথচ এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তিগুলি না সারালে চলে না। মঞ্চ-বক্তৃতায়, অভিনয়ে, রেডিও ভাষণে, গানে একটু উচ্চারণের ত্রুটি পেলে কেউ সেটাকে ক্ষমা করবে না। উচ্চারণের ভুল-ভ্রান্তিটা অনেক সময়েই কলা-কৃষ্টির অভাব হিসাবেই পরিগণিত হয়। উচ্চারণের ভুলের জন্য বানান ভুল হলেও সেটার জন্যও ক্ষমা পাওয়া যায় না।

ইংরাজীর উচ্চারণবিধির কঠিনতার জন্যই তার উচ্চারণের জন্য বেশী যত্নের প্রয়োজন

মাতৃভাষার অনুশীলনের দিক দিয়েই এই সমস্ত কথা প্রযোজ্য। খুব কম লোকেই বলতে পারেন যে তাঁর মাতৃ-ভাষার উচ্চারণটা নির্ভুল ও সুন্দর। এই কথা

যদি সত্য হয়, তাহলে পরের ভাষা, বিশেষতঃ বিদেশী ভাষার সম্বন্ধে এই কথাটা আরও সত্য। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটা অনস্বীকার্য্য। কারণ ইংরাজী ভাষাতে শব্দের বানানের সঙ্গে তার উচ্চারণের বিশেষ একটা সম্পর্ক নেই। তাই একজন বিদেশী যখন ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখে

"Stranger" does not rhyme with "anger"
Neither does "devour" with "clangour"
"Soul" but "foul" "gaunt" but "aunt"
"Fort" but "front" "wont" "want"
"grand" and "grant"
(daily telegraph)

ইংরাজী ভাষায় উচ্চারণটা বানান সম্মত নয় বলেই তার উচ্চারণটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

বিরুদ্ধ যুক্তি ও তার খণ্ডন

(ক) ভারতীয়দের ইংরাজী শিক্ষা হচ্ছে passive knowledge-এর জন্য শিক্ষা।

West সাহেব বলেছেন ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্যটা শুধু একটা passive knowledge এর বাহন হিসাবেই হওয়া উচিত। কারণ তারা যখন ইংরাজী শেখে, তখন সেই ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য শেখে না, সেটা শেখে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হিসাবে। সুতরাং ইংরাজী উচ্চারণের বিশুদ্ধির জন্য তাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন খুব বেশী নেই। এই মতবাদটা আংশিক সত্য হলেও এটা সর্ব্বথা সত্য নয়। কারণ ইংরেজীর নীরব-পাঠের মধ্যেও একটা সরব-পাঠের ব্যাপার আছে এবং সেই অশ্রুত সরব পাঠের জন্যও প্রয়োজন হয় বিশুদ্ধ উচ্চারণের। কাজেই কোনও ভাষার শিক্ষাটাই "passive knowledge এর জন্য হয় না।

(খ) ইংরাজেরা বাংলা শেখবার সময় শুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

যারা এই ব্যাপারটিকে নিয়ে লঘুভাবে চিন্তা করেন, তাঁরা বলবেন "ইংরাজী ভাষা উচ্চারণের বিশুদ্ধির জন্য আমাদের বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি ? একজন ইংরেজ যখন বাংলা শেখেন, তখন তিনি ত উচ্চারণ বিশুদ্ধির জন্য মাথা ঘামান না। তাহ'লে আমরা ঐ ব্যাপারে মাথা ঘামাবো কেন ?"

এযুক্তি ঠিক নয়। অনুকরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাল জিনিসের অনুকরণ করে নিজের উন্নতি করা। অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুকরণ করে নিজেদের ব্যর্থতাকে সমর্থন করার মধ্যে কোনও সুযুক্তি নেই।

(গ) ইংরাজীর উচ্চারণে সার্ব্বজনীন আদর্শের অভাব।

কেউ কেউ বলতে পারেন "কোন ভাষাই তার অধিকৃত জনপদের সব জায়গাতেই এক ভাবে উচ্চারিত হয় না। ফলে একজন ইংরাজের সঙ্গে অপর একজন ইংরাজের উচ্চারণ এক রকমের হয় না। তা হলে ভারতীয়রা কোন ইংরাজের উচ্চারণকে আদর্শ বলে মেনে নেবে ?"

এ যুক্তিও অচল। কারণ ইংলণ্ডের জেলায় জেলায় উচ্চারণের বিভিন্নতা থাকলেও ইংরাজী ভাষার একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত উচ্চারণ-মান আছে। সেটা শ্রেণী বিশেষের, গোষ্ঠী বিশেষের বা জনপদ বিশেষের উচ্চারণ-ভঙ্গী নয়; সেটা হচ্ছে মধ্য ও দক্ষিণ ইংলণ্ডের শিক্ষিত ভদ্র লোকদের, বিশেষতঃ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের ব্যবহৃত ভাষা। এটা একটা স্বাভাবিক ভাষা নয় এটা হচ্ছে একটা কৃত্রিম ভাষা। তবে এটা কৃত্রিম ভাষা হলেও এর আদর্শটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। এই ভাষার উচ্চারণটা প্রায় একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত স্থায়ী রূপ পেয়েছে Daniel jones প্রভৃতির "উচ্চারণের অভিধানের" (pronouncing Dictionary) মধ্যে।

বর্ত্তমানে ইংরাজী শেখা ও শেখানোর দায়িত্ব বৃদ্ধি

বর্ত্তমানে ইংরাজী ভাষাটা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয়দের কাছে "দ্বিতীয় ভাষা" (second language) হিসাবে শেখানো হয়। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে এই ভাষাটা ভারতীয়দের কাছে "content subject" হিসাবে পড়ানো হয় না, সেটা পড়ানো হয় "skill subject" হিসাবে। ফলে ইংরাজীর সিলেবাসে ইংরাজী সাহিত্য-সংকলন হিসাবে কোনও পাঠ্য পুস্তক নেই। সেই জন্য ভাল ভাল অধ্যাপকদের মুখে wordsworrth, shelly, keats, ruskin, carhyle প্রভৃতির ভাল ভাল অংশগুলির পাঠ বা আবৃত্তি শোনবার সুযোগ আর নেই বল্লেই চলে। বর্ত্তমানে তারা শুধু precis writing, dialogue writing, essay writing প্রভৃতির মধ্য দিয়েই ইংরাজী শেখে। এতে ইংরাজী উচ্চারণের মান অনিবার্য্য ভাবেই কিছুটা হ্রাস

পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানের সিলেবাসটা দীর্ঘ এবং জটিল হয়েছে বলে ইংরাজী অধ্যাপনার জন্য সাপ্তাহিক রুটিনে ইংরাজীর জন্য পিরিয়ডের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। আগেকার দিনে ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও ইংরাজীর মাধ্যমে পড়ানো হতো। তাতে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ইংরাজীটা শোনা এবং বলার সুযোগটা বেশী ছিল। এখন সে সব সুযোগ নেই। কাজেই এখন ইংরাজী শেখা ও শেখানোর দায়িত্বটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তার পদ্ধতিটাকে আরও বৈজ্ঞানিক হতে হবে, তার উচ্চারণ প্রভৃতিকে আরও শুদ্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রয়োজন হইলে যদি ইংরাজীতে মনের কথা প্রকাশ করতে না পারি, অথবা পরের ইংরাজী বুঝতে না পারি, তবে তার মত অস্বস্তির ব্যাপার আর কিছুই নেই। কাজেই সেটা যাতে না হয়, সে জন্য ছাত্রদের বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

এখনও "ইনটারভিউ" প্রভৃতিতে ইংরাজীতে প্রশ্ন করা হয়; হয়ত বহুদিন ধরে হবেও। কাজেই ইংরাজীর উচ্চারণ বিশুদ্ধিটা লক্ষ্য রাখা উচিত।

ইংরাজী উচ্চারণ-শিক্ষার জন্য বিশেষ কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন

এই উচ্চারণের বিশুদ্ধির জন্যই ছাত্র এবং শিক্ষকদের বিশেষ ভাবে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ডে শুদ্ধ ইংরাজী "কথ্য ভাষা" শেখবার জন্য ব্যাপকব্যবস্থা আছে এবং ট্রেনিং কলেজগুলিতে "কথ্য ইংরাজী" (spoken english) টা একটা পৃথক বিষয় (subject) হিসাবে "সিলেবাসে"র মধ্যে স্থান পেয়েছে। তবে ইংলণ্ডে ইংরাজী "কথ্য ভাষা" শেখবার যতটা সুবিধা আছে, ভারতবর্ষে ততটা নেই। কাজেই ইংরাজী কথ্য ভাষা শেখবার জন্য ভারতীয়দের কার্য্য-সূচীটা একটু অন্য রকমের করতে হবে।

(ক) ইংরাজী শোনা ও আবৃত্তির ব্যবস্থা

আমাদের মনে হয় ভাল "কথ্য-ইংরাজী" শিখতে হলে ভাল ইংরাজী ভাল ভাবে শোনা ও ভাল ভাবে আবৃত্তি করার ব্যবস্থা করা দরকার।

এই আবৃত্তি প্রভৃতির সৌকর্য্যের জন্য lambert বলেছেন শিক্ষার্থীদের প্রথম প্রয়োজন হবে মনোযোগ দিয়ে ইংরাজী কথাবার্ত্তা শোনা এবং তারপর প্রয়োজন হবে "acquisition of the power of exaggerated through correct reproduction"

এই মতবাদটা শিল্পের ক্ষেত্রে 'শিলারের" (schiller) মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি বলেছেন শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর চেষ্টা হওয়া উচিত প্রকৃতিকে অনুকরণ করে প্রকৃতির বিশেষত্বগুলিকে বেশী ভাবে ফুটিয়ে তোলা (accentuation on nature's lines) এই জন্যই নর-নারীর সৌন্দর্য্যের মডেলের জন্য তাঁরা প্রকৃতির সৃষ্টির অনুকরণে সূক্ষ্ম কটিকে সূক্ষ্মতর করে, উন্নত বক্ষকে উন্নত-তর করে, বিস্তৃত নয়নকে আকর্ণ বিস্তৃত করে দেখান।

(খ) মাতৃভাষার উচ্চারণতত্ত্বের জ্ঞানের প্রয়োজন

ইংরাজী উচ্চারণ-তত্ত্বটা বোঝবার জন্য মাতৃভাষার বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ, বাগযন্ত্রের কার্য্যকলাপ এবং মাতৃভাষার ধ্বনিবিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞানটি থাকলে মাতৃভাষায় সঙ্গে তুলনা করে ধ্বনি-তত্ত্বের জ্ঞানের সাহায্যে বিদেশী ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ব করা সহজ-সাধ্য হবে।

(গ) আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত বর্ণমালার (Inter-National Phonetic script) ব্যবহার।

কোন ভাষারই স্বাভাবিক বর্ণ-মালার বর্ণগুলি এক একটি অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয় উচ্চারণ মূল্য (Souud value) বহন করে না। তা ছাড়া এক ভাষার এক একটি বর্ণের অনুরূপ বর্ণ অন্য একটি ভাষায় নাও থাকতে পারে। কাজেই একটি ভাষার প্রচলিত বর্ণমালা দিয়ে "transliteration" করে অন্য ভাষার শব্দগুলিকে বিশুদ্ধ ভাবে দ্যোতিত করা যায় না। যেমন বাংলা ভাষার "ফ" এবং "ভ"এর সঙ্গে ইংরাজী ভাষার "f" এবং "v"র উচ্চারণের তুলনা করে দেখা যাক্। "ফ" এবং "ভ"-এর উচ্চারণ মূল্য "f" এবং "v"এর কাছাকাছি হলেও সেগুলি সম্পূর্ণ এক রকমের নয়। কারণ বাংলা "ফ" ও "ভ" হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণ, কিন্তু ইংরাজী "f" ও "v" হচ্ছে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ।

সেই জন্য একটা বিদেশী ভাষা শিখতে হলে এমন একটি বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রয়োজন হয়, যেখানে প্রত্যেকটি বর্ণের একটি মাত্রই উচ্চারণ-মূল্য থাকবে। কোনও স্বাভাবিক ভাষাতেই এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা নেই। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য এই জাতীয় একটা কৃত্রিম এবং

বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা তৈরী হয়েছে, যেখানে প্রত্যেকটি বর্ণই এক একটি বিশিষ্ট উচ্চারণ মূল্য বহন করে। এই বর্ণমালাকে "আন্তর্জাতিক ধ্বনি বিজ্ঞান সম্মত বর্ণমালা" (International phonetic script) নাম দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণেরই একটি মাত্র উচ্চারণ মূল্য আছে। ফলে এই বর্ণমালা দিয়ে যে কোনও বিদেশী শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণটি দ্যোতিত করা যায়। কোনও স্বভাবিক ভাষায় এটি সম্ভব নয়। সেখানে (১) একই বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি নানা প্রকারের উচ্চারণ সৃষ্টি করতে পারে, অথবা (২) একই প্রকারের উচ্চারণ নানা বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি দ্বারা দ্যোতিত হতে পারে। ইংরাজী ভাষার কথাই দেখা যাক্। সেখানে gem এবং get শব্দ দুটিতে "g"এর পৃথক উচ্চারণ। আবার bread break bead head heart heard এই শব্দগুলির মধ্যে "ea" এই বর্ণ-দ্বয়ের উচ্চারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার।

বিপরীত পক্ষে দেখা যাবে একই "উ" উচ্চারণটি পাওয়া যায় Too True truth root fruit শব্দগুলির মধ্যে। এ ছাড়া এমন বহু শব্দ আছে, যার মধ্যে উচ্চারণ হীন (mute) বর্ণও অনেক আছে। Bed এবং head, no এবং know water এবং daughter Head এর , "know"এর k, 'daughter'এর gh বর্ণগুলির উচ্চারণ মূল্য কিছুই নেই।

ইংরাজী ভাষায় ২৬টি বর্ণের মধ্যে c q এবং x বর্ণগুলির বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই, বাকী ২৩টি বর্ণের মধ্যে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি এবং g, s, t এবং v বর্ণগুলি দুই বা ততোধিক উচ্চারণ মূল্য বহন করে। আবার একই উচ্চারণ নানা রকমের বর্ণ সমষ্টি দ্বারা তৈরী হতে পারে। G. Noel, Armfield প্রভৃতি পণ্ডিতরা লক্ষ্য করে দেখেছেন ইংরাজীর ৫টি (তথা ১৫টি) স্বরবর্ণের ২৫০ রকমের উচ্চারণ আছে এবং ২৬টি ব্যঞ্জন বর্ণকে ১৫০ ভাবে লেখা যায়। এই জন্য ইংরাজী বানান প্রথা উচ্চারণ ইংরাজী শিক্ষার্থীদের কাছে একটা বড় রকমের সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।

সেই জন্যই ইংরাজী বানান দিয়ে (বা বাংলা বানান দিয়ে) ইংরাজী উচ্চারণটা শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু "International phonetic script" দিয়ে সেটা করা সম্ভব। কারণ ঐ বর্ণমালায় প্রত্যেকটি বর্ণের পৃথক পৃথক এবং অপরিবর্তনীয় উচ্চারণ মূল্য আছে। কাজেই ইংরাজী "কথ্য ভাষা" শিখতে হলে এই বর্ণমালাটা শিখতেই হবে, নতুবা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হবে না।

মাতৃভাষার প্রভাবে উচ্চারণে অশুদ্ধি
(Vernacularism)

একটা বিদেশী ভাষার উচ্চারণ শেখার একটা বড অন্তরায় হচ্ছে vernacularism বা মাতৃভাষার উচ্চারণ রীতির অনুকরণ জনিত অশুদ্ধির সম্ভাবনা। মাতৃভাষার দ্বানিতত্ত্বটা বিদেশী ভাষা শেখার পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস হলেও মাতৃভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের অনমনীয়তাটা আবার বিদেশী ভাষা শেখার পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা। এই জিনিসটাকেই vernacularism বলা হয়। এটা শুধু উচ্চারণের দিক দিয়েই ফুটে ওঠেনা, মনের ভাব প্রকাশের জন্য অনুবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়েও এটা ফুটে ওঠে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝানো যেতে পারে। ইংরাজী "very fine" শব্দ দুটি যখন বাংলায় transliterae করা হয়, তখন সেটা লেখা হবে "ভেরি ফাইন"। কিন্তু বাংলা "ভ" এবং "ফ" দিয়ে ইংরাজী "v" এবং "f" উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ বাংলা "ফ" অথবা "ভ" উচ্চারণ করবার সময় দুটি ঠোঁটের সাহায্য নিতে হয়। ইংরাজীতে কিন্তু "f" এবং "v" বর্ণদ্বয় দুটি ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত হয় না। সে দুটি উচ্চারিত হয় নীচের ঠোঁট এবং উপরের দাঁতের স্পর্শে, অর্থাৎ বাংলা "ফ" এবং "ভ" হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণ (bi-labial), কিন্তু ইংরাজী "f" এবং "v" হচ্ছে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ (labio dental)। এখন কোনও লোক যদি "very fine" শব্দটি উচ্চারণ করবার সময় "ভেরি ফাইন" ভাবে উচ্চারণ করে, তখন বলতে হবে তার উচ্চারণের মধ্যে vernacularism এর দোষ হয়েছে।

এই vernacularism এর দোষটা যেমন উচ্চারণের দিক দিয়ে হয়, তেমনি ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে অথবা বাগ্বিধি (ideom) দিক দিয়েও হতে পারে। তবে সেটা উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়।

বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরাজী ভাষা শেখবার সময় আমাদের এই virnacularlismএর দোষ সম্বন্ধেও সাবধান থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার (inter-national phonetic script) ব্যবহার এই বিষয়ে আমাদের অনেকটা সাহায্য করবে। এ ছাড়া প্রয়োজন হবে ভাল ইংরাজী মন দিয়ে শোনা এবং তার উচ্চারণের অনুশীলন।

(চ) কথ্য ভাষা শোনা ও বলার অভ্যাস

এই শোনা ও বলার অভ্যাসটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। এই ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব "ডি, পি, আই" (D, P, I) P, wrenএর অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয়। তিনি ব্যাকরণ ও অনুবাদের মাধ্যমে দশ বৎসর ধরে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে ঐ ভাষায় লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে ছিলেন। কিন্তু ঐ দশ বছরের সাধনার পরেও ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতে তিনি পারতেন না। বিপরীত পক্ষে একজন অশিক্ষিত গাড়োয়ান এক বৎসর মাত্র প্যারি নগরীতে অবস্থান করে শুধু বাধ্য হয়ে ফরাসী ভাষা শোনা ও বলার অভ্যাসের জন্য এমন বিশুদ্ধভাবে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারতো, যে সাধারণ লোকে বুঝতেও পারতো না যে ঐ লোকটা একজন ইংরাজ কিংবা ফরাসী।

ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ শেখবার জন্য এই শোনা ও বলার অভ্যাসটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঐ ভাষা শেখবার জন্য ভাল ভাল রেকর্ড, B B C-র রেডিও-ভাষণ, গান, অভিনয় প্রভৃতি শোনবার ব্যবস্থার প্রয়োজন। এইজন্যই একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বলেছেন ইংরাজী শিখতে হলে ইংলণ্ডে যেতে হয়, অথবা ইংলণ্ডকে ক্লাশের মধ্যে আনতে হয়, অর্থাৎ ইংরাজীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

(ছ) বিশুদ্ধ উচ্চারণের মডেল সংগ্রহ

ইংরাজী উচ্চারণ শেখবার জন্য ইংরেজী পরিবেশ সৃষ্টি সহজ নয় বলেই আমাদের অন্যতর ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরাজ বক্তাদের বক্তৃতা শুনলে আমরা হয়ত খাঁটী ইংরাজী উচ্চারণের খানিকটা সন্ধান পেতে পারি। তবে সে ব্যাপারেও কিছুটা ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। কারণ বিভিন্ন বক্তার মধ্যে উপভাষাগত পার্থক্য (dialectical difference) আছে। কাজেই কোন ইংরাজের উচ্চারণটাকে মডেল হিসাবে ধরে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধেও একটা সমস্যা থেকে যায়।

কাজেই সাধারণ বক্তৃতা বা কথাবার্ত্তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিস হবে "Danial Jones" "Rippman" প্রভৃতির কথ্য ইংরাজী (Spoken English) সম্বন্ধে বইগুলি পড়া, তাঁদের রেকর্ডগুলি মন দিয়ে শোনা এবং উচ্চারণের জন্য ভাল অভিধান দেখা। ভাল অভিধান বলতে আমরা Chembers বা Oxfordএর অভিধান বলছি না। ঐ বইগুলিতে International Phonetic Script দিয়ে উচ্চারণগুলি দেখানো হয় নি। তাই ঐগুলিতে উচ্চারণ সম্বন্ধে নিখুঁত বিশুদ্ধির সন্ধান পাওয়া কঠিন। বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য Danial Jonesএর "Pronouncing Dictionary"ই (J. M. Dent & Sons Limited. London) হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পুস্তক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভাল অভিধানের নাম করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে Oxford University Press থেকে প্রকাশিত "A Learner's Dictionery of Current English"। এই গ্রন্থটিতে শব্দের উচ্চারণ ছাড়া তার অর্থগুলিও দেওয়া আছে।

(জ) Intonation সম্বন্ধে যত্নের প্রয়োজন।

তবে অভিধান থেকে আমার যা শিখবো, সেটাই যথেষ্ট নয়। কারণ অভিধানাদি গ্রন্থ থেকে আমরা এক একটি শব্দের (word) উচ্চারণ শিখতে পারি। কিন্তু ঐ শব্দগুলি একত্র গ্রথিত হয়ে যখন বাক্য বা প্যারাগ্রাফ তৈরী হবে, তখন আসবে আর একটি সমস্যা। সেটি হচ্ছে intonationএর সমস্যা। এই intonation জিনিসটাকে অভিধানের সাহায্যে শেখা যায় না। এর জন্য জীবন্ত ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের দরকার। তার অভাবে গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড প্রভৃতির বহুল ব্যবস্থার প্রয়োজন। British Broadeasting Corporationএর announcerদের উচ্চারণটা অনেকখানি নির্ভরযোগ্য। কারণ "standard pronounciation" সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ রকমের ট্রেনিং নিতে হয়।

এই বিশুদ্ধ intonationটা কথ্য ইংরাজীকে এমন একটা স্বাভাবিক ভঙ্গী দান করে, যে কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত দু'চারটি শব্দের অভিধান-সম্মত উচ্চারণ না হলেও

সাধারণ শ্রোতারা শুদ্ধ Intonation যুক্ত ভাষণটীকে বিশুদ্ধ উচ্চারণের মডেল হিসাবেই ধরে নেয়। বিপরীত পক্ষে কোনও ভাষণে প্রত্যেকটি শব্দের অভিধান-সম্মত উচ্চারণ থাকলেও তার মধ্যে যদি বিশুদ্ধ intonation না থাকে, তাহলে সেই ভাষণটা শ্রোতাদের কাছে নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম বলেই মনে হবে। অনেক সময় অভিনেতা বা "কেরিকেচারিষ্ট"রা এই intonationটা ঠিকভাবে আয়ত্ত করে যখন সাহেব-মেমের ভূমিকা অভিনয় করে, তাতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায়। অথচ হয়ত ঐসব অভিনেতাদের ভাষণের মধ্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দই "শব্দ-একক" (word-unit) হিসাবে শুদ্ধ নয়। শ্রোতারা অতটা হিসাব করতে পারে না, তারা খাঁটি intonation শুনেই ভাষণটাকে খাঁটি সাহেবী উচ্চারণ বলে ধরে নেয়।

এই intonation শব্দটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছি। আমাদের উচিত ছিল intonation শব্দটির প্রয়োগ না করে synthesis (বা সংশ্লেষণ) শব্দটির প্রয়োগ করা। একটা ভাষাকে 'কথ্য ভাষা' হিসাবে ব্যবহার করার সময় আমাদের ব্যবহারিক "একক" (unit) হচ্ছে শব্দ (word)। এই শব্দগুলি আবার কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি। এই বর্ণগুলিই হচ্ছে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। শব্দগুলিকে তার উপাদানীভূত বর্ণে বিশ্লেষণ করে তাদের উচ্চারণগুলি শেখানো হয় অভিধান প্রভৃতিতে।

শব্দের উচ্চারণের বিশুদ্ধির জন্য এই বিশ্লেষণমূলক আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ছাড়া সংশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনটা হয়ত আরও বেশী প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। বাক্যে ব্যবহারের সময় একটা শব্দের পর আর একটা শব্দ যখন গেঁথে যাওয়া যায়, তখন একটা শব্দের প্রভাবে অন্য একটা শব্দের উচ্চারণের কিছুটা পরিবর্তন হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়, শব্দের অক্ষর-বিন্যাসের (syllable division) হিসাব করে কোন কোনও জায়গায় জোরে উচ্চারণ করতে হয়, আবার কোন কোনও জায়গাতে হয়ত অল্প জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, ইত্যাদি।

এই সমস্তই হচ্ছে উচ্চারণ-সংশ্লেষণের ব্যাপার। Intonation তারই একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাত্র। মোটামুটি হিসাবে বলা যেতে পারে এই সংশ্লেষণের পাঁচটি উপাদান আছে। যথা—

Assimilation (সমীভবন)

Quality (মাত্রা)

Stress (শ্বাসাঘাত, বল)

Breath Groups (ছেদ, যতিপর্ব)

Intonation (স্বর, স্বরবৈচিত্র্য)

এইগুলি নিয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। উপস্থিত শুধু এইটুকুই বলবার চেষ্টা করা হ'ল যে ইংরাজীর উচ্চারণের বিশুদ্ধির জন্য শুধু এক একটি শব্দের বিশুদ্ধি লক্ষ্য করলেই চলবে না। শব্দগুলি যখন বাক্যে গাঁথা হবে, তখন তাদের উচ্চারণগুলি কি ভাবে বদলে যাবে কি ভাবে গতি যতির ব্যবহার করতে হবে, কি ভাবে কণ্ঠস্বরের উঠানামা হবে, কিভাবে অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে, এগুলিও লক্ষ্য রাখতে হবে।
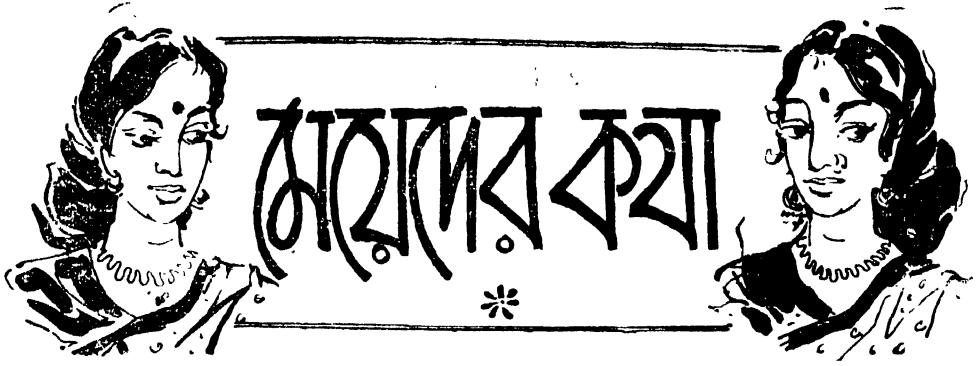
নারী পীড়নে নারী

বাগশ্রী রায়

সভ্যতার যুগচক্র এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে নারী, এগিয়ে চলেছে পুরুষ। কখনও মাতৃ-প্রাধান্য, কখনও বা পিতৃ প্রাধান্য সমাজকে শাসন করেছে। তাতে কখনও পুরুষ শাসিত হয়েছে—কখনও বা শাসিত হয়েছে নারী। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রাধান্যই নারীকে শাসিত ও শৃঙ্খলিত করেছে। তাই আজকের দিনে প্রগতি কথার অর্থ হচ্ছে পুরুষের শাসন না মেনে চলার প্রগতি, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার জন্যে সুসংহত প্রয়াস। পুরুষের উৎপীড়ন যে নারী সমাজকে সভ্যতার বিবর্তনের স্তরে স্তরে নানা কালে দলিত করে চলেছে—এই হচ্ছে তার বিশেষ কারণ। কিন্তু নারীকে কে বেশী পীড়িত করে চলেছে যুগে যুগে? সে হচ্ছে পুরুষ নয়—নারী। নারীর উৎপীড়ন পুরুষ যতখানি করেছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী করেছে নারী!

সীতা বনে চলেছেন। হস্তী-ব্যাঘ্র-বন্যমানুষ-রাক্ষসের মাঝে বাস করতে হবে স্বামী দেবরের সঙ্গে। কৈকেয়ী হাসি মুখে সেই দৃশ্য ভোগ করলেন। পুত্র রাজা হবে—স্বামী তাঁর কথায় উঠে বসে সেই গর্বে গরবিনী রাণীর মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সীতার দুঃখের কথা মনে পড়ল না। হয়ত পীড়নের আনন্দে তিনি তখন প্রমত্তা ছিলেন।

ভীমের প্রেমে পড়েছেন হিড়িম্বা। কুন্তী হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র পুত্রের জন্মের পরই ভীমের সঙ্গ তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। এ কী ধরণের পুত্র স্নেহ, এ কী ধরণের বধূনিগ্রহ।

আয়ান ঘোষের মাতা জটিলা ও বোন কুটিলার হাতে কত নিগ্রহ যে ভোগ করছেন কৃষ্ণপ্রেম-বিভোরা বিরহিণী রাধা তার হিসাবের তো লেখাজোখা নেই।

এবার এ যুগে আসা যাক। প্রগতির যুগে কত নারী সর্বোচ্চ পদে আসীন। বলতে গেলে নারী প্রগতির রাজত্বই বলা চলে। তবু পত্রিকা খুললেই দেখা যাবে আত্মহত্যার প্রেরণা দিয়েছে কুলবধূকে তার শাশুড়ী, ননদ,—ছেলের বিয়েতে এত গহনা দেবার কথা ছিল, দরিদ্র মেয়ের বাপ তা দিতে পারেন নি, তাই বধূকে অনবরত গঞ্জনা দিয়ে চলেছেন শাশুড়ী।

কিছুকাল আগেও অধিকাংশ পরিবারেই অশান্তির মূল ছিল শাশুড়ীর উৎপাত। সে উৎপাত যে বৌ বড় হলে, বা পাকা গিন্নী হলে কমে যায়, তাও নয়। বৌর ছেলে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে বেরিয়েছে তেমন অবস্থাতেও তাকে তার শাশুড়ীর কাছে নিগ্রহ লাভ করতে হয়। নারীপীড়নে নারী যে কত পটু, কত হীনমনা তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আজকাল আবার দেখা যাচ্ছে এই ধারা যেন পালটে যাচ্ছে। অনেক স্থলে, বিশেষ করে যেখানে বৌ 'বিদুষী, বিদ্বান স্বামীর মত তিনিও চাকুরিয়া। দুজনে দু'হাতে রোজগার করছেন। কিন্তু কিছুতেই ওঁদের কুলোয় না—ভোগের সব উপকরণ জুটাতে তাঁরা পারেন

না। বুড়ী শাশুড়ী হয়ত গ্রামের বাড়ীতে অবহেলায় দিন কাটান। ছেলে-বৌএর পীড়নের কথা মুখ ফুটে বলারও তাঁর উপায় নেই। কত ঠাকুমা, পিসীমা, কাকীমা যে এই সব আধুনিকা বৌমাদের কাছে লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা তার হিসাব কে রাখে!

আধুনিকাদের মধ্যে এই পীড়ন প্রবণতা ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে। লেখাপড়া শিখে তাঁরা যেন আজকাল ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। অনেক আধুনিকা আজকাল বড় বড় অফিসের বড় মিস্‌সাহেব বা মেম সাহেব হচ্ছেন। মিস্ প্রগতি বর্মণ কোলকাতার আফিসের ইনচার্জ হয়ে এসেই একটি কাজের ছেলের উপর নজর করলেন। প্রেমাংশু রায় যেমন চেহারায়, তেমন মিষ্টি স্বভাবে। অফিসের কাজে তার না নেই। বাইরের কাজ, অর্থাৎ সস্তায় হরলিক্‌স জোগার করা, গাড়ীর দুষ্প্রাপ্য স্পেয়ার পার্টি এনে দেওয়া, সেতার, রেডিও সারাই করিয়ে দেওয়া —মিস বর্মণের সব কাজেই প্রেমাংশু পারদর্শী। কিন্তু প্রেমাংশুর পাশে বসে কাজ করে সুলেখা সুর। তার বয়স কম, স্বভাব মিষ্টি,চেহারা ভালো। প্রেমাংশু তাকেও অনেক কাজে সাহায্য করে, আফিসের শেষে তাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। মিস্ বর্মণের কঠিন দৃষ্টি তা এড়িয়ে যেতে পারে না। কী একটা বিশ্রী হিংসা তার মনকে বিষিয়ে ফেলে। তিনি একটা কোন অজুহাতে বদলী করে দেন সুলেখাকে কলকাতার বাইরে। গ্রামে গ্রামে সে ঘুরবে এখন থেকে। গ্রামের সেবা করবে, প্রেমাংশুর সঙ্গে তার দেখা আর হতে পারবে না—কোন কালেই পারবে না!

মোঘল যুগে নারী গভর্ণর

মাধব পাল

"সরে যাও—যে যেদিকে পারো শীগ্‌গির সরে পড়। দিল্লীর জনাকীর্ণ রাজপথে হঠাৎ আতঙ্কের সোরগোল পড়ে গেল। উন্মত্ত হস্তীর তাণ্ডবে ভয়ার্ত পথচারীগণ আর্তনাদ করে পালাতে লাগলো।

সম্রাট সাজাহানের একটি হাতী খেপে গিয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পথচারী নাগরিকগণ প্রাণ-ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে আর চিৎকার করে সতর্ক করে দেয় অন্যকে।

—'সরে যাও—পাগলা হাতী বেরিয়েছে—শীগগির পালাও।'

মুহূর্তের মধ্যে রাজপথ জনবিরল হয়ে পড়লো। কেবল একটি মাত্র পাল্কীর বাহকগণ দ্রুত গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আর বোধ হয় প্রাণরক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পাল্কীর আরোহিণীর সম্মান রক্ষা করা। উন্মত্ত হস্তী উদ্ধত শুঁড় তুলে ধেয়ে আসছে শাহী পাল্কীর দিকে।

আর মাত্র কয়েক পা এগোতেই উন্মদ হাতী নিপিষ্ট করে ফেলবে আরোহিণীসহ পাল্কীর বাহকদের। অগত্যা পাল্কী বাহকগন প্রাণভয়ে পাল্কী নামিয়ে রেখে যেদিকে পারে দৌড়াতে থাকে। আরোহিণী অসহায় হয়ে পাল্কীর ভিতর জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভয়ে কাঁপতে থাকে। হারেমের বেগমদের রাজপথে আত্মপ্রকাশ করাও যেমন অপরাধ অপরদিকে মৃত্যুও তার একেবারে সম্মুখে।

অবশেষে আত্মরক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করে আরোহিণী পাল্কী থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে রাস্তার পাশে এক দোকানে গিয়ে উঠে। দোকানে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। আর তখনই ভীষণ আক্রোশে উন্মত্ত হস্তী চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললো শাহী শিবিকাকে।

প্রাণে বেঁচে গেলেও গ্লানিকর লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেলো না সাহেবজী বেগম। তিনি কাবুলের শাসন-কর্তা আমির খানের স্ত্রী। হারেমের বেগম হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে মুখ দেখালো হারেমের অসম্মান—সুবাদার

আমির খানের অপমান। সাহেবজীকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন আমির খান।

ঘটনাটির স্রোত আবর্ত্তের সৃষ্টি করলো শাহী মহল পর্য্যন্ত। সম্রাট সাজাহানের প্রধান মন্ত্রী আলিমর্দ্দন খাঁর কন্যা সাহেবজী? সে কিনা স্বামী পরিত্যক্তা!

খবর শুনে সম্রাট সাজাহান ডেকে পাঠালেন সুবাদার আমির খানকে। প্রশ্ন করলেন বাদশাহী নীতি চাতুর্য্যে—

—"বল দেখি খাঁ সাহেব প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে রাজপথে আত্মপ্রকাশ করে সাহেবজী তোমাকে যে অসম্মান করেছে, তার চেয়ে উন্মত্ত হাতীর পায়ের নীচে প্রকাশ্য রাজপথে নিপিষ্ট বিধ্বস্ত সাহেবজীর মৃতদেহ তোমাকে কতটুকু বেশী সম্মানিত করতো?"

ভুল ভাঙ্গলো আমির খানের। সম্রাট সাজাহানের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে সাহেবজীকে তিনি সাদরে নিয়ে যান আপন মহলে।

পারস্যের ভাগ্যান্বেষী খলিলুল্লা খাঁ দিল্লীশ্বর সাজাহানের দরবারে বেতন সরকারের চাকরি করতেন। এই কাজে তিনি খুবই প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ফলে সম্রাট মহিষী মমতাজমহল নিজে আগ্রহ করে আপন ভাইঝিকে খলিলুল্লা খাঁর সাথে বিয়ে দেন এবং আফগানিস্থানের সুবাদার করে দেন খলিলুল্লা খানকে।

খলিলুল্লা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমিরখান আফগানিস্থানের সুবাদার হন। এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় পর্য্যন্ত প্রায় বাইশ বৎসরকাল আফগানিস্থানের সুবাদারী করেন। সম্রাট সাজাহানের প্রধানমন্ত্রী আলিমর্দ্দন খানের সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কন্যা সাহেবজী বেগমকে তিনি বিয়ে করেন।

ভারতে যত বিদেশী শক্তির অভিযান হয়েছে সবই আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে হয়েছে। মোঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবরকেও কাবুল জয় করে ভারতে আসতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই আফগান সর্দ্দারগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করতো। এ হেন বিদ্রোহী আফগানদের দমন করে আমির খান খুবই কৃতিত্ব দেখান। এই বিদ্রোহ দমনে সাহেবজী বেগমের চাতুর্য্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তাই আমির খানের প্রধান সহায় ছিল।

আওরংজেব তখন দিল্লীর মসনদে। হঠাৎ কাবুলের গুপ্তচরের নিকট থেকে গোপনে সংবাদ এলো আফগানিস্থানের এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথে বিদ্রোহী আফগানদের হাতে সুবাদার আমিরখান নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। চিন্তিত হলেন সম্রাট আলমগীর।

কাবুলের দেওয়ান আরসাদ্ খান তখন দিল্লীতে। সে সম্রাটকে আশ্বস্ত করে বললো সে আমির খান মরেনি। যতদিন সাহেবজী বেগম জীবিত থাকবে ততদিন সুবাদার আমির খানের মৃত্যু হতে পারে না। আরসাদ্ খানের কথায় বিস্মিত হলেন সম্রাট আলমগীর।

ওদিকেও বিস্মিত হচ্ছে বিদ্রোহী আফগান সর্দ্দারগণ, বিস্মিত হচ্ছে মোঘল সেনা বাহিনী। মৃত্যুর পরেও আমির খান কি করে বিদ্রোহ দমন করছে!

অবাক হওয়ার কথাই। বুদ্ধিমতী সাহেবজী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখে নিজেই আমির খানের মত সাজ পোষাক পরে বিদ্রোহ দমন করছে। বিদ্রোহীদের ধরে এনে তাদের সামনে তুলে ধরছে পলো খেলার বল।

—'বিদ্রোহীদের আমি পলো খেলার বলের মতই মনে করি। আর পলো খেলাটাকে আমি পছন্দও করি। সাহেবজীর ঘোষণা।

বিস্ময় ও লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ।

—"আমি আমির খান নই, আমি সাহেবজী বেগম। বিদ্রোহীদের চক্রান্ত দূর করতে গিয়ে আমি আমার স্বামীর চেয়েও নৃশংসভাবে মরতে রাজী আছি।"

আফগান সর্দ্দারগণ এই বুদ্ধিমতী রমণীর ব্যবহারে ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শান্তই ছিল। সম্রাট আওরংজেব সাহেবজীর কার্য্যাবলীতে মুগ্ধ হয়ে কাবুল শাসন করে যাওয়ার জন্য তাকে সুবাদারী সনদ পাঠিয়ে দেন।

প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল সাহেবজী বেগম আফগানিস্থানের সুবাদারী করেন। তারপর নূতন শাসন কর্তার হাতে কার্য্যভার দিয়ে বাকী জীবন মক্কাবাসে অতিবাহিত করেন।

——

সুপর্ণা দেবী

প্রসাধন মানেই নানা রকম সাজে-পোষাকে, অলঙ্কার শোভায়, কেশ-বিন্যাসে, সুগন্ধি সেবনে, কজ্জল-তিলক প্রভৃতি, বিবিধ উপকরণে নিজের দৈহিক রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য্য বিচিত্র সুন্দর পরিপাটি ছাঁদে মনোরম শ্রীমণ্ডিত করে তোলা এবং এ ব্যাপারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অধুনাকাল পর্য্যন্ত সকল দেশের ও সর্বস্তরের নর-নারী সমাজেই সবিশেষ উৎসাহ-অনুরাগ দেখা যায়। মানব-সভ্যতা বিকাশের আদিম যুগে অরণ্য-গুহাবাসী নর-নারীদের মধ্যেও নিজের দেহশ্রীকে নানা উপায়ে বর্ণে-গন্ধে-সজ্জা অলঙ্কারে অপরূপ মাধুর্য্যে বিভূষিত করে তোলার রীতিমত আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ছিল তার প্রমাণ, পুরাতত্ত্ববিদ প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিবিধ বিবরণেই মেলে। নীল-নদের তীরে প্রাচীন মিশরীয় সমাজে রূপচর্চ্চা প্রসাধনকলা নিছক সৌখিন বিলাস ছাড়াও, কৃষ্টি আভিজাত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হতো। প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও 'চৌষট্টি কলাবিদ্যার' অন্যতম প্রধান ছিল—রূপচর্চ্চা প্রসাধন তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আজো নজরে পড়ে সেকালের কাব্যে সাহিত্যে-চিত্রে ভাস্কর্য্যে। সুপ্রাচীন অজন্তা, ইলোরার গিরিগুহা চিত্রাবলীতে, উড়িষ্যা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের অপরূপ মন্দির-ভাস্কর্য্যে সেকালের নরনারীদের বসন ভূষণ, কেশ-বিন্যাস, গন্ধবারি স্নান, অলক্তক রঞ্জন, অঙ্গ-প্রসাধন প্রভৃতি দেহশ্রী শোভামণ্ডিত করার নানান্ রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শিক্ষিত ও সভ্য নর-নারীর পক্ষে কয়েকটি বিশেষ বিদ্যা আহরণ করা আবশ্যকীয় ছিল। এই 'বিশেষ-বিদ্যাকেই' কলাবিদ্যা বলা হয়। মনীষী বাৎস্যায়ন রচিত 'কামসূত্র' শাস্ত্রে বহুবিধ কলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মহর্ষি বাল্মীকি, বামন, ভবভূতি, মাঘ, দণ্ডী প্রমুখ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতাই বিবিধ কলার কথা বলেছেন। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার ৬৪ প্রকার কলার উল্লেখ করেছেন। জৈন গ্রন্থেও প্রায় ৭২ প্রকার কলার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। 'ললিতবিস্তর' নামে সুপ্রাচীন বুদ্ধ-জীবনীতে ৬৪ কলার উল্লেখ থাকলেও, প্রসঙ্গক্রমে মোট ৮৩টি কলার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কামসূত্রের' টীকায় শাস্ত্রজ্ঞ যশোধর মোট ৫১২টি কলার সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তবে কালক্রমে ভারতীয় শাস্ত্রকারদের মতে মোট ৬৪ কলাই প্রবাদমূলক সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রকারদের মতানুসারে কলাকে প্রধানতঃ 'স্ত্রী-কলা' ও 'পুরুষ-কলা'—এই দুই ভাগে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। তাঁদের হিসাবমতো—পুরুষদের মোট ৭২টি এবং স্ত্রীদের মোট ৬৪টি কলাবিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক। রূপচর্চ্চার আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ প্রসাধন কলার যে সব বিশেষ রীতি অনুসরণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেগুলির অন্যতম হলো—

১। অঞ্জন ক্রিয়া—নেত্রশোভা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, নানা রকম কাজল রচনার বিদ্যা।

২। আভরণবিধি—দেহ সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে নানা রকম অলঙ্কার পরিধানের রীতি।

৩। উৎসাদন, সংবাহন ও কেশ মর্দ্দন—হাত, পা, মাথা প্রভৃতি 'massaging' বা মর্দ্দন করার কৌশল।

৪। কেশমার্জ্জন কৌশল—কেশ প্রসাধন বিষয়ক বিদ্যা।

৫। ক্ষুরকর্ম্ম—ক্ষৌর কার্য্য সুসম্পন্নের কৌশল।

৬। গন্ধযুক্তি—বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে বিচিত্র গন্ধদ্রব্য রচনার রীতি।

৭। তরুণী-প্রতিকর্ম্ম—তরুণীকে রূপসজ্জায় মনোরমভাবে সাজানোর কৌশল।

৮। দশন-বসনাঙ্গরাগ—দন্ত, বস্ত্রাদি ও দেহ রঞ্জিত করার বিদ্যা।

৯। পলিত-বিনাশ—পাকা চুল কালো করার কৌশল।

১০। মাল্যগ্রথন-বিকল্প—নানা রকম সুন্দর-সুগন্ধি ফুলের সাহায্যে মালা-গাঁথার বিদ্যা।

১১। মাল্য গ্রন্থন— ঐ

১২। মাল্যবিধি—সুচারু-ছাঁদে ফুলের তোড়া রচনা ও মালা গাঁথার রীতি।

১৩। বস্ত্রবিধি—পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় রীতি।

১৪। বলিবিনাশ—বয়োধিক্যের কারণে মুখমণ্ডলে কুশ্রী কুঞ্চিত বলিরেখা নির্লোপ করার কৌশল।

১৫। বস্ত্র গোপন—পরিধেয় বস্ত্রের হ্রস্বতা গোপন করার কৌশল···অর্থাৎ, খাটো কাপড় এমন কায়দায় পরা যেন কারো চোখে সে খুৎ বিসদৃশ না বোধ হয়।

১৬। বস্ত্ররাগ—নানা রঙে মনোরম শোভায় পরিধেয় বস্ত্রাদি রঞ্জিত করার কৌশল।

১৭। বস্ত্র সংমার্জ্জন—পরিধেয় বস্ত্রাদি সাফ্‌সুতরো, ঝাড়াই ও সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখার সুকৌশল।

১৮। বিলেপনবিধি—অঙ্গরাগ ও গন্ধদ্রব্যাদি মাখার রীতি।

১৯। বিশেষকচ্ছেদ্য—ললাটশোভা বর্দ্ধন ও কপালে পরার জন্য নানা ছাঁদে পাতা কাটার কৌশল।

২০। ব্যায়াম বিদ্যা—শরীর সুস্থ, সবল, নীরোগ, সতেজ ও লাবণ্যশ্রীশোভায় মনোরম সুন্দর রাখার উদ্দেশ্যে ব্যায়াম অনুশীলনের রীতি।

২১। শয্যাস্তরণসংযোগ পুষ্পাদি গ্রথন—সৌখিন বিলাস উপভোগের উদ্দেশ্যে মনোহরভাবে পুষ্পশয্যা ও পুষ্পমাল্য রচনার কৌশল।

২২। শরীর সংস্কার—অলঙ্কারাদির সাহায্যে দেহশ্রী সুশোভিত ও সজ্জিত করার রীতি।

২৩। শেখরাপীড় যোজন—শেখর ও আপীড় নামে দুই প্রকার শিরোভূষণ ব্যবহার বিধি।

২৪। সংবাহন—অঙ্গমর্দ্দন বা গা টিপে দেবার রীতি।

২৫। সুগন্ধিযুক্তি—নানা রকমের মনোহর গন্ধদ্রব্য অনুলেপনে দেহ সুরভিত করে তোলার রীতি।

২৬। বস্ত্রালঙ্কার—মনোরম সুন্দর নানা ধরণের বস্ত্র ও অলঙ্কারে অঙ্গ সুসজ্জিত করার বিধি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সুপ্রচলিত এমনি ধরণের আরো যে সব রূপচর্চ্চা-প্রসাধনকলার বিশিষ্ট রীতির পরিচয় মেলে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। আগামী সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে সেকালের আরো কয়েকটি অভিনব প্রসাধন রীতির কথা বলবার চেষ্টা করবো।

—

এমব্রয়ডারী শিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

গতবারে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী 'শেভরনষ্টিচ' (chevron stitch) ও 'ফ্লাই ষ্টিচ' (fly stitch) পদ্ধতিতে অভিনব সুন্দর সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার যে হদিশ দেওয়া হয়েছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে নীচের 'ক' চিহ্নিত ছবিতে সেধরণের সৌখিন 'কুশন' ও 'বালিশ' রচনা করা যেতে পারে।
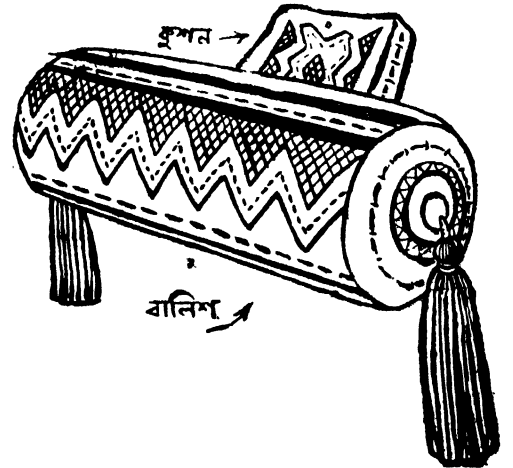
এ প্রসঙ্গে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী আরেক ধরণের সেলাইয়ের ফোড় তোলার পদ্ধতিরও নমুনা দেওয়া হলো—নীচের 'খ' চিহ্নিত নক্সাটিতে। এই ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতির নাম—'রুমানিয়ান ষ্টিচ' (Roumanian stitch)। এ ধরণের সেলাইয়ের

ফোঁড় তোলার পদ্ধতি ইউরোপের রুমানিয়া অঞ্চলের সুচীশিল্পানুরাগিণীদের সমাজে বিশেষ প্রচলিত। তাই এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পে এই নামটি সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ও সমাদৃত হয়েছে। এমনি ধরণের বিচিত্র অভিনব 'রুমানিয়ান ষ্টিচে'র সাহায্যে উপরের 'ক' চিহ্নিত ছবিতে দেখানো 'কুশন' ও বালিশের অংশ বিশেষও সৌখিন ছাঁদে অলঙ্কৃত করা হয়েছে—তার নমুনা নক্সাতেই নজরে পড়বে। উপরোক্ত নক্স নমুনার ধাঁচে, এমব্রয়ডারী সূচীশিল্প সামগ্রীতে টানা-লম্বা 'পাড়' বা 'বর্ডার' রচনার পক্ষে, এ ধরণের 'রুমানিয়ান ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কাজ বিশেষ উপযোগী হবে। এছাড়া আরো নানা রকমের এমব্রয়ডারী নক্সার কাজেও, 'রুমানিয়ান ষ্টিচ্' পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ, উপরের নক্সা নমুনাতে দেখানো সৌখিন বালিশ ও কুশানের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কলা কৌশল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভবপর হলো না, আগামী সংখ্যায় হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।
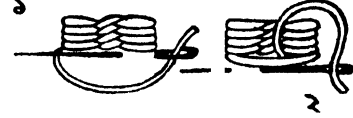
এবারে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের এই দুটি বিশেষ পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব বিচিত্র পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইলো।

মরণের প্রতি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

হরণ করার মালিক মরণ—
　　কে জানে কী রীতি তা'র!
যত সম্ভার হরিয়া সে লয়
　　সতত যে দুনিয়ার।
মানস কী তা'র, কী তা'র বিচার,
　　কে কবে বুঝিতে পারে!
আলো হ'তে হায় কোথা নিয়ে যায়
　　অজানা অন্ধকারে!
ক্ষয় ক্ষতি যত সেথা অবিরত
　　পূরিত কি হবে ফিরে?
হেথা সমুদয় কুড়ায়ে সে লয়
　　তাই কি তিমির-তীরে?

২

হরণ কেন যে বিধান ধরার?
　　কেন গতি অবিরত
মহাসাগরের ধাবন্ত যত
　　উর্মি-মালার মত?
প্রবাহ ফুটিছে, ছুটিছে, টুটিছে—
　　ধারা যে অথির হায়;
যদি বা ফুটিল, কেন বা টুটিবে
　　হ'য়ে চির-নিরুপায়?
প্রশ্নই শুধু মথিবে মানস
　　উত্তরও পাবো না যে;
মরণের মায়া ফেলে যাবে ছায়া
　　নিয়ত মর্ত্য-[illegible]

৩

হরণ করার মালিক মরণ,
　　সঙ্কেতে শুধু বলো,
হরণ-লগনে তোমারও নয়ন
　　করে না কি ছলো-ছলো?
তুমি হ'রে লও; যা'রা প'ড়ে থাকে
　　ডুকরিয়া তা'রা কাঁদে,
তুলিতে চিতায় অতি-মমতায়
　　শবে হায় বুকে বাঁধে।
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত যত
　　বসুধার আঁখি-লোর
করে না কি হায়, ব্যথিত তোমায়,
　　নির্মম সুকঠোর!

৪

হরণ না হ'লে হবে না পূরণ—
　　এই যদি হবে রীতি,
বিধেয় নহে কি বিদূরিত করা
　　মর্ত্ত্য-মরণ-ভীতি?
হাসি মুখে যদি মরা যায় হেথা,
　　কাঁদন কা'রও না পায়,
প্রশ্নে প্রশ্নে পরাণ তা' হ'লে
　　দহে না তো দুনিয়ায়।
হরণে পূরণে নাহি গরমিল,—
　　মরণ, বুঝাবে কবে?
বিরহ মিলন তব বিভূতিতে
　　[illegible]
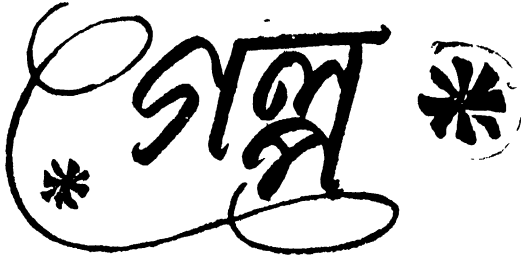
মাদার টিচার

শ্রীমদন চক্রবর্তী

কল্যাণী,

বাণিজ্যিক হাটের বেপারি হয়ে আমি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে পথটা দিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি সে পথটা আমাদের চির চেনা পথেরই মতন। আমাদের রায় পুকুরের পাশ দিয়ে যে পথটা এগিয়ে গেছে মল্লিক পাড়ার দিকে সেই পথের দু'ধারের ঘন ঝোপঝাড় আর গাছগুলো যেমন করে মাথা নেড়ে নেড়ে দুলে উঠত, এ পথটাকে ঠিক তেমনই লাগছে আমার। চলে আসার সময় তোমার চোখের জল আঁকড়ে ধরেছিল আমার যাত্রা পথকে শুভ করার উদ্দেশ্যে। আমার এগিয়ে চলার কাঁকর বিছান পথটা যেন বন বাদাড় চিরে তোমার সিঁথির মত সরল রেখায় লাল রঙকে জাপটে ধরে আছে। এগিয়ে চলেছি আমি…‥

সামনের গরুর গাড়ীটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে কাঁকর বিছান লাল পথটার ওপর সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি তুলে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল সরোজ। হোমিওপ্যাথী অষুধের ব্যাগটাকে হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে কল্যাণীর সঙ্গে আপন মনে কথা বলে চলেছিল সে। লাল রঙের ফাঁকা সরু পথের সঙ্গে দুরন্ত হাওয়ার আমেজে সে সব ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল নিজের অস্তিত্ব, ভুলে গিয়েছিল নিজের উদ্দেশ্য। হঠাৎ গরুর গাড়ীর সামনে পড়ে যেতে জীবনের বাস্তবটা যেন ধাক্কা মারল তার বর্ত্তমান জীবনটাকে।

অপ্রয়োজনেই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কয়েক বার ধ্বনি তুলল সাইকেলের ঘণ্টায়। মুখর জীবনটা থেতো হয়ে উঠল দৃষ্টি পথে।

বিগত জীবনের সাহিত্য প্রবণ মনটা ফাঁকা কথাতেই ভেজাতে চেয়েছিল কল্যাণীর মনকে। আজ তাকে চিঠি লিখে পাঠাবার দিন। তারই বিষয় বস্তু, সার বস্তুকে বাদ দিয়ে জীবনের কঙ্কালটাকে যেন ফুল চন্দন দিয়ে সাজাতে ব্যস্ত।

সাইকেল থেকে নেমে পাল্লা দেওয়া দোকান ঘরের মত ডিস্‌পেন্সারীর মধ্যে এসে ঢুকল সরোজ। সাইকেলটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে রুমাল দিয়ে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে ধপাস করে বসে পড়ল সেখানে।

সামনের কাঁকর ছড়ান লাল রাস্তার ওপারে ঘন ঝোপ জঙ্গল। তার পিছনে অনেক দূরের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা কুটিরের দিকে অবসন্ন দৃষ্টিটাকে ভাসিয়ে দিল সে। তারপর জীবনের আশা আর বাস্তবের সংঘর্ষের চকমকিতে তার দৃষ্টিটা শাণিত হয়ে মুখ খানাকে করে তুলল থ্যাতলানো বেগুনের মত।

বহু পথ আর অনেক পাড়া ঘুরে এল নিখিল। খেটে খাওয়া আদিবাসীপ্রধান স্থান এটা। আট দশ মাইল জায়গা জুড়ে জঙ্গলের ধারে কাছে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন পল্লীতে অনেক মানুষের বাস। এদের ব্যাধির কথা চিন্তা করে কোন চিকিৎসক অনেকদিন যাবৎ এ অঞ্চলে চিকিৎসার মন নিয়ে আসেনি। এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের ব্যয় বহুল চিকিৎসার সঙ্গতি কোন দিন ছিল না, আজও নেই। সে কথা চিন্তা করেই মাইল পঞ্চাশেক দূরের গ্রাম ছেড়ে সরোজ এখানে এসে খুলে বসেছিল হোমিওপ্যাথীর ডিস্‌পেন্সারী। অল্প দামে অষুধ দিয়ে আর অষুধের উপকারিতার বহু প্রমাণ দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতেও তার বেশ কিছুদিন সময় চলে গিয়েছিল। তারপর ব্যবসাও জমে এসেছিল মোটামুটি।

সামনের ঝোপ জঙ্গল ভেদ করে তাড়া খাওয়া দু'টো শুয়োর বেরিয়ে এসে দৌড়ে চলে গেল ডিস্‌পেন্সারীর পাশ দিয়ে।

ডিস্পেন্সারীর পিছনের দিকে চটের পার্টিশানের ভেতরে চৌকীর বিছানার ওপর পড়ে আছে কল্যাণীর চিঠি। জবাব লিখতে হবে আজ। কি লিখবে সরোজ?

শুয়োর তাড়া দিতে দিতে লাঠি হাতে বেফনা বেরিয়ে এল ঝোপের বাইরে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সেও দৌড়ে চলে গেল ডিসপেন্সারীর পাশ দিয়ে।

বেফনার দিকে তাকিয়ে আপনিই ভুরুটা কুঁচকে উঠল সরোজের। এই বাউণ্ডুলে বেফ্নার বউকে গত বছরে ওলাওঠার আক্রমণ থেকে বিনা পয়সায় অষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিল স। আর সেই বেফ্না এখন মুখের দিকে তাকায়না, কথাও বলেনা, তাছাড়া তলে তলে শত্রুতা করতেও দ্বিধা বোধ করেনা।

সরোজ কোঁচকান ভুরুর দৃষ্টিটাকে আর একবার তুলে ধরল দূরের মাথা তুলে দাঁড়ান কুটিরগুলোর দিকে। পিয়াল গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো হেলে দুলে উঠল বার কয়েক।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল জংসনের কলোনীট। ঐ কলোনীটাই শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মারল এখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। বড় বড় বাড়ী উঠল ওখানে। লোকজন এসে হাজির হল নানা বর্ণের, নানা ধর্মের ও নানা মনোবৃত্তির। ঢুকে গেল এখানকার জীবনযাত্রার মধ্যে নানা ধরনের ব্যবসা। জঙ্গল থেকে বড় বড় শাল গাছগুলোকে কেটে নিয়ে যাওয়া হল কলোনীতে। জঙ্গলে কাজ করত যারা তারা সভ্যতা ঘেষা ঠিকে কাজ পেয়ে গেল কলোনীতে। আদিবাসীদের হাত থেকে জমি, জঙ্গল সবই চলে গেল ব্যবসায়ীদের হাতে। জমির দামও বেড়ে গেল হুড়হুড় করে। আদিবাসীদের ধারে কাছে গড়ে উঠল কয়েকটা সভ্য মানুষের বাস। এই জঙ্গলের মধ্যে যত রকমের ব্যবসা গড়ে তোলা যায় তারই গবেষণায় ব্যস্ত রইল তারা। মৌচাকের মধু, জঙ্গলের কাজু বাদাম, বন্য গাছ গাছড়া, জঙ্গলের কাঠ, পুকুরে মাছের চাষ, ছোট খাট বন্য জন্তুর চালান, জায়গা বিশেষে ইঁটের পাঁজা, শাল পিয়ালের পাতা, জঙ্গলের উপযুক্ত নানা আকারের বন্য ফল ও শিকড়, ইত্যাদি নিয়ে সুরু হয়ে গেছে ব্যবসার মাথা। শেষে লক্ষ্য পড়ল হোমিওপ্যাথী ব্যবসার দিকেও।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে সজলপুরে হাঁস মুরগী চালান দেবার কারবার খুলেছেন যে ভদ্রলোক তারই ছেলে হঠাৎ বাড়ীতে খুলে বসল এক হোমিওপ্যাথীর ডিসপেন্সারী। সেখানে বসান হল এক তরুণীকে। আর ব্যবসায়ীর ছেলে ডাক্তার সেজে বসল প্যান্ট টাই পরা অবস্থায়। জঙ্গলের মুলুকে নিমেষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল খবরটা।

ডাক্তারের নাম জানবার চেষ্টা করল সরোজ। কিন্তু অদ্যাবধি মিঃ ডাটা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেনি কেউ।

এই বেফ্নাই একদিন এসে সরোজকে জানিয়েছিল, ডাক্তারবাবু, আপনার বদনাম আর সহ্য করতে পারছিনা আমরা। বলেন তো ডাটা সাহেবকে এক কোপে শেষ করে দিই।

সরোজ বলেছিল, না, না, অত উত্তেজিত হোসনে বেফ্না। মানুষ আসে তার বরাত নিয়ে। যে যার ভাগ্য নিয়ে চলাফেরা করবে, তার জন্যে কখনও হিংসের স্থান রাখতে নেই মনে।

উত্তরে বেফ্না বলেছিল, এ তো ভাগ্যের কথা নয়, এ যে মিথ্যে বদনাম রটান। সে বলে কিনা তোদের ডাক্তারবাবু পাশ করা ডাক্তার নয়। তাছাড়া ওর হাতে তোদের ঘরের মেয়ে-বৌদের চিকিৎসা হলে তাদের ইজ্জত বলে কোন পদার্থ আর থাকবে না। সব অসতী হয়ে যাবে। কেননা আপনি নাকি এর আগে কোথায় কি ঘটিয়ে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছেন?

আর কথা বলতে পারেনি সরোজ। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবেই বিদায় দিয়েছিল বেফ্নাকে।

এরপর মিঃ ডাটের নির্বাচিত তরুণীটি ঘুরে বেড়াতে লাগল আদিবাসীদের ঘরে ঘরে। পাড়ার মোড়লগুলোকে সে হাত করে ফেলল, দালালী দিয়ে, নেশার উপকরণ জুগিয়ে। শেষে মিঃ ডাট্ই হল আট দশ মাইল জায়গার একচেটিয়া ডাক্তারবাবু। সরোজ বুঝল, ডাক্তারীতে নয়, ডাক্তারীর এই ব্যবসায় পাল্লা দেওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বেফ্নার মত শেষ ভরসার যে কয়েকজন ছিল তারাও সাহেবী ব্যবসার যন্ত্রে কেমন যেন পালটে গেল দিনে দিনে। টাকা, তাড়ি আর গাঁজার তাড়নায় তারাও

সরোজের নামে বদনাম রটিয়ে জাত ভাইদের টেনে নিয়ে গেল মিঃ ডাটার ডিসপেন্সারীতে। তাই কয়েকদিন সরোজ সাইকেল নিয়ে শুধু শুধু ঘুরে বেড়াল আদিবাসীদের পল্লীতে পল্লীতে। আজও বৈশাখের খর রৌদ্রে আট দশ মাইল রাস্তা সাইকেলে পাক খেয়ে রিক্ত হাতেই ফিরতে হল তাকে। শেষ দিকে ঝিম মারা লাল রঙের পথের ছায়ায় আর শাল পিয়ালের পাতার ফাঁকের শিড়শিড়ে বন্য হাওয়ায় ঘুঘু ডাকা মনটা কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে উঠল। আজই প্রথম সে দেখেছিল মিঃ ডাটের সহকারিণীকে তার ব্যবসার প্রতিযোগী হিসেবে।

মিষ্টি কথা দিয়ে কাব্য তৈরী করার পরিবেশটা যেন হারিয়ে গেল তার সামনে থেকে। অতীত দিনের আকর্ষণ করা দু'টো চোখ তার কোঁচকান ভুরুর ফাকে যেন যন্ত্রণা নিয়ে জেগে উঠল।

এই জঙ্গলের পরিবেশে বসে মুদিত চোখের অন্তরালের মনটা ছুটে বেড়াল যে কোন একটা উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায়। এ অঞ্চলের মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে তাকে। আবার নতুন জায়গায় নতুন উৎসাহ নিয়ে সুরু করতে হবে জীবনের এগিয়ে চলার পথ।

ডিস্‌পেন্সারীর ভাঙা আলামারীর ভেতরের খালি অষুধের শিশিগুলো মনের রিক্ততা যেন আরো বাড়িয়ে তুলল। যেগুলোয় বড়ি আছে সেগুলোও অট্টগাস্য নিয়ে ভেংচি কেটে উঠল।

অন্য কোন পথের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সরোজের মন। গোল গোল বড়ি নিয়ে খেলাটাই তার জীবনের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরই ওপর ভরসা করে কল্যাণীকেও এনেছিল সে জীবনের সঙ্গিনী করে। জলের সঙ্গে জলের মন্থন। তার মধ্যে মাপ অনুযায়ী কয়েক ফোঁটা অষুধ দিয়ে ডাইলুসন তৈরী করা ছাড়া জীবনের অন্য কোন দিকে জলের পটি দিয়ে যন্ত্রণার উপশম করতে জানে না হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য কোথাও সরে গিয়ে এ ব্যবসা জমিয়ে তোলাও দুরূহ। কোথাও চাকরী নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার যোগ্যতা নেই তার আয়ত্বের মধ্যে।

কল্যাণীর ঔৎসুক্যভরা কালো চোখ দু'টো শত আবেদনভরা অনুনয় নিয়ে জেগে উঠল দৃষ্টিপথে। দোষ নেই কল্যাণীর। তার আশাভরা জীবনটা সরোজের উন্নতির ধাপের দিকে অনভিজ্ঞ সরল মনের কল্যাণ কামনায় এগিয়ে চলেছে।

সরোজের মনে হল, কল্যাণীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা মাথাটা যেন জলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে সন্ধ্যার তুলসীমঞ্চে প্রণাম জানাল। শঙ্খধ্বনি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল গুটিয়ে ফেলার বাসনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠা এই ডিস্‌পেন্সারীর গুম হয়ে থাকা আবহাওয়ায়।

কল্যাণী,

এই গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে জঙ্গলে স্তব্ধতায় বিচিত্র একটা স্বাদ অনুভব করছি প্রকৃতি থেকে। এটা হল বাইরের। ভেতরের দিকে তাকালে জঙ্গলের মত আবার খাঁ খাঁ করে ওঠা শূন্যতা ধরা পড়ে যাবে। আমি বাইরে পড়ে আছি বাইরের চিত্র নিয়ে। ভেতরে তুমি আছ কিন্তু মনে হয় শূন্যতা'রও অনেক দূরে। তোমায় মঙ্গলকামনায় আমি পথ চলি সত্যকথা। কিন্তু আমার কামনা যে পথের ধুলোর মত শাল পিয়ালের ফুরফুরে হাওয়ায় শুধু মর্মরধ্বনি তুলে ব্যর্থতায় মাথা কুটে মরে, সেটা ভাব কি ?

না কল্যাণী, আর কাব্য নয়। এবার নেমে আসি সত্যকার বাস্তবতায়। তোমাকে দূরে ফেলে রেখে আর ডাক্তারী নয়। আমি কোলকাতায় চলে যাবো। আরো উন্নতি করার পরিকল্পনা নিয়ে। তোমাকে নিয়ে আসব কাছে, আরো কাছে। তুমি এসে করবে ডাক্তারের মনের ডাক্তারী, কেমন ?

চিঠিটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল সরোজ। ডিস্‌পেন্সারী তুলে দিয়ে চলে যাবার মনস্থ করেছে সে। গোপনে চলে যেতে হবে এ অঞ্চল ছেড়ে। পরাজয়টা যেন গোপনেই ঘটে যাক্, সাক্ষী থাক শুধু মন আর সাক্ষী থাক শাল-পিয়ালের সারি লাগান জঙ্গলে পথগুলো।

সরোজ একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল আলমারীর অষুধের শিশিগুলোর দিকে। বেশীর ভাগ অষুধই বিদেশ থেকে আনানো। আর কোন কোনটার ডাইলুসন তার নিজের হাতের তৈরী। সাদার টিনচারের জারগুলোও সবই প্রায় শূন্য।

জঙ্গুলে জীবনে সাধারণ রোগের বালাই নেই। থাকলেও অষুধের শরণাপন্ন হত না কেউ। নিম, নিশিন্দে, হাড়ভাঙা পাতা, আপাঙ, হিঙ্গুল, মহুয়া, আমরুল, বেলশুঁট কণ্টিকারী, জায়ফল, দূর্বা, পাথরকুচি পাতা, আয়াপান, যষ্টি মধু, নারেঙ্গা, কচ্ছপের শুকনো খোল, ধনেশ পাখীর তেল, কাঁকড়া বিছের জারক, চরম অবস্থায় মন্ত্র বা ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির প্রচলনই এখানে বেশী। এর মধ্যেও জঙ্গুলে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে, তাড়াতাড়ি রোগের উপশম করার অষুধ দিয়ে এই হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস আনতে কত যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়েছে তাকে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল 'ইথুজা' শিশির লেভেল। ডাইলুসন ঠিক করে এক ডোজে ভাল করতে হয়েছিল ঝগড়ু সর্দারের ছেলেকে। 'হ্যামামেলিস-কিউ' চাঙ্গা করে তুলল আগন্তু সর্দারকে। বেফ্‌না সর্দারের বউকে দিতে হয়েছিল 'ভেরেট্রাম-আল্ব' আধঘণ্টা অন্তর অন্তর। একবেলার মধ্যে নাড়ি ছেড়ে যাওয়া রোগীর ভেতরে সুরু হয়েছিল প্রাণের নড়ানড়ি।

একটা বিশেষ শিশির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সরোজ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সমস্ত জঙ্গলটা যেন ক্রুর জিজ্ঞাসার ফণা তুলে দুলে উঠল তার সামনে। অষুধের শিশিটা আলমারী থেকে টেনে বের করে নিয়ে দূরে ফেলে দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল সরোজকে।

এক শিশুর কান্নায় তার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পালসেটিলা-মাদার টিন্‌চার। তাজা তাজা রক্ত যেন ফেনিয়ে উঠল চতুর্দিক থেকে।

ঝিম মেরে বসে পড়ল সরোজ। শাল পিয়ালের মাথাগুলো জুজুবুড়ির রুক্ষতা নিয়ে নড়ে ওঠার ফাঁকে যেন তাড়া দিল ডাক্তারকে। ঝগড়ু, বেফ্‌না মণ্ডরু ও আগন্তু সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতা যেন মলিন হয়ে গেল। সামনে পড়ে আছে কল্যাণীর জন্যে সেই ভাঁজ করে মুড়ে রাখা চিঠিটা।

সামনের লাল পথটার কাঁকরগুলো কট্‌মট্‌ করে উঠল। ঝোড়ো হাওয়ায় মট্‌মটিয়ে উঠল কাজু বাদামের শাখা।

কল্যাণী,

চিঠির ভাষা শুধুই ভাষা। জীবন এর থেকে অনেক তফাতে, অনেক দূরে। আজ মনে হয় জীবনের ছলনাটাই হল জীবনের ভাষা। এখানে মিশকালো নিশ্চুপ জঙ্গল ডেকেছিল প্রাণের মমতা দিয়ে। গাছ কেটে ফেলার মত সেই নিঝুম অরণ্যের শান্ততার বক্ষে আমরা সঙ্গে করে এনেছি রক্তের দাগ। তোমার মঙ্গল কামনায় সে রক্তের দাগ মুছবেনা। এখানকার সরলতাও তাই কাঁটা গাছ হয়ে যেন বিক্ষত করতে চাইছে আমার চেতনাকে। সকলেই যেন অজান্তে জেগে উঠেছে আমার সেই ছলনার মুখোসটাকে খুলে দিতে। ডাঁটা সাহেব হোমিওপ্যাথীতে নামে নি। অরণ্যের বুকে নেমেছে চেতনার অরণ্য রক্ত ফেলার প্রতিশোধ নিতে। তাই আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে।......

কল্যাণীকে লেখা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সরোজ।

ডাটা সাহেবের সহকারিণীর মুখটা ভেসে উঠল দৃষ্টিপথে। নাম তার শ্যামী।

শ্যামী আর কল্যাণী। দু'জনেরই ছবি ভেসে উঠল দৃষ্টিপথে। কল্যাণী যদি জীবনের শ্যামল ঘেরা স্বচ্ছ সরোবর, শ্যামী ছিল জীবনের ভেসে আসা মেঘ।

ডিস্‌পেন্সারীর সব জিনিষের মায়া কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে অরণ্যের পাশ ঘেঁষা কাঁকর ছড়ান রাস্তায় কটকটে আওয়াজ তুলে পালিয়ে চলল ডাক্তার। জঙ্গলে গাছের শিড়শিড়ে হাওয়ায় তার অনুভূতি সতেজ হতে টনটন করে উঠল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা অষুধের শিশিটা। ভুল করে সঙ্গে আনা শিশিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে সরোজ ভাবতে লাগল, জংশন কলোনীর শ্যামী নিজের রক্তাক্ত কলঙ্কের ইতিহাস ঢাকতে জঙ্গলের ছায়ায় মুখ লুকোতে এল না পালসেটিলা মাদার টিনচারের অব্যর্থ সুফলের বিশ্বাসে কান্নায় ধ্বনি জাগাতে ডাটা সাহেবের সহকারিণী হল?

পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্যনীতি—

দুইদিন ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বিতর্কের পর নূতন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁহার খাদ্যনীতির সংশোধনের কথা ঘোষণা করেন। সর্বশেষে তিনি বিধানসভার সকল সদস্যগণকে বলেন— বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা সমাধান অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। সকলের সহযোগিতা ছাড়া তাহা সম্ভব হইবে না। তিনি তিনটি বিষয় ঘোষণা করেন। (১) চালকলে মজুরী আড়াই টাকা স্থলে দুই টাকা করা হইবে। (২) উৎপাদকগণ একশত মণের স্থানে ৫০ মণ মজুত রাখিতে পারিবেন। (৩) সেচ এলাকায় ১০ একর এবং সেচহীন এলাকায় ১২ একরের বেশী জমি কাহাকেও রাখিতে দেওয়া হইবে না। নূতন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ ঘোষ শুধু পণ্ডিত ও প্রবীণ নহেন দীর্ঘদিনের দেশকর্মী। মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর নেতৃত্বে তাঁহার এই নূতন খাদ্যনীতি যদি সাফল্য লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের লোক দুইবেলা খাইতে পাইবে।

সাধারণ রাজনীতি—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সারা ভারতবর্ষে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে দেশের বহু রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস দল পরাজিত হওয়ায় সেখানে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা হইয়াছে সেখানেও সংখ্যাল্প দলের চাপে তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। শুধু কেরল রাজ্যে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। সকলেই জানেন পশ্চিমবঙ্গে সকল অকংগ্রেসী দল একত্রিত হইয়া যে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন তাহা কি করিয়া স্থায়ী করা যাইবে সে বিষয়ে সকলে চিন্তিত হইয়াছেন। উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, প্রভৃতি রাজ্যের মন্ত্রীসভা অকংগ্রেসী হইলেও তাঁহারা কেন্দ্রের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় লোকসভায় কংগ্রেস সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং পুরাতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। সংখ্যায় কিছু বেশী সদস্য লইয়াও শ্রীমতী গান্ধীকে লোকসভায় সর্বদা বিব্রত হইতে হইয়াছে। বিরোধীদলের বহু খ্যাতিমান নেতা লোকভায় নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাজ বানচাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাঞ্জাবে দুইটি রাজ্যে ও রাজস্থানে ভাল মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নাই। এই সকল সমস্যার মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী কোন রকমে লোকসভার সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন শেষ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে বহু সমস্যা জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে। (১) গত দুই বৎসর ধরিয়া প্রায় সমগ্র ভারতে খাদ্যাভাব চলিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা সেজন্য সর্বপ্রথমে খাদ্যমন্ত্রীদের লইয়া দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিভাবে খাদ্য সমাস্যার সমাধান করিবেন তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

(২) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। বিদেশ হইতে আর টাকা ধার পাওয়া যাইতেছে না। অথচ খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি সরকারী কর্মচারীকে অধিক বেতন দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্যও শ্রীমতী ইন্দিরা সকল রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের লইয়া এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুরাহার সম্ভাবনা দেখা যায় নাই।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দীর্ঘস্থায়ী হইবে কিনা তাহা লইয়াও লোকের মনে সন্দেহ জাগিতেছে।

কলিকাতায় অশান্তি—

বাগমারীর গুরুদ্বারের একটি ঘটনা লইয়া কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। শিখদিগের গ্রন্থসাহেব

পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং একটি শিবমন্দিরের কিছু ক্ষতিসাধন করা হয়। প্রকাশ গোড়ার দিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। শেষপর্য্যন্ত নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে আসে এবং ঘটনাটি একদিনেই শেষ হইয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন এবিষয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করিয়া অপরাধীদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। সে যাহা হউক ঘটনাটি ঘটিতে দেওয়াই অন্যায় হইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক চাঞ্চল্য—

গত একমাস কাল পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছোট-বড় ৫০টি কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। কোন কোন কারখানায় কর্তৃপক্ষকে ৩।৪ দিন ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হইয়াছে। হাসপাতালে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় একটি অক্সিজেন গ্যাস কোম্পানাতে ধর্মঘটের ফলে হাসপাতালে গ্যাস সরবরাহ সঙ্কটজনক হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের নূতন শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দোপাধ্যায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু বিষয়টি এত ব্যাপক যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হইতেছে না। খাদ্যাভাব, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে শ্রমিক চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। কবে দেশবাসীর এসকল সমস্যার সমাধান হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন রাজ্যপাল—

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা গত ৪ঠা এপ্রিল দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী মে মাসের প্রথমেই শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কার্য্যভার ত্যাগ করিবেন। তখনই পণ্ডিত ঝাকে নূতন কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী হইতে ঐ সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জীকে জানাইলে অজয়বাবু এই নিয়োগ সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিত ঝা পশ্চিমবঙ্গেরই রাজ্যপাল হইতে চাহিয়াছিলেন।

বিনোদানন্দ শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং কলিকাতার কলেজে তাঁহার উচ্চ শিক্ষালাভ হইয়াছিল। তিনি প্রবীণ দেশকর্মী। কয়েক বৎসর বিহারে সাফল্যের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আছেন। বিহারবাসী হইলেও তিনি দেওঘরের লোক। কাজেই তাঁহার নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহাকে স্বাগত জানাই এবং প্রার্থনা করি তাঁহার শাসনে পশ্চিমবঙ্গ উন্নতিলাভ করুক।

রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী—

শ্রীসুব্বারাও দিল্লীতে ভারতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পদত্যাগ করায় বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ঐ পদের জন্য আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না, স্থির করিয়াছেন। উভয়েই মাদ্রাজের লোক।

উ থাণ্ট সম্মানিত—

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট ভারতে আসিয়া দিল্লীতে বাস করিয়াছেন। তাঁহাকে দিল্লীতে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এক সভায় সম্মানিত করা হয় এবং ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জওহরলাল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর এই প্রথম তাঁহার নামে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করা হইল।

উ থাণ্ট পৃথিবীতে সুপরিচিত। তিনি বহু বৎসর রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজ করিয়া জগতের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশ মন্ত্রীসভা—

সাধারণ নির্বাচনের পর পুরাতন দেশকর্মী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তকে নেতা করিয়া উত্তর প্রদেশে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সে মন্ত্রীসভা এক মাসও স্থায়ী হইল না। গত ১লা এপ্রিল রাজ্যপালের ভাষণ সম্বন্ধে আলোচনার সময় সাতজন কংগ্রেসী সদস্য হঠাৎ বিরোধীদলে যোগদান করায় মন্ত্রীসভার পরাজয় ঘটে। এবং তাহার পর বিরোধীদল নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে। চন্দ্রভানুবাবু পুরাতন রাজনীতিক। কাজেই নূতন মন্ত্রীসভা যে বেশীদিন থাকিতে পারিবে এরূপ মনে হয় না। ফ্রান্সের মত এইভাবে নিত্যনূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে দেশ আদৌ উপকৃত হয় না।

কনষ্টেবল থেকে পুলিশ মন্ত্রী—

পাটনার শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী এক সময়ে বিহারে পুলিশের কনষ্টেবল ছিলেন, এবারে তিনি বিহারে পুলিশ মন্ত্রী হইয়াছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিং আজ তাঁহাকে পুলিশ মন্ত্রীর নূতন কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসন যন্ত্র গঠনের সময়ে মহাত্মা গন্ধী এইরূপ একটি আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন—যত নিম্নস্তরের লোকই হউননা কেন জনগণের সমর্থন পাইলে তিনি উচ্চতম পদলাভ করিতে পারেন। আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হইতে দেখিয়াছি। তিনি এম-এ পাশ করিয়া ৬০৲ টাকা বেতনের অধ্যাপকের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে শেষ বয়সে তাঁহাকে রাজ্যপাল হইয়া রাজভবনে বাস করিতে হইয়াছে। এই সকল আদর্শের কথা সর্বদা সকলের স্মরণ করা কর্তব্য।

ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা কমান উচিত—

ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলেও ভারতবাসীর মন হইতে দাস মনোভাব এখন পর্য্যন্ত চলিয়া যায় নাই। সেজন্য ডাঃ ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হইয়া গত ৩১শে মার্চ একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এদেশে উচ্চ শিক্ষা শেষ করিয়া তাহার পর বিশেষ শিক্ষার জন্য কোনও ছাত্র যদি বিদেশে শিক্ষা করিতে যায় তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু টাকা থাকিলেই একদল ছাত্র এদেশে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিদেশ যাইতে চাহে। বর্ত্তমানে বিদেশী মুদ্রার কড়াকড়ির জন্য তাহাদের সকলকে বিলাত যাইবার টাকার ব্যবস্থা করা যায় না। সেজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সেন বিষয়টির বিবেচনা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুপ—

গত ২০ বৎসর ধরিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত কোটি কোটি উদ্বাস্তুকে গৃহ নির্মাণ, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বহু খাতে যে কত কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অবশ্য দুর্নীতি পরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের দোষে এবং দুর্নীতিপরায়ণ উদ্বাস্তুদের চেষ্টায় বহু টাকা যে আর আদায় হইবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উদ্বাস্তুদের কাছে টাকা আদায়ের জন্য নোটিশ যাইলেই তাহারা চারিদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করেন। এবারও পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর একদল উদ্বাস্তু ঋণ মকুপের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। যাহারা সত্য সত্যই দুঃস্থ তাহাদের ঋণ মকুপ করা হইলে কাহারও আপত্তির কারণ হইবে না। কিন্তু তদ্বিরের জোরে সরকারী বহু টাকা যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি এখনও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। তাহারা এই ২০ বৎসর ধরিয়া কি ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছে তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিবেন না। তাঁহাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু ইহাও সকলে জানেন যে অনেক উদ্বাস্তু সরকারী ঋণ লইয়া তাহার অপব্যবহার করিয়াছেন। সেই অপব্যবহার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

আবার বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদ—

ইংরাজ কিছুতেই তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি বৃটিশ সরকার ভারতসাগরে তিনটি ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া সেখানে একটি সামরিক ঘাটি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

গত ৬ই এপ্রিল ভারতের পার্লামেণ্টে ঐ ঘাটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। মন্ত্রী শ্রীচাগলা জানাইয়াছেন যে তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে ইহার নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব করিবেন। আশা করা যায় তাহার পূর্বেই বৃটিশ সরকারের মনোভাব বুঝা যাইবে এবং এ বিষয়ে তিক্ততা সৃষ্টির কারণ হইবে না।

খাদ্যসমস্যা ও রাজনীতি—

যে সকল রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে সেখানে একদল মন্ত্রী প্রচার করিতেছেন যে যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত অতএব তাহারা কেন্দ্রের নিকট হইতে খাদ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবহার পাইবেন না। চারিদিকে এই কথা আলোচিত হওয়ায় গত ৬ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম দিল্লীতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই। বিভিন্ন রাজ্যে যে দলের মন্ত্রীসভাই গঠিত হউক না কেন, তিনি সর্বত্র প্রয়োজন ও পরিস্থিতি

বুঝিয়া খাদ্য সরবরাহ করিবেন। তাঁহার খাদ্যনীতি সকল সময়ে দলাদলি ও রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিবে।

তবে একথা সকলের জানা প্রয়োজন যে আজ ভারতবর্ষ দারুণ খাদ্যসঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। প্রত্যেক রাজ্যকেই সেজন্য তিনি অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

লোকসভার নূতন দলীয় কর্মকর্ত্তা—

গত ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে লোকসভায় কংগ্রেস দলে নূতন কর্মকর্তার দল নির্বাচন হইয়াছে। নির্বাচনে ১৬জন প্রার্থীর মধ্যে উপপ্রধানমন্ত্রীর গোঁড়া সমর্থক শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছেন। বাতাস যে কোনদিকে বহিতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দলেরও কয়েকজন নির্বাচিত হইয়াছেন। এতদিন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম কোথাও দেখা যাইতেছিল না। দলীয় নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাহা হউক এই নির্বাচনে চিন্তার কোন কারণ নাই।

পণ্ডিচেরীতে নূতন মন্ত্রীসভা—

গত ৯ই এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীফারুক মারকার নেতা হইয়া ৫জন সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। পণ্ডিচেরী একটি ক্ষুদ্র স্থান। পূর্বে উহা ফরাসী অধিকৃত ছিল। এখন একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সমস্যা—

কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতি চর্চ্চা অধিক হওয়ায় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মত স্থানে গত বৎসর যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহা কোন সভ্য দেশের মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্য শিক্ষাদপ্তরের ভার লইয়াই শিক্ষা বিভাগের সমস্যা সমাধানে উৎসুক হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কাজেই হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই সর্ব্বপ্রথম মনে হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা এমন এক অবস্থায় আছে যে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে দেশের কোন শিক্ষাই ফলপ্রসূ হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আছে। বুনিয়াদী শিক্ষা নামে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বোধহয় শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষেরাও বুনিয়াদী শিক্ষার কথা চিন্তা করিয়া দেখেন না। গত ২০ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন করায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। সেখানেও কিছু কিছু পার্থক্য রাখিয়া প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয়। পশ্চিম বাংলায় মিউনিসিপাল এবং গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন রকমের প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয়। এইভাবে শ্রেণী বিভাগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা ভাল না হইলে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়া নানারূপ অসুবিধা ভোগ করে।

আমরা নূতন মন্ত্রী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সর্ব্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি উপযুক্ত মন দিতে অনুরোধ করি। তিনি যদি সকল প্রাথমিক শিক্ষা একই পর্য্যায়ে আনিতে পারেন তাহা হইলে সমস্যার সমাধান আদৌ কষ্টকর হইবে না।

জীবন-বসন্ত

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ

কিংশুক রাঙালো আজ যৌবন আমার অলক্তক রাগে
নিকুঞ্জে গাহিছে পাখি, হৃদয়ে ধরেছে রং জীবনের ফাগে
ফাগুন নিয়ে এল ফুলে ভরা একখানি সাজি
বিকচ কুসুম ফুল বৃক্ষে বৃক্ষে নব পত্র রাজি

বসন্তিকা এল আজ নব মল্লিকার মালা গলে
ব্যাকুল সুবাস বয় মুক্তিকাতে ভুঁই চাঁপা দোলে
নৃত্যমত্তা তটিনীর তালে তালে জাগে যে যৌবন
সারি সারি বনস্পতি ঘনবদ্ধ রক্তিম যৌবন

পুষ্পমাল্য অগুরুর গন্ধ ধূপে এ ধরণী ভরা
জীবন বসন্ত এল ভরি আজ ফুলের পসরা

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

শ্রীজ্ঞান

আজকাল তোমরাও বোধ হয় লক্ষ্য করে দেখেছ যে অতি সামান্য কারণে লোকে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে বিচার বিবেচনা হারিয়ে হানাহানি, খুনোখুনি করে এক খণ্ড-প্রলয়ের সৃষ্টি করে তোলে! কিছুদিন আগেই কলিকাতার রাস্তায় দুই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ধর্ম্মস্থানের একটি ব্যাপার উপলক্ষ্যে এই রকম বীভৎস ও লজ্জাকর কাণ্ড ঘটে গেছে।

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মের, নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাস। এখানে কত ভাষা, কত ধর্ম্ম, কত বর্ণ, কত আচার, কত আচরণ, কত আভরণ। কিন্তু আমরা সবাই জাতি হিসাবে ভারতীয়—তাই না? তাই এত সব বিভেদের মধ্যেও আমাদের মধ্যে একটা মিল রয়েছে—রয়েছে একতা। এই একতা, এই একজাতীয়তাই হচ্ছে আমাদের শক্তি, আমাদের বল। এর ব্যত্যয় ঘটলেই জাতি হয়ে পড়বে দুর্ব্বল, ব্যাহত হবে আমাদের প্রগতি—ভেঙ্গে পড়বে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো। সুতরাং এই মিল, এই একতা যাতে বজায় থাকে তার জন্যে আমাদের সকলকেই চেষ্টা করতে হবে। মনকে তৈরী করে নিতে হবে এই একতা বোধের উপযোগী করে। জাতীয়তাবোধ থেকেই আসে এই একতা; তাই জাতীয়তাবোধকে আমাদের মনে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। এখানে যেন ফাটল না ধরে। তাহলেই হবে সর্বনাশ! অতীতে বহুবার আমরা এই জাতীয়তাবোধের অভাবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে এই একতাবোধ হারিয়েছি—সেই সঙ্গে হারিয়েছি আমাদের স্বাধীনতা, আর হয়েছি পরপদানত।

সুতরাং এ বিষয়ে তোমরা সচেতন হও। আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ বহু প্রদেশে বিভক্ত। নানা ধর্ম্মাবলম্বীর এখানে বাস। আচারে-ব্যবহারে, চলনে-বলনে, পোষাকে-পরিচ্ছদে বহু প্রকার বিভিন্নতা রয়েছে এদেশের লোকেদের মধ্যে। ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু আগেই বলেছি এই বিভিন্নতার মধ্যেই রয়েছে মিল ও একতা এবং তা রয়েছে জাতীয়তাবোধের মাধ্যমেই। এই যে 'Unity in Diversity' এ সম্ভব হচ্ছে জাতীয়তাবোধের জন্যই। তাই এই জাতীয়তাবোধকে সব সময়েই জাগ্রত রাখতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে বা দুষ্টের প্ররোচনায় বা হঠকারিতায় আমরা এই জাতীয়তাবোধকে ক্ষুণ্ণ না করি, ভ্রাতৃতুল্য নিজ দেশবাসীকে, শুধু অপর প্রদেশবাসী বলেই যেন সামান্য কারণে প্ররোচনা প্রসূত সাময়িক উত্তেজনায় আঘাত না করি, বিভেদকে ইন্ধন দিয়ে রক্তাক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত না করি। মনে রেখ আমাদের শত্রুপক্ষের তাই কাম্য। তারা ভারতকে গৃহ-বিপ্লবে, গৃহ-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়—দুর্ব্বল করে, আত্মরক্ষায়

অসমর্থ করে তুলতে চায়। সুতরাং তাদের ফাঁদে যেন তোমরা পা দিও না। ভারতবাসী মাত্রকেই তোমাদের ভাই বলে মনে কর, আপন জন বলে আলিঙ্গন কর। সব সময় মনে রেখ আমাদের দেশমাতা ভারতমাতা সকলকারই মা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীশ্চান প্রভৃতি সকলকারই তিনি দেশমাতা। তাই তো বিশ্বকবি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে গেয়েছেন—

"পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ
বিন্ধ্য, হিমাচল, যমুনা, গঙ্গা, উচ্ছল জলধি তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে—
গাহে তব জয়গাথা।

তাই তোমাদের বলি ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মনোভাব বিসর্জ্জন দিয়ে একতার মধ্যে দিয়ে একজাতি, একপ্রাণ হয়ে গড়ে ওঠ। সকলকে মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, একতার সূত্রে বন্ধন করে বজ্রের শক্তিতে গড়ে তোল—দেশকেও গরীয়ান ও বরীয়ান করে তোল।

***

কৃপণের বুদ্ধি

শ্রীমতী সবিতারাণী দেবী

শিবপুরে এমন একজন লোকছিল, যার নাম সকালে উঠে কেউ করত না। তাদের ধারণা ঐ কিপটে লোকটার নাম নিলে সেদিন কারো ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না। লোকটি যে শুধু কৃপণই ছিল তাই নয়—তার চেহারাটাও ছিল এমনি যে সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দেখলেই লোকে রামনাম করত, কারণ রামনাম করলে নাকি ভূতের ভয় থাকে না।

এমন কৃপণ ছিল সেই লোকটি যে কাউকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা—সারাটি জীবন সে শুধু ছাতু খেয়েই কাটিয়েছে,—তাও আবার বিনা নুনে, বিনা মিষ্টিতে—ভাত ডাল তো তার কাছে "হারাম"! এই জন্যে পাড়ার লোকে তার নাম বদলে রেখে দিল ছাতুয়া বাবা। আসল নামটা যে কি তা এক রকম সবাই ভুলে গেল ধীরে ধীরে।

একদিন ছাতুয়াবাবার হঠাৎ কেন যেন খেয়াল হ'ল পায়েস খেতে। সকালে উঠে সে তার বউকে বললে "বৌ, আজ একটু পায়েস…"

বউ তো অবাক্। বলে কি? মাথা খারাপ হ'ল নাকি!

"শুনছ? একটু পায়েস আজ রাঁধলে হয় না?—" আবার বলে ছাতুয়াবাবা।

বউ জবাব দিল—

"হবে না আর কেন? বিনা দুধে, বিনা মিষ্টিতে, বিনা চালে ছাতুর পায়েস খেতে ভাল লাগে বৈ কি!"

কৃপণ হলেও সে তামাসাটা বুঝতে পারল। বলল—

"আরে না, না। তা কেন হবে? সব এনে দেব যা যা চাই তোমার।

এই বলে ছাতুয়াবাবা পায়েস রাঁধবার উপযোগী সব কিছু উপকরণই এনে দিল।

গিন্নী পায়েস পাক করে স্বামীকে খেতে ডাক্‌ল। পাড়ার লোকে তা'র রান্নাঘরে ধোঁয়া দেখে ভাবছে, ব্যাপার কি আজ?

একটা শয়তান লোক আড়িপেতে দেখে ও বাবা, আজ যে দেখছি…

ছাতুয়াবাবা ঘর থেকে বের হতেই দেখে, কে যেন তাকে দেখে সরে গেল। পাছে লোকটি হাজির হয়ে ভাগ বসায় এই ভয়ে প্রাণটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। একেই তো অতগুলো পয়সা দুধ, মিষ্টি কি. জলে ফেলা হয়েছে… পয়সা তো নয় যেন এক একটা মোহর।

ইসারায় সে তার বউকে ডেকে বল্‌লে, "দেখ, একটা রাক্ষুসে লোক আমার মাথায় হাত বুলিয়ে পায়েস খাওয়ার মতলব এঁটেছে বলে মনে হচ্ছে। তা দেখ, আমি একটু চুপচাপ শুয়ে থাকি—হঠাৎ কেউ আসে যদি—ঝাঁ করে বলে দিও আমি মরে গেছি। কাউকে খেতে দেওয়া আর মরে যাওয়া দুই-ই আমার কাছে সমান।

তাড়াতাড়ি সে কাপড় গায়ে দিয়ে টান্‌টান্ সটান পড়ে গেল বিছানায়। যে লোকটা মতলব নিয়ে ঘুরছিল সে ভাবল—কেমন কথা, পাক হ'ল কিন্তু খেতে তো আসেনা ছাতুয়াবাবা!…

এক পা, দু' পা করে সে এসে হাজির একেবারে ঘরের সামনে। তাকে দেখেই ছাতুয়ার বউ হাঁউ মাউ করে

কেঁদে বলল, "ওগো, আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো··· আমাকে ছেড়ে···"

লোকটাতো অবাক! তা সেও পাত্রটি সোজা নয়। সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল···"ওরে ছাতুয়ারে, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলিরে বন্ধু?·· চোখের জলে একেবারে নদানদী।

হঠাৎ ছাতুয়ার বাড়ীতে কি হ'ল ভেবে পাড়ার লোক দৌড়ে এসে সব শুনে বলল—"তা হ'লে তো এখন সৎকার করতে হয়···আর উপায় কি? কেঁদে আর...

কাঠ খড়ি জোগাড় করে সবাই মিলে ছাতুয়াকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশানে নিয়ে চলল পোড়াতে।

ছাতুয়া দেখল এওতো আচ্ছা ফ্যাসাদরে বাবা! মরলে যে এত দূর গড়াবে তা তো ভাবিনি। কি করা যায়?

পায়ের দিকটা যারা কাঁধে নিয়েছে, তাদের যেন কেমন সন্দেহ হ'ল—পা দুটো একটু একটু নড়ছে না? আরে হ্যাঁ, নড়ছেই তো! তা হলে?···ও বাবা, হাতখানাও নড়ছে যে···তবে কি?···

ছাতুয়া তড়াক করে উঠে বসেছে খাটিয়ার উপর। আর যায় কোথা, "ওরে বাবারে···ভূ···উ···ত" বলেই ধড়াস করে খাটিয়া ফেলে সবাই দে দৌড়, দে দৌড়···।

ছাতুয়া খোনা স্বরে ডেকে বললে—"ওঁরেঁ তোঁরা পাঁলাস কেঁন·· আঁমিঁ রে আমি···ভয় কিঁ···ভূত হঁইনি রে···। সেও ছুটল ওদের পেছনে পেছনে।

তারাতো ছাতুয়ার ভূত তাড়া করেছে ভেবে মরি-কি-পড়ি করে দে দৌড়। থামল এসে যে যার বাড়ীতে। ক'জনের যে কাপড় রাস্তায় পড়ে রইল তার ঠিকানাই নেই।

এদিকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ছাতুয়া বাড়ীতে এসে হাজির। পায়েস খেতে খেতে বউকে বললে—"দেখলে গিন্নি কি ফাঁকিটাই না দিলুম ব্যাটাদের। এক দাঁতের বুদ্ধি নেই—এসেছিল আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে।

পরের দিন সবাই দেখল, ছাতুয়া বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে!*

* (সংস্কৃত গল্পের ছায়া অবলম্বনে)
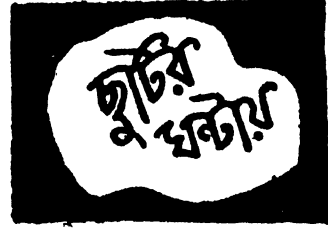
চিত্রগুপ্ত

দোলের দিনে গামলা আর বালতির জলে, লাল, কালো, সবুজ, বেগুনী, নীল, হলদে, বাদামী—নানা ধরণের রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে পিচকারী ভরে আত্মীয়-বন্ধু-লোকজনের গায়ে ছিটিয়ে তোমরা তো প্রচুর মজা করেছো···এবারে শোনো—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজব উপায়ে জলের রঙ বদলানোর বিচিত্র মজার কলা কৌশলের কথা। এ রঙের খেলাতেও কিন্তু যথেষ্ট মজা আছে!

অভিনব মজার হলেও, এ কলা-কৌশল রপ্ত করা, এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তবে রঙ বদলানোর এই আজব কায়দা কেরামতী নিজে পরখ করে দেখা কিম্বা আর পাঁচজনকে দেখাতে হলে গোড়াতেই দরকার—স্বচ্ছ একটি কাঁচের গেলাস, এক গামলা পরিষ্কার জল এবং কয়েকটি বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। এ সব রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা খুব একটা দুঃসাধ্য বা ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার নয়—সহরের যে কোনো বড় এবং ভালো ডাক্তার-খানায় বা রাসায়নিকের দোকানে কিনতে পারবে।

এ সব উপকরণ জোগাড়ের পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলের রঙ বদলানোর যে খেলাগুলি তোমরা সহজেই নিজেরা পরখ করে দেখতে এবং আসরে আত্মীয় বন্ধুদের সামনে দেখিয়ে মজা লুটতে পারবে, আপাততঃ তেমনি ধরণের কয়েকটি আজব কারসাজির কলা কৌশলের পরিচয় দিই।

প্রথমেই যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটির কথা বলছি, সেটি হলো—জলের রঙ বাদামী করে তোলার কায়দা। এ কায়দাটি পরখ করে দেখতে বা অপরকে দেখাতে হলে—গোড়াতেই স্বচ্ছ কাঁচের গেলাসটিতে জল ভরে নাও। এবারে ঐ গেলাসের জলে মিশিয়ে দাও একফোঁটা 'নাইট্রেট অফ্ কপার' (Nitrate of copper)রাসায়নিক পদার্থটি। এটি মেশানোর ফলে, গেলাসের জলের রঙ কিন্তু এতটুকু বদলাবে না। তবে এ জলে যদি 'প্রুসিয়েট অফ্ পটাস্' (Prussiate of Potash) রাসায়নিক পদার্থের এক ফোঁটা মিশিয়ে দাও, তাহলেই দেখবে—গেলাসের জলের রঙ বদলে দিব্যি বাদামী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু জলের রঙ যদি গাঢ় নীল করে তুলতে চাও, তাহলে আগের মতো পদ্ধতিতে গেলাসের জলে গোড়াতেই 'নাইট্রেট অফ্ কপার' মিশিয়ে, পরে সেই 'মিশ্রণে' এক ফোঁটা তরল অ্যামোনিয়া (Liquid of Ammonia) ফেলে দাও। তাহলেই দেখবে—গেলাসের স্বচ্ছ-জল ক্রমেই চমৎকার গাঢ় নীল রঙের হয়ে উঠেছে।

এবারে গেলাসের এই গাঢ় নীল রঙের জলে মিশিয়ে দাও, দু'এক ফোঁটা 'নাইট্রিক অ্যাসিড' (Nitric Acid) —তাহলেই দেখবে—গেলাসের জলের গাঢ় নীল রঙ বেমালুম উধাও হয়েছে এবং জলের রঙ যেমন ছিল তেমনি ...অর্থাৎ, দিব্যি স্বচ্ছ সাদা হয়ে উঠেছে আবার ঠিক আগেরই মতো।

এমনটি ঘটে রাসায়নিক পদার্থের বিচিত্র প্রক্রিয়ারই ফলে। এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য।

—

মনোহর মৈত্র

১। 'কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

অন্তরীক্ষে আছি আমি,
আকাশেতে নাই।
অম্বু শীর্ষে রহি, কিন্তু
বাতাসে হারাই।
অবনী ভিতরে আছি—
থাকি এককোণে...
বলো দেখি, আমি কে—
ভাবো মনে-মনে !

ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

মাঘমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :
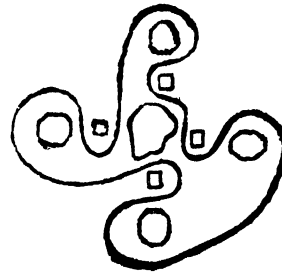
১। উপরের নক্সাটি দেখলেই বুঝতে পারবে গ্রামের পুকুর-পাড়ে জমিদারবাবুর ছেলেদের বাগান-বাড়ী আর চাষীদের কুঁড়েঘরের মাঝখানের জমিতে কি ধরণে লম্বা একটানা পাঁচিল রচনা করা হয়েছিল।

২। [অগজ=বৃক্ষজাত। অগ-সর্প, গজ-হাতী, অজ-চন্দ্র]

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

কল্যাণ, মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), রিনি, রণি ও মীরা (কাইরো), শর্ম্মিষ্ঠা, সঙ্ঘমিত্রা ও শচীন রায় (কলিকাতা), লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, মুরারি, সঞ্জয়, সুনীল, নমিতা ও অমিয় (ভিলাই), পুপু, ভুটিন ও বাবুই মুখোপাধ্যায় কলিকাতা), সুধাংশু, অলকা, হিমাংশু, হারাণচন্দ্র, শী ু ও সুষমা (শিলিগুড়ি), বুজু ও বিজু ভাদুড়ী (কলিকাতা), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (লক্ষ্ণৌ), কুলু মিত্র (কলিকাতা), বিজয়েন্দ্রকুমার ও বিনয়েন্দ্র . সিংহ (হাজারিবাগ), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবল নপু ও সঞ্জীব (হাওড়া), ফণী, পিন্টু ও খুকুন সাহা (কলিকাতা), ইন্দ্রাণী, উদয়ন, উত্তরা, পার্থ, অলক, তিলক, ঋতা, শীলা, মাণিক, মিনতি, অমিয়, সুনীত, কৃষ্ণা, নন্দা, পাপু, ছোটন, অর্চ্চি, মঞ্জু, মধুমালা, রাণা ও গৌতম (গড়িয়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), গৌর, লিপিকা রাণা ও বুনা (চুঁচড়া), সুধীশ, মানস, রজত, বিশ্বতোষ, অনিল, পূর্ণিমা, রেণুকা, সতী, মণিলাল, তিনকড়ি, ভুবন-মোহন, অভি, কৃষ্ণলাল, ভাস্কর, মনোজ, অশোক, অনাদি ও অমৃত (কলিকাতা), পৃথ্বীশ, নীলমণি, সুশীল, কালিদাস, রণজিৎ, আশুতোষ ও গোপীনাথ (বর্দ্ধমান), হরিদাস, কানাই, বলাই, দুলাল, হরিমোহন, অমু, অনিল, শ্যামসুন্দর, ও সুবোধ (রাণাঘাট), মণি, প্রীতি, চন্দন ও খোকন মজুমদার (কলিকাতা), অজয়, অজিত, দুর্গাদাস, প্রণব, আরতি, রেণু, খুকু ও ক্ষেত্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় (আগ্রা), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা)।

কবিতায় কাহিনী

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কতবার যে ভাবি মনে ভালই হব তবে
দুষ্টুমিটা দিলে ছেড়ে ব'লবে ভাল সবে।
সত্যি কথা ব'লতে কি আর সবই আমি বুঝি
কিন্তু ভাল হবার আসল জিনিস নেইকো আমার পুঁজি।
যদিই দু'দিন চেষ্টা ক'রে ভালর পথে চলি
ভাল যেন হচ্ছি ভাবি মুখেও সেটা বলি
কিন্তু হায়রে এমনই কপাল! কোত্থেকে কি এসে
সেই পুরান দুষ্টু ভুতটা ঘাড়ে চেপে বসে
মোড় ফিরিয়ে নে যায় টেনে আবার আগের হাল
সব ওলট পালট হয়ে যে যায় ভেবেছি যা' কাল।
আবার সুরু দুষ্টপনা ফাঁকিবাজির ফন্দিগোনা
সর্ব্বনাশের ফাঁদ পাতা আর মিথ্যার জাল বোনা
ফন্দি গড়ি ভাবি মনে, "বুদ্ধি বলে যাকে"
ফন্দি আঁটা ফাঁকির মাঝে নিজেই পড়ি ফাঁকে
সত্য-মিথ্যা অসুখ আছে; থাকি নানা বাজে কাজে
কেমন করে অবোধ মনে বসাই পড়ার মাঝে
এ' কথাটা কেউ বোঝে না মাষ্টারমশায় ভাই'
যাবার বেলা রোজই বলেন, "যেন কালকে পড়া পাই"।
পড়ার চাপে হৃদয় কাঁপে আবার পড়ার কথা
দুষ্টুমিতে মাথা খাটাই নেইকো পড়ায় মাথা
নিম-নিসিন্দে তা'ও যে ভাল তা'ও যে গেলা যায়
কিন্তু অনিচ্ছার যে পড়া তা'তে প্রাণটা রাখা দায়।
প'ড়তে ব'সে জ্বর এসে যায় মাথাটা যায় ঘুরে
ভাবি প'ড়তে গেলে অজ্ঞান হব, চলে যেতে চাই দূরে।
হাতটা দেখাই "মাষ্টার মশাই দেখুন কত জ্বর"
হেসে বলেন মাষ্টারমশাই, "আর দুটো অঙ্ক কর"।
করি কি আর ছুতো ধরি জল খেতে যাই ব'লে
ব'সে থাকেন মাষ্টারমশাই বই ফেলে যাই চ'লে।
স্বাস্থ্য-সুখটা আমার হাতে জীবন রাখার ভার
আমি যত ভাববো সেটা, এমন গরজ কার?
পড়ার ভারে শরীরটাকে কষ্ট যদি দি
বোকা আমায় ভাববে সবাই ব'লতে পারে ছিঃ
অনেক ভেবে বুদ্ধি ক'রে চ'লছি পথে আমি
দেখি কি হয় ভবিষ্যতে উঠি কিম্বা নামি
কাহিনীটা হ'ল সারা শুনলে ত সবাই
ঠিক না বেঠিক পথটি আমার ব'লতে পার ভাই?

বাংলা ও রাশিয়ার লোকসংগীত

শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি

একদিকে নাৎসী রাইখ অন্যদিকে জার—এই দু'য়ের অমানুষিক শাসনে সমগ্র ইউরোপের সংগে রাশিয়াব সামাজিক অসংগতির যে চরম বিপর্যয় সমগ্র মানুষের মানস জগতে একটা ভাব-সামঞ্জহীনতার অনিবার্য সর্বনাশের সূচনা ঘটিয়েছিল—রাশিয়ার ইতিহাস ওল্টালেই আমরা জানতে পারি। সমাজ ও জনসাধারণের সেই চরম অবক্ষয়ীর বেদনা গলিত লাভার মত একদিকে রাশিয়ার প্রাচীন লোককথার মধ্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে—তেমনি লোকগীতির মধ্যেও অপূর্ব ভাষা পেয়েছে। গ্রাম্যচারণ কৃষক কবির মুখ থেকে বেদনার বাণী সেদিন ঝরেছে। ভল্‌গা নদীর তীর ধরে, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, উজবেকিস্থান, কিরগিজিয়া, ও উক্রানিয়ানের পাশ দিয়ে তার প্রবাহ সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের হাজার হাজার কৃষকের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত দিয়েছে।

বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিহৃদয়ের আশা-আকাংক্ষা এবং তার ব্যর্থতার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে—যেমন, সেগুলো সমবেত লোকসংগীত যেখানে ব্যক্তি-হৃদয়ের চেয়ে সমষ্টি-হৃদয়ের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। তবে প্রেম-সংগীতে ব্যক্তির কান্নাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই ব্যক্তি-হৃদয়ের বেদনাই শেষে নিখিল মানবের চিরন্তন বেদনার সাথে মিশে গিয়ে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—বাংলা দেশের মানুষ—সান্তকে মিলিয়েছে অনন্তের সাথে;—মানুষ ও দেবতার কোন ভেদ নেই যখন এ প্রাণ খুলে কথা বলে। তাই বাংলা লোক-সংগীতের Love Song পরিণত হয় eternal song বা চিরন্তন বিরহগীতিতে।

রাশিয়ার লোকসংগীতের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এর অধিকাংশ সংগীতের পেছনে রয়েছে সমাজ-চৈতন্য। আর সংগীতের মধ্যে যে আশা, আকাংক্ষা বা ব্যর্থতার বেদনা ধ্বনিত হয় তাও কোন একক ব্যক্তির নয়—পরন্তু সমগ্র মানুষের ব্যক্তি-মানসের সংগে সমাজ-মানস এবং ব্যক্তি-চৈতন্যের সংগে সমাজ-চৈতন্যের এই অপূর্ব সংযোগই রাশিয়ার লোক-সংগীতের মূল-বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক ও আর্থিক জীবন যখন বিপর্যস্ত—এক টুকরো স্বাধীনতার জন্য মানুষের সমস্ত হৃদয় যখন ভেঙ্গে পড়ছে—তখন গ্রাম্য-কবি বড়জোর সমষ্টির এই উন্নততর স্বাধীন জীবনের বাসনাকে ছন্দে ও সুরে প্রকাশ করতে পারে। পৃথিবী থেকে সব দুঃখ—সব প্রতারণা ধুয়ে মুছে যাবে,—পৃথিবী হবে সুন্দর—এমন দিনটির জন্য সবাই প্রতীক্ষা করে;—কবে আসবে সে দিন, যেদিন এ পৃথিবীতে শোষণ থাকবে না—অত্যাচার থাকবে না—মানুষের কামনা ও বাসনা অপূর্ণতার বেদনায় কলঙ্কিত হবে না। পৃথিবীর সেই সুন্দরতম দিনটির জন্য সবাই প্রতীক্ষারত।

ঠিক এই পটভূমিকায় একটি আর্মেনিয়ান (Armeniun) লোকসংগীত শুনুন :—(মূল রাশিয়ান থেকে অনূদিত)

As long as world is all sin
As long as deciet stands to win,
So long do I part with this world.

কিন্তু এই পাপ ও প্রতারণাময় পৃথিবী বুঝি বড় কষ্টের—তাই কবির আকাংক্ষা—

When all is destroyed and created a new,
When barely grows large as the berries I knew
Oh ! then will I welcome my day,

নতুন পৃথিবীকে স্বাগত জানিয়ে সেদিন রাশিয়ার সাধারণ মানুষ পাপ ও প্রতারণাপূর্ণ পৃথিবীকে জানাবে তার শেষ ও চরম বিদায় অভিনন্দন—

This place will I leave on that day.

এই লোকসংগীতটির মধ্যে একদিকে রোম্যান্টিসিজম্ অন্যদিকে রিয়্যালিজম্, একদিকে বাস্তব পৃথিবীর যন্ত্রণার বেদনা অন্যদিকে land of utopia'এর জন্য আকাঙ্ক্ষা—এ দু'য়ের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে।

নাৎসী বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের একটি সুন্দর আলেখ্য রাশিয়ার একটি লোকসংগীতের মধ্যে কী সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে।

"If a man doth money back
From him his child they take.
If a man doth helpmate lack
From him his very self they take."

একেই বলে বুঝি লোমহর্ষক অত্যাচার!

রাশিয়ার অধিকাংশ লোকসংগীতের উৎসভূমি সমাজ-মন। কসাকরা (Cossack) হচ্ছে বীর যোদ্ধা;—সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এবং দেশমাতৃকার জীবন থেকে যারা শেষ স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে, তাদের যুদ্ধে উৎসাহ দেবার জন্য অনেক দেশাত্মবোধক সংগীতেও রাশিয়ার লোক-সংগীতে শোনা যায়। যেমন,

"Drop not, plant tree,
Still art thou green,
Fret not, little Cossack,
Still art thou young."

এরই পাশাপাশি বাংলা দেশাত্মবোধক একটি সংগীত রাখলে বোঝা যাবে—সর্বদেশের দেশাত্মবোধক সংগীতের প্রেরণা এক—পরাধীনতা থেকে মুক্তি—স্বাধীনতার জন্য প্রবল তৃষ্ণা—কসাকদের মতো,—

"চলো চলো ছুটে চলো, শত্রুনাশে চলো সবে দৃপ্ত রণসাজে,
স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহসী সৈনিক! করো যুদ্ধ অভিযান
ফিরাইয়া আনো তব অপহৃত মর্যাদারে, বিশ্বসভামাঝে,
অসি-চর্ম ধনুঃশর "ধরো লৌহ বর্ম পরো শিরে শিরস্ত্রাণ।"

রাশিয়ার দেশাত্মবোধক লোক-সংগীত আর বাংলার সংগীতে পার্থক্য কোথায়? সুর তো এক।

রাশিয়ার সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা ও বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষকে ভাষা দিয়েছিলেন লোকসংগীতজ্ঞ Kerogln.

সোভিয়েত ইউনিয়েনে লোকসংগীতের সমাদর সবচেয়ে বেশী—বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের মধ্যে লোকসংগীতের প্রচলন অত্যধিক—কেননা, লোকসংগীতের মধ্যেই তাদের সমাজ ও জাতীয় জীবন পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। রাশিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত "Song of the Motherland" এবং "Hymn of the democratic youth of the world"—রাশিয়ার মানুষের কাছে এ গান খুব পরিচিত ও প্রচলিত।

আমেরিকার লোক-সংগীতের ক্ষেত্রে আফ্রিকার নিগ্রোদের যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি রাশিয়ার লোক-সংগীতের ক্ষেত্রেও কসাক্ (Cossack)-দের দান উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে কসাকদের মত দুর্দান্ত অশ্বারোহী নেই বললেই চলে।

এই কসাক্‌রা শেষ পর্যন্ত যে ভাবে রাশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলো স সম্পর্কে প্রসংগত সমালোচকদের একটি তথ্যপূর্ণ উক্তি মনে পড়ে:—

"In their vast Prairielike lands in the south of Russia Partly in Asia, the Cossack tribes-men of centuries ago terrorited their neighbours with their plundering and freebooting in fact, derived from a word meaning plunderer. Agaist the Russians of the north—the so-called great Russians—they waged incessant warefare; from the twelfth and thirteenth centuries, when they were one of the Asiatic invaded Europe, the Cossacks attacked the outposts of the growing Russian empire"--এই ছিল প্রাচীন কসাকদের চিত্র। পরবর্তী-কালে এদের পরিণতি—"Finally, in the 18th. century they were incorporated in the Russian state. In latstimes the Ctarist army made use of their fierce spirit by making Cossak divisions the core of its cavalry."

এই দুর্দান্ত কসাকরা যখন শেষপর্যন্ত রাশিয়ার ভূখণ্ডে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গে চলে এলো তাদের লোকসংগীতের ছিটে-ফোঁটা অংশ।

সবদেশের ছেলেরাই ছোটবেলায় খুব দুরন্ত থাকে। কিছুতেই ঘুমাতে চাইবে না,—কান্না যদি জুড়ে, তবে পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে আসে—না জানি, ছেলেটাকে কী অমানুষিকভাবে প্রহার করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে কিছুই নয়—তুলতুলে ছোট্ট ছেলের ইচ্ছে মায়ের কোলে কিছুক্ষণ থাকবে ;—কিন্তু মায়ের যে অনেক কাজ,—তাই চাঁদ-সোনাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। বাংলাদেশের মা ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে সুর করে গান ধরে—

"ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি
মোদের বাড়ী এসো
আমার খোকার চোখে তুমি
ঘুম দিয়ে যেও।"

আসলে বাংলাদেশের এই ছড়াটি সুর দিয়ে মা গাইতে থাকেন। সুরের মায়াজালে দুষ্ট খোকা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু কসাকদের মধ্যে একটি লোকসংগীত প্রচলিত আছে—কসাক-মাতা ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর সময় তা গাইতে থাকে। বাংলাদেশের cradle song ও 'কসাক cradle song'এর মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কসাকদের ঘুম পাড়ানো সংগীত-এর মধ্যে রয়েছে কসাক-জননীর এক মর্মন্তুদ অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র। কসাক-জননী জানেন—তার এই ছোট্ট শিশু একদিন বড় হবে—তার চাঁদ মাতৃহৃদয় দিগন্ত থেকে বেরিয়ে যাবে দিগ্বিজয়ে, মা তাকে ধরে রাখবে না—রাখতে পারে না ; কেননা, তারা কসাক—যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়ই তাদের পেশা। তাই ছেলে বড় হওয়ার সংগে সংগেই কসাক-জননী ছেলেকে বিদায় জানায়—যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়—নির্মম ও নিষ্ঠুর মৃত্যুর সাথে জীবনভোরের বোঝাপড়ার জন্য। এই বুঝি কসাকদের ভাগ্য! তাকে সারাজীবন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের সাথে জড়িয়ে থাকতে হবে—প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে হবে দেখা। কিন্তু কসাক-জননী—সে যে মা! সবদেশের মায়ের মত তারও যে একটা পোড়া হৃদয় আছে—সেখানে তার ছেলে—তার নিজের রক্তে তৈরী—সারাজীবনের বাসনার ও কামনার চরম পরিণতি—তার আদরের সন্তান। মৃত্যুর খেলা যেখানে হচ্ছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন করে তাকে সে পাঠাবে।.......... কিন্তু বৃত্তিগত পেশার সংস্কার তাকে বাধ্য করে ;—তাই যেতে দিতে হয়। মা শঙ্কাকুল হৃদয়ে বসে থাকে বাড়ীতে—ছেলের সংবাদের জন্য। তাই ছোট-বেলায় ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে তাদের জীবনের নির্মম ভাগ্যের কথা গানের সুরে গাইতে থাকে—পরবর্তীকালে রাশিয়ার সাহিত্যিক Mikhail Lermonton এমনি Cossackদের অনেক Cradle Song বা ঘুমপাড়ানী সংগীত সংগ্রহ করেন—তারই একটি উল্লেখ করছি—তা হলেই বাংলাদেশের লোক-সংগীতের সংগে এর পার্থক্য কতখানি বোঝা যাবে—

"Softly pretty baby, sleeping,
Bayushke´—bayu´,
Quiet moon bright watch is keeping
On your evil for you.........
I shall tell you tales past number,
Sing you ditties too.
Close your tender eyes, in
Byushke´—bayu'.. ..."

শিশু শুয়ে রয়েছে—ছোট্ট একটি বিছানায়—ওপরে চাঁদ হাসছে—বুঝি শিশুকে প্রাণভরে দেখছে "moon... on your crib (the child-bed) for you"—মায়ের অনুরোধ—খোকা, লক্ষ্মী আমার, তুমি চোখের পাতা বন্ধ কর—আমি একটি পুরণো গল্প বলছি। তারপর মা স্মৃতি রোমন্থন করে—অতীতস্মৃতি ও ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বেদনা গানের সুরে ঝরতে থাকে,—

"Terek on his stones is fretting
With his troubled roar ;
Wild cheche´n his dagger whetting.
Crawls along the shore.
But your father knows war riot,
Knows what he must do,......
Sleep, my darling, sleep in quiet."

অর্থাৎ যুদ্ধ চলছে, চারিদিকে তার ভয়াবহ গর্জন—নদীর তীর ধরে হামাগুড়ি দিয়ে শত্রুরা আসছে—কিন্তু, খোকন, তোমার বাবা জানে—কী করতে হবে। সে যুদ্ধ করবে......এখন তুমি শান্তিতে ঘুমোও।

তারপর মায়ের বুক গৌরবে ভরে ওঠে। সন্তানও তার এমনিভাবে যুদ্ধে যাবে। সেই ভাবী বীর যোদ্ধা সৈনিকের কী অপূর্ব চিত্র—মায়ের কী করুণ বাসনা—

"You will learn—the time is nearing
All a soldier's ways ;
Foot in stirrup, never fearing,
Rifle you will raise,
Silk for battale I shall deftly
On your saddle sew.
Sleep, my own sweet child, sleep softly.

মাতৃহৃদয় গৌরবে পরিপুর্ণ হ'য়ে যাবে যখন সে দেখবে যে তার সন্তান সত্যিকারের কসাকদের ঐতিহ্য তুলে ধরছে ;—তাই মা বলছে ছেলেকে যখন যুদ্ধের ডাক আসবে তখন,—

"You will show a fighter's mettle,
Cossack to the heart ;
I shall see you ride to battle,
Wave your hand and start."

তারপর ? ছেলে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু মাতৃহৃদয় ?—রাত্রির প্রতিটি প্রহর মায়ের কেমন করে কাটবে—

"All that might in secret weaping
My sad tears shall flow."

... ...

কাঁদতে গিয়েও মা কাঁদবে না—কসাকজননী একদিকে অন্তরে তাঁর কসাক ঐতিহ্য আবার অন্যদিকে রয়েছে স্বাভাবিক মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ও মমতা—এই দু'য়ের টানা পোড়েনে কসাক-জননী ক্ষতবিক্ষত। মাতৃহৃদয়ের এই বেদনাদায়ক অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র অন্য কোনদেশের লোকসংগীতে বিরল। এই সংগীতের মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের বিষণ্ণতা যেন ফেটে পড়েছে,—

"I shall find that life in dreary ;
Comfortless I'll wait,
Daily pray till I am weary,
Nightly guess your fate,
a ofu you in countries going
That are nought to you,
Sleep, my darling, care not knowing."
[Cossac Cradle Song.]

সন্তান জন্মের পরই কসাক জননী বুঝতে পারে যে, 'her child will grow up to fight and possibly die in battle.' এই মর্মন্তুদ ধারণাই সংগীতের মধ্যে ছড়িয়েছে এত বেদনার অশ্রুবারি। আমি আগেই বলেছি, শুধু বাংলাদেশে কেন, কোনদেশের লোকসংগীত বিশেষ করে ঘুমপাড়ানী গানের সংগীত, বিশেষ করে ঘুমপাড়ানী গানের (Cradle Song) মধ্যে মাতৃহৃদয়ের বেদনা এত নির্মম সত্যরূপে প্রকাশ পায়নি। বাংলা তথা ভারতে কসাকদের মত ক্ষত্রিয়রাও বড় যোদ্ধা। যুদ্ধই তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই তাদের গৌরবের। আমাদের পুরাণ কথায় (Myth.) দেখেছি ক্ষত্রিয়সন্তান যখন যুদ্ধে যাচ্ছে তখন মাতা ও স্ত্রী তাকে সাজিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু ছোটবেলায় ক্ষত্রিয়মাতা কসাক মাতাদের মত ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে এমন করুণ সংগীত করেন নি। এই কসাক লোকসংগীতটি সত্যিই অপূর্ব। আজকের রাশিয়ায় যে Disarmament বা নিরস্ত্রীকরণের আকাঙ্ক্ষা তারই সূক্ষ্ম পদধ্বনি যেন এই কসাকজননীর সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর আর একটি রাশিয়ার লোকসংগীত উল্লেখ করছি। মানুষের জীবনে দুঃখ যে অবশ্যম্ভাবী তারই সার্থক প্রকাশ এই সংগীতটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছি।

প্রায় ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যামুয়েল কলিন্‌স্ (Samuel Collins) নামে এক ইংরেজ-ডাক্তার মস্কো থেকে চলে আসার চেষ্টা করেন। তিনি লণ্ডনে ফিরে আসার সময় রাশিয়ার কিছু লোক-সংগীত সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (১৬৭০) পর একটি বই প্রকাশিত হয় "The Present state of Russia" (1671)—এতেই তাঁর আনীত রাশিয়ার লোক-সংগীতগুলি আমরা পাই। মানুষের জীবনে যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী—তাকে কিছুতেই যে এড়ানো সম্ভব নয়—তার কত সুন্দর ও সাবলীল প্রকাশ অখ্যাত কোন এক কবির এই সংগীতে প্রকাশ পেয়েছে,—

এক সুন্দরী যুবতী নিজে গাইছে—দুঃখের হাত থেকে

রেহাই পাওয়ার জন্য সে কত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছে—কিন্তু দুঃখের হাত থেকে সে রেহাই পায়নি—সুখের আশায় ছুটতে গিয়ে দেখে দুঃখ সেখানে এসে উপস্থিত। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সংগীতটি অপূর্ব—

"Whether shall I, the fair maiden,
Flee from sorrow ?

—আমি এক কুমারী,—দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোথায় যাব ?

"If I fly from sorrow into the dark forest –
After me runs sorrow with an axe :
"I will fell, I will fell the green oaks ;
I will seek, I will find the fair maiden."

জঙ্গলে লুকিয়ে তো দুঃখকে এড়ানো গেল না! তবে যদি দুঃখের হাত থেকে বাঁচার জন্য নীল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করি—তবে দুঃখও পিছনে পিছনে ছুটবে—দেখা দেবে একটা বিরাট মাছ হয়ে এবং সেই মৎস্যরূপী দুঃখ বলবে—

"I will drink, I will swallow the blue sea ;
I will seek, I will find the fair maiden."

এখানেও নিস্তার নেই। যদি বিবাহিত জীবনের আনন্দের মধ্যে—আত্মগোপন করা যায়, তবে বুঝি দুঃখকে এড়ানো যেতে পারে, কিন্তু হায়রে, সেখানেও—

"Sorrow flows me as my dowry :'

তবে 'If I take to my bed to escape from sorrow" ;—

সেখানেও "Sorrow sits beside my Pillow ;" কোথাও শান্তি নেই—কোথাও দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই! সুন্দরী এই কুমারী যেখানে গেছে সুখের জন্য,—দুঃখ সেখানে উপস্থিত হয়েছে বিভিন্ন মূর্তিতে। এক সুন্দরী নারীর কী অপূর্ব এই জীবনদর্শনালেখ্য। রাশিয়ার লোককথার ঐ 'Seeking Immortality'র মত। মৃত্যুকে এড়াতে গিয়ে যেখানে যুবক যাচ্ছে সেখানে দেখছে মৃত্যুর কালো ঘন ছায়া আর রাশিয়ার এই লোকসংগীতের মধ্যে যুবতী দুঃখকে এড়াতে গিয়ে যে সব নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে সেখানেও দুঃখের উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে।

এ যেন বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার আক্ষেপ। কৃষ্ণকে ভালবেসেছিল এই যুবতী রাধা- সুখের আশায়। দুঃখের কালো আঁধার এই তরুণী প্রেমিকার জীবন-দিগন্তকে যেন না ঘিরে—এই ছিল তার গোপন আশা।

কিন্তু এ কি হল? সুখের জন্য ঘর বাঁধতে গিয়ে দুঃখের আগুনে যে সব পুড়ে গেল —তাই আক্ষেপ—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল—
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

... ...

আর, "শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি"......

রাধা সুখের আশায় যা করলো—পরিবর্তে পেল দুঃখের আলিঙ্গন। কেন? দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার যে কোন উপায় নেই! উভয়দেশের এই দুটি সংগীতের মধ্যে সুর কিন্তু এক। অর্থাৎ, "Sorrow follows every-where."

জ্ঞানী

শ্রীপ্রশান্ত ব্যানার্জী

জানি আমি ত্রিভুবন
জানিনা আমি নিজেরে,
চরাচরে ঘুরে বেড়াই
এই জানাকে সাথী করে।

জানার বাহিরে জানা
কত যে আছে ছড়ায়ে,
আহারে অ-জানা বলে
রাখি দূরে সরায়ে।

সাধক সমভিব্যাহারে তীর্থদর্শন (২)

হৃষীকেশ

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিদ্বার দর্শনের পর আমরা (শ্রীমদ ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস মহারাজ, আমার স্ত্রী ও আমি) দেরাদুনে গেলাম। মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সাথে আমার বাটীতেই উঠিলেন এবং তাই আমরা তাঁহার সহিত বিবিধ ধর্ম প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার ও সাধনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য জানিবার সুযোগ পাইলাম। মহারাজ বললেন মহাবীর পবননন্দন রক্ষক রূপে আমাদের এই বাড়িতেই আছেন আর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে কিছু পাঠ বা আলোচনা হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে উহা শ্রবণ করেন। আমার বাটির বিষয়ে মহারাজ মন্তব্য করিলেন স্থানটি সুন্দর, কোনরূপ বাস্তু দোষাদি নাই, সাধনার জন্য উত্তম।

২০শে নভেম্বর ইং ১৯৬৬ রবিবার বৈকালে আমার বাড়ির উদ্যানে পদচারণ করিতে করিতে মহারাজ একদিকে হাত তুলিয়া বলিলেন, "ঐদিক্ হইতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ডাকিতেছেন ও বলিতেছেন, এখানে এসে আমার পূজা কর। এই বাটীর বাগান হইতে ভাল ফুল ও মালা লইয়া যাইতেও আদেশ করিয়াছেন।" সে সময়ে আমাদের বাগানে অজস্র ছোট বড় গাঁদা ফুল এবং গোলাপাদি অন্য পুষ্প ছিল।

মহারাজ আরও বলিলেন, "আমি দেখিতেছি শ্রীবিষ্ণুর স্থানটি পর্বত সংলগ্ন এবং নিম্নে খরস্রোতা গঙ্গা ঘোর কলকল নিনাদে বহিতেছেন। গঙ্গোত্রী গোমুখী কি ঐ দিকে?" আমি মহারাজকে জানাইলাম, "গঙ্গোত্রীর স্থান ঐ দিকে নয়। ঐ দিকে হৃষীকেশ আছে এবং আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে আমার অনুমান যে হৃষীকেশে গঙ্গার তীরস্থ কোন বিষ্ণু মন্দির হইতে আহ্বান আসিয়াছে। হৃষীকেশ দর্শন আমাদের প্রোগ্রামে আছে, আমরা সেখানে যাব।"

পরদিন মহারাজ যখন পুনঃ শ্রীবিষ্ণুর আহ্বানের কথা বলিলেন আমি তাঁহাকে জানাইলাম আমরা বৃহস্পতিবারে (২৫শে নভেম্বর) যাইব। কিন্তু আমার শরীর অল্প অসুস্থ হওয়ায় শুক্রবারে (২৬ নভেম্বর) মোটর যোগে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল এবং মালীকেও ভাল ফুল, চারটি বড় তোড়া, কয়েকটি মালা, তুলসী, বিল্বপত্র আদি তৈয়ার রাখার আদেশ দেওয়া হইল।

২৬শে নভেম্বর '৬৬ শুক্রবার দিন প্রভাতে আহ্নিকাদি সারিয়া ফুল, মালা, চন্দনাদি পূজার উপকরণ, কিছু আহার্য্য ও পানীয় জল লইয়া আমরা আমাদের প্রতিবেশিনী ডাঃ কুমারী থাপন এবং আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ দুর্গাদত্ত যোশী, মোটরকারে রওনা হইলাম। আমার বাটীর অনতিদূরেই দেরাদুন হরিদ্বার মার্গ। ইহা হৃষীকেশ ঘুরিয়া হরিদ্বারে যায়। দেরাদুন হইতে হৃষীকেশ ২৬ মাইল। ত্রিংশ বর্ষ পূর্বে যখন আমি দেরাদুনে সার্বজনিক নির্মাণ বিভাগের (P. W. Dর) ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, তখন দেরাদুন হইতে হৃষীকেশে যাইবার কোন স্থায়ী পাকা রাস্তা ছিল না। রুড়কী ও হরিদ্বার ঘুরিয়া হৃষীকেশে যাইতে হইত। দেরাদুন হইতে ডোইওয়ালা পর্যন্ত ১১ মাইল পি. ডাবলু. ডির পাকা রাস্তা ছিল। বনবিভাগের একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে, বনবিভাগের আদেশপত্র গ্রহণ করিয়া হৃষীকেশে যাওয়া সম্ভব ছিল। আমরা ঐ পথ দিয়াই তখন যাতায়াত করিতাম। পথে সংগ নদী, অন্য তটিনী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ, ছোট ছোট অস্থায়ী সাংকোর দ্বারা পার করা হইত। হরিণ ও হিংস্র জন্তু জঙ্গলে দেখা যাইত।

ভাল পাকা রাস্তার দ্বারা দেরাদুনের সহিত হৃষীকেশের সংযোগ করিতে পারিলে পরিবহনের অনেক সুবিধা হইবে এই উদ্দেশ্যে তখন আমি ঐরূপ মার্গ নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং যদিও একাধিকবার ঐ রাস্তার প্রাক্কলন (এস্টিমেট) করা হইয়াছিল আর উহা উত্তরপ্রদেশের

রাস্তা নির্মাণের যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, কার্য্য আরম্ভ করা কিন্তু সম্ভব হইয়াছিল যখন আমি নির্মাণ বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এখন বেশ ভাল আংশিকভাবে পার্বত্য মার্গ আছে। ইহাতে দুটি বড় সেতু আছে। [টোল দিতে হয়।] রাস্তা সকল ঋতুতেই ব্যবহার উপযোগী। পরিবহনের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই অঞ্চলে মহারাজের প্রথমবার আগমন হইল এবং পার্বত্য পথ কিরূপ হয়, তাহা তিনি দর্শন করিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্থানটি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া, গন্তব্য স্থানটি কোন্‌দিকে তাহা দেখাইয়া দিতেছিলেন। পাহাড়ের পথ আঁকা বাঁকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি দিক ঠিকই দেখাইতেছিলেন। হৃষীকেশে যখন আমরা উপস্থিত হইলাম মহারাজ বলিলেন, স্থানটি গঙ্গার পরপারে। তাই আমরা মুনি কিরেতীর দিকে চলিলাম এবং খেয়াঘাটের যথাসম্ভব নিকটে মোটরগাড়ি রাখিয়া খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম পারে যাওয়ার জন্য নৌকা নাই। আমরা নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং মহারাজকে বলিলাম, "আমরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আহ্বানে আসিয়াছি। ওপারে যাওয়ার জন্য নৌকা পাওয়া উচিত।" যখন নৌকা আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন মোটর গাড়িতে লছমনঝোলা ঘুরিয়া, ঝোলা সেতুর দ্বারা গঙ্গা পার করিয়া ওপারে স্থিত স্বর্গাশ্রম, গীতাভবনাদি দর্শনের প্রস্তাবে মহারাজ বলিলেন, "সূক্ষ্ম শরীরীগণ বলিতেছেন ঐ পথে বিলম্ব হইবে, নৌকায় পার করাই বিধেয়।" এক দিব্যপুরুষ মহারাজকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা কর, নৌকা শীঘ্রই আসিবে।" তাই আমরা অপেক্ষা করা স্থির করিলাম এবং অচিরেই দেখিলাম ওপার হইতে একটি মোটরবোট তীব্রবেগে আসিতেছে। ইহাতে উঠিয়া আমরা এবং অন্য আগত যাত্রীগণ গঙ্গা পার হইলাম।

ওপারে নামিয়াই মহারাজ ত্বরিতপদে একদিকে চলিলেন। আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। স্বর্গাশ্রমাদির সামনে গঙ্গার ধারের পথটি মহারাজ ধরিলেন এবং দ্রুত হাটিতে লাগিলেন।

স্বর্গাশ্রমের দ্বারে তিনি দাঁড়াইলেন না, কোন এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলিলেন। আমি ভাবিলাম গীতা ভবনের মন্দিরটি গন্তব্য স্থান। কিন্তু তিনি উহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না, গীতা ভবন ছাড়াইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "আর একটু যেতে হ'বে। তিনটি দেবতাকে দেখছি।" তারপর পরমার্থ নিকেতনের সদর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, "এই দিকে অল্প পিছনে আছে।" আমি তখন তাঁহাকে জানাইলাম ওখানে মন্দির আছে এবং তাহাতে শিব, রাধাকৃষ্ণ, ও সীতারামের বিগ্রহগুলি আছেন—নিকটে আরও মন্দির ও বিগ্রহ আছে। মহারাজ বলিলেন "শিব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকে দেখিলাম।" পরমার্থ নিকেতনের দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডাইনে মন্দিরটি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এই মন্দিরই দেখছিলাম।"

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমরা বিগ্রহগুলির দর্শন করিয়া বসিলাম। মহারাজ আমাকে স্থূল পূজা করিতে বলিলেন প্রথমে জগদগুরু শিবের তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এবং শেষে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের। তিনি নিজে ধ্যানস্থ হইয়া সূক্ষ্ম পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি তাহার নির্দেশ অনুযায়ী স্থূল পূজাদি করিলাম, এবং আমার স্ত্রী ও ডাঃ থাপন ধ্যান জপাদি করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এই মন্দিরে শিব বিগ্রহটি অতীব সুন্দর। রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-জানকীর মূর্তিগুলিও দর্শনীয়। মন্দিরের নির্মাণ, চিত্রাদি, অন্য বিগ্রহগুলি এবং পশ্চাদদিকে ভগবানের বিশ্বরূপ মূর্তি সবই চমৎকার।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও রত্নেশ্বর মুনির সহিত কথা কহিয়া মহারাজ এই স্থানের সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন :—

"এই স্থানের বিশেষত্ব আছে। ইহা শ্রীবিষ্ণুর স্থান। ঐ দুই পর্বতের মাঝে একটি বাঁক ঘুরিয়া গঙ্গা এখানে প্রবাহিতা এবং নদীগর্ভে অনেক প্রস্তর ও শিলা থাকায় এবং ঢালু পাথুরে ভূমির উপর দিয়া তীব্র প্রবাহের কারণ গঙ্গা নাদ করিতে করিতে বহিতেছেন। ঐ উত্তর দিকে পর্বতের চূড়ায় শ্রীবিষ্ণু নিজের আসল স্থানটি দেখাইলেন। শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত। তিনি নিজের গদা ঘুরাইয়া ইহার পরিধি মোটামুটি দেখাইলেন। এই ক্ষেত্রের উত্তর সীমা হিমাদ্রি, দক্ষিণে সিবালিক পর্বতমালা, পূর্ব সীমা গঙ্গার উপত্যকা এবং পশ্চিমে যমুনার উপত্যকা। এই পাবন ক্ষেত্রটিতে সকল পূজাতেই শ্রীবিষ্ণুর পূজা অবশ্য

করণীয় না করিলে সেই পূজা বা কৃতকার্য্য সফল হয় না।

আমি বলিলাম, "আমি এই ক্ষেত্রে বহুবার এসেছি ও বাসও করেছি, কিন্তু ঐ তথ্যটি আমি জানিতাম না—কোন গ্রন্থে পড়িনি—কাহারও নিকট শুনিওনি। ইহা সাধন ভূমি। সাধকগণের কাছে শুনেছি এখানে সাধনরত কেহ কেহ দিব্য বা অলৌকিক দর্শন লাভ করেছেন, দিব্যানুভূতি হয়েছে।" মহারাজ পুনঃ বলিলেন, "শ্রীবিষ্ণুর প্রকৃত স্থানটি পর্বত-চূড়ায় অবস্থিত, দুর্গম। সাধারণ মনুষ্যের ঐখানে উঠিয়া পূজার্চনাদি করা সুকঠিন, তাই ত্রেতাযুগের প্রথম পাদে ভৃগু-বংশীয় এক ঋষি—নাম রত্নেশ্বর—গঙ্গার বাম তটে যেখানে এখন পরমার্থ নিকেতনের উক্ত মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে দু'টি শিলা স্থাপিত করিয়াছিলেন—একটি শ্রীবিষ্ণুর আর অপরটি নিজ গুরু শিবের পূজার উদ্দেশ্যে। ঐ শিলাগুলির উপর তিনি শিব ও শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি করিতেন। এই স্থানে সাধন করিয়া তিনি মুনিত্ব লাভ করেন ও জ্ঞান-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। রত্নেশ্বর মুনি দিব্যদেহে আসিয়া এই ইতিহাসটি ব্যক্ত করেন। জানিনা কোন্ প্রেরণায় পরমার্থ নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এখানে মন্দির নির্মাণের সংকল্প করিয়া মন্দিরটি নির্মাণ করাইলেন। উপাসনার হলে তাহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তিনি চরম ইষ্ট সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক ছিলেন। ভগবৎপ্রেরণা পাইয়া থাকিবেন।"

"এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সত্তাকে দেখিয়া, আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম," প্রভো! আপনি ত্রেতাযুগের অবতার পুরুষ, আপনি এখানে কেন? তখন তিনি বলিয়া-ছিলেন, 'যে কোন অবতার ভারতে অবতীর্ণ হন, তাঁহাকে এই বিষ্ণুমার্গে আসিয়া সূক্ষ্ম শক্তি অর্জন করিতে হয়। আমিও অবতাররূপে এখানে শক্তি অর্জনের সাধনা করিয়াছিলাম। তাই আমার কিছু সত্তা এইস্থানে বিদ্যমান।" "আমি ভগবানকে প্রশ্ন করিলাম," প্রভো, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে দ্বাপরের অবতার পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও এখানে আসিয়া শক্তি অর্জন করিতে হইয়া থাকিবে। তিনি এখানে কোথায়?"

"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, তিনিও এখানে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এখানে যাহারা বিগ্রহগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহারা এখানকার তত্ত্বগত ভিত্তি জানে না। এইস্থানে মূলতঃ শঙ্খচক্রধারী নীলবর্ণ রাজরাজেশ্বর-বেশী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ছিল (যেমন মূর্তি গীতা ভবনের প্রবেশ দ্বারের উপর আছে)। কিন্তু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার ইষ্ট রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, সাথে নিজ গুরু জগদ্‌গুরু শিবের বিগ্রহ রাখিলেন এবং আমাদের যুগলমূর্তি বসাইলেন'!"

"আমি যখন সূক্ষ্ম পূজা করিলাম তখন রাধাকৃষ্ণ আসিলেন না, বিগ্রহের পশ্চাৎ পূর্ণ বিষ্ণুশক্তি পূজা গ্রহণ করিলেন। এবং পূর্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পিছনে অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন। ভগবান শ্রীরাম যাহা বলিয়াছিলেন তিনি তাহা সমর্থন করিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কল্কি অবতারকেও ঐস্থানে আসিয়া শক্তি অর্জন করিতে হইবে।"

ইহার পর আমরা নবগ্রহের মন্দিরগুলি দর্শন করিলাম। এখানে স্থাপিত মূর্তিগুলির কল্পনা তাঁহাদের বাস্তব রূপের ন্যায় করা হয় নাই এই আমার মনে হইল—মহারাজও দেখিয়া আমার মত সমর্থন করিলেন। গ্রহ মন্দিরগুলিতে লিখিত গ্রহ-মন্ত্রগুলি প্রচলিত মন্ত্রানুরূপ। কিন্তু অনেকগুলি গ্রহাধিপতি অনুমোদিত শুদ্ধ মন্ত্র হইতে ভিন্ন ছিল। এই শুদ্ধ মন্ত্রগুলি মহারাজ যোগবলে জানিয়া গ্রহরাজ সূর্যকে বলিয়াছিলেন। গ্রহরাজ সেগুলিকে গ্রহগণের শুদ্ধ ও ব্যবহার্য মন্ত্র বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন—তখন মহারাজ ঐগুলিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন পূজা ও সাধনাতে ব্যবহারের জন্য। মহারাজ নিজ যোগবলে জানিয়া এবং দেবতা বা ঋষিগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া অনেক-গুলি দেবতার শুদ্ধ মন্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি মন্ত্র প্রচলিত মন্ত্র হইতে ভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রে পূজক বা সাধকগণ এগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, ব্যবহার করিতে ভরসা পান না। সংস্কারও অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ইহা স্বাভাবিক। যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, মন্ত্র সংস্কারের কারণ বুঝিয়াছেন এবং শুদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া উহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা ঐগুলি ব্যবহার করিবেন এবং অন্যদের ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিবেন। সকল মূর্তিগুলির নির্মাণ-শিল্প সুন্দর।

এখানে উপাসনার হল ঘরটি বেশ বড়, সুসজ্জিত এবং স্থানে স্থানে ধর্মগ্রন্থাদি হইতে সুভাষিত সুন্দর শ্লোকাদি

লিখিত ও চিত্রাদির দ্বারা শোভিত। বাহিরে প্রাঙ্গণে অনেক ঋষি, মহাত্মাদির মূর্তি আছে এবং উদ্যানে ছোট ছোট মণ্ডপে চিত্তাকর্ষক শিল্পের মূর্তিগুলির দ্বারা পৌরাণিক আখ্যায়িকার রূপ ফুটান হইয়াছে।

পরমার্থ নিকেতন গঙ্গার ধারে নির্মিত একটি বিরাটায়তন ভবন। ইহার অধিকাংশ একটি বিশাল অংগনের চারিপাশে নির্মিত। এই দ্বিতল ভবনে অনেকগুলি ভাল প্রকোষ্ঠ আছে, যেখানে সাধু, সাধক, এবং সাধনরত বা সৎসঙ্গ-প্রার্থী গৃহী বাস করিতে পারেন আর শুদ্ধ স্বস্থ পরিবেশে অন্য সাধকদের সঙ্গ লাভ ও নিয়মিত ভগবৎ কথা উপাসনাদির দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসে সাহায্য লাভ করিতে পারেন।

পরমার্থ নিকেতন দর্শন করিয়া আমরা গীতাভবনের মন্দির দু'টি এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি দর্শন করিলাম। ইহাও বিশাল অংগনের চারিদিকে নির্মিত বিরাট দ্বিতল ইমারত। উঠানের মাঝে প্রশস্ত নাটমন্দির-যুক্ত মুখ্য মন্দির ও শিব মন্দির। বিগ্রহগুলি সুন্দর এবং মন্দিরাদির নির্মাণ-কার্য মনোরম। নিয়মিত সময়গুলিতে পূজা আরতি আদি হয় এবং অল্প প্রসাদও বিতরণ করা হয়। অংগনের চারিধারে টানা বারান্দার সংলগ্ন বাসোপযোগী প্রকোষ্ঠের সারি। গীতা-ভবনের এই অট্টালিকা ও অন্যগুলিও গঙ্গাতটে নির্মিত। প্রবেশ দ্বারের উপরেই শ্রীকৃষ্ণের অতি সুন্দর নীলবর্ণ মূর্তি! বাহিরের বারান্দায় এবং অন্য অনেক স্থানে অনেক ভাল ভাল বচন দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। ভিতরে বারান্দার দেয়ালে চিত্রে সমগ্র তুলসী-রামায়ণের বিবিধ দৃশ্য সুন্দরভাবে অংকিত আছে এবং যেখানেই চোখ পড়ে, গীতা, রামায়ণ, সাধকদের রচনা ও নানা ধর্ম-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত শ্লোক, দোহা বচনাদি লিখিত। দ্বিতলে তিনদিকে টানা বারান্দা ও প্রকোষ্ঠের সারি আছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের পিছনে আর একটি ঘর আছে। ইহাতে জলের কল আছে এবং ইহা রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্যুতিক আলো পাখা, শয়নোপযোগী তক্তপোষ, দেয়ালে দুটি আলমারী, মাল-পত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থাদি আছে। এখানে সাধনা করিবার বা সৎসঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে অনেক লোক কয়েকমাস ধরিয়া থাকেন। ঘরগুলির ব্যবহারের জন্য কোনরূপ ভাড়া লওয়া হয় না। [illegible]

প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও কাঠকয়লা সুলভে ভবনের স্টোর হইতে পাওয়া যায়।

দ্বিতলে একটি গ্রন্থাগার এবং আর একটি বৃহৎ হল আছে। হলের দেয়ালে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শ্লোকগুলি ও প্রতি অধ্যায়ের মর্ম এবং জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রদ বচনাদি লিখিত আছে আর কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজ-বেশের মূর্তি আছে। এখানে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গীতা ও রামায়ণ পাঠ, আর ধর্মালোচনা হয়। মন্দিরে সন্ধ্যার পর ভজন কীর্তনাদি হয়। গঙ্গায় স্নানের জন্য ভাল বাঁধানো কয়েকটি ঘাট আছে—পুরুষ ও মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পৃথক্ করা।

স্বর্গাশ্রমের ভবন ব্যবস্থাদিও গীতাভবনের অনুরূপ। সমস্ত পরিবেশটি সুন্দর, শান্ত, মনে স্থিরতাপ্রদ ও সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপক। আমরা শুনিয়াছিলাম যে গ্রীষ্মে অনুমান দুই সহস্র পর্যন্ত নরনারী গীতাভবনের অট্টালিকাগুলিতে বাস করেন। তখন সাধু সমাগমও হয় এবং ধর্মতত্ত্বের উপদেশ, চিত্তাকর্ষক আলোচনা, ভজন, কীর্তনাদিতে স্থানটি অপূর্ব আনন্দদায়ক হয়। পূর্বে আমার স্ত্রী ও আমি এখানে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। আমরা এখানকার বাতা-বরণ, ব্যবস্থা, পরিচালনাদি এবং কর্মচারীগণের ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। স্থানটি স্বাস্থ্যকর।

খেয়ার মোটর বোটগুলি গীতাভবনের অধীনে। প্রত্যহ অসংখ্য লোক এই নৌকাগুলিতে এপার ওপার যাতায়াত করে। কোন ভাড়া বা শুল্ক দিতে হয় না।

স্বর্গাশ্রম দর্শন করিয়া পুনঃ মোটর বোটে গঙ্গা পার করিয়া আমরা মোটরকারে লছমনঝোলা দর্শনার্থে চলিলাম। সেখানে ঝোলানো সেতু ও মন্দিরাদি সংক্ষেপে দেখিয়া, হৃষীকেশে প্রত্যাগমন করিয়া, বাবা কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালার দ্বিতলের একটি ঘরে আহার ও অল্প বিশ্রাম করিয়া মোটরকারে ডেরাদুনে ফিরিলাম।

লছমনঝোলার বর্তমান সেতুদর্শনে মনে অতীতের বহু স্মৃতি জাগিয়াছিল। লছমনঝোলা প্রাচীনকাল হইতে এই পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গা পার করিবার স্থান। বলা হয় ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণ এইস্থানে গঙ্গা পার করিয়াছিলেন। পূর্বে এই স্থানে গঙ্গার এপার হইতে [illegible]

হইত। ইহার দ্বারা গঙ্গা পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। বদ্রীনাথ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রতিবৎসর কয়েকটি এই সেতু দ্বারা গঙ্গা পার হইবার সময়ে পড়িয়া গঙ্গা লাভ করিত। বাবা কালী কমলীওয়ালার প্রেরণায় শেঠ সুরজমল লোহার দড়ির ভাল ঝোলান পুল নির্মাণ করান। ইহা আমি দেখিয়াছিলাম ছাপান্ন বর্ষ পূর্বে যখন পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীআদির সহিত হরিদ্বারাদি তীর্থ দর্শনার্থ আমরা আসিয়াছিলাম। রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রাবস্থায় এই সেতুর পরিদর্শন করিয়াছিলাম। তারপর এক প্রবল বন্যায় ইহার পূর্ব পূর্ব নির্মিত সেতুগুলির ন্যায় এই পুলটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গঙ্গার গর্ভে তলাইয়া যায়।

ইহার পরই ১৯২৭ সনে কুম্ভস্নানে আগত যাত্রীদের কিছু ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থাভিলাষীদের লছমণঝোলায় খেয়া দেওয়ার কর্ম আমার অধীনে ছিল, এবং এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররূপে নূতন পুলের নির্মাণ পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারও আমি তখনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পুনর্নির্মাণের স্থানটি ভাল করিয়া পরীক্ষার পর আমি নির্মাণ কার্য বন্ধ করিয়া মত দিয়াছিলাম যদি ঐস্থানে সেতু পুনর্নির্মিত হয় তবে উহা গঙ্গার বন্যায় নষ্ট হইবে যেরূপ পূর্ব পূর্ব সেতুগুলি হইয়াছিল। যেখানে বর্তমান সেতুটি আছে ঐ স্থানটিতে নির্মাণের পরামর্শ দিয়াছিলাম। এই স্থানটি পুরাতন স্থানটির অল্প উপরে। এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে স্থানীয় মহন্ত, তদনীন্তন বাবা কালী কমলীওয়ালা ও স্থানীয় লোক সকলের ঘোর আপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু নির্মাণের আংশিক ব্যয়ভার বহনকারী স্বর্গগত সুরজমলজীর সুযোগ্য পুত্র, পরিবর্তনের কারণ ও প্রয়োজন আমার নিকট বুঝিয়া, আমার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহমত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে আমি বাবা কালী কমলীওয়ালা ও অন্য সকলকে সম্মত করিয়া বর্তমান পুলের স্থানটিতেই নির্মাণকার্য করাইতে পারিয়াছিলাম।

অনুমান আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া বর্তমান সেতুটি পদচারীদের সেবায় অটল হইয়া আছে। অন্ততঃ দুইটি অতীব ভয়ঙ্কর বন্যার তাণ্ডবলীলাও ইহার কোন অংশের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই—সাধারণ বন্যাতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তাই নাই। আশা করা যাইতে পারে এখনও বহু বর্ষ ধরিয়া ইহা মানবের কার্যে লাগিবে।

মহারাজ বলিলেন, "তীর্থযাত্রার মূল উদ্দেশ্য এইরূপ :— নিম্নমার্গী সাধকগণ তীর্থক্ষেত্রে স্থূল ক্রিয়ার দ্বারা মনোজগতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে ; মধ্যমার্গী সাধকরা তীর্থস্থানে আসিয়া উচ্চতর সাধনার প্রেরণা পায় এবং উত্তম সাধক এখানে সাধনসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তীর্থমাহাত্ম্য লাভ করে। এইজন্য হিন্দুরা তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে। তীর্থস্থানে বিগ্রহ আদিতে যদি সত্তা থাকে, এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে যদি বিগ্রহগুলির সেবাপূজাদি করা হয়, শুদ্ধ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ঐ বিগ্রহগুলির দর্শন অর্চনাদির ফলে তীর্থদর্শন অধিকতর উপযোগী হইবে। সাধক গণের মহৎ উপকার হইবে।"

কাশ্মীরের পথে পথে

শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী

চিনার গাছের পাতায় পাতায়
লেগেছে লালের ছোপ,
দূরের পাহাড়ে সাদায় সাদায়
তুষারের ঘেরা ঝোপ।
হাতছানি দেয় ধূসর পাহাড়
নীলজলে তার ছায়া,
কাশ্মিরী মেয়ে রূপে কি বাহার
শান্ত স্নিগ্ধ কায়া।
পহলগামের পথেতে দেখেছি
প্রকৃতি যে কহে কথা,
হাউস বোটেতে বসিয়া ভেবেছি
কাশ্মিরী সরলতা।
পপলার শ্রেণী স্বাগত জানায়
'বরমুলা রোড' পাশে,
ভ্রমণকারীর পিপাসা মেটায়
লতাপাতা ফুল হাসে।
গুলমার্গের গোলাপ দেখেছি
তুলনা মেলেনা তার
"রুবাইয়াতের" 'রুবাই' ভেবেছি
নেশা যে লেগেছে তার।
শিকারার পথে যেতে যেতে তাই
নগিন হ্রদের পাশে,
"হজরত বালে" শ্রদ্ধা জানাই
প্রণত নম্র ভাষে।
ভ্রমণ সূচীর তালিকা ফুরালো
দেখি ফিরিবার পথে,
চিনারের গাছ লালে লাল হলো
যার শুভ্র রথে।

এস, কে, সি

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

"কুমারটুলি ইন্সটিটিউট"-এর নতুন ভবন ঃ

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখারজি গত ১৫ই এপ্রিল,বাংলা ন বর্ষের প্রথম দিন কুমারটুলি পার্কে কুমারটুলি ইন্সটিটিউট-এর নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান ঘনবসতিপূর্ণ উত্তর কলিকাতায় খেলাধুলা করার যায়গার অভাব, ভাল জিমন্যাসিয়ামের অভাব, ভাল লাইব্রেরীর সুযোগ সুবিধাও কম। প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই "কুমারটুলি ইন্সটিটিউট-এর এই নব প্রচেষ্টা। পল্লীর দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন ভবনে পাঠ্য পুস্তকের একটি লাইব্রেরি খোলারও পরিকল্পনা আছে।

কুমারটুলি পার্কের সংলগ্ন কর্পোরেশন প্রদত্ত পুরানো জমির উপরই ৬৫ হাজার টাকা ব্যায়ে সুদৃশ্য দো-মহলা ক্লাব ভবন গড়ে উঠেছে। ভবন নির্মাণে সাহায্য হিসাবে ভারত সরকার ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবল ক্লাব এবং প্রথম ডিভিসন ক্রিকেট ক্লাব হিসাবেই নতুন যুগের ক্রীড়ামোদিদের কাছে কুমারটুলি ইন্সটিটিউটের পরিচয়। কিন্তু খেলাধুলা সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের কারোরই বোধহয় অজানা নয় যে ক্রীড়াক্ষেত্রে কুমামারটুলি ইন্সটিটিউট বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব ক্লাবের সৃষ্টি তাঁদের মধ্যে কুমারটুলি ইন্সটিটিউট অন্যতম। এই ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালে।

এই পার্কেই প্রথম ফুটবল খেলে যশস্বী হয়েছেন তুলসী দত্ত, গোষ্ঠ পাল, হাবুল সরকার প্রভৃতি এবং এই পার্কেই প্রথম ক্রিকেট খেলেছেন এ যুগের পঙ্কজ রায়, নিমাই রায়, অম্বর রায় প্রভৃতি।

ভাগ্য ভাল থাকলে কুমারটুলি ইন্সটিটিউটও কলিকাতা তথা বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মত প্রতিষ্ঠা পেতে পারত। কারণ কুমারটুলি ইন্সটিটিউটই মোহনবাগানের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্লাব যাঁরা ফুটবলের বৃটিশ যুগে আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনালে খেলেছে। ১৯২০সালে সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়েই কুমারটুলি সে সম্মান লাভ করেছিল। ফাইনালে অবশ্য ব্ল্যাক্ ওয়াচ রেজিমেণ্ট এর কাছে ২—১ গোলে পরাজিত হয়। ভাগ্য একটু সহায় থাকলে দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে "শীল্ড" বিজয়ীও হয়ত হতে পারত। তাছাড়া ভারতীয় তৃতীয় দল হিসাবে তারা প্রথম ডিভিসন লীগে খেলারও যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু দুবার যোগ্যতা অর্জন করা সত্বেও যেহেতু মোহনবাগান ও এরিয়ান দুটি ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম ডিভিসনে ছিল বলে প্রথম ডিভিসন লীগে তৃতীয় ভারতীয় দলের স্থান ছিল না। তাই ভাগ্যের বিরূপতায় কুমারটুলি ইন্সটিটিউট নাম করা ক্লাবে পরিণত হতে পারেনি। আশা হয় কুমারটুলি ইন্সটিটিউটের আবার অতীত ঐতিহ্য ফিরে আসবে। ইন্সটিটিউটের এই নব-কলেবর যেন তারই আভাস।

আই-এফ-এর নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন :

গত ১লা বৈশাখ আই-এফ-এ-র নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবাংলার উপ-

মুখ্যমন্ত্রী প্রজ্যোতি বসু এদিনকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আই-এফ-এর সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় হকিদলের ইংলণ্ড ভ্রমণ বাতিল:

আগামী অক্টোবর মাসে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা হবে তাতে ভারতের যোগদান বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় ব্রিটিশ হকি এসোসিয়েশন ভারতীয় হকি দলের ইংলণ্ডে যে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার কথা ছিল তা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ ব্রিটিশ হকি এসোসিয়েশন ঐ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার খেলার যে তালিকা তৈরী করেছে তা ভারত পছন্দ করেনি। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে সাংবাদিকদের জানান যে, টাকার অভাবের জন্যেও ভারত ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান নাও করতে পারে। তা ছাড়াও তিনি ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়রা যাতে বিশেষ বিশেষ খেলার আগে বিশ্রাম করতে পারে ও আরও এক সপ্তাহ খেলার সময় বাড়িয়ে দিতে ব্রিটিশ হকি এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ হকি এসোসিয়েশন তাতে রাজি হননি। তার ওপর নিখিল ভারত স্পোর্টস্ কাউন্সিল বোম্বাইর সভায় স্থির করেন যে, শতকরা ৫০ ভাগের বেশী টাকা সাহায্য করতে পারবেন না। হকি ফেডারেশনকে ৫০ ভাগ টাকা যোগাড় করতে হবে। শ্রীঅশ্বিনীকুমার মনে করেন যে, লণ্ডন যাওয়া থেকে কেনিয়াতে যাওয়াই ভারতীয় হকি দলের পক্ষে ভাল। কারণ কেনিয়াতে মক্সিকোর মতন আবহাওয়াতেই খেলতে হবে।

মহিলা হকি দলের বিদেশ সফর:

এ বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় মহিলা হকি দলের ইউরোপ সফরে যাবার সম্ভাবনা আছে। দলটির কালোনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই প্রতিযোগিতা সুরু হবে ১০ই সেপ্টেম্বর।

ভারত সরকারের অনুমোদন পেলে দলটি আগষ্ট মাসের শেষাশেষি ইউরোপের পথে যাত্রা করবে।

"অল-ষ্টার" ফুটবল দল:

এশিয়ার "অলষ্টার" ফুটবল দলে ভারতের দুইজন খেলোয়াড় জারনেল সিং (মোহনবাগান) ও পিটার থঙ্গরাজ (ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব) মনোনীত হয়েছেন। এই "অলষ্টার" দলের ১৯ই জুন কলকাতায় খেলার কথা ছিল, কিন্তু ঐ তারিখে ফুটবল ফেডারেশন কলকাতায় খেলার ব্যবস্থায় অসুবিধা আছে বলায় এশিয়ান ফুটবল কনফিডারেশন ঐ খেলা বাতিল করে দিয়েছেন। তবে অলষ্টার দল ঐ সময় সিঙ্গাপুরে ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিসনের দুইটি দল লীসটার সিটি ও সাউদাম্পটন-এর সঙ্গে খেলবে। জারনেল সিং ও থঙ্গরাজ ১২ই মে কুয়ালালামপুরে এসে পৌছাবেন ও যে শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে যোগ দেবেন।

"অলষ্টারের" খেলার তালিকা

১৬ মে—মালয়েশিয়ার সঙ্গে কুয়ালালামপুরে
২০ মে—লিস্টার সিটির সঙ্গে কুয়ালালামপুরে
২৩ মে—সাউদাম্পটনের সঙ্গে পেনাংয়ে
২৭ মে—সিঙ্গাপুরের সঙ্গে
৩০ মে—লিষ্টার সিটির সঙ্গে সিঙ্গাপুরে
৩ জুন—সাউদাম্পটনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে

ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ:

১৯৬৭-৬৮ সালে ইংলণ্ড ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবেন। প্রতি ম্যাচই পাঁচদিন-ব্যাপী হবে। এর আগে ইংলণ্ড ১৯৫৩-৫৪ সালে ও ১৯৫৯-৬০ সালে ছয়দিন ব্যাপী টেষ্ট খেলায় যোগদান করেছিল। এইবারে প্রথমে এম-সি-সি দল বিমানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যাবে। এর আগের আগের বারে জাহাজেই যাতায়াত করেছে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আলাপ—
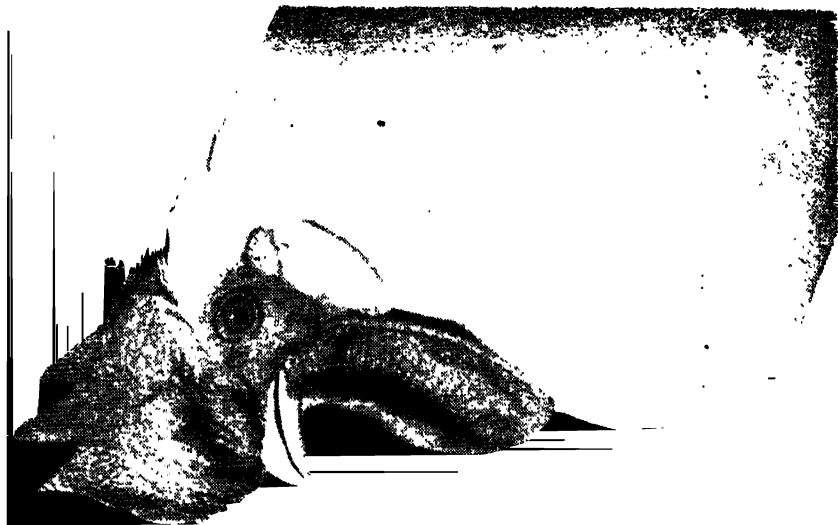
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বৈশাখ—১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মানবধর্মের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সাহা

রবীন্দ্র-মনের বিকাশ দিকে দিকে। তার এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে মানুষের ধর্ম অনুভূতিতে। মানব-জীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-মনের বিস্তৃতি কত উদার, কত মহৎ তারও বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর এই মানব-ধর্মবোধে। সেই বিস্তৃত মনের বিকাশ তাঁর সাহিত্যে, দর্শনে ও কর্মপ্রচেষ্টায়। সে ১৯৩০ সালের কথা। রবীন্দ্র-জীবনের প্রায় শেষ প্রান্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র অক্সফোর্ডে তিনি মানুষের ধর্ম বা 'রিলিজিয়ান অব্‌ ম্যান' ব্যাখ্যা করলেন। অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে প্রদত্ত এই হিবার্ট বক্তৃতামালা সূচিত করে মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা ও জীবনবোধ। অহং বাদী স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ পাশ্চাত্যবাসীকে তিনি উদার মানবতাবোধের মন্ত্র দিলেন। প্রবল উৎসাহে তা অভিনন্দিত হলো। মানব মাহাত্ম্যবোধের উদার অনুভূতিশীল এই বাণী। হিবার্ট বক্তৃতামালা শেষ হলো। কিন্তু রবীন্দ্র-মনে এই ধর্মবোধ গভীর সুরের স্পন্দন তুলেছিল। তা সুযোগ চাইছিল কবির মাতৃভাষায় পরিস্ফুট হতে। আহ্বান এলো। সুযোগ হলো। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা-বক্তৃতামালায় তিনি দেশবাসীকে শোনালেন মানব-ধর্ম সম্পর্কে তাঁর উদার অনুভূতির কাহিনী। হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কমলা-বক্তৃতামালা একে অন্যের

পরিপূরক। এই উভয় বক্তৃতায় ব্যক্ত হয়েছে মানব ধর্ম সম্বন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধ।

মানবধর্ম সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি তাও জানা প্রয়োজন। 'রিলিজিয়ান অব্ ম্যান' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত পরিস্ফুট করেছেন। তিনি জানেন, ধর্মের সাথে মিশে আছে বিশেষ মতবাদ। তা ভিন্ন ইহলোক পরলোক, আত্মা, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি বিবিধ বস্তু সংযুক্ত। তাই ধর্ম বস্তুটি যুগে যুগে সকল দেশের মানুষের কাছে একটি জটিল বিষয় হয়ে আছে। ধর্ম তো কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের নয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের তাৎপর্য বিচিত্র। ধর্মশাস্ত্রের আসল অর্থ হলো আচরণের পদ্ধতি। যে সমস্ত নিয়ম ও সদাচার মানব সমাজকে ধারণ করে তাকেই বলে ধর্ম। তা ভিন্ন ধর্মের অন্য অর্থও আছে। যে মন জলের ধর্ম শীতলতা। আবার বিশেষ ধর্মও আছে। যেমন রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম, সর্পের ধর্ম। কিন্তু নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক মানুষেরও সাধারণ ধর্ম আছে। মনীষী রবীন্দ্রনাথ 'রিলিজিয়ান অব্ ম্যান' গ্রন্থে তা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন।

ব্যক্তি-সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি মানব ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে স্বীয় মননজাত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির স্বাক্ষর রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ 'রিলিজিয়ান অব্ ম্যান্' বা মানুষের ধর্ম নামক পুস্তকদ্বয়ে। এই উভয় পুস্তকের বক্তব্য প্রায় এক এবং অভিন্ন। তাই আমাদের আলোচনার ভিত্তি করলাম 'মানুষের ধর্ম' পুস্তকখানি। মানুষের ধর্ম পুস্তকের অবতরণিকায় মানব মনের দুই পরিষ্কার অবস্থা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক অবস্থার বশবর্তী হয়ে মানুষ কেবল আপন ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধি, আপন স্বার্থবোধের দ্বারা জীবিত থাকতে চায়। মানবাত্মার এই অবস্থাকে বলতে হবে জীবভাব। কিন্তু এই মানব জীবনেই অপর এক অবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন-যাত্রার আদর্শ যাকে বলি ক্ষতি; তাই লাভ; যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশী। সেখানে জ্ঞান প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন, সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।"

জীবনের ক্ষুদ্র চাহিদাকে উত্তীর্ণ করে সকল যুগের বিশ্বমানবের আদর্শ লাভের অভিমুখিতাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলবো—বিশ্বভাব। জীবভাবকে পশ্চাতে রেখে মানুষের অন্তরে বিশ্বভাবের জয়যাত্রা। এই বিশ্বভাবের আরাধনাই মনুষ্যত্বের আরাধনা। এ সাধনা দুস্তরের সাধনা। এই সাধনারসিদ্ধিতে যে দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়, তাই মানব-ধর্ম। মানব হৃদয়ে জীবভাব ও বিশ্বভাব দুই-ই সতত বিরাজিত। সাধনার দ্বারা জীবভাবকে অতিক্রম করে জীবনে ও মনে বিশ্বভাবকে প্রতিষ্ঠা করাই মনুষ্যত্বের যথার্থ নিদর্শন। এই তপস্যাই সাধারণ মানুষকে দান করে সর্বজনীন সর্বকালীন মানবের স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন—"তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে। তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই উত্তরণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য মনে করেন না। ইহা অনুশীলনলভ্য বস্তু। আজকের আন্ত-র্জাতিকতার যুগেও এই বিশ্বমানবের অনুভূতি পূর্ণ নয়। তাই মানুষ আজও কিছুটা অমানুষ। তবুও এই অসম্পূর্ণ মানুষও বিশ্বভাবের ও বিশ্বমনের আকর্ষণ অনুক্ষণ অনুভব করছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথকে বল্‌তে শুনেছি—"আত্ম-প্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই পূর্ণ মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে।"

"সেই মানব, সেই দেবতা······যিনি এক" তাঁর ভূমি-কাকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম আলোচনায়। তার প্রকাশ ধারায় চতুষ্পদ প্রাণী যতদিন দ্বিপদ মানুষে রূপান্তরিত হয়নি, ততদিন তার প্রয়োজনবোধ ছিল দৈহিক গণ্ডীতে সীমিত। মনের স্ফুরণ হলো তখন, যখন চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ মানুষে রূপান্তরিত হলো। তার প্রয়োজনের গণ্ডীও তখন প্রসার লাভ করলো, কেবলমাত্র দেহের ক্ষুধা নিবারণ করে সে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। মানসিক সন্তুষ্টির

জন্য সে আরও ব্যগ্র হলো। পশুর মধ্যে আছে সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহের প্রবল প্রতিযোগিতা। আর মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হলো পরস্পরের সহযোগিতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"মনে মনে সে আপনার মিল পায়, এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।"

ব্যক্তিমন এই প্রকারে বিশ্বমনের সাথে মিলনার্থে ধীরে ধীরে চঞ্চল হলো। সে উপলব্ধি করলো যে, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলেই সঙ্গে সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই যোগযুক্ত মন—সর্ব্বজনীন মন। এই সর্বজনীন মনকে ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ করে অনুভব করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। এই অভিব্যক্তির বলেই মানুষ স্বীয় পরিসরের সংকীর্ণতা করেছে অতিক্রম। আর নিয়োজিত করেছে নিজেকে মহত্তর মানবতার সাধনায়। এই মহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত। আর অন্তরে আছে এক এবং অভিন্ন মানব। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, এই অভেদ মানুষের একতা অনুভূতির মধ্যেই নিহিত যথার্থ সত্য উপলব্ধি। এই সত্যই মানব সত্য। মানব সত্যের মহত্তম স্বীকৃতি হলো—সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দেশসীমাকে অতিক্রম করা। সর্বযুগের সর্বদেশের মানবাত্মার সাথে সহজ আনন্দের যোগ প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যে পরিমাণে— এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে,—মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।"

আত্মগত জীবনসাধনায় মানুষ পশুধর্মী। আর আত্মগত ভাবের মুক্তিতেই মানবধর্মের উদ্বোধন। পশুধর্মের আত্মমগ্নতার সঙ্গে মানবধর্মের উন্মুক্ত বিস্তৃতির ভেদরেখা চিহ্নিত করেছেন, মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী রবীন্দ্রনাথ। তিনি কতকগুলি সুন্দর উপমার দ্বারা তা বুঝিয়েছেন। তিনি জীবজগৎকে তুলনা করেছেন একটি চলন্ত রেলগাড়ীর কামরার দুই প্রকারের আরোহীর সাথে। এক কামরার আরোহী কোন এক পশু। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"এ গাড়ী সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা আর আহার-বিহারের সন্ধান চলেছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐ টুকুর মধ্যে বাধা-বিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মত সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানালা পর্যন্ত পৌঁছায় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণ ধারণের বাইরে।" কিন্তু একই গাড়ীর অন্য এক কামরায় মানুষ-যাত্রীর অবস্থা পৃথক্। সেখানে তিনি বক্তব্য রাখলেন—"মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানালা। জানতে পেরেছে গাড়ীর মধ্যেই সব কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকী আছে, তার আভাষ পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না।"

অন্তহীন বহির্ভাগের প্রতিই মানবাত্মার অকির্ষণ সহজাত। 'সুদূরের পিয়াসী' স্বভাব চঞ্চল মানুষকে উপলব্ধি করাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই, যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করেছে, উন্মুক্ত করেছে।"

দৈহিক দিকেও পশুর সঙ্গে মানুষের ব্যবধান বিরাট। চার পায়ের উপর নির্ভর করে চলার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ। কিন্তু কেবল দুই পায়ের উপর ভর করে চলা কঠিন। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন—"ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায়, মানুষ উদ্ধতভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবনত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়াল।" দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াবার ফলে মানুষের গতিপ্রবণতা কষ্টসাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে যা লাভ করলো তা মানুষকে দিল মনুষ্যত্বের মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন—"নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ।...দেখা ও ঘ্রাণ দিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয়

মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়; দেখলো দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।"

এই মুক্তদৃষ্টি মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়েছে অচিন্ত্যনীয়ের দিকে। আর মুক্তদৃষ্টির সাথে ক্রমান্বয়ে মানুষ পেল কল্পনাদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায় এই দৃষ্টির সাহায্যে "সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়। মানুষের ঋজু—মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাদের বলা যায় বিজ্ঞান ব্রহ্মের আনন্দ রাজ্য।" এই জ্ঞানভাণ্ডারে অবগাহন করে মানুষ পেল আনন্দ। ধীরে ধীরে অনুভব করলো এই বিরাট বস্তুবিশ্ব একটা দুজ্ঞেয় রহস্যে আবদ্ধ। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করলো সে আপন অন্তরের অন্তরে। সূচিত হলো মানব মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের নব অধ্যায়। সে অভিলাষ মানুষের আজও পূর্ণ হলো না। যতই সে এই রহস্যের বন্ধন ছিন্ন করতে প্রয়াসী হয়, ততই সে নূতন নূতন বস্তু আবিষ্কার করে। এজন্যই মানুষের পূর্ণস্বরূপ আজও অনাবিষ্কৃত। মননশীল মানুষ রবীন্দ্রনাথ বললেন—"পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও অব্যক্ত। ব্যক্ত করার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক। তার রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছান নি।"

অজ্ঞাত অচিন্ত্যনীয়ের দিকে মানুষের যাত্রাপথ। সে পথ বিঘ্নসংকুল তবুও পূর্ণের পথযাত্রী মানুষ কোন বাধা মানেনি। দুঃসহ দুঃখকে সে স্বীকার করেছে, লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে। পূর্ণের বাস্তব প্রকাশ দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। স্বেচ্ছায় এই দুঃখ ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পরিচয় দিয়েছে মহৎ প্রবৃত্তির সেই মানবধর্ম। আপন সীমিত জীবন-নাট্যের বৃহৎ ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের মন যদি মুক্তি-প্রার্থী হতো, তা হলে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।" সীমাকে মানুষ স্বীকার করে। স্বীকার তাকে না করে উপায় নেই। কিন্তু চরম বলে মানে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করতো। মানুষের মনে এই অনন্ত অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আছে বলেই তথ্য হতে সত্যের আদর তার নিকট বেশী। তথ্য মানুষের সম্বল; কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো।" পৃথিবীতে যারা অনুভব করেছেন সত্যের সম্পদ, তাঁরাই মহামানব। তাই তুচ্ছ সুখের হাতছানি তাঁদের প্রাণকে উদ্বেল করতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন ভূমার সুখ। তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন বৃহতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা। বৃহতের এই ঐশ্বর্য অনুভূতির মধ্যে বিরাজিত মানুষের ধর্ম।

মানুষের অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির প্রতি-যোগিতায় মানবধর্মের উন্মেষ। মানুষের অন্তরে যে আদিম পাশবিক শক্তি বিদ্যমান তা মানুষকে নিয়ে যায় ভোগের পথে। আবার তার হৃদয়ে যে আদর্শবাদী মহৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান, সে প্রবৃত্তি পথ নির্দেশ করে মানুষকে দুঃখ বরণের পথে, ত্যাগের পথে, কঠোর সাধনার পথে। মানুষ যতখানি সহজ ভোগপ্রবৃত্তিতে আসক্ত, ততখানি মনুষ্যধর্ম বিচ্ছিন্ন। আর যতখানি ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত, ততখানি মানব ধর্মবোধে উন্নীত। চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবধর্মের তত্ত্বও খুবই কঠিন। তার প্রতিষ্ঠা একমাত্র মানুষের ধ্যানের উপর সংস্থাপিত হয়। তা মানুষের মননের উপরেও প্রতিষ্ঠিত। এই মহৎ ধর্মলাভের জন্যে, চাই অন্তরে ধ্যান ও বাইরে কর্ম। অন্তরের ধ্যান দিয়ে মানুষ লাভ করে শ্রেয়কে। বাইরের কর্মের ধ্যান দিয়ে মানুষ পায় প্রেয়কে। এই শ্রেয় ও প্রেয়-এর দ্বন্দ্বে মানব ধর্ম বিমূঢ় হয়ে উঠে ধীরে ধীরে।

শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু লাভের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। প্রেয় বস্তু ঐহিক, শ্রেয় আত্মিক। প্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ উপলব্ধি করে সে জাগতিক ধন-মান, যশ-ঐশ্বর্য কিছু পেয়েছে। কিন্তু শ্রেয় বস্তুর স্পর্শে এলে মানুষ স্বীকার করে সে মহৎ কিছুর অধিকারী হয়েছে। সে জন্য শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব। জীবনে শ্রেয়ের সান্নিধ্যে এলে মানুষ হয় নির্মোক। সে তখন জাগতিক ধনৈশ্বর্যকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারে। মানব-ধর্মের প্রকৃত উন্মেষ এই শ্রেয়বোধের উদ্বোধনে। এই শ্রেয়বোধের শ্রেণী বিন্যাস আছে। ব্যক্তির মুক্তি

কামনার মধ্যে যে শ্রেয়বোধের বিকাশ সে শ্রেয়বোধ খণ্ডিত। আর সমষ্টির মুক্তি কামনায় যে শ্রেয়-বোধের প্রকাশ মানবধর্ম সেখানে পূর্ণ বিকশিত। সকল মানুষের এই মুক্তি সাধনার দ্বারাই মানবধর্মের পরিচয় হয় সম্পূর্ণ। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদার অনুভূতি সেই সাক্ষ্য বহন করে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার দুইরূপ। এক রূপ অহং। অপর রূপ আত্মা। অহং-এর মোহে মানুষ হয় সঙ্কুচিত। আর আত্মার বিকাশে লাভ হয় উদারতা। ব্যক্তিগত আমি লোভী। আর নৈর্ব্যক্তিক আত্মা সকলের সাথে সংযুক্ত। এই আত্মিক তপস্যার বলেই মানব মনে প্রজ্বলিত হয় আলোক। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে—বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তির দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা।" এই দুই ভাবের প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মানবের মধ্যে। তিনি বলেন—"একদিকে ব্যক্তিগত আমির টানে ধনসম্পদ ও প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে আর একদিকে অতি মানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ।" এই ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও ক্ষমার দ্বন্দ্বে মানবধর্ম আজ দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে অহং-এর প্রভাবে আত্মার সঙ্কোচন। অন্যদিকে আত্মার বলিষ্ঠতায় অহংবোধের নিধন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের অন্তরে একদিকে পরম মানব আর একদিকে স্বার্থ-সীমাবদ্ধ জীব-মানব। এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।"

কিন্তু এই সামঞ্জস্য বিধানে মানবধর্মের আত্মবিকাশ অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানবধর্মের আসল স্ফুরণ হবে আত্মার উদ্বোধনে। মননধর্মী রবীন্দ্রনাথ বলেন—"অহং সীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ আত্মার সীমায় তা রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অর্থ তার কাছে উল্টো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখ স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে।" আত্মার সান্নিধ্যে আগত এই পরিবর্তিত মানবের সর্ব আকাঙ্ক্ষা নিয়োজিত হয়েছে সর্বকালে, সর্বযুগে। তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—"মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সেই সত্য, যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথামত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।" সেই সত্য অনুভবেই মানবধর্মের প্রকৃত গৌরবময় ভূমিকা।

মানবধর্ম ও তার সত্যের মহত্তর স্বরূপ অনুধাবনের জন্য রবীন্দ্র-মন অবগাহন করেছে হিন্দুর সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের জগতে এবং মহামানবদের জীবন-সাধনার মধ্যে। আবার সহজপন্থী বাউলদের স্বতঃউৎসারিত মর্মসঙ্গীতের মধ্যেও ভাবগ্রাহী মন শ্রবণ করেছিল মানবধর্মের সত্যবাণী। উপনিষদের ঋষির মতো বাউলও দেবতাকে সন্ধান করে আত্মার মধ্যে। আর তাকে বলে মনের মানুষ। দেবতার এই অন্তর উপলব্ধির দ্বারা বাউল আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিকতাকে হীন বলে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেন—"যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি, তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।" দেবতাকে আপন প্রাণে অনুভব বাসনার মধ্যে অহংই শ্রেষ্ঠতা পায় বলে প্রথমে ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বাউলের সোঽহং তত্ত্বে অহং-এর স্থান গৌণ। স্বীয় অন্তরে বিশ্বানুভূতির ধ্যানই বাউলের অন্তর তপস্যার গৌণ বস্তু। এই তপস্যা কঠোর। ইহা দুঃসাধ্য-ব্রতী মানুষেরই উপযুক্ত। বৃহতের উপলব্ধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ ভাবে, বিশুদ্ধপ্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে এই বৃহতের অনুভূতি। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে—অনুষ্ঠানে, পূজোপচারে-শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ; কিন্তু আপনার চিন্তায় কর্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা।" মানুষের রিপু যখন প্রধান হয়ে উঠে, তখন মানুষ পরমাত্মা থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে। সে অহংবোধের মোহে অহংকৃত হয়ে উঠে। তখনই মানুষ মানবধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি সেই

আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনুভূত হচ্ছে, সে পরিমাণেই আমরা মানুষ হয়ে উঠ্‌ছি।"

প্রকাশ ধারায় মানব মন অন্তর্মুখী হয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে আপন মনের অভ্যন্তরে বিশ্বচৈতন্যকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"জ্বলে উঠলো যখন ধীশক্তি, তখন চৈতন্যের রশ্মি চললো সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে।' কেন না তাঁর ভালবাসা, তাঁর বুদ্ধি সর্বমানবের প্রতি সমান প্রসারিত। সেই প্রেমের আলোকেই স্বীয় অহং সীমা অতিক্রম করে পরমানবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তিনি। বুদ্ধদেব যাকে বলেছিলেন--ব্রহ্মবিহার। তারও অর্থ হলো—অপরিসীম প্রেমে আপন অন্তরের ব্রহ্মকে প্রকাশ করা। অন্তরালোকে এই বিশ্বচৈতন্যের অনুভবই মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে মানবধর্মবোধে। আর অপর দিকে প্রাণীজগতে মানবাত্মার মহত্ত্ব কেবল অমেয় প্রাণশক্তিতে নয়। তাকে কেন্দ্র করে মানব মহিমার অম্লান জ্যোতি প্রবাহিত। সে জ্যোতিই দান করেছে তাকে মহত্ত্বের মর্যাদা। এই মহিমাই তাকে সবল করেছে 'সোঽহম্' তত্ত্ব প্রচারে। মানবধর্মের মহৎ বিকাশ ঘটেছে সে তত্ত্বে। এই সোঽহম্ শুধু আত্মকেন্দ্রিক মুক্তিই ঘোষণা করেনি— সমষ্টিগত মানুষের সামগ্রিক বিকাশের মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে এই তত্ত্বের মধ্যে। মানবধর্ম উপলব্ধিতে যাঁদের জীবন হয়েছে সার্থক, তাঁরা কেবল আপনমুক্তি চিন্তায়ই লিপ্ত থাকেননি। তাঁদের জীবনের জয়যাত্রা বিশ্বজনীন মঙ্গলকামনায় বিচিত্র কর্মের পথে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন"ভারতের সোঽহম্ তত্ত্ব উপলব্ধি ধ্যানস্তব্ধ নয় কর্ম নির্ভর,কেন না যারা মহাত্মা, তাঁরা বিশ্বকর্মা।"

মানবধর্মের পরিণতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রমন আশান্বিত। অহং সীমায় সীমিত মানবের মাঝে কখনও কখনও যুগনায়কের উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, ক্রমবিকাশের মাধ্যমে তা লব্ধ হবে। তাই তিনি বলেছেন—"জীব-মানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে। এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানব।" আমরা ক্ষুদ্র মানুষ। গণ্ডীবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি। তাই অহংবোধ ও মানবধর্মচ্যুতিতে দ্বিধাগ্রস্ত, দুঃখিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনাদি অতীত থেকে ভবিষ্যতের মানুষের ক্লান্তিহীন অগ্রগতি দেখেছেন। মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়েছেন আশাবাদী। তাঁর এই আশাবাদ শুধু কবির ভাবাবেগের উপর স্থাপিত নয়। এই আশাবাদের প্রাণকেন্দ্র হলো সমাজতাত্ত্বিকের বস্তুদৃষ্টি ও তত্ত্বান্বেষীর ভাবদৃষ্টির মধ্যে। অবশ্যম্ভাবী দৃষ্টিতে তাঁকে বল্‌তে শুনেছি—"জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ-কণায়, তারপর জন্তুতে, তারপর মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগলো। মানুষে এসে যখন ঠেকলো, তখনই যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়, দেখলুম রহস্যময়, যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলো, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন। আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকীরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি। তার মহৎকে, তার মহামানবকে—দুঃখ আসে আসুক, মৃত্যু হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক 'সোঽহম্' মানবধর্ম অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁকে সর্বকালের মানবহিতৈষীদের সমপর্যায়ে উন্নীত ক'রেছে।
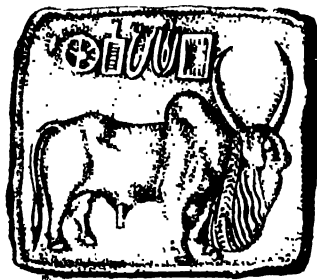
ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (২৫)

হৃদয়াপেক্ষা করি ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠকেতেই কয়
কারণ শাস্ত্রে অধিকার শুধু মানবজনেরই রয়
ব্রহ্মা জীবের হৃদয়ে থাকিয়া
অঙ্গুষ্ঠ মাঝে বসতি করিয়া
হৃদয় কমলে রাজেন ব্রহ্ম মানব বুকের মাঝে
কন শঙ্কর শাস্ত্রাধিকার শুধু মানবেরই আছে।

তদুপর্য্যপি বদরায়ণঃ সম্ভবাৎ (২৬)

মানব উপরে থাকেন যাহারা দেব ঋষি যতজন
ব্রহ্মজ্ঞানেতে অধিকার জেনো তাঁরাও প্রাপ্ত হন
মোক্ষলাভেতে আশা মানবের
দেবতারা জেনো আশা করে এর
মোক্ষ মিলিলে সকল দুখের হয় জেনো অবসান
উপনিষদেতে ব্রহ্ম ব্যাকুল লভিতে ব্রহ্ম জ্ঞান।
ছান্দোগ্য উপনিষদেতে জেন এ কাহিনী কহিয়াছে
ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন ব্রহ্মজ্ঞানেরে যাচে
ব্রহ্মসমীপে করিয়া গমন
ব্রহ্মজ্ঞানের লাভ আশামন
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যেজন সেও ব্রহ্মেরে চায়
সবাকার চাওয়া ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনা কি দিব হায়?

বিরোধঃ কর্ম্মণি ইতি চেৎ
ন অনেকপ্রতিপত্তেঃ (২৭)

অনেকে বলেন দেব বিগ্রহ কর্মে বিরোধী হয়
জেনো মনে ঠিক এই কথা কভু সত্য কখন নয়
দেবতারা ধরে রূপ অগণন
বিভিন্ন রূপে সবেতেই রন
যেখানে যে ডাকে যেই রূপ ভেবে সেথায় মূর্ত্ত হন
যেখানেই থাকে যাহা তাঁরে দাও তিনি যে তাহাই লন।
ইন্দ্রে স্মরিয়া বিভিন্ন স্থানে কত না যজ্ঞ হয়
ইন্দ্র সেথায় বিভিন্ন রূপে নিজে সেথা বিরাজয়
দেহাতীত সেই রন দেহ মাঝে
মহিমা তাঁহার বলার কি আছে
বিগ্রহ মাঝে ভক্তের তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়
বিরাট বিশাল অণু হতে অণু বলে বোঝানর নয়।

শব্দে ইতি চেৎ ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (২৮)

"শব্দে" বিরাধ হয় "ইতিচেৎ" যদি তাহা বলা যায়
উত্তর এই "ন" এই শব্দে জেনে রেখো তাহা নয়
"অতঃ প্রভবাৎ" শব্দ হইতে
দেবতাগণের সৃজন ইহাতে
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বেদ ও স্মৃতিতে কয়
ন এই শব্দে বুঝাযে দিয়াছে কখনই তাহা নয়।
যদি দেবগণ বিগ্রহ হলে অনিত্য বলা হয়
দেহ যেই ধরে সে সব জিনিষ নিত্য কখন নয়
বেদের মাঝেতে ইন্দ্র যে রয়
অনিত্য যদি তাহারে কহয়
নিত্য বেদেরে অনিত্য বলে এমন সাধ্য কার?
বেদ যদি হয় নিত্য দেবতা অলীক নহেক তার।
সৃষ্টি কালেতে ঈশ্বর বেদ ব্রহ্মা হৃদয়ে দেন
ব্রহ্মা তাহাই স্মরণ করিয়া দেবতার রূপ দেন
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত
সৃজেন ব্রহ্মা দেবগণ কত
বেদেরই মতন নিত্য জানিও দেবতার রূপ হয়
ব্রহ্ম শব্দ নিত্য যেমন বেদও সেইমত রয়।

অতএব চ নিত্যত্বম্ (২৯)

বেদও নিত্য শব্দ নিত্য নিত্য যে দেবগণ
অনিত্য এই ত্রিলোকের মাঝে সত্য নিত্যধন
ব্রহ্মা ঋষির করেন সৃজন
ঋষি মন্ত্রেতে করে দরশন
মন্ত্র ছিলই দর্শন শুধু ঋষির নয়নে হয়
বেদের নিত্য তেমনি সত্য মিথ্যা হবার নয়।

সমান নাম রূপ ত্বাচ্চাবৃত্তৌ অপি
অবিরোধঃ দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ (৩০)

সমান নাম ও রূপ থাকে বলি আবৃত্তির কালে
(মানে) মহা প্রলয়ের মাঝেও বিরোধ হয়নাত কোনকালে
প্রলয়েতে দেব নর কেহ নাই
সৃষ্টির পর আসিল সবাই
সেই নাম আর সেই রূপ লয়ে আবার সৃষ্ট হয়
প্রলয়েতে লয় হইলেও জেনো হয়না তাহার ক্ষয়।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রূপন্যাস)

তেরো

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রেমল একটু থেমে স্বরু করে:

সেদিনও উড়ে চলেছি রোজকার মতন—জর্মনদের ট্রেঞ্চের উপর বোমা ফেলতে। হঠাৎ দেখি—ডান দিকে, পাঁচ ছটা বিমান। চোখের ভুল কিনা বলতে পারি না—কিন্তু মনে সন্দেহ রইল না: এতো আমাদেরই বিমান R. A. F. খুশী হ'য়ে ডানদিকে আমার বিমানের মুখ ঘোরাতে যাব হাতের চাকা ঘুরিয়ে—এমন সময় একটা জোরালো শক্তি আমার কব্জি ধ'রে ঘুরিয়ে দিলে উল্টো—মানে বাঁ দিকে।

আকাশে বিমান চলে হু হু ক'রে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলাম নিজের এলাকায়। ঘাঁটিতে নামতেই এক পাইলট বলল: কী কাণ্ড! হঠাৎ ডানদিকে একদল নতুন বিমান এসেছে জর্মনদের। তাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ভাবছিলাম তোমার বিমান নিয়ে তুমি এখন ঘরের ছেলে ঘরে না ফিরলে কী হবে কে জানো?

(একটু থেমে, ডাক্তারবাবুকে), বুঝলেন তো অবস্থা? যদি সে-সময়ে এক প্রত্যক্ষ অথচ অদৃশ্য শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার হাতের চাকা না জোর ক'রে ঘুরিয়ে দিত তো আমি শত্রুদের বিমানবাহিনীর মধ্যে প'ড়ে নিশ্চয়ই মারা যেতাম, কি বন্দী হ'তে হ'ত তাদের এলাকায়। সেইসময়ে প্রথম আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় ভগবানের কৃপায়। (হেসে) এ-কৃপা না থাকলে আজ এ-গল্প বলার কোনো লোক আপনার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে আসত না গেরুয়া প'রে—একথা জোর ক'রেই বলা যায়, নয় কি?

অসিত: আমি তোমার এজাহার পুরো বিশ্বাস করছি প্রেমল। কেবল একটা প্রশ্ন করব তবু—যদি কিছু মনে না করো?

প্রেমল (হেসে): জানি—কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছ: এ-অঘটনের আর কোনো ব্যাখ্যা কোনোমতে দাঁড় করানো যায় কি না: যথা ধরো কোনো spasm জাতীয় কোনো শক্তি আমার কব্জিকে ঘুরিয়ে দেয় নি তো? এই না?

অসিত (আশ্চর্য): তুমি তর্কের মতন টেলিপাথিতেও পাকা না কি?

প্রেমল: ঐ দেখ, কিন্তু এই সামান্য টেলিপাথির অঘটনেরও কতরকম জটিল প্যাঁচালো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমন্তেরা। কেউ শূন্যে উঠেছে এ-এজাহার সবই বুজরুকি, আটোম্যাটিক লেখা বিলকুল ফক্কিকারি এইসব। কিন্তু এ-জাতীয় occult phenomena অবিশ্বাস করলে তত যায় আসে না—যদিও সত্যকে না মানার প্রত্যবায় আছেই আছে—যদি ভগবানের কৃপায় যে অঘটন ঘটে তাকে অবিশ্বাস না করি। শোনো, খতিয়ে মোটামুটি দুরকম অঘটন আছে: আমাদের মধ্যে নানা নেপথ্য শক্তির অবতরণে যেসব অঘটন ঘটে—যেমন কোনো medium-এর মধ্যে দিয়ে। আর এক হ'ল ভগবানের বা গুরুর কৃপার অবতরণে পথের বাধা কাটাতে বা সাধনাকে

এগিয়ে দিতে যেসব অঘটন ঘটে! এ-দুই জাতের অঘটনের বাহ্যরূপের মধ্যে অনেকসময় কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এদের ভাব ছন্দ লক্ষ্যের মধ্যে তফাৎ আসমান জমীন। আর সবচেয়ে বড় অঘটন এমনকি মানুষের কঠিন রোগ সারানোও নয়—যেমন অনেক যোগীরাই সারান সবদেশেই—সবচেয়ে বড় অঘটন হ'ল মানুষের মনের প্রাণের বদল—ওরফে প্রকৃতিকে স্বভাবকে ঢেলে সাজানো।

ডাক্তারবাবু: কিন্তু স্বভাবকে কি সত্যি ঢেলে সাজানো যায়, সাধুজি? যে স্বভাবে তামসিক সে হাজার চেষ্টা করলেও সাত্ত্বিক হয়ে উঠতে পারে কি? গীতায় কি বলেনি প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি?

প্রেমল: এই কথাই যদি ঠাকুরের শেষ কথা হ'ত তাহ'লে তিনি কি এত করে বোঝাতেন অর্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ ক'রে ধীর হ'তে, আলস্য ত্যাগ ক'রে যোগী হ'তে—যোগীভবার্জুন? অর্জুন স্বভাবে যে যোগী ছিলেন না তা কি আর বলতে হবে—পদে পদে যাঁর মনে সংশয় আসে, কৃষ্ণ বলেন এক তিনি বোঝেন আর, এক কথায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে ধনুর্বাণ ছেড়ে বলেন এ আমি পারব না পাপিষ্ঠ কৌরবদেরও রক্তপাত করতে? অবিশ্যি একথা মানি যে, স্বভাবের রূপান্তর কঠিন—শুধু কঠিন নয়, এর চেয়ে দুরূহ সাধনা, অদ্ভুত কীর্তি আর নেই। কিন্তু তবু এই অসাধ্য সাধন করতেই যুগে যুগে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের পথ নেন নি কি? ইতিহাসে কি দেখতে পাই না সাধনায় লম্পট নিষ্কাম হয়েছে সংশয়ী বিশ্বাসী হয়েছে, কৃপণ উদার হয়েছে, দাম্ভিক বিনয়ী হয়েছে? আর শুধু বরেণ্য মহাভাগদের জীবনেই এ অঘটন ঘটে নি, হাজার হাজার গড়পড়তা সাধকও ভগবানের জন্যে সব ছেড়ে সাধু মহাত্মা হ'য়ে বহু আর্তকে আলো বল আশা দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু: কিন্তু এ পেরেছেন তাঁরা কি সাধনার জোরে না ঠাকুরের কৃপায়?

প্রেমল: কিন্তু ঠাকুরের কৃপা কে কবে পেয়েছে সাধনা না ক'রে, ডাক্তারবাবু? দেখাতে পারেন কি একটিও বরণ করা এমন কি প্রাণ দেওয়ার কথা বলছি না আমি। কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আত্মজয় করার সাধনা বিনা কি কেউ কোনোদিন কৃপার পরশ পেয়েছে, কোনো দেশে? যদি পেত তাহ'লে উপনিষদে গীতায় ভাগবতে সাধনার এত গুণগান রটত কি, না তপস্যা মান পেত? অত দূরে যাবারই বা দরকার কি ডাক্তারবাবু? আমি নিজে তো জানি—আমি কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! ভগবানের কৃপার সঙ্গে লড়েছি কি কম? বার বার তাঁর নির্দেশ পেয়েছি গুরুর মুখে, তবু করেছি বিদ্রোহ। বার বার গুরুবলে প্রলোভন জয় করেছি, তবু রোখ ক'রেই বলেছি—আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব—কৃপার কাছে হাত পাততে যাব কেন, গুরুর কথা নির্বিচারে মেনে নেব কেন? বার বার চোখের জলে হার মানা সত্ত্বেও ফের আবার প্রশ্রয় দিয়েছি শয়তান অহঙ্কারকে, অন্ধ আত্মাদরকে। কিন্তু তবু ঠাকুরের কৃপা আমাকে ছেড়ে যায় নি, গুরুর প্রসাদ আমার প্রতি বিমুখ হয় নি—যার ফলে তিলে তিলে দিনে দিনে শুদ্ধিলাভ ক'রে আমি যা পেয়েছি তা আশার অতীত। এ প্রত্যক্ষ পাওয়া সম্ভব হ'ত কি যদি আমার স্বভাবকে গুরুর কৃপা ঢেলে না সাজাতেন? না অসিত, জানি গুরুর কৃপাশক্তিকে তুমি এখনো সন্দেহের চোখে দেখ, ভাবো—অনিশ্চিত জনশ্রুতি। কিন্তু যেদিন গুরু তোমার হৃদয়ে তাঁর প্রেমের আসন পেতে তোমাকে ডাকবেন তাঁর করুণার প্রসাদ পেতে তখন তুমি ধন্য হয়ে বলবেই বলবে মীরার নৈশ্চিত্যের সুরে:

সদগুরু গোবিন্দ এক শরীরী, জয় গুরু জয় গুরু গাও।
সদগুরু বিন গতি নহী জগতমে, সদগুরু নাম ধিয়াও॥

অসিত (আতপ্ত সুরে): গুরু কী বস্তু না জানলে তাঁর কৃপার খবর রাখা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে—অন্ততঃ আমার মতন অধন্য সংশয়ীর পক্ষে। কেবল একটি কথা না ব'লে থাকতে পারছি না তাই, রাগ কোরো না। আমি শ্যাম ঠাকুরের কাছেও শুনেছি গুরুর স্তব—যে কোনো গুরুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব উপাধিই দেন তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। অনেকে তাঁকে অবতার ব'লেও ক্ষান্ত হন না বৈষ্ণবদের মতন অবতারী তকমা দিতে চান। তুমি জানো, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি কী গভীর ভক্তি করি। কিন্তু তাঁর এক শ্রদ্ধেয় শিষ্য

অবতারকে গ'ড়ে তোলেন—যেমন king and king-maker আমি তোমার গুরুদেবীকে জানি না। তবে নন্দিতালে দেখে ও তোমাকে জেনে মনে হয়েছে—যিনি এমন মেয়ে তথা শিষ্যের প্রাণের প্রণামী পেয়েছেন তাঁকে সদ্‌গুরু বলা চলে। কিন্তু তুমি যদি আমার আর মুখদর্শনই না ক'রো তাহ'লেও তোমার মন রাখতে বলতে পারব না যে তিনি অবতার, অবতারী বা অবতারকে গ'ড়ে তোলেন পটুয়ার মত।

প্রেমল: শোনো—শোনো—

অসিত: না, তুমিই আগে শোনো। আমার কাছে সত্যি অসহ্য মনে হয় এই গুরু বা ইষ্ট নিয়ে বাড়াবাড়ি—গোঁড়ামি। কেউ বললেন কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই, উনি বললেন, শিব ছাড়া ঠাকুর নেই। তিনি বললেন, কালী ছাড়া তারিণী নেই—আরো উৎসাহী যাঁরা—যাঁদের নাম শুনি "পরম ভাগবত"—বলেন সদম্ভে আমার গুরুর মতন অবতারী বা অবতার-নির্মাতা নেই নেই নেই। ভাই, কিছু মনে কোরো না, তুমি এসেছ ওদেশ থেকে, তাই আমাদের মধ্যে অনেক গলদই তোমার চোখে পড়ে নি। আমাদের এক ঘরোয়া প্রবচন আছে: যার সঙ্গে ঘর করি নি সে বড় ঘরণী। এর মানে—যাকে দূর থেকে দেখা যায় তাকে মনে হয় নিখুঁৎ কিন্তু কাছে যেতে না যেতে মনে হয়—অন্ততঃ অনেক সময়েই—ও বাবা, কার সঙ্গে ঘর করতে এসেছি? কাজ নেই। আমাদের দেশে হাটে ঘাটে মাঠে অলিতে গলিতে গুরুকে নিয়ে নাচানাচি করতে করতে ভক্তদের দশা হয়। তাঁরা দেখেন প্রত্যক্ষ যে শুধু তাঁদের গুরুই এসেছেন জগদ্‌গুরু কি কলির কল্কি হ'য়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার ভক্তিশ্রদ্ধায় আমি সত্যিই মুগ্ধ হই কিন্তু আমাদের দেশের বহু গুরুর মধ্যে যে তামাসিকতা, নীচতা, মিথ্যাচার, কাপুরুষতা, holier-than-thou ঘোষণা শুনি উঠতে বসতে তাকে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি সময়ে সময়ে। ভক্তির তৃষ্ণায় অন্ততঃ আমার গলদ নেই। কিন্তু অতিভক্তির গোঁড়ামি আমার চক্ষুশূল তা সে ইষ্টকে নিয়েই হোক বা গুরুকে নিয়েই হোক। গুরুর পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে ভয় করে আমার নানাকারণেই, যেসব কারণকে হয়ত আমি একটু বেশি বড় ক'রে দেখছি আজ, পরে হয়ত কোনোদিন বুঝব যে, আমার নানা আশঙ্কাই ছিল ভিত্তিহীন। কিন্তু যে মহাপুরুষকে দেখে আমার মন সাড়া দেয় নি, মনে হয়েছে গতানুগতিক মামুলি ভড়ং—অকূলে কূল পাবার জন্যে তাঁর হাতে আমার মনের প্রাণের হাল সঁপে দিয়ে শুধু তাঁর হুকুমবড়দার হ'য়ে কৃতাঞ্জলি তালে দাঁড় বেয়ে অশ্রুময়ী রাগিণীতে গান গাইব না কিছুতেই:

"হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

প্রেমল: তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ভাই, তাই যেন আমার মুখে চাপিয়ে দিলে—যা আমি শুধু যে কোনোদিনই বলি নি তাই নয়, বলবার কথা ভাবতেও পারি নি। তোমাকে সেদিনও বলেছি—তোমার মনে থাকতে পারে—যে, গুরুকে ঠাকুরের প্রতিনিধি মেনে তাঁর শরণ চাওয়া উচিত হ'লেও তাঁকে অবতার বা জগদ্‌গুরু ব'লে হুঙ্কার করা অনুচিত। তাছাড়া অতিভক্তির নাচানাচিকে বাড়াবাড়ি নাম না দেবে কে? আর বাড়াবাড়ি মানেই তো নিন্দনীয়, বর্জনীয়। স্ত্রীকে ভালোবাসা উচিত হ'লেও যে স্ত্রৈণ হ'তে হবে, কানা ছেলেকে স্নেহ করলেও যে তাকে পদ্মলোচন নাম দিতে হবে, বাপ মাকে মান্য করলেও যে তাঁদের কথায় বিয়ে করতে হবে, কি বিয়ে করলে শ্বশুরকে সর্বস্বান্ত ক'রে পণ আদায় করতে হবে—একথা কি কেউ বলে,—না বললেও লোকে বাহবা দেয় আদর্শ স্বামী, মা বা ছেলে ব'লে? কেবল গুরুর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা ঠিক—এত সহজ নয়।

অসিত: কেন নয় শুনি? যদি দেখি তিনিও অন্ধ, বাড়িয়ে বলেন, হুকুম করতে ভালোবাসেন হাকিম হ'তে চেয়ে?

প্রেমল (হেসে): কিন্তু যে এমন মিথ্যুক, অজ্ঞান, দাম্ভিক তাকে কি কোনো সত্যজিজ্ঞাসু গড় করতে পারে?

অসিত: বাঃ! করে না কি? তুমি চলো আমার সঙ্গে বাংলাদেশে—আমি নিয়ে যাব তোমাকে অন্ততঃ এক-ডজন এমন ধনুর্ধর গুরুর আশ্রমে।

প্রেমল: বাংলাদেশে যেতে হবে না ভাই এমন গুরু অন্যত্রও আমারও চোখে পড়েছে। কিন্তু তুমি একটি কথা ভুলে যাচ্ছ: আমি স্তব গান করেছি সদ্‌গুরুর, বদ্‌গুরুর নয়। পাস্কালের উক্তিটি মনে করিয়ে দিই ফের। বুজরুকি আছে ব'লে যেমন সত্যি বিভূতি নেই এমন কথা প্রমাণ হয় না, অনাচারের ব্যভিচার হয় ব'লে যেমন সদাচারের

ব'লেই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সদ্‌গুরুও আকাশকুসুম। তুমি যে-সব গুরুদের তামসিক ব'লে তাঁদের অপছন্দ করতে চাইলে, তাঁরা বদ্‌গুরু ব'লেই তাঁদের বিঁধতে পারলে, সদ্‌গুরু হ'লে তাঁদের শক্ত সাঁজোয়ায় লেগে ঠিকরে পড়ত তোমার মর্মভেদী বাণ।

অসিত: কিন্তু যদি দেখি অনেক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সমাজস্তম্ভরাও তাঁদের নিয়ে নাচানাচি করছেন তাহ'লে কী ক'রে জানব—তাঁরা সদ্‌গুরু না বদ্‌গুরু?

প্রেমল: যদি ধ'রেও নিই যে, বদ্‌গুরু থেকে সদ্‌গুরুকে তফাৎ করা কঠিন, তাহ'লেও প্রমাণ হয় না—সদ্‌গুরু নাস্তি। কোন্ সাপের বিষ আছে আর কার নেই বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও বিষধর সাপের অস্তিত্ব নামঞ্জুর হয় না। আর কেন হয় না বলবে?

অসিত: কেন হয় না? বাঃ! বিষধর সাপে কাটলে বহু লোকই মারা গেছে ব'লে।

প্রেমল: অবিকল। ঠিক তেমনি বদ্‌গুরুকে বহু অন্ধ অজ্ঞ সদ্‌গুরু ব'লে ঠিকে ভুল করলেও এমন বহু মহাপুরুষ শিষ্য দেখা গেছে যাঁরা সদ্‌গুরুর ছোঁওয়াতেই ফুলের মতন ফুটে উঠেছেন, নির্দিশায় দিশা পেয়েছেন, নিরাশায় শক্তি পেয়েছেন। তর্কে জিৎবার জন্যে বলছি না একথা—তুমি জানোই জানো। না জানলে মানতে না—স্বামী বিবেকানন্দ বহু কিশোরের দিশারি হ'তে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিশা তথা গুরুশক্তি পেয়েই। বিশেষ ক'রে এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু মহাসাধক মহাজনকে দেখিয়ে দিয়ে জোর ক'রেই বলা যায় যে, তাঁরা বদ্‌গুরুকে সদ্‌গুরু ব'লে ভুল করেন নি, করলে কখনই কৃতকৃত্য হ'তে পারতেন না। শ্রীচৈতন্যের কত শিষ্যই এযুগেও অঙ্গীকার করেছেন বলো তো—যে তাঁদের জীবনের মোড় ফিরে গেছে সেই মহাপুরুষের ছোঁওয়ায়? শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, কাঠিয়াবাবা, সন্তদাস বাবাজি, সাঁইবাবা, পাগল হরনাথ—আরো কত মহাতান্ত্রিক মহাবৈষ্ণব সাধুসন্তেরই ছবি আজো সাধকেরা পুজো করেন, তাঁদের বাণী থেকে বল পান, প্রেরণা পান—তাঁদের ধ্যান ক'রে অশান্তি কাটিয়ে শান্তির আভাস পান, বলো তো? তোমার ভুল হচ্ছে কোথায় জানো? তুমি ধ'রে নিচ্ছ যে কোনো বদ্‌গুরুর অনেক চেলা জুটলেই বা মান্যগণ্য শিষ্যের পেয়ে জেঁকে বসতে পারেন। আমি বলব—না পারেন না। দুদিন একে ওকে তাকে ধোকা দিতে পারেন। কিন্তু মেকি বেশিদিন সাঁচ্চার মুখোষ প'রে আত্মগোপন করতে পারে না। তেলাপোকার পাখা থাকলেও সে পাখী ব'লে নিজেকে চালাতে পারে না। বিড়াল বাঘের মাসি হ'লেও বাঘের শক্তির সরিক হয় না।

অসিত: কিন্তু তুমিও ভুলে যাচ্ছ না কি যে, এইসব নামজামা বদ্‌গুরু সদ্‌গুরুর সনন্দ পেয়ে অনেককে বিপথে টানতে পারেন এবং টেনেও থাকেন?

প্রেমল: অনেক মানে কারা? যারা কৌতূহলী হুজুগে স্বভাবে ধামাধরা—তোমার ভাষায়, তামসিক, গতানুগতিক। এরা গিল্টিকে সোনা ভাবে সোনা চায় ব'লে নয়—চকচক করছে দেখলেই খুশী হ'য়ে যায় ব'লে। আমার বলবার উদ্দেশ্য—যারা সত্যি জিজ্ঞাসু তাদের কোনো দেশধ্বজ, বেশধ্বজ কেশধ্বজ বজ্রধ্বজই সনন্দের জাল জৌলুষে ভোলাতে পারেন না, বড় জোর একটু চমকে দিতে পারেন প্রথমটায়। কিন্তু খাঁটি জিজ্ঞাসু যারা তারা দুদিন ভুললেও তিনদিনের দিন মুখোষকে মুখোষ ব'লে চিনতে পারেই পারে।

অসিত: পারে কি সত্যি? আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি অনেকেই পারেন না।

প্রেমল: তারা খাঁটি জিজ্ঞাসু নন। মানে, তারা হয়ত চান একটু আধটু যোগবিভূতি দেখতে, কি মিথ্যে ভেল্কি দেখে চমকে উঠে বাহবা দিতে। যারা সত্যি পরমার্থ চান তাঁরা এসব নিরর্থক জাঁকজমককে অনর্থ ব'লে চিনে দুদিন বাদেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন মোহ কাটিয়ে। আর তাঁদের মোহ কাটে কেন জানো? কারণ সদ্‌গুরু তাঁর চাপরাশ পান ঠাকুরের কাছ থেকে। যে এ-চাপরাশ পায় নি তার বুজরুকি তুকতাক ভেল্কিবাজি দুদিনেই ফাঁশ হ'য়ে হাঁকডাক মিইয়ে আসে—মানে সত্যিকার সত্যকামদের কাছে। খৃষ্টের একথার মার নেই অসিত যে, যে সত্যি চায় সে পায়ই পায়। আর পায় এইজন্যেই যে, ভগবানের জন্যে যার প্রাণে সত্যিকার তৃষ্ণা জেগেছে তার তৃষ্ণা ঠাকুর না মিটিয়েই পারেন না। না, শুধু তৃষ্ণা মেটানোই নয়, তার ভারও ঠাকুর নেনই নেন—

অসিত (খুশী হ'য়ে): একথা আমিও মানতে রাজী আছি। কিন্তু তাহ'লে গুরুর কী দরকার শুনি? খোদ রাজাবাহাদুর যার খোরপোষের ব্যবস্থা করেছেন সে তাঁর খাজাঞ্চির দ্বারস্থ হ'বে কেন?

প্রেমল: একটু বেশী তাড়াতাড়ি খুশী হয়ে খাজাঞ্চির উপমা দিয়ে পাকে পড়লে, দাদা! কারণ রাজাবাহাদুর ওঁর টাকশালের টাকা একে ওকে তাকে দিতেই খাজাঞ্চিকে বাহাল। অর্থাৎ রাজাবাহাদুর নিজে হাতে দান-খয়রাৎ করেন না বলেই খাজাঞ্চির দ্বারস্থ না হ'লে তাঁর দান কারুর হাতে আসে না। কিন্তু উপমাটা ভুল হ'লেও তোমার প্রশ্নটা মঞ্জুর। (থেমে) আসল কথাটা কী জানো? ষোলো আনা ব্যাকুল হ'লে তবেই জীবের শিবের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হ'তে পারে। কেবল মুস্কিল এই যে, ষোলো আনা ব্যাকুলতা আসে না তাকে ভালবাসতে না পারলে। যদি গুরুর কথা মেনে তাঁকে ভালোবেসে ভগবানকে ভালোবাসার দীক্ষা চাওয়া যায় তাহ'লে ভালোবাসা একটু সহজ হয়, আর হয় এই জন্যেই যে গুরুকে—মানে সদ্‌গুরুকে—তিনি পাঠান শিষ্যের পথ সাফ করতে, বল দিতে, দেখিয়ে দিতে—কোন্‌টা পথ, কোনটা বিপথ—আর পথের বাধা দূর করার উপায় কি। কিন্তু এ শুধু যুক্তির কথা নয়। কারণ গুরু দিশারি পদবী পান কোনো সুখ সুবিধার যুক্তিতে নয়—পান এই জন্যেই যে, তিনি ইষ্টের কৃপা পেয়ে তবে সে কৃপার প্রসাদ বিতরণ করবার অধিকারী হয়েছেন। (থেমে ঈষৎ হেসে) ভাই, তাঁর হুকুম তামিল ক'রে মানুষ অধন্য হুকুমবরদার বলে না—সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে নিজেও বরেণ্য গুরু ওরফে উদার হাকিম হ'য়ে উঠতে পারে। একে বলা হয় গুহ্যতত্ত্ব—mystic truth কিন্তু এ সত্যের নাগাল পেতে হ'লে যুক্তি বিশেষ কাজে আসে না। তার জন্যে চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা, দীনতা ও আন্তরিকতা। নৈলে বড় জোর শাস্ত্রী হওয়া যেতে পারে কিন্তু সাধনার তীর্থপথে চলে পরা-ভক্তি লাভ ক'রে ঠাকুরের লীলাসাথী হওয়া যায় না।

তারা: আমি এসব গুহ্যতত্ত্বের কিছুই জানি না দাদা, কেবল জানি যে, আপনি যে আমাদের এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন তাতে ধন্য হয়েছি। (চোখের জল মুছে) আমাকে আশীর্বাদ করুন দাদা যেন আমার ভক্তি হয় গুরুর পায়ে।

প্রেমল (অসিতকে): দেখলে তো ভাই বিশ্বাস এলে কত সহজে অজানা অচেনা বিদেশীকে শুধু যে আপন ক'রে নেওয়া যায় তাই নয়, তাকে প্রণাম ক'রে তার কাছে চাইতে পারা যায় গুরুভক্তি সরল দীনতায়, চোখের জলে। (তারাকে) কাছে এসো দিদি, তোমাকে আশীর্বাদ করার আমি অধিকারী নই, সে তোমার গুরু করবেন। তবে প্রার্থনা করতে পারি যেন আমার গুরুর মধ্যে আমি যা দেখেছি তুমিও তোমার গুরুর মধ্যে তাই দেখতে পাও। কারণ এই দেখাই হ'ল সবচেয়ে বড় দেখা। আর এ আমার গাজোয়ারি গুরুবাদী হাঁকডাক নয় দিদি, উপনিষদের কথা—যাকে কাটা যায় না:

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

দিদি, লোকে কথায় কথায় ভগবানকে দোষ দেয়—তিনি কেন আমাদের বুঝিয়ে বলেন না। অসিত প্রায়ই অনুযোগ করে—কেন শুধু গুরুরূপী পূজারীর ছাড়া আর কারুর হাতেই ভগবান সরাসর দেন না তাঁর আনন্দমন্দিরের চাবি? কিন্তু সত্যি যদি এ-প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও জিজ্ঞাসু হ'য়ে, তাহ'লে দেখতে পাবে—শাস্ত্রের পাতায় পাতায় এই কথাটা নানাভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন মুনি-ঋষিরা: যে ভগবান আর তাঁর প্রতিভূ গুরু যে বরণ করে সহজ ভক্তিতে সেই ধন্য জিজ্ঞাসুর মনের আয়নায়ই শাস্ত্রের নানা গভীর বাণী গুহ্য তত্ত্ব আপনা থেকে ঝলকে ওঠে। এই হ'ল শ্লোকটির মর্মবাণী। বড় প্রাণকাড়া ডাক দিদি।

ডাক্তারবাবু: একথা মানতে তো বাধে না সাধুজি, গোল বাধে আসলে ভক্তি আসে না ব'লেই। তাই গুরুবরণও সত্য হয় না—শাস্ত্রপাঠও শুধু পুঁথির বুলিই থেকে যায়—প্রাণকাড়া ডাকের সুরে ডেকে ওঠে না।

প্রেমল: একথা সত্যি, ডাক্তারবাবু। আর সেই জন্যেই গীতায় বলেছে জানতে হ'লে সব আগে তত্ত্বদর্শীদের কাছে নত হ'য়ে চাইতে হয় জ্ঞান বা পরাভক্তি কিন্তু শুধু চাইলেই হয় না, তাঁদের একটু সেবা করতে হয়, কারণ সেবা করতে করতেই ভালোবাসা আসে গুরুভক্তি আসে। আর গুরুভক্তি না এলে গুরুশক্তি কিছুতেই শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে পারে না। (অসিতকে) আর

ভগবান্ বর দিতে এলেও মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে দেয় যদি তিনি বলেন বর পেতে হ'লে সব আগে অহঙ্কারকে দাবিয়ে চোখের জলে চাইতে হয় তাঁর কৃপা। তুমিই তো কাল গাইছিলে মনে নেই :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

কেবল মুস্কিল কি জানো? চোখের জলে তাঁকে না ডাকলে তাঁর চরণধূলার তলে মাথা নিচু কারুর হয় নাই হয় না। নাস্তিক বা গুরুবিমুখীদের বিদ্রোহের মূলে আছে এই অহঙ্কার যে, আমি আগে জানব তবে মানব। কিন্তু সাংসারিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্থীর মুখে একথা শোভা পেলেও অধ্যাত্মজ্ঞানার্থীর মুখে একথা সাজে না। তার কাছে সূত্রটি উল্টে যায় : অর্থাৎ আগে মানলে তবেই জানা যায়—গুরুতত্ত্ব-ভগবৎ-তত্ত্ব। কেন ঠাকুর এ-ব্যবস্থা করেছেন সে নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ক'রে লাভ নেই, যাঁরা চিনেছেন জেনেছেন দেখেছেন তাঁদের কাছেই চাইতে হবে—কী কী চিহ্ন দেখে চিনব, কেমন ক'রে জানব, দিব্যদৃষ্টি পাবার উপায় কি যার বরে দেখা যায় যে, গুরু ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়ে আসেন ব'লেই তাঁর কথায় যুগের বন্ধন কাটে, চোখের ঠুলি খ'সে প'ড়ে, আমাদের মধ্যেকার সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। উপনিষদে তাই বলেছে যে সব আগে মানতে হবে আমি জানি না তবেই জানা যায়—যে বলে—আমি জানি, সে জানতে পারে না জ্ঞান অজ্ঞানের তফাৎ। আর একথা আমি জেনেছি ভুক্তভোগী হ'য়েই—শিখেছি ঠেকেই—একবার নয় বার বার।

অসিত (খুশী): এই তো তোমার আজ মুখে খই ফুটেছে ভালো ভালো কথার! আমরা শুনতেও চাই তো এইসব কথাই। বলো না কেন? জেনে শুনে মুখে চাবি দিয়ে মৌনীবাবা হ'য়ে ব'সে থাকো কেন ছাই?

প্রেমল (হেসে কপাল চাপড়ে): কপালং কপালং কপালং মূলম্—রে ভাই। সেধে গুরুবরণ করার পরেও তাঁর বারণ না মেনে করি কি? তিনি যে পই পই ক'রে মানা করেন এসব ভালো ভালো কথা যার তার কাছে ফাঁশ না করতে, করলে যে উল্টো উৎপত্তি হয় দেখতে পাওনা? তারা যে হাসাহাসি করে—মিথ্যুক বলে সত্যদর্শীদের! বলবে বস্তু জানে? পেটুককে যদি বলো গান শুনে পোলাও কালিয়া খাওয়ার চেয়ে ঢের বেশি ও স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যায়, সে কি তোমাকে পাগল ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে না?

তারা : কিন্তু আপনারা যদি না বলেন কিছুই, আমরা জানতে পারব কেমন ক'রে?

প্রেমল : দিদি, জানা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে খবর পাওয়া। কিন্তু ভগবৎ তত্ত্ব তো তথ্য নয় যে তার রিপোর্ট পড়লেই খবর পাওয়া যাবে।

চেতনার একটা বিশেষ স্তরে উঠলে তবেই সে-স্তরের সত্য আলো হয়ে মনের সব কালোকে ঘুচিয়ে দেয়। এই দেখ না, আমি যদি তোমাকে বলি গুরুকে সেবা করলে সে-সেবা ইষ্ট গ্রহণ করেন, তুমি কি সত্যি কিছু বুঝবে, না তোমার সংশয়গ্রন্থি একটুও আলগা হবে? যে গুরুকে কখনো ভালোবাসে নি তাকে কি বোঝানো যায়—ভালোবাসলে কেন তাঁকে সব দিয়ে ফকির হয়েও মানুষ আমীর বনতে পারে? শোনো দিদি, আমার একটা ঠেকে-শেখা অভিজ্ঞতা।

তোমাদের বলেছি আমার পাইলট হ'য়ে অঘটনের অভিজ্ঞতা। সেই থেকে আমার মনে কে যেন বলত যে, আমরা মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যা যা দেখছি তার ওপারের খবর কিছু না পেলে অন্ধকারে ঘুরে মরাই সার হবে—আর এই জিজ্ঞাসা জাগাতেই অঘটনটি ঘটিয়েছে তাঁর করুণা।

তারপর আমি কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়া শুরু করলাম নানা দর্শন। দর্শনে ডিগ্রিও নিলাম। কিন্তু বহুপাঠের পরে বুদ্ধির বিকাশে কিছু লাভ হ'লেও অহঙ্কার আমাকে মোক্ষম পেয়ে বলল যে, বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু জানা যায়। কিন্তু হায়রে, বহু ভেবেচিন্তেও কোনো কূলকিনারা পেলাম না—কেন আমার কজি ঘুরে গিয়েছিল যার ফলে আমি বেঁচে গেলাম। একটা জায়গায় আমার বাঁচোয়া ছিল—বুদ্ধিবাদীদের চলতি বুলিবাজি যে ফাঁকা, এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধি আমার হয়েছিল।

এইসময়ে উপনিষদ হাতে এল। সবকথা বলা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন হঠাৎ তুফানে তারা ফুটে উঠল। হ'ল কি, তৃষ্ণা আমার জেগেছিল ব'লেই উপনিষদের বাণীও আমার কাছে এল যেন

আমাদের দেশের দর্শনের সঙ্গে এ-বৈদিক দর্শনের কিছু মিল থাকলেও, বেদের শুধু যে বাণীটি আলাদা তাই নয় লক্ষ্য ছন্দ ঝঙ্কার রেশ সবই আলাদা। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ প'ড়ে এ-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'ল। মনে হ'ল পরম জ্ঞানের পথের পাথেয় মিলতে পারে কেবল বেদান্তের কাছে।

কিন্তু তবু বেদান্তের দিশায় আলো পেলেও রাত পোহালো কই? তুষার, দুঃখ কাটলেও তাপ জুড়োলো না তো? এ কী ব্যাপার? এইসময়ে আমি কয়েকটি স্বপ্ন দেখি পর পর। সে-সব স্বপ্নের মধ্যে আবছা আলো কিছু থাকলেও একটি ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট: যে, আমাকে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির অহমিকা—শিখতে হবে নত হ'তে।

পণ নিলাম বুদ্ধির ঝাঁঝকে আমল দেব না আর। কিন্তু নত হব কার কাছে? ভগবান্? তিনি কী বস্তু না জানলে তাঁর কাছে নত হবই বা কেমন ক'রে? প্রণাম? ও তো কথার কথা। স্বপ্নে আবার আভাস এল হেঁয়ালিরই ছন্দে: সুরু করলাম প্রার্থনা—বেদান্তের: অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়......কিন্তু ফলে একটু আধটু আশ্বাস এলেও শান্তি এল না। এমনসময়ে গীতায় পড়লাম: জানতে হ'লে যেতে হবে "তত্ত্বদর্শী" জ্ঞানীর কাছে—কেন না তারাই ভগবানের প্রতিভূ ব'লে তাদের মধ্যে দিয়েই ঠাকুর কথা কন, পথ দেখান, সন্দেহ ভঞ্জন করেন। কিন্তু গীতা বলল তত্ত্বদর্শীদের কাছে শুধু জিজ্ঞাসু হ'য়ে গেলেই হবে না, চাই সবপ্রথম তাঁদের গড় হ'য়ে প্রণাম করতে শেখা, আর সবশেষে তাঁদের সেবা করতে চাওয়া। মনে হ'ল এইই তো পথ। কিন্তু সাধুর সেবা ক'রে এ-পথে চলা মানেই তো গুরুবাদ মেনে নেওয়া—ভাবতেই বুদ্ধি ফের শিরপা তুলল। এ হতেই পারে না—প্রণাম করতে পারি, জিজ্ঞাসা করতেও নারাজ নই—যদি বেশি বুঝি—কিন্তু তাঁদের সেবা করতে যাব কী দুঃখে? যাঁকে জানি না চিনি না ভালোবাসি নি তাঁর সেবা করতে সাধ হবেই বা কেন? কিন্তু এ-অনিচ্ছাকে বাতিল ক'রে দিল দুটি প্রবল ইচ্ছা বা আগ্রহ: এক—ভারতবর্ষে গিয়ে on the spot তদন্ত করতে হবে গীতা উপনিষদের মর্ম; সেখানে এমন কোনো গুরু মেলে কি না যাঁকে ভালোবেসে সেবা করা সম্ভব। এক-কথায়, দোমনা আর কি: গুরু চাই না, কিন্তু গুরু কী বস্তু একটু খোঁজ নিলে ক্ষতি কি? এ-ও তো হ'তে পারে যে, আমার গুরুবিমুখতার মূলে গাঢাকা হ'য়ে আছে আমার বুদ্ধির অভিমান যে চায় না তার পারের খেয়ার হাল আর কারুর হাতে সঁপে দিতে? ফের বেঁচে গেলাম মনটা একটু খোলা ছিল ব'লে—যার নাম sincerity.

তা তো হ'ল। কিন্তু শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসে কেমন ক'রে? গীতায় বলেছে—শ্রদ্ধা বাতি না ধরলে জ্ঞানের দিশা মেলে না। সংশয়াত্মাকে কোনো বুদ্ধির দাওয়াই দিয়েই বাঁচানো যাবে না।

এলাম লক্ষ্ণৌয়ে প্রফেসর হ'য়ে। বুদ্ধি ছিল, পড়াশুনা ছিল, যাকে বলে gift of the god—কিনা বোলচালের কসরৎ—তাও কিছু ছিল। কাজেই নামডাক হ'ল বৈ কি। ছাত্রেরাও খুশী, প্রফেসররাও সদয়। তাঁদের মধ্যে বন্ধুও মিলল—যদিও বহিরঙ্গ বন্ধু, অন্তরঙ্গের দেখা পাইনি।

কী করা? তর্কাতর্কি। বুদ্ধির লকড়ি খেলা। এতে কিছুকিঞ্চিৎ আনন্দ পেতাম বৈকি। কিন্তু যে-আনন্দের উল্টোপিঠে জমতে থাকল অভিমান—আমি বুঝি, জানি, চিনি, দেখতে শিখেছি, ভাবতে পারি, কিসে কী হয় বুঝতে পারি—পাকা জহুরী না হ'লেও উঁচুদরের সমাজদার, বটেই তো!

এমন সময়ে দেখা পেলাম গুরুমার—মানে শান্তিদেবীর। যেমনি দেখা অমনি আমার বুকের তারটি বেজে উঠল: এই এই এই—এইই তো খুঁজছিলাম! এমনি সময়ে (অসিতকে) রেডিওতে তোমার একটি গান শুনে তোমাকে প্রথম ভালবাসি। সত্যি, মনে হয়েছিল—যেন তুমি ঠিক সময়ে ঠিক গানটি গেয়েছিলে আমার জন্যেই। গানটির কেবল প্রথম লাইনটি মনে আছে:

"এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি"

মাকে বললাম একথা। মাও বললেন—কিন্তু না সেকথা বলা চলে না। (তারাকে) দিদি, এমন কথা আছে যাদের বলতে গেলেই মনে হয় হাল্কা ক'রে ফেললাম। সাধে কি শাস্ত্রে মন্ত্রগুপ্তির কথা বলেছে এতবার? অদিতিকে নারায়ণ বলেছিলেন: দেবতার বাণী গোপন রাখলে তবেই ফলে—সর্বং সম্পৎস্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্। উপায় কী, বলো? গুরুর মহিমা যে উপলব্ধি করল সে সে-মহিমার কথা কেমন

ক'রে বলবে তাদের কাছে যারা সে-উপলব্ধিকে অন্তরে পায় নি পাবার মতন ক'রে? (হঠাৎ) মনে পড়ল ঠিক এই সময়েই পড়েছিলাম কবীরের একটি দোঁহা—মনে হয়েছিল আমার গুরুকে দেখে আমার যা মনে হয়েছে তার precedent আছে—কেন না কবীরেরও হয়েছিল।

তারা: কী দোঁহা দাদা? তাও কি বলা মানা?

প্রেমল: না, বলতে পারি—কেবল (ঠেশ দিয়ে) এখানে একজন আছে সে যদি ফের রুখে ওঠে তাই ভয় করে।

অসিত (হেসে): আমি কি এমনিই দুরাচার ভাই?

প্রেমল: (জিভ কেটে): ছিঃ ছিঃ! অমন কথা বলে? এইমাত্র বলি নি কি—তোমার গান শুনেই তোমাকে প্রথম ভালোবেসেছিলাম? তবে কি জানো। প্রেমে যে পড়ে নি তার কাছে প্রেমিকের উচ্ছ্বাস যেমন সেন্টিমেন্টাল মনে হয়, গুরুকে পেয়ে যে পারের পারানি পেয়েছে—তার উচ্ছ্বাসকে একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়ই তাদের কাছে, যাদের অন্তরে গুরু স্বপ্রকাশ হন নি।

ললিতা: হোক গে। তোমাকে বলতেই হবে কবীরের দোঁহা—আমার মন আনচান করছে জানতে। কই আমাকে তো বলো নি?

প্রেমল: বলি নি পাছে ভাবো তোমাকে শাসাচ্ছি নিজের জন পেয়ে। যাহোক তবু এ-রিস্ক এখন নিতেই হবে যখন ব'লে ফেলেছি। কবীর বলেছিলেন:

সব ধরতী কাগদ করূঁ, লেখনী সব বনরায়,
সাত সমুন্দরী মসী করূঁ গুরু গুণ কহা ন জায়।*

কিন্তু সে অপরূপ অনুভবের কথা কী বলব—যার আলোয় যুগের আঁধার কাটে? (অসিতকে) তুমি মাঝে মাঝেই সাধু-সন্তদের দোষ দাও যে তারা সংসারের সঙ্গে নন-কোঅপরেশন করতেই কোমর বেঁধে নিজেকে তফাতে রাখেন যতটা পারেন—শুধু কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেই নয়, চলন-বলন ধরণ-ধারণ সব বদলে—এমন কি পূর্বাশ্রমের নাম পর্যন্ত মুখে আনতে চান না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবে যে এ তাঁরা না ক'রেই পারেন না অনেকগুলি কারণে। প্রধান কারণ এই যে, গুরু বা ভগবানের কৃপা পেলে কৃপাধন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়ই যায়, আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে জীবনের ধারাও বদলাতে বাধ্য। একটা মাত্র উদাহরণ দিই। যে-গুরুর কাছে দাসখৎ লিখে দিতে তোমার এত ভয় করে পাছে তিনি তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নেন যা তুমি সত্য ব'লে মানো না, সেই গুরুকে যে-শিষ্য শুধু যে সত্যস্বরূপ ব'লে চিনেছে তাই নয়, জেনেছে প্রিয় হ'তে প্রিয় সবচেয়ে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু দিশারি সারথি পারের পারী ব'লে—সে কেমন ক'রে আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র ছেলে-মেয়ে বাপ-মাকে ঠিক আগেকার চোখে দেখবে, বলবে তারা গুরুবরণের আগেও যেমন আপন ছিল গুরুবরণের পরেও ঠিক তেমনিই আছে? যে-গুরুভক্তি যে দেখেছে কবীরের মতনই যে, "সদ্‌গুরু বিন কো হৈ সগা? সাধু সব কো দাত?" অর্থাৎ "গুরুর মতন কোথায় স্বজন, কে দাতা সাধুর মত?"

ললিতা: একথা সত্যি দাদু! আপনাকে আমি বলতে ভরসা পাই নি কাল—পাছে বাপী রাগ করে এই ভয়ে। কিন্তু যে মাকে আমি এত ভালোবাসতাম যে—মানে, খুবই ভালোবাসতাম বাপীকে গুরুবরণ করার পরে আর তেমন আপন মনে হ'ত না, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। অথচ আমার মন যে এতটা বদলে যেতে পারে বাপীর দীক্ষা পেতে না পেতে আমাকে যদি সেও বলত দীক্ষা দেবার সময় তো আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। (ব'লে প্রেমলের দিকে সভয়ে তাকায় চকিতে)।

প্রেমল (হেসে): ভয় নেই, আমি বকব না। কারণ আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। ললিতা জানে প্রথম প্রথম এদেশে আসার পরে আমার বাবা মার জন্যে কী ভীষণ মন কেমন করত। টাকা জমাতাম মাইনে থেকে প্রতি দুবছর অন্তর বিলেত ঘুরে আসতে। কিন্তু মা-র কাছে দীক্ষা নেবার পরে শুধু যে বাবা মার কাছে যেতে ইচ্ছে হ'ত না তাই নয়, ভাবতাম কী কথা বলব তাঁদের সঙ্গে? (অসিতকে) আমাকে ভুল বুঝো না ভাই, লক্ষ্মীটি, যদি বলি যে, অন্তরে নানা অদ্ভুত অনুভূতির মহলের দোর যখন খুলে যায় তখন এমন একটা আশ্চর্য আলোর বান ডেকে যায় যে, তার স্রোতে বাইরের জগতের নানা বদ্ধমূল ধারণা ও মতি-গতি ভেসে যায়। শুধু তাই নয়, সে আলোর পাশে যাকে

---

* ধরিত্রী যদি হয় পত্রিকা, লেখনী বেণুর বন,

হয় ছায়াময়। কিন্তু যাঁরা এ-জগতের আদৌ খবর রাখেন না তাঁরা প্রায়ই মিস্‌টিক বলতে বোঝেন "মিসৃটি"—ধোঁয়াটে। (হেসে) যেন সেই লজ্জায়ই যোগীরা বলতে চান না—তাঁরা কী দেখেছেন শুনেছেন জেনেছেন চেখেছেন। তবু বলবই বলব আজ একটা ঘটনা—যা থাকে কপালে।

সবাই একটু অবাক হ'য়ে তাকায়।

প্রেমল (ব'লে চলে): আমরা আল্‌মোরার আশ্রমে যাই বছর সাতেক আগে—ললিতা আমার কাছে দীক্ষা নেবার ঠিক ছমাস পরে। প্রথম প্রথম আমার নানারকম উপলব্ধি অনুভূতি হ'ত। কিন্তু ক্রমশ সব যেন থিতিয়ে গেল—বা থেমে গেল বলাই ভালো। মনের মধ্যে একটা চলনসৈ শান্তি মতন ছিল, কিন্তু নানা দর্শনের যে-চমক সে আর ভুলেও উঁকি মারত না। মনে ভারি ক্ষোভ এল। ভাবলাম—হয়ত গুরুর উপরে বেশি নির্ভর করেই ঝিমিয়ে পড়ছি। মা-কে একদিন বললাম। তিনি বললেন: "ব্যস্ত হোয়ো না দুলাল—মনে রেখো উপনিষদের কথা, পড়েছ তো? —'ন ত্বরমানেন লভ্যঃ' হাঁকপাঁক করলেই কিছু বস্তু লাভ হয় না।" ঠিক এইসময়েই হঠাৎ অসিতের আর একটা গান রেডিওতে শুনলাম:

ধরিব ধরিব যে বলে সেই তো পায় না।
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।

মাও শুনছিলেন, বললেন: "ঐ দেখ, অসিত বাবাকেও ঠিক এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সেও তো জিজ্ঞাসু।"

আমি বললাম: "কিন্তু তার একটা লেখায় পড়েছি—গুরুবাদে তার বিশ্বাস নেই তাই হয়ত সে এত হা হুতাশ করে।"

মা বললেন হেসে: "দুলাল, এপথে এলে হা হুতাশ করতে হবে সবাইকেই, গুরু থাক বা না থাক। তবে গুরু থাকলে এই একটা সুবিধে যে, হা হুতাশ করলেও হুতাশ্বাস হ'তে হয় না। কিন্তু তিনি যতবড়ই সাধক হোন না আর যত বড় গুরুই পেয়ে থাকুন না কেন—সাধনার পথে বহু মরু পার না হ'লে সুধার ঝর্ণার দেখা মিলতেই পারে না। কবীর যে-কবীর, অতবড় মহাপুরুষ, তাঁকেও কান্নাকাটি করতে হয়েছিল কি কম বাবা? সাধনার একটা অবস্থায় তাঁকে.

হঁস হঁস কান্তা ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়
হাঁসী খেলে পিউ মিলে, তো কৌন দুহাগিনি হোয়!*

আমার মনে রোখ চাপল। না কাঁদলে দেখা দেবেন না তিনি? কিন্তু কান্না তো কাপুরুষের স্বধর্ম, আমি নিজেকে মনে করতাম শুধু বুদ্ধিমান্ নয়, বলীয়ান্। পণ নিলাম—বিপর্যয় ধ্যান ক'রে ঠাকুরকে নামিয়ে আনবই আনব। শাস্ত্রে বলে নি কি "তপসা বিন্দতে মহৎ?"—তপস্যায় সবকিছুই পাওয়া যায়।

ভেবে গুরুর মত না নিয়ে সব কাজবর্ম ছেড়ে ধ্যানে বসলাম। কিন্তু বৃথা! যত ডাকি তত তিনি দূরে স'রে যান। অবশেষে অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠলাম মা কে গিয়ে কেঁদে বললাম: "মাপ করো মা—যা পেয়েছি সব বুঝি খুইয়ে বসেছি অহঙ্কারের ফেরে প'ড়ে।"

মা হেসে বললেন: "গুরুর কাছে যে দরবার করে অহঙ্কার তার ঘোচেই ঘোচে।"

আমি বললাম: "না মা, অথই জলে অহঙ্কারের জাহাজ চালাতে গিয়ে ঝড়ের ঘায়ে জাহাজ ভেঙে ডুবুডুবু হয়েছে ব'লেই এসেছি তোমার চরণতরীর life boat-এ ঠাঁই পেতে

মা খানিকক্ষণ ধ্যান ক'রে বললেন: "যাও বৃন্দাবনে, থাকো দু'চারদিন যমুনার তীরে। কিন্তু কারুর বাড়ীতে নয়। ঠাকুরের উপর নির্ভর ক'রে যাও সেখানে—গাছতলা গাছতলাই সই ব'লে।"

আমি বললাম: "জো হুকুম।"

ললিতা শুনে প্রথম কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিল: "গাছ-তলায় থাকবে কি বাপী?"

আমি বললাম: "তাতে কী হয়েছে? আমি কি আলমোরায় দুবৎসর মাধুকরী ক'রে সেই ভিক্ষান্নেও নাদুস নুদুস হ'য়ে উঠি নি? গুরুকৃপায় কী না হয়?"

ললিতা পিঠ পিঠ বলল: "তবু ভালো যে কারে প'ড়ে গুরুর কথা মনে হয়েছে। কিন্তু শোনো, তুমি যদি যাও আমিও যাব।"

আমি বললাম: "সে কি হয়? গাছতলায় আমি থাকতে পারি, কিন্তু—"

---

*মেলে না কান্তে হাসির মেলায়, কান্নায় মেলে তারে শুধু

ও বলল : "ঈ—শ্। তুমি যদি পারো আমি পারব না? পারব পারব পারবই।" ব'লে সে কী কান্নাকাটি! কী করি? মা-কে বললাম ওকে বোঝাতে। মা বললেন হেসে: "আমি অনধিকার-চর্চা করি না বাবা। ও তোমার চেলী, আমার নয়। আমি কেন কোনো কথা বলতে যাব? ওর দায়িত্ব যখন নিয়েছ তখন ওকে বোঝাবার ভারও তোমারই—আমার নয়।"

অগত্যা ওকে নিয়ে আসতে হ'ল। এসে এক গাছতলায় আসন বিছিয়ে বসেছি যমুনার ধারে। এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি। মা-কে ডাকলাম ব্যাকুল হ'য়ে—বিশেষ ক'রে ললিতার জন্যে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখি একটু দূরেই একটা টিনের ঘর। উঠে দেখি—একটা গোয়াল ঘর। কিন্তু কী আশ্চর্য—দুটো দড়ির খাটিয়া আছে! দোর নেই, কিন্তু ছাদ আছে!

ললিতা ঘরের কোণে কাঠের উনুন বানিয়ে রান্না সুরু ক'রে দিল।

একটু বাদেই বৃষ্টি থেমে গেল। আবার ফের উঠে গিয়ে বসলাম গাছতলায়—গোয়ালঘরের চেয়ে গাছতলাও ভালো তো। (তারাকে) তারপর সে কী বলব দিদি? হঠাৎ মেরুদণ্ডের নিচে থেকে বিদ্যুৎ-এর স্রোত উঠতে লাগল ধ্যানে বসতে না বসতে। কী আনন্দ! চারদিক থেকে আনন্দ ঝরছে। আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ, গাছপালা, ঘাস, ফুল, বৃন্দাবনের রজঃ সব যেন চিন্ময় হ'য়ে উঠল আর আমার দেহচেতনা একেবারে উবে গেল।

তারা : সে কি দাদা?

প্রেমল : সে অনুভূতি বোঝাব কেমন ক'রে দিদি? সে যার হয়েছে কেবল সেই জানে। কেবল এইটুকু বলতে পারি—হয়ত একটু আভাষ পেলেও পেতে পারো—যে, দেহের যে একটা স্থূল ভার আছে তার লেশও রইল না। মনে হ'ল—আমি তো দেহ নই, আমি শুধু এক আনন্দঘন সত্তা—ভিতরে বাইরে যেন এক হয়ে গেছে। (অসিতকে) তুমি মুখ ভার করো যে সাধুরা তাঁদের চমৎকার চমৎকার অনুভবের কথা বলতে চান না ব'লেই সাধারণ মানুষ তাদের তুচ্ছতাকে আঁকড়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলে সারাজীবন—কোথাও জানতেও পারে না যে, এ-দৈনন্দিন জীবনের বাইরের তুচ্ছতা ঢেকে রেখেছে অরূপের আনন্দতত্ত্ব। কিন্তু যাদের চেতনা বাহ্যকেই একান্ত ক'রে দেখে, ইন্দ্রিয় জগৎকেই মনে করে বাস্তব—real—ধ্যানে পাওয়া দর্শন ও শ্রুতির জগৎকে মনে করে অবাস্তব—বা কল্পনা—তাদের ধারা আমি জেনেই বললাম যে আমি যমুনার তীরে সাত দিন ধ'রে আমার দেহ চেতনার স্থূল ভার থেকে মুক্তি পেয়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে, বাহিরের জগতের সঙ্গে অন্তরের আলো এক হ'য়ে গেছে subject object-এর পার্থক্য লুপ্ত হ'য়ে। একটি—ধরো, তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোকে এই উপলব্ধিটিরই আভাষ দিয়েছেন ব্যাসদেব তাহ'লেও মনে করো কি তারা বুঝবে আমি কী বলতে চাইছি? না বলবে—I am talking through my hat—লম্বা লম্বা কথা ব'লে তাদের ধোকা দিতে চাইছি?

ডাক্তারবাবু : ভাগবতের শ্লোকটি কী সাধুজি, বলবেন? আমি আর একটু মন দিয়ে পড়তে চাই ভাগবত।

প্রেমল : পড়বেন ডাক্তারবাবু—ভাগবতের সত্যি তুলনা নেই। মা আমাকে নিজে পড়িয়েছিলেন ভাগবত যার ফলে আমি কত কী যে শিখেছিলাম বলতে পারি না—বলতে কি, I was swept off my feet. জ্ঞান ও ভক্তির এমন বিচিত্র সমন্বয় কৃষ্ণের জীবন চিত্রের ভাষ্যে—ভাগবত সত্যিই কল্পতরু, যে যা চাইবে সে তাই পেতে পারে এর অশ্রুতি বাণীর ঝংকারে।

ললিতা : ঐ দেখ বাপী, ভাগবতের কথা বলতে বলতে ভাগবতের বাণীর কথাই ভুলে বসলে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন ভাগবতের কোন্ শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায় তোমার এ-অনুভূতির খবর!

প্রেমল : পুরো শ্লোকটি মনে পড়ছে না। দশম স্কন্ধে পাবে শ্লোকটি : কৃষ্ণ যখন মথুরায় কারাগারে জন্মালেন তখন বসুদেব স্তব করেছিলেন, তার একটি শ্লোকে আছে : "অনাবৃতত্বাৎ বহিরন্তরং ন তে" অর্থাৎ তুমি যখন আমাদের কাছে নিজেকে খুলে ধরো তখন তোমাকে দেখলে মনে হয় সদর ও অন্দরমহলের মধ্যে কোনো ভেদই নেই, অর্থাৎ ভিতর, বাহির সব একাকার হ'য়ে গেছে। (অসিতকে) কিন্তু মনে করো কি—আমি হাজার ব্যাখ্যা করলেও গড়পড়তা বাস্তববাদী আন্দাজ করতে পারবে এ-উপলব্ধির আনন্দবাণী বা নিহিতার্থ? অসম্ভব। আর অসম্ভব ব'লেই মুনি ঋষিরা মানা করেছেন বেণাবনে মুক্তো ছড়াতে।

অসিত : কিন্তু যারা দেখতে পায় না তাদের দৃষ্টিদানের দীক্ষা দিতে, যারা বুঝতে পারে না তাদের বোধশক্তিকে টেনে তুলতে, যারা শুনতে শেখেনি তাদের সুর শুনিয়ে সুরেলা ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে না। শুধু নিজে পেয়ে খুশী থাকাটাই পন্থা, আর যে-আনন্দ গগন গঙ্গার মতন নামল আমার অন্তরে অপরকেও তার সরিক করতে যাওয়াটা ভুল —এই-ই কি জ্ঞানের চরম বাণী! ভাগবতের কথা পাড়লে। কিন্তু ভাগবতেই প্রহ্লাদ কি বলেন নি নৃসিংহদেবকে :

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে বা পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদন্যশরণ্যং ভ্রমতোহনুপশ্যে *

ভাগ্যবান্ অধিকারী মুনিঋষিরা নিজে পেয়েই বলেন : ব্যস। কিন্তু যারা দুর্ভাগা অনধিকারী হ'য়ে জন্মেছে তাদের অধিকারী ক'রে তোলাও কি মহা-সাধকদের একটি মহৎ কর্তব্য নয়? পরমহংসদেব কি বলতেন না যে, যারা কোনো অচিন বনে ঢুকে আম খেয়ে ফিরে এসে মুখ মুছে চুপ করে ব'সে থাকে তিনি তাদের দলে নন—তিনি লোক ডেকে বলতে চান ওরে অমুক বনে চমৎকার আম ফলেছে, আমি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছি, যা তোরাও খেয়ে খুশী হ।

ললিতা (খুশী হ'য়ে) তুমি যতই বলো না কেন বাপী, এখানে আমি দাদার দিকে। কারণ আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি যে চাইব না আম খেতে? না দাদা ভাই, তুমি বাপীর কথা শুনো না। আম তুমি যখনই খাবে অন্ততঃ আমাকে তলব করবে—আমি ছুটে যাবই যাব যেখানে আম ফলেছে।

* তাপসমুনি যারা দেখেছি প্রায় তারা
আপন মুক্তিরই সাধনা করে
জগৎ ত্যজি হয়ে মৌনব্রতী
প্রাণ কাঁদেনা তাহাদের পরের তরে।
তাপিত পানে যদি না চায় ফিরে তারা—
কে দিবে তাহাদের শরণ দান
না দিলে তুমি? ত্যজি তাপিতে আপনার
চাহে না মোক্ষও আমার প্রাণ।

প্রেমল : তোমার একথা আমিও মানি অসিত। কিন্তু কি জানো? আমার এখন মনে হয়—জানি না পরে এ দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে কি না—যে, সাধনার অবস্থায় আম খেতে চাওয়াই ভালো—সে আমের খবর পাঁচজনকে দেওয়া চলে যখন হাত বাড়ালেই আমের নাগাল মেলে। পরমহংসদেবেরই আর একটি বিখ্যাত উপমা মনে করিয়ে দিই : এক সন্ন্যাসী কাঠুরেকে বললে এগিয়ে যেতে। সে যতই এগিয়ে যায় ততই সন্ধান পায় রূপোর খনি, সোনার খনি হীরের খনি। অল্প স্বল্প উপলব্ধিতে খুশী থাকা ঠিক নয়——এগিয়ে যেতে যেতে যখন মানুষ কোনো মহৎ স্থায়ী উপলব্ধির মহলে পৌঁছয় কেবল তখনই সে অধিকারী হয় মানুষকে ডাকতে তার সরিক হতে। পরমহংসদেব ছিলেন এক লোকোত্তর মহাপুরুষ তাই তিনি চেয়েছিলেন অপরকে বলতে কী পেয়েছিলেন। কিন্তু কতবার এমন হয়েছে—তিনি বলতে চেয়েছেন তার অনেক অপূর্ব উপলব্ধির কথা কিন্তু—হায়রে, মা মুখহলুসা ছেলের গলা টিপে ধরেছেন, বলতে দিচ্ছেন না। আরো দেখ, তিনি বারবারই বলতেন না কি যে, আদেশ না পেলে লেকচার দিয়ে কোনো কাজ হয় না? বলেন নি কি শশধর তর্কচূড়ামণিকে "বাবা, আরো একটু সাধন করে আগে বল বাড়াও তারপর প্রচার করতে ছুটো?"

বেশ দুপয়সা সঞ্চয় না ক'রে দান-খয়রাৎ করার ঝোঁককে কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলবে?

তারা (ললিতাকে) : আমার মন কিন্তু দাদার এই কথাই নিচ্ছে। আগে পাই তবে তো বিলোবো?

ললিতা : কিন্তু বাপী তো পেয়েছে।

প্রেমল : কী পেয়েছি? তামার খনি?

ললিতা : কেন মিথ্যে সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছ বাপী! তুমি যে কতবড় আধার মা-র মুখে কি শুনি নি?

প্রেমল : চুপ করো—

ললিতা : না, করব না। আমার গুরুকে ছোট করতে দেব না—যে-গুরু তার ওপরে মা-র আদরের দুলাল। (অসিতকে) শোনো ভাই, বলি কী হয়েছিল গোয়াল ঘরে। বাপী এইমাত্র ওর যে-উপলব্ধির কথা বলল ওর

পাদটীকা দ্রষ্টব্য—৪৫৯ পাতায়

প্রেমল : কী ছেলেমানুষি করছ ললিতা? চুপ করো।

ললিতা : না, করব না—বলবই বলব। মুখ বুজে থাকব? তুমি সবাইকে ভুল বুঝিয়ে আমার গুরুর মানহানি করবে আর আমি মুখ বুজে থাকবো? (ডাক্তারবাবুকে) কী হ'ল জানেন? এর পরে বাপীর চোখের দৃষ্টিই যেন বদলে গেল। এদিকে ওদিকে তাকায় আর চোখ জলে ভ'রে আসে। কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে—কিছুই বলতে চায় না কী দেখছে। কেবল মাঝে মাঝে বলে গদগদ কণ্ঠে সব একাকার…কেবল ঠাকুর…ঠাকুর…দুই নেই আর…শুধু এক এক এক। (প্রেমলকে হাত তুলে নিরস্ত করে) না, তুমি থামো, আমি বলবই বলব। তারপর হঠাৎ দেখি এক সাংঘাতিক কাঁকড়া বিছে খাটিয়ার পায়ার কাছে আসছে। আমি মারতে যেতেই বাপী আমার হাত চেপে ধরে ভারমুখে বলল, কি, কাকে মারছ? ছি ছি! ঠাকুর যে!" ব'লেই এক বইয়ের মলাটে সাদরে তাকে তুলে বাইরে গিয়ে এক বাবলা গাছের নিচে তাকে ফেলে দিয়ে এসে আপন মনে হাসতে লাগল। লোকে দেখলে নিশ্চয় বলত পাগল। কিন্তু আমায় বলেছিল পরে—

প্রেমল : বাস, হয়েছে। আর না। না ললিতা। মা বলতেন একটা কথা মনে নেই—যে যতটুকু হজম করতে পারে তার বেশি পরিবেষণ করতে নেই?

অসিত (হেসে ললিতাকে) : তুমি ঠিকই বলেছ দিদি: স্বভাব না যায় মলে—ও হচ্ছে ইন্‌কারিজিবল্—সেই গল্প জানো তো? মেকুরের?

ললিতা : না। বলুন না দাদা। তত্ত্বকথা ঢের হয়েছে—আর পারছি না। এবার গাল গল্পই হোক।

অসিত : পূর্ববঙ্গের লোক বেড়ালকে মেকুর বলে। এক বাঙাল কলকাতায় এসেছে। তাকে কিছুতেই বেড়াল বলান যায় না। শেষে তার এক বন্ধু ধরল শেখাবেই শেখাবে। বলল : "বলো তো ব-য়ে, হ্রস্বই কি হয়? সে বলল : বি।" —"তারপর ড়-এ আকার দিলে?"—"ড়া।"—"তার পর ল বসালে কি দাঁড়ায়? সে বলল : "মেকুর।"

সবাই হেসে ওঠে কোরাসে।

প্রেমল (হাসি থামলে) : আমি আরো এক কাঠি যেতে পারি—হ্যামলেট বলেছিল তার incorrigible কাকাকে নিশানা ক'রে:

Let Hercules himself do what he may
The cat will mew and the dog will have his day.

এমন সময়ে সবাই থেমে গেল পিওনের আবির্ভাবে। তারা উঠে গিয়ে একটি চিঠি নিয়ে প্রেমলের হাতে দিল প্রণাম করে।

প্রেমল চিঠিটি খুলে প'ড়েই ললিতাকে বলল: "মা গত কাল রওনা হয়েছেন কাশী আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবেন। আমাদের যেতে বলেছেন।"

ললিতা (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) : অসুখ?

প্রেমল (পড়ে) : মা লিখেছেন শোনো: "দুলাল! আমার পায়ের ব্যথাটা একটু বেড়েছে। এখানে বর্ষা নেমেছে। প্রণব বলছে পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর থাকা ভালো নয়। তাই আমরা কাল কাশী রওনা হচ্ছি—তোমরা পারো তো এসো। ভাবনার কোনো কারণ নেই। বাতের ব্যথা—কখনো বাড়ে কখনো কমে ঠাকুরের ইচ্ছায়। তোমার ডাক্তার বন্ধুকে আর তারা মা-কে আমার আশীর্বাদ দিও। হ্যাঁ, ললিতা লিখেছে অসিতের কথা। তাকে যদি ধরে কাশী নিয়ে আসতে পারো তবে একটা কাজের মতন কাজ হয়। তার আমাকে মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এ তার গান আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। গেয়েছিল সে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কালোয়াতী সঙ্গীত সভায়। ওস্তাদী গানের লম্ফঝম্পের পর তার মীরাভজন "সুনি মৈ হরি আওনকী আওয়াজ" শুনতে শুনতে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন কুরুক্ষেত্রের পরে দেখা পেলাম ধর্মক্ষেত্রের। তাকে আমার আশীর্বাদ দিও—তোমরাও নিও।"

ললিতা (হাততালি দিয়ে) : চলুন দাদু। যেতেই হবে। না যদি যান তো বেঁধে নিয়ে যাব।—মা বলেছেন—আমার গুরুর গুরু! কাজেই আপনার আর নিস্তার নেই।

অসিত (হেসে): কাঙালকে শাকের খেত দেখানোর পরে ভয় দেখাতে হয় না দিদি, সে ছোটে লোভের তাগিদেই—নিজের গরজে।

প্রেমল : একটু ভুল হ'ল। কারণ যে-কাঙাল বৃন্দাবনে পায়েস প্রসাদে নধরকান্তি হয়েছে তাকে কাশীতে বৈরিগিদের শাকভাত খেতে ডাকলে সে লোভে পড়ে না।

ললিতা : না দাদু! বাপীর কথা তুমি শুনো না। ওরা যা খায় খাক শাকভাত—আমি তোমার জন্যে দুবেলা পায়েস রাঁধব কথা দিচ্ছি—কেবল তোমাকেও কথা দিতে হবে যে, তুমি এখানকারই মতন রোজ ভজন শোনাবে।

তারা (বিষণ্ন): কিন্তু আমাদের বাড়ী যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে বকুল!

ললিতা : তোমরাও চলো না কেন?

তারা (ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে) সে কি হয়?

প্রেমল : খুব হয়। ডাক্তারবাবুর প্লাস্টার তো কাল খুলে দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তারবাবু : কিন্তু—আমরা এতজনে —

ললিতা : ও! আমাদের মস্ত বাড়ী—জায়গার অভাব হবে না।

ডাক্তারবাবু : জায়গার কথা নয়। তোমার মাতৃদেবীর অসুখ —

ললিতা : পায়ে ব্যথা কি আমার একটা অসুখ নাকি? তাছাড়া এক্ষেত্রে ডাক্তারকেই তো চাই। আপনার নাম ধন্বন্তরি—না জানে কে? একটি পুরিয়ায় বা পিল্-এ সব সারিয়ে দেবেন।

ডাক্তারবাবু : শোনা কথায় কি বিশ্বাস করতে আছে দিদি?

ললিতা : এবার হেরে গেলেন দাদা! বাপী আর আমি যখন গোয়ালঘরে খাটের দ্বীপে ব'সে ধ্যানের নামে হাপুস নয়নে কাঁদছি তখন আপনি আমাদের তলব করলেন কেন শুনি? বাপী একটি প্রচণ্ড সাধু এই শোনা কথায় বিশ্বাস ক'রেই তো!

প্রেমল (হেসে): কী করো ললিতা? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

ললিতা : পারবে কোত্থেকে বাপী—নিজেই মেনে নেওয়ার পর যে, হার্কিউলিসও পারেন না বেড়ালকে মিউ মিউ করা থেকে ঠেকাতে।

প্রেমল : আর কিছু মানি বা না মানি, তুমি যে নম্র মানতেই হবে। মনে পড়ল অসিতের একটি ভজনের লাইন:

চরণকি কিংকিনী বনী রহ সিরকা তাজ হো গঈ

(অসিতকে) এর কী বাংলা করেছিলে তুমি একটু গেয়ে শোনাও না ভাই লক্ষ্মীটি।

অসিত (সুর করে):

গুরুর পায়ের পায়েল হ'য়ে বাজতেন হায় যিনি
হ'লেন পলে মাথার মুকুট তার কেমনে তিনি?

ললিতা (ফের হাততালি দিয়ে পাদপূরণ করে):

পারে যে সে আপনি পারে—নাম তারি মোহিনী।

ললিতা রোখালো মেয়ে: এ তো শ্বশুর বাড়ী নয়, বাপের বাড়ী। অনুমতি চাইবে কি? তারপর সে সাহেব গুরুকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর ও সখী বকুলের স্কন্ধে চার সপ্তাহ ভর করে নি? সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর সামাজিক দায়িত্ব নাই থাকলো: যাদের আদরযত্নে সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও রাজার হালে কেটেছে তাদের স্নেহের শ্রদ্ধার জ্ঞানের কিছুটা অন্তত: তো শোধ দেওয়াই চাই। তারা তর্ক তুলেছিল: "ঋণ আবার কি? এমন মহাত্মা আমাদের কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—এর নাম কি ঋণ, না দান? ডাক্তারবাবু স্বভাবে উচ্ছ্বাসী নন তবু তাঁরও গলা ধ'রে এসেছিল বলতে বলতে যে এমন আনন্দে তিনি কখনো কাটান নি। শুধু ভজন ও হরিকথাই তো নয়—প্রতিদিন সকালে উঠেই রোমাঞ্চন—এতবড় সাধু তার ত্যাগী শিষ্যাকে নিয়ে শুধু যে ওদের আতিথ্য স্বীকার করেছেন তাই তো নয়—সহজ স্নেহে অপার করুণায় সংসারীদেরও কাছে টেনে নিয়েছেন। যারা ভগবানকে কিছুতেই আপন মনে করতে পারে না এমন বিষয়ীদের তিনি কী দিয়েছেন দিনের পর দিন? অনাবিল স্নেহ, পুণ্য আশীর্বাদ—সবার উপর তাঁর আনন্দময় সঙ্গ। এ-সংসারে আনন্দের দেখা মেলে কদিন—আর মিললেও তার রেশ থাকে কতক্ষণই বা? ওরা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, না চাইতে পাবে এমন নির্মল আনন্দ—একটানা, অফুরন্ত, নিত্য নতুন ছন্দে?

ওদের কথা শুনতে শুনতে অসিতেরও মনে হয়েছে কতবারই: "সত্যিই তো—না চাইতে পাওয়া-দানের মূল্যও কত বেশি! তোড়জোড় বেঁধে এ ও তা গ'ড়ে তুলে আনন্দ—সৃষ্টির আনন্দ—খুব দামী একথা মেনেও বলা যায় না কি যে, সাধুর কাছ থেকে যা মেলে তা রোজগার নয়, মাইনে নয়—পুরস্কার, নিছক হরির লুট ছড়ানো—শুধু হেঁট হ'য়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। সব নির্মলিন প্রীতি প্রেম ভালোবাসাই এম্নি ঠাকুরের দান বটে। কিন্তু তবু একটা

কিছু চায়ই চায়। কিন্তু সাধুরা—মানে প্রেমল মহারাজের মতন নির্ভেজাল সাধুরা—সত্যিই তো কিছুই চান না প্রতিদান। যদি তখনো কিছু চান সেও যেন দান—মানুষ কৃতার্থ বোধ করে সাধু ভিক্ষা চাইলেন ব'লে। সাধুর ভিক্ষা কি আর হাত-পাতা? ছদ্মবেশে দানই তো। নয় তো কি!

সেদিন প্রেমল যমুনায় স্নান করবার আগে ঘরে গিয়ে যখন তেল মাখছিল তখন তারা একলা পেয়ে অসিতকে বলেছিল: "দাদা, আমাদের সেবা উনি নিলেন—সত্যি বলছি এ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। কতবারই যে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে যখন সাধুদাদা আমাকে টুকিটাকি রাঁধতে বলেছেন—পাটিসাপটা, মোচার ঘণ্ট, ছানার ডালনা, কমলালেবুর পায়েস! মনে হয়েছে—যে ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়েছে সে যখন গৃহীদের ঘরে আসে তখন সে তো পদার্পণ নয় দাদা—আবির্ভাব আবির্ভাব—হ্যাঁ ঐ কথাটিই খুঁজছিলাম। কিন্তু তার উপর ভাবুন তো—আমাদেরও নেমন্তন্ন করা—ওঁদের সঙ্গ আরো দুদিন পেতে। তাছাড়া ওর গুরুমাকেও দেখব—এই দেখুন দাদা, আমার গায়ে ফের কাঁটা দিচ্ছে।...দেবে না? যাঁর ছোওয়ায় খাস সাহেব হ্যাট বুট ছেড়ে বোষ্টম হ'য়ে চোখের জলে হরিনাম করে···উঃ সেই সাক্ষাৎ ভানুমতীকে দেখব এবার—এতদিন যাঁকে শুধু তার হাতে-গড়া শিষ্যের মধ্যে দিয়েই জেনেছি, চেখেছি।"

প্রেমল এই সময়ে ওঘর থেকে হুঙ্কার দিয়ে অভ্যুদিত হ'ল: "আমি সত্যিই পুরো বৈষ্ণব বনেছি বটে। তাই না আড়ি পেতে তোমার কথা শুনতে এতটুকু সাহেবি চিত্তগ্লানি হ'ল না শুধুই বৈষ্ণব হর্ষ আর আত্মপ্রসাদ আমি তো তাহ'লে দেখছি সোজা সাধু নয়—এমন স্নেহময়ী দিদিও যার বোঝা ব'য়ে নিজেকে হাল্কাই বোধ করেন! অঘটনকে আমি বরাবরই খাতির করি। তাই এ-অসম্ভবকে সম্ভব করেছি ব'লে আমারও—তোমার ভাষায়—গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, দিদি, এই দেখ না। কাজেই শোধবোধ।" ব'লেই অসিতকে: "এবার যমুনাস্নানে চলো অসিত। কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি তোমার আর ললিতার অত্যাচারে। আজ বারোটার মধ্যে খেয়েই দিবানিদ্রার ব্যসন চাই। সাধুর কৃপায় দেখবে সে ব্যসনও হ'য়ে উঠবে অজ্ঞান—দিব্যজ্ঞান—দেখবে হয়ত আরো অভয় স্বপন যার ফলে হবে সংশয়

পনেরো

কিন্তু এবার যমুনায় স্নান করা হ'ল দুর্ঘট। এ এক-মাসের বর্ষায় আষাঢ়ের শেষে যমুনার আর সে তন্বী তরুণী নীলকান্তি নেই। তিনি হয়ে উঠেছেন এখন ধূসর প্রবীণা, গর্জমানা অশান্ত। ললিতা ও তারা ভয় পেয়ে নামল না জলে, ঘটি ক'রে জল নিয়ে পৈঠার উপরেই স্নান সারল। অসিত নামল বটে, কিন্তু হাঁটুজলের বেশি নামতে সাহস হ'ল না। প্রেমল হাসল: "ওকি! অবগাহন স্নান না হ'লে কি স্নানযাত্রা হয়?" ব'লেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভয় পেয়ে তারা চিৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু প্রেমল হেসে চেঁচিয়ে বলল: "কোনো ভয় নেই দিদি! যমুনায় কালিয় নেই। তাছাড়া আমি কাশীতে প্রায়ই সাঁতরে গঙ্গা পার হতাম।" ব'লেই দীর্ঘ বাহুসঞ্চালনে পরের ঘাটে গিয়ে উঠল। ললিতা সগর্বে বলল: "এতো বাপীর কাছে কিছুই নয়। কাশীতে ওর চিৎসাঁতার দেখে অনেকে ওকে ঠাট্টা ক'রে বলত ত্রৈলঙ্গ স্বামী।" তারা তবু আপত্তি করে: "তা হোক—বর্ষার জলে সাঁতার দেওয়া—মোটেই ভালো নয়। আমি যদি জানতাম তো আসতাম না।"

অসিত (হেসে): না এলে কি আর ও সাঁতার দিত না!

তারা: তবু চোখে দেখতে তো হ'ত না দাদা! আমার বুকের মধ্যে এখনো ঢিপ ঢিপ করছে। ওর জীবনের কত দাম—এভাবে বিপন্ন করা কি উচিত?

ললিতা: বাপী বলে প্রায়ই যারা অষ্টপ্রহর ভাবে তাদের জীবনের দাম বেশি জানবে তারা নিজেকে ভোলাতে চায় ব'লেই এমন কথা ভাবে।

তারা: কী যে বলো বকুল! ওঁকে দিয়ে ঠাকুর কত কাজ করিয়ে নেবেন—

ললিতা: বাপী প্রায়ই কে এক ভাবুকের কথা আওড়ায় বকুল: "We all of us are wanted but none of us is wanted much"

অসিত তারাকে (হেসে) তাছাড়া একটা কথা ভুলো না দিদি: ও দীক্ষায় বোষ্টম হ'লে কী হবে? ওর রক্তে যে এখনো গোরা গর্জাচ্ছে। দুদিন নিরামিষ খেলেই কি বাঘ ভেড়া ব'নে যায় আমাদের ম'ত?

(ক্রমশঃ ...)

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতি

অধ্যাপক গৌরীদাস মল্লিক

বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ চিন্তায় ও কর্মসাধনায় ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। তাঁর এই বিশ্বপ্রেম শুধু বিশ্বজনের মধ্যে সীমিত ছিল না, তা বিশ্বপ্রকৃতিরাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর কবিমন বিশ্বপ্রকৃতির অলৌকিক প্রভাবে হয়েছিল প্রভাবিত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের যেন এক নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল। এ-কথা ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে নানাপ্রসঙ্গে তাঁর কথায় ও লেখায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'জীবন-স্মৃতিতে' তিনি লিখেছেন, "আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটা সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।" আবাল্য ছিল তাঁর এইরূপ মনোভাব। তাঁর এই মনোভাব নিছক কল্পনাপ্রসূত বা আবেগজনিত ছিল না, তা ছিল তাঁর দার্শনিক মনের একান্ত অনুভূতি। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ ছিল অতি গভীর। এ কথা তিনি ব্যক্ত করে বলেছেন, "এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা—তরুগুল্ম; এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতু চক্র; এই অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্তপ্রাণিপর্যায়—এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ির রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে।.........আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাত্মীয়তা-বোধই তাঁকে করেছিল বিশ্বপ্রেমিক, প্রকৃতির পুজারী ও প্রকৃতির কবি। তিনি ভাবময় দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আর তাঁর সেই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লোকে দেখতে পেতেন প্রাণরসে সঞ্জীবিত এক আনন্দময় জগৎ। সেই জগতের কথা উল্লেখ করে প্রকৃতির কবি লিখলেন—

> "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজনে মোহিছে।
> স্থলেজলে নভোতলে বনে উপবনে
> নদীনদে গিরিগুহা পারাবারে
> নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা,
> নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।
>
> * * *
>
> কত দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা।
> ঝর ঝর রসধারা।"

ঋতুচক্রের আবর্তনক্রমে বৎসরের একনির্দিষ্ট সময়ে সেই বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমে বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক সাজসজ্জা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বর্ষাপ্রকৃতি। আর এই বর্ষাপ্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ প্রকৃতির কবির মনকে কত ভাবে কতরূপে আন্দোলিত হিল্লোলিত ও সচকিত করে তুলেছিল, কত ভাবরসের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিল তাঁর ভাবপ্রবণ হৃদয়ে, কত ভাবপূর্ণ বর্ষাকাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর কবিমনকে। তাই, তাঁর রচিত বর্ষাকাব্যে বর্ষাগানে প্রকৃতিলোকের বর্ষা কত যে বিচিত্রভাবে হয়েছে মূর্ত, কত যে ভিন্ন ভিন্ন রসের স্রষ্টারূপে হয়েছে লীলায়িত, তা সাধারণের কাছে অভাবনীয়। ছন্দে সুরে, ব্যঞ্জনায়, শব্দালংকারে ও ভাবপূর্ণতায় সমৃদ্ধ কাব্যে ও সংগীতে তিনি বর্ষাকে রূপায়িত করেছেন বৈচিত্র্যময়ী ভাবময়ী ও রহস্যময়ীরূপে।

কবির বাল্যকাল থেকেই বর্ষা কবিমনে দিয়েছে দোলা। কবির শিশুমনকে আকর্ষণ করতো বর্ষার সজল সঘন কাজল-

মেঘের সমারোহ, বৃষ্টিবর্ষণমুখর ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধশীতল পরিবেশ। এ সম্বন্ধে তিনি এক প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি।...আরও মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ মনের ভিতর সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে, মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয়।"

এইভাবে বালককবি বর্ষাকে জানিয়েছিলেন তার প্রতি তাঁর অনুরাগ। বর্ষার প্রতি তাঁর এইরূপ অনুরাগ যে কেন ছিল, তা' সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর এই কথায়—"সেই (বাল্যকালের) বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনাবাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে।"

কোন্ আদিকালে এক অনামা কবি রচনা করেছিলেন বর্ষার এই ছড়াগান—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।" এই ছড়া বাংলার ঘরে ঘরে শিশুরা বৃষ্টিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে গানের সুরে গেয়ে থাকে। শিশু রবীন্দ্রনাথের মনেও যে গভীর রেখাপাত করেছে ঐ বর্ষার ছড়াগান, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ ছড়াগানটির সম্বন্ধে মন্তব্য করে তিনি লিখেছেন, "ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।" এইভাবে কবি ঐ বর্ষার ছড়াকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ বর্ষার ছড়াকে অবলম্বন করে তিনি রচনা করলেন ঐ শিরোনামায় আধুনিকযুগের শিশুমহলের এক বর্ষাকবিতা যাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শৈশবকালের বর্ষাদিনের পুলকময় পরিবেশ, যে পরিবেশ অন্যের কাছে অতি সাধারণ বলে মনে হলেও বর্ষামুগ্ধ কবির কাছে তা উল্লেখযোগ্যরূপে স্মরণীয়। তাই পরিণত বয়সেও তাঁর (কবির কথায়)—

"বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

* * *

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,

* * *

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ।"

শৈশবের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে জীবনের পরিণত অবস্থায়ও কবির মনে ভীড় করে এসেছিল শৈশবের বর্ষাদিনের পুলকময় পরিবেশের স্মৃতিকণাগুলি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর এই মন্তব্য—'বর্ষাকাল বালকের কাল—বর্ষাকালে তরুলতার শ্যামল কোমলতার মতো আমাদের স্বাভাবিক শৈশবস্ফূর্তি পেয়ে ওঠে—বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।"

তারপর, কবির বাল্যের বর্ষাদিনের সুখস্মৃতি মন থেকে চলে যায়। এক সময়ে আসে তাঁর ভাবান্তর যখন তিনি বর্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন বয়স্ক সংসারী লোকের সাবধানী মন নিয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করে। তখন কবির স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়ে বর্ষার রূঢ় বাস্তব রূপ, তার অশান্ত দুরন্ত প্রকৃতি। তাই যখন কবির উক্তিতে :—

'বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো,
আউশের ক্ষেত জলে ভরো ভরো,"

তখন তিনি তাঁর স্বজনদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে থাকেন—

' কালীমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়াছে, দেখ্ চাহিরে॥"

আর এই সঙ্গে নিরাপত্তার জন্যে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,—

"ওগো, আজ তোরা যাসনে গো তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশে আঁধার, বেলা বেশি আর নাহিরে।
ঝরো ঝরো ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,—
ওই বেণুবন দোলে ঘন ঘন
পথপাশে দেখো চাহিরে॥"

কবি এই অবস্থায় স্থূলদৃষ্টিতে দেখছেন বর্ষাকে। তাই বর্ষার আরও ভয়াবহ রূপ তাঁর সেই চোখে ধরা পড়লো। তার সেই ভয়ংকর রূপ কবিমনে সৃষ্টি করলো ভয়ানক রসের। যখন ধারাবর্ষী ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশের মাঝে মুহুর্মুহু হতে

নৃত্য আর, তার সঙ্গে আকাশ জুড়ে ছোটাছুটি করতে থাকে চঞ্চলা চপলার চোখ ঝলসানো বজ্রাগ্নি, তখন কবি ভুলে গেছেন তাঁর শৈশবকালের বর্ষাদিনের পুলকময় স্মৃতিকথা, তখন আর তিনি ভাবেন নাই সাংসারিক পরিবেশের কথা। তখন তিনি আতঙ্কচিত্তে দেখছিলেন বর্ষার ভয়ালরূপ আর সেই সঙ্গে তাঁর অন্তর্লোকের কবিমন বর্ষার সেই রূপকে ভাষার অলংকারে, ছন্দের সৌন্দর্যে, শব্দের গাম্ভীর্যে, ব্যঞ্জনার মাধুর্যে ভূষিত ও ভয়ানকরস মিশ্রিত কণ্ঠে প্রকাশ করলেন বর্ষাসংগীতে—

"আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথ পল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে।

* * *

তড়িৎ-শিখা-জুটে দিগন্ত সন্ধিয়া
ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া
নাচিছে যেন কোন প্রমত্ত দানব
মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া ॥"

কিন্তু বর্ষার প্রতি কবির এইরূপ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী শুধু সাময়িক। তিনি প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ তাঁর কবিমনকে নব নব ভাবে আকৃষ্ট করে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে তাঁর হৃদয়কে আবিষ্ট করে রেখেছে। তাই, তাঁর স্থূলদৃষ্টি দিয়ে দেখা বর্ষার রুদ্রমূর্তি কবির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেনি। যখন তিনি বর্ষাকে দেখতেন ভাবময় দৃষ্টি দিয়ে, তখন তাঁর হৃদয়ে বয়ে যেতো আনন্দের হিল্লোল ও মনে জাগতো ভাবের উচ্ছ্বাস। কারণ, তখন তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতি সজল কাজল মেঘের ছায়াতলে বর্ষণসিক্ত সুবাসিত ফুলদলশোভিত বন-উপবনের শোভায় হয়ে উঠতো শ্রীমণ্ডিত। বর্ষার এই স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা যেন কবির চোখে পরিয়ে দিত তার মায়াঞ্জন, মনে জাগিয়ে দিতো ভাবের উচ্ছ্বাস, অন্তরে বইয়ে দিত আনন্দের স্রোত। কবির মনে যখন এইরূপ ভাবাবস্থা এসেছিল, তখন তিনি তাঁর উচ্ছ্বসিত ভাব ব্যক্ত করে উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।"

বর্ষার পরিবেশে তাঁর এইরূপ ভাববিহ্বলতার কথা তিনি প্রসঙ্গক্রমে এক স্থানে লিখেছেন—"ঘোর বর্ষা নেমেছে, এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে, আর হৃদয়ের মধ্যে পেখম-মেলা ময়ূরের নাচও সুরু হয়।"

তাই বুঝি, কবির হৃদয়ের এই নাচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর মনের শিখর দেশে ঘনিয়ে আসা সুরের মেঘ থেকে বর্ষণ সুরু হয়েছিল ভাবরসমিশ্রিত এই সংগীতধারা—

"নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীল নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।"

ভাবের আবেগে পরিচালিত হয়ে কবির কল্পনার গতি যেন এখানে এক অভিনব ধারায় বয়ে চলেছে। তাঁর রচিত এই গানে ফুটে উঠেছে তাঁর বর্ষাপ্রীতির উচ্ছ্বাস। কবির বর্ষাপ্রীতি যে কত উচ্ছ্বাসময়, তা' সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়।

কবির বর্ষাপ্রীতি অতি প্রগাঢ় তাই, বৎসরে বৎসরে যখন সজল মেঘের সমারোহ নিয়ে সগর্জনে ধরার বুকে নেমে এসেছে নববর্ষা, তখন কবি আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে নববর্ষার আগমনবার্তা ঘোষণা করেছেন এই বলে—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরবে হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

এইভাবে কবি নববর্ষাকে বিশেষ বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করে তাকে দিলেন গরীয়সী নারীর মর্যাদা। এমনই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বর্ষাপ্রীতি।

কবির কথায় 'নিখিল-চিত্ত-হরষা' রূপে নববর্ষা আসছে, তাই তাঁর এই উল্লাসপূর্ণ ঘোষণা। কেন এই উল্লাস! হয়তো সেই সময় তাঁর মনে পড়ে ছিল, (কবিরই কথায়) "বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন"-এর তিক্ত অভিজ্ঞতা, যখন কষ্টে পড়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল,—

"সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে

* * *

দারুণ অগ্নিবাণেরে হৃদয় তৃষায় হানেরে॥
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানেরে॥"

কিন্তু এখন নববর্ষার আগমনে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের হয়েছে অবসান, দারুণ অগ্নিবাণের হয়েছে নিবৃত্তি। তাই তখন কবি কণ্ঠে শোনা গেল তাঁর উল্লাসধ্বনি—

"এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা।
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা
গীতময় তরুলতিকা।"

কবি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যেন তখন দেখতে পেলেন,— নববর্ষার আবির্ভাবে প্রকৃতি রাজ্যেও যেন আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে, সন-সন-শব্দমুখর বনবীথিকায় তরুলতিকা পর্যন্ত গীতময় ধ্বনি তুলছে।

শুধু প্রকৃতি রাজ্যে নয়, ভাবাবিষ্ট কবির মনে হয়েছিল বর্ষার আকাশলোকও যেন যুগযুগের বর্ষাকবিগণের বর্ষাসংগীতে মুখরিত। তাই তিনি বললেন,—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা॥"

নববর্ষার আবির্ভাবে কবির মনে স্বতঃই উদয় হত অতীত যুগের তাঁর প্রিয় বর্ষাকবিগণের স্মৃতিকথা ও তাঁদের রচিত সরস মধুর বর্ষাসংগীত আর বর্ষাকাব্য। তাই বুঝি, তাঁর মনে জেগে উঠেছে উপরোক্ত ঐ অনুভূতি।

কবির বর্ষাপ্রীতি ছন্দে স্বরে রূপকালংকারে আরও জমে কাব্যময় পরিবেশের কল্পনাকে কবিতায় রূপায়িত করে বললেন,—

"ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী ;
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী॥"

কবি কল্পনায় যেন চলে গেলেন 'কালিদাসের কালে'র মালবিকা, মঞ্জুলিকা প্রভৃতি চপল চটুল সংস্কৃতিসম্পন্ন অঙ্গনাদের পরিবেশে যার ফলে, কবির চোখে বর্ষাসৌন্দর্য যেখানে ঘনীভূত সেই 'ঘনবনতলে' তাঁর মানসী 'নিখিলচিত্তহরষা' 'নবযৌবনা বরষা'র সংবর্ধনার সেই কালোপযোগী এক কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তাই কবিমন ডাক দিতে চেয়েছিল ঐ সব সপ্রতিভ বিদগ্ধা অঙ্গনাদের যারা মর্মে মর্মে বুঝেছে 'মেঘদূত' বর্ষাকাব্যে উল্লেখিত কালিদাসের বাণী— 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।' কবি রসিক, মন তাঁর আনন্দময়, তাই কল্পনায় এদেরই কথা তাঁর মনে পড়েছিল, আর তখন তাঁর ইচ্ছা জেগেছিল,—বর্ষা-সংবর্ধনার অনুষ্ঠানকে মধুময় ও আনন্দমুখর করে তুলুক এইসব অঙ্গনাদের ললিতনৃত্যের তালে তালে মঞ্জীর সিঞ্জন, তাদের নিপুণ হাতে বাজানো বীণার শ্রুতিমধুর ঝংকার, মুরজ মুরলীর সুমধুর স্বর, মৃদঙ্গের মর্মস্পর্শী মন্দ্র, এইসঙ্গে তাদের বাজানো মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি, আর অপরপক্ষে ভাবাবিষ্টা রচনাকুশলী পুরনারীদের মেঘমল্লার রাগিণী সংবলিত বর্ষাগানের রচনাসম্ভার। বর্ষাকে কেন্দ্র করে কবির এই অভিনব কল্পনায় পাওয়া যায় তাঁর রসবোধ রুচিবোধ ও শিল্পীমনের পরিচয়। বর্ষাকবির বর্ষাসংবর্ধনা

বাস্তবক্ষেত্রে তার সুশোভন আয়োজনও হয়ে থাকে তাঁরই প্রবর্তিত 'বর্ষামঙ্গল'—দিবস অনুষ্ঠানে। সহাসমারোহে আগত নববর্ষার গতিবিধি শুধু প্রকৃতিরাজ্যেই সীমিত হয়ে রইলো না, সে কবির কল্পনাকে আশ্রয় করে তাঁর মনোরাজ্যেও প্রবেশ করেছিল মূর্তিমতী হয়ে। কল্পনায় কবি বর্ষাকে তখন দেখলেন এক দেহধারিণী চঞ্চলা তরুণীরূপে। এইবার অরূপের মধ্যে তিনি রূপের কল্পনা করলেন, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন আর প্রাণচাঞ্চল্য দিয়ে তাকে তরুণধর্মী করে গড়লেন। কবির মনোরাজ্যের এইরূপ মূর্তিমতী বর্ষার দেখা পাই তাঁর 'নববর্ষা—কবিতায়।

এই কবিতায় বর্ষা আর 'বর্ষামঙ্গল'এর 'শ্যামগম্ভীর সরসা' নয় 'মত্ত বর্ষা'ও নয়, সে যে এবার আর এক রূপ পরিগ্রহ করেছে কবিকল্পনায় ; এই নববর্ষার নবরূপের আভাস পাই প্রশ্নচ্ছলে ব্যক্ত কবির এই ব্যঞ্জনাময় উক্তিগুলিতে—

"ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ?
ওগো নবঘন-নীল বাসখানি
বুকের উপর কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?"

* * *

"ওগো নদীকূলে তীর-তৃণদলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে ?"

* * *

"নব মালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে ?"

* * *

"ওগো নির্জনে বকুল-শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?"

* * *

"বাদলরাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ হরণী ।"

কবি যেন এখানে এক দৃশ্যকাব্যের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করলেন বর্ষাঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। এখানে কবি বর্ষার রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করলেন তাঁর মানসী খামখেয়ালী তরুণী বর্ষাকে নায়িকারূপে। তারপর, কাব্যরসিক তাঁর কথাশিল্পনৈপুণ্যের গুণে তাঁর রসিক পাঠকদের মন আকর্ষণ করে, তাদেরও কল্পনাশক্তি জাগ্রত করে তুললেন। তাই এই কবিতাপাঠে পাঠকদের মনেও এক অভিনব রসানুভূতির সঞ্চার হয়।

বর্ষাপ্রকৃতিকে কবি ভালবেসেছিলেন মনে প্রাণে, তাই নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবরসের মাধ্যমে বর্ষার বর্ণনা দিয়ে তাকে যেন সমাদর করেছেন, বিশেষ বিশেষ রূপক-সজ্জায় তাকে সাজিয়ে যেন আনন্দ উপভোগ করেছেন। কোন একদিন তাঁর খোশমেজাজী অবস্থায় তিনি কৌতুকরসের মাধ্যমে বর্ষাকে বীরপুরুষ সাজিয়ে তার এক রাজকীয় বর্ণনা দিয়ে লিখলেন,—"বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলা দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরু গুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়।......লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশ দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে।......তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ বাণ নিঃশেষ হইতে চাহে না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লব-শ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকী গন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

কবির মনের ভাবের হাওয়া দিক বদলেছে, তাই বর্ষা এখন আর 'শ্যামগম্ভীর সরসা' 'নবযৌবনা' নয়, এলায়িত-বেশিনী নীলবসনা চঞ্চলা তরুণীও নয়, সে বকুলশাখায় আর দোল খায় না, সজল নয়নে বাদলরাগিণীও সে এখন গায় না ; কবির কল্পনাচাতুর্যে সে এখন দিক্‌চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়রাজা সে বীরপুরুষ আর তার সাজসজ্জা ও আদব-কায়দাও তদনুরূপ।

কবির কল্পনার যাদুমন্ত্রে বর্ষা নানারূপ পরিগ্রহ করে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ষাপ্রকৃতিও কবির চিত্তে তার মায়াজাল বিস্তার করতে ছাড়ে নাই। বর্ষা মায়াবিনী, তার এই খ্যাতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তার মায়াময় রূপকে কেন্দ্র করে অতীতযুগের কবি মহাকবি-গণ সৃষ্টি করেছেন কত প্রেমকাব্য। বহির্জগতের বর্ষা

এযুগের বর্ষারূপ-মুগ্ধ বিশ্বকবিরও মনোজগতে প্রবেশ করে তাঁর চিত্তকে নানাভাবে দোলা দিয়েছিল, তার অন্তর্জগতে ভিন্ন ভিন্ন আবেগের উৎস সৃষ্টি করেছিল।

তাই কোন এক বর্ষাদিনে বর্ষার মায়ায় মুগ্ধ কবি এক ভাবাবেগে আনন্দবিহ্বল হয়ে লিখেছিলেন—"নয়নে আমার সজল মেঘের/নীল অঞ্জন লেগেছে।" তাই বুঝি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি তখন দেখলেন, "পুলকিত নীল নিকুঞ্জে আজি/বিকশিত প্রাণ জেগেছে।"

এই মোহময় পরিবেশে বর্ষার যাদুমন্ত্রে বুঝি কবির অন্তরে একদিন জেগে উঠেছিল যৌবনজলতরঙ্গের উচ্ছ্বাস, তাই বুঝি অমন জীবজগতে ডুবে গিয়ে তিনি আনন্দবিহ্বলচিত্তে ডাক দিয়েছিলেন—

"জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।"

প্রকৃতিজগৎ তখন (কবির কথায় প্রকাশ) "শশী-তারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী" আর তার উপর (কবির কথায়)—

"যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,"

এইভাবে রহস্যময় এক পরিবেশ সৃষ্টি করে বর্ষাপ্রকৃতি কবির হৃদয়ে যে বিশেষ রসসৃষ্টি করেছিল, তা কবির কল্পনাকে আশ্রয় করে ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

একাধারে তিনি বর্ষারূপমুগ্ধ কবি ও রসজ্ঞব্যক্তি, তাই তাঁর বর্ষাবর্ণনা যেমন ছন্দে শব্দে প্রাঞ্জলতায় হয়েছে মাধুর্যমণ্ডিত, বর্ষাশ্রীকে উপভোগ করার পরিকল্পনাও তাঁর তেমনি হয়েছে সরস সুন্দর ও কাব্যময়। বর্ষারাতে বর্ষাপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কল্পনারাজ্যের সহচরীর সঙ্গে যুগলমিলনে 'পুলকিত নীপনিকুঞ্জে' দোদুল্যমান নীপশাখে বাঁধা ঝুলনায় দোল খাওয়ার এক পুলকময় কল্পনাকে তিনি ছন্দায়িত করে তুলেছেন এইভাবে;

"কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।"

এই প্রসঙ্গে হয়তো কবির মনে উদয় হয়েছিল—কোন এক অতীতযুগে বৃন্দাবনে যমুনার তটে শ্রাবণরাত্রে মেদুর মেঘের চন্দ্রাতপতলে বর্ষাস্নাত সজল হাওয়ায় স্নিগ্ধ কেলি-কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার বিষয় অবলম্বনে রচিত বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীর সরস মধুর বর্ণনার কথা। কারণ বৈষ্ণব কবিদের বিরহ-প্রেমঅভিসার-সম্বলিত বর্ষাবর্ণনা পাঠে ছিল কবির গভীর অনুরাগ। এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হবে।

তারপর কবির মনে যখন ভাবের হাওয়ার দিক আবার বদলে গেল, তখন যুগলমিলনের পটভূমিরও পরিবর্তন হলো, আর এইসঙ্গে ভিন্ন হয়ে গেল মিলনের ছন্দ, বদল হলো প্রেমগুঞ্জনের সুর। বর্ষার পাগল হাওয়াই যেন এনে দিল কবির মনের ভাবধারার এই পরিবর্তন। তাঁর এই ভাবান্তরে তাঁর প্রেমার্থী চিত্ত তাঁর মানসীকান্তাকে আর এখন পেতে চায় না বর্ষাপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, তাকে আর নির্দেশ দিতে চায় না—'নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।' এখন প্রেমাবেগের উচ্ছ্বসিত ভাব আর নাই, তা এখন শান্ত সমাহিত ও সমবেদনাশীল হয়ে উঠেছে। তাই কবির মনে শুধু জাগছে এই কথাটি (কবির ছন্দোবদ্ধ কথায় যা প্রকাশ)—

"এমন্ দিনে তা'রে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!
সেকথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
* * *
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু-কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কী বা কার?"

প্রেমিকের হৃদয়ে জমে আছে যেন কত দুঃখ-বিরহ বেদনা প্রভৃতির গূঢ় কথা। কবির কথায় প্রকাশ, সে কথা শুধু প্রাণ খুলে বলা যায় ব্যথার ব্যথী 'জীবন সঙ্গিনীকে'। বর্ষার মায়ায় আচ্ছন্ন এক নিভৃত গৃহকোণে যেখানে "সেথায়

শুনিবে না কেহ আর", শুধু তাদের বলা (কবির কথায়) "সে কথা আঁখি-নীরে মিশিয়া যাবে ধীরে/এ ভরা বাদলের মাঝখানে।/সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।"

এইভাবে বর্ষার 'সজল সঘন বিশাল মায়ায়' অভিভূত কবি মধুর ছন্দে সরল সরস ভাষায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মনোজ্ঞ ভঙ্গিমায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন, বর্ষার মায়াময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তাঁর রসঘন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বিভিন্ন আবেগ।

বর্ষাপ্রকৃতি বর্ষানুরাগী কবিমনকে যে কতভাবে দোলা দেয়! কখনও সে কবির কল্পনার গতিকে রুদ্ধ করে কবিমনকে অনুপ্রাণিত করেছে—যুগযুগের কবিমহাকবিদের কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত রসসিক্ত প্রেমমূলক বর্ষাকাব্য পাঠ করতে। এইজন্য বর্ষার পরিবেশে কবি পাঠ করতে ভালবাসতেন—বর্ষার পটভূমে বর্ণিত বৈষ্ণবকবিদের বিরহ-মিলন-অভিসার-সংবলিত প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে বর্ষাকাব্য। এইপ্রসঙ্গে তিনি একস্থানে লিখছেন,—"কালরাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে।.. আজ সকালবেলায়...সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি হচ্ছে। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমন দিনে কি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করে! মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে 'পদরত্নাবলী'র পাতা ওল্টাচ্ছি—বৃন্দাবন-নামক বিরহ মিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখতে পাচ্ছি—'গগন হি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।......"

কবি ঐ পদাবলী তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠেছে ঐ পদাবলীর অন্তর্নিহিত বর্ষাভিসারের একটি ছবি যার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখলেন,—"বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ, মেঘচ্ছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ দিয়ে গৌরী চলেছেন—অস্থির পবনে গাছপালা দুলছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃষ্টির ছাট উড়ে চলেছে—সূর্য কোথায় ডুবে আছে তার সন্ধান নেই, দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে।"

এইপ্রসঙ্গে তিনি আরও একস্থানে জানাচ্ছেন, "মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকলে বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে।"

তাই তিনি যখন প্রকৃতিজগতে দেখেছেন,—(কবির ছন্দায়িত ভাষায়)

"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যামবনশ্রেণী।"

তখন তাঁর মানসপটে যে কথা ভেসে উঠেছিল, তা' তিনি ব্যক্ত করে বললেন,—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা—অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।
সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি
তড়িৎ-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হয়ে রমণীর হিয়া।"

বর্ষার উল্লিখিত পরিবেশে কবির শুধু মনে পড়ে নাই বৈষ্ণবপদাবলীতে বর্ণিত পাগলিনী রাধিকার বর্ষাভিসারের কথা, এই পরিবেশে তাঁর মনে ভেসে উঠতো কালিদাসের বর্ষাকাব্য 'মেঘদূত'এ বর্ণিত বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার বিরহকাতর শীর্ণ মলিন মূর্তিটিও। উপরোক্ত একই প্রসঙ্গে তাঁর মনের এই ভাবটির কথাও উল্লেখ করলেন এই বলে—

"যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন,
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন মলিন বেশ,
সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।"

তাই বুঝি, বর্ষাদিনে কবির পাঠ করতে ভাল লাগতো কালিদাসের বর্ষাকাব্য 'মেঘদূত' যার 'মেঘমন্দ্র শ্লোক'-এর অন্তরালে (কবির ছন্দায়িত ভাষায়)

"বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।"

বর্ষার এইসব দিনে যখন কবির নিজ কল্পনা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতো নানাকারণে, তখন অন্যান্য বর্ষাকবিদের কল্পনানৈপুণ্যে সমৃদ্ধ প্রেম-বিরহের সরস বর্ণনা পাঠ করে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন রসানুভূতিতে ভরে উঠতো। এই

অবস্থায় তিনি মেঘদূতও পাঠ করতেন বর্ষার পরিবেশে। তাঁর কথাতেই প্রকাশ—

"আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝর ঝর।
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত......"

বর্ষার পরিবেশ যথারীতি বর্তমান থাকলেও নিজ কল্পনার আলো নিভিয়ে দিয়ে মধ্যযুগের রসিক মহাকবির কল্পনার আলোয় নিজমনকে উদ্ভাসিত করে সেই মহাকবির বর্ষাকাব্যের রস এইভাবে উপভোগ করেছেন, এযুগের বিশ্বকবি।

শুধু তাই নয়, বর্ষার দিনে যখন কবির মন ভাব-কল্পনামুক্ত হয়ে থাকতো, বর্ষার প্রভাবে যেন তাঁর কণ্ঠে তখন জেগে উঠতো বর্ষাগান। তাই, তিনি এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন,—"এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে..."

এ সম্বন্ধে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি একসময়ে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন—"আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণে জগতে আর যত কিছু কথা আছে সমস্তকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে।......প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকেন তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকে জাগিয়ে তোলে।...আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি-তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথাই নাই।"

কবির নির্দেশে সেই বর্ষণমুখর শ্রাবণসন্ধ্যার অন্ধকার আরও মুখর হয়ে উঠলো মানবের কণ্ঠনিঃসৃত বর্ষাসংগীতের মূর্ছনায়। বারিধারা বর্ষণের ঝর ঝর শব্দের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো সুর-তাল-লয়সমন্বিত কণ্ঠসংগীত (কবিরচিত)—

"এসো হে এসো, সজলঘন,
বাদল বরিষণে—
বিপুল তব শ্যামলস্নেহে
এসো হে এ জীবনে।

* * *

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগের আতিশয্যে তিনি যখন আবার ভাবসমাহিত হয়েছেন তখন তিনি অনুভব করেছেন, বর্ষাপ্রকৃতির দিকে দিকে নানাভাবে নানারূপে বিরাজ করছে জীবনধারার লক্ষণ। তাই তিনি তাকে জানিয়েছেন অন্তরের আহ্বান, অরূপের মাঝে দেখেছেন তার অপরূপ রূপ, উপলব্ধি করেছেন তার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আর শুনতেও পেয়েছেন তার মর্মবাণী। এইরূপ ভাবসমাহিত অবস্থায় তিনি শুনতে থাকেন—(কবির উক্তিতে)

"শ্রাবণ-বরিষণ পার হয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখিজলে ব'য়ে ব'য়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।"

কেয়া বকুল প্রভৃতি বর্ষাকুসুমের সুবাস, আকাশ থেকে ঝর ঝর করে পড়া জলধারার দৃশ্য, এসব যেন প্রকৃতির ভাষা হয়ে কবিমনে ধরা দিয়েছে। কিন্তু সে ভাষা তো কবি বোঝেন না। সে শুধু কবিমনে সাড়াই জাগিয়েছে। তাই তিনি ভাবেন—"কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে", কী সে বলতে চাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কবির এই কথা—"আজ (ঘনবর্ষার শ্রাবণসন্ধ্যায়) বোবা সন্ধ্যা-প্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে। আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠছে—সেও একটা কিছু বলতে চাচ্ছে।"

আবার একসময়ে বর্ষার এক পরিবেশ তাঁর মনে এনে দিল ভাবান্তর। এই অবস্থায় তিনি হয়ে পড়লেন উন্মনা। তখন তাঁর স্বাধীন চিত্ত যেন জেগে উঠলো, সংসারের আবেষ্টনের মধ্যে আর সে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইলো না, সে মুক্ত হয়ে মিশে যেতে চাইলে বর্ষাপ্রকৃতির আকাশে

বাতাসে। উন্মনাকবির কণ্ঠ থেকে এখন ভেসে এলো এই গান—

"চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে।
কোথায় ছুটে চলেছে সে, কোথায় কে জানে।
* * *
পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো যে অঙ্গ আমার জড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি' হলো আমার সাথের সাথী,
অট্টহাসে যায় কোথা সে, বারণ না মানে।"

বর্ষাপ্রকৃতির আকাশে সবেগে ভাসমান নিরুদ্দেশের যাত্রী মুক্ত মেঘের দল, সর্পিল-গতিতে সঞ্চরমান চঞ্চলা চপলা, বাধনহারা বেগবান ঝড়ো হাওয়া—এই সব বর্ষার সাঙ্গো-পাঙ্গ কবির মনে জাগিয়ে দিয়েছে মুক্তির আনন্দ। কবি উপলব্ধি করেছেন (তাঁরই কথায় প্রকাশ)—"মুক্তির উদ্বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে।" শ্রাবণের সেই মুক্তির উদ্বেগ কবির মনেও গভীরভাবে দোলা দিয়েছে।

তাই তাঁর মনেও জেগেছে মুক্তির উদ্বেগ। সেই জন্য যখন তিনি বর্ষার আকাশে দেখতে পেয়েছেন,—(কবির কথায়) "পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে" তখন তাঁর স্বাধীন চিত্ত বলে উঠেছে—"মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।"

কবির উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে শুধু কবির মুক্তির উদ্বেগের কথা প্রকাশ পায়নি, এর সঙ্গে আরও প্রকাশ পেয়েছে—বর্ষাপ্রকৃতির লীলা সঙ্গী হবার তাঁর প্রবল আকুতি। বৈশিষ্ট্যময় কবির অন্তরে সুপ্ত হয়ে থাকে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একান্ত একাত্মতাবোধ। কবির অন্তরের এই ভাব কবিকল্পনাপ্রসূত নয়, তা তাঁর দার্শনিক মনের একান্ত অনুভূতি। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর মন্তব্য লিখে জানিয়েছেন —"আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে।... .. সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো।"

প্রকৃতির পরিবেশকে কেন্দ্র করে কবির ভাব-আবেগ-কল্পনা শুধু ভাবরসের মধ্যে ডুবে থাকে নাই, প্রকৃতির ভিতর ও বাহিরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের তাঁর যে দার্শনিক তত্ত্ব, তার ব্যাখ্যার মধ্যেও হয়েছে তাদের প্রকাশ। বর্ষার বহিঃপ্রকাশের মাঝে কখনও কখনও দেখা যায়, তার কঠোরতা, উন্মত্ততা ও বিভীষিকা। কিন্তু কবির দার্শনিক দৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতির এই বাহ্যিক রূপ একমাত্র রূপ নয়। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই প্রকৃতির অন্তর্লোকে সন্ধান পেয়েছেন আনন্দরসের ফল্গুধারার উৎস, পেয়েছেন মুক্তির আস্বাদ, আর দেখেছেন শান্তির আলো। তাই বর্ষার মধ্যে তিনি দেখেছেন কঠোরতার সঙ্গে মাধুর্যের মিলন। বর্ষাপ্রকৃতির এইরূপ বৈপরীত্যের উল্লেখ করেছেন—তিনি এই সংগীতে—

"বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা॥
তোমার মন্ত্র বলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে—
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা॥
* * *
সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী বন্যা মরণ ঢালা॥"

কবিদৃষ্টিতে বর্ষা প্রকৃতির মধ্যে সহ-অবস্থান করছে কঠোরের সঙ্গে মধুর। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর শেষ বর্ষণ নাট্যকাব্যের নটরাজের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁরই মনের কথা—"মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন।" কবির মতে এইরূপ মিলনই হয়েছে লীলাময়ী বর্ষাপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে।

চর্মচক্ষের দৃষ্টি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে বিচার করলে উপরি উক্ত বর্ষার কার্যকরণ ও কার্যকারণের ব্যাপার জানাও বোঝা যায়। কিন্তু দৃষ্টির যে আর এক দিক আছে, যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় অতীন্দ্রিয় অন্তর্জগতে যেদিকে জড়বিজ্ঞান অচল, যেদিকে বিচারের প্রয়োজন হয় না, যেদিকে আছে হৃদয়াবেগের অনুপ্রেরণা, সেখানে প্রয়োজন হয় অনুভবশক্তির। এই দিকের কথা উত্থাপন করে কবি এক 'শ্রাবণ সন্ধ্যায়' এক জনসমাবেশে বললেন, "আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও! * বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটা বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা ঘরের

কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্য-কারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে!

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় প্রকৃতির লীলা ধরা দেয় দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধরূপে। বাইরের দিক থেকে বজ্রকে তিনি মন্তব্য করলেন, "বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে/ অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে॥" কিন্তু মনের গভীরে নেমে এসে সেই বজ্রগর্জনের মধ্যে তিনিই আবার শুনতে থাকেন,—(কবির এক সংগীতে প্রকাশ)

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।"

এই একই প্রসঙ্গে কবি বলতে থাকেন—"এইটেই বড় আশ্চর্য ঠেকে, একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের ও মুক্তির; একই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের ও আনন্দের; বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি।"

দুই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কবি দেখেছেন বর্ষাপ্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত। এই সম্বন্ধে তিনি এক উদাহরণ দিয়ে বললেন, "প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা (ফুল) কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনাবার চিহ্ন, মানুষের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনাপ্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালীতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।"

কবির মতে, সুন্দর সুরভিময় ফুলের আছে দুই সুর, এক সুরে সে মধুকরকে কার্যোদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়। এই সুরে আছে বাস্তব মাদকতা আর এক সুরে সৌন্দর্যরসিকের মনে আনন্দের সাড়া তোলে। সেই সুরে আছে অলৌকিক বিহ্বলতা। তেমনি করে ধরার বুকে বর্ষা নেমে এসে তার বাস্তব লীলায় মত্ত থেকে মানুষের বাস্তব দৃষ্টিকে সজাগ ও সচকিত করে তোলে, আর অপর দিকে সেই বর্ষা কবির হৃদয়ে নেমে এসে তার অন্তরকে দোলা দিয়ে নানাভাবরসে সিক্ত করে দেয়, আর প্রেমের চিঠিও নিয়ে আসে।

বর্ষা যে প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে, সে প্রেম মানবিক ও ঐশ্বরিক। একথা কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যে গানে ও কথায়। এ সম্বন্ধে মানবিক প্রেমের যে কথা আগেই উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে তা মিলন মূলক। সেখানে সহচর তার সহচরীকে ডেকে বলতে পারে, "জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না।" কিংবা, সে সুযোগ পেতে পাবে এই আশায়—"এমন দিনে তা'রে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।" কিন্তু যেখানে (কবির উক্তিতে) "প্রেম আপনার নাহি পায় পথ" সেখানে মিলন অভিসার অসম্ভব। তাই, সেখানে প্রেমিকের উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে মনোরথ"। এইখানে বর্ষা প্রেমের চিঠি দিয়ে শুধু বিরহ-বেদনাকেই জাগিয়ে তোলে। তাই, কবির কথায়, "শ্রাবণের বরিষায়, উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।"

'বর্ষাকালের বিরহ' সম্বন্ধে কবির তত্ত্বকথা প্রণিধান-যোগ্য। এই তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন 'বসন্ত ও বর্ষা'র বিরহের পার্থক্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে। এইপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "বর্ষায় আমাদের মনের চারিদিকে বৃষ্টি জলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। মন চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যবনিকার মধ্যে চাঁদোয়ার তলে একত্র হয়।······বর্ষার বজ্রসংগীতে আমাদের মনকে মনের মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ষাকালে 'আমি' গাঢ়তর হয়।··· চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার করিয়াছে; কাহাকেও পাইবার নাই, কিছুই দেখিবার নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ সঙ্গীহীন 'আমি'র পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই বর্ষাকালের বিরহ। ···· এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের ফুল দিয়া গঠিত, আষাঢ়ের বৃষ্টিধারা দিয়া নহে······বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে।"

যে বর্ষা মানুষের মনে জাগিয়ে দেয় বিরহবেদনা, কবির কল্পনায় সেই বর্ষারই আকাশে বাতাসেও যেন ফুটে উঠে বিরহবেদনার রূপ ও সুর। তাঁর 'শেষ-বর্ষণ' এর নটরাজের মুখ দিয়ে কবি ব্যক্ত করলেন সেই কথা—"বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়ালো ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল····· "

কবির এই তত্ত্বকথার বর্ষার বিরহী তার বিরহ কাতর

বিষাদাচ্ছন্ন দেহ মনের সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পেলে বর্ষার জলভারাক্রান্ত মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন সজল পরিবেশ আর হুহু রবে প্রবাহিত অশান্ত বাতাসের মধ্যে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে, বর্ষাকাব্য 'মেঘদুতের' সুদূর প্রবাসী বিরহী যক্ষরাজের মত এই বর্ষাকালের বিরহীদের মন যে উচাটন হয়ে উঠে। সেই বিরহীদের মর্মবেদনা কবিও তাঁর নিজের অন্তরে অনুভব করেছেন। তাঁর এই অনুভূতি ফুটে উঠেছে তাঁর এই সংগীতে—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে॥
ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণপুটে কোনখানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা জেগে উঠে হৃদয় কোণে॥"

আবার যখন কবির হৃদয়াকাশে গেরুয়ারঙের আলোর আবির্ভাব হয়েছে, তখন তিনি ভিন্ন সুরে বলেছেন বর্ষালীলার কথা। শ্রাবণ সন্ধ্যায় তিনি সেই সুরে সেকথা বলে চলেছেন,—"আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই; সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত।"

বাইরের প্রকৃতির মেঘগর্জনধ্বনি কবির সেই দরবারে মেঘমল্লারের সুরে গাওয়া করুণ সংগীতধ্বনিতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। কবির মনে তখন যে অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে, তা তিনি ব্যক্ত করে বলতে লাগলেন,—"তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবল করুণ গান জেগে উঠছে—

'তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে, দিন রাতিয়া।'

এইবার কবির বর্ষাতত্ত্ব আরও গভীরে প্রবেশ করলো। বর্ষাকালের মানবিক প্রেমজাত বিরহকে আধ্যাত্মিকতার গেরুয়া রঙে রঙীন করে তুলে কবি উর্ধ্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভগবদ্‌বিরহরূপে। বিদ্যাপতির উপরোক্ত পদটিকে অবলম্বন করে শ্রাবণ-সন্ধ্যার ধারাবর্ষণের পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি শোনাতে লাগলেন তাঁর এই অধ্যাত্ম-বাণী,—"আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এই যে বর্ষা, এতো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়। এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। ......আমার সমস্ত আকাশ ঝর ঝর করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।'........সেই জন্যে 'হরিবিনে' কথাটিকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ।"

বর্ষার গর্জন বর্ষণ কবির ভাবসমুদ্র মন্থন করে ভগবৎ-প্রেমসুধায় ভরে দিয়েছে তাঁর হৃদয়ে। কবি উপলব্ধি করেছেন, এরাই, তো তাঁর হৃদয়ে পৌছে দেয় এই খবর, (কবির কথায় প্রকাশ) "আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি।"

এই সম্বন্ধে কবি বলে যাচ্ছেন,—"খবর আমাদের দেয় কে? ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারে কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মত কাজ করে যাচ্ছে—তারাই।"

বিজ্ঞানবিদদের কাছে বর্ষার গর্জন-বর্ষণ প্রকৃতির ঘরে পায়ে শিকল বাধা শ্রমিক কয়েদী রূপে বিবেচিত হয় কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিক ভাববিহ্বল কবির কাছে তারাই হয়ে দাঁড়ায় অধ্যাত্ম-বাণী বাহক দেবদূত। তাই, যখন বর্ষা নামে মেঘগর্জনে ও অবিরল অজস্র ধারা বর্ষণ শব্দে, কবির মতে বিজ্ঞানবিদেরা যাকে ভাবে উপরোক্ত কয়েদীদের পায়ের শৃঙ্খলশব্দ, তখন কবির হৃদয়ে সেই শব্দ জাগিয়ে দেয় এক অভিনব অনুভূতি। সেই অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে তিনি বলে চলেছেন,—"যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে, অমনি দেখতে পাই, এ-যে মিলনের আহ্বান সংগীত।"

যেন, ভগবানের প্রেরিত বর্ষাদূত কবির অন্তরের দুয়ারে আঘাত করলো। কিন্তু বর্ষার এই বিরহের বেদনাগান ও মিলনের আহ্বান সংগীতের মধ্যদিয়ে কবির অন্তরে বর্ষা কি জানাচ্ছে? কবি সেই কথাই ব্যক্ত করে বললেন, "প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে তুই-যে বিরহিণী—তুই বেঁচে আছিস্ কী করে! তোর দিনরাত্রি

কেমন করে কাটছে! সেই চিরদিন রাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ।' সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।......এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরিবিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।''

এখন সাধারণ লোকের মনে হয় তো কতকগুলি প্রশ্ন জাগতে পারে—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি কি কবিত্বের উচ্ছ্বাস, কবিকল্পনার নিছক নিদর্শন দর্শনভিত্তিক ব্যাখ্যা, না আন্তরিক উপলব্ধির পরিস্ফুটন! এর উত্তর পেতে হলে জানতে হবে, তাঁর এই উক্তিগুলি ব্যক্ত হয়েছে কোথায় তাঁর কোন পত্রে, প্রবন্ধে বা জনসভায় বক্তৃতারূপে তা প্রকাশ পায় নাই, ঐ কথাগুলি আচার্যের বাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের মুখনিঃসৃত হয়েছে মন্দিরে উপাসনাস্থলে। সেখানে তিনি বিশ্বকবি-রবীন্দ্রনাথ নন, সেখানে মানুষের মনোরাজ্যের গুরু আচার্য, এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় ধারাবর্ষণের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ। তাই, সেখানে তিনি কবিত্ব করেন নাই অন্তরের উপলব্ধ ভাবধারাকে বাণীরূপে শুনিয়েছেন মানব সমাজকে।

বর্ষার প্রভাব কবিমনে জাগিয়ে দিয়েছে বৈষ্ণবভাব, তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির পদকয়টি তার মনে গভীর রেখাপাত করলো বর্ষাদিনে বৈষ্ণবভাব তিনি অন্তরে পোষণ করতেন; এর নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাঁর অধ্যাত্মপূর্ণ বহু কথায়, কবিতায় ও সংগীতে। এই ভাব অন্তরে উপলব্ধি করেছেন বলেই তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হতে পেরেছে 'ভানুসিংহের পদাবলী', যা ভাবে, ভাষায়, ছন্দে সুরে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।

অধ্যাত্মপ্রভাবে আচ্ছন্ন কবির হৃদয়ে যে বর্ষা জানিয়ে দিল এই অধ্যাত্মবাণী—'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া', সেই বর্ষাকেই আবার তিনি দেখলেন অধ্যাত্মভাবাপন্ন উদাসী বাউলরূপে যে বাউল নূপুর পায়ে একতারা হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে উদাসী হয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেড়িয়ে পড়ে তার 'মনের মানুষ'কে মনের মধ্যে পাবার আশায়। কবির 'শেষবর্ষণ' নাট্যকাব্যের নটরাজের মুখে শুনি কবিকল্পিত বাউলরূপী বর্ষার বর্ণনা,—"আলথাল তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হলো। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।" তাঁর এই ভাবকে অবলম্বন করে লিখলেন তিনি এই গান—

"বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
কেঁদে কেঁদে হলো সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর
নূপুর মধুর বাজে।
ঘরছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়াই ঘুরে—
পুবে হাওয়া গৃহহারা॥"

* * *

এইভাবে বর্ষা যেন তার যাদুদণ্ডের স্পর্শে নানাভাবে নানারূপে কবিমনকে করেছিল উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হিল্লোলিত সমাহিত। কবিমনে দিয়েছে কত কাব্যপ্রেরণা, ভাবপ্রেরণা ও অধ্যাত্মপ্রেরণা। কবিও নানাভাবরঙে রঙীন কাব্যগুচ্ছ দিয়ে সাজিয়ে গেছেন তাঁর বর্ষাকাব্যের ডালি, ধর্মভাব জাগানো অধ্যাত্ম-বাণীর মন্ত্র দিয়ে পবিত্র করে গেছেন বর্ষাপ্রকৃতির পরিবেশকে।

সাধারণ মন নিয়ে লেখা তাঁর বর্ষাকাব্য হয়ে উঠেছে মানবধর্মী। এই শ্রেণীর কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় মানবজীবনের সকল বয়সের ভাববৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনা।—শৈশবের সারল্য, তরুণের তারল্য, যৌবনের প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রাবীণ্যের প্রশান্তি। আবার প্রকৃতিবাদী হিসাবে যখন তিনি বর্ষাকাব্য লিখেছেন তখন তা হয়ে উঠেছে প্রকৃতিপ্রেমমূলক। এই ধরণের কাব্যে ছন্দে-শব্দে-ভাবে-ভাষায় ভূষিত হয়ে ফুটে উঠেছে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনা ও তার স্তুতিকথা, তাতে প্রকাশ পেয়েছে, বর্ষাপ্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মবোধের প্রগাঢ়তা আর তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিশিয়ে দেবার তাঁর ঐকান্তিকতা। আবার দার্শনিক ব্রহ্মবাদী হিসাবে যে বর্ষাকাব্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই কাব্যসমূহের ভাবধারা কবির নিজ জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য [illegible]

অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে কবির অধ্যাত্ম চিন্তার গভীরতা।

এমনিভাবে বর্ষাপ্রকৃতি নানাভাবে নানাছন্দে লীলা করে গেল কবিমনে, নানারূপ মায়ার প্রভাবে সে ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিবাহিত করে গেল তার চিন্তা-কল্পনা-ভাবধারাকে। তারপর প্রকৃতির বুকে, তথা কবির হৃদয়ে তার লীলা সাঙ্গ করবার সময় হয়ে আসে। যখন (কবির ছন্দায়িত কথায়) "বাদলধারা হলো সারা বাজে বিদায়সুর," যখন কবি দেখলেন (তাঁর উক্তিতে)

"আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা।—
আজি মেঘ বয পরিক্ত
নিঃশেষ বিত্ত,—
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা।"

তখন তিনি বর্ষার অবদানের কথা উল্লেখ করে বললেন, "...জানি, রেখে গেল তার দান বনের মর্মের মাঝে ; দিয়ে গেল অভিষেক স্নান সুপ্রসন্ন আলোকেরে,...... ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল।"

বর্ষা করলো অন্তর্ধান কিন্তু কবির মন হতে তার স্মৃতি একেবারে মুছে গেল না। তার সত্তাকে যেন তিনি দেখতে পেলেন তার অনুগামী শরতের আলোর সঙ্গে মিশে থাকতে। তাঁর 'শেষ বর্ষণ' এর নটরাজের মুখ দিয়ে তিনি তারই মনের ঐরূপ ভাবের কথা প্রকাশ করলেন, "শরতের আলো আসবে ওর (বর্ষার) সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।"

কবি আগত শরতের পটভূমিকায় বর্ষাকে আবার যেন দেখলেন নতুন সাজে। এইকথা তিনি পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করলেন তাঁর এক কবিতায় যেখানে শরৎপ্রকৃতিকে প্রধান ভূমিকায় নামিয়ে তিনি তাকে দিয়ে বললেন,—

"শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশমাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।"

এমনি করে কবির ভাবজগতের বর্ষা তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে শরতের মাঝে মিশে গেল।

ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির বুকে একে একে এসেছে আর সব ঋতু তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যময় সাজসজ্জা ও প্রভাব বিস্তারের উপকরণ নিয়ে, কবির অন্তরেও তারা করে গেছে ন্যূনাধিক রখাপাত। তাই, কবিও তাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে মর্যাদা দিয়েছেন কাব্য-অর্ঘ্যের ডালি দিয়ে। তারা সব একে একে চলে যায়, কবির অন্তরে রেখে যায় স্মৃতিচিহ্ন। তারপর, আবার আসে আষাঢ় নববর্ষাকে সঙ্গে করে নবজলধরশ্যামসমারোহ নিয়ে। কবির চোখে আবার সে পরিয়ে দেয় তার মেদুর মেঘের মায়াঞ্জন। কবির হৃদয় আবার দুলে উঠে, তাঁর অন্তর পুলকে হয়ে পড়ে রোমাঞ্চিত, আর তাঁর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে সুমধুর গান —

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে॥
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে॥"

কাল-পরশু

(নাটক)

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য

প্রথম অঙ্ক

[পুরীর সমুদ্রতীরে একটি হোটেল। দোতলার করিডোর থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যায়। আড়া আড়ি দু'টো করিডোরের সঙ্গমস্থলে কয়েকখানি বেতের চেয়ার ও মাঝে টেবিল। পিছনে সমুদ্র দেখা যায়, পাশে দু'তিনটে ঘর, তাতে তালা দেওয়া। বাইরে সমুদ্রে বৃষ্টি হ'চ্ছে-দূরাগত মেঘের শব্দ ও তার সঙ্গে সমুদ্রে বিদ্যুৎ চমক। ভিজে অবস্থায় লতিকা ও সুবীরের প্রবেশ।]

লতিকা। একশ' বার তোমাকে বললাম, বর্ষাকালে পুরীতে এসে দরকার নেই। তা শুনলে না, এখন ভিজে পুড়ে একাকার—

সুবীর। এই উন্মুক্ত সমুদ্র সৈকতে তোমার সঙ্গে ভিজে ভিজে ছোটা,—কি আনন্দের ব্যাপার বলত? কি রোমাণ্টিক,—ভেবে দেখেছ লতা?

লতিকা। সারাজীবন এই রকম ভেজাবে আর ছোটাবে, এই জন্যেই বিয়ে করেছ বুঝি?

সুবীর। তা কেন? দুজনে একসঙ্গে ভিজবো, এক সঙ্গে রোদ পোহাবো, এক সঙ্গে আনন্দ করবো—ইত্যাদি ইত্যাদি—

লতিকা। সুবীর থাক্। এখন কাপড় জমা ছাড়বে না কি?

সুবীর। তুমি ছেড়ে ফেল। শীত শীত করছে, একটু চার ব্যবস্থা করি। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতই হয়েছে।

[সুবীর কলিং বেল টিপল, লতিকা ঘরের তালা খুলে ভিতরে গেল। হোটেলের চাকর গোপাল প্রবেশ করল]

শুন গোপাল, দেখো ভিজি কিড়ি একেবারে গোবর হই গেলানি। গরম গরম চা লাগিব। জলদি চা আনিকিড়ি এয়াড়ে টেবিলরে রাখিবু। পারিবি ত?

গোপাল। হ বাবু। পারিবি না কাঁই? আহুচি

[গোপালের প্রস্থান। সুবীর রুমাল দিয়ে মাথা মুছছে]

[লতিকা কাপড় ছেড়ে এল]

লতিকা। সুবীর, এখন তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে ফেল। বিদেশে শেষে একটা কেলেঙ্কারী করবে?

সুবীর। আচ্ছা তুমি ঐ লোকটাকে লক্ষ্য করেছ? বীচে হঠাৎ বৃষ্টি আসায়, আমরা সকলেত হুটোহুটি করে ছুটলাম কিন্তু ঐ লোকটা একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল—ভিজলো। সমুদ্রের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে আছে—এত ঝড়বৃষ্টি, এসব তার গ্রাহ্যই নেই। লোকটাকে তুমি লক্ষ্য করেছ?

লতিকা। হ্যাঁ, করেছি। কত রকমের কত পাগল জগতে আছে। যাক, সুবীর এখন জামা কাপড় ছাড়বে, না বিদেশে ফ্লু বাধিয়ে আমাকে নাকাল করবে?

সুবীর। এই-ত যাচ্ছি,—বাবা! এই দশদিন বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই শাসন তর্জন শুরু করলে?

লতিকা। তোমার মত বে-হিসেবী লোককে কড়া শাসনেই রাখতে হবে দেখছি। যাও বলছি—

সুবীর। যাচ্ছি। [সুবীর ঘরে কাপড় ছাড়তে গেল, গোপাল চা নিয়ে এল]

গোপাল। মেম সাহেব। এয়াড়ে চা রাখুচি, সায়েব কোথাকে গেলানি?

লতিকা। আসছে,—এখুনি আসবে। এখানে রেখে যাও—[গোপাল চলে গেল, সুবীর এল]

সুবীর। [চেয়ারে বসে] আমি ভাবছি লোকটা কি রকম! এই বৃষ্টিতেও বসে বসে ভিজছে। আরে! একটু ছুটোছুটি করে একটা আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবি ত!

লতিকা। তার আশ্রয়ের দরকার নেই হয়ত! আর তোমার মত হৈ হুল্লোড় সকলে ত ভাল বাসে না।

সুবীর। [চা খেয়ে] বুঝেছি। লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক। হ্যাঁ ঠিক মিলেছে,—তুমি যখন আমার কথার পরিষ্কার জবাব দিতে না, তখন আমি ঐ রকম মাথায় হাত দিয়ে গড়ের মাঠে বসে তারা গুণতাম।

লতিকা। কই, সে কথা ত বলনি। বললে, অনেক আগেই আমি হয়ত রাজি হয়ে যেতাম। তা এ রকম তারা কতদিন গুণেছ?

সুবীর। তা যখন থেকে তোমাকে দেখেছি তখন থেকেই—

লতিকা। লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক না হয়ে, কবি-টবিও হতে পারে, দার্শনিকও হতে পারে।

সুবীর। ও আমি জানি, কবি হলেই তার বড্ড ভয় সর্দিজ্বরে, অতএব কবিরা কখনই জলে ভেজেনা। সাহিত্যিকদেরও খুব ভূতের ভয়। তারা কিছুতেই একা থাকে না। ও নিশ্চয়ই ব্যর্থ প্রেমিক—

লতিকা। দার্শনিকও ত হতে পারে!

সুবীর। লতু, তুমি জগতের কিছু জানো না। দার্শনিক হলে ও বৃষ্টি থেকে বাঁচতে নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলে ডুব দিত। [ওরা হাসল। একটা লোক সর্বাঙ্গ ভিজে অবস্থায় করিডোর দিয়ে গিয়ে ঘরের তালা খুলে ভিতরে গেল, আলো জ্বলল]

আরে এই ত সেই লোকটা! ওই ঘরেত বোর্ডার ছিল না,—এসেই গেছে সমুদ্রের ধারে। লোকটা ত বাঙালীই মনে হয়।

লতিকা। হবে। বাঙালীর মধ্যেই ত ব্যর্থপ্রেমিকের সংখ্যা বেশী।

সুবীর। তা সত্যিই! ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের বইতে একথা লেখাও আছে। তা তোমাদের মত মেয়ে যেদেশে বেশী, সে দেশে ব্যর্থপ্রেমিক ও আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়বেই।

লতিকা। তার মানে?

সুবীর। তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ এই যে দশদিন পূর্বে তুমি আমার সঙ্গে যদি বিবাহ রেজেষ্ট্রি আফিসে না যেতে তবে আমিও ব্যর্থপ্রেমিক হতাম, বা আত্মহত্যাও করতে পারতাম।

সুবীর। তা জানিনা, তবে চেষ্টাত নিশ্চয়ই করতাম। দেখি লোকটাকে দেখে আসি, আলাপটা জমাই। আড্ডা না হলে আমায় ভাল লাগে না। দেখি ব্যর্থপ্রেমিক না কি?

লতিকা। কেন আবার ওকে ঘাটাতে যাবে? ভদ্রলোক বিরক্ত হতে পারেন। কতরকম লোক আছে।

সুবীর। আরে! সেইজেই ত জগতে বড় দেখবার বস্তু। [সুবীর উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের দরজায় কড়া নাড়ল। ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন]

আপনি কলকাতা থেকে আসছেন?

দীপক। হ্যাঁ।

সুবীর। আজই?

দীপক। হুঁ।

সুবীর। আসুন, আসুন, আলাপ করে নি। বিদেশে বাঙালী—বাংলা ধুলপরিমাণ। একসঙ্গে আড্ডা না দিলে পুরীতে আমাইত বুঝ।—আসুন—

দীপক। চলুন। [দীপক এসে একখানা চেয়ারে বসে, লতিকার দিকে চাইল। উভয়েই চেয়ে থেকে যেন কেমন একটা চমকে ওঠার মত করল। লতিকা মাথায় কাপড় তুলে দিল।

সুবীর। পরিচয় করিয়ে দি। আমার নাম সুবীর মিত্র, ইনি মিসেস মিত্র মানে লতিকা মিত্র।

দীপক। মানে?

সুবীর। মানে আমার স্ত্রী।

দীপক। ও আপনারা স্বামী স্ত্রী! আমার নাম দীপক লাহিড়ী।

সুবীর। হ্যাঁ, দীপকবাবু আপনি এই বর্ষাকালে পুরী বেড়াতে এলেন?

দীপক। সেটা ত গহিত কাজ হয়েছেই কিন্তু আমিত এসেছি একা। আপনারা দু'জনে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজতে এলেন কেন? আর ভিজবার ভয়ে ছুটোছুটোই বা করলেন কেন?

সুবীর। এই দিনদশেক হল আমাদের শুভ-পরিণয়, অর্থাৎ বিয়ে হয়েছে। কোথায় যাই, কোথায় যাই, হঠাৎ পুরীতেই চলে এলাম। এই উদার সমুদ্র আমার ভাল লাগে।

নে মধুচন্দ্রিমায় বেরিয়েছেন, তাই ভিজে পড়ে ছুটোছুটিতেও উল্লাস। হ্যাঁ, তা আপনিই ওঁকে বিয়ে করেছেন না নই আপনাকে বিয়ে করেছেন ?

সুবীর। তাইত, এটা একটা বিরাট জিজ্ঞাসা! হ্যাঁ তিকা, সত্যিই, তুমিই আমাকে বিয়ে করেছ না, আমিই মাকে বিয়ে করেছি!

[লতিকা একটা অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটি করে অন্যদিকে চেয়ে ল]

দীপক। যাক, সে ঝগড়ার দরকার নেই। মোটের র বিয়ে হ'য়েছে—এইটেই বেশ।

সুবীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বেশ। বিয়েটা সত্যিই হয় —র এ্যাকসিডেন্টের মত হয়,—কেউ ইচ্ছে করে না, ও হয়।

দীপক। ঠিক বলেছেন। সকলেই ভীড়ের মাঝে গা য়ে চলতে চায়, তার পরে হঠাৎ এ্যাকসিডেন্ট হয়ে । তারপরে দু'জনেই চেয়ে দেখে দু'জনেই মারা গেছে।

সুবীর। [হেসে] হাঁা ঠিক যা বলেছি। নিশ্চয়ই শনিক নইলে এমন কথা বেরোয়? এখন আমাদের প্রশ্ন, আমরা যখন বৃষ্টিতে ভিজবো বলে ছুটোছুটি করছি তখন শ্চেষ্ট ভাবে আপনি বসে ভিজলেন কেন?

দীপক। আমাদের প্রশ্ন! মানে?

লতিকা। [ঝাঁঝিয়ে উঠে] আমার কোন প্রশ্ন নেই। াকলে আমিই বলতে পারতাম।

সুবীর। যাক—ধরুন ওটা আমারই প্রশ্ন।

দীপক। গল্পটি হয়ত জানেন—একটা লোক ব্যবসায় লাখটাকা লোকসান দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল আর একটা লোক লটারীতে একলাখ টাকা পেয়ে হাসতে হাসতেই মরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করলে—you see, the result is the same.—অর্থাৎ ফল একই। আপনাকে ছুটোছুটি করেও কাপড় ছাড়তে হয়েছে, আমি বসে থেকেও তাই—result is the same.

[সকলের হাসি]

সুবীর। ফাইন! ফাইন! সুন্দর কথা—দার্শনিক না হয়ে যায়!

লতিকা। বৃষ্টির ভয়েত সমুদ্রজলে ডোবেন নি,—তবে

[বাইরে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হল, বিদ্যুৎ হানল, সকলে চেয়ে দেখল]

সুবীর। এমন দিনে তারে বলা যায়. এমন ঘনঘোর বরিষায়,—মুড়ি তেলেভাজা বিনে প্রাণ যায়। আপনারা বসুন,—চালান আড্ডা। আমি ঝালমুড়ি তেলে ভাজা নিয়ে আসি। এমন দিনে খবরের কাগজ পেতে মসলামুড়ি ভাজা আর চা না খেলে, বাদল দিনই মাটি। [প্রস্থানোদ্যত]

দীপক। দাঁড়ান দাঁড়ান—চাকরকে বললেই হবে, আপনি যাবেন কেন?

সুবীর। না, নিজেই যাবো। [প্রস্থান]

[লতিকা ও দীপক অর্থব্যঞ্জক ভাবে উভয়ের দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল—কি যেন ভাবল লতিকা]

লতিকা। আজ অবশ্য অধিকার নেই,—ছিলও না হয়ত কোন দিন। তবুও একটা অনুরোধ করি, রাখবে?

দীপক। নিশ্চয়ই রাখবো।

লতিকা। কথাটা না জেনেই যে কথা দিলে?

দীপক। কথাটা কি তা আমি জানি। তাই নিঃসঙ্কোচে বললুম নিশ্চয়ই।

লতিকা। কি অনুরোধ তুমি বুঝলে?

দীপক। আমার সঙ্গে তোমার একদিন বিয়ে হয়েছিল, —আমি তোমার প্রথম পক্ষের স্বামী তথা সুবীরবাবুর সাংঘাতিক কুটুম্ব. সে কথাটা সুবীরবাবু জানতে না পান। এই ত? তাই কি না?

লতিকা। হুঁ।

দীপক। কথা দিচ্ছি,—সুবীরবাবু কখনও তা জানবেন না। কিন্তু তোমার এই পতি দেবতাটিত একেবারেই ছেলেমানুষ মনে হয়। তোমার থেকে কি বয়সে ছোট?

লতিকা। সম্ভবতঃ। কিন্তু এমন ভাবে ধরল, এমন সিন্‌সিয়ার

দীপক। আহা হা, এ ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাকে excuse দিচ্ছ কেন? দেবেই বা কেন? তবে ওকেই তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, না ওই তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, সেইটে জানতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য

* ইংরেজি কবিতা কাব্যরীতি মত উদ্ধৃতি নয়।

লতিকা। ও এমন ভাবে এসে পড়ল, এমন ভাবে জড়িয়ে নিল যে এড়াতে পারলাম না।

দীপক। [ব্যঙ্গস্বরে] তার মানে, তোমার মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, ও বিদ্যুৎ গতিতে এসে এ্যাকসিডেণ্ট করে তবে ছাড়লে—

লতিকা। অনেকটা তাই।

দীপক। মানুষে ভালবেসে বিয়ে করে, তাও টেকেনা, বিচ্ছেদ হয়। আমাদের যেমন হল। আর তুমি না ভালবেসেই, এড়াতে না পেরে বিয়ে করলে, এটা কি ভাল হল? তুমি সুখী হও তাই-ই আমি চাই, কিন্তু—

লতিকা। আমার জন্যে নয়—ও সুখী হবে এই ভেবে। আমাকে নিয়ে যদি একটা লোক সুখী হয়—[সোল্লাসে সুবীরের প্রবেশ। মুড়ি তেলেভাজা টেবিলে রেখে]

সুবীর। এই নিন। সার্থক হবে বাদল-সন্ধ্যা। উঃ আপনি যদি সস্ত্রীক আসতেন কি আনন্দই না হত! আপনি একলা এলেন কেন? তাঁকে নিয়ে এলেই হত।

দীপক। যেহেতু তিনি নেই তাই আনা হল না।

সুবীর। তার মানে আপনি ব্যাচেলর। এতটা বয়স হল একটা বিয়ে করতে পারলেন না? ছোঃ, বিয়ে করতে ভয় করে বুঝি? নিন, ভাজা আর মুড়ি চলুক। শ্রীমান গোপাল চা নিয়ে আসবে। সত্যিই বিয়ে করেন নি?

দীপক। হ্যাঁ বিয়ে করেছিলাম, তবে তা টেকেনি।

সুবীর। মানে? তার মানে?

দীপক। আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম তিনি আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। [গোপাল চা দিয়ে গেল]

লতিকা। তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছেন না, আপনিই তাকে ত্যাগ করেছেন? মেয়েরা ত' সহসা স্বামী ত্যাগ করে না।

দীপক। আগে হয়ত করত না—এখন করে। হিন্দু বিয়েতেই ডাইভোর্স হচ্ছে অবিরাম।

সুবীর। তা আপনাদের কি হিন্দু ম্যারেজ না সিভিল ম্যারেজ ছিল—মানে লভ্ ম্যারেজ।

দীপক। লভ্ ম্যারেজ—সিভিল ম্যারেজ।

সুবীর। তা হলে ডাইভোর্স হবে কেন? যেখানে ভালবাসা আছে সত্যিকার প্রেম আছে—

দীপক। সত্যিকারের ভালবাসা থাকলেই বিচ্ছেদ হবে —তাই হয়—

সুবীর। তার মানে? আপনাদের বিচ্ছেদটা হল কেন? প্রেম ছিল বলেই? এটা ত ভয়াবহ—

দীপক। নতুন বিয়ে করেছেন—কিছু জানেন না। বিয়েটা হয় মোটর এ্যাক্সিডেণ্টের মত, আপনি যা বলেছেন তাই কিন্তু তার পরেরটুকু ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান ওয়ার—ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ—ভয়াল সংগ্রাম—

সুবীর। যুদ্ধ! দাম্পত্য জীবনটা একটা যুদ্ধ! বলেন কি?

দীপক। হ্যাঁ। স্ত্রী মনে করেন তিনি স্বামীটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবেন, স্বামী মনে করেন তিনি স্ত্রীকে গ্রাস করবেন। যেখানে একজন স্বেচ্ছায় সানন্দে "গ্রাসিত" হন সেখানে গোলমাল নেই কিন্তু যেখানে এমনটা হয় না সেখানেই খাওয়া-খায়ি। তার পরেই উভয় পক্ষ ক্লান্ত হয়ে দূরে সরে যায়।

লতিকা। এইটেই সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবন? তাই না?

দীপক। অবশ্যই!

সুবীর। ব্যাপারটা একটু সহজ সরল করে বলতে পারেন? অভিজ্ঞ লোকের কাছেই প্রথম পাঠ নেওয়া সঙ্গত,—কি বল লতিকা?

দীপক। সরল ব্যাপার হচ্ছে—যেখানে ভালবাসা আছে, অর্থাৎ কবিতার ভাষায় প্রেম আছে সেখানে মানুষ অনেক চায় কিন্তু ততখানি পায় না বলে দুঃখে ফিরে আসে।

সুবীর। আপনাদের ব্যাপারটাও তাই?

দীপক। সকলেরই তাই—আমারও তাই। আমি তার কাছে অনেক চেয়েছিলাম কিছু পাই নি। তিনিও হয়ত অনেক চেয়েছিলেন কিছু পান নি, তাই দু'জনেই দুঃখ পেয়ে হতাশায় বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছি—

সুবীর। তার মানে, আপনি এখনও তাকে ভালবাসেন আর তাই বসে বসে বৃষ্টিতে ভেজেন!

দীপক। শুধু তাই নয়। তিনি আজও আমাকে ভালবাসেন, এ কথা আমি জানি। তবু ভালবাসার জন্যেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। [লতিকার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়]

সুবীর। তা হলে লতিকাকে গভীরতরভাবে ভালবাসা আমার পক্ষে ভাল নয়?

দীপক। না, গভীরভাবে ভালবাসবেন না। আবছা আবছা ভাবে, অস্পষ্ট ভাবে ভালবাসবেন। তা হলেই দেখবেন দাম্পত্য জীবন রহস্যময় হয়ে সোনার শিকলে বাধা পড়েছে।

লতিকা। আপনি বিশ্বাস করেন আজও তিনি, অর্থাৎ স্ত্রী আপনাকে ভালবাসেন?

দীপক। হঁ্যা,—এ আমার স্থিরবিশ্বাস। যিনি আমার সন্তান ধারণ করেছেন তিনি আমাকে ভুলবেন কি করে? সে সন্তান বেঁচে থাকলে তিনি ছেড়ে যেতে পারতেন না। সন্তানকে ঘিরেই সহিষ্ণুতা আসতো—

সুবীর। আপনাদের সন্তান হয়ে বাঁচে নি? আহা— খুবই দুঃখের কথা। আপনি আর বিয়ে করেন নি? কতদিন আপনাদের ছাড়াছাড়ি—

দীপক। প্রায় দু'বছর হল। তারপরে পুনরায় বিয়ে করার কারণ ও সুযোগ হয় নি।

সুবীর। আবার বিয়ে করলে হয়ত সবই ভুলতে পারতেন।

দীপক। ভুলতে চাই নি বলেই বিয়ে করি নি।

লতিকা। ভুলতে চান না? কেন? সে কথা সযত্নে লালন করে লাভ কি?

দীপক। লাভ লোকসান ভেবে দেখি নি, তবে ভাল লাগে সে কথা সযত্নে লালন করতে এইটুকু জানি।

সুবীর। নাঃ দীপকবাবু, আড্ডাটা মাটি হতে চলেছে। ও সব দুঃখ বেদনার কথা থাক। নতুন করে জীবন উপভোগ করা যাক্। ও সব ধামাচাপা দিন। নতুন করে বিয়ে করে নতুন জীবন আরম্ভ করুন। আপনার কোন্ আপিস্? সেখানে মহিলা কর্মী নেই?

দীপক। অনেক আছে—

সুবীর। তবে আর ভাবনা কি? আমরাও ত একই আপিসে চাকুরী করতাম—এখনও করি। লতিকা কি আমাকে কম জ্বালিয়েছে? দু'টি বছর একনাগাড়ে পিছন পিছন ঘুরে তবুও আধখানি মন পেয়েছি—

লতিকা। আধখানি?

সুবীর। না—মানে, একটু বাদে সবখানি।

লতিকা। কোনটুকু বাদে?

সুবীর। বর্তমানে তোমার ওই মেঘে ঢাকা মুখখানি বাদে সবখানি। এ দু'বছর কি গম্ভীরই ছিলে!

দীপক। [পরিহাস করে] ওই জন্যেই ভয় হয়, বিয়েত করা যায় কিন্তু অধিবাস সামলানোই দায়।

সুবীর। তার মানে আবার কি?

দীপক। বাঘের বিয়ের গল্প জানেন না? শুনুন— এক বিপত্নীক বাঘ, ঘটক ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে বললে, একটা বাঘিনী দেখে দাও বিয়ে করব, নইলে তোমাকে খাবো। ঘটক ঠাকুর বললে—হঁ্যা কনে ঠিকই আছে, শনিবার বিয়ের দিন আছে দিয়ে হবে। বাঘ যথাসময়ে এলে ঘটক বলল,—বিয়েত করবে, অধিবাস করবে ত? বাঘ বললে, নিশ্চয়ই। ঘটক একটা বস্তা এনে বললে,—বেশ, তুমি এর মধ্যে ঢোকো, আমি অধিবাসের মন্ত্র পড়ি। বাঘ অধিবাসের বস্তায় ঢুকলে ঠাকুর বস্তার মুখ বেঁধে বাবলাকাঠের মুগুর দিয়ে একেবারে হাড়গোড় ভেঙ্গে তাকে খালের জলে ফেলে দিল। বাঘ ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছে,—এক বিধবা বাঘিনী তাকে খাদ্য মনে করে ডাঙ্গায় তুলল। তারপরে উভয়ের মিলন হল। কিছুদিন বাদে আর এক বিপত্নীক বাঘ এসে বললে,—বন্ধু, তোমার ত স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল তা আবার পরিবার পেলে কি করে? বিয়ে করলে কি করে? বাঘ বলল,—বিয়েত' ভাই করা যায় কিন্তু ওই অধিবাস সামলানোই দায়—[সকলের হাসি]

বুঝলেন সুবীরবাবু ওই অধিবাসের ভয়েই আর বিয়ের সখ নেই।

সুবীর। হঁ্যা, আমিও দু'বছর ধরে অধিবাস সামলে তার পরে দু'জনে পুরীতে এসেছি।

দীপক। আমিও চার বছর ধরে ওই মর্মান্তিক অধিবাস করে তবে বিয়ে করেছিলাম। [লতিকার প্রতি কটাক্ষ]

সুবীর। চার বছর এই অধিবাসের পর বিবাহিত জীবন ক'বছর?

দীপক। দু'বছর।

সুবীর। আমিত মাত্র দু'বছর অধিবাস করেছি,— তাহলে আমার কি হবে—?

লতিকা। তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে।

দীপক। না—না, দুঃখ দেবেন কেন? না হয় আরও কিছুকাল অধিবাসই চালিয়ে যান।

[হোটেলের ম্যানেজারবাবু, ভৃত্যগোপাল স্যুটকেশ হোল্ড অল নিয়ে পিছনের করিডোর দিয়ে এল। সঙ্গে এক তরুণ ও তরুণী আর একটি বছর ৬।৭ এর মেয়ে। ওদের গায়ে ওয়াটার প্রুফ]

ম্যানেজার। আসুন মিষ্টার বিশ্বাস,—এই ঘর আপনার, ডবলবেড। বারান্দায় দাঁড়ালেই সি-ভিউ। এঁরাও সব কলকাতা থেকে এসেছেন, একসঙ্গে থাকবেন ভাল তাই এদিকেই দিলাম। [সুবীরের ঘরের বিপরীত ঘরের দরজা খুলে] দেখুন, হোটেলের বেষ্ট রুম বলা যায়। গোপাল, যা সব গুছিয়ে ঠিক করে দে—

মিঃ বিশ্বাস। আপনারা কলকাতা থেকেই ?

সুবীর। আজ্ঞে হ্যাঁ,। আপনি ত এক্ষুনি এলেন। জিরিয়ে নিন, তার পরে আমরা সব একসঙ্গে মিলে হৈ-হাল্লা লাগিয়ে দেব। কোন ভয় ভাবনা নেই ভিজে গেছেন বোধ হয় ?

বিশ্বাস। একটু—সামান্য—

সুবীর। কাল ভাল করে জমিয়ে নেওয়া যাবে। কোন ভাবনা নেই—এমন জিরিয়ে নিন। মিসেস ত বেশই ভিজেছেন দেখছি। [মিসেস্ পিছন ফিরে তাকিয়ে দীপককে দেখলেন, দীপকও তাকে লক্ষ্য করল—মিসেস্ কেমন একটু বিব্রত হলেন মেয়েটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলেন]

বিশ্বাস। গাড়ীটাকে একটু দাঁড়াতে বলবেন ম্যানেজার বাবু, আমাদের একটু বেরুতে হবে—

ম্যানেজার। ও আমাদের চেনা গাড়ী, যতক্ষণ বলবেন ততক্ষণই থাকবে।

বিশ্বাস। তা একটু চা-টা খেয়েই বেরুবো, ততক্ষণে বৃষ্টিও হয়ত থামবে। ওকে ওয়েট করতে বলুন—[তিনি ঘরে ঢুকলেন]

ম্যানেজার। হ্যাঁ, বলে দেব। [প্রস্থান]

সুবীর। দেখুন দীপকবাবু, বর্ষাবাদলে ভিজবার জন্যে ভীড় লেগে গেল।

দীপক। আমি, আপনি অর্থাৎ আপনারা, ওঁরা সব

সুবীর। আপনি ভিজতেই এসেছেন পুরীতে ?

দীপক। জীবনটা বড় শুকনো ড্রাই হয়ে গেছে তাই ভিজে সরস হতে এসেছি। আপনারা কেন এসেছেন সে অবশ্য—

সুবীর। আমি এসেছি, ওই দীর্ঘ অধিবাসের পরে জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে—

দীপক। ভাল করেছেন। তাতে হাড়গোড়ের বেদনা কমবে, অর্থাৎ জলপটির কাজ হবে।

[দীপক লতিকার দিকে চেয়ে রইল]

লতিকা। সুবীর, তোমার মাথায়, ওই ব্রহ্মতালুতে জলপটি দিতে হবে।

সুবীর। ওই যে ওঁরা,—ওরাও হয়ত জলপটি দিতেই এসেছেন। [বিশ্বাস, মিসেস্ ও মেয়েটির প্রবেশ] আসুন! আসুন! বসুন। [গোপাল চা নিয়ে এল] এখানেই চা খেয়ে নিন। তারপর ক'দিন থাকবেন ?

বিশ্বাস। ঠিক নেই, তবে এক সপ্তাহত বটেই।

সুবীর। হ্যাঁ, তা হলেই হবে। দীপকবাবুও ত তাই,—না ?

দীপক। আমি জীবনকে সপ্তাহ মাস বছর দিয়ে গুনতে পারি না। যে ক'দিন থেকে আনন্দ পাই সেই কয়দিনই থাকবো।

সুবীর। ইনি মিসেস্—আর ওই খুকু ?

বিশ্বাস। হ্যাঁ মিসেস্ বিশ্বাস। ওর নাম রঞ্জু—

মিসেস্। [নমস্কার করলেন কিন্তু দীপকের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন]

সুবীর। এসো এসো রঞ্জু—বাঃ বাঃ চমৎকার মেয়ে! একেবারে ফিলিম ষ্টার মাফিক চেহারা।

বিশ্বাস। আমরা বিশেষ কারণে একটু বেরুবো। রঞ্জু ততক্ষণ তুমি এদের কাছে থাকো। পারবে ত ? কি বৃষ্টি হচ্ছে, তুমিও শেষে ভিজে যাবে।

রঞ্জু। হ্যাঁ।

লতিকা। নিশ্চয়ই পারবে, আমি ত আছি—

মিসেস্। হ্যাঁ ওকে দয়া করে একটু রাখুন। আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবো। কটা এসেনসিয়াল জিনিষ

দীপক। কিছু না, কোন ভয় নেই। রঞ্জু, আমি বাঘের গল্প, ব্যাঙের গল্প, ভূতের গল্প সব জানি। যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই বলব—

মিসেস্। রঞ্জু, ওদের কাছে একটু থাকো, আমরা এক্ষুণি আসবো। [উভয়ের প্রস্থান]

দীপক। রঞ্জু, তোমরা কলকাতায় কোথায় থাকো?

রঞ্জু। ভবানীপুর।

দীপক। স্কুলে পড় ত? তা হঠাৎ চলে এলে কেন?

রঞ্জু। মা বললে তাই চলে এলাম। জ্যেঠাবাবু, কাকীমা ঠাকুমা কত বারণ করলে তা মা শুনলে না।

দীপক। তোমার বাবা কি করেন?

রঞ্জু। আমার বাবা নেই। বাবা জার্মাণীতে গিয়েছিল, আসবার পথে প্লেন ভেঙ্গে পড়ে মারা গেছেন—তাই আসছেন না। অত লোক আসে—বাবা আসে না।

দীপক। তা হলে মিঃ বিশ্বাস কে?

রঞ্জু। জানি না, ও আমাদের কেউ নয়। [সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করল]

দীপক। তবে তুমি ওর সঙ্গে এলে কেন?

রঞ্জু। মা এল, আমিও এলাম।

সুবীর। তা উনি কে তা জানো না?

রঞ্জু। জানি, কিন্তু বলতে মানা আছে যে!

দীপক। বলতে মানা আছে? কে মানা করে দিয়েছে—

রঞ্জু। ছোটকাকী বারণ করে দিল। ছোটকাকী কি বলে জানো?

দীপক। কি?

রঞ্জু। ও নাকি আমার মেজ বাবা। [সকলের হাসি]

দীপক। মেজবাবা!

রঞ্জু। জানিনে। ঠাকুমা কাঁদে, তাই কাকী বারণ করে দিলে।

দীপক। কিন্তু, উনি ত বেশ ভদ্রলোক।

রঞ্জু। ও আমার বাবা নাকি? ও ত মার বন্ধু—

দীপক। সুবীরবাবু, মায়ের বন্ধুকেই বোধ হয় মেজবাবা বলে—না? মেয়েটি ভাগ্যবতী, নয় লতিকাদেবী? [ল্তি বিরক্তি প্রকাশ করল]

সুবীর। মানুষ চেয়েছে সাম্য আর স্বাধীনতা—তাকে ত অস্বীকার করার উপায় নেই—

দীপক। হ্যাঁ, স্বাধীনতার খেসারৎ দিতে হবে বৈ কি?

সুবীর। স্বাধীনতার খেসারৎ নগণ্য, মুনাফাটাই বেশী দীপকবাবু। সাম্য আর স্বাধীনতাই—দেহমনের মুক্তিই সভ্যতার কাম্য।

দীপক। সত্যি কথা বলতে কি, ওই দুটো কথা আমার মগজে জটিলতার সৃষ্টি করে। সাম্য মানে কি তাই বুঝি না—মানুষের সাম্য কিসের মাপকাঠিতে? ধন-সম্পদ, বুদ্ধি, দৈহিক সৌন্দর্য বা শক্তি, বিদ্যা, জাতিকুল না মানব হৃদয়ের উৎকর্ষতায়। না—সর্বসাকুল্যে? একটার সমতা হলেও সবটার হয় না। মানুষ মানুষের মাঝে সাম্য খোঁজে কিন্তু কুকুর পুষতে কুলীন এ্যালসেসিয়ান, গরুতে হরিয়ানা, পাখীতে ময়না। আর রেসের ঘোড়ার বেলায় ত তার বংশ পরিচয়ের কথা ছেড়েই দিলাম। যদি বলেন সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে তবে সেখানেও গোলমাল—সুন্দরী মেয়েরা যত ভালবাসা প্রেম আকর্ষণ করে কুৎসিতেরা তা পারে না। যেমন পৃথিবীর বা আপনার আপিসের এত মেয়ে থাকতে আপনার সবকিছু যেয়ে পড়েছে ওঁর উপর কিন্তু আরও অনেকে হয়ত আপনার জন্যেই ব্যাকুল। [লতিকাকে আড়চোখে দেখল]

সুবীর। এসব আপনার বৃথা অনুমান দীপকবাবু—

দীপক। অনুমান সন্দেহ নেই কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ অনুমান—

সুবীর। সম্ভাবনাপূর্ণ?

দীপক। হ্যাঁ, আপনি সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত উপার্জনশীল যুবক—অন্য কোন মেয়ের মানসপটে আপনার স্থান হয় নি এটা ধরে নেওয়া ত নিজেকে ছোট করা?

লতিকা। সম্ভাবনার কথাটা তুমি অস্বীকার করছ কি করে?

দীপক। ইয়েস্, রাইট পয়েণ্ট। লতিকা দেবীকে বিবাহ করে অন্য কোন অজ্ঞাত সুন্দরীর বা নারীর অন্তর যে আপনি খান্ খান্ করে দেন নি তারও যেমন প্রমাণ নেই, তেমনি লতিকাদেবী আপনাকে বিবাহ করে অন্য পুরুষের হৃদয়কে চুরমার করেন নি—এরও কোন প্রমাণ নেই।

সুবীর। সম্ভব, একেবারে অসম্ভব বলা যায় না।

দীপক। তবে এখানে, অধিকারগত সাম্যের কথাটাও মাঠে মারা গেল। তারপরে স্বাধীনতা,—আমি বাবা-মা'র অমতে, দাদাবৌদির অমতে, স্বাধীনচিত্তে স্বাধীনভাবে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম সুখী হতে কিন্তু সেখানে এসে দেখা গেল আমি একেবারেই পরাধীন যেহেতু আমার সুখ শান্তি আনন্দ নির্ভর করছে আর একজনের হাতে। তা'হলে স্বাধীনতা কোথায়? আমরা পরাশ্রয়ী—তাই না লতিকা দেবী? আমার পয়েণ্টটা আপনি বুঝবেন নিশ্চয়ই। [লতিকা মাথা নীচু করে রইল]

আরে রঞ্জু, রঞ্জু ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? গল্প শোনো,—কোন্ গল্প শুনবে?

রঞ্জু। আমাদেরও এ্যালসেসিয়ান আছে। সে কি করে জানেন?

দীপক। আরে সেইটেই ত শুনবো,—

রঞ্জু। আমাদের সকলের কথা শোনে কিন্তু ওকে দেখলেই কামড়াতে যায়—

সুবীর। কাকে কামড়াতে যায়?

রঞ্জু। ওইত, ওই ছোটকাকী যাকে—

সুবীর। সেজবাবা বলে?

দীপক। আচ্ছা রঞ্জু তোমার বাবার নাম কি?

রঞ্জু। সমর চ্যাটার্জী—

দীপক। সমর—ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার? তোমাদের বাড়ী দেবেন ঘোষ রোডে?

রঞ্জু। হ্যাঁ, বাবা ত আর আসে না—

লতিকা। দীপকবাবু, ও প্রসঙ্গ থাক।

দীপক। [হঠাৎ বিমর্ষভাবে উঠে দাঁড়িয়ে—রঞ্জুকে কোলে তুলে নিয়ে] রঞ্জু মা, তোমার জ্যেঠামশায় কি উকিল চন্দ্রকান্তবাবু?

রঞ্জু। হ্যাঁ, আপনি জানেন?

সুবীর। আপনি ওদের চেনেন নাকি দীপকবাবু! [দীপক জবাব দিল না, রঞ্জুকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। লতিকা আর সুবীর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল মিষ্টার বিশ্বাস ও মিসেস্ এলেন]

মিসেস্। রঞ্জু। রঞ্জু। [নেপথ্যে—রঞ্জু। এই যে আমি] [দীপকের হাত ধরে প্রবেশ] [মিসেস্ দীপকের দিকে চেয়ে একটু বিব্রত হোল]

মিসেস্। রঞ্জু এসো, খেয়ে ঘুমোবে। [প্রস্থান]

বিশ্বাস। থ্যাঙ্কস্—আপনারা খুবই উপকার করেছেন!

সুধীর। কিছু না, রঞ্জুই কত গল্প শোনালে—সুন্দর আপনাদের মেয়েটি।

বিশ্বাস। বৃষ্টিটা একটু কমেছে তাই রক্ষে, নইলে আমায়ও ভিজতে হত।

দীপক। আপনাদের এসেনসিয়াল জিনিষপত্র পেয়েছেন ত?

বিশ্বাস। এখানে পাওয়াই যায় না, শেষে বহু ঘুরে ঘুরে পাওয়া গেল।

দীপক। যাক্, পেয়েছেন ত। সেই রক্ষে—

বিশ্বাস। হ্যাঁ, নইলে খুবই অসুবিধে হত। থ্যাঙ্কস্ [প্রস্থান, সকলেই কিছুক্ষণ নির্বাক]

সুবীর। দীপকবাবু, হঠাৎ যেন একটু বিমনা, একটু সকড্ হয়েছেন মনে হয়।

দীপক। বিমনা একটু হয়েছি, সন্দেহ নেই তবে সকড্ আমি হইনা। এই বিচিত্র পৃথিবীতে যদি একদিন দেখি সবমানুষ পা দুটো আকাশে তুলে হাত দিয়ে হাটছে তাতেও সকড্ হবে না অথবা যদি দেখি আধুনিক জগতে সমস্ত নরনারী হঠাৎ বিবস্ত্র হয়ে রাস্তায় ভীড় করেছে তাতেও আশ্চর্য হবো না।

সুবীর। এমন সম্ভাবনাও অনুমান করেন নাকি?

দীপক। এমন দিন আসবে বই কি? আমার একটা সংশয় হয়,—আমরা যাকে সভ্যতা বলি শিক্ষা সংস্কৃতি বলে গর্ব করি সেই মহার্ঘ বস্তুটা যেন মানুষের স্বাভাবিকতাকে তার স্বধর্মকে হরণ করেছে। কথাটা শুনতে কটু। কিন্তু এই স্বাধীনতার মোহ মানুষকে বড় স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। আমরা অন্যের হৃদয়কে তুচ্ছ করে, মাড়িয়ে গুড়িয়ে চলেছি। ছেলের স্বাধীনতা বাপমায়ের হৃদয় ভাঙছে, স্ত্রীর স্বাধীনতা স্বামীর, এমনি ক্রমাগত চলেছে। [লতিকাকে লক্ষ্য করল]

সুবীর। দীপকবাবু, এইবারই মাটি করেছেন! এই দার্শনিক তত্ত্বেই সবমাটি। ওসব হাতুড়ী দিয়ে ঠুকলেও আমার মাথায় ঢুকবে না।

দীপক। মাটি—একেবারেই মাটি। জীবনটাকে সিরিয়সলি দেখতে গেলেই মাটি—নইলে বেশ হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়।—সিনেমা, ফুটবল, ক্রিকেট, আড্ডা, উপার্জন বেশ চলে গেল। স্বামী স্ত্রী চাকুরী করলাম,—খেলাম, ঘুরলাম, ব্যস। বিবেক, হৃদয় এগুলো স্বীকার করলেই মাটি!

লতিকা। সিরিয়স হতে গেলে যদি জীবন দুঃখময় হয়, তবে তা না হয় নাই ভাবলাম।

দীপক। হ্যাঁ, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানই সুখের—Ignorance is bliss. সেইজন্যেই জন্তু, জানোয়ার পশু-পক্ষীর জীবনের সমস্যা অতি সামান্য। [হঠাৎ চুপ করে থেকে] নাঃ এবারকার যাত্রাটাই খারাপ, তেরস্পর্শ মঘা অশ্লেষা প্রভৃতি যাবতীয় জ্যোতিষিক অযাত্রায় বেরিয়েছি বোধ হয়।

সুবীর। আমার ত মনে হয় যাত্রাটা অত্যন্ত শুভ—আপনাকে আমরা পেয়ে সত্যিই আনন্দিত।

দীপক। আমরা আনন্দিত!—লতিকাদেবীর ব-কলমে আপনি বলছেন কেন? লতিকাদেবী আনন্দিত কিনা তিনিই জানেন। উনি হয়ত ভাবছেন, এইসুন্দর মধুর মধুচন্দ্রিমায় এক আপদ এসে জুটেছে।

লতিকা। এটাও ত আপনি আমার ব-কলমে বলছেন।

দীপক। বলিনি ত—মস্ত বড় একটা 'হয়ত' দিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছি।

লতিকা। সংশয় প্রকাশ করলেও সন্দেহ দূর হয়নি।

সুবীর। চমৎকার, রাইট আনসার দিয়েছ লতিকা। [গোপালের প্রবেশ]

গোপাল। আজ হোটেলরে খিচুড়ী পকাইলা, গরম গরম খিচুড়ী ভজা আপনারা ভোজন করিবাস্ত।

সুবীর। খিচুরী! ভাজা—কি ভাজা!

গোপাল। পাপড় অছি, ডিম্ব অছি মাংস কটলেট অছি। [গোপাল বিশ্বাসের ঘরের দরজায় গেল]

বিশ্বাস। [দরজায় এসে] গোপাল আমরা ঘরেই খাবো—এখানে দিয়ে যাবে—

গোপাল। যেমতি বলিছন্ত তেমতি হব। মনেজার বাবুকে মু বলিবি। [প্রস্থান)

সুবীর। এই বাদলরাতে খিচুড়ী পাপড়ভাজা শুনে হঠাৎ গরম গরমই সেরে আসি। চল লতিকা দেরী করা এসব ব্যাপারে সুবুদ্ধি নয়—

দীপক। এত সকালে খাওয়া যায়? ও আমার অভ্যাস নেই—

লতিকা। হ্যাঁ, সত্যিই নটাও বাজেনি এখনও—

সুবীর। আমার বুভুক্ষা ন'টা দশ'টার অপেক্ষা রাখে না। খিচুড়ীর কথা শুনেই পেটের মাঝে শত শত ঘুমন্ত নেকড়ে জাগ্রত হ'য়েছে। চল—চল লতিকা দেরী নয়।

[লতিকা ও সুবীর করিডোর দিয়ে চলে গেল—লতিকা পিছন ফিরে চাইতেই দীপকের সঙ্গে চোখে চোখে হল]

[দীপক কিছুক্ষণ নীরব থেকে সিগারেট ধরাল]

দীপক। না, একেবারেই বিমনা হয়ে পড়েছি। সিগারেট ধরাতেই ভুলে গেছি—এই শোকের সান্ত্বনা, দুঃখের অপনোদন, বিশ্রামের অবলেহ, চিন্তার অনুপান, অপচয়ের সিংহদ্বার।

[দীপক টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে। গোপাল ও আর একটি লোক খাবার নিয়ে বিশ্বাসের ঘরে ঢুকল, বেরিয়ে গেল। ম্যানেজারবাবু এসে বিশ্বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে]

ম্যানেজার। দেখুন আর কি লাগবে, সবই আমি গুছিয়ে পাঠিয়েছি।

বিশ্বাস। [দরজা থেকে] না, না, আর কিছু লাগবে না—সব ঠিক আছে। [প্রস্থান]

ম্যানেজার। দীপকবাবু, খেয়ে নিলে পারতেন। খিচুড়ীই আজকের মেনু। বৃষ্টির রাতে জমবে ভাল তাই ব্যবস্থা করেছি—কেমন ভাল হয়নি?

দীপক। ভালই, আপনার পছন্দ আছে বলতে হবে।

ম্যানেজার। খিচুড়ী ঠাণ্ডা হলে সোয়াদ থাকে না। গরম গরমই—

দীপক। আর খিচুড়ীর স্বাদ ম্যানেজারবাবু! পুরীতে এসে জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে গেল।

ম্যানেজার। কেন? কেন? বলুন, আমার যা করণীয় সব করতে প্রস্তুত। আপনাদের আনন্দের জন্যেই আমার হোটেল। আনন্দের কি উপকরণ চাই শুধু একটু বলুন। সব পাবেন, খাদ্য আছে, পানীয় আছে, শয্যা

দরকার? কোন্ শুভক্ষণে কোন বস্তুটি চাই শুধু মুখ ফুটে একবার বলবেন—

দীপক। আপনি যা বললেন ওগুলোর একটারও দরকার অন্ততঃ আজ নেই। তার মানে এই নয় যে কাল দরকার হবে না। তবে এত সকালে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।

ম্যানেজার। তাই হবে, তাতে কি। খিচুড়ী গরম রাখতে বলে দিচ্ছি। সে কিছু না, গরমজলে হাণ্ডা বসিয়ে রাখবে। আর ভাজা গরমই থাকবে—চারটে ফ্রাই, পেঁপের চাটনি—হজমকারক।

দীপক। আচ্ছা আপনি যান, আমি পরে যাচ্ছি। [উঠে নিজের ঘরে গেল—উভয়ের প্রস্থান। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। সমুদ্রের আকাশে ছেঁড়া মেঘের মাঝে চাঁদ উঠেছেন ঘোলাটে জোছনা, ফেনায়িত সমুদ্রের উপর খেলা করছে। বিশ্বাস ও মিসেসের প্রবেশ তাঁরা করিডোরের দু'খানা চেয়ারে বসলেন]

বিশ্বাস। রঞ্জু ঘুমিয়েছে?—

মিসেস। হ্যাঁ, বেচারীর সারাদিন খাওয়া হয়নি।

বিশ্বাস। তোমার যেন মুড নেই। ইউ আর রাদার স্যাড—কি ভাবছ বলত চন্দ্রা?

চন্দ্রা। অনেক ভাবছি। ঝগড়া ঝাটি করে এতদূর আশাটা ভাল হয়নি। অবশ্য লোকে কি বলল আর না বলল তা আমি গ্রাহ্য করি না। তবুও তাঁরা হয়ত দুঃখ পেয়েছেন—তাঁরাও স্নেহ না করেন এমন নয়।

বিশ্বাস। ছ্যাখো চন্দ্রা—তাদের স্নেহকে আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু তাদের স্নেহেত জীবনের চাহিদা মেটে না। দেহ ও মনে মানুষের চাহিদা অনেক। তাকে অস্বীকার করে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। দু'জনে আজ এতদূরে এসেছি, জীবনকে নতুন চোখে দেখতে এসেছি। সংশয় সন্দেহ দিয়ে এই ক'টি দিন তুমি খণ্ডিত করো না।

চন্দ্রা। আমি কি চাই, কেনই বা এলাম কিছুই বুঝছি না। একটা অকারণ জিদের বশবর্তী হয়ে এসে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তাও জানি না।

বিশ্বাস। কেন তোমার মনে এসব কথা আসছে বুঝি না। কিন্তু আজ এসব কথা ভাবা, উচিত কি অনুচিত চিন্তা করাটা কি নিরর্থক নয়?

চন্দ্রা। মোটেই নিরর্থক নয়। তুমি হয়ত ভাবছ, তোমার সঙ্গে এসেছি বলেই তোমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছি। সেটা মনে করলে ভুল করবে। আমি আমাকে যাচাই করে নিয়ে, মনকে যাচাই করে নিয়ে, বুঝবো কেন এসেছি। আমাকে বুঝে নেওয়ার সময় তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে।

[দীপক সিগারেট মুখে ধরিয়ে এসে ঘরে তালা দিল। চন্দ্রার দিকে চেয়ে চলে গেল চন্দ্রাও চাইল—কেমন যেন একটু বিব্রত হল]

বিশ্বাস। এই লোকটিকে দেখে তুমি যেন বড়ই বিমনা হচ্ছ। লোকটা কে? চেনো নাকি?

চন্দ্রা। চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে না। লোকটার চাউনি দেখে মনে হয় ও হয়ত বা আমাকে চেনে।

বিশ্বাস। চিনলেই বা ক্ষতি কি? নিকট আত্মীয় নিশ্চয়ই নয়, আর যদি হয়ও তবু তোমার মত স্বাধীনচেতা মেয়ে নিশ্চয়ই সেটাকে খুব গুরুত্ব দেবে না।

চন্দ্রা। ছ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক কোনদিন গড়ে উঠবে কিনা তাও জানি না। তোমার সঙ্গে বন্ধু হিসাবে বেড়াতে এসেছি মাত্র। সেই বেড়াতে আসার সাক্ষী থাক্ এটা অভিপ্রেত নয়।

বিশ্বাস। অভিপ্রেত তোমার হোক আর নাই হোক, সাক্ষী যদি কেউ থেকেই যায়, তাতেই বা কি এসে যায়। তুমি স্বাধীন। ওদিকে বাবা আর স্বামীর সম্পত্তি যা তোমার আছে তাতে কারো ভয় করার প্রয়োজন তোমার নেই। তা ছাড়া আমারও সামান্য যা কিছু আছে তা যদি তুমি ইচ্ছে কর, তোমারই হতে পারে।

চন্দ্রা। তোমার অর্থ বিত্তের লোভ দেখিও না। টাকা আমার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মত বেচে থাকতে চাই। প্রথম বিয়ের পর স্বামী শ্বশুর শাশুড়ীর চাপে আমার ব্যক্তিত্ব আমার স্বাধীন সত্ত্ব ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বার সেটি হতে দেব না।

বিশ্বাস। আজ তিন বছর, একান্তে নিবিড় ভাবে মিশেও তুমি আমাকে চিনলে না?

চন্দ্রা। ছ্যাখো, আমার রূপের খ্যাতি আছে সে কথা জানি এবং সেই খ্যাতি আর রূপের ছটায় লোক চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। [illegible]

মৌমাছিও আসে। এটা আমার অহঙ্কার নয় অভিজ্ঞতা। কত পুরুষ এল কামনা নিয়ে কিন্তু হৃদয় নিয়ে কেউ আসেনি।

বিশ্বাস। হৃদয় নিয়ে কেউ এসেছিল কিনা, এসেছে কিনা, তুমি বুঝলে কি করে?

চন্দ্রা। আমিত মানুষ, হৃদয় এমনি বস্তু যে পশুপাখী কুকুর বেড়ালও তার স্পর্শ বুঝতে পারে।

[নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে কথা বলার শব্দ এগিয়ে আসছে। সুবীর ও লতিকা করিডোর দিয়ে এল]

সুবীর। এই যে মিঃ বিশ্বাস, খাওয়া হল ?

বিশ্বাস। না, ঘরেই খাবার আনিয়েছি, একটু পরে খাবে'খন।

সুবীর। চমৎকার খিচুড়ী বেঁধেছে কিন্তু। ঐ কাট্‌লেট আর কি মাছের যেন ফ্রাই, খুব খেলাম—একেবারে ভুরি ভোজন। গরম গরম খেয়ে নিন—তোফা খাবার হয়েছে—

লতিকা। তোমার মত ঔদরিক ত সকলেই নয়।

সুবীর। হেউ—না হোক, খায়ত সকলেই। যারা খেয়ে আনন্দ পায় না তারা নিশ্চয়ই অজীর্ণ রোগী, যারা ভালবেসে আনন্দ পায় না তারা মৃগীরোগী, যারা বেড়িয়ে আনন্দ পায় না তারা হাঁপীরোগী না হয় বেতো রোগী। [লতিকাকে টিপ্পনী করল]

লতিকা। থাক্ থাক্। [দুজনে অপর দু'খানা চেয়ারে বসে]

সুবীর। পুরীতে বেশ জম-জমাট হয়ে উঠল দেখছি। দীপকবাবু চমৎকার লোক। তার মধ্যে আপনারাও এসে পড়েছেন। আমরাই একশ'। কলকাতা ত পুরীতেই এসে গেছে! চলুন কাল সকলে মিলে কোনারকে যাওয়া যাক্। সকালে বেরিয়ে সারাদিন হৈ-হাল্লা, বিকেলে ফিরবো।

লতিকা। বৃষ্টিটা থামুক, এই বৃষ্টিতে কে বেরুবে?

সুবীর। ট্যাক্সি করে যাবো—এমন কিছু খরচও নয়। খাবার নিয়ে যাবো, পিকনিকও হবে, কোনারক দর্শনও হবে।

বিশ্বাস। আনন্দও হবে। চল চন্দ্রা কাল কোনার্ক ঘুরে আসি। [চন্দ্রা নীরব]

লতিকা। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নি—কোমরের ব্যথাটা

বিশ্বাস। কোমরে ব্যথা? আপনি অসুস্থ তা হলে?

লতিকা। ছিলাম না, হয়েছি। আজ সকাল বিকেল ওঁর সঙ্গে সমুদ্রতীরে ঘোড়দৌড় হয়েছে। বিকেলে ভিজে একেবারে আমসত্ত্ব। আর নয় একদিন জিরিয়ে নি।

সুবীর। ওইত তোমার দোষ, এমন একটা হ্যাপি কোম্পানি তুমি কি আর পাবে? চলুন মিসেস্ বিশ্বাস সকালে ৮টার মধ্যে আমি সবঠিক করে ফেলবো। ন'টায় ষ্টার্ট। রঞ্জু খুব এনজয় করবে। হ্যাঁ, সেখানকার মেনু কি হবে সেটা ঠিক হয়ে যাক।

লতিকা। হ্যাঁ, যাওয়া হোক আর নাই হোক, মেনুটা ঠিক হয়ে থাকাই ভাল। [হাসি]

সুবীর। তার মানে? খাওয়াটা যুৎসই না হলে বেড়ানটা জমবে কেন? [দীপকের প্রবেশ] এই যে দীপকবাবুও এসে গেছেন। আমরা সকলেই কাল কোনারক যাচ্ছি, আপনিও নিশ্চয়ই যাচ্ছেন। তা সেখানে যেয়ে কি খাওয়া হবে সেই মেনু নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনার কি মত?

দীপক। আমার মত!

সুবীর। আপনার মতের অপেক্ষায়ই আছি আমরা। কি বলেন মিঃ বিশ্বাস?

দীপক। তা ধরুন, রুটি মাখন, জ্যাম, জেলি, কিছু মাংসের কারি, ডিম, কফি, চা।

সুবীর। হ্যাঁ, একেবারে পারফেক্ট মেনু—ব্যস কাল আটটার মধ্যে আমি সব ঠিক করে ফেলবো—মায় ট্যাক্সি। ন'টায় ষ্টার্ট। আমরা পাঁচ আর রঞ্জু, তাকেত কোলে করেই নিয়ে যাওয়া যাবে—

দীপক। আমি যাবো, সে কথাত বলিনি। মেনু কি হওয়া উচিত তাই বলেছি।

সুবীর। সে কি! আপনি যাবেন না?

দীপক। না। আমি এসেছি সমুদ্র দেখতে, যা ভগবান বা প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষের হাতে গড়া পাথরের মন্দিরে আমার কোন আকর্ষণ নেই।

চন্দ্রা। কেন? পাথরের মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টি কি দেখবার নয়।

দীপক। নিশ্চয়ই দেখবার, তবে সে চোখ আমার নেই। আমার চোখে মনে হয় এই সমুদ্র আর হিমালয়

এর থেকে বিচিত্র সুন্দর আর কিছু নেই। এর যে কোন একটা দেখেই জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়—

বিশ্বাস। ওঃ আপনি কবি!

দীপক। বলেন কি? এমন অপবাদ আমার চরম শত্রুরেও দেয়নি কোনদিন।

সুবীর। যাক্ ওসব কথা, কাল কি হবে সেইটে ঠিক হোক্। দীপকবাবু যদি নাই যান, আপনারা যাবেন ত?

চন্দ্রা। না, কাল যাওয়া হয় না।

বিশ্বাস। তবে পরশু, কাল ধীরে সুস্থে সব গুছিয়ে ফেলা যাক্, পরশু গেলেই হবে—

দীপক। তাও হতে পারে। আপনাদের খিচুড়ী কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সত্যিই মাছের ফ্রাইটা ভালই হয়েছে। ওটা ঠাণ্ডা হলে খাওয়াই বরবাদ।

বিশ্বাস। হ্যাঁ চল চন্দ্রা, আমরাও খেয়েনি।

[ম্যানেজার বাবুর প্রবেশ]

ম্যানেজার। আপনাদের খাওয়া হ'য়েছে? ঠাকুর কি রান্না করেছে জানি না। কোন কষ্ট হয়নি ত!

সুবীর। খাওয়ার সময় কোন কষ্ট হয়নি, কিন্তু এখন হচ্ছে। হেউঃ বাবাঃ কি খাওয়াই খেয়েছি।

দীপক। হ্যাঁ খাওয়া ভালই হয়েছে বলতে হবে, তবে আর একটু নুন দিলেই খিচুড়ী নুনে পুড়ত, আর একটু ঝাল দিলেই ফ্রাই অখাদ্য—[সকলের হাসি]

ম্যানেজার। তা হয়নি ত? হলে ত লজ্জায় মরে যেতুম।

দীপক। ভালই খেয়েছি—ধন্যবাদ। রান্না ভালই হ'য়েছে—

ম্যানেজার। তা রাত্রে আর কিছু দরকার থাকে আদেশ করুন। আপনাদের আরামের জন্যেই যদি কোন খাদ্য পানীয় দরকার হয়—

বিশ্বাস। পানীয় কি পাওয়া যাবে?

ম্যানেজার। আজ্ঞে ধরুন সোডা, লেমনেড, কোকো, কফি, দেশী বিলাতী সবই জোগাড় করে রাখতে হয়।

বিশ্বাস। চল চন্দ্রা, আমরা খেয়ে নি। ম্যানেজারবাবু, আমাদের ঘর হয়ে একটু যাবেন। রাত্রে যদি কিছু দরকার হয় আনিয়ে দেব। [চন্দ্রা বিশ্বাস ঘরে গেল]

ম্যানেজার। আজ্ঞে নিশ্চয়ই, আপনাদেরও যদি দরকার না হয় তবে আমার সংগ্রহ করাই বৃথা।

সুবীর। আমাদের দুটো সোডা পাঠিয়ে দেবেন—অত্যন্ত গুরুভোজন হয়েছে—

ম্যানেজার। সোডা? শুধু সোডা,—মানে শুধুই সোডা? আচ্ছা, আচ্ছা তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ম্যানেজার বিশ্বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনে, খুশী মনে মাথা নেড়ে চলে যেতে]

ম্যানেজার। আর কিছু, মানে আরও কিছু—আচ্ছা, আচ্ছা ওই ওই পাঠিয়ে দিচ্ছি—এক্ষুনি দিচ্ছি—

সুবীর। চল লতিকা, সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। ভোরে উঠতে হবে—আজ ত মেঘলা আকাশে সানরাইজ দেখা হল না। দীপকবাবু, আপনাকে ঠিক সময়ে ডাকবো, একসঙ্গে বীচে যেয়ে সানরাইজ দেখবো।

দীপক। সর্বনাশ! ভোরে উঠবো কি? এখনি শোবো, বলেন কি সর্বনেশে কথা! আমি বারটার আগে শুই না, অন্ততঃ ৭টার আগে উঠি না। আমার নিজস্ব একটা ভদ্রলোকের ডেফিনেশন আছে—কি জানেন?

সুবীর। কি?

দীপক। যে লোক রাত বারটার আগে শোয়, সূর্যোদয়ের আগে ওঠে, আর বন্ধের দিনে একটার আগে খায় সে ভদ্রলোকই নয়। যারা সূর্যোদয়ের আগে অন্যের ঘুম ভাঙ্গায় তারাই আসল খুনী।

লতিকা। বুঝলে ত? খুন আমাকেই ক'রো—ওঁকে আর ক'রো না।

সুবীর। না, হোপলেস্। একটা হৈ হৈ যদি না হল তবে জীবন কিসের?

দীপক। আপনার ভুরিভোজন হয়েছে, শুয়ে পড়ুন সূর্যোদয় দেখতে আমিই বরং ডাকবো।

সুবীর। বেশ তাই। দেখি কে কাকে ডাকতে পারে। চল লতিকা, শুয়ে পড়ি।

[ওরা তাদের ঘরে ঢুকল। গোপাল দুটো সোডা ঘরে দিয়ে গেল। দীপক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রেলিং এর ধারে গেল। চাঁদ উঠেছে—সমুদ্রের জলে তার প্রতিবিম্ব নাচছে। দীপক ঘরে গিয়ে বই নিয়ে এসে বসল। ম্যানেজারবাবু একটা বোতল লুকিয়ে নিয়ে এলেন। দীপক উঠে এসে ইশারায় তাকে থামালো, বোতলটি দেখে ফেরৎ দিল। ম্যানেজারবাবু

ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন—দরকার কিনা? দীপক 'না' জানালো। ম্যানেজারবাবু বিশ্বাসের দরজায় নক্ করলে, দরজা খুলে গেল। তিনি বোতল দিয়ে এলেন—ওদের দরজায় হুক পড়ল। ওদিকে লতিকাদের দরজায়ও হুক পড়ল। ম্যানেজার দীপককে সামনে নিয়ে এল]

ম্যানেজার। দেখুন দীপকবাবু, কিছু মনে করবেন না। এটা আমাদের ব্যবসা। আপনি ত জানেন এখানে যে সব ভাই-বোন আসেন তারা সবাই ভাই-বোন নয়, যে স্বামী-স্ত্রী আসেন তারাও সব স্বামী-স্ত্রী নয়। তাদের প্রয়োজনে সবই রাখতে হয়,—নইলে চলে না।

দীপক। রাখবেন, তা আমার কাছে অজুহাত দেবেন কেন?

ম্যানেজার। না, ভাল লোকও আসেন—তাদের মুখে এসব কথা প্রচার হলে ভাল লোক আর হোটেলে আসবেন না,—এটা চুরাশি নরকে পরিণত হবে। সকলেই ত জগন্নাথ দেখতে আসেন না—এসব ত জানেন। [হাত ধরে] কিছু মনে করবেন না। এদেরও সুবিধে হয়, আমাদেরও দুপয়সা হয়। আপনাদের সেবা করেই আমরা উদরান্ন সংস্থান করি।

দীপক। বলা বাহুল্য মাত্র।

[ম্যানেজারবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে চলে গেলেন। দীপক বই নিয়ে বসল। মঞ্চ স্বল্পান্ধকার। শুধু দীপক বসে আছে দেখা যায়। মঞ্চ ঘুরে পাশের ঘরে সুবীর আর লতিকাকে দেখা গেল। সুবীর খাটে হেলান দিয়ে। লতিকা চুল আঁচড়াচ্ছে]

সুবীর। তোমার চুল একেবারেই ভিজে গেছে?

লতিকা। ভিজবে না? খুলে শুলেই শুকিয়ে যাবে। [একটু নীরবতা—সুবীরের ঘুম পাচ্ছে] আচ্ছা সুবীর, তুমি ত জানো আমি অন্যপূর্বা, তবুও তুমি বিয়ে করবার জন্যে এমন জিদ করলে কেন, বলত?

সুবীর। কথাটা একটু বুঝিয়ে বল।

লতিকা। আমি ত গোপন করিনি—আমার আগে বিয়ে হয়েছিল, সন্তানও হয়েছিল যদিও সে বাঁচেনি। তবুও তুমি আমাকে বিয়ে করতে এমন জিদ করলে কেন? তুমি সত্যিই ভালবেসেছিলে? না একটা খেয়াল, একটা লালসার দাস হয়ে আমাকে চেয়েছিলে?

সুবীর। ভালবাসা হোক, লালসা হোক, খেয়াল হোক, আমার মনে হয়েছে তুমি ব্যতীত আমার জীবন চলবে না, তাই আমি তোমাকে জয় করেছি—পেয়েছি—

লতিকা। সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার অতীত মনে করে কি তোমার মনে কোন ক্ষোভ নেই? কোন দুঃখ হয়নি। মন কি স্বচ্ছন্দ চিত্তে সব গ্রহণ করেছে? কোন অস্বস্তিও নেই?

সুবীর। এখনও হয়নি। আমি বর্তমানে বিশ্বাসী। অতীত ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবি না। যদি তেমন ভাবনা ভবিষ্যতে আসে তখন ভাববো। অতীত মুছে যায়, ভবিষ্যৎ অনাগত—

লতিকা। দেখ, জীবনটা কাব্য নয়। যুক্তি বুদ্ধি উপরেও হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে তাতে অনুভূতি আছে, সেন্টিমেন্ট আছে, সংস্কার আছে। যুক্তিকে ডিঙিয়ে যদি সেটা মাথা উঁচু করে?

সুবীর। আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, মানুষ মানুষই, দেবতা নয়, পশুও নয়। তুমি যদি ভালবেসে নিঃশঙ্কচিত্তে আমার কাছে না এসে থাকো, তবে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা তোমার নিশ্চয়ই থাকবে!

লতিকা। থাকবে—মানে?

সুবীর। আমার মনে হয় মানুষ অত্যন্ত অসহায়। মানুষ তার মানস-নারীর সামনে এলে তার ব্যক্তিসত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। সেখানে বুদ্ধি যুক্তি সংস্কার শিক্ষা কোনই কাজে লাগে না। এটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই সত্য। কাজেই সে সঙ্কটে তোমাকে যদি পড়তে হয় তবে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা তোমার থাকবে—

লতিকা। যদি তুমি ওই সঙ্কটের মাঝে পড়—

সুবীর। ও সঙ্কট আমার জীবনে আসবে না,—আমি তোমার মাঝে আমাকে হারিয়েছি।

লতিকা। সত্যিই! আমার অতীত ভেবে কোনদিনই তোমার কোন ক্ষোভ হবে না?

সুবীর। হবে কিনা জানি না. তবে হয়নি. এটুকু জানি। এখন শুয়ে পড়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, কাল সকালে 'সান-রাইজ' দেখতেই হবে।

লতিকা। তুমি ঘুমোও—আমার দেরী আছে!

[[illegible]]

টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে গুণ গুণ করে গান করছিল আর বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিল। মঞ্চ ঘুরে গিয়ে পূর্বতন দৃশ্য এল। দীপক বসে আছে বই নিয়ে। দীপক বই রেখে উঠে এল লতিকাদের দরজা পর্যন্ত। কড়াটা নাড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, একটু ভাবলো, ফিরে গেল—চেয়ারে বসল। মঞ্চট' আবার ঘুরে লতিকাদের ঘর এল। লতিকা বই রেখে ডাকলো—সুবীর সুবীর। সুবীর ঘুমুচ্ছে। সে তার নাকে শুড়শুড়ি দিল, তবুও সুবীর ঘুমুচ্ছে। লতিকা আস্তে দরজা খুলে পূর্বতন দৃশ্যে এল—ধীরে ধীরে এসে দীপকের কাছে দাঁড়াল। ইশারায় সামনে ডেকে নিয়ে এল]

লতিকা। তুমি আজও বিয়ে করনি ?

দীপক। না।

লতিকা। কেন ?

দীপক। প্রয়োজন বোধ করিনি। [একটু থেমে] তুমি চলে যাওয়ার পরে মনে হল, আমার অন্তর হয়ত অনুদার, অপ্রসন্ন তাই তুমি চলে গেছ। সেজন্য মনে আমার রাগ দুঃখ কিছু নেই। তুমি সুবীরবাবুকে পেয়ে সুখী হয়েছ—এতে আমিও সুখী। এই আনন্দ, এত ভালবাসা হয়ত আমি দিতে পারতাম না।

লতিকা। তুমি ছন্নছাড়া জীবন কাটাচ্ছো, এ দেখে আমি ত সুখী হতে পারিনি।

দীপক। ওটা ভাগ্যলিপি—ও নিয়ে অভিযোগ চলে না।

লতিকা। তখন তুমি বললে, আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি, একথা কি তুমি বিশ্বাস করো?

দীপক। করি।

লতিকা। কেন ?

দীপক। আমরা কেন বিচ্ছিন্ন হলাম, সেইটে আজও বুঝতে পারিনে। আমার বিশ্বাস, মানুষ জীবনে মাত্র একবার ভালবাসে। বাকীগুলো হয় তার প্রয়োজন, স্বার্থ, লালসা বা অমনি কিছু। তারা নর্ম সহচরী, স্ত্রী নয়, পত্নী নয়—

লতিকা। তুমি আর বিয়ে করবে না ?

দীপক। জানি না, তবে এখনও প্রয়োজন বোধ করিনি। তুমি জানো, তোমাকে বিয়ে করায় বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন, দাদারাও সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। তারা বলেন, তাদের পছন্দমত বিয়ে করলে তারা আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু সে আহ্বানকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

লতিকা। কেন? আত্মবঞ্চনাও ত পাপ।

দীপক। হ্যাঁ, সেইজন্যেই তাদের ডাকে সাড়া দেইনি। নেহাত আত্মরক্ষার্থে, স্বার্থের প্রয়োজনে এই বিয়ে করাটাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় আত্মপ্রবঞ্চনা।

লতিকা। ফিরে গিয়ে বাবা মা দাদাদের আনন্দ দিতে পারতে।

দীপক। সেকথা ভাবলে তোমার সঙ্গে বিয়ের আগেই ভাবতাম। তখন ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। এখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা পাই। যুদ্ধে পরাজিত যুদ্ধজাহাজ আত্মসমর্পণ করে না, সে আপনাকে ডুবিয়ে দেয়—

লতিকা। তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছ ? কিন্তু কেন ? আমার জন্যে ? আমি আজও তোমাকে ভালবাসি এ বিশ্বাস যদি তোমার থাকে তবে আমার জন্যেই তুমি ভাসতে চেষ্টা কর—ভেসে ওঠো। জীবনটা মহার্ঘ, তাকে মূল্যহীন করে লাভ কি ?

দীপক। লাভ নেই জানি তবুও মূল্যহীন হয়ে যায়—আপনি জীর্ণ হয়ে মূল্যহীন হয়।

লতিকা। আর বারোদিন আগেও যদি দেখা হত তোমার সঙ্গে—তোমার কথা জানতে পারতাম! দীপক, লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে জীবন নষ্ট ক'রো না। আমায় ক্ষমা কর—

দীপক। তুমি ভুলে যেয়ো না, তুমি সুবীরবাবুর বিবাহিত পত্নী। তোমাকে আমি কি ক্ষমা করবো ? করতে পারি ?

লতিকা। আমি ওকে ভালবেসে বিয়ে করিনি দীপক। ওর ভালবাসাকে প্রতিরোধ করতে পারিনি তাই। অন্তর্যামী জানেন, আজও আমি তোমার, একান্তই তোমার কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ ত আর নেই ! [লতিকার চোখে জল]

[লতিকাদের ঘরে একটা খুট করে শব্দ হল, ওরা দু'জনে ফিরে তাকালো। সুবীর এসে দরজায় দাঁড়াল]

সুবীর। আরে ! লতিকা, তুমি শোওনি এখনও,—দীপকবাবুর সঙ্গে গল্পই করছো।

লতিকা। এক কাঁড়ি খিচুড়ী খেয়ে এখন বাঘের মত নাক ডাকাচ্ছো, কার সাধ্য ও-ঘরে শোয় ?

সুবীর। আমার নাক ডাকে ? কখখনও না, আমি ত শুনিনি।

দীপক। ওটা শোনা কঠিন—খুব কঠিন। কারণ না জাগলে শোনা যায় না, আবার না ঘুমুলে নাক ডাকে না। [সকলের হাসি]

সুবীর। কি গল্প করছিলে ?

লতিকা। গল্প নয়, ওর ওই [হাতের বই দেখিয়ে] কোপেন হাওয়াবের ফিলজফি শুনছিলাম।

সুবীর। সারা রাত্তিরই শুনবে।

লতিকা। তা কেন ? এবার তুমি একটু জেগে থেকে ফিলসফি শোনো—তা হলে আর নাক ডাকবে না। সেই ফাঁকে আমিও একটু ঘুমিয়ে নি।

সুবীর। চলে এসো, এবার নাককে কিছুতেই ডাকতে দবো না, ওটা ধরে রেখে ঘুমোবো—

[ওরা ঘরে গেল—লতিকা পিছনে। দরজা দেওয়ার সময় একখানা চিঠি বুকের ভেতর থেকে বের করে দীপককে ছুঁড়ে দিল।]

লতিকা। কাল দেখা হবে, দীপক বাবু। [দরজা দিয়ে দিল]

[দীপক চিঠিখানা পড়ল। একটু ভেবে পকেটে রাখলো। পুনরায় রেলিংএর ধারে চেয়ারে বসে বই খুলল। আলো নিভে এল, মঞ্চ ঘুরে মিঃ বিশ্বাসের ঘর এল। রঞ্জু ঘুমুচ্ছে। টেবিলে অর্দ্ধবোতল মদ রয়েছে। টেবিলে চন্দ্রা আর বিশ্বাস বসে।

বিশ্বাস। চন্দ্রা তুমি কোন কালে খাওনি এমন ত নয়, বারে ত যথেষ্টই খেয়েছে। তবে আজ কেন খেলে না? আজ আমার বড় প্রয়োজন ছিল তাই বোধ হয়।

[বিশ্বাসের নেশা হয়েছে]।

চন্দ্রা। তুমি ত খেয়েছ—পেট ভরে খেয়েছ—তবে আর কেন ?

বিশ্বাস। মধুছন্দা চন্দ্রা, তোমার পিছনে পিছনে সম্মোহিতের মত ছুটে এসেছি কেন জানো !

চন্দ্রা। তোমার মনের কথা আমি জানি ?

বিশ্বাস। আমি চাই, তোমাকে চাই, আমার জীবন ঘিরে তোমাকে চাই।

চন্দ্রা। কিন্তু আমি তোমাকে চাই কিনা সেটা ত এখনও ঠিক জানি না। আমি এসেছি একটা রুষ্ট ক্রুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে—বাইরের মুক্ত বাতাসে স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস নিতে। আমি জীবনের সঙ্গী খুঁজতে আসিনি।

বিশ্বাস। তবে আমাকে ডাকলে কেন ? আমি সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ফেলে তোমার হাতে জীবন তুলে দিতে এসেছি—তুমি গ্রহণ করবে না ?

চন্দ্রা। আমি তোমাকে ডেকেছি ? মিথ্যে কথা, কখ্খনও নয়। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তুমি আমাকে অনিবার্য্যভাবে অনুসরণ করেছ। আমি একটা ভুল করে, সাময়িক একটা রাগের ঝোঁকে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি এইমাত্র। কেন এসেছি তা এখনও ভাবিনি।

বিশ্বাস। তার মানে ? তার মানে আজ তুমি আমার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ করে দিয়ে আমাকে পথের কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে ?

চন্দ্রা। বাজে ব'কোনা, যাও শুয়ে পড়—আমার ইচ্ছায় তুমি পথের কুকুর হবে ?

বিশ্বাস। তা হয় না চন্দ্রা [উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্রার কাছে গিয়ে] এসো আমাদের নূতন পরিচয় হোক। উদার সমুদ্র, ও উচ্ছ্বসিত তরঙ্গকে সাক্ষী করে, আকাশের ওই চাঁদকে সাক্ষী করে আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হোক। [চন্দ্রাকে ধরতে গেল]

চন্দ্রা। আমাকে ছুঁয়ো না বলছি। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তাই তোমার সঙ্গে এসেছি—তা নয়। বন্ধুত্বের সীমা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রো না।

বিশ্বাস। তুমি করনি, কিন্তু আমি করেছি। তাই তোমাকেও করতে হবে। [চন্দ্রার হাত ধরল]

চন্দ্রা। ছাড়ো বলছি, [হাত ছাড়িয়ে] তুমি কি আমাকে অক্ষম অবলা পেয়েছ ? যাও সরো—

[আলো নিভে গেল—মঞ্চ অন্ধকার। মঞ্চ ঘুরে গেল, দীপক পড়তে পড়তে একটা গোলমাল শুনে কান খাড়া করলো। চীৎকার শুনল—নেপথ্যে]

চন্দ্রা। ছোটলোক বেইমান—

বিশ্বাস। চন্দ্রা—চন্দ্রা। দুম-দাম শব্দ ভারী জিনিস পতনের শব্দ]

[চন্দ্রা বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি কড়ার মধ্যে তালা দিয়ে দিল]

বিশ্বাস। [ভিতর থেকে] কি করছো চন্দ্রা? কি করছো, খোলো, খোলো—[দরজায় ধাক্কা দিল—তার পরেই পড়ে গেল]

চন্দ্রা। [দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে—যেন মল্লযুদ্ধ হয়ে গেছে, কপাল থেকে ঘাম মুছে] উঃ উঃ—

দীপক। [ধীরে ধীরে কাছে এসে] চন্দ্রা দেবী, আপনি অসুস্থ বোধ করছেন? আসুন, এখানে বসুন। [হাত ধরে করিডোরের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে] কি রকম বোধ করছেন বলুন। আমার সঙ্গে ওষুধপত্রও আছে একটু ষ্টিমুলেন্ট কিছু—

চন্দ্রা। না ওষুধের দরকার নেই। আপনি বসুন, আমার বড্ড ভয় করছে। আপনি এখানে বসুন—

দীপক। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কাছেই আছি কি সাহায্য করতে পারি বলুন। [সে কাছের চেয়ারে বসল]

চন্দ্রা। মানুষ যে এত বড় পশু হয়, তা কে জানতো!

দীপক। ভুল হল চন্দ্রা দেবী, মানুষ শুধু পশু নয়, হিংস্র পশু। তার হিংস্রতাটা শিক্ষা আর সভ্যতার সোনালী মোড়কের মাঝে থাকে এই মাত্র। এটা যারা জানে না, তাদের ভুলের মাশুল গুনতে হয়—

চন্দ্রা। ভুল, সত্যই ভুল। একটা জেদ আর খেয়ালের বশবর্তী হয়ে—

দীপক। পীড়াদায়ক এবং কঠোর হলেও বলতে হচ্ছে—বলব কি?

চন্দ্রা। বলুন—

দীপক। আপনি ভুল করেন নি। ইচ্ছে করেই এসেছেন—একই ঘরে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে উঠতেও কুণ্ঠিত হন নি কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন করেছেন। চরম মুহূর্তে আপনার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে,—আপনি আত্মরক্ষা করতে চাইছেন—ঘুমন্ত রজুর দিকে চেয়ে দেহ ও মন বিদ্রোহ করেছে'—তাই না?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। মানুষকে মানুষের অধিকার দিয়ে ভুল করেছি।

দীপক। না চন্দ্রা দেবী, আপনি পশুকে পশুর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জয়ী হয়েছেন এই ত আপনার জয়।

চন্দ্রা। হ্যাঁ তাই, আপনি জানেন?

দীপক। হ্যাঁ জানি, আপনাকেও জানি—আপনাদেরও আমি চিনি। সমর জার্মানীতে যাওয়ার পর আর যাইনি। কোথায়ই বা যাবো? যাওয়ার তাগিদ ছিল না তাই যাইনি—আপনি ভাল করে দেখলে চিনতে পারবেন।

চন্দ্রা। আপনি তার বন্ধু দীপক বাবু। কিন্তু একি চেহারা আপনার! কি চেহারা হয়েছে তাই চিনতে পারিনি।

দীপক। চন্দ্রা দেবী, আপনি আমাকে চিনেছেন, অনেক আগেই চিনেছেন। তাই আজ আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে পশুর অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—আমি অভিনন্দন জানাই।

চন্দ্রা। হ্যাঁ তাই, সত্যিই তাই। আমাকে রক্ষা করুন দীপকবাবু। আমি অসহায়—অসহায়। আমার কাছে কাছে থাকুন আমার বড্ড ভয় করছে।

দীপক। কোনো ভয় নেই—আপনি আমার ঘরে চলুন, দরজা দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোন।

চন্দ্রা। আপনি!

দীপক। আমি রাত্রে কদাচিৎ ঘুমুই—আমি সূর্যোদয় দেখব, তাই এখানেই থাকবো। বই পড়েই কেটে যাবে—

চন্দ্রা। আপনি আমার রক্ষা করুন। আপনি বন্ধু, তার বন্ধু

দীপক। আপনিও বন্ধু—ভয় কি?

[বিশ্বাস দরজায় ধাক্কা দিয়ে মাতাল স্বরে বলল—চন্দ্রা, চন্দ্রা দরজা খোলো, নইলে ভাঙবো,—তার পরে পড়ে গেল]

চন্দ্রা। [উঠে দাঁড়িয়ে] দীপকবাবু, দীপকবাবু—

দীপক। কোন ভয় নেই চন্দ্রাদেবী—আমি ত আছি। আসুন—

[দীপক তাকে ধরতেই সে এলিয়ে পড়ল। দীপক তাকে ঘরে নিয়ে নিজের ঘরে শুইয়ে দিল। বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসে বই খুলল। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল। দূরে উজ্জ্বল আলো পড়েছে সমুদ্রের জলে। আধখানা চাঁদ সমুদ্রের জলে ডুবে গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চন্দ্রকান্তবসুর বৈঠকখানা। উকিলের চেম্বার, আইনের বই, চেয়ার টেবিল, মক্কেল বসবার চেয়ার বেঞ্চি। পিছনের পর্দা দিয়ে অন্দরে যাওয়া যায়। পাশের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়, সেইদিকেই সদর। অন্যদিকে আর একটা দরজা, তা দিয়ে ওদিকের ঘরগুলোয় যাওয়া যায়। টেবিলের পাশে, মুহুরী ও জুনিয়ারের বসার জায়গা। সামনে একটি তরুণ-তরুণী, এইদিকের চেয়ার থেকে দু'জন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।]

মিঃ রায়। আমরা এখন যেতে পারি।

চন্দ্র। না, বসুন মিঃ রায়। [তারা বসলেন] ওদের নথিটা একটু দিন ত। [মুহুরী নথি দিল]

রায়। কালই প্রথম হিয়ারিং, আমাদের ইচ্ছা আপনিই আগাগোড়া থাকুন। জেরাটা আপনি নিজে করুন।

চন্দ্র। আগাগোড়া আমার থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য মেন উইটনেস আমিই জেরা করবো। কোন অসুবিধে হবে না—ভার যখন নিয়েছি।

রায়। আপনি ভার নিয়েছেন বলে তাতেই আমরা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবো।

চন্দ্র। অমিয় কেসটা বুঝেছ ?

অমিয়। [জুনিয়র] গ্রে রয়েড ষ্ট্রীটের একটা অজ্ঞাত হোটেলে হানা দিয়ে কতকগুলি মেয়ে আর এদের ধরে— হোটেল-মালিকও। সবই জামিনে আছে কিন্তু স্যর এটাত পুলিশ কেস্।

রায়। দেখুন চন্দ্রবাবু, এই মামলায় যদি প্রমাণ হয় যে আমি ওখানে ছিলাম তাহলে আত্মীয়স্বজন স্ত্রী এদের কাছে মুখ দেখাব কি করে ? তারপরে আমার স্ত্রীও বড়লোকের মেয়ে, হয়ত' ডিভোর্সের মামলা করবে—

চন্দ্র। যখন ছিলেন, একটু স্ফূর্তি করেছেন, তখন তার ধকলটা সইতে হবে বৈকি ? পুলিশই আপনাকে বাঁচাতে পারে—দেখি তাদের তুষ্ট করা যায় কিনা—

রায়। আজ্ঞে সেজন্যে যা লাগে—

চন্দ্র। লাগবেই, টাকা না হলে কেউ তুষ্ট হয়, মিঃ রায় ? অমিয় তুমি ওসি'র সঙ্গে কনট্যাক্ট করে ব্যাপারটা বুঝে এস আজই। কাল দিন নিতে হবে,—দীনবন্ধু পারবে ত ?

দীন। নিশ্চয়ই পারবো বাবু, নইলে বাইশবছর বৃথাই মুহুরীগিরি করছি।

চন্দ্র। পারতেই হবে, নইলে পুলিশের সঙ্গে কথাবলার সময় কোথায় ?

দীন। শ' দুই টাকা রেখে যান, মিঃ রায়—তার পরে যা লাগে—

মিঃ রায়। দেখবেন তদ্বিরের যেন ত্রুটি না হয়। [টাকা দিলেন]

দীন। ত্রুটি ! আমি থাকতে তদ্বিরের ত্রুটি ! বলেন কি ? তদ্বিরেই জগৎ চলছে—

চন্দ্র। [তরুণ তরুণীকে] আপনাদের কি বলুন।

তরুণী। বলছি।—মানে একটু—

মিঃ। নমস্কার, -আমরা আসি।

চন্দ্র। হ্যাঁ, আসুন। [ওদের প্রস্থান] বলুন আপনার—

তরুণ। একটা ডিভোর্স কেস্। ইনি বড়ই লাঞ্ছিতা হচ্ছেন। অপমানের সীমা নেই। এই লাঞ্ছনা আর অপমান থেকে এক আপনিই মুক্তি দিতে পারেন। আপনি ডিভোর্স কেসে বিশেষজ্ঞ তাই আপনার শরণাপন্ন।

চন্দ্র। আপনি কে ?

তরুণী। উনি আমার বন্ধু—দয়া করে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

দীন। বেশ,—এবার কেসটা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন বাবুকে।

তরুণী। বিয়ের পরে যৌতুকের ব্যাপার নিয়ে শাশুড়ী স্বামী সকলেই বড় গঞ্জনা সুরু করেন তার পরে এখন সেটা চরমে উঠেছে। এমনকি স্বামী মারধোরও করেন। তিনি ত ব্যবসা নিয়ে থাকেন। ৯টায় বেরিয়ে রাত দশটায় এখানে আসেন। তার চরিত্রও ভাল নয় বলে আমার সন্দেহ। মাঝে মাঝে বোধহয় মদের গন্ধ পাই—

চন্দ্র। ইনি আপনার কে ?

তরুণী। উনি আমার এই দুরবস্থার কথা জেনে বন্ধুর মত সাহায্য করতে এসেছেন।

চন্দ্র। দেখুন, আমাদের কাছে খুনীও খুন স্বীকার করে,

তাই আমরা মামলা সাজাতে পারি। অর্থাৎ প্রসিকিউসনের অবস্থাটা বুঝে নিতে পারি। আপনি সত্যি ব্যাপারটা বলুন —তার পরে কেস্ আমরা সাজিয়ে নেব। আপনারা সাজাতে চাইলে মামলা ফেঁসে যাবে!

দীন। দেখুন দিদিমণি, এই ঘরের এই যে সব নথিপত্তর দেখছেন এর মধ্যে কত গোপন রহস্য রয়েছে কিন্তু স্বয়ং বিধাতাও তা জানেন না। জানলে পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যেত। কোন ভয় নেই, আসল কথাটা বলুন—

চন্দ্র। ক'দিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

তরুণী। বছর চারেক, বি-এ পাশ করার পরেই বিয়ে হয়—

চন্দ্র। ছেলে-পুলে হয় নি—

তরুণী। না,—সেটা ওর অভিপ্রেত নয়।

চন্দ্র। তা—এর সঙ্গে পরিচয় কোথায়?

তরুণী। আমরা একই মিউজিক কলেজে পড়ি, সেখানেই পরিচয়।

চন্দ্র। এবং যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও নিশ্চয়। আমার সময় খুব কম—প্রকৃত ব্যাপারটা বলুন। আমার মনে হয় আপনার বিবাহিত জীবনে ভালবাসা গড়ে ওঠে নি। অত্যাচার হোক আর নাই হোক, পুরাতন স্বামীর ঘর আপনি করতে চান না —এখন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন—অবশ্য উভয়তঃই। ওর সঙ্গে নতুন ঘর বাঁধতে চান। তাই ডিভোর্স চাইছেন?

তরুণী। স্বামীর কাছে যদি ভালবাসা না পাওয়া যায় তবে কেবল উদরান্নের জন্য পড়ে থাকা চলে না এবং তার চেয়ে অত্যাচার আর কি হতে পারে? আমি নতুন ঘর বাঁধতে চাই।

চন্দ্র। মানে, এর সঙ্গে। [তরুণী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল] যতদূর বুঝছি, আপনার স্বামী অবস্থাপন্ন, কিন্তু ইনি কি করেন? এডুকেশন—

তরুণ। না, আমি গ্রাজুয়েট নই। আমি মিউজিক টিউটর হিসেবেই কাজ করি। শিগ্‌গিরই দু'খানা ফিল্মের মিউজিক ডিরেকশন্ হাতে আসবে।

চন্দ্র। ভাল কথা। আপনার স্বামীর ধনাঢ্য গৃহচ্ছায়া ছেড়ে জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া কি ভাল হবে? তার চেয়ে যেমন বন্ধুত্ব চলছে তেমনি চলুক না। হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদের অনেক ঝঞ্ঝাট।

তরুণী। জীবনের ঝঞ্ঝাট এড়াতে কিছু ঝঞ্ঝাট ত আসবেই—

চন্দ্র। আপনাকে—কারণ যথা দুর্ব্যবহার, ব্যাধি, চরিত্রহীনতা, পৃথক্ ভাবে বাস প্রভৃতি প্রমাণ করতে হবে। এগুলো প্রমাণ করা খুব কঠিন। প্রথমে জুডিসিয়াল সেপারেসনের জন্যে মামলা করতে হবে। সে মামলা মিটলে তবে দুবছর আলাদা বাস করতে হবে, তার পর ডিভোর্সের মামলা হবে—সে মামলা মিটলে তার একবছর বাদে বিয়ে হবে—

তরুণী। যদি এডালটারী প্রমাণ করা যায় তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হবে না?

চন্দ্র। হতে পারে—তবে সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমি বলি এ ফ্যাসাদের দরকার কি? যেমন চলছে চলুক, তিনি ত দিবারাত্রি ব্যবসার মুনাফা খুঁজছেন—টাকা আপনাকে দিতেও কার্পণ্য নেই মনে হয়। তবে আর কেন বৃথা ঝুঁকি নেবেন?

তরুণী। যদি এডালটারী প্রমাণ করা যায়?

চন্দ্র। হতে পারে, তবে তা প্রমাণ করতে পারবেন না।

তরুণী। কিন্তু শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন—

চন্দ্র। [হেসে] তারা আপনাকে সব সময় বেরুতে দিতে চান না—এইত! সেটাত কলেজ যাওয়ার নামেই হতে পারে। যাক আমি ব্যস্ত—যদি এডালটারী প্রমাণের কাগজপত্র জোগাড় করতে পারেন তবে আসবেন। আসুন—[তরুণ-তরুণী উঠে দাঁড়াল]

দীন। কনসালটেসন ফি ষোল টাকা! [তরুণী ১৬ টাকা দিয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল]

চন্দ্র। বুঝলে অমিয়, ভদ্রলোকের ব্যবসার মুনাফা খুঁজতে খুঁজতে আসলেই লোকসান হতে চলেছে।

অমিয়। তাই ত হচ্ছে! যাদের জন্য আইন তারাত জানেই না। সুবিধাবাদীরাই সুযোগ নিচ্ছে—

চন্দ্র। এই সব মামলার খরচ যোগানোও ত যা তা ব্যাপার নয়। শেষকালে স্বাধীনতার নামে ঘরে-বাইরে সবই ভেজালে ভরে গেল!

অমিয়। তাইত হয়েছে—আজ আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য খুঁজলেও একটু খাঁটি দুধ ঘি মেলে না।

চন্দ্র। সর্বত্র ভেজাল, সম্পর্কে ভেজাল, বয়সে যৌবনে

ভেজাল, মেয়েদের চুলেও আজকাল ভেজাল। মানুষের বিবেকবুদ্ধিতেই ভেজাল বেশী হয়েছে অমিয়—

দীন। বিবেকের ভেজালেইত জগৎটা গেল—কিন্তু মারাত্মক ভেজাল হল ঔষুধের ভেজাল আর সম্পর্কের ভেজাল। দু'টোই মানুষ মারে—

চন্দ্র। দীনবন্ধুর ত বেশ বুদ্ধি খুলেছে। যাক তোমরা কালকের সব কেস রেডি করো। রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, যেতেই হবে। আচ্ছা উঠি—

[অমিয় ও দীনবন্ধুর প্রস্থান—বাইরের দরজা দিয়ে ভিতর থেকে চন্দ্রের মা বাসন্তী দেবীর প্রবেশ]

চন্দ্র। কি মা? এই যাচ্ছি চান করতে। আজ রবিবার একটু বেলাত হবেই।

বাসন্তী। আচ্ছা তুই কি চোখ বুঁজে আছিস? ঘরের বৌ এই যে বেহায়া বেলেল্লা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বলা নেই কওয়া নেই কার না কার সঙ্গে পুরী চলে গেল একটু জিজ্ঞাসা করলে না। তুই কি কিছুই করবিনে? কিছুই বলবিনে?

চন্দ্র। কাকে বলব? বললে শুনবে কেন? এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ. সে স্বাধীনতাকে ত স্বীকার করতেই হবে মা। সেইটেই যে আমাদের সভ্যতার কাম্যবস্তু।

বাসন্তী। হিন্দুর বিধবা—সে ত কিছুই মানে না। মাছ মাংস খাচ্ছে, রেষ্টুরেন্টে খাচ্ছে. শুনছি নাকি বাবেও যায়। সেও না হয় সয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু বন্ধু নিয়ে পুরী বৃন্দাবন গেলেও তুই কিছুই করবিনে?

চন্দ্র। করার কিছুই নেই মা। সমর আমাদের ছেড়ে গেল, সেই শোকে বাবাও গেলেন। যাওয়ার আগে দান পত্র উইল কিছুই করেন নি। মেঝবৌ আইনতঃ এ বাড়ীর এক চতুর্থাংশের মালিক, সে তা ভাগ করে নিয়েছে, বাবার টাকার অংশও নিয়েছে। বাপের বাড়ীতে টাকাও সে পেয়েছে। সে সাবালিকা, অর্থ সম্পত্তির মালিক, সে আমার বারণ বা তোমার বারণ শুনবে কেন?

বাসন্তী। আহা আমার সমর! প্লেন ভেঙ্গে পড়ে গিয়েও হয়ত বেঁচে ছিল। আহা কি কষ্ট যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে। [চোখ আঁচল দিয়ে মুছে] কিন্তু এ কি কাল সাপ ঘরে রেখে গেল! প্রতিমুহূর্তে বুকে ছোবল মারছে। এত যাতনা ত সহ্য হয় না চন্দর। রূপ আর বিদ্যে দেখে এই কাল সাপ ঘরে এনেছিলি?

চন্দ্র। সে কথা বলে লাভ নেই মা। যে শিক্ষা ও সংস্কার থাকলে হিন্দু বিধবার মত জীবন যাপন করা যায় তা তার নেই। তারা ভগবান মানে না, তুমি যে পূজো আহ্নিক করো এগুলো তাদের কাছে হাস্যকর। যারা জড়জগৎ, আর ভোগবিলাসের মাপে জীবনকে দেখে তাদের আমি বললেই বা কি হবে! তুমি বললেই বা কি হবে? যে সংযম থাকলে, যে শিক্ষা থাকলে মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে আচার পালন করতে পারে, তা ত তার নেই—

বাসন্তী। এই অনাচার ও বেহায়াপনা করে সে আমাদের মুখে চুনকালি দিচ্ছে, সংসার পুড়িয়ে ছারখার করছে, আমাদের সব কিছু পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে এর কি কোন প্রতিকার নেই।

চন্দ্র। না মা, এ বাড়ীতে তার অংশে বসে সে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে, তাতে আইনতঃ কিছু বলবার নেই—

বাসন্তী। সে যদি মুসলমান কি খৃষ্টান বিয়ে করে বাড়ীতে ঢোকে তবুও কিছুই বলবার নেই?

চন্দ্র। মা আমি উকিল। এই আমার ব্যবসা—বর্তমানের আইন অনুসারে তার কোন প্রতিকার নেই।

বসন্ত। তবে এ বাড়ী ভাড়া দিয়ে অন্য কোথায়ও চল—না হয় আমাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দে। আমার সমরের বৌ এইরকম বেলেল্লাপনা করে বেড়াবে, এ দেখতে হবে! সে কোন লোকের সঙ্গে পুরীতে স্ফূর্তি করতে গেল—এও বেঁচে থেকে দেখতে হবে।

চন্দ্র। বললাম ত, যদি মুসলমান বিয়ে করে এবাড়ীতে এসে নিষিদ্ধ মাংসও সস্তারা দেয়, তাতেও কিছু বলবার নেই।

বাসন্তী। কোন উপায়ই নেই?

চন্দ্র। আপাততঃ নেই। তবে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে যদি রাজি করা যায়—তবে হয়। সে বাপের বাড়ীরও অংশ পেয়েছে, সেখানে বাস করুক, তার ঘরক'টা আমাদের কাছে ভাড়া দিয়ে যাক। আমরা ভাড়া যা হয় দেব।

বাসন্তী। তাও ত সে যাবে না। সে এখানে বসে আমার আর তোদের মুখে চুণকালি দেবে। ভাইদের মুখে দিতে যাবে কেন? বড়বৌমাকে দিয়ে তাও ত বলিয়াছিলাম।

চন্দ্র। কি বললে?

বাসন্তী। বললে, -আমার বাড়ীতে আমি বাস করবো কি ক'রবো না সে সম্বন্ধে হিতোপদেশ দিতে হবে না। না হয় শোনো, বৌমার মুখে—ও বড়বৌ মা—[চন্দ্রের স্ত্রী গৌরীর প্রবেশ]

বাপের বাড়ী যেয়ে থাকার কথায় সেজ বৌ কি বলেছিল – বলতো—

গৌরী। সেখানে সে যাবে না। মা, চন্দ্রা সাহেব বাড়ীতে সেইভাবেই মানুষ। ওরা নামেই হিন্দু কিন্তু ঠাকুরদেবতা কিছুই মানে না। সে এখন বিধবা হয়ে বিধবার ব্রত পাল পার্বণ মানবে কি করে? জীবনভোর ফ্লার্ট করেছে, হোটেলে রেস্তোরায় খেয়েছে, স্বাধীনভাবে বেড়িয়েছে—সে সেই শিক্ষাই পেয়েছে। আমি তাই মাকে,—মনে করুন একঘর-ভাড়াটে আছে। সেও এম, এ পাশ করেছে, যুক্তি তর্কে তার সঙ্গে কে পারবে?

বাসন্তী। আমার সমরের বৌকে আমি কেমন করে ভাড়াটে মনে করবো? রঞ্জুকে আমি কোন প্রাণে রাক্ষুসীর হাতে ছেড়ে দেব।

চন্দ্র। শোনো মা। শিক্ষা দীক্ষা ডিগ্রী অর্থবিত্ত রূপ সবই তার আছে, যুক্তিবুদ্ধিও তার যথেষ্ট। ভাল ছাত্রীও সে ছিল কিন্তু আমাদের এই বেদনা, তোমার মনের এই দুঃখ যাতনা বুঝবার হৃদয়ত তার নেই! যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা হৃদয়কে জাগ্রত করা যায় না মা। অন্যের হৃদয়ের দিকে তাকানোর শিক্ষা ও হৃদয় সে পায়নি। তুমি দুঃখ ক'রো না। সমর নেই, সে চলে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে ত সবই গেছে, ভেবে নও সবই গেছে। [চন্দ্রের গলা ভারী হল]

বাসন্তী। সবই গেছে, সবই যেতে বসেছে কিন্তু রঞ্জুকে আমি কোন প্রাণে ভাসিয়ে দেব? ও যে রঞ্জুকে চিবিয়ে খাবে—সে যে আমার সমরের মেয়ে।

[রঞ্জু চন্দ্রা ও দীপকের প্রবেশ। পিছনে চাকর গণেশ সুটকেশ ও ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করল]

রঞ্জু। ঠাকুমা, আমরা চলে এসেছি। পুরীর সমুদ্রে কত বড় ঢেউ জানো?—উই এত বড়। [বাসন্তী রঞ্জুকে কোলে নিলেন। দীপক বাসন্তী বড়বৌ ও চন্দ্রকে প্রণাম করল। চন্দ্রা কাউকে প্রণাম না করে চাকরকে ইসারায় আসতে বলল। গণেশ সুটকেশ বেডিং নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকলো। চন্দ্রাও পিছন পিছন গেল]

বাসন্তী। কে দীপক! সমর আমায় ছেড়ে গেছে দেখে তোমরাও ছেড়ে গেছ! সমরের সঙ্গে সঙ্গে সবই গেছে! [দীপক অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে]

গৌরী। সত্যিই ঠাকুরপো, মানুষ যে মানুষকে এত সহজে ভুলে যায়, তা জানতুম না।

চন্দ্র। সমর জার্মানী যাওয়ার পরে আর একটিবারও এলে না!

দীপক। অপরাধ স্বীকার করছি বৌদি। তবে আমার জীবনেও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেল তাই ভুলও হল।

বাসন্তী। তা তুমি রঞ্জু আর বৌমাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে? কোথায় দেখা?

দীপক। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চন্দ্রা দেবীও সেই হোটেলেই উঠেছিলেন। প্রথমে চিনতে পারিনি—অনেকদিন দেখিনি ত!

চন্দ্র। তা চলে এলে?

দীপক। পুরীতে সে কি বৃষ্টি! কার সাধ্যি ঘর থেকে বেরোয়? তাই ঘরে বসে পচে কি হবে। চলে এলাম, উনিও এলেন।

চন্দ্র। বৌমা হঠাৎ তোমার সঙ্গে চলে এলেন কেন? ঠিক বুঝছি না। [দরজার পর্দার আড়ালে চন্দ্রাকে দেখা গেল]

দীপক। সে অনেক কথা। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওয়েটিং দিতে হবে। এখন যাই—

বাসন্তী। সে কি দীপক! এই দুপুরে বৌমাকে পৌঁছে দিয়ে না খেয়ে যাবে কি? ট্যাক্সি ছেড়ে দাও—ওবেলা যাবে। খেয়ে সুস্থ হয়ে পরে যাবে।

রঞ্জু। না কাকু, তোমার যাওয়া হবে না—আমরা একসঙ্গে খাবো।

গৌরী। এখন কোথায় আছ তুমি?

দীপক। বাসা করেছিলাম বিয়ের পরে—এখন সেখানেই থাকি ভোজন যত্র তত্র।

বাসন্তী। তুমি এখন সেখানে গিয়ে না খেয়ে থাকবে। তুমি আমাদের কী ভেবেছ বলত দীপক! আমি সমরের মা, সেটা একেবারেই ভুলে গেছ! তোমরা দু'জন আমার হাতে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছ না? গণেশ ট্যাক্সিটাকে যেতে বল। [গণেশের প্রবেশ]

চন্দ্র। আমি ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আসছি। গণেশ তুই যা, বৌমার ঘর দোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে দিয়ে আয়। উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান]

গৌরী। সেই সঙ্গে শুনে আসবি গণেশ, ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলে খাবে না কি করবে! এ বাড়ীতে এসেত খাবে না! এখন কোথায় কি ব্যবস্থা হবে? [চন্দ্রাকে দেখতে পেয়ে] এই যে চন্দ্র, তুমি চান করে নাও, আমি ঠাকুরকে দিয়ে ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেব ত? রঞ্জু এখানেই থাক, কি বল?

চন্দ্রা। দেবেন। [সে দরজা থেকে সরে গেল]

গৌরী। ঠাকুরপো, একটু চা খেয়ে চান করবে ত? গাড়ীর ধকল ত কম নয়। তুমি বসো, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান]

রঞ্জু। জানো, ঠাকুমা, কাকু আমাদের নিয়ে কত বেড়াতো। আমাকে এত কড়ি দিয়েছে! জগন্নাথ ঠাকুরের চেহারা কি বিশ্রী। ঠাকুর কাঠের—কালো কাঠের তৈরী।　　[চা নিয়ে গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। ঠাকুরপো, চা খেয়ে চান করে ফেল। তোমরা ক'জন একসঙ্গেই খাবে অনেকদিন পর। আয় রঞ্জু চান করবি, তার পরে পুরীর গল্প শুনবো—আয়। [রঞ্জুকে হাত ধরে নিয়ে গেল। চন্দ্র বাহিরের দিক থেকে এল]

চন্দ্র। দীপক, হাওড়া থেকে ট্যাক্সি চোদ্দ টাকা উঠল কি করে?

দীপক। এখানে আসবো তাত ঠিক ছিল না। প্রথমে উনি বাপের বাড়ী যাবেন ঠিক করেন, তার পরে কাছাকাছি যেয়ে মতের পরিবর্তন করে এখানে এলেন। ট্যাক্সি ভাড়াটা আপনিই দিলেন নাকি?

চন্দ্র। আমার বৌমাকে আনতে ট্যাক্সি ভাড়া তুমি দেবে নাকি! মা তুমি খাওয়ার ব্যবস্থা কর গিয়ে আমরা যাচ্ছি। অময় এখনো এল না।

বাসন্তী। তাড়াতাড়ি চান কর, গাড়ীর ধকল আছেত! অমর এসে পড়বে—　　[প্রস্থান]

চন্দ্র। সমর তো আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। মায়ের চোখের জল পড়ছে নিশিদিন। তার মাঝে বৌমার হঠকারিতা অবিবেচনা তাকে আরও অস্থির করে তুলছে। এমন সুখের সংসার ছিল আমাদের, কি পাপে কি হল?

দীপক। পাপ অবশ্যই আছে দাদা,—সেটা আপনাদের নয়, যুগের পাপ।

চন্দ্র। [একটু চুপ করে থেকে] যাক্ তোমার খবরই বল। কি বলছিলে ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে তোমার উপর দিয়ে—

দীপক। পরীক্ষায় ফেল করেছি, একথা বলা বড় কঠিন দাদা। ওকথা তাই বলতে ইচ্ছে করে না। বলতে লজ্জা পাই—

চন্দ্র। তবুও যারা নিকট, তাদের কাছে বলতেই হয়, নইলে সান্ত্বনা পাবে কোথায়? লজ্জার কিছুই নেই। জীবন-ভোর ফেল পাস রয়েছে।

দীপক। সমর যখন জার্মানীতে গেল, সেই সময়েই আমি বাবা-মা দাদাদের অমতে এক অসবর্ণ বিয়ে করেছিলাম। বাবা এত বড় পণ্ডিত লোক হয়েও ভয়ানক কনজারভেটিভ তা ত জানেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ত্যাগ করেন, দাদারও আর সম্পর্ক রাখেন নি।

চন্দ্র। কেন, তোমার মা! তিনি কি বললেন? মায়েরা ত সর্বংসহা ধরিত্রী।

দীপক। কি বলেছেন জানিনা, তবে কাঁদতেন শুনেছি। বাবা জানালেন। বাবা মা দাদাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে, নিজের সুখের জন্যে স্বাধীনভাবে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে যদি সুখী হতে চাও, হও। কিন্তু তুমি ফিরে আসতে পারবে না। ব্যক্তিজীবন একক নয়, সামগ্রিক এই সত্য একদিন বুঝবে, সেদিন ফিরে আসতে চাইবে কিন্তু জেনো সেদিন আমায় গৃহদ্বার রুদ্ধই থাকবে, তা খুলবে না, কিছুতেই খুলবে না—

চন্দ্র। তারপর?

দীপক। তারপরে বছর দু'য়েক বাদে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মামলা করে নয় নিজেদের মধ্যেই চুক্তি করে মুক্ত হই। তারপরে একাই আছি। ছুটিতে পুরী গিয়েছিলাম—ছুটি না নিলে আমাদের ছুটি আবার পচে যায়—

চন্দ্র। তা সে বৌমা এখন কোথায়?

দীপক। যতদূর জানি, সে আবার বিয়ে করেছে। মনে হয় সুখেই আছে—

চন্দ্র। তা এখনত বাবা মায়ের কাছে ফিরে যেতে পার।

দীপক। তাঁরাও বলেছেন, তাঁদের মত যদি বিয়ে করে সংসারে থাকি, তবেই তারা আমাকে গ্রহণ করবেন।

চন্দ্র। সেটা ত ভালকথা। বাবা-মা সুখী হবেন এটাত সনাতন কথা। ঘরে যেয়ে সকলের সঙ্গে হৈ-হাল্লা করে জীবন কাটানোই ত আনন্দের। মা একটু শাসন করল না, বৌমা একটু সমীহ করল না, ভাই একটু আব্দার করল না তবে সারা জীবনটা কি? আপনি আর কপনি সে কি ভাল লাগে! আমারত ভাল লাগে নি।

দীপক। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। মাথা নীচু করে অগৌরবে যাবো!

চন্দ্র। ধুত্তোর! বাপমার কাছে আবার পরাজয়, অগৌরব কি! মা'ত এখনও আমাকে যাচ্ছে তাই বকে আমারত বেশ লাগে। ইচ্ছে করে বকুনা খাই।

[বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। হ্যারে চন্দর, দীপক কি চান করবে না খাবে না? এখন এই বেলা একটায় গল্পের ছালা খুলে বসলি? বুড়ো হলি তবুও আক্কেল হল না। একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হল না!

চন্দ্র। এইত যাচ্ছি মা।

বাসন্তী। শিগগির উঠে আয়, এস দীপক। ওর পাল্লায় পড়লে আর খাওয়া হবে না—[বাসন্তীর প্রস্থান]

চন্দ্র। দেখলে দীপক, মার গালাগালিটা কেমন মধুর। চন্দ্রকান্ত উকিলের ভয়ে জজ ব্যারিষ্টার কাঁপে, তাকে দিব্যি বে-আক্কেল, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে দিলেন মা। চল চল আর দেরী নয়। [উভয়ের ভিতরের দিকে প্রস্থান

[গণেশ প্রবেশ করে, একটা ময়ুরের পাখনার ঝাড়ন দিয়ে টেবিল বই ঝাড়তে সুরু করল। কাগজ পত্র ও গুছিয়ে রাখল] [অমরের প্রবেশ]

অমর। গণেশ দা, দাদা কোথায়? বৌদি কোথায়?

গণেশ। খাইয়ে শুতি গেছেন। বৌদিরা খাচ্চেন—

অমর। তার মানে? এইত সাড়ে বারো। এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল! মা কোথায়?

গণেশ। তোমার জন্যি, না খা'য়ে শুয়ে আছেন। তা এত দেরী ক্যান? যাওনা ভিতরি, দ্যাখনা ঠ্যালাখান—

অমর। কল ছিল,—ডাক্তারদের কি সময় ঠিক থাকে!

গণেশ। থাক, আর গাল গল্প করতি হবে না। তুমি আবার ডাক্তার, তোমার আমার কল!

অমর। তার মানে? জানো, এম, বি, বি, এস-এতে আমি ক'টা গোল্ডমেডাল পেয়েছি।

গণেশ। জানতি বাকী নেই, আমার অম্বলের ব্যথাটাই সারাতি পারলে না। আবার কল? কলের গল্পো করতিছ।

অমর। যার জলযোগে ২৬ খানা রুটি লাগে তার অম্বল সারাবার অষুধ আবিষ্কারই হয়নি।

গণেশ। তার মানে পেট ভরে খাতি পাবো না! কি ডাক্তারই তুমি!

অমর। (ষ্টেথস্কোপ নিয়ে, দেখি গণেশদা তোমার পেটটা ভাল করে। অম্বলই সারল না কেমন কথা। [পেটে ষ্টেথো, দিয়ে, টিপে] হ্যাঁ যা ভেবেছি তাই—

গণেশ। তা কি দেখলে?

অমর। পেট-টা খালি তাই বেদনা হয়। ২৬ খানা রুটি এই দিকে চলে যায়, আর ৭৬ খানা যদি এদিকে চালানো যায়, তবে কিছুতেই বেদনা হবে না।

গণেশ। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি ৭৬ খানা রুটি খাই?

অমর। আহা-হা, খাবে কেন? খাওয়া দরকার। আচ্ছা আচ্ছা দেখছি পেটের এদিকটা কেটে ছোট করে দিলেও হয়।

গণেশ। আমার পেট কাটবা? এই তোমার ইচ্ছে। দাড়াও মাকে বলে দিচ্ছি, কল না ছাই ছিল তাস খেলতি গিছিলে, বলে দিচ্চি—

অমর। চোটছো কেন গণেশদা! বলনা, মা রাগ করেছে খুব? দাদা?

গণেশ। যাও না, ছাখো গিয়ে হুড়োটা কেমন।

[অন্দর থেকে বাসন্তী বললেন]

বাসন্তী। ওরে গণেশ, অমর এখনও ফিরলো না।

গণেশ। এই আলেন বাবু। আসেই আমার পেট কাটাতে চাচ্ছেন।

অমর। এই এসে গেছি মা, তুটো কল ছিল তাই দেরী হয়ে গেছে।

বাসন্তী। কল্ ছিল তা ওবেলা গেলেই পারলি, তা যখনই দেখা হয় তখনই গণেশের পেট কাটতে চাস্ কেন? ও তোর দাদা হয়না? ওর সঙ্গে ঠাট্টা করিস্—

অমর। কখ্‌খনও না, গণেশদা, আমি তোমায় ঠাট্টা করছি? বল, উপরে ভগবান সামনে মা, বল ঠাট্টা করেছি?

গণেশ। না ঠাট্টা নয়ত কি? তোমার কল্ ছিল?

অমর। আমি শুধু বলেছি, ২৬ খানা রুটিতে যার জলযোগ হয় তার অম্বলের ব্যায়রাম সারানোর ওষুধ আবিষ্কার হয়নি—আমেরিকায় গবেষণা চলছে—

বাসন্তী। বাড়ীতে পা দিয়েই আরম্ভ করেছিস্? এখন চান করে খেয়ে তবে সুরু কর—

[বাসন্তী ও অমর ভিতরে গেল। গণেশ ধুলা ঝাড়তে লাগল মঞ্চ ঘুরে গেল]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছেদ

এম, আতাউল্লাহ

উপকণ্ঠ শহরের সীমানা পেরিয়ে—
তুমি আমি কতদিন বিকেলের সফল সফরে
ভাসিয়ে দিয়েছি নরম কাগজের মত মন।
ক্রমশঃ দুর্বোধ সত্তার গভীরে তোমাকে
ডুবিয়ে দিতে চাইনি কখনো—
সত্যি-কিংবা মিথ্যে ভাবো যা খুশী তোমার,
নির্মম নির্বাক চোখ বিঁধ না'ক আর।

কাঁটা ঝরা খেজুরের ঝোপের ছায়ায়
পশ্চিমের রক্তসূর্য সন্ধ্যার আঁচল
দেখেছি আদিগন্ত শান্ত সমুজ্জ্বল;
বিস্ময়ে প্রদীপ্ত তোমার দু'চোখ।
উর্বর মাটির মত নিবিড় পুলকে
রহস্য-হৃদয়ে ছিল কোন যোগাযোগ।

সে স্বপ্ন কোথায় আজ, পটভূমি স্তব্ধ, শিথিল
প্রেয়সী নামের মধু কোন উষর মরুতে
সম্পূর্ণ শোষিত; অবশেষ হৃদয়ের সীমাহীন খেদ।
অভিযোগ তুলে নাও, মর্মের শীল রক্তে দাও মুছে দাও
ভ্রান্তির ছায়ায় গড়া দীর্ঘায়িত ছেদ!

নববর্ষ প্রশস্তি

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

উষা!
বর্ষদেবতা তুমি।
তোমার উদয়ে—
শুচিশুভ্র আলোর ঝলক—
দূর ক'রে দিক—
দুঃখ-দৈন্য-ক্লান্তি সকলের।
অনাবিল আনন্দে মুখরিত হো'ক চতুর্দিক—
জল-স্থল-আকাশ-বাতাস।

*   *   *

অমিতপ্রভা তোমার।
তোমার আধারে প্রকাশ—
কল্যাণের স্বরূপ তপন—
বিশ্বপ্রাণ।
তপনের সোনাগলা রোদ
দিক থেকে দিকে
ঝরে পড়ুক।
ভরে উঠুক পৃথিবীর বুক—
বনজ সম্পদে।
দেশ থেকে দেশান্তরে খেলুক সৌভাগ্য—
সতেজ সবুজ।

ঋগ্বেদের উষা মন্ত্রের ভাবার্থ অবলম্বনে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী

লীলা বিশ্বাস
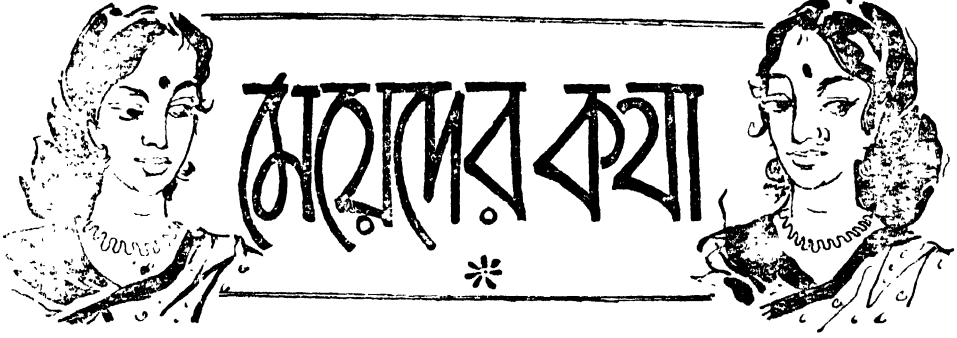
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিদায় অভিশাপ কবিতায় দেবযানী বলছে কচকে—মানুষ কি শুধু বিদ্যার জন্যেই সাধনা করে? সে বলছে —"রমণীর মন সহস্রবর্ষের সখা সাধনার ধন।" প্রতিদিনের সাধনা প্রতিমুহূর্তের জাগ্রত মনোযোগ দিয়েই স্বামীকেও তার বিবাহিতা স্ত্রীর হৃদয় পেতে হয়। উদাসীন স্বামী নিজেকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তার পরে একদিন যখন সে এই বঞ্চনার গুরুতর ক্ষতি উপলব্ধি করে, তখন আর প্রতিকারের উপায় থাকে না। নারীর চিত্ত শুধু অত্যাচারই বিমুখ হয় না, তা উদাসীনতার বিরুদ্ধে আরও বেশী-বিদ্রোহ করে। এই জন্যে একটা চলতি বিশ্বাস আছে যে, যে স্বামী স্ত্রীকে ধ'রে মারে, মেয়েরা তাকেই বেশী ভালোবাসে। সেকসপীয়র লিখেছেন তার "টেমিং অফ দি শ্রু" নাটকে, দজ্জাল স্ত্রীকে কেমন করে শাসিয়ে বাধ্য করতে হয়। সেকসপীয়র স্ত্রী-চরিত্র জানতেন, তিনি মিথ্যে লেখেন নি। আর লোকে যা বলে তাও মিথ্যে নয়। সত্যিই মেয়েরা উদাসীনতার চেয়ে মারও বেশী পছন্দ করে। মারের চেয়েও উদাসীনতার মার তাদের গায়ে বেশী বাজে। ভিতরের কথাটা হ'ল এই যে স্বামী যখন মারে তখন পাঁচজনে তা দেখে, মার খাবার পরে সে যখন স্ত্রীকে আদর করে তখন সেটা কেউ দেখে না।

যে স্বামী মারে সে যদি আদরও করে, তাকে নিয়ে স্ত্রী সন্তুষ্টই থাকে। কিন্তু যে মারেও না, আদরও করে না তাকে নিয়ে সে কি করবে, সে যে তাকে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখে। হৃদয়ের উপবাস নারী সহ্য করতে পারে না, এতই সে হৃদয়-সর্বস্ব।

আমাদের সমাজে মুখের কথায় নারীর মান কম নেই। তবে সেটা নিতান্তই যাকে বলে কথার কথা, অর্থাৎ কাজের কথা নয়। ঠিক যেমন মান আমরা দিয়েছি গরুকে। মুখের কথায় আমরা বলি গোমাতা, কিন্তু কাজের বেলায় তার গোয়াল ঘরের এমনি দুর্দশা যে আমরা ঘরের অপরিচ্ছন্নতা বোঝাতে হ'লেই বলি 'ঘর যেন গোয়ালঘর' 'চিরকুমার সভা' নাটকে চন্দ্রবাবু বলছেন—আমরা মুখে গরুকে পূজা করি আর গরুর অশেষ দুর্গতির প্রতি উদাসীন হ'য়ে থাকি, আমার মতে এরকম মিথ্যা ভাবালুতার চেয়ে লজ্জাকর জিনিষ আর কি আছে? আমাদের সমাজে মেয়েদের যে শক্তি, দেবী ইত্যাদি নামে ডাকা হয়, সেও একটা মিথ্যা ভাবলুতা মাত্র। 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে কবি বলেছেন আমাদের পুরুষরা যে দেবতা তার অর্থ সংসারের সমস্ত ভোগ, সমস্ত সুখ, সমস্ত সেবা তাদেরই জন্যে, আর আমাদের মেয়েরা দেবী এই অর্থে যে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত পদসেবা এবং পাদপীড়ন (লাথি) তাদেরই জন্য। কবি লিখেছেন—"দেবী, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিংবা আড়াইখানি মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা, যে তোমরা যে সুখ-স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী, একথা মুখে উচ্চারণ করিলে

হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের। আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা, প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের এবং দুর্লভ মানব জন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পাদপীড়ন সহ্য কর। প্রণিধান করিয়া দেখিলে এই দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।" অর্থাৎ যাকে ঠকাতে হ'বে তাকে একটা বড়ো নাম দিতে হয়। যার কাছে মোটা চাঁদার অংক আদায় করতে হবে, তাকে প্রেসিডেন্ট করার মত। আমাদের সমাজ মেয়েদের কাছে মোটা রকম ত্যাগের চাঁদা আদায় করতে চায় ব'লেই তাকে মিথ্যে দেবী নাম দিয়েছে, তার প্রতি কোন শ্রদ্ধা করে নয়।

কবি লিখেছেন বাঙালী পুরুষের সমাজে সংসারে কোন বৃহৎ মূল্য নেই বলেই সে অন্তঃপুরে নিজেকে দেবতা ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সংসারে যদি তার সত্যিকারের যোগ্যতা থাকত, তাহ'লে সে সহজে মানুষরূপেই মেয়েদের কাছে সম্মান পেত। কিন্তু তার মধ্যে যথেষ্ট মনুষ্যত্ব নেই বলেই তাকে দেবতা সেজে থাকতে হয়। যেখানে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সেখানে তাকে যদি কেউ দেবতা বলে পূজো করতে আসে, তাতে সে লজ্জা পায় এবং সেই লজ্জার বশে সে দেবতা হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দেশের অযোগ্য পুরুষ নিজের মিথ্যে দেবত্বের কথা নিয়ে অহংকার করে থাকে। আমাদের দেশের মেয়েদের পতিভক্তি কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আধুনিক মেয়েদের পতিভক্তি কম বলে আমাদের পুরুষরা উপহাস করেন, কিন্তু তাদের যদি এতটুকুও রসবোধ থাকত তাহ'লে সে বিদ্রূপ তাদের গায়েই গিয়ে বাজত। এদেশের মেয়েদের পতিভক্তি শেখানোর চেয়ে, পুরুষদের সত্যিকারের মানুষ হতে শেখানো বেশী দরকার।

কিন্তু কবি আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিটাকে দেখে বলেছেন, আমাদের মেয়েরা যে পুরুষদের দেবতা ব'লে মনে করে, তাদের মনের সেই ভুল দূর ক'রে দিলেও মেয়েদের তাতে ক্ষতিই হবে, লাভ হবে না। মেয়েরা নিজের কল্পনা নিয়ে খেলা ক'রে দিন কাটায়। ছোটবেলায় সে মাটির পুতুলকে প্রাণবান ব'লে কল্পনা করে, তেমনি বড় হ'য়ে সে অযোগ্য, হীন, পুরুষমানুষকেও দেবতা ব'লে কল্পনা ক'রে তার সংসারখেলা খেলে। ছোটমেয়ের মাটির পুতুল ভেংগে দিলে তার যেমন দুঃখ হবে, বড়ো বয়সে পুরুষ মানুষের দেবত্ব নেই একথা প্রমাণ ক'রে দিলে তার মনে ঠিক তেমনি ব্যাথাই বাজবে। এতে তার কোন লাভ হবে না।

আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কার মতে রামচন্দ্রের সীতাকে ত্যাগ করাটা একটা মহত্ত্বের উদাহরণ। কিন্তু মহত্ত্বের এই আদর্শ কবি রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আগেও আর একজন কবি রামচন্দ্রের কাজের সমালোচনা করেছেন। তিনি হ'লেন কবি ভবভূতি। 'উত্তর রাম চরিত' নাটকে সীতার দুই সখী, তমসা ও মুরলা, রামচন্দ্রের নামে অভিযোগ করে তাকে বলছে—'ব্যাধ যেমন করে পাখীকে ভুলিয়ে এনে তাকে হত্যা করে, তুমিও তেমনি নৃশংস ব্যাধের মতই সেই সরলা সীতাকে ভুলিয়েছ।'

গল্পগুচ্ছের চারটি গল্পে কবি লিখেছেন শ্বশুরবাড়ীর বদ্ধ সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদার পিতার সাহচর্য্যে উদার হিমালয়ের মুক্ত প্রকৃতির বুকে লালিত মেয়ে হৈমবতী দিনে দিনে শুকিয়ে উঠতে লাগল। তার বয়স নিয়ে নিন্দা হবে বলে শাশুড়ি লোকের কাছে তার বয়স কমিয়ে বল্লেন। তাই শুনে সে নিজের সত্য বয়সের কথা বলে দিল। এতে শাশুড়ী তার উপরে রেগে গেলেন। কিন্তু এই সমস্ত মিথ্যার ইংগিত, সে মেয়ে বুঝতেই পারে না, এমনি সত্যের উদার পরিবেশে সে শিশুকাল থেকে মানুষ হয়েছে। তাই এই সংকীর্ণ পরিবারের রুদ্ধতার মধ্যে এসে তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠল। কবি লিখেছেন সেই মেয়ের বাপ ছিলেন, যেখানে তিনি থাকতেন, সেই হিমালয়ের মতই উদার, শুভ্র এবং পবিত্র। কবি এই গল্প লিখেছেন ঐ মেয়েটির স্বামীর জবানিতে। সে বলছে—"ওর আসল নাম গোপন রেখে ওকে বলব হৈমবতী।" ও যেন হিমালয়েরই দুহিতা। হৈমবতীর বাপ যখন তাকে নিতে এলেন তখন শ্বশুর শাশুড়ী তাকে যাবার অনুমতি দিলেন না। অবশেষে একদিন ওর স্বামী গেল

এমব্রয়ডারী শিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী 'শেভরন-ষ্টিচ্' (Chevron Stitch, 'ফ্লাই-ষ্টিচ্' (Fly Stitch) ও 'রুমানিয়ান ষ্টিচ্' (Roumanian Stitch) পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে নীচের নমুনামতো ছাঁদে সৌখিন সুন্দর বালিশ ও কুশন প্রভৃতি রচনা করা যাবে, ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দেওয়া হয়েছে।
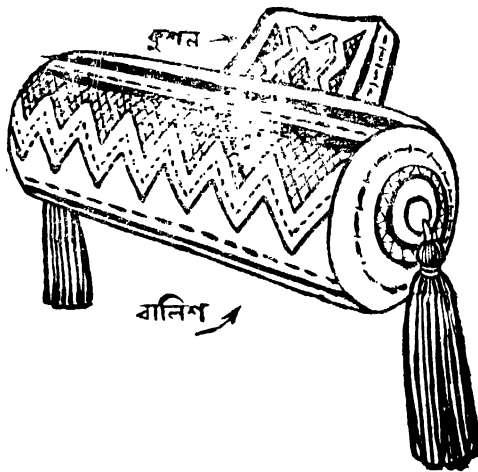
উপরোক্ত সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতি অনুসারে, কি উপায়ে নকশা-নমুনামতো ছাঁদে গৃহ-সজ্জার উপযোগী সৌখিন সুন্দর বালিশ ও কুশন রচনা করা যাবে, আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

উপরের নক্সা-নমুনাতে দেখানো বালিশের দুই প্রান্তে গোলাকার অংশের কিনারায় সরু ছাঁদের লাইন দুটি রচনার জন্য—শেভরন-ষ্টিচ' ও 'ফ্লাই-ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে, নীচের ২নং ছবিতে যেমন হদিশ দেওয়া হয়েছে, তারই ঈষৎ রকমফের করে সযত্নে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের সুষ্ঠু পরিপাটি ফোঁড় তুলে। বালিশের দুই প্রান্তে গোলাকার অংশের মধ্যভাগে যে 'আলঙ্কারিক-নক্সাটি' (Decorative motif) রয়েছে সেটি রচনা করতে হবে নীচের নকশা-নমুনাতে দেখানো 'শেভরন-ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে।
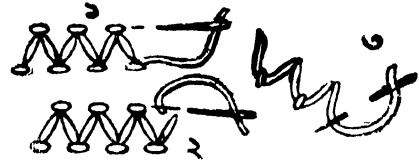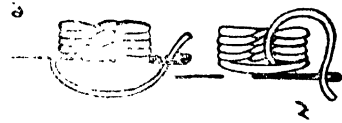
এবারে বালিশের পাশের বড়-অংশে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের নকশা-রচনার মোটামুটি পরিচয় দিই। বালিশের পার্শ্বভাগের উপরের ও নীচের অংশে সরু রেখার মতো যে 'পাড়' বা 'বর্ডার' (Border) দেখানো রয়েছে, সেটি রচনা করতে হবে—সমান-লাইনে আগাগোড়া সাধারণ-ধরণের 'ব্যাক্-ষ্টিচ্' (Back Stitch) কিম্বা 'ষ্টেম-ষ্টিচ্' (Stem Stitch) সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে। বালিশের মধ্যভাগের 'আলঙ্কারিক-নকসা'টি রচনা করবেন 'শেভরন্ ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে। আলঙ্কারিক-নকসাটির' উপরভাগে চওড়া-ছাঁদের যে দুটি 'পাড়' বা 'বর্ডার' রয়েছে, সেগুলি রচনার জন্য 'রুমানিয়ান ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে হবে। তাহলেই আগাগোড়া বেশ সৌখিন-সুন্দর ছাঁদে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে বালিশটিকে অলঙ্কৃত করা যাবে।

বালিশ অলঙ্করণের মতো পদ্ধতিতে উপরোক্ত বিবিধ সেলাইয়ের ফোঁড তুলে সহজেই কুশনটিকেও সূচীশিল্পের বিচিত্র নকশায় ভূষিত করে তোলা যাবে—কাজেই সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি ধরণের সেলাই-এর ফাঁড় তোলার হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

কন্যা বিদায়

সতীন্দ্র নাথ লাহা

(১)

খেলা নিয়েই মত্ত থাকে
কত তাহার ছল—
গাছ-চালানি ধিঙ্গি মেয়ের
সদাই বাজে মল্ ।
গুলতি নিয়ে করবে তাড়া,
খেলবে না সে রান্না বাড়া
গাছ কোমরে আঁচল বেঁধে
পাড়বে গাছের ফল ।
খেলা নিয়ে মত্ত থাকে
বাজছে সদাই মল ।

(২)

দোলনা বেঁধে দুলতে জানে
ইচ্ছে চলেই তার—
কখন কাকে উল্টে দেবে
সেটাও বোঝা ভার ।
মা বাপ যে তার ভয়েই সারা
এই মেয়ে কে দেয় পাহারা !
কিচ্ছুতে কি বাগ মানে না
করলে তিরস্কার
কখন কাকে উল্টে দেবে
সেটাও বোঝা ভার ।

(৩)

চিরটা কাল এমনি করে
কাট্‌বে না তো তার !
ডাক্-সাইটে দস্যি মেয়ের
কে-ইবা নেবে ভার
কয়লা কালো যায় না ধুলে
কে আর ঘরে রাখছে তুলে ।
আসছে বছর ফাগুন এলে
হোক সে পগার পায় ।
ডাক্‌সাইটে দস্যি মেয়ের
কে-ইবা নেবে ভার !

(৪)

ফাগুন এল যথা সময়
বিদায় হলো মেয়ে
কোকিল পাখী সব ডালেতে
চেঁচায় গেয়ে গেয়ে ।
বর চলে তার ঘোড়ায় চেপে
পালকিতে বৌ উঠ্‌লা কেঁপে,
মা'মণিকে জড়িয়ে ধরে
হঠাৎ কাছে পেয়ে
মনটা মায়ের পড়লো ভেঙ্গে
জল ঝরে গাল বেয়ে ।

(৫)

দস্যি মেয়ে বিদায় হলো
ভালোই বলে লোকে ।
একটা কথাও কেউ বলে না
কাঁদেওনা তার শোকে ।
মা'মণি তার কেমন ধারা -
কা'র ডাকে ছায় না সাড়া,
চোখ মোছে আর বিড় বিড়িয়ে
যাচ্ছে কেবল বোকে—
দস্যি মেয়ে বিদায় হতে
ভালোই বলে লোকে ।

স্বাপ্নিক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

(১)

এলোমেলো স্বপন দেখা—
সে যে আমার ভালোই লাগে,
সাত সাগরের ঢেউয়ের দোলা
বুকের তটে সদাই জাগে !
আমি সে কোন্ অলস ভেলা
ভেসেই চলি সারাবেলা,
ঘুম্তি নদীর মেদুর স্রোতে
স্নিগ্ধ তরল অনুরাগে।

(২)

তেপান্তরের উদাস মাঠে
বেড়াই ঘুরে মনে মনে,
সখ্য আমার সবার চেয়ে
দুঃখী রাজার পুত্রসনে।
পক্ষীরাজের সোয়ার আমি
উড়েই চলি দিবসযামী ;
সপ্তডিঙায় বেড়াই চড়ে
ধনপতির পণ্যসনে !

(৩)

মেরু—মরু—শৈলশিরে
কল্পনাতেই করি বিহার,
আকাশকুসুম—তাও তো খুঁজি,—
কে জানে ভাই অর্থ ইহার ?
গজমোতির মালা গাঁথি
কাটাই আমি আধেক রাতি ,
কঙ্কাবতীর বিয়ের থালায়
দূর্বা তুলি এবং নীহার।

(৪)

যে-নীল পাখী নেইকো বনে
যে-ফুল ফুটে রয় না শাখে,
আমার মনে সে ফুল ফোটে,
সেই পাখীটাই নিত্য ডাকে।
যে,—নিধি নেই সাগর-বুকে
তার বিহনেই থাকি দুখে ;
কতই রঙীন্ ফানুস উড়াই
সে কথা আর কইব কাকে !

(৫)

বিত্তবিভব নেইকো আমার,—
আদৌ সে সব চিন্তা নাহি,
পাগল ভোলার ভাঙের প্রসাদ
একটি ফোঁটা কেবল চাহি।
থাক না আমার হাজার অভাব,
স্বপন দেখা—সেটাই স্বভাব ;—
বাস্তবের এই পঙ্কিলতায়
কি ফল বলো অবগাহি' !
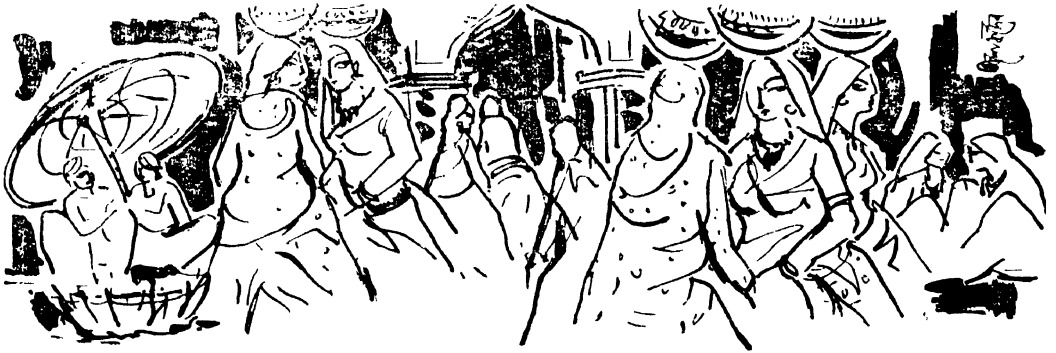
বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই সেদিন উনিশ শতকেও এলফিনস্টোন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিত আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান ও মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে ভারতের ইতিহাস আলোচনা সুরু করতেন। বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ জাগরণ ও বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের দাবি-দাওয়ায় গৌতম বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ বা বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে স্বীকৃতি পেলেন মাত্র সেদিন। সার্ এড্-উইন আর্নল্ড "এশিয়ার আলো" রচনা ক'রে বুদ্ধের দিকে পাশ্চাত্য জগৎকে চুম্বকের মতো টেনে আনলেন। তার আগে বুদ্ধকেও প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র ব'লে ধরা হত এবং তাঁর আবির্ভাব-কাল নিয়ে অনেক বাজে গণ্ডগোল করা হয়েছে। দীর্ঘকাল তাঁর মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ব'লে দাবি করা হত। অথচ সিংহলীয় বৌদ্ধমত অনুসারে তাঁর মৃত্যু-বৎসর খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৪ সাল ব'লে স্পষ্ট নির্দেশ করা ছিল। ১৯৫৬ সালে গয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে সকলে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, ঐ বছর গৌতমের মৃত্যুর পর ২৫০০ বৎসর পূর্ণ হ'ল।

অতএব নিরাপদে ধরা যেতে পারে যে, বুদ্ধদেবের জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে ৬২৪ সালে; আশি বছর বয়সে ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের ইতিহাস বুদ্ধের সময় থেকে সহজে নিরূপণ করা যায়। বুদ্ধ-পরবর্তী ভারতের ইতিহাস নিরূপণে বুদ্ধদেবের আয়ুষ্কাল, আবির্ভাব ও তিরোভাববর্ষ মস্ত এক দিগ্দর্শনের কাজ করে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় আর্যরা যেমন হিত্তিদের থেকে, ইউরোপীয়দের থেকে, তেমনি ইরানীয়দের থেকে পৃথক হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং এশিয়া মাইনর থেকে পঞ্চনদ অঞ্চলের পরিবর্তে সিন্ধু নদ থেকে ভাগীরথী তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস করেছেন। অন্যথায় বুদ্ধদেবের গয়া অঞ্চলে তপঃসিদ্ধি, পাটলিপুত্রে নব নন্দের সাম্রাজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে পারত না। মগধে আর্য সভ্যতা বুদ্ধদেবের বেশ কিছুকাল আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু প্রাক্ গৌতম ভারতের ইতিহাস অন্বেষণে দিগ্দর্শনের কাজ করে মহাভারত গ্রন্থখানি। অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থও এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করে বটে, কিন্তু বেদ ছাড়া আর কোন বই ভারতের গ্রন্থজগতে এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। মহাভারতে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় করলে আমরা শুধু যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী প্রায় হাজার বছরের ভারত ইতিহাস বুঝতে পারি, তাই নয়—বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করাও অনেকটা সহজ-সাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন বুঝবার পক্ষে মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধকাল নিরূপণ অত্যাবশ্যক।

ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রেই জানেন যে, ভারতীয় আর্য ভাষার সমগ্র বিবর্তন কালকে সাধারণত তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়: প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এবং নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঠিক মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ সুরু হবার প্রাক্কালে। তাঁর আগেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ শেষ হয়ে গেছে। জনসাধারণের মুখের ভাষায় ভারতের আর্যভাষা তখন মধ্যবর্তী স্তরে উপনীত হয়েছে। সাহিত্যের কাজে তখনও প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আধুনিকতর রূপ সংস্কৃত ভাষার বিপুল প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু লোকমুখে তখন অনেক আঞ্চলিক মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রচলন বলবৎ হয়েছে। বুদ্ধদেবের

আগেই যাবতীয় বেদ সঙ্কলন, রামায়ণ ও মহাভারত প্রণয়ন শেষ হয়েছে। পৌরাণিক সাহিত্য সঙ্কলন অবশ্য আরো পরে সমাধা করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষান্তরে দুটি বড় সাহিত্যের ভাষার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে: বৈদিক ও সংস্কৃত। এ দুটি মোটেই এক ভাষা নয়; এদের ব্যাকরণ আলাদা এবং স্বতন্ত্রভাবে না শিখলে একটির জ্ঞানের দ্বারা অপরটি আয়ত্ত করা যায় না। বৈদিক প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম নিদর্শন; সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ নিদর্শন। অর্বাচীন সংস্কৃতকে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন স্তরের সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না।

বুদ্ধদেবের কাল অর্থাৎ ৬২৪—৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে মহাভারতের কালে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যেতে হলে বুদ্ধদেবের মতো আর একটি উজ্জ্বল নামের সঙ্গে আমাদের অবশ্যই পরিচয় করতে হবে। তিনি পাণিনি। তাঁর কথা জানতে হলে আগে ভারতে আর্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে নিতে হবে।

আগেই এ কথা বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে ভারতীয় আর্যদের বিস্তার সিন্ধুনদের পশ্চিম থেকে অপসারিত হয়েছে বটে, কিন্তু সিন্ধু নদের পূর্বতীর থেকে অন্তত ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত তাঁরা বিস্তার লাভ করেছিলেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত অঞ্চলের ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা তখন ইরানীয় আর্য, মিতান্নি, কাস্‌সি, মেদ, হেত্থি বা হিত্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য রাজবংশ বিশেষত অশোকের সময়ে আর্যগণ বর্তমান আসাম বা কামরূপ অথবা প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিলেন। কিন্তু মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির কাহিনী থেকে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের আগেই পূর্ববঙ্গে আর্য সভ্যতা প্রসার লাভ করুক বা না করুক, উত্তরবঙ্গের পথে তাঁরা কামরূপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য দাক্ষিণাত্যে খুব বেশী অগ্রসর হতে তাঁরা পারেন নি। বিজয়ী অভিযাত্রীরূপে মৌর্য আমলে দাক্ষিণাত্য জয় করলেও আর্য ভাষীরা সেখানে উপনিবিষ্ট হতে পারেন নি।

বিবেকানন্দের মতে, আর্যরা বহিরাগত নন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিশেষত নরতাত্ত্বিকদের মতে, আর্যরা ত বটেই, নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো বা নেগ্রিল্লো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বোড়ো জাতের সব লোকই ভারতে বহিরাগত। ভারতের মাটির নিজস্ব সন্তান কেউ নয়। সে যাই হোক, আর্যরা ভারতে আসার বা তেমন বিস্তার লাভ করার আগে নিগ্রোমিশ্র অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়েরা দুটি সভ্যতা গঠন করে। বোড়োরা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে আর উত্তর-পূর্ব ভারত সীমান্তে থাকত। তারা সংখ্যায়ও কম, সভ্যতায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল। বর্তমান কালে তারা ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তার অভ্যন্তরে নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর নামে দুটি অঙ্গরাজ্য গঠনে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া ভারত রক্ষিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সিকিম আর ভারতের অর্থসাহায্যপুষ্ট মিত্র-রাষ্ট্র ভুটানও এদের রাষ্ট্র। আর্য আগমনের সমকালে বোড়োদের জ্ঞাতি তিব্বতি বা বর্মিরা তবু কতকটা সভ্য ছিল, কিন্তু বোড়োরা অসভ্য ছিল বলা যায়। আর্যরা এদের এবং তিব্বতসন্নিহিত গোটাংমি শাখার অন্যান্য লোকদের একত্র ক'রে "কিরাত" আখ্যা দিয়েছিলেন। অষ্ট্রিকদের নাম ছিল "নিষাদ" আর দ্রাবিড়দের বলা হত "দাস" বা "দস্যু।" অবশ্য আর্যরা তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ অহমিকা ও প্রবল জাত্যাভিমানবশত আর্যেতর জাতিদের কোনটিকে পাখি, কোনটিকে বানর, কোনটিকে ভল্লুক, কোনটিকে রাক্ষস, কোনটিকে কিন্নর আখ্যা দিতেন। উন্নততর অনার্যজাতিগুলিকে ভারতীয় আর্যরা দেব, গন্ধর্ব ইত্যাদি বিশেষণ দিতেন।

আর্যবৃন্দ ভারতে এক মহান সভ্যতার পত্তন করেন বটে, কিন্তু অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতা দুটির কাছ থেকে তাঁরা অনেক কিছু গ্রহণও করেন। অনুমানগঠিত মূল আর্য বা ভারত-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ছিল না। অনেকের ধারণা, আর্যরা ভারতে আসার পর সম্ভবত দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ঐ ধ্বনিগুলি নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করেন। দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এই মূর্ধন্য ধ্বনি-সমূহ নেওয়ার ব্যাপারটা ভারতইরানীয় শাখা দুই বর্গে বিভক্ত হওয়ার সমকালে বা পরে সংঘটিত হয়, এই হচ্ছে পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের অভিমত। কারণ, মূল ভারত-ইরানীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ছিল না। সুতরাং

ইরানীয়দের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে বা পরে বেদ রচিত হয়েছিল, একথা বলতে হয়। তা বললে আর ইরাণীয়দের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক বলা যায় না। বরং তিলকের বা বটকৃষ্ণের মত অনুযায়ী ঐ বিচ্ছেদের সময় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ বা বিংশ শতক বলতে হয়। তখনই বেদ সঙ্কলিত হয়ে থাকবে। তাতে দ্রাবিড় প্রভাবজাত মূর্ধন্য ধ্বনিও এসে থাকবে। এ মত না মানলে ভারত-ইরানীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না, ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপটিকেই মূল "আর্য" বা ভারত-ইরানীয় মিলিত রূপ বলতে হয়। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে ইরানীয় আর্য ভাষা পৃথক হয়ে যায়, ভারত-ইরানীয় "আর্য" ভাষা থেকে নয়। ভারত ইউরোপীয় বা ভারতহিত্তি গোষ্ঠী থেকে যখন "আর্য" বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী জাতি পৃথক হন তখন সে মিলিত রূপের মধ্যে প্রথমে মূর্ধন্য ধ্বনি ছিল না। ইরানীয় আর্যভাষীরা তখন তাঁদের অন্তর্গত ছিল, সে সময়ে তারা স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয় নি। ভারতে দ্রাবিড় সান্নিধ্যে "আর্য" অর্থাৎ প্রাচীনতম ভারতীয় আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি গৃহীত হল। ক্রমশ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বৈদিকে গ্রন্থ রচিত ও সঙ্কলিত হল। তারপর বেদাচারবিরোধী ইরানীয়রা নিজেদের ভারতীয় আর্যদের থেকে পৃথক ব'লে যে স্বতন্ত্র ভাষাবর্গ রচনা করল, তাতে মূর্ধন্য ধ্বনিসমষ্টি পরিত্যক্ত হল কিম্বা ইরানীয়আর্য শাখায় বা সেই শাখায় ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত থাকা কালে উপভাষারূপ-গুলিতে হয় তো প্রথম থেকে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি প্রবেশ করে নি। এক্ষেত্রে ইরানীয়রা বেদ সঙ্কলনের অনেক পরে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকেও আলাদা হয়ে থাকতে পারে। কেবল মনে রাখা চাই যে, তারা আলাদা হয়েছিল বৈদিক ভাষার স্রষ্টা ভারতীয় আর্য জাতি থেকে, বেদের চেয়ে প্রাচীন কোন ভারত-ইরানীয় ভাষাভাষী জাতি থেকে নয়। এই বিষয়টি এখন একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বেদাচার প্রচলিত ছিল অনেক দিন থেকে। বৈদিক স্তোত্র ও গাথাগুলির প্রাচীনতর রূপ দীর্ঘকাল থেকে শ্রুতি পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। হয় তো ভারতহিত্তি বা ভারত-ইউরোপীয় মূল ভাষার অখণ্ডত্বের সময় থেকে বৈদিক গাথা ও স্তোত্রগুলি মুখে মুখে রচিত হয়ে জনশ্রুতিক্রমে এবং গুরুশিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত ছিল। বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় অনেক পরে। ভারতহিত্তি থেকে ভারতইউরোপীয়, ভারত-ইউরোপীয় থেকে ভারতইরানীয় বা ভারতীয়আর্য মূলভাষা-গুলি পৃথক হয়ে আসার পর ভারতইরানীয় আর্যরা আবার দু ভাগে ভাগ হবার আগে ইরানীয়রা ইরানে এবং ভারতীয়রা ব্রহ্মাবর্ত দেশে বা উত্তরপশ্চিম ভারতে বসবাস করতে লাগল একভাষী একজাতিরূপে, এমন অবস্থাতেও তাদের মধ্যে উপভাষাগত প্রভেদ থাকার কথা এবং ইরানীয় উপ-ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব একটুও না প'ড়ে ভারতীয় উপভাষায় প্রচুর পরিমাণে পড়তে পারে। বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হতেই ভারতীয়আর্য ভাষার বিশিষ্ট আদর্শ সাহিত্যিক রূপ বা Standard writing language রূপটি দাঁড়িয়ে গেল এবং তখন বেদাচারবিরোধী ইরানিরা স্বতন্ত্র মতে স্বতন্ত্র পথে স্বতন্ত্র ভাষায় স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠবার প্রেরণা পেল যার নেতা হলেন জরথুস্ত্র এবং যার ফলে নবগঠিত ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি অনুপস্থিত দেখা গেল।

ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির রচনাকাল খুব বেশি আধুনিক হলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশশতক, একথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। ঐসব কবিতায় মূর্ধন্য ধ্বনি আছে যদিও মূল ভারতইরানীয় ভাষায় তা নেই। তা থেকে বোঝা যায়, ভারতইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময়ে ভারত-ইরানীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি না থাকলেও এবং পরে ভারত-ইরানীয় গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ইরানীয় ভাষাগুলিতেও তা না থাকলেও দ্রাবিড়সান্নিধ্য অথবা অন্য যে কোন কারণে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন স্তরেই যথেষ্ট মূর্ধন্য ধ্বনি বর্তমান ছিল। ঐ ধ্বনিগুলির আবির্ভাবের সময় ঋগ্বেদ রচনার ঢের আগে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে যদি ঋক্‌সমূহে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি গৃহীত হয়ে থাকে তা হ'লে আর্যরা তার অনেক আগে ভারতে এসেছিলেন এবং আসার পর দ্রাবিড়দের দ্বারা রীতিমতো প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য অনতিকাল পরে আর্য-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতাগুলি মিলে গিয়ে এক বিরাট হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজের সৃষ্টি করে যা আজ পর্যন্ত অটুট আছে।

ভাষার ব্যাপার ছাড়া অন্য অনেক ব্যাপারে আর্যরা

দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিকদের কাছে ঋণী। গ্রামাশ্রয়ী সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক উপাদান তাঁরা অষ্ট্রিকদের কাছে এবং নাগরিক সভ্যতা ও ভক্তিধর্মের দীক্ষা দ্রাবিড়দের কাছে গ্রহণ করেন। আর্যরা প্রথম দিকে সম্ভবত যাযাবর ধরণের লোক ছিলেন। গোষ্ঠীপিতার দ্বারা তাঁরা পরিচিত হতেন এবং স্থায়ী গ্রাম ও নগরের ধার ধারতেন না। আর্যরা দ্রাবিড়দের নগরসভ্যতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। আদিম আর্যদের ভাষা, সাহিত্য রণনীতি অনেক বেশি উন্নত ছিল। তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁদের জীবনযাপন পদ্ধতিও ছিল খুব সরল ও আড়ম্বর-বর্জিত। ফলে জীবনযুদ্ধে তাঁদের জয় অচিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্থেজের সেমীয়দের তুলনায় রোমক আর্যরা যেমন নানা বিষয়ে পশ্চাৎপদ হয়েও ক্ষাত্রশক্তি ও রণনীতির উৎকর্ষের জোরে কার্থেজীয় সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে দেয়, তেমনি পশুপালক যাযাবর আর্যজাতিও ভারতে এসে দ্রাবিড়দের পরাস্ত করেন ক্ষিপ্র সমরকৌশলের প্রয়োগে। গ্রামজীবনের অনুরাগী নিরীহ অষ্ট্রিকরাও তাঁদের আক্রমণের সামনে হ'টে যায়। তবুও গত সাড়ে চার হাজার বছরে দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিকরা লুপ্ত হয় নি। চারটি প্রধান দ্রাবিড় জাতি, তামিল, মালয়ালি, কানাড়ি ও তেলেগু, কখনও লুপ্ত হবে না। আর্যরা দাক্ষিণাত্যে অশোকের সময়েও চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র—এই চারটি দেশ দখল করতে পারেন নি। এরা অবশ্য যথাক্রমে আজকের তামিলনাদ বা মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কর্ণাটক বা মহীশূর এবং কেরল রাজ্যগুলি নয়। সমুদ্রগুপ্ত তার বিজয়-অভিযান সিংহল পর্যন্ত প্রসারিত করায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পরবর্তীকালে দক্ষিণী ভাষাচতুষ্টয়ের ওপর পড়ে বটে, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত বা অন্য কোন আর্যরাজা দ্রাবিড়ভাষী এলাকাগুলি খাস তালুকের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তামিল ভাষা ইচ্ছা করলে সংস্কৃত একেবারে বাদ দিয়েও কাজ চালাতে পারে। সাধারণত যতটা মনে করা হয়, দক্ষিণী ভাষাগুলির ওপর সংস্কৃত প্রভাব তত বেশি নয়। মুসলমান আমলেও তুর্কি ও মুগল সাম্রাজ্য খাস দাক্ষিণাত্যে বেশি দিন ঘাঁটি বজায় রাখতে পারে নি। স্থানীয় মুসলমানরা উর্দু বা দকনি ভাষা শিখতে খুব উদ্যোগী হয় নি।

আর্যরা দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্যন্ত দখল করতে না পারলেও বাংলাদেশ বা রাঢ়দেশ থেকে সমুদ্র পথে সিংহলে গিয়ে অবতরণ করে। তার ফলে সিংহল ও মাল দ্বীপপুঞ্জে আর্য ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সিংহলের উত্তরাঞ্চল থেকে ভারতীয় বৈদেশিক অপসারণের অজুহাতে তামিলদের তাড়িয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে ভারতীয় আর্যভাষা সিংহলির প্রসার সাধিত হচ্ছে। তামিলরা সিংহলকে দ্বিভাষিক রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি জানিয়েছিল। তার জন্যে প্রবল আন্দোলনও চলেছে। এমন অবস্থায় সিংহলকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সাহায্যে তামিলশূন্য করাই সিংহলের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। সিংহলিরা ধর্মে বৌদ্ধ হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের বৌদ্ধদের হিন্দুদের এক শাখা বললেও ভুল হবে না। সুতরাং ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দ্রাবিড়দের চেয়ে সিংহলিরা উত্তর ভারতের আর্যভাষীদের বেশি আপন জন।

ভারতীয়-আর্যভাষার কোন কোন আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষা মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষান্তরেও মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে-সব এখন লুপ্ত বা অপসারিত হয়ে ভারতের মধ্যে এসে অন্য আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে হারিয়ে গেছে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর দুটির কোন কোন দ্বীপে ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা যাওয়ায় সে-সব জায়গায় ভারতীয় নানা ভাষা শোনা যায়। তাদের মধ্যে হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি আর্য ভাষাও আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে কিছু কিছু আর্যভাষী ভারতীয় এই ভাবে ছড়িয়ে গেছে। এরা স্বতন্ত্র কোন ভারতীয়-আর্য ভাষার সৃষ্টি করে নি। যে-সব ভাষা ভারতে বলা হয়, সেগুলিই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশ গিআনা বা গুইআনা, ফিজি, মরিশাস, সিসিলিশ প্রভৃতি দ্বীপ, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যত্র শোনা যায়। বর্তমানে ভারতের বাইরে কেবল জিপ্সি জাতির লোকেরা রোমানি নামে এক ভারতীয়-আর্য ভাষা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে ব্যবহার করে। বহুকাল আগে কোন অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে একদল ভারতীয় আর্য নরনারী ভারত থেকে বেরিয়ে এসে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে। তাদের ভাষা এখন খুব মিশ্র হয়ে পড়েছে। এরা

সংখ্যায় কত, সে-সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান বা সংকারি হিসেব পাওয়া না গেলেও এদের এক দলপতির মতে এদের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৪মিলিঅন। এরা রোমক লিপিতে তাদের ভাষা লিখবে নিঃসন্দেহ; কিন্তু এদের ভাষার ভারতীয়-আর্য কাঠামো একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে ক্রমাগত ইউরোপীয় সাহচর্যের ফলে, এ-ধারণা অমূলক। এদের শ্রেষ্ঠ দান এদের সঙ্গীত; তার মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। বহু বছরের বিচ্ছেদ সত্ত্বেও আধুনিক জগৎকে জিপ্‌সিদের দেওয়া সেরা উপহার যে-সঙ্গীত, তার মধ্যে ভারতীয় সাঙ্গীতিক কাঠামোটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে। সোভিয়েট ইউনিঅনের বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত রুশবাসী জিপ্‌সিদের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা এ-সত্য উপলব্ধি ক'রে থাকবেন। যাঁরা তা শোনেন নি বা শোনেন না তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় বা তাঁর পরলোকগতা ছাত্রী কুমারী উমা বসুর কণ্ঠে গাওয়া রুশদেশবাসী জিপ্‌সিদের দুটি গান শুনে থাকবেন বা শুনতে পারেন: (১) সোলাভে! ও সোলাভে! যার জার্মান অনুবাদ টমাস হাউপ্টনার করেছিলেন তাঁর হুণ্ডর্ট লিডার (সঙ্গীত-শতক) পুস্তকে: নাথ্‌টিগাল! ও নাথ্‌টিগাল! যার দুটি বাংলা অনুবাদ দিলীপকুমার করেছেন: পাপিয়া কাঁপিয়া কার গান গায় এবং বুলবুল মন! ফুল-সুরে ভেসে, যে-দুটিই তাঁর কণ্ঠে বহু শ্রোতা শুনেছেন, যে-দুটির শেষোক্তটি উমা বসু N17200 সংখ্যক HMV রেকর্ডে গেয়েছিলেন; (২) ইআৎনিগান্ উদা লিআৎস্ মালা দিমাৎস্ যার বাংলা অনুবাদ দিলীপকুমার করেছেন: অকূলে সদাই চলো ভাই, যা উমা বসুর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে তিনি রেকর্ড করেছিলেন N17200 সংখ্যক HMV রেকর্ডে। বাজি নজরুল ইসলামও কিছু জিপসি সুর তাঁর বাংলা গানে প্রয়োগ করেছিলেন সম্প্রতি জিপ্‌সিরা ইহুদিদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব রাষ্ট্র ও বাসভূমি দাবি করছে সোমালিল্যাণ্ডে। এ দাবির অন্তরালে ফরাসি প্রেরণা সক্রিয় থাকা সম্ভবপর।

ভারত রাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ লোক ভারতীয়-আর্য ভাষা ব্যবহার করে। পাকিস্থান ভৌগোলিক ইরান ভূখণ্ডের প্রায় পৌনে দু লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় বালুচ ও পশ্‌তোভাষী অঞ্চলে জোর ক'রে অন্যতম ভারতীয়-আর্য-ভাষা উর্দু চালাচ্ছে। সে-দিক থেকে পাকিস্থান প্রায় সর্বাংশে ভারতীয়-আর্যভাষী রাষ্ট্র।

বৈদিক এবং সংস্কৃতের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার যে প্রাচীন কাঠামোটি রক্ষিত, তাকেই প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা বলা হয়। বৈদিক থেকে সংস্কৃতের বিবর্তনটি ভালো ক'রে বোঝা দরকার।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে বেদ গ্রন্থের আকার লাভ করে বা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়, এই মত খুব প্রবল। অবশ্য তারও আগে মুখে মুখে বেদ রচনা ও রক্ষার ব্যবস্থা ছিল যার জন্যে বেদের আর এক নাম শ্রুতি। বেদ-রচনা সঙ্কলিত তথা বৈদিক সাহিত্যের নির্দিষ্ট আকার লাভ হল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ। অন্তত ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই তিন বেদ পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ সঙ্কলিত হয়েছিল। এ-মত এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমাদের পাণিনি-প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে। আপাতত ধ'রে নেওয়া গেল যে, আনুমানিক পঞ্চদশ খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য নির্দিষ্ট গ্রন্থবদ্ধ আয়তন লাভ করে। অথর্ব বেদ অনেকের মতে অনেক পরের রচনা; কিন্তু অন্য তিনটি বেদ যে মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের মধ্যে সম্পাদিত, এটা প্রায় নিঃসন্দেহ। ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন বেদ; তার প্রাচীনতম কবিতাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেরও হতে পারে। ঋগ্বেদের মধ্যে আদিম আর্য তথা ভারত-হিত্তি তথা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম কাব্যসৃষ্টি সংরক্ষিত হয়েছে। এটি এই ভাষাগোষ্ঠীর সব চেয়ে পুরোনো লৈখিক নিদর্শনও বলা যায়। ঋক্, সাম ও যজুঃ— এই তিন বেদ প্রকৃত বেদ অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদ। এদের সঙ্কলনকাল খুব আধুনিকতাবাদী পণ্ডিতেরও মতে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের মধ্যেই।

অযজ্ঞীয় অথর্ব বেদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ, বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপনিষদ্‌সমষ্টি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। প্রত্যেক বেদের একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ আছে। ব্রাহ্মণ হল যজ্ঞের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও প্রাচীন উপাখ্যানের সঙ্কলন; এগুলি গদ্যে লেখা; সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সেই প্রাচীন যুগেও প্রাচীন ভারতীয়-আর্য

ভাষায় উৎকৃষ্ট গদ্য রচিত হয়েছে। উপনিষদ্ হ'ল ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট; তাতে বৈদিক দর্শনের ব্যাখ্যা ও অধ্যাত্মচিন্তার সংজ্ঞ কবিত্বময় প্রকাশ আছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ মুখ্যত গদ্যে লেখা। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণগুলির প্রধানতম ও প্রাচীনতম ঐতরেয় নামক ব্রাহ্মণটিতে প্রাচীনতম আর্যভাষার গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। ঐ গদ্যের রচনাকাল অন্তত তিনহাজার বছর আগে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মধ্যে।

সামবেদে ঋগ্বেদকেই সঙ্গীতের পক্ষে সুবিধাজনক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত।

যজুর্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ দু ভাগে বিভক্ত। বৈদিক সভ্যতা সাহিত্যও সেই যুগের ঘটনাবলীর কাল-নির্ণয়ের পক্ষে যজুর্বেদের গুরুত্ব অপরিসীম। পরে সে-কথা বোঝা যাবে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর সময়কে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার বৈদিক যুগ বলা যায়। এর পর সংস্কৃত ভাষার প্রামাণ্য ব্যাকরণ সঙ্কলিত হলে সংস্কৃত যুগ আরম্ভ হয়। লোকের মুখের ভাষার মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষান্তর এসে গেলেও সাহিত্য ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনার কাজে, সরকারি প্রশাসনিক ব্যাপারে, আন্ত-প্রাদেশিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ রক্ষার কাজে সংস্কৃত ভাষা দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত যুগ ও মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষাসমূহের যুগ পাশাপাশি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর ধ'রে চলে। সুতরাং বৈদিক ও সংস্কৃত, দুই প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার স্থায়িত্বের সময় প্রায় আড়াই হাজার বছর।

(ক্রমশঃ)

শত্রুর সাধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
পূরাবে কি শত্রু মনোরথ?
তপস্যায় এক তপস্বীর,
ভক্তি ত্যাগ সংকল্প নিবিড়।
সমগ্র জাতির উন্মাদন।
সমগ্র জাতির উপাসনা।
স্বাধীনতা এনেছে হেথায়,
পুনরায় যেন না হারায়।
দুর্নীতি দুর্মতি অনুক্ষণ,
বিড়ম্বিত করিছে জীবন।
এলো দিন অধঃপতনের।
কলুষিত দেহ ও মনের,
দিন দিন বাড়িছে অসৎ।
পুরিবে কি শত্রু মনোরথ?

২

জাতির জাগ্রত ভগবান,
এ বিপদ হতে কর ত্রাণ।
ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে তোলো জাতি
কাটাও তাহার কালরাতি।
স্বার্থহীন শুদ্ধ কর তারে
পাপ যেন ঘেঁষিতে না পারে।
কর দিব্য জীবন উন্মেষ
রক্ষা কর জাতি আর দেশ।
তোমা হতে যাইতেছে সরি,
তুমি লও আপনার করি।

(জনৈক বৃটিশ এ দেশ ত্যাগের সময় বলিয়াছিলেন নাকি আমরা আবার বিশ বৎসর পর ফিরিব।)

নাগিনী

শৈলেন রায়

তানু মাসি বলতো—"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। তিন ভাইয়ের পর বোন। দিদি অবিশ্যি সবারই বড়। মা মারা যাবার পর থেকেই দিদি সংসারের কর্ত্রী। সংসারের কোন ঝক্কি ঝামেলাই ছিল না আমার ওপর। খেতুম দেতুম আর পুতুল খেলতুম, তাদের বিয়ে দিতুম, ছেলে পুলে মানুষ করতুম। সেই আমার সংসার। সব খেলাই খেলে ফেলেছি—আর বাকি রইলো না কিছু।'

একটু থেমে আবার বলতো মাসি, 'তাইতো পড়ে আছি পরের সংসারে।'

মৃদু আপত্তি করতো মল্লিকা—'পর কেন? তোমার দিদি জামাইবাবু—'

কথা শেষ করতে দিত না মাসি—'পর বই কি। নিজের মানে, নিজের স্বামী, ছেলে পুলে আর কি—'

—'আচ্ছা মাসি, তোমার বর নেই?'

মাসি চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় কত দূরে কে জানে। দূরের তাল গাছের সারির ওপারে হয়তো। ম্লান হেসে বলে—

'—সবই ছিল। ছিলই বা কেন? আছে। এখনও আছে, তবে আমার বর আর আমার নেই কিনা। তার আবার বিয়ে হয়েছে। আমি দেখেওছি একবার, ভাল নয়, একটুও ভাল নয় বৌ।'

বিস্ময় ফুটে ওঠে মল্লিকার চোখে—'তবে?'

মাসি হেসে মল্লিকার থুতনী নেড়ে দিয়ে বলে—'তবে কিরে? কেন আমাকে ছেড়ে আবার বিয়ে করলো, ভাই? বড় হ তারপর বুঝবি। বুঝবি, ফর্সা বাপমার কালো ছেলে হবার জ্বালা।'

কথার মোড় ঘুড়িয়ে দেবার জন্যই যেন বললে মাসি—'জামাইবাবুকে তো তুই দেখেছিস। কালো বেঁটে খাটো মানুষটি, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে একটু বেশী রাতে বাড়ী ফেরে। আমাকে খুব ভালবাসে কিনা। জামাইবাবুই তো নিয়ে এলো আমাদের, আমাকে দীপুকে। সেই থেকে এখানেই আছি দুজনে। বর খোঁজও করেনা। ভারী বয়ে গেলো আমার।' লাল ঠোঁট উল্টে শেষ কথাটাকে আরো জোড়ালো করে মাসি।

তানু মাসি! ও বাড়ীর সব ছেলে মেয়ের তানু মাসি সে। যাকে না হ'লে—বাড়ীর কর্ত্তা থেকে চাকর বাকর কারো'ই চলে না এক মুহূর্ত্ত। সকাল থেকে এক মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই যার। ঠাকুর এসে দাঁড়িয়ে আছে কি রান্না হবে, চাকর বাজারের থলি নিয়ে ফর্দ্দর জন্যে হা করে আছে।

একটু পরেই স্কুলে যাবার তাড়া পরে যাবে ছেলে মেয়েদের। কেউ যাবে স্কুলের বাসে, কেউ বা যাবে চাকরের সঙ্গে ট্রামে চড়ে। বাড়ীর গাড়ী কর্ত্তাকে নিয়ে আফিসে যাবে সেই এগারোটার সময়। সকাল থেকেই ধোয়া মোছা হচ্ছে গাড়ী।

মাসির মুখেই শোনা—'জামাইবাবু তো খুব ফিটফাট। দেখিস না সকাল থেকে গাড়ীটাকে কি ভাবে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার হচ্ছে। একটুও ধুলো থাকলে চলবেনা কিনা।'

ও বাড়ীর এত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে বাড়ীর গিন্নী মন্দিরা মাসির যেন কোন স্থান নেই। একতলা দুতলা যখন কর্ম্মমুখর, তখন তিনতলায় বসে একা একা কি করে মন্দিরা মাসি?

মল্লিকা ওবাড়ী ক'দিন গেছে তা গুনে বলা যায়, মা পছন্দ করতেন না। বলতেন,—বড় হচ্ছে এবাড়ী ও

বাড়ী ঘুরে না বেড়ানোই ভালো। তা ছাড়া—কি ভেবে আর কথাটা শেষ করেন নি মা। মল্লিকাও সে কথা জানতে চায় নি। মাসিই আসতো—প্রায় রোজই আসতো, ছাদের ওপর দুটিতে কতক্ষণ গল্প করতো তার হিসেব কেউ রাখে নি। কবে কখন দুটি অসমান বয়স্কা নারীমন এক বিন্দুতে এসে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল তার খোঁজ দু জনার কেউ-ই রাখে নি।

'—ওমা, তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস, আর আমি সারা রাজ্য খুঁজে মরি।'

মল্লিকা চমকে উঠলো, মা কখন ছাদে এসেছেন—কখন তার একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা সে জানতেও পারেনি।

—কেন মা?

'—শোন মেয়ের কথা! কী হয়েছে রে আজকাল তোর?' মা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হাল্কা স্বরে আবার বলেন,

—'আজ সুজিতের বৌভাত, যেতে হবে না? আমি যাচ্ছি, তুইও তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে লাল বেনারসীটা পরে নিস্। বয়স হচ্ছে, আজকাল আর যে রকম সে রকম ভাবে নেমন্তন্ন বাড়ী যাওয়া যায় না। কত লোক-জন আসবে, সবাই আমার মেয়ে দেখতে চাইবে। বলা তো যায় না ভালো ছেলে তো দু চার জনের থাকতেও পারে।' মা আরও কি সব বলতে বলতে নেমে গেলেন। এমনিতেই মা একটু বেশী কথা বলেন, আর মল্লিকার বিয়ের কথায় তো রক্ষেই নেই। সবে সতেরোয় পা দিয়েছে মেয়ে। মার যেন নাওয়া খাওয়া বন্ধ। এই বয়সে বিয়ে না দিতে পারলে মেয়েদের রূপ আর ক'দিন। পদ্ম পাতায় জল। সব সময়ই হারাবার ভয়। বহুবার এ কথা শুনেছে মল্লিকা। নতুন মনে হয় না আর এখন। চুপ করে শোনে আর ভাবে।

কি এতো ভাবে মন্দিরা মাসি? কতদিন দেখেছে মল্লিকা। ঘুমভেঙ্গে পাশের বাড়ির তিনতলার সামনের ছোট্ট বারান্দায় চোখ পড়েছে। দেখেছে মন্দিরা মাসি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কি এত দেখে মাসি? আকাশের তারা? আর কিছু তো অন্ধকারে দেখা যায় না। না, আরও কিছু দেখতে চায় মন্দিরা মাসি? যা খালি চোখে দেখা যায় না—তাই দেখবার চেষ্টা করে রোজ রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, যখনও বিমল মেসোমশাইর গাড়ী এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ায় না।

খস্ খস্ খস্। একটানা আওয়াজ। প্রথমটা বুঝতে পারতো না মল্লিকা। তারপর বুঝেছে। মাসিই বুঝি শ্ব দিয়েছে। পা ঘষছে বিমল মেসোমশাই। ঘষে ঘষে জুতো ছিঁড়ে ফেলবে নাকি লোকটা? শুয়ে শুয়েই কতদিন খিলখিল করে হেসে উঠেছে মল্লিকা। মাথায় দোষ আছে নাকি ভদ্রলোকের? কী রকম জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে—বেশ জোড়ে। যেন নাটক করছে। অথচ দিনে গলা শোনাও যাবেনা একবার। সেজেগুজে এগারোটার সময় গাড়ী করে ভদ্রলোক অফিসে চলে যাবে। ফিরবে সেই রাত শেষ করে দিয়ে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে খস্ খস্ আওয়াজ পায় মল্লিকা। রোজ নয়। মাঝে মাঝে। যেদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, সেদিন।

—কী এত কাজ করে মেসোমশাই?

—কাজের কী আর শেষ আছে? এই তো বলছিলো সেদিন, আর একটা প্রজেক্টে হাত দেবে। টাকার দরকার। কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনী! তাই তো জেগে বসে থাকি। কখন আসবে। গরম গরম লুচি দু'টো, একটু মাংস, নইলে শরীর টিঁকবে কেন?

—তুমি রোজ জেগে থাক কেন মাসি? মন্দিরা মাসিও তো খেতে দিতে পারে?

তবেই হয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দেবে না জামাইবাবু। এই তো সেদিন বিকেলের দিকে তুমুল জ্বর, রাত্রে আর হুঁস নেই। চেঁচামেচি, তুমুল কাণ্ড। থালা, বাসন সব গড়াগড়ি! দিদি তো দৌড়ে ওপরে পালিয়েছে। আমার হাত ধরে জামাববাবু হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে নিয়ে এলো। শোন কথা, কেন আমি নিজের হাতে খাবার দিই নি। আমারও ধুম জ্বর। জ্ঞানগম্যি নেই। সাফ জবাব দিলুম, পারব না আমি, আমি কি তোমাদের গোলাম, বাঁদী? কালই চলে যাব। বল্লে বিশ্বেস করবি না মলি, ওই দুরন্ত বাঘ একেবারে কেঁচো। পা ধরতেই বাকি আর কি। খুব ভালোবাসে কিনা, আর তা ছাড়া ভয়ও করে খুব। তাই তো যেতে পারি

না। এক এক সময় মনে হয় যাই চলে দীপুর হাত ধরে। কেউ কথা বলে না—এই দিদি আর কি। কী যে পাকা ধানে মই দিলুম। তুমিই তো বাপু তোমার ছেলেপুলে নিয়ে ওপরে উঠে গেলে। নিজের স্বামীটিকে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে না। এমন মেনিমুখ মেয়ে মানুষের অদৃষ্ট অনেক জ্বালা, হোল কি এখন পর্য্যন্ত, আরও কত দেখবো।'

আরও কত দেখবার আশা ছিল তাম্নু মাসির।

পেঁজা তুলোর মত টুকরো টুকরো মেঘগুলো আকাশের এ পাশ ওপাশ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অনেক উঁচুতে কালো বিন্দুর মত দু'টো পাখি। কি ও দু'টো? চিল না শকুন! ফিকে নীল আকাশের গায়ে কালো কালো নিথর দু'টি বিন্দু। মনে হয় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে যেন।

মল্লিকার কানে এখনও ভাসছে মাসির কথা—'জানিস মলি, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মরে গিয়ে যেন আকাশের মেঘ হয় থাকতে পারি। শরৎকালের আকাশে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করবো, হাসবো, খেলবো। কেউ শাসন করবে না, কেউ বকবে না, কাউকে কিছু দেবার নেই, কারুর কাছে কোন প্রত্যাশা নেই। আকাশ আমার ঘরবাড়ী, আকাশ আমার সব কিছু।'

পরন্ত রোদে ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশে হাল্কা মেঘের ছুটোছুটি দেখে বার বার মল্লিকার মনে হয় তাম্নু মাসির কথাগুলো, মাসি খেলাচ্ছলে একদিন যা বলেছিল। মাসি কি মুক্তি খুঁজে পেয়েছে আকাশের পেঁজা তুলোর মত এই মেঘের টুকরোগুলোর মধ্যে?

একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে ট্রেণ লাইন পেরিয়ে, দূরে যেখানে অনেকগুলো বড় বড় তালগাছের জটলা, তার পেছনে। লাল হয়ে যাবে সমস্ত আকাশটা। দল বেঁধে পাখির ঝাঁক উড়ে যাবে। বাড়ি ফিরে যাবে, সবাই বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু তাম্নু মাসি বাড়িঘর দীপু সবাইকে ছেড়ে চলে গেল কেন? কী এমন দরকার পরেছিল তাম্নু মাসির, সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবার? তার কথা কি একবারও মনে হয় নি মাসির?

মাসি বলতো—'তুই আমার মেয়ের মত। আর জন্মে নিশ্চয়ই মেয়ে ছিলি। নইলে প্রথম নজরে এত ভালবাসবো কেন? তুই আমার মেয়েও, আবার আমার বন্ধুও। সব কথাই তো তোকে বলি।'

ছাই বলে! কিছুই বলতো না তাম্নু মাসি। সব লুকোতো। নইলে এমন করে কল নেই যাবে? কিছুই কি বলে যেতে পারতো না মাসি? আর বললো কি এমনটা হ'তো?

মাসি দূরে সরে গিয়েছে। নিজে মুক্তি পেয়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু কোন এ অদৃশ্য গ্লানির বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলো মল্লিকাকে।

সেই রাতের কথা মনে পড়ে মল্লিকার। সব সময়ই মনে পড়ে। দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে মল্লিকা—

'—কেন এমন করলে মাসি?'

'—দিদিমণি, মা ডাকছেন। সন্ধ্যে হ'য়ে এলো যে।'

মুখ তুলে ধরাগলায় মল্লিকা বল্লে—'তুই যা, আমি যাচ্ছি, সন্ধ্যে এখনও হয় নি।'

সন্ধ্যে না হওয়া পর্য্যন্ত তারা নীচে নামতো না। কত কথা, কত গল্প। কেমন সুন্দর গল্প বলতে পারতো তাম্নু মাসি। তার গল্প, আরও কত লোকের গল্প। তাদের অনেককেই মল্লিকা দেখেনি। কিন্তু হঠাৎ যদি তাদের মধ্যে কেউ এসে সামনে দাঁড়ায়, ঠিক চিনতে পারবে মল্লিকা।

এমন বলার ভঙ্গি ছিল তাম্নু মাসির। গল্প দিয়ে মানুষ চিনিয়ে দিতে পারতো সে।

—যখন আমার বিয়ে হয় বয়স তখন কত হ'বে? আঠেরো কি উনিশ। লোকে বলতো, 'এই মেয়ে যে ঘরে যাবে, মন মজাবে সবার।' একটু হেসে মাসি আবার বলতো,—সবাইর কেন, একজন, যার মন মজাবার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশী, ফিরেও তাকালো না সে। দু বছর ঘর করলুম। ব্যস্। ঐ পর্য্যন্ত। চলে এলুম জামাইবাবুর সঙ্গে, তিনিও আবার বিয়ে করে সংসারী হ'লেন। বেশ আছে এরা। জলের মত আর কি বাটিতে রাখ এক বাটি জল। ঘটিতে রাখ একঘটি জল।

এক একদিন বলতো—'দেখতে কিন্তু বেশ ছিল।

ইয়া লম্বা চওড়া জোয়ান লোক। চেঁচিয়ে কথা বলে, হো হো করে হেসে ওঠে। এক একদিন আমায় মাথার ওপর তুলে ধৈ ধৈ নাচ।'

হঠাৎ মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসতো মাসি—'তোর মাথা খাচ্ছি একেবারে, এতটুকু মেয়ে, তুই এসব কী বুঝবি বলতো?'

অধৈর্য্য হয়ে মল্লিকা বলে উঠতো—'তুমি বলো মাসি। আমি বুঝবো। বড্ড মাঝপথে ডিষ্টার্ভ ক'রো তুমি।'

সেই তানু মাসি, যে আর মল্লিকাকে গল্প বলবে না, গল্প মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে বলবে না,—'বড় হও। সব বুঝবে, এখন আর এর বেশী শুনতে নেই না।'

সহরের যে দিকটা বাড়তে বাড়তে একেবারে ট্রাম লাইনটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তারই গা ঘেঁসে ছোট বড় কয়েকটা বাড়ী।

সহর বাড়ছে।

তখন সামনের মাঠটা খালি ছিল। দুর্গা পূজো হ'তো সেখানে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে লাইন পেরিয়ে ওপারের কচুরীপানা ঢাকা লম্বা টানা জলা পরিস্কার দেখতে পেতো মল্লিকা। যখন প্রথম এসেছিল তারা, নতুন বাড়ি করে। তখন।

এখন ছাদে না উঠলে আর দেখা যায় না কিছু। মল্লিকবাবুদের নতুন বাড়ি হচ্ছে, সব কিছু দৃষ্টির আড়াল করে দিচ্ছে মল্লিকবাবুর নতুন বাড়ি।

—'তোমরা বুঝি নতুন এলে?'

চমক ভেঙে মল্লিকা তাকিয়ে দেখল তাদের বাড়ির গা ঘেঁসে যে বাড়ি—যে বাড়ির মালিকের নাম গেটের সামনে পেতলের প্লেটে লেখা বিমলকুমার মিত্র—সে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মহিলা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মাকে মল্লিকা সুন্দর দেখে, খুব সুন্দর দেখে, কিন্তু সেই দিন সেই সময় মনে হয়েছিল এ যেন মার চেয়েও সুন্দর। অনেক সুন্দর।

এ প্রথমদিনকার কথা। তিন বছর, না আরও দুএক মাস বেশি হবে। তখনও সে মাঝে মাঝে ফ্রক পরতো। বাসে চড়ে স্কুলে যেতে। নিজে নিজে বাইরে বেড়ুতে গা ছম ছম করতো। এ তখনকার কথা।

তারপর কতদিন কেটে গেলো।

—তুমি আমাকে তানু মাসি বলে ডেকো। সবাই তাই ডাকে। মল্লিকাও ডাকতো। চিরদিন ডাকতো।

কিন্তু সেই আজ, কী ভয়ঙ্কর, কী নিষ্ঠুর!

বিকেল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। কুকুর তাড়ানো বৃষ্টি। তানু মাসি এখনও এলো না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মল্লিকা পড়ার টেবিলে বসে বই টেনে পড়বার চেষ্টা করছে। এমন সময়—

—'আঃ, কি হচ্ছে! চোখ ছাড়ো, থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই, এখন আসবার সময় হ'লো?'

মল্লিকার চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে তানু মাসি সামনে এসে দাঁড়ালো।

মল্লিকা হাঁ করে দেখছে তানু মাসিকে। সব কথা যেন বন্ধ হয়ে গেছে তার:

—কি হ'লো রে? কথা বলবি নে?'

মল্লিকা অনেকটা সামলে নিয়েছে ততক্ষণ।

—'তুমি এতো সেজেছো কেন মাসি? কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাকে।'

লাল টুকটুকে বেনারসী পড়েছে তানু মাসি। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে, জুঁই ফুলের মালা জড়িয়েছে খোঁপায়। গা ভর্ত্তি গয়না, ঠোঁটে গাঢ় লিপ্‌ষ্টিক।

—'কি করবো বল? কিছুতেই ছাড়লো না জামাইবাবু। বিয়ের সাজে সাজালো আমাকে, আর এই দেখ্, জোর করে পরিয়ে দিল।'

শাড়ি একটু তুলে পা দেখালো তানু মাসি। রূপোর পাঁজোর পড়েছে মাসি, কাঁচা সোনা দিয়ে মোরা পায়ে কী চমৎকার যে মানিয়েছে! সোনা রূপোর এই অপূর্ব্ব মিলন এর আগে কখনও দেখেনি মল্লিকা। আর দেখবে কিনা তাও জানে না।

—আজ আমার জন্মদিন কিনা। তাইতো জামাইবাবু সকাল সকাল ফিরেছে আজ। আর এই সব পাগলামি, খুব ভালবাসে তো! আর তা ছাড়া আমার দুঃখ জামাইবাবুই যা বোঝে। বউয়ের বোন, বলতে গেলে ছোট বোনের মত। তাই তো না বলতে পারি নে। নে, হাঁ কর।

তা করতেই মল্লিকার মুখে একটা সন্দেশ গুঁজে দিয়ে তান্নু মাসি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে—

—'বিয়ের পর সন্দেশ মুখে গুঁজে দিয়েছে। খেতেও পারি না, লোকে কি বলবে। ফেলতেও পারি না, কে কি ভাববে। সে যে কী অবস্থা।' হেসে লুটিয়ে পড়ে তান্নু মাসি।

শুধু শুধু এতো হাসতে পারতো তান্নু মাসি।

কিন্তু তখন কি জানতো, আর কতক্ষণ বা।

সেই ভয়ঙ্কর রাত।

এবার নিচে নামতে হবে, এক্ষুণি মা আবার এসে হাজির হবেন হয়তো। সুজিতদার বিয়েতে কত লোক আসবে। এর মধ্যে দু'চার জনের কি আর ভাল ছেলে নেই? নিশ্চয়ই আছে। মল্লিকার জন্যে একজনকে যদি টুপ করে তুলে আনতে পারা যায়। লাল বেনারসী পরে সেজে গুজে যাবে মল্লিকা। যেতে ইচ্ছে না করলেও যাবে, কিন্তু আর একটু থাক।

জটলা করা তাল গাছগুলোর ফাঁকে এখনও সূর্য্য দেখতে পাচ্ছে মল্লিকা। ঝিমিয়ে পড়েছে, এবারই ঢলে পড়বে একেবারে। আকাশের ওদিকটায় লাল ছোঁয়া লেগেছে। আর একটু পরেই কালো হয়ে যাবে। নিচে নামতে হবে মল্লিকাকে। সুজিতদার বিয়েতে যেতে হবে সেজেগুজে যদি কোন ভাল ছেলের নজরে পড়ে যেতে পারে তবেই, তবেই সার্থক হবে মল্লিকা! সার্থক হবে মল্লিকার মা, বাবা, দাদা সবাই।

আর একটু। সূর্য্য এখনও ঢলে পড়েনি। আর একটু দাঁড়াতে পারে মল্লিকা। আর একটু ভাবতে পারে তান্নু মাসির কথা! যে মাসি আর দশদিন আগেও এমন সময় তার সঙ্গে গল্প করেছে!

সেই রাত আসবার আগেও যে রোজ তার কাছে এসে গল্প শোনাতো। তার কথা, আরও কত লোকের কথা। যাদের মল্লিকা দেখেনি। কিন্তু দেখলে চিনতে একটুও দেরী হবে না। ঠিক চিনে নেবে।

...ঘুম ভেঙ্গে গেলে, প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে নি মল্লিকা।

আবার কানে এলো—না, না, এখন নয়। দীপু এখনও জেগে।

এ যে মাসির গলা! তান্নু মাসির! ধরমড়িয়ে বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকা।

মুখোমুখি জানালা, রোজ বিমলবাবু আসবার আগে জানালা বন্ধ করে দেওয়া হতো, আজ বিকেল থেকেই বিমলবাবু বাড়িতে।

জানালা বন্ধ করার সময়, এখনও হয়নি।

হাই পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে বিমলবাবুর ঘরে। আর সেই আলোতে দেখছে মল্লিকা।

মাসি দোর গোড়ায় বসে আছে। অত সাধের খোঁপা ভেঙ্গে পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে, ফুলের মালা ছিঁড়ে ফুলগুলো এখানে ওখানে পড়ে আছে। মাসির কপালের ডান-দিকটায় লাল কেন? কেটে গেছে নাকি? পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ডান পাশটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

বিমলবাবু মাসির হাত ধরে জোরে টানতেই মাসি ক'কিয়ে উঠলো—তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এখন নয়। দীপু এখনও ঘুমোয় নি ভালো করে।

বিমলবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজর পড়েছে এ বাড়ির দিকে। হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো বিমলবাবু।

মাসিও দৃষ্টি ফিরিয়েছে এদিকে।

সিমেণ্ট গলে গলে যাচ্ছে। আর তাতে আটকে যাচ্ছে মল্লিকার পা দুটো। তুলতে পারছেনা, একটুও তুলতে পারছে না পা দু'টো।

তান্নু মাসি ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ততক্ষণ।

সকাল হতে না হতেই ভীড় লেগে গেছে ও বাড়ির গেটে। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়েছিল মল্লিকা, ঘরে ঢুকবার দরকার হয়নি।

বাইরে থেকেই দেখতে পেয়েছিল।

মাটির থেকে অনেক উঁচুতে ঝুলছে দু'টো শ্বেত পদ্ম, আর তাদের জড়িয়ে রয়েছে দুটো কালো কালো সাপ!

আলো-আঁধারের মাঝে পাঁয়জোর দু'টোকে সাপের মতই দেখাচ্ছে যেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি
[অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়]

রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' লিখেছিলেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় তাঁর কবিখ্যাতি তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও প্রতিভার অরুণোদয় যে হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। রাজর্ষি উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র চিত্রণেই তা ধরা পড়ে। একটি বিশিষ্ট উদার ধর্মের সহজ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে। এই সময়ে দেশের প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করে। রাজর্ষি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ যুবক; দেহ ও মন তাঁর পরিপুষ্টি লাভ করেছিল পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য এবং বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ নানা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে। দেশের কুসংস্কার দূর করতে হলে মনের দৃঢ়তা, চিত্তের স্থৈর্য, মহান্ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সত্যাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন। কোনো মহাপুরুষের এই সমস্ত গুণ থাকলে তিনি সর্বত্র সাফল্য লাভ করতে পারবেন এবং জগতের তাতে মহা কল্যাণ সাধিত হবে, এ-ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল। উপরন্তু এক আদর্শবান্ রাজার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছিল তাঁর মানসপটে। মনে হয়, তদানীন্তন আদর্শভ্রষ্ট প্রজাপীড়ক স্বেচ্ছাচারী রাজাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ঘৃণা ছিল; তাই জগদ্বাসীর সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন এক আদর্শবান্ রাজাকে। গোবিন্দমাণিক্যের মতো একজন সত্যাশ্রয়ী রাজর্ষি-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল বরাবরই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের যখন শৈশবাবস্থা, তখন থেকেই তিনি এই রাজপরিবারের আনুকূল্য পেয়ে আসছিলেন। এই রাজ্যের রাজার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল বিশেষ উন্নত; তার উপর মনের মাধুরী দিয়ে এই রাজাকে তিনি সর্বগুণে সমলংকৃত করে উপস্থাপিত করেছেন তার রাজর্ষি উপন্যাসে। এই দিক থেকে রাজর্ষি উপন্যাসকে অংশতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে বলা যায়।

উপন্যাসের প্রথমেই দেখি গোবিন্দ মাণিক্যকে গোমতী নদীর ঘাটে। তিনি প্রভাতে স্নান করতে এসেছেন; হাসি নামে একটী ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা সেই ঘাটে। তার সঙ্গে প্রথম কথাতেই গোবিন্দ মাণিক্য নিজেকে তার সন্তান বলে পরিচয় দিলেন। তারপর মেয়েটি তাকে ফুল পেড়ে দিতে বললে রাজা নিজের হাতে ফুল তুলে হাসির আঁচল ভরে দিলেন। এই সময় তিনি মনে করলেন, পবিত্র হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে আজ তার পুজো সার্থক ও সম্পূর্ণ হল। সেদিন তিনি হাসির মুখে দেখেছিলেন বিমল উষার প্রতিচ্ছবি। ছোট্ট মেয়েটির ফুটফুটে মুখখানি থেকে যেন বিমল সৌরভ বিচ্ছুরিত হয়ে কাননভূমি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল। হাসির ছোট ভাই তাতা তার দিদিরই যেন একটি ছায়া। হাসির হাত ধরে রাজা যখন ফুল পেড়ে দিচ্ছিলেন, তখন ছোট ভাইটি তার দিদির কাপড় ধরে ধরে অবাক হয়ে ফিরছিল। এই শিশু দুটির অমিয় মাধুরীতে রাজার মন গেল ভরে। হাজার হাজার প্রজা অনুক্ষণ যাঁর আদেশের অনুগামী, সেই রাজা গোবিন্দমাণিক্য সামান্য একটি বালিকার সেদিন ফুল পেড়ে দেবার আদেশ পালন করে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে রাজর্ষি জনকের চিত্র চিরদিন ছিল অম্লান। সেই শাশ্বত আদর্শ ভুলে যাওয়াতে ভারতের দুর্দশায় কবির মনকে অনুক্ষণ দগ্ধ করত; সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে ভারতের সেই সনাতন রাজাদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাসির সঙ্গে প্রথম সংশ্রবে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে রাজর্ষির সেই রূপটি চোখে পড়ে।

গোবিন্দমাণিক্য রাজা হলেও শিশুর মতো মনটি ছিল অত্যন্ত নির্মল ও কোমল। হাসি ও তাতাকে প্রতিদিন

প্রভাতে ফুল তুলে দিতেন; কোনো দিন তাদের না দেখতে পেলে সেদিন তাঁর সন্ধ্যাবন্দনাদি হত অসম্পূর্ণ। রাজার সঙ্গে সরল শিশুদুটির এমন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে হাসি রাজাকে 'বাবা' বলে ডাকত, আর রাজা উত্তর দিতেন 'মা' বলে। এই ভাবে দিন যায়। নির্মল শিশু-চরিত্রের সংস্পর্শে নির্মল রাজচরিত্রও মহিমময় হয়ে উঠল।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে একশ মোষ বলি হওয়ায় স্নানের ঘাট দিয়ে রক্ত গিয়ে মিশেছে নদীতে। পরদিন ঘাটে এসে তাই দেখে হাসি সভয়ে রাজাকে বলে উঠল—'এ কিসের দাগ, বাবা।' রাজা উত্তর দিলেন 'রক্তের দাগ, মা।' হাসি যখন পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করল—'এ রক্ত কেন?' তখন রাজার মুখে আর উত্তর সরল না; তিনি বালিকার প্রশ্ন শুনে শিউড়ে উঠলেন—ক্ষুদ্র এক বালিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে রাজা বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজার নীরবতার মধ্যে সে রক্তের দাগ মুছে দিল দুই শিশুসন্তান। বাড়ী এসেই হাসি পড়ল প্রবল জ্বরে। রাজা পরের দিন ঘাটে ভাই-বোনকে দেখতে না পেয়ে বড়ই ব্যাকুল হলেন এবং অনুসন্ধান নিতে গেলেন তাদের বাড়ীতে। সেখানে গিয়েই জ্বরবিকারের মধ্যে হাসির মুখে রাজা যখন শুনলেন, 'মা গো, এত রক্ত কেন?' তখনই তিনি তার উত্তর পেলেন, আর দীর্ঘকালের মোহান্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে এই রক্তস্রোত-নিবারণে কৃতসংকল্প হলেন। ক্ষুদ্র সরলা বালিকা নিজের প্রাণ দিয়ে রাজাকে জানিয়ে গেল, জগজ্জননী তাঁর সন্তানের রক্তে কখনই তুষ্ট হতে পারেন না। রাজত্বের ঘোলাটে আবিলতার মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য এ-সত্য জানতে অবকাশ পাননি; কিন্তু যখনই তিনি সে-সত্যের সন্ধান পেলেন, তখনই তাকে আঁকড়ে ধরলেন দৃঢ়ভাবে। তিনি চিরদিনের জন্য মন্দিরে বলিদান নিষেধ করে দিলেন। সহস্র বাদ-প্রতিবাদ, ষড়যন্ত্র কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারে নি। ওদিকে মন্দিরের পুরোহিত তেজস্বী ও দৃঢ়সংস্কারাচ্ছন্ন রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করতে লাগলেন; রাজাকে অভিশাপ দিতেও রঘুপতি পশ্চাৎপদ হন নি; কিন্তু হাসির কথা স্মরণ করে ও তার ছোট ভাই তাতাকে আশ্রয় করে রাজা একাকী হলেও হৃদয়ে পেলেন অসীম বল। তিনি প্রবল প্রতিপক্ষকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে সত্যকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন।

এরপর রঘুপতি নক্ষত্র রায়কে দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের হত্যাসাধনে কৃতসংকল্প হন। শেষে রাজা সমস্ত বুঝতে পেরে পরমস্নেহাস্পদ সরলান্তঃকরণ নক্ষত্র রায়কে গোমতী-তীরের নির্জন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাজ্যের লোভে তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও? 'তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজচ্ছত্র? এই মুকুট, এই রাজচ্ছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক।' এখানে লক্ষণীয়, রাজর্ষি গোবিন্দ-মাণিক্যের মুখে ভারতীয় রাজাদর্শের চিরন্তন সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আদর্শ রাজচরিত্র এতদিন সংগোপনে কল্পনাজগতে বিচরণ করছিল, তাই আজ মূর্ত হয়ে দেখা দিল গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে। গোবিন্দমাণিক্যকে সেই আদর্শে বিভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ জগৎকে জানিয়ে দিলেন রাজার কর্তব্য কি। সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃহত্যা, পিতৃনির্যাতন ইত্যাদি কত পাপই না করেছে লুব্ধকশ্রেণী; এই ভারতের বুকে কত নির্দোষের প্রতি অত্যাচার, অবিচার হয়েছে—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। সত্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়ায় কত পাপে কলুষিত হয়েছে ঐ রাজসিংহাসন। ভোগকে জয় করেই রাজা হওয়া যায়, ভোগকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়। এই আদর্শ থেকে রাজারা ভ্রষ্ট হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাই তিনি লোকশিক্ষার জন্য সমস্ত গুণে বিভূষিত করে গোবিন্দমাণিক্যকে রাজর্ষিরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

নক্ষত্ররায়কে দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের হত্যাসাধনে বিফল হয়ে রঘুপতি মায়ের পূজার ছলে রাজরক্ত আনতে আদেশ করলেন তাঁরই চরণাশ্রিত সেবক জয়সিংহকে। প্রভুর আদেশে জয়সিংহ অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে শেষে মন্দিরে গিয়ে প্রতিমার

দিকে চেয়ে করজোড়ে বলল—'পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অন্তর করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়?' এখানেও প্রতিমার অন্তরালে থেকে রঘুপতি জয়সিংহকে ছলনা করেন। পরিশেষে জয়সিংহ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে গোবিন্দমাণিক্যের অঙ্কাশ্রিত শিশু ধ্রুব উর্ধ্বস্বরে কেঁদে তার ছোট দুই হাতে রাজাকে জড়িয়ে প্রাণপণে রাজাকে আচ্ছাদন করে রাখলে নিরস্ত্র গোবিন্দমাণিক্য আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করে ধ্রুবকেই বক্ষে চেপে ধরে রইলেন। এই দেখে মহত্তম জয়সিংহ তরবারি দূরে ফেলে দিয়ে ধ্রুবের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'কোনো ভয় নেই, বৎস, কোনো ভয় নেই। আমি এই চলিলাম। তুমি ঐ মহৎ আশ্রয়ে থাকো। ঐ বিশাল বক্ষে বিরাজ কর—তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।' এই ব্যাপারে বুঝতে পারা যায়, নিরক্ষর অথচ সত্যাশ্রয়ী জয়সিংহের চোখে গোবিন্দমাণিক্য কত মহান্ ছিলেন।

শেষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জয়সিংহ রাজাকে রক্ষা করল নিজ রক্তদানে। পুত্ররূপে পালিত জয়সিংহের আত্মবলিতে রঘুপতি হয়ে উঠলেন ক্ষিপ্ত ও হিংস্র। প্রতিশোধ মানসে নক্ষত্র রায়কে দিয়ে কৌশলে শিশু ধ্রুবকে আনালেন রঘুপতি প্রতিমার সামনে বলি দেবার জন্য; কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সময়োচিত তৎপরতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে রঘুপতি ও নক্ষত্র রায় উভয়েই শিশু হত্যার ষড়যন্ত্রে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হলেন। পরম স্নেহাস্পদ অনুজ নক্ষত্র রায়কে নির্বাসন দণ্ড গোবিন্দমাণিক্য দিয়েছিলেন রাজকর্তব্য বোধে। সেখানে ব্যক্তিগত স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা অতি তুচ্ছ। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার নির্বাসন দণ্ড ঘোষণা করলে প্রহরীরা নক্ষত্ররায়কে নিয়ে যেতে উদ্যত হল, তখন সিংহাসন থেকে নেমে ভাইকে আলিঙ্গন করে গোবিন্দমাণিক্য রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইলনা, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম। যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।' এখানে গোবিন্দমাণিক্যের আদর্শচরিত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। একদিকে কর্তব্য, আর একদিকে স্নেহ। কত দৃঢ়চেতা ও কর্তব্যপরায়ণ হলে এ রকম অবস্থায় ন্যায়-রক্ষা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যকে সত্য ও ন্যায়ের উপাদানে গঠিত করে ভারতীয় রাজাদর্শ পুনঃ সংস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

অহিংসার মূর্তপ্রতীক গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র হিংসাভাব ছিল না। নক্ষত্ররায় কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের সংবাদে বিল্বন ঠাকুর গোবিন্দমাণিক্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললে গোবিন্দমাণিক্য যে চিঠি দিয়েছিলেন নক্ষত্ররায়কে, তাতে যুদ্ধের নামগন্ধও ছিল না; ছিল পরম স্নেহাস্পদ নক্ষত্ররায়কে দেখবার জন্য গোবিন্দমাণিক্যের কি ব্যাকুলতা। রাজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, যে নক্ষত্ররায় যুদ্ধ করতে এসেছে সে আসল নক্ষত্ররায় নয়। গোবিন্দমাণিক্য মনে করতেন, একই রক্ত উভয়ের ধমনিতে প্রবাহিত হলে কেউ কারও শত্রু হতে পারে না। তিনি বুঝেছিলেন, নক্ষত্র রায়ের মধ্যে এই হিংস্র প্রবৃত্তি এনে দিয়েছে প্রতিহিংসালোলুপ রঘুপতি। তার হাত থেকে নিস্তার পেলেই নক্ষত্ররায় পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, এ-কথা গোবিন্দমাণিক্য স্থির জানতেন। এই জন্যই বিল্বন ঠাকুরের কথায় রাজা যুদ্ধের কোনই আয়োজন করলেন না। এতেই বোঝা যায়, অনুজের প্রতি গোবিন্দমাণিক্যের ছিল কি গভীর স্নেহ ও অগাধ বিশ্বাস!

রঘুপতির কবল থেকে নক্ষত্ররায়কে যখন কিছুতেই মুক্ত করতে পারা গেল না, তখন রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাদের কথা চিন্তা করে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে রাজ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করলেন। তিনি রাজবেশ ছেড়ে গেরুয়া বসন পরলেন, আর ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক দীর্ঘ আশীর্বাদ পত্র লিখলেন। রাজার বড় আশা ছিল, ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মনে কিছুটা শান্তিলাভ করবেন কিন্তু সে পথে কেদারেশ্বর কণ্টকস্বরূপ হলে গোবিন্দমাণিক্যের 'সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল—অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খেলা করো।" রাজার সমস্ত হৃদয়

গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল, অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন, "তবে ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।" অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষু তারকায় অঙ্কিত হইল।' কেদারেশ্বর জোর করে রাজার কাছ থেকে ধ্রুবকে টেনে নিতেই বালক কেঁদে উঠল। রাজা তার দিকে ফিরে চাইতেই ধ্রুব ছুটে এসে রাজাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাল, রাজা তাকে বুকে তুলে নিলেন; তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, ধ্রুবকে বুকের কাছে চেপে অতি কষ্টে হৃদয়কে দমন করলেন। সেই অবস্থায় শিশুকে কোলে রেখে রাজা দীর্ঘ কক্ষে পদচারণা করতে লাগলেন। বালক রাজার কাঁধে মাথা রেখে অত্যন্ত স্থির হয়ে পড়ে রইল এবং অচিরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা কেদারেশ্বরকে আর বললেন না; ধীরে ধীরে ঘুমন্ত শিশুকে কেদারেশ্বরের হাতে সমর্পণ করে রাজা যাত্রা করলেন। এই সব ব্যাপারে গোবিন্দমাণিক্যের অতি মহনীয় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যত্যাগের সময়েও প্রজাবর্গের মঙ্গলের দিকেই ছিল গোবিন্দমাণিক্যের লক্ষ্য; ভাই নক্ষত্ররায়কে যে আশীর্বাদী পত্র দিয়েছিলেন তাতে স্নেহের যে কী গভীরতা ছিল তা শুধু অনুভূতিগম্য; আর পরিশেষে স্নেহের পুত্তলি ও রাজার একমাত্র সান্ত্বনার ধন ধ্রুবকে ফিরিয়ে দিয়ে কেদারেশ্বরের মনে গোবিন্দমাণিক্য কোনো আঘাত দিলেন না; অথচ প্রস্থানকালে তাঁর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কাউকে তাঁর বেদনার কথা তিনি জানান নি।

গোবিন্দমাণিক্য স্বেচ্ছায় তাঁর সাধের রাজ্য ছেড়ে চলেছেন। প্রজারা কেউ এল না তাঁর বিদায়ের সময়; কেবল এক জুমিয়া রাজাকে দেখতে পেয়ে ক্ষেত থেকে ছুটে এসে রাজাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। রাজা ঘোড়া থেকে নেমে আকুলকণ্ঠে তার কাছে বিদায় নিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁর সমস্ত সন্তান প্রজাদের হয়ে তাঁর রাজত্বের অবসানে তাঁকে ভক্তিভরে ম্লানহৃদয়ে বিদায় দিল।

ধীরে ধীরে রাজা এসে পড়লেন কেদারেশ্বরের কুটিরের কাছে। এইখানে এসে হাসির কথা তাঁর মনে পড়ল। হঠাৎ এই সময় ধ্রুব তার ছোট ছোট পা ফেলে ও হাত তুলে হাসতে হাসতে রাজার কাছে ছুটে আসতে লাগল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়লে ধ্রুব একেবারে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজার কাপড় টেনে, তাঁর হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আনন্দোচ্ছ্বাসের পর সে রাজাকে বলল 'আমি টকটক্ চ'ব।' রাজা তাকে ঘোড়ার উপর চাপিয়ে দিলেন। ঘোড়ার উপর চড়ে ধ্রুব রাজার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর কপোলের উপর সে তার কোমল কপোলখানি বিন্যস্ত করল। রাজা ধ্রুবকে বার বার মুখচুম্বন করে তার কাছে বিদায় চাইলেন; কিন্তু শিশু কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না; সেও যাবে রাজার সঙ্গে, কখন সে বাড়ী ফিরবে না। এমন সময় পরিচারিকা এসে সবলে ধ্রুবকে টেনে নিতে চেষ্টা করল; শিশু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাল। রাজা কাতর হয়ে ভাবলেন, বক্ষের শিরাও টেনে ছেঁড়া যায় কিন্তু এই ছোট দুটি হাতের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রাজাকে কঠোর হতে হল, কারণ তিনি নিরুপায়। ধ্রুবের হাত খুলতে তাঁর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। তিনি জোর করে বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরিচারিকার হাতে ধ্রুবকে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদতে কাঁদতে হাত তুলে চীৎকার করে বলল, 'বাবা, আমি যাব, বাবা, আমি যাব।' রাজা যতদূর যেতে লাগলেন কেবল শিশুর কান্নাই তিনি শুনতে পেলেন; অজস্র ধারায় রাজার বক্ষঃস্থল গেল ভেসে, পথঘাট হল ঝাপসা, সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল অন্ধকারে। ঘোড়া যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলল।

গোবিন্দমাণিক্য যেতে লাগলেন; পথের মাঝে কতকগুলি মোগলসৈন্য রাজাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে অদূরবর্তী অশ্বারোহী রাজার এক সভাসদ্ রাজার কাছে এসে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলে গোবিন্দমাণিক্য তাঁকে শান্ত করে বললেন যে তাঁর এই দুঃসময়ে জগদীশ্বরের মুখ চেয়ে তিনি সব সহ্য করবেন। শেষে রাজা সভাসদকে আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নেবার সময় বললেন, 'নয়ন রায়, তোমরা নক্ষত্রকে সমাদর করো, আমার মতো তাকেও সম্মান দিও। সকলে

মিলে তাকে সুপথে রেখো আর প্রজাদের কল্যাণের জন্যই তাকে রক্ষা করে চলো।'—ছোট ভাইয়ের প্রতি গোবিন্দমাণিক্যের কি অগাধ স্নেহরস সঞ্চিত ছিল তার নিদর্শন এইখানেই। গোবিন্দমাণিক্যের মত রাজর্ষি না হলে এমন উক্তি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সদ্‌গুণ দিয়েই গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিভূষিত করেছেন।

এরপর বিল্বন ঠাকুরের সঙ্গে রাজার দেখা গোমতী নদীর তীরে। সেখানেও রাজা ঠাকুরকে প্রণাম করে অনুরোধ করলেন নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে অনুক্ষণ থেকে তাকে সৎপরামর্শ দিয়ে রাজ্যের হিতসাধন করতে। এখানেও রাজার মহৎ প্রজাবৎসল্যই সুপ্রকট। ত্রিপুরার প্রজারা যে তাঁরই সন্তান; সেজন্য তাদের কল্যাণের কথাই তিনি ভেবে চলেছেন. আর কারোর কাছে মনের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ পেলেই অকপটে বলে চলেছেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আর কলিযুগে রাজা গোবিন্দমাণিক্য প্রজাদের কল্যাণে স্বয়ং নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করলেন।

অবশেষে রঘুপতি ও কেদারেশ্বরের প্রায়শ্চিত্ত হল। উভয়েই নক্ষত্র রায় কর্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়ে ত্রিপুরা পরিত্যাগ করলেন। কেদারেশ্বর ধ্রুবকে নিয়ে যেতে যেতে নায়াখালির পথে মড়কে মারা গেলে অসহায় ধ্রুব রক্ষা পেল বিল্বন ঠাকুরের আশ্রয়ে। আর, রঘুপতি পাষাণপ্রতিমা ত্রিপুরেশ্বরীকে গোমতীর জলে বিসর্জন দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। আজ তাঁর রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল।

এদিকে গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করলেন। আরাকানরাজের অনুগ্রহে ময়ানি নদীর ধারে তিনি কুটির বাঁধলেন। নদীর দুইপাশে খাড়া পাহাড়; কোথাও ছোট ছোট গহ্বর; নদীতীরের মাঝে মাঝে কোথাও বা বিস্তীর্ণ জঙ্গল; ফাঁকে ফাঁকে ঝরণা পাহাড় বেয়ে করুণাধারা বিতরণ করে চলেছে। গোবিন্দমাণিক্য বাস করতে লাগলেন এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে। তিনি প্রকৃতির এই প্রেমসম্পদ হৃদয় ভরে গ্রহণ করলেন; বিজন প্রকৃতির চিরশান্ত এই গম্ভীর প্রেমধারা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বর্ষিত হতে লাগল। তিনি আত্মসমাহিত হয়ে ক্ষুদ্র অভিমানরাশি মুছে ফেললেন; নিজের মধ্যে চির নির্মল আলো ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করতে লাগলেন দ্বার উন্মুক্ত করে। তাঁর পূর্বের দুঃখ, ব্যথা, স্নেহ, মায়া, উপকার, কৃতঘ্নতা, অপমান সমস্ত গেলেন ভুলে। প্রশান্তমনে হাতযোড় করে তিনি বললেন জগদীশ্বর! তোমার কোল আমায় স্থান দিয়ে তুমি আমায় নূতন আলোক দেখালে। আমার পরাণপুতলি ধ্রুবকে কেড়ে নিয়ে আমায় শিখিয়েছ যে পুণ্যের পুরস্কার পুণ্যই। সেই পুণ্যের ফলে ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলে—তোমার প্রসাদ বলে অনুভব করছি। তোমার প্রেমে আমায় বশীভূত করে তোমার সেবা করবার আমার শক্তি দাও।

প্রকৃতির সস্নেহলালনে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে আরও এক বিরাট পরিবর্তন এল। তিনি বুঝতে পারলেন, ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি তাঁর স্নেহধারা বর্ষণ করছেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে নদীরূপে, তাতে তৃষ্ণা দূর হচ্ছে সমগ্র জীবকুলের, শস্যসম্পদে ভরে উঠেছে সর্বত্র; তরুলতা ফলফুলে পূর্ণ হয়ে জীবসাধারণের হিতসাধন করছে। তাই গোবিন্দ মাণিক্যও তখন চলে এলেন লোকের মধ্যে প্রেমদান করতে যা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন প্রকৃতির কোলে এত দিন বাস করে। যাকে দেখতে পেলেন তার সঙ্গে দুটো কথা বলে সুখ পেলেন; যে তাঁকে উপেক্ষা করল তার থেকেও তাঁর হৃদয় অপসৃত হলনা। তিনি ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে পিতাকে পুত্রের সঙ্গে, মাকে শিশুর সঙ্গে মিলনে দেখতে পেলেন সুদূরবিস্তৃতব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম। কোনো জননীর অঙ্ক শিশুকে দেখতে পেয়ে তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে। দুই বন্ধুকে হাত ধরে যেতে দেখলে তিনি তার মধ্যে অনুভব করলেন বন্ধুপ্রেমে সমৃদ্ধ সমগ্র মানবজাতিকে, ধরিত্রীকে তিনি এখন দেখতে পেলেন আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীরূপে। সর্বত্রই তিনি জগজ্জননীর কল্যাণমূর্তিকে দেখতে লাগলেন।

গোবিন্দমাণিক্য রাজা হয়েও ঋষি; তাঁর মধ্যে জ্ঞানের যে দীপশিখা রাজ্যশাসনের কঠোর কর্তব্যের মধ্যে স্তিমিত হয়েছিল, ত্রিপুরা ছেড়ে আসার পর সেই শিখা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল সর্বশক্তি নিয়ে। ত্রিপুরায় অবস্থানকালেও

গোবিন্দ মাণিক্য প্রকৃতির সাহচর্য পাবার জন্য গোমতী-তীরে মাঝে মাঝে যেতেন। রাজ্য ছেড়ে আসার পর প্রকৃতির অফুরন্ত স্নেহে তিনি মনকে নিলেন পূর্ণ করে। এখানে এসে তিনি যে প্রেমামৃত লাভ করলেন, তা জনগণকে দান করার জন্য চলে গেলেন লোকালয়ে সেবাব্রত নিয়ে। একদিন তিনি আলমথাল নামে এক গ্রামে পৌঁছানর পর এক কুটীর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি কুটির মধ্যে দেখলেন, গৃহস্বামী একটি শীর্ণ শিশুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন, আর বালকটি থর থর করে কাঁপছে এবং মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। গোবিন্দমাণিক্য তৎক্ষণাৎ নিজের কম্বলখানা দিয়ে শিশুর দেহ ঢেকে দিলেন এবং তার শয্যাপার্শ্বে বসে গল্প বলতে লাগলেন। বালক রোগের কষ্ট ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, রাজা শয়ন করলেন পাশের ঘরে। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল ধ্রুবের কথা—তাকে ছেড়ে আসার পর সকল বালককেই রাজার ধ্রুব বলে মনে হত। এইবার তিনি স্থির করলেন, আর বৃথা ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে লোকালয়ে এসে জনসেবা করবেন। এই উদ্দেশ্যে আরাকানরাজের অনুমতি নিয়ে মগদের এক দুর্গে বাস করতে লাগলেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে ভীড় করে এল, তিনি তাদের নিয়ে পাঠশালা খুললেন। তিনি তাদের পড়াতেন, তাদের সঙ্গে খেলতেন, তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে থাকতেন; রোগ হলে তাদের সেবা করতেন। এই ভাবে গোবিন্দমাণিক্য তাদের সঙ্গ পেয়ে লাভ করলেন নূতন জীবনের আস্বাদ। গোবিন্দমাণিক্য শত শত ধ্রুবকে নিয়ে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

এর পরে ফকিরবেশী বাংলার শাসনকর্তা সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের দেখা। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখে ফকিরের মনে হল, তিনি যুগপৎ রাজা ও সন্ন্যাসী। ফকিরের ছিল অন্তর্দৃষ্টি; তাই গোবিন্দমাণিক্যের মহিমময় রূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ইহা অতি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। কবিগুরু বলছেন, 'গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া ফকিরের রাজা বলিয়াও মনে হইল, সন্ন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় একটা লম্বোদর পাগড়ি-পরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন, নয় তো দীন বেশধারী মলিন সন্ন্যাসী, অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ধূলি-শয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন, তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাহার নিকট ধরা দিয়াছে। কোনোপ্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এই জন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।'

এখানে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাগুলির মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের সম্বন্ধে সমস্তই বলা হয়ে গেল। তাঁকে প্রকৃত রাজর্ষি রূপে দেখে কবিগুরুর মন ভরে উঠেছিল। জগতের সামনে রাজার মহনীয় আদর্শ সংস্থাপনের জন্য গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি সমস্ত গুণেই ভূষিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তথাকথিত সন্ন্যাসীর প্রতি ধিক্কারও রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

রাজর্ষি উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের শেষাংশে দেখা যায় গোবিন্দমাণিক্যের মহনীয় চরিত্রের কাছে সবাই এসে ধরা দিয়েছেন। সর্বপ্রথম এলেন, রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য যে রঘুপতি কত নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং তাতে বিফল হয়ে গোবিন্দমাণিক্যের পরাণ পুতলি ধ্রুবকে বলি দেবার প্রচেষ্টায় ধরা পড়ে নক্ষত্ররায় সহ স্বয়ং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, সেই রঘুপতি দীর্ঘ দিন পরে আশ্রয় নিতে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে যখন এলেন তখন গোবিন্দমাণিক্য যথারীতি পূর্বের মতোই রঘুপতিকে প্রণাম করে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন; যে রঘুপতির চক্রান্তে গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যহারা হয়েছেন, প্রাণের ভাই নক্ষত্ররায়ের সঙ্গে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে এবং ধ্রুবের বিরহে যাঁর হৃদয় একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, সেই রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের সামনে উপস্থিত হলে রাজার আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পেলনা যে রঘুপতির সঙ্গে তাঁর কোনোও দিন বৈর ভাব ছিল; উপরন্তু তিনি করজোড়ে ব্যাকুলচিত্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'নক্ষত্রের

নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর? বিশেষ কোনো সংবাদ আছে?

—অহিংসা ও প্রেমের কি অপূর্ব সমন্বয়!

গোবিন্দমাণিক্যের প্রশ্নের উত্তরে রঘুপতি যে-সব উক্তি করলেন তার মধ্যে রাজার অপূর্ব মহত্ত্বই সুপ্রকট। রঘুপতি উত্তরে বললেন—'নক্ষত্ররায় ভাল আছেন, তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।...আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব, নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্যে আমি যোগ দিব।...আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম? আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।'

এখানে বিশেষ লক্ষণীয়, গোবিন্দ মাণিক্যের পরম শত্রুর মুখ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই দেবমহিমা।

এর পরেই ধরা দিলেন গোবিন্দ মাণিক্যের কাছে ফকিরের ছদ্মবেশে বাংলায় শাসনকর্তা সুজা। তিনি রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাংলার নবাব, আমিই তোমাকে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছি এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি—আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।' রঘুপতি আবার অকপটে বললেন, 'মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোনো কালে তোমাকে জানিতাম না।'

পরিশেষে বিল্বন ঠাকুর এসে যখন রাজার বুক জুড়ানো মাণিক ধ্রুবকে রাজার কোলে দিলেন তখন সত্যই স্বর্গ এসে নেমে পড়ল ধরাতলে। গোবিন্দ মাণিক্য শিশু ধ্রুবকে বুকে চেপে ধরে ডাকলেন 'ধ্রুব'। বালক সেই যে রাজার কাঁধে মাথা দিয়ে পড়ে থাকল আর কোনো কথা বলল না। রাজার গলা জড়িয়ে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে তার বহুদিনের দগ্ধ হৃদয় শীতল করে নিল। মিলনোৎস-ধারায় অভিষিঞ্চিত সেই নির্জন বনানীতে পরমা শান্তি মূর্ত হয়ে দেখা দিল। এইখানেই রাজর্ষি উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

রামায়ণে রাজর্ষি জনকের কথা সর্বজন-বিদিত। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি পরিকল্পনাও রামায়ণ থেকে পরিগৃহীত। রামায়ণে রাজা জনকের স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণের উল্লেখ আছে; ইহা ছাড়া আর কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোবিন্দ মাণিক্য অশেষ গুণে বিভূষিত। ভোগবিলাসের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও তিনি সংযত নিস্পৃহ। একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি স্বেচ্ছাচারী নন—রাজসভার পরামর্শ নিয়েই তাঁর রাজকার্য। প্রজাসাধারণের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর বাৎসল্য ও বিরাট দায়িত্বজ্ঞান—কিসে প্রজাদের সুখ সেই দিকেই ছিল তাঁর সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ন্যায় ও সত্য রক্ষায় তাঁর দৃঢ়তা, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতা, অপরিমেয় ভ্রাতৃস্নেহ, শত্রু হলেও সম্মানীয় ব্যক্তির প্রতি অকৃপণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তিপ্রদর্শন, করুণাময়ী প্রকৃতির নিকট আত্মোৎসর্গ ও শিক্ষাগ্রহণ, সর্বজীবে দয়া ও সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি নানা গুণাবলীতে তিনি সমলংকৃত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাজা করে ঋষির উপাদানেই গড়েছিলেন। এইজন্য তাঁর গোবিন্দ মাণিক্য যথার্থই রাজর্ষি।

লোকহিত ঃ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

শান্তিসুধা ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ নানা প্রসঙ্গে ভারতসভ্যতার স্বরূপ বিচার করেছেন। তাঁর এই জাতীয় আলোচনার মূল ধুয়াটি হল এ সভ্যতা পাশ্চাত্যের সঙ্গে একই মানে বিচার্য নয়, কারণ এ সভ্যতা ত্যাগমূলক। দর্শনের ক্ষেত্রে ভারত একদিন বোধির যে তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল কেবলমাত্র তার জন্যেই যে এ মূল্যবান, এমন নয়। সেই অধ্যাত্মচেতনার একটা বিচ্ছুরিত প্রতিফলিত আলো আমাদের জনজীবনেও প্রবেশ করেছিল। সাধারণ মানুষ জটিল বিষয় ধারণা করতে পারেনি, কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে এটুকু বিশ্বাস করেছে যে দৃশ্যমান জীবনই একমাত্র জীবন নয়। জীবনের আসল যে অর্থ এবং মানুষের আসল যে স্থান তা পরকালে এবং পরলোকে। পাপের ভয়, পুণ্যের লোভ, স্বর্গনরক সম্বন্ধে বিবিধ কল্পনা ভারতের মৌলিক অধ্যাত্মচেতনাকে অংশতঃ বিকৃত ও আবিল করে ফেলেছিল একথা অনস্বীকার্য, তবু জীবন সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর রূপটা বহু শতাব্দী ধরে একরকমই ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে নিজের জ্ঞান, প্রত্যক্ষানুভূতি এবং পরিব্রাজক জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বামীজী আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখেছিলেন, সংক্ষেপে তা নিম্নলিখিত প্রকার—

ভারতের প্রকৃতির মধ্যে একটা সন্তুষ্টির ভাব আছে। এজন্য সে কোনদিন পররাজ্যলোলুপ হয় নি। আর রাজা মহারাজাদের কথা বাদ দিলেও সাধারণ লোক চিরকাল মাত্র নিজের জন্য কিছু করতে কুণ্ঠিত হয়েছে। সে গৃহ নির্মাণ করেছে ইষ্টদেবতার সেবার নামে, রন্ধন করেছে অতিথিসেবার নামে, এবং নিজেদের প্রসাদভোজী ও প্রসাদজীবী রূপে কল্পনা করেছে। একান্নবর্তী পরিবার বন্ধনে সক্ষম ব্যক্তি নিজের ভোগকে ন্যূনতম মাত্রায় টেনে এনে সকলের সুখসুবিধার দিকে নজর রেখেছে, এবং কখনও মনে করেনি এটা তার মহত্ত্ব. বরং ভেবেছে এটা তার কর্তব্য।

সন্তুষ্টির সঙ্গে ছিল জাতিধর্মনির্বিশেষে ধর্ম সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। পাশ্চাত্যে সামান্য কৃষক মজুরও সেখানে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির নাম জানে, এবং নিজে কোন দলের সমর্থক নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারে। আমাদের দেশের লোক তা পারে না। অপর পক্ষে হিন্দুধর্মের মূল নীতি কোনগুলি তা জিজ্ঞাসা করলে দীনতম ব্যক্তির কাছ থেকেও শ্রদ্ধার্হ উত্তর পাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী হয়ত বলবে ধর্মের তত্ত্ব কি জানি না গির্জায় যাই মাত্র।

সহনশীলতা ও সমন্বয়ী মনোভাব ভারত সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য বিদেশী ও বিধর্মীকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে, অথবা তাকে উৎখাত করে দেয়। ভারত সেক্ষেত্রে নিরুৎসুক ও উদাসীনভাবে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়কেই আপনাপন পথে চলতে দেয়, এবং কালক্রমে তাকে বিশাল ভারত সভ্যতার অঙ্গীভূত করে নেয়। এইভাবে এখানে শক-হূণদল পাঠান মোগল একদেহে লীন হয়েছে। এইভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে নিত্য নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হচ্ছে। বিরাট ধর্মক্ষেত্রে সবাই অবিরোধে অবস্থিত। স্বামীজীর মতে এই সমস্ত নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ক্ষতিকর নয়, বরং এর দ্বারা ধর্মচেতনার পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক বিস্তৃতি, এবং সামাজিক স্বাস্থ্য ও সজীবতারই পরিচয় দেয়।

কিন্তু ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ইতিহাসের যে যুগান্তরকে লক্ষ্য করেছিলেন তার মধ্যে আমাদের সভ্যতার পূর্বোল্লিখিত মৌল লক্ষণগুলি আর স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছিল না।

স্বভাবগত সন্তুষ্টি ও উদাসীনতা তামসপর্যায়ে নেমে এসে দীর্ঘকাল আমাদের পরাধীন করে রেখেছে। সারা পৃথিবী

থেকে সরে এসে আমরা ঘরের কোণে কূপমণ্ডুক হয়ে রয়েছি। বহির্বিশ্বে আমাদের কোনো সম্মান নেই। এবং সব চেয়ে যা শোচনীয় তা হল আমাদের নিজেদের মধ্যেই আত্মবিশ্বাসের বিলয় ঘটেছে। ধর্ম হয়েছে কুসংস্কারমূলক আচার বিচারের সমষ্টি, এবং দেশের সাধারণ লোক দুর্দশার অতল গহ্বরটার দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত পরিব্রাজকরূপে সারা ভারতে পরিভ্রমণ করে স্বামীজী দেখেছেন কোটি কোটি দেশবাসীর অন্ন নেই, বস্ত্র নেই কোন রকম শিক্ষা নেই। বহুশতাব্দী ধরে উচ্চ-বর্ণের অত্যাচারে এবং বহির্বিশ্বের জ্ঞানের অভাবে তাদের মানসিক মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায়। তারা নেহাতই তুচ্ছ এবং সর্ববিষয়ে অপারগ একথা বংশানুক্রমে বিশ্বাস করতে করতে তারা তাইই হতে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের ভবিষ্যৎ কি, এবং কার্য-প্রণালীই বা কেমন হবে সে সম্বন্ধে স্বামীজী স্পষ্ট পথনির্দেশ করেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান, এবং তার অব্যবহিত পূর্বকাল থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রবীন্দ্র-নাথের সামাজিক চিন্তা 'স্বদেশ' 'সমাজ' 'আত্মশক্তি ও সমূহ' এবং কালান্তরের প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশ পেয়ে এসেছে। সেখানে তিনিও সমস্যার স্বরূপ বিচারপূর্বক পরবর্তী কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনাবলী দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি, অন্ততঃ সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রেরণা আহরণ করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ কোথাও নেই। তবু আশ্চর্য হয়ে দেখি উভয়ের সমাজ চিন্তায় কী বিস্ময়কর ঐক্য। সম-কালীন দুই যুগন্ধর মনীষী যেন পরস্পরের পরিপূরকরূপে লোকহিতের একটি সমগ্র পরিকল্পনা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ব্যবহারের জন্য তৈরী করে গেছেন।

ভারতবর্ষ ও স্বদেশের অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯০১—২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ভারত সভ্যতার অন্তর্মুখিতা, সমাজকেন্দ্রিকতা, ত্যাগশীলতা, উদারতা সমন্বয়সাধনের প্রণালী এবং বর্তমান দুর্দশা সম্বন্ধে যা বলে-ছেন, স্বামীজীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। দুঃখগ্রস্ত জনসাধারণের হিতচেষ্টা করা প্রয়োজন কিন্তু হিতসাধন কোন পথ দিয়ে সুরু হবে?

রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের প্রাচীন সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তার আত্মশক্তিনির্ভরতা। অতি প্রাচীন-কাল থেকে ভারতের মাটিতে রাজায় রাজায় যুদ্ধ কম হয় নি। কিন্তু সেই সব রাজনৈতিক আলোড়ন দেশের কেন্দ্রস্থ শক্তি ও আত্মাকে বিধ্বস্ত করতে পারেনি এই জন্য যে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্যগুলি রাজার হাতে ছিল না, সেখানে সমাজ স্বাধীন ছিল। অলিখিত নিয়মেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাদান করেছেন, ভূস্বামী জলাশয় খনন করেছেন, অতিথিশালা নির্মাণ করেছেন। নিজ নিজ বৃত্তি স্ব স্ব কর্ম নিয়ে জনসাধারণ মোটামুটি সন্তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু কাল-ক্রমে সে মনোভঙ্গীর পরিবর্তন হল। নবযুগে যে নতুন সভ্যতা আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হল তার ধারাটিই অন্য রকম। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় তার ভিত্তি থাকলেও সে সভ্যতা থেকেও সে অনেকখানি পৃথক্ এবং নিত্য পরিবর্তমান।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন —"প্রাচীন সভ্যতামাত্রেই একটা না একটা কিছুর একাধি-পত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত।··· আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকল রকম মূলতত্ত্বই বিরাজমান। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায় সকল অবস্থাই ইহার মধ্যে বিজড়িত হইয়া দৃশ্যমান। এই বিচিত্র শক্তি স্থির নহে, ইহারা আপনা আপনির মধ্যে কেবলই লড়িতেছে।" এবং তারই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন "রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে।"

এই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রাধান্যমূলক বেগবান নব সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের প্রথম লাভ হল শিক্ষাবিস্তার ও চিত্তের বন্ধনমুক্তি। কিন্তু যে কারণেই হোক সেই শিক্ষার সুফল দেশের একটা পর্যায়েই আবদ্ধ রইল, সর্বস্তরে আপনার আলোক তেমন করে বিকীর্ণ করল না। তার ওপর নতুন নগরকেন্দ্রিক সমাজবিধিতে যাঁরা বিত্তশালী অথবা জ্ঞানবান তাঁরা প্রায় সবাই সহরে এসে ভিড় করলেন। নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হল, এবং সারা পল্লীগ্রামে যখন

দেবমন্দিরগুলি ভেঙে পড়ছে, পুষ্করিণীর জল স্নান পানের অযোগ্য হচ্ছে, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষায় ও মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে তখন সমস্ত শরীরকে বঞ্চনা করে মুখেই রক্তসঞ্চারের মত কেবল সহরগুলি স্ফীত হয়ে উঠছে। এইভাবে আমাদের দেশে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে একটা বিরাট প্রভেদ দেখা দিল।

অথচ প্রত্যেক সমাজেই যারা শিক্ষিত এবং অগ্রসর তাদের হাতেই জনকল্যাণের প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এই শ্রেণীকে দেশের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করতে উপদেশ দিয়েছেন। দুজনেরই মতে দেশবাসীকে ভালবাসাই হচ্ছে সমস্যাসমাধানের প্রথম সোপান। 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন—"হে ভাবী সংস্কারকগণ, স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে। ...দেশের দুর্দশা চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ?"

কুম্ভকোনম্‌এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলছেন—"আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, কেবল দেশবাসীর নিন্দা করিলে চলিবে না। আমাদের এই পরম পবিত্র মাতৃভূমির কালজীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না। কারণ নিন্দাবাদ নয়, কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

স্বামীজীর এই উক্তিগুলি গোড়ার কথা স্মরণ করায়।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লোকহিতের প্রারম্ভিক উপাদানরূপে লোকপ্রেমের প্রসঙ্গটিকে রবীন্দ্রনাথ আর একভাবে দেখেছেন। স্বামীজীর মতে কর্মীর কর্মপ্রেরণা সত্য হবে না যদি না তার মূলে ভালবাসা থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে জনসাধারণের কাছে সেবা ফলবান হবে না যদি না কর্মী যথার্থ প্রেমবান হন। লোকহিত প্রবন্ধে তিনি বলছেন—"আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।" এবং অপমানিত স্বতঃই প্রতিহিংসাপরায়ণ।

স্বামীজীর তিরোধান ১৯০২ সালে। ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন তিনি দেখে যান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও হিন্দুমুসলমান বিরোধের মধ্যে এদের কথার সত্যতা ইতিহাসের ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হল। ১৯০৮ সালে লেখা 'সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি সমসাময়িক কতকগুলি সামান্য তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। "বরিশালের কোনো এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে, তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি লবণ বা কাপড় ব্যবহার করে না, তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।"

"ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন।"

শুধু মুসলমান নয়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ও যে ভদ্রশ্রেণীর স্বদেশহিতৈষণায় যোগ দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে তার উল্লেখ প্রবন্ধান্তরে পাই।

যারা বাধা দেয়নি তারাও যে সব সময় সমর্থন করেছে এমন নয় বরং ভেবেছে বিলাতি কাপড় দহন এবং লবণ বর্জন বাবুদের শত খেয়ালের মধ্যে একটা খেয়াল। ঘরে বাইরের পঞ্চুর কথা এক্ষেত্রে আপনিই মনে আসে। তার পশুসুলভ জড়তা ও ঔদাসীন্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন ভারতবর্ষের চেষ্টাশূন্য মূক অবুদ্ধিকে দেখেছিলেন। এমন অবস্থা হওয়ার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। দেশের লোককে আমরা তাদের উন্নতিকল্পে প্রেমের প্রেরণায় ডাক দিই নি, আমাদের রাষ্ট্রস্বার্থ সফল করতে ডেকেছি। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে

না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কথনোই সফল হইতে পারে না" (লোকহিত)।

মানব মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গ ছাড়াও লোকহিত সমস্যার আর একটি দিক আছে যা ঐতিহাসিক এবং সুদূরপ্রসারী।

পরমকুড়িতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামীজী পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে জগতের সমাজব্যবস্থাগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়,—কতকগুলি আধ্যাত্মিকত মূলক ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কতকগুলি জড়বাদপ্রধান সামাজিক প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জড়বাদের পূর্ণ প্রতাপের যুগে সৌভাগ্যসম্পদের বৃদ্ধি থেকে মানুষের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে। তীব্র প্রতিযোগিতা ও নিষ্ঠুরতা আবর্তে আন্দোলিত হতে হতে মানুষ ভাবে এখানে জীবনের স্বার্থকতা নেই। তখন সে অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝোঁকে। কালক্রমে ধর্মের অভ্যুত্থানের যুগেও একদল লোক আসে যারা পার্থিব সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের একচেটিয়া করে ফেলে সর্বসাধারণের প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। বঞ্চিত বিরক্ত ও ক্ষুধিত সমাজ তখন ধর্মের আবেশের সঙ্গে ধর্মের উদারতাকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জড়বাদের দিকে ঝোঁকে।

উক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আমরা যোগ করতে পারি যে কোন দেশে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রথম চক্রাবর্তনের পর দ্বিতীয় পরিক্রমাটি যখন সুরু হয় তখন ইতিহাসের মৌলিক সত্যটি কেন্দ্রে থাকে বটে, কিন্তু রূপের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার হুবহু পুনরাবৃত্তি হয় না। আদি মানব একদিন তার জড়জীবনের মধ্য থেকে মেঘভেদী প্রথম আলোর মত যে অধ্যাত্মলোকের আভাস পেয়েছিল, আজকের বস্তুভারক্লিষ্ট পৃথিবী যদি দূর ভবিষ্যতে কোনদিন মনের শান্তির জন্য অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার কাছে হাত পাতেই তাহলেও সে তার পূর্বপুরুষদের প্রাথমিক বিস্ময়বোধ ও নবীন ধর্মচেতনা ফিরে পাবে না। যা তার হাতে আসবে তা অনেক অভিজ্ঞতার ভারে ভারী, অনেক জটিলতায় আচ্ছন্ন একটা শান্তি। সেই রকমভাবে জড়বাদের উত্থানের পিছনেও অনেক হিংসা-বিদ্বেষের স্মৃতি কিছুতেই মুছবে না।

উনবিংশ শতাব্দী শেষে স্বামীজী অনুভব করেছিলেন এই চক্রাবর্তে একটা পরিবর্তন আসন্ন, এবং সে পরিবর্তন জড়বাদেরই দিকে। তবু তিনি যুগান্তরকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে—"এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল এবং যাহার ব্যবহার তাহারা নিজেরাও ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।"

আবার এর পাশে পাশে তাঁর সাবধানবাণীও শোনা যায়। আমাদের গৃহের যে প্রাচীন ভিত্তি তার উপরেই যেন আমরা নব সভ্যতার ইমারত নির্মাণ করি। প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বকীয় জীবনছন্দ আছে। তাকে অস্বীকার করে অন্য ছাচে চিত্তকে ঢালাই করবার চেষ্টা 'পরধর্মো ভয়াবহ'। স্বামীজীর মতে যে মুহূর্তে আমরা বিদেশের হুবহু অনুকরণ করতে সমর্থ হব সেই মুহূর্তেই জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু ঘটবে। প্রায় সমকালেই (১৩০৮) রবীন্দ্রনাথও বলছেন—"আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ। যদি আমরা মনে করি য়ুরোপীয় ছাদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

কাজেই যুগান্তরকালের আলোড়ন ও নবমূল্যায়নের ঘূর্ণাবর্তে আমাদের পথ আরও দুর্গম হয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দের অনুসরণে যুগপরিবর্তনের মৌল লক্ষণগুলি আর একবার স্মরণ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ অধ্যাত্মবাদের অতিজীর্ণতার পরে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই জড়যুগের অভ্যুত্থান ঘটবে। দ্বিতীয়তঃ এই অভ্যুত্থানকে স্পষ্ট ও ত্বরান্বিত করবে মহাবেগবান ও প্রত্যক্ষ পূজারী পাশ্চাত্য সভ্যতা। তৃতীয়তঃ স্বামীজীর যেটি বোধহয় সর্বাধিক আলোচিত থিসিস, এই অভ্যুদয়ের বাহক হবে শূদ্রসম্প্রদায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রাজত্বের শেষে শূদ্র অর্থাৎ সাধারণের শাসনের অনিবার্যতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন (বর্তমান ভারত)।

ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের জীবনে আলো এসেছে। কিন্তু পরাধীন

দেশে, বহুধা বিচ্ছিন্ন নিদ্রাতুর দেশে, এ আলো একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ রইল। ভাবী যুগের কর্ণধার লোকসাধারণ তার থেকে বহু দূরে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন "ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি।" তাই দেশসেবা করতে ছুটি ইংরেজি উপায়ে, এবং দেশের লোক জমিদারের দ্বারা, মহাজনের দ্বারা, শত সহস্র অবুদ্ধি ও কুসংস্কারের দ্বারা জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাদের জন্য দুই একটা নাইট স্কুল খুললে বা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে ডাকলেই তাদের সত্য উপকার করা হয় না। তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ প্রয়োজন। মানবধর্মের কথা ছাড়াও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। আজকের প্রতিহিংসা কুটিল ক্ষুব্ধ অন্ধকারের চিত্তজগৎ থেকে যদি তারা শুধু বহির্জাগতিক শক্তি সম্বল করে বেরিয়ে আসে তবে সেই উত্থানের বেগে শুধু শিক্ষিত বা ভদ্র সমাজই যে নষ্ট হবে তাই নয়, জাতি হিসাবে তারাও নষ্ট হবে, কেননা সত্য ভারতের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই।

আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও বেশী আগে স্বামীজী এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে একটু পরিবর্তিত আকারে রবীন্দ্রনাথ এই ভবিষ্যৎ বুঝেছিলেন। দুজনেই অসহায় জনসাধারণের আত্মশক্তি উদ্বোধনের কাজে দেশের প্রতিটি সমর্থ মানবকে ডাক দিয়েছিলেন এবং দুজনেই অনুভব করেছিলেন সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি, এখনও বাহিরের জীর্ণতার অভ্যন্তরে 'ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।'

স্বামীজীর কর্মপ্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করেও তার মূলভাবটির চুম্বক দেওয়া চলে। লোকশিক্ষার যে যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ডাক দিয়েছেন সেখানে প্রথমে চাই একদল নিঃস্বার্থ কর্মী, মানুষের প্রতি অতি তীব্র ভালবাসা যাদের শোণিতস্রোতে স্পন্দিত হচ্ছে, কর্তব্যের আহ্বানে যারা জীবনের অন্য সমস্ত রকম আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে এবং সর্বোপরি সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও দুঃখকষ্টের মধ্যে নিজেদের নিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখতে পারে (আমার সমরনীতি)। এই কর্মীদল দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক। চিরকাল আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেই জনসাধারণ পেয়ে এসেছে। তাই তাদের আত্মসমর্পিত কর্মও দেশবাসীর কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হবে। এঁরা জনগণের অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মেটাবেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করবেন। ভাবী সংস্কারকদের প্রতি তাঁর উপদেশ তাঁরা যেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করে মানুষ যেখানে মনুষ্যত্বহীন সেখানে তাকে সঞ্জীবিত করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবলতা দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও শিখাও, সবল দুর্বল উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে" (কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা)। মানবাত্মার এই মহিমাবোধও ত এক হিসাবে অদ্বৈতবাদেরই প্রকাশ। এর দেশকাল নেই।

লাহোরে প্রদত্ত বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ধনঝঙ্কারশব্দিত আমেরিকায় দাঁড়িয়েও তিনি সেদেশের জড়জীবনের তলদেশে বেদান্ততত্ত্বকে রূপায়িত দেখেছিলেন। আর্মেনিয়া বা অনুরূপ কোনও দেশের পদদলিত আশাহীন লোকও সেদেশে এসে শুধুমাত্র নিজের গুণের জোরেই বড় হয়ে ওঠে। দেশের চারদিকের উদ্যমশীল কর্মশক্তি তাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়। জ্ঞানজগৎ ও জড়জগতের চারদিকে ইউরোপ যে বিপুল শক্তির সঙ্গে নিজেকে বিস্তার করছে তার পিছনেও স্বামীজী আত্মপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসের লীলা দেখেছেন। খৃষ্টধর্মরীতি অনুসারে এরা গির্জায় গিয়ে নিজেদের পাপী বললেও অন্তরে এরা নিজেদের তার বিপরীত বলে অনুভব করে এই তাঁর ধারণা। তা যদি না হত তবে সারা পৃথিবীতে এমন সচল উদ্যমের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল কি করে? সে আত্মবিশ্বাস আমাদের কই?

বাইরে যখন নববন্যাগমে 'জোয়ার জলে উঠছে প্রবল ঢেউ' তখন আমাদের ভদ্রসম্প্রদায় কাগজ নেড়ে উচ্চৈঃস্বরে পোলিটিক্যাল তর্ক করে কর্তব্য সমাধা করছেন, এবং সাধারণ লোকের চরিত্রমান রসাতলের দিকে ছুটেছে। ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে লেখা এক খোলা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার ঢাকা থেকে ষ্টীমারে করে ফেরবার সময় ঢেউয়ের আঘাতে একটি নৌকা জলমগ্ন হয়ে

তিনজন আরোহী বিপন্ন হয়। কাছ দিয়ে আর একটি নৌকা যাচ্ছিল। উদ্ধার কর্মে সহায়তা করার জন্য ষ্টিমারের লোক সেখানকার মাঝিদের ডাকাডাকি করলেও তারা কর্ণপাত করল না। প্রাণ সম্বন্ধে তাদের এতখানি ঔদাসীন্য। আর একবার বোলপুরের বাজারে আগুন লেগেছিল। তখন সাহায্যকারীরা স্থানীয় কোনো লোকের সাড়া ত' পায়ই নি, বরং পাড়ায় যাদের কাছে জলের কলসী চাইতে গিয়েছিল পাছে তাদের কলস অপবিত্র হয় এই ভয়ে তারা তা দেয় নি (যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশিভূষণ যে মাঝিদের পক্ষসমর্থন করে আদালতে মামলা করতে গিয়েছিলেন তাদের ভীরু মনের আশাঙ্কক্তব্যতাও এই সূত্রে স্মরণীয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দারিদ্র্য ও চাতুরীর ফাঁদে আটকা পড়া পঞ্চুর কথা চিন্তা করতে করতে নিখিলেশ তার মধ্যে আমাদের দেশের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন—"প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ আর একদিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে।"

নিখিলেশ এর সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, নিখিলেশের স্রষ্টাও। রাজনীতির পথে নয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মকর্তৃত্ব সৃষ্টির পথে। সৌভাগ্যক্রমে নিজের শৈশব এবং প্রাক্‌যৌবন পর্বেই তিনি স্বাদেশিক অভিজ্ঞতার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে এসেছিলেন। হিন্দুমেলার অপটু লালনের মধ্যে স্বদেশচেতনার শৈশব কাটতে দেখেছেন। জ্যোতিদাদার সেই বিখ্যাত সভা যেখানে অন্ধকার ঘরে ঋকমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে চুপি চুপি কথা বলে তাঁরা ভারত উদ্ধারের মহড়া দিতেন সেখানকার প্রহসনও সমাপ্ত। সর্বোপরি জ্যোতিদাদার স্বদেশশিল্প উদ্ধারের বিবিধ প্রচেষ্টা, বিলাতি কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিনা ভাড়ায় ষ্টীমার চালানো, জ্বলনশক্তিহীন দেশলাইয়ের কারখানা এবং গামছানির্মাণক্ষম কাপড়ের কলের জন্য অজস্র অর্থব্যয় ও ব্যর্থতার পিছনে প্রেরণার উত্তেজনা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব তাদের ভালমন্দ সব কিছু নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বৃত্তটিকে পরিপূর্ণ করেছিল (জীবনস্মৃতি)। তাই প্রথম শিলাইদহে গিয়ে তিনি আর একভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি সাম্প্রতিক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে (তাঁর পরেই প্লাবন : রবীন্দ্রনাথ) কথাচ্ছলে কয়েটি তথ্য উদ্ধার করেছেন (তথ্যগুলি রবীন্দ্র জীবনী সমর্থিতও বটে)। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রথম সুযোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী দেখতে যান হয়েছিলেন। তাঁরই ভাষা উদ্ধার করি,—"পতিসরের যে দশা আমি দেখলুম তা পড়তি দশা। আমি দেখলুম তা পড়তি দশা। জমিদারি কোনোরকমে চলছে, কিন্তু প্রজাদের অল্প সুদে কর্জ দেবার জন্যে যেসব ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন দরদী রবীন্দ্রনাথ সেসব প্রায় অচল। অতি ক্লেশে চলছে কল্যাণবৃত্তি তহবিল। অন্য কারো জমিদারিতে এর মতো কিছু দেখিনি। এটি রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। এই তহবিলে প্রজারা দিত অধিক চাঁদা, বাকিটা দিতেন জমিদার। সরকারী সাহায্য না নিয়ে নিজেদেরি অর্থে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা চালানো প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানারও মলিন দশা।...'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' সেই শিলাইদাতেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর পাওয়া গেল। কবিতার টেক্‌নিক নিয়ে নয়। মণ কয়েক ইলিশমাছ জোগাড় করে মাটিতে পুতেছিলেন। জমি সারবান হবে।"

কাজগুলি কোনোটাই অসামান্য নয়, কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের দিক্‌দর্শনে তাৎপর্যময়।

যে কারণেই হোক বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই। হয়ত তা ভালই হয়েছিল, কেননা রচনার দ্বারাই মানবমনকে বেদনাময় এক গভীর চৈতন্যের মধ্যে জাগ্রত করে তিনি তাঁর স্বধর্ম নিঃশেষে পালন করেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন কর্মক্ষেত্র থেকে তাঁর হাত সরে গেলেও লেখনী যায় নি, হৃদয় ত' নয়ই।

তাই গান্ধীজী যখন দেশবাসীকে সত্য ও ধর্মের আহ্বানে ডাক দিলেন এবং দেশ সচকিত আগ্রহে সাড়া দিল তখন তিনি একটা ভরসা দেখেছিলেন। কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশে বহুকালের জড়ত্ব হেতু আমরা দুঃখভোগের নিষ্ঠা হারিয়েছি। আমরা সস্তায় ফললাভ করতে চাই। মহৎ আদর্শের প্রেরণা দীর্ঘকাল আমাদের ধরে রাখতে পারে না। আবেগের দ্বারা আমরা উঁচুতে উঠে ক্লান্তির মাধ্যাকর্ষণে মাটিতে অবিলম্বে

ফিরে আসি। আমাদের এই জাতিচরিত্র এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর কর্মপন্থার অতি সরলীকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আপনার অনবদ্যভঙ্গীতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ হলেও তাঁর সে উক্তি উল্লেখের দাবী রাখে—"মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হলনা। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল; তিনি তাঁর তারে দুটি চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ উৎসের মুখে এত দিন যে পাথর চাপা ছিল সেটা যেন এক মুহূর্তে গেল গলে।

…দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো। এই বিদ্যায় প্রেম যে কতবড় সত্য জিনিষ সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজীর কাছ থেকে শিখে নিতে বসেছি। কিন্তু স্বরাজ গড়ে তোলার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত। তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য।

মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন। কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে। অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?"

(সত্যের আহ্বান: কালান্তর)

মহাত্মাজির পূর্ণ আদর্শ এইই ছিল কিনা বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মাজির উল্লেখ করা হল শুধু রবীন্দ্রনাথের মনের গতিটি দেখাবার জন্য। ১৯২১ সালে লেখা এই 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তাঁর মনের উদ্বেগাকুল অধীরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি অনুভব করছেন আমাদের সময় বয়ে যাচ্ছে।

সময় আরও এগিয়ে গেছে, কাল আরও জটিল হয়েছে। স্বামীজী বেঁচে থাকলে এই যুগকে কিভাবে দেখতেন জানি না, রবীন্দ্রনাথ শান্তি ও নিশ্চিন্তির সঙ্গে দেখতে পারেন নি। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুদয় হয়েছে আমাদের দেশে। তার পিছনে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে, রুদ্ধ যৌবন-শক্তির অন্তরচাঞ্চল্য আছে, প্রেরণার অকৃত্রিমতা আছে, কিন্তু অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ধূম ও অঙ্গারের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর হল না, কেন না এ পথ ভারতের পথ নয়, হয়ত বা কোন দেশেরই গঠনের পথ নয়, ক্রোধের বহিঃ-প্রকাশ। তাই ভাঙনের পরিমণ্ডলটাও এর বিরাট। তার লালসারূপ সন্দীপ, আত্মগ্লানি অতীন, বিরুদ্ধতা ঘরে বাইরের মুসলমানসম্প্রদায়, গুরুনির্ভর জড়তা শিবতরাইয়ের প্রজাবৃন্দ, যৌবনের বলি অমূল্য। অপর পক্ষে কালান্তরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রবন্ধগুলিতে দেখি কবি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন হিন্দুমুসলমান বিরোধ উগ্রতর হচ্ছে এবং জাতিভেদচেতনা উচ্চ সম্প্রদায়ের অহংকার অপেক্ষা নিম্ন সম্প্রদায়ের হীনমন্যতার মধ্যেই আশ্রয়লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব, যার ফল হিংসা ও ঘৃণা। এরই মধ্যে দুর্যোগকে পরিপূর্ণ করতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার বিশাল ক্ষুধা নিয়ে পৃথিবীর উপর অবতীর্ণ হল। 'সভ্যতার সংকটে' জীবনের শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবনসংকটকে প্রত্যক্ষ করে গেলেন।
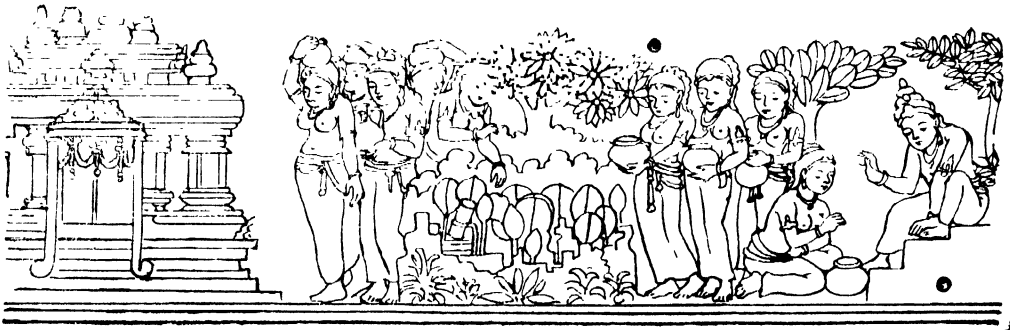
গণ-গল্প

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

গণগল্প কোনও একজন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় না। ইহা মুখে মুখে জনতার দ্বারা রচিত হয়ে থাকে। একজন ইহার সূত্রপাত করে বটে, কিন্তু পরে অন্যরা উহার উন্নতি সাধন করে। ইহার প্রচারও মুখে মুখে হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে জনচিত্তের প্রতিফলন দেখা যায়। এই রস সৃষ্টি যে শুধু শিক্ষিত মানুষ করে তা নয়, বহু নিরক্ষর ব্যক্তিও এইগুলি সৃষ্টি করেছে। এই থেকে বুঝা যায় যে—দেশে দেশে মানুষ নিরক্ষর হলেও তারা শিক্ষিত। কথকতা পুতুল নাচও এই দেশের মহাকাব্য ও ধর্ম্ম কথা তারা আগ্রহের সঙ্গে শুনে ও মনে রাখে। তা না হলে এরূপ অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। বস্তুতঃ পক্ষে তাদের মনোভাবের আদান প্রদান দ্বারা ইহাদের সৃষ্টি।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বহু কার্য্য জনতা মনে প্রাণে পছন্দ করে নি। অথচ ইহাদের প্রতিকারের ক্ষমতা তাদের থাকে না। এ অবস্থায় তাদের মূক প্রতিবাদ এই গল্প গুলির মধ্যে (মাধ্যমে) প্রকট হয়ে উঠে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে উপহাসের ছলে এই গুলি রচিত হয়। যুগে যুগে এই গুলি শাসক কুলের ও ধর্ম্মীয় নেতাদের প্রতি সাবধান বাণী রূপে স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ বিপ্লবের ইহারা অগ্রদূত। এই সব গণ গল্প জন চিত্তকে সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য শনৈঃ শনৈঃ—প্রস্তুত করে। উহারা মূক-জনতার মুখে ভাষা আনে ও ভীরু নাগরিকদের মনে উহাতে সাহস আসে। এই জন্য এইগুলিকে অবহেলা করা উচিত হবে না। বরং শাসকগোষ্ঠীর এই গুলি সংগ্রহ করে সাবধানে অনুধাবন করা উচিত। কারণ, জন-চিত্তের পছন্দাপছন্দের প্রতিফলন উহাতে ধরা পড়ে। এতদ্বারা সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব। প্রতিটী ক্ষেত্রে এই গণ গল্প গুলি জনতার অপছন্দের ও অসুবিধার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে তাও নয়। কয়েকক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ নেতাদের বা গোষ্ঠী ও সম্প্রদয়ের কার্য্যাবলীর প্রশংসাও উহাতে করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে অধুনা লুপ্ত পূর্ব্বের ভালো ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন মানসে জনতা ঐ সব গল্পের সৃষ্টি করেছ।

যুগে যুগে সৃষ্ট বহু গণ গল্প আমি বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করে সাবধানে উহাদের বিশ্লেষণ করেছি। এই সকল বিদ্রূপাত্মক গণগল্প গুলির রচনা কাল ও উহার কারণ সহ আমি ঐ গুলি নিম্নে বিবৃত করবো। এই সব প্রাচীন ও আধুনিক গণ গল্প গুলি হতে বুঝা যাবে যে, যে যুগেই উহাদের স্রষ্টারা জন্ম গ্রহণ করুক না কেন উহারা কুসংস্কারাছন্ন অবিবেচক মানুষ ছিল না। বরং তারা প্রগতিশীল সুরুচিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন ছিলেন।

(১) গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে শহরে শহরে বাটী ভাড়া পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠে। বহু অর্থ ব্যয় করেও একটু মাথা গোঁজার স্থান সংগ্রহ করা যেত না। এই বিষয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অসুবিধা চরম সীমায় পৌঁছায়। অথচ ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা মানুষের বেশী। কারণ, যুদ্ধের জন্য নগরে লোক দলে দলে এসে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে। অথচ দ্রুতগামী যান-বাহনের অভাবে নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চল বা শহরতলী হতে শহরে চাকুরী করাও সময় সাপেক্ষ। এই বিষয়ে সরকার হতে কোনও সুরাহা হয় নি। উপরন্তু সরকার দ্বারা বহু বাড়ী যুদ্ধের প্রয়োজনে হুকুমদখল করা হয়েছে। ঐ সময় সরকারী অফসাররা কোনও বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরলে সেই বাড়ীর বাসিন্দারা প্রমাদ গুণে ভাবত 'এই বুঝি তাদের সেই বাড়ী হুকুমদখল করা হলো'। এই পরিস্থিতিতে

জনতা বহু গল্প মুখে মুখে রচনা করে তাদের অসুবিধার বিষয় প্রতিফলন করে। এই রূপ একটী বিদ্রূপাত্মক গল্প আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। ইহাতে বাটী ভাড়া পাওয়ার (বাটীর স্বল্পতা) অসুবিধার বিষয় ব্যঙ্গ করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

"শ্রীরামবাবু সেদিন নির্জ্জন গড়ের মাঠের একটী পুষ্করিণীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজনকে চেঁচাতে শুনে তিনি দৌড়ে এসে সেখানে থমকে দাঁড়ালেন ও দেখলেন যে একজন ভদ্রলোক ছিপ হাতে জলে ডুবে যাচ্ছেন। সেই ভদ্রলোক ডুবতে ডুবতে পারিত্রাহি চীৎকার করে বলে উঠলেন—'মশাই! বাঁচান, আমাকে বাঁচান, আমি ডুবে গেলাম, আমাকে তুলুন। শ্রীরামবাবু একটু ঝুঁকে পড়ে কান খাড়া করে তাঁকে বললেন—'আচ্ছা। আমি যা হোক ব্যবস্থা করছি। তার আগে বলুন আপনি থাকেন কোথায়? আপনার বাসা বাড়ীর ঠিকানা কি? সেই ভদ্রলোক এবার কাতরস্বরে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, আজ্ঞে, আমি ১৬১০ বসন্ত রায় রোডে থাকি। আর দেরী না করে আমাকে আপনি তুলুন। আমি আর পাচ্ছি না। এবার জলে ডুবে যাচ্ছি। শ্রীরামবাবু এইবার উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বললেন আচ্ছা, তাহলে আপনি ডুবুন। আমি আপনার সেই বাড়ীটা ভাড়া নিতে চললাম। এর পর শ্রীরামবাবু আর সেখানে দেরী না করে ১৬১০ বসন্ত রায় রোডে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি হরিহরবাবু পোঁটলা ও ট্রাঙ্ক সমেত সেই বাড়ীতে ঢুকছেন। শ্রীরামবাবু হতভম্ব হয়ে তাঁর সেই পরিচিত ব্যক্তি হরিহরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই একটু মাত্র আগে তো এই বাড়ী খালি হলো। মশয় আপনি এতো শীঘ্রী এই খবর পেলেন কি করে। আমার আগে এই খবর তো আপনার পাবার কথা নয়। আশ্চর্য্য! হরিহরবাবু এবার শ্রীরামবাবুকে আরও আশ্চর্য্য করে উত্তর করলেন—'মশয়। আপনি বেশ লোক তো। আমিই তো ঐ লোকটাকে একটু আগে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। আপনি আমার চেয়ে আগেতে কি করে খবর পাবেন? হেঃ। মশয় কি যে সব আজে বাজে আপনি বলেন ও করেন।"

উপরের গণ-গল্পটী হতে তৎকালীন নাগরিকদের মানসিক অশান্তির একটি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ কঠিন পরিস্থিতি এই সম্পর্কিত নানাবিধ অপরাধ বা ক্রাইমের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে। অবচেতন মনের এই সব ইচ্ছা দানা বেঁধে চেতন মনে এলে মানুষ তৎসম্পর্কিত অপরাধেতে প্ররোচিত হয়। কোনও কারণে প্রতিরোধ শক্তির [রেসিস্‌টন্স্‌ পাওয়ার] হানি ঘটলে মানুষের এই বিষয়ে হানাহানি করা অসম্ভব নয়। এই ধরণের গণ-গল্পের সৃষ্টি উহার প্রমাণ।

(২) মহাযুদ্ধের সময় বহু শিক্ষিত যুবক সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে অন্য দেশে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। কার জন্যে কার দেশ রক্ষা করতে তারা লড়ছে—তা তাদের সকলের বোধগম্য হয় নি। বহু কারণে বুদ্ধিজীবী সৈন্যরা উহা সমর্থন করে নি। কিন্তু তা বলে তারা যুদ্ধে অমনোযোগীও নয়। রাষ্ট্রীয় আদেশ বহন ও নিয়মতান্ত্রিকতা তাদের রক্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বহু গণগল্প মুখে মুখে সৃষ্টি করে ইহার প্রতিবাদ করেছে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে সেনানীরা এইরূপ বহু গণগল্প সৃষ্টি করতো। ঐ সময় কলিকাতা পুলিশের পক্ষে আমি এংলো-আমেরিকা সেনাদের মধ্যে লিয়াসোঁ অফিসার রূপে কাজ করেছিলাম। সেই সময় এই সম্পর্কিত বহু গণ গল্প আমি সংগ্রহ করি। এইরূপ একটী বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদমূলক গণ-গল্প আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"শুনুন, মশায়। ঘটনাটা কিন্তু সত্যি। জনৈক ব্যক্তির মস্তিষ্কটা খারাপ হয়। ভদ্রলোক ইটালীর এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে তাঁকে জানালেন—বাপু! ব্রেনটা তোমার বিগড়েছে। ওটা মেরামত করা দরকার। আমি ওটাকে বার করে রেখে দেবো। মেরামত করতে এক সপ্তাহ লাগবে। এতে সেই নাগরিক যুবক সম্মতি জানালে ডাক্তারবাবু অপারেশন করে মাথার খুলি হতে ব্রেনটি বার করে নিয়ে একটা কাঁচের জারে সেটা রেখে বললেন—'ঠিক আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এর মেরামত শেষ হবে। তুমি দিন দশ পরে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যেও। ওটা তখন ভালো অবস্থাতে আবার তোমার মাথার খুলিতে পূর্বের মত ফিট করে দেবো। এর পর সেই ইটালিয়

নাগরিক খুশী মনে শিশ দিতে দিতে সেখান হতে বার হয়ে গেল। এর পর এক সপ্তাহ এক মাস ও এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেই ব্রেণের মালিকের আর দেখা নেই। এর পর একদিন হঠাৎ রোমের এক বাজারে ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই ডাক্তারবাবুর দেখা হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু তাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে বলে উঠলেন—আরে! ও ও জেণ্ট্‌লম্যান। তোমার ব্রেণটা মেরামত হয়ে কতো দিন আমার দোকানে পড়ে আছে। তুমি সেটা নিতে গেলে না। এতোকাল ব্রেণলেশ হয়ে আছো কি করে? আশ্চর্য্য! সেই ব্রেণের মালিক ভদ্রলোক তখন একটু হেসে ডাক্তারবাবুকে জানালো—'আজ্ঞে! ব্রেণ আমার আপাততঃ দরকার নেই। তাই আমি ওটা নিতে যাই নি। ডাক্তার তার সেই উত্তর শুনে অবাক হয়ে বললেন—এঁ্যা! ব্রেণ তোমার দরকার নেই! কিন্তু ডাক্তারবাবুর অবাক হওয়ার আরও বাকী ছিল। তাঁকে আরও অবাক করে দিয়ে সেই যুবক উত্তর করলে—আজ্ঞে! ব্রেণ তো আমার আর দরকার নেই। আমি যে এখন সৈন্য বিভাগে ঢুকে পড়েছি"।

এই সকল সৈন্যরা কার জন্যে লড়ছে ও মরছে কোথায় ও কি জন্যে তারা যাচ্ছে। এ সব তাদের জানবার অধিকার নেই এ বিষয়ে তাদের মতামত মূল্যহীন। কোনও কিছু না বুঝে নির্ব্বিচারে যন্ত্রবৎ হুকুম প্রতিপালন করা তাদের একমাত্র কাজ। অসহায় গুলি ছোড়ে অসহায় মরে এইরূপ এক রূপ এক মানসিক অবস্থার প্রতিফলন উপরের গণ-গল্পের মধ্যে দেখা যায়। মানব সমাজে মতবাদ ও আদর্শ পরিবর্ত্তনে এই রূপ গণ গল্প সৃষ্টির মূলে অন্য কারণও থাকতে পারে। ইহাতে মানুষকে অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিক হতে বলা হয়েছে। আমার মতে অহেতুক নিয়ম তান্ত্রিকতাকে বিদ্রূপ করে ইহার দ্বারা প্রতিবাদ করা হয়েছে। কারণ যাহাই হউক, এই গল্পটী যে শিক্ষাপ্রদ তাতে ভুল নেই।

সেনা বিভাগে (পুলিশ বিভাগেও) বহু অফসরের ধারণা যে, যে অফসার যত বড়ো বুলিই (Bully) সেই ব্যক্তি ততো ভালো অফিসার। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বহু সেনানায়ক অতীতে অধীনদের উপর অকারণে বহু অবিচার করেন। বলা বাহুল্য অধীনগণ এই ব্যবহার আদপে পছন্দ করেন না। অথচ তারা কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার কারণে উহার প্রতিবাদ প্রথমে করতে পারে নি। ফলে, তারা প্রতিবাদ স্বরূপ বহু বিদ্রূপাত্মক সত্য ও মিথ্যা গণগল্পের প্রচার সুরু করে দেয়। এইরূপ নীরব প্রচারের ফলে বহু স্থানে বিদ্রোহেরও সৃষ্টি হয়। এই গণ-গল্প হতে পূর্ব্বাহ্নে কর্তৃপক্ষ সাবধান হলে ঐরূপ ঘটনা ঘটতো না। প্রথম মহাযুদ্ধে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে এইরূপ বহু গণ গল্পের সৃষ্টি হয়। উহার একটী আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"প্রথম মহাযুদ্ধে আমি একজন কমিশনণ্ড অফিসর হই। এ জন্য আমাকে একটি পরীক্ষা দিতে হয়। ঘোঁড়ায় চড়ে কর্ণেল সাহেব এসে আমার প্লেটুনের সামনে এসে আমাকে ওদেরকে প্যারেড করাতে বললেন। কি ভাবে কেমন করে সৈন্যদের কি কম্যাণ্ড দেবো—এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথাতে একটা চমৎকার বুদ্ধি এলো। আমি ভ্রূ কুঁচকে ও দাঁত খিচিয়ে ডাইনে বামে গম্ভীর ভাবে একবার তাকালাম। তার পর ছুটে গিয়ে একজন সিপাহীর গলাটা টিপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম—ক্যা তুম শির হেলাতা! জানাতা নেই আভি তোমরা আঁখ উখাড় লেগা। তোমরা দাঁত তোড় দেগা। উল্লুক কাঁহাকো'। আমার এই সিংহনাদ শুনে ও আমার এই ব্যবহার দেখে একটু হেসে কর্ণেল সাহেব আমাকে সম্বোধন করে বললেন—'ঠিক হ্যায় হাম বহুৎ খুস। তুম পাশ (মতুয়া হো' গয়া এর পর আর না অপেক্ষা করে কর্ণেল সাহেব ঘোড়া ছুটীয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

বাঙ্গালীদের বুদ্ধিজীবী ও সেই সাথে তার্কিক ব'লে সুনাম আছে। কিন্তু বেশী বুদ্ধি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এদের এই অন্যায় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে প্রথম যুদ্ধের কালে ইংরাজ রেজিমেণ্টে বহু গাল-গল্পের সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীতে মগজওয়ালা বাঙ্গালীরা অনুপযুক্ত এই তত্ত্বটি সর্ব্বত্র সরবে প্রচার করা। [এখানে গণগল্প গোষ্ঠীর স্বার্থে মন্দ উদ্দেশ্যে প্রচারিত] ইংরাজ সৈন্যরা বাঙ্গালীকে এই বিষয়ে অপছন্দ করে। এদের এই অপছন্দকর মনোভাব তাদের সৃষ্ট গণ-গল্পগুলিতে

সেই কালে প্রতিফলিত হলো। গণস্বার্থের কারণে এখানে এই সম্পর্কিত একটি মাত্র গণগল্প নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

যুদ্ধক্ষেত্র হতে ক্যাম্পে ফিরে জনৈক ইংরাজ কর্ণেল বললেন—আরে ভাই, বলো না আর। বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডের ভার নিয়ে কি ঝকমারী করেছি। সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে আমি বললাম—ভাইগণ। শত্রুরা একটু দূরে আছে। দশ ফুট এগিয়ে যাও। তারপর—'ওপেন ফায়ার।' সঙ্গে সঙ্গে এদের ক'জনা প্রতিবাদ করে বলে উঠলো—কেন স্যার? আমাদের রাইফেল তো এডযাষ্ট করা যায়। এর রেঞ্জ দশ ফুট বাড়িয়ে নিয়ে এখানে বসেই ফায়ার করা যাক। এতে তাহলে বহু সময় আমাদের বেঁচে যাবে। বাপরে বাপ, আমি বুঝলাম যে—'এরা প্রত্যেকেই মগজী জেনারেল, কিন্তু সৈন্যরূপে এরা অনুপযুক্ত'। হুকুমটা অবশ্য আমারই ভুল দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে ওরা হক্‌ কথাই বলেছে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যে [তর্কবিতর্ক কালে] শত্রু সৈন্যরা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। অযথা ওদের বহু লোক মরলো। আমি নিজেও গুরুতরভাবে আহত হলাম। বাবাঃ, আর বাঙ্গালী রেজিমেণ্টেতে নয়। [বলা বাহুল্য ঐ ভুল হুকুম তখুনি তামিল করলে হয়তো যুদ্ধেতে ফল ভালো হতো।]

কালোবাজারী ও মুনফা-শিকারী ব্যবসায়ীদের অর্থ-গৃধ্নুতা দেশবাসী মনে প্রাণে অপছন্দ করে। নানা কারণে এদের ধারণা যে দেশের যাবতীয় অনর্থের মূল কারণ এদের অতি অর্থ-লিপ্সা। জনতার এই বিরূপতা বহু বিদ্রূপাত্মক গণ-গল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এইরূপ একটী গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"সোহনলালের পত্নী সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলো। কিন্তু ডাক্তার জানালো যে গর্ভস্থ সন্তান উল্টে গেছে। পেট কেটে সন্তানকে বার করতে হবে। এখন তাঁরা মাকে না সন্তানকে বাঁচাতে চান। দু'জনকে একত্রে বাঁচানো এখন সম্ভব নয়। সোহনলালের কারবারী পিতা মোহনলাল ডাক্তারের কথা শুনে ক্ষেপে উঠে বললেন—'ক্যা কহতা?' নিকালেগা নেহী। আচ্ছা মে তোন দেখতা। আভি উনকো নিকাল দে'গা। এই কথা বলে মোহনলাল একটা চকচকে রূপার টাকা দুই আঙ্গুলে টং করে বাজিয়ে দিলে। সেই টাকার আওয়াজ কানে শুনা মাত্র গর্ভস্থ শিশু দুই হাত বাড়িয়ে সটা ধরবার জন্যে সড়াৎ করে বার হয়ে এলো। ছুরি হাতে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে গেলেন—আরে! একি হলো! এই ভাবে সেই জাতক প্রমাণ করলে যে সে খাঁটী ব্যবসায়ীর বংশধর বটে।

বর্তমান শতাব্দীতে ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েট রাশিয়াতে রাষ্ট্র বিপ্লবের সূচনা হয়। কর্তৃপক্ষ ঐ সব স্বাধীনতা আন্দোলন সুনজরে দেখে নি। এই সময় কঠোরভাবে প্রকাশ্য আন্দোলন দমন করা হয়। এর ফলে এই তিনটি দেশে গুপ্ত আন্দোলন এবং বিপ্লবী দলের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীগণ দমন নীতির ফলে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যান। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে এই সময় তাদের খুঁজে বার করার জন্য ঐ সব রাষ্ট্র গোয়েন্দা বিভাগের সৃষ্টি করেন। ঐ সব গোয়েন্দা অফিসাররা গুপ্তচরদের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করতো। কিন্তু প্রতিদিন খাঁটী সংবাদ প্রদান না করলে ঐ সব গুপ্তচরদের অর্থ দেওয়া হতো না। কারণ খবর পিছু অর্থ রাষ্ট্র হতে তারা পেতে পারতো। অন্যদিকে—ভালো খবর না দিলে এই সব গুপ্তচর নিয়োগকারী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা অফিসারদেরও চাকুরীতে বদনাম হতো। এই ক্ষেত্রে তাদেরকে যে কোনও গুপ্ত সংবাদের জন্য প্রাণপণ করতে হতো। এমন কি এই সময় এরা মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেও নির্দোষ নাগরিকদের হায়রাণি বা নিপীড়ন করেছে। এই পুলিশ সংস্থার প্রতি সাধারণ নাগরিকরা স্বভাবতঃই বিরূপ ছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের অযথা উৎপীড়ন হতে নিরীহ নাগরিকরা পছন্দ করতো না। অথচ এ বিষয়ে সরবে প্রতিবাদ করতেও তারা অক্ষম। এই অবস্থাতে তারা বহু প্রতিবাদমূলক হাস্যকর গণ-গল্প কর্তৃপক্ষকে উপহাস করে মুখে মুখে প্রচার করে। এইরূপ [এই সম্পর্কিত] কয়েকটী আইরিশ রুশ, ও ভারতীয় গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) আয়ার্ল্যাণ্ডে তখন ব্রিটীশ বিতাড়নরূপ আন্দোলন সুরু হয়েছে। এই সময় বিপ্লবী দল গুপ্তদল গঠন করে বহু বোমা পিস্তলাদি সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মত ঐ সময় আয়ার্ল্যাণ্ডেও বহু ব্যক্তি ব্রিটীশরূপ বিদেশী শাসকদের সমর্থকও ছিল। অবশ্য মনে-প্রাণে তাদের প্রায় সকলের মনেই বিদেশী ব্রিটীশদের প্রতি বিরূপতা আছে।

এদের কেউ কেউ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের বিপক্ষে এবং ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধেতেও যোগদান করে।

এই সময় একজন আইরীশ যুবক ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ পক্ষীয় সৈন্য হয়ে আসে। এই সময় সেই আয়ার্ল্যাণ্ড হতে তার স্ত্রীর নিকট হতে একটি পত্র পায়। এই পত্রটিতে তার স্ত্রী বিব্রত হয়ে লিখেছিল - ওগো, এবার আমরা বড়ো মুস্কিলে পড়েছি। গ্রামের সমর্থ যুবকরা কেউ স্ব ইচ্ছাতে কেউ বা কনস্‌ক্রিপ্ট হয়ে যুদ্ধেতে চলে গিয়েছে। এখানে এখন লাঙ্গল চষবার লোক নেই। এ' জন্য এবার আলুবোনা মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। আমরা মেয়েছেলেরা আলু বুনতে পারি। কিন্তু জমি চষার মত আমাদের সামর্থ্য কোথায়? এই আইরীশ যুবক 'সৈনিকটি' ধীরভাবে এই পত্রটি পড়ে সেই দিনই তার এইরূপ এক উত্তর লিখে তা তাকে পাঠিয়েছিল—'উঃ। প্রিয়তম। অমন কাজও করো না। এ বছর ওই জমিতে খোঁড়াখুঁড়ী করো না। আমার কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধু ঐ জমির বহু স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র সমূহ পুঁতে রেখেছে। এর কয়দিন মাত্র পরে ঐ আইরীশ যুবক তাঁর সেই স্ত্রীর নিকট হতে অন্য একটী পত্র পেলো। এই পত্রে তার স্ত্রী ভীত ত্রস্ত ভাবে তাকে জানিয়েছিল—'ওগো। সর্বনাশ হলো। হঠাৎ কাল পুলিশ এসে বহু ট্রাক্টারের সাহায্যে আমাদের সেই জমীর এ মুড়ো এ মুড়ো পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ী সুরু করছে। আমি তো এ সব কাণ্ড কারখানার কিছু' বুঝতে পারছি না।' এর জবাবও সেই আইরীশ যুবক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে পাঠিয়েছিল। তার সেই শেষ পত্রে সে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে লিখে দিল—তোমার ঐ বিষয়ে কিছু বোঝবার দরকার নেই। ওরা [পুলিশ] চলে গেলেই তুমি ওখানে আলু বুনে দিও।

এখানে দেখা যায় যে—ব্রিটিশ পক্ষে যুদ্ধ যোগ দিলেও তাকে সেই কর্তৃপক্ষ পুরাপুরি বিশ্বাস করতে পারতো না। এই জন্য সেনা বিভাগের আইরীশ যুবকদের চিঠিপত্রও গোপনে ডাকঘরে সেন্সার করা হতো। এর ফলে এই সৈনিক যুবককে অন্য অজুহাতে বাহিনী থেকে ডিসচার্জ্জ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে বাধ্যতামূলক সৈন্য [কনসক্রিপসন] হওয়ার দায় হতে সে মুক্তি পায়। সেই সাথে নিঃখরচে তার চাষের জমিটুকুও সময় মত চষার কাজ সমাধা হয়।

এইবার রুশ দেশে রচিত ঐ রূপ গল্প-গল্পের বিষয় এখানে উল্লেখ করবো। মহামান্য জারের সাম্রাজ্য তখন টলমল। মহান বলশেভিক আন্দোলন অব্যাহত। এই আন্দোলনের সমর্থকদের খুঁজে বার করে অন্তরীন করার জন্য ঐ কালে বহু গোয়েন্দা অফসারকে নিযুক্ত করা হয়। ইহারা ছদ্মবেশে জনতার মধ্যে ঘুরে প্রয়োজনীয় সংবাদ রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রহ করতেন। এদের অবিমৃষ্যকারিতাকে উদ্দেশ করে এই সময় রুশ দেশে বহু গল্প-গল্পের সৃষ্টি হয়। জনতার মুখে প্রচারিত হয়ে এইগুলি নাগরিকদের জারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো।

(২) শহরের এক গোয়েন্দা অফিসে এক নং দু' নং এবং তিন নং গোয়েন্দা অফসারদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। এক নং ভদ্রলোক আপশোষ করে অন্য দু'জনাকে বললেন—আরে ভাই। এবার দেখছি চাকুরী আর রাখা গেলো না। এই সপ্তাহে কারুর মুখ হতে একটা সংবাদও বার করতে পারলাম না। ভাই, কিন্তু তুই রোজ রোজ এতো ভালো ভালো খবর জোগাড় করিস, কি করে? ১নং ভদ্রলোকের এই আফশোষ শুনে দুই নং অফসর বললেন—'কেন? কেন? শহরের যে কোনও একটা কফিখানাতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসিস না কেন? সেখানে কতো লোক আসে ও কতো কথাবার্ত্তা বলে থাকে'। দু'নং বন্ধুর এই উক্তিতে একটু ম্লান হাসি হেসে ১নং ভদ্রলোক বললেন—আরে ভাই। ওখানে কি আর আমি যাই না? কিন্তু ওখানে আমাকে দেখা মাত্র সকলে একেবারে চুপ মেরে যায়। ওরা তখন আর একটি কথাও কাউকে না বলে একে একে সরে পড়ে। এক নং ভদ্রলোকের এই খেদোক্তিকে তার বন্ধু দুই নং ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে জবাব দিলো—আরে আমার বেলাতেও ওরা ঐরূপই ব্যবহার করে। আমি তখন কি করি জানিস্? আমি তখন নিজেই ওদেরকে উদ্দেশ্য করে রাজনীতি আলোচনা করি এবং বড়ো কর্তাদের নাম করে তাদের কাজের সমালোচনা করি এবং তাদের প্রাণভরে গাল পাড়তে থাকি। এর পর আমি ওদেরকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করি—কি মশাই। আমি ঠিক বলেছি কি'না? এতে ওখানকার যে ব্যক্তি অতর্কিতে 'হু' বলে উঠে, তখন তার নামেতেই

আমারই সেই কথা [বক্তব্য] গুলি চালিয়ে তার নামে একটা মস্ত বড়ো রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে দিই। এতোক্ষণ ওদের অপর বন্ধু সেই তিন নং গোয়েন্দা নিবিষ্ট মনে তার সেই বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্তা শুনছিল। এইবার সে মুখ হতে সিগারেট নামিয়ে হাঁ করলো ও বললো—দূর! তোরা বড়ো বোকা। আমি, কিন্তু অতো কষ্ট করি না। আমি শুধু প্রাতে উঠে সংবাদ পত্র পড়ে জেনে নিই যে ঐদিন অমুক অমুক বিশিষ্ট নেতা মস্কো শহরে হাজির আছে কি না! তারপর তার নামে বানিয়ে বানিয়ে বহু কিছু সত্য মিথ্যা লিখে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিই।"

ভারতবর্ষেও ঐ সময় এইরূপ কিছু গোয়েন্দা পুঙ্গব ছিল। এদের ভুল রিপোর্ট পড়ে কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্ত হতেন। এর ফলে বহু বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিও সরকারের শত্রু হয়ে উঠতেন। অবশ্য এতে অপ্রত্যক্ষভাবে এদের এই অকাজ স্বাধীনতা যোদ্ধাদের উপকার করেছে। এর ফলে ঐ সব উৎপীড়িত ব্যক্তি দলে দলে সরকার বিরোধী মানুষে পরিণত হয়েছে।

এইবার এখানে এতৎ সম্পর্কিত একটি অনুরূপ ভারতীয় গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করলাম, এই গল্পটির সাথে উপরোক্ত রুশ ও আইরীশ গণ-গল্পের সাদৃশ্য আছে।

(৩) হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়কে সিঁদুরে পটির মোড় বলা হয়। সেই দিন আমরা দু'জন ওয়াচার সেই মোড়েতে ওয়াচ ডিউটিতে ছিলাম। এমন সময় দেখি এক সন্দেহভাজন লোক সন্দেহজনকভাবে একটা ভারী পুঁটলী হাতে এগিয়ে চলেছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে ওর ভিতর গোল গোল বড়ো বড়ো ভারী পদার্থ। আমরা বুঝতে পারলাম যে ওর মধ্যে সাংঘাতিক বোমা আছে। আমরা ধীরে ধীরে বিপ্লবী লোকটাকে অনুসরণ সুরু করলাম। আমাদের চক্ষুকে ফাঁকী দেওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু ঐ লোকটাও কম চালাক নয়। সে এখান ওখান ক্রমাগত ঘুরতে থাকে আর এটা সেটা কেনার ভান করে আমাদের হায়রানী করে। পরিশেষে হাওড়ার পুলের নিকট লোকটা এলে আমাদের একজন সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ওখানকার পুলিশ ফাঁড়ী থেকে অফিসে ফোন করে দিলে কিন্তু আমরা যে তাকে অনুসরণ করছি তা বোধ হয় সে জানতে পেরেছিল। কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাওড়া ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকলো, ঠিক সেই সময় সশস্ত্র বাহিনীও দৌড়ে এসে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ভদ্রলোকের বিরক্তি বোধ হয় এতক্ষণে চরমে উঠেছে। দূর্ ছোরা। তবে রে" ব'লে ভদ্রলোক বলে উঠলো তবে এ' আপদ আর কাছেই রাখবো না। এরপর উনি দুই হাত উপরে তুলে সজোরে সেই বোঝা প্লাটফর্মের শক্ত ভূমিতে আছড়ে ফেললে। এর ফলে পূর্ব্ব শিক্ষামত আমরা প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার্থে ভূমির উপর শুয়ে পড়লাম। আমরা নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম যে আমাদের কারুর কারুর দেহ বোমার ঘায়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু বহুক্ষণ কোনও বিরাট আওয়াজ না শুনে আমরা একে একে মাথা তুলে দেখি যে চারদিকে শুধু কয়েকটা ফুট ও তরমুজ ফলের টুকরো প্লাটফর্মের এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। [ক্রমশঃ

নববর্ষ—

বাংলা ১৩৭৩ সাল শেষ হইয়া ১৩৭৪ সাল আরম্ভ হইয়াছে। '৭৩ সাল নানা কারণে ভারতবর্ষের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে অনাবৃষ্টির ফলে দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে নূতন রাষ্ট্রচালকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ২০ বৎসরে বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার চাল ও গম আমদানী করা হইয়াছে। এমন কি দুধের উৎপাদনও প্রয়োজনমত বাড়ে নাই। ফলে বিদেশ হইতে বহুক কোটি টাকার দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সে শিক্ষা আমাদিগকে নিজেদের খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী করে নাই। সত্য কথা বলিতে কি ভারতের মানুষ আজ পেট ভরিয়া দুইবেলা খাইতে পারে না। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু শিক্ষিত ও ধনীর দল খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে একেবারে উদাসীন।

হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এবং গুজরাট হইতে আসাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই অবস্থা। শাসকগোষ্ঠী জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংখ্যা কমাইবার কথা চিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা একদিকে যেমন সহজসাধ্য নহে, অন্যদিকে তেমনি ভারতের মত বিরাট অশিক্ষিতের দেশে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় ৭৩ সালের অনাবৃষ্টি ভারতকে খাদ্যহীন দেশে পরিণত করিয়াছে। বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাঁহাদের দল ঠিক রাখিতে ব্যস্ত, খাদ্যের কথা তাঁহারা চিন্তা করিবার সময় পান না। স্বাভাবিক নিয়মে কয়েকটি রাজ্যে প্রয়োজনের অধিক খাদ্য উৎপাদন হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু খাদ্য ভারতে রপ্তানী করা হয়। ইহাতে কোনরকমে মানুষ আধপেটা খাইতে পায়।

এই সকল স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া ভারতের মানুষ গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে। তাহারা যে কোন উপায়ে বেশী লাভ করিয়া নিজেদের সুখ সুবিধা বাড়াইতে চায়। তাহার ফলেও দেশের লোক চাল বা গম উপযুক্ত মূল্যে ঠিক সময়ে পায় না।

পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রের ধারে সুন্দরবনের জঙ্গল কাটিয়া মানুষের বাস ও চাষ আবাদ বাড়াইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেদিকেও বেশী লোক মন দেয় নাই। শুধু সুন্দরবনে উপযুক্তভাবে খাদ্যের চাষ করা হইলে পশ্চিমবঙ্গকে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হয় না। নারিকেল ও সুপারি সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর উৎপাদন হয়। কিন্তু সেই নারিকেলকে খাদ্যরূপে ব্যবহার না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের লোক ডাব খাইয়া নারিকেলের অপব্যবহার করিয়া থাকে। কলিকাতায় একশ্রেণীর বিলাসী ধনীদের জন্য সহরে একটি ডাব আট আনা মূল্যে ব্যবহার হয় এবং একটি পাকা নারিকেল একটাকা দামে বিক্রয় হয়। অথচ একটি ডাবের তুলনায় একটি নারিকেলের খাদ্য মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ছয় গুণ বেশী।

দেশে ফলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। আর কোন ধনী লোক আম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের বাগান করেনা। মানুষ তাড়াতাড়ি বড়লোক হইতে চায়, কাজেই ফলের বাগান করিলে যে হারে লাভ পাওয়া যায় অন্যান্য ব্যবসায়ে কম পরিশ্রমে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইয়া থাকে। মাছের চাষও একদল লোভী ব্যবসায়ীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই মাছের দাম দিন দিন বাড়িতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বাজারে মাছের অভাবও বেশী হইতেছে।

যাহারা দৈহিক পরিশ্রম করিয়া মাছের চাষ করিত

তাহারা লাভ কমিয়া যাওয়ার আবসে কাজে অগ্রসর হয়না। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে বহু পুষ্করিণীতে এখন আর মাছের চাষ হয়না। গত ২০ বৎসরে সরকারী ব্যবস্থা এত আন্তরিকতা হীন হইয়াছে যে সরকার যে কাজে হাত দিয়াছেন তাহাই নিষ্ফল হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পুকুরের মাটি কাটিবার জন্য বায়বরাদ্দ হইয়াছিল কিন্তু সমস্ত টাকা অপব্যয় হইয়াছে। কাগজে কলমে যেখানে ২০ হাজার টাকা খরচ দেখান হইয়াছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে দুই হাজার টাকাও খরচ হয় নাই। কয় বৎসর সরকার জাকজমকের সহিত বৃক্ষরোপণ করিয়াছিল। ঐ বাবদে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ও হইয়াছে। গ্রাম গ্রামে বড় বড় মন্ত্রী প্রভৃতি যাইয়া লক্ষ লক্ষ গাছ পুঁতিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গাছ যত্নের অভাবে শুকাইয়া গিয়াছে।

কাজেই দেখা গিয়াছে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষের সাহায্য দান, কৃষির জন্য বীজ বিতরণ প্রভৃতি সবই হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বেও ১২ বৎসর মন্ত্রী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে এ সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা একটি বিষয়ে পূর্ব্বেও কারখানার মালিক ও পরিচালকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কারখানার পরিচালকরা যদি অন্যান্য ব্যবসার সহিত খাদ্য উৎপাদনকে একটি ব্যবসা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং কারখানার লাভের কিছু অংশ অপব্যয় করিয়া খাদ্য উৎপাদনে তাহা নিযুক্ত করেন, যে সময়ে কারখানার শ্রমিকরা কাজ পায় না সেই সময়ে তাহাদের দ্বারা খাদ্য উৎপাদন কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা হইলে অতি সহজে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

লাভের পরিমাণ কমিয়া গেলেও শ্রমিক মালিক সকলেই উপযুক্ত মূল্য খাদ্য পাইলে এ ব্যবস্থায় কেহ আপত্তি করিবে না। নূতন করিয়া কোম্পানি গঠিত করিয়া বা সমবায় সমিতি করিয়া খাদ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা সকল কারখানার পরিচালক নিজ নিজ এলাকায় এ কাজে হাত দিলে দেশের বর্ত্তমান খাদ্যাভাব দূর হইবে।

এভাবে ফলের চাষ না করিলে ইহার পর টাকায় একটা আমও কিনিতে পাওয়া যাইবে না। আম, জামরুল, লিচু, পেয়ারা, শশা, কলা, নারিকেল, বেল, প্রভৃতি ফলের চাষ দেশে না বাড়াইলে পরিপূরক খাদ্যের পরিমাণও বাড়িবে না।

নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া কাজে হাত দিতে পারেন। আমাদের দেশে মানুষ এক সময়ে শুধু খাদ্য উৎপাদনের কথাই চিন্তা করিত। এখন মালদহ জেলায় ধনী বলিলে আম বাগানের মালিকদের বুঝা যায়। দেশে পতিত জমির অভাব নাই। বিশেষ করিয়া বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় এখনও ফলের চাষের প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কারখানা নির্ম্মাণের যুগে কেহ ফলের চাষের কথা চিন্তাও করে না। সরকারী কর্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৬ই এপ্রিল ৬৬ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। সকলেই জানেন তিনি বাল্যকাল হইতেই দেশসেবক। ধনী পিতার পুত্র হইয়াও আজীবন অবিবাহিত আছেন। এবং সারা জীবন দেশের মুক্তিসংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ২০ বৎসর তিনি পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন এবং গত বৎসরাধিককাল নূতন বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করিয়া তাহাকে সাফল্যের পথে আনিয়াছেন। তাঁহার সত্যপরায়ণতা, সকলেরই জন্য দরদ, নিরহঙ্কার অতি সাধারণ জীবন যাত্রা তাঁহাকে আজ মুখ্যমন্ত্রীর পদ দান করিয়াছে। বিস্ময়ের কথা পশ্চিমবঙ্গে পর পর যে চারজন মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় চারজনেই অবিবাহিত। আমরা অজয়বাবুর আদর্শ জীবনযাপন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দারুণ শীতের রাত্রেও তাঁহাকে খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। ছোট, বড় সকল কর্ম্মীকে ভালবাসা ও আদর করার তাঁহার যে গুণ তাহা যেন তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মে সাফল্য দান করে। ইহাই আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি—

চৈত্রমাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাজারে সকল জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। রেশনে চাউলের দাম বাড়ে নাই বটে, কিন্তু রেশনের বাইরের এলাকায় নির্ব্বাচনের সময় চাউলের যে সামান্য দাম কমিয়াছিল তাহা আবার বাড়িয়া গিয়াছে। এ বৎসর চৈত্রমাসেই আলুর দাম এক টাকা কিলো হইয়াছে। যদি ব্যবসাদারদের কারসাজিতে ঠাণ্ডা গুদামে আলু জমা হয় ও আলুর দাম বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আলুর সঙ্গে সঙ্গে বেগুন, পটল, কুমড়া প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য তরিতরকারী দুর্মূল্য হইয়াছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতি বুঝে না, সুলভে খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। সরকারী ভাগ কৃষি বিভাগ চাউলের উৎপাদন তো বাড়াইতে পারে না, কিন্তু একটু মনোযোগ দিলে তরিতরকারীর উৎপাদন অনায়াসে বাড়ান যায়। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও মনোযোগী হইতে দেখা যায় না।

আর একদিকে কাপড়ের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, ব্যবসাদাররা বলিবে যে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য সমস্যা—

কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা সহরে চারটি ও কলিকাতার বাহিরে বাঁকুড়ায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ঐ সকল কলেজ হইতে ৪৫ শত যুবক চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ডাক্তার হইতেছেন। তাহাছাড়া অনেকগুলি বেসরকারী ইস্কুলকলেজেও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভাবে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া দেশের সর্বত্র বহু বড় বড় হাসপাতাল এবং প্রতি থানায় একটি করিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র নামক ছোট হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ায় কাহারও কোন পীড়া হইলেই হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে, সরকার নিজ চেষ্টায় গত ২০ বৎসরে বহু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে বেসরকারী চেষ্টাও বাড়িয়া গিয়াছে এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু বেসরকারী হাসপাতাল এবিষয়ে মানুষকে সাহায্য করিয়াছে।

আমরা স্বাধীন হইলেও আমাদের দাস মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এবং কথাটা শুনিতে অত্যন্ত অশোভন হইলেও এককথায় বলিতে হয় বর্ত্তমান যুগে চিকিৎসকগণ বিদেশী ঔষধের দালাল ছাড়া আর কিছুই নহেন। আমরা বাল্যকালে যে চিকিৎসা পদ্ধতি দেখিয়াছিলাম তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে চিকিৎসকগণ শুধু পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা কার্য্য চালাইয়া থাকেন, অবশ্য সরকারী কড়াকড়িতে বিদেশী ঔষধ আমদানী কিছু কমিয়াছে বটে। কিন্তু তাহা প্রায় নগণ্য বলা যায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এদেশে অসংখ্য পেটেণ্ট ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকল কারখানায় কিছু কিছু দেশীয় জিনিষ ব্যবহৃত হইলেও এখনও বিদেশ হইতে আমদানী করা মাল অধিক ব্যবহার করা হয়। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে এবং দরিদ্রের পক্ষে চিকিৎসিত হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য জীবনযাত্রা প্রণালী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ডাক্তারের ফি বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পূর্ব্বে লোক মনে করিত যে হাসপাতালে হইলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করা যায়। এখন আর তা সম্ভব হয়না। হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের জন্য যে সমস্ত বহু মূল্য ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় তাহা সংগ্রহ করা রোগীদের পক্ষে সম্ভব হয়না। কাজেই এখন আর হাসপাতালে দরিদ্রের স্থান হয় না, ডাক্তারকে ফি না দিলে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া যায়না এবং ভর্ত্তি হওয়ার পর ডাক্তারের পরামর্শমত মূল্যবান ঔষধ সংগ্রহ করিতে না পারিলে চিকিৎসাও হয় না। অনেক দরিদ্র রোগীকে ঔষধের অভাবে বিনাচিকিৎসায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হয়, সমস্ত হাসপাতালগুলির ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

আমরা যে দরিদ্র ভারতের অধিবাসী সেকথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করিয়া বড় বড় হাসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণ হয় কিন্তু সেই বিপুল অর্থব্যয়ের অনুপাতে উপযুক্ত চিকিৎসা হয়না। সব দিক দিয়া আমরা নিজেদের বেসামাল করিয়া তুলিতেছি। দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য কতকগুলি নূতন বড় বড় চিকিৎসালয় সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। সেখানে ঔষধ পাওয়া যায়না, ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিলে ঔষধের দোকান তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। এই ব্যবস্থা এমন গোলমেলে হইয়াছে যে মজুরী অর্থ থাকিলেও দরিদ্র শ্রমিক বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। সে জন্য সর্ব্বদাই আমাদের মনে হয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা কি পাইয়াছি!

পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মনকে এমনভাবে গঠিত করেছে যে আমরা কিছু পাইয়াই সন্তুষ্ট হইনা চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমরা যতই মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিনা কেন, যত অধিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিনা কেন, আসলে আমাদের সমস্যা একটুও দূর হয় নাই, মানুষ পূর্ব্বের মতই রোগে কষ্ট পায়। বিনা চিকিৎসায় ও বিনা ঔষধে মারা যায় এবং সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না।

ভারতবর্ষে যে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এ দরিদ্র দেশের কোন উপকার হইবেনা। যে দেশে কবিরাজগণ অতি সুলভে বন জঙ্গল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা কার্য্য চালাইতেন, সেব্যবস্থায় এখন আর কেহ সন্তুষ্ট হয়না। এখন কাহাকেও বিলাত হইতে আমদানী করা শিশিতে ভর্ত্তি বড়ি না দিলে তাহার অসুখ সারেনা। কে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিবে? এ সকল বিষয় মানুষ চিন্তা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

চারিদিকের অবস্থা মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। দেশের নূতন রাষ্ট্র পরিচালকরা কি এ কথায় কর্ণপাত করিবেন?

॥ নিরুদ্দেশ ॥

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এরও মাস দেড়েক পরে মহালয়ার পরের দিন অলকের চিঠি এল, সে পুজোর ছুটীতে কলকতায় আসবে পঞ্চমীর দিন সকালে। রেণুর মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অমু এক টেলিগ্রাম হাতে এবাড়ীতে এসে বল্লে, দিদি, বড়ই খারাপ খবর কি করব ভাবতে পারছি না।

রেণু উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে, কি খবর অমু? কার টেলিগ্রাম?

বউদির টেলিগ্রাম। দাদা না কি মোটর এ্যাক্সিডেণ্টে ভীষণ ভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। রেণু টেলিগ্রামখানা অমুর হাত থেকে নিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্লে। এখন কি হবে?

বউদিত যেতে লিখেছে।

অলক তখন চাকরী করত জলপাইগুড়ীতে। রেণু বল্লে, আমি যাব, জলপাইগুড়ী আমার চেনা জায়গা। তুমি আমায় নিয়ে চল।

অমু বল্লে, আমার যেতে দিন দুই দেরী হবে যে দিদি। এখানে এমন সব কাজে পড়ে গেছি যে—

রেণু বল্লে, আমি এখনি যাব। সাড়ে আটটায় দার্জ্জিলিং মেল না? এখন ত সাতটা কুড়ি। তুমি আমায় শিয়ালদহে পৌঁছে দাও। আমি আজই চলে যাই।

একলা যেতে পারবে? অমু প্রশ্ন করলে।

পারব। তুমি শিয়ালদহে গাড়ীতে চড়িয়ে দেবে কাল সকালে জলপাইগুড়ী নেমে আমি বাড়ী খুঁজে নেব। ও জায়গা আমার জানা।

ভাড়াটের দেওয়া টাকা রেণুর হাতেই ছিল। যা ছিল সমস্ত আঁচলে বেঁধে সেই রাত্রেই রেণু রওনা দিলে। দোতলার ভাড়াটেকে বলে গেল, ওপোরের ঘরটা দেখা শুনা করতে, কারণ একটা মাত্র তালা দেওয়া রইল ত!

তারপর তিনদিন ধরে আহার নিদ্রা ছেড়ে হাসপাতালেই পড়ে রইল রেণু কিন্তু অলককে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। অলকের শ্বশুর শাশুড়ীও জলপাইগুড়ীতে এসেছিলেন, অপুবাও এসেছিল কিন্তু অমু যেতে পারে নি গোটা দুই টেলিগ্রাম সে করেছিল। সমুকে কোন খবরই দেওয়া হয় নি।

কদিন পরে সকলেই কলকাতায় ফিরে এসেছিল। অলকের শ্বশুর রেণুকে শিয়ালদহ থেকে একখানা গাড়ী ভাড়া করে একলাই চেৎলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রেণু বাড়ীতে নেমে ঘাড় হেঁট করে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছিল। দোতলার ভাড়াটেদের বউ অর্থাৎ অলকের বন্ধুপত্নী পেছন পেছন ওপোরে এসে দেখলে, রেণু ঘরের মেঝেয় ধুলো পায়ে একদৃষ্টে সরোজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ফটোটা দেখছে এবং দু'চক্ষের জলে ওর বুক ভেসে যাচ্ছে।

বউটি ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে ডেকেছিল, দিদি, দিদি—

রেণু ওর দিকে চেয়ে দেখলে।

বউটি রেণুকে ধরে খাটের ওপোর বসিয়ে দিলে।

খাটের বাজুতে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রেণু বলেছিল পারলুম না ভাই, অলককে ফিরিয়ে আনতে পারলুম না। সে চলে গেল বাবার কাছে—

চেৎলায় আড্ডি'দের পুজো-বাড়ীতে বিজয়ার দিন সকালে দর্পণ-বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছিল।

দুদিন পরেই সমু এল কেষ্টনগর থেকে। স্ত্রীর অসুখের জন্য এবার পুজোয় সে কলকাতায় আসতে পারে নি, কিন্তু খবরের কাগজে জলপাইগুড়ির মুন্সেফ অলক গাঙ্গুলীর

মোটর-এ্যাকসিডেণ্টের খবর পেয়ে সে মাকে এবং অলককে চিঠি দিয়ে কোন খবর না পেয়ে বাধ্য হয়ে কলকাতায় এসেছিল। অলকের মৃত্যু সংবাদ কাগজে বেরোয় নি।

সমু এবার বেশ কিছুদিন, প্রায় দিন পনরই হবে, কলকাতায় মায়ের কাছে থেকে গেল। দোতলার মুন্সেফবাবুরাও বল্লেন থাকতে, তোমরা থাক, না হলে রেণু স্নান করে না, খায় না, এভাবে একটা লোক কদিন বাঁচবে!

রেণু একটু সামলে নেবার পর একদিন সমর মাকে বল্লে, মা, মানুষের জীবন মৃত্যুর কথা ত বলা যায় না। এই ত চোখের সামনে দু' দুটো ঘটনা ঘটে গেল। তা আমি বলি কি, তোমার ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে তুমি এমন একটা ব্যবস্থা করে রাখ, যাতে তোমার পরে আমি ওখান থেকে টাকা তুলতে পারি। এই যেমন দাদু তোমার নামটা ওঁর পাস বইয়ে দিয়ে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, সেই ভাবে।

অলকের মৃত্যুর পর রেণুর মনটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। এমনই সময় সমরের সাময়িক আদর যত্নে সমরের ওপোর রেণুর যে বিতৃষ্ণাটুকু পূর্ব্বে এসেছিল, সেটা তার দুর্ব্বল মন থেকে সরে গিয়েছিল। সে বল্লে, যা ভাল হয় কর।

সেইদিনই দুপুরে ব্যাঙ্কে গিয়ে সেখানকার কাগজপত্র এনে সমু মাকে দিয়ে সই-সাবুদ করিয়ে নিলে, অর্থাৎ মায়ের টাকাটা either or survivorকে দেওয়া হবে। কাজ শেষ করে সমু পাস বইটা স্বেচ্ছায় মায়ের কাছেই রেখে দিলে। পাস বইটা ছেলে নিজের কাছে রাখতে চাইলে না এই পরিবর্ত্তন দেখে রেণু ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তাহলে অমুর মত সমুও এবারসত্যিকার মানুষ হয়ে উঠছে। হবেই ত, শোকের আগুনে পুড়ে পুড়ে মানুষের সব খাদ গলে গিয়ে খাঁটি সোনাটা বেরিয়ে আসে। দুঃখের মধ্যেও রেণু যেন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল।

কালীপূজার একদিন আগে সমর সকাল সকাল ভাত খেয়ে বেলা দশটা নাগাদ রওনা দিলে কেষ্টনগরে।

অমু নিয়মিত ভাবেই রেণুর কাছে আসা-যাওয়া করে। তার কারবারে এখন মন্দা পড়েছে। মিলিটারী বিভাগে তেমন কোন কাজ নেই। সবাই সব দিক থেকে হাত গুটিয়েছে। অমুর কাছেই রেণু শুনলে, প্রফুল্লবাবু, অর্থাৎ অমুর বন্ধুর বাবা, যার সঙ্গে ওর অংশীদারী কারবার চলছিল সে লোকটা মোটেই সুবিধের নয়; কারবারের পাওনা টাকা সব হাত করে দেনাগুলো ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়বার তাল খুঁজছে। অমু এখন উকীল এটর্নীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করছে। সেও ত আর কাঁচা ছেলে নয়, এতদিন কারবার চালিয়ে সেও এখন এ সব ব্যাপারে পোক্ত হয়ে উঠেছে।

দিন যায়। রেণু দেখলে, ও বাড়ীর অফিসের লোকেরা আস্তে আস্তে বিদায় নিলে। অমু বল্লে, কাজ কর্ম্ম কম, কি হবে মিছামিছি লোকগুলোকে পুষে। তার চেয়ে একতালাটা ভাড়া দিয়ে দিলে নগদ কিছু আসবে। সেই ব্যবস্থাই করছি দিদি।

আর একদিন অমু বল্লে, তোমার ঘরে আমায় থাকতে দেবে দিদি, তাহলে একটা ভাল ভাড়াটে পাচ্ছি, তারা গোটা বাড়ীটা দেড়শ টাকায় নিতে চাইছে, কিছু সেলামীও পাওয়া যাবে। তোমার অসুবিধে না হলে—

রেণু বল্লে, তোর অত জিনিষপত্র, আমার ত মোটে একখানা ঘর। সে ঘরও ত জিনিষে ভর্ত্তি, এত সব একখানা ঘরে ধরবে?

অমু বল্লে, আমার জিনিষ সব বিক্রী করে দেব। তুমি জান দিদি, যে দামে কিনেছি, এখন আমি যদি ওগুলো ছেড়ে দি, তাহলে দেড়া দাম পাব, ডবলও পেতে পারি।

স্নেহ দুর্ব্বল মন নিয়ে রেণু বল্লে, যা ভাল হয় কর। তার মনে হোল, কেষ্টনগরেও অমু সমু রেণুর দু'পাশে দু'জনে থাকত। কলকাতায় এসেই অমর আলাদা ঘর নিয়ে একলা থাকতে সুরু করেছিল।

ও-বাড়ী ভাড়া দিয়ে অমু এসে দিদির তিনতালায় আশ্রয় নিলে।

দিদির ঘরখানা গুছাবার নাম করে অমু বল্লে, দিদি, এই একটা বিশ্রী নড়বড়ে কাঠের আলমারী এ ঘরে রেখেছ কেন? এটা ছাতে বার করে দি।

দিদি বল্লে, না অমু, ওটা ওখানেই থাক্। ওটা তোমার মায়ের স্মৃতি।

কিসের স্মৃতি! এতখানি জায়গা জুড়ে,—অমু অবজ্ঞাভরে কথাগুলো বলেছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে রেণু বলেছিল, আমি যতদিন থাকব ততদিন ওটা ঐখানেই থাকবে, আমার পরে তোমার মাকে

স্মৃতি যদি তোমার কাছে জঞ্জাল বলে মনে হয় তা হলে তখন যা খুসি হবে কোরো, এখন নয়।

নিজেকে সামলে নিয়ে রেণুর সামনে এসে ছেলেমানুষের ভঙ্গীতে অমু বল্লে, মায়ের স্মৃতি কি বললা দিদি! আমি ত জানি, তুমিই আমাদের মা।

রেণু ওকে জালের আলমারীর ইতিহাসটুকু বলেছিল, যা সে সরোজের কাছ থেকে শুনেছে। সব শুনে অমু বল্লে, তাই বুঝি? এ-সবত আমি জানতুম না। তাহলে ওটা যেমন আছে তেমনই থাক। রেণু খুসি হয়ে গেল। অমুর মত ছেলে কটা হয়! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রেণু মনে মনে প্রার্থনা করলে, অমু সমু ভাল থাক, সুখে থাক, ওরা ছাড়া আর আমার কেই বা রইল। একে একে সবাই ত চলে যাচ্ছে।

সুখে দুঃখে দিন যায়। রেণু বেশ বুঝতে পারে যে, অমুর মনে আদৌ শান্তি নেই। লরীখানা বিক্রী করে দিলে, গাড়ী দুখানা বিক্রী করেছে কি অন্য কাউকে মাস-কাবারী হিসেবে ভাড়া দিয়েছে, কি করেছে ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু সে দুটো ওর হাতে ঠিক আছে বলে মনে হয় না। মোটের ওপোর এটা স্পষ্ট যে, টাকাকড়ি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অমু খুব বিব্রত, বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

ক'দিন ধরেই মাঝে মাঝে অচেনা সব লোক আসছিল অমুর কাছে। অমু তাদের সঙ্গে নিয়ে ওর নিজের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। চাবিবন্ধ খালি গুদাম ঘরটাও দেখায়। কি ব্যাপার?

রেণু প্রশ্ন করে। অমু বলে, গুদামটাও ভাড়া দিয়ে দেব ভাবছি। কারবার ত এমন কিছু নেই, মিছামিছি গুদামটা ফেলে রেখে লাভ কি?

কিন্তু আসল কথা রেণু শুনলে দোতলার বউটির কাছে। সে বল্লে, দিদি, অমরবাবু কি ওঁর বাড়ীটা ছেড়ে দিলেন?

রেণু ওর কথা ঠিক ধরতে পারে নি। বলে, ছেড়ে দেওয়া মানে, ও ত ভাড়া দেওয়া আছে অনেক দিন।

মুন্সেফের বউ বল্লে, তা নয় দিদি, ওঁর কাছে শুনলুম, বাড়ীটা নাকি বায়না হয়ে গেল। ওঁরই কোর্টের এক উকীল ঐ বাড়ীটা কিনছেন।

সর্ব্বনাশ! অমু বাড়ী বিক্রী করলে!

রেণুর চোখের সামনে ভেসে উঠল সরোজের রৌদ্রক্লিষ্ট মুখ। ছাতাটি মাথায় দিয়ে প্রৌঢ় সরোজ দিনের পর দিন ধুলো বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও-বাড়ীর এবং সবগুলো বাড়ীর এক একখানি ইট গাঁথিয়েছিল, মিস্ত্রীরা পাছে কোথাও ফাঁকি দেয়, পাছে কোথাও কোন কারণে বাড়ী কমজোরী হয়ে পড়ে! দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমে সরোজ আধখানা হয়ে গিয়েছিল। সেই বাড়ী, বাবার বুকের রক্ত জল করা বাড়ী, অমু স্বচ্ছন্দে বিক্রী করে দিলে?

অমুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই সে চটে উঠল, বল্লে, মিথ্যে কথা। বাড়ীর ভাড়াটে হয়ে এইভাবে দুর্নাম ছড়াচ্ছে। আমি করব বাড়ী বিক্রী? ওদের বলে দিও দিদি, ঐ রকম একখানা বাড়ী পেলে আমি কিনতে রাজী আছি। ব্যবসা আমার বন্ধ হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু নগদ টাকাগুলো ত আছে, সেগুলো ত যায় নি।

রেণু চুপ করে গিয়েছিল। সন্দেহটা পুরো না কাটলেও সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছিল।

কিন্তু সেই আশ্বাস বেশীদিন টিকল না। বাড়ী যিনি কিনেছিলেন সেই উকীলবাবু এসে ও বাড়ীর ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে নিয়ে গেলেন। রেণু যেন মরমে মরে গেল।

অমু বলেছিল, দিদি, ওটা একটা চাল দিতে হোল। মানে বাড়ী আমি বিক্রী করি নি, শুধু পাওনাদারদের দেখাবার জন্য উকীলবাবুকে বেনামদার খাড়া করেছি। আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে।

হতাশ হয়ে রেণু বলেছিল, যা ইচ্ছে কর ভাই, আমি আর ওসবের কি বুঝি। তোমার যাতে ভালো হয় তাই কর।

দিনকয়েক পরেই অমু বল্লে, দিদি, একটা ভাল কাজ পেয়েছি, কিন্তু এখানে নয়, বোম্বাইয়ে। আমার এক বন্ধু আছেন সেখানে, তিনিই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছেন। খুব ভাল কাজ দিদি।

খানিকটা উৎসাহিত হয়ে রেণু বলেছিল, কি কাজ রে, কত মাইনে?

অমু বল্লে, কাজ ভাল। অফিসে বসে মালপত্র কেনা-বেচার কাজ। মাইনে অবশ্য প্রথম দেবে আটশ' টাকা, কিন্তু তা ছাড়া আয় আছে অনেক। যত মাল কেনা বেচা

হবে তার ওপোর মোটা কমিশন আছে। সব মিলিয়ে মাসে দু'হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাব। কিন্তু একটা কথা, থাকতে হবে সেই বোম্বাইয়ে।

রেণু চুপ করেই ছিল।

তুমি আমার কাছে থাকবে দিদি, বোম্বাইয়ে। তুমি গেলে আমার খুব সুবিধে হয়।

যাব, রেণু ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিল।

সেই ভাল। তা হলে তোমাকেই নিয়ে যাব।

কবে যেতে হবে, রেণু প্রশ্ন করে।

দশ-পনের দিনের মধ্যেই। আমি বলি কি, প্রথমে এই ঘর তোমার চাবি দেওয়া থাকবে, পরে এসে না হয় ঘরটা দেখেশুনে ভাড়া বসিয়ে দিয়ে যাব। কেমন?

রেণু বলেছিল কি দরকার ভাড়া দেবার। ভাড়া দিলে কটা টাকাই বা আনবে। তার চেয়ে বরং কলকাতায় একখানা ঘর নিজস্বভাবে থাকা ভাল, না হলে হঠাৎ এখানে এলে দাঁড়াবার জায়গাও ত পাওয়া যাবে না।

উৎসাহিত হয়ে অমু বলেছিল, ঠিক কথা দিদি, ঠিক বলেছ তুমি। সত্যি দিদি, এই সব ব্যাপারে তোমার বুদ্ধি যেমন খোলে, এমনটা আমি বড় বড় লোকের ভেতরেও দেখতে পাই না।

বোম্বাই যাবার আয়োজনে অমু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বল্লে, আসছে মঙ্গলবার যেতে হবে দিদি। সব গোছগাছ করতে থাক।

দিদি বল্লে, আমার আর গোছগাছ কি। গোরু-টরু ত অনেকদিনই গেছে, একটা বেড়াল-কুকুরও নেই যে, সেজন্য ভাবতে হবে। জলের পাম্প ত দোতলার ওদেরই জিম্মায় আছে। আমি শুধু কাপড়চোপড় আর বিছানা-কম্বল গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তা হ্যাঁরে অমু, ওখানে কি খুব শীত নাকি?

না দিদি, শীত-টীত তেমন নেই, এই এখানকার মতই।

রেণু বল্লে, মঙ্গলবারেই যাওয়া ঠিক করেছিস্, বুধবারে গেলে হয় না।

বুধবার? কেন দিদি? অমু প্রশ্ন করলে।

রেণু বল্লে, ছেলেবেলায় মামার কাছে শুনতুম, 'মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা', তাই বলছিলুম, বুধবার যেতে। আর দ্বিতীয় কথা, সেই যে কালীপুজার আগের দিন সমুটা চলে গেল, তারপর ত আর তাকে দেখি নি। তাকে একটা চিঠি দে, ছুটী নিয়ে এসে থাকুক, বুধবার আমরাও যাব, সেও সেদিন কেষ্টনগরে ফিরে যাবে।

আগ্রহভরে অমু বল্লে, বেশ কথা, আজই চিঠি দিয়ে দাও। সত্যি দিদি, আমিও তাকে অনেকদিন দেখি নি। আমার—আমার যদি হাতে সময় থাকত, তাহলে কেষ্টনগরে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসতুম। সমুর বাচ্চাটা কেমন হয়েছে, একবার দেখাই গেল না। তা চিঠি লেখার সময় লিখে দাও-না দিদি, সে যদি পারে তাহলে ছেলে-বউ নিয়ে যেন দুদিন থাকবার মত সময় হাতে নিয়ে আসে। এখনই দু'লাইন লিখে আমার হাতে দাও, আমি বেরোবার সময় চিঠিটা ফেলে দিয়ে যাব।

এতগুলো কথা বলে অমু একখানা পোষ্টকার্ড রেণুকে দিয়েছিল। রেণু তাড়াতাড়ি দু'চার কথা লিখে পোষ্ট-কার্ডটা অমুর হাতে দিয়ে দিলে।

কিন্তু রবিবারেও সমু এল না, ওরা আশা করেছিল, রবিবার বিকাল নাগাদ সে আসবে। কে জানে, অসুখ-বিসুখ কিছু হোল, কিম্বা অন্য কোন কারণে—

সোমবার বেলা ন'টা নাগাদ বাইরে থেকে ঘুরে এসে অমু হতাশ হয়ে পড়ল। রেণু জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, কি হোল?

না দিদি, বোম্বাই যাওয়া বোধ হয় হবে না, চাকরীও বোধ হয় হোল না।

কেন, এরই মধ্যে আবার কি হোল, রেণুর মুখে চোখে উৎকণ্ঠা।

হতাশার সুরে অমু বল্লে, এখনকার দিনে সবই ত বোঝ দিদি, ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না। আমার সেই বন্ধু যে সেখানে আছে, সে কোনরকমে ঠিক করেছিল যে, দশহাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কাজটা আমি পাব। পাঁচহাজার টাকা আমি দিয়েও ফেলেছি, আর কথা আছে ওখানে গিয়ে যেদিন কাজে বসব সেদিন বাকী পাঁচহাজার দেব। ঐ টাকা এখানে আমি পাব, তাও ঠিক ছিল। ও টাকা আমারই। অপরের কাছে পাওনা আছে। কিন্তু আজ সকালে সে লোক তিনহাজার মাত্র

দিলে, বল্লে, বাকী দু'হাজার আসছে মাসের আগে কিছুই দিতে পারবে না। এ অবস্থায় কি আর হবে। আগের দেওয়া পাঁচহাজার টাকা বোধ হয় লোকসানই হোল, আর চাকরীটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। বরাৎ দিদি, সবই বরাৎ, সময় যখন খারাপ হয়—অমু বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রেণু ওর কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এখন ঐ তিনহাজার দিয়ে পরের মাসে দু'হাজার দেব বল্লে হবে না?

উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠে বসে অমু বল্লে, তারা কি আমার বাপ-খুড়ো যে, মুখের কথায় বিশ্বাস করবে? ঘুষের ব্যাপারে বাকী কারবার চলে না।

একটু থেমে বলেছিল, দাদাও যদি আজ থাকত, তা হ'লে তাকে বুঝিয়ে বল্লেই একমাসের জন্য দু'হাজার টাকা ধার পেতুম।

অলকের উল্লেখে রেণুর মনটাও খারাপ হয়ে গেল। রেণু গভীরভাবে ভাবতে লাগল। অমুটার জীবনে এ একটা সুযোগ। এই সুযোগ নষ্ট হলে ছেলেটা আবার কি করে বসবে কে জানে?

কিছুক্ষণ পরে রেণু এসে দেখলে, অমু মড়ার মত বিছানায় পড়ে আছে। ওর চোখমুখ ছলছল্ করছে।

রেণু ডাকলে, অমু!

অমু চোখ চেয়ে দেখেছিল।

নাওয়া-খাওয়া করবি না?

কি হবে? অমন কাজটা হাতে পেয়েও যখন পেলুম না, তখন আর নাওয়া খাওয়া করে কি হবে?

রেণু বল্লে, দু'হাজার টাকার জন্য ত আটকাচ্ছে, তা সে ব্যবস্থা না হয় করা যাবে, তোর ভয় নেই।

কি করে? অমু তড়াক্ করে বিছানায় উঠে বসল।

রেণু বল্লে, আমার ব্যাঙ্ক আর পোষ্ট অফিস মিলিয়ে বোধ হয় দু'হাজারই আছে। তা তুই—

হতাশার সুরে অমু বলেছিল, না দিদি, তোমার টাকা নিয়ে আর আমি জড়াতে চাই না। আমার অদৃষ্টই মন্দ, না হলে আমার পাওনা টাকাই যখন পেলুম না—

রেণু বল্লে, পাবি না কেন, আসছে মাসেই ত দেবে। তা ছাড়া সে লোক নিশ্চয়ই খারাপ নয়, তিনহাজার ত দিয়েছে।

অমু বল্লে, হ্যাঁ, তা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আসছে মাসে দু'হাজার সে ঠিকই দেবে, কিন্তু আমার দরকারের সময় না পেলে আর কি হবে?

রেণু বল্লে, তাই বলছিলুম, তুই আমার টাকাটা নিয়ে নে, আসছে মাসে যখন তার কাছ থেকে পাবি তখন আমায় দিয়ে দিস।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে অমু বল্লে, তুমি দেবে? তবে তাই দাও। আসছে মাসে সে যদি নাও দেয়, তাহলেও আমার চাকরীর আয় থেকে দু'তিন মাসেই তোমার দু'হাজার আমি দিয়ে দিতে পারব।

অল্প হেসে রেণু বল্লে, তবে আর ভাবছিস্ কেন, নে ওঠ, নাওয়া-খাওয়া কর। যাবার যোগাড় করে ফেল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে অমু বলেছিল, আসল কথা কি জান দিদি, তোমার টাকাটা নিতে আমার এখনও কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌ছে। মানুষের জীবন ত; যদি আমি—

বলোই ষাট, ও কি কথা! রেণু ধমক দিয়ে উঠল। তুই কিছু ভাবিস নি। এটা মনে রাখিস্, ও টাকা আমার নামে থাকলেও আসলে ত ওটা তোর বাবারই টাকা। তাঁরই বাড়ী, সেই বাড়ীতে বাস করে বাড়ীভাড়া বলে মাসে মাসে দিয়ে ঐ টাকা তিনিই জমিয়েছিলেন।

রেণুকে দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে অমু দুপুরে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

দৌড়ে এসে রেণু বল্লে, কি—কি হোল রে। ও রকম করছিস্ কেন?

ওঃ দিদি, সমু যে এমন শয়তান, তা আমি জানতুম না।

কেন? কি করলে সে?

সে তোমার ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে নিয়ে গেছে। পুরো দেড় হাজার টাকা। মাত্র সাতাশটে টাকা পড়ে আছে।

সে কি? রেণু চমকে উঠল।

অমু বল্লে, হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক বল্লে, টাকাটা তোমার ও সমুর দু'নামে ছিল। সমু টাকাটা তুলে নিয়েছে সাতাশে অক্টোবর, মানে কালীপূজার আগের দিনে।

রেণু অবাক হয়ে গেল। তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, তা হলে কি হবে?

হবে আর কি? তাকে যেমন বিশ্বাস করে দিয়েছিলে—

রেণু বল্লে, সে কি? সে যে আমাকে বলেছিল যে, আমার পরে যাতে সে টাকা তুলতে পারে সেই রকম ব্যবস্থাই সে করলে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই—

সে রকম ব্যবস্থা ত হয় নি দিদি, ব্যাঙ্ক দেখালে, তুমি সই দিয়েছ, সে কিম্বা তুমি যে কেউ খুসিমত তুলতে পারবে। তোমার সেই সইয়ের জোরে সে টাকা তুলে নিয়ে পালিয়েছে। সেইজন্যই সে আর এ-মুখো হয় নি।

রেণু স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়েছিল।

কিছুক্ষণ লেগেছিল রেণুর নিজেকে সামলে নিতে। পরে বল্ল, আমার ত যা হবার তা হোল, এখন তোর কাজের কি হবে?

কাজ? কাজের চেষ্টা আমি ছাড়ব না। আমি ঠিক করেছি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এক হাজার এবং অন্য একজনের কাছ থেকে পাঁচশ ধার করে নিয়ে যাব। আর হাঁা দিদি, বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমার পোষ্ট অফিসের পাঁচশ আমি তুলে এনেছি। এই নাও, পাসবই গুলো তুমি রাখ।

ও আর রেখে কি হবে, কি আছে ওতে?

এখন কিছু নেই, কিন্তু পাঁচশ ত আমি দেব। আসছে মাসেই পাঁচশ আমি দিয়ে দেব। তারপর দেখি, আরও কিছু কিছু করে দিয়ে যদি আমি সমুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেণু উঠে গেল অমুর জন্য খাবার তৈরী করতে। ছেলেটা বিগড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু এখন সত্যিই ভালো হয়েছে, তার নিজের পেটের ছেলের মত নয়। পেটের ছেলে, পোড়াকপাল! ওঁর প্রথম পক্ষের ছেলেরা যেমন এক একটা রত্ন, এ পক্ষের এই বা কম যাবে কেন?

বুধবার বেলা এগারটায় বাড়ী ফিরে অমু বল্লে, দিদি, বোম্বাইয়ে থাকার মত কোন ঘর পাওয়া যায় নি। আমার সেই বন্ধুকে আজ সকালে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্লে, এখন তুমি একলা এসে কাজে যোগ দাও, এবং আমার সঙ্গে আমারই মেসের ঘরে একখানা খাট পেতে থাক, আমারই সঙ্গে হোটেলে খাও। তারপর এখানে খুঁজে পেতে তোমার মনোমত বাড়ী ভাড়া করে তবে তোমার দিদিকে নিয়ে আসবে. না হলে এখনই দিদিকে নিয়ে এলে বিপদ হবে। থাকা বা রান্নার জায়গা কিছুই পাওয়া যাবে না। অমু জানে, দিদি পরের হাতের রান্না খায়।

রেণু আজই বিকেলে যাবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। হতাশ হয়ে পড়ল। বল্লে, যাওয়া কি একেবারেই হবে না রে, না হয় কিছুদিন কষ্ট করেই থাকতুম।

অমু বল্লে, কি করব বল। আমি ত তোমায় নিয়ে যেতেই চাইছিলুম, কিন্তু যার ভরসায় যাব, সে যখন মুখ ফুটে বারণ করলে, তখন তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই কি করে। তবে এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি দিদি, ওখানে যেয়ে ঘরভাড়া করার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব এবং ঘর পেলেই আমি নিজে একদিনের জন্যও এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

বিকালে সামান্য কিছু পোষাকপত্র একটা স্যুটকেসে ভরে ছোট হোল্ড-অলে অল্প বিছানা নিয়ে অমু রওনা দিলে, বল্লে, বাকী জিনিষ এবং বিছানাপত্র গোছ করে রাখবে দিদি, আমি যে কোনদিন এসেই একদিনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

রেণু বল্লে, হ্যাঁরে তোর ওখানকার ঠিকানাটা কি হবে?

সে বল্লে, ঠিকানা এখন কি করে দেব, ঠিকানা ত জানি না। ওখানে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দেব। দোতলার বউ-ও তিনতোলায় উঠে এসেছিল। সে রেণুকে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, ওঁর বন্ধুর ঠিকানাটা চেয়ে নিন দিদি। উনি ত সেইখানেই থাকবেন বলছেন।

রেণু বলতেই অমু বল্লে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা দিচ্ছি। একটা কাগজ নিয়ে খস্‌খস্ করে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা লিখে দিয়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে ট্যাক্সিতে উঠল। রেণু দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিল। আকুলকণ্ঠে মনে মনে উচ্চারণ করছিল দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

একে একে আট, দশ, পনেরদিন কেটে গেল, অমুর কোন চিঠি আর এল না। রেণু ব্যস্ত হয়ে উঠল। দোতলার বউ, যাকে রেণু তার নাম ধরে রাণী বলে ডাকত, সেই রাণী বল্লে, বন্ধুর ঠিকানায় একখানা চিঠি দিয়ে খবর

নিন, অতগুলো নগদ টাকা নিয়ে রেল পথে গেছেন, ঠিকমত পৌঁচেছেন কি না?

রেণু আরও ভয় পেয়ে গেল। সেইদিনই বন্ধুর নামে চিঠি পাঠানো হোল।

কেটে গেল আরও প্রায় দিন পনেরো। কোন খবরই নেই। কুড়িদিনের মাথায় রেণুর চিঠি ফিরে এল। পোষ্টাফিসের অনেক ছাপসমেত ফেরৎ এল। ঐরকম কোন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

চিঠিখানা নিয়ে রেণু দৌড়ে গেল দোতলায়। রাণী বলে, কি জানি, কি হোল। ঠাকুরপো ত এই ঠিকানাই দিয়েছিল। অমুর লেখা কাগজটার সঙ্গে চিঠিতে লেখা ঠিকানাটা আর একবার মিলিয়ে দেখা হোল, কিন্তু কোথাও কোন ভুল পাওয়া গেল না। রাণী বলে, তুমি ভেব না দিদি, আমার বড় ভগ্নীপতি বোম্বাইয়ে আছেন প্রায় পনর-ষোল বছর। তিনি ওখানকার সমস্ত বাঙ্গালীকে জানেন, তাকে আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওরা বোম্বাইয়ে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই খবর দিতে পারবেন।

সেই ভগ্নীপতির চিঠির জবাব এল আরও প্রায় দিন কুড়ি পরে। তিনি লিখেছেন, ঐ নামের কোন বাঙ্গালীকে তিনি জানেন না, ঐরকম কোন ঠিকানাই বোম্বাইয়ে নেই। ঐ নামে একটা রাস্তা আছে বটে কিন্তু সে রাস্তায় শুধু বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং অফিস বাড়ী আছে এবং তাও মাত্র বাইশ নম্বর পর্যান্ত, কিন্তু অমুর দেওয়া ঠিকানা হচ্ছে শিয়াত্তরের তেরো। ঠিকানায় নিশ্চয়ই ভুল আছে, কারণ ঐ রাস্তায় কোন মেস বা বোর্ডিং হাউসও নেই। হয়ত বা ইচ্ছে করেই বাজে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

[ক্রমশঃ

‘যদি হি আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ’

‘বৈভব’

আকাশে আনন্দধারা না থাকিত যদি,
কে থা হ’তে এত প্রাণ আসে নিরবধি?
আকাশ-স্পন্দনে জাগে আলোকের
ঢেউ!
আকাশের বায়ু বিনা বাঁচিত কি কেউ
অসীম আকাশ ওই উদার বিস্তার
কোন পারাপার নাই নভো নীলিমার,
শ্রান্ত মন শান্ত হ’য়ে ফিরে আসে শেষে
কী জানি কি পায় সেথা অনন্তের দেশে!
সত্য-জ্ঞান-আনন্দের কী মৌন
প্রতীক!
অমূর্ত সে মূর্ত তবু, পূর্ণ চারিদিক!
অন্তরে বাহিরে আছ পরিপূর্ণ করি
প্রলয় প্লাবন সম আছ সব ভরি
হৃদয়-আকাশ কেন বাজে গুরু-গুরু?
আনন্দের আতিশয্যে কাঁপে দুরু দুরু!

জন্মদিন

শকুন্তলা

এ-মাটি আকাশ আর দূরে কোন প্রশান্ত সাগর—
সেখানে অরণ্য আর বেদুইন মনের প্রান্তর:
গোপনে গোপনে সেথা জন্ম নেয় নূতন পৃথিবী,
কোন এক সম্ভাবনা, তার সাথে নিয়ে আসে ঝড়।
কোথাও আকাশ লাল, লাল মেঘ রাতের আকাশ—
অমানিশা অন্ধকার আঁধারের শুধু ঢেউ ওঠে:
সে দিনে কে জন্ম নেয় চারিদিকে পাতা আছে ফাঁদ,
সে ফাঁদে বিধ্বস্ত পৃথ্বী, জন্মদিন তার পিছু ছোটে।
কখনো অরণ্য কাঁদে কখনো বা গর্জ্জিছে সাগর,
নতুন দ্বীপের বুকে কেউ জ্বালে সোণালী প্রদীপ:
কালো কালো মেঘঘন জাগায় না ত্রাসের কম্পন—
রাতের আকাশ নীল সে আকাশে চাঁদ যেন টিপ।
ওপরে আকাশ নীল, আর নীল মানুষের মন,
সে মনে অনেক স্বপ্ন শুধু ভেজা মাটি বসন্ত বাতাস
চোখের পাতায় জাগে অতীতের ঘুমভাঙা রাত:
সে-রাত এনেছে বয়ে আজিকার নূতন আকাশ।

ক্ষুধা ও খরা

শ্রীজ্ঞান

"ক্ষুধা"—এ কথাটার সঙ্গে তোমাদের সকলেরই নিশ্চয় পরিচয় আছে। খিদে তো সকলেরই পায়—তাই নয় কি? কিন্তু এই খিদের সময় যদি তোমাকে খাবার খেতে না দেওয়া হয় অর্থাৎ খাবার তুমি না পাও, তাহলে তোমার অবস্থা কি রকম হবে বল তো? খিদে ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় খাদ্যের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করবে অথচ খাবার তুমি পাবে না, কিংবা হয়ত যৎকিঞ্চিৎ পাবে তাতে তোমার ক্ষুধা মিটবে না। এই রকম যদি কিছুদিন চলে তাহলে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়বেই শুধু নয়, অনাহার বা অর্দ্ধাহার জনিত নানা রকম উপসর্গ দেখা দিয়ে পরিণামে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে! তবে তোমার, আমার ক্ষেত্রে এরকম এখন ঘটছে না বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ যে সকল স্থানে দেখা দেয়, সে সকল স্থানে এ রকম অবস্থা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে,—এ কথা নিশ্চয়ই তোমাদের অজানা নয়।

আজ আমাদের পশ্চিম বাংলায় অন্নাভাব, খাদ্য দ্রব্যের দর ক্রমশঃই ঊর্দ্ধগামী। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানকার অনেক স্থলেই বৃষ্টি না হওয়ায় জলাভাবের দরুণ খাদ্য শস্য নষ্ট হয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অনাবৃষ্টি জনিত এই শস্যক্ষেত্র শুকিয়ে যাওয়াকে "খরা" বলে। জলাভাবের দরুণ এই যে খরা, এর কবলে পড়ে বিহারের গ্রামে গ্রামে আজ হাহাকার উঠেছে। খেতে না পাওয়া, শীর্ণ, কঙ্কালসার মানুষ একটুকু খাদ্যের জন্যে দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে ফিরছে। কিন্তু এদের কি কেউ সাহায্য করছে না? করছে বই কি। সারা ভারতের মানুষই তাদের জন্যে সহানুভূতি জানাচ্ছে—সাধ্যমত সাহায্যও করছে। কিন্তু খাদ্যাভাব আজ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, তাই ইচ্ছা থাকলেও অন্যান্য প্রদেশ যথেষ্ট সাহায্য করে উঠতে পারছে না। যেমন পশ্চিমবঙ্গ—এখানেও অত্যন্ত খাদ্যাভাব, নিজেদের খাবার সংস্থানই হচ্ছে না। সুতরাং এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও বিহারবাসীদের বিশেষ সাহায্য করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো আমাদের প্রতিবেশীদের এই বিপদে সাহায্য করতে পারি। তোমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুযায়ী ইচ্ছা করলে তোমরাও বিহারবাসীদের এই বিপদে সাহায্য করতে পার, সহানুভূতি জানাতে পার। তোমাদের স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে তোমরা সকলে একজোট হয়ে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী খাদ্য বা অর্থ সংগ্রহ করে তা বিহার সরকারকে পাঠাতে পার। যারা বড় হয়েছ তারা অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিহারের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ত্রাণ কার্য্যে সহায়তা করবার জন্যে যেতে পার। অবশ্য তোমাদের লেখাপড়ায় ক্ষতি না হয় বা স্বাস্থ্যহানি না ঘটে তা বিবেচনা করে তবে ত্রাণকার্য্যে অগ্রসর হও। যারা দুর্ব্বল বা পড়াশুনার জন্য যারা সময় নষ্ট করতে পারবে না তারা যেন এই কষ্টকর ত্রাণকার্য্যে যেও না। অর্থ, খাদ্য,

বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে থরা পীড়িত অঞ্চলে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। তবে মনে রেখ এখানে ঐ সব জিনিষ সংগ্রহ করতে গিয়ে যেন কারুর ওপরই জুলুম করা না হয় বা চাপ দেওয়া না হয়। যে যা স্বইচ্ছায় দেবেন তাই গ্রহণ করবে। আর কোনও রকম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে নিজেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই ত্রাণ ও কল্যাণ-মূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করবে। এই রকম কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে তোমাদের সংগঠনী শক্তিকে তোমরা কাজে লাগাও। এতে তোমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও দুঃস্থ ও পীড়িত মানুষের শুভেচ্ছা লাভ করে ধন্য হবে।
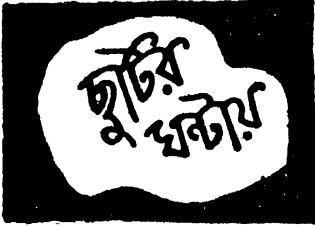
চিত্রগুপ্ত

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম—এই পঞ্চভূতের মধ্যে 'অপ্' বা 'জল' আর 'তেজ' বা 'আগুন'—এদের দুজনের পরস্পর-বিরোধী সম্পর্কের কথাও তোমাদের অজানা নয়। কাজেই কেউ যদি তোমাদের জলের বুকে আগুনের শিখা জ্বালিয়ে তুলতে বলে, তাহলে তোমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়ে বসবে যে এমন আজব-কাণ্ড কখনো সম্ভব হয় নাকি!

বাস্তবিকই, এমন আজব-কাণ্ড সচরাচর বড় একটা ঘটতে দেখা যায় না বটে···তবে বিজ্ঞানের রহস্যময় বিচিত্র-কৌশলে অভিনব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় এ-ধরণের অসম্ভব-ব্যাপারও খুব সহজেই সম্ভব করে তোলা চলে। কথাটা হয়তো তোমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। তাহলে শোনো, সে রহস্যের বিচিত্র-মর্ম্মটুকু তোমাদের জানিয়ে রাখি আপাততঃ।

জলের বুকে জ্বলন্ত-আগুনের শিখা জাগিয়ে তোলার অভিনব-কারসাজিটি নিজেদের হাতে কলমে পরখ করে দেখতে হলে, গোড়াতেই টুকিটাকি কয়েকটি বিশেষ-ধরণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা দরকার। অর্থাৎ, এই আজব-কারসাজিটি প্রত্যক্ষ করার জন্য জোগাড় করা চাই—এক-ডেলা 'রিফাইণ্ড্' 'পরিস্কৃত' চিনি বা (a lump of Refined Sugar), এক শিশি 'ফস্‌ফুরেটেড্ ঈথার্' (Phosphurated Ether) এবং এক গেলাস ফুটন্ত-গরমজল (a glass of warm water)।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই 'রিফাইণ্ড' বা 'পরিস্কৃত' চিনির ডেলাটির উপর কয়েক ফোঁটা 'ফস্‌ফুরেটেড্ ঈথার্' ঢেলে দাও। এবারে সেই 'ঈথার' ঢেলে-দেওয়া 'পরিস্কৃত চিনির ডেলাটিকে সযত্নে ডুবিয়ে রাখো গরম-জল-ভরা গেলাসে। এভাবে চিনির ডেলাটিকে গেলাসের গরম-জলে ডুবিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—বিচিত্র রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, ক্রমশঃ গেলাসের তলদেশ থেকে জলের উপরাংশভাগে জ্বলন্ত আগুনের শিখার আবির্ভাব ঘটছে। এ সময়ে গেলাসের গরম-জলের উপরাংশে যদি সযত্নে কায়দা করে মৃদু-ফুঁ (gently blown with the breath) দিতে পারো, তাহলে দেখবে যে গেলাসের জলে ছোট-ছোট ঊর্মিমালার শিয়রেই অপরূপ-ছন্দে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে নানান্ জ্বলন্ত-আগুনের লেলিহান শিখা।

এই হলো—জলের বুকে জ্বলন্ত আগুনের শিখা সৃষ্টি করার আজব কৌশল। তবে এ কারসাজিটি যে অন্ধকার জায়গায়ই দেখা যুক্তিযুক্ত—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামীবারে এমনি ধরণের আরেকটি মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। হিসাবের হেঁয়ালি:

প্রত্যহ সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটে পর্যান্ত একটানা মেহনতের পর, জমিদার-বাড়ীর বৈঠকখানাটি আগাগোড়া চূণকাম করতে কালু-রাজমিস্ত্রীর সময় লাগলো মোট তিনদিন। বৈঠকখানা-চূণকামের কাজ সেরে, কালু-রাজমিস্ত্রী স্থরু করলো—জমিদার-বাড়ীর জলসা-ঘর চূণকামের কাজ। জমিদার-বাড়ীর জলসা-ঘরটি বিরাট ···বৈঠকখানার চেয়ে দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ, প্রস্থে দ্বিগুণ এবং উচ্চতায়ও দ্বিগুণ মাপের। জলসা-ঘর চূণকাম করবার সময়ও কালু-রাজমিস্ত্রী আগের মতোই প্রত্যহ সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটে পর্যান্ত একটানা কাজ করে যেতো। বলতে পারো হিসাব কষে, এই নিয়মে কাজ করে জলসা-ঘরটি আগাগোড়া চূণকাম করতে কালু-রাজমিস্ত্রীর মোট ক'দিন লেগেছিল?···এ হেঁয়ালির সঠিক জবাব যদি চটপট আমাদের দপ্তরে লিখে পাঠাতে পারো তো বুঝবো তুমি সত্যিই বাহাদুর বটে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

তিন আখরে নাম তার—
রক্ষা করে দেহ···
পাখীর রূপ ধরে, যেই
প্রথম হরে কেহ!
তৃতীয়টি ছাড়লে, তারে
চটাশ্ চাপড় মারে···
তোমরা বলো দেখি, ভাই—
নামটি কিবা তারি!

রচনা: বাবুই মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

চৈত্র মাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' উত্তর:

১। অ।

গত মাসের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, অজিত, সঞ্জয় বুলু, মুরারি, শ্রীমতী, অমিয়, স্থনীল, নর্ম্মদা ও কনা (ভিলাই); বিজয়েন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, অজয়েন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ, কমলা ও গঙ্গা (হাজারীবাগ); সুদীপ, কল্যাণ শচীন, রঞ্জন, বিশ্বতোষ, ইন্দ্র, রবীশ, প্রতুল, পূর্ণিমা, নীলিমা, বিমান ও চন্দ্রিমা (কলিকাতা); ফণী, দোলন ও রোচনা সাহা (কলিকাতা); অশোক, সুস্মিতা, বাপি, বুকাম ও পিন্টু (বোম্বাই); রবি রায় (কলিকাতা); পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, নিপু ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); শর্মিলা, উর্মিলা, প্রমীলা, অজিতেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সমীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অণ্ডাল); সুধাংশু, অলকা, হিমাংশু, সুষমা, হারাণচন্দ্র, শোভনা, সীতাংশু, গোপা, মাধবীনাথ ও সুনন্দা সেন (জয়পুর); লোপামুদ্রা, অতনু, মেঘমালা, শতঞ্জীব ও সঙ্ঘমিত্রা রায়চৌধুরী (কলিকাতা); নিখিল, জ্যোতি, প্রমোদ, ভূপেশ, সুশীল, সুবোধ, নিরঞ্জন, সুনীল, কিরণ, সন্তোষ, সুরেন্দ্র, আভা, পূরবী, নন্দা, মোহিনী, কুন্দা ও নীরদ বসুমল্লিক (নিউ দিল্লী); শকুন্তলা, হরেন্দ্র, কাদম্বরী, ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও দীপেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ (কলিকাতা); দ্বিজেন্দ্র, রথীন্দ্র, মানবেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, সুবলচন্দ্র, জয়ন্তনাথ ও কামিনী মিত্র (কার্মাটার); রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা)।

আর না

শ্রীস্বরূপরতন সিংহ

সাত সমুদ্র তের নদী পারে
রাজকন্যা বন্দী পাষাণ পুরে।
দিন যে কেটে যায়—
কেবল নিরাশায়,
হায় কেউ না আসে মুক্তি দিতে তারে ॥
রাজার কুমার অজানা এক দেশে,
যাত্রা সুরু ক'রল বীরের বেশে।
ছুটিয়ে ঘোড়া টগ্‌বগিয়ে—
অনেক নদী বন পেরিয়ে,
দৈত্য ব'ধি রাজ কন্যা উদ্ধারিল শেষে ॥
উঠ লো বলে হঠাৎ একটি ছেলে—
আজকে দিনে এ সব না আর চলে।
দেশের রক্ষা তরে—
যুদ্ধ যারা করে,
বীর জোয়ানের সেই কাহিনী যাওগো

দাদু বলে ॥

"নাচাও কেন ভালুক নাচ
দাও না দেখি কেমন মাছ"

ফটো—রণেন ঘোষ।

ক্ষেত্রনাথ রায়
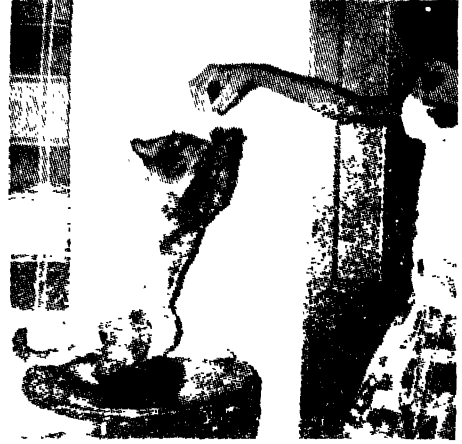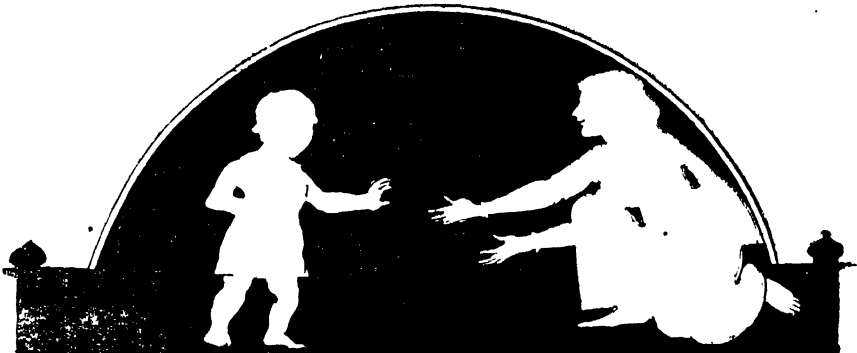
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা :

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ১৯৬৬-৬৭ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের খেলায় রাজস্থানের থেকে ৩০৪ রাণ বেশী সংগ্রহ করার দরুণ উপর্যুপরি ৯ বার রঞ্জিট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই জয় লাভের ফলে জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের এই দুটি রেকর্ড আরও বেশী পাকা-পোক্ত হল—সর্বাধিকবার জয় লাভের রেকর্ড (এ পর্য্যন্ত মোট ১৮ বার) এবং সর্বাধিকবার উপর্যুপরি জয়লাভের রেকর্ড (এ পর্য্যন্ত ৯ বার)। বোম্বাই যে ১৮ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে তার মধ্যে এই প্রথম সরাসরি জয়ী হল না—প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার ভিত্তিতে জয়ী হল। জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা। (১৯৩৫) থেকে ৩৩ বছরের খেলায় বোম্বাই এ পর্য্যন্ত ১৯ বার ফাইনালে খেলে ১৮ বার জয়ী হয়েছে—বোম্বাইয়ের একমাত্র পরাজয় হোলকারের কাছে ১৯৪৭-৪৮ সালের ফাইনালে।

আলোচ্য ফাইনাল খেলায় বোম্বাইদলের নতুন অধিনায়ক এম এস হার্দিকার টসে জয়ী হন; কিন্তু তিনি প্রথম ব্যাট করার সুযোগ না গ্রহণ করে রাজস্থান দলকে ব্যাট করতে দেন। প্রথম দিনের খেলায় রাজস্থান সাত উইকেট খুইয়ে ২৩৬ রান সংগ্রহ করেছিল। এই রানের মধ্যে দুই সহোদর ভাই সূর্য্যবীর সিং এবং হনুমন্ত সিং তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১৯৫ মিনিটের খেলায় ১৭৬ রান তুলে দলের মুখ রেখেছিলেন। রাজস্থান দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং তাঁর ১০৯ রানে ১৫টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে রাজস্থানের প্রথম ইনিংস ১০৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে বাকি তিন উইকেটে দলের ৪৬ রান উঠেছিল। রাজস্থানদলের প্রথম ইনিংস ২৮২ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বোম্বাই দুটো উইকেটের বিনিময়ে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। হাতে জমা ছিল প্রথম ইনিংসের আটটা উইকেট। অজিত ওয়াদেকার এবং দিলীপ সরদেশাই ১৪০ মিনিট সময়ে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১৮৬ রান সংগ্রহ করে খেলার গোড়াপত্তন পাকা করেছিলেন। সরদেশাই ১৬৫ (২৩ বাউণ্ডারী সহ) রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার এ বছরের খেলায় সরদেশাইয়ের এইটি ছিল দ্বিতীয় সেঞ্চুরী।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের আরও চারটে উইকেট খুইয়ে দ্বিতীয় দিনের ২৭২ (২ উইকেটে) রানের সঙ্গে ২৪৭ রান যোগ করে। ফলে রান দাঁড়ায় ৫১৯ (৬ উইকেটে) এবং বোম্বাই প্রথম ইনিংসের খেলায় রাজস্থানের থেকে ২৩৭ রানে অগ্রগামী হয়। হাতে জমা থাকে চারটে উইকেট। ওপনিংব্যাটসম্যান দিলীপ সরদেশাই ১৯৯ রান করেন। মাত্র এক রানের জন্যে তিনি 'ডাবল সেঞ্চুরী' থেকে বঞ্চিত হন। এই ১৯৯ রানই রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান। বোম্বাই দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাপু নাদকার্ণী এই ফাইনাল খেলায় ১০৩ রান করেন—রঞ্জি ট্রফির খেলায় নাদকার্ণীর এইটি দ্বাদশ সেঞ্চুরী।

চতুর্থ দিনে বোম্বাই ৫৮৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন বোম্বাই দলের অধিনায়ক হাদিকার সেঞ্চুরী (১০৮ রান) করেন। তাঁকে নিয়ে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসে তিনজন সেঞ্চুরী করেন। রাজস্থান ৩৪ রানের পেছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে দুই উইকেটের বিনিময়ে চতুর্থ দিনে ১৮২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

পঞ্চম দিনে অর্থাৎ ফাইনাল খেলার শেষ দিনে রাজস্থান দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৪৫ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় যখন সমাপ্ত ঘোষণা করে তখন আর মাত্র ৫০ মিনিট খেলার সময় ছিল। রাজস্থান প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের খুব ভাল খেলার দরুণ বোম্বাইয়ের পক্ষে খেলায় সরাসরি জয়লাভ সম্ভব হয়নি। রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সূর্য্যবীর সিং এবং হনুমন্ত সিং যে ২১৩ রান সংগ্রহ করেন তা রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় রাজস্থানের পক্ষে তৃতীয় উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়েছে। এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেই হনুমন্ত সিং এবং পার্থসারথি শর্ম্মা চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৬২ রান তুলে দিয়ে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভের পথ বন্ধ ক'রে দেন। রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন হনুমন্ত সিং (২১টা বাউণ্ডারীসহ অপরাজিত ২১৩ রান) এবং সূর্য্যবীর সিং (১৭টা বাউণ্ডারীসহ ১৩২ রান)। রঞ্জি ট্রফির খেলায় হনুমন্ত সিং এই নিয়ে আটটা সেঞ্চুরী করলেন। এবং তাঁকে নিয়ে চোদ্দজন খেলোয়াড় রঞ্জিট্রফির একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন।

রাজস্থান: ২৮২ রান (সূর্য্যবীর সিং ৭৯ এবং হনুমন্ত সিং ১০৯ রান। দেশাই ৪২ রানে ৩ এবং ভার্দে ৩৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪৪৫ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সূর্য্যবীর সিং ১৩২, হনুমন্ত সিং নট আউট ২১৩ এবং পার্থসারথি শর্ম্মা ৭৪ রান। সরদেশাই ১৫ রানে ২ উইকেট)

বোম্বাই: ৫৮৬ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দিলীপ সরদেশাই ১৯৯, বাপু নাদকার্নি ১০৩, এম এস হাদিকার ১০৮, অজিত ওয়াদেকার ৮৩ এবং ই ডি সোলকার ৫০ রান। সি জি যোশী ১৮২ রানে ৪ এবং রাজ সিং ৫৭ রানে ২ উইকেট)।

ও ৫৪ রান (২ উইকেট)

পক প্রণালী সন্তরণ:

ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং সার্ভিসেস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনায় প্রথম পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার বৈদ্যনাথ নাথ প্রথম স্থান এবং রেলওয়ের লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। পক প্রণালীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন এই প্রথম। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রখ্যাত সাতারু মিহির সেন একক চেষ্টায় ২৫ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে পক প্রণালী অতিক্রম করে দুরপাল্লার সাতারে আর একটি সাফল্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। ভারতবর্ষ এবং সিংহলকে ভারত মহাসাগরের যে জলরাশি বিচ্ছিন্ন করেছে তারই নাম পক প্রণালী। জলপথে ভারতবর্ষ থেকে সিংহলের দুরত্ব প্রায় ১৯'৪ মাইল। কিন্তু সাঁতারে এই জলপথের দুরত্ব স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পায়। সিংহলের তালাইমানা থেকে ভারতবর্ষের ধনুস্কোটি এই ছিল পক প্রণালী প্রতিযোগিতার আরম্ভ এবং শেষ। প্রতিযোগিতায় যে আটজন সাতারু ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র রামেশ্বরমের ভি কালীর সমুদ্রবক্ষে দুরপাল্লার সাঁতার দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল। এই আটজন সাঁতারুর মধ্যে মাত্র বৈদ্যনাথ নাথ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিকই লক্ষ্যস্থলে পৌছান। নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে বৈদ্যনাথ নাথ ১৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক ১৮ ঘণ্টা ১৫ মিঃ সময় নিয়েছিলেন। বৈদ্যনাথ নাথ হলেন ক্যালকাটা স্পোর্টস্ এসোশিয়েশনের সভ্য এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারী।

এম সি সি-র আজীবন সভ্য:

প্রখ্যাত মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব [সংক্ষেপে এম সি সি] ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুনের চুড়ান্ত রায় দেওয়ার সুপ্রীম কোর্ট। এই মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে আজীবন সভ্যপদে সম্মানিত করে থাকেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই তিনজন খেলোয়াড়কে এম সি সি-র আজীবন সভ্য করা হয়েছে—পলি উমরীগড় [বোম্বাই], পঙ্কজ রায় [বাংলা] এবং গোলাম আমেদ [হায়দরাবাদ]। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং বিজয় মার্চেন্ট এই সম্মান লাভ করেছেন।

ধর্ম্ম-পরিচয়ঃ অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুস্তকের লেখক অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারতবর্ষ" পত্রিকার পাঠকপাঠিকাদের কাছে অপরিচিত নন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি এই পত্রিকায় লিখছেন। এক্ষণে তাঁর পাঠ, সাধন ও অনুশীলন লব্ধ কয়েকটি বিষয়ে তাঁর শ্রবণ ও চিন্তনের ফল এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে যে সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অন্তর আলোড়িত করে থাকে, যেমন নিরাকার পূজা, অবতারবাদ, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি তাহা সমস্তই এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। লেখক স্বর্গত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহারই নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া তিনি যেমন স্বচ্ছ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন সেইমত এই পুস্তকখানির বিন্যাস করেছেন। অথচ এর মধ্যে উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির শিক্ষা সাহিত্যের দরবারে যেমন ভাবে অসম্প্রদায়িকভাবে পরিবেশন করতে হয় তাহাই করা হয়েছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারত ইতিহাসের কালান্তরকারী ধর্ম্ম সাধনার পর্য্যায়গুলির একটি সুন্দর চিত্রও পাওয়া যায়।

পুস্তকখানি দেড়শত পৃষ্ঠার উপর, তবুও মূল্য মাত্র দুই টাকা রাখা হয়েছে, যাতে ইহা জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইতে পারে।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য—২'০০]

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীঃ ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এম-এ, ডি-লিট্।

দিনের পরে দিন চলে যায় কোন বৈচিত্র্যের অনুভূতি না রেখে। তাদের মধ্যে অকস্মাৎ একটি দুর্লভ ক্ষণের আবির্ভাব হয় পরম সত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ক্ষুদিরামবাবুর বইটি পেয়ে এবং প'ড়ে পাঠকে মনে সেই অনুভূতিই জাগবে। অষ্টাধ্যায়ী এই মহৎ গ্রন্থে তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও রসানুভূতির যে সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য সমাবেশ সাধিত, তা প্রায় অলৌকিক। গ্রন্থের বহিরঙ্গ মুদ্রণপারিপাট্যে যেমন সুরুচিসম্মত, অন্তরঙ্গ তেমনি কাব্যসম্মিত কাব্যোপদেশে মাধুর্য পরিপ্লুত।

মহাকাশে অনাহত দিব্য বাকের যে-সূক্ষ্ম প্রায়-অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি আমাদের কানে ছন্দের প্রসাদে এসে উপস্থিত হয়, সেই নিতল নীল নীরবের মাঝে বেজে-ওঠা গভীর বাণীর শ্রুতিসুখ আমরা পেলাম অধ্যাপক দাস মহাশয়ের মনোরম রবীন্দ্রসাহিত্যবিশ্লেষণের মধ্যে। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি—তিন সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মনীষীপ্রবর রবীন্দ্রকাব্যের সংকেতিক সৌন্দর্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কাব্যসৌন্দর্যের মূলতত্ত্বগুলি সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ-বইটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অমূল্যসম্পদ তো বটেই, পণ্ডিত গবেষক ও অধ্যাপকের পক্ষেও এর সাহচর্য ছাড়া রবীন্দ্রসমীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

কোন এক বই সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা রোনাল্ড্ নিক্সন সাহেব বলেছিলেন: বইটি চুরি ক'রে পড়াও উচিত! আমরা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুদিরামবাবুর বই প্রসঙ্গে নির্ভয়ে সেই পরামর্শ দিই।

দু-একটি অসতর্ক মুদ্রণপ্রমাদ পরবর্তী সংস্করণে অচিরে সংশোধিত হবে, এই আশায় রইলাম।

[প্রকাশক—গ্রন্থনিলয়, ৪৮।১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১২'৫০

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জীবন-তত্ত্ব

শ্রীরাধাবল্লভ দে

প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর তিন প্রকার, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। এই ব্যষ্টি শরীরের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা জীবাত্ম রূপে বিরাজমান। চৈতন্যরূপী জীবাত্মার স্বরূপত্ব দেখাইবার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোষের কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থূল শরীর অন্নময় কোষাত্মক, সূক্ষ্মশরীর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক, এবং কারণ শরীর আনন্দময় কোষাত্মক। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ুকে লইয়া প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তির আধার কার্য্য-স্বরূপ। ইহারই প্রভাবে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে বচন, গমন, প্রভৃতি ক্রিয়ার আরোপ করা হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ লইয়া মনোময় কোষ, ইহাই ইচ্ছা শক্তির আধার এবং কারণ স্বরূপ। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে লইয়া বিজ্ঞানময় কোষ। এই বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা বলা হয়। কারণ ইহারই প্রভাবে অকর্ত্তা আত্মায় কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়। এই তিন কোষের একত্রীভূত নাম সূক্ষ্মশরীর। আর অজ্ঞান-প্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময় কোষ বলা হয়। ইহাই কারণ শরীর নামে উক্ত হয়। চৈতন্যরূপী জীবাত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ ও শুদ্ধচিৎ

স্বরূপ হইলেও ত্রিবিধ শরীরের সন্নিধি বশতঃ উহাদের ধর্ম্ম আত্মায় প্রতিফলিত হয়। উহারা জড়, পরাধীন প্রকাশ। উহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ না থাকিলেও চৈতন্যরূপী জীবাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশিত হয়। এই চৈতন্যরূপী জীবাত্মার প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণস্থ সত্বপ্রধান বুদ্ধির উপর প্রতিফলিত হয়। চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলিয়া ইহা চৈতন্য শক্তি বিরহিত নহে। ইহাই চিদাভাস নামে আখ্যাত। চৈতন্যযুক্ত হইলেও বুদ্ধিরূপ অবিদ্যাকৃত অবিদ্যা দোষে ইহা দূষিত। এই জন্যই আভাস চৈতন্য বা চিদাভাস বুদ্ধিরূপ উপাধির প্রভাবে নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বোধ করে। মানুষের মৃত্যু বলিতে এই চিদাভাসের সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরসহ স্থূল দেহত্যাগ, আর জন্ম বলিতে ইহাদেরই প্রত্যাগমনকে বুঝায়। যে মুহূর্ত্ত এই আভাস চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাস তার বিম্ব চৈতন্যের (শুদ্ধ চিত্তের) সহিত নিজের একতা আধারণ করিবে সেই মুহূর্ত্তেই ইহা অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং মানুষও তাহার জন্ম-মরণচক্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। মানব জীবনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই চিন্তার বিষয়।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। শ্বেতাশ্বতর ১৬.৮
পরমেশ নিজে ব্রহ্মারে হেথা আবার সৃষ্টি করে
তাঁহার হৃদয়ে বেদের জ্ঞানটি পুনরায় সঞ্চরে
প্রলয়ের কালে এভাবে আবার
পূর্ব্ব কালেতে বেদের প্রচার
করিলেন হরি তাঁহার মহিমা বলে বোঝানর নয়
তাঁর কৃপা হলে তাঁর লীলা তবে হৃদয়ঙ্গম হয়

মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ। (৩১)

জৈমিনি কন মধুবিদ্যায় অসম্ভব যে হয়
দেবতাগণের ব্রহ্মবিদ্যা তাই আয়ত্ত নয়
ছান্দোগ্য উপনিষদেতে বলে
"অসৌ আদিত্য দেবমধু বলে
সূর্য্যকে হেথা দেবমধু বলি বর্ণনা করিয়াছে
কিন্তু সূর্য্য মধু ভাবি নিজে উপাসনা নাহি যাচে।
মধু বিদ্যায় বসুরূপে সেথা পূজা তার করা হয়
মধু বিদ্যায় বসুর জানিও অধিকার কভু নয়।
উপাস্যদেব যে সব পূজাতে
তাঁর অধিকার নাহিক তাহাতে
মানবের দেখো কত অধিকার শ্রেষ্ঠ মানবতাই
ধন্য মানব শ্রেষ্ঠ মানব মানবের তুল নাই।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ (৩২)

জৈমিনি কন জ্যোতির্মণ্ডলে সূর্য্য যখন রয়
অচেতন তাহা, ব্রহ্মবিদ্যা অচেতনতরে নয়।
রামানুজ কন অন্য কথায়
উপনিষদের মাঝে দেখা যায়
তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি আয়ুর্হ উপাসতে মৃতম্
পরমাত্মাকে জ্যোতির জ্যোতি যে বলি দেবগণ কন।
এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় মধু বিদ্যার পরে
দেবতাগণের নাহি অধিকার শুধু মানবের তরে॥

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(উপন্যাস

দ্বিতীয় পর্ব

(দু'দিন পরে)

এক

কাশীতে গঙ্গার ধারে মহেন্দ্র ডাক্তারের সুরম্য নিলয়ে এসে ওরা আরো চমকে গেল। এই বিলাস ছেড়ে শান্তি দেবী প্রয়াণ করেছেন কিনা আলমোরার নৈমিষারণ্যে? প্রেমল দুটি বৎসর রোজ ভিক্ষা ক'রে চাল ডাল এনে স্বপাকে রেঁধে খেয়েছে! এ তো শুধু আখ্যানই নয়, তার উপর রোমান্স যে! ট্রেনে ললিতাকে অসিত ডাক্তারবাবু ও তারা তিন জনে মিলে কত প্রশ্নই যে করেছিল। প্রেমল ও তার গুরুমার আগেকার জীবনের সম্বন্ধে! প্রেমল তাতে মোটেই প্রসন্ন হয় নি। তিন চার বার টুকেছিল :

"সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। শাস্ত্রেও আছে যে, সেইদিনই আমাদের সত্যিকার জন্ম যেদিন গুরু দীক্ষা দেন। তার আগের জীবনের খবর জানতে চাওয়া কেন?" কিন্তু ললিতা ওকে আমল দেয় নি। বলেছিল: "তুমিই তো বলো বাপী যে, শাস্ত্র-শাস্ত্রীরা কী বলেছেন তার ঠিক অর্থ বুঝতে হ'লে আগে জানা দরকার কাকে বলেছেন, কবে বলেছেন আর কোথায় বলেছেন। তাই এযুগে শাস্ত্রের অনেক কথাই অমান্য করা বলে কারণ দেশ কাল পাত্র সবই বদলে গেছে।"

ফলে প্রেমলের আপত্তি সত্ত্বেও অসিত ট্রেনে ললিতার মুখে শুধু যে তার পূর্বাশ্রমের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাই নয়, অনেক কিছু বুঝবার কিনারায় এসেছিল যা আগে ও ঠিক ধরতে পারে নি। ললিতা ওদের বেশ ফলিয়েই বলছিল মহেন্দ্রবাবুর ইতিহাস।

বিচিত্র মানুষ! গুপ্তযোগী—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। নৈলে কি তিনি স্ত্রীকে ও মেয়েকে এককথায় ছেড়ে দিতে পারতেন—সংসারের সাজানো বাগান ছেড়ে তাদের বনবাসের প্রস্তাবে সায় দিয়ে? ললিতা তার সরল বিজ্ঞ সুরে বলেছিল: "সংসারীদের মধ্যেও অনাসক্ত মানুষ দেখা যায়—যদিও খুব কম, বিরল। আর বিরল ব'লেই না এত দামী! মা বাবাকে গভীর ভক্তি করেন কি সাধে দাদু? বলতে কি মার মুখেই শুনেছি যে বাবাই ছিলেন ওঁর প্রথম গুরু—বৃন্দাবনের বাবাজি পরে মাকে গ'ড়ে পিটে নিতে পেরেছিলেন বাবা তাঁর মনকে বৈরাগ্যের রঙে আগে রঙিয়ে তুলেছিলেন ব'লেই না!"

তারা তাঁর উদ্দেশে কপালে হাতজোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বলেছিল: "এমন মানুষ সংসারে দুচারটে দেখা যায় ব'লেই ভাই আজও চন্দ্রসূর্য উঠছে। আমার দাদামশায়ও ছিলেন এম্‌নি মহাপুরুষ। তাঁর একটিমাত্র ছেলে যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যায় রামকৃষ্ণ মিশনে তখন তিনি তাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। কিন্তু হ'লে হবে কি—"বলেছিল তারা সরল ভাবেই—"আমার দিদিমা কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্র ক'রে বলেছিলেন, 'কৃতার্থ হয়েছি বটে বাবা, কেবল বংশলোপ হ'ল ভেবে ভয় করে পাছে আমার সাতপুরুষকে পুন্নাম নরকে যেতে হয়।'

শুনে প্রেমলের সে কী হাসি! বলেছিল: "দিদি, একটা নতুন দুশ্চিন্তায় ফেললে তুমি। এক পুরুষ হ'লেও বা কথা ছিল, কিন্তু উপরওয়ালা সাত পুরুষকে নরকে গরম তেলে ভাজা হবে দেখলে আমার মাকে হয়ত যুধিষ্ঠিরের মতনই বলতে হবে: 'আমি তাঁদের দুঃখের সরিক হ'তে নরকেই বসবাস করব।'

অসিত বলেছিল মিঠে মিঠে: "সাধু, সাধু, কারণ তাহ'লে যুধিষ্ঠিরের মতনই তোমার মাতৃদেবীর নরকদর্শনে তাঁরা সবাই সরাসরি ইন্দ্রের বিমানে ক'রে উড়ে গিয়ে স্বর্গের গঙ্গায় স্নান ক'রে দেবদেহ পেয়ে নন্দন কাননের শালিমার পার্কে নিশ্চয় মলয় হাওয়া খেয়ে জুড়োবেন।"

তারা একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়তে প্রেমল তাকে মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের কথা বলে: কী ভাবে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। বলেছিল: যুধিষ্ঠির স্বর্গে পৌঁছে তাঁর ভাইরা নরকে তেলেভাজা হচ্ছেন শুনে রুখে উঠে বলেন: স্বর্গে তিনি একলা সুখে না থেকে নরকে ভাইদের দুঃখের শরিক হ'য়েই থাকবেন। ভাবো দিদি, একবার ভাবো মহত্বে: এমন কল্পনা কি আর কোনো কবি করতে পেরেছেন?

অসিত টুকেছিল: "বটে। কেবল আমার মনে হয়—যুধিষ্ঠিরের মহত্তর অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল যখন ধর্ম কুকুর হ'য়ে স্বর্গের পথে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। এ-অপূর্ব কাহিনীটি আমি যতবার পড়ি আমার চোখে জল আসে। সশরীরে স্বর্গে পৌঁছাতে যেয়ে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সঙ্গে চললেন ধর্ম কুকুরের ছদ্মবেশে। পথে সবাই এক এক ক'রে প'ড়ে গেলেন—ফলে শেষে স্বর্গে পৌঁছলেন কেবল যুধিষ্ঠির আর ঐ কুকুর। পড়েছ তো?"

তারা: না দাদা, বলুন না—কী হ'ল তারপর?

অসিত: বড় মধুর ছবি দিদি! আমি গুরুবাদ বুঝি না, কিন্তু মহত্ত্বের এমন ছবিতে প্রাণ দুলে না ওঠে কার? হ'ল কি শোনো।

যুধিষ্ঠির শুধু আশ্রিত কুকুরটিকে নিয়ে স্বর্গের গেটে পৌঁছাতে ইন্দ্র বললেন যে স্বর্গে পৌঁছানোর একটি মাত্র সর্ত হচ্ছে কুকুরটিকে ত্যাগ করা। উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন যে, আশ্রিতকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ করবেন না এইই হ'ল তাঁর 'নিত্যব্রত'।

তারপর সে কী ড্রামাটিক ডায়ালগ, দিদি! ইন্দ্রও ছাড়বেন না—(কুকুর কেমন ক'রে স্বর্গের পাসপোর্ট পাবে?) যুধিষ্ঠিরও নাছোড়বান্দা: "নিজের নিটোল সুখের লোভে কেমন ক'রে আশ্রিতকে খেদিয়ে দেব?" শেষে ইন্দ্র জেরা ধরলেন: "তুমি পথে চার ভাই ও স্ত্রী দ্রৌপদীকে ছাড়তে পারলে, অথচ এ কুকুরটিকে ছাড়তে পাচ্ছ না এ কেমন মোহ? তোমার স্বর্গের পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াল কিনা এক কুকুর!!"

যুধিষ্ঠির অম্লানবদনে বললেন: "তোমার উপমা ভুল হ'ল দেবরাজ! কারণ তুমি জানো—এ-জগতের বিধান এই যে, মৃতদের সঙ্গে সহবাস হ'তে পারে না। আমার গতাসু স্বজনদের বাঁচাবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাছাড়া আমি তাঁদের ত্যাগ করেছি তাঁদের মৃত্যুর পরে—আগে নয়। কিন্তু এ কুকুরটি এখনো জীবিত—তথা আমার আশ্রিত, তাই একে যে আমি ছাড়তে চাইছি না কোনো মোহের জন্যে নয়—ছাড়লে ধর্মভ্রষ্ট হব ব'লে।"

শুনে কুকুরটি নিজমূর্তি ধারণ ক'রে ধর্মের রূপে যুধিষ্ঠিরকে বললেন: মহারাজ, আমি তোমাকে একবার বক হয়ে পরীক্ষা করেছিলাম দ্বৈতবনে। তুমি সে-পরীক্ষায় পাশ করেছিলে। আজ আবার পাশ করলে। তাই পেলে 'দিব্যাং গতিমনুত্তমাম্' কি না পরম পদ।

প্রেমল: সাধু সাধু অসিত! তাই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি: তুমিও সংশয়ের পরীক্ষা পাশ ক'রে গুরুচরণে শরণ নিয়ে পাবে 'দিব্যাং গতিমনুত্তমাম্।'

দুই

অসিত সাত আট বৎসর আগেও একবার শান্তিদেবীকে দেখে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে। শুনেছিলও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা—ভালো তথা মন্দ। কেউ কেউ বলত: "কী কাণ্ডকার! অল্ট্রা মডার্ন মোটেই! হাসি গল্প নাচ গান সিগারেট কিছুতেই পেছপাও নন। সাহেব মেমদের সঙ্গে সমানে মেশেন কী বেপরোয়া চঙে!" আর একদল বলত: "বড় বেশি মেমসাহেবিয়ানা বাপু! বরদাস্ত হয় না! বিশেষ মেয়েদের সিগারেট খাওয়া 'বব্‌ড হেয়ার' ওবঙ্গধটি ক'রে শাড়ী পরা..." ইত্যাদি ইত্যাদি। তার বাইরের চেকনাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও মন টানে নি। বরং মহেন্দ্রবাবুকে বেশি ভালো লেগেছিল। বিলিতি হ্যাট কোট পরেন বটে। কিন্তু যেমন নিপুণ ডাক্তার, তেমনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—নির্লোভ, অমায়িক, দাতা...নানা গুণ তাঁর—বলত সবাই একবাক্যে। কেবল কেউই জানত না যে, তিনি গুপ্তযোগী। অসিত শুধু শুনেছিল—কে এক বিত্তশালী বন্ধু ওঁকে গুরুবরণ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন সাত লক্ষ টাকা। সেই টাকা থেকেই দুলক্ষ টাকা দিয়ে তিনি

কাশীর প্রাসাদ কেনেন গঙ্গাতীরে—গঙ্গাস্নানে তিনি গভীর আনন্দ পেতেন ব'লে। বৃন্দাবনে একবার অসিত প্রেমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল সাহেব মানুষের এমন গঙ্গা-প্রীতি হ'ল কেমন ক'রে? তাকে প্রেমল শুধু বলেছিল: "মানুষের বাইরেটা দেখে তাকে বিচার করতে নেই। গুপ্ত যোগী সাহেবদের মধ্যেও দেখা যায়।"

তারপর এর ওর তার কাছে শুনেছিল—এমনি জনশ্রুতি—যে, তাঁর নাকি এক মহাত্মা গুরু আছেন তিব্বতে। শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—থিয়জফিষ্টদের সম্বন্ধে কত রকম উদ্ভট কথাই তো শোনা যায় তবে ও এসব কথা নিয়ে বেশি মাথা বকায় নি, তার না ছিল প্রয়োজন, না অবকাশ। গান শোনা শেখা আর গাওয়া এই তিনটি প্রেমের চাপে ও ফুরসৎ পেত না এসব হাবিজাবি জনশ্রুতির তদন্ত করবার। কেবল একবার শুনেছিল কোনো সংবাদদাতার কাছে যে, মহেন্দ্রবাবুকে কেউ কখনো মিথ্যা বলতে শোনে নি এবং এক প্রখ্যাত ইংরাজ মহিলা, জননেত্রী, তাঁকে নাকি গুরুর মতন ভক্তি করতেন—এত ভক্তি যে তাঁকে এই গুরুকল্প গুপ্তযোগীর জুতোর ফিতে বেঁধে দিতেও দেখা গেছে। ও একটু ভেবেই ডিশমিশ—গালগল্পকে ডিশমিশ ক'রে দিয়েছিল: গুজবের মাইক্রোফোনে তো কত কী-ই ফেঁপে ওঠে। তা ছাড়া মানুষ যে শ্রোতাদের চমকে দিতে অনেক কিছুই স্রেফ বানিয়ে বলে কে না জানে?

কিন্তু তবু যেদিন শুনেছিল যে, এক সাহেব প্রফেসর কেম্‌ব্রিজ থেকে ট্রাইপস পাশ ক'রে এসে শান্তিদেবীর শিষ্য হয়েছেন, তখন একটু অবাক্‌ হয়েছিল বৈ কি। অতঃপর আরো অবাক্ হয়ে ছিল শুনে যে মহেন্দ্রবাবু কাশীতে গঙ্গাতীরে এক চমৎকার প্রাসাদ বাড়ী কিনে শুধু যে কাশীবাসী হয়েছেন তাই নয়, স্ত্রী শান্তিদেবীকে তার সাহেব শিষ্যকে নিয়ে সন্ন্যাস জীবন বরণ করতে অনুমতি দিয়েছেন। তারপরের খবর আরও চমকপ্রদ: শান্তিদেবী সন্ন্যাসিনী হ'য়ে মাথা মুড়িয়ে আলমোরার এক গহন অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে বৈষ্ণব সাধনায় ব্রতী হয়েছেন! এ এক অদ্ভুত পরিবার বৈ কি—মনে হয়েছিল আরো ললিতাকে দেখার পরে!

কিন্তু ওর সব চেয়ে অবাক লেগেছিল ভাবতে—ফ্যাশনেবল শান্তিদেবী কেমন ক'রে প্রেমলের মতন অসামান্য প্রতিভাধরের গুরু হ'য়ে ওকে ছিনিয়ে নিলেন ইনটেলেকচুয়াল জীবনের লোভনীয় রামরাজ্য থেকে! যে মানুষ হেসে খেলেই পণ্ডিত গবেষক হ'য়ে কৃতকৃত্য হ'তে পারত—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে রাজসম্মান পেতে পারত দেশগুণিজনদের কাছে, সে কিসের টানে স্বদেশ স্বজন স্বভাষা সবার উপর শ্বেত সংস্কৃতির আত্মাভিমান ছেড়ে পরাধীন জাতির এক শ্যামচর্ম গৃহিণী গুরুকে এমন নির্বিচারে বরণ ক'রে তার পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে পারল? অসিত বৃন্দাবনে ললিতার কাছে এ-খবরও পেয়েছিল—ললিতা বেশ ফলিয়েই বলেছিল—যে একাধিক গৌরাঙ্গিনী স্বদেশিনী প্রেমলকে বরণমালা দেবার জন্যে আকুলি বিকুলি করে কিন্তু ও তাদের সঙ্গে সুভদ্র ব্যবহার করলেও তাদের দিকে ফিরেও তাকায় নি—তাদের কাউকে আস্কারা দেওয়া তো দূরের কথা—যার সুভদ্র সাহেবি নাম ফ্লার্টেশন। অথচ এ-ও সত্য নয় যে, প্রেমল নারীলাবণ্যের সমঝদার ছিল না। ছিল ব'লেই ওকে আরও সতর্ক হ'তে হয়েছিল—পাছে এ-সাংঘাতিক দ-য়ে ম'জে ওর প্রাণশক্তির অপব্যয় হয়। বারবারই ও অসিতকে বলত একটি কথা—যা শুনে শুনে অসিতের মনে আরো গেঁথে গেছে: যে জিতেন্দ্রিয় না হ'লে পূর্ণজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ হওয়া অসম্ভব। "কারণ"—বলত প্রেমল ওর স্বচ্ছ ভঙ্গিতে—"মানুষের প্রাণশক্তির মূল হ'ল তার রেতস্, বীর্য। সেই বীর্যপাত হ'লে রেতস্ কখনোই ওজস্-এর কোঠায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সার্থক হ'তে পারে না। আর ওজস্-এরও-দুর্লভ বিকাশ বিনা আমাদের মত স্বভাবের রূপান্তরের আশা দুরাশা। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে মহাসাধক তথা সাধু-সন্ত মুনিঋষি সবাই একবাক্যে ঘোষণা ক'রে এসেছেন যে, ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ হ'তেই পারে না।" ওর বিশেষ প্রিয় ছিল ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে দহরবিদ্যার ব্যাখ্যা—যেখানে বলা হয়েছে: "ব্রহ্মচর্যেন হ্যেবাত্মানম্ অনুবিন্দতে"—ব্রহ্মচর্যের আলোয়ই ব্রহ্মকে খুঁজে পেতে হবে।

অসিত দেখেছিল বৃন্দাবনে বহু বৈষ্ণবীই ওকে প্রণাম করতে এসে নানা সূক্ষ্মভাবে হাতছানি দিত—যার মর্মজ্ঞ হ'তে দিব্যদৃষ্টির দরকার করে না। এদের মধ্যে একটি সুন্দরী ওকে নির্জনে তার সাধনার কথা বলতে চেয়েছিলেন। উত্তরে প্রেমল বলেছিল ভদ্র কিন্তু দৃঢ়স্বরে: "মা, আমি

একলা কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করি না। তুমি বলতে পারো তোমার যা বক্তব্য—কিন্তু ললিতার থাকাই চাই।" পণ্ডিতা একটু ঠেস দিয়েই বাঁকা হেসে বলেছিলেন: "কিন্তু আপনার মতন সিদ্ধ মহাত্মাও যদি সহজিয়া হ'তে না পারেন তাহলে কার কাছে সহজিয়া তন্ত্রের পাঠ নেব?" তাতে প্রেমল বলেছিল: "প্রথম কথা, আমি সিদ্ধ মহাত্মা নই, জিজ্ঞাসু সাধক মাত্র—আর সাধকের অধিকার নেই সিদ্ধেই চালে চলবার। দ্বিতীয় কথা, যদি সিদ্ধ মহাত্মা হইও কোনোদিন, তাহ'লেও গুরুর নির্দেশই চলব। তিনি আমাকে বলেছেন কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে হ'লে ললিতাকে ডাক দিতে।" একথায় সুন্দরী পণ্ডিতা ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব্যঙ্গের তীরন্দাজি করতে চেয়েছিল: "কিন্তু ললিতা দিদি কি তাহ'লে পুরুষ বন্ধু?" প্রেমল বলেছিল: "ও আমার মেয়ে। কিন্তু ওকেও আমি বরণ করেছি—গুরুরই নির্দেশে।" সে বলেছিল: "মানে রক্ষাকবচ?" প্রেমল বলেছিল: "তাও বলতে পারেন, আমার মানহানি হবে না মা। কারণ আমি অনেক পোড় খেয়ে শিখেছি যে, সাধক অবস্থায় নিজের মনের জোরকে বড় ক'রে দেখা কোনো কাজের কথা নয়। যেমন যে ভাবে সে জানে, সে জানেনা—বলেছেন বেদ—তেমনি বলা চলে যে, যে ভাবে সে সবল দুর্বলতা তাকেই পেয়ে ব'সে চক্ষের নিমেষ before one can say Jack Robinson." তবু সে নাছোড়বান্দা জেরার সুর ধরেছিল: কিন্তু তারাদির কাছে শুনেছি—ললিতাদি নিজে পুরুষদের ঘরে অনেক রাতেও একলা কথাবার্তা কইতে ভয় পান না।" (তারা শুনে পরে দুঃখ করেছিল যে সে একথা কথায় কথায় তাকে ব'লে ফেলেছিল আচম্কা) প্রেমল হেসে উত্তর দিয়েছিল: "ওর কথা আলাদা মা! অধিকারিভেদে ব্যবস্থাও আলাদা হয়। ললিতা মস্ত আধার—ভোরবেলায় তোলা মাখন—সরলতা ও নির্মলতা যার সহজাত কবচকুণ্ডল, তার কথা যেতে দাও;—না আর না মা, তবে একটা কথা বলি: তুমি যদি তোমার সাধনার সম্বন্ধে কোনো সাহায্য চাও তো ওকেই বোলো। এসব ক্ষেত্রে গুরুর কাছে দরবার করাই সবচেয়ে ভালো, তবে গুরু যদি না থাকেন তবে সাধনায় কো-এডুকেশন যত কম হয় ইভলিউশনও ততই বেশি হয়। আমি চলি মা—আমাকে যমুনাস্নানে যেতে হবে।"

এরকম যে কত ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনা ঘটেছে যা থেকে অসিত শুধু যে প্রেমলকে চিনতে পেরেছে তাই নয়, দেখতে পেয়েছে ললিতার আধার কত নির্মল। ওর মনে পড়ে সতীর কথা। কিন্তু সে তো এখন স্বামীর কাছে শিলঙে। কী ভাবে সাধনা করছে কে জানে? কেবল মনে পড়ে—সেও ছিল এমনি স্বভাব-নির্মলা—অন্ততঃ বিয়ের আগে। এখন তার কী অবস্থা জানতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মনে আলো হ'য়ে ওঠে প্রেমলের আন্তরিকতা আর গুরুভক্তি। আন্তরিকতা মন টানে, গুরুভক্তি জাগায় চমক। আন্তরিক মানুষ ও আরো দেখেছে, কিন্তু এমন গুরুভক্তির কথা বইয়ে পড়লেও চোখে দেখবার কখনো সৌভাগ্য হয় নি। গুরুবাদে অবিশ্বাস সত্ত্বেও ও মনে মনে সত্যিই প্রণাম করে ভগবানকে যে, তিনি এ-হেন আশ্চর্য গুরুভক্তকে চাক্ষুষ করবার সুযোগ দিলেন ওকে। ক'জন পায় এমন বিরল সুযোগ? ওর মনে পড়ে সতীর একটি কথা: সে-ও দেখতে চেয়েছিল এমন কোনো বুদ্ধিমান চক্ষুষ্মান সাধককে যে এক কথায় গুরুর চরণে শরণ নিয়ে বলতে পারে: "গুরুর মধ্যে আমি ইষ্টকে দেখেছি।"

প্রেমল দেখেছে কি? ওকে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন সাহস হয় নি। হয় নি ঠিক কী জন্যে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উত্তর পায় বিদ্যুৎ ঝিলিকে: যদি ধরো ও শোনে সে দেখেছে—তাহ'লে তো আর বলতে পারবে না যে, গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন এ-রটনা একটা গুজব মাত্র। ও চায় এ-রটনা গুজবই থাক। এ যে গুজব নয়, কোনো সত্যনিষ্ঠ মহাসাধকের প্রাণে-পাওয়া সত্য একথা জানলে ওর মন ক্লিষ্ট হয়, ভয় পায়, তাই জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় নি। হায় হায়! এর নাম কি সত্যার্থী, জিজ্ঞাসু?

[ক্রমশঃ

জাগৃহি ভগবান

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

১

ধরণীর ধূলি হল পবিত্র ধন্য এ ধরাধাম ;
যুগে যুগে তিনি আসিলেন হেথা অমরার ভগবান।
আসিলেন তিনি শুনাতে ধরায় নবীন জীবন বেদ,
শঙ্কা ভাঙিতে, অশুভ নাশিতে, তরিতে ধরার ক্লেদ।
কতবার তিনি এসেছেন নিজে ধরিয়া নরের বেশ ,
কতবার তিনি পাঠালেন দূত নাশিতে নরের ক্লেশ।
প্রতিবার আসি শুধালেন তিনি, "ভ্রান্ত পথিক শুন,
কোথা চলিয়াছ ভুল পথ ধরি ঠিক পথে এস পুনঃ।
তোল দেখি আঁখি। চিনিতে কি পার?
আমি চির প্রিয়জন ;
তোমাদের মাঝে আমার প্রকাশে চলিছে মহাজীবন।
কেন তোমাদের আকুল কণ্ঠ? নয়নেতে কেন লোর?
অমৃতের শিশু কেন তোমাদের এই মোহ ঘুম ঘোর?
কেন তোমাদের সুপ্তিমগ্ন স্বপ্ন জড়িত আঁখি?
উত্তিষ্ঠত! চও জাগ্রত! মোরে বিশ্বাস রাখি
কর্ম সায়রে ঝাঁপ দাও সবে, হওনাক উচাটন ;
ফলাফল সব খোলা প্রাণে কর আমারে সমর্পণ।
নিষ্কাম যদি কর্ম তোমার জেন তবে নিশ্চয়,
মৃত্যুর পরে লভিবে অমৃত হবে হবে তবে জয়।"
মোহঘুম ঘোর হইতে উঠিয়া তন্দ্রা জড়িত চোখে
দেখে সম্মুখে নররূপ ধরি নারায়ণ অনিমেখে
রয়েছে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস কণ্ঠে দৃপ্ত বাণী ;
ভুবন আলোকে গিয়েছে ভরিয়া নিঠুর তমসা হানি।
"হের বন্দিনী জানকী কাঁদিছে রাবণের কারাগারে!
হের দেবকীরে শঙ্কামগ্ন কংস অত্যাচারে!
হের চারিদিকে স্বার্থপরের কানাকানি দাপাদাপি,
নিঃশ্বাসটুকু করেছে রুদ্ধ বক্ষ ধরেছে চাপি।
নাগিনীরা সবে উগরে গরল ধরার ধ্বংস লাগি ;
উঠ উঠ জাগ বীর্যবন্ত সকল সুপ্তি ত্যাগি!
হের ওই দূরে চলিছে বৃদ্ধ জরায়গ্রস্ত দেহ।
শোন তব কাছে কাঁদিছে দুখিনীনাহি তার কোন গেহ!
শোন হাহাকার উঠিছে কেবল অন্ন নাহিক মুখে ;
সন্তান হারা কাঁদিছে জননী শেষ নাই তার দুখে।
হের চারিদিশি গিয়েছে ভরিয়া অবিদ্যা কালো মেঘে ;
বলদর্পীর ভ্রান্ত আদেশে স্বার্থ চিন্তা শেখে।
লাঞ্ছিত আর অপমানিতের কণ্ঠ রুদ্ধ আজ ;
দুঃখ সবার হইবে হরিতে এই তোমাদের কাজ।"
জেগে ওঠে প্রাণ, সেই আহ্বান আকুল
করিল চিত্ত ;
ভ্রান্ত ধরায় ধ্রুব নির্দেশ শাশ্বত আর সত্য।
শমন-শাসন মহা যজ্ঞের প্রভু নিজে পুরোহিত,
মানব শত্রু হল পরাভূত জাগে নব সম্বিৎ।
মহা শ্মশানের সেই হোমানলে ঝলসিয়া উঠে নেত্র
নূতন সমাজ, নূতন জীবন, নব প্রভাতের সূত্র।

২

এমনি করিয়া যুগ যুগে তিনি অথবা তাঁহার দূত
বাঁচালেন ধরা নিজের সৃজন অপরূপ অদ্ভুত।
জাগ জাগ দেব হয়েছে সময় এসেছে আবার লগ্ন,
তব সন্তান ভুলিয়াছে পথ আবার স্বার্থ মগ্ন।
বলদর্পীর ক্রুর নিঃশ্বাস ; কূটনৈতিক চালে,
বিশ্ববাসীর অতিষ্ঠ প্রাণ চিন্তার রেখা ভালে।
বিজ্ঞান বলে সৃজিছে মানব নূতন মারণ অস্ত্র ;
ধ্বংস যজ্ঞে কার কত বল তাই আজ শুধু সত্য।
তণ্ডুল কণা নাই যার ঘরে সেও যদি চায় ভিক্ষা
আগে দলে নিয়ে তারপর দান এই হল আজ শিক্ষা।
আগে আসে তাই গোলা ও বারুদ তারপর আসে ধান্য
তিক্ত কষায় কটু হয়ে যায় ভিক্ষালব্ধ অন্ন।
গোলায় তোমার কত ধান আছে? গোয়ালে কত গরু?
কত বিদ্যার তুমি অধিকারী? করেছ কি তুমি সুরু
নতন জ্ঞানের নব উন্মেষ? লভেছ কি নব সত্য?
এসব প্রশ্ন জাগে নাক প্রাণে ; এসব নহেক নিত্য।
কত অর্থের তুমি ভাণ্ডারী? বোমা কত হাতে আছে?
এই দিয়ে আজ চলিছে বিচার কেবা আগে কেবা পিছে।
বিজ্ঞান বলে বৃহৎ বিশ্ব হয়ে গেছে একাকার ;
মনের ভ্রান্তি তবুও কাটেনি, কাটেনি অন্ধকার।
যার যাহা আছে তাই নিয়ে আর মেটে না মনের সাধ ;
নানা পথ আর নানা মত নিয়ে কেবল বিসম্বাদ।
পঞ্চশীলের শান্তির বুলি তোলে যাঁরা শুধু মুখে ;
বাঘিনীর ন্যায় ওৎ পেতে রয় রক্ত তিয়াস বুকে,
রাবণের মত, কংসের মত, কশিপুর মত কারা
রচনা করিয়া, তব সঙ্কেত দলিত করিছে যারা,
ভুলে গেছে যারা শুধু দেশ নয় পৃথিবী জন্মভূমি,
পৃথিবীর লোক সব ভাই বোন ধারক তাদের তুমি,
বক্ষে যাদের ছলের চাতুরী মুখে শান্তির গান
তুমি কি তাদের ক্ষমা করে যাবে? জাগৃহি ভগবান।
বক্ষ কটাহে স্নেহ উত্তাপ সুধা প্রস্তুত করে
বিতর আবার, নিজের কণ্ঠ হলাহলে নাও ভরে।
তব আহ্বানে বিশ্ব প্রেমের উঠুক জয়ধ্বনি ;
শেষ হয়ে যাক সকল বিবাদ কাড়াকাড়ি হানাহানি।
ভ্রান্তি হারক, তমো বিনাশক ওগো বিশ্বের প্রাণ,
চির লীলাময় নিত্য নূতন জাগৃহি ভগবান।

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনুমান করা যায় যে, বৈদিক যুগে আর্যভাষা অল্পসংখ্যক হলেও কয়েকটি উপভাষায় বিভক্ত ছিল। কাশ্মীর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত যে-এলাকায় আর্যরা উপনিবিষ্ট ছিলেন, সে-এলাকা এত বড় যে, এখনও সেখানে কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি (হিন্দকি ও পূর্ব পাঞ্জাবি দুই উপভাষা সমেত), ডোগ্‌রি, গুজরি, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষা বর্তমান তাদের নিজস্ব উপভাষাগুলিশুদ্ধ যানবাহন ও চলাচলের সুব্যবস্থা সত্ত্বেও। তখনকার দিনে নানা কেন্দ্রে দলে দলে ছড়িয়ে-থাকা আর্যরা নানা উপভাষায় কথা বলবেন, এটা স্বাভাবিক। তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, সাহিত্যচর্চা, সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান ও অনুরূপ নানা বহুজনসংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে একটি সর্বজন গ্রাহ্য সর্বজন-অনুমোদিত আদর্শ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ভাষার প্রয়োজন হয়। এই ভাষাটি গঠিত হল ত্রয়ী বেদগ্রন্থে, যার নাম বৈদিক ভাষা। এর ব্যাকরণ যিনিই প্রথম সূত্রবদ্ধ ক'রে থাকুন, এই ত্রয়ী বেদগ্রন্থ সঙ্কলক-সম্পাদকের উপাধি ছিল বেদব্যাস।

বৈদিক ভাষা তাহলে তৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন ভারতীয়-আর্য উপভাষার বিধিবদ্ধ মার্জিত সাহিত্যিক রূপ। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের গদ্যভাষা থেকে তখনকার শিষ্ট অভিজাত আর্য পুরুষদের কথ্য বা মৌখিক ভাষা কেমন ছিল, তার খানিকটা আভাসও পাওয়া যায়। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যের গদ্য যে সাধুভাষার গদ্য, তা ধরে নিলে দোষ হবে না। কিন্তু তখনকার কালের চলিত ভাষা বা তার ভিত্তিতে গঠিত নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্যে লিখিত গদ্যভাষাও যে অনেকটা ঐ ছাঁচের হবার কথা, তা ধারণা করা যেতে পারে।

সুতরাং বৈদিক যুগে বৈদিক সাহিত্যের তুল্য ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের কথ্যভাষা ছিল ; কিন্তু ব্যাকরণবদ্ধ অতি উন্নত বৈদিক ভাষায় সাধারণ লোকে কখনই কথা বলতে পারত না। কোন দেশে কোন কালেই বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত ভাষায় কোন জাতি কোন কথা বলে না। বিশুদ্ধ ব্যাকরণবদ্ধ ভাষা সাহিত্যের কাজে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। লোকমুখে ভাষাটি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে যায়। কিন্তু যে-উপভাষাগুলোর মার্জিত রূপ ঐ ব্যাকরণ-সম্মত ভাষা, লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে বহতা নদীর মতো এগিয়ে চলে। সুতরাং ঋগ্বেদ প্রভৃতির ভাষা ধর্মকার্যে, সাহিত্যে ও অনুরূপ সাধারণসংক্রান্ত বৃহৎ অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হলেও ক্রমশ বৈদিক ভাষা অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার ভিত্তি যে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য উপভাষাগুলো, সে-সব লোকমুখে চলতে চলতে বদলে যেতে লাগল। অনড় অপরিবর্তনীয় বৈদিক ভাষা স্থিরভাবে অপ্রচলনের মৃত্যুবরণ করল বটে, কিন্তু ভারতে আর্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার নানা উপভাষার নতুন নতুন রূপ গ'ড়ে উঠতে থাকল। প্রায় হাজার বছর পরে যখন প্রচুর সংখ্যক অনার্য আর্য সভ্যতা গ্রহণ করল, তখন তাদের মুখে মুখে প্রচলিত আর্য উপভাষাগুলো ভেঙে গিয়ে নতুন ও বিকৃত নানা রূপ গ্রহণ ক'রে পুরাতন ও প্রকৃত রূপের সঙ্গে অসুন্দর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করল। এর ফলে একদিকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা লোকমুখে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা-স্তরে উন্নীত হল যার ভাষাকারীরা খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছরকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল, অন্য দিকে সর্বভারতীয় সংযোগরক্ষার জন্যে এক নতুন শিষ্ট ভাষার গুরুতর প্রয়োজন উপলব্ধ হল। তখন সারা আর্য-ভারতের বিভিন্ন উপভাষার একটি মার্জিত ও শিষ্টরূপ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের উপযোগী ক'রে সংস্কারের দ্বারা গঠন

করা হল। তার নাম সংস্কৃত, যার সংস্কারকার্য সুসম্পন্ন। এই সংস্কার যিনি সাধন করেন, তিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ চিরস্মরণীয় পাণিনি।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর সময় সাধারণ লোকে বিভিন্ন মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা ব্যবহার করত। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত আর্যরা এই সময়েও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। দ্রাবিড় সমাজেও এর প্রসার খুব বৃদ্ধি পায়। বাস্তবিক সমস্ত ভারত হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃত ভাষার ঐক্যবন্ধনের জোরেই দীর্ঘকাল সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের দারুণ উপপ্লব ও বহিঃশত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও।

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান আছে। দুটিই মুখ্যত লেখ্য ভাষা ব'লে মৌখিক ভাষারূপে তেমন ব্যবহৃত হয়নি এই কারণে দুটিই অনড় অচল রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই দুটি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে খুব বিরাট্ ব্যবধান নেই। দুটিই নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা। সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় লিখিত বলা যায় না। ভারতীয়-আর্যভাষার মধ্যবর্তী স্তরের অনেক শব্দ ও প্রয়োগ অর্বাচীন সংস্কৃতে প্রবেশ ক'রে বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে প্রচুর কালপরিণামগত পার্থক্য এনে দিয়েছে। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা সেইজন্যে সর্বদা সমার্থক নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়—বৈদিক অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদসমূহের ভাষা এবং পাণিনির দ্বারা পরিমার্জিত প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা—এই দুই ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুই রূপ। বর্তমান রূপে প্রাপ্তব্য অথর্ববেদ ও অর্বাচীন সংস্কৃতের ভাষা মোটেই প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা নয়। এই দুটির ওপর মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার প্রবল প্রভাব দেখা যায়। অথর্ব বেদের শেষ উপনিষদ্ সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা; অর্বাচীন সংস্কৃতের শেষ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ "রসগঙ্গাধর"-ও এই সময়ের। অর্বাচীন সংস্কৃতের বেশ প্রচলন এখনও আছে এবং তার মৃত্যু হয়েছে, এ-কথা বলার কোন উপায় নেই। এই কারণে অর্বাচীন সংস্কৃতকে অনেকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। তার জন্যে একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও আছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত পনেরোটি আঞ্চলিক ভাষার অন্যতম হচ্ছে সংস্কৃত। হিন্দির চেয়ে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হওয়া অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু কোন্ সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হবে, প্রাচীন না অর্বাচীন, তা নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। কারণ, পাণিনির দ্বারা সংস্কৃত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। যাঁরা ব্যাকরণ সহজবোধ্য ক'রে দিয়ে এক অর্বাচীন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা ভুলে যান যে, অর্বাচীন ঐ নতুন-গড়া সংস্কৃতের দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃতে লিখিত বিশাল সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি কিছুই পড়া যাবে না; তা ছাড়া, ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্বজনগ্রাহ্য সুবোধ্য রূপ দেবেন যে-নব পাণিনি, তাঁর সন্ধান কোথাও পাওয়া সম্ভবপর হবে কি না, সন্দেহ। শিখতে হলে পাণিনীয় সংস্কৃত শিক্ষা করাই সুবুদ্ধির কাজ। পাণিনির ভাষাকে আরো সরল করার প্রচেষ্টায় এস্পেরান্তোর মতো নতুন একটি কৃত্রিম ভাষা মাত্র গ'ড়ে উঠবে যা ভারতের জনগণের মুখের ভাষা নয় ব'লেই তার দ্বারা অখণ্ড মিলিত ভারতের সর্বজনস্বীকৃত রাষ্ট্রভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতীয়-আর্যভাষার কালবিভাগ করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষার লিপিসহযোগে প্রথম উদ্ভব-কাল যখনই হোক না কেন, বেদগ্রন্থ সঙ্কলনের কাল খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা কথ্যভাষা হিসেবে অন্ততে শিক্ষিত পণ্ডিত ও অভিজাত রাজপুরুষ মহলে অবস্থান করেছে। লেখ্যভাষা হিসেবে প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা সংস্কৃত ও তার অর্বাচীন রূপের কোন সময়ে মৃত্যু হয় নি। অন্তত সপ্তদশ শতক পর্যন্ত জগন্নাথের মতো পণ্ডিত-লিখিত রসগঙ্গাধর গ্রন্থ পাওয়া যায়। এখনও অর্বাচীন সংস্কৃতে সাহিত্যরচনা অব্যাহত আছে।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বৈদিক ও সংস্কৃত, দুই সাহিত্যিক ভাষার ভিত্তিমূল যে-সব উপভাষা, আর্যশাসিত সমাজের লোকেরা তাতে কথা কইতেন। তারপর থেকে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণবদ্ধ রূপ আর মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার রূপ, দু রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষা-

সমূহের উদ্ভব হওয়ায় সেগুলি কথ্যভাষা হিসেবে চলতে লাগল। পণ্ডিত ও রাজপুরুষ মহলে হিন্দু রাজত্বে দশম শতাব্দীর পরেও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে দশম শতাব্দী থেকে কথ্যভাষারূপে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাসমূহের ব্যবহার একরকম বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লেখ্যভাষা হিসেবে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা পঞ্চদশশতাব্দী পর্যন্ত আর অর্বাচীন সংস্কৃত আজ পর্যন্ত বজায় আছে। দশম শতাব্দী থেকে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রয়োগ দৈনন্দিন কাজে একরকম বন্ধ হয়ে গেলেও সংস্কৃত তার পরেও ভারতের বিভিন্ন হিন্দুরাজ্যে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা দেশেই সেন রাজাদের আমলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ছিল। ইউরোপে লাতিন ভাষা যেমন ধর্মযাজকেরা ধর্মকার্যে উনিশ শতক পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে লাতিনেই কথাবার্তা বলেছেন, তেমনি সংস্কৃতের প্রভাব—প্রাচীন ও অর্বাচীন দুই রূপে—আজ পর্যন্ত জীবিত রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতভাষী জনগোষ্ঠী পৃথিবীর কোথাও আজ নেই; মাত্র এই কারণেই সংস্কৃতভাষী রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব। পশ্চিম জার্মানির বেতার-কেন্দ্র থেকে সংস্কৃতে সংবাদ পরিবেশন করা হয়, এটা অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু ইহুদিরা যেমন নানাদিগ্দেশাগত হয়ে ইস্রাএলে এসে অন্য সব ভাষা পরিত্যাগ ক'রে হিব্রুকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করছে, তেমনি হিন্দুরা বাংলা, হিন্দি, তামিল ইত্যাদি মাতৃভাষা পরিত্যাগ ক'রে যদি একমাত্র সংস্কৃতকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে, কেবল তা হলে সংস্কৃতভাষী আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর হবে, নইলে নয়। উৎকৃষ্ট মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ ক'রে সংস্কৃত ভাষাকে সরাসরি কাজে প্রয়োগ করার কোন কথাই এ-যুগে উঠতে পারে না।

বেদব্যাস উপাধিবিশিষ্ট শেষ উল্লেখযোগ্য মনীষী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। তাঁর কাল পরে নির্ণয় করা যাবে। তিনি বেদগুলির চূড়ান্ত সম্পাদনকার্য শেষ করার পর আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে লিখিত আকারে সাহিত্য রচনার সময়ে ভারতীয় আর্যরা সাধু লেখ্যভাষা বৈদিক ব্যবহার করত বটে, কিন্তু তারা কথা বলত যে-সব বৈদিক-তুল্য উপভাষায়, সেগুলিতেও লেখার কাজ চলত। ঐ সব উপভাষার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক রূপটিই বৈদিক সাধু লেখ্যভাষা। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই ভাবে লেখায় বৈদিক এবং লেখায় ও কথায় দু ভাবেই সংস্কৃততুল্য উপভাষাগুলির ব্যবহার হতে থাকে। তার পর যখন আর্য-জাতি সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ, কারাকোরাম পর্বত ও পামির মালভূমি থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত ও সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত হল, তখন সমস্ত সংস্কৃত-তুল্য উপভাষা-গুলিকে একটি শিষ্ট ব্যাকরণসূত্রবদ্ধ রূপ দিয়ে সমস্ত ভারতীয় আর্যদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য স্থাপন ও সংযোগ সাধনের প্রয়াস দেখা গেল। তার ফলে পাণিনির ব্যাকরণ রচিত ও গৃহীত হয়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন সাহিত্যিক রূপটির জন্ম হল, যে-ভাষায় কালিদাসের মতো কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। প্রাক্-পাণিনি সংস্কৃত উপভাষা-গুলোতেও বৈদিক ধর্মসাহিত্যের মতো এক বিরাট সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল। এই সাহিত্যের উৎকর্ষও বৈদিক সাহিত্যের মতো। এই উপভাষাগুলিতে—উপভাষাগুলির তৎকালোচিত মার্জিত সাহিত্যিক রূপগুলিতে বলা আরো বেশি ভালো—রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্য এবং কোন কোন পুরাণ লেখা হয়। পাণিনি ঐ উপভাষা-মূলক সাহিত্যের ভাষার সংশোধিত রূপটি গ্রহণ করেন।

পাণিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আর একটি দিগ্-দর্শন। পরবর্তী সমস্ত কবি ও লেখক প্রধানত পাণিনির ব্যাকরণ মেনে চলেছেন। পাণিনির পরে জন্মগ্রহণ ক'রে যাঁরা প্রাক্-পাণিনি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাঁরা সমাজে আদৃত হন নি। কোন রচনার ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে তা পাণিনির পূর্ববর্তী কি পরবর্তী, তা বুঝতে পারলে সেই সংস্কৃত রচনার কালনির্ণয় সহজসাধ্য হয়ে আসে। পাণিনির ব্যাকরণ গৃহীত হওয়ার পরবর্তী যুগের প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃতরচয়িতা ভাষাসৃষ্টির সময়ে ব্যাকরণবিধির ক্ষেত্রে পাণিনিকে মান্য ক'রে চলেছেন। অনুমান করা হয়, অশ্বঘোষের মতো প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনাও পাণিনিকে না মানার অপরাধে ভারত থেকে একরকম বহিষ্কৃত ও অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

পাণিনির মতো বৈয়াকরণের ব্যাকরণের জোরে সারা ভারতের প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষা-গুলো একটিমাত্র শুদ্ধ ও সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিক রূপ পেল। বৈদিক ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা সুচিহ্নিত হয়ে

পৃথক্ রূপে দাঁড়াল। অর্বাচীন সংস্কৃত বৈদিক ভাষা থেকে অনেক কারণে আরো বেশি স'রে গেছে। বহু অর্বাচীন ধাতু সংস্কৃত ব্যাকরণে পরবর্তী কালে গৃহীত হয়।

ঋগ্বেদের ভাষা সর্বত্র অন্যান্য বেদের ভাষার পূর্বরূপ নয়। অর্বাচীন বেদের ভাষা সংস্কৃত-তুল্য উপভাষা ও অনার্য ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পাণিনির চেষ্টায় সংস্কৃতের ভিত্তিভূমিস্বরূপ অবস্থিত উপভাষাসমূহ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয়-আর্যভাষাকে খণ্ডিত করতে পারে নি। বহুকাল ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার জোরে অখণ্ড হয়ে ছিল। সম্রাট্ অশোকের জন্যে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি বিশেষভাবে মিশ্র ও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত আবার সংস্কৃত ভাষার শক্তিতে সেই সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন; তাঁর ও তাঁর বংশধরদের আমল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁস বা নব-জাগরণ যুগের তুল্য। মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার প্রচলনকালেও সংস্কৃত ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ভাষা ছিল। দশম শতাব্দীর পরেও সর্বভারতীয় যোগসূত্ররূপে এর দান অসামান্য। নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিতেও দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেবের চেয়ে বড় কবি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও রূপ-সনাতন যে-সব সংস্কৃত কবিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন, সেগুলির তুলনা বিরল। কোন নবীন ভারতীয়-আর্যভাষা সংস্কৃতের মতো শক্তিশালী নয়। বাংলা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ কি না, সংশয়ের বিষয়। যদিও জয়দেবের পর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি মধুসূদন বলেছিলেন, বাংলা ভাষা সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা। ইংরেজি ভাষা গোথিক ভাষার চেয়ে শক্তিশালী তো বটেই, গ্রিক ও লাতিনের চেয়ে তার ক্ষমতা কম নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নবীন ভারতীয়-আর্যভাষা বাংলা সংস্কৃতের সবচেয়ে যোগ্য বংশধর হলেও সংস্কৃতের চেয়ে জোরালো ভাষা বলার উপায় নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে সংস্কৃত, গ্রিক ও ইংরেজ কবির নাম করা যায়। সে-পর্যায়ে কোন বাঙালি কবির নাম তোলা এখনও অসম্ভব।

পাণিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। অ-বৈদিক শিষ্ট ভাষার রূপ চিরকালের মতো নির্ধারিত করার সময়ে সংস্কৃতের মতো বিরাট ভাষার ব্যাকরণের যে নিপুণ বিবরণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছেন, তা তুলনারহিত। তিনি তাঁর ব্যাকরণের নাম দেন "অষ্টাধ্যায়ী।" এই অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের আটটি অধ্যায়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বা উদীচ্যের ভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। উদীচ্য অঞ্চলের আর্যদের খাতির সে-যুগে খুব বেশি ছিল। তাঁদের সাধারণ ভারতীয়রা "দেব" ব'লে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করত। সেই জন্যে সংস্কৃতের আর এক নাম দেবভাষা।

পাণিনির আগেও অনেক বড় বৈয়াকরণ ভারতে বর্তমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য প্রভৃতি বিখ্যাত। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ প্রচারিত হওয়ার পর তাঁদের ব্যাকরণগুলি মর্যাদা হারিয়ে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

যে-সব "অ-সংস্কৃত" সংস্কৃত উপভাষা আগে চলত, তারা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হল বটে, কিন্তু মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা প্রাকৃতের সঙ্গে মিশে তাদের এক রূপান্তর পরবর্তী কালে "বৌদ্ধ সংস্কৃত" নামে পরিচিত হয়। বৌদ্ধরা তাঁদের শাস্ত্র-গ্রন্থ এই ভাষায় রচনা করতেন। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা পালি-র চেয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতের আদর অনেক বেশি ছিল বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে।

ভারতীয়-আর্যভাষার এই কালবিভাগ সাধারণত গ্রাহ্য :—

(১) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা : বৈদিক ও সংস্কৃত ; খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষা একই স্তরের।

(২) মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা : আঞ্চলিক প্রাকৃতসমূহ, পালি ভাষা, সাহিত্যিক প্রাকৃতসমূহ, অপভ্রংশ ভাষাসমষ্টি, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি লৌকিক ভাষা ; খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। লেখ্যভাষা সংস্কৃত ও কথ্য-ভাষাসমূহ—কথ্যভাষাসমূহ প্রাক্-পাণিনি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত অনার্য উপাদানসমন্বিত ভাষা ; লেখ্যভাষা ও কথ্য-ভাষা একই কালে দুই স্তরের ; লেখায় প্রাচীন স্তরের ও কথায় মধ্য স্তরের প্রাধান্য।

(৩) নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষা : অসমিয়া-বাংলা-

উড়িয়া-মৈথিল-মগহি-ভোজপুরি—নেপালি-সিংহলি-মারাঠী গুজরাতি-রাজস্থানি-কোসলি-হিন্দি-ডোগরি-কাশ্মীরি-উর্দু-পাঞ্জাবি-সিন্ধি-রোমানি; দশম শতাব্দী থেকে এখন পর্যন্ত।

এবার পাণিনির কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। পাণিনি তক্ষশিলার কাছে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার প্রভৃতির মতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বা তার কিছু আগে আবির্ভূত হন। এমন মূঢ় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও আছে যার মতে পাণিনি ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লোক অর্থাৎ অশোকের সমসাময়িক! পাণিনির ব্যাকরণ শাস্ত্রে বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধদের কোন উল্লেখ নেই। মহাভারতের চরিত্রগুলি তাঁর রচনায় উল্লিখিত। পাণিনি মহাভারত কাব্যগ্রন্থ রচনার পরবর্তী এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী, এটাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত। বুদ্ধের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৪ সালে হলে পাণিনি অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে জন্ম নিয়েছিলেন। গোল্ডষ্টূকারের মতে, পাণিনি অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর লোক। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" রচনায় বলেছেন:—

"বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র খ্রীষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে পাণিনি ও যাস্কের নাম আছে। তদনুসারে বলিতে হইবে, পাণিনি ও যাস্ক বৌধায়নের পূর্বে ছিলেন। বৈদিক নিঘণ্টু যাস্কেরও পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বেদের জ্যোতিষ বাদে অপর পাঁচ অঙ্গের কাল খ্রীষ্ট জন্মের অন্তত সহস্র বৎসর পূর্বে হইবার সম্ভাবনা।"

অতএব, পাণিনির খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ হবার কথা, যদি আরো আগে নাও হয়। পাণিনি বুদ্ধদেবের পরবর্তী লোক হ'লে তিনি গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারতেন না। গ্রিকরা ভারত আক্রমণের আগেও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে "যবন" নামে ভারতে সুপরিচিত থাকা বিচিত্র ব্যাপার নয়। সুতরাং পাণিনির রচনায় যবন শব্দ ব্যবহৃত দেখে তাঁকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লোক মনে করা অযৌক্তিক। বটকৃষ্ণ ঘোষ ঐ রকম ধ'রে নিয়েছেন। মনে হয়, ইরানের পথে মিতান্নি রাজসভা ও হিত্তিদের সঙ্গে যেমন ভারতের আর্যদের স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ ও ভাব-বিনিময় ছিল, তেমনি গ্রিকদের বা যবনদের সঙ্গেও ছিল। প্লাতোন্ বা প্লেটোর রচনা থেকে বোঝা যায় যে, গ্রিক সভ্যতাও বটকৃষ্ণবাবু বা অন্য অনেকে যতটা মনে করেন, তার চেয়ে প্রাচীন। ট্রোজান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর সেটা আরো ভালো ক'রে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং খ্রীষ্ট জন্মের এক হাজার বছর আগে পাণিনির পক্ষে যবন জাতির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বুদ্ধদেবও সংস্কৃত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘকাল ধ'রে পণ্ডিতমহলে প্রচলিত কিন্তু সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ভাষা না হয়ে দাঁড়ালে সংস্কৃত ছেড়ে লোকবোধ্য মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করতেন না। বুদ্ধদেবের বেশ কিছু আগে পাণিনির অভ্যুদয় না হলে সংস্কৃত ভাষা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাকরণবদ্ধ হয়ে বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচারের পক্ষে অনুপযোগী ব'লে গণ্য হতে পারত না।

বটকৃষ্ণ ঘোষের মতে, ঋগ্বেদের ভাষা পাণিনীয় ভাষার চেয়ে বড় জোর আরো ৫০০ বছর আগেকার। চসার থেকে বার্নার্ড শ-এর ভাষার যে পার্থক্য, ঋগ্বেদের গোড়ার দিকের সূক্তগুলির সঙ্গে পাণিনির ভাষার প্রভেদ নাকি তার চেয়ে বেশি নয়। কালনির্ধারণ সম্পর্কে বটকৃষ্ণবাবুর অভিমত মহা ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি পাণিনিকে খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর লোক ব'লে ধরা যায় আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-সম্পাদিত বেদের আধুনিকতম অংশের ভাষার কথা বিবেচনা করা যায়, তা হলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেষবারের মতো সম্পাদিত বেদের সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর পাণিনির কালগত প্রভেদ মাত্র পাঁচ শো বছর হয় বটে। কিন্তু দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সম্পাদিত বেদের কোন সূক্তের ভাষার সময় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক হলেও ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির ভাষা অনেক বেশি পুরোনো। তার সঙ্গে পাণিনীয় ভাষার ব্যবধান এই জন্যে মাত্র ৫০০ বছরের হতে পারে না যে, ভাষার অত দ্রুত পরিবর্তন সে-যুগে অসম্ভব ছিল।

তখনকার মুদ্রাযন্ত্রবিহীন জগতে মুদ্রিত কাগজ পত্রের ব্যাপক প্রচার ও বিনিময়ের অভাবে ভাষা সহজে পরিবর্তিত হত না। আর্যদের বসতিবিস্তারও প্রতীয়মান কারণে শ্লথ গতিতে অগ্রসর হত। প্রায় জনশূন্য অর্ধসভ্য অসভ্য লাল মানুষদের দেশ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উন্নততর ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার হতে যে-সময় লেগেছে, বহু

জনাকীর্ণ ভারতে উন্নততর দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য সভ্যতার বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে আর্যদের তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগার কথা। সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গীয় মূর্ধন্য ধ্বনিসম্ভার ভারতীয় আর্যভাষায় যদি দ্রাবিড়দের কাছে থেকেই এসে থাকে, তবে তার জন্যেও বহু শত বছর সময় দরকার। শুধু কতকগুলি বিদেশি ধ্বনি আত্মসাৎ করা নয়, সেই ধ্বনিগুলি স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার ক'রে তাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ও অনুপম কাব্য রচনার ভাষা নির্মাণ করতে বহু শতাব্দী প্রয়োজন। আর্যরা দ্রাবিড়দের ঘৃণা করতেন। ঘৃণিত শত্রুর ভাষার ধ্বনিসম্ভার আত্মস্থ করতে দীর্ঘতর সময়ের সাহায্য প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার রাজকীয় প্রভাব ও সাহচর্য সত্ত্বেও বাংলা বা অন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষায় Z, F, V প্রভৃতি ধ্বনি ভাষারচনায় সামান্যই গৃহীত হয়েছে। ঋক্‌বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে পাণিনীয় ভাষার চেয়েও বেশি মূর্ধন্য ধ্বনি আছে। মাত্র ৫০০ বছরের মধ্যে সেই বেশির ভাগ মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি লুপ্ত হয় কি ভাবে, তার কোন প্রমাণ নেই। তারপর মনে রাখা দরকার যে, বেদ ও পাণিনির ভাষার মধ্যবর্তী কালে আছে রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা। বটকৃষ্ণবাবু ও তাঁর মতো আরো অনেকে রামায়ণ ও মহাভারতের সাক্ষ্যপ্রমাণ উড়িয়ে দিতে চান। দুঃখের বিষয়, ঐ উপেক্ষা নির্বোধ অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভারতীয় আর্যরা স্বভাবত মন্থরগতি তো বটেই, অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতিরও নিশ্চয়। এমন অবস্থায় ভাষায় নতুন ধ্বনিসম্ভার গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে তাঁদের অন্য জাতি-গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি সময় লাগার কথা। বৈদিক সাহিত্য থেকে রামায়ণ মহাভারত ও কোন পুরাণের ভাষা, সেই ভাষা থেকে পাণিনির ব্যাকরণের দ্বারা মার্জিত ভাষা —বিবর্তনের ধারায় এ-সব গ'ড়ে উঠতে রক্ষণশীল মন্থরগতি সমাজে বহু বছর লাগে।

মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরা বলেন ব্রহ্মাবর্ত দেশ অর্থাৎ পাঞ্জাব থেকে কামরূপ যেতে ভারতীয় আর্যদের অন্তত সহস্র বৎসর প্রয়োজন হয়েছিল, তাঁরা রামায়ণে বর্ণিত আর্যবিস্তারের সঙ্গে পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের আর্যবিস্তার ও পরবর্তী মহাভারতের যুগের আর্যবিস্তারের তুলনা ক'রেও বুঝতে পারেন না যে, ঐ সব বসতিবিস্তারে কত শতাব্দী লাগতে পারে এবং এই সব সাহিত্যসৃষ্টি ও তাদের মধ্যে বর্ণিত কাহিনীগুলির মধ্যে কালব্যবধান কি পরিমাণের। বৈদিক ভাষা ও পাণিনীয় সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য যে বহুল পরিমাণে আর্যবসতিবিস্তারের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল, তাও তাঁরা ভুলে যান। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আর্য-বিস্তার পাণিনীয় বা পতঞ্জলির যুগের আর্যবিস্তারে পরিণত হতে যে-সময় নিতে পারে, বৈদিক ভাষার সঙ্গে পাণিনি বা পতঞ্জলির ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি হতে অন্তত সেই সময় নেবে। তা ছাড়া প্রথম দিকে আর্যরা যতটা বিস্তার লাভ করেছিলেন, অন্তত বৈদিক আর্যরা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তারের গতি যতটা ছিল, রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের শক্তিশালী দ্রাবিড় জাতিগুলির সান্নিধ্যে আসার পর তাঁদের আর ততটা বিস্তার লাভের ক্ষমতা ছিল না।

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি চতুষ্টয়কে উত্তর ভারতের কোন সম্রাট্‌ই যে সহজে বা বেশিদিন আয়ত্ত ক'রে রাখতে পারেন নি, এই ঐতিহাসিক সত্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এদের প্রতিরোধ শক্তির তীব্রতার জন্যেই গত কয়েক হাজার বছরে এদের দিকে আর ভাষাগত অগ্রগতি সাধনের ক্ষমতা আর্যদের ছিল না। অশোকের সময়ে ভৌগোলিক দিক থেকে আর্য আর দ্রাবিড়দের আনুপাতিক অবস্থান যা ছিল, এখনও তাই আছে। সুতরাং প্রথমে আর্যরা যত ক্ষিপ্রভাবে ভারতে ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন, পরের দিকে আর তেমন পারেন নি। ফলে বসতিবিস্তারগতির শৈথিল্যের সঙ্গে উপভাষাগত পরিবর্তনের জন্যে ভাষাতাত্ত্বিক তথা বৈয়াকরণিক পরিবর্তনের বেগও ক'মে আসার কথা। অবশ্য মুদ্রাযন্ত্র থাকলে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ও অগ্রগতি হতে পারত। কিন্তু সে-কথা তখনকার যুগে উঠতে পারত না।

পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব দশম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ের লোক ব'লে মানলেও আমরা ভারতীয়-আর্যভাষার যে-কালানুক্রমিক যুগবিভাগ করেছি, যা সুনীতিকুমার, সুকুমার ও কোন কোন ইংরেজ পণ্ডিত করেছেন, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হচ্ছে না। পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হবার পর তা গৃহীত হয়ে কার্যকর হতে কিছু সময় লাগার কথা। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণ বিধিবদ্ধ হয়ে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে সংস্কৃতকে মুখ্যত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করায় ঐ সময় থেকে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার যুগ আরম্ভ হ'ল, এ-রকম হিসেবে কোন অসুবিধে নেই। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার এই সময়ের ঘটনা এবং সম্ভবত এ-ব্যাপারে কিছু প্রভাবও বিস্তার করেছিল।

(ক্রমশঃ)

* বৈশাখ সংখ্যায় ৫০৯ পৃষ্ঠায় বাম স্তম্ভে ২৮ পংক্তিতে N 17200 পরিবর্তে N 17248 হবে।

তীরন্দাজ

রথীন সরকার

প্রথম দিন গেলো। দ্বিতীয় দিন গেলো। তৃতীয় দিনের দিন বিল সেকশানের কান্তিবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—মিস সেন ?

মাধবী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। ভেবেছিলো পথ চলতি আর কেউ। কিন্তু দ্বিতীয়বার ডাকটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালো, আমাকে বলছেন ?

কান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, দ্বিতীয়জন আর কই। সবাই তো টিফিন করছে। আর তা ছাড়া মিস সেন বলতে তো এ অফিসে এক আপনাকেই চিনি।

মাধবী লজ্জিত হলো। মাত্র তিনদিন হলো চাকরীতে ঢুকেছে। কিন্তু এরই মধ্যে একটা পরিচিতির গণ্ডী সৃষ্টি করে নিয়েছে। হেড ক্লার্ক বিনয়বাবু থেকে সুরু করে অফিসের বেয়ারা পর্য্যন্ত সকলেরই সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে—কেবল বাকি ছিলেন কান্তিবাবু। এ কয়দিন কান্তিবাবু নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেননি। ফাইলে চোখ রেখে একাগ্রমনে কাজ করে গেছেন। কোনদিকে চোখ তোলেন নি। কে এলো, কে গেলো তাতে কিছু যায় আসেনি কান্তিবাবুর।

আর তাই এই তিনদিনে মাধবীর যতদূর মনে হয়েছে বুঝেছে লোকটি দাম্ভিক, ভীরু, লাজুক স্বভাবের।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লোকটি ঠিক তা নয়। ভীরু কিংবা লাজুক হলেও দাম্ভিক নয়। বরং তার উল্টো। একটা সহানুভূতিসম্পন্ন মন আছে। যে মনটা আর পাঁচ-জনের মধ্যে দেখেনি মাধবী। তাঁদের মধ্যে ছেলেমানুষী আছে, চপলতা আছে কিন্তু আন্তরিকতা নেই—দরদ নেই।

কান্তিবাবু আবার বললেন, সেই তখন থেকে কি দেখছেন মিস্ সেন ?

—লোকজন।

—কেন আপনি টিফিন করেন না ?

—টিফিন! মাধবী চোখ তুলে তাকালো। বললো, করি তো। আপনি—

—আমি! কান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, আমিও করি। অফিস থেকে যে চা আর দু'খানা বিস্কিটের বরাদ্দ থাকে তাতেও কাজটা সারি। চা টুকুতে গলাটা ভেজাই আর বিস্কিট দু'খানা ছোট ভাইটির জন্যে তুলে রাখি। আজ দেড় মাস হলো অসুখে ভুগছে। গেলেই তো চিৎকার সুরু করে দেবে—বিস্কিট দাও বিস্কিট দাও। তাই তুলে রেখে দিই। দেড়শ' টাকা মাইনের কেরাণী এরচেয়ে আর ভালো পথ্য কোত্থেকে জোটাবো বলুন।

মাধবী চুপ করে থাকলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাদেরও পরিবারের অবস্থাটা। বাবার রোগ পাণ্ডুর মুখ, মার পাঁজরা বেরুনো শরীর। ছোট ছোট দুটো ভাই, আর একটা বোন। যাদের দেহে এক টুকরো কাপড় জোটে না। মুখে একটু খাদ্য উ'ঠেনা। আর মাধবী। রোজ খানতিনেক কাপড় উল্টে পাল্টে যাকে নানা কসরৎ করে পরে আসতে হয় তার মর্মবেদনা বুঝবে কে ? বাইরের আবরণ দিয়ে ভেতরের দারিদ্র্যের নগ্নতাকে কতটুকু ঢেকে রাখা যায়! মাস ছয়েক আগে তবু এক রকম করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার চলেছে—কিন্তু বাবা রিটায়ার করবার পর থেকেই আর চলেনা। তরণী চড়ায় ঠেকেছে। আর তাই মাধবীকে রাস্তায় বেরুতে হয়েছে। চাকরী নিতে হয়েছে মার্চেন্ট অফিসে।

অথচ মাধবী তো জানে বাবা মার কতখানি অমত, কত খানি আপত্তি ছিলো চাকরী নেওয়ায়। চিরকালের রক্ষণ-শীল পরিবার। রক্ষণশীলতা যাদের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় ওতপ্রোতোভাবে মিশে রয়েছে—তাঁদের বাড়ির মেয়েরা যে

রাস্তায় বেরুবে পেটের চিন্তায় এতখানি ভাবতে পারেনি। কোথায় বে-থা করে ঘর সংসারী হবে তা নয় উদরের ধান্ধায় রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়ান!

আজ সত্যিই আশ্চর্য লাগে মাধবীর। বাবা যদি রোগ শয্যায় পড়ে না থাকতেন—যদি আজ সামর্থ্য থাকতো চাকরী করবার, তবে কি মাধবী চাকরী করতে পারতো? পারতো না। একদল বুড়ো কিংবা একদল বাচাল ছেলে-দের সামনে বসে করুণ প্রয়াস করতে হতো ভালো পাত্রী সাজবার। নয় তো সীবনপটুত্ব থেকে শুরু করে বন্ধন পটুত্বের হাজার হাজার প্রশ্নের সমাধান করতে হতো কয়েকটি কথায়।

কিন্তু কিছুই করতে হলো না মাধবীকে। কোন প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধেই মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো না। দিব্যি মার্চেণ্ট অফিসের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসতে পারলো। তার মূলে অভাব, দারিদ্র্য।

কান্তিবাবু কাছে সরে এলেন। বললেন, কেমন লাগছে আপনার?

—কি?

—এই অফিস।

মাধুরী হাসলো। বললো, ভালো।

—হুঁ। কান্তিবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, অবশ্য আপনাদের অর্থাৎ যাঁদের রূপ আছে তাঁদের ভালোই লাগবে। পড়ে থাকবো শুধু আমরা। আমাদের মতো অক্ষম পুরুষেরা। সারাজীবন মুখ থুবড়ে কাজ করেও আমাদের কোন উন্নতি হবে না। কোন লিভ পাবো না। কোন ইনক্রিমেণ্ট হবে না। ধরা পাকড়া করলে বড়জোর ফাইল ডিপার্টমেণ্টে ঠেলে দেবে তার বেশী আর কিছু নয়।

কান্তিবাবু চুপ করলেন। গলার মধ্যে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হলো। যেন বহুদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা একটা নিষ্ফল আক্রোশে গুমড়ে মরলো।

মাধবী আশ্চর্য হলো। আশ্চর্য বৈকি! অনেকের কাছেই দুঃখের কথা শুনেছে—ওপরওয়ালেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কিন্তু কান্তিবাবুর মতো এমন হতাশাপূর্ণ অভিযোগ কারও মুখে শোনেনি। এ যেন শুধু অভিযোগই নয়—সারা জীবনের গ্লানী, দাসত্বের একটা চরম লজ্জা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ছুটীর পর আবার দেখা হলো। কান্তিবাবু বাসট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। বললেন, কোথায় থাকেন আপনি?

—নারকেলডাঙ্গা। আপনি?

—আমি ভবানীপুর।

—ও। মাধবী চুপ করলো।

কান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, যাই একটু ফলের দোকান থেকে ঘুরে যেতে হবে। গোটা কয়েক ফল কিনবো। কয়েকদিন ধরে ডাক্তার পৈ পৈ করে বলছে একটু ফলের রস খাওয়ানো দরকার। কিন্তু তাতো আর হবার উপায় নেই। গরীবের সংসার—নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু চেষ্টার ক্রটী রাখি কেন। যাই—

কান্তিবাবু আর দাঁড়ালেন না। এগুলেন। আর মাধবী চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো একটা জীবন্ত অভিযোগ কি করে দিনের পর দিন তিল তিল করে নিঃশেষিত হতে হতে একেবারে চরমসীমায় এসে দাঁড়ায়।

দিনকতক পরে কান্তিবাবুই প্রথম কথাটা বললেন, শুনেছেন?

—কি?

—আপনার একটা লিফ্‌ট হচ্ছে।

—লিফ্‌ট হচ্ছে! মাধবী অবাক হলো।

কান্তিবাবু বললেন, হ্যাঁ লিফ্‌ট। মানে রাতারাতি প্রমোশন। সেদিন বলেছিলাম না যাঁদের হয় তাঁদের অঙ্কুরেই হয়। আর যাঁদের হয়না তাঁরা শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলেও হয় না। এও হলো তাই। আপনি এলেন—এসেই ট্রফিটা জিতে নিলেন। আর আমি দশবছর ছুটোছুটি করেও তার পাশ দিয়ে যেতে পারলাম না। একেই বলে ভাগ্য। বুঝলেন মিস্ সেন একেই বলে ভাগ্য। কান্তিবাবুর মুখে এবার বিষাদের ছায়া নামলো। যেন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। বললেন, কেন? আপনি শোনেননি?

শোনেনি যে ঠিক তা নয়। মাধবীও শুনেছে। অর্থাৎ কয়েকদিন ধরেই সারা অফিসে একটা কানাঘুষা হচ্ছিলো। মাইনে বাড়বে, প্রমোশন হবে। প্রাইভেট কোম্পানি। সুতরাং কার ভাগ্যে কখন শিকে ছেঁড়ে বলা মুস্কিল। কে কতখানি তৈল সিঞ্চন করলো তারই উপর নির্ভর করে চাকরীর স্থায়িত্ব। আর্থিক মানদণ্ড।

কিন্তু তা বলে যে কান্তিবাবুর কথাটাই এতবড় হয়ে দেখা দেবে মাধবী তা ভাবতে পারেনি। হলোও তাই। লিষ্ট বেরুতে সবাই চমকে উঠলো। পুরোনোদের মধ্যে যেমন সুজিত নাগ, সোমেন দাশ, অমল তরফদার আছে; তেমনি নতুনদের মধ্যে আছে মাধবী সেন, সুপ্রভা সরকার আর আছে অনুতোষ দত্ত। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে মাধবী। একেবারে খোদ সাহেবের পি, এ। অর্থাৎ মিঃ ঘোষের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্ট।

নোটীশবোর্ডের দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলো মাধবী। ছি ছি! শেষ পর্যন্ত কিনা ঐ লোকটার খবরদারী করতে হবে। বিশ্রী বেঢপ একটা কদাকার চেহারার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের অপব্যবহার করতে হবে। ঘৃণায় মন বিষিয়ে গেলো মাধবীর। একটা জঘন্য কদাকার মুখ, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে; চোখে একটা শাণিত দৃষ্টি ঠোঁটের ফাঁকে সেই অদৃশ্য হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার ঢং—যেন সমস্ত মিলিয়ে একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে।

মাধবীর এক এক সময় মনে হয়েছে লোকটা তাকায় না যেন সমস্ত শরীর লেহন করে। একটু একটু করে রসস্বাদ করতে চায়। আর সে কারণেই মাধবী সব সময় লোকটাকে এড়িয়ে এড়িয়ে থেকেছে—দূরে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে।

কতদিন কান্তিবাবুকে দেখিয়ে মাধবী বলেছে, লোকটিকে আপনার কেমন মনে হয় মিঃ চৌধুরী?

কান্তিবাবু বলেছেন, খুব ভালো। সদা সত্যকথা বৈ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। ক্লার্কদের সঙ্গে মন কষা কষি করেন না! মেয়েদের দিকে কখনও চোখ তুলে তাকান না। এতটুকু পান দোষ নেই—একেবারে নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

মাধবী হেসেছে। বলেছে, অর্থাৎ বিড়াল তপস্বী।

কান্তিবাবু চোখ তুলে তাকিয়েছেন। বলেছেন, আপনি জানলেন কি করে!

মাধবী বলেছে, এ আমাদের জানতে হয় না মিঃ চৌধুরী আমরা টের পাই।

—হুঁ। কান্তিবাবু চুপ করে থেকেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলেছেন, কিন্তু ভাবলে লোকটাকে একেবারে অবজ্ঞা করবেন না মিস্ সেন। লোকটিতো আমাদের হর্তা, কর্তা বিধাতা, ধ্যান, জ্ঞান সব। এই যে আপনি লাফিয়ে এত-বড় একটা পোষ্টে বসতে পারলেন সেও তো ঐ লোকটির দয়ায়।

মাধবী এবার হেসে ফেলেছে। বলেছে, হয়েছে হয়েছে, এবার চলুন দেখি। অপরের হয়ে যে ওকালতি করতে একেবারে সিদ্ধপুরুষ তাতো স্বচক্ষেই দেখছি।

সত্যিই তাই। ওকালতি কেউ করুক বা না করুক ওকালতি তো মাধবীর নিজেকেই করতে হয়। নইলে দিনের পর দিন মাধবী লোকটির অসহ্য বেয়াড়াপনাকে প্রশ্রয় দেয় কেমন করে! কেমন করেই বা লোকটির বেয়াড়পনাকে ঘাড় পেতে নির্বিবাদে মেনে নেয় মাধবী! আসলে এও এক ধরনের ওকালতি। সরব না হোক নীরব ওকালতি বৈকি।

সামান্য একটা কাঠের পার্টিশান। যেন বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক টুকরো দ্বীপ। আর নীলপর্দা—যেন নিমজ্জমান ব্যক্তির খড়কুটো। তবু তারই ফাঁক দিয়ে দৃষ্টির অবাধ গতিবিধি। টাইপ করতে করতে কতদিন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছে মাধবী—দেখেছে লোকটি তারই দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। যেন দেখছে না গিলছে।

চোখাচোখি হতেই লোকটি মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আর মাধবীর সমস্ত শরীর রী রী করে জ্বলে গিয়েছে। ইচ্ছা হয়েছে ছুটে গিয়ে লোকটির গালে ঠাস ঠাস করে গোটা দুই চড় কষিয়ে দেয়। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসে। কিন্তু কিছুতেই পারেনি মাধবী। মনের রাগ মনেই পুষে রেখে কী-বোর্ডের উপর দ্রুত হাত চালিয়েছে।

কিন্তু লোকটি তবু রেহাই দেয়নি। ছুটীর পর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, চলুন মিস্ সেন, আপনাকে একটু লিফ্‌ট দিয়ে আসি।

মাধবী খুব সন্তপর্ণে এড়িয়ে গিয়েছে। বলেছে, মাপ করবেন মিঃ ঘোষ আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে এন্‌গেজ-মেণ্ট আছে। সেখানে রাত হবে।

মিঃ ঘোষ বলেছেন, বেশ তো, তাতে আর কি হয়েছে। চলুন না আপনার বান্ধবীর বাড়ি পর্যন্তই না হয় লিফ্‌ট দিয়ে আসি।

মাধবী তবু টলেনি। বলেছে, পারলে তো খুবই সুখী হতাম। কিন্তু মাথাটা বড্ড ধরেছে। গাড়ি ঘোড়া এখন আর কিছুই ভালো লাগবে না। মাপ করবেন আপাততঃ এটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

মিঃ ঘোষ এরপর আর একমুহূর্ত দাঁড়াননি। হাতের সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

আর মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু আত্মতৃপ্তি উপভোগ করেছে। ভেবেছে এরপর মিঃ ঘোষ হয়তো আর ডাকবেন না। আর জ্বালাতন করবেন না। কিন্তু পরদিন অফিসে আসতেই মাধবীর ভুল ভেঙেছে—না মিঃ ঘোষের তেমন কোন ভাবান্তর ঘটেনি। এতটুকু অপমানের জ্বালা অন্তরে পুষে রাখেননি। বরং আরও সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। কারণে অকারণে মাধবীকে নিজের চেম্বারে ডেকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন।

মাধবী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, আমাকে কিছু বলছেন ?

মিঃ ঘোষ চোখ না তুলেই বলেছেন,হ্যাঁ,বসুন কথা আছে।

মাধবী প্রতীক্ষা করেছে সেই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য। কখন চোখ তুলে তাকাবেন মিঃ ঘোষ। হয়তো একটু আদর্শের বুলি আওড়াবেন কিংবা একটু করুণ মিনতি। কিন্তু মিঃ ঘোষ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। খস্‌খস্ করে লিখে গেছেন একান্ত মনে। আর মাধবী লক্ষ্য করেছে পুরু ঠোঁটে মোটা চুরুটটা থরথর করে কাঁপছে। কখনও বা দপদপ করে জ্বলে উঠে চোখ রাঙাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ ঘোষ চোখ তুলে তাকিয়েছেন। হেসেছেন একটু। তারপরই ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প ফাঁদতে বসেছেন।

মুহূর্তে মাধবীর সমস্ত শরীর রী রী করে জ্বলে উঠেছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলেছে, মাপ করবেন অনেকগুলো চিঠি টাইপ করতে বাকি। চিঠিগুলি আজ টাইপ না করলেই নয়। আচ্ছা নমস্কার। বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি মাধবী। হন্‌হন্ করে এগিয়ে গিয়েছে। পিছনে কোন ক্ষুধার্ত নেকড়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে কিনা, কিংবা দুই চোখে প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে কিনা সেদিকে আর লক্ষ্য করবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

টিফিনে মুখোমুখি হতেই মাধবী বললো, চলুন ঐ রেষ্টুরেণ্টটায় গিয়ে বসি।

—রেষ্টুরেণ্টে! কান্তিবাবু অবাক হলেন।

মাধবী বললো, হ্যাঁ, কেন আপত্তি আছে আপনার ?

—না না আপত্তি আর কি।

—তবে আসুন।

মাধবী এগুলো। কান্তিবাবুও এগুলেন পিছু পিছু।

রেষ্টুরেণ্টের নিরিবিলি কামরায় ঢুকে কান্তিবাবু এবার মুখ খুললেন। বললেন, হঠাৎ আজ এত উদারহস্ত যে ?

মাধবী হাসলো। বললো, কেন আমাদের উদারহস্ত হতে নেই নাকি ?

—না ঠিক তা নয়। মানে কোনদিন দেখিনি তো।

মাধবী লজ্জিত হলো। বললো, বারে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন কথা ছিলো না মাইনে বাড়লে পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

—ওহো তাই বলুন! কান্তিবাবু হো হো করে হাসলেন। বললেন, অবশ্য এ আপনাদেরই সাজে। আমি ভাবলাম বুঝি আর কিছু!

—কি আর কিছু ?

কান্তিবাবু এবার একটু ইতস্তত করলেন। বললেন, মানে কোন শুভদিন-টিন। চিরকাল তো আর এমনি একা একা কাটাবেন না।

মাধবী লজ্জায় মুখ নীচু করলো, সারা মুখে আবির ছড়িয়ে পড়লো।

বললো, যান্ কি যে বলেন—

প্লেটগুলো নামিয়ে রাখতে কান্তিবাবু এবার নিজের প্লেটটা টেনে নিলেন। তারপর মাধবীরটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, মিস্ সেন ?

—বলুন।

—আর যে কানপাতা যায় না অফিসে।

—কিসের কথা বলছেন! মাধবী চোখ তুলে তাকালো।

কান্তিবাবু বললেন, এই আমাদের দু'জনকে নিয়ে গুঞ্জন। কেন আপনি কিছু শোনেননি ?

মাধবী হাসলো লজ্জার হাসি। সত্যিই তো শোনেনি যে ঠিক তা নয়। সেও শুনেছে। এরই মধ্যে একটা চাপা

উত্তেজনা আর গুজগুজ ফিস্‌ফিস্ শুরু হয়েছে। চাপা হাসি আর বাঁকা বাঁকা কথার তীক্ষ্ণ বাণও কাণে এসে বিঁধেছে।

সেদিন তো ডলি দত্ত মাধবীকে সিঁড়ির মুখে জড়িয়েই ধরেছিল। বলেছিলো, মাধবীদি একটা কথা।

—কি ?

—কবে আমাদের খাওয়াচ্ছো বলো।

—কিসের খাওয়া! মাধবী থমকে দাঁড়িয়েছিলো।

ডলি দত্ত এবার কাছে সরে এসেছিলো। তারপর ফিস ফিস করে বলেছিলো, আহা কিছু জানো না বুঝি। একেবারে কচি খুকী! কিন্তু যতই ডুবে ডুবে জল খাও আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না তা বলে দিচ্ছি।

ডলি দত্ত চুপ করেছিলো। আর মাধবী একরকম ছুটে পালিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পালিয়ে এসেই বা রেহাই কই! পিছনে পিছনে চাপা অট্টহাসি আর ব্যঙ্গ কথার ছুরি তো তাকে রেহাই দেয়নি। বিল সেকশানের বাষট্টি বছরের বুড়ো কিরণবাবু বলেছিলেন, মা লক্ষ্মী পাজি-দেখে এবার একটা দিন-টিন স্থির করে ফেল। আমরা দুদিন আনন্দ করি।

মাধবী সে কথারও কোন উত্তর দিতে পারেনি। লজ্জায় আর অনুরাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিলো। টাইপ-বোর্ডে আঙুলগুলো জড়িয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু আজ! আজ কি বলবে মাধবী! সেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে মাধবী চুপ করে থাকলো। কাঁটা চামচ দিয়ে মটন চপটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

কান্তিবাবু ডাকলেন, মিস্ সেন ?

—উঁ।

—আসুন এবার আমরা সবার মুখ বন্ধ করে দিই। আর ওদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

—কিন্তু—

—না না কিন্তু নয়। কান্তিবাবু মাংসের টুকরোটা মুখের কাছে তুলতে গিয়েও তুললেন না। বললেন, আমি এক রকম ঠিক করেই ফেলেছি মিস্ সেন, ছোট ভাইটা সেরে উঠলেই এবার দিন স্থির করে ফেলবো। আপনি আর অমত করবেন না।

কান্তিবাবু চুপ করলেন যেন কিছু একটা উত্তরের প্রত্যাশায়। কিন্তু মাধবী তেমনিই মুখ নীচু করে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে কান্তিবাবু বললেন, কি হলো চুপ করে রইলেন যে ?

—কি বলবো বলুন।

—বারে কিছু একটা উত্তর দিন।

মাধবী বললো, এর আর কি উত্তর দেব। আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে।

কান্তিবাবু হাসলেন। আর হাসতে গিয়েই বাধা পেলেন। না, মাধবী একটি দানাও মুখে দেয়নি। সেই তখন থেকে প্লেট সাজিয়ে সমানে বসে রয়েছে।

বললেন, কি হলো খেলেন না ?

—না। ভালো লাগছে না চলুন ওঠা যাক্।

—চলুন।

কান্তিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। মাধবীও বেরিয়ে এলো পিছু পিছু। রাস্তায় এসে কান্তিবাবু বললেন, আপনি ও রাস্তা দিয়ে যান আমি এ রাস্তা দিয়ে যাই। নইলে কে আবার দেখে ফেলবে সারাদিন অফিসে জ্বালিয়ে মারবে।

এরপর আরও দিন কতক হু হু করে কেটে গেলো। পার্কের ঘাসের জাজিমে শুয়ে আর বাদাম চিবোতে চিবোতে অনেক স্বপ্ন দেখলো। মন্থর দিনগুলোকে রঙিন করে তুললো। আর মাধবী কুসুম কলির মতো কখনও আনন্দে নেচে উঠলো। কখনও উত্তাল হয়ে ফেটে পড়তে চাইলো।

ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল অফিসে। ফাইল ডিপার্টমেন্টের ছোকরা ক্লার্ক নীরোদ প্রথম খবরটা নিয়ে এলো, শুনেছেন কিরণবাবু কাল রাত্রে মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! এক সঙ্গে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, কি হয়েছিলো মশাই লোকটার ?

কি হয়েছিলো নীরোদও সঠিক জানতো না। খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলো। বললো, কি আবার হবে পুরোণো হার্টের রোগ। কাল রাত্রে বেড়ে উঠে হঠাৎ—

কিন্তু বুঝতে কারই অসুবিধা হলো না—যাঁর স্ত্রী নেই, সংসার নেই তাঁর রোগের মধ্যে একটি রোগই ছিলো তা হলো নেশা। সেই নেশার পিছনে অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন কিরণবাবু। কখনও পিছু-পা হননি। বিশেষতঃ মাইনের দিন তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। ছুটতেন দোকানে। তারপর অনেক রাত্রে টলতে টলতে বাড়ি

ফিরতেন। বন্ধু বান্ধবেরা কতবার সাবধান করে দিয়েছেন কিন্তু কিরণবাবু কর্ণপাত করেননি। বলেছেন, দুদিনও যদি ফুর্তি না করবো তো করবো কি। কতকগুলো অকাল কুষ্মাণ্ড ভাইপো ভাইঝির জন্য টাকা জমিয়ে রাখবো। না না না আর যেই করুক এই কিরণশর্মা ও কাজটি করতে পারবে না।

সত্যিই তাই। কিরণবাবু যে ভাইপো ভাইঝির জন্য টাকা জমিয়ে রেখেছেন এমন আশা দুরাশা। তিনি যা উপার্জন করেছেন তা দু'হাতে ছড়িয়েছেন ছিটিয়েছেন, ফুর্তি করেছেন। কখনও অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করেননি। কিন্তু তা বলে যে সেই নেশাই তার কাল হবে এতখানি ভাবতে পারেননি কেউ।

মাধবীর দুঃখ হলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাষট্টি বছরের বৃদ্ধের সদাহাস্য মুখ। যিনি দুদিন আগেও ছুটে এসেছিলেন ঠাট্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, মা লক্ষ্মী এবার পাঁজি-টাঁজি দেখে একটা দিন-টিন স্থির করে ফেল আমরা দুদিন আনন্দ করি। অথচ সেই লোকটি আর নেই। স্বপ্ন যখন সফল হতে চলেছে তখন লোকটি অনেক দূরে সরে গেছেন। পৃথিবীতে আর কোনদিন তিনি ফিরে আসবেন না।

বারোটার সময় ছুটী হয়ে গেলো। স্বয়ং ম্যানেজার বি, কে কৃষ্ণমাচারি অফিসে অফিসে ঘুরে প্রস্তাবটা পেশ করলেন। কিরণবাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সত্যি —কিন্তু আমরা ভুলি কি করে, তাঁর আন্তরিকতা তাঁর সহৃদয়তার কথা! তিনি দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে গেছেন। কখনও ভুলেও কামাই করেননি। কখনও কাজে গাফিলতি দেখাননি। সুতরাং তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে সামান্য একটু শ্রদ্ধাঞ্জলি না জানালে আমরাই পাপপঙ্কে লিপ্ত হবো।

কৃষ্ণমাচারিকে এরবেশী আর কিছু বলতে হলো না। মুহূর্তে শোকের সাগর উথলিয়ে উঠলো। যেন অন্তরের ব্যথা বেদনা উত্তাল সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউ।

অফিস প্রাঙ্গণেই সভা ডাকা হলো। শোকসভা। পূত চরিত্রের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন। অ্যাসিসটেণ্ট সেক্রেটারি রামকৃষ্ণবাবু নিজেই তদারক করলেন। একটা ছবিও যোগাড় করা হলো। আর কিছু ফুল।

সভার কাজ শুরু হলো সাড়ে বারোটায়। বি, কে কৃষ্ণমাচারি স্বয়ং সভাপতি। প্রথম বক্তৃতা দিতে উঠলেন রামকৃষ্ণবাবু। ইনিয়ে বিনিয়ে গুণকীর্তন। তাঁর মতো সচ্চরিত্রের লোক বিরল। তিনি উদার সহৃদয়। কখনও কারও সঙ্গে এতটুকু মন কষাকষি করেননি, এতটুকু রেষারেষি। সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছেন সবাইকে ভালবেসেছেন। আজ তিনি নেই-কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি যেন আমাদের ছেড়ে যাননি। আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন। আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তেমনি মিটিমিটি হাসছেন।

রামকৃষ্ণবাবু এরবেশী আর কিছু বলতে পারলেন না। দুঃখে আবেগে তাঁর গলা ধরে এলো।

এরপর শুরু করলেন হেডক্লার্ক বিনয়বাবু। চোস্ত ইংরাজীতে। সবাইকে টপকিয়ে বক্তৃতা ইংরাজীতে শুরু করতেই বি, কে কৃষ্ণমাচারি নড়েচড়ে বসলেন। কাছেই ছিলেন মিত্র আর ঘোষ সাহেব। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করলেন। উদ্দেশ্য: দেখেছেন লোকটির হিম্মত আছে। খোদ সাহেবের চোখে ধরেছে। এরপর আর বিনয়বাবুকে ঠেকায় কে!

ঝাড়া আধঘণ্টা একটা বক্তৃতা করলেন বিনয়বাবু। তারপর উঠলেন মিত্র সাহেব। মিত্র সাহেবের পর স্বয়ং সভাপতি কৃষ্ণমাচারি। কৃষ্ণমাচারি আধা বাংলা আর আধা হিন্দিতে শুরু করলেন। বলবার চেয়ে কাঁদলেনই বেশী। যেন একটা শোকের নদী বয়ে গেল। আর নিজে হাউহাউ করে কেঁদে সে নদীকে আরও উত্তাল করে তুললেন। যাঁরা এতক্ষণ গুজ গুজ ফিসফিস্ করছিলেন তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন কৃষ্ণমাচারিকে, কৃষ্ণমাচারির কান্নাকে। কৃষ্ণমাচারি যে এমন হাউহাউ করে কাঁদতে পারেন তা কারও জানা ছিলোনা।

তবু সভা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দুটো হয়ে গেল। একটানা গুণকীর্তন আর ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের স্বপক্ষে ঝোলটানার ফিরিস্তি শুনতে শুনতে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিলো। সুতরাং বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মাধবী। যাক্, এতক্ষণে তবু একটু স্বচ্ছন্দে ডানা মেলতে পারবে।

কান্তিবাবু বাইরে আসতেই মাধবী বললো, কি করবেন এখন?

—চলুন আশেপাশে কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

—কোথায় ?

—আপাততঃ যেদিকে দুচোখ যায়।

—মানে !

—মানে এই শ্রীরামপুর কি লিলুয়া যেখানে হোক। যেখানে গিয়ে একটু মুক্তি পাবো। একটু তৃপ্তি পাবো। অর্থাৎ মহানগরের এই কোলাহল থেকে সাময়িক পলায়ন।

মাধবী অবাক হলো। বললো, হঠাৎ আজ এত বেপরোয়া ?

—বেপরোয়া! কান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, সত্যিই এক এক সময় বড্ড বেপরোয়া হতে ইচ্ছা করে মিস্ সেন। ইচ্ছা করে পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের জিগীর তুলি। কিন্তু পারি না। পারি না কেন জানেন ? আমাদের সে শক্তি নেই। সে সাহস নেই। বাবা মার ঘ্যান ঘ্যানানি আর সংসারের এটা নেই সেটা নেই-এর চাহিদার যোগান দিতে দিতে আমরা সে শক্তিকে হারিয়েছি। সে সাহসকে জীবন থেকে ছেঁটে নির্মূলভাবে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি: কি হলাম! পৃথিবীতে সবাই যখন আনন্দ করছে, তখন আমরা কোন অন্ধকূপে বসে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুর্বোধ্য শিলালিপি পাঠোদ্ধারের নিষ্ফল চেষ্টা করছি। তার চেয়ে আসুন মিস্ সেন আমরাও জীবনটাকে উপভোগ করি, আনন্দ করি। আমাদের এই একঘেয়েমী জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনি।

কান্তিবাবু চুপ করলেন।

মাধবী বললো, কিন্তু যদি রাত হয় ?

—রাত হয় হোকনা। জীবনের অর্ধেকটা ঘিরেই তো অন্ধকার। সুতরাং বাস্তব পৃথিবীতে যদি আর একবার রাত নামেই তো নামুক। ক্ষতি কি! অন্ততঃ এটুকু তো জেনে যেতে পারবো আমাদের এই ছক বাঁধা জীবনেও একদিন ব্যতিক্রম ঘটেছিলো।

কান্তিবাবু একবার একটু এগিয়ে গেলেন। ডাকলেন, এই ট্যাক্সি-ট্যাক্সি—

ট্যাক্সি এগিয়ে আসতেই কান্তিবাবু মাধবীকে তুলে দিলেন। তারপর নিজেও উঠে বসে বললেন, মিস সেন এক এক সময় জীবনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে আত্মঘাতি হই মুক্তি নিই, কিন্তু পারিনে। পারিনে কারণ মায়া। জীবনের প্রতি সেই অহেতুক ভালবাসা।

কান্তিবাবু দম নিলেন।

মাধবী হাসলো বললো, আর এখন ?

—এখন! কান্তিবাবু এবার কাছে সরে এলেন। একেবারে বুকের কাছাকাছি। বললেন, এখন আমার বাঁচতে ইচ্ছা করছে। অন্ততঃ আপনার পাশে বসে এই উদ্দেশ্যবিহীন অভিযানে এখন কেউ মৃত্যুর কল্পনা করতে পারে না। বরং কাব্য করে বলতে ইচ্ছা করে "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।"

—কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ?

—কি ?

—আমার কিন্তু মরতে ইচ্ছা করছে।

—মরতে !

—হুঁ মরতে। মাধবী বললো, মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার আদরে আমি মরে যাই।

কান্তিবাবু এবার হেসে ফেললেন। বললেন, না মিস্ সেন সেখানেও আপনার বাধা আছে। মরতে চাইলেই মরা যায় না। তাহলে তো কোন সমস্যাই থাকতো না। তাছাড়া আপনার জীবন এখন আর একজনের কাছে বাঁধা। আপনার জীবনের উত্থান পতনের সঙ্গে আর এক জনের উত্থান পতন নির্ভর করছে। সুতরাং সে আপনাকে মরতে দেবে কেন।

কান্তিবাবু চুপ করলেন।

আর মাধবী লজ্জায় মুখ নীচু করলো।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে স্ট্যাণ্ডে থামতেই কান্তিবাবু নেমে দাঁড়ালেন। ভাড়াটা মিটিয়ে দিলেন। তারপর মাধবীকে নিয়ে এগুলেন গুটি গুটি।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো। দুটো পঁচিশের প্যাসেঞ্জার। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ছাড়বে। সুতরাং কান্তিবাবু আর কালক্ষেপ না করে একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় মাধবীকে টেনে তুলে দিয়ে বললেন, প্লীজ আপনি একটু ওয়েট করুন মিস্ সেন আমি চট করে দুটো টিকিট কেটে আনি।

কান্তিবাবু আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে ছুটলেন কাউন্টারের উদ্দেশ্যে।

মাধবী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। কামরাটা বেশ ফাঁকা। ওপাশের বেঞ্চে একজন ভদ্রলোক ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় যাত্রী নেই। বোধহয় ভদ্রলোক দূর-পাল্লার যাত্রী তাই এখন থেকেই খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঘুমের মহড়া দিচ্ছেন।

আনন্দ আর উত্তেজনায় মাধবী গাড়ির মধ্যেই কয়েক-বার পায়চারি করলো। কল্পনার জাল আঁকলো। রঙিন কল্পনার জাল। যেন বাস্তব আর স্বপ্নের অধিভৌতিক জগৎ। রহস্যের ইন্দ্রপুরী।

কিন্তু পর মুহূর্তেই চমকে উঠলো মাধবী। একি! এত দেরী হচ্ছে কেন কান্তিবাবুর! এত সময় তো লাগবার কথা নয়! তবে কি কান্তিবাবু কিউ-এ দাঁড়িয়েছেন, কিংবা আর কিছু! অথচ গাড়ি যে আর মিনিটখানেকের মধ্যেই ছাড়বে।

মাধবী দরজার কাছে ছুটে এলো। ছটফট করতে লাগলো। ঘনঘন তাকাতে লাগলো গেটের দিকে। কিন্তু না—কান্তিবাবুকে দেখা গেল না। কাউকেই ছুটে আসতে দেখা গেল না হন্তদন্ত হয়ে।

এরপর কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মাধবী খেয়াল করেনি। হঠাৎ একটা বলিষ্ঠ হাত মাধবীর কাঁধের উপর চেপে বসতেই চমকে ঘুরে দাঁড়ালো, একি আপনি!

মিঃ ঘোষ এতক্ষণ ওপাশের বেঞ্চে ঘুমের ভান কর-ছিলেন এবার নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, হাঁ। আমিই। কেন ভয় পেলেন মিস্ সেন?

ইচ্ছা হলো এই মুহূর্তে মাধবী ছুটে বেরিয়ে যায়। কিংবা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না মাধবী। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে আর মিঃ ঘোষের বলিষ্ঠ হাত অক্টোপাশের মতো মাধবীর দুই কাঁধে সজোরে চেপে বসেছে।

মাধবী মুহূর্তে দিগভ্রষ্ট উন্মাদের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। চিৎকার করতে চাইলো কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। শুধু অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলো, কান্তিবাবু—কান্তিবাবু—

—কান্তিবাবু! মিঃ ঘোষের বীভৎস মুখ এবার আরও বীভৎস হলো। শ্বাপদের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। বললেন, কান্তি আর আসবে না মিস্ সেন! ও স্টেশনেই অপেক্ষা করছে—ফিরবার সময় আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

বিধবা

হরিপদ সাহা

স্বামী মরেছে বছর কুড়িক
ক্লান্ত হয়েছে শোক।
বসিয়া বসিয়া প্রৌঢ়া বিধবা
রচিছে স্মৃতির লোক॥
কবে স্বামী তারে বলেছিল প্রিয়ে
চেয়েছিল মুখপানে।
সেকথা আজ ঘুরিয়া ফিরিয়া
পড়েছে মনের কোণে॥
বলে তার মন সেদিন শ্রাবণ
ঘন বাদলের দিন।
প্রিয় তারে টেনে নিয়েছিল প্রাণে
বক্ষে করেছে লীন॥
কবে মৃদু হেসে বলেছিল দুহে
দুইটি মিষ্টি কথা।
সেকথা স্মরণে মনের মরমে
বাড়িতেছে তার ব্যথা॥
প্রহরের পর প্রহর কেটেছে
এসেছে নেমে নিশা।
যৌবন সন্ধ্যায় রূপের প্রদীপ
জ্বলে যায় শেষ শিখা॥

রবিন্‌সন্ ক্রুশো

শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

বিশ্ব-সাহিত্যের একখানা সেরা বই রবিন্‌সন্ ক্রুশো। পঞ্চতন্ত্র (পিল্লের গল্প), ঈশপের উপকথা, ঠাকুরদাদার এবং ঠাকুরমা'র ঝোলাঝুলি, আরব্যোপন্যাস, গ্রিমের জনপ্রিয় গল্প, কথা-সরিৎ-সাগর, বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি এবং তজ্জাতীয় রূপকথার মত এই বইখানা মরলোকে অমরতা লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় বই আর নাই—তামিল, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি অপরাপর ভারতীয় ভাষায় আছে কিনা জানি না। রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন বই জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ প্রভৃতি সমৃদ্ধ ইউরোপীয় ভাষায়ও আছে কিনা ভাষাবিদগণই তাহা বলিতে পারেন। এই বইর জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে পৃথিবীর যত বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে তত ভাষায় আর কোন বই অনূদিত হইয়াছে কিনা এবং পৃথিবীর যত লোক এই বইখানা পড়িয়াছে তত লোক অন্য কোন একখানা বই পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। এক শ্রেণী পাঠকের কাছে 'কেচ্ছা'র খুব আদর, কেননা, নিন্দা-কুৎসা ঝাল ও টকের মত স্বভাবতই মুখরোচক। কথায় আছে "রাধার কলঙ্ক যত গাহে সব ভাগবত"। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক প্রধান আবেদন ও আকর্ষণ হইতেছে নিষিদ্ধ প্রেম, পরকীয়া পীরিতি—তাহা কলঙ্কিনী রাধাকে অবলম্বন করিয়াই হউক বা রামী রজকিনীকে কেন্দ্র করিয়াই হউক। কৃষ্ণ-প্রেম-কলঙ্ক-সাগরে যিনি ডুবিয়াছেন এবং যাঁহার প্রেমকে নিকষিত হেম বলা হইয়াছে সেই নারীযুগলই হইতেছেন বৈষ্ণব-মহাজন-বিশেষের রচিত পদাবলীর মূল প্রেরণা ও প্রধান অবলম্বন। "কেচ্ছার" ঠিক সংজ্ঞা দিতে পারিতেছিনা। সাধারণের যাহা পড়িতে ভাল লাগে, যাহা অনুশীলিত সুরুচির অপেক্ষা রাখেনা, মানবের সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি যে জাতীয় সাহিত্যের দিকে তাহাকে উন্মুখ করে তাহাই হইল কেচ্ছা শ্রেণীর। উদাহরণ স্বরূপ এই ধরণের একখানা সুপরিচিত কেচ্ছার উল্লেখ করা যায়—যথা গুলেবকাবলি। রবিনসন ক্রুশো যে কেচ্ছা নয় ইহা বলাই বাহুল্য। আবার যাহাকে ডিটেকটিভ উপন্যাস বলা হয় এবং যে শ্রেণীর উপন্যাসের আবেদন এই যুগে সাধারণ পাঠকের কাছে প্রায় দুর্নিবার রবিনসন ক্রুশো সেই ডিটেকটিভ উপন্যাস শ্রেণীতেও পড়েনা, তবে রবিনসন ক্রুশোর সাহিত্যিক নামকরণ কি হইবে। অর্থাৎ সাহিত্যের কোন শ্রেণীতে, কোন পংক্তিতে তাহাকে স্থান দিব ? ভ্রমণকাহিনী, Adventure (বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না) আত্মচরিত, কোন নামকরণ এই বইর প্রাপ্য বা ইহার পক্ষে প্রযোজ্য ? বিশ্ব-সমাদৃত সর্ব্বজনপ্রিয় এই গ্রন্থখানার প্রধান আবেদন কোথায় এবং প্রধান আকর্ষণ কি ? কেন এই বইখানা এত লোকের এত ভাল লাগিয়াছে ? দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে ইহার এত জন-প্রিয়তা কেন ? গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেমন, তুহিনাঞ্চলেও তেমন, যেমন শৈলশিখরে তেমনই সমুদ্রোপকূলে, নির্জ্জন দ্বীপে যেমন কলকোলাহলময় মহানগরীতেও তেমনই ইহার তুল্য আকর্ষণ। শ্বেত পীত কৃষ্ণজাতির ইহা সমান উপভোগ্য হইয়াছে। পুরুষের কাছে ইহার আবেদন যেমন দুর্নিবার নারীর কাছেও তাহার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই বইখানা বালককেও যেমন আকর্ষণ করে বালকের পিতাকে এবং পিতার পিতাকেও তেমনই আকর্ষণ করে। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা যে সাময়িক কোন হুজুগ-জনিত নয় তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কাল-সমুদ্রের কয়েকটা শতাব্দী পার হইয়া আসিয়াছে এই বইখানা—সখের বা রুচির বা মনের পরিবর্ত্তনে ইহার জন-প্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় নাই। অমর এই গ্রন্থ—ইহার মধ্যে নিহিত আছে পরমরহস্যময় মানবজীবনের নিগূঢ় শাশ্বত সত্য এবং সেই জন্যই ইহার অন্তর্নিহিত আবেদন ও আকর্ষণও চিরন্তন না হইয়া পারেনা। সেই চিরন্তন নিত্য সত্যটী কিন্তু মোটেই দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-কণ্টকিত

জটিল নয়, নিতান্তই সহজ সরল। ফুল যেভাবে ফোটে, বালক যেভাবে খেলা করে, মা যেভাবে সন্তানকে বুকে রাখিয়া আদর করেন, তেমনই সহজ সরল ও সুন্দর নয় কি জীবনের পরম সত্য ? আর সেই সহজ সরল সুন্দর সত্যেরই এক অনির্ব্বচনীয় ও অনবদ্য প্রকাশ নয় কি এই রবিনসন ক্রুশো নামক মহাগ্রন্থ ?

আধুনিক সাহিত্যের যে মোহিনীশক্তি লক্ষিত হয় যৌন আবেদনে (sex-appeal) তাহা এই পুস্তকে একান্তই অবিদ্যমান। ৩১৩ পৃষ্ঠার এই বইখানার মধ্যে আদিরসের ইঙ্গিতও মিলে না। কামগন্ধের বিন্দুমাত্র নাই, এমনকি প্রচ্ছন্ন প্রেমাসক্তির বাষ্পটুকুও নাই। আদিরস-প্লাবিত যুগধর্ম্মের একটি ব্যতিক্রম এই বইখানা—anachronism বলা চলে। এই পুস্তকের অনাবিল স্বাস্থ্যপ্রদ শুষ্ক আবহাওয়ার (dry climate) মধ্যে আদিরসের ক্লেদ জমিতে পারে নাই—শুচিশুভ্র শিবের পূতদেহে কাম-কালিমার স্পর্শ বা লেশমাত্র নাই। ক্রুশো যখন এই দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি তরুণ যুবক। তাহার পর প্রায় আটাশ বৎসর কাটিল তাহার এই নির্জ্জন নারীহীন নির্ব্বাসনে। প্রথম যৌবনের আতপ্ত ফাল্গুনে, বর্ষামুখর সন্ধ্যায় অথবা জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্র-সৈকতে একমুহূর্ত্তের জন্যও প্রিয়ার মুখচ্ছবি তাহার চিত্তপটে উদিত হয় নাই, ইহা কি অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত বলিয়া অনেকের মনে হয় না ? ঐ প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা-বিধুর দিনে ক্ষণেকের জন্যও কি নারীর চিন্তা তাহাকে উন্মনা করে নাই ? ইহা কি স্বাভাবিক, না সম্ভবপর ? দ্বীপে কত লোক আসিল, কত অঘটন ঘটিল, কিন্তু সেখানে নারীর আগমন বা আবির্ভাব কি একেবারেই অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ? নারীর বাস্তব আগমন ত দূরের কথা, তাহার স্মৃতি, চিন্তা এবং কল্পনাও যেন সেখানে নিষিদ্ধ। এই শৈবদ্বীপে কি শিব-সেবক নন্দী নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন—নারীর এখানে স্থান নাই (no admission for women) ? কথায় বলে "কানু বিনা গান নাই"—sex ছাড়া literature নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আদিরস-প্লাবিত যৌন-আবেদনাবিষ্ট সাহিত্যের যুগে রবিনসন ক্রুশো হইতেছে এমন একখানা বই যাহার মধ্যে যৌন-আবেদনের বালাই নাই, এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যৌন-আবেদন-হীন এই বইখানা আদি-রসাশ্রিত কোনও বইর চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। Sexless literature-ও যে উচ্চ পর্য্যায়ে স্থান পাইতে পারে রবিন্‌সন্ ক্রুশোই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উত্তর-কাণ্ডে ক্রুশোর বিবাহ হইয়াছিল—বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। পূর্ব্বরাগের বালাই নাই, পত্নী-বিয়োগে অশ্রুর বন্যা বহে নাই। matter-of-fact এবং businesslike তিনটী লাইনে বিবাহ-জীবনের আদ্যন্ত বর্ণিত—"I married, and that not either to my disadvantage or dissatisfaction, and had three children, two sons and one daughter. But my wife dying……" কেহ যদি ক্রুশোকে অরসিক বা হৃদয়হীন বলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইব না। যে অবস্থায় ও পরিবেশে বাঙ্গালী তরুণ প্রিয়ার কথাই ভাবিতেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে অশ্রু-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন বা কবিতা লিখিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতেন তেমন পরিবেশে ক্রুশো যে অনুরূপ কিছু করেন নাই তাহাতে কি তাঁহার রসজ্ঞতার তথা হৃদয়াবেগের অভাব অনুমিত হয় ?

এইবার সহৃদয় পাঠকদের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে আমার মূল প্রতিপাদ্য স্থাপন করিতে চাই। আমার বিবেচনায় ক্রুশোই হইতেছেন খাঁটী ইংরাজ—ইংরাজ-চরিত্রের সত্যিকার প্রতিনিধি বা প্রতীক। তাহার মধ্যে আমরা আদর্শবাদ, ভাবুকতা, তাত্ত্বিকতা, কবিত্ব বা কল্পনা ততটা দেখিতে পাইনা যতটা দেখিতে পাই পার্থিব-জনোচিত কাণ্ডজ্ঞান (common sense), বাস্তব-মুখীনতা, কর্ম্ম-পটুতা এবং বৈষয়িক বোধ। এই হিসাবে সেক্সপীয়র, মিল্টন, নিউটন, গ্লাড্‌ষ্টোন্ ইংরাজের representative man ন'ন—বরং সাধারণ গড়পড়তা ইংরাজচরিত্রের ব্যতিক্রম, যেমন বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালীচরিত্রের ব্যতিক্রম। ক্রুশো সমুদ্রোপকূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাড়ীর কথা ভাবিয়া হাপুস নয়নে কাঁদেন নাই, পিয়ামুখচন্দ্রর স্বপ্ন দেখিয়া, জীবনের ট্রাজেডি লিখিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। জন-মানব-হীন দ্বীপকে নিজের অর্থাৎ মানুষের বাসোপযোগী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

কতনা ফিকিরফন্দি, কত উদ্যোগ আয়োজন, কত কলা-কৌশল, নিশিদিন অবিশ্রান্ত কত না অনুষ্ঠান! এই ত কর্ম্ম-দক্ষ কর্ম্ম-কৌশলী কর্ম্মযোগী ইংরাজ। ভক্তি যোগ নয়, রাজ-যোগ নয়, জ্ঞানযোগ নয়, বক্তৃতা নয়, লেখা নয়, কর্ম্মবীরের একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা। প্রতিকূল অবস্থায়, পড়িয়া হাজার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঁচিবার এবং মানুষের মত বাঁচিবার জন্য এই যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও ও উদ্যম—এই ত ইংরাজ-চরিত্র! একাধারে কারিগর, মিস্ত্রি, ছুতার, কুমার, দর্জি, চাষী, গৃহ-নির্মাতা, পশুপালক, শিকারী, এবং কি নয়? ক্রুশো বিদ্যাবুদ্ধিতে অতি সাধারণ মানুষ—কোন দিক দিয়া অসাধারণ হবার কোন দাবী তাহার নাই, কিন্তু তিনি সদা জাগ্রৎ, সতর্ক, নিরলস ও কর্ম্মতৎপর। যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান অর্থাৎ commonsense এবং যাহাকে বলে কর্ম্মকৌশল (hard practicalilty) এই দুইটী গুণ তাহার চরিত্রে পুরামাত্রায় বিদ্যমান। প্রাচ্যদেশে এই দুইটী গুণের কিন্তু অনেক সময়ে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যাহার নাম commonsense তাহা প্রকৃতই তেমন common নয়, আর যাহাকে বলে hard practiclity তাহা এ দেশে আরও দুর্লভ। end and means উদ্দেশ্য ও উপায়ের সার্থক যোগসাধন আছে এই কর্ম্ম—কৌশলের মূলে। আমরা কাঁদিতে ও কাঁদাইতে জানি. বড় বড় বুলি বলিতে ও শুনিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমাদের দেশে কাজের কাজী কয়জন? ক্রুশো চরিত্রের এই ইংরাজ—সুলভ কর্ম্ম কৌশল ও কর্ম্ম পটুতাই বোধ হয় আমাদের মত ভাব বিলাসী ও বাক্ সর্ব্বস্ব কর্ম্মপঙ্গু বাঙ্গালীকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

রবিনসন্ ক্রুশোর যাত্রা আরম্ভ হয় জলে, শেষ হয় স্থলে এদিক দিয়া দেখিলে বইখানা উভচর বটে। তবে পৃথিবীর যেমন তিন ভাগই জল, এক ভাগ মাত্র স্থল—বইখানার interestও তেমনই বারো আনাই জলের—সমুদ্র যাত্রা এবং বাধাবিঘ্ন ও বিপদ আপদের মধ্যে সমুদ্রের বুকে দুঃসাহসিক অভিযানে! কি দুর্নিবার আকর্ষণ এই সমুদ্রের। পঞ্চভূতের মধ্যে দ্বিতীয় যে অপ তাহাই এই পুস্তকের প্রধান উপজীব্য ও অবলম্বন। জল জমিয়াই বরফ হয়, সুতরাং বরফও জলেরই রূপান্তর। এই হিসাবে আদি পর্ব্বে সমুদ্রের জল এবং অন্তে স্থলপথের তুষার সলিল তত্ত্বেরই দুই রূপ—এক বস্তুরই এপিঠ আর ওপিঠ। দিগন্ত-বিস্তৃত নীল বারিরাশির যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহারই পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থকার তুষারাচ্ছন্ন স্থল পথের বর্ণনা দিয়াছেন উত্তর কাণ্ডে। তিমি-মকর-সঙ্কুল বাত্যা পীড়িত উত্তাল তরঙ্গ মালা বিক্ষুব্ধ অশান্ত সাগরের এবং নরখাদক অসভ্য বর্ব্বরদের দ্বারা আক্রান্ত সমুদ্রোপকূলের ভয়াবহ বর্ণনার পরিশিষ্ট হিসাবে পাইতেছি তুষারাচ্ছন্ন ভূপ্রদেশের ছবি, আর সেখানে মিলিতেছে বুভুক্ষু হিংস্র ভালুকের ও নেকড়ের সঙ্গে মোলাকাৎ। সমুদ্রের ও সমুদ্রোপকূলের বর্ণনাতেই যে শুধু লেখক সিদ্ধহস্ত এমন নয়,তুষারাবৃত জনহীন প্রান্তর ও বনপ্রদেশের বর্ণনায়ও তাঁহার লেখনী সার্থক। কুয়াসায় ঢাকা আকাশ, বরফে ঢাকা পাহাড়, সমুদ্রের সুনীল জলরাশি এই তিনের সঙ্গেই ব্রিটেন নন্দনের আজন্ম ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। গ্রন্থকারের অবচেতন মানসে প্রকৃতির সেই রূপই বোধ হয় ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার একাংশ গ্রন্থের উত্তরকাণ্ডে অনিবার্য্যরূপে স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্রুশো যে দ্বীপে জীবনের শ্রেষ্ঠ আঠাশ বৎসর কাটাইয়াছেন তাহা উষ্ণ প্রধান ভূ প্রদেশ—সেখানকার আবহাওয়া বিলাতের আবহাওয়ার মত হিম-শীতল নয়। কিন্তু শীতের ও বরফের দেশের এই মানুষটীর চিরপ্রিয় আবহাওয়া উত্তর-কাণ্ডে বর্ণিত দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য অভিযানে তাহার নিজস্ব প্রাপ্য গৌরব লাভ করিয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও সেই বর্ণনার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।

ফ্রাইডের সঙ্গে ক্রুশোর ধর্ম্ম প্রসঙ্গে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাও ক্রুশোর চরিত্রের উপর আলোকপাত করে। specnlative thonght অর্থাৎ সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকতার রাজ্যে এই কাজের লোকটী দেখিতেছি শিশুর মতই সরল ও অসহায়। তাহার এই শিশু সুলভ সরলতা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে আংশিক অক্ষমতা পাঠকের মনে কৌতুকের উদ্রেক করে না কি? ফ্রাইডের প্রশ্নের কোন সন্তোষ জনক সদুত্তর দিতে পারেন নাই তাহার এই মনিব—শিক্ষক। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে শয়তানের সহাবস্থান (শান্তিপূর্ণ নয় নিশ্চয়ই) কৌতুককর নয় কি? বাইবেলে বর্ণিত অশুভ তত্ত্বের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা ও হাস্যকরত্ব আছে তাহা আজন্ম সঞ্চিত সংস্কার ও শিক্ষার জন্য খৃষ্টানগণ

ধরিতে পারেন না। ব্রহ্মের মায়া ও সূর্য্যের মায়ার মতই এই অশুভ (evil) কি আদিত্বের নিত্য সনাতন সত্যের মতই গৃহীত হইবে ?

পিতার হিতোপদেশে কর্ণপাত না করিয়া এবং পিতা-মাতার স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া সমুদ্রের ডাকে যে তরুণ বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল তাহার পরিণাম কি ভাল হইয়াছিল ? স্নেহময় সাংসারাভিজ্ঞ প্রবীণ পিতার হিতৈষণা প্রণোদিত সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে অবাধ্য পুত্র নিজের খেয়ালখুসিতে গৃহত্যাগ করিয়া গেল সে নিজের দুর্দশা নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সে অনুতপ্তচিত্তে পিতাকে স্মরণ করিয়াছে এবং মনে মনে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে। নির্জন দ্বীপে যে প্রায় তিনদশকের মত তাহার নির্ব্বাসন হইয়াছিল তাহা পিতামাতার অভিশাপ ছাড়া আর কি ? বিধাতার মঙ্গলময় বিধানের ও ন্যায়-বিচারের উপর ক্রুশোর যেমন ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস পিতার বিচক্ষণতার ও স্নেহ পরায়ণতার উপরেও ছিল তেমনই অখণ্ড আস্থা। গৃহত্যাগী পিতৃদ্রোহী এই সন্তানের বুকের মধ্যে পিতৃভক্তির অন্তঃসলিলা ধারা বরাবর নীরবে বহমানা ছিল। পিতার প্রতি যে ক্রুশো অন্যায় করিয়াছে তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। তাহার অনুতাপ ও সখেদ উক্তি আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে।

শ্বেত-জাতির প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজের প্রতি নায়কের মমতা ও পক্ষপাতিতা এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। Racial feeling, race-superiortlyএর বোধ প্রচ্ছন্ন নাই, বরং বেশ প্রকট হইয়াছে। সাদাজাতির পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। তবে সাদার প্রতি অনুরাগ কালোর প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। ড্যানিয়েল ডিফোর ভাষা বিংশ শতাব্দীতে একটুখানি quaint, অদ্ভুত বা সেকেলে বলিয়া মনে হয় নাকি ? এই বইর কোন কোন স্থানে রচনারীতি ঠিক আধুনিক নয়—বর্ত্তমান যুগের পাঠকের কাছে যেন কেমন কেমন ঠেকে। কোন কোন শব্দের ব্যঞ্জনাও কালক্রমে একটু বদলাইয়াছে বই কি ! ডিফো নিশ্চয়ই প্রথমশ্রেণীর লেখক নয়, কিন্তু তাঁহার রচিত রবিন্‌সন্ ক্রুশো গ্রন্থখানা উৎকর্ষের মাপকাঠিতে কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে তাহা বিচার্য্য। "কবিষু কালিদাসঃ, কাব্যেষু মাঘঃ" উক্তিটী তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। প্রথম শ্রেণীর লেখকের সকল লেখাই যে প্রথম শ্রেণীর হইবে এমন নয়, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের রচনা-বিশেষ প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে। ডিফোর প্রণীত রবিন্‌সন্ ক্রুশো সম্বন্ধে এ সূত্রটী কতখানি প্রযোজ্য ?

এই একনায়ক গ্রন্থের নায়ক ক্রুশো সুস্থ, সবল, সহজ স্বাভাবিক মানুষ—তাহার চরিত্রে বাহয়াছে আশ্চর্য্য ভারসাম্য গ্রীক-জীবনবেদের যাহা আদর্শ। কোনদিকে কোন আতিশয্য, উৎকেন্দ্রতা নাই তাঁহার প্রকৃতিতে। তিনি সহৃদয়, কিন্তু ভাবাবেগের অধীন নন। তিনি উদার, মহৎ, ক্ষমাশীল, বিবেচক ও বুদ্ধিমান। রক্ষিত, প্রতি-পালিত, আশ্রিত, অনুগৃহীত, উপকৃত, অধীন অনুগত-জনের প্রতি তিনি সদয় ও ন্যায়-পরায়ণ। তাহারা তাহাকে মনিব, কর্ত্তা, প্রভু, অধিনায়ক বলিয়া উল্লেখ করে (master, commander এবং governor)। গ্রন্থের নামকরণ বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে। ক্রুশো এক এবং অদ্বিতীয়ই বটে। তাহার পাশে এক শূন্য বসিলে দশ। দুই শূন্য বসিলে শত হয়; তাহাকে মুছিয়া ফেলিলে সব শূন্যই কিন্তু হয় মূল্যহীন। তাহার মানবতার ও হৃদয়বত্তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কাপ্তেনের বিদ্রোহী নাবিকদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার রাজোচিত মহিমায় পূর্ণ। বালুর উপরে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছে, রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। ভয়ে মানুষ নিষ্ঠুর হয়—ইহা মনো-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। চরম আতঙ্কেও কিন্তু ক্রুশো মানবতা বিসর্জন দেন নাই। রক্তপাত করিতে তিনি ছিলেন সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। পারৎপক্ষে তিনি রক্তপাত করেন নাই এবং করিতে দেন নাই। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ কৃতজ্ঞতা। জীবনে যাহার নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়াছেন সারাজীবন তাহা মনে রাখিয়াছেন এবং শতগুণে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বৃদ্ধা মহিলার এবং প্রাচীন কাপ্তেনের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে ক্রুশো সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইবে তাহা

হয়ত কিঞ্চিৎ রূঢ় শোনাইবে। কিন্তু উপায় নাই। আলোচনার অঙ্গহানির ভয়ে অপ্রিয় সত্যটুকু ও বলিতে হইবে। ইংরাজজাতিকে যে দোকানদারের জাত্ nation of shop-keepers) বলা হয় এ উক্তিটী অ-যথার্থ নয়। বৈশ্যের ধর্ম্ম রহিয়াছে ইংরাজের অস্থি মজ্জায়। ইংরাজের স্বভাব বৈশ্যের স্বভাব—তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে ফরাসী জার্ম্মান এবং রাশিয়ান্, এমনকি নিকট প্রতিবেশী আইরিশ হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। আদর্শবাদ, ভাবুকতা, ধ্যান তন্ময়তা, ভক্তি-বিহ্বলতার বালাই নাই এই বণিক জাতির। "কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং-বৈশ্য-কর্ম্ম-স্বভাবজম্"—মধ্যে বাণিজ্যই এই বৈশ্যজাতির প্রধান বৃত্তি ও অবলম্বন, বলিতে গেলে পেশা ও নেশা। এই বাণিজ্য-সূত্রেই ভারতে ইংরাজের সাম্রাজ্য-লাভ হইয়াছিল। রাজত্ব পাইয়াও কিন্তু বণিক তাহার বণিক-বৃত্তি ভুলিতে বা ছাড়িতে পারে নাই। রাজ্যকেও প্রকারান্তরে ব্যবসায়ে পরিণত করার ফলে ইংরাজের বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে ভারত সাম্রাজ্য হারাইতে হইয়াছে। এ সম্পর্কে মুসলমানের সঙ্গে ইংরাজের তুলনা ঐতিহাসিকের মনে আপনি আসিয়া পড়ে। উৎপীড়ন অত্যাচার ধর্ম্মান্ধতা সত্ত্বেও মুসলমান শাসকের মধ্যে রাজোচিত গুণ লক্ষ্য করা গিয়াছে যাহা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই স্বাভাবিক। রবিনশন্ ক্রুশোর উপসংহারে এই বৈশ্যধর্ম্মের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রুশোর পরিত্যক্ত খামার (plantafion) ও তাহার বিলিব্যবস্থা, প্রতিনিধি-নিয়োগ, দলিল-দস্তাবেজের মোসাবিদা, আইন-আদালতের প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন উপযোগী প্রক্রিয়া ও পন্থা অবলম্বন, টাকাকড়ির হিসাব-নিকাশ, অংশীদারের বখ্রা নির্ণয় একজন বিষয়ীর পাকা ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয়। কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের, অমনোযোগের ভুলত্রুটীর অবকাশ মাত্র নাই। সভ্যসমাজের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বৎসর সংস্রবশূন্য এই নির্জ্জন দ্বীপবাসীর ব্যবসায়-বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। কবিত্ব নয়, কল্পনা নয়, ভাবুকতা নয়, তাত্ত্বিকতা নয়, অতীতের রোমন্থন নয়, নিছক নিরেট ব্যবসায়-বুদ্ধি ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই কি সংসার বিরাগীরা "পাটোয়ারী বুদ্ধি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন? সে যাহাই হউক, ইংরাজীতে ইহাকে বলে prudence and practical common sense অর্থাৎ কাজের লোকের 'কেজো' বুদ্ধি, এই মাটীর পৃথিবীর সাধারণ সহজ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানের এবং দৈনন্দিন জীবনের স্থূল বাস্তব পরিচয়।

রবিন্সন্ ক্রুশোর মধ্যে নবরসের কোন রস কি পরিমাণে আছে রসিকজনই তাহা বলিতে পারেন। জীবন-প্রভাতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় এই জীবন-সন্ধ্যায় সেই পুরাতন বন্ধুকে আবার স্মরণ করিতেছি।

চরৈবেতি

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত, দুর্মদ আমি ধেয়ে চলি সমুখের পানে
অনন্ত জিজ্ঞাসা আজ, সদা যেন বাজে মোর কানে।
"চরৈবেতি" আসে ডাক, "একাল তো এগোনর কাল্,
পিছনেতে নয় থাকা, নয় আর ছেড়ে দেওয়া হাল্।
পিছনের অভিশাপ, পিছনেই থাক পড়ে থাক
অগ্রগামী এস তুমি, বাধা যত যাক সড়ে যাক।"

শুনি আমি সে আহ্বান, বার বার, অশান্ত হৃদয়ে।
শুনি আমি সে আহ্বান, ছুটে যাই, কত আশা লয়ে।
এ আশা বাঁচার আশা, মরিব না আমি রব বেঁচে।
আপনার মৃত্যুদণ্ড, প্রতিদিন লবনাকো যেচে
আমি যে বাঁচিতে চাই মানুষের মত এ ধরায়
মরিতে চাইনা আমি প্রতিদিন রোগে ও জরায়।

ডাকিছে উদার নভে, সম্মুখের আসে আহ্বান
দুরন্ত দুর্মদ আমি, শুনেছি যে নতুনের গান।
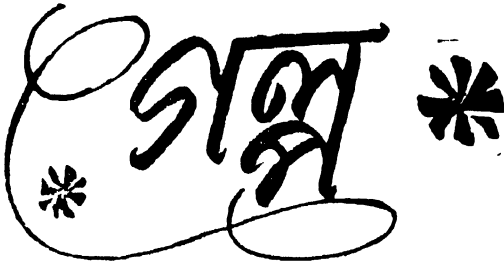
ষ্ট্রাইক

জ্যোৎস্না গুহ

একি ! স্কুল থেকে চলে এলি যে ? মুচকী হেসে বইগুলি টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দীপু বলে—"ছুটি হয়ে গেল।" বিস্মিত রমা প্রশ্ন করে—"কেন রে ?" "মাষ্টাররা মাইনে বাড়াবার জন্য ধর্ম্মঘট করেছেন।" "বেড়ে মজায় আছিস তোরা, রোজই ষ্ট্রাইক, পড়াশুনা হবে কি করে আর শুনি ?" "তা আমাকে কেন বলছ, মাষ্টারদের গিয়ে বলে এলেই পার ?" "এত মেজাজ দেখাচ্ছিস কেনরে হতভাগা, পূজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই পরীক্ষা, সেদিকে খেয়াল আছে ?" ততক্ষণে দীপু একটি বল নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিয়েছে। তা দেখে রমা গলার স্বর আরো এক পর্দা চড়িয়ে বলেন—"এখন রাত দিন খেলে বেড়াস, তা হলেই পরীক্ষাতে সব বিষয় ঐ বলের মত গোল্লা নিয়ে বাড়ী আসতে পারবি।" "মোটেই নয়" বলে ক্লাশ ফাইভের ছাত্র দীপু প্রতিবাদ জানায়। রমা নিজের মনেই গজরাতে থাকে। "তাই বলি রোজই যদি এ-রকম একটা না একটা ছুঁতো লেগে থাকে, তবে ছেলে মেয়ের পড়াশুনো হয় কি করে। হ্যাঁরে শুনছিস—তোদের দিন দশেক আগে একবার ধর্ম্মঘট একটা হলো না ?" দীপু এক দুই তিন করে বল লুফেই যেতে থাকে। চীৎকার করে বলে রমা—"হ্যাঁরে মুখপোড়া ছেলে, জবাব দে ?" দীপু সরু গলায় মাকে বলে—"সে তো পরীক্ষার প্রশ্ন শক্ত এসেছিল বলে, ছেলেরা 'প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট' করেছিল।"

"আরে ঐ হলো, ধর্ম্মঘট তো বটেই। তোদের কপাল তো সব রকমেই চচ্চড়ি হচ্ছে।" "তা আমি কি করবো, তুমি গিয়ে ওদের বলে এলেই পার ?" "আবার চোপা দেখনা ! হ্যাঁরে, বিদ্যাদিগ্‌গজ, সেদিকে খেয়াল আছে, যে ফাইভ থেকে আর সিক্সে উঠতে হবে না ?" মার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু বলে, "কেন হবেনা শুনি ?" "কি করে হবে, তাই বল ? রোজ যদি ধর্ম্মঘট হরতাল চলে—তবে ঐ খোল করতাল বাজান ছাড়া আর কি করবি ? স্কুল তোদের শিকেয় উঠে গেল। স্কুল হবে না, পড়াশুনো হবে না, কিন্তু মাস অন্তে মাইনেটি পুরোই নেবে।" দীপু রেগে বলে—"না দিলেই পার ?" "না দিলে যে নাম কেটে দেবে। কাটা নাম আবার জুড়তে বাপের তিন জোড়া জুতো ছিঁড়বে, তবু নাম জুড়বে কিনা সন্দেহ। তুই তো খুব মজায় আছিস, যত দায় তো আমাদের। মাস-খানেক আগে এসে একদিন বললি—"মা, স্কুলে আর যাওয়া যায় না, মেথররা ষ্ট্রাইক করেছে, নোংরা জমে ডাঁই হয়েছে—ফলের খোসা, কাগজের টুকরো, ঠোঙ্গা, ভাঁড় কত জঞ্জাল জড়ো হয়েছে,—বাথরুমে ঢুকলে দুর্গন্ধে অজ্ঞান হয়ে যেতে হয়।" ভেবে আর বাঁচিনে শেষটায় অসুখ-বিসুখ একটা হয়ে না পড়ে।" দীপু খেলতে খেলতেই জবাব দেয়—"সে তো ওদের মাইনেই কুলোয় না বলে।" "আরে ঐ হলো—তোদের দফা তো গয়া হলো। আধঘণ্টা স্কুল হয়ে ছুটি হয়ে যেত, তারপরে সারা দুপুর হাড়মাস ভাজাভাজা করতিস। পড়াশুনা তো হবেই না একটু আটকা থাকলেও দুপুরে দুদণ্ড ঘুমিয়ে বাঁচি।" দীপু বলে—"স্কুল ছুটি হয়ে গেলে কি আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব ?" "তা বেড়াবি কেন ? বাড়ী এসে আমার শ্রাদ্ধ করবি। স্কুলের কেরাণী হতভাগা যে কম মাইনে বলে, তিন দিন না খেয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে স্কুলে পড়ে রইল, তার মাইনে স্কুল কমিটি বাড়িয়ে দিয়েছিল ?" "বাড়ায়নি আবার ! এক সঙ্গে দশটাকা বাড়িয়ে দিয়েছে।" "মরণ আমার ! এই দুর্মূল্যের বাজারে দু-দশ টাকা বাড়লেই বা কি হয়।"

"তা ওরা কি করবে ?" "ওরাই তো সব নষ্টের গোড়া তা তুই বুঝবি কি রে মুখ্যুর সর্দার ? লেখা নেই, পড়া নেই,

সব সময় আছে খেলা। এই যে এতক্ষণ স্কুল থেকে এসেছিস, একটু বইখানা নিয়ে বসলেও তো পারতিস ?" "এই তো দু মিনিট হলো এসেছি।" "এই তোমার দু'মিনিট ? আমার বকে বকে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল—আর তুই বলছিস দু'মিনিট ? যত মরণ হয়েছে মা, বাপের—বাপ, মা হয়ে যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।"

অফিস থেকে এসেই বিনয়বাবু, দীপুর বাবা বললেন—"ওগো শুনছো, কাল আমরা ষ্ট্রাইক করছি।" "ওমা! তোমরাও আবার ষ্ট্রাইক সুরু করে দিলে ?" "কেন তুমিই তো বলতে, এই মাইনের কি সংসার চালান যায় ? সকলে এক জোট হয়ে ষ্ট্রাইক কর,—তবেই বাবুধনেরা বাপ বাপ করে মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবে। আজ এখবরে তুমিই রেগে আগুন !"

"না হয়ে কি ক'রে বল, দীপুর স্কুলের হতচ্ছাড়া মাষ্টারগুলোও যে ষ্ট্রাইক করেছে। দীপুরা স্কুলে গিয়েই চলে এসেছে। আর সারা দুপুর ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়িয়েছে। তুমিই বল স্কুল এমন ঘন ঘন ষ্ট্রাইক হলে, ছেলেগুলোর দশা কি হবে ?" দীপু ঘুড়ি লাটাই যথাস্থানে রেখে দিতে দিতে বলে, "তা কি করবে, মাষ্টারদের সংসার না চললে ?" "তুই চুপ করতো হতভাগা ছেলে, মাষ্টারদের হয়ে তোর আর ওকালতী করতে হবে না। নিজের পড়াশুনো করতে হবে না তাই বল—মাষ্টারদের দুঃখে তো তোর বুক ফেটে যাচ্ছে।"

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বলেন—"তা ওকে বকছ কেন ? অভাব অনটনের জ্বালায় মরিয়া হয়েই না লোকে এই পন্থা অবলম্বন করছে। তা না হলে ভেবে দেখ, আমাদের ছোট বয়সে কখনও ধর্ম্মঘট হতে শুনেছি ? অনেকে তো শব্দটার অর্থই প্রায় জানতো না।" রমা বলে—"ওসব কথা এখন রেখে দাও। দীপুটার কি দশা হবে তাই চিন্তা কর। মাঠে ময়দানে গলা ফাটিয়ে মুরুব্বিরা ছাত্রদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর বলে তো লেকচার দিয়ে হাততালি কুড়ান, এখন দেখে যান এসে, বংশধরদের অবস্থা ! যত সব ছেঁদো কথায় কান ভারি করা লোকদের। জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে যখন তোদের দোষে, দে—বেশী করে মাইনে বাড়িয়ে, চুকে যাক ল্যাঠা। আমাদের হাড়েও বাতাস লাগুক।"

বিনয়বাবু ও দীপু জানে, রমার যখন মুখ ছোটে,—তখন পাগলা ঘোড়াও ছুটে তার সঙ্গে পারবে না। কিন্তু বিপদ হলো পরের দিন। ঠিকা ঝি নোটিশ দিল, এই মাইনেতে মাগ্গি গণ্ডার দিনে সে কাজ করতে পারবে না। মাইনে না বাড়ালে, কাল থেকে সে আর কাজে আসবে না।

শুনে রমা মাথায় হাত দিয়ে বসল। "এখন উপায় ! এই আড়াই মুনি দেহ নিয়ে, বাসন মাজা, মসলা বাটা, ঘর মোছা, কি করে সম্ভব হবে আমার পক্ষে ?" দুদিনেই ঘরে জঞ্জালো ধুলো, গেলাসের আঁসটে গন্ধে জল খাওয়া যায় না, আর সেদ্ধ তরকারী খেয়ে খেয়ে জিবও আহার গ্রহণে শীঘ্রই ধর্ম্মঘট করবে মনে হচ্ছে। বেগতিক দেখে বিনয়বাবু বললেন—"ওগো, খবর পাঠাও ঝিকে—দেব কিছু মাইনে বাড়িয়ে।" রমা হেসে বলে—"তাই দাও, ওরাও তো ছাপোষা মানুষ ; কুলোতে পারবে কেন এই বাজারে।" এল ঝি, বাড়ী-ঘর আবার ঝকঝক করে হেসে উঠল, তরকারীতে পড়ল মসলা, খেতে হলো উপাদেয়, জল খেয়ে গেলাসে এতদিন পরে তৃপ্তি পেল সকলে।

গতানুগতিক দিনগুলি কাটছিল মন্দ নয়। বিভ্রাট বাঁধালে রান্নার লোকটা। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, দুম করে বলে বসল, "মা, বুঝতেই তো পারছেন, এ মাইনেতে আজকাল আর সংসার চলে না। অন্ততঃ আরো পাঁচটি টাকা না বাড়িয়ে দিলে, কাল থেকে আমি আর রান্না করতে পারব না।"

"যাস হয়ে গেল তো !" রমার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত অন্ধকার হয়ে যায় দুশ্চিন্তায়। "এই গরমে দুবেলা আগুন তাতে গিয়ে রান্না করতে হবে নাকি ? সে আমা দ্বারা অসম্ভব।" খবরটা শুনে বিনয়বাবুর চোখ, গোল আলুর আকার ধারণ করল। পরের দিন আফিসে গেলেন না খেয়ে,—কারণ তখনও রান্না হয়নি ! রাতে ন'টার খাওয়া খেলেন, রাত এগারোটায়। পরের দিন বদহজমে চোঁয়া ঢেকুর উঠে, অতিষ্ঠ করে মারলে সারাদিন। বাধ্য হয়েই বললেন—"ওগো লোকটিকে খবর দাও, মাইনে কিছু বাড়িয়েই দেব।" রমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"দীপু তো ওর বাড়ী চেনে, কাছেই থাকে, বলে আসুক গিয়ে এখুনি। বাব্বাঃ, এসে পড়লে হয় এখন।"

যথারীতি পাঁচ রকম মাছ তরকারী দিয়ে খেয়ে বিনয়বাবু এবং দীপু অফিসে স্কুলে গেল। রাত্রি ৯ টায় রান্নাঘরে শিকল পড়ে গেল, আবার যে-কে সেই। এ ঘটনার দু'দিন পরে রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে, আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নিয়ে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল, ফলে পরের দিন রমা চাবীর গোছা বিনয়বাবুর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—"সবাই ধর্ম্মঘট করতে পারে, আমি পারিনা,—রইল পড়ে তোমার সংসার আমি আর দেখতে শুনতে পারবো না।"

অফিস যাওয়ার সময় বিনয়বাবু পড়ে গেলেন বিপদে, চেঁচিয়ে বলেন—"আহা, বলই না, কোথায় আছে আমার সার্ট প্যাণ্ট ?"

সেদিক থেকে কোন উত্তর এল না। এদিকে বেলা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে হাতড়ে নাৎড়ে কোন রকমে বের করলেন সার্ট প্যাণ্ট—কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য সার্টে নেই বোতাম !

রেগে আগুন—"দূর শালা, শুধু গেঞ্জি পরেই অফিস যাব।"

রমা হাসি আঁচল চাপা দিয়ে লুকোয়।

—"দূর ছাই, জুতোটা গেল কোথায় ? ও ধার থেকে বিনয়বাবুর অসহায় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে "নাঃ, আর পারি না! এরা সবাই মিলে আমার পিছনে লেগেছে। আশ্চর্য্য এদের তো জড় পদার্থ বলেই জানতুম, কিন্তু দেখছি তা নয় সময় বুঝে এরাও দাম বাড়াতে জানে।" বিপন্নস্বরে বিনয়বাবু বলেন—"দাওনা খুঁজে রমা! এর পরে অফিস গেলে কি আর চাকরী থাকবে ? তখন গুষ্ঠিশুদ্ধ উপোষ করে মরবো।"

এ-ওষুধে কাজ হলো। নড়ে চড়ে বসলো রমা।

বিনয়বাবু হাত জোর করে বলেন,—"আমার ঘাট হয়েছে, এই বারটি ক্ষমা কর।"

তারপর অবশ্য সামনের মাসের মাইনে পেয়েই এক জোরা চুড় গড়িয়ে দিতে হবে, এই সর্ত্তে সংসারের হাল আবার পুনরুদ্যমে চেপে ধরলে রমা। আজ মাসের পয়লা—বিনয়বাবু সকলের দাবী মিটিয়ে দিয়ে, অল্প কিছু টাকা হাতে নিয়ে ভাবেন—এই ক'টা টাকায় সমস্ত মাস চলবে কি করে!

শাশ্বতী

শ্রীঅমিয়কুমার বসুমল্লিক ; পুরাণরত্ন

ক্লেদাক্ত পরিবেশে, হায়, বিষাক্ত বায়ু
ফুরায়ে দিয়াছে আজি পঙ্কজের আয়ু!
ধূলিমাখা ছিন্নভিন্ন শুষ্ক শতদল—
পড়ে আছে হতাশের দীর্ঘশ্বাস কেবল।
অগ্নিবর্ষী ড্রাগনের কুটিল অভিশাপ ;
পঙ্কমাঝে ঘৃণ্য যত বিষবাহী সাপ ;
নোংরা কদর্য বায়ু অসহ্য পরিবেশ ;
বুঝি তামসী রাত্রিই সত্য, দিন হল শেষ।

*　　*　　*

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
পঙ্কজের সৌন্দর্য তবে কি হবেই মলিন ?
শাশ্বত চিরন্তন যত কবি বাণী
ম্লান হয়ে রবে শুধু ব্যর্থতা আনি' ?

*　　*　　*

উন্মুক্ত মেঘরাজ্যে নক্ষত্রের বাণী
সহসা পশিল কণ্ঠে রৌদ্র পরশ আনি'।
বিস্ময়ে আনন্দে আমি দেখিলাম চাহি'
উত্তরের ধ্রুবতারা একি, উঠিয়াছে গাহি'!
দেখিলাম নক্ষত্রের দীপ্তিতে উজ্জ্বল
অপরূপ শোভায় ফুটন্ত কমল :
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি যক্ষ বিরহিণী,
ধ্রুবতারা মাঝে জাগে প্রিয় কমলিনী।

*　　*　　*

মর্তের অনেক উর্ধ্বে নাগিনীর পাশ
সৌন্দর্যের পুষ্পে আর করিবে না নাশ
স্থিরদীপ্তি শান্ত জ্যোতিঃ আশার
　　　　আলোক
প্রেরণার উৎসমুখ অনির্বাণ পাবক।

ভারতে খাদ্য সমস্যা—

ভারতের সর্ব্বত্র খাদ্য সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। কোন রাজ্য অপর কোন রাজ্যকে উদ্বৃত্ত খাদ্য দিতে সম্মত হইতেছে না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। কিন্তু কতকগুলি রাজ্য অ-কংগ্রেসী সরকার হওয়ায় এই জটিলতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এতদিন অনেক রাজ্যে বেশী দামে খাদ্য ক্রয় করিয়া কম দামে তাহা দেশের লোককে বিক্রয় করা হইত। এই ব্যাপারে যে ঘাটতি হইত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম দিল্লীতে ঘোষণা করিয়াছেন যে কোন রাজ্য বেশী দামে খাদ্য দিতে পারিবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাবই তাহার কারণ। পশ্চিমবঙ্গের খোলা বাজারে চাল ১টাকা ৫০ পয়সার স্থলে দুই টাকা কিলো দরে বিক্রয় হইতেছে। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দামে সারা বাংলায় ধান ও চাউল ক্রয় করিতেছেন তাহাতে বর্ত্তমান মূল্যে রেশনের দোকানে চাউল বিক্রয় হইলে বৎসরের শেষে কয়েক কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। এতদিন কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে সেই ঘাটতি পূরণ হইত, কাজেই এই সমস্যা বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাকে চঞ্চল করিয়াছে। রেশনের দোকানে চাউলের দাম বাড়ানো হইলে দেশের লোক ক্ষিপ্ত হইবে! এমনি সকল রকম ডাল, সরিষার তেল, আলু, তরী-তরকারী প্রভৃতির দাম খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই সমস্যা সমাধানে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তিনি অন্যান্য রাজ্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম দামে পশ্চিম বাংলায় ডাল, সরিষার তৈল প্রভৃতি আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। বাংলাদেশেও ঠাণ্ডাঘরে প্রচুর আলু ধরিয়া রাখিয়াছে। অন্য রাজ্য হইতে আলু আনা হইলে বাংলায় আলুর দাম কমিয়া যাইবে, অধিক পরিমাণে তরীতরকারী উৎপাদনের চেষ্টা আজও বিশেষ সফল হয় নাই, কৃষি-মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ যদি সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে তরিতরকারী চাষের ব্যবস্থা বাড়াইতে পারেন তবেই কোন সুরাহা হইবে। নচেৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসের অবস্থার কথা ভাবিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। এই সমস্ত খাদ্য সমস্যা গত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। রাস্তাঘাট, পুল, স্কুল, কলেজ, পাঠশালা, নূতন বড় বড় বাসগৃহ যতই করা যাউক না কেন খাদ্য সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত একজন কৃতী ব্যক্তিকে খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভার দিয়াছেন। সকল মন্ত্রী যদি ডঃ ঘোষকে তাঁহার কাজে সহায়তা করেন তবেই তাঁহার কাজ সফল হইতে পারে।

বিহারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি—

পূর্ব্বে বিহারের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় সকল জেলাতেই দারুণ খাদ্যাভাব বর্ত্তমান। সে জন্য এখন বিহারের সকল অংশই দুর্ভিক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে সারা ভারতে খাদ্যের অবস্থা সঙ্গীন হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে খাদ্যাভাব বর্ত্তমান আছে। কাজেই বাহির হইতে খাদ্য না আসিলে সকল লোককে একবৎসর পুরা খাদ্য সরবরাহ করা যাইবে না।

রাজস্থানে নূতন মন্ত্রী সভা—

গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর রাজস্থানে নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সম্প্রতি রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রীহুকুম সিং বিশেষ তদন্তের পর গত ২৫শে এপ্রিল ঘোষণা করিয়াছেন যে রাজস্থানের বিধান সভায় ১৮৪ জন সদস্যের মধ্যে ৯৪ জন কংগ্রেস সমর্থক। তিনি ২৭শে এপ্রিল কংগ্রেস নেতা শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়াকে

মুখ্যমন্ত্রী করিয়া নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করিয়াছেন এবং সেই মন্ত্রীসভা কার্য্য ভারও গ্রহণ করিয়াছেন।

কাশ্মীর সীমান্তে রণসজ্জা—

পাকিস্থান আবার কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। আমেরিকার নিকট হইতে অস্ত্র পাইয়া পাকিস্থান এখন তাহার শক্তি কিছু বাড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া চীনের সাহায্য তো তাহার আছেই। ভারতকে শক্তিহীন করিবার জন্য চীন সর্ব্বদা ব্যস্ত। ভারত আক্রমণ করিয়া সে সুবিধা করিতে পারে নাই। কাজেই বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্যকে দিয়া চীন ভারতের শক্তি কমাইয়া দিতে চায়। কুড়ি বৎসরেও ভারতের সহিত পাকিস্থানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হইল না, কতদিন যে এইভাবে ভারতকে অযথা অর্থব্যয় করিয়া সৈন্য রক্ষা ও অস্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিতে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তেও পার্ব্বত্য জাতিগণ বাহিরের সাহায্য লাভ করিয়া মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। সেজন্যও ভারতকে বিব্রত থাকিতে হয়। শক্তিশালী নেতার অভাব ভারতবাসী আজ সর্ব্বদা অনুভব করে।

দুই ভাষাশিক্ষা সমর্থন—

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলন ভারতীয় ছাত্রদের তিনটি ভাষার শিক্ষা দেওয়ার স্থলে দু'টি ভাষা শিক্ষা দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের তরফ হইতে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ নীহার মুন্সী, ডঃ হেমচন্দ্র গুহ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবাল গুপ্ত, মনোজ বসু প্রভৃতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দুই ভাষা শিক্ষার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। এই বিষয়টি লইয়া সকল শিক্ষাব্রতীর অভিমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য কৃপালনী নির্ব্বাচিত—

আচার্য জে, বি, কৃপালনী এক সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯২১ সাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী রূপে কংগ্রেসের কাজ করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর মত ভেদের ফলে তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহার পরও তিনি বিরোধী দল হইতে লোক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এখনও কংগ্রেসদলে কাজ করেন। তিনি সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি এবার লোক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আচার্য কৃপালনী গত ১লা মে মধ্য প্রদেশের একটি কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া লোক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও বক্তৃতা শক্তি দেশের বহু সমস্যার সমাধানের কাজে সহায়তা করিবে।

সাত জন সাহিত্যিক সম্মানিত—

গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে সাত জন সাহিত্যিককে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার দান করা হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন লেখক শ্রীবিমল কর। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শিশিরকুমার পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীদীপক চৌধুরী। 'মৌচাক' প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় 'উল্টোরথ' পুরস্কার পাইয়াছেন কবি শ্রীরাম বসু ও নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। সংবাদ পত্রগুলি এই ভাবে লেখকদের সম্মান দান করায় লেখক গোষ্ঠী আনন্দ লাভ করেন। প্রতিবৎসরই এই সকল পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে।

নূতন হলদিয়ার বন্দর—

কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গা নদীতে পলি পড়িয়া জাহাজ যাতায়াতের দারুণ অসুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের কাজ সে জন্য সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিকট হলদিয়াতে বহুকোটি টাকা ব্যয় করিয়া নূতন বন্দর নির্ম্মাণ করা হইতেছে। তাহার কাজ ১৯৭১ সালে শেষ হইবে। ঐ নূতন বন্দর হইলে বিদেশী জাহাজগুলি সেখানে ভিড়িতে পারিবে। কলিকাতা হইতে নূতন রেলপথে স্থাপন করিয়া হলদিয়া বন্দরে যাতায়াতে সুবিধা করা হইবে। সে রেলপথও প্রায় তৈয়ারী হইয়াছে। সম্প্রতি সরকারী সেচ-বিভাগ একটি এবং পোর্ট কমিশনার আর একটি নূতন বন্দরের চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। চলচ্চিত্রগুলি শীঘ্রই কলিকাতায় দেখান হইবে।

পাঠাগারের পঁচাত্তর বৎসর—

গত ২৯শে এপ্রিল শনিবার ২৪ পরগণা জেলার

আগড়পাড়া সাধারণ পাঠাগারের বয়স পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পাঠাগারের কর্মকর্তারা এক উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা হইতে খ্যাতনামা বক্তা শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সৌমেন্দ্র বাবুর দেড়ঘণ্টাব্যাপীর অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্যের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায় কোনরূপ রাজনীতির গন্ধ ছিল না, খগেন্দ্রবাবু একটি গল্প বলিয়া উপস্থিত তরুণদিগকে সৎ হইতে উপদেশ দেন। গ্রামবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। উৎসবের পর কয়েকদিন ধরিয়া পাঠাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

পরলোকে সুজাতা দাশ—

গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্রবধূ স্বর্গত চিররঞ্জন দাশের পত্নী সুজাতা দাশ ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ভবানীপুর নফরচন্দ্র কুণ্ডু লেনের বাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা বর্ত্তমান। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর পর সুজাতা দেবী সমাজসেবার কাছে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাশুড়ী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী এখনও জীবিত আছেন।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

প্রবীন ও খ্যাতনামা সাংবাদিক আনন্দবাজার পত্রিকার সহসম্পাদক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গত ২২শে এপ্রিল ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বেলঘরিয়ার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং পরে ভাগ্যান্বেষণে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হওয়ায় শেষজীবনে আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি কিছুকাল 'আর্থিকজগৎ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যুগান্তরের প্রথম দিকে তিনি কয়েক বৎসর 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। তিনি ময়মনসিং জেলার অধিবাসী, এবং সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

কাল-পরশু

(নাটক)

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অমরের ঘর। অমরের স্ত্রী স্বাতী কাপড় গুছিয়ে রাখছে। তক্তাপোষ, কিছু মেডিকেল বই, চেয়ার টেবিল। অমর ঘরে ঢুকে টেবিলে ষ্টেথস্কোপ রেখে জুতো খুলছিল]

স্বাতী। এতক্ষণে আসা হল?

অমর। দু'টো কল্ ছিল, সেরে আসতে দেরী হয় না?

স্বাতী। তোমার কল্ ছিল? সত্যি করে বলত, রমেনবাবুর ওখানে তাস পিটছিলে কিনা?

অমর। কেন, ডাক্তারের কল্ থাকতে নেই নাকি?

স্বাতী। তোমার মত ডাক্তারের! দেখি দু'টো কলের আট-টাকা দেখি—

অমর। তোমাকে কে স্বাতী নাম দিয়েছিল বলত! তোমার নাম হওয়া উচিত অশ্লেষা, মঘা, হস্তা, শতভিষা—বুঝলে?

স্বাতী। দেখাও না টাকা। বেরুবার সময় দাদা ছ'টাকা দিয়েছেন, আর আট-টাকা চোদ্দ টাকা দেখাও—কই বের কর না। তাস খেলছিলে স্বীকার করো, নয় টাকা বের করো।

অমর। চেঁচিও না ছাই,—শেষে দাদার কানে যাক্—

স্বাতী। তা তাস খেলে বেলা একটা না করে একটু সকাল সকাল এলে ক্ষতি কি? শরীরটা নষ্ট করে কার উপকার করছ?

অমর। আমি তোমার বিবাহিত স্বামী কিনা—বল বল—

স্বাতী। তাই কি?

অমর। স্বামী—পতি এরা গুরুজন কিনা?

স্বাতী। ধরলাম তাই—তারপর?

অমর। আমি গুরুজন, আমাকে তুমি শাসন করছ? ছাখো, একেই মা দাদা আর বড়বৌ-ঠাকরুণের শাসনে কেঁচোটি হয়ে আছি। তার সঙ্গে আর তুমি লেগো না। বুঝলে, গুরুহত্যার ঘাতক হবে। যাক্—খবরবার্তা বল।—দাদার খাওয়া হয়ে গেছে।

স্বাতী। না, চান করে ঠাকুরঘরে গেলেন। তোমাদের মেজঠাকরুণ ত পুরী থেকে এসে গেছেন। রঞ্জু এসেছে কিন্তু কই সঙ্গে ত সে মেজ-বাবা দেখলাম না।

অমর। একাই গেলেন—একাই এলেন?

স্বাতী। তা জানিনে তবে তোমার দাদার কোন বন্ধু দীপকবাবু নাকি,—তিনি নিয়ে এসেছেন—

অমর। ও দীপকদা! দাদার নিকট-বন্ধুই ছিলেন একসময়, তার সঙ্গে কোথায় দেখা—এও একটা মিস্ট্রি মনে হচ্ছে--

স্বাতী। দীপকবাবু বল্লেন, বিষ্টিতে বেরুনো যায় না বলে পালিয়ে এলেন। রঞ্জু বলছে তাদের নিয়ে দীপকবাবু কত বেড়িয়েছেন। দাঁড়াও রঞ্জু খেয়ে আসুক, আমি মিস্ট্রি সলভ্ করে দিচ্ছি। সে বিশ্বেস মশায় মেজবাবা ডুবে গেলেন, দীপকবাবু ভেসে উঠলেন, এসবই ত রহস্যময়।

অমর। চুপ্। ছাখো, বারবার মেজবাবা মেজবাবা বলবে না। কবে রঞ্জু মা'র সামনে বলে ফেলবে, একটা কেলেঙ্কারী হবে!

স্বাতী। আমি একলা নাকি? মা-ও ত সেদিন রেগে বলে উঠেছিলেন। [গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। বলি ঠাকুরপো, এখন বেলা একটার সময় প্রেমালাপ সুরু করলে, আমরা যে প্রাণে মারা যাই। দয়া করে দু'টি খেয়ে আমাদের ছুটি দাও—

অমর। প্রেমালাপ? তেমনি ভগিনীই এনেছেন বটে! দেখছেন না [দ্রুত জামা প্যাণ্ট খুলে] ইলেকট্রিক ট্রেণের স্পীডে ধড়াচুড়ো ছাড়ছি, জেটপ্লেনের স্পীডে চান করবো—তারপর বৌদি গাধাবোটের স্পীডে খেয়ে নেব। দেরী হবে কেন ছিঃ!

গৌরী। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এস, একসঙ্গে খাবে বলে দীপক বসে আছে। [প্রস্থান]

অমর। এই এসেছি [কাপড় তোয়ালে নিয়ে বেরুতে যাবে, চন্দ্রকান্ত দরজায় এলেন। গরদের কাপড় পরা, খড়ম পায়, পৈতেটা বেশ প্রকট]

চন্দ্রা। অমর তাড়াতাড়ি চান করে নে। বহুদিন পরে দীপক এসেছে, একসঙ্গে বসে খাবো—বুঝলি।

অমর। আপনারা বসে যান—বসতে বসতে আমি এসে যাবো। [উভয়ের প্রস্থান] [রঞ্জুকে নিয়ে বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী। বৌমা, রঞ্জুকে তোমার কাছেই রাখো। ওর খাওয়া হ'য়ে গেছে, এখানেই ঘুম পাড়িয়ে রাখো। সারারাত্রি ট্রেণে ত ঘুমোয় নি। ও রাক্ষুসীর কাছে যেন না ও যায়। সমরকে খেয়েছে আবার ওকে খাবে। আমি গিয়ে দেখি ওরা খেতে বসবে—

স্বাতী। মা দীপকবাবু কে? দিদির সঙ্গে এলেন—

বাসন্তী। ওই সমরের সবচেয়ে নিকট বন্ধু ছিল। কত এসেছে,—সমরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে। সমর নেই তা আর আসবে কেন? অমর এত দেরী করে ফেরে কেন? একটু শাসন করতে পারো না? শেষে বেয়াড়া হ'য়ে যাবে—

[বাসন্তীর প্রস্থান, স্নানান্তে তোয়ালে কাঁধে অমর এসে চুল আচড়াচ্ছে]

অমর। ইয়েস, মাদার রঞ্জু, আমার কাছে ঘুমোবে ত! আমরা পুরীর গল্প করবো কেমন? ভূত প্রেত দত্যি দানা পরী হুরী সব গল্প জানি।

স্বাতী। চুপ কর, শিগগির খেতে যাও।

অমর। তার মানে?

স্বাতী। মা গুরুজন ত?

অমর। নিশ্চয়ই।

স্বাতী। মা এই মাত্তর আমাকে বলে গেলেন তোমাকে শাসন করতে। তাই না রঞ্জু।

রঞ্জু। হ্যাঁ, ঠাকুমা বলেছে।

অমর। করো, শাসন করো—একদিন বুঝবে ফলটা। [প্রস্থান]

স্বাতী। [রঞ্জুকে কাছে নিয়ে] এখন কি ঘুমোবে রঞ্জু না গল্প করবে?

রঞ্জু। সমুদ্রের ঢেউ কত বড় জানো? তোমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এত বড়ো—

স্বাতী। হাওড়ায় তুমি আর তোমার মা গেলে—তারপরে কে এল?

রঞ্জু। ঐ যে সেই,—তুমি যাকে মেজবাবা বল,—সেই ত আমাদের নিয়ে গেল।

স্বাতী। পুরীতে গিয়ে ত হোটেলে উঠলে কেমন?

রঞ্জু। সেখানে কি বৃষ্টি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘরে তালা। আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। মা ঘরে নেই—

স্বাতী। আর সে বিশ্বেস মশায়?

রঞ্জু। মেঝেয় চিৎপাত হয়ে ঘুমুচ্ছে—তার নাক ডাকে বাঘের মত। তখন দীপককাকু এসে দরজা খুলে দিলেন।

স্বাতী। তোমার মা কোথায় তখন?

রঞ্জু। দীপককাকুই ত মা'র কাছে নিয়ে গেল। দীপককাকুর ঘরে মা ঘুমুচ্ছিল।

স্বাতী। দীপককাকু কোথায় ছিল?

রঞ্জু। সে ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল। আর পড়ছিল—

স্বাতী। কোথায় থাকলে? কোথায় খেলে—কি কি দেখলে?

রঞ্জু। দীপককাকুর ঘরে এতটুকু বিছানায় আমি আর মা শুতাম—

স্বাতী। দীপকবাবু?

রঞ্জু। কাকু ত রাতে ঘুমোয় না। সারারাত্রি পড়ে আর সারাদিন ঘুমোয়—জগন্নাথ ঠাকুর দেখতে কি বিচ্ছিরি। কালো—বোঁচা নাক—

স্বাতী। ও বলতে নেই, ঠাকুর সবই ভাল। ঠাকুর রাগ করবে—এখন ঘুমোও—

[রঞ্জুকে আদরে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে হাত বুলুতে লাগল]

রঞ্জু। জানো কাকীমা, কত কড়ি এনেছি—কি সুন্দর ঝিনুক—

স্বাতী। এখন ঘুমোও [স্বাতী গায়ে হাত বুলুতে লাগল। অমরের প্রবেশ]

অমর। কি মিষ্টিটা কিছু বুঝলে ?

স্বাতী। সিম্পল—বাট কমপ্লেক্স। হাওড়া ষ্টেশনে বিশ্বেস মশায় জোটেন। পুরী গমন, একই ঘরে অবস্থান। তার পরেরটুকু জটিল—ঘরের বাইরে তালা দিয়ে দীপকবাবুর ঘরে রাত্রিযাপন। দীপকবাবুর বারান্দায় নিশাজাগরণ। সকালে রঞ্জুর ক্রন্দন,—দীপকবাবুর তালা খোলন,—তার ঘরে রঞ্জুর মাতৃদর্শন—

অমর। ও বাবা, ব্যাপারটা ত আরও ঘুলিয়ে গেল দেখছি—

স্বাতী। ওসব জানেন এক দীপকবাবু, কিন্তু তিনি কি আর বলবেন ? যখন বন্ধু তখন—অন্ততঃ আমাদের কাছে কিছুতেই বলবেন না।

অমর। দীপকদাকে উদার ও মহৎ বলেই জানি। তার মুখ থেকে কিছুই বেরুবে না। কিন্তু না জানলেও ত নয় — মেজ ঠাকরুণ কতদূর ডুবেছেন, কতদূর ডোবাচ্ছেন, তা ত জানতেই হবে।

বাসন্তী। [নেপথ্যে] ছোট বৌমা খেতে এস—

স্বাতী। তুমি থাকো রঞ্জু ঘুমোয়নি, আমি আসছি। [প্রস্থান]

রঞ্জু। কাকু, আমি ঘুমুচ্ছি, তুমি গল্প কর।

অমর। [সিগারেট ধরিয়ে] সেই দাড়িওলা ভূতের গল্পটা বলব ত! শোনো ভয়ানক এক মাঠের মাঝে বিরাট এক বেল গাছে মস্ত খড় দাড়িওয়ালা এক বেহ্মদত্তি ছিল। তার দাড়িটা ছিল পা-পর্যন্ত। তালের আঁশের মত শক্ত দাড়ি—

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[চন্দ্রার ঘর। ভিতরে শোবার ঘর। বাইরের ঘরে সোফা টবিল পভৃতি সাজানো। পাশে একটা খাবার টেবিলে এঁটো বাসন রয়েছে। একটা গোল টেবিলের চারি পাশে ক'খানা চেয়ার। চন্দ্রা একটা টেবিলে বসে বই নাড়াচাড়া করছিল। গণেশ ঝাতা নিয়ে ঢুকে বাসনপত্র হাতে করে টেবিল মুছল]

চন্দ্রা। গণেশ, রঞ্জু কোথায় ?

গণেশ। ছোট বৌমার ঘরে ঘুমাচ্ছে।

চন্দ্রা। তাকে কি এদিকে আসতে দেওয়া হবে না ?

গণেশ। সেডা আমি কবো কেম্‌নে? আমি ত চাকর বৈ না।

চন্দ্রা। তবুও, কথাবার্তা কি সব হচ্ছে, সেটা শুনে একটা অনুমান করতে পারো ত।

গণেশ। তা পারি। মা বলতিছেন, পেটে ধরলিই ত আর মা হয় না যে লালন পালন করতি জীবন দেচ্ছে সেই মা।

চন্দ্রা। তার মানে সে আমার মেয়ে নয়, ওদেরই মেয়ে—

গণেশ। আজ্ঞে আপনার মেয়ে কিন্তু মাজদায় মেয়েও ত বটে। সে সম্পর্কে যতি কেউ আপনার ভাবে তাকে ত দোষ দিতি পারিনে।

চন্দ্রা। [উত্তেজিত ভাবে] তার মানে রঞ্জুকে আসতে দেবে না ওরা ?

গণেশ। সেডা কতি পারিনে, তবে আপনার কাছে থাকলি ত আপনারই অসুবিধে—

চন্দ্রা। অর্থাৎ ?

গণেশ। মানে, আপনার নড়তি চড়তি অসুবিধে হয়ত! আপনি হাওয়া খাতি যাবেন, হোটেলে যাবেন, তখন ওটা ল্যাংবোট হবে ত! আর সেই শিক্ষেই পাবি ত। —তাই—

চন্দ্রা। তার মানে মেয়েকে আমি কুশিক্ষা দিচ্ছি!

গণেশ। আজ্ঞে তা জানিনা। তবে রঞ্জু আপনার মত হতি পারে এই ভয়তে তারা ওকে তফাৎ রাখতি চান। তবে বৌমা, আমি চাকর, আমার সঙ্গে এসব কথা ভাল নয়। সমরদা হিন্দু ছেলেন ওরাও চান রঞ্জু হিন্দু হোক্।

চন্দ্রা। তার মানে আমি খ্রীষ্টান— হিন্দু নয় ?

গণেশ। আজ্ঞে দোষ নেবেন না—আচারে ব্যাভারে ত হিঁদুর মত নয়, সেইটেই সকলে বলতিছে—

চন্দ্রা। তুমিও তাই বল ?

গণেশ। আজ্ঞে, আমি ত আর সকলের বাইরি নয়।

[প্রস্থান]

[বিপরীত দিক থেকে অমরের প্রবেশ]

অমর। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়! [পকেট থেকে সিগারেট বের করে] ওদিকে মা, এদিকে দাদা বৌদি ওদিকে ঘরে খড়্গধারিণী চামুণ্ডা, দ্বীপীচর্ম-পরিধনা শুষ্ক-মাংসাতিভৈরবা। নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট খাবো তার উপায় নেই। তাই তোমার ঘরে এলাম বৌদি। নিশ্চিন্তে দু'টো টান দেই। আর গল্প শুনি—পুরী কি রকম এনজয় করলে? সমুদ্রে সাঁতার টাঁতার দিলে ত!

চন্দ্রা। [কথা বলল না, কটাক্ষে চেয়ে দেখল]

অমর। নাও, সিগারেট খাবে ত খাও। [সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই সিগারেট ঠেলে দিল]

চন্দ্রা। আমি সিগারেট খাই?

অমর। খাও না? কিন্তু আজকাল যত মডার্ণ সোফিষ্টিকেটেড লেডি সবত খায়। আমাদের সঙ্গে যারা মেডিকেল পড়ত তারা ত খায়। নার্সরাও ত খায়। খাওনা? যাক বুঝলে বৌদি। যাদের বাড়ীতে মোটর আছে তারাও খায়। [সিগারেট পকেটে রেখে] পুরী টুরের কাহিনীটা বল—

চন্দ্রা। ঠাকুরপো, কি জন্যে এসেছ সত্যিকরে বলত! আমি তোমাদের কেউ না। আমি খৃষ্টান, আচার ব্যাভার ভাল নয়। আমি ত তোমাদের কেউ নয় তবে কেন, তবে কেন তুমি এসেছ?

অমর। তুমি আমাদের কেউ নয়?

চন্দ্রা। না।

অমর। তবে ঠাকুরপো বললে কেন? উইথড্র কর— বল ডক্তর চ্যাটার্জী।

চন্দ্রা। আমি হিন্দু নয়, হিন্দু-বিধবার আচার আর কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করিনে, ভগবানও বিশ্বাস করিনে।

অমর। সত্যিকথা বলব বৌদি? ভগবান আমিও মানিনে। তবে বেরুবার সময় ঠাকুরঘরে প্রণাম করি দায় ঠেকে। তোমার মত ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স যদি আমার থাকতো তবে ভগবানকে থোড়াই কেয়ার করতাম।

চন্দ্রা। আমি স্বাধীন, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার স্বাধীনতাকে আমার স্বাধীন চিত্ততাকে তোমরা বাধা দিতে এসো না! তুমি যে আমাকে জেরা করতে এসেছ, তার অধিকার তোমার নেই—

অমর। নেই—নিশ্চয়ই নেই। জেরা করতে আসিনি। তবে ওই স্বাধীনতা বললে না, ওটা একেবারেই ভুয়ো। স্বাধীনতা মানুষের নেই। এই ধর স্বাধীন জীবন যাপন করব বলে ডাক্তারী পড়লাম, ভগবানও মানিনে কিন্তু সকালে উঠেই ভগবানকে বলতে হয়, কিছু রোগ-ভোগ দাও মা কালী, দুটো রুগী টুগী দাও। এখন একেবারেই রুগীর অধীন। উকিলরা মক্কেলের অধীন—এমনি সব। তারপরে ধর ঘরের স্বাধীনতা, তাও নেই। আমার স্বাধীনতা আনন্দ সব ওই খড়্গধারিণী চামুণ্ডার হাতের মধ্যে—

চন্দ্রা। তুমি স্বাতীর এমন নিন্দে কর কেন বলত। সে ত ভাল মেয়ে—ওটা আমি ভাল শুনি না।

অমর। স্বাতী! ওর নাম মঘা, হস্তা কি শতভিষা হওয়া উচিত ছিল। আমাকে শাসন করে, আবার মা তাকে লেলিয়ে দেয় শাসন করতে—জানো? কি পরাধীন বলত!

চন্দ্রা। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না ঠাকুরপো— ওটা অর্জনের বস্তু—

অমর। যা বলেছ, অর্জন করতে পারি, সে সাহস আমার আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে ঝগড়ায় পারিনে। আর ঝগড়া বাধালেই মা-দাদা-বৌদি ছুটে এসে ওর পক্ষ নিয়ে আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দেয়। নইলে আমিও তোমার মত স্বাধীনতার পূজারী। মানুষ স্বাধীন হবে—যা ইচ্ছে তাই করবে—ব্যস, মুক্ত স্বাধীন সত্তা নিয়ে চলবে এইত সভ্যতার মূল কথা। ইকোয়ালিটি, লিবাটি, ফ্রাটারনিটি, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। আর একটা মুস্কিল হয়েছে দাদা আর মাকে দেখলে ভয়ে কিছুই বলতে পারিনে।

চন্দ্রা। কাউয়ার্ডরা কোনকালেই স্বাধীন নয় হতে পারে না।

অমর। আমিও ভীরু নয়, স্বাধীনভাবে চলতে পারি। কিন্তু জানো বৌদি, যখনই ভাবি, এই মা কাঁদবে, দাদা দুঃখ পাবে, তখনই থেমে যাই। মনটা যদি এমন হত যে তাঁদের দুঃখে একেবারেই টলবে না তা হলে স্বাধীন হতে পারতাম। ওই মনটাই আমার স্বাধীনতার শত্রু। আর একটা বড় কথা পড়েছিলাম—We have won liberty—the liberty

to misbehave. এটাও মাঝে মাঝে ভাবি।

চন্দ্রা। ওটা তোমার মনের দুর্বলতা। অন্যে কি ভাববে, কি বলবে একথা ভাবতে গেলে স্বাধীন ভাবে পা ফেলা যায় না।

অমর। অন্যের দুঃখের কথা ভাবতে গেলেই স্বাধীনতা থাকে না—সত্যিই তাই। যাকগে, ওসব কচকচি। পুরীতে কি দেখলে বল। কোণারক গিয়েছিলে ?

চন্দ্রা। না।

অমর। কেন ?

চন্দ্রা। ক'দিনই ত বৃষ্টি। কোথায়ও বেরুবার উপায় ছিল না।

অমর। আচ্ছা মিঃ বিশ্বাস ত হাওড়ায় তোমার সঙ্গে মিট করলো—তোমরা একসঙ্গে পুরী গেলে—তা হোটেলে ভাল জায়গা পেলে ত ! এখন ত অফ্ সিজন্।

চন্দ্রা। বিশ্বাস হাওড়া এসেছিল, একসঙ্গে পুরী গেলাম —এসব কে বললে ?

অমর। কেন—রঞ্জু বললে। বিশ্বাস ওকে কত আদর করলে—

চন্দ্রা। কেন ? বিশ্বাসের সঙ্গে পুরী যাওয়ার অধিকার আমার নেই নাকি ?

অমর। নেই, তাত বলিনি,—তুমি স্বাধীন শিক্ষিত বেড়াতে যাবে এতে আপত্তির কি আছে ! তবে কিরকম এনজয় করলে তাই শুনতে চাচ্ছি। বিশ্বাসমশায় সমুদ্রে সাঁতরাতে পারেন ?

চন্দ্রা। শোনো ঠাকুরপো, তোমাদের খুব স্পষ্ট করে একটা কথা জানাই। আমি স্বাধীন তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার তোমাদের নেই। আইনতঃও নেই, নীতির দিক থেকেও নেই। তোমাদের বাড়ীতে এসে বহু অত্যাচার সহ্য করেছি। আমি ভগবান মানিনে অথচ সাত সকালে উঠে চন্দন ঘষতে তোমরা বাধ্য করেছ। সেদিন ছোট ছিলাম, সয়েছি'—আজ আর নয়। তোমরা কি মনে কর যেহেতু তোমার দাদার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিয়ে হয়েছিল, সেই হেতুই নিজেকে বঞ্চিত করে, জীবনকে বঞ্চিত করে সারাজীবন তার স্মৃতি পূজো করে কাটাতে হবে ? থান পরে নিরামিষ খেয়ে একাদশী করতে হবে ? এসব কুসংস্কার আমি মানিনে, আমরা মানিনে।

অমর। তুমি মানো, তোমাকে মানতেই হবে এমন কথা ত কেউ বলেনি।

চন্দ্রা। মনের ইচ্ছে তোমাদের তাই। কেন আমি জীবনে আনন্দ পাব, আনন্দ ভোগ ক'রবো এইটে তোমরা সহ্য করতে পারো না, তোমাদের কুসংস্কারের অন্ধত্ব দিয়ে। তার পরে বিয়ে হলেও তোমার দাদার সঙ্গে আমার কোনদিনই ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আজ যদি ভালবেসে কাউকে সত্যিই জীবনে গ্রহণ করি, সে বিশ্বাসই হোক মুসলমানই হোক, খৃষ্টানই হোক, তাতে তোমাদের বলবার কি আছে ?

অমর। কিছু না—কিচ্ছু বলবার নেই, তবে ধর নেমন্তন্নে 'দু'খানা ফাউল কাটলেট একটা গ্র্যাণ্ডি চপ ত নিশ্চয়ই আশা করতে পারি !

চন্দ্রা। আমি যদি তাকে বিয়ে করে এই ঘরে বাস করি, আইনত তোমরা কি করতে পার ? কি তোমাদের করবার আছে ?

অমর। ছাখো বৌদি, আইনের কথা দাদাকে ব'লো —আমাকে রোগের কথা বল। তোমাকে একটা রোগে ধরেছে'—ঠিক আমার রোগ—

চন্দ্রা। [তার দিকে কটু কটাক্ষে তাকালো]

অমর। ওই যে ভালোবাসার কথা বললে না। ওটা একটা ব্যাধি, ওটারও চিকিচ্ছের যন্ত্র বেরিয়ে যাবে শিগগিরই—

চন্দ্রা। ভালবাসাটা রোগ ?

অমর। ভালবাসাটা ঠিক একটা ব্যায়রাম হয়ত নয় তবে তোমার আমার রোগে ধরেছে—মানে, তুমি কাকে ভালবাসো সেইটেই বোঝো না।

চন্দ্রা। তুমি বোঝো ?

অমর। আমি ত একেবারেই বুঝিনে বললাম। শুনবে শোনো, খুব frankly বলছি একেবারে ফ্র্যাঙ্ক কনফেশন। ছাখো যখন আই, এস-সি পড়ি তখন আমাদের সঙ্গে নমিতা বলে একটা মেয়ে পড়তো। সে কখন ট্রামে উঠবে একবার দেখবার জন্যে ট্রাম ষ্টপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি—সেই সময়ই সিগারেটের নেশা হয়ে যায়। যেদিন সে ফিরে তাকাতো সেদিন বুকখানা ফুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতাম। যেদিন তাকাতো না সেদিন

শোকে মুহ্যমান হয়ে চা'র দোকানে ঢুকে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতাম—

চন্দ্রা। [হেসে] তারপর ?

অমর। তারপর যখন ডাক্তারী পড়ি তখন শ্যামলী পড়ত আমাদের সঙ্গে—ঠিক ওই অবস্থা বুক দুরু দুরু। একদিন টিউটর সময়ে হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। সে হেসে ফেললো—সেদিনত আমার অবস্থা প্রায় মূর্চ্ছো যাওয়ার মত।

চন্দ্রা। তারপর!

অমর। তারপরে চেম্বার খুলেও ওই সামনের ঝুল বারান্দার মেয়েটি।

চন্দ্রা। তারপর ?

অমর। তারপর? এখন ওই খাণ্ডার মেয়েলোকটির গালাগালি না খেলে ভাল লাগে না। মনে হয় কখন বাড়ী যাবো একটু ঝগড়া করবো। আমি ত বুঝেই উঠতে পারিনি কা'কে ভালবাসি—

চন্দ্রা। সকলেই ত তোমার মত নয়।

অমর। তুমিও কিছু জানো না—কা'কে ভালবাসো তাও জানো না। ওই বিশ্বাস কি মজুমদার কেউ নয়। তুমি ভালবাসতেই জানো না—

চন্দ্রা। আমার মনকে আমি জানি না। তুমি সেটা জানো বোধ হয়—

অমর। মনটাকে জানাই ত বড় কঠিন। আজ ভাবি নমিতা, কাল শ্যামলী, পরশু ওই চামুণ্ডা, এই ত বিচিত্র মানুষের মন। আর ভালবাসার তুমি কি জানো? আমার মার মত মা, আমার দাদার মত দাদা, আমার মত দেবর লক্ষ্মণকে ভালবাসতে পারলে না যখন তখন তুমি ভালবাসার কিছুই জানো না। অন্য কেউ হলে আমার মত দেবরকে মোটরগাড়ী কিনে দিত।

[পর্দার আড়ালে থেকে দীপক]

দীপক। আসতে পারি ?

চন্দ্রা। আসুন, আসুন, বসুন। [দীপক প্রবেশ করল]

অমর। আসুন দীপকদা, আপনি ঘুমোন নি। [দীপক বসল]

দীপক। শুয়েছিলাম কিন্তু ঘুম হ'ল না। তুমি ত এম. বি. বি. এস পাশ করে বেশ জমিয়ে বসেছ শুনলাম—

অমর। জমাতে পারিনি দাদা, আমিও ডাক্তার হলাম, দেশের রোগও কমে গেল—

দীপক। [হেসে] বড়ই দুঃখের কথা।

অমর। সত্যিই দাদা, দুটো রোগ আছে—একটি থ্রম্বসিস্ আর একটা ক্যানসার। থ্রম্বসিস্ হলে একটা কল তারপরেই আর টেকে না। ক্যানসার হলেও তাই, তারপরেই হাসপাতালে। আর সর্দি কাশি-টাসির অসুখ রোগীরা নিজেরাই বড়ী বড়ি খেয়ে চিকিৎসে করে। হ্যাঁ তবে বিলেত ঘুরে এসে একটা এসপেসালিষ্ট হলে হয়ত অন্ন জুটতো—সে ত আর হবে না।

দীপক। কেন ?

অমর। দাদার এ্যাকসিডেন্টের পরে মা আবারও যেতে দেবে!

দীপক। ও আলোচনা থাক। চন্দ্রাদেবী আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আমার আস্তানায় ফিরে যেতে হবে ত!

চন্দ্রা। যাবেন, এত তাড়াতাড়ি কি? সেখানে গৃহ সাজিয়ে কেউ ত আপনার জন্যে বসে নেই।

দীপক। বসে নেই বলেই ত তাড়াতাড়ি—যেয়ে দেখবো হয়ত তক্তপোষ ছাড়া সবই চুরি হ'য়েছে, তার পরে খাওয়া দাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

চন্দ্রা। যাবেন এখন,—আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

দীপক। আপনি কষ্ট করবেন কেন—একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাবো। [গণেশের প্রবেশ]

গণেশ। ছোড়দা, তোমার টেলিফোঁ আইছে—ছোট বৌমা ডাকতি বললেন।

অমর। যাতিছি, যাতিছি।—জয় মা কালী রোগীর ফোন যেন হয়—সর্দি কাশি নয়, অন্ততঃ যেন টাইফয়েড হয়। [গণেশের প্রস্থান]

দীপক। [হেসে] কেবল রোগই কামনা ক'রছ—

অমর। ডাক্তারে রোগ চাইবে, উকিলে মামলা চাইবে, শকুন গো-মড়ক চাইবে—এ আর এমন আশ্চর্য কি? যাক্ দীপকদা না বলে চলে যাবেন না, চা টা খেয়ে তারপর যাবেন। আসছি—[প্রস্থান]

[চন্দ্রা ও দীপক উভয়েই ক্ষণকাল নীরব]

চন্দ্রা। আপনাকে কেমন করে ধন্যবাদ জানাবো, ামার কৃতজ্ঞতা জানাবো, বুঝতে পারি না।

দীপক। কোনটাই আমার প্রাপ্য নয়,—কোনটাই াপনাকে জানাতে হবে না।

চন্দ্রা। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন,—নইলে কি 'তো, কি হ'তে পারতো ?

দীপক। ভুল চন্দ্রাদেবী, আপনিই আপনাকে রক্ষা :রেছেন। যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে েউও রক্ষা করতে পারে না। ওসব অবান্তর চিন্তা ছেড়ে িন—

চন্দ্রা। আমার জন্যেই কটা রাত্রি আপনি বিনিদ্র াটিয়েছেন।

দীপক। মোটেই নয়, ঘুমোনোয় আমার অসাধারণ টুতা। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, বাসের হ্যাণ্ডেল ধরেও আমি ুমতে পারি। ঘুম যা দরকার তা ঠিকই হয়েছে—

চন্দ্রা। আপনার সঙ্গে এই আকস্মিক দেখা ও পরিচয় ান জীবনের পথে নতুন আলোক দিয়েছে। নইলে—কি 'তো, হতে পারতো ভেবে শিউরে উঠি।

দীপক। আমার নিজের জীবনই ঘনীভূত অন্ধকার— ামি আপনাকে আলোক দেব কি করে ?

[চন্দ্রা তার দিকে আড় চোখে চাইল—এমনভাবে যে তুন করে তাকে আকৃষ্ট করতে চায়]

চন্দ্রা। ওঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে নানা প্রশ্ন করেছেন। কাথায় দেখা, কিভাবে একত্র এলাম—আপনাকে জবাব াতে হয়েছে।

দীপক। নিশ্চয়ই আমি সবই সত্যকথা বলেছি। কবলমাত্র আপনার সম্মান রক্ষার্থে তথা বন্ধুপত্নীর সম্মান-ক্ষার্থে একটা মিথ্যে কথা বলেছি। জানি না,—সেটা কিলের জেরায় টিকবে কিনা।

চন্দ্রা। কি বললেন ?

দীপক। মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনি পুরী গেছেন একথা জুই বলে দিয়েছে। হোটেলে দু'টো ঘর ছিল না। াপনি বিপদে পড়েন। বৃষ্টিতে অন্যত্র যাওয়ার উপায় ল না। আমি চিনতে পেরে আমার ঘর ছেড়েছি। ওরা ।কদিন ভালবাসতেন আমাকে, তাই মনে হয় তাদের সংশয় সন্দেহ আমার কথায় দূর হয়েছে—

চন্দ্রা। ওঁরা কি ভাবলেন তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ওরা আমার কেউ নয়, আমিও ওঁদের কেউ নয়।

দীপক। ওটা আপনার জিদ। ওঁরাও আপনার— আপনিও ওঁদের নইলে এই প্রশ্নই আপনার মনে আসতো না। ওই সামনের বাড়ীর লোকগুলো কি ভাবছে সেকথা ত আপনার মনে হয়নি ? মানুষ তিনটি জিনিষ চায়—স্বাস্থ্য, বিত্ত আর খ্যাতি। কলঙ্কিত লোক মিথ্যে বলে সুনাম পাবার জন্যেই।

চন্দ্রা। আমার কলঙ্ক গোপন করতে আপনি মিথ্যা বলেছেন।

দীপক। বলেছি, প্রয়োজনে শতবার বলবো। ওদের মনে বেদনা দিতে আমার বাধে। ওরা ত কোনমতেই ভুলতে পারে না। আপনি সমরের স্ত্রী, রঞ্জু সমরের মেয়ে আপনি তার মা, –

চন্দ্রা। [একটু চুপ করে থেকে] আপনি সারারাত্রি বই পড়ে, বিশেষতঃ ফিলজফির বই পড়ে কি করে কাটান ? আপনার মত এমন অদ্ভুত মানুষ আমি কল্পনা করতে পারি না।

দীপক। [হেসে] না, ওটা আমার বারমেসে রোগ নয়। পুরীতে যেয়ে আমি মনের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে এমন একটা ঝড় চলছিল যে ঘুমোনোটা অবান্তর হয়ে পড়ল

চন্দ্রা। কেন ? এ প্রশ্ন করা হয়ত আমার উচিত নয়।

দীপক। আমার বলতে বাধা নেই তবে আপনি তা শুনে সুখী হবেন না।

চন্দ্রা। আপনার দুঃখ বেদনা জানবার অধিকার দিতে যদি আপনি অস্বীকার করেন তবে আমার প্রশ্ন করা চলে না।

দীপক। [অর্থব্যঞ্জক ভাবে] সে অধিকার আপনি অর্জন করেছেন বলে মনে করেন কি ?

চন্দ্রা। আমার মনে হয় একদিনের পরিচয় ও সান্নিধ্য এবং পূর্বের সম্পর্ক এ অধিকার আমাকে দিয়েছে। আপনি বলুন, আমি জানতে চাই—

দীপক। পুরীতে সুধীর-লতিকা যে দাম্পত্যির সঙ্গে

পরিচয় হল, তাদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে ?

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই।

দীপক। ওই লতিকা একদিন আমার পত্নী ছিল। স্বাধীনভাবে, স্বাধীন চিত্ত নিয়ে আমরা বিয়ে করেছিলাম—পরিবারের সকলের অমতে। পরিবার থেকে দূরে ঘর বেঁধেছিলাম—সে ঘর ভেঙ্গে গেল। কেন গেল, আজও জানি না। মনে হয় দুই স্বাধীন সত্তায় সংগ্রাম হল,—তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। লতিকা সুবীরকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে দেখে আমার আনন্দ হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু—

চন্দ্রা। কিন্তু ?

দীপক। হ্যাঁ, একদিন লতিকা স্বীকার করলো সে আজও আমাকেই ভালবাসে। সুবীরের ভালোবাসাকে সে প্রতিরোধ করতে পারেনি বলেই তাকে বিয়ে করেছে। আমার স্বাধীনসত্তা ও জীবন যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল হঠাৎ—

চন্দ্রা। দুঃখ বেদনা আছে, থাকতে পারে তাই বলে স্বাধীনতাকে অস্বীকার যায় না।

দীপক। কোথায় স্বাধীনতা! মানুষের বিড়ম্বিত বিকৃত মনই তার স্বাধীনতার অন্তরায়। পুরীর ঘটনাটা ভেবে দেখুন। আপনার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা আপনার মনের বাধা অতিক্রম করতে পারেনি—সেখানে আপনিই আপনার বাধা সৃষ্টি করেছেন। আর সে বাধা অতিক্রম করলেও আপনি বা আরও অনেকে হয়তো দুঃখ পেতেন।

চন্দ্রা। জীবনের চাহিদাকেই বা মানুষ অস্বীকার করবে কেন ?

দীপক। জানি না—এই চাহিদাই পরাধীনতার আশ্রয়। জীবন দিয়ে দেখেছি স্বাধীনতার ভার বহন করা বড়ই দুরূহ, সে শক্তি সে সাহস সংযম মানুষের নেই—অন্ততঃ আমার নেই।

চন্দ্রা। কেন ?

দীপক। আজকার সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতি, সমাজ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথিবীর প্রাঙ্গণে মানুষকে একান্ত একক করে দিয়েছে। নগরের জনারণ্যে মানুষ একা, একেবারেই একা। এই একাকীত্বের বেদনা বহন করা বড়ই কঠিন। মানুষের সমাজে মানুষ একা—স্বাধীনতার নামে মানুষ এই একাকীত্ব বরণ করেছে—এই একাকীত্বের বেদনা অসহনীয়—

চন্দ্রা। আমার জীবনেও এই একাকীত্বই বিভ্রান্ত করেছে দীপকবাবু, এই এককজী[illegible] অসহনীয়—

দীপক। লতিকা যদি আমার ঘরে থাকতে[illegible] ফিরে আসতো তা হলেও এই একাকীত্ব আম[illegible] না মনে হয়।

চন্দ্রা। কেন ? আপনারা উভয়ের পরিপূরক-

দীপক। তা হয় না—আমার স্বাধীনসত্তাকে [illegible] করলেই তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে [illegible] [উত্তেজিতভাবে] চন্দ্রাদেবী, যুক্তি নয়, তর্ক নয়, [illegible] বড় হৃদয়। এই হৃদয় যখন শুকিয়ে যায় তখন শা[illegible] তৃপ্তি নেই। আমরা স্বাধীনতা চাই—কিসের স্বাধীনত[illegible] পারেন ? দেহে মনে পরাধীন সত্তার স্বাধীনতা কে[illegible] এই দেহের ঊর্দ্ধে হৃদয়কে না পেলে স্বাধীনতা [illegible] দেহ মনের অপার আকাঙ্ক্ষা কামনা আমাদের [illegible] পরাধীন করেছে পরমুখাপেক্ষী করেছে।—সংযম [illegible] স্বাধীনতা নেই। পৃথিবীতে অনেক চাই আমি, তাই দুঃখ—না চাইলে কে দুঃখ দিতে পারে ? এই ব[illegible] ধরণী তাই আজ হাহাকার করছে—যতই পেয়েছে [illegible] চেয়েছে সে—

চন্দ্রা। [বিলোল কটাক্ষে] দীপকবাবু, [illegible] উত্তেজিত হয়েছেন হয়ত ! আমি ফিলজফি বুঝি[illegible] জানি না, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের একাকীত্ব, আর তার বেদনা আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের [illegible] জলাবর্তে যেন দিশেহারা। আপনি একবার আ[illegible] রক্ষা করেছেন। আপনার পরিচয় জীবনে হয়ত'— [ক[illegible] করে থেমে গেল—পরে] দিশারীও হতে পারে।

দীপক। [আনমনে] দীর্ঘজীবন পথ এখনও অ[illegible] ক্রান্ত কিন্তু জীবনের ভার আর আমি সইতে পারি[illegible] লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে আমি একাকী। আপ[illegible] বেদনা আপনি বহন করে বেড়াই—কোথায়ও হৃদয় [illegible] প্রীতি নেই, স্নেহ নেই। সকলেই চলেছে নি[illegible] জীবনের বোঝা নিয়ে একাকী, একান্ত একাকী, ভারবা[illegible] পশুর মত। মানুষের ভীড়ে আমি একা, একা—[illegible] একাকীত্ব থেকে মুক্তি চাই—[হঠাৎ চুপ করে গেল, তার [illegible]

উঠে দাঁড়াল]

চন্দ্রা। [উঠে দাঁড়িয়ে] একথা কি শুধুই আপনার জীবনে—আমার জীবনেও সত্য নয়?

দীপক। হ্যাঁ, আপনি, আমি, পৃথিবীর সকল নর-নারী। মানুষের মুক্তি নেই—

চন্দ্রা। আমি—আমি, আপনি কি এই মুক্তি অর্জন করতে পারি না, দীপকবাবু!

[হঠাৎ দীপকের হাত ধরল]

দীপক। [চন্দ্রার হাতখানা ভাল করে ধরে নিয়ে, একটু থেমে মুখের দিকে চেয়ে] আপনি যা বলেছেন তার অর্থ বুঝে নেওয়ার বয়স আমার হয়েছে। তার অর্থ আমি বুঝি, বুঝেছি। কিন্তু জড়বাদী মানুষের মুক্তি নেই—

[পর্দার আড়ালে অমরকে দেখা গেল। এই অবস্থায় দু'জনকে দেখে একটু বিব্রত হল। ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্ততঃ করল]

চন্দ্রা। [অমরকে লক্ষ্য করে, হাত ছেড়ে দিয়ে] জীবনে তাহলে কি আলো নেই—[অমরের প্রস্থান]

দীপক। আছে, সে জীবন আমাদের নয়। জড় জীবনের স্বাধীনতা প্রীতি আমাদের জীবনের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। আমরা জোনাকী, জোনাকীর আলো পৃথিবীর অন্ধকারকে বাড়িয়ে দিয়েছে মাত্র। আজ যাই চন্দ্রাদেবী—উত্তেজিত মুহূর্তে যা বলেছি ভুলে যাবেন—ওর কোনই অর্থ নেই।

চন্দ্রা। আপনার কথা ভুলতে যেন না হয়। আবার কবে আসবেন?

দীপক। যখনই আদেশ করবেন—এই পরিবারের মাঝে এসে যেন কেমন শান্তি পাই। সেই লোভেই হয়ত বার বার আসবো। না ডাকলেও আসবো—

চন্দ্রা। দীপকবাবু। [একদৃষ্টে চেয়ে থেকে] আচ্ছা আজ থাক্, আপনার মন আজ শুনবার জন্যে প্রস্তুত নয়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শীতকাল, পাত্র পাত্রীর গায়ে শীতের পোষাক, তা থেকেই বোঝা যায় বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত, চলে গেছে। শহরের মধ্যে বৃহৎ একটা পার্ক,—সেটা ঘুরলে পার্কের বিভিন্ন অংশ দেখা যায়। শীতের মরসুমী ফুলের কেয়ারী মাঝে মাঝে বেঞ্চি দূরে একটা বনস্পতি। আকাশে চাঁদ মঞ্চ স্বল্পালোকিত। একখানা খালি বেঞ্চি রয়েছে—স্বাতী আর অমর এসে বসল]

স্বাতী। খামকা টানতে টানতে এখানে নিয়ে এলে কেন বলত? রাত্রি হল, আমার এ রকম ঘুরে বেড়ান ভাল লাগে না। দূর—চলো বাড়ী যাই।

অমর। বসো, বসো। তোমার মধ্যে এতটুকু রোমান্স নেই। এইসব বেঞ্চে প্রেমিক প্রেমিকারা বসে কত প্রেমের কথা বলে। তাই একটু রোমান্টিকতার জন্যে তোমাকে নিয়ে এলাম।

স্বাতী। তা এখানে কেন? ঘরে বসে প্রেমের কথা বলা যায় না?

অমর। সেটা সেকেলে ব্যাপার—এখন এই পার্কে, মাঠে না হ'লে হয় না। তুমি একটি ঘরকুনো, কিছু জানোনা—

স্বাতী। ওদের ঘর নেই, না হয় ঘর ভেঙ্গেছে তাই মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, আর প্রেম করে। নইলে এই শীতে এখানে বসে কেউ ঠিব ঠির করে?

[জনৈক ফেরিওয়ালা চিনেবাদাম দিয়ে ঢুকলো।]

অমর। এই বাদাম, দাও একশ'। [চিনেবাদাম কিনল, বাদাম ওয়ালা চলে গেল]

এই খাও, বাদামে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, সব ভিটামিন আছে।

স্বাতী। আমি বাইরে খাই দেখেছ?

অমর। [বাদাম খেতে খেতে] বাদাম বা ঝালমুড়ি বা ফুচকা না হলে প্রেমালাপ জমে না।

স্বাতী। কি করে জানলে?

অমর। গড়ের মাঠে দেখেছি, পার্কে দেখেছি, লেকে দেখেছি, দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি। সব চিনেবাদাম আর ঝালমুড়ি খাচ্ছে আর প্রেম চালাচ্ছে—

স্বাতী। বাদামে প্রেম জমে?

অমর। নিশ্চয় জমে—বাদাম বিনা প্রেম নেই।

স্বাতী। তাহলে বাড়ী নিয়ে চল। লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে খাবো,—খুব জমবে।

অমর। মাষ্টারের মেয়ে ত, একেবারেই মাষ্টারের

মেয়ে,—এতটুকু প্রেমবোধ নেই। একটু আধুনিকতা নেই। একটু সোফিষ্টিকেশন নেই। তুমি একটা যে কি? কি করেই বি. এ. পাশ করেছিলে!

স্বাতী। ছাখো, আমার বাবা তোমাদের ঘরে মেয়ে দেবার জন্যে সাধতে আসেন নি। তোমার দাদাই আমার বাবাকে সাধতে গিয়েছিলেন।

অমর। আমার দাদা, তোমার মত রমণী রত্নের জন্যে সাধতে গিয়েছিলেন?

স্বাতী। নিশ্চয়ই। সম্বন্ধ উঠলে বাবা ত স্পষ্টই বলেছিলেন, অত বড় ঘরে মেয়ে দেবার সামর্থ্য তার নেই,—গরীবের মেয়ে ঘরে নিলেও তোমরা সুখী হবে না। তখন তোমার দাদাই ত—

অমর। দাদা সাধতে গিয়েছিলেন!

স্বাতী। নিশ্চয়ই—হঠাৎ যেদিন দেখতে গেলেন সেদিন বাবার চণ্ডীপাঠের পূজার সাজ করছিলাম। তিনি একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির। তারপরে ত জোর করে নিয়ে এসেছেন নইলে তোমাদের ঘরে আমায় কল্পনা আমিও করিনি, বাবাও করেন নি।

অমর। কি আশ্চর্য! পালিয়ে এলাম তোমাকে নিয়ে পার্কে—একটু রোমান্স ক'রবো—এখানেও ঝগড়া লাগিয়ে দিলে!

স্বাতী। আমি দিলাম! তুমিই ত মাষ্টারের মেয়ে বলে খোঁচা দিলে।

অমর। ওসব থাক্। একটু প্রেমের কথা বলতো—ভালবাসাবাসির কথা—

স্বাতী। বলছি ত, তোমাকে খুব ভালবাসি, তুমি আমার দেবতা, তোমার পায়ে জীবনযৌবন সব ঢেলে দিয়েছি'—এখন বাড়ী চল লক্ষ্মী। আমার ভাল লাগছে না—

অমর। তুমি কিচ্ছু জানো না,—তোমার ওটা যাত্রা গানের মত হল—

স্বাতী। বেশ তাহলে তুমিই বল, বেশ সিনেমার মত করে, রসিয়ে কসিয়ে বলত—

অমর। আমিই জানি! না, জীবনটাই মাটি, কি করে এসব আলাপ করে তাও ত জানিনে ছাই। তবে হ্যাঁ দাঁড়াও,—একদিন দীপকদা আর বৌদিকে দেখেছিলাম। এমনি করে [হাত ধরে] বলছে—বড় একা জীবনে, আমি মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—

স্বাতী। যতই বল, তোমাদের মেজঠাকরুণের পুনরায় বিয়ে না করলে মুক্তি নেই। তবুও মন্দের ভাল যদি দীপকবাবুকেই বিয়ে করে। যা হোক্ ভদ্রলোক ত বটে; না হয় ওই বাড়ীতে থাকলো। দিদি বা মা'র বোধ হয় তাতে আপত্তিও নেই।

অমর। সে কি সর্বনাশ! তুমি ওকথা বলে দিয়েছ? তোমাকে কোন গোপনকথা আর বলব না।

স্বাতী। দিদিকে বলেছিলাম, তিনি আবার মাকে বলে দিয়েছেন তা, আমার দোষ কি? মাও নাকি বলেছেন সেও মন্দের ভাল—দীপকবাবুকেও ত তালাক দিয়েছে—দু'জনেরই মিল্লে হয়। নইলে উনি চূণকালি না দিয়ে ছাড়বেন না—

অমর। নাঃ কি জন্যে এলাম, আর কি সব আলোচনা হ'চ্ছে। একটু প্রেমালাপ হল না,—কিচ্ছু না—

স্বাতী। চল, বাড়ী যাই। এরকম ঘুরে বেড়ান আমার ভাল লাগে না।

অমর। দেশশুদ্ধ তরুণ-তরুণী হাটে-মাঠে ঘুরছে'—চোখে মুখে কত কি বলছে, আর তুমি যে কি?

স্বাতী। তাদের ঘর নেই, তাই হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়—তা বোঝ না কেন? আর ভালবাসা জমানোর জন্যে প্রেমালাপ করে। আমাদের ত জমেই গেছে—চল বাড়ী গিয়ে ভাল করে জমাই,—শীতে আর জমি কেন?

অমর। তোমার দ্বারা হবে না। দিন কয়েক বিলিতি কি হিন্দি সিনেমা না দেখলে তুমি শিখবে না। এরকম ঢিলে ঢালা সেকেলে প্রেম নিয়ে আর চলে না। একটু আধুনিক হও—

স্বাতী। আমিত সেকেলে, তুমিত একেলে। তুমিই বলত দেখি, শুনি প্রেমলাপ কেমন—বল,—কই বলছ না ত! বল—

অমর। দূর, অমনি করলে বলা যায়!

স্বাতী। তোমার ত ডাক্তারী প্রেম, কার পেট কাটবো কার গলা কাটবো, কার দাঁত তুলবো। চল ওঠো। [উঠে দাঁড়িয়ে, অমরকে টেনে তুলে] ওঠো, বাড়ী গিয়ে ঘরে বসে সব বলব। চল, লক্ষ্মীটি, দেরী হলে মা ব'কবেন। তার পরে ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি কাশি হলে ত রক্ষে নেই।

[উভয়ের প্রস্থান। মঞ্চ ঘুরে যেতে লাগল। একাকী একটি তরুণ বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। ঝাল মুড়ি বাদাম হেঁকে গেল। তরুণ নির্বাক। চন্দ্রা ও দীপক প্রবেশ করে পাশাপাশি চলছে। দীপক লোকটিকে দেখল। মঞ্চ ঘুরলে আর একখানি বেঞ্চিতে ওরা দেখে এক তরুণী কাঁদছে, একটি তরুণ বেঞ্চিতে মাথা রেখে বসে আছে—মনে হয় সেও কাঁদছে। ওরা চলতে চলতে ফাঁকা একটা বেঞ্চির কাছে এল। মঞ্চ থেমে গেল]

চন্দ্রা। দীপক, এসো এখানে একটু বসি, অনেকক্ষণ ঘুরেছি। [উভয়ে বসল—একটু নীরবতা] কিছু বলছ না যে আজ?

দীপক। ভাবছি।

চন্দ্রা। কি ভাবছ? কি এত ভাবো তুমি বুঝতে পারিনে।

দীপক। তোমাকে বলেছি ত। জীবনকে যারা হালকাভাবে উড়িয়ে দেয়, তাদের ভাবনা নেই। রোজগার করছে, খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে প্রজনন করছে—পশুর মত, কিন্তু জীবনকে গভীরভাবে দেখতে গেলেই ভাবনা আসে—

চন্দ্রা। গভীরভাবে দেখলে যদি জীবনের স্বাদ বদলে যায় তবে হালকা হলে ক্ষতি কি?

দীপক। সেখানেই মানুষ আর পশুর তফাৎ। আচ্ছা এই যে শীতের রাত্রে লোকগুলো বেঞ্চে বসে আছে, এদের লক্ষ্য করেছ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ।

দীপক। দেখেছ—এরা দুঃখী। এরা যেন জীবনের ভার বহনে অক্ষম। সেটা লক্ষ্য করেছ?

চন্দ্রা। জীবনে দুঃখ আছে, আনন্দও আছে,—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।

দীপক। কিন্তু, এরা ক্ষণিক দুঃখ বেদনায় কাতর নয়। মনে হয় এরা যেন কি হারিয়েছে। কি হারিয়েছে এরা জানে না, কেন হারিয়েছে তাও জানে না। জীবনে এই হারানোর বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রা। জগতে এত দুঃখ কেন বলতে পারো?

দীপক। বলতে পারি না, ঠিক জানি না, তবে মনে হয় এরা জীবনের একাকীত্বের ভারে বিপন্ন। এই যন্ত্র সভ্যতা, শিল্পায়ন মানুষকে তার বাবা মা পরিজনের থেকে সোনার আপেল দেখিয়ে ছিনিয়ে এনেছে। সমাজ জীবনের নির্ভরতা, পরিবারের সামগ্রিকতা, প্রকৃতির উদারতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে ধূলি-ধূসর রুক্ষ নগরীর রাস্তায় ছিটিয়ে দিয়েছে। এরা হৃদয়হীন যন্ত্র—এরা ব্যক্তি হিসাবে একক, স্বতন্ত্র, পরিবারের স্নেহ-প্রীতির বন্ধন নেই, মুক্ত অহং চাইছে, কেবল চাইছে। যত পেয়েছে ততই চেয়েছে, তাদের চাহিদা মেটেনি তাই কাঁদছে—রুগ্ণ এই পৃথিবী কাঁদছে। এরা একা, বড়ই একা,—স্বাধীন সত্ত্বাকে বইতে পারছে না।

চন্দ্রা। তুমি বলতে চাও, পৃথিবীর এই মানুষের ভীড়ে আমরা একা!

দীপক। হ্যাঁ একা,—আমরা একক। অশ্রুর সমুদ্রে পরিবেষ্টিত দ্বীপের মত একা। মানুষের অহং পৃথিবীর মানুষের হৃদয় গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্যথিত করে, ছিন্ন করে এগিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তি সংগ্রাম ও সংঘাতে আমরা মুমূর্ষু, ত্রাহি ত্রাহি করছি মানুষের ভীড়ে। [একটু চুপ করে থেকে] কেমন জানো? বাস্ চলেছে, ভিতরে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছি অন্যের পা মাড়িয়ে, আমার পা মাড়াচ্ছে আর একজন। কনুয়ের খোঁচায় পাঁজর ভাঙছে, কাঁধের ব্যাগের খোঁচায় কোমর ভাঙছে—কিন্তু বাস চলছে তীব্রগতিতে—এগিয়ে যাচ্ছে। চলার দ্রুতিকে আমরা বাহবা দিচ্ছি, রাস্তার লোক বাহবা দিচ্ছে।

চন্দ্রা। দীপক, তোমার মনটা বিকল হয়েছে মনে হয়। তোমার মত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এই নৈরাশ্য ভাল নয়। তুমি জীবনের দুঃখকে মুছে ফেলে হাসতে শেখো—

দীপক। তা বলতে পারো—বিকল। এ জীবনের ভার যেন আর বইতে পারিনে মনে হয়। আত্মসমর্পণ করবো কোথায়ও—যে আমার ভার নেবে। যাকে ভার দিয়ে আমি মুক্ত হবো।

চন্দ্রা। পুরীতে লতিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই তোমার মনে এই বিকলতা এসেছে। তুমি তাকে এত ভালবাসো, তবুও সে চলে গেল!

দীপক। হ্যাঁ, সেও আমাকে সত্যিই ভালবাসে—আজও ভালবাসে। কিন্তু মনে হয় সে এত চেয়েছে যে আমি তা দিতে পারিনি, আমি এত চেয়েছি যে সে তা দিতে পারে নি—তাই বাঁধন ছিঁড়েছে। যদি একজন আত্মসমর্পণ করতো তা হলে হয়ত বাঁধন ছিঁড়ত না।

চন্দ্রা। আজ যে আত্মসমর্পণ করবে ভাবছ:—কোথা করবে? কার কাছে করবে? লতিকা কি ফিরে আসবে? তুমি তারই প্রতীক্ষায় রয়েছ?

দীপক। না, সে ফিরবে না। ফিরলেও তার কাছে আমার অহং আত্মসমর্পণ করবে না, এ পরাজয় আমার স্বাধীন সত্তা মেনে নেবে না—কিছুতেই নেবে না।

চন্দ্রা। জীবনের জন্যে,—অন্য কারও কাছে কি তুমি আত্মসমর্পণ করতে পারো না? আর কারো উপর নির্ভর করতে পারো না।

দীপক। হয়ত পারি,—হয়ত তাই করতে হবে। নইলে এই একাকীত্বের বেদনা বহন করা আজ আমার সাধ্যাতীত। মানুষের মাঝে বাস করেও এমন বিচ্ছিন্ন, একা—একান্তই একা! [হঠাৎ চন্দ্রাকে লক্ষ্য করে] এমনি আত্মসমর্পণ করলে তোমার জীবনের সমস্যারও সমাধান হতে পারে—

চন্দ্রা। কিন্তু সে কে? কার উপর নির্ভর করবো? সে আমার জীবনের ভার গ্রহণ করবে? এতবড় বিশ্বাস আমি কাকে করবো। তুমি কি সেই মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছ?

দীপক। পাইনি। আমি ব্যক্তির কাছে আপনাকে সমর্পণ করতে চাইনি, চেয়েছি হৃদয়ের কাছে। সে লতিকা হোক, তুমি হও, আর যেই হোক—যে হৃদয়ের করুণা দিয়ে, সুধা দিয়ে আমার সমস্ত অমঙ্গল—মঙ্গলকে ঘিরে রাখবে, হৃদয়ের ক্ষতস্থানে শান্তির প্রলেপ দেবে,—যার হৃদয় সম্পর্কে আমি নিঃসংশয়, তার হাতে আপনাকে ছেড়ে দেব—

চন্দ্রা। তুমি তেমন হৃদয় খুঁজে পাওনি?

দীপক। না, আজও পাইনি?

চন্দ্রা। আমি কিন্তু পেয়েছি; যদি সে গ্রহণ করে, আমি তার হাতে আপনাকে সমর্পণ করতে পারি।

দীপক। কে সে? আজকার যন্ত্রযুগে সে হৃদয় কোথায়? সে ত্যাগ সহিষ্ণুতা সততা কোথায়?

চন্দ্রা। তোমার মাঝে আমি তেমন হৃদয় দেখেছি দীপক। সে হৃদয়কে আমি বিশ্বাস করি।

দীপক। আমার মাঝে? [ক্ষণিক নীরব] না, চন্দ্রা সে হৃদয় আমার নেই। আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ তুমি রাঙতাকে সোনা মনে করেছ—আমি উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল, অহং—

চন্দ্রা। আমার চোখে রাঙতাই সোনা হয়ে উঠেছে আজ, দীপক। তাকে সোনার মূল্য দিতে আর আমার বাধা নেই।

দীপক। [উত্তেজিত ভাবে] চন্দ্রা, তুমি কি বললে? কি বললে? যা বললে, তার অর্থ তুমি বোঝোনি। [তার হাত ধরে] তুমি বোঝোনি চন্দ্রা।

চন্দ্রা। [সস্নেহে তার হাত ধরে] দীপক তুমি ভুল ক'রোনা। আমি তোমায় চিনেছি।

[মঞ্চের আলো নিভে এল, শুধু ওদের হাত দু'খানির উপর উজ্জ্বল আলো। তার পরে তাও মিলিয়ে গেল। স্বল্পান্ধকার মঞ্চ ঘুরলো। বেঞ্চিতে ম্লান জোছনালোকে সেই তরুণটি বসে, নিঃসঙ্গ। তার পরের বেঞ্চিতে তরুণীটি চোখমুছে উঠে গেল। লতিকা ও সুবীর এসে সেই বেঞ্চিতে বসল—আলো একটু উজ্জ্বল হল]

সুবীর। লতা, পুরী থেকে আসবার পর তোমার কি পরিবর্তন হয়েছে, তুমি হয়ত জানো না। কি একটা তুমি আমার কাছে গোপন করে নিয়ে বেড়াচ্ছ। সে গোপন কাঁটার ক্ষতে তুমিই বেদনায় অধীর হয়েছ। তোমার দুঃখ আমাকে না বললে আর কাকে বলবে?

লতিকা। তমি কি ক'রে জানলে? তোমার কাছে কি গোপন করে চলেছি?

সুবীর। আমার অন্তর দিয়ে তা আমি বুঝি। পুরী থেকে আসবার পর দেখেছি, তোমার কর্তব্যে ত্রুটি নেই, কাজে ভুল নেই, সবই সত্যি কিন্তু তোমার হৃদয়ের উষ্ণতা হারিয়ে গেছে। তোমার স্পর্শে আমার হৃদয় পুলকে অধীর হত, আজ হয় না কেন? আমাকে লুকিয়ে তুমি যেন কি ভাবো। তুমি আমাকে বল, তোমাকে সেইজন্যেই এই নির্জনে নিয়ে এসেছি। এই চাঁদ, এই উদার প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে বল—

লতিকা। কি বলব?

সুবীর। তুমি যে ভাবনার গোপন জ্বালায় জ্বলছ তা আমাকে বল। তোমার সমস্ত দুঃখবেদনার ভার বইবার শক্তি আমার আছে। তোমার দুঃখের ভাগ বইতে দাও—

লতিকা। তাতে কি তুমি সুখী হবে?

সুবীর। সুখী হবো কি দুঃখী হবো জানিনা, তবে তোমার দুঃখের অংশভাগী হলে জীবনকে সার্থক মনে করবো—নইলে আমাদের মিলিত জীবনে কোন অর্থ হয় না। আমরা এক, ভিন্ন নয় একথা ভাববার সুযোগ দাও—

লতিকা। সুবীর, তোমার অন্তরকে আমি চিনি। সত্যিই মনের গোপনে আমি বড় জ্বালা বয়ে নিয়ে চলেছি। কিন্তু তা জানলে তুমি সুখী হবেনা—তুমি নিদারুণ আঘাত পাবে, তাই বলিনি।—বলতে চাই না। তুমি আমাকে বড় বেশী ভালবাসো তাই বলতে ভয় হয়।

সুবীর। আমার ভালবাসায় যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে বল,—সে আঘাত সহ্য করতে চাই, বুকে পেতে নিতে চাই—

লতিকা। অনেকদিন ভেবেছি বলবো, এ গোপন-জ্বালা আমি আর সইতে পারি না। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারি না। তুমি বড় ভালো, বড় সরল, বড় উষ্ণ তোমার হৃদয়, বড় কোমল তোমার অন্তর, তাকে আঘাত করতে চাইনি কিন্তু আর না বললেও নয়। এ আত্মবঞ্চনার গ্লানি আজ অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে।

সুবীর। বল,—আমি তোমার স্বামী, নিঃসংশয়ে বল—

লতিকা। [একটু থেমে, সুবীরের মুখের দিকে চেয়ে, মাথা নীচু করে] পুরীতে যে দীপকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে আছে। সেই অদ্ভুত লোকটি, সারারাত্রি ফিলজফি পড়তো, একা বসে দৃষ্টিতে ভিজতো—

সুবীর। দীপকবাবু, হ্যাঁ চমৎকার ভদ্রলোক, তার কথা মনে থাকবে না?

লতিকা। সেই আমার প্রথম স্বামী। এতদিন আমি বলিনি, দুঃখ পাবে বলে, পুরীতে সেকথা দু'জনেই গোপন করেছি।

সুবীর। [অবাক হয়ে লতিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল]

ললিতা। সে আজও আমাকে ভালবাসে—আমি চলে আসার পরে সে এই ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। মনের গভীরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, ভাল করে ভেবে দেখেছি—আমি আজও তাকেই ভালবাসি। তারই সন্তান আমি হারিয়েছি। জানি—আমি দেহে দ্বিচারিণী সে তুমি ক্ষমা করেছ, জেনে শুনেই—আমাকে গ্রহণ করেছ কিন্তু আমি আজ বুঝেছি, মনেও আমি দ্বিচারিণী। আমি তোমাকে হৃদয় দিতে পারিনি- তোমাকে বঞ্চিত করেছি। তোমার ভালবাসা প্লাবনের শক্তি ও উন্মত্ততা নিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছে—আমি আত্মরক্ষা করিনি, করতে পারিনি।

সুবীর। [রুদ্ধ কণ্ঠে] লতা, লতা, সত্যি করে বল, তুমি কি ফিরে যেতে চাও? শূন্য হৃদয়ে আমার ঘরে না থেকে দীপকবাবুর গৃহে অন্তর পূর্ণ করতে চাও? বল, মুক্ত কণ্ঠে বলো।

লতিকা। [রুদ্ধ কণ্ঠে] জানিনা, জানিনা সুবীর। আমার দেহ মন দ্বিধা-খণ্ডিত। এই বিদীর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না সুবীর। দীপক জীবনে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে হত্যা করছে এও সহ্য করতে পারি না, তোমার হৃদয়কে অপমান করে, বঞ্চিত করে চলে যেতেও পারি না। তোমার গৃহবধূ হয়ে কি করে আমি দিনের পর দিন তোমাকে বঞ্চিত করবো, প্রবঞ্চিত করবো? আমি কি করবো, আমাকে বলে দাও সুবীর। আমার বাঁচা চলে না, এই দুই অন্তর নিয়ে বাঁচা চলে না। বল সুবীর,—আমি কি করবো, কি করবো আমি?

[উত্তেজনায় কেঁদে ফেলে দিল]

সুবীর। লতা, লতা, তুমি অধীর হ'য়োনা। তুমি আমায় ভাল না বাসতে পারো, ভালবেসোনা। তোমার হৃদয়ের যতটুকু পেয়েছি তাতেই আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তুমি যেয়ো না, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, লতা! তুমি অন্তরে দীপকবাবুকে ভালবাসো, কিন্তু আমাকে ত্যাগ ক'রো না। তুমি নেই সে ঘরে আমি থাকতে পারবে না—যে পৃথিবীতে তুমি আমার পাশে নেই সে পৃথিবীতে আমি বাঁচতে পারবো না।—লতা—

লতিকা। [সুবীরের বুকে মুখ লুকিয়ে] তুমি কি করে আমাকে ক্ষমা করবে? এর পরেও কি করে আমি তোমার ঘরে থাকবে? বল? আমি দেহমনে দ্বিচারিণী, আমি তোমাকে কেমন করে প্রতারণা করবো?

সুবীর। তোমার এই স্বীকারোক্তি তোমার সমস্ত প্রতারণা, গ্লানিকে মুছে দেবে লতা! তুমি আমার—

একান্তভাবে আমার। তুমি কোথাও যাবে না—এখানে থাকবে, সমস্ত হৃদয় জুড়ে থাকবে।

[মঞ্চ ধীরে ধ'রে অন্ধকার হয়ে গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বেলা দ্বিপ্রহর—রবিবার। দীপকের বাসা। অবিন্যস্ত ঘর—সবই আছে কিন্তু সবই অগোছাল। বই, খবরের কাগজ—টেবিলে রেডিও, বিছানার চাদর ওল্টানো। একখানা খবরের কাগজে তরকারীর খোসা, ডিমের খোলা। মেঝের মাঝখানে একটা ষ্টোভ; কুকারের কতকগুলো বাটি। থালা ঘটি গ্লাস ইতস্ততঃ ছড়ানো। একটা কুলুঙ্গীতে বই জড়ো করা। দীপক তরকারী কুটছিল। সেগুলো কুকারের বাটিতে ভরে দিয়ে জনতা ষ্টোভে চাপিয়ে দিল। উঠে চেয়ারে বসে বই খুলল,—তারপরেই ষ্টোভটাকে বাড়ালো। বই বন্ধ করে আলোয়ান গায় দিয়ে রেডিও খুলে দিল। রেডিওতে গান হচ্ছিল,—গানটা অর্থব্যঞ্জক। দীপক শুনছিল। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রেডিও বন্ধ করে দরজা খুলল। দীপকের দাদা ও বৌদির প্রবেশ। দীপক অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে]

দীপক। দাদা, বৌদি? তোমরা হঠাৎ! [প্রণাম করতে ভুলে গেল]

দ্বিজেন। হ্যাঁ হঠাৎই—তিনবছর পরে আসতে বাধ্য হয়েছি—

দীপক। [বিছানায় চাদর ঠিক করে দিয়ে] ব'সো। [মনে পড়ায় প্রণাম করলো]

দ্বিজেন। ষ্টোভে রান্না হচ্ছে তোর? নিজেই রেঁধে খাচ্ছিস্, তা হলে।

দীপক। না। রোজ নয়। যেদিন আফিস থাকে সেদিন যাওয়ার পথেই হোটেলে খেয়ে নি। তবে রবিবারে, বন্ধের দিনে বেরুতে ইচ্ছে করে না,—তাই কুকারে চাপিয়ে দি—

বৌদি। ঠাকুরপো, এই তোমার ঘর। এর মাঝে দিন কাটাচ্ছো, তবুও আমাদের কথা একবার মনে হল না! যে বৌদি তোমায় চান করিয়ে প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছে তার কাছে ফিরে যেতে পারলে না? এতই তোমার অভিমান?

দীপক। একটু চা ক'রবো বড়দা!

দ্বিজেন। না, তোর এখানে জলস্পর্শ করার অধিকার আমাদের নেই। তোকে ওসব কিছুই করতে হবে না।

দীপক। জলস্পর্শ করার অধিকার নেই?

দ্বিজেন। না,—আমরা বাবার কাছে প্রতিশ্রুত—বাবার নিষেধ আছে। তুই হয়ত দুঃখ পেয়েছিস্ কিন্তু উপায় নেই। বলবি,—আমাদের কি যুক্তি বুদ্ধি নেই? আছে, কিন্তু বাবার বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশী আছে এইটে মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন তাঁর সমস্ত জীবন আমাদের মঙ্গলেচ্ছায়ই কেটেছে—

দীপক। [শুধু চেয়ে রইল]

দ্বিজেন। তিনবছর বাদে হঠাৎ কেন এলাম, সেইটে শোন্—

দীপক। বল।

দ্বিজেন। এই আসাটাও বাবার অভিপ্রেত নয়, তবুও এসেছি কারণ ভুল মানুষেই করে—ভুল সংশোধনও সেই করে। আমরা কেউই দেবতা নয়—

দীপক। বাবার অনভিপ্রেত?

দ্বিজেন। হ্যাঁ,—তবুও নিজের দায়ীত্বেই এসেছি। শোন্—বাবার বোধ হয় আর বেশীদিন নেই। তারজন্যেই অষুধ কিনতে এসেছি—দেশে সে অষুধ মিলল না।

দীপক। মা?

দ্বিজেন। তাঁর শরীরও ভাল নয়—সে সব খবরে দরকার নেই। একটা কথা জেনে রাখ, তুই বাবার অমতে যে বিয়ে করেছিলি তাতে বাবা দুঃখ পেয়েছিলেন সত্যি কিন্তু সেজন্যে তোর উপরে কোন রাগ তাঁর নেই। তিনি বারবার বলেছেন—মানুষের জীবন একক নয়,—সামগ্রিক। সেখানে পত্নীর যেমন স্থান, বাবা মা দাদা, বৌদিরও স্থান তেমনি আছে।—নইলে সে জীবন পূর্ণ নয়। তুই একদিন এই সত্য বুঝে তার কাছে ফিরে যাবি এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি জানতেন এ বিবাহ টিকবে না,—স্বাধীন সত্তায় সংঘাত হবেই। সেই সংঘাতই হয়েছে—ছাড়াছাড়িও হয়েছে। এখন তোর অভিমান আর স্বাধীনতার অহঙ্কার নিয়ে একক জীবনযাপন করবি না ফিরে যাবি সেকথা অবশ্য তুই ঠিক করবি। আমাদের বলবার কিছু নেই। আমি কর্তব্য হিসাবে বলতে এসেছি বাবা মৃত্যুশয্যায়—

যদি তোর করণীয় কিছু থাকে করবি—সেই সুযোগ তোকে দিয়ে গেলাম—

দীপক। বড়দা—

দ্বিজেন। শোন দীপ! আমার যথেষ্ট সময় নেই হাতে, পরের ট্রেনেই ফিরতে হবে। এদের বাপের বাড়ী ছিলেন নিয়ে যাচ্ছি। একটা কথা শোন্—বাবা, দর্শনের অধ্যাপক, রিটায়ার করেও কেবল দর্শনশাস্ত্র আর মনোবিজ্ঞান পড়েছেন। তিনি বলেন,—মানুষ যতদিন ভাববে, আমি কি চাই আর কতটুকু পেয়েছি, ততদিন তার মুক্তি নেই। না-পাওয়ার দুঃখ তাকে অভিশপ্ত করবেই। মানুষ যেদিন ভাববে, এই পৃথিবীতে অন্যের আমার কাছে কি চাইবার আছে আর কতটুকু আমি দিয়েছি — এই হিসেবে জীবনকে যখন দেখবে তখনই তার মুক্তি। দেওয়ার তুরীয় আনন্দকে না চিনলে তার মুক্তি নেই। যে মুক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা চাই, সেই মুক্তিই আমাদের অজ্ঞাত অচেতন মনের ক্রিয়া।

দীপক। দেওয়ায় আনন্দ?

দ্বিজেন। তুই মূর্খ নয়। তুইও যথেষ্ট পড়াশুনো করেছিস। বাবার কথার অর্থ তুই নিশ্চয়ই বুঝবি—না বোঝবার কথা নয়। যাক আমি ওষুধটা নিয়ে আসি। হ্যাগো তুমি এখানে একটু থাকো, -তিনটের গাড়ী ধরতেই হবে! [প্রস্থান]

বৌদি। ঠাকুরপো, তুমি কি এমনি জীবনই কাটাবে। যার জন্যে তুমি বাবা-মা, আমাদের সকলকে ছেড়ে দিলে সে ত চলে গেছে—তার পরেও এমনি ছন্নছাড়া জীবনই কাটাবে?

দীপক। মনে হয় এই-ই ভাগ্যের লিখন। অনিবার্য ভবিষ্যৎকে মানতেই হবে।

বৌদি। এ তোমার জিদ। অথবা লজ্জা, না হয় আত্মাভিমান।

দীপক। হয়ত' তাই—

বৌদি। তুমি ভেবে দেখেছ—যেদিন তুমি শিশু ছিলে, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শেখো নি, সেদিন কে তোমাকে রক্ষা করতো? কে আছাড় খেলে ধুলো ঝেড়ে দিত? আঘাত পেলে কার বুকে মুখ লুকিয়ে বেদনা ভুলতে! তাদের প্রতি কি কোন কর্তব্য নেই! তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষার কি কোন মূল্য নেই তোমার কাছে? একমাত্র তোমার সুখ দুঃখই জীবনে বড় হয়ে উঠেছে! তুমি কেন ফিরে যেতে পারো না, তা আমি জানি।

দীপক। কেন?

বৌদি। তোমার আত্মাভিমান,—তোমার স্বাধীন সত্ত্বা তাতে সায় দেয় না।

দীপক। হয়ত তাই।

বৌদি। এই পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে ফিরে যেতে পারো না—এইত!

দীপক। [বৌদির দিকে চেয়ে রইল]

বৌদি। যাদের জীবন, যাদের কার্য, চিন্তা কর্ম অতন্দ্র প্রহরীর মত তোমার জীবনকে ঘিরে মঙ্গল কামনা করেছে, তোমার মঙ্গল অমঙ্গলকে ঘিরে রেখেছে, তাদের হাতে তুমি নিজেকে ছেড়ে দিতে পারো না কেন? তোমার জীবনের ভার ত তোমার কাছেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে—তবুও—

দীপক। তুমি এসব কথা পেলে কোথায়? এমন কথা ত তুমি কোনদিন বলতে না।

বৌদি। এ আমার কথা নয়—বাবার কথা। মা তোমাকে বহুবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন কিন্তু বাবা বলেছেন—না। তাকে নিজে থেকে ফিরে আসতে দাও। নইলে সে আসা নিরর্থক হবে। একক জীবনের দুর্বহ বেদনাহত হয়ে সে একদিন ফিরবেই—

দীপক। বাবা বিশ্বাস করেন,—আমি ফিরে যাবোই!

বৌদি। হাঁ। মানুষ স্বাধীন নয়, সে চির পরমুখাপেক্ষী। মানুষের কাছেই মানুষের জীবন বাঁধা। তোমার জীবন কেন এমন হল ঠাকুরপো? তোমার জীবন লতিকার মুখাপেক্ষী বলেই না?

দীপক। তোমরা এতদিন আমার কথা ভাবতে?

বৌদি। যারা ভাববার তারা দিনরাতই ভেবেছেন। আমার বলতে নিষেধ আছে তাই বলতে পারি না—তবে যা বললাম, ভেবে দেখো। তুমি ত মূর্খ নয়। কি পেয়েছি সেইটেই কি জীবনের বড় হিসাব, কি দিয়েছি তার হিসাব একবারও করবে না? [দ্বিজেনের প্রবেশ]

দ্বিজেন। ওগো, চলো। সময় হ'য়ে গেছে, পথে কিছু ফল-টল কিনে নিতে দেরী হবে—

বৌদি। তাহলে যাই ঠাকুরপো!

দীপক। বাবা, আর বাঁচবেন না?

দ্বিজেন। সম্ভবতঃ না। মা-ও যে এই শোক সামলাতে পারবেন তাও মনে হয় না।

দীপক। একটু চাও খেয়ে গেলে না?

দ্বিজেন। দীপু, তোর বাসায় এসে চা-টুকুও না খেয়ে চলে যাচ্ছি একি খুব আনন্দের? তোর বাসায় এসে ভুরিভোজনেও ত বাধা ছিল না। কিন্তু এই শাস্তি তোকে পেতে হবে বলেই দিয়ে যাচ্ছি। চলো—চলি দীপু।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দীপক কুকারটা নামিয়ে দিয়ে, ষ্টোভ নিভিয়ে দিল। বিছানায় বসে ভাবছিল। হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে লতিকার প্রবেশ]

লতিকা। দীপক।

দীপক। [মুখ তুলে] লতা, তুমি হঠাৎ?

লতিকা। [ঘরের চারিদিকটা দেখে নিয়ে] ও তোমার এখনও খাওয়া হয় নি। এখন ত দু'টো বাজে।

দীপক। কিছু না, এইটেই আমার অভ্যাস। দুঃখের কিছু নেই। রোজই হয় এমন নয়, রবিবার বেরুতে ইচ্ছে করে না তাই যা হয় করেনি।

লতিকা। দীপক,—আমি অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর।

দীপক। আমিও ত কত অপরাধ করেছি—তারও ইয়ত্তা নেই। তার জন্যে তোমার মনে ক্ষোভ নেই!

লতিকা। না—কিছুমাত্র না। তুমি এমনি করে জীবন কাটাবে? আমার জন্যে?

দীপক। জানি না—সত্যিই জানি না। জীবনে যাকে চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম, তার ভিত্তি আজ নড়ে উঠেছে। বিশ্বাস করেছিলাম—মানব সত্ত্বা স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সে আপনার গৌরবে, আপনার মহিমায় মহিমান্বিত কিন্তু হায়! কোথায় তার স্বাধীনতা! মানুষে মানুষে এমন বন্ধন যে তার মুক্তি নেই। আমার সুখ-দুঃখ ত আমার কর্ম আমার চিন্তার উপর নির্ভর করে না—সে যে সমগ্র পৃথিবীর মুখাপেক্ষী, সমগ্র মানব সমাজের মুখাপেক্ষী।

লতিকা। তুমি বিদ্বান, তুমি হৃদয়বান দীপক। তুমি অনেক জানো, আমায় বলে দাও দীপক, আমি কি ক'রবো?

দীপক। তুমি কি করবে, আমি বলে দেব! বড়ই অসময়ে এসেছ লতা!

লতিকা। [ভিজা কণ্ঠে] আমায় বলে দাও—আমার অন্তর আজ তোমার জন্যে উন্মুখ। তোমার ঘরে ফিরে না এলে তার মুক্তি নেই। ওদিকে সুবীরের ভালোবাসা জলোচ্ছ্বাসের মত আমাকে ঘিরে রেখেছে—তাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না। সমস্ত অন্তর আমার দ্বিধা বিভক্ত আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, আত্মা, হৃদয় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমায় বলে দাও দীপক আমি কি ক'রবো? এ জ্বালা, এ বেদনা আমি সইতে পারি না আর!

দীপক। আমি তোমায় কি পথ বলে দেব! আমার জীবন তাসের প্রদীপ নিভে গেছে—পথ ঘনান্ধকার, সেখানে আলোর রেখাটি নেই, কোন পথের নিশানা নেই। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিকহারা,—তোমাকে কি পথ দেখাব?

লতিকা। সুবীরকে আমি সবই বলেছি—কিছুই গোপন করিনি। আমি বলেছি, তোমার জন্যে আমার সমস্ত দেহ মন আজ অশান্ত উন্মুখ। সে সব শুনে শুধু বললে, "আমায় ভাল না বাসতে পারো বেসো না—আমায় ছেড়ে যেও না। তোমায় যেটুকু আমি পেয়েছি তাতেই আমি পূর্ণ। তাকে বিমুখ করে, তার এই হৃদয়কে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে কেমন করে আসবো? কিন্তু তাকে ত্যাগ না করলেও আমার হৃদয় শূন্য। আমি কি করি দীপক?

দীপক। সে আত্মসমর্পণ করেছে তোমার কাছে?

লতিকা। হ্যাঁ, তার যা কিছু ছিল সবই দিয়েছে আমাকে কিন্তু আমি যে নিতে পারি নি। এ প্রবঞ্চনা সারাজীবন আমি কি করে করব?

দীপক। [চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে] লতা, আজই আমি একটা আলোর রেখা পেয়েছি। তুমি কি পেয়েছ, কি পাও নি, কতখানি পাওনি সে হিসাব আর ক'রো না! কি দিয়েছ কতখানি দিয়েছ সেই হিসেবে জীবনকে দেখ—মনে হয় তাতে শান্তি পাবে, তৃপ্তি পাবে।

লতিকা। শান্তি পাবো! তৃপ্তি পাবো! কতখানি দিয়েছি? কতখানি দিতে পারি?

দীপক। হ্যাঁ, সুবীরের হাতে আপনাকে সমর্পণ কর—সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর। তার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেল। নিজের সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গল ইচ্ছা বাসনা তার হাতে

তুলে দিও—সে তার উষ্ণ বুকের স্পর্শে তোমাকে ঘিরে থাকবে। জীবনের নিশ্চিন্ততা তোমাকে মুক্তি দেবে। তুমি কিছু চাইবে না, চাইলেই আসবে না-পাওয়ার বেদনা—

লতিকা। আর তুমি? তুমি এমনি করে আপনাকে হত্যা করবে—আমার জন্য দীপক? এ বেদনা আমি সইব কেমন করে—এ ভাবনায় যে আমার সমস্ত অন্তর রক্তাক্ত হ'য়ে যায়।

দীপক। না-লতা। আমিও আত্ম সমর্পণ করবো। বড় গর্বে বলেছিলাম, যুদ্ধ জাহাজ আত্মসমর্পণ করে না, নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, কিন্তু আজ আমি আত্মসমর্পণ করবো।

ললিতা। কোথায় কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

দীপক। যেখানে যার কাছে আত্মসমর্পণ করলে সব দুঃখ ভুলে পরম শান্তি পেতাম তার কাছে নিজেকে দিতে পারলাম না। যুগধর্মে ভগবৎ বিশ্বাস হারিয়েছি, নইলে তার উপরে সব সঁপে দিয়ে মুক্ত হতাম, কিন্তু মানুষের কাছে, মানবতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে—

লতিকা। কোথায় সে মানুষ? কোথায় তোমার সে নির্ভর!

দীপক। খুঁজে নিতে হবে লতা! খুঁজতে হবে। তুমি যাও লতা, সুবীরের উষ্ণ বুকের তলায় আশ্রয় নিয়ে মুক্ত হও। দেওয়ার আনন্দে তৃপ্ত হও, পূর্ণ হও—

লতিকা। তোমার এ গৃহ শূন্য রবে, তুমি একা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে?

দীপক। না, আমি ফিরে যাবো। আমার স্বাধীনতা, স্বাধীন সত্ত্বাকে আমি বিসর্জন দেব। আমি আপনাকে বিলিয়ে দেব অন্যের ইচ্ছার কাছে। এই একাকীত্বের বেদনা তুলে দেব অন্যের হাতে—আমার ভাবনা আর আমি ভাববো না।

লতিকা। দীপক!

দীপক। লতা! হ্যাঁ ফিরে যাও। আপনাকে ত্যাগ কর, নিজের জীবনের চাহিদাকে বিসর্জন দাও—

লতিকা। দীপক!—আমি ফিরে যাবো? তোমাকে শূন্য ঘরে রেখে ফিরে যাবো?

দীপক। [বুকের মাঝে নিয়ে] ফিরে যেতে হবে—তোমার জন্যেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমার মুক্তির জন্যেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[চন্দ্রার ঘর। পূর্ববৎ। চন্দ্রার সামনের টেবিলে একখানা বই উপুড় করা। পিছনের রেডিওতে একটা সেতারের গৎ বাজছে। চন্দ্রা উন্মনা হয়ে ভাবছে—সে ঠিক শুনছে না। পর্দার আড়াল থেকে অমর বলল।]

অমর। বৌদি, তোমার ঘরে একটু আসবো?

চন্দ্রা। এসো। [রেডিও বন্ধ করলো—অমর ঢুকলো]

অমর। [সিগারেট ধরিয়ে] তোমার ঘরে বসে একটা সিগারেট খেতে এলাম—নইলে তোমাকে ডিস্টার্ব করতাম না। তুমিও ত সিগারেট খেলে পারো এতে মেজাজটা বেশ ভাল হয়—

চন্দ্রা। সিগারেট খাওয়ার দরকার না হলে আসতে না?

অমর। আজ ত রবিবার—ওদিকে দাদা, এদিকে বৌদি, ওদিকে মা, আর নিজের ঘরে সেই খাণ্ডার খড়্গ-ধারিণী চামুণ্ডা শববাহনা—কোথায় যাই বল ত।

চন্দ্রা। তুমি স্ত্রীকে এই সব যা-তা বল এটা আমি পছন্দ করিনে—তার একটা প্রেষ্টিজ আছে। সে কি তোমাকে সিগারেট খেতে দেয় না?

অমর। কনট্রোল—কনট্রোল বৌদি তার হুকুম মত। আজ দু'টো, পরশু নট। এই শাসন আমাকে মানতে হবে—কি অন্যায় বলো ত। আজকাল আবার নতুন পলিসি ধরেছে, সিগারেট ধরালেই যা হোক ছুতো-নাতা করে হয় বৌদি না হয় মা'কে ডেকে নিয়ে আসে ঘরে,—আমাকে সিগারেট ফেলে দিতে হয়। অপচয়।

চন্দ্রা। সিগারেট ছেড়েই দাও না—

অমর। তা হলে আমার স্বাধীনতাটা রইল কোথায়? তা হ'লে আমার নিজের আপনার বৌএর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় না! এত কাণ্ডের হেতু কি? সিগারেটের গন্ধে বমি আসে। ও ত দু'দিনেই সেরে যাবে, ডিসেকসনের ঘরের গন্ধও ত আমাদের সহ্য হয়েছে। যাকৃগে ও সব বাজে কথা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, তোমরা ত ভগবান মানো না।

চন্দ্রা। না। আমাদের বংশেও কেউ মানে না।

অমর। এই পূজো-আর্চ্চা, জাতবিচার, উপনয়ন নান্দী-মুখ, যাগ-যজ্ঞ এসব?

চন্দ্রা। এর সবই কুসংস্কার,—অবশ্য সবদেশেই এসব কিছু কিছু আছে।

অমর। আমিও মানি তা নয়। তোমার মত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকলেত মানতামই না। দেখ, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, ডাক্তারী ছাত্র, সব ঘেঁটে-ঘুটেও মনে হয় কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাতে এটম ভাগ হয়, আবার মিলে যায়। যাক্ সেটা না হয় নেচার, বা ভাইটাল কোর্স যাই বল না—

চন্দ্রা। তা হঠাৎ তোমার এসব তত্ত্বকথা মনে হচ্ছে কেন?

অমর। আচ্ছা বৌদি, তোমার মনে যখন খুব দুঃখ হয় তখন কি কর, বলত?

চন্দ্রা। সহ্য করি, না হয় সিনেমা থিয়েটারে যেয়ে ভুলতে চেষ্টা করি।

অমর। সিনেমা থেকে বেরুলেই দুঃখটা আবার এসে পড়ে যে!

চন্দ্রা। তা-ত আসেই, সেটা সহ্য করতেই হবে।

অমর। আমি কিন্তু একটা পলিসি বের করেছি, ভাল রেমিডি।

চন্দ্রা। কি?

অমর। আমি বলি, ভগবান, তুমিই দুঃখটা দিয়েছ যখন তখন আর কি ক'রবো—দাও। এই বলে দুঃখের বোঝাটা তাঁর কাঁধেই তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, আমার দুঃখটাত গেল সেই লাভ। মানে এটা একটা এ্যানেস্থেসিয়ার কাজ করে।

চন্দ্রা। তুমি দুর্বল, তাই পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত।

অমর। তুমি হয়ত সবল, বুদ্ধিমতী, সইতে পারো কিন্তু আমার মত দুর্বল নির্বোধের অভাব নেই ত এই পৃথিবীতে। তাদের ত বিশ্বাস না করে উপায় নেই—

চন্দ্রা। তারা বিশ্বাস করে, তাই দেবস্থান, তীর্থস্থান চলছে, বেশ মুনাফা করেই চলছে—

অমর। আবার কি মনে হয় জানো? বুদ্ধ চৈতন্য যিশু এরা না হয় কোন অতীত যুগের হয়ত বা বানানো গল্পই কিন্তু সেদিনের দক্ষিণেশ্বরের ব্যাপারটা, এটা ত চাক্ষুষ। তোমরা বলবে, লোকটার রিলিজিয়াস ইন্‌স্যানিটি, ধর্মীয় পাগলামী ছিল। বেশ তাই। কিন্তু দেশ শুদ্ধ লোকেরই কি ইনস্যানিটি হল, আর আমরাই কেবল সেইন এ আমি ভেবে পাইনে।

চন্দ্রা। হঠাৎ তোমার ধর্মতত্ত্বে এত আগ্রহ হল কেন? স্বাতী বুঝি খুব ব'কেছে?

অমর। ভেবে পাইনে, যুক্তিতর্ক দিয়ে ভাবতে গেলে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় তুমি কি করে পারো বুঝিনে। আমি কি করি জানো?

চন্দ্রা। কি?

অমর। মা, দাদা বৌদি, এরা ত আমার ভালই চান, তাই তাঁরা যা বলেন তাই করি। যা শত্তুর পরে পরে—আমার দোষ নেই, ভুল নেই, হলে সবই ওদের।

চন্দ্রা। স্বাতী যা বলে তা কর না?

অমর। এইবার জেরায় জব্দ করলে বৌদি। তুমি স্বাতী স্বাতী কর কিন্তু ও মোটেই ভালনা—কেন জানো? ওর ইচ্ছে ওরই হাতের মুঠোর মধ্যে আমি থাকি, কিন্তু আমি থাকবো কেন? আমি পুরুষ মানুষ। বৌদি মা দাদাকে ও এমন হাত করেছে যে তারা আমার সত্যি কথাও বিশ্বাস করে না, ওর মিথ্যে কথাই বিশ্বাস করে। মন্তর তন্তর জানে কিনা বুঝিনে।

চন্দ্রা। তা হলে আর কি? সারেনডার কর গিয়ে তা না হলে তোমার মুক্তি নেই।

অমর। [উঠে দাঁড়িয়ে] আমারও তাই মনে হয়, নিজের ভার নিজে বয়ে বেড়ানোর ফ্যাসাদ অনেক, তার চেয়ে পরের কাঁধে তুলে দেওয়াই সুবিধে। বুঝলে বৌদি,—আমি ত জানি তোমার মনেও অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা, তুমি সে ভার বইতে পারছো না। তুমি যার কাছে হয় সারেনডার মানে আত্মসমর্পণ কর। তাতে শান্তি পাবে।

চন্দ্রা। [অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে]

অমর। দীপকদা মাঝে মাঝে আমার চেম্বারে আ তিনি সেদিন বলছিলেন—

চন্দ্রা। দীপকবাবু? কি বলছিলেন—

অমর। অবশ্য ফিলজফি—আমি বুঝি না। f

বলছিলেন, 'মানুষ এককও নয়, স্বাধীনও নয়, তাই স্বাধীনতার ভার সে বইতে পারে না। এটা জীবনেও সত্য, পরিবারেও সত্য এমন কি রাজনীতিতেও সত্য। মানুষই মানুষের নির্ভর,—মানুষের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণ করতেই হবে—

চন্দ্রা। তার মানে?

অমর। ওসব দার্শনিক তত্ত্ব আমি বুঝিনে বৌদি। দীপকদা কত কি বলে, আমি চা খাওয়াই আর শুনি, বুঝিও না বুঝতে চেষ্টাও করি না। দেখি আবার বেরুতে হবে। দীপকদার অনেক পড়াশুনো,—লোকটা সত্যিই জ্ঞানী। [প্রস্থান]

[চন্দ্রা নীরবে বসে কি যেন ভাবতে স্বরু করল। চুপে চুপে রঞ্জু এল]

রঞ্জু। মা,—ওমা—

চন্দ্রা। [আদর করে কোলে নিয়ে] তুই আমার কাছে যে একেবারেই আসিস্ নে!

রঞ্জু। সময় কোথা? এই ত ঠাকুমার দশটা পাকা চুল তুলতেই বেলা গেল, এখন ত খেলতে যাবো।

চন্দ্রা। ওরা তোকে এদিকে আসতে দেয় না—না?

রঞ্জু। তা কেন? আমার আসতে ভয় করে তুমি গোমড়া মুখ করে বসে থাকো—

চন্দ্রা। [নির্বাক]

রঞ্জু। আচ্ছা মা? অপু, রন্টু, মন্টু, সকলের বাবা আছে, আমার নেই কেন?

চন্দ্রা। তোমার বাবা যে এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়ে মারা গেছে—

রঞ্জু। মারা গেলে কি আর আসা যায় না? ওদের বাবা বুঝি কোনদিনই মরে নি? কত লোক আসছে।

চন্দ্রা। [হঠাৎ খুব গম্ভীর ও বিমনা হ'য়ে গেল। রঞ্জু তার মুখের দিকে চেয়ে ভীত হল। কোলের থেকে নেমে একপায়ে দু'পায়ে পালিয়ে গেল। চন্দ্রা বিবশ ভাবনায় যেন ডুবে গেছে। উত্তেজিতভাবে দীপকের প্রবেশ]

দীপক। চন্দ্রা।

চন্দ্রা। দীপক! ও—

দীপক। তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি।

চন্দ্রা। শেষ বিদায় নিতে!

দীপক। হ্যাঁ, চিরদিনের মত বিদায় নিতে এসেছি, এই পৃথিবীতে, এই জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না।

চন্দ্রা। কোথায় যাবে তুমি? কেন দেখা হবে না,—তোমার কথাত আমি বুঝছি না।

দীপক। তুমি সেদিন আমাকে সোনার মূল্য দিয়েছিলে—সোনালী রাঙতাকে সোনার মূল্য দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে চিনেছ—আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে তোমার বাধা নেই।

চন্দ্রা। একথা ত মিথ্যা নয় দীপক।

দীপক। তুমি আমাকে চিনেছ এই অহঙ্কার তোমার কিন্তু আজ দেখছি শুধু আমিই আমাকে চিনতে পারিনি। শুধু জীবনের একাকীত্ব নয়, আমার স্বাধীনতা আমার সত্ত্বাকে দ্বিধা বিদীর্ণ করে দিয়েছে'—বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। চন্দ্রা আর লতিকা আমাকে দুই ভাগে ভেঙ্গে দিয়েছে। [যেন হাঁপিয়ে গেছে এমনিভাবে বসে পড়ল।] আমি জীবনের সন্ধান পেয়েছি'—আলোর সন্ধান পেয়েছি। জীবনে কি পেলাম, কি আমার পাওনা এ হিসাব আর করবো না। কি দিলাম কতখানি দিলাম এই হিসাবেই জীবনকে দেখতে শিখবো। আমি ডুববো না আত্মসমর্পণ করবো।

চন্দ্রা। তুমি কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? সে কে যার উপরে একান্ত বিশ্বাস নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারো?

দীপক। আমার জন্মের পূর্বে, আমার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পূর্বে যাদের মঙ্গলেচ্ছা, যাদের সমস্ত ইচ্ছা কামনা অতন্দ্র প্রহরীর মত আমাকে ঘিরে রেখেছিল, যাদের সাধনা ও কর্মের মাঝে আমার ব্যক্তিসত্ত্বা গড়ে উঠেছিল, তাদের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করবো। যুক্তি আর হৃদয়ের সংগ্রামের এইখানেই শেষ করবো—আত্মবিলুপ্তির মধ্যে সে সংগ্রামের সমাপ্তি।

চন্দ্রা। [নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছে] তুমি চলে যাবে?

দীপক। হ্যাঁ, চলে যাবো, আমি আর কিছু চাইব না, আমি কেবল দিয়ে যাবো পৃথিবীতে, আমি আপনাকে বিলিয়ে দেব পৃথিবীতে। আমার দেহ মন সত্ত্বাকে তুলে দেব মানবজাতির হাতে, তাদের ইচ্ছার কাছে। আমি আর সুখী হতে চাই না, আমি সুখী করতে চাই—

চন্দ্রা। তুমি ঘরে ফিরে যেতে চাও—তোমার বাবা-মায়ের কাছে?

দীপক। শুধু তাই নয় চন্দ্রা। আমার সত্ত্বা, আমার ইচ্ছা, মঙ্গল-অমঙ্গল সব তাদের হাতে তুলে দেব, পৃথিবীর সব বাবা-মায়ের হাতে, পৃথিবীর মানুষের হাতে—মানবতার কাছে—কিছু চাইব না, আপনাকে বিলিয়ে দেব। এই দুর্বহ একাকীত্ব, এই একক জীবনের দুর্ভর বেদনা, নিঃসঙ্গতা আমি আর সহ্য করতে পারি না চন্দ্রা। এই বিদীর্ণ ব্যক্তিত্বের ভাঙ্গারথ আর কতদূর টেনে টেনে যাবো ?

চন্দ্রা। কিন্তু আমি ? আমি ?

দীপক। তুমি মুক্তি চাও ? তৃপ্তি চাও ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, মুক্তি চাই, এই একাকীত্ব, এই বেদনার কারাগার থেকে মুক্তি চাই।

দীপক। তবে নিজেকে বিলিয়ে দাও—আত্মসমর্পণ কর। জগতে কিছু চাইবে না,—তাহলেই না-পাওয়ার বেদনা ঘনীভূত হ'য়ে উঠবে।

চন্দ্রা। কোথায়, কার কাছে আত্মসমর্পণ করবো? আমি যে তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। তোমায় সোনার মূল্য দিয়েছিলাম—

দীপক। আজ আমার অস্তিত্ব নেই চন্দ্রা—স্বাধীনতা নেই, ব্যক্তিসত্ত্বা নেই। আমি বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমি নিজের ভার বইতে অক্ষম,—তোমার ভার বইব কেমন করে ? আমি আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছি'—আমি পেতে চাই না, দিতে চাই।

চন্দ্রা। তুমি চলে যাবে ? চিরদিনের মত !

দীপক। হ্যাঁ চলে যাবো। আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও চন্দ্রা। সমস্ত দুঃখ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ভুলে শুধু বল,—আমি যেন আমাকে বিলিয়ে দিতে পারি, জীবনের পাওনা ভুলে দেনা মিটিয়ে দিতে পারি।

চন্দ্রা। আমি কোথায় সেই নির্ভর পাবো ?

দীপক। পাবে, খুঁজে ছাখো —পাবে। আমার মাঝে যা দেখেছ তা সোনা নয়। [চন্দ্রার হাত ধরে] আমায় ক্ষমা করো চন্দ্রা—যদি কোন ব্যথা, কোন বেদনা, দিয়ে থাকি, ক্ষমা ক'রো। তুমি সুখী হও। [বেরিয়ে যেতে যেতে] আপনাকে বিলিয়ে দাও—সুখী হবে—

চন্দ্রা। আমি ! আমি ! দীপক ! [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল]

[কিছুক্ষণ বাদে রঞ্জু ও বাসন্তীর প্রবেশ]

রঞ্জু। বললুম, ঠাকুমা,—মা কাঁদছে—

বাসন্তী। তুমি কাঁদছো বৌমা। তোমার দুঃখ ত আমি জানি,—সেত আমার বুকেও শেল হ'য়ে বিঁধে আছে বৌমা। কেঁদো না,—শক্ত হও সহ্য করতে শেখো—

চন্দ্রা। আমায় কি ক্ষমা করতে পারবেন মা ? আমি অপরাধী—শত অপরাধে অপরাধী।

বাসন্তী। [চন্দ্রাকে বুকের মাঝে নিয়ে] সে কি কথা! তুমি যে আমার সমরের বৌ, রঞ্জুর মা, আমার ঘরের বৌ—তোমার আবার অপরাধ কি ?

[চন্দ্রা বাসন্তীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল]

[মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল]

যবনিকা

পাত্রগণ

সুবীর—তরুণ যুবক—মাঝারি চাকুরিয়া	
দীপক— ঐ	মধ্যম বয়স্ক
মিঃ বিশ্বাস—	চন্দ্রার প্রণয়ী
চন্দ্রকান্ত—	কলিকাতার উকিল
অমর—	চন্দ্রকান্তের ছোটভাই
হোটেল ম্যানেজার—	পুরীর হোটেলের ম্যানেজার
গোপাল—	ঐ চাকর
অমিয়—	চন্দ্রকান্তের জুনিয়র
দীনবন্ধু—	চন্দ্রকান্তের মুহুরী
গণেশ—	চন্দ্রকান্তের চাকর
দ্বিজেন—	দীপকের দাদা
তরুণ তরুণী।	মক্কেল মিঃ রায়

পাত্রীগণ

লতিকা—বর্তমানে সুবীরের স্ত্রী

চন্দ্রা—চন্দ্রকান্তের বিধবা ভ্রাতৃবধূ

স্বাতী—অমরের স্ত্রী

গৌরী—চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

বাসন্তী চন্দ্রকান্তের মা

রঞ্জু—চন্দ্রার মেয়ে

তরুণী—জনৈকা মক্কেল

বৌদি—দীপকের বৌদি

বিশ্ব বেষ্টন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(৩)

সিডনী

রবিবার (১৭।৪।৫৬) রাতের "কোয়ান্টাস" বিমানে ম্যানিলা সময় রাত দশটায় বিমানবন্দর ছেড়ে সিডনীর দিকে উড়তে লাগলাম। আসনে দিয়ে ব'সে আর কত ঘুম হবে। ঘড়িতে বেজে চলেছে এগারটা, সাড়ে এগারটা, বারটা, একটা, দেড়টা, আড়াইটে ভোর চারটে। দেখি পূবের আকাশ ফরসা হ'তে আরম্ভ করেছে আমরা ৩৫,০০০ ফীট থেকে ৩৭,০০০ ফীট ঊর্ধ্বে সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। মেঘের স্তর আমাদের অনেক নীচে। অপূর্ব সে এক সূর্যোদয়। সাদা মেঘের ভেতর থেকে কে যেন রক্তাক্ত ছোরা তুলে ধরেছে। এত লাল সূর্য পৃথিবীর মাটি থেকে ধূলো বালি ও ধোঁয়াভরা ভারী বায়ুস্তরের মধ্যদিয়ে দেখা যায় না। এদিকে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার সময়ের ভোর ছ'টা হ'য়ে গেছে। বিমান থেকে নেমে বন্দরের ডাক্তারকে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নথীপত্র দেখিয়ে, শুল্ক বিভাগের কর্মচারীকে দেখাতে গেলাম। শুল্ক দপ্তরের ভদ্রলোকটি শুল্ক পরিদর্শকের হাতে আমার পাসপোর্ট দিয়ে কি বললেন জানি না। আমার ব্যাগ আর খুলতে হলনা। 'Pass' বলে দুটো কাগজের টুকরো সেঁটে দিলেন।
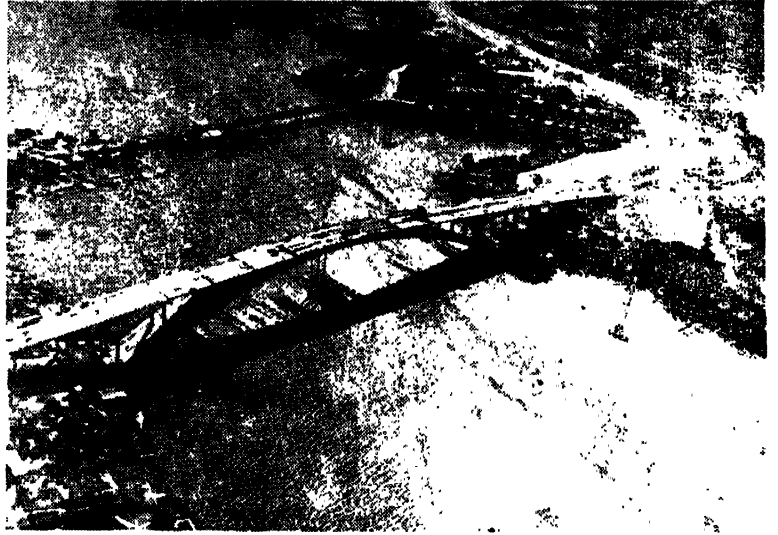
পারামাতা নদীর উপর ১০০০ ফুট উত্তরের সেতু—সিডনী

শুল্ক বিভাগের বেড়া থেকে বেরুবার পথে আমার হাতে একটা লিখিত সংবাদ ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা আছে যে আমার আস্তানা ঠিক হয়েছে 'পমিরয় (Pomeroy) হোটেলে'। 'ওয়াটার এ্যাণ্ড্ স্যুয়েজ বোর্ডের' মুখ্য এঞ্জিনিয়ার 'স্কট' সাহেবকে থাকার আস্তানা ঠিক করতে লিখেছিলাম—তিনি আবার অন্য হোটেলে ঠিক করেন নি তো? 'পমিরয়' হোটেলে পৌঁছে জানলাম আমাকে U. N. অফিস থেকে টেলিফোন করেছিলো। এ খবর দিলেন হোটেলের অধিকত্রী ভদ্রমহিলা। আমি বললাম—'তাহলে আপনি একটা পাল্টা টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দিন আমার এখানে পৌঁছানোর কথা। সেখান থেকে ভদ্রমহিলা 'কুমারী বুল'

১২০ ইঞ্চি ব্যাসের জলের নল স্থাপন প্রণালী—সিডনী

আমায় 'মার্টিন প্লেসে' আসতে বললেন।

আমি বললাম—"'মার্টিন প্লেস' আমি জানি না, তুমি একটি গাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

—"আচ্ছা, আমিই এক্ষুনি যাচ্ছি।"

একটু বাদে আমি রাস্তায় বেরিয়ে দেখি যে টসটসে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি হাসি মুখ বের করে কুমারী 'ভেরোনিকা বুল' বললেন—"আমিই তো সেই"। মনে পড়ল কবিগুরুর 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি—

শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে
মোটর হইতে নামিয়া সে রাজপথে,
হাসিয়া শুধাল 'সে কোথায়, সে কোথা?'
ত্রস্ত চরণে আমি যে আসিয়া পথে
বলিনু বিনয়ে "সে আমি, দাঁড়ায়ে হেথা"।

ভদ্রমহিলার বয়স হ'লে কি হয় দেহ ও মনের যৌবন অটুট আছে তাঁর হাবভাবে, কথায় বার্তায় ও আপনকরা হাসিতে। দুজনে পাশাপাশি চললাম মার্টিন প্লেসে। বেশী দূর নয়। উনি ট্যাক্সী ভাড়া দিতে গেলে আমি বললাম—, "সে কি হয়?"

তিনি বললেন,—"আমি আদায় করে নেবো। আমার গাঁট থেকে লাগবে না।"

—"তাহলে আমার আপত্তি নেই।"

ডাঃ বিয়ারমেনকে লেখা চিঠি ভদ্রমহিলাকে দিলাম। তিনি আমার সামনেই খুলে ফেললেন ও প'ড়ে বললেন, 'আমি আবার অষ্ট্রেলিয়ান টাকা তুলে রেখেছিলাম। দেখো লাল লাইনে দেগে দিয়েছে টাকা দেওয়া হয়েছে লিখে।"

—"আমি তো তোমায় টাকার কথা একবারও বলিনি"।

—"তা নয় আমার ভাবনা হয়েছিল তুমি যদি মুস্কিলে পড় Exchange-এর অভাবে"।

—তিনি সামান্য কাগজপত্র দিলেন ও External affairs Departmentএর 'বাওয়ার' (BOWER) সাহেবকে টেলিফোনে বললেন আমার আসার কথা। তখন বেলা বারোটা। তিনি বললেন বেলা দুটোয় আসতে। এই ফাঁকে আমি ঘুরে এলাম নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরাট লাইব্রেরী দেখে। এটি নাকি অষ্ট্রেলিয়ায় বৃহত্তম লাইব্রেরী। সেখানের তিনতলায় কাফেটেরিয়া। সেখানে গিয়ে আহারটাও সেরে নিলাম। প্রায় দেড়টা নাগাদ পৌছলাম 'মার্টিন প্লেসের' M. L. A. বিল্ডিংএ। M. L. A অর্থাৎ Mutul life Assurance Building। MEMBER of the Legislative Assembly নয়। আর এত কর্মব্যস্ত জায়গায় M.L.A.-রাই বা থেকে কি করবেন।

প্রায় দুটো নাগাদ হেঁটে চলে গেলাম—বহির্বিভাগীয় দপ্তরে শ্রীমতী বুলের সংগে। সেখানে 'বাওয়ার' সাহেবের সংগে পরিচয় হ'ল। তিনি গাড়ী করে নিয়ে গেলেন সিডনী ওয়াটার বোর্ডের নতুন বাড়ীর বাইশ তলায়। এটি নাকি সিডনীর দ্বিতীয় উচ্চতম বাড়ী। সেখানে 'উইকলী' সাহেবের সংগে পরিচয় হল। তিনি নিয়ে এলেন আমাকে উপমুখ্য এঞ্জিনিয়ার (BAIRD) 'বেয়ার্ড' সাহেবের কাছে। বহু কাজের কথা হ'ল। এখানে আমার দু'সপ্তাহের অবস্থিতির পরিকল্পনার কথা বললাম। আরও বললাম—"পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় যদি ছেড়ে দেন তা'হলে আমি তাড়াতাড়ি 'হনলুলুতে' দুদিন থাকতে পারি।"

আমার কি কি বিষয়ে, ও জানার প্রবণতা সেকথা তিনি জানতে চাইলেন।

আমি বললাম নানা জায়গায় বড়গোছের যেসব কাজকর্ম হ'চ্ছে সেইসব দেখা ও প্রশাসন প্রণালী এবং পরিচালনা পদ্ধতিটা জানাই আমার ইচ্ছা। আর সেই

সংগে জানা তোমাদের কাজের যে সব অসুবিধা হচ্ছে তা আমাকে জনান্তিকে বলা, যাতে সেই ভুল আমরা বৃহত্তর কলিকাতা জল সরবরাহ ও ময়লা জল নিষ্কাশন সংস্থায়—না করি।"

তিনি হেসে উঠলেন। তারপর পরিচালনা পদ্ধতির সারমর্ম অতি অল্পে বললেন। এইসব কথাবার্তায় বৈকাল প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। আমরা আগামী কয়েকদিনে কি কি কাজ দেখবো ও কোরব তারও একটা কর্মসূচী তৈরী হল। মুখ্য কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষকের সংগে একদিন, দুদিন বাইরের কাজকর্ম দেখা, দুদিন পরিচালনা দেখা, একদিন ড্রয়িং ও ডিজাইন অফিস দেখা, একদিন সার্ভিস দপ্তর দেখা, একদিন কর্তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করা ইত্যাদি। এরমধ্যে পরের সপ্তাহে সোমবার ওখানে ছুটি। শনি ও রবিবারতো ছুটি আছেই।

সিডনীর উপকণ্ঠ—দূরে পারামাত্তা সেতু

ইতিহাস :

পলাশীর যুদ্ধের একত্রিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী থেকে তিনদিন ধরে কাপ্তেন আর্থার ফিলিপসের অধিনায়কত্বে নিউ সাউথ ওয়েলেসে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য এগারটি জায়গা থেকে প্রায় এক হাজার লোক 'বটনী বাই'য়ের (BOTANY BAY) ধারে অবতরণ করল। জায়গাটি প্রথমতঃ পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা ছোট একটি দলে আরও ভালো জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। অবশেষে আরও উত্তরে বর্তমানে যা 'পোর্ট জ্যাকশন' (অর্থাৎ সিডনীর বর্তমান বন্দর) সে জায়গাটি তাঁদের ভাল মনে হ'ল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আর্থার ফিলিপস্ তাঁর Voyage to BOTANY BAY পুস্তকে লিখেছেন :

"The different caves of the harbour (Port Jackson) were examined in all possible expedition, and the preference was given to one which has the finest spring of water. This cave is about half a mile in length and a quarter of a mile across at the entrence. In honour of Lord Sydney, the Governor distinguished it by the name—'Sydney Cave'."

কাপ্তেন কুক পৃথিবীর নানাস্থানে জীবজন্তু ও গাছপালার সন্ধানে ও সংগ্রহে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপপুঞ্জ হ'তে নানা পশুপক্ষী, লতাগুল্ম আহরণ ক'রে দেশে ফিরে যান। তিনি উদ্ভিদ বিদ্যা অর্থাৎ BOTANY সংক্রান্ত বহু গাছপালা এখান থেকে সংগ্রহ করেন বলে নাম দেন—BOTANY BAY।

কলিন্স্ সাহেবও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত New South Wales' পুস্তকে 'সিডনী' সম্বন্ধে লিখে গেছেন—"The spot for the settlement was at the head of the cave".

দ্বিতল সড়ক আকৃতির স্তম্ভের উপর গোলাই রাস্তা

পূতং ন্যসেৎ পাদং
বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ"
কোথাও আছে
পৃষ্ঠতঃ সেবয়েৎ অর্কং
জঠরেণ হুতাশনং
স্বামিনং সর্বভাবেণ
পরলোকং অমায়য়া।

সিডনীর পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যমান বিঘ্নিত হ'তে না দেওয়ার জন্য ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর সিডনী গেজেটে এক নির্দেশনামা বেরুলো—

"If any person whoever is detected in throwing into the stream of fresh water, cleaning fish, washing, erecting prigsties near it or taking water out of the tank on conviction before the magistrate their home will be taken down and forfeit £ 5 for each offence to the orphan fund."

লোকগণনায় দেখা যায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিডনীর লোক-সংখ্যা ছিল ৫,৫৪৭। তার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ছিল ৭৭৬। ক্রমে ক্রমে এই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী থেকে জলসংগ্রহ স্বাস্থ্যমানে নির্ভরযোগ্য মনে না হওয়ায় জলের নতুন উৎসের সন্ধান সুরু হয়। যে মূল জলাশয় থেকে ক্ষীণধারায় যে জল চারটি জলাধারে সংগৃহীত হ'ত, তার উপর দিয়ে আজ সিডনীর বিখ্যাত রাস্তা জর্জ স্ট্রীট ও পীট স্ট্রীট চলে গেছে।

সিডনী সাউথ ওয়েল্‌স প্রদেশের রাজধানী। সারা অষ্ট্রেলিয়াকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে, যেমন পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর অঞ্চল, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, কুইনসল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া ও টাসম্যানিয়া। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি সারা অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল ও

অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা 'সিডনীর' মান জনবহুল নগরীর তালিকার ঊর্ধ্বে তোলার জন্য লিখেছেন: Sydney is now the second largest white city in the British Commonweath. :

কেন না কমনওয়েলথে লণ্ডনের পর আসবে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি। তেমনিভাবে আমেরিকায় নিগ্রোদেরও বলতে শুনেছি—'Washington is the largest coloured city in the new continent."

"বটনী বায়' (ওদের উচ্চারণের প্রতিলিখনে), যাকে আমরা বলতাম 'বটানী বে') থেকে শিবির তুলে স্বাদু জলের উৎসের নিকটে স্থাপন করা হ'ল। এটিকে 'ট্যাংক ষ্টীম' (Tank Steam) বলা হ'ত।

শ্রমলাঘব ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য অন্যের ক্ষতি করার অনিচ্ছাকৃত প্রবণতা বহু মানুষের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় ছিল ও আজও আছে। আজও রেলের কামরার মধ্যে জলন্ত সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, থুথু ও পানের পীচ প্রভৃতি ফেলা বারণ; সিনেমা থিয়েটার ও ট্রাম বাসে 'ধূমপান নিষেধ' আজও লেখা হয়। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধান মানার জন্য নির্দেশ দেওয়ার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যেমন—

সমৃদ্ধিশালী। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় সহর হ'ল সিড্‌নী। প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ লোক এখানে বাস করে। অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী যদিও ক্যানবারা কিন্তু তার তেমন প্রসিদ্ধি নেই। যেমন নিউইয়র্ক ষ্টেটের নিউইয়র্ক সহরের যেমন প্রসিদ্ধি সেই অনুপাতে নিউইয়র্ক প্রদেশের রাজধানী 'আলবানীর' তেমন প্রসিদ্ধি নেই। কলকাতার যেমন প্রসিদ্ধি দিল্লীর তেমন নেই। এর মুখ্য কারণ এগুলো হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বন্দর ও জনবহুল মহানগরী। ব্যবসা বাণিজ্য এখানে যেমন চলে তেমন অন্য জায়গায় চলে না। সমুদ্রের ধারে থাকার জন্য গরম তেমন বেশী মনে হয় না। মানুষের বসবাসের ও চলাফেরার বিশেষ উপযোগী। সিড্‌নী হারবার (পোর্ট জ্যাকসন) তেমনি একটি সুন্দর বন্দর।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের প্রধান সহর হ'ল 'পার্থ'। উত্তর অঞ্চলের 'ডারউইন', দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের 'এডেলেড্‌', কুইন্‌সল্যাণ্ডের 'ব্রীসবেন', ভিক্টোরিয়া প্রদেশের 'মেলবোর্ণ', নিউ সাউথ ওয়েলসের সিডনী ও ক্যানবারা, টাসমানিয়ার 'হোবার্ট', সারা অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্র সংলগ্ন প্রান্তিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মুখ্য রাজপথ চলে গেছে। 'এডেলেড্‌' থেকে 'ডারউইন' যাবার পথ দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে চলে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব পশ্চিম প্রসারী কোন রাজপথ বা রেলপথ নেই। এর প্রধান কারণ হ'ল মরুভূমি ও মধ্য ভূভাগে লোকের সামান্য বসতি। ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলসের রাস্তাঘাটও বেশী ও তাদের সমৃদ্ধিও বেশী।

মংগলবার সকালে কর্মসূচী অনুসারে জলকলের অফিসে এসে মুখ্য হিসাবরক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ ও তাঁদের সহকারীদের সংগে নানা আলোচনা হ'ল। কেমন ক'রে তাঁরা জল বেচে কোটি কোটি টাকা তোলেন, কেমন করে কত দ্রুত তাঁরা পাওনাদারের বিলের টাকা দিয়ে দেন, কেমন ক'রে তাঁরা হিসেব রাখেন। এখন সবই প্রায় I. B. M.-এর কার্ডের সাহায্যে হিসেব রাখা চলছে।

তাঁরা হিসেব রাখেন এই পদ্ধতিতে। আগে এই দপ্তর
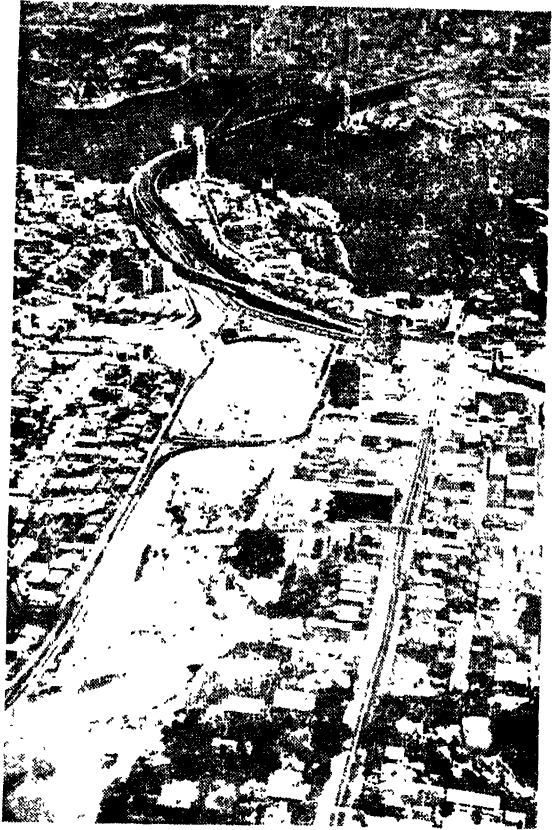
উত্তর দিক সিডনী সহরের দৃশ্য—চিত্রের মধ্যস্থলে নতুন "হাইওয়ে তৈরী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে।

ছিল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এখন তা সচিবের দপ্তরের অধীন হ'য়েছে।

ছুটির পর বাসে ক'রে 'পমীরয়' হোটেলে চলে এলাম। একই খরচে তিনতলার একটি ঘরে বিছানায় রাতে শোয়া ও সকালে প্রাতঃরাশ। জানলা দিয়ে দূরে বন্দর দেখা যায়। সামনেই বোট ক্লাবের সাদা সাদা নৌকোগুলো হাঁসের মত শুভ্র ডানা মেলে ভেসে রয়েছে।

কর্মসূচী অনুসারে তারা আমায় বুধবার বড় বাষ্পীয় ইঞ্জিনে চালানো ওদের সর্ববৃহৎ পাম্পিং ষ্টেশনে নিয়ে গেল। প্রায় মাইল দশেক দূরে। পথে পড়ল বিরাট রিইনফোর্স ড্‌ কংক্রিটের সেতু নাম 'নতুন গ্ল্যাড্‌সভীল সেতু'। এটি পারামাতা নদীর উপর। আদিম 'পারামাতা' শব্দের অর্থ

একটি অংশ। এই একস্‌প্রেসওয়ের সাত হাজার ফুট দৈর্ঘের মধ্যে তিনটি সেতু পড়ে। তারা হ'ল "ফিগটি" (Figtree) সেতু, টারবান সেতু ও নতুন গ্ল্যাডসভিল সেতু। গ্ল্যাডসভিলের খিলেন সেতুর খিলেন অংশের উস্তারে (Span) হ'ল ১০০০ ফিট। আর দুপাশের সংলগ্ন সেতু কয়েকটি মিলে রাস্তার লেভেলের সংগে মিশেছে। সেতুর মোট দৈর্ঘ হ'ল ১৯০০ ফিট। বারিপৃষ্ঠ হ'তে এর গড় উচ্চতা ১২০ ফিট। খিলেনের সর্বোচ্চ তল থেকে বারিপৃষ্ঠের মাপ হ'ল ১৩৫ ফিট। সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য এই ব্যবধানের প্রয়োজন। যেমন নতুন হাওড়ার সেতুতে অনুরূপ ব্যবধান দিতে হবে। সেতুটির উপর দিয়ে ছ'লাইন গাড়ী চলার পথ। দুপাশে ছ' ফুট ক'রে চওড়া পথচারীর চলার পথ যদিও পথচারী নেই বললেই চলে। এই সেতুটির নির্মাণ মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। এটির কাজ শেষ হ'য়েছিল ১৯৬৪ সালের শেষে। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম ঢালাই-এর খিলান সেতু। 'সিড্‌নী হারবার' বিখ্যাত ইস্পাতের খিলেন সেতুর কাছে 'বোম্বে পয়েন্ট' ও নির্মীয়মান বৃহত্তম অপেরা হাউস। অদ্ভুত এর স্থাপত্য ও গঠন নৈপুণ্য। ইতালীয় বিখ্যাত অধ্যাপক নাভি এর পরিকল্পক। যে মূল্যানুমানে কাজ ধরা হ'য়েছিল তার বহুগুণ দাম প'ড়ে যাবে এখন দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য হয়েছিল।

সিডনীতে বহু কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এখানে জল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৪,০০০ লোক নিয়োগ করে। এদের নানারকম গাড়ী যেমন মোটর, লরী, গ্রেডার, ট্রেঞ্চার ইত্যাদি। মোট গাড়ীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এরা দিন মজুরীতে বহু কাজ করায়। বিরাট ১২০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ১৪½ মাইল পাইপ বসানোর কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। যন্ত্রে মাটি সরিয়ে লেভেল ক'রে দিয়ে গেছে। মাত্র এক জায়গায় কংক্রীট মেশাবার—যন্ত্র বসানো হ'য়েছে, যাকে বলে BATCHING PLANT। সেখান থেকে ঘোরানো ড্রামে কংক্রিট নিয়ে আসা হ'চ্ছে। যাতে সিমেন্ট চুরির ও বেশী জল দেওয়ার সুযোগ নেই। ⅜" পুরু ইস্পাতের চাদরের প্রায় ৪০ ফুট লম্বা এক একটি পাইপ বিরাট চলমান ক্রেনে করে এনে যথাস্থানে বসিয়ে দিচ্ছে। সবই ওপর থেকে দেখা যাবে। পাইপের ভেতরে বিটুমেনের এক প্রলেপ, তার ওপর মিহি পাথরের কুচি ছড়ানো। তার উপর সিমেন্টের পাতলা ক'রে পলস্তারা ধরানো রয়েছে। প্রত্যেক পাইপের ওজন প্রায় পনেরো টন। প্রত্যেক পাইপ পাশের পাইপের সংগে জোড়া লাগানো হ'চ্ছে 'ওয়েল্‌ড্‌' ক'রে। সেই ওয়েল্‌ডের জায়গাও মূল পাইপের মত ক'রে মিস্ত্রী দিয়ে মেরামত করিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে।

ওই পাইপলাইন ধরে ওয়ারাগাম্বা আড় বাঁধ দেখতে গেলাম। জলকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটা একটা বিরাট ব্যাপার। যে আড়বাঁধ গড়ে উঠেছে তাতে ৪৬,০০০ কোটা গেলন জল ধরে। ওয়ারাগাম্বা নদীতে ৩,৪৮০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডের জল আসে। তার মধ্যে ৯৭১ বর্গ মাইল জমির ওপর জলকলের সম্পূর্ণ প্রভাব কোথাও খরিদ ক'রে ও কোথাও ইজারা দিয়ে। নদীর বুক থেকে ৪৪৫ ফিট উঁচু এই আড় বাঁধ। আর পাঁচটী নদী থেকে সিডনী অঞ্চলের জল সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে গড়ে দৈনিক জল সরবরাহের পরিমাণ ছিল :—

বিভিন্ন Catchment	দৈনিক উৎপাদন লক্ষ গেলনে	সরোবরের ধারণ ক্ষমতা কোটী গেলনে
ওয়ারাগাম্বা	৩৪৯০	৪৫৫০
ক্যাটারাক্ট	৭০	২০৭৪
ওরোনারা	৪০	১৫৭৯
এভন	১৮০	৪৭১৫
কর্ডিএক্স	৩০	২০৩০
নেপিয়াণ	—	১৭৯০

সকালে নানা দর্শনীয় স্থান ঘুরে এসে দুপুরে পঁচিশ তলা ওয়াটার বোর্ডের বাড়ীতে দোতলায় খাবার ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য ওদের অতিথি হয়ে বসেছি। বাড়ীর জানলা অধিকাংশই বড় বড় কাঁচের। ভিতরে ফুল্ল আলোক ও শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত। চলাফেরার শব্দ প্রতিরোধের জন্য অষ্ট্রেলিয়াতে বিখ্যাত উলের পুরু কার্পেট প্রতিতলায় পাতা। ভ্যাকুয়াম্‌ ক্লীনারে প্রতিদিন ধুলো শুষে নেওয়া হয়। এখানে আটটায় অফিস খোলে। দশটা নাগাদ বাজারে যে দামে কফি বা চা পাওয়া যায়, তার চাইতে আধা দামে মেয়েরা প্রতিতলায় গিয়ে হাসপাতালের

মত খাবারের চার চাকার গাড়ি ঠেলে প্রতিজনের কাছে দিয়ে যায়। এখানে 'কফি-ব্রেক' বলে মার্কিন দেশের মত খানিকক্ষণ ফাঁকি চলে না। যদিও সংস্থার কিছু খরচ হচ্ছে তবু তার তুলনায় কাজ ঢের বেশী পাচ্ছে। খাবার ঘরটি পীট ষ্ট্রীট ও বেথাষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে। আমার খাবার টেবিলে অতিথিবন্ধুরা বললেন।—

"এখনই সৈন্যরা মার্চ্চ করে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে বন্দরের জাহাজে ওঠার জন্য যাবে। ১৩০০ সৈন্যের মধ্যে আগামীকাল ৮০০ সৈন্য "সিডনী" নামে যুদ্ধ জাহাজে আর বাকী সৈন্য নিয়ে যাওয়া হবে বিমানে। রাজ্যপাল স্যার রোডেন্ কাটলার্ V.C. পৌর প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করবেন।" পথের ধারে কাতারে কাতারে নরনারী সম্মিলিত। রাস্তার ধারের বাড়ীর উপর থেকে টেলিফোন্ ডিরেক্টরীর পাতলা পাতা কুচি কুচি করে নীচে ফেলে দিয়ে তাদের অভিনন্দন ও উল্লাস জানাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক নারীর চক্ষু সজল, তার মধ্যে কেউ মাতা, কেউ প্রিয়তমা, কেউ আবার প্রণয়িনী। সৈন্যরা বাজিয়ে চলেছে রণবাদ্যের সুর :—

'When Johnny comes marching house again অথবা Auld Lang Syne.'

এতো দ্বিতীয় মহাসমরের পর সৈন্যরা যখন ঘরে ফিরে এসেছিল তারি সুর। সেই আনন্দের সুর আজ বিরহের বিষাদে এক করুণ আকার ধরেছে। জনতার মধ্যে থেকে কেউ চীৎকার করে বলছিল—

Bring back few V. Cs,

অথবা, We are proud of you, Boys.

উদ্বৃত্ত লোক এখানে প্রচুর নেই যে সারা বিকেল ঝাণ্ডা হাতে ক'রে চেঁচাচ্ছে। প্রত্যেকেই যোগ্যতা অনুসারে কোন-না-কোন কাজে লিপ্ত—এখানে বেকার নেই বললেই চলে।

কোথাও রাস্তার ধারে প্ল্যাকার্ড ঝোলানো—ভিয়েত্‌নামে অষ্ট্রেলিয়ানদের না পাঠানোর দাবীতে। প্রথম সপ্তাহের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সারাদিন ধ'রে অষ্ট্রেলিয়ার ও সিডনীর নানা দর্শনীয় কাজের জায়গা দিয়ে ঘুরে এলাম। শুক্রবার ফেরার পথে এঁড়েদার শম্ভুদার নির্দেশ অনুযায়ী একদিন অষ্ট্রেলিয়ার গো-পালন ও মুর্গীপালন কেন্দ্রও ফেরার পথে দেখে এলাম। দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রে 'কল্যানী' মতই সব ব্যবস্থা। তবে একটি গরু এখানে ভারতবর্ষের তুলনায় পাঁচ থেকে দশ গুণ দুধ দেয়। যে গরু মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় তার পালন ব্যবস্থার একটু বৈশিষ্ট্য আছে যাতে মাংসের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ে। গরুর খাদ্যের একটা হিসেব নিলাম দুধ বাড়ানোর ব্যবস্থার জন্য।

চলার পথে নব নব পরিকল্পনায় নতুন নতুন ঘরবাড়ী তৈরি চলেছে। জল সরবরাহের জন্য দশ ফুট ব্যাসের সাড়ে চোদ্দ মাইল লম্বা ইস্পাতের পাইপ বসানোর কাজ অতি দ্রুত গতিতে চলেছে। জল সরবরাহ পরিকল্পনার ব্যাপ্তি নগর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে, কলকাতার মত স্থিতিশীল নয়। এ কথা বলা যায় যে নগর প্রসার ও নগর সভ্যতার ইতিহাস পানীয় জল বিবর্ধন ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশুদ্ধ জল ব্যবহারের পরিমাণের উপর নগর ও নাগরিকদের অর্থ নৈতিক, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির মান বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজ্য সরকার ১২০ কোটী ডলারের জল সংরক্ষণ ও সংভরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,—প্রতি নদ-নদীতে আড়বাঁধ বেঁধে। জলসেচের জন্য গভীর নলকূপ খননেরও পরিকল্পনা আছে।

যুক্তবাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশী সাহেব বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেল। তাঁকে 'মোনাস্ বিশ্ববিদ্যালয়' 'ডক্টর-অব-ল' উপাধিতে ভূষিত করার সংবাদ দেখলাম এখানের খবরের কাগজে।

সিডনীর জলকল চার হাজার বর্গ মাইল জুড়ে ৭৪০০ কোটী গেলন জল দেয়। বৃহত্তর কলিকাতা মহানগরীর প্রসার মাত্র ৪৭০ বর্গ মাইল। এই জলকলের সম্পত্তির পরিমাণ হ'ল একত্রিশ কোটি পাউণ্ড। বৃহত্তর সিডনীতে প্রায় পচিশ লক্ষ লোক বাস করে। অষ্ট্রেলিয়ার তৈরী 'হোল্ডেন' মোটর গাড়ী এখানে বেশী চালু। অষ্ট্রেলিয়ানরা আজ মার্কিন অনুগামী।

হাতে কোন কাজ না থাকায় শনিবার সারাদিন মধ্যাহ্ন ভোজ সমেত সকাল বিকেল সারা সহর ঘুরে আসার বাসের টিকিট কাটলাম। বাসে চ'ড়ে চলেছি, দুপাশের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে ও ড্রাইভারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে।

পূর্বাহ্নে বিখ্যাত সিডনী হারবার সেতু পার হ'য়ে মিলসন

পয়েণ্টে এলাম। এখান থেকে একটু বেঁকে নেমে এলে সিডনী সহরের ও নীচে থেকে সিডনী সেতুর অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাবে। এর পরই সুরু হ'ল সিড্নীর সুন্দর সুন্দর উপনগরী—প্রথমে এল রোসভিল, পূর্বদিকে ঘুরলেই রোসভিল সেতু 'মিড্ল্ হারবারের' উপর দিয়ে চ'লে গেছে। এরপর আবার চললাম—সমুদ্রের বেলাভূমি দেখতে দেখতে—যেখানে সমুদ্র স্নানে নরনারীরা প্রচুর অবসর বিনোদনরত, মোনাভিল (Monaville), নারাবীন (Narrabeen), কোলেরয় (Collaroy), ডিহাই (Deewhy) এবং ম্যানলী (Monly)। ম্যানলী তটের উপর 'মেরিন লাইফ' নামে একটি মীনাগার রয়েছে। ঢুকতে তিরিশ সেণ্ট লাগল। বিরাট গোল কাঁচের জলাধারে সামুদ্রিক মাছ, ডলফিন, বিরাট কাছিম, ভেটকী, চাঁদা, ছাতার মত দেখতে কতরকমের রঙিন মাছ। কটা কাছিম রয়েছে। ওজনে তিনচার মণ হবে। ছোট ছোট মাছ রয়েছে তাদের ধরবার চেষ্টা করছে না বড়রা কেউ। 'অতি মানোহর কৈলাশ ভূধরে'র জীবজন্তুর মত সবাই যেন হিংসা ভুলে গেছে। একজন ডুবুরী বাক্সে মাছের খাবার চুণো মাছ নিয়ে জলে ডুব দিয়ে নানারকমের কাছিম ও মাছেদের খাওয়াতে লাগল। যাকে বলে কাছিমের কামড়। সে কামড় যদি একবার বসায় আঙ্গুল তো ছার, হাত শুদ্ধ চলে যেতে পারে মুখের মধ্যে। ডুবুরী কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে কাছিমের গলা ধ'রে আদর ক'রে হাত দিয়ে মুখে পরে দিচ্ছে পুঁটি বা বেলে বা ছোট চাঁদা মাছ। খাবার পেয়েই ওরা কাছে থাকে না দূরে চলে যায় ও চলতে থাকে ; বোধ হয় আড়ালে খাবার জন্যে। ছাতার মত চেটালো মাছটা এসে তার দেহ দিয়ে খাবারের বাক্সটা আগলে বসে আছে। ডালা খুলে খাবার ক্ষমতা নেই। ডুবুরীর গায়ে রবারের জামা, পীঠে অক্সিজেনের ছোট হলদে রং-এর সিলিণ্ডার বাঁধা। এইসব দেখে যখন ফিরলাম তখন বেলা ১২টা। এক হোটেলে নিয়ে এল। ৪॥ ডলারের মধ্যে দুপুরের লাঞ্চ পর্য্যন্ত ধরা আছে। সুতরাং ওদের খরচেই আহারাদি সেরে নিলাম ওদেরই নির্দিষ্ট হোটেলে। বৈকাল ২টা নাগাদ মধ্যাহ্নভোজে তৃপ্ত যাত্রী নিয়ে আবার বাহন ছাড়ল। এল 'মাটিন প্লেসে'। সকালে একটু বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশে মেঘলাভাব। তাই যাত্রী হ'য়েছিল মোট নয়জন। বৈকালে 'মাটিন প্লেস' থেকে উঠল বহু নরনারী ; ৫০ সীটের বাস ভর্তি হ'য়ে গেল। এবার মূল সহর অঞ্চল ঘোরা। আর সিডনী হারবার সেতু পার হ'তে হবে না। এখানে অনেক রাস্তা একমুখী। অতএব জর্জ স্ট্রীট, পীট স্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তা-গুলো দোকানে ভর্তি। এইসব অঞ্চলের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে চলেছেন ও গাড়ী চালাচ্ছেন একলাই আমাদের ড্রাইভার সাহেব।

কখনও ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের চূড়োয় কখনও সমুদ্রতট বাসে ক'রে চলেছি। মাঝে মাঝে হাতের ম্যাপের সংগে মিলিয়ে নিচ্ছি কোথায় এলাম। নামাবার বালাই নেই। বিকেলটা মেঘলা। ছবি তোলা তেমন গেল না। ড্রাইভার এনে হাজির করলে Vancluse House-এ। এটি উইলিয়াম চার্লস ওয়েণ্টওয়ার্থ (১৭৯০-১৮৭২) স্থাপন করেন। ইনি অষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এক তাৎপর্য্যপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। একাধারে তিনি আইনবিদ্, কূটনীতিক, বিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁকে বলা হয় নিউ সাউথ ওয়েলসের (NWS)-এর দায়িত্বপূর্ণ সরকার স্থাপনের জনক। সিডনীর দক্ষিণ উপান্তে প্রশস্ত নানা বৃক্ষশোভিত প্রাঙ্গণে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। এটিকে যত্ন ক'রে সংরক্ষণ করা হ'য়েছে প্রাচীন কালের আসবাবপত্রাদি দিয়ে। ওয়েণ্ট ওয়ার্থ (Wentworth) বংশের বংশধরেরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে বসবাস ক'রে গেছেন। ১৯১৯ সালে এটি সরকার দখল করেন এবং আদি সম্প্রদায়ের হাতে এর সংরক্ষণের ভার দেন। এটি অষ্ট্রেলিয়ার অতি মনোরম সংরক্ষণ। বিরাট মোটা মোটা পায়ার কাঠের টেবিল। বিরাট বিরাট খাট ও কারুকার্য্য করা মোটা মোটা তার ছত্রি। বিরাট আয়না। বহু তৈলচিত্র ও আগুন জ্বালানোর জায়গা। ছাদে কত আসবাব। এইসব দেখে নানা জায়গায় ঘুরে-ফিরে এলাম মাটিন প্লেসে। এখানে একখানা রঙিন ছবির বইও কিনলাম।

রবিবার কি করা যায়! বৃষ্টি হচ্ছে টিপি টিপি। ঘরে বসেই লেখার কাজ, চিঠিপত্র যা লিখবো ব'লে স্থির করেছি সেই সবই করা যাক। পায়ে হেটে একটু বেড়িয়ে এলাম মাত্র। সন্ধ্যাবেলা পীট স্ট্রীট ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে রাতের খাওয়া সেরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি যে একদল গাড়ীতে

চ'ড়ে এসেছেন। একজন যীশুর মহিমা কীর্তন করছেন। মাঝে মাঝে দু-তিনটি মেয়ে নিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান করে যাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে শুনলাম সংগীত ও বক্তৃতা সর্বশেষে ধর্মযাজক মশাই আমার কাছে এলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন—"আমরা যা বললাম—তুমি বুঝতে পারলে?"

—"অল্প অল্প পারলাম বৈকি।"

"—আগে কোথাও যীশুর বাণী শুনেছিলে।"

—আমাদের কলেজে ছেলেবেলায় বাইবেল পড়ানো হ'ত। শুনেছি আমি এতে ভালো নম্বরই পেতাম ও পুরস্কারও একবার পেয়েছিলাম।"

"—তুমি কি খ্রীষ্টান?"

—"না"।

"—তুমি কি জানো মুক্তি পেতে গেলে যীশু ছাড়া উপায় নেই?" ব'লে বাইবেল থেকে খানিকটা প'ড়ে শোনালেন—

..."I amin my father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. He that loveth me shall be loved of my father, and I will love him and will manifest myself to him."

এই 'I' যীশু নন্ এ হ'ল Eternal I, আদি ব্রহ্ম। এরকম বহু কথা বহু মনীষী সাধক ও অবতারেরা যীশুর বহু আগে বারবার ব'লে গেছেন। মানুষের স্মৃতিশক্তি অল্প স্থায়ী। তাই একই কথা বলতে হয় কেননা মানবজাতি এসব কথা সহজে ভুলে যায়।"

"যীশুর মত মরার পরও কে বেঁচে উঠেছিলেন?"

"এরকম অলৌকিক ঘটনা বহু সাধক করেছেন। এতে কিছু বাহাদুরী নেই। এই তো সেদিন তৈলঙ্গস্বামীও এরকম অলৌকিক কাহিনী বারাণসীধামে দেখিয়েছিলেন। সাবিত্রী ও বেহুলার চেষ্টায় সত্যবান ও লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভের কথা বাদই দিলাম। যীশুখৃষ্টের ৫০০ বছর আগে বুদ্ধদেব এরকম বহু অসাধারণ ক্রিয়া দেখিয়ে গেছেন।

"আমার কাছে এসো আমি তোমাদের ত্রাণ কোরব একথা কে আগে বলেছেন?"

"লর্ড কৃষ্ণ বলেছেন ব'লে গীতা থেকে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে দিলাম

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

আর বললাম "Comparative Philosophy না পড়লে বুঝতে পারবে না ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যই বা কি? কেননা প্রতি ধর্মের উদ্দেশ্য একই। প্রেমের অবতার যীশুর ভক্ত তোমরা তবে কেন এখান থেকে গত কাল ভিয়েটনামে বহু সৈন্য মানুষ মারতে পাঠালে? যীশুর প্রেমে মত্ত হ'য়ে কি ওরা মানুষকে ভালবাসতে চলেছে, না মারতে চলেছে? ভীয়েটনামীরা অষ্ট্রেলিয়ায় কি করেছে যে সেখানে সৈন্য পাঠালে তোমরা? কেউ কাউকে কখনও দেখেনি তাকে কিনা তোমরা হত্যা করবে?'

—ওরা কারুর কথা একদম শোনে না, বাইবেল মানে না।

—ওদের আগে শোনাও ধর্মের বাণী। ওরা জাতে খ্রীষ্টান ওদের আগে—আসল খ্রীষ্টান করো তারপর অন্য লোককে করার চেষ্টা কোরো কেমন? তুমি কি জানো—মহাত্মা গান্ধীর নাম? তাঁকে খ্রীষ্টানরা ব'লত খ্রীষ্টান হ'তে খ্রীষ্টানোত্তম। কারণ তাঁর আদর্শ ছিল অহিংসা, জীবে প্রেম। প্রত্যেক খ্রীষ্টানের বাড়ীতে আলমারীর মধ্যে অন্তত একখানা করে বাইবেল আছে। তা আজ কেউ কি পড়ে? আর যারাও পড়ে, সেইমত কাজ কি তারা করে? বিশেষ ক'রে গিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বাইবেলের বাণী শোনাও, তাদের খেরাও কর।

—"ঠিক বলেছ। অষ্ট্রেলিয়ানরা বাইবেল মানে না। বলে বাজে, ওটাকে ফেলে দাও।"

বললাম—'Victory begins at home' 'charity begins at home' এর মত। ঘর থেকেই জয়যাত্রা সুরু হ'ক। পৃথিবীর ধর্মতত্ত্বের মূল তত্ত্বটুকু আগে জানার চেষ্টা কর। দেখবে সবই মূলতঃ এক। সংখ্যাধিক্য দিয়ে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য ও নীতিতে খ্রীষ্টান বাড়িয়ে লাভ নেই।

এখানের সংবাদ পত্রের মাপ 'স্টেটস্ম্যান' কাগজ আর এক ভাঁজ করলে যা দাঁড়ায়। অর্থাৎ ষোল পাতার ষ্টেটসম্যান মানে সিডনীর 'সানডে মিরারে' পাতায় দাঁড়াবে

বত্রিশ পাতা। এখানে চোষট্টি পাতার খবরের কাগজের দাম পাঁচ পেনী অর্থাৎ চার আনারও কিছু কম ছিল। প্রচুর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনগুলো বিশেষ ক'রে নতুন বাড়ী ও গাড়ীর কেনার জন্যই বেশী। চাকরী খালিরও প্রচুর সংবাদ থাকে। এখানে নানা চটকদারী সংবাদই মুখ্য স্থান পায়। সেদিন CALL GIRLS এর সংবাদ সারা প্রথম পাতাটা জুড়ে। কলকাতার এরকম খবরের চাঞ্চল্যকর আবেদন নেই। সিডনী মর্ণিং হেরাল্ডে কলকাতার খবর ব'লে বেরুলো আসামের ট্রেণ দুর্ঘটনা। টাইম'বম্' দিয়ে বিস্ফোরণের ফলে বিশজন মৃত ও একশো জন লোক আহত হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্র ও T.V.তে দেখানো হয়।

আজ সোমবার (২৫ ৪।৬৬) অষ্ট্রেলিয়ায় 'এনজ্যাক' (ANZAC অর্থাৎ AVSTRALIAN NEWZELAND ARMY CORPS DAY) এটী অষ্ট্রেলিয়া ও ও নিউজীল্যাণ্ডের জাতীয় দিবস। 'LEST WE 'FORGET'—পাছে ভুলে যাই এই মহৎ বাণী অন্তরে রেখে বৃদ্ধ সৈনিকরা মার্চ ক'রে বাজনা বাজিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন। আজ জাতির শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন। যারা হাঁটতে অপারগ, তাঁরা কেউ নিজেদের মোটরে, কেউবা ট্যাক্সিব সারি দিয়ে চলেছেন। প্রায় দু' ঘণ্টা লাগলো এই 'মার্চ পাষ্ট' দেখতে। এরপর হবে সৈন্য-গোষ্ঠীর পুনর্মিলন—যার আদি ও অন্তিম পর্ব সুরাসেবনে শেষ হবে। এখানে মদের দোকানকে বলে 'বটল সপ' (BOTTLE SHOP) সেখানে আজ একটু বেশী ভিড়। এই মিলনোৎসবের অজুহাতে নানাস্থানে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের সীধুপানরত দেবগণের যেন ইন্দ্রসভা ব'সে গেছে।

সিডনীর পশুশালা ঃ

সকাল নটা থেকে ১১॥ টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ANZAC দিনের শৃঙ্খলাবদ্ধ জনসমাগম দর্শন পর্ব সেরে 'তরঙ্গা পশুশালা' দেখতে গেলাম। এটি একটি বিখ্যাত পশুবাটিকা।

ষ্টীমারে পার হবার জন্য দশ সেণ্টের মুদ্রা কলের ফোকরে ঢুকিয়ে বেড়া ঠেলে ষ্টীমারে চলে গেলাম। ওপারে কিন্তু টিকিট বিক্রীর কোন ব্যাপার নেই। ফিরে আসার সময় ঠিক একই পদ্ধতিতে ফুটাতে ১০ সেণ্ট ফেলে কাঠের হাত ঠেলে বেরিয়ে যেতে হয়। ওরা একাধারের টিকিট অফিসের খরচ বাঁচিয়েছে। যদি কেউ অনবরত ষ্টীমার চড়ে ও আর না নামে তার প্রতিবিধানের জন্য লোক আছে দেখবে ষ্টীমার খালি হ'ল কিনা। সে ষ্টীমার কোম্পানীর ব্যাপার —তারা বুঝুক গে।

আদিম ভাষায় 'তরঙ্গা' কথার অর্থ হ'ল 'সমুদ্রের অপূর্ব শোভা।' সত্যই এখান থেকে সমুদ্রের ও সৈকতের ও মানুষের প্রয়োজনীয় সৃষ্টির অপূর্ব শোভা দেখতে পেলাম। সমুদ্রের শোভা এখানে শুধু অপূর্ব নয় অনবদ্য সুন্দর। ফেরীঘাট পার হ'য়ে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে, সে বাস নিয়ে যাবে 'জু গার্ডেনের ওপার। সেখান থেকে আবার নেমে এস। বাস কখন ছাড়বে কে জানে। একটু হেঁটেই দেখা যাক না কি ব্যাপার। ৩।৪ মিনিট হাঁটলেই পশুশালার দরজা। ৫০ সেণ্ট অর্থাৎ তখনকার দিনের আড়াই টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হ'ল ছেলেদের বেলা সামান্য কম টিকিটের দাম। ঢুকে পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করলাম। সামনে মীনাগার। মীনাগার ছাড়িয়ে সিংহের আস্তানা, বাঁদরের ঘর। খানিকটা পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে সুন্দর করে সাজানো। লণ্ডন জু-তে এরকম করা আছে। পাহাড়ের উঁচু চুড়োতে আছেন কিংকং; এটি বনমানুষ, ওরাংওটাং, বেবুন, বহু ক্যাঙ্গারু, জলহস্তী, ডলফিন, কুমীর, হাঙ্গর, হাতী, ঘোড়া, জাগুয়ার, চিতাবাঘ, সারস, অষ্ট্রিচ, নানা রকমের পাখী, নানারকমের বাঁদর, নানারকমের সাপ, উট, জিরাফ, ভালুক, সীলমাছ, ভোঁদড়, পেঙ্গুইন, পেলিক্যান প্রভৃতি।

হাতীর ঘরটি আবার তাজমহল প্যাটার্ণে তৈরী—তাতে তিনটি হাতী আছে। ঘরটিতে একটি ফলক আঁটা। তাতে লেখা আছে—"ভারতবর্ষের হাতী"। রাজ-রাজড়াদের উৎসবে সুসজ্জিত হ'য়ে কাজে লাগে, আর ভারী মাল টানতেও কাজে লাগে। হাতীর আয়ু ৫৫ বছর। আগে যে হাতীটা ছিল তা প্রায় ৬৫ বছর বেঁচেছিল। কত ছেলে মেয়ে, কত বাপ মা, কত তরুণ তরুণী প্রেমিক প্রেমিকা নিবিড় আলিঙ্গন ও চুম্বন বিনিময় করত। বসার ও বিশ্রামের জন্য বহু বেঞ্চি পাতা। কোথাও ছাদ দেওয়া বসার জায়গা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্থানে স্থানে কাগজ ইত্যাদি ফেলার জায়গা।

ছেলেদের দোলনা এক জায়গায় রয়েছে সেখানে এসে শিশুরা দোল খাচ্ছে। এখানে পুণার মত ইলেট্রিক রেলগাড়ী আছে তাতে ছেলে ও তার বাবা মায়েরা কয়েক পাক ঘুরে আসতে পারে।

চুড়োয় আছে বনমানুষ নাম 'কিং কং'। তার ঘরের গরাদ বেজায় মজবুত। তিনি দেহটাকে কুঁকড়ে চাকার মত পাক খেয়ে খেয়ে চলে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন। মেঝেতে খড়পাতা। গায়ে ধুলো লাগে না। উনি আবার ধরিয়ে দিলে সিগারেট খান। কলা ও ছোলা তো সবাই খাওয়াচ্ছে। এটি পশুশালায় এক মূল্যবান সংগ্রহ। পাহাড়ের গায়ে কৃত্রিম দাঁড়াবার জায়গায় ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের রাম ছাগলগুলো। দেখলে মনে হয় যেন ছবি তোলার জন্তেই এরা দাঁড়িয়ে।

মংগলবার ২৬শে এপ্রিল।

অফিসের কাছে হবে বলে পীট ষ্ট্রিটের Y. M. C. A.-তে উঠে এসেছি। Y. M. C. A.-এর পাশের বাড়ীতেই ওয়াটার বোর্ডের অফিস। পৌনে ন'টা নাগাদ বেরুলাম। সারারাত ধরে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছে। সকালেও তার শেষ নেই। বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে চলে গেলাম রাস্তা পার হ'য়ে অফিসে। তিনদিন বাদে আবার সবার সংগে দেখা। 'ওয়েষ্ট' সাহেব বলেছিলেন দেখা করতে। তিনি ঘরে নেই। পাশের ঘরে 'কৃশ্চান' সাহেবের ঘরে গিয়ে সন্ধান করলাম 'হোয়াইট' সাহেবের, কেননা আজ হোয়াইট সাহেবেরই দেখাবার পালা। তিনি আসতে একটু দেরী করছেন। ডেপুটী এঞ্জিনিয়ার-ইন্-চীফ্ গোল্ডস্মিথ্ সাহেব ছুটি থেকে ফিরেছেন। তাঁর সংগে দেখা করতে নিয়ে চললেন কৃশ্চান সাহেব। আমি বললাম 'পরশু তো এঁর সংগে আলাপ আলোচনার কথা আছে কর্মসূচী অনুসারে।'

কৃশ্চান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম 'তিনদিন দীর্ঘ ছুটি কেমন কাটলো। তোমার তো ANZAC-দিনে দেখলাম না ?,

—আমি এখানে ছিলাম না। সহরের বাইরে এক ঘর বানাচ্ছি। সেখানে গিয়েছিলাম।

—ঘরের মডেল কি তৈরী করেছ ?

—না আমি নিজে নিজেই তৈরী করছি।

—ঠিকে দাওনি ?

—আরে ঠিকে ! আমি নিজেই করছি। নিজের হাতে কণিক ধরে, ব্রাস্ দিয়ে রং লাগিয়ে।

—মানে তুমি লোক লাগিয়েছ আর তদারক ক'রছ ?

—না, না, আমি নিজের হাতে করছি। পাঁচ বছর প্রায় লেগে গেল। শনিবার ভোরে বেরুই। সকাল ৭টায় পৌছে যাই। তারপর দুদিন কাজ। অর্থাৎ বছরে ১০৪ মানুষ দিন। Man-days

—ঠিক তাই।

—বাড়ীর লোকদের সাহায্য করতে বল না কেন ?

—এই শেষ হ'য়ে এল। তারা আর কি সাহায্য করবে ?

উনি কথায় কথায় বললেন ওঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কোথায় যেন এক সুপ্ত অভিমান আছে। শনিবারে লোকেরা সাহায্য করতে চায়না বা উনি তাদের সাহায্য নিতে চান না। নিজে করেছি এর মধ্যে একটা পরম গৌরব গোপন আছে।

হোয়াইট সাহেব এসে গেছেন। তাঁর সংগে আলাপ আলোচনা হ'ল। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাঁর সহকারীর সংগে বেরুলাম। তখনও টিপ্-টিপ্ করে বিষ্টি পড়ছে।

বললাম, একবার 'মার্টিন প্লেসে' চলো। ওখান থেকে আমার প্লেনের টিকিটটা নিয়ে নেবো।

কুমারী ভরোনিক ঠোঁটে হাসি খেলিয়ে— QUANTAS বিমান প্রতিষ্ঠানের টিকিট এনে দিলেন, PANAM এর বদলে।

গাড়ীতে ফিরে এলাম ও 'পেনরিথের' পথে চললাম। পেনরিথের কাছেই ব্লু মাউণ্টেন্, কাটুন্স, লিউরা অঞ্চল।

সিডনী থেকে উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে তিনটি মুখ্য রাজপথ চলে গেছে। পূর্বে মহাসাগর। উত্তরের রাজপথ হ'ল 'প্যাসিফিক্ হাইওয়ে,' দক্ষিণের রাজপথ হ'ল 'প্রিন্সেস হাইওয়ে' বা ১নং রাজপথ, পশ্চিমের রাজপথটি হ'ল 'গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ হাইওয়ে।' তাছাড়া একটি এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরী করা হ'চ্ছে। মূল রাস্তা এক্সপ্রেসওয়ে কোথাও মাটীর ওপর দিয়ে কোথাও নীচে দিয়ে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে। আমরা গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ হাইওয়ে ধরে প্রসপেক্ট (PROSPECT) হ্রদে এলাম। এখানে নানা নদীর ওপর আঁড় বাঁধ বেঁধে, পাইপ ও খোলা নালা দিয়ে জল নিয়ে এসে হ্রদে জমা করা হয়। এখান থেকে সেই জল সহরে ও তার উপকণ্ঠে পাঠানো হয়। পেনরিথে জল পরিস্রাবণাগার দেখতেই আসা হয়েছে। যেটি ঐ সহরের নিজস্ব জলকল ছিল এখন 'সিডনী ওয়াটার বোর্ডের' আওতায় আসায় সেটিকে আরও উন্নত করা হয়েছে। দ্রুত বালুকা পরিস্রাবণাগারে এখানের জল পরিষ্কার করা হয়। এখান থেকে রিচমণ্ডের দিকে (RICHMOND) চলে এলাম। পেনরিথ থেকে যাবার পথে ব্লু-মাউন্টেন। এই পাহাড়ে 'কাটুম্বা'। কাটুম্বা থেকে 'তিন ভগ্নী'স (Three SISTERS) স্থান। —আফড় পাথর কেটে ও ক্ষয়ে যেন তিনটি ভগ্নী শীতে জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছেন! আরও দূরে 'জেনোলান' (JENOLAN) গুহা। পাথরের বিরাট শিলান জল গিয়ে গিয়ে তৈরী হয়েছে। মানুষের চেষ্টায় সে ক্ষতি এখন স্থগিত রয়েছে এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিরাট শিলানটি ৪৫০ ফীট লম্বা; ২৭৭ ফীট চওড়া, আর খাড়া কোথাও ৪০ ফীট কোথাও বা ৮০ ফীট। সামনে ঢেউ খেলানো জমি। ঘোড়া চরছে। কপি ক্ষেত, টম্যাটো ক্ষেত ও বহু কমলালেবুর বাগান করা হয়েছে। ক্ষেতে থেকে পাম্প করে জল দেয়। এত ঢালু যে সেচের জন্য খাল কেটে— জল দেওয়া সম্ভব নয় এ অঞ্চলে।

পেনরিথ থেকে আমরা উত্তর মুখে চললাম 'রিচমণ্ডে'। রিচমণ্ডের জল-কল দেখলাম। সেখান থেকে এবার ঘরে ফিরতে হবে। প্রায় ৪॥ টা বাজলো। আমরা একটু সটকাট করবার জন্য রিচমণ্ড থেকে বার্কশায়ার পার্ক, মার্সডেন পার্ক, ব্ল্যাক টাউন হ'য়ে পারমাতায় চলে এলাম। সেখান থেকে পারমাতা রোড বা প্যাসিফিক হাইওয়ে ধরে জর্জ ষ্ট্রিট ধরে ওয়াটার বোর্ডের অফিস। অফিস থেকে নেমে ঘরে চলে এলাম, তখন ৬টা বেজে গেছে।

উলুং গং :—

আগে থেকেই কথা ছিল বুধবার উলুংগং এ যাবার। ওরা আমায় গাড়ী দেবে খুব সকালে তবে এখান থেকে আমার সংগে কেউ যাবে না। সেখানে পৌঁছালে আমার সংগী হবেন ওখানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট। বড় বড় কারখানা এখানে গ'ড়ে উঠেছে। মূল কেন্দ্র হ'ল এটির ইস্পাত কারখানা। ইস্পাত থেকে পাশেই করোগেটেড টীনের কারখানা, ষ্টুয়ার্ট লয়েডের পাইপের কারখানা, সার প্রস্তুতের বিরাট কারখানা প্রভৃতি। সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড (SULPHURIC ACID,-ও তৈরী হয় এখানে প্রচুর। অর্থাৎ এটি ভারী যন্ত্রপাতি ও ভারী রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণের কেন্দ্র।

সিডনী থেকে উলুংগং প্রায় ষাট মাইল দূরে। এ স্থানটি যদিও ওয়াটার বোর্ডের আওতায় তবুও একটু বিকেন্দ্রীকরণ রয়েছে। দূর বলে 'হোয়াইট' সাহেব বলে-ছিলেন সকাল সকাল বেরুতে। কথামত ৮॥০ টার সময় আসা হ'ল। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছে ছিল যাবনা। এই জলে কে যায়? তবে মনে হ'ল কথা দিয়েছি। আর দেখা যাক্ না বৃষ্টিতে কলকাতার মত সহরে জল জমে কি না। মনে হ'ল সারারাত যখন বৃষ্টি হয়েছে বিকেলের দিকে আকাশের মেঘলা ভাব কেটে যেতে পারে। গেলাম অফিসের তলায় গ্যারেজে। গাড়ী আগে থেকে বলা ছিল। গিয়ে চড়লাম গাড়ীতে। যাবার পথে ড্রাইভারকে বললাম পেট্রলের দোকান থেকে একটা ম্যাপ চেয়ে নাও। সে (SHELL) 'সেল' কোম্পানীর দোকানে গাড়ী থামিয়ে একটা মানচিত্র নিয়ে এল। আমরা দক্ষিণ মুখে চলেছি। প্রিন্সেস্ হাইওয়ে দিয়ে না গিয়ে চললাম 'বটানী বাই'-এর ধার দিয়ে, কিংসফোর্ড স্মিথ বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে। সমুদ্রের তট দিয়ে এ রাস্তার নাম Grand Promenade General Homes Drive। এবার জর্জেস নদী, 'ক্যাপ্টেন কুকের নামে সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'য়ে এবার ধরলাম প্রিন্সেস্ হাইওয়ে। প্রিন্সেস্ হাইওয়ে দিয়ে খানিকদূর গেলে রাস্তা দুভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে। একটি জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে, অপরটি প্রিন্সেস হাইওয়ে ধরে।

ড্রাইভারকে বললাম চলো জাতীয় মহোদ্যানের মধ্য দিয়ে যাই। অপূর্ব বনাকীর্ণ রাস্তা। পান্না থেকে ছাত্রপুর যাবার রাস্তার মত। এই নামছে এই উঠছে। দু'পাশে ওক, ইউ ক্যালিপ ও আরও কতকি বন্য গাছ, লতা গুল্ম। এরপর সমুদ্রের ধারে এসে পড়লাম। সমুদ্রের

ধার দিয়ে রাস্তা চলেছে। রাস্তা ও সমুদ্রের ধারের মধ্যে লোকের বসবাস। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি কয়লার খনি দেখা গেল। এরপর সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরে এসে গেলাম উলুংগং। এটিকে 'ইস্পাত নগরী' বলা যেতে পারে। দুটি ইস্পাতের কারখানা রয়েছে। তৃতীয় ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। যেখানে 'অয়জান তৈরী' হয় সেখানে চিমনি থেকে ধুয়ো পাশের জমীতে পড়ে তা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জমীতে কোন ফল ফসল হয় না তাই কংক্রীটের ৬০০ ফীট উঁচু চিমনী তৈরী করেছে যাতে হাওয়াতে কলের দূষিত গ্যাস সমুদ্রের ওপারে চলে যায়—এবং ধুয়ো ও এ্যাসিডের গাঢ়তা মন্দীভূত হয়।

কর্মকর্তা ম্যাকলাউরী প্রথমে জলকলের অফিসে যেতে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও ময়লাকল দেখাতে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রের ধারে এটি তৈরী হয়েছে, বিশেষ শোধনের প্রয়োজন নেই, তবুও বেশ কিছু লম্বা পাইপ দিয়ে ময়লাকলের নল সমুদ্রগর্ভে এগিয়ে দেয়া হয়েছে। ময়লার গাদ শুকোনোর কোনও ভাবনা নেই, সমুদ্রের ধারে বালিতে চৌবাচ্চা করে তা রাখলেই প্রায় দুতিন দিনেই বালিতে জল শুঁষে রোদে শুকিয়ে যায়। ম্যাকলাউরী সাহেব গাড়ীতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা দর্শনীয় জায়গা দেখালেন। সহরটী বেড়েই চলেছে। যত শিল্প গড়ছে ততই এর প্রসার বাড়ছে, আর জনসংখ্যা বাড়ছে। তাদের গলফ ক্লাবের আসরে মধ্যাহ্ন ভোজটি সামাধা করালেন। এই ক্লাবে দুপুরেই জুয়ো খেলা চলেছে। বেলা দুটো বাজতে ফিরতে চাইলাম, আমার ইচ্ছা বেলা ৪॥০ মধ্যে অফিসে ফিরি। ওখানের একটি জলকল দেখার কথা কিন্তু সেটী সময়ের অভাবে কর্মসূচী থেকে বাদ দিতে হল বিশেষ করে বৃষ্টির অবিশ্রান্ততায়। ফেরার পথে চললাম বুলাই গিরিপথ দিয়ে, জাতীয় মহোদ্যানের ভিতর দিয়ে নয়। তাই চললাম ১নং রাজপথ ধরে, পথের এক জায়গায় দেখি কয়েকটি মোটর শীর্ষাসন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা নীচে চাকা চারটে ওপরে, এসব দেখে শোফারকে বললাম "ভায়া, একটু ধীরে চালাও"। এখানে Water Board গাড়ীর নম্বর সরকারের সাধারণ নম্বর থকে পৃথক নম্বর, রেখেছে। যেমন—A.W.B. 313. W. B. অর্থে ওয়াটার বোর্ড। A. B. C-র AWB-৩১৩ নম্বর গাড়ী A বর্গের ৩১৩ নম্বরের।

কাল সন্ধ্যাবেলা মনে হল সিড্‌নীর ভারতীয় 'টি সেন্টার' দিয়ে ঘুরে আসি। আমার পীট স্ট্রীটের আস্তানার তিন চার ব্লক দূরে ঐটী অবস্থিত। এয়ার ইণ্ডিয়ার বেটে রাজার মূর্তিটি যেন অভিবাদন জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ডিম মাংস নিত্যি খেয়ে বিরক্ত লাগছিল। দুপুরে কিনেছিলাম পাঁচটী আপেল দশ (১০) সেন্ট দিয়ে। স্থির করলাম ফলাহারে আজ রাতটা কাটিয়ে দি। একাদশীর পারণ কিনা জানিনা, কেননা তিথির সন্ধান এখানে মেলে না, শুধু চাঁদ দেখে পূর্ণিমা বলা যায়। চণ্ডীগড়ের 'রাণী সিং' টি সেণ্টারের তদারককারিণী, শ্রীকুমার বড় কর্তা। রাণীর এক ভাই নিউ সাউথ ওয়েলেস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করে সিডনী ওয়াটার বোর্ডে কাজ করে। রাণী ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে জিগ্যেস করল "আপনি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ফরমেশন সেণ্টারে জাননি ?"

—'না তো।'

—'যাবেন ? ওখানে মিঃ মৌলিক আছেন। তিনি গেলে খুব খুশী হবেন।'

পরের দিন দুপুরে কাজের কিছু ছুটী করে গেলাম হেঁটেই। আমাদের অফিস থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে। সত্যিই মিঃ মৌলিক বেজায় খুশী হ'লেন ও আমায় রাত্রে লাউ চিংড়ি খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি। টেলিফোনে স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন ও তাঁরও আমায় লাউ চিংড়ি খাওয়াবার জন্য অনুরোধ।

আমি বললাম, আমায় বিকেল পাঁচটার মধ্যেই কোয়াণ্টা (Quanta) হাউসে রিপোর্ট করতে হ'বে, তাকে বললাম পাসপোর্টে Mexico-র নাম ঢুকিয়ে দিতে হবে। কোথায় করানো যাবে বলুন ?"

"এ অফিসে নয়, ভাবনা নেই, করিয়ে এনে দিচ্ছি" বলে এক ভদ্রলোককে ডাকলেন, সে বললে যে ফর্ম আছে তাতে ভর্তি করতে হবে, অমনি তাকে পাঠানো হ'ল ফর্ম আনতে। সে ফর্ম নিয়ে এল, ট্রেড কমিশনার ছিলেন না, বিকেলে আসবেন, আমি যেন লাঞ্চের পরে সেখানে যাই।

লাঞ্চের পরে ওয়াটার বোর্ডের অফিস থেকে তাদেরই গাড়ীতে চললাম একটু দূরে টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও নানা রকমের প্রিণ্টিং করা হয়- সেই অফিসে নিয়ে এল। সময় সীমিত, তাই বেলা ৩॥ থেকে ৪টার মধ্যে এই পরিদর্শন পর্ব সারতে হবে। দেখে এলাম ওদের ছাপাখানা ও ফটো তোলার বিরাট ব্যবস্থা।

আমার সঙ্গের ভদ্রলোককে বললাম, "আমায় কোট স্ট্রীটে ক্যালটেক্স বিল্‌ডিংয়ে ট্রেড কমিশনারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তারপর যেন (Quantas) কোয়াণ্টাসের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমার অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাস পর্ব শেষ করান।' তিনি সানন্দে রাজী হলেন।

[ক্রমশঃ]

॥ নিরুদ্দেশ ॥

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অমু চলে গেছে দু'মাসের ওপর। কোন পাত্তাই তার পাওয়া গেল না। রেণু ভাবে, মাঝে মাঝে কাঁদে এবং প্রায়শঃই নিজের ঘরের মেঝেয় অন্যমনস্ক হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। কতদিন, আর কতদিন তাকে এমনি করে কাটাতে হবে কে জানে ?

রেণুর এই আকুল প্রার্থনা কি ভগবান শুনেছিলেন ? বোধ হয় শুনেই ছিলেন। কারণ বেশীদিন রেণুকে এ ভাবে থাকতে হয় নি। একদিন দুপুরে এক রেজেষ্টারী চিঠি এসে হাজির হোল। পিয়ন চিঠি দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গেল। রেণু জিজ্ঞাসা করলে, কোথাকার চিঠি, কে দিয়েছে ? পিয়ন বললে, এটর্নী বাড়ীর চিঠি, ওলড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট থেকে আসছে।

দুরু দুরু বুকে রেণু খাম খুলে পড়তে চেষ্টা করলে। ইংরাজী পড়ে বুঝতে সে পারত, কিন্তু অনেকদিন ইংরাজী পড়ার অভ্যাস নেই। টাইপ-করা চিঠিটা বার বার পড়েও ঠিক হৃদয়ঙ্গম হোল না। দোতলায় রাণীর কাছে চিঠি-হাতে রেণু গিয়েছিল। রাণীর বিদ্যেও অনেকটা রেণুরই মত, সে পড়ার চেষ্টা করে শেষে বললে, আপনার ভাই আসুক দিদি, তাকে দিয়ে পড়িয়ে আপনাকে বলব।

সন্ধ্যার পরে রাণীর স্বামী অর্থাৎ অলকের বন্ধু সঞ্জীববাবু রেণুকে ডেকে বললে, আপনি মাস পাঁচেক আগে অমরবাবুর পাওনাদারের কাছে তেতাল্লিশ হাজার টাকার জন্য যে জামিন দিয়েছিলেন, সেই টাকা তারা অমরবাবুর কাছ থেকে আদায় করতে না পেরে আপনাকে ঐ টাকা সুদ এবং খরচ সমেত দেবার জন্য দাবী জানিয়েছে।

অবাক হয়ে রেণু বললে, আমি ? আমি জামিন দিয়েছিলুম ?

সঞ্জীব বললে, হ্যাঁ। আপনি দেন নি ?

রেণু বলল না ত। আমি ত কিছুই জানি না।

সর্বনাশ ! তা হলে অমর বাবু এই সব কাণ্ড করে গা ঢাকা দিয়েছে। এখন উপায় ?

রেণুর সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম্ করতে লাগল।

সঞ্জীব রেণুকে জেরা করতে লাগল। আপনি কোথাও কোন কাগজে সই দেন নি ?

আমার তা মনে পড়ে না।

কিন্তু এরা ত লিখছে—আপনি বাড়ীর দলিলখানা পর্য্যন্ত ওদের কাছে জমা রেখে তেতাল্লিশ হাজার টাকার ঝুঁকি নিয়েছেন। আচ্ছা দেখুন ত, দলিল আপনার কাছে আছে কি না ?

রেণু ছুটে এসে বাক্স খুলে দেখলে দলিল নেই, বাক্সের মধ্যে ওর দলিলটাই শুধু ছিল কারণ সাবোজের দলিল ও উইল অলক নিয়ে গিয়েছিল উইল অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্যে। কাঁপতে কাঁপতে দোতলায় নেমে এসে রেণু বল্লে, না, দলিল আমার বাক্সে নেই।

সঞ্জীব স্তম্ভিত হয়ে গেল। এখন উপায় ?

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাণী তার স্বামীকে অনুরোধ করে বলেছিল, তুমি একটু ভাল করে দেখ না গো ? দিদি যে পথে বসবে !

স্বামী বল্লে তাইত এখন কি করা যাবে ? আচ্ছা দেখি কাল এই এটর্নীকে ফোন্ করে যদি পারি সকাল সকাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে এটর্নী অফিসে যেতে হবে; তারপর কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে দেখে এসে যা হয় কিছু একটা করা যাবে।

সে রাত্রে রেণুর ঘুম হয় নি।

পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় সঞ্জীব ফিরে এসে বলেছিল দিদির কোন ভয় নেই। জামিননামায় সই বোধ হয় জাল করা হয়েছে। এটর্নী অফিসের একজন পার্টনার আমার'

ল'কলেজের সহপাঠী ছিল আমি জানতুম না। ওখানে দেখা হতেই চেনা বেরুল। সে আমাকে এ বিষয়ে পুরো সাহায্য করবে। সে বল্লে, যা সত্য ঘটনা দিদিকে মাত্র সেইটুকুই বলতে হবে। অমর বাবু দিদির ঘরেই থাকতেন। তিনি কোন এক সময় দলিল চুরি করে অন্য কোন স্ত্রী-লোককে রেণুবালা দেবী সাজিয়ে সই দিইয়েছেন। জামিনের সই এব সঙ্গে দিদির সই মেলালেই জিনিষটা প্রমাণ হয়ে যাবে। তাহলে দিদির কোন দায়িত্বই আর থাকবে না।

সঞ্জীবের কথায় রেণু আশ্বস্ত হোল। স্বামীর সামনেই রাণী রেণুকে বল্লে আপনার কোন ভয় নেই। উনি আপনার জন্য যা দরকার হয়, সমস্ত করে দেবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সঞ্জীব বল্লে আপনার চিঠির জবাব আমি কাল লিখে টাইপ করিয়ে আনব। আপনি সই দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

তারপর রাণীর দিকে চেয়ে সঞ্জীব বলেছিল, কত রকমের জোচ্চুরিই যে হয়, কিন্তু এই জোচ্চুরিটা বড় কাঁচা হয়ে গেছে। ধরা পড়লে বাছাধনের বেশ কয়েক বছর ঘানি ঠেলতে হবে।

রেণু শিউরে উঠল, কি রকম?

সঞ্জীব বল্লে, রকম আর কি? দুনিয়ার লোককে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে শ্রীমানের এমনই সাহস বেড়ে গিয়েছিল যে, নিজের ভবিষ্যৎটা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে এমনই একটা সাংঘাতিক কাজ করে বসেছে।

রেণু ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেছিল, কেন এরকম করলে কিছু জানেন?

সঞ্জীব বল্লে, জানি। শুনলুম চুরানব্বই হাজার টাকার ওপোর দেনা ছিল হরকিষণলাল নামক এক মাড়োয়ারীর কাছে। সেই মাড়োয়ারী চাপ দিয়ে অমর বাবুর নিজের বাড়ীটা বিক্রী করিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় করেছে। সেই বাড়ী কিনেছে আমাদের কোর্টের এক উকিল। তারপর ওর দুখানা মোটর সেই মাড়োয়ারী দখল করেছে, গাড়ী দু'খানার দাম ধরেছে চার হাজার আর দু'হাজার ছ হাজার টাকা। এই একান্ন হাজার টাকা আদায় করার পর বাকী তেতাল্লিশ হাজার টাকার জন্য হরকিষণলাল ওকে জেলে দেবার ভয় দেখিয়েছিল। তখন আর দেউলে নাম লেখাবার সময় বোধ হয় পায় নি, কিম্বা কি ভেবেছিল সেই জানে। তখনই, অমর বাবু একটি স্ত্রীলোককে রেণুবালা দেবী সাজিয়ে দলিল নিয়ে কোর্টে গিয়ে জামিন নামায় সই করায়, এবং নিজে টাকা দেবার জন্য তিনমাস সময় নেয়। সেই তিন মাস সময় পার হয়ে যাবার পর হরকিষণলালের লোক ওর খোঁজ করে কোন পাত্তা না পেয়ে জামিনদার রেণুবালা দেবীর নামে এই রেজেস্ট্রী চিঠি দিয়েছে।

কথাটা শুনে রেণু বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুদিন ধরে এক মাড়োয়ারী ওর খোঁজ করতে এসেছিল। তা আমি তাকে বলেছিলুম, সে বোম্বাইয়ে আছে এবং বোম্বাইয়ের ঠিকানাও দিয়েছিলুম। তারপর সে আর আসে নি।

সঞ্জীব বললে, তা হলে ঠিকই হয়েছে। ঐ ঠিকানায় খোঁজ করে দেখেছে বাজে ঠিকানা, তাই আপনার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করার জন্য ব্যবস্থা করছে। তা সে যাই হোক, আপনার কোন ভয় নেই দিদি। আপনার একটু ভোগান্তি হবে বটে, কিন্তু আপনার একটি পয়সাও সে নিতে পারবে না।

কথায় কথায় বেশ খানিকটা রাত হয়ে গিয়েছিল। রেণু পায়ে পায়ে নিজের ঘরে চলে এল।

সে রাত্রেও রেণুর ঘুম হোল না।

সেই অমু, যার জন্য রেণু এ বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিল, সেই ছোট্ট রোগা হাড়সার এক ফোঁটা ছেলেটা কোথায় পথে পথে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তারই বাবার দেওয়া তিনতলার বাড়ীর উপর রেণু আজ শুয়ে আছে। আহা, শেষকালে ছেলেটা সত্যিই ভাল হয়ে গিয়েছিল। গোড়ায় অসৎসঙ্গে জুটে সে যাই করুক না কেন, শেষে তার কোনরকম বদখেয়াল আর ছিল না। শেষের ক'মাস সে আবার সেই ছোট্ট ছেলেটির মতই রেণুর কাছে-কাছে ঘুরত, সুখ-দুঃখের কত কথাই সে কইত। টাকা-কড়ির ব্যাপারে নেহাৎ প্রাণ বাচানর জন্য, জেল বাঁচানোর জন্য কাজ একটা করে ফেলেছে বটে, কিন্তু---কিন্তু এ ছাড়া হয়ত তার অন্য কোন উপায়ই আর ছিল না। রেণু মনে মনে শিউরে উঠল। যে জেলখানার ভয়ে সে এত কাণ্ড করলে, সেই জেলই কি তার শেষ পর্য্যন্ত হবে! সঞ্জীব তো সেই কথাই বলেছে। আহা, সরোজের দুটি মাত্র ছেলে, একটি

অকালে অপঘাতে গেল, আর ছোটটির কি শেষ পর্য্যন্ত জেল হবে! জেলে গেলে সে আর বাঁচবে না, কিছুতেই বাঁচবে না। কে ওকে খেতে দেবে, কে সেখানে যত্ন করবে। হুঁঃ, যত্ন দূরের কথা, খেতেই পাবে না, খাটতে খাটতে প্রাণ যাবে। সঞ্জীব ত বললে, ঘানি টানতে হবে। শুনেছি কয়েদীদের রোদ্দুরে বসে পাথর ভাঙতে হয়। উঃ, ভগবান, যাকে নিজের বুকের দুধ দিয়ে একটু একটু করে মানুষ করে তুললুম, সেই আমার চোখের সামনে এই ভাবে তিল তিল করে নিঃশেষ হবে। সেই মাড়োয়ারীর হাতে পায়ে ধরলেও সে কি রেহাই দেবে না! আমি যদি তার কাছে গোলাম হয়ে থাকি, আমি যদি নিজেকে তার কাছে বিকিয়ে দি, তাহলেও কি অমুকে, আমার অমুকে সে ছেড়ে দেবে না? আজ এখন অমু লুকিয়ে আছে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেকি আর চিরদিন এমনই ভাবে পালিয়ে বেড়াবে। একদিন সে আসবেই, কাজকর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম করবেই, সে ত বলেইছিল যে তার বিয়ে করতে ইচ্ছে আছে, কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে কি কিছুই তার হবে।

সারাটি রাত অনিদ্রায় কেটে গেল। শরীর ঝিম ঝিম্ করছে, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, উঠে দাঁড়ালে পা টলে পড়ে। রেণু ভোরেই স্নান সেরে নিলে। পূজো করতে বসে অঝোর ধারে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে মনটা হাল্কা করে সে দোতলায় নেমে গিয়ে দেখলে, সঞ্জীব ছোট ছেলেকে নিয়ে সিঁড়ির সামনে দালানের টেবিলে চা খেতে বসেছে। রাণী গরম গরম নিমকি এনে ওদের দুজনের প্লেটে দিয়ে রেণুর দিকে চেয়ে দেখেই মাথায় কাপড় তুলে বললে, আসুন দিদি, কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনার কথাই হয়েছে। বসুন এখানে।

অদূরে একটা চেয়ারে রেণু বসে পড়ল। তার মনে পড়ল, সরোজও এমনই ভাবে অমু সমু অলক অপুকে নিয়ে সকালে খেতে বসত। অবশ্য টেবিলে বসত না, মেঝেয় আসন পেতে বসত এবং চা সে খেত না, কিন্তু এক কাপ করে দুধ ওরা খেত। রেণুকেও এক কাপ দুধ এবং অন্য যা থাকত, ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খেতে হোত। সেদিনের সেই মুখচ্ছবি স্মরণ করে রেণু তার উদ্গত দীর্ঘশ্বাস দমন করেছিল।

সঞ্জীব বললে, আপনার ভয় নেই দিদি, আমি আজই ঐ চিঠির একটা উপযুক্ত উত্তর লিখে টাইপ করিয়ে আনব। মাড়োয়ারী আপনার কিছু করতে পারবে না।

রেণু অত্যন্ত ধীরে মৃদুস্বরে বলেছিল, অমুর কি হবে?

রুক্ষভাবে সঞ্জীব বললে, তার আর কি হবে? যতদিন ধরা না পড়বে ততদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। ধরা পড়লে পাপের ফলভোগ করবে।

জেলও হতে পারে? রেণু প্রশ্ন করেছিল।

অবধারিত। শুধু টাকা ফাঁকি দেওয়া নয়, জালিয়াতীও করেছে। জেল তার অবশ্যই হবে, এবং ভালরকমই হবে। ওসব লোকের ভালরকম শাস্তি হওয়াই উচিত।

ম্লান মুখে রেণু প্রশ্ন করেছিল, তাকে বাঁচাবার কোন পথই কি নেই?

সঞ্জীব ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আশ্চর্য্য! এখনও ওর ওপোর এত টান্ আপনার? যে আপনাকে পথে বসাতে চেয়েছে, সেই তাকেই বাঁচাবার জন্য আপনি এত ভাবছেন? আপনার কাকা মানে যাকে আপনি বাবা বলতেন, তিনি ত সকলকে সমানে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাতে কারুর কোন কষ্ট না হয় সেজন্য তাঁর ত ব্যবস্থায় কোন ত্রুটী ছিল না। এর মধ্যে একটা ছেলে যদি নিজেরটা নষ্ট বড করে বড় বোন, যে মায়ের মত যত্নে তাকে মানুষ করেছে, সেই বোনকে পথের ভিখারী বানাতে চায়, তাহলে তাকে— ! একটু থেমে সঞ্জীব বল্লে সব ই শুনেছি আমি। এ বাড়ীতে আসার সময় অলকই আমাকে সমস্ত বলেছিল। আমি দেখুন,—আমি চাই অমর বাবু তার দুষ্কর্ম্মের শাস্তিভোগ করুন। ঐ সব লোককে দয়ামায়া করা উচিত নয়। ওদের ওপোর দয়ামায়া আসেও না।

রেণু চুপ করেই বসেছিল।

সঞ্জীব চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে, ও সব অন্যায় মায়া করবেন না দিদি। যতদিন ছোট ছিল ততদিন মায়ের মত লালন পালন করেছেন, কিন্তু দুজনকে আদর করে আর প্রশ্রয় দেবেন না। ওতে তার কোন উপকারই করতে পারবেন না, উল্টে সে আরও বেপরোয়া হয়ে সমাজের আরও অনেক ক্ষতি করে বেড়াবে। সঞ্জীব দালান থেকে ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ প'রে রেণু নীরবে দোতলা থেকে উঠে এসেছিল।

দুপুরে রেণু আবার দোতলায় এসে রাণীর কাছে বসেছিল। রাণী তখন নিজের ঘরে পাখা খুলে পিঠের ওপোর ভিজে চুল ছড়িয়ে বসে বসে কি সব সেলাই করছিল। রাণীর ছেলেটা রবারের বল নিয়ে দালানে লাফাচ্ছিল, রাণী মাঝে মাঝে ছেলেকে সাবধান করছিল, দালানের টাঙানো ছবিতে যেন বল না লাগে, ছবি ভাঙলে মার খেতে হবে, ইত্যাদি। রেণুর মনে পড়ল, এমনি করে অমু সমুও ঘরের মধ্যে বল ছুঁড়ত এবং সে নিজে পড়াশুনা, সেলাই, পশম বোনা এই সব করতে করতে ওদের সাবধান করত। সে আর কদিনেরই বা কথা!

রাণী বল্লে, বসুন দিদি, রান্না খাওয়া হয়ে গেল।

রেণু বল্লে, হাঁ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রেণু বল্লে, সঞ্জীববাবু সকালে যা বলছিলেন সেই ব্যাপারে ওঁর সামনে কিছু বলতে পারি নি রাণী, কিন্তু আমার সম্বন্ধে উনি ওঁর বন্ধুর কাছে যা শুনেছেন, সেটা সব ঠিক নয়। আমি তপু অমুর আপন জাঠতুত বোন নই। মৃত অলকের নামটাও সে মুখে আনতে পারে নি।

সে কি? আমরা কিন্তু তাই শুনেছিলুম, রাণী সবিস্ময়ে উত্তর দিলে।

রেণু ধীরে ধীরে সবিস্তারে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লে, অমুর বাবাকে আমি নিজের বাবার মতই বরাবর মনে ভেবে এসেছি, তিনিও আমাকে সেইভাবেই পালন করেছেন, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সমানে বাড়ী পর্য্যন্ত দিয়ে গেছেন, কিন্তু এখন সেই আমি কি প্রাণ থাকতে এমন কাজ করতে পারি যাতে সেই বাবার সন্তান, যার জন্য এ বাড়ীতে আমি এসেছিলুম এবং যার জন্য আমার এত সুখ সম্পদ, সেই তাকেই জেলের মুখে ঠেলে দেব। তুমিই বল রাণী, এ কী আমার ধর্ম্মে সইবে? পরলোক থেকে বাবাই কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

রাণী অবাক হয়ে সবটাই শুনলে। শেষে বল্লে, তাহলে আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন?

আমি আর কি ঠিক করব বল। তুমি তোমার স্বামীকে বলে এমন ব্যবস্থা করে দাও, যাতে আমার দ্বারা অমুর কোন ক্ষতি না হয়। ভবিষ্যতে কোথায় কি বিপদে সে আবার পড়বে জানি না। ভগবান করুন তার যেন আর কোন বিপদ না হয়, কিন্তু আমার কাছ থেকে সে যেন নিরাপদ থাকে এইটাই তুমি ওঁকে বলে করিয়ে দিও। এই আমার শেষ মিনতি তোমাদের কাছে।

রাণী ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার বেশ খানিকটা পরে রাণীর ছেলে টুকটুক্ করে ওপোরে এসে রেণুকে বল্লে পিসিমা, পিসিমা, বাবা আপনাকে ডাকছে। আপনি আসুন।

রেণু ধীর পায়ে রাণীর ছেলের পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

গম্ভীর কণ্ঠে সঞ্জীব বল্লে, বসুন। আপনার কথা সব শুনলুম। এখন কি করতে চাইছেন আপনি?

রেণু ধীরে ধীরে ওর মনোভাব প্রকাশ করেছিল।

সঞ্জীব বল্লো, দেখুন আপনি যা যা চাইছেন এটা করা মোটেই শক্ত নয়। আপনি যদি স্বীকার করে নেন যে আপনি জামিন হয়েছিলেন ঐ সই আপনার, তাহলে অমর বাবুর কোন বিপদই আর হবে না, কিন্তু আপনার এই বাড়ীখানি বিক্রী হয়ে যাবে, আপনি পথে বসবেন। আমি ত শুনলুম যে আপনার টাকা যা ব্যাঙ্কে ছিল তাও সব গেছে। তা হলে এই বয়সে কি ভিক্ষে করে খাবেন? বেশ ভাল করে ভেবে দেখুন।

ঘরের মেঝের ওপোর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রেণু বলেছিল, ভেবেছি। ভেবেই বলছি, এমন কাজ করে দিন যাতে তার কোন বিপদ না হয়।

কিন্তু,—সঞ্জীব পুনরায় বল্লে, কিন্তু এই বাড়ী আপনার পরে আপনার পেটের ছেলেই পেত। তার পাওনা থেকে তাকে আপনি বঞ্চিত করবেন?

রেণু মুখ তুলে চেয়েছিল। তার চোখের কোণে জল। বল্লে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তার পাওনা ত কিছুই নেই। সে যার ছেলে, সে ত তার জন্য কিছুই রেখে যায় নি। যার বাবার বাড়ী, তার জন্যই যদি বাড়ীটা যায় তা হলে অন্য

লোকের ছেলের বঞ্চিত হবার কারণ কি ?

সঞ্জীব রেণুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ পরে বল্লে, আচ্ছা তাহলে তাই হবে।

হোলও তাই। রেণুর বাড়ীখানা এটর্নী অফিস থেকেই বিক্রী করবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

খবর পেয়ে সমু, সমুর শাশুড়ী, শ্বশুর, এবং বাচ্ছা-কোলে সমুর বউও দৌড়ে এল! সমুর শ্বশুর বল্লে, এটা আপনি কি করলেন বেয়ান! ছেলেটাকে পথে বসালেন।

ও যে পথেরই ছেলে সেটা ভুললে চল্‌বে কেন, রেণুর স্পষ্ট উত্তর।

কিন্তু পথের ছেলে ত আমি নই। দাদু যে আমারই জন্যে বাড়ীখানা তোমার নামে দিয়ে গিয়েছিল, সমু কড়া-ভাবে উত্তর দিলে, তোমার কি অধিকার আছে সেই বাড়ী হাতছাড়া করবার? কলকাতার সহরে এমন বাড়ী জীবনে কোনদিন করতে পারব?

রেণু কোন উত্তর দেয় নি।

এ বাড়ীতে আমি আর জলগ্রহণ করব না, সমু ক্রুদ্ধকণ্ঠে শাসিয়েছিল।

মা তাতেও নিরুত্তর ছিল।

সমুর শাশুড়ী ক্রুদ্ধকণ্ঠে ফোড়ন দিলে, বল্লে, মনে মনে এই ইচ্ছেই ওঁর ছিল, না হলে দলিলখানা কিছুতেই ছেলের হাতে দিলে না কেন! দলিলটা আমাদের হাতে থাকলে ত আর এই কাণ্ডটি হতে পারত না।

বাচ্ছাটাকে রেণুর কোলের ওপোর জোর করে নামিয়ে দিয়ে সমুর বউ বল্লে, এই অবোধ দুধের ছেলে, আপনার একমাত্র বংশধর। এর মুখের দিকে চেয়েও কি আপনার একটু মায়া হয় না? আপনি এখনও রাজী হোন। বাবা বলছেন, এই সংস্ত মামলাই বাবা সাম্‌লে নেবেন।

যার বাবার বাড়ী তার ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে, এইত? সে আমি পারব না বউমা, রেণু একটি একটি করে কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

রাণী তখন ঐ ঘরেই ছিল। তাকে লক্ষ্য করে সমুর শাশুড়ী বল্লে, শুনলেন ত, শুনলেন ত ওর কথা! এই হোল ওঁর বিচার। নিজে মরবেন, ছেলে নাতিকে মারবেন। এর চেয়ে ওঁর নিজেরই আগে মরা উচিত ছিল।

রেণু বল্লে, ছেলে নিয়ে কবে সেই বিশ-পঁচিশ বছর আগেই ত মরে যেতুম। তখন ত কেউ রক্ষে করতে আসেনি। সেদিন যিনি বাঁচিয়েছিলেন, ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরীতে বসিয়ে চিরকালের মত ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন, সেই তারই ছেলেকে আমি জেনে শুনে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিই কি করে সে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

আমাকে ক্ষমা করুন। কথাগুলো বেয়ানকে লক্ষ্য করে রাণীর দিকে চেয়ে চেয়েই রেণু বলেছিল।

হ্যাঁ, তাঁর ছেলে, তাঁর সেই জোচ্চর ছেলে, যে সেই জাল করিয়ে—রাগের চোটে সমুর শাশুড়ী নিজের কথা শেষ করতে না পেরে গজরাতে লাগল।

যে ছেলে সই জাল করে, তাকে ঘৃণা করার কোন অধিকার কি আছে? আমি যে জোচ্চরের মা, যে জোচ্চর মাকে না জানিয়ে মায়ের টাকা নিয়ে পালায়,—রেণুর কথায় ক্ষোভ এবং উষ্মা দুইই প্রকট।

বেশ করেছে, সমুর শাশুড়ী জোর দিয়ে বলেছিল, বেশ করেছে, না করলে সে টাকাটাও ঐ জোচ্চরের গর্ভে যেত।

রেণু দাঁড়িয়ে উঠল। রাণী বল্লে, আসুন দিদি, আমাদের ঘরে চলুন।

রেণু বল্লে, চল।

সমুর শাশুড়ী বল্লে, তাই যাও। নষ্ট-দুষ্ট মেয়েমানুষ ছেলে নাতিকে চায় না, পরের দোরেই পড়ে থাকতে ভালবাসে।

রেণু শিউরে উঠল। রাণীর পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর সমুর শ্বশুর তার পরিচিত উকীলের সাহায্যে রেণু পাগল এবং তাকে না জানিয়ে অন্যকে দিয়ে জামিন নামায় জাল সই দেওয়া হয়েছে এই মর্মে এক আবেদনও করেছিল। সে সম্বন্ধে কোর্টের তরফ থেকে যথারীতি অনুসন্ধানও হয়েছিল, কিন্তু রেণুর এক কথা, ঐ স্বাক্ষর তারই এবং নানাভাবে জেরা করেও তাকে পাগল প্রমাণ করা গেল না। সমুর শ্বশুর রেণুকে পয়সা খরচ করে পাগলা গারদে পর্য্যন্ত পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুন্সেফ সঞ্জীবের বাধায় সে চেষ্টা সফল হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত রেণুর বাড়ী নিলামে বিক্রী হোল। দাম যা উঠল, তাতে হরকিষণলালের পাওনা কোনমতে ওয়াশীল হয়েছিল। সমুরা সদলবলে শাপ শাপান্ত করতে করতে

কেষ্টনগরে চলে গেল, অথবা যেতে বাধ্য হয়েছিল অনেক কেলেঙ্কারীর পরে। যে দু'মাস ধরে সমুর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এখানেই ছিল, সেই দু'মাস রেণুকে সঞ্জীবরা ওপোরে থাকতে দেয় নি, নিজেদের কাছেই একরকম জোর করে রেখেছিল। সঞ্জীব বলেছিল, ওরা সব করতে পারে, এ অবস্থায় দিদিকে ওদের হাতে ছাড়লে বিপদ হতে পারে। এতে ওরা সঞ্জীবকেও দোষ দিতে ছাড়ে নি, বলেছিল সঞ্জীব মাড়োয়ারীর টাকা খেয়ে এমনটা করছে। সঞ্জীব এ কথা গ্রাহ্যই করে নি। বলেছিল, অলককে আমরা খুব উঁচুদরের লোক বলেই জানতুম, এখন বুঝলুম, এত বড় উঁচু মন সে কোথা থেকে পেয়েছিল।

ঘাড় নেড়ে রেণু বলেছিল, না না, অলক তার বাবার ধাত পেয়েছিল; আমিও একটু আধটু যা কিছু তাঁর কাছেই শুনে শুনে শিখেছিলুম।

কেষ্টনগরে যাবার দুদিন আগে থেকে সমু ও সমুর শ্বশুর রেণুর যা কিছু ছিল সমস্তই বাঁধা-ছাঁদা করতে সুরু করলে। সঞ্জীব বিরক্তি প্রকাশ করায় রেণু বল্লে, না না, ওরা যা নিলে খুসি হয় তাই নিক, কেবল খাটখানা ও জামার আলমারীটা দেব না, ও দুটো এখানেই থাক, অলকের যা হয় একটু গুঁড়ো আছে, সেই নেবে ও দুটো, তবে তার দাদু যদি নেহাতই না নেয়, তা হলে অপুকে বলব, সে যদি নেয়। আর হ্যাঁ,—পাগলের মত রেণু সবেগে ওপোরে দৌড়ে গিয়ে উঠল।

আঁচল থেকে তাড়াতাড়ি চাবি নিয়ে রেণু ওর তোরঙ্গটা খুললে। তখন সেই সকালে সমু ও সমুর শ্বশুর বাড়ী ছিল না, সমুর শাশুড়ীও বোধ হয় বেরিয়েছিল, সমুর বউ ছিল রান্নাঘরে। কাজেই রেণুকে বাধা দেবার কেউ ছিল না।

তোরঙ্গ খুলে তোরঙ্গর তলা থেকে রেণু বার করলে কাগজ ও ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা পুঁটলী এবং তোরঙ্গের অপর কোণ থেকে একটা পুরানো রং-চটা কাঠের সিঁদুর কৌটো। সমুর ছেলে তখন কোন রকমে হাঁটতে শিখেছে। তোরঙ্গর ওপোর হুমড়ী-খাওয়া রেণুর পিঠে হাত দিয়ে সে বোধ হয় ওকেই ডাকছিল, মা-ম্মা ম্মা—

পুঁটলী ও সিঁদুর কৌটো বুকের ভেতর পুরে রেণু ওর নাতির দাড়িতে হাত দিয়ে আদর করলে, চুমু খেলে। ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। নাতিকে কোলে তুলে টিপে ধরে রইল। নাতি রেণুর কোল থেকেই বিকটভাবে কেঁদে উঠল। প্রায় অচেনা এক প্রৌঢ়ার আদরের অত্যাচার শিশু সহ্য করতে পারে নি। সমুর বউ রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, কি রে, কি রে, কি হোল, এই যে আমি আছি ভয় কি—

ঘরে ঢুকেই রেণুকে দেখে বল্লো ও মা, আপনি? আমি ভাবলুম, পড়ে টরে গেল বুঝি। খোলা তোরঙ্গের দিকে চেয়ে বল্লে, কি নিচ্ছেন, আবার কি সব কাকে দাতব্য করবেন—

কিছু নয় মা, এমনি এসেছি, রেণু নাতিকে কোল থেকে নামিয়ে তোরঙ্গর চাবি দিয়ে ঘাড় হেঁট করে তিনতালা থেকে নেমে এল। বউ ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাশুরীকে দেখলে, একটি কথাও বল্লে না।

নীচে এসে দালানের খোলা জানলা ধরে রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে এখন দারুণ সমস্যা।

দামী জিনিষ রেণুর কাছে অনেক কিছু থাকত, সরোজের সমস্তই সরোজ রেণুর জিম্মায় রেখেছিল। আজ আর তার হাতে দামী বলে কোন কিছুই নেই। কেবল ছিল একজোড়া সোনার বালা, যে বালাজোড়া সম্বন্ধে সরোজ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রেণুকে বলেছিল, ঐ বালা আমি রেখেছি অমুর বউকে দেব বলে। ওদের মায়ের গয়না সকলেই কিছু কিছু পেয়েছে, তাই অমুর কাছে যে আসবে তার জন্যও কিছু রাখা দরকার। আমি না থাকলে ওটা তাকেই দিস্—

না-থাকার কথায় রেণু প্রতিবাদ করতে সরোজ বলেছিলো, শোন্ শোন্, রাগ করিস্ পরে, কথাগুলো আগে শুনে রাখ। আমার সামনে অমুর বিয়ে হলে আমিই বউমাকে তার শাশুড়ীর বালা দিয়ে দেখব, না হলে সে কাজটা তুইই করিস্। আর যদি ওর বিয়ে টিয়ে নাই হয়, কিম্বা অজাত-কুজাত বিয়ে করে, তা হলে ঐ বালা আর ওকে দিতে হবে না, তুই যাকে দেওয়া ভাল বলে মনে করবি, তাকেই দিয়ে দিস্, এমন কি কোন গরীবের কন্যাদায় উদ্ধারে দরকার হলে তাকেও দিতে পারিস্।

সেই তখন থেকেই বালা-জোড়া রেণুর বাক্সে রয়েছে। বালার কথা মনে পড়তেই ও ঐর কম পাগলের মত দৌড়ে

গিয়ে ওপোরে উঠেছিল। বালা বার করেও নিয়েছিল, ভেবেছিল ঐ দুটো ও প্রাণ দিয়েও রক্ষে করবে, কিন্তু এখন ওর মনে কেমন যেন ভাবান্তর এসেছে—

অমু কি ফিরবে! সে কি বিয়ে করে সংসারী হবে? তার ফেরার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্ম রেণু স্বেচ্ছায় পথে এসে দাঁড়াল, কিন্তু তাতেও যদি সে না আসে তাহলে? তা ছাড়া সে আসবেই বা কি করে? সে ত জানে যে, সে যা করেছে তাতে তার জেলবাস সুনিশ্চিত। রেণু তাকে খবরই বা দেবে কি ভাবে যে, সে বিপন্মুক্ত। তা হলে সে যদি না আসে, তাহলে ঐ বালা-জোড়া সে কেন তার নাৎবৌকে দিক-না। আহা, ছেলেটা গায়ের ওপর এসে পড়ল, আধো-আধো স্বরে মা মা বলে ওকেই ত ডেকেছিল, যেমন ডাকত সেই সেদিনের অমু ও সমু। রেণু ভাবতে ভাবতে জানলার গরাদ ধরে আকুল হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগল, বাবা আপনি ওপার থেকে বলে দিন, আমি কি করব, আমি কি করব—

এক ছোকরা এসে অলকের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। রেণু জানে, ও হচ্ছে অলকের শ্বশুরের আত্মীয়। প্রতি মাসের গোড়ার দিকে ও আসে অলকের বাড়ীর ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া আদায় কারার জন্ম। অলকের শ্বশুর সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন।

রেণু তাড়াতাড়ি ওপোর থেকে নেমে এসে তাকে ডাকলে। সে রেণুকে চিনত না। সন্দিগ্ধভাবে ওর কাছে এসে বল্লে, আমাকে ডাকছেন?

রেণু বল্লে, হ্যাঁ।

বলুন।

রেণু খাট এবং জালের আলমারীর কথা বল্লে। বল্লে, এ দুটো জিনিষ আমার কাছে এতদিন রয়েছে, কিন্তু এখন আর আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অলকের বউয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কেউ যদি আসে তাহলে ও দুটো জিনিষ আমি তার হাতে দিয়ে দিতে চাই। আর হ্যাঁ, একটা পাথাও আছে, বাক্স তোরঙ্গও কয়েকটা আছে, ওঁদের চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিয়ে দিন। আমি বোধ হয় শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাব।

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। বল্লে, কি বলে ওঁদের লিখব? আপনার নাম কি?

রেণু বল্লে, আমি অলকের দিদি, আমার নাম—

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বল্লে, আপনি কি সেই রেণু?

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সে বল্লে, আমি লিখব। ওঁদের খবর পেলেই আপনাকে এসে জানাব।

সেইদিনই দুপুরে কয়েকটা কুলি এসে রেণুর ঘরে খাট নিয়ে টানাটানি সুরু করলে। সমুর শ্বশুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল।

শব্দ শুনে রেণু এসে ওপোরে উঠল। রেণুর বেয়াই ওকে দেখেও দেখলে না। সমু ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে চলে গেল।

কুলিদের হাতে খাটের চাবি। খাটের বিছানা মেঝেয় টেনে ফেলে তারা চাবি দিয়ে খাট খোলার চেষ্টা সুরু করলে।

রেণু ঘরে ঢুকে কুলিদের বল্লে, খাট খুলছ কেন? তোমরা কারা?

তারা সমুর শ্বশুরের দিকে দেখিয়ে দিলে।

সমুর শ্বশুর কুলিদের নির্দেশ দিলে, দাঁড়িয়ে কেন, খাট খোল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রেণু কুলিদের ধমকে উঠল, খাট আমার, তোমরা খাট খুলবার কে? বেরোও ঘর থেকে।

কুলিদের মধ্যে যেটা ছিল বুড়ো সে বল্লে, মাজী গোঁসা করছেন কেন? এই খাট আলমারী, পাঙখা যো কুছ আছে সবহি হাম কিনে লিয়েছি—

কিনে নিয়েছ? বিক্রী করলে কে?

অমুর শ্বশুরকে দেখিয়ে সেই বুড়ো বল্লে, এহি বাবু—

সবিস্ময়ে রেণু ধমকে উঠল, বিক্রী করেছেন? উনি? কার জিনিষ কে বিক্রী করে? জিনিষ আমার, ওর বিক্রী করার অধিকার কি?

সমুর শ্বশুর পুরাতন ফার্নিচারওয়ালাকে হুকুম দিলে, নিয়ে যান খুলে, কথামত কাজ করুন। বাজে লোকের কথায় সময় নষ্ট করতে হবে না।

জীবনে রেণু যা কোনদিন করে নি, আজ সে তাই করে বসল। বেয়াইকে মুখের ওপোর বলে বসল, চোপরাও, চোর কোথাকার। দিন দুপুরে ডাকাতী করতে লজ্জা হয় না? বেরোও আমার বাড়ী থেকে—

গম্ভীর কণ্ঠে বেয়াই বল্লে বেরুব, জিনিষপত্তরের ব্যবস্থা হলেই বেরুব। শ্লেষ দিয়ে বল্লে, কিন্তু তোমার বাড়ী থেকে বেরুব না, তোমার বিক্রী হয়ে যাওয়া বাড়ী থেকে তুমি আগে বেরুবে, তারপর আমি বেরুব। কুলিদের বল্লে নাও নাও, খুলে নাও, দেরী কোরো না।

দরজার কাছে রাণী এসে দাঁড়িয়েছিল। গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে, সদরে চাবি দিয়ে এসেছি, সব কটাকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব। দিন দুপুরে ডাকাতী?

রাণীর চেহারায় ফানিচারওয়ালা ঘাবড়ে গেল। বল্লে, মায়িজী, হামার কুছ্ কসুর নেই, বাবু হামারে ডাক দিল—

তোমার বাবুকেও দেখবো, চালাকী করার জায়গা পাও নি, মগের মুল্লুক!

কুলীরা ভয়ে জড়সড় হয়ে বুড়ো ফানিচারওয়ালার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ো মিনতির সুরে বল্লে, মায়িজী, হামলোককো ছোড় দিজিযে—

রাণী বল্লে, খাট যেখানে যেমন ভাবে ছিল সেইভাবে সরিয়ে বসাও। ওর ওপোর বিছানা যেমন ছিল সেইভাবে রাখ।

রাণীর সেই তখনকার চেহারাই আলাদা, এমন কি রেণুও ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কুলীরা রাণীর নির্দেশমত কাজে লেগে গেল। সমুর শ্বশুর ঘর থেকে ছাতের দিকে যেখানে সমু ও তার শাশুরী ছিল সেইদিকে যেতেই রাণী রাণীর মত দৃপ্ত কণ্ঠে হুকুম করলে, শুনে যান, পালালে চলবে না।

সমুর শ্বশুরের সামনে রাণী এর আগে কোন দিনই বেরোই নি। সিঁড়িতে দেখা হলেও অনেকটা ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি সরে পড়ত। সেই রাণী ডান হাতের তর্জ্জনী তুলে নির্দেশ দিলে। যদি ভাল চান, তা হলে আপনার লোকজন, মেয়ে জামাই সমস্ত নিয়ে এই মুহূর্তে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। খবরদার, এ-মুখো হবার চেষ্টা করবেন না—

বাড়ী কি তোমার নাকি বাছা, তুমি ত দোতলার ভাড়াটে, তিন তলায় এসেছ কেন? সমুর শাশুরী রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলে। সমু ও সমুর বউ এখনও নেপথ্যে, রান্নাঘরের সামনে ছাতের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। বেলা বারোটা, এখনও ওদের খাওয়া হয়নি!

আপনার সঙ্গে কথাকাটি করতে আসিনি। যদি না যান, থাকুন। আমি সদরে চাবি দিয়ে ওঁকে টেলিফোনে ডাকে পাঠাই, যা বলার ওঁকে বলবেন। রাণী রেণুর হাত ধরে টান্তে টান্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির সামনে এসে গেল।

রাণীর স্বামী যে মুন্সেফ, সেটা সমুর শ্বশুরের জানা ছিল। ফাণিচার বিক্রী যে অন্যায়ভাবেই করছিল, সে জ্ঞান তার সম্যকরূপেই ছিল। ভেবেছিল, ধমক-ধামক দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেবে, কিন্তু এই এক উল্টো ফ্যাসাদে পড়ে সে কি করবে, প্রথমে ঠিক করতে পারেনি। শেষে ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে সিঁড়ির সামনে এসে প্রায় জোড় হাত করেই বল্লে, শুনুন, শুনুন, মানে, মানে এটা একটু বোঝার ভুল হয়েছে—

কথাগুলো ওঁকে বলবেন, আমাকে নয়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর থেকে তালা এনে একতলায় দৌড়ে চলে গেল সিঁড়ির দরজায় তালা দিতে। রেণু দোতলায় সিঁড়ির সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সমুর শ্বশুর রেণুর কাছে এসে বল্লে, বেয়ান, বেয়ান ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন —

ওর কথা শেষ হবার পূর্বেই রাণী সিড়ির দরজায় তালা বন্ধ করে ওপরে এসে রেণুর হাত ধরে বল্লে, চলে আসুন দিদি, উনি আসুন, পুলিশ আসুক, তখন এর ব্যবস্থা হবে।

বুড়ো ফাণিচারওয়ালা রাণীর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল, মায়িজী, মায়িজী, হামকো ছোড় দিজিয়ে। হামি আপনাদের নোকর আছে মায়িজী। হামাকে ডাকিয়ে এনেছে বুড়া বাবু—

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাণী বল্লে, বেশ, তোমাকে আমি ছাড়তে পারি। কিন্তু এক সর্তে। তোমার বুড়া বাবু তার লোকজন জিনিষপত্র সমস্ত নিয়ে যদি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে এই মুহূর্তে চলে যায়, তা হলে তোমাদের সবাইকে ছাড়তে পারি।

একতলার ভাড়াটেদের চাকর এবং তাদের বউ ও গিন্নী সিঁড়ি বেয়ে ওপোরে উঠে এল। বউ বল্লে, ব্যাপার কি রাণীদি, আমাকে ডাকলেন কেন? গিন্নী বল্লেন, কি হোল বউমা, ও রকম করে ডাকলে কেন মা!

রাণী বল্লে, আপনাদের চাকরকে ঐ পাশের বাড়ীতে একবার পাঠান ত, এই নম্বরে আমার নাম করে ওঁকে

টেলিফোন করুক, এক্ষুনি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী আসার জন্য। রাণী রীতিমত হাঁপাচ্ছিল।

অপুর ভাড়া বাড়ীর দোতলা থেকে জানলা খুলে একটি মেয়ে ডাকলে, রাণীদি, কি হয়েছে রাণী দি?

রাণী বল্লে, তোমার জেঠা মশাই আছেন? তাঁকে বল, এ বাড়ীতে কয়েকটা লোক এসে হাঙ্গামা সুরু করছে। রাণী তখন কি যে করছিল, তা যেন তার হুঁসই ছিল।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি জেঠামশাইকে ডাকতে গেল। সমুর শ্বশুর প্রমাদ গনলে। কোর্টে চাকরী করে চুল পাকিয়েছে। এতগুলো সাক্ষী তৈরী হবে বুঝে সে অস্থির হয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাপাতে বুড়ো এসে বল্লে, আমরা, আমরা এখনই চলে যাচ্ছি। আপনি শান্ত হোন্।

অপুদের ভাড়া বাড়ীর দোতলার জানালায় এক প্রৌঢ় মূর্ত্তি দেখা দিল, কি হয়েছে বউমা?

বড় বিপদে পড়েছি, একবার আসুন, জীবনে এই প্রথম রাণী ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কইলে।

যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি। বৃদ্ধ কাছা আঁট্‌তে আঁট্‌তে চটির শব্দ তুলে ওদের বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

ও বাড়ীর এক তলার ছেলের গলা শোনা গেল, ও বাড়ীতে কি হয়েছে জেঠামশাই, যেন গোলমাল শুনতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ বাবা, তুমি এস ত আমার সঙ্গে।

দেখতে দেখতে ছেলেতে বুড়োতে চারজন এ বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত। রাণী একতালার চাকরকে চাবি দিয়ে দরজা খুলতে পাঠিয়ে দিলে।

সমুর শ্বশুর রাণীকে বল্লে মা, মা, আমরা এখনই চলে যাচ্ছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনই যাচ্ছি।

বুড়ো তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মেয়ে জামাইকে বল্লে, নাও, নাও, এখনই চল, আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না—

সমুর শাশুড়ী ওপোর থেকেই বল্লে, কি এমন হয়েছে যে এখনই পালাতে হবে? আমরা কি চোর যে রান্না ভাত ফেলে—

সমুর শ্বশুড় খিঁচিয়ে উঠল। থাম্ মাগি থাম্, চুপ কর্। তোর জন্যই ত যত আপদ। তোর বুদ্ধিতে খাট বিক্রী করতে গিয়ে—হারামজাদী যত নষ্টের মূল—

বাইরের চারজনে দোতলায় এসে উপস্থিত। পেছন পেছন এল সেই মেয়েটি, অপুদের বাড়ী থেকে যে প্রথম রাণীদের খোঁজ নিয়েছিল।

জেঠামশাই রাণীর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বউমা?

রাণী সংক্ষেপে খাট খোলার পরিচয় শেষ করার পূর্বেই সমু, সমুর শ্বশুর, শাশুড়ী এবং ছেলে কোলে সমুর বউ সবাই সিঁড়িতে এসে গেছে। ফার্নিচারওয়ালারা সিঁড়ির মুখের ভিড় ঠেলে নামবার চেষ্টা করতেই বৃদ্ধ ওর দিকে চেয়ে বল্লেন, আরে ব্রিজলাল যে, তা ব্রিজলাল তোমাদের এই কাজ? ঐ গোপালনগরের মোড়ে তোমার দোকান না?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বুড়ো ফার্নিচারওয়ালা বল্লে, জী—

তুমি এই কাজ করছ? তুমি জান এটা কার বাড়ী? উনি হাকিম সাহেবের স্ত্রী সেটা মনে রেখ।

ভীত কণ্ঠে বুড়ো বল্লে, জী।

জী নয়, চালাকী করলে হাকিম সাহেব ধরে ফাটকে পুরবে, পাশের বাড়ীর জেঠামশাই ফার্নিচারওয়ালাকে আরও ভয় পাইয়ে দিলে। রাণীকে বল্লে, তা বউমা তুমি এখন কি করতে চাও, থানায় খবর দেব?

রাণী বল্লে, দিতে হয় দিন, না হয় ত আমি বলছিলুম, ওরা ওদের জিনিষ নিয়ে নিঃশব্দে চলে যান।

তাই ত যাচ্ছি, তাই যাব বলেই বেরিয়ে এসেছি, সমুর শ্বশুর নিজেদের সুটকেসটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লে।

বৃদ্ধ বল্লেন, ছি ছি ছি, আপনি একটা প্রবীণ লোক,—আপনার এই প্রবৃত্তি, ছিঃ—

জেঠামশাইয়ের সঙ্গে যে ছোকরা এসেছিল সে বল্লে, কষে ধোলাই দিলে তবে এরা সায়েস্তা হয়। যত সব চোর, জোচ্চোর, বদমায়েস—। ছেলেটার হাত যেন নিস্‌পিস্ করছিল। বাকী ছেলেদুটো নীরবে অপেক্ষা করছিল, ক্লাবের ডাম্বল ভাঁজা ছেলে, জেঠামশাইয়ের হুকুমের অপেক্ষা মাত্র।

জেঠামশাই বল্লেন, যান ভালোয় ভালোয় নেমে যান,—আর কখনোও এ মুখো হবেন না। ছেলেদের দিকে চেয়ে বল্লেন, সরে দাঁড়াও ওদের পথ দাও।

কাঁদো কাঁদো গলায় সমুর শ্বশুর বল্লে, যাচ্ছি ত। আপনারা বরং দেখে নিন আপনাদের কোন জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি না, এ সবই আমাদের, আমরা এনেছিলুম—

জেঠামশাই রাণীর দিকে চেয়ে বল্লেন, বউমা—

রাণী বল্লে যেতে দিন, ঐ পাপ যত শিগ্‌গির বিদেয় হয় ততই ভালো।

রেণু চুপ করে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিল, একটি কথাও বলে নি। ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রাণীর ছেলেটা। এতদিন রাণীদের ঘরে থাকার ফলে রাণীর ছেলে নিজের মায়ের চেয়ে রেণুকেই যেন বেশী করে ভালবেসে ফেলেছিল। বিশেষতঃ এখন তার মায়ের যে মার মূর্তি। খোকাটা রীতিমত ভয়ই পেয়েছিল।

সমুরা সকলে এবং ফার্নিচারওয়ালারা নেমে যাবার পর জেঠামশাই বল্লেন, এবার আসি বউমা?

মাথায় কাপড় টেনে রাণী বল্লে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম, এই দুপুর বেলা—

না না, এ আর কষ্ট কি, এ আর কষ্ট কি! বৃদ্ধ ছোকরাদের লক্ষ্য করে বল্লেন, চল, চল সব, ওঁরা এখন বিশ্রাম করুন। বৃদ্ধ সরকারী অফিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এখনও এই বৃদ্ধবয়সেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলেন না।

বৃদ্ধের ভাইঝি বল্লে, আমি একটু পরে যাব জেঠামশাই।

একতোলার গিন্নি বল্লেন, ওপরে উঠে একবার দেখে নাও, সব ঠিক আছে কিনা।

ওরা সকলেই তিনতলায় গিয়ে উঠেছিল।

রেণুর জিনিষপত্র যেমন ছিল সবই ঠিক আছে বরঞ্চ ওদেরই একখানা গামছা, কলতলায় সমুর শ্বাশুড়ীর ভিজে কাপড়, খোকার জুতো এই রকম কয়েকটা জিনিষ পড়েছিল। আর ছিল রান্নাঘরের বড় হাঁড়িতে এক হাঁড়ি গরম ভাত, ডাল, তরকারী এবং নুন হলুদ মাখানো মাছ। উনানে আগুন তখনো গন গন করছে।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে রেণুর চোখে জল এসে গেল। একতালার গিন্নীর একটিও দাঁত ছিল না। ফোগ্‌লা মুখে তিনি বল্লেন, দুঃখও হয়, হাসি পায়। তৈরী ভাত ফেলে বামুনবাড়ী থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হোল, বেয়াই আমার মনই গুণের গুণনিধি!

বিকেলে এসে সব শুনে সঞ্জীব বলেছিল, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। তুমি যে বুদ্ধি করে ওদের তাড়িয়েছ এতে আমি তোমার তারিফ না করে পারছি না। কিন্তু দিদি কিছু মনে করেন নি ত? হাজার হোক, নিজের ছেলে, বউ, নাতি—

রাণী বলেছিল, না, দিদি কিছু বলেন নি।

সঞ্জীব খোঁজ নিলে, দিদি কোথায়?

ওপরে। উনি দুপুর থেকে আর নামেন নি।

খোকার হাত ধরে সঞ্জীব তিনতলায় উঠে এল। ঘর খোলা, অন্ধকার। দরজায় দাঁড়িয়ে সঞ্জীব ডাক দিলে, দিদি—

ছাতের ওধার থেকে রেণু সাড়া দিলে। তারপর ঘরে এসে আলো জেলে বল্লে, আসুন।

সঞ্জীব বললে, না, আমার কোন দরকার নেই। সব কথা শুনলুম, তাই ভাবলুম, কি করছেন একবার দেখে আসি।

খোকা এসে রেণুর হাত ধরলে। পিসিমা, আমাদের ঘরে যাবে না?

যাব বইকি বাবা, রেণু ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব আছে? সঞ্জীব প্রশ্ন করলে।

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সঞ্জীব বললে, আজ কোথায় থাকবেন? এখানে, না—আমাদের দোতলায়?

এখানেই থাকব।

সঞ্জীব বললে, আজকেও আমাদের ওখানেই থাকুন না। কাল থেকে না-হয়—

রেণু বললে, আচ্ছা।

রেণুর বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। ঠিক যে কোন তারিখে নিলেম হয়েছিল রেণু তা জানে না, কেউ তাকে বলেও নি। রেণু টের পেলে সেইদিন, যেদিন ওরা এসেছিল দখল নিতে।

রেণু অত্যন্ত শান্তভাবে ওদের কথামত যেখানে যা সই দেবার দিলে। বল্লে, তিনতলার ঐ একখানা ঘরই মাত্র আমার দখলে আছে, ঐ ঘরের দখলই আপনাদের দিতে পারি, কিন্তু ও ঘরের জিনিষপত্র কোথায় রাখব এখনও ঠিক হয় নি। যদি কিছুদিন সময় দেন।

সেদিন সঞ্জীবও উপস্থিত ছিল। নতুন বাড়ীওয়ালার নোটীশ সই দিয়ে নিয়ে সঞ্জীব নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, যাঁর বাড়ী আপনারা কিনলেন তিনি মানুষের আকারে দেবী। তাঁর কথার কখনও নড়-চড় হবে না, আমার অনুরোধ, ঐ ঘরখানায় ওঁকে আরও একমাস থাকতে দিন।

তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একমাস সময় দিয়ে সেই মর্মে লিখিয়ে নিয়ে গেল।

এর ক'দিন পরেই অলকের শ্বশুর নিজে এসে উপস্থিত হলেন। বিশেষ কোন কথা তিনি বললেন না। লোক ডেকে খাট খুলিয়ে পাখা নামিয়ে সব ব্যবস্থা করে নিয়ে গেলেন। জালের আলমারীটা নিতে চাইলেন না। রেণু অনুরোধ করে আলমারীর ইতিহাস বলা সত্বেও তিনি ওটা নিতে রাজী হলেন না। শুধু বললেন, ঠিক আছে।

খালি ঘরে পড়ে রইল রেণুর সেই তোরঙ্গ আর একটা বিছানা। সেই তোরঙ্গ, সেই শ্রীপতির জিনিষ, যেটা সম্বল করে গরুর গাড়ীতে তিন মাসের সমুকে বুকের মধ্যে চেপে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তরুণী রেণু অজানা মুন্সেফ-বাড়ী ঝিয়ের চাকরী নিয়ে এসেছিল। তোরঙ্গটা সরোজ এ বাড়ীতে এসে নিজের তোরঙ্গের সঙ্গে একই সঙ্গে মেরামত এবং রং করিয়েছিল, তাই ওটার এখনও বেশ শ্রী-ছাঁদ আছে।

ওরা চলে যাবার পর রেণু ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ঘর, যে ঘরে সরোজ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ঘর খালি, কেবল ছিল ঐ তোরঙ্গ, সরোজের তোরঙ্গ অলকের শ্বশুর নিয়ে গেছে। আর মেঝেয় পড়েছিল কতকগুলো বিছানা, এবং একপাশে দাঁড়িয়েছিল নড়বড়ে জাল-ছেঁড়া আলমারী। এ বাড়ীতে আসার পর পুরণো জিনিষ সমস্তই মেরামত করা, রং করা হয়েছিল কেবল ঐ জালের আলমারীতে কিচ্ছু করা হয় নি। সরোজ বলেছিল, ওটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। এর কারণ সরোজ কিছুই বলে নি, সে কি ভেবেছিল, ঐ আলমারীতে ওর স্ত্রীর যে পবিত্র স্পর্শটুকু লেগে আছে, রং করা হলে সেটা নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। কে জানে, তার কথা সে ছাড়া আর কে জানবে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেণুর একটা নিঃশ্বাস পড়ল। বুক খালি-করা দীর্ঘশ্বাস। কবে যেন কোথায় একটা গান শুনেছিল তারই দুটো কলি ওর হঠাৎ আজ মনে পড়ল। 'আজি মোর শূন্য ডালা, কি দিয়ে গাঁথব মালা, কেন এ নিঠুর খেলা, খেলিলে আমার সনে'।

রেণু জানে, এই ঘরও ওর থাকবে না। থাকবে না কি, নেই-ই ত। এখন যা আছে, এ-ত ভিক্ষের দান, যিনি কিনেছেন তিনি এক মাসের জন্য ভিক্ষে দিয়েছেন মাত্র। সেই এক মাসের বোধ হয় আর দিন পনেরো বাকী আছে।

রেণু গিয়ে জালের আলমারীর কাছে দাঁড়াল। সে যেন মনে মনেই কথা কইতে লাগল। আলমারীর দরজায় হাত দিয়ে সে যেন মনে মনেই বল্লে, তোমার জিনিষ কোথায় রাখব মা, কেউ যে নিলে না। আমি রাখতুম, তোমায় আমি রাখতুম মা কিন্তু আমার নিজেরই যে থাকার কোন জায়গা নেই, কি করব, কোথায় যাব, কিছুই জানি না। কথা কইতে সরলা ও আলমারী মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। আলমারী সরলার সরলাই আলমারী। এ যেন রিক্ত রেণু ও পরিত্যক্ত আলমারীর নিভৃত আলাপ।

হঠাৎ হাওয়া এল। দুটো জানালা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। রেণু চমকে উঠল। এ ঘরে আজ সে এতদিন বাস করছে। হাওয়ায় জানলা এর পূর্বে অনেকবারই বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই আওয়াজ ও আজকের এই আওয়াজে কত তফাৎ। আজকের আওয়াজটা কি ভীষণ ফাঁকা, যেন বুক ফাটা আর্তনাদ! ফাঁকা ঘরে জানলা পড়ার শব্দ যে জিনিষ ভর্তি ঘরের শব্দের তুলনায় অনেক বেশী ফাঁকা হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্যটা রেণুর জানা থাকলে হয়ত তার মনে এ ভাবে দোলা লাগত না।

সেই জালের আলমারীর গতিও হোল। সব শুনে এক তলার গিন্নি বল্লে, ভাগ্যিমানীর সখের জিনিষ গো, এ কি ফেলতে আছে। ওটা তুমি আমায় দিও বাপু ও আমি নেব। তার পুত্রবধূ হয়ত ওটা পছন্দ করে নি, কিন্তু শাশুড়ীর কথায় বাধা দেবার শিক্ষাও সে মেয়েটির ছিল না।

কিন্তু রেণুর গতি কি হবে? সে থাকবে কোথায়?

সঞ্জীব বল্লে, দিদি, আপনি অলকের দিদি হয়ে এতটা কাল কাটালেন এবার আমার দিদি হয়ে বাকী জীবন এখানেই থাকুন।

রেণু ঘাড় নাড়লে, না আর কারুর দিদি হবার সাধ আমার নেই।

কিন্তু আপনি না থাকলে খোকাটার কি হবে? ও যে আপনাকে এক মিনিট ছাড়তে চায় না। সঞ্জীব যখন কথা বলছিল সেই তখনও খোকা ছিল রেণুর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

রেণু ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, ছোট ছেলে আর মানুষ আমি করব না। আমার হাতে ছেলে মানুষ হয় না। 'মানুষ' শব্দটার ওপর রেণু জোর দিয়েছিল।

রাণী বল্লে, আমাদের ওপর রাগ করছেন কেন দিদি, আমরা আপনার কি করলুম?

ম্লান হেসে রেণু বল্লে, তোমাদের ওপর রাগ করব কেন ভাই, তোমরা ছাড়া এখন আর কে আছে আমার? রাগ আমি কারুর ওপরে করছি না।

তবে থাকবেন না কেন আমাদের কাছে?

আমি আর কারুর মায়ায় জড়াতে চাই না। কোন বাড়ীতে আর আমার থাকার ইচ্ছে নেই। না হলে অপু ত আমায় দুখানা চিঠি দিয়েছিল, তাকেও লিখে দিয়েছি ঐ বলে। সে রাগ করে দুঃখ করে আবার লিখেছে—

তা হলে কোথায় থাকবেন? থাকতে তো কোথাও হবে, সঞ্জীব প্রশ্ন করলে।

আমার ইচ্ছে, কোন তীর্থে গিয়ে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেব, রেণু ধীরে ধীরে উত্তর দিলে।

খাবেন কি, কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সঞ্জীব মুখ ফুটে প্রশ্নটা করতে পারে নি।

দুদিন পরে মাস কাবার হোল। সঞ্জীব বল্লে, দিদি, আপনার টাকাটা—

কিসের টাকা?

ভাড়ার।

ভাড়া? ভাড়ার টাকা এখন কি আর আমি পাব? আর ত বাড়ী আমার নয়।

সঞ্জীব বল্লে গেল মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত বাড়ী আপনারই ছিল। ঐ দিন পর্যন্ত ভাড়া আপনি নেবেন, তের তারিখ থেকে যিনি বাড়ী কিনেছেন তাঁর পাওনা।

রেণু বল্লে, দিন। তার মনে হোল টাকাটাই বাবার শেষ দান এই টাকাটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেণুকে অভাব দুঃখের হাত থেকে চিরদিনের মত রক্ষা করার জন্য সরোজের যে একান্ত প্রয়াস ছিল, সেই অকপট চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দুদিন পরেই রেণু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ ভাবে আর কতদিন থাকব? নিজের বাড়ীতে পরের অন্নদাস হয়ে— রাণীকে বল্লে, এবার আমায় বিদায় দাও বোন্, আর কেন?

বাড়ী যারা কিনেছিলেন, তারা ঠিক এক মাসের পরেই তিনতালার ঘরখানা দখল নিয়ে তালা বন্ধ করে গেছে। সেদিন থেকেই রেণু দু-তলায় সঞ্জীবদের ঘরে ছিল।

রাণী বল্লে, 'যাবেন? কিন্তু ছাড়তে যে মন চায় না। কোথায় যাবেন?

রেণু কদিন ধরে সেই কথাই ভেবেছে। ওর মনে পড়ছে সরোজের কথা। সেই যেদিন সরোজ অমুর জন্য সখেদে বলেছিল, চাকরি ছেড়ে, ঘর বাড়ী ছেড়ে, সব ফেলে কাশী যাব, সেই সেদিনের কথা। ও মনে মনে ঠিক করেছিল, কাশীতেই যাবে। সেখানে সব অন্নসত্র আছে বলেও শুনেছিল। সেই রকম একটা জায়গায় একবেলা খেয়ে বাকি সময় বিশ্বনাথের মন্দিরের চত্বরে কিম্বা অন্য কোন মন্দিরে পড়ে থাকবে এই কথাই ও ভেবেছিল। মুখ ফুটে বল্লে, কাশী যেতে ইচ্ছে করছে, কাশীতেই যাব।

রাণী হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বল্লে, যাবেন? কাশী যাবেন? তা'হলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার মামা মামী সেখানে থাকেন। দুজনেই খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। দেখাশুনা করবে কেউ নেই। তা'হলে তাদের আমি চিঠি লিখি। আপনি তাদের কাছে সেইখানে থাকবেন।

আবার একজনের ঘাড়ে! রেণু প্রথমটা দমে গেল। তারপর ভাবলে নতুন জায়গা, অজানা জায়গা, প্রথমে একটা স্থান ত চাই। ঠিক আছে, প্রথমে সেইখানে গিয়েই ওঠা যাবে। রেণু রাজী হয়ে গেল।

রাণী তার মামাকে অনেক দিন পরে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলে। রেণুর সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখে সেই দিনেই চিঠি ডাকে দিলে। সঞ্জীবকে বল্লে, কলকাতায় মামাতো ভাইকে বলে রেণুর যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। মামাতো ভাইরা মাঝে মাঝেই কাশী যায়, ওদের অন্যান্য লোকও যায়। সেই তাদের সঙ্গে যদি পাঠানো যায়। রেণুর মামাতো ভাই থাকে শ্যামবাজারে।

পরের দিনই সঞ্জিব মামাতো শালার অফিসে টেলিফোন করেছিল। সব শুনে সে খুসি হয়ে বল্লে, খুব ভালো হয়, এ রকম বিশ্বাসী লোক পেলে, বাবা-মার সত্যি খুব উপকার হবে। কিন্তু সে কবে যেতে পারবে? আমার ছোট ভাই কালই বিকেলের ট্রেনে কাশী যাবে। কাল তাকে পাঠাতে পারবেন?

সঞ্জীব চট করে অফিস থেকে কোন উত্তর দিতে পারেনি। বলেছিল, বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখি, তুমি কাল সকালে খবর নিও। আমার পাশের বাড়ীতে এত নম্বর ফোনে যদি ডাকো কাল সকালে, তা'হলে আমি পাকা কথা দিতে পাবব।

কিন্তু মামাতো শালা আর ফোন করেনি। ছোট ভাইকে একেবরে পাঠিয়ে দিয়েছিল চেৎলায়। সেই ছোট ভাই, যে ওই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কাশী যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল।

রেণু রাজী হয়ে গেল। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর বারান্দায় জানলা ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশাপাশি চারখানা বাড়ী। সরোজের বুকের রক্ত জল করা জিনিষ। এক একটা ছাত যখন ঢালাই হোত, সেই সব দিনে সরোজের খাওয়াই হয়ত হোত না। কোন কোন বার রাত পর্যন্ত হ্যারিকেন জেলে ঢালাই হোত, তার পর সরোজ এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ত। বারান্দার এইখানে দাঁড়ালে তিনখানা বাড়ীই এক সঙ্গে দেখা যায়। রেণু যেন আজকেও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, লম্বা লম্বা বাঁশের ভারা-বাঁধা ইট বার করা বাড়ী, দশ পনের জন লোক কাজ করছে, আর তাদের ভেতরে ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাতা হাতে শীর্ণ দেহী সরোজ। কখনও ছাতাটি খুলে মাথায় দিত, কখনও ছাতা মুড়ে সেই ছাতায় ভর দিয়ে ক্লান্ত দেহে বৃদ্ধ সরোজ দাঁড়িয়ে থাকত। কোন কোন দিন ছোট্ট শিশুর মত উজ্জ্বল হয়ে রেণুর সঙ্গে গল্প করত, আবার বেশীর ভাগ দিন দৈহিক অবসাদে নীরবে শুয়ে পড়ত।

রেণু বলত, বাবা, মিস্ত্রিরা কাজ করছে করুক না, ওদের সঙ্গে অত লেগে থাকার দরকার কি?

সরোজ বলত, হুঁ। জানিস না ত। এত লেগে থাকি তাতেও ফাঁকি দেয়, কাজ খারাপ করে, না থাকলে যা করবে তাতে বাড়ী আর দুদিনও ভোগ করতে হবে না। ফেটে ফুটে ভেঙ্গে চুরে দুদিনেই ঝরে পড়বে।

জানলার শিক্ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেণু ভাবলে, সেই ভোগ আর হোল না। তার এবং অমুর বাড়ীই রইল না, অলক নিজেই চলে গেল; বাকী অপু। তা সে তার নিজের বাড়ীতে এক রাত্তিরও থাকে নি। রেণু ভাবলে, সেই ভাল; না থেকেও যদি ভোগ করতে পারে তবে তাই করুক। এই অভিশপ্ত বাড়ীতে এসে আর বিপদে পড়ার দরকার নেই।

কিন্তু তবুও কি মায়া কাটানো যায়! এক একখানি ইঁট যে এক একখানি শিরা! এই যে হাজার হাজার ইঁট দিয়ে, না, না, রেণু এর হিসেবপত্র সবই জানে। চারখানা বাড়ীতে দেড় লক্ষ ইঁট লেগেছিল, এই দেড় লক্ষ শিরার বাঁধন সে কাটাবে কি করে! লোকে বলতে পারে বাড়ী কি তার? না, নিশ্চয়ই তার নয়, এখন ত নয়ই, কিন্তু যদি নিজেরই হোত, তা হলেও ত এর চেয়ে বেশী করে সে এই বাড়ীগুলোকে ভালবাসতে পারত না। এ বাড়ী ত নির্জীব নিষ্প্রাণ বাড়ী নয়, এর মধ্যে সরোজের বুকের স্পন্দন যে এখনও শোনা যায়। কিন্তু মায়া কাটাতেই হবে। যেমন করে মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা দেহের মায়া, সংসারের মায়া, সকলকে সব মায়া কাটিয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত অবস্থায় নিঃশব্দে সরে যেতে বাধ্য হয়, ঠিক তেমনই ভাবে রেণুকে সরে যেতে হবে; বাড়ী ছেড়ে। চেৎলা ছেড়ে। কলকাতা ছেড়ে, এমন কি বাংলা মুল্লুক ছেড়ে সে চলে যাবে। সেই ভালো, সে আর আসবে না; আসবে না এই দেশে যেখানে ছেলে মানুষ হয় না। মানুষ হলে বাঁচে না, আত্মীয়রা পয়সার লোভে দস্যু হয়, যে দরকারী সে চলে যায়, যে অদরকারী,—যম তাকে ভুলে থাকে! জানলার রেলিং ছেড়ে রেণু তার তোরঙ্গ খুলে বসল।

সেই তোরঙ্গ, সেই শ্রীপতির ফেলে-যাওয়া জিনিষ। আরও একটা রেণু পেয়েছিল তার বিয়ের সময় যেটা লক্ষ্মীর মাকে দিয়ে এসেছিল। তোরঙ্গটা পুরানো হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের আগের জিনিষ। সরোজ বলেছিল, ভাল বিলাতী জিনিষ এখানকার মত পাতলা টিনের তৈরী নয়। এখন এই তোরঙ্গ নিয়ে কোথায় যাবে সে। রেণু ভাবলে, তোরঙ্গটায়

সমস্ত জিনিষ পুরে রাণীদের ভাঁড়ার ঘরে রেখে গেলে হয়। কিন্তু কার জন্যেই বা রাখবে, কেনই বা রাখবে, সে কি আবার ফিরে আসবে না-কি? এত দুঃখেও রেণুর হাসি পায়। এখনও কি তার আশা আছে ফিরে আসার!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই সে করেছিল। রাণীকে বলতে সে বল্লে নিশ্চয়ই দিদি। আপনার যখন ইচ্ছা হবে তখনই চলে আসবেন। এ আপনার ভাইয়ের বাড়ী। মনে রাখবেন, এখানে আপনার পুরো অধিকার রইল।

রেণুর মনে পড়ল সরোজের কথা। সরোজ বলেছিল, অলক অপুর যে অধিকার, তোরও সেই অধিকার। আজ থেকে তুই আমার মেয়ে। কথাগুলো সরোজ বলেছিল সেই সে দিনে, যে দিনে, সরোজের সাময়িক মোহভঙ্গ হয়েছিল। রেণু ঠিক বোঝে না, সে কী এমন কথা বলেছিল, যাতে সরোজের মত লোকের মোহভঙ্গ হতে পারে। তাঁর দুর্বলতা তিনি নিজের জোরেই কাটিয়ে উঠেছিলেন, তিনি ত—এখনকার মত হাল্কা লোক ছিলেন না, কিন্তু নাম পেয়েছিল রেণু, অবশ্য সরোজের কাছে, কারণ এ খবর ত তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউই জানে না।

রেণু বল্লে, রাণী, আমার একটা কাজ করবে ভাই।

রাণী বল্লে, নিশ্চয়ই। কি করতে হবে বলুন।

কাগজের মোড়া খুলে বালা জোড়া রাণীর দিকে এগিয়ে ধরে রেণু বলেছিল সরোজের নির্দেশ। তারপর বল্লে, আমি ভাই কোথায় থাকি কোথায় যাই তার ঠিক নেই তাঁর শেষ ইচ্ছাটা তুমি পূরণ করার ভার নাও।

রাণী বল্লে, দিদি, এ ভার নেওয়া বড় শক্ত। ঠাকুরপো কবে ফিরবে, ফিরলেও আমাদের সঙ্গে কখনও দেখা হবে কি না—

রেণু বল্লে, চ' পাঁচ বছর দেখবে, তারপর যাকে দেওয়া উচিত বলে মনে করবে, তাকে দিয়ে দেবে।

রাণী বল্লে, দিদি, আমি বলছিলুম, কি, এটা আপনার কাছেই থাক। বিদেশে যাচ্ছেন, দায়-অদায় আছে ভগবান না করুন, কখনও যদি অভাবে পড়েন—

জিভ কেটে রেণু বল্লে, সেইজন্যই ত কাছে, রাখতে চাই না বোন্, নিজের লোভ আছে, আবার চুরিও ত হয়ে যেতে পারে।

আপনার লোভ? হু; আর যে বলে বলুক, আমি তা ভাবিতেও পারি না।

রেণু যেন কুঁকড়ে গেল। সে ত জানে, সে এই বালা জোড়া মনে মনে তার নাৎবৌকে দেবার কথা ভেবেছিল!

শেষ পর্যন্ত রাণীকে বালা জোড়া নিতেই হোল।

সঞ্জীব আজ সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরেছিল। সে জানত, রেণু বেলা তিনটে নাগাদ এখান থেকে রওনা দেবে, না হলে শ্যামবাজারে গিয়ে সেখান থেকে আবার সন্ধ্যার সময় হাওড়া যাওয়া হয়ে উঠবে না। ওরা ত বাসে বাসেই যাবে, কাজেই সময় থাকতে যাওয়া দরকার।

সঞ্জীব বল্লে, দিদি আপনার ব্যাঙ্ক পোষ্ট অফিসের বইয়ে কি রইল?

সামান্যই আছে, খুব সামান্য। ব্যাঙ্কে সাতাশ টাকা আর পোষ্ট অফিসে বোধ হয় যেন পনর টাকা।

তা বইগুলো সঙ্গে নিচ্ছেন ত?

নেব?

নেবেন না? এখানে ফেলে রেখে কি লাভ। আমার মনে হয় ব্যাঙ্কের টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে ওখানকার পোষ্ট অফিসে যে বই বদল হয়ে যাবে সেই বইয়ে জমা করিয়ে নেবেন। মিছামিছে দুটো বই রেখে আর কি লাভ হবে?

দিদি নেবেন কি করে, তুমি করে দিলে না কেন? রাণী স্বামীর ওপরে অনুযোগ করলে।

সঞ্জীব বল্লে, দিদি তোমার মত নন, নিজেই তিনি সব করে নিতে পারবেন।

হ্যাঁ দিদি, তুমি এ-সব ইংরাজী চিঠিপত্র লিখতে পার? রাণী প্রশ্ন করলে।

নীরবতার ভেতর দিয়েই রেণু বোধ হয় উত্তর দিয়েছিল।

সব কাজ চুকিয়ে রেণু ধীর পায়ে ওপরে তিনতালায় গিয়ে উঠেছিল, তখন আর সময় নেই, তবুও সে গেল, গিয়ে আর দেখবে কি? এ বাড়ী যারা কিনেছে তারা সেই ঘরে তালা লাগিয়ে রেখে গিয়েছে। কিন্তু তালা দিয়ে কাঠের দরজাই বন্ধ রাখা যায়, ঘরের মধ্যে যে সত্তা বাস করে তাকে বন্ধ করার কোন ক্ষমতা কারুরই নেই। এই ঘরের দেওয়ালে সরোজের বহু অস্তিত্ব, বহু স্বাক্ষর যে এখনও বর্তমান। তালা লাগানো দরজায় মাথা ঠেকিয়ে রেণু বল্লেন বাবা, আমি

চল্লুম। আপনার দান আপনারই ছেলের কল্যাণে দিয়ে গেলুম। পারলুম না আমি এখানে বাস করে আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলুম না, ক্ষমা করবেন বাবা, রেণু দরজায় মাথা ঠেকিয়ে চোখের জলে সমস্ত ঝাপসা দেখতে লাগল।

নীচে থেকে ওরা ডাকাডাকি সুরু করেছে। রেণু ওপর থেকে নেমে এল। বেরোবার সময় একবার সে গিয়েছিল একতলায়। গিন্নীকে নমস্কার করে এদিক ওদিক সতৃষ্ণ নয়নে দেখেছিল যদি সেই জালের আলমারীটা দেখতে পায়। কিন্তু পায় নি। সে যেন উদ্দেশ্যে জালের আলমারীর কাছে বিদায় নিলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রাণী ও তার ছেলে। ছেলেটা তখন থেকেই রেণুর কাছে ছিল এখন বল্লে পিসিমা আবার কবে আসবে?

রেণু তাকে আদর করে বলেছিল কোথায় আর যাব রে এইখানেই ত রইলুম।

সে স্ফূর্তি করে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। পিসিমা কোথাও যাবে না রে এইখানেই থাকবে।

রাণী হেঁট হয়ে রেণুকে প্রনাম করে পায়ের ধূলো নিয়েছিল। রেণু থাক থাক বোন বলে রাণীকে বুকের মধ্যে টেনে জড়িয়ে ধরতেই খোকা মায়ের দেখা দেখি টুক করে রেণুর পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত নিজের মাথায় ঠেকাল। রেণু খোকাকে টেনে কোলে তুলে চুমু খেয়ে আদর করতে গিয়ে অঝোর ধারে কেঁদে ফেলে। সঞ্জীব ও সঞ্জীবের কনিষ্ঠ শ্যালক ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদায় দৃশ্য দেখছিল।

পরের দিন বেলা ন'টা নাগাদ সঞ্জীবের শালা বীরেন ওরফে বীরু রেণুকে নিয়ে কাশীতে ওর বাবার বাড়ীতে উপস্থিত হোল। ওদের পেছন পেছন একটা মুটে বাক্স বিছানা মাথায় নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল। বাক্সটা রেণু রানীর কাছে রাখবে বলে স্থির করেছিল, কিন্তু সঞ্জীব জোর করে রেণুর সঙ্গে পাঠিয়েছিল, বলেছিল বিদেশে ওটা নিশ্চয়ই দরকার হবে।

বীরুর বাবা স্থবির হয়ে পড়েছেন। বাড়ীর চলন-কক্ষের পাশের রোয়াকে বসে তামাক খাচ্ছিলেন এবং বীরুর মা একখানি গামছা পরে ও আর একখানি গামছা বুকে দিয়ে কুঁজো অবস্থায় ছোট বালতী থেকে জল নিয়ে চারিদিকে ছড়াচ্ছিলেন। একতোলা ছোট বাড়ী, চারিদিক ভিজে স্যাঁতসেঁতে, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ছোট এক চিলতে উঠোনের কোনে আঁস্তাকুড়। ছোট বড় মাছি, পিপড়ে এবং আরশোলার মেলা বসেছে সেখানে। আর কোন লোক সেখানে ছিল না।

বীরু বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মায়ের দিকে হাত এগুতেই মা কোনমতে সোজা হয়ে দাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বয়সের ভারে কুঁজো শরীর পুরো সোজা হল হল না। থাক্ থাক্ বলে বীরুকে বাধা দিয়েই দেখলেন, রেণু বীরুর বাবার পায়ে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করছে। বীরুর মা বললেন, ও,—ঐ মেয়েটি কে?

বীরু বললে, ঐ ত দিদি। রাণীদি ওর সম্বন্ধে তোমাদের চিঠি দিয়েছে—না?

রেণু এগিয়ে গেল বীরুর মাকে প্রণাম করতে।

ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধা পেছিয়ে গেলেন। বললেন, থাক্ থাক্ বাছা, আমাকে নমস্কার করতে হবে না, আমি—বীরুর দিকে চেয়ে বললেন, আমার চিঠি তোরা পাস্ নি? তোর দাদাকে আমি খামে চিঠি দিয়েছি, রাণীকেও পোষ্ট কার্ড দিয়েছি, কেউ কোন চিঠি পাস নি?

কই, না। আমি ত এরকম কোন চিঠির কথা শুনি নি, বীরু উত্তর দিলে।

তা চিঠি না পেয়েই দুম্ করে একজনকে এনে বস্‌লি?

মুটে বললে, বাবু, সামান্ কাঁহাপর ছোড়্‌না?

বীরু বললে, এই যে এই ঘরে নিয়ে এস। বীরু মায়ের ঘরের দিকে মুটেকে নিয়ে যাবার উপক্রম করলে।

মা বললেন, হ্যাঁরে বীরু, ওসব কার জিনিষ? ও বাক্স কি তুই এনেছিস?

বীরু বললে, না, ও সব দিদির জিনিষ, ওগুলো কোন ঘরে রাখব মা?

মা গম্ভীর ভাবে বললেন, ও সব আর ঘরে ঢোকাতে হবে না বীরু, ঐ বাইরেই রাখ।

রেণু মনে মনে প্রমাদ গণলে। কথাবার্তা বড়ই বেসুরো।

মুটে সেইখানেই মাল নামালে, সেই ভিজে মেঝের ওপর। বাক্সটা পেতে তার ওপর বিছানা ফেললে, তার ওপর পুটলীটা। বললে, পয়সা দিজিয়ে।

বীরু ওর হাতে একটা আনি দিতেই সে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে চলে গেল। ষ্টেশন থেকে গলির মুখ পর্য্যন্ত ওরা এসেছিল এক্কায়, সেখান থেকে এই সামান্য পথ কুলি বোঝাটা নিয়ে এসেছিল। এক আনাই তার প্রাপ্য।

মুখ থেকে হুঁকা নামিয়ে বাবা বললেন, আয় বোস, দাদা বউদি সব ভাল আছে ত? বাচ্চারা? কাল রেলে কোন কষ্ট হয় নি?

বীরু বলল, না, সংক্ষেপে উত্তর দিলে, সব ভাল।

বীরুর মা এগিয়ে এসে বললে, এখন কি করবে গো? এই যে এক জঞ্জাল এসে ঘাড়ে পড়তে চাইছে, একে নিয়ে কি হবে?

বীরু বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে, কি সব যা-তা বলছ তুমি মা, দিদির মত লোক হয় না, আমিও দেখছি, আর রাণীদি, দাদাবাবু সকলেই ওর প্রশংসায়—

তুই থাম বাপু! রাণীর কথা আর বলিস্ নি। চারপাতা জোড়া এক চিঠি সে লিখেছে। সারা দিন ধরে উনি পড়েছেন আর আমি শুনেছি। জানতে আমার কিছুই বাকী নেই। আমি কিন্তু সাফ্ কথা বলে দিচ্ছি, বিষয়, আশয়, সংসার, সব ছেড়ে আমরা এই তীর্থস্থানে ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে আছি, এখানে আর নষ্ট দুষ্টু মেয়েমানুষ নিয়ে পরকালটা খোয়াতে পারব না।

বীরু ছটফটিয়ে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, আঃ, কি সব যা-তা বকছ। কে ভাল, কে মন্দ তা তুমি জান? রাণী কি জেনে-শুনে খারাপ লোক পাঠাবে? বৃদ্ধ নিবে যাওয়া হুকোয় জোরে টান দিতে লাগলেন।

তুমি ছাই জানো। মহিলা কোমরে হাত দিয়ে যথাসম্ভব খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললেন, চিঠি শুনেই আমি বুঝেছি, ও কি রকমের লোক! আমরা সেই কাঁচকামিনীর গল্প শুনেছিলুম, ও সেই রকমই এক কাঁচকামিনী। না হলে ওকে কেউ কলকাতায় বাড়ী দেয়। আর যদিও দেয়, সেই বা কি বাবুর ছেলের জন্য অত বড় সম্পত্তি ইচ্ছে করে ছাড়ে কখনও? তুমি ঠিক জেনো, এর ভেতর গোলমাল আছে। ঐ ত ও সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও-ই বলুক। যে-ছেলের টাকের ভয়ে ও সম্পত্তি ছেড়ে দিলে, সে নিশ্চয়ই ওর পেটের ছেলে, বাবুর জন্মিত। রাণী ত আর আগে ওদের চিনত না, ওরই কাছে যা শুনেছে ছেলেমানুষ সরল-বিশ্বাসে তাই লিখেছে। তা ছাড়া ওরা সব অনেক রকম তুক-গুণ জানে। কে জানে, ও হয়ত রাণীকে শেকড়-মাকড় খাইয়ে অমনিধারা 'বশ' করে ফেলেছে। নইলে রাণী আমার বোকাও নয়, শত্তুরও নয়, সে কেন ওকে নিয়ে আমার কন্ধে চাপাতে চাইবে। কি বল বাছা? এই ত হক কথা? তুমি যেই হও বাপু, আমার মনকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না,—মন অন্তর্যামী।

সারারাত ট্রেণ জার্নির পর সকালের অভ্যর্থনায় রেণুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিম ঝিম্ করে কাঁপতে লাগল। সে কোনমতে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যাবার ক্ষমতাটুকুও তার রইল না। কোন উত্তরও সে দেয় নি।

বৃদ্ধ হুঁকোটি পাশে নামিয়ে রেখে বল্লেন, যাকগে যাক, ওসব কেচ্ছা নিয়ে অশান্তি কোরো না। সারারাত রেলে পথে এসেছে! এখন একটু বসুক, হাতে মুখে জল দিক্—

এ্যাঃ, হয়েছে ত! তোমারও নজর পড়েছে ওর দিকে। ছি-ছি, বুড়ো হয়ে মত্তে বসেছ, এখনও ঐ সব কু-দিকে মন। তোমার তীর্থে বাস বিড়ম্বনা, এসেছ কেন কাশীতে, যাও, ওর আঁচল ধরে ফিরে যাও, আমার হাড়ে বাতাস লাগুক। চিরটাকাল আমাকে জালিয়ে—

অনেকখানি সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করে রেণু ধীরে ধীরে বল্লে, আমি চলে যাচ্ছি, এখনই—

বীরু বল্লে, কোথায় যাবেন দিদি? এখানে এই কাশীতে আর কে আছে আপনার?

বীরুর মা বল্লেন, কেন, থাকার এখানে দুঃখু কি? কত অতিথশালা রয়েছে, সেই রকম জায়গায় চলে যাক ও। কাশীর রাস্তায় দুদিন ঘুরলেই কত খদ্দের জুটে যাবে, ভাবনা কি?

বীরু বল্লে দিদি, একটু দাঁড়ান, একটা মুটে ডেকে আনি। বীরু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বীরুর মা বল্লেন, আদ্‌সী, ঐটুকু মালের জন্য আবার মুটে! নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারে না। সব নষ্ট দুষ্টু মেয়েমানুষ—

শুনতে শুনতে রেণু বীরুর পেছন পেছন দরজা পার হয়ে রাস্তায় এসে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। সহজেই ওর চোখ জলে ভরে উঠত, আজ কিন্তু এত ভৎর্সনাতেও চোখের

পাতা ভেজে নি। ওর চোখের জল কি ফুরিয়ে গিয়েছিল !

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রেণুর জন্য বীরু একটা ছোট ঘর জোগাড় করলে ধর্মশালায়। বল্লে, দিদি, হাঁড়ি কুঁড়ি সবই আপনার পুঁটলীতে আছে। চাল ডাল কিনে আনি।

রেণু বল্লে, না ভাই, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। সারারাত জেগে এসেছ রেলে। এবার বাড়ী গিয়ে নাওয়া-খাওয়া করগে। আমি আর আজ রান্না বাড়া করতে পারব না। ঐ সামনের দোকানে 'মুড়ি চিঁড়ে আছে দেখেছি, ঐসব খেয়েই আজ এবেলাটা কেটে যাবে।

এবেলা রান্না করবেন না? বীরু কথাগুলো একটা একটা করে বলেছিল, তা হলে সেই ভাল। চান করে যা হয় কিছু খেয়ে নিন, বিকেলে এসে আমি তখন ব্যবস্থা করব।

রেণু বল্লে, তুমি আর এসো না ভাই, আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। তুমি এলে তোমার মা হয়ত রাগ করবেন।

বীরু বল্লে, করুনগে। উনি ঐরকমই। বউদির পেছনে এমন লাগাই লেগেছিলেন; সে সব কথা আমার এখনও মনে আছে। আমি তখন কত ছোট। জানেন দিদি, উনি নিজে পছন্দ করে মেয়ে দেখে দাদার বিয়ে দিয়ে বউদিকে এনেছিলেন, শেষে এমন কাণ্ড সুরু করেছিলেন যে, বউদি একদিন কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়ে মরতে গিয়েছিল। বউদিকে আপনি ভাল ভাবে দেখেন নি, দেখলে বুঝতেন, বউদির সর্ব্বশরীর এখনও সেই সব পোড়া দাগ আছে। অথচ বউদি আমাদের কত ভালো !

তা উনি যদি এই রকমই তা হলে আমাকে এখানে আন্‌লে কেন ভাই, রেণু প্রশ্ন করেছিল।

বীরু বল্লে, সে কথা আমি রাণীদিকে বলেছিলুম। রাণীদি বল্লে, এখন বুড়ো হয়ে মামীমা নিশ্চয়ই সুদরে গেছে। তা ছাড়া আপনার কথায় রাণীদি বলেছিলেন যে, দিদির সঙ্গে ঝগড়া করবে এরকম লোক আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মায় নি। তা আপনি কিছু মনে করবেন না দিদি, আমার বাবা খুব ভাল লোক যাকে বলে একবারে মাটীর মানুষ। ঐ বাবার একটু যত্ন-আত্তি যাতে হয় সেইজন্যই আমার দাদা বা রাণীদি এবং আমরা সকলেই এত আগ্রহ করে আপনাকে এখানে এনেছিলুম।

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বীরু বল্লে, যাকগে দিদি, কিছু মনে করবেন না। আমি বিকেলেই আসছি। বাবাও আসতে পারে। আমার ছুটী আছে এখনও তিনদিন। দুটো দিন এখানেই থাকুন তারপর আমার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। কোন অসুবিধা হবে না। এই দু'দিনে আপনাকে সমস্ত কাশী দেখিয়ে দেব।

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। বীরুর কথায় কোন প্রতিবাদ করে ওর তরুণ মনে কোনরকম আঘাত দিতে তার ইচ্ছে হয় নি, না হলে ও স্থির জানত, কলকাতায় ও আর ফিরবে না।

ধর্মশালা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বীরু আবার ফিরে এল। বল্লে, দিদি টাকা পয়সা কিছু রাখুন, চিঁড়ে মুড়ি এসব কিনতে হবে ত।

রেণু বল্লে, টাকা কড়ি আমার সঙ্গেই আছে। কিন্‌ব'খন।

ইতস্ততঃ করে বীরু বল্লে, কিনে দিয়ে যাব?

ওর উৎসাহে বাধা না দিয়ে রেণু বল্লে। দাও, অল্পকিছু এনো।

বীরু বেরিয়ে গেল এবং কিছু পরেই ফিরে এল একেবারে ছাপোষা হয়ে। এক ঠোঙ্গা চিড়ে, তার ওপর এক ঠোঙ্গা মুড়কী, চিঁড়ের ঠোঙ্গার মধ্যে পাতায় মোড়া কতকগুলো পেঁড়া এবং বড় মাটীর ভাড়ে এক ভাঁড় সরশুদ্ধ দুধ। বল্লে, এইগুলো আস্তে আস্তে নামিয়ে নিন দিদি, না হলে সব পড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

রেণু একে একে সমস্ত নামিয়ে নিতে বীরু ওর এক পকেট থেকে বার করলে দুটো ল্যাংড়া আম এবং অন্য পকেট থেকে তিনটে মোটা মর্তমান কলা।

রেণু বল্লে, এ সব কি করেছ বীরু? তোমার দিদির পেট কি জালা না কি?

বীরু হাসতে হাসতে বল্লে এখন চল্লুম দিদি, বিকেলে আসব। এসে আপনাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব। দুপুরে ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবেন কিন্তু। খুলে-টুলে

রাখবেন না, কাশী জায়গা ভাল নয়, শেষে দেখবেন বাক্স বিছানা সব উধাও হয়ে গেছে।

বেলা এগারটা। রন্‌রনে রোদ, ছেলেটা রাস্তায় পড়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল।

রেণুর নতুন জীবন, একক সংসার সুরু হোল।

অনেকক্ষণ চুপ করে ঘরের মাঝখানে রেণু দাঁড়িয়ে রইল। শেষে পুঁটলী খুলে ঘটি গামছা বার করলে, বাক্স থেকে কাপড় নিলে, কিন্তু কলতলাটা কোথায়? যাক গে, এখনই হাত মুখ ধোয়ার কি দরকার।

দেশ বিদেশে অনেক ঘুরেছে সে। রেল, ষ্টীমার, নৌকা, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, পাল্কীতেও চড়েছে। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন করে সংসার পাতার অভ্যাস তার আছে, কিন্তু আজ সে কেমন নিরুদ্বেগ, এরকমটা পূর্ব্বে কোনদিনও হয় নি। প্রত্যেকটা নতুন জায়গায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ান, সরোজের ব্যবস্থা করা, ঝি ঠিক করা, বিছানাপত্র কোথায় কি হবে তার বন্দোবস্ত করা,—নতুন জায়গায় এসে দশপনর দিন ক্রমাগত পরিশ্রম করে নতুন সংসার গুছিয়ে তোলার অভ্যাস তার আছে। কিন্তু এখানে কোন তাগিদ নেই, যখন হোক করলেই হোল। আর কার জন্যেই বা করবে?

এমনই ভাবে কতক্ষণ কেটেছিল, ওর মনে নেই। ঘরের দরজা ওর খোলাই ছিল। একটা কুকুর দরজার কাছে এসে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে দেখে একটু একটু করে পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢোকবার উপক্রম করতেই রেণু অভ্যাস মত সেটাকে তাড়া দিলে। কুকুরটা পালিয়ে গেল।

রেণুর হাসি এল। ওর মনে হোল, ঐ কুকুরটার সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আছে। আজ সকালে সেও একটা বাড়ীতে ঢোকার উপক্রম করতেই সে বাড়ীর গিন্নি ওকে এমনই ভাবে তাড়া করেছিল।

একটা বুড়ো মতন হিন্দুস্থানী লোক ওর ঘরে দরজায় এসে ডাকলে, মায়িজী—

কে?

গোসল, রসুই ই-সব করবেন না?

রেণু বল্লে, করব। তুমি কে?

সে বল্লে, হামি এই ধরমশালার দারোয়ান আছি। গোসল, টাট্টি সব উধার হ্যায়। সে হাত দিয়ে ধর্ম্মশালার পেছন দিকে দেখিয়ে দিলে। বল্লে, বাবু কাঁহা?

রেণু বল্লে, বাবু বাইরে গেছে।

দারোয়ান বল্লে, আপকো পাস তালা হ্যায়? তালা?

ঘাড় নেড়ে রেণু বল্লে, তালা ত নেই।

নেহি? তব হামার তালা লিজিয়ে। লোকটা বেরিয়ে গেল এবং ক্ষণপরে একটা চাবিতালা এনে রেণুর হাতে দিলে।

চাবিতালা নিয়ে রেণুর মনে হোল, আজই বিকেলে একটা তালা কিনতে হবে। মনে হওয়া মাত্রই রেণুর হাসি পেল। যার ঘর নেই সে তালা নিয়ে করবে কি?

দারোয়ন বল্লে, হামি ঐ দেউড়ী পর থাকব, কোই জরুরৎ হোগা তব হামকে বোলিয়ে।

রেণু হিন্দী একেবারেই জানত না। জরুরতের মানে সে কি বুঝলে, সেই জানে, কিন্তু ঘাড় নেড়ে দারোয়ানকে সায় দিয়েছিল। দারোয়ান চলে গেল।

তারপর তালাচাবি লাগিয়ে ঘটি, গামছা, কাপড় নিয়ে জলের সন্ধানে রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকাল পাঁচটার সময় বীরু এসে হাজির। মুখ কাঁচুমাচু করে বল্লে, দেরী হয়ে গেল দিদি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘরের শেলফের দিকে চেয়ে বল্লে, ওমা আম, কলা সবই যে পড়ে রয়েছে, খান নি কিছু?

রেণু বল্লে, কত খাব? দইটা খারাপ হবার ভয়ে চিঁড়ে দই খেয়েছি। তা তোমাকে একটা আম ছাড়িয়ে দিই। আম, সন্দেশ, কলা এইসব খেয়ে একটু জল খাও।

ছেলেটা লাফিয়ে উঠল। বল্লে, ওরে বাপ্‌রে, এইমাত্র খেয়ে আসছি। এখন আর কিছু নয়। বরঞ্চ আপনি কিছু খেয়ে নিন। বেরুবেন না?

রেণু ঘাড় নাড়লে, না, কোথায় আর বেরুব?

কেন বিশ্বনাথের মন্দিরে, অন্নপূর্ণা বাড়ী, দশাশ্বমেধ ঘাট—

রেণু বল্লে, চল।

কিছু খাবেন না? বীরু প্রশ্ন করলে।

না। বরঞ্চ তুমি কিছু খাও, রেণু আর একবার অনুরোধ করলে।

ছেলেটা বোধ হয় ঐ অনুরোধই চাইছিল, মুখে বল্লে, খাব? আপনার আমগুলো খেয়ে দিয়ে যাব।

হাসি মুখে রেণু বল্লে, খাও-না, বাজারে কি আর আম নেই? আমি কিনে নেবখ'ন।

তবে দিন, ছেলেমানুষের মত বীরু উত্তর দিলে। ছেলে-মানুষই ত! কি এমন বয়স তার। হয়ত পঁচিশ কিম্বা এই রকমই হবে।

রেণু তাড়াতাড়ি ছুরি বার করে ঘটির জলে আম দুটো ধুয়ে ছাড়িয়ে আম, কলা, পেঁড়া রেকাবীতে সাজিয়ে দিলে।

বীরু বল্লে, আবার অত করে ছাড়াবার কি দরকার ছিল, বলেই খেতে সুরু করলে। খেতে খেতে বল্লে, জান দিদি, এখানে এসে অবধি এখনও আম খাওয়া হয় নি, অথচ কাশীর ল্যাংড়া বিখ্যাত। আর কি সস্তা! এগুলো এক আনা করে নিয়েছে। এক টাকায় কিনলে কুড়ি বাইশটাও দেয়। এবার নাকি আমটা এখানে খুব হয়েছে।

রেণু বল্লে, ও বাড়ীতে আম আসে নি?

সে বল্লে, বাপ্‌রে, মা তাহলে রক্ষে রাখবে না। বলবে, এত বড়লোক ত আমরা নই, যে রোজ রোজ আম খেতে হবে। ঐ সব নিয়েই ত বউদির সঙ্গে খিটমিটি লাগত। একটু ভেবে বল্লে, তবে আজ বোধ হয় আমার জন্যে আম আনতে পারে। হয়ত রাত্তিরে খাবার সময় দেবে।

কলা ছাড়িয়ে খেতে খেতে বল্লে, বউদির বাবা যখন ফল মিষ্টি পাঠাতেন তখন মা সমস্ত নিয়ে চাবি দিয়ে তুলে রাখত। তারপর জিনিষগুলো পচে গেলে একটা একটা বার করে বাদ-সাদ দিয়ে আমাদের দিতে আসত। আমরা কেউই খেতুম না, তখন নিজে রাগারাগি করে সেই পচাগুলো খেয়ে মাঝে মাঝে রোগেও পড়ত। কিছু বল্লেই বলত, দামী জিনিষ, না হয় একটু খারাপই হয়েছে, তা বলে ফেলে দিতে ত পারি না। ছেলেটা হাসতে হাসতে কাহিনী শেষ করে পেঁড়া ও জল খেয়ে বল্লে, উঃ, খুব খাওয়া হোল। চলুন এবার বেরিয়ে পড়া যাক্।

রেণু বল্লে, তোমার বাবা এলেন না। তিনি আসবেন বলেছিলেন যে।

বীরু বল্লে, বাবা মা সন্ধ্যের একটু আগে বেরিয়ে পাঠ শুনতে যান, তারপর মাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বাবা দশাশ্বমেধ ঘাটে আসবেন আমাকে বলেছেন। সেইখানে আপনার সঙ্গে তাঁর কথা হবে। আপনার সঙ্গে মা ঐ রকম ব্যবহার করাতে বাবার মনটা আজ খুব খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু বাবা আর কি করবেন? মাকে আঁটতে পারেন না। সেইজন্য উনিই ত মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে আজ প্রায় সাত-আট বছর হোল কাশীবাস করছেন।

বেরোবার জন্য কাপড়টা গুছিয়ে নিতে নিতে রেণু বল্লে, ওঁদের চলে কি করে, তোমরা টাকা পাঠাও বুঝি?

বীরু বলে, না-না, বাবা পেন্সন পান, তাইতেই ওঁদের চলে যায়। আর কিইবা খরচ? বাড়ী ভাড়াও লাগে না, এবং একটা ঝি পর্যন্ত নেই।

বাড়ীটা বুঝি ওঁর? রেণু প্রশ্ন করলে।

বীরু বল্লে, হ্যাঁ। প্রথমে বাবা বলেছিলেন, বাড়ীটাড়ি কিনব না, ভাড়া বাড়ীতেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু মা ত কারুর সঙ্গে থাকতে পারে না। তাই ঐ বাড়ীটা বাবা কিনতে বাধ্য হলেন।

রেণু ঘরে তালা লাগাবার সময় বীরু বল্লে, দোষ ত মায়ের প্রত্যেক চিঠিতে লিখছেন, একলা মুখ রগ্‌ড়ে কাজ করতে পারি না, অসুখ-বিসুখে মুখে একফোঁটা জল কে দেয় তার ঠিক নেই, দেশ থেকে যদি একটা ভাল মেয়ে টেয়েও আনতে পারতুম, এইসব প্রত্যেক চিঠিতে থাকে। এর ওপর বাবা সেবার লিখলেন, তোমাদের গর্ভধারিণীর অসুখ, চারদিন ধরে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছি, বুড়ো বয়সে কি নাকালই হচ্ছি। তাই দাদা সকলকে বলেছিল একজন ভাল লোকের জন্য। রাণীদিকেও বোধ হয় বলেছিল দাদা। তারপর এখানে আসার আগের দিনে অফিস থেকে ফিরে দাদা আপনার কথা বলে আমাকে বলেছিল, সকালে উঠে আর ফোন-টোন করা নয়, একেবারে চেৎলায় গিয়ে সেই ভদ্রমহিলা যা মাইনে চায় তাই দিতে স্বীকার হয়ে—

জিভ কেটে ছেলেটা থেমে গেল।

রেণু ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে বীরু বল্লে, কিছু মনে করবেন না দিদি। দাদা বউদি, আমি, আমরা কেউই বুঝতে পারি নি যে, আপনি মাইনে নিয়ে অন্য লোকের মত কাজ করেন না। মানে—

রেণু বল্লে, না ভাই, আমি কিছু মনে করব কেন? চিরটা কালই ত পরের বাড়ী কাটালুম, তা মাইনে নিই আর নাই নিই, ও একই কথা।

পথে বেরিয়েই বীরু এক কাণ্ড করে বসল। আমওয়ালার কাছে দর করে একটাকায় পঁচিশটা ল্যাংড়া আম কিনে

ফেল্লে। তারপর একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বল্লে, এই দুটো পয়সা দেব, এগুলো নিয়ে চল।

ছেলেটা আমওয়ালার টুকরী করে আমগুলো মাথায় তুল্লে।

বীরু বল্লে, দিদি, চলুন, এগুলো রেখে আসি।

রেণু বল্লে আমি আর কি করতে যাব, তুমি রেখে আবার ফিরে এস। আমি এইখানে দাঁড়াই।

তাহলে চাবিটা দিন, বীরু হাত বাড়ালে।

আমগুলো কোথায় নিয়ে যাবে? সবিস্ময়ে রেণু প্রশ্ন করলে।

কেন, ধর্মশালায়।

ওমা, অত আম নিয়ে ধর্মশালায় কি করব? রেণুর উত্তর।

তবে কি বাড়ীর জন্য কিনলুম নাকি? আপনি বুঝি তাই ভেবেছিলেন।

টুক্‌রী মাথায় ছেলেটা বল্‌লে, চলিয়ে বাবুজী, কিধার যানে হোগা।

ওরা এগুতে লাগল। বীরু বল্‌লে, কিছু ভয় নেই দিদি। আপনার ভাইটিকে আপনি আজ যা লোভ দেখিয়েছেন, এই আম চ'দিন পর্য্যন্ত চললে হয়। হয়ত আরও এক টাকার আম কিনতে হবে।

যেতে যেতে বল্‌লে, জানেন দিদি, যাবার দিন দু'টো বড় টুকরী কিনব। একটা আপনি রাণীদির বাড়ী নিয়ে যাবেন, একটা আমি শ্যামবাজারে নিয়ে যাব। কলকাতায় এই আম টাকায় দশটার বেশী কিছুতেই দেবে না, এ কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি।

ধর্মশালায় আম রেখে বীরু বল্‌লে, আপনার ভাল তালা নেই। এ যা তালা লাগিয়েছেন, একটা টান দিলে এ তালা ভেঙ্গে দু'খানা হয়ে যাবে।

রেণু বল্লে, তালা আমার আদৌ নেই। এটা ধর্ম-শালার দারোয়ানের তালা!

সর্বনাশ! কাউকে বিশ্বাস নেই দিদি। ও-ই হয়ত আর একটা চাবি দিয়ে সর্বস্ব বার করে নিয়ে ধর্মশালার ধর্মপুত্র সেজে বসে থাক্‌বে।

রেণুর মুখে পুনরায় হাসি এল। সেই ম্লান রিক্ত হাসি। ধর্ম্মপুত্র কে নয়? তাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেনি কে?

দোকানে এসে বীরু একটা তালা কিনে বল্লে, চলুন দিদি, এইটে লাগিয়ে দিয়ে আসি। এ সব ব্যাপারে কুড়েমি করা ভাল নয়।

বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির, জ্ঞানবাপী এইভাবে কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা ঘুরে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রেণু দশাশ্বমেধের সিঁড়িতে বসে গঙ্গা, গঙ্গার নৌকো, ওপারের আলো, এপারের লোকজন এইসব দেখছিল এবং বীরুর নানা কথায় হুঁ হাঁ দিয়ে তার মন রক্ষে করে চল্‌ছিল। বীরু ছেলেটা যে এত কথা কইতে পারে তা রেণু কাল রাত্রে ট্রেনেও ঠিক বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ যত সময় যাচ্ছে বীরু এই নীরব শ্রোতাটিকে পেয়ে ততই প্রবলবেগে গল্প করে চলেছে।

ওরই মধ্যে এক সময় বীরু বল্লে, দিদি, বাবা আসছে।

লাঠি হাতে, হাঁটুর ওপর তোলা কাপড় পরা, ফতুয়া গায়ে বৃদ্ধ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। বীরু বল্লে, এই যে বাবা, আমরা এইখানে আছি।

বৃদ্ধ বল্লেন, ও, তোমরা এইখানে? বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে বেশ কষ্ট করে সিঁড়ির ঘাটে বসলেন। ওঁর বসার কসরৎ দেখে মনে হয় ওঁর হাঁটুতে অথবা কোমরে নিশ্চয়ই বাত ছিল।

বসে একটু সুস্থ হয়ে বৃদ্ধ বল্লেন, রেণু মা, উনি মানে আমার পরিবার তোমার সঙ্গে সকালে এরকম ব্যবহার করলেন যে, সেই তখন থেকেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে। তা তুমি মা কিছু মনে কোরো না। উনি ঐরকমই। ওঁর মাথার কিছু গোলমাল আছে।

রেণু বল্লে, না বাবা, আমি কিছু মনে করি নি। উনি মায়ের মতন, যা ভেবেছেন তাই বলেছেন, এতে অন্যায় কি।

বুড়ো ওর মুখের দিকে লক্ষ্য করতে করতে বল্লেন, যা বুঝছি, তুমি মা খুব বড় ঘরের মেয়ে। তোমার বাবা কি করতেন বল ত?

বাবা শুনেছি স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, রেণু উত্তর দিলে।

শুনেছি মানে? তোমার কি তাকে মনে নেই।

না, আমার খুব ছোট বেলায় তিনি গত হয়েছেন।

তোমার ভাই বোন কে আছে?

কেউ নেই। আমিই মায়ের একা ছিলুম।

তোমার নিজের ছেলে মেয়ে?

একটি ছেলে আছে।

ছেলে কোথায় থাকে?

রেণু প্রমাদ গণলে। বল্লে, তার বিয়ে হয়েছে, ছেলেও হয়েছে, কিন্তু সে শ্বশুরবাড়ী থাকে, কাজেই সেখানে আর আমি থাকি কি করে? রেণুর কথায় কৈফিয়তের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কৈফিয়ৎটা বুঝে বুড়ো বল্লে, বুঝেছি বুঝেছি, ওসব আর বলতে হবে না মা। একটু থেমে তিনি বল্লেন, দেখ মা, বিকেল থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে থাকলে হাজার হাজার বাঙ্গালী তুমি দেখতে পাবে? বড়, ছোট, ইতর ভদ্র সব রকম। এদের মধ্যে সামান্য কেরাণী, দোকানী থেকে সুরু করে বড় বড় জজ ব্যারিষ্টার সমস্তই আছে। শিক্ষা, অর্থ, মান, সম্মান সকলেরই ভিন্ন রকমের, কিন্তু এক জায়গায় এদের মধ্যে আছে একটা পরম মিল। সেটা কি জান? এরা সকলেই আপন আপন পরিবার থেকে পরিত্যক্ত বিতাড়িত। এরা সকলেই প্রাচীন মানে ভূত, বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে এরা বলে যে এরা নাক সিঁটকে চলে এসেছে, কিন্তু লোকে বলে এদেরই সংসার এদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই তুমি যে তোমার ছেলে বউমার কাছে থাকতে পার না, সেটা আর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন নেই। এখানে যারাই বসে, তাদের সকলেরই এক অবস্থা। এই আমাকে দেখেই তুমি বোঝ না কেন?

রেণু বল্লে, কেন? আমি ত শুনেছি আপনার ছেলে বউ আপনাকে খুবই ভালবাসে। আপনার এই ছেলেও ত আপনাকে খুব ভক্তি করে।

বুড়ো বল্লে, তা করে, কিন্তু আমার ঐ সহধর্মিণীকে নিয়ে ত সংসার করা চলে না। তুমি ত এখানে আসা মাত্রই তার নমুনা পেয়েছ। তা ওঁকে আর কোথায় ফেলব বল? চিরটা জীবন, মানে আমাদের বিয়ে হয়েছে ধর প্রায় পঞ্চাশ বছর, এই পঞ্চাশ বছর ধরেই ওর এই ব্যবহার। তাই আমি ইচ্ছে করেই বড় বউমার হাতে সব ভার দিয়ে এখানে এসে বসেছি। বড় বউমা বেশ বুদ্ধিমতী। সে বড় হয়েছে। তারও ত স্বাধীনভাবে সংসার করা দরকার। আমরা কি চিরকাল তার পথের বাধা হয়ে থাকব।

রেণু আর কি উত্তর দেবে? চুপ করেই ছিল, বীরু ইতস্ততঃ করে কোথায় যেন এদিক ওদিকে চলে গিয়েছিল। হয় কথা বলা, না হয় ছট্‌ফট্‌ করে বেড়ানো এ ছাড়া সে বোধ হয় এক মিনিট স্থির থাকতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বৃদ্ধ বল্লেন, তা তুমি ত মা বীরুর সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ। মিছামিছি কতকগুলো খরচ করে এলে! তবে হ্যাঁ, কাশীটা তোমার ঘোরা হয়ে গেল। তা এখানে কি আগে এসেছিলে মা?

রেণু বল্লে, না, আসিনি। আর ফিরে যাবার ইচ্ছেও আমার নেই বাবা।

ফিরবে না? বৃদ্ধ চিন্তিতকণ্ঠে বল্লেন, তাও ত বটে, ফিরবেই বা কোথায়? তোমার কথা আমি সমস্তই পড়েছি রাণীর চিঠিতে। একটু থেমে বল্লেন, ফিরে যাবার জায়গা থাকতে কি আর কেউ কাশীতে আসে? তা এখানে থাকবে কোথায়? তেমন কোন ভাল বাড়ীও আমার জানা নেই, যেখানে তুমি মান সম্মান নিয়ে বাড়ীর লোকের মত হয়ে থাকতে পারবে। তা ছাড়া এখনকার দিনে একটা লোকের ভার নেবার মত সামর্থ্যই বা কটা লোকের আছে। যা দিনকাল পড়েছে, দশ টাকার কমে একটা লোকের এক মাস খাওয়া পরা হয় না।

রেণু বল্লে, আপনি ত কাশীতে এতদিন রয়েছেন। এখানে শুনেছি সব অন্নসত্র আছে, সেখানে কাঙ্গাল গরীবকে এমনি খেতে দেয়। তেমন ধারা কোন সত্রে আমার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন না? আমি না হয় সেখানে রান্নাও করতে পারি?

বৃদ্ধ ওর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বল্লেন, অন্নসত্র? সে ত সব ভিখারী, সন্ন্যাসীর জায়গা মা। তুমি যাবে সেখানে?

ভিখারী ছাড়া আমি আর কি বাবা? রেণুর গলাটা বুজে এল।

তাও ত বটে। আজ দুপুরে আমি আর একবার রাণীর চিঠিখানা আগাগোড়া পড়েছিলুম। সত্যি মা, রাণী যা লিখেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তোমার মত লোক এই কলিযুগে আর দুটি মিলবে না।

রেণু যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল বল্লে, আপনাকে বাবা এইটুকু করে দিতেই হবে। একটা অন্নসত্রের ব্যবস্থা।

বল্লেন, আচ্ছা দেখি। কাল সকালে খোঁজ খবর নিয়ে আমি বীরুকে দিয়ে বলে পাঠাব।

না বাবা, বীরুকে বলবেন না ও মনে কষ্ট পাবে। আপনার কাছে কখন আসব বলুন, আপনি আমাকে বলবেন।

ও, আচ্ছা আচ্ছা। তা বেশ। কাল ধর এমনই সময়ে এইখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। তা হলে আজ এখন উঠি মা, আর বেশী রাত্তির হলে উনি বকাবকি করবেন। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে অনেক কসরৎ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে রেণু ওর হাত ধরলে। বৃদ্ধ কোন আপত্তি না করে এক হাতে লাঠি অন্য হাতে রেণুকে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, উঠতে বসতেই যত কষ্ট, একবার দাঁড়ালে আমি দু'মাইল হাঁটতেও ভয় পাই না। এদিক ওদিক চেয়ে বল্লেন, বীরুটা গেল কোথায়? তোমাকে ধর্মশালায় পৌঁছে না দিলে কি তুমি যেতে পারবে?

রেণু চুপ করে ছিল। এই রাত্রে একলা পথ চিনে যাওয়া সত্যিই অসুবিধা, কারণ আসার সময় ওরা বিশ্বনাথের মন্দির এবং আরও সব কি কি জায়গা দেখে তবে এখানে এসেছিল।

বৃদ্ধ বল্লে, ঠিক আছে। তুমি এস মা, আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি যেখানে আছ ওটা আমাদের ওখান থেকে খুব বেশী দূর নয়।

বৃদ্ধ আগে আগে চলতে লাগল। রেণুর ইচ্ছা হোল, ওঁকে বলতে যে আপনি আর কষ্ট করে যাবেন না, কিন্তু বলতে গিয়েও সাহস হোল না, যদি বীরু না আসে। যেতে যেতে রেণুর মুখে এল সেই ম্লান হাসি। হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন ওকে এই গঙ্গার ধারেই সারারাত কাটাতে হবে, যেমন ঐ ওরা সব রয়েছে, থলে, ন্যাকড়া এই সব পেতে। চিরকালটা সরোজ এই ভয়ই করেছিল,—আমি না থাকলে তোকে কেউ দেখবে না রে—

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে উঠেই বৃদ্ধ এক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এখানে পাশাপাশি যতগুলো দোকান ছিল, তার মধ্যে এই দোকানটা ছোট এবং অন্ধকার মতো। এ দোকানে ইলেক্‌ট্রিকের পরিবর্তে হ্যারিকেন জলছিল। দোকানীটাও অতি বৃদ্ধ। রেণু দেখলে, দোকানের সামনের পাটাতনে দু'ভাগা কাঁচা তামাক বারকোষে সাজানো রয়েছে।

বৃদ্ধ যেতেই দোকানী খাতির করে তামাক ওজন করতে সুরু করলে। রেণু কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

বৃদ্ধ বল্লে, ওহে লালা, এখানে ঐ গোধুলিয়ার পশ্চিমে নতুন যে অন্নসত্র খুলেছে, সে সম্বন্ধে তুমি যেন সেদিন কি বলছিলে—

তামাকওয়ালা বল্লে, জী। ঐ অন্নসত্রের চৌধুরী হচ্ছে আমার ভাতিজা। বহুৎ বড়িয়া অন্নসত্র হয়েছে বাবু। সবেরে ভাত রোটী আউর সামকো বখৎ চুড়া, দোনো বখৎ খানা দেতা।

রেণু বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বৃদ্ধ বল্লেন, ঠিক হ্যায়। তা আমার দেশ থেকে একটি মেয়ে এসেছে, তার খুব অভাব। তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

তামাকওয়ালা বল্লে, কোশিস্ করব বাবুজী।

তামাক ওজন করে পাতায় জড়িয়ে সুতো বেঁধে বৃদ্ধের হাতে তামাকুওয়ালা দিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ বল্লেন, কোথা গো মা, এবার চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তামাকুওয়ালার দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, এই মেয়েটির জন্য বলছিলুম লালা। এর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

রেণুর ফর্সা কাপড় এবং ভদ্র কাঠামো দেখে তামাকওয়ালা বল্‌লে, মায়িজী থাকেন কোথায়?

সে ব্যবস্থাও কিছু নেই। আগে খাওয়ার ব্যবস্থাটা হোক, তারপর থাকার ব্যবস্থা করা যাবে।

তামাকওয়ালা রেণুর দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে, কাল বল্‌ব বাবুজী। আমার ভাতিজাকে বলে যা হয় করব।

পেছন থেকে বীরু এসে বল্লে, এর মধ্যে আপনারা উঠে পড়েছেন। ভাগ্যিস্ এইখানে ধরলুম—

কোথায় গিসলি রে, বৃদ্ধ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ওকে ধর্মশালায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলুম।

বীরু বল্লে, না বাবা, আমি যাচ্ছি। দিদিকে পৌঁছে দিয়েই বাড়ী ফিরব।

তাড়াতাড়ি আসিস, নইলে দেরী হলে জানিস ত? পিতা পুত্রকে সাবধান করে দিলেন।

রেণুর ব্যবস্থা হোল সেই অন্নসত্রে, হরকিষণলালের অন্নসত্র। হরকিষণলালের কলকাতায় বহুৎ ভারী কারবার। নামটা শুনেই রেণুর মনে হোল, এই বোধ হয় সেই,

যে ওর জাল জামিননামার দাবীতে চেৎলার বাড়ীখানা নিলেম করিয়ে নিয়েছিল। বীরুর বাবা নিজে রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বেলা দশটার সময় গোধুলিয়ার অন্নসত্রে এসে সত্রের খাতায় ওর নাম লিখিয়ে দিলেন। চৌধুরী অর্থাৎ তামাকুওয়ালার ভাতিজা খাতায় সব লিখে রেণুকে বল্লে, এইখানে টিপসহি দিতে হবে।

রেণু বল্লে, সই দিলে চলবে না?

হাঁ হাঁ উ ত আউর আচ্ছা হোবে।

রেণু ইংরাজীতে নাম সই করতে সে লোকটা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল।

এর পর বাসস্থানের বন্দোবস্তও রেণুর হয়ে গেল। ঐ চৌধুরীই করে দিলে। অন্নসত্রের বাড়ীর দোতলায় ওঠার যে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ির তলায় দরজা লাগিয়ে ছোট একটা কোটর করা ছিল। সেই কোটরে দরজাটি ছাড়া আর কোন জানলা বা ফোকর কিছুই ছিল না। সেখানে ছেঁড়া নাগড়া জুতো, পুরোনো তলাফুটো ক্যানেস্তারা, শালপাতার বাণ্ডিল, কাঠের ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি অনেক অনেক তৈজসপত্র যে যখন সুবিধে পেয়েছে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ইংরাজী জানা ভদ্দর আওরাতের জন্য চৌধুরী সেই ঘরের সব কিছু বার করে অন্নসত্রের চাকরকে দিয়ে ঘরখানা ধুইয়ে রেণুকে দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বল্লে, মায়িজী ই কামরা আপ লিজিয়ে। আরামসে বৈঠ যাইয়ে।

কিন্তু শুধু বৈঠ যাইয়ে না, শোবার জায়গাও এ ঘরে হয়। একটা মানুষ এ ঘরে শু'তেও পারে, তবে সারারাত দরজা বন্ধ করে থাকলে দম যদি বন্ধ হয়ে যায়। তা হলে কারুর অভিযোগ করা উচিত নয়। কারণ এখনকার দিনে বিনা ভাড়ায় এর চেয়ে আর কি ভাল ঘর আশা করা যায়। এ ঘরটা এতদিন পরে মাত্র ইংরাজীতে নাম সই করার গুণপণারূপ মূল্য দিয়ে রেণু উপার্জন করেছিল। সারা জীবনভোর সব কিছুই ত রেণুর নিজের গুণপনার উপার্জন, তবে বোধ হয় এইটেই তার শেষ অর্জন।

চৌধুরী বল্লে, বহিনজী আজ থেকেই ত এখানে খাওয়া থাকা করবেন।

রেণু বল্লে, আজ থাক। আজ ধর্মশালায় আছি, কাল থেকে এই কামরা নেব, এইখানেই থাব।

চৌধুরী বল্‌লে, বহুৎ আচ্ছা। কাল সবেরে আ যাইয়ে ই কামরা আপ্‌কো ওয়াস্তে রিজার্ভ থাকবে।

অন্নসত্রের চাকর ঠাকুর রেণুকে বেশ খাতিরের লোক বলে মনে করেছিল।

বেলা তিনটের কট্‌কটে রোদ্দুর মাথায় নিয়ে বীরু এসে ধর্মশালায় রেণুর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে।

রেণু শুয়েছিল। উঠে দরজা খুলে দিলে।

বীরু বেশ রাগতঃ স্বরে বল্‌লে, দিদি, আপনি ভিখারীদের সঙ্গে ছত্তরে খাবেন?

রেণু ওর দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, আমি যে ভিখারী ভাই, চিরকাল আমাকে কে খাওয়াবে?

কেন আমরা কি মরে গেছি?

ছি ছি ছি, বালাই ষাট, ও কথা বলছ কেন? তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তোমাদের ভাল শুনলেই আমার ভাল লাগবে।

আর আপনি ছত্তরে থাকলে আমাদের খুব সুখ হবে! আপনি আমাদের কি মনে করেন বলুন ত?

রেণু চুপ করে রইল।

বীরু বল্‌লে, মায়ের কথা শুনে শুনে বাবা যেন কী রকম হয়ে গেছেন। না হলে তিনি নিজে কি বলে ছত্তরে গিয়ে আপনার ব্যবস্থা করলেন আমি বুঝতে পারি না। একটু থেমে বল্‌লে, ওসব ছত্তর-মত্তর চলবে না দিদি, এই আমি বলে দিচ্ছি; আপনি কাল আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাবেন। কালকের বেনারস এক্সপ্রেসে ফিরব। আপনি রাণীদির বাড়ী, না হয় আমাদের বাড়ী যেখানে আপনার ইচ্ছে হয় থাকবেন। তারপর আমার চাকরীতে আমি যদি শিগ্‌গিরই কলকাতার বাইরে বদলী হতে পারি, তা হলে আপনি আমার সঙ্গে আমার চাকরীর জায়গায় যাবেন। মনে রাখবেন, আমার এই ব্যবস্থার যেন এদিক ওদিক না হয়।

রেণুর মনে পড়ল, অমুও ঠিক এই কথাই বলেছিল, আমার সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে থাকতে হবে। সেই অমু, যাকে সে ছ'মাস বয়স থেকে সেদিন পর্যন্ত ছেলের মত পালন করেছিল, কিন্তু বীরু? বীরুর সঙ্গে পরিচয় মাত্র তিনদিনের। তার আগে ওরা কেউ কাউকে দেখে নি, নামও শোনে নি।

কি? আমার দরখাস্ত মঞ্জুর? বীরু রেণুর মুখের দিকে প্রার্থীর মত চেয়ে রইল

রেণু বল্লে, আমি আর কি বলব? যা ভাল হয় কর।

এই ত? এই ত দিদির উপযুক্ত কথা। তা দিদি, আপনি আম ছাড়ান দেখি। বেশ ভাল দেখে ছ'টা আটটা আম ছাড়িয়ে ফেলুন, আমি আসছি এখুখুনি।

ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রেণু আম নিয়ে ধুতে বসল।

ক্ষণপরেই বীরু ফিরে এল এক ঠোঙ্গা পেঁড়া নিয়ে। ঠোঙ্গাটা নামিয়ে বীরু বল্লে, ল্যাংড়া আম আর পেঁড়া যে কি ভাল লাগে দিদি, এই জন্যেই আমার ইচ্ছে হয় কাশীতে আরও এক হপ্তা থেকে যাই।

তা থাকো না ভাই, যেতে বলছে কে?

হুঁ, থাকার জো আছে। যেখানে চাকরী করি, তারা ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাবে-না। না গেলে চাকরী নট।

রেণুর আম ছাড়াবার দেরী সইল না। বীরু একটা আম তুলে খোসা ছাড়িয়ে কামড়ে খেতে সুরু করলে। কপালের ঘামটা মোছবার অবসর পর্যন্ত পেলে না।

ছ'টা আম ছাড়ানো হলে বীরু বল্লে, আপনি খান, চুপ করে বসে রইলেন যে?

রেণু বল্লে, আমি এখন খাব না, তুমি খাও।

কেন? আপনি খাবেন না কেন? তা হলে এতগুলো আম কাটতে বল্লুম কেন? ওসব হবে না দিদি। দুজনে একসঙ্গে খাব, না হলে এই রইল সব পড়ে; ছেলেটা হাত গুটিয়ে বসল।

রেণু বল্লে, আমার এখন ক্ষিদে নেই ভাই, তুমি খাও।

খিদে নেই? তা কখনো হয়? কাশী এমনই জায়গা, বেলা বারোটার সময় একথালা ভাত খেয়েছি, আর এখন তিনটে বাজতে না বাজতে এখানে দৌড়ে এলুম আম খেতে—

হাসিমুখে রেণু বল্লে, তাই বলছি, খাও-না, থামলে কেন?

ঘাড় নেড়ে সে বল্লে, না,—একা একা খেতে ভাল লাগে না, আপনিও খান, আমিও খাই, না হলে—

রেণুর মনে পড়ল সরোজকে। বিকেলে জল খাবার সময় সে ঠিক এমনইভাবে জোর করে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে রেণুকেও একসঙ্গে খাইয়ে তবে ছেড়েছিল। তারপর থেকে বরাবর সেইটেই রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল।

রেণু বল্লে, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খাচ্ছি।

বীরু আবার খেতে সুরু করলে।

বিকেলে ওরা বেরুল বেণীমাধবের ধ্বজায়। বীরু বল্লে, দিদি, এমন জায়গায় নিয়ে তুলব যে সেখানে উঠে দাঁড়ালে গোটা কাশীটা একসঙ্গে দেখতে পাবেন। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে পারবেন ত? দশপনর তোলা উঁচু হবে, তা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি।

রেণু বল্লে, চল।

ফেরার সময় বীরু কিছুতেই শুনলে না, একখানা একা ভাড়া করেছিল। বল্লে, এতটা পথ, আপনার কষ্ট হবে।

গোধুলীয়ার মোড় পর্য্যন্ত এসে ওরা একা থেকে নামল। একাওয়ালাকে দাম চুকিয়ে এই সামান্য পথ হেঁটে যাবে, মনে মনে বীরু তাই ঠিক করেছিল, কারণ সে জানত বাবা মা কোন কোন দিন পাঠ শোনার পর পাড়ার রাস্তায় অল্প-স্বল্প কেনাকাটা করার জন্য ঘোরাঘুরি করে। রেণুকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে এটা দেখলে মা ত চটবেই, এর ওপোর বাবা যদি দেখে ছেলে একা চড়ে পয়সা নষ্ট করছে তাহলে বাবাও রক্ষে রাখবে না।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। একাওয়ালাকে টাকা দিলে ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য। তার কাছে ভাঙ্গানী না থাকায় সে গেল পাশের খাবারের দোকানে। বীরু ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েই দেখলে মার হাতে খাবারের ঠোঙা, বাবা দোকানে দাম দিচ্ছেন। একাওয়ালা দোকানদারকে টাকাটা দিলে ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য। বীরু জানত না, আজ ওরা গোধুলিয়ার বড় দোকানে এসে ছিলেন বীরুরই জন্য ভালো খাবার কিনতে।

মা ডাকলেন, বীরু, সেই দুপুর থেকে কোথায় ঘুরছিস্ রে।

বীরু বল্লে, এই এদিক ওদিক। এলুম কাশীতে, বেড়াব না?

একাওয়ালা দোকানীর কাছ থেকে খুচরা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। বাবুজী, পয়সা লিজিয়ে—

মা বল্লেন, কোথায় গিয়েছিলে একাওয়ালা?

বেণীমাধব মাঈজী।

দূরে দাঁড়ানো রেণুর দিকে মায়ের নজর পড়ল। তিনি রাস্তার মধ্যেই ফেটে পড়লেন। ঐটেকে নিয়ে গাড়ীভাড়া করে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল।

থতমত খেয়ে বীরু বল্লে, না, আমি, ও মানে দিদি—

মা বল্লেন, একাওয়ালা! ঐ মেয়েটাও তোমার গাড়ীতে ছিল ত?

এক্কাওয়ালা বীরুর হাতে পয়সা দিয়ে রেণুর দিকে দেখে বল্লে, জী।

ফতুয়ার পকেটে পয়সা ফেলে এক্কাওয়ালা নিজের গাড়ীর দিকে চলে গেল।

মা বল্লেন, লজ্জা সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসেছিস্! তোর চেয়ে তিনগুণ বয়সের একটা খান্‌কী মাগী নিয়ে গাড়ী চড়ে বেড়াতে একটু ঘেন্নাও হয় না। রাগে তিনি আর কি বলবেন ভেবেই পেলেন না।

বাবা বল্লেন, এইভাবে পয়সা নষ্ট করছিস বীরু? তোর দাদা ত কখনও এ রকম ছিল না।

এগিয়ে গিয়ে রেণুকে বল্লেন, গলায় দড়ি জোটে না, ছি-ছি ছি। ঐ এক ফোঁটা ছেলেকে নিয়ে—

মা বল্লেন, চলে আয় বাড়ীতে। রাস্তার মাঝখানে আর কেলেঙ্কারীতে কাজ নেই, চলে আয় বলছি।

বীরু এবার সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, ওকে ধর্ম্মশালায় পৌঁছে দিয়ে যাব —

আর পৌঁছাতে হবে না, কচি খুকি রাস্তায় মুচ্ছো যাবেন না, ভয় নেই। মা যেন ফেটে পড়লেন।

গোধুলিয়ার মোড়ে সন্ধ্যে আটটার সময় লোকের ভীড় কম নয়। কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে গেল। এক বৃদ্ধা বীরুর মাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে গো, ব্যাপার কি?

বীরুর মা খন্‌খনে গলায় বল্লেন, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। এক রত্তি ছেলের কাণ্ড দেখলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়।

বীরুর বাবা বল্লেন, না না, ও কিছু নয়, আপনারা যান। ও আমাদের নিজেদের ঘরের কথা—

ঘরের কথা? উনি ঘর দেখাতে এসেছেন? গুণধর ছেলের গুণপনা সব্বাই জেনে গেছে, তুমি ঢাকবে কি দিয়ে শুনি? বীরুর মা চীৎকার করতে লাগলেন।

লোকগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বীরুর বাবা লাঠি উঁচু করে গৃহিণীকে ধমকে বল্লেন, তবে কি দুনিয়ার লোককে ডেকে ডেকে বলতে হবে যে—

বলার দরকার নেই। সবাই বোঝে। কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। ছেলের বয়স হয়েছে, উপায় করছে, তুমি তার বিয়ে দাও নি কেন? তাই ত বুড়ী ছুঁড়ী যা পাচ্ছে তাই নিয়ে বাবু গাড়ী চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

বীরু এবার মরিয়া হয়ে উঠল। ভিড় থেকে বেরিয়ে রেণুর কাছে এসে জোর গলায় বল্লে, চলুন দিদি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বীরুর মা কুঁজো হয়ে হয়েই যথা সম্ভব দৌড়ে এলেন। খবর্দ্দার, বলেই বীরুর জামাটা ধরে ফেল্লেন।

কৌতূহলীদের ভিড়টাও এদিকে সরে এল।

বীরু বল্লে, জামা ছাড়। বলেই মায়ের হাতটা ছাড়িয়ে নিলে।

বীরুর মা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বলি পেটের ছেলে হয়ে একটা মাগীর জন্যে তুই আমায় হাতটা এমনি করে মুচড়ে দিলি? বৃদ্ধা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

জনতার মধ্য থেকে নানারকম টিপ্পনী শোনা গেল। সেই বৃদ্ধা বল্লেন, দিনকাল এমনই হয়েছে মা কাকে কি বলবে আর?

একজন হিন্দুস্থানী বল্লে, বাঙ্গালী লোক এ্যাসাই হ্যায়। ছোঃ ছোঃ—

গৈরিকধারী একজন বল্লে, আপনারা তীর্থে এসেছেন কেন, তীর্থস্থল কলুষিত করতে—বেলেল্লাপনার জায়গা ত অনেক আছে, কাশীধামে কেন? কথাগুলো বোধ হয় বীরু ও রেণুকে লক্ষ্য করেই বলা হোল।

মোড়ের মাথায় কনস্টেবল ভিড় দেখে এগিয়ে এসে বল্লে, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?

কুছ্ নেহি হুয়া, উ সব দিল্লগীকোবাত হ্যায় ভাই, এক দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ কনেষ্টবলকে জবাব দিয়েছিল।

কনেষ্টবল্ বল্লে, চলিয়ে চলিয়ে, রাস্তা ছোড় দিজিয়ে।

এরই মধ্যে ভিড়ের জন্য কয়েকটা টাঙ্গা, দু'খানা এক্কা এবং একখানা মোটর গাড়ী যাবার পথ পাচ্ছিল না, আটকে গিয়েছিল।

ভিড় সরাবার পর দেখা গেল, যাদের নিয়ে এত কাণ্ড সেই বীরু ও রেণু উধাও হয়ে গেছে। বুড়ো বুড়ী দু'জনে ঝগড়া করতে করতে এগিয়ে পড়ল। জনতার লোকেরা আসল মজা পালিয়েছে এইটা উপলব্ধি করে বুড়ো বুড়ীর শুরু ঝগড়ায় কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে যে যার মত কেটে পড়ল।

বাবা বল্লেন, ছিঃ, এমন কাণ্ড করলে তুমি—

মা বল্লেন, করবো না, উপযুক্ত ছেলে হয়ে সে যদি,— আমার হাতটা এখনও কন্‌কন্ করছে।

বাবা বল্লেন, তুমি বাড়ী যাও, আমি ওকে ধরে নিয়ে তবে ফিরব।

মা বল্লেন, না, ও সব চালাকী চলবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এমন বলাই বল্‌ব যে, বাছাধন এ জীবনে আর বারমুখো হবেন না।

নরম হয়ে বাবা বল্লেন, না, না, ও সব করতে যেও না। ছেলে বড় হয়েছে, উপায় করছে, ও আর তোমার সেই কোলের ছেলে নেই, এটা মনে রেখ।

মা গজ্‌রাতে লাগলেন। বল্লেন, কেন? ভয় কি? আমরা কি ওর খাই না পরি, যে, ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। যা উচিত কথা, আমি তাই পষ্টাপষ্টি বলি, কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ আমি বুঝি না।

ধর্ম্মশালায় এসে কোন্ ঘরে রেণু আছে সেটা খোঁজ করতে বাবার গলার শব্দ শুনে বীরু রেণুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেণুকে বল্লে, দরজা বন্ধ করে দিন দিদি, আমি চলি,

বাবা ও মায়ের সঙ্গে বীরুর সাম্‌না-সামনি দেখা হয়ে গেল।

মা বল্লেন, হোল, মাগীর মন রাখা হোল?

বীরু পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। মা ওর জামা ধরে কর্কশ কণ্ঠে বল্লেন, এইখানে এই ধর্ম্মশালায় আমার পায়ে হাত দিয়ে পিতিজ্ঞে কর যে জীবনে আর কখনও ওর মুখ দেখবি না। পিতিজ্ঞে কর।

বীরু বল্লে হবে হবে, আগে বাড়ী চল।

মা বল্‌লেন, না আগে পিতিজ্ঞে, তারপর বাড়ী।

বাবা বল্‌লেন, আঃ, এখানে গোলমাল কোরো না। বাড়ী চলো।

কেন, ভয় কিসের? মা বল্‌লেন, যার মা বাপ হেঁটে হেঁটে মরে, সে কিনা মাগী নিয়ে গাড়ী চড়ে হাওয়া খায়।

ধর্ম্মশালার অন্য সব যাত্রীরা গলা বাড়ীয়ে দেখতে লাগ্‌ল। ভাগ্যে ভাল, ধর্ম্মশালার দারোয়ানটা ঠিক সেই সময় ওখানে ছিল না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বীরু বল্লে, দেখ মা, বুঝেসুঝে কথা বোলো। ওকে নিয়ে বেড়াবার জন্যে আসি নি। তাহলে কাশী না এসে অন্য কোথাও যেতুম। এসে আমি সব আগে তোমাদের কাছেই গিয়েছিলুম। তোমরা ওকে জায়গা দিলে ওর জন্যে কোন চিন্তাই থাকত না। কিন্তু তোমরা ওকে তাড়িয়ে দিলে। এখন ওকে দেখা আমার কর্ত্তব্য, না হলে একা মেয়েছেলে বিদেশে কোথায় যাবে বল ত? লোকের নামে যা-তা দোষ দেবার আগে বুঝে সুঝে বলবে।

বাবা বল্লেন, বীরু, আমায় তুমি সে কথা বলতে পারবে না আমি ওর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আজই সকালে করে দিয়েছি। তারা আজ থেকেই ওকে থাকা খাওয়ার জন্য বলেছিল। ও আজই সেখানে গেল না কেন? কি মৎলবে এখনও ও এখানে রয়েছে সেটা বলতে পার?

বীরু বল্লে, বাবা, দিদির সঙ্গে কথা বলে দেখেছ ত? শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, নিজেও শিক্ষিতা শুধুমাত্র একজনকে বিপদ থেকে বাচাবার জন্য নিজে ইচ্ছে করে কলকাতার অতবড় সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে যে চলে এসেছে, তাকে ঐ ভিখারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত তুমি কি করে করলে বল ত?

তবে রাজরাণীর উপযুক্ত সিংহাসন কোথায় পাবে বলতে পার, উত্তর দিলেন মা। কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস, সেটা মনে আছে। পিতার তুল্য গুরু নেই, তার মুখের ওপর এই সব কথা।

বীরু বল্লে, ঠিক আছে, আমি আজই বাড়ী চলে যাব, জীবনে আর কখনও তোমাদের কাছে আসব না।

তাই যা। ও রকম ছেলে দূরে দূরে থাকাই ভালো, বাবা উত্তর দিলেন।

মা বল্লেন, সে কি কথা! ওর জন্য খাবার কিনলুম, সেই খাবার এখনও আমার আঁচলে বাঁধা। আর ও অমনি যাবে বল্লেই যাবে। কেমন যায় যাক দেখি, আমি এখানে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব না!

ধর্ম্মশালার রোয়াকে বসে বসে এক বৃদ্ধ মুখ হাত ধুচ্ছিল। এতক্ষণ কোন কথা কয় নি, শুধু দেখছিল মাত্র।

সে বাঙ্গালী, বল্লে, মা-ছেলের রাগারাগি ও রকম হয়, সে জন্য কি পাড়া ফাটিয়ে ঝগড়া করতে হয়? যান, বাড়ী যান, বিদেশে আর বাঙ্গালীদের মুখ পোড়াবেন না।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে ওরা আর কোন উচ্চবাচ্য না করে নিঃশব্দে তিনজনে ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দরজার ফাঁকে চোখ রেখে রেণু এতক্ষণ সমস্তই দেখছিল। বীরুর লাঞ্ছনায় রেণু যেন মরমে মরে গিয়েছিল। ছেলেটা এত ভাল, অথচ অভিশপ্ত রেণুর সংস্রবে এসে আজ তার কি অপমান! রেণুর বারবার মনে হচ্ছিল, দরজা খুলে সামনে গিয়ে বলে, বীরুর কোন দোষ নেই, যা বলতে হয় আমাকে বলুন, কিন্তু সে মনে মনে বুঝেছিল যে এর ফলে বীরুর বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তা ছাড়া ওরা যদি ঘরে এসে ঢোকে, তাহলে দেখবে, এখনও প্রায় আঠারোটা ল্যাংড়া আম ওর ঘরে সাজানো রয়েছে এবং তার গন্ধে ঘর আমোদ করছে। আম দেখলে ওরা যে কি অনর্থের সৃষ্টি করবে, তা ভাবতেও রেণুর ভয় হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই আমের জন্যই ও আজ ছত্তরের ঘরে যেতে পারে নি। অনাথিনী ছত্তরে আসবে একরাশ ল্যাংড়া আম নিয়ে, তা কি হয়! ও ভেবেছিল, আজ বিকালে আমগুলো যে কোন প্রকারে হোক্ বীরুকে দিয়ে বীরুদের বাড়ীতে পাঠিয়ে কাল সকালে অন্নসত্রে যাবে। কিন্তু বীরু বিকেল থেকে সত্রের নামে যে রকম খড়্গহস্ত হয়েছে, সে আমগুলো নিয়ে ওকে রেহাই দেবে! তবুও রেণুর শেষ আশা ছিল, বেণীমাধব থেকে ফিরে যে কোন প্রকারে হোক বীরুকে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করবে, কিন্তু বিধি বাম, কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল, রেণু যেন ঠিকমত বুঝতেই পারে না। একেই বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

দরজা ছেড়ে রেণু এসে ঘরের মেঝেয় পাতা বিছানাটায় বসল। ঘরের কোণে বিকেলের কাটা আমের খোসাগুলো এখনও জমে রয়েছে। বিকেলে খাওয়ার পর বীরু ওকে ঘর পরিষ্কার করার জন্য এক মিনিট সময়ও দেয় নি। বলেছিল, ফিরে এসে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে যখন সে যাবে তখন একসঙ্গে সমস্ত সাফ করবে রেণু। কিন্তু ফিরে এসে সেই সুযোগ আর রেণু পেলে না।

রেণু বসে বসে ভাবতে লাগল, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে সে মুখ দেখাবে কি করে। ছি ছি। কি বিশ্রী অপবাদ ভদ্রমহিলা অবলীলাক্রমে সকলের সামনে দিয়ে গেলেন। রেণু ভাবতেও পারে না যে মা হয়ে ছেলের নামে এমন কথা লোকে বলে কি করে। সে না হয় পর, তার সম্বন্ধে যা মুখে আসে তাই বলে গায়ের ঝাল ঝাড়তেও তিনি পাবেন, কিন্তু এই অপবাদ শুধু একা তার নয়, নিজের ছেলেও যে এর সঙ্গে জড়িত। নিজের ছেলের মুখে চুনকালি মাখাতে বৃদ্ধবয়সে মায়ের এতটুকু দ্বিধা হোল না!

একে একে কত কথাই রেণুর মনে পড়তে লাগল। অলকের পিসি নিজের ভাইকে নিয়ে এমনই একটা কুৎসিত সন্দেহ করেছিল। অলকের পিস্‌শাশুড়ীও ছেড়ে কথা কয় নি। এমন কি নিজের ছেলের শাশুড়ীও! যার ছেলেকে জামাই করে ঘরে নিয়ে এসেছে, সেই জামাইয়ের মায়ের সম্বন্ধে কুৎসা করলে কি নিজেদের মান বাড়বে! রেণু ভাবে, মানুষ কি বোকা যে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে এই সব কুৎসিত বিলাসে মানুষ এত আনন্দ পায়।

হারিকেনটা সমানে জ্বলছে। ঘরের দরজা ও এ পাশের জানলাটা পুরো বন্ধ। সেই বেরোবার সময় জানলা বন্ধ করেছিল, ফিরে এসে ওটা খোলবার সময় সে পায় নি। সমস্ত ঘরটা কেরোসিনের গ্যাস ও ল্যাংড়া আমের গন্ধে ভরপুর! গরমটাও এ'দিন খুব, কিন্তু গরম কি ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধ কি সুগন্ধ রেণুর কোন হুঁসই তখন ছিল না। সে যে কি করবে, তা সে ভেবেই পাচ্ছিল না।

সারাটা জীবনে জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় কাজ সে করে নি, কিন্তু তবুও তার বদনাম কি কম হোল! আবার সেই সঙ্গে মনে হোল, সরোজ ও সঞ্জীব দু'জনেই রেণুকে কত মহৎ বলে জানত! শুধু জানত নয়। লোক সমাজে কত অকপটে রেণুর প্রশংসায় ওরা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। সেই যারা নিলামে রেণুর বাড়ী কিনেছিল, তাদের কাছে তিন-তোলার ঘরখানা একমাসের জন্য নেবার সময় সঞ্জীব যা বলেছিল, তাতে রেণু নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

পৃথিবীকে রেণু দেখেছে বিভিন্ন মানুষের মধ্য দিয়ে। একদিকে যেমন অলক অপু, অপর দিকে তেমন অমু সমু। অলক অমু সহোদর ভাই, কিন্তু কত প্রভেদ। একদিকে ওর নিজের বউমা, অন্যদিকে হাকিমের স্ত্রী রাণী। একদিকে

পিসিমা ও বেয়ান, অন্যদিকে সেই ভদ্রমহিলা যিনি ওদের আলমারীটা আদর করে নিয়েছিলেন।

এই ভালমন্দ আলো আঁধারীর অবাধ সংমিশ্রণে গঠিত যে পৃথিবী, রেণু ভাবতে ভাবতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করছিল যে, এই পৃথিবীতে তার কোন স্থান আর নেই। যে আবর্জনার দল পৃথিবীর কোন কাজে আসে না, এমন কি নিজেদের কাজও যারা করতে পারে না, সেই সব মনুষ্যদেহধারী হতভাগাদের শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রেখে পরকালে পুণ্য সঞ্চয়ের প্রেরণায় যারা অতিথিশালা খুলেছে, সেই তাদেরই দয়া ভিক্ষা করে এখন থেকে দিনের পর দিন রেণুকে চুপচাপ হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, কবে তার শেষ আহ্বান আসে তারই জন্য। তাও সে কি শান্তিতে থাকতে পারবে। এই যে আজ রাস্তায় এবং এখানে এই ধর্মশালায় এত কাণ্ড করে গেলেন বীরুর মা এবং বাবা, এর পর তাকে চিনতে আর কারুরই বাকী থাকবে না। ভাল লোক তাকে দেখে নাক সিটকাবে, দুষ্ট লোক অসদুদ্দেশে তাকে বিরক্ত করতে আসবে, প্রতিবাদ করলে আজকের নাজির তুলে ধরবে। তারপর—

রেণু শিউরে উঠল। বীরু যদি কাল তাকে জোর করে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বীরু যদি ধরে, তাহলে রেণুর সাধ্য নেই, সরলপ্রাণ ছেলেটাকে প্রত্যাখান করার। কিন্তু এতে যে বীরুর সারা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। রেণু স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে বীরু রেণুকে ছাড়বে না, তার অন্ধ জেদ চেপে গেছে, অথচ রেণু সঙ্গে থাকলে বীরুকে তার নিজের ঘরবাড়ী ছাড়তেই হবে। এখান থেকে নিশ্চয়ই বড় বড় চিঠি যাবে। ওর দাদা বউদি লোক খারাপ নয় বলেই রেণুর মনে হয়েছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় ত মাত্র দু'এক ঘণ্টার। তারা কি তাদের বাবা-মার কথা অবিশ্বাস করবে? না, কখনই নয়। এমন কি রাণীও হয়ত মামামামীর কথাই বিশ্বাস করবে। বলবে, দিদি, আপনার এই কাজ! আপনার ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট একটা ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে একাচড়ে কাশীর রাস্তায় বেড়াবার কি দরকার ছিল? অথচ বীরু ক্ষেপে আছে। তারুণ্যের প্রচণ্ড আদর্শবাদ সমস্ত বিপরীত বাধা চূর্ণ করে যত দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠবে, রেণুর পক্ষে বিনা দোষেই লোক সমাজে মুখ-দেখানো ততই ভার হয়ে পড়বে। তারপর বীরু যদি চাকরী স্থান বদল করিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে একা থাকে এবং রেণুকে নিজের কাছে নিয়ে রাখে তাহলে এই সব সন্দেহকারীর দল তখন কি বলবে? বীরু ও রেণু দুজনেই দু'জনের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, অথচ দু'জনেই দু'জনের কি বিপুল ক্ষতির কারণ হবে, সেই ভেবে রেণু নিদারুণ ভীত হয়ে পড়ল।

নাঃ, রেণু আর ভাবতে পারে না! সারাটা জীবনে সে অনেক ভেবেছে। ভালবাসা পেয়েছে প্রচুর, ঘৃণাও সে কম পায় নি। দরিদ্রতম সংসারের পিতৃহীনা নিঃস্ব রেণু জেলা ও দায়রা জজের বাড়ীর সর্বেসর্বা হয়ে জজসাহেবকে সর্ব বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে, তারই হাতে মানুষ অলকও হাকিম হয়েছিল। কপর্দক শূন্য অবস্থা থেকে কলকাতায় তিনতালা বাড়ীর অধিকারিণী সে হয়েছিল, ব্যাঙ্ক এবং পোষ্টঅফিসের পাস বই আজও পর্য্যন্ত ছিটে ফোঁটা তলানী নিয়ে তার তোরঙ্গর মধ্যে পড়ে আছে। উত্থান এবং পতন সে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, কিন্তু আজ সকালে অন্নসত্রের ব্যবস্থা, বিকালে বীরুর অন্তরঙ্গতা এবং সন্ধ্যায় মিথ্যা অপবাদ সব মিলিয়ে আজকের মত মর্ম্মান্তিক দিন তার জীবনে বোধ হয় কখনও আসে নি। এই পরিবেশ থেকে অবশ্যই পালাতে হবে। নিজের জন্যও যদি না হয়, তা হলে অন্ততঃপক্ষে বীরুর জন্যও তাকে আত্মগোপন করতে হবে, অন্যথায় আগামীকাল বীরু তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করবেই এবং নিজের মুখ নিজের হাতে পোড়াতে সে ছেলে পিছপাও হবে না। তার বাবা মা হয়ত রেলস্টেশনে পর্য্যন্ত ধাওয়া করে বীভৎস এক জটিল অবস্থার দৃষ্টি করবেন।

তাছাড়া রেণুর জীবনে আর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অবশ্য অনেক দিনই ফুরিয়েছে। সেই যবে থেকে সমু স্বাধীনভাবে কেষ্টনগরে রয়েছে এবং সরোজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, সেই সেদিন থেকেই রেণুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন শুধু প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াই নয়। অপ্রয়োজনের বোঝা গুরুভার হয়ে বাড়ছে, প্রত্যহই বাড়ছে।

সরে ওকে যেতেই হবে। ঐ বীরুর জন্যেই যেতে হবে। পরের ছেলে অমুর জন্যও স্বেচ্ছায় নিজের শেষ সম্বল কলিকাতার বাড়ীখানি ছেড়েছিল, এবার অন্য এক পরের

ছেলে বীরুর জন্য নিজের অস্তিত্বই বর্জ্জন করতে হবে। ছেলেবেলায় রেণু শুনেছিল শিবি রাজার উপখ্যান, ঋষি দধীচির কাহিনী। অনেক দুঃখে রেণুর মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসির ক্ষীণ একটি রেখা।

বাইরে নিস্তব্ধ রাত। শুনসান্। রাত্রি বোধ হয় বারোটা কি একটা হয়ে গেল। রেণু উঠে ওধারের বন্ধ জানলাটা খুলে দিলে। মধ্যরাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরে ঢুকল। আঃ, বাইরেটা কত মধুর কত প্রাণপ্রদ।

তাহলে বাহিরটাই রেণুকে বাঁচাবে। ভেতরে আর নয়। ভেতরের দুর্গন্ধ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। অসহ্য এই আবহাওয়া, প্রাণঘাতী এই পরিবেশ।

তবে কি রেণু মা-গঙ্গার কোলেই তার শেষ আশ্রয় নেবে। না। 'আত্মঘাতী দিবারাতি অনন্ত নরকে করে বাস', রেণু যেন কোথায় পড়েছিল এই পদ্যটা। ঠিক মনে নেই, কিন্তু এই একটা লাইনই ওর মনে আছে।

রেণু উঠে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে। সুনসান্, কিন্তু অন্ধকার নয়। উঠানের এক পাশে ধর্মশালার আলোটা জলছিল। ধর্মশালার রোয়াকে এধারে-ওধারে কতকগুলো লোক বিছানা পেতে শুয়ে অগাধে ঘুমুচ্ছে। ধর্মশালার কুকুরটা উঠানের মঝেখানে হাত পা ছড়িয়ে আরামে খোলা আকাশর তলায় ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু কুকুরের ঘুম, অত্যন্ত সজাগ। রেণুর পায়ের মৃদু শব্দেই তার ঘুম ভেঙ্গেছিল। সে মুখ তুলে দেখে আবার ঘাড় নামিয়ে নিলে। রেণু ওখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ধর্মশালার সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার সামনে খাটিয়া পেতে বোধ হয় সেই দরোয়ানটাই ঘুমাচ্ছিল।

সব কিছুর মায়া কাটিয়ে চলে যাবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। না হলে সকাল হলেই বীরু আসবে, হয়ত সেই সঙ্গেই আসবে তার বাবা। তারপর—রেণু আর সে কথা ভাবতেও পারে না।

সদর দরজা বন্ধ আছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। রেণু জানে ধর্মশালার পেছন দিকে পাঁচিল ভেঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের কি সব কাজ হচ্ছে। সেখান দিয়ে সচ্ছন্দে বাইরে যাওয়া যায়।

রেণু তার ঘরে এসে ঢুকল। একলা যেতে হবে। এক কাপড়ে। কিছুই নেওয়া চলবে না। পুরাতন সঞ্চয় সমস্ত ফেলে দিয়ে, নিজের সমস্ত পরিচয় গোপন করে এমন কি নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে তাকে পথের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু—কিন্তু একটা জিনিষ সে নেবে। তার স্বামীর শেষ দান যা সে এতদিন ধরে এত অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করে এসেছিল। রেণুর বিশ্বাস সেই ওকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। পালন করেছে। সেটা সে ফেলে যেতে পারবে না। শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটাকে সে বহন করবে।

সেই সিঁদুর কৌটো। সধবা অবস্থায় বহু ব্যবহারে সেই কাঠের সিঁদুর কৌটোর রং চটে গিয়েছিল। একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে এক পাশ থেকে চটা উঠেও গিয়েছিল। সেই কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকারের সামান্য একটু সিঁদুর যা থেকে খুটে নিয়ে সে মাথায় দিয়েছে তার সধবা জীবনের শেষ দিনটিতে, সেই সিঁদুরের মধ্যে ছিল একটা আনি। শেষ শয্যা গ্রহণের সময় শ্রীপতির জামার পকেটে যে সাড়ে তের আনা পয়সা ছিল, সেই পয়সা থেকে সাড়ে বারো আনা খরচ হয়ে যাবার পর শেষ আনিটি রেণু তার জীবনের পরম মূল্যবান সম্পদ রূপে সিঁদুর কৌটোয় রেখেছিল। শেষ সিঁদুরের মধ্যে স্বামীর শেষ আনি। বাক্স থেকে সেই সিঁদুর কৌটো বার করে রেণু তার নিজের আঁচলে বেঁধে নিল। টাকা পয়সা যা ছিল, তাও সে সঙ্গে নিল। তারপর ঘরের চারিদিকে বিভ্রান্তের মত দেখতে দেখতে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগালে। সেই তালা, যা বীরু এই কালই তাকে কিনে দিয়েছে। তালা দিতে দিতে মনে ভাবলে, সে কি কিছু লিখে রেখে যাবে। ওর বাক্সের মধ্যে কাগজ আছে, পেন্সিলও আছে। থমকে দাঁড়াল রেণু, তারপর তালা বন্ধ করে এদিক ওদিক দেখলে, না, একমাত্র কুকুর ছাড়া কোথাও কোন জাগরণের চিহ্ন নেই। নতুন তালার সুতোয় বাঁধা দুটো চাবিই সে তালাবন্ধ দরজাটা ফাঁক করে মেঝেয় চৌকাঠের পাশে রেখে দিল। তারপর ঘাড় হেঁট করে ধর্মশালার পেছন দিকে যেখানে সেই ভাঙ্গা পাঁচিল দেখেছিল সেইদিকে চলে গেল। আকাশ এবং গাছ এবং কুকুর ছাড়া রেণুর এই বহির্গমনের সাক্ষী আর কেউই রইল না, পেন্সিলের একটা আঁচড়ও সে কারুর জন্য রেখে গেল না। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ জীবিত মানুষ মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করে অজ্ঞাতপুরে মহাপ্রয়াণ করে, রেণু আজ জীবনের মহারণ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় হারিয়ে দিয়ে জীবিত অবস্থাতেই অজ্ঞাতলোকে চলে

গেল। রাত্রির অন্ধকারে রেণু যেন মিলিয়ে গেল নিরুদ্দেশের অন্ধকারে। তোমরা, তোমরা সবাই সুখে থাক, ভাল থাক, সরোজ মাঝে মাঝেই বলত, 'সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ', রেণু সকলের জন্য সেই মঙ্গল কামনা করতে করতে সংসারের ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বৃহৎ পৃথিবীর অনাবৃত ভূমায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই বীরু এসে ঢুকেছিল ধর্মশালায়। দরজায় তালা দেখে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষাও করেছিল, শেষে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মাঈজী কাঁহা গিয়া। দরোয়ান কিছুই বলতে পারে নি। পাশের ঘরেও কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। দরজা ঠেলে দরজার ফাঁক দিয়ে বীরু দেখেছিল, মেঝের ওপর শূন্য শয্যা পূর্বের মতই পাতা আছে। ভাল ভাবে দেখতে দেখতে চৌকাঠের পাশে সুতো বাঁধা নতুন চাবি দুটো দেখে একটা কাঠি চালিয়ে চাবি বার করে ঘরও সে খুলেছিল। কাল বিকালে এই ঘরে সে যেখানে যা কিছু দেখেছিল, আজও ঠিক সেইখানেই সমস্ত জিনিষ পূর্বের মতই রয়েছে, সেই আমের খোসাগুলো পর্যন্ত, সেই ভুক্তাবশিষ্ট আমের আঁঠি, সেই পেঁড়ার ঠোঙা, সেই ঘটি, ঘটির তলায় একটু জল তখনও ছিল, কিন্তু ঘরের মালিক নেই। এ ঘর আজ ঘর নয়, যেন এক প্রাণহীন শবদেহ মাত্র।

বেলা বারোটা পর্যন্ত বীরু সেই ঘরেই বিভ্রান্তের মত বসেছিল। হাতে ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারে নি, বেলা কতটা হয়েছে। শেষে হুঁস হোল, যখন তার বাবা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সেদিন বিকেলের বেনারস এক্সপ্রেসে বীরুর কলকাতায় যাওয়া হয় নি। আরও দু'দিন সে কাশীতেই রয়ে গেল। থানায় জানালে, বিভ্রান্তের মত সারাদিন ঘাট-ফাটা রৌদ্রে কাশীর অলি-গলি, বিশ্বনাথের মন্দির চত্বর, অতিথিশালা, অন্নসত্র, হাসপাতাল যেখানে যা কিছু ছিল সর্বত্রই খোঁজ নিলে। গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল, কোথাও কোন মৃতদেহ ভেসে উঠেছে কিনা, এবং তারপর কাশী থেকে কলকাতায় চলে এল। আসার আগে থানায় গিয়ে নিজের কলকাতার ঠিকানা দিয়ে এল, যদি কোথাও কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে তাকে যেন টেলিগ্রাম করে জানানো হয়। টেলিগ্রামের খরচও সে থানায় জমা রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওরকম কোন টাকা জমা রাখার নিয়ম নেই বলে থানার দারোগা টাকা না নিয়ে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, খবর পেলে তিনি নিজে টেলিগ্রাম করবেন, পরে তাঁকে টেলিগ্রামের খরচটা দিয়ে দিলেই চলবে।

তারপর অনেক—অনেক দিন কেটে গেছে। বীরুর বিয়ে হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে, চাকরীতে উন্নতি হয়েছে, রাণীদির স্বামী নানাস্থানে বদলী হয়ে এখন কেষ্টনগরে সব্‌জজ হয়েছে, কিন্তু রাণী এখনও রেণুর দেওয়া বালাজোড় বাক্সে রেখে অপেক্ষা করছে অমুর জন্য, যে অমু এখনও ফেরে নি। অন্যদিকে বীরুর যেন কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, কালীঘাটের মোড়ে, রেল স্টেশনের ধারে, বড়লোকের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায়ের জমায়েৎ ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ছিন্ন মলিন বসনপরিহিতা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখা,—ঐসব অনাথিনীদের মুখের সঙ্গে দিদির মুখের কোন সাদৃশ্য আছে কি? অবসর সময়ে বীরুর মনে হয়, এই যে শত শত দরিদ্র বুভুক্ষু অনাথ কাঙ্গালের দল কোনমতে ক্ষুধার অন্ন জোটাবার উগ্র আশায় অহোরাত্র পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, এদের প্রত্যেকেরই পেছনে আছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের দীর্ঘ বিলপি ইতিহাস। হয়ত সেই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় ইতিবৃত্তের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আজ যারা সমাজের শীর্ষস্থানে উজ্জ্বল ভাবে যাবতীয় চাকচিক্যের মধ্যে সগৌরবে অধিষ্ঠিত, সেই সব ভাগ্যবানদের সমস্ত কীর্তিগৌরব পথের পাশে পড়ে থাকা মুমূর্ষু নিঃস্বের পুরাকীর্তির সঙ্গে নিরপেক্ষের তুলাদণ্ডে স্থাপন করলে নিতান্তই ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতীয়মান হবে।

প্রৌঢ় বীরু ভিখারিণীদের ভিক্ষা দেয়। পকেটে যখন যা থাকে, বিনা দ্বিধায় সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে যায়। তার মনে হয়, যে—দিদি পরের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন, বীরুর এই সামান্য দু'চারপয়সার দান হয়ত পরোক্ষভাবে সেই দিদির মানসিক, না-না আত্মিক, না-না ভাগবিক তৃপ্তিসাধনেই সহায়তা করবে।

—শেষ—

সৃষ্টি লীলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

তোমার জন্ম-দিনে আমার
আজ্‌কে মনে পড়ে,—
জন্ম দিলেন তিনি আমায়
তাঁ'রই বিশ্ব-ঘরে,
আমায় দিয়ে তাঁ'রই লীলায়
তোমার সৃজন তরে।

(২)

সেই সৃজনের উদ্বেলতায়
আমার এ বুক ভ'রে
বৎসলতার তুফান্ এলো
মায়ের মূর্তি ধ'রে ;
তোমায় কখন্ মহোল্লাসে
তুল্‌লো হঠাৎ গ'ড়ে।

(৩)

মায়ের জন্ম—শিশুর জন্ম
এক-সাথে যে হয়
আমার মাঝে পেলেম যে তাঁ'র
প্রথম পরিচয়।
বুঝে নিলেম—মানব-জনম
সামান্য তো নয়।

(৪)

আজও তোমায় যখন হেরি,—
স্মরি তোমার কথা,
মনে পড়ে মা হবার সেই
আদিম আকুলতা ;—
পড়লো ধরা নিজের মাঝেই
নিজের অনন্ততা।

(৫)

তাঁ'রই মাঝে বুঝে নিলেম,—
লীলার গুরু যিনি
লক্ষ সৃজন ক'রেই চলেন
কেবল কেন তিনি !
সৃষ্টি যে তাঁ'র— মুকুর লীলার,
নিজ্‌কে নিতে চিনি'।

(৬)

নিজের অতল বুক থেকে তাঁ'র
লক্ষ রূপের ধারা
বাহির করেন ; হন্ সে রূপেই
বুঝি পাগল-পারা।
এম্‌নি ক'রেই লীলায় নিজের
হন্ যে নিজে হারা।

(৭)

লীলার সে-বীজ কোথায় যাবে !
যুগ-যুগান্ত ধরি'
সৃজন করে ; সৃষ্টি আবার
চলছে সৃজন করি'
এম্‌নি ভাবেই অথই স্নেহে
জগৎ ওঠে ভরি'।

(৮)

মহাকালের ধাবন্ত ঢেউ
ছুটিছে কলোচ্ছ্বাসে।
জীবন আমার জীবন-শেষের
খেয়ার কাছে আসে।
তোমার মাঝে এই 'আমি' মোর
নোতুন হ'য়ে হাসে।

(৯)

আমি অমর—আমি অমর
অনন্ত কাল ধ'রে।
আমি অমর - আমি অমর
তোমায় সৃজন ক'রে।
মহাবৎসলতায় আমার
সব যে ওঠে ভ'রে।

(১০)

লীলার গরজ যাঁহার, তিনি
চলেন শুধু গ'ড়ে ;
জন্ম-দিনে মা'র মাঝে তাঁ'র
আশিস্ পড়ে ঝ'রে,
সেই আশিসের অঝোর ধারায়
বিশ্ব ওঠে ভ'রে।
চলেন তিনি অনন্ত কাল
এম্‌নি লীলা ক'রে।
ধন্য মোরা — ধন্য মোরা
সৃষ্টি-লীলায় ওরে !
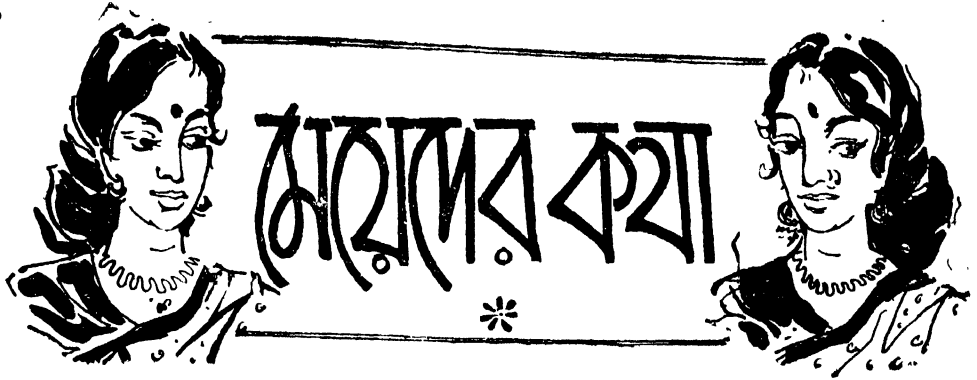
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের প্রতি কবির পক্ষপাত ছিল, কিন্তু তবু তিনি মেয়েদের অন্ধ ভক্ত ছিলেন, একথা বলা যায় না। তার প্রমাণ 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে পাই। সেখানে কবি বলেছেন—আমাদের দেশের সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রগুলোই বেশি মহৎ, পুরুষ চরিত্রগুলো অপেক্ষাকৃত হীন ও নিষ্প্রভ। এর কারণ এই যে আমাদের দেশে মেয়েরাই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ স্বরূপ কবি দেখিয়েছেন কপালকুণ্ডলার তুলনায় নবকুমার, রোহিণীর তুলনায় গোবিন্দলাল, সূর্য্যমুখী ও কুন্দর তুলনায় নগেন্দ্রনাথ, বিদ্যার তুলনায় সুন্দর, ফুল্লরার তুলনায় কালকেতু কত নিষ্প্রভ। কিন্তু কবি সেখানে এই কথা বলেছেন যে এই যে শ্রেষ্ঠতা, এর কারণ এই যে মেয়েদের জীবনে সফলতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। পুরুষের জীবনে সফলতার ক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাই তার সফলতা লাভ করা কঠিন। মেয়েদের সফলতা প্রকৃতির দেওয়া হৃদয়বৃত্তির চর্চার মধ্যেই। মেয়েদের যা কিছু মহৎ হৃদয়বৃত্তি, তা তার প্রাকৃতিক জৈব ধর্মের ফল। যেমন সন্তানকে ভালোবাসা, এ ভালোবাসা নারীর পক্ষে মহত্ত্ব হ'তে পারে, কিন্তু এ মহত্ত্ব তার জৈব প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এর জন্যে তাকে আপন প্রকৃতির উপরে জয়ী হবার জন্যে কঠিন তপস্যা করতে হয় না। এ তার সাধনা নয়, এ তার স্বভাব। এই জন্যেই মেয়েদের আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে মহত্ত্ব প্রকাশ করতে হয় না। তাদের যা কিছু ত্যাগ, যা কিছু মহত্ত্ব, সে তাদের স্বভাবের সংগে এক। এই জন্যেই মেয়েদের পক্ষে জীবনে সফলতা লাভ করা সহজ। নারী যেন প্রকৃতির অন্তরে সন্তান। প্রকৃতি তাকে তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার উপকরণ আপনি যোগান দিয়েছে, কিন্তু পুরুষের অভিযান প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে যদি সে জয়লাভ করতে পারে, যা দুরূহ, যা দুর্গম, তাকে যদি সে আয়ত্তে আনতে পারে, তবেই সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হ'তে পারে। পুরুষকে যেন বিশ্বের শক্তির ভাণ্ডার লুট করে আনতে হয়। কিন্তু সবাই তা পারে না ব'লেই অনেক পুরুষই জীবনে অকৃতার্থ। কিন্তু যারা পারে তাদের তুলনায় নারীর মহত্ত্ব অকিঞ্চিৎকর। আমাদের সমাজেও শ্রেষ্ঠ পুরুষের সংগে তুলনা করা যেতে পারে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই,তেমন নারীর নাম করা যেতে পারে না। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কলাবিদ্যায় জীবনের বৃহত্তর কোন ক্ষেত্রেই নারী শ্রেষ্ঠপুরুষের সমকক্ষ নয়। তাই নারীর জীবনে যে সুসম্পূর্ণতা দেখা যায় তার কারণ এই যে তার পক্ষে সম্পূর্ণতা লাভ করা সহজ। আপনার ছোট সংসার সীমানার মধ্যে, আপন প্রিয়জনের সেবার মধ্যেই, তার জীবনের সফলতা মেলে। পুরুষের সফলতা সেখানে মেলে না। পুরুষের পৌরুষ লাভ করা কঠিন ব'লেই তার মূল্যও বেশি। এই জন্যেই সার্থক পুরুষের সংখ্যাও কম।

কিন্তু মেয়েরা আপন আপন সংসারের মধ্যে বেশির ভাগই সফলতা লাভ করতে পারে।

এ কথাও কবি বলেছেন যে অনেক সময় আমাদের দেশের পুরুষ যে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে না, মেয়েরাই তার কারণ। মেয়েরাই তাদের মনের সংকীর্ণতা দিয়ে পুরুষের কর্মের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। মেয়েদের অন্ধ সংস্কার, আসক্তি, ঈর্ষা এবং কৃপণতা পুরুষকে অনেক সময় মহৎ প্রচেষ্টা থেকে পিছনে টেনে রাখে। মেয়েরা তখনই ত্যাগ করতে পারে, যখন তাদের হৃদয়বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাদের ত্যাগের প্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ যেখানে সন্তান বা প্রিয়জনের জন্যে ত্যাগ সেখানেই মেয়েরা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে। সাধারণ ভাবে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে তারা ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু পুরুষ যে ত্যাগ করে, সে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করে। সেখানে তার হৃদয়বৃত্তির কোন প্রেরণা নেই, সেখানে সে শুধুমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, মানুষ সাধারণের জন্যে ত্যাগ করে। এই রকম ত্যাগ করতে তাকে আপন স্বার্থ, আপন সন্তান, আপনপরিবারের জন্য সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, এ সবের প্রতিকূলে কাজ করতে হয়। তাই মেয়েদের ত্যাগ আর পুরুষের ত্যাগের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য। একটা হ'ল স্বভাবের অনুকূলে কাজ, অন্য জায়গায় কাজ স্বভাবের প্রতিকূলে। স্বভাবের প্রতিকূলে কাজ করা অনেক বেশি কঠিন। স্রোতের মুখে নৌকো আপনি ভেসে যায়। উজানে নৌকো বাওয়ার মতই পুরুষকে কঠিন সাধনা করতে হয়। তাই পুরুষের পক্ষে আদর্শ পুরুষ হওয়া, মেয়ের পক্ষে আদর্শ মেয়ে হওয়ার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন।

কবি আরও বলেছেন, প্রত্যেক ছোট সংসারের মধ্যেই যে মেয়েরা লক্ষ্মী, একথাও বলা চলে না। অন্ধ হৃদয়াবেগ যেমন অনেক সময় মেয়েদের দিয়ে কল্যাণ-কাজ করায় তেমনি অনেক সময় সংসারের নিদারুণ অকল্যাণও ঘটায়। যার হৃদয়াবেগ অন্ধ তার ভালোবাসাও অন্ধ, তার হিংসা, ঈর্ষা, নির্মমতাও অন্ধ। মেয়েরা সংসারের মর্মস্থানে বিরাজ করে। দেশের বুকে তাদের স্থান। কিন্তু মেয়েদের মূঢ়তার জগদ্দল পাথর দেশের বুকে চেপে আছে বলেই দেশকে উপরে টেনে তোলা কঠিন হয়েছে। শুধু যে মেয়েরা অশিক্ষিত বলেই এমন ঘটেছে তা নয়, তারা অত্যন্ত বেশি হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত বলেই তারা দেশের পুরুষকেও পিছনে টেনে রেখেছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধি দুর্বল, হৃদয়াবেগ প্রবল। তাই তারা প্রবৃত্তির বশেই কাজ করে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে কাজ করে না। এই জন্যেই তারা অনেক সময়েই মহৎ কাজে, কল্যাণ কাজে প্রেরণা দিতে পারে না, বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

কবি মেয়েদের সাবধান করেছেন। অনেক সময় পুরুষরা যে মেয়েদের প্রশংসাবাদ করে তাতে যেন তারা অহংকৃত না হয়ে ওঠে। তারা যেন নিজেদের দোষ সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তারা যেন নিজেদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে পুরুষের স্তবস্তুতি শুনে আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসে। পরকে ভোলাবার জন্যে অহংকার দেখানো চলে, কিন্তু সংগে সংগে নিজের মনে মনে চাপা হাসি দরকার। গম্ভীর হ'য়ে সমস্ত স্তবস্তুতি হজম করতে থাকলে সেটা মেয়েদের পক্ষে শোচনীয় হ'য়ে উঠবে। শুধু স্বর্গের দেবীরাই এই রকম অপরিমিত স্তব শুনে নির্বিকার চিত্তে তা মেনে নেয়। মর্ত্যের দেবীরাও যদি তাই করতে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে যে তাঁদের দেবীত্বের এই একমাত্র অর্থ যে তারাও দেবীদের মতই অনায়াসে অপরিমিত স্তব স্তুতি আপনার পাওনা ব'লে মেনে নিতে পারেন। এ ছাড়া তাঁদের আর কোন মাহাত্ম্য এতে প্রকাশ পাবে না। এতে তাঁদের চরিত্রের একটি মহৎ দোষ—চাটুপ্রিয়তা, সেটাই প্রমাণিত হবে। তাই কবি মেয়েদের বন্দনা গান গাইতে গাইতে তারই মাঝখানে তাঁদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন যে তাঁরা যেন এ সমস্ত স্তুতি বিনা বিচারে নিজের পাওনা বলে মনে করে অহংকারে ফুলে না ওঠেন।

[ক্রমশঃ]

সুপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রসাধন-কলার আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ ছিল—ফুল বা পুষ্প। সেকালের রমণীরাই শুধু যে বিভিন্ন ধরণের পুষ্পসজ্জায় নিজেদের কণ্ঠ, কবরী, হস্ত-পদ প্রভৃতি অপরূপ ছাঁদে বিভূষিত করে তুলতে সোৎসুক-অনুরাগিণী ছিলেন তাই নয়, তখনকার আমলের বিলাসী সৌখিন পুরুষদের মধ্যেও সুগন্ধি-পুষ্পের মাল্য ধারণ ও স্তবক ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীন যুগের রমণীসমাজে মাল্যগ্রথন বা বিচিত্রসুন্দর ছাঁদে বিবিধ ধরণের মালা গাঁথা এবং পুষ্পালঙ্কার রচনা করা ছিল ভারতীয় কলাবিদ্যার অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ। ছোট বড় সকল রকম পালপার্ব্বণ ও সামাজিক উৎসবাদিতে ছাড়াও, পুষ্পস্তবক ব্যবহার ও মাল্যধারণ রীতি, তখনকার দিনে বিলাসীসৌখিন নরনারীদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রসাধনকলার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হিসাবে গণ্য হতো। কারণ, সেকালে ফুলেরও ছিল যেমন প্রাচুর্য্য, তেমনি পুষ্পধারণের শারীরিক ও মানসিক উপকারিতার সম্বন্ধেও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ছিলেন বিশেষ সচেতন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পুষ্পধারণ সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস তাঁর সুবিখ্যাত 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উল্লেখ করেছেন :—

"অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥

প্রাচীনকালে ভারতের বিলাসী সৌখিন নরনারীদের মাল্যধারণের রীতিও ছিল নানা প্রকার। তদানীন্তনযুগের সুপ্রসিদ্ধ 'অমরকোষ' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত মাল্যধারণের রীতি সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে, সেগুলির মোটামুটি পরিচয় দিয়ে রাখি। যেমন :—

১। গর্ভক—কেশরচনার সঙ্গে যে ধরণের পুষ্পমাল্য ধারণ করা যায়।
২। প্রভ্রষ্টক—যে মালা মাথার পিছনের দিকে, অর্থাৎ মহিলাদের কবরীতে শোভা পায়।
৩। ললামক—যে মালা মাথার সম্মুখভাগে প্রলম্বিত থাকে।
৪। প্রালম্ব—যে মালা কেবল নরনারীর গ্রীবা বেষ্টন করে থাকে।
৫। বৈকক্ষক—যে মালা নরনারীর বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত ঝোলানো থাকে।
৬। অপীড়ক—ফুলের মুকুট ও শিরস্ত্রাণ।
৭। শেখরক—ফুলের শিরস্ত্রাণ ও মুকুট।

সেকালের এই ধরণের বিবিধ মাল্য ধারণ রীতি সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যগ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। যেমন :—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং
কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং
দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না॥"

(কুমারসম্ভব)

* *

"নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈঃ
বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ।"

(ঋতুসংহার)

* *

"প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং..."

(রঘুবংশ)

* *

"কপালমেবামলশেখরশ্রীঃ..."

(কুমারসম্ভব)

*　　*

এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় "মহাভারত' গ্রন্থেও সেকালের এই মাল্যধারণ রীতির বৈশিষ্ট্যকাহিনীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :—

"বিচিত্রমুকুটাপীড়া বিচিত্রকবচধ্বজা···"

(মহাভারত)

*　　*

পুষ্পমাল্য ধারণ ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নরনারী চৌষট্টিকলার অন্যতম নিম্নলিখিত কলাগুলিকে প্রসাধনসম্পর্কীয় হিসাবেই গণ্য ও সোৎসাহে অনুশীলন করতেন :—

১। বিশেষকচ্ছেদ্য।
২। দশন বসনাঙ্গরাগ।
৩। মাল্যগ্রথন বিকল্প।
৪। শেখরাপীড় যোজনা।
৫। নেপথ্যপ্রয়োগ (বেশভূষা করার কলাকৌশল)।
৬। কর্ণপত্রভঙ্গ (কানের ফুল, কানবালা প্রভৃতি অলঙ্কারনির্ম্মাণ কলা)।
৭। গন্ধযুক্তি।
৮। ভূষণযোজন।
৯। কৌচুমার যোগ (কুরূপাকে সুরূপা করার কলা-কৌশল)।
১০। সূচীবাণকর্ম্ম (পোষাকপরিচ্ছদ রচনার কলা-কৌশল)।
১১। মণিরাগাকরজ্ঞান (মণির রঞ্জন বিদ্যা প্রসাধনান্তর্গত করার কলা)।
১২। উৎসাদন।
১৩। বস্ত্রগোপন (কোনো সময়েই শ্লীলতাহানি ঘটবে না, এমনই সুকৌশলে বস্ত্রপরিধানের কলা)।
১৪। তাম্বূলধারণ (সুগন্ধিযুক্ত তাম্বূলাদি গ্রহণে মুখবাস মনোরম করে তোলার কলাবিদ্যা)।
১৫। দর্পণ-রূপদর্শন [প্রসাধন-ও সাজসজ্জার সময় দর্পণে আত্মরূপ দর্শন বিশিষ্ট কলা হিসাবে বিবেচিত হতো।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে বক্তব্য এখানেই মুলতুবী রাখতে হলো। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ

এমব্রয়ডারী শিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত 'শেভ্রন্ ষ্টিচ্' (Chevron stitch)। 'ফ্লাই-ষ্টিচ্' (Fly stitch) ও 'রুমানিয়ান্ ষ্টিচ্' (Roumanian stitch) প্রভৃতির মতোই সৌখিন সুন্দর ছাঁদে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী আরো কয়েকটি অভিনব ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতি প্রসঙ্গে মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি।

প্রথমেই যে পদ্ধতিটির পরিচয় দিচ্ছি, সেটির নাম—"ব্ল্যাঙ্কেট ষ্টিচ" (Blanket stitch)। এ পদ্ধতি অনুসারে এমব্রয়ডারী—সূচীশিল্পের কাজ করতে হলে, কি ভাবে ছুচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাই দিতে হয়, নীচের ১নং নক্সাটি দেখলেই, তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন।
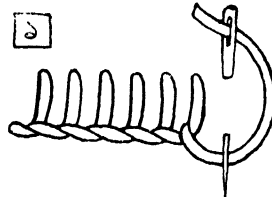
অনেকটা ঠিক এই পদ্ধতির মতোই, আরেক ধরণের
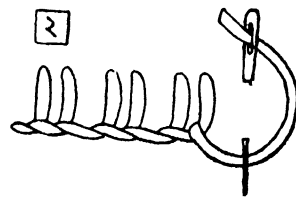
সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার রীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে ৬৫২ পৃষ্ঠার ২নং নক্সাটি। এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী উল্লিখিত এ পদ্ধতিটির নাম—"স্পেস্‌ড্‌-বাটন্‌হোল ষ্টিচ্‌" (Spaced Buttonhole stitch) বা 'ফাঁক-রাখা বাটন্‌-হোল্‌" সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার রীতি।
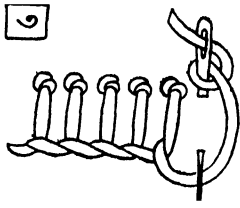
উপরের ৩নং নক্সাতে বিচিত্র ছাঁদে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার যে পদ্ধতিটির নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটির নাম "নটেড্‌-বাটন্‌হোল" (Knotted Buttonhole) বা "গিট দেওয়া বাটন্‌হোল্‌" সূচীশিল্প রীতি।
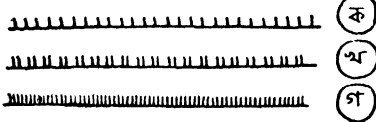
উপরের ৪নং নক্সাতে ছুচ-সুতোর ফোঁড় তুলে এমব্রয়-ডারী শিল্পের উপযোগী যে পদ্ধতিটির নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটির নাম—"টেলার্স বাটন্‌হোল্‌" (Tailor's Button hole) বা 'ওস্তাগরী বাটন্‌হোল্‌' রীতি।

উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি-অনুসারে ছুচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাইয়ের কাজ করলে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্প সামগ্রীটির রূপ কি ধরণের হবে, ছবিতে তারই মোটামুটি হদিশ পাওয়া যাবে।

এই ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতিগুলি এমব্রয়ডারী সূচীশিল্প সামগ্রী রচনার কাজে অভিনব ছাঁদের লম্বা 'পাড়' বা 'বর্ডারের' (Bordering) পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। এ ছাড়াও সুদক্ষ সূচীশিল্পকারিণী অনায়াসেই এ সব পদ্ধতিগুলিকে সুকৌশলে ব্যক্তিগত রুচিও প্রয়োজনানুযায়ী সৌখিন সুন্দর ছাঁদে এবং অভিনব ধরণের আরো নানা রকম এমব্র ডারী শিল্প সামগ্রী রচনা-অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে, পরে যথাসময়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

স্থানাভাবের কারণে, এবারের মতো উপরোক্ত চারটি বিশেষ ধরণের এমব্রয়ডারী সূচীশিল্প পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী সৌখিন সুন্দর ছাঁদের আরো কয়েকটি—অভিনব সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭

দিন তিনেক পরে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। সকালের ডাকে যে তিনখানা চিঠি এল শুভ্রাদের তার একখানা ইলেকট্রিক বিল একখানা মায়ের দূর সম্পর্কের কাকা কুশল সংবাদ চেয়ে এবং স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তৃতীয় চিঠিখানাই সব চেয়ে উল্লেখ করবার মত। না, কোন বন্ধুর চিঠি নয়, কোন প্রণয় পত্র নয় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। ইণ্ডিয়া অয়েলস অফিস থেকে নিয়োগপত্র। গ্রামের স্কুলে মাষ্টারি নেবার আগে সহরের বিভিন্ন অফিসে দরখাস্ত করেছিল শুভ্রা, কোন কোন অফিস থেকে ইণ্টারভিউর ডাকও এসেছিল। কিন্তু ওই ডাক পর্যন্তই। দেখাসাক্ষাৎ করে আসার পর কোন জায়গা থেকে আর কোন সাড়া শব্দ পায়নি শুভ্রা। পাবে যে এমন কোন আশাও ছিল না। দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো ভাই আছে ওই আফিসে। আসবার সময় শুভ্রা তাকে বলে এসেছিল 'একটু দেখবেন সীতেশদা।'

যেমন সবাইকে বলে তেমনি বলেছিল। সেই কথায় যে কোন কাজ হ'বে তা আশা করেনি শুভ্রা।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেখে শুভ্রার দুই ভাই বোন তপু আর শিপ্রা লাফিয়ে উঠল।

তপু বলল, 'এবার একটা চাকরির মত চাকরি পেয়েছিস দিদি। এবার আমরা নির্ঘাৎ বড়লোক হব। কেউ আর তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

শুভ্রা বলল, 'ফাজিল কোথাকার। চাকরি করে কেউ আবার বড়লোক হতে পারে নাকি? তা ছাড়া এ কীইবা এমন চাকরি। সিনিয়র গ্রেডের ক্লার্কের কাজ। কীইবা এমন মাইনে।'

শিপ্রা বলল, 'তবু তোর গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারির থেকে অনেক ভালো। কী বলো মা, তাইনা?'

নলিনী রান্নাঘরে ছিলেন। বেরিয়ে এসে মেয়েদের কাছ থেকে সব শুনলেন। তারপর খুশি হয়ে বললেন, অনেক ভালো। কোথায় সেই মাষ্টারি করতে যায়। সারা দিনমানের মধ্যে ওর আর মুখ দেখতে পাইনে।'

শিপ্রা হেসে বলল 'এবার আর সে দুঃখ তোমাকে ভোগ করতে হবেনা মা। দিদির এই চাকরিতে তুমি সাড়ে নটা পর্যন্ত ওর মুখ দেখতে পাবে আবার সাড়ে

পাঁচটার পর থেকে ওই বাটা মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে পারবে।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'মোটেই আমার মুখ বাটার মত দেখতে নয়। জানো মা শিপ্রা হিংসেয় ফেটে মরছে।'

শিপ্রা বলল, 'শুধু কি ফাটা? ফেটে বুকটা একবারে চৌচির হয়ে গেছে দিদি।'

এই আনন্দ উল্লাসের মাঝখানে নলিনী হঠাৎ একটি আশঙ্কার প্রশ্ন করে বসলেন 'আচ্ছা শুভ্রা, তুই যে অফিসে কাজ করবি সেইখানে আরো মেয়ে কাজ করে তো?'

শিপ্রা গম্ভীর ভাবে বলল 'না মা আর কোন মেয়ে সেখানে নেই। সব দাড়ি গোঁফওয়ালা পুরুষ। বাঙ্গালী কম, অবাঙ্গালীই বেশি। গোঁফ দাড়ি আর বড় বড় পাগড়ি।'

শুভ্রা ধমক দিয়ে বলল 'কেন মাকে অমন করে ভয় দেখাচ্ছিস।' না মা সেখানে আমার মত বহু মেয়ে কাজ করে। তুমি কিছু ভেবনা মা।'

স্কুলে গিয়ে এই শুভ সংবাদটি কলীগদের জানাল শুভ্রা। কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত কেউ বা শুনে খুশিই হল। সেই চিত্রা আর ইন্দিরা যাদের সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ হয়েছিল শুভ্রার তারাও খুসি হল। তারা প্রায় শুভ্রারই সমবয়সী।

ইন্দিরা একটু বিষণ্ণ সুরে বলল, 'তুমি যে এত শীঘ্র আমাদের ছেড়ে চলে যাবে শুভ্রা আমরা কেউ ভাবিনি।'

চিত্রা বল 'কী যে বলিস ইন্দু ও কি আমাদের মত হেজি পেজি যে গণ্ড গাঁয়ে পড়ে থাকবে! ওর কত গুণ। ইন্দিরা বললে 'রূপও কি কম নাকি? রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।'

শুভ্রা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহাহা। তোমাদের সবই বাড়াবাড়ি।'

সেক্রেটারী রামনারায়ণ বসাকও শুনলেন কথাটা। ছুটির একটু আগে স্কুলে নিজেই এলেন। তারপর শুভ্রার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'সত্যি-নাকি? আপনি কি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন মিস দত্ত চৌধুরী?'

শুভ্রা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'দেখুন যেতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পেয়ে গেলাম একটা চান্‌স্। তা ছাড়া এই কুমারপুর একটু দূরও হয়।' রামবাবু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, 'একটু মানে বেশ দূর। রোজ বিশ মাইল পথ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা সোজা কথা নাকি? ছেলেদেরই কষ্ট হয় আর আপনি তো কোমল প্রাণা মেয়ে।'

কোমলপ্রাণা কথাটি শুনে শুভ্রার হাসি পেয়েছিল। কিন্তু মুখ নিচু করে সেই হাসিটুকু সে গোপন করল।

একটু বাদে মুখ তুলে নিয়ে শুভ্রা বলল 'যাতায়াতের অসুবিধে একটু ছিল। কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। আপনাদের কাছ থেকে এত আদর যত্ন পেয়েছি—। তবু মা চাইছিলেন আমি সহরের ওপরই কিছু একটা করি।'

রামবাবু বললেন, 'তা করবেন বই কি। শহরে কিছু করবার সুবিধে পেলে কে আর গ্রামে আসতে চায় বলুন? সারা দেশের সব গ্রাম আজকাল শহরের দিকে মুখ করে রয়েছে। আপনাকে আমি আটকে রাখব না। কালকেই রিলিজ করে দেব। সর্টিফিকেটও দিয়ে দেব একখানা—I wish you success in life.'

রামবাবু একটু হাসলেন, 'যে কথাটা কাল কাগজে কলমে লিখে দেব, তা আজই মুখে বলে ফেললাম।'

শুভ্রা বলল, 'ভালোই তো। আপনার আশীর্বাদ আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

রামবাবু বললেন, 'একটি ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা করতে হয়। আমি হেডমিষ্ট্রেসকে বলি।'

শুভ্রা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না না, ও সব কিছু করতে যাবেন না। ভারি লজ্জায় পড়ব। মাত্র তিন মাস তো কাজ করেছি।'

রামবাবু বললেন, 'তাতে কি। সময়টাই কি সব নাকি। এই তিন মাসের মধ্যেই আপনি যা পপুলার হয়ে উঠেছিলেন—'

হেডমিষ্ট্রেসের বোধ হয় তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সেক্রেটারীর অনুরোধ এড়ানো তাঁর পক্ষে কঠিন হল। ভঙ্গিটা অনুরোধের, আসলে তো তা আদেশ। তাই ছোট খাটো রকমের একটি ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা হল। স্কুলের হল ঘরখানায় ছাত্রীরা এসে জড়ো হল। টিচাররাও এলেন। সেক্রেটারীই প্রেসিডেন্টের আসন নিলেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইল ছাত্রীরা। শুভ্রার গুণপণার কথা উল্লেখ করে তার কয়েকজন সহকর্মিণী বক্তৃতাও দিলেন।

নিতান্তই মামুলী কথা। গতানুগতিক আয়োজন। তবু শুভ্রার জীবনে সবই তো এই প্রথম। প্রথম চাকরি, প্রথম বিদায় অভ্যর্থনা। অনুষ্ঠানটুকু তার খুব ভালো লাগল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মাঝে মাঝে চোখ তার সজল হয়ে উঠল।

এরপর শুভ্রাকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্ট।

শুভ্রা সঙ্কুচিতভাবে বলল, 'আমি আর কী বলব। না না, আমি কিছু বলতে পারব না।'

হেডমিষ্ট্রেস আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই কি হয়? কিছু তোমার বলা উচিত। অন্তত দুটি কথা বললেও বল।'

অগত্যা শুভ্রাকে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। মাইকের কোন দরকার ছিল না। এতটুকু ঘর। আর এসেছেই বা কজন। তবু সেক্রেটারীর উদ্যমের সীমা নেই। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ঘটতে তিনি দেবেন না।

মাইকের সামনে শুভ্রা প্রথমে নির্বাক হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল সে বুঝি কিছু বলতেই পারবে না। একটি সেনটেনসও বেরোবে না তার মুখ থেকে। কিন্তু একটু চেষ্টা করবার পর বেরোল কথা।

শুভ্রা বলল, 'সত্যি আমি কিছু বলতে পারছিনে। বলবার আমার কিছু নেইও। অল্পদিন হল আমি এখানে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিনের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা। এই আমার প্রথম কাজ করতে আসা। ছাত্রীদের, কর্মীদের প্রথম শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা। এসব কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।'

অতি সাধারণ কথা। তবু বলবার ভঙ্গিতে সবাইরই বেশ ভালো লাগল। শেষ দিকে গলা ধরে আসছিল শুভ্রার। সেই ধরা গলায় সবাই তার ভরা হৃদয়ের পরিচয় পেল।

এর পর সেক্রেটারী উঠে দাঁড়ালেন। কোন সভায় তিনি বলতে উঠলে সহজে বসতে চান না। কিন্তু আজ তাঁকে ভারি অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। তিনি আজ আর বেশি সময় নিলেন না। অল্প কথাতেই নিজের বক্তব্য শেষ করলেন।

সেক্রেটারী বললেন, 'আমারও বলবার বিশেষ কিছু নেই। মিস দত্তচৌধুরীকে আমরা খুবই অল্পদিনের জন্যে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। তাহলেও তিনি তাঁর ছাত্রীদের যে স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন তা অল্প নয়। তারা তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রেরণা পেয়েছে। তিনি বলেছেন এই তাঁর প্রথম কাজ। আমাদের অবশ্য তা নয়। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা জীবনে এমন অনেক আসা যাওয়া দেখেছি। অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেছি আবার বিদায় অভিনন্দনেরও ব্যবস্থা করেছি। আরো হয়তো করতে হবে। তবু এরই মধ্যে কারো কারো স্মৃতি আমাদের মনে স্থায়ী হয়ে থেকে যায়। আমাদের মনে হয় মিস দত্তচৌধুরী তাঁদের একজন হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্য, সুখ আর সাফল্য কামনা করি।'

এর পর হেড মিষ্ট্রেসের ধন্যবাদ দেবার পালা। শুভ্রা নিচে নেমে ইন্দিরা আর চিত্রার পাশে এসে বসল।

হেডমিষ্ট্রেস কী যেন বলছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা সেদিকে কান দিল না। সে শুভ্রার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের সেক্রেটারীকে হতাশ করলে। তিনি সবে একটা লেডীজ হস্টেল করবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ইট আর সিমেণ্ট নাকি সব এসেও গিয়েছিল।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'বেশ তো। তোমরা থাকবে।'

ছাত্রীদের কাছ থেকে ছোটখাটো উপহার অনেক পেল শুভ্রা। কেউ দিয়েছে রুমাল কেউ বই। কেউ খাতায় পদ্য লিখে নিয়ে এসেছে। হেডমিষ্ট্রেস একটি ফুলের স্তবক উপহার দিলেন।

ষ্টেশন পর্যন্ত রামবাবু এগিয়ে দিয়ে এলেন শুভ্রাকে। এক রিক্সায় গেলেন না। দুটি আলাদা রিক্সা করা হল। একটিতে রামবাবু, আর একটিতে শুভ্রা আর চিত্রা। চিত্রা যাচ্ছে টিচারদের পক্ষ থেকে তাকে এগিয়ে দিতে।

যেতে যেতে শুভ্রার মনে হল এ পথে হয়তো আর ফেরা হবে না। দুদিকে এই মাঠ, বাঁশঝাড়, ঝোপঝাড় তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট বাড়ি। এর পর আরো কত জায়গায় যাবে, আরো কত গ্রাম দেখবে। কিন্তু কুমারপুরের এই বিশেষ পরিবেশটুকু আর না দেখাই সম্ভব।

খানিক বাদে ষ্টেশনে এসে পৌঁছল শুভ্রা। রামবাবু নিজে তার টিকিট কাটতে চললেন।

প্লাটফর্মের একপ্রান্তে কয়েকজন লোক কী যেন সব বলাবলি করছে। তাদের ভিতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে শুভ্রার সামনে থেমে দাঁড়াল। সমীরণ সুর। শুভ্রা অবাক।

সমীরণের মুখে মৃদু হাসি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। বোধ হয় বই-টই আছে।

শুভ্রা বলল, 'আপনি যে।'

সমীরণ বলল, 'আপনাকে sea off করতে এলাম। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন বলেননি তো।'

শুভ্রা বলল, 'আমিও জানতাম না। হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল।'

সমীরণ বলল, 'কি ঠিক হল বিয়ে?'

তাদের দুজনকে কথা বলতে দেখে চিত্রা সরে গিয়েছিল।

শুভ্রা আরক্ত হয়ে উঠে বলল, 'যাঃ। বিয়ে কেন। এখনি কে বিয়ে করতে যাচ্ছে? চাকরি। ভালো চাকরি পেয়েছি।'

সমীরণ হেসে বলল, 'তবু ভালো।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের ছেড়ে চললেন তাহলে। আর হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হবেনা। সে দিন, কত প্রতিশ্রুতি। গ্রামের কাজে কত সাহায্য সহযোগিতার সঙ্কল্প।

একটু অনুযোগের মত শোনাল। সমীরণ অবশ্য হাসিমুখেই বলছিল কথাগুলি।

শুভ্রা বলল, 'বাঃরে—আমি কি জানি এমন হবে?'

সমীরণ বলল, 'আর বোধ হয় কোন দিন দেখা হবেনা।'

শুভ্রা বলল, 'তা কেন। ইচ্ছা থাকলেই দেখা হবে। আমি তো আর নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিনে। তা ছাড়া আপনি আরো কতবার কলকাতায় যাবেন, আরো কত বইপত্র কিনবেন।'

সমীরণ বলল, 'আপনার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে আরো কতবার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। তাই না। তা হয়না। অমন নাটকীয় ঘটনা বারবার ঘটে না।'

শুভ্রা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, রামবাবুরা এসে পড়লেন। আর একটু বাদে এল ট্রেন। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন শুভ্রাকে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলল।

কিছুক্ষণের জন্যে কেমন মন ভারি হয়ে রইল শুভ্রার। একখানা অজানা গ্রামের সঙ্গে অতি অল্প দিনের জন্যে তার সামান্য জানাশোনা হয়েছিল। সামান্য কাজ, সামান্য মাইনে। সাধারণ আলাপ পরিচয়, বন্ধুত্ব। তবু ছেড়ে যেতে কেমন কষ্ট লাগে দুঃখ হয়! কেন এমন হয় কে জানে?'

শুভ্রা ভাবতে ভাবতে চলল।
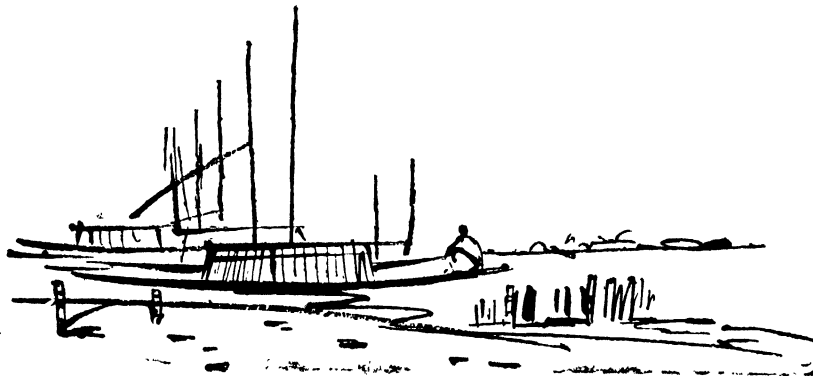
সংগ্রাম ও শান্তি

শ্রীজ্ঞান

মানুষের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে হিংসা ও লোলুপতা এবং তার থেকেই আসে হানাহানি বা যুদ্ধের প্রবৃত্তি। মানবজাতির সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে এই পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামের প্রমাণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন ঘটে তখন তোমরা কেহই জন্মগ্রহণ কর নি। কিন্তু এর পরের অনেক ছোটখাট যুদ্ধের খবর তোমরা পাচ্ছ। আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভারতের মাটিতেও যুদ্ধ হয়ে গেছে—চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের মোকাবিলা আমাদের করতে হয়েছে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ছোট খাট এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক যুদ্ধই বিশ্বের নানা স্থানে সংঘটিত হয়েছে। এই সকল যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন তার থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনাও যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সেই মহাভয়ঙ্কর তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ এখনও ঘটেনি। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে ঘটবে না তাও বলা চলে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াই এখন বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই দুই দেশ যুদ্ধরত যে কোনও দুই পক্ষের হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেই তা মহাযুদ্ধের আকার নেবে। অতীতে কয়েকবার, বিশেষ করে বার্লিন অবরোধ ও কিউবার যুদ্ধের ব্যাপারে এই রকম অবস্থা প্রায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, সৌভাগ্যবশতঃ দুই পক্ষই যথেষ্ট ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সে রকম কোনও মহা বিপর্য্যয়ের মুখে বিশ্বকে ঠেলে দেয় নি।

এই তো সম্প্রতি পশ্চিম এসিয়ায় এক দারুণ যুদ্ধ হয়ে গেল। সমগ্র আরব দুনিয়া ইহুদি রাষ্ট্র ইস্রায়েল-এর বিপক্ষে নেমেছিল। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নেতৃত্বে সমগ্র আরব ভূমির নৃপতি ও নায়করা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের পতাকাতলে এক হয়ে নব গঠিত ইস্রায়েল রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। আরবরা চাইছেন আরব দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। আর অপর পক্ষে ইস্রায়েলিরা, যাদের আগে পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি বলে কিছু ছিল না, তাদের এই নবলব্ধ দেশের স্বাধীনতা তথা অস্তিত্বকে রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এক ঊষর মরুখণ্ডকে অক্লান্ত পরিশ্রমে ইস্রায়েলিরা সবুজ উদ্যানে পরিণত করেছে, গড়েছে বিরাট ও সুন্দর শহর, নির্ম্মাণ করেছে মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। মরুর বুকে এই যে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র তারা গড়ে তুলেছে একে রক্ষা করবার জন্য তারাও মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশগুলিও এক এক পক্ষকে সমর্থন করছে। অবশ্য তারা এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি বলেই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হয় নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য। নিরাপত্তা পরিষদ (security council) দুই পক্ষকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন অবিলম্বে অস্ত্র সম্বরণ (cease fire) করে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য। তারপর এই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইস্রায়েল বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে আরব বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করে আরব ভূখণ্ডের অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেলেছে। যাই হোক, আশা হয় এবার পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে এবং দুইপক্ষই তাঁদের মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে নেবেন।

সংগ্রাম যেমন মানবের একটি কর্ম্ম, তেমনি শান্তিও মানবের ধর্ম্ম হওয়া উচিত। তা নইলে হয়ত অচিরেই একটি মহা ভয়ঙ্কর বিশ্ব-যুদ্ধের কবলে পড়ে মানব জাতি তথা সারা জীবজগতেরই ধ্বংস সাধিত হবে! তোমরা, যারা বড় হয়েছ, তারাও নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করতে পারছ। আণবিক যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা তোমাদেরও অজানা নয়। প্রার্থনা কর সেই বিশ্ব-ধ্বংসী ভয়ঙ্কর দিন যেন না আসে—মানুষ যেন মারামারি, হানাহানি ভুলে নিজের দেশে ও অপরের দেশে শান্তিতে বাস করতে পারে।

***
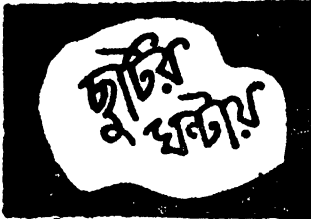
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি অভিনব-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি। বিচিত্র রহস্যময় এ খেলাটির নাম—"অদৃশ্য-আলোর আজব-কারসাজি।" ছুটির দিনে আত্মীয় বন্ধুদের সামনে এ খেলাটি দেখিয়ে তোমরা তাঁদের প্রচুর আনন্দদান ছাড়াও, অনায়াসেই রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলি নিতান্তই টুকিটাকি ঘরোয়া ধরণের এবং আদৌ ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। অর্থাৎ, এ খেলা দেখাতে হলে জোগাড় করা চাই—একবাটি জল, একমুঠো লবণ, পরিচ্ছন্ন কাপড়ের টুকরো দিয়ে পাকানো দু'তিনটি পলিতা (a clean catton-wick) একটি স্পিরিট-ল্যাম্প। (a spirit lamp) বা 'কুপি-বাতি', একখানি নীল রঙের ও একখানি হলদে-রঙের কাঁচ এবং একবাক্স দেশলাই। ফর্দ্দ মতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করে, আসরে দর্শকদের সামনে খেলাটি দেখানোর আগেই, সকলের অগোচরে বাটির জলে লবণটুকু মিশিয়ে বেশ কড়া ধরণের 'মিশ্রণ' (a strong solution of salt and water) তারপর সেই 'লবণাক্ত মিশ্রণে' (saline mixture) বাতির পলিতাগুলিকে কিছুক্ষণ বেশ ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে, সেগুলিকে রোদে বাতাসে মেলে আগাগোড়া শুকনো খটখটে করে রাখো।

উদ্যোগ পর্ব্বের এ কাজটুকু সারা হলে, শুকনো পলিতাটিকে 'স্পিরিট ল্যাম্প' অথবা 'কুপি-বাতিতে' সুষ্ঠুভাবে পরিয়ে দাও।

তারপর আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময় টেবিলের উপর পলিতা-পরানো 'স্পিরিট-ল্যাম্প' কিম্বা 'কুপি-বাতিটিকে' বসিয়ে রেখে দেশলাই কাঠির সাহায্যে বাতির পলিতাটি জ্বালিয়ে দাও। তাহলেই দেখবে—অন্ধকার ঘরের মাঝে হলদে রঙের উজ্জ্বল আলোর আভা ছড়িয়ে বাতির পলিতাটি বেশ অনেকক্ষণ জ্বলতে সুরু করেছে।

বাতির পলিতাটি এভাবে জ্বলবার সময়, দর্শকদের হাতে নীল-রঙের কাঁচখানি সপে দিয়ে, তাঁদের বলো সেই নীল-কাঁচের অভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করে আসরে টেবিলের উপর-রাখা জ্বলন্ত 'স্পিরিট-ল্যাম্প' অথবা 'কুপি-বাতি'র হলদে রঙের উজ্জ্বল শিখার পানে লক্ষ্য করতে। এমনিভাবে লক্ষ্য করার ফলে, তাঁরা সবিস্ময়ে জ্বলন্ত শিখার হলদে রঙের বদলে দেখবেন বিচিত্র আজব ফিকে-বেগুনী রঙের আলোর আভা। এবারে তাঁদের হাতে হলদে রঙের কাঁচখানি সপে দিয়ে, নীল আর হলদে দুটি রঙীন কাঁচের অভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করে আসরে টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখা জ্বলন্ত বাতির শিখার পানে তাকাতে বলো। এভাবে লক্ষ্য করার ফলে, শুধু বাতিদানটিই দর্শকদের নজরে আসবে—বিজ্ঞানের রহস্যময় লীলায় জ্বলন্ত আলোর শিখাটি হয়ে যাবে বেমালুম অদৃশ্য!

এই হলো, এবারের মজার খেলাটির আজব কারসাজি। তবে নজর রেখো—অভিনব মজার এই 'অদৃশ্য আলোর আজব কারসাজি' দেখানোর সময়, কেবলমাত্র 'স্পিরিট-ল্যাম্প' অথবা 'কুপি-বাতির' জ্বলন্ত পলিতার শিখাটি ছাড়া আসরে যেন অন্য কোনো আলোর এতটুকু আভা না থাকে। কারণ, তাহলেই এ খেলার আসল মজা বিলকুল মাটি হয়ে যাবে।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি—আজব-মজার নতুন খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। মজার অঙ্ক ঃ

এমন কি সংখ্যা আছে—যে সংখ্যাকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না···অথচ সে সংখ্যা দিয়ে নীচের এই ১১১; ১২২, ৩৩৩; ৪৪৪; ৫৫৫; ৬৬৬; ৭৭৭; ৮৮৮; ৯৯৯—সংখ্যাগুলিকে ভাগ করা চলে?

রচনা: বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

২। 'কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

প্রথমার্দ্ধ জলেতে মোর, শেষার্দ্ধ তরঙ্গে,
আঘাত পেলেই সুর জাগে নানা ছন্দে,
মধুর ধ্বনিতে তুষি মন সবাকার
বলো দেখি, তাই তোমরা—কি নাম আমার?

রচনা: কল্যাণী দেবী (কলিকাতা)

৩। একটি ঘড়ি প্রতি সেকেণ্ডে তিনবার বাজে। বলতে পারো, ছয়বার বাজতে তাহলে কত সময় লাগবে?

রচনা: রাঙ্গা মুখোপাধ্যায় (ইছাপুর)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর ঃ

১। মোট ১২ দিন—কারণ, জমিদার বাড়ির জলসা ঘরটির মাপ আসলে ছিল, বৈঠকখানার ঠিক চারগুণ বেশী।

২। মশারী।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

অনন্ত, মৃণাল, সুবোধ, কালীপ্রসাদ, নিতাই ও রামচন্দ্র চৌধুরী (আসানসোল), কুলু মিত্র (কলিকাতা), অমলেশ, অমরেশ, কুমারেশ ও সুনন্দা শিকদার (হায়দাবাদ), হাবলু, টাবলু, পুতুল, সুমা, নিপু, সঞ্জীব, সনৎ, সনৎ, ও প্রকৃতি মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), রেণু, দুর্গা, গৌর, লিপি, প্রণব ও লিলি (গয়া), সৌবাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিনি, রনি, সুধীন ও আরতি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), বিজয়, বিনয়, অজয়, ইন্দ্র ও গঙ্গা সিংহ (কলিকাতা), মোহনদাস, করঞ্জাক্ষ, নলিনাক্ষ ও বিশালাক্ষী সেনরায় (কাটোয়া), রাণা, বুনা, ক্ষেপী, প্রশান্ত ও বাপি (রাণাঘাট), পুপু, ভুটন ও বাবুট মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সঞ্জয়, সুনীল, মুরারি, নমিত, বুলু, অমিয়, সত্যেন্দ্র ও লক্ষ্মী (ভিলাই, কৃষ্ণকান্ত, সজনীকান্ত, নিশিকান্ত, সুজন, রঞ্জত, বাবুয়া, কানাই, রতন, মণিমালা, সুখলতা, চারুলতা ও প্রীতিলতা হালদার (কলিকাতা),

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

শর্ম্মিষ্ঠা, সখ্য মিত্র, শচীন ও কেতকী রায় (কলিকাতা), বুবু, মিঠু, কল্যাণ ও শর্ব্বরী গুপ্ত (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), অমিয়, প্রশান্ত, রবীন, সুনীত, অমৃত, ভাস্কর, নরেন্দ্র, অমলেন্দু, কৃষ্ণলাল, তিনকড়ি, অনিল, ভুবনমোহন, দিব্যকান্তি ও অভীন্দ্রনাথ (কলিকাতা), অজিত, অজয়, হরিদাস, অমিতা, মোহিনী, কামিনী, চম্পা, ভুপেশ, সুধীশ ও কান্তিলাল বসু (নিউদিল্লী), বটুকেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, ভুবনেশ্বরী, মহেশ্বরী, জোনাকী, ও মোহনলাল রায় (কলিকাতা), পুলিন, পূর্ণিমা, অনিমা, মলিন, শ্যামল, ও কাদম্বরী রায়চৌধুরী (আন্দুল)।

ক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

এশিয়ান যুব ফুটবলঃ

ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্রায়েল ৩—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে সুত্রা কাপ জয় করেছে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে নিয়ে চোদ্দটি দেশ যোগদান করেছিল। ভারতবর্ষ লীগ পর্য্যায়ে "বি" গ্রুপে খেলে নক্‌আউট পর্য্যায়ের কোয়াটার ফাইনালে শোচনীয়ভাবে ২—৬ গোলে ইন্দোনেশিয়ার কাছে পরাজিত হয়। অথচ এই খেলার প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষ ২—১ গোলে অগ্রগামী হয়েছিল।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ:

বি-এন-রেলওয়ে ১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৬৬-৬৭) অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান। মোট ১৯টা খেলায় বি-এন আর ৩৭ এবং মোহনবাগান ৩৩ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে।

মাদ্রিদ হকি টুর্ণামেণ্ট:

মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল:—১ম ভারতবর্ষ, ২য় স্পেন এবং ৩য় বৃটেন। ফাইনালে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে স্পেনকে পরাজিত করে।

বেটন কাপ:

১৯৬৭ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে ভিলাই ইস্পাত কারখানা দলকে পরাজিত করে চারবার বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গলের পাঁচবার ফাইনালে খেলা হল।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ:

ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল পরিচালিত ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ২৯৭ রানে কালীঘাট ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি পাঁচবার এবং সর্ব্বসাকুল্যে ৮বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

বিশ্ব টেবল টেনিসঃ

স্টকহোমে আয়োজিত ২৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান মোট ৭টি বিভাগে যোগদান করে ৬টি খেতাব জয়ী হয়েছে। দলগত বিভাগে সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। ১৯৫৯ সালেও জাপান মোট সাতটি খেতাবের মধ্যে ছ'টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। বিশ্ব টেবল টেনিস খেলার সুদীর্ঘ বছরের ইতিহাসে একমাত্র জাপানই একই বছরের আসরে সর্ব্বাধিক ছ'টি খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছে। ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীনের অনুপস্থিতির ফলে জাপানের পক্ষে প্রতিযোগিতায় এই রকম নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভের পথ সহজ হয়। কারণ জাপানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রজাতন্ত্রী চীন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত—এই সময়ে যে ১১টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মোট ৭৭টি খেতাবের মধ্যে এশিয়া মহাদেশই ৫১টি খেতাব জয়ী হয়েছে—জাপান

৩৯টি এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ১২টি খেতাব। তবু ১৯৫৩ সালে জাপান এবং ১৯৬৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীন রাজনৈতিক কারণে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি এবং ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসছে। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে উঠেছিল জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন। এই প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন ৫টি এবং জাপান ২টি খেতাব জয়ী হয়। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৯তম প্রতিযোগিতায় জাপান প্রথম যোগদান করে ৪টি খেতাব জয়ী হয়—এশিয়া মহাদেশের পক্ষে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম বিশ্ব খেতাব জয়।

১৯৫২ সাল থেকে জাপান ১০টি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ৭০টি খেতাবের মধ্যে যে ৩৯টি খেতাব জয়ী হয়েছে তার হিসাব: ১৯৫২ সালে ৪টি খেতাব; ১৯৫৩ সালে যোগদান করেনি; ১৯৫৪ সালে ৩টি খেতাব; ১৯৫৫ সালে ২টি খেতাব; ১৯৫৬ সালে ৪টি খেতাব; ১৯৫৭ সালে ৫টি খেতাব; ১৯৫৯ সালে ৬টি খেতাব; ১৯৬১ সালে ৩টি খেতাব; ১৯৬৩ সালে ৪টি খেতাব; ১৯৬৫ সালে ২টি খেতাব এবং ১৯৬৭ সালে ৬টি খেতাব। তাছাড়া বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের এই বিশ্ব রেকর্ডগুলি আজও অক্ষুন্ন আছে: সর্ব্বাধিক ৭বার মহিলা বিভাগের দলগত পুরস্কার কোর্বিলোন কাপ জয়; উপর্যুপরি সর্ব্বাধিক ৫ বার (হাঙ্গেরীর সঙ্গে সমান) সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের দলগত পুরস্কার) জয়; উপর্যুপরি সর্ব্বাধিক ৪বার কোর্বিলোন কাপ জয়; একই বছরে সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ জয় ৪বার (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭ সাল)।

১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় জাপান ৭টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে ৬টি অনুষ্ঠানে বিশ্ব খেতাব জয়ী হয় এবং ব্যক্তিগত বিভাগের চারটি অনুষ্ঠানে—পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে কেবল জাপানের খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। কেবল পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে জাপানী খেলোয়াড় ছিলেন না।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: নোবুহিকো হাসিগাওয়া (জাপান) ২১—৮, ১৯—২১, ২০—২২, ২১—১৪ ও ২১—১৬ পয়েন্টে অবাছাই খেলোয়াড় মিৎসুরো কোনোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: সাচিকো মোরিসাওয়া (জাপান) ২১—১৮, ১৫—২১, ২১—১৮ ও ২১—১৭ পয়েন্টে গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান কুমারী নাওকো ফুকাজুকে পরাজিত করেন। মোরিশাওয়ার জয়লাভে জাপান ১৯৬৩ সাল থেকে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৩, ১৯৬৫ ও ১৯৬৭) মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ফুকাজুর এই প্রথম পরাজয়।

পুরুষদের ডাবলস: হান্স আলসার এবং কেজেল জোহানসন (সুইডেন) ২১—১৬, ১৯—২১, ২১—১৩ ১২—২১ ও ২২—২০ পয়েন্টে আনাতোলি আমেলিন এবং স্ট্যানিস্ল গোমোজকভকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: কুমারী সাচিকো মোরিসাওয়া এবং সাইকো হিরোতা (জাপান) ২১—১৯, ২১—১৭ ও ২২—২০ পয়েন্টে নাওকো ফুকাজু এবং নোরিকো ইয়ামানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: নোবুহিকো হাসিগাওয়া এবং নোরিকো ইয়ামানাকা (জাপান) ২১—১৫, ২২—২০, ১৯—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্টে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ান কোজি কিমুরা এবং নাওকো ফুকাজুকে (জাপান) পরাজিত করেন।

দলগত অনুষ্ঠান

সোয়েথলিং কাপ: ১ম জাপান, ২য় কোরিয়া, ৩য় সুইডেন, ৪র্থ পশ্চিম জার্মানী এবং ৫ম চেকোশ্লোভাকিয়া।

কোর্বিলোন কাপ: ১ম জাপান, ২য় রাশিয়া, ৩য় হাঙ্গেরী, ৪র্থ চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ৫ম ইংলণ্ড।

পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে (সোয়েথলিং কাপ) জাপান ৫—৩ খেলায় উত্তর কোরিয়াকে এবং মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে (কোর্বিলোন কাপ) জাপান ৩—০ খেলায় রাশিয়াকে পরাজিত করে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।